দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

ত্রিংশ বর্ষ

দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩৪৯—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

সম্পাদক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

ত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৪৯—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্রসূচী—মাসানুক্রমিক

পৌষ—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

মাঘ—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৪৯

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৫০

বহুবর্ণ চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২

বহুবর্ণ

সমাপ্তি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার মুখার্জ্জি 'পন দেখে মেটে না আশ' ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৪৯

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

রাশিয়ার খনিজ সম্পদের ক্রমবিকাশ

শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্তরায় এম্‌-এস্‌-সি, ডক্টর অব ইঞ্জিনীয়ারিং

বিগত ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে, আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন মস্কো নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়, এই অধিবেশনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভূতত্ত্ববিদ্‌ ধাতুশিল্পবিদ্‌ এবং আরও অন্যান্য বহু বিজ্ঞানী যোগ দেন। এই সুযোগে তাঁরা সবাই সোভিয়েট্‌ শাসনের ফলে মাত্র বিশ বছরে সেখানে শিল্পের যে মহতী উন্নতি ও বিরাট সাফল্য লাভ হয়েছে—রাশিয়ার এই দাবী প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। এই উন্নতি ও সাফল্যের মূলে আছে তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ভারতবর্ষ থেকে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টার সরকারী প্রতিনিধিত্বের জন্যে আমাকে মনোনীত করায় আজ নিজেকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে ক'রছি এবং নিজেকে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি ভেবে যে কয় সপ্তাহ সেখানে ছিলাম যথাসাধ্য শুধু বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহেই ব্যাপৃত ছিলাম। এ'কথা আজ অনায়াসে ও অসঙ্কোচেই বলা যায়, দুনিয়ার কোনো দেশের গভর্ণমেণ্ট রাশিয়ার মত করে ভূতত্ত্ববিদের স্কন্ধে এত দায়িত্ব ন্যস্ত করেনি। সোভিয়েট্‌ গভর্ণমেণ্ট "কেন্দ্রীয় ভূতত্ত্ব পরিচালন" এই নামে একটি পরিষদ গঠন করেছে। ইহাতে ৬০০০—১২,০০০ ভূতত্ত্ববিদ কাজ করেন। এ পরিষদের কাজ—(১) ভূতত্ত্ববিভাগীয় জরীপ, (২) খনিজ সম্পদের আবিষ্কার (৩) খনির কাজের উন্নতি এবং (৪) ষ্টেটের ব্যবহারের জন্যে কাঁচামালের সরবরাহ। উপরোক্ত কাজকর্মের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ৪ কোটি পাউণ্ড।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা হ'তে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝা যাবে যে কি পদ্ধতিতে সেখানে খনিজ সম্পদ আহরণের প্রচেষ্টা চলছে এবং প্রভূত পরিমাণ সাফল্যের জন্যে কি অসাধারণ সাজ সরঞ্জামেরই সমাবেশ হয়েছে।

পটাশের অবস্থান :—প্রথমেই বল্‌তে হয় আপার কমা পটাসিয়াম সল্টএর ভূগর্ভস্থ অবস্থানের বিষয়। সোলিকামস্ক্‌ (Solikamsk)এর পটাস-লবণাক্ত জলবাহী প্রস্রবণের কথা ৪০০ শত বছর আগেও জানাছিল। স্যার রোডারিক ইমেপ মার্চিসান্‌ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দেও তা' দেখে আসেন। তিনি এরও আগে আর একবার ওরেণ্‌বার্গ ও কাস্পিয়ানের মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ ইউরালের ইলেট্‌জ্‌কায়া ও জাষ্টিচিকার লবণের খনি দেখেছিলেন এবং তিনি এ'ও জান্‌তেন যে ভূতত্ত্বে পৃথিবীর বয়ক্রমের হিসাবের অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে

স্তরে এইসব লবণ খনি ব্যাপ্ত আছে। এই কারণেই মার্চিসান সোলিমাস্ক্ (Solikamsk)এর লবণখনির গভীরতার বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলে যান্নি। কিন্তু সোলিকাম্স্ক (Solikamsk)এর খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণের কোনো বাধাই হয়নি, কেননা লবণাক্ত প্রস্রবণ ও লবণ তৈরীর জন্যে ঐ অঞ্চল সকলেরই বিশেষ জানা ছিল। ঐ অঞ্চলে হঠাৎ যখন একটুকরা কার্নাইট পাওয়া যায় এবং প্রস্রবণের জলেও যথেষ্ট পটাস আছে দেখা যায় তখন ভূতত্ত্ব-পরিষদের বিশ্বাস হয় যে সোলিকামস্ক (Solikamsk)এর লবণ খনিতে পটাস সল্ট্ও আছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টএর অনুমতিক্রমে প্রায় বছর দশেক আগে ৩৮৬ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে নানা অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে প্রায় পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে গভীরতায় হাজার ফিটের মধ্যে সোলিকামস্ক (Solikamsk)এর পামিয়ান্ স্তরে আছে প্রভূত পরিমাণ পটাস সল্ট। গত পাচ বছরে ইহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে এখানে সিল্‌ভিনাইটএর আকারে পটাস সল্ট আছে ১৫০০ কোটি টন (১টন=২৭ মনের কিছু বেশী); ১৮০০ কোটি টন আছে ম্যাগনেসিয়াম্ ক্লোরাইড্ এবং বেশীর ভাগই কার্নালাইট—আর আছে কোটি কোটি টন খনিজ লবণ।

ইহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যে সোলিকামস্ক (Solikamsk)এর এই খনিজ সম্পদের আবিষ্কার কিছুতেই আজ এত বড় হয়ে উঠত না যদি রাশিয়ান্ গভর্ণমেণ্ট ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়ানোর কাজে পটাস সল্টএর উপকারিতা না বুঝতেন—ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের কাজে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য না করতেন।

পাঁচ বছরও হয়নি মাটিতে shafts বসানো হয়েছে। ৭৫০ ফিট নীচে গেছে সেই shaft এবং রাস্তাও নেমে গেছে নীচে। যে shaft বেয়ে নীচে নেমে গেলাম তা'তে দুইটা Winding Engine সংযুক্ত আছে। এর মধ্যে একটা হ'ল উঠা-নামার জন্যে এবং অপরটা দিয়ে পটাস্‌সল্ট ভর্ত্তি পাত্রগুলি উপরে তোলা হয়। দৈনিক প্রায় ৬০০০ টন পটাস সল্ট উৎপাদিত হয়। সকল কাজই বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়া সম্পন্ন হয়। নীচে বিদ্যুতের আলোরও ব্যবস্থা আছে এবং প্রায় সর্ব নিম্নাংশে মেরামতী কাজের জন্যে আছে একটী পূর্ণ সাজসরঞ্জামে সজ্জিত ওয়ার্কসপ্। যন্ত্রপাতি চালানোর জন্য উপরে ও নীচে মেয়েরাও কাজ করছে দেখা গেল। যেহেতু সিল্‌ভিনাইট ও অন্যান্য ধাতুজ পদার্থ ইতস্তত সর্বত্র মিশ্রিত আছে খননের কাজে তাই এমন বিশ্লেষণী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যেন পটাস সল্টএর সঙ্গে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কারণে লাইট্ ইত্যাদি না আসে। গড়ে শতকরা ৮০ ভাগেরও উপর পটাস্ সল্ট আছে এরূপ মালই শুধু উপরে তোলা হয়। উপরে তুলিয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহাকে ঘন করা হয়।

গত ১৯৩৬এর হিসাবে দেখা যায় সর্বশুদ্ধ উৎপন্ন ও শোধিত পটাস সল্টএর পরিমাণ প্রায় ১৮ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। আর একটি খনিও ঐ অঞ্চলে শীঘ্রই চালু হ'বে আশা করা যায় এবং এরও উৎপাদিকাশক্তি বার্ষিক ৩০ লক্ষ টন দাঁড়াবে অনুমান হয়। মাত্র দশবছরেই এই প্রকাণ্ড সাফল্য কল্পনাতীত বলেই মনে হয়। আরও আশ্চর্য্য ঠেকে এ'জন্য যে—এই বিরাট সাফল্যের মূলে আছে একটুকরা কারনালাইটের আবিষ্কার।

লৌহ ও ইস্পাতের কাজ:—আর একটা চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। তা'হল মস্কোর উপকণ্ঠে পুরাণো লোহার কুচি-কাচি বা ভাঙ্গা টুকরা কাজে লাগিয়ে যে প্রকাণ্ড শিল্প গড়ে উঠেছে তার কথা। এগুলোকে অনেকটা কুমারধুবির ঈগল্ আয়রণ ওয়ার্কসেরই বৃহৎ সংস্করণ বলা যেতে পারে। কিন্তু মনে হয়, ওরা নরম লোহার চেয়ে ইস্পাত উৎপাদনই বেশী পছন্দ করে। মস্কোর এই শিল্প বর্তমানে হ্যামার এণ্ড সিকল্ ষ্টিল ওয়ার্কস্ নামে অভিহিত এবং এখানেই এনে স্তূপীকৃত করা হয় যত সব পুরাণো, মরচে-পড়া ভাঙ্গা লোহার কুচি-কাচি, ভাঙ্গা বাইসিকেল, লোহার খাট, ভাঙ্গা, পুরাণো রেল—আরও কত কি তাহার ইয়ত্তা নেই। শক্তিশালী চুম্বকের সাহায্যে এ'সব মরচে-ধরা স্তূপাকার লোহার সমষ্টিকে উপরে তোলে, খুব চাপ দিয়া এ'গুলোকে ৩।৪ ফুট লম্বা, ৫।৬ ইঃ চওড়া ও ৩।৪ ইঃ উঁচু আয়তখণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। এই লৌহ-খণ্ডগুলোকে বড় বড় Spoonএর সাহায্যে তৈল চালিত Reverberatory চুল্লীতে ফেলা হয় এবং তখন ঐ সংগে হিমেটাইট লাইমষ্টোন, পিগ্ আয়রণ, মাঙ্গানীজযুক্ত পিগও সংমিশ্রিত করা হয়। গলিত ধাতুকে পরিশ্রুত করবার আগে পরীক্ষা হয়—তা'র (ইস্পাতের) মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর অনুপাত ঠিক আছে কি-না।

চুল্লীগুলিকে খালি করার জন্য আছে বড় বড় পাত্র। এক একটা পাত্রে প্রায় ৭০ টন ধরে এবং চলন্ত ক্রেন্ দিয়ে এগুলোকে ইচ্ছামত এদিক ওদিক সরানো যায়। প্রত্যেকটী পাত্র ঢাক্‌নি ও লীভার সংযুক্ত। এগুলো এমনি ভাবে কাজ করে যে খুব হিসাব মত গলিত ধাতুকে ছাঁচে ঢালা যায়। গলিত ধাতু শক্ত হয়ে গেলেই ছাঁচগুলোকে তখনি পরিষ্কার করা হয়। ছাঁচ থেকে ইস্পাতের থামি-গুলোকে তুলে নিয়ে কখনও রেলওয়ে ট্রাক্-এ করে গুদামে নিয়ে যায়, কখনও বা তৈলচালিত Reverberatory চুল্লীতে পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। এই পুনরুত্তপ্ত ইস্পাতের থামিগুলো তৎক্ষণাৎ রোলিং মিল-এ নিয়ে যায়। সেখানে এগুলো থেকে প্রয়োজন মত প্লেট, রেল, পাত তৈরী হয়। ইস্পাতে তৈরী দণ্ড (Rods) গুলোকে সরু তারে পরিণত করা হয়। এই তার থেকে জাহাজ বাঁধা কাছি হ'তে ফটো বা ছবি টাঙ্গাইবার সরু তার তৈরী হয়। আরও কত

জিনিষ হয় তা'র ইয়ত্তা নেই। আমরা জান্‌তে পারলাম এ' সব কারখানায় বার্ষিক আনুমানিক ২২/১ লক্ষ টন ওজনের ইস্পাতনির্মিত দ্রব্যাদি তৈরী হয়। হামার এণ্ড সিকল ষ্টিল্ ওয়ার্কসের কার্য্যাবলী খুব সুসংবদ্ধ নয়—কারখানার উৎপাদনশক্তি বাড়ানোর জন্য যে বিরাট পুনর্গঠন আরম্ভ হয়েছে—ইহাই এর জন্য দায়ী। আমরা কাঁচা-মালের আহরণ থেকে সুরু করে কারখানায় বিভিন্ন পর্য্যায়ের যাবতীয় কাজ পর্য্যবেক্ষণ করেছি। সর্ব্বপ্রথমেই যা আমাদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো রাশিয়ানদের অপচয়হীন কার্য্যক্ষমতা। আমরা আরো দেখ্‌লাম যে প্রত্যেক বিভাগে তার নিজস্ব পানাগার, বিশ্রামাগার ইত্যাদি আছে। খাবার-দাবার পানীয় ইত্যাদি খুবই ভাল ও সুলভ (মাছ, মাংস, রুটী দুধ, সোডা ইত্যাদি অপর্যাপ্ত), কিন্তু কিন্‌তে হয় নগদ মূল্যে। এই কারখানায় দশহাজার সাধারণ শ্রমিক কাজ করে এবং রাসায়ণিক, ইঞ্জিনীয়ার ও যন্ত্র-শিল্পী নিয়া আরো ৩৫০ জন দক্ষ কর্ম্মী কাজ করে। সকলের শীর্ষস্থানে রয়েছে একজন জেনারেল্ ম্যানেজার। শ্রমিকদের মাসহারা হচ্ছে তাদের যোগ্যতানুসারে ২০০ থেকে ৮০০ রুবেল্ (১ পাউণ্ড—৬০৩ রুবেল্)। আর রাসায়ণিক ও অন্যান্য শিল্পীদের মাসহারা তাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করছে (১০০০—৪০০০ রুবেল)। জেনারেল ম্যানেজারের নির্দ্দিষ্ট মাসহারা হচ্ছে ২০০০ রুবেল্। তবে উৎপাদনের উপর লভ্যাংশ তার প্রাপ্য বটে।

সংগঠনের মূল্য :—আমার নূতন আর কোন বৃহৎ লৌহ কারখানা দেখা হয় নাই—তবে ইহা বিশেষ চমকপ্রদ যে দক্ষিণ উরাল্ অঞ্চলে ম্যাগ্‌নিটো-গর্স্কে'র কারখানাগুলি ম্যাগ্‌নেটিক্ লৌহ-প্রস্তর-এর খনির কাছে—আর কুজ্‌নেট্স্ক্-এর কারখানা সাইবিরিয়ায় কুজনেট্স্ক্-এর কয়লার খনির কাছে অবস্থিত। এই দুই কারখানার ভেতর লৌহ, ইস্পাত, রোল্ড ইত্যাদির নির্ম্মাণ নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান্। উভয় কারখানার কর্ত্তৃপক্ষই তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিভিন্ন চুলী ও মিলজাত দ্রব্যাদির সঠিক হিসাব রাখেন। রেলওয়ের মালগাড়ীগুলি ম্যাগ্‌নিটোগর্স্ক থেকে লৌহ-প্রস্তর কুজ্‌নেটস্কে দিয়ে ফেরবার পথে কুজ্‌নেটস্ক থেকে কয়লা নিয়ে আসে ম্যাগ্‌নিটোগর্স্কে'র কোক্‌চুল্লীর জন্য। সুতরাং এ দুই কারখানার কোনদিকেই শূন্য-গাড়ী যায়ও না—আসেও না। এই দুই কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আধ কোটী টনেরও অধিক (Six million ton); যে লৌহপ্রস্তর ব্যবহার করা হয় তাতে শতকরা ৫২ ভাগ লৌহ আছে কিন্তু উৎপাদনের ক্রমশঃ বাড়তির দিকেই চলেছে (১ কোটী টন্); দু'টী কারখানাই পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়েছে—কুজনেটস্ক-এর উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণের হিসাব নিম্নে নেওয়া গেল।

সন	পিস্	ষ্টীল	রোল্ড
১৯৩৬	১,৩৬৩,০০০টন	১,২৬০,০০০ টন	৮৬৬,০০০ টন

রেল—বহুসংখ্যক।

ম্যাগ্‌নিটোগর্স্ক-এর কারখানায় এরচেয়ে আরো বেশী উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু কোন কারখানাই আজ অবধি তাদের পূর্ণ উৎপাদনশক্তি লাভ করতে পারে নাই। সুতরাং উপরোক্ত দ্রব্যের পরিমাণের হিসাবই চূড়ান্ত নয়। প্রকৃত কারখানা অঞ্চলে এক অভিনব পরিবর্ত্তনের ছবি ফুটে উঠেছে—যা আমাদের দেশের টাটার কারখানার চেয়েও সুন্দরতর। শ্রমিকদের জন্য বাড়ী-ঘর, দালান-কোঠা আর কারখানার সম্প্রসারণের জন্য নূতন নূতন বাড়ী—তার সীমা নেই—সংখ্যা নেই। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে এসব গড়ে উঠেছে এবং আরো উঠ্‌ছে। এই প্রবন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় খনিজ সম্পদের যে সকল তথ্য পেয়েছি তারই উল্লেখ কর্‌বো—তবে একথা সর্ব্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে যে এ সমস্ত সংখ্যা ও তথ্যাদি রাশিয়ান্‌দের কাছ থেকেই সংগৃহীত হয়েছে।

এ বিষয়টী একটু বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, কারণ কেবলমাত্র পরিমাণের উপরই ধাতু-প্রস্তরের খাঁটী মূল্য নির্ভর করে না। এর আসল দাম হচ্ছে নির্দ্দিষ্ট ধাতুর শতকরা ভাগের উপর। কারণ এ সমস্ত ধাতু প্রস্তর নিয়ে ছোট রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে না। দেখা যায় তথাকথিত প্রভূত পরিমাণ ধাতু-প্রস্তর অর্থে বাস্তবে শুধু বিরাট পরিমাণটাই বুঝায় কিন্তু তার গুণাগুণ বুঝায় না। এর আলোচনা পরে আরো বিশদভাবে করা হবে। বিগত অধিবেশনের সময় প্রায়শঃ নানাদিক্ হতে নানাভাবে অতিরঞ্জিত হয়ে হরেক রকমের ধাতুর আবিষ্কারের কাহিনী এমনিভাবে সম্মিলনীতে এসে পৌছেচে যেন এগুলি কত বড় বিস্ময়কর আর প্রয়োজনের প্রতীক্। কোন কোন ক্ষেত্রে রাশিয়ান্ ভূতত্ত্ববিদেরাও কোন কোন ধাতু-প্রস্তরের প্রাচুর্য্য ও বিরাট অবস্থান নিয়ে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন যেন এসবই সোলিকামস্কের লবণখনি কিংবা খিবিন্ প্রদেশের এ্যাপিটাইট্-খনির সমতুল্য।

তাদের হাবভাবে এই ধারণাই মনে হয় যে এসব আবিষ্কারই একদম নূতন এবং আধুনিক ভূতত্ত্ববিদেরাই এর আবিষ্কার-কর্ত্তা। কিন্তু এ ধারণা একেবারে নিছক ভুল। যদিও আজ আগের চেয়ে বিপুল ও বিরাটভাবেই নানা দিক্ দিয়ে উন্নতি সাধন হয়েছে—তবু তাদের একথা প্রারম্ভেই স্বীকার কর্‌তে হবে যে বহুদিন এসব তথ্য পরিজ্ঞাত ছিল।

১৮২৪সালে ফক্স ষ্ট্রেঞ্জওয়ে ও ১৮৪৫ সালে মার্চিসান প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদ্ ও অন্যান্য আরো অনেকের রাশিয়ায় ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অমূল্য অবদানসমূহ পাঠ কোরে অবাক্ হয়েছি যে শতাব্দী পূর্ব্বেও কত কথা—কত তথ্যই না জানা ছিল। যা হোক্, স্যার টমাস্ হল্যাণ্ড্ বলেছেন—জীবনের লক্ষ্য শুধু জ্ঞান আহরণ নয়—আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাজ। এই খনিজ সম্পদকে নানাভাবে কাজে প্রয়োগ করেই আজ

রাশিয়ায় শিল্প-সমৃদ্ধি এত বড় সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমার মতে আজ রাশিয়ায় এই যে উন্নতি আর প্রগতিশীলতা—তার মূলে রয়েছে তিনটী কারণ। প্রথমতঃ সোভিয়েট্ গবর্ণমেণ্ট-এর স্থিরসঙ্কল্প হচ্ছে যথাসাধ্য খনিজ সম্পদের আহরণ ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির দেশের মধ্যে প্রচলনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন—এই পন্থাটাই শিল্প-বিস্তারকে সবল ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সুদৃঢ় করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয় মাফিক বিলাসিতামুক্ত একটী কার্য্যক্ষম ভূতত্ত্ব-বিভাগ গঠন—যাদের ধাতুপ্রস্তরের আকরিক অবস্থান ও ধাতুর প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আছে। তৃতীয়তঃ লক্ষ লক্ষ লোকের কাজ করার জন্য একটা অদম্য স্পৃহা—দেশের এতটুকু গৌরব বাড়ানোর জন্যও এরা শ্রমকুণ্ঠ নয়। আজ রাশিয়ায় বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আর গৌরবের পেছনে রয়েছে এসবই।

ভূতত্ত্ববিষয়ক ও খনিজ সম্পদের জরীপ :—প্রুশিয়ায় সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হাম্‌বল্‌ড্‌ট্ রাশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা কার্য্যে পরিভ্রমণ করার ফলে এই অনুমান করেন যে গ্রীস্ ও রোমে যে সকল মূল্যবান্ ধাতু ব্যবহৃত হত—তাহা দক্ষিণ উরালের বনভূমি থেকেই সংগৃহীত করা হত। যা হোক্ সত্যিকার কাজ সেইদিনই সুরু হ'ল যেদিন ১৬৯৯ সনে পিটার দি গ্রেট্ তাঁর সুদূর-প্রসারিত রাজ্যে বহু সরকারী খনি স্থাপন কর্‌লেন (দক্ষিণ উরাল ও অপরাপর স্থানে)। এই খনিগুলিকে রুশীয় ভাষায় বলা হয় জাভদস্। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝির উপর, রাশিয়ায় বিখ্যাত বৈমানিক পল্লাস্ ভূতত্ত্ব ও খনিজ সম্পদ নিয়ে অসংখ্য চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত করেন। প্রায় এই সময়ে ১৭৭৩ সনে জার্ম্মানীর ফ্রাইবার্গের স্কুল অব্ মাইন্‌সের অনুকরণে সেণ্ট্ পিটাস্‌বার্গে রাশিয়ায় ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব মাইনস্ স্থাপন করা হয়। ১৮২১ সনে লণ্ডনের ভূতত্ত্ব পরিষদের সম্মুখে মাননীয় ফক্স্ ষ্ট্রেঞ্জওয়ে তাঁর অমূল্য প্রবন্ধে রাশিয়ার ভূতত্ত্ব বিষয়ে মোটামুটিভাবে অনেক তথ্যের অবতারণা করেন। এই প্রবন্ধের সাথে রাশিয়ার ভূতাত্ত্বিক ম্যাপও ছিল এবং কিভাবে লোহা, সোনা, তামা ও কয়লার কাজ চল্‌ছে—তাহারও উল্লেখ ছিল। তিনি আরো দেখান যে রাশিয়া মধ্য আফ্রিকার সম-গোত্রীয় নহে। মাত্র কিছুদিনের জন্য স্যার মার্চিসান্ ১৮৪০ সনে রাশিয়ার "সাইলুরিয়ান্ সিষ্টেম্" সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গমন করেন—পরবৎসরই তদানীন্তন সম্রাট প্রথম নিকোলাস ডনেট্‌জ্ প্রান্তরে কয়লা আবিষ্কার এবং ভল্‌গা ও উরালের মধ্যবর্ত্তী খনিজসম্পদের বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে তাঁকে নিযুক্ত করেন। স্যার মার্চিসানের বিবরণীতে প্রকাশ যে ঈকাটেরিন্‌বার্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলসমূহ ইউ-রোপীয় রাশিয়ার মধ্যে সমধিক শিক্ষিত ও উন্নত ছিল। সরকারী খনিপ্রদেশে স্কুল, হাস্‌পাতাল ও অপরাপর যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন খনি-অঞ্চলে রাজ-কর্ম্মচারীর কাছ থেকে কি ভূতত্ত্ব বিষয়ে—কি আদর অভ্যর্থনায় কত সাহায্যই না তিনি পেয়েছেন। জেনারেল পিরোফস্কি, কর্ণেল হিল্‌মারসান্ ও জেনারেল এনোসাফের কাছে তিনি তার তদন্ত ব্যাপারে যে কত ঋণী—পুনঃ পুনঃ তার উল্লেখ করেছেন। রাশিয়ায় যে চমৎকার ভূতাত্ত্বিক ম্যাপ্‌খানি তাঁর বিবরণীর সাথে সংলগ্ন রয়েছে—তাহা কিছুতেই এদের সাহায্য ব্যতীত সম্ভবপর হ'ত না। সাধারণ অধিবাসীদের কাছেও তিনি যথেষ্ট হৃদ্যতা ও সাহায্য পেয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট বুঝা যাবে।

"Our own impatient forward was cheerfully responded to by the Monja of the natives. With this talismanic word, the Russian has, indeed, raised monuments on the Moskra Neva that rival the grandest efforts of ancient and modern times."

১৮৮২ সন :—লণ্ডনের রয়েল্ জিওগ্রাফিকেল্ সোসাইটীর ১৮৭৩ সনের সভাপতির অভিভাষণে স্যার র‍্যালিন্‌সন্ রাশিয়ায় উন্নতির উল্লেখ করে বলেন "রাশিয়ার মানচিত্রসম্ভারে যে নূতন জিনিষ এল—তাহা হিল্‌মারসন্ কর্ত্তৃক ঐ দেশের একটী ভূতাত্ত্বিক ম্যাপ ও ককেশাস্ পর্ব্বতের একটী নূতন ম্যাপের অংশ বিশেষ (স্কেল হচ্ছে ২০ ভর্ষ্ট = ১ ইঞ্চি)। ১৮৮২ সনে রাশিয়ায় যখন ভূতত্ত্ব-কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মাইনিং ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেকটার ছিলেন কর্ণেল হিল্‌মারসন্ এবং তাঁকেই সর্বপ্রধান কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তখনকার দিনের প্রথানুযায়ী মাত্র ছ'জন ভূতত্ত্ববিদ্, আর বার্ষিক ৭৫০০ পাউণ্ড ব্যয় মঞ্জুর নিয়ে রাশিয়ায় ভূতত্ত্ব-বিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৭ সনে সেণ্ট্ পিটাস্‌বার্গে আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব-কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন হয়। তখনও রাশিয়ায় ভূতত্ত্ব-বিভাগে ছিল মাত্র ২০ জন ভূতত্ত্ববিদ্ আর বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০ হাজার পাউণ্ড। ১৯১৩ সনে দেখা গেল কর্ম্মীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ জন—আর ব্যয়ের বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার পাউণ্ড। গত মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৮) আগেই রাশিয়ায় কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ্ বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁদের ভেতর আলেক্‌জাণ্ডার কার্‌পিনস্কির নাম অন্যতম—তাঁকে রাশিয়ায় বর্ত্তমান ভূতত্ত্বের জনক বলা হয়। এছাড়া টিচেরনিচিড্ অক্রুচিভ প্রমুখ মণীষীদের নামও আজ পৃথিবীর ভূতত্ত্ববিদ্দের নিকট অতি সুপরিচিত। ১৮৯৭ সনে ভূতত্ত্ব-কমিটির ডিরেক্টার ছিলেন কারপিনস্কি। তিনি ঐ বৎসর আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ঐ

বৎসরের অধিবেশনের বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই যে—বিদেশাগত প্রতিনিধির দল রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে বিনা ভাড়ায় পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাশিয়ায় সম্রাট্ দ্বিতীয় নিকোলাস্ অম্লান বদনে এই ব্যয়ভার গ্রহণ করেন—কিন্তু ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে ১৯১৭ সনের বিপ্লবে ঈকাটোরিনস্লাভে দ্বিতীয় নিকোলাস্এর জীবনান্ত ঘটে। এ অধিবেশনের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল Petrological নামকরণ ও stratigraphical শ্রেণী-বিভাগ। কিন্তু প্রতিনিধিবর্গ রাশিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন করে আনন্দ পেয়েছিলেন প্রচুর। প্রচুর আনন্দে সময় অতিবাহিত হলেও প্রতিনিধিবর্গ কার্য্য-সূচী অনুসারে উরালের প্রসিদ্ধ Samara bend, বাকালের লিমোনাইট (লৌহ), সিমস্কের প্রসিদ্ধ কারখানা, বিয়োসকোর ম্যাগ্‌নিটাইট্ (লৌহপ্রস্তর), নিজনি-টাগিল-এর ম্যালাকাইট্ (তাম্রপ্রস্তর), প্লেটিনাম খনি, প্রাচীনতম স্বর্ণ-খনি ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের কোন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে ছিলেন না—কারণ শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সি-আই-গ্রাইস্‌বাথ্ যেতে পারেন নি। রাশিয়ায় ভূতত্ত্ব-বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদাই আগ্রহ ছিল এবং আমরা রাশিয়া সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ আমাদের Recordএ প্রকাশ করেছি। রাশিয়া কর্ত্তৃক মধ্য-এসিয়া জয়ের পর ও পামীরের উপর রাশিয়ায় সীমান্ত-রেখা এসে পড়ায় আজ রাশিয়ার ছবি ভারতের বুকে স্বতঃই জাগরূক হয়ে উঠে।

১৯১৪—১৯১৮ সন:—ভূতত্ত্ব-বিভাগ গঠিত হবার পর প্রথম ৩০ বৎসর শুধু জিওলোজিক্যাল ম্যাপ তৈরীর কাজেই অতিবাহিত হয়। ১৯১৪ সনে ভূতত্ত্ব-বিভাগ সেণ্ট্ পিটার্স-বার্গে স্থানান্তরিত করা হয়—তখন সবেমাত্র সমগ্র সাম্রাজ্যের এক-দশমাংশএর জরীফ শেষ হয়েছে। তখনকার অবস্থানুসারে কাজের প্রগতি বেশ সন্তোষজনকই মনে হয়। ভারতের আয়তন রাশিয়ার এক পঞ্চমাংশ মাত্র এবং আমাদের কর্ম্মীর সংখ্যা ও ব্যয়ের পরিমাণ মনে রাখিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ভারতের ভূতত্ত্ব-বিভাগের কাজও অতি সন্তোষজনকভাবে গড়ে উঠেছে। কিন্তু রাশিয়ায় প্রাকৃতিক দুর্গমতা কাজের বহুল অন্তরায়—উত্তরে তুন্দ্রাভূমি, সাইবেরিয়ার দুর্গমতা, আর মধ্য এশিয়ার বনভূমি স্বতঃই একথা মনে জাগিয়ে তোলে। (ক্রমশঃ)

দুঃখীর প্রার্থনা

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

জন্মিয়াছি যেইক্ষণে তখনি জীবন সনে
দুঃখবীজ করেছ বপন,
সে বীজে গোপন করি বৃথা চেষ্টা ক'রে মরি,
শাখাপত্র রহে না গোপন।

নিত্য যত দুঃখ পাই ভাগ্যে মোর যোগ্য তাই
স'য়ে যাই মাথা নত ক'রে,
জানি তুমি করুণার কর না'ক অপচার
দণ্ড দিয়া শুদ্ধ কর মোরে।

জীবনে ব্যর্থতা যত সহি আমি সাধ্য মত,
জানি তা' ভুলেরি পরিণতি।
প্রায়শ্চিত্ত আছে নামি শির পাতি লই আমি
তাহা ছাড়া অন্য কিবা গতি?

আমি ছাড়া কেহ আর দায়ী নয় বারবার
মনকে তা দিয়াছি বুঝায়ে।
সহি তাই ক্ষতিক্ষয়, প্রবঞ্চনা, পরাজয়,
সবি মোর স'য়ে গেছে গায়ে।

সহিতে পারি না খালি হিংসুকের করতালি,
দংশে তাই হ'য়ে কালফণী,
সকল দুঃখের বাড়া এই দুঃখে আত্মহারা
আপনারে হতভাগ্য গণি।

যত মোর লক্ষ্মী ছাড়ে শত্রুর আনন্দ বাড়ে,
এই দুঃখ মৃত্যুদণ্ড সম,
শত্রুরে সুমতি দিয়া হিংসাবিষ কাড়িয়া নিয়া
সহনীয় কর দুঃখ মম।

রূপান্তর

ইন্দ্রযব

সামন্তপুর। প্রাকৃতিক অবস্থানে ভৌগোলিক সীমা সুনির্দ্দেশিত। একদিকে পনের হাজার ফিট্ উচ্চ তুষারগিরি। অন্য তিন দিক ঘিরিয়া বরুণ-বিল। মাঝখানে একশত ঘর প্রজার বাস। এই সমস্তের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন রাজা রূপনারায়ণ রায়। তাঁহার সময়ের দানে ধ্যানে উৎসবে মুখরিত দিনগুলি সপ্তম পুরুষ রুদ্রনারায়ণ রায়ের কালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অন্যরূপে।

সামন্তপুরের ঠিক মাঝখানে রুদ্রনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ। কিন্তু পূর্ব্বের জৌলুস আজ আর নাই। শৃঙ্খলে লম্বমান কাচের ঝাড় বাতিতে মোম আর জ্বলে না। পূর্ব্বের গলান মোমের রেখার উপর ধীরে ধীরে নীল সবুজ রংয়ের পাতলা আবরণ পড়িতেছে। মাকড়সার দল নির্ভয়ে একটা ঝাড়বাতি হইতে অন্য একটায় লুতাতন্তু বুনিয়া চলিয়াছে। দামী কার্পেটের নীচে ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিয়াছে—অজস্র ধূলিকণা। নাটমণ্ডপে ভিড় করিয়াছে কবুতরের দল। তাহাদের ময়লায় ভরিয়া চলিয়াছে মেঝে। কাছারী বাড়ীতে ময়লা ফঁরাসের উপর কাজ করে তিন জন কর্ম্মচারী। কাঠের বাক্সের উপর উবু হইয়া সার্টিফিকেটের নম্বর মিলায়, আর বাকীখাজনার হিসাব করে। সিংহদ্বারে স্ফীতোদর নগ্নগাত্র ভোজপুরী জিহ্বার নীচে খৈনী চাপিয়া ঘুমের নেশায় ঢোলে।

রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় অন্দর মহলেই দিন যাপন করেন.। কাছারী বাড়ীতে বড় একটা পদার্পণ করেন না। বর্ত্তমানের রিক্ততা তাহাকে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। একমাত্র সন্তান ত্রিবেন্দ্র-নারায়ণ রায় আজ গর্জ্জমান সপ্তসিন্ধুর ওপারে—ইউরোপে। তাহার আশা বিলাত-ফেরত ভুতত্ত্ববিদ্ ও রাসায়নিক তাহার যাদু-দণ্ডের স্পর্শে পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্যের বিলাসময় দিনগুলি আবার ফিরাইয়া আনিবে। রুদ্রনারায়ণ তাহারই আশায় দিন গণেন। নিতান্ত উৎসাহ ভরে কাছারী বাড়ীতে তাহার খবর নিতে যান। খবর না থাকিলে সামান্য কারণে কর্ম্মচারীদের উপর একেবারে ফাটিয়া পড়েন। সমস্ত বাড়ীটা চম্‌কাইয়া উঠে। ত্রস্তে কবুতরের দলের পাখা ঝাপ্‌টায় আর কয়েকটী চাম্‌চিকা অন্ধকারতর কোণের জন্য ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়।

বৃদ্ধ দেওয়ান হরিহর কোন রকমে লাটের খাজনা বাঁচাইয়া চলিয়াছে। মুনাফা হয় না। তবে পরিচালনা সুষ্ঠু। তাহার পর্য্যবেক্ষণে আজও গৃহদেবতা ব্রজকিশোরের মন্দিরে ধূম্রজাল কুণ্ডলী পাকাইয়া গৃহছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়, আর আরতির ঘণ্টা বাজে ঠং—ঠং। আরতির ঘণ্টা শুনিয়া আফিমের নেশায় বুঁদ হইয়া মুদিত নেত্রে রুদ্রনারায়ণ স্বপ্ন দেখেন, পশ্চাতের কোলাহলময় দিনের!

তবু বাঁচিয়া আছে বরুণ-বিলের দানে।

বরুণ-বিল! রূপকথার কাহিনী।

সামন্তপুরের ভাগ্য-লক্ষ্মীর দান! রাজা রূপনারায়ণ তুষ্ট করিয়াছিলেন বৈকুণ্ঠেশ্বরীকে। তিনি ঢালিয়া দিয়াছেন অপরিমিত ঐশ্বর্য্য এই বরুণ-বিলে। তাই অক্ষয় এর সম্পদ।

ছিদাম মণ্ডল যখের মত পাহারা দিয়া চলিয়াছে এই বরুণ-বিল। ছোট একখানা ছোট ডিঙ্গি লইয়া প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। চলমান মৎস্যের রজতশুভ্র শুল্কে রৌদ্রের প্রতিফলন তাহার চক্ষে রূপ নেয় স্বর্ণের ধাতব দ্যুতির! চোখে লালসার বিদ্যুত চমকাইয়া উঠে, যেমনি যখ তাকায় তাহার সঞ্চিত সম্পদের প্রতি।

সরকার ওকে সন্তুষ্ট রাখেন। মাসে মাহিনা আট টাকা; পোষাক একজোড়া আট হাত কাপড় ও একখানা গামছা।

আর বরুণ-বিলে সরকারের বাৎসরিক আয় মৎস বিক্রয়ের বত্রিশ টাজার টাকা; সামন্তপুরের ভাগ্যলক্ষ্মীর দান। তাহারই জোরে সাত সমুদ্রের ওপারে কাণায় কাণায় রাসায়নিক পাতন জমে। সন্ধ্যায় ব্রজকিশোরের মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজে ঠং ঠং! আর রুদ্রনারায়ণ—আফিমের নেশায় ঢোলেন।

প্রজারা কাজ করে সরকারের অধীনে। যখন আকাশের গায় তুষারগিরির মাথায় কণায় কণায় শুভ্র-পুঞ্জীভূত তুষার জমিয়া উঠে, তাহার তুষার গিরির পাদদেশের ঘন শালবন হইতে মোটা মোটা শাল গাছ আনিয়া বাঁকের কাছে শীতের দিনের ক্ষীণস্রোত বরুণে বাঁধিয়া ফেলে।

বরুণ নদী! শীতের দিনে পঁচিশ হাত চওড়া ও ক্ষীণস্রোত। এই ক্ষীণস্রোতই সামন্তপুরের এক কোণ ঘেঁসিয়া, যেন উপেক্ষা করিয়াই একটা মোচড় খাইয়া মোহনার দিকে চলিয়া গিয়াছে। বর্ষার দিনে এই বরুণের চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়। পাহাড়ের বরফগলা জলে ঐশ্বর্য্যের বিলাসিতার চাপে ফুলিয়া গর্জ্জাইতে থাকে! উদ্দাম স্রোত আসিয়া বাধা পায় বাঁকে। একটা মোচড় খাইয়া নামিয়া যায় বরুণ-বিলে।

বাঁক বাধা হইলে মহিষ আর লাঙ্গল লইয়া চাষ করে সমতল ও অর্দ্ধ সমতল মালভূমি। প্যাট ও ভুট্টা বোনে। এর পর কয়েক-মাস নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম।

পাটগাছ আপনিই বাড়ে দশহাত পর্য্যন্ত; আর বরুণ বিলের জঠোরে পুষ্ট হয় রূপান্তরিত ঐশ্বর্য্যের জীবাণু।

হঠাৎ একদিন কৈলাস ঢাকী সিংহদ্বারে ঢাক বাজাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সামন্তপুর চম্‌কাইয়া উঠিল। নাটমণ্ডপে কবুতরের দল পক্ষ আলোড়নে ভীতিব্যস্ত জানাইয়া উড়িয়া গেল। নাটমণ্ডপ ও চত্বর পরিষ্কার করা হইল। ঝাড় বাতিতে মাকড়সার লুতাতন্তু ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল! সিংহদ্বারে বহুদিন পরে আবার গ্রামবাসী আসিয়া ভিড় করিয়াছে। ভোজপুরী দারোয়ান তক্‌মা আঁটিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

জনতা ব্যগ্র কৌতূহলে দেখিতেছিল দূরে ছাউনি ঢাকা একখানা গরুর গাড়ী। জনরব কোন বিখ্যাত নর্ত্তকী নাচিবে। ……তাহাদের চোখে অতীতের স্বপ্নময় অনুলেপন। হাজার বাতির ঝাড়ের উজ্জ্বল আলো……নর্ত্তকীর লাস্যময় নৃত্য…… সুরার সুরভি!

সিংহদ্বারে খড়মের শব্দ—ঠক্! ঠক্!

চমকিয়া সকলে দেখিল। সৌম্য মূর্ত্তি, শুভ্র কেশ, বার্দ্ধক্যের ভারে নত দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ। শিথিল শিরার বন্ধনমুক্ত চর্ম্ম লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অক্ষম দেহভার বহনে, রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়! সকলে নত হইয়া প্রণাম জানাইল। মৃদুহাস্যে প্রণাম গ্রহণ করিয়া মেরুদণ্ডটাকে চাপ দিয়া সোজা করিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলেন বাঁধান রাস্তার মোড়ে।

ঠং ঠং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া একটি হাতী আসিয়া সিংহদ্বারে থামিল। হাওদা হইতে নামিলেন কুমার ত্রিবেন্দ্র নারায়ণ রায়।

সকলের চোখে বিস্ময় ছুটিয়া উঠিল। সুদীর্ঘ পনের বছরে কুমার অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন। গৌরবর্ণের উপর শীতের শ্বেতবর্ণ লেপন! নিঁখুত সাহেবী পোষাক!

আগাইয়া যাইতে না যাইতে বৃদ্ধ রুদ্রনারায়ণের কম্পিত বাহুবন্ধনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেলেন। বৃদ্ধ স্তিমিত নেত্রের কোণ হইতে বড় বড় অশ্রুবিন্দু সুদৃশ্য বিদেশী পোষাকের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বিস্ময়ে হতবাক্ জনতা প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেল।……

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ রুদ্রনারায়ণ অনেক দিনের অভিযোগ জানাইলেন।

ত্রিবেন্দ্রনারায়ণের পর্য্যবেক্ষণে আবার পূর্ব্বের ন্যায় দাপট ফিরিয়া আসুক। হুমকিতে সমস্ত সামন্তপুর কাঁপিয়া উঠিবে, আবার প্রাসাদ ঝম্ ঝম্ করিবে।…নাটমণ্ডপে ঝিল্লির রবকে ছাপাইয়া উঠিবে নূপুর নিক্কণ। হাজার বাতির আলো রৌপ্য ভৃঙ্গারের গায়ে চমকাইবে।…

মোটকথা আবার তিনি নূতন করিয়া ত্রিবেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিতে চাহেন।

ত্রিবেন্দ্র নারায়ণের কুঞ্চিত ভ্রু'র রেখায় রেখায় জাগিল চিন্তার অভিব্যক্তি। ইউরোপ-ফেরত রাসায়নিক ও ভূ-তত্ত্ববিদের মাথায় চিন্তার আবর্ত্ত ঘোলাইয়া উঠিল।

* * * *

পরের দিন বৈকাল বেলা।

চত্বরের পাশে সহিস প্রকাণ্ড একটা কালো তেজী ঘোড়ার রাশ ধরিয়া ছিল। কুমার ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ আসিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বসিলেন। ঘোড়া টগ্‌ বগ্‌ করিয়া আগাইয়া চলিল। কর্ম্মচারী ও অনেক লোকের মাথা আপনা হইতেই নুইয়া পড়িতেছিল। ত্রিতল গবাক্ষে স্মিতহাস্যে দণ্ডায়মান রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়!

সিংহদ্বারের খোলা পথে সামন্তকুমারের ঘোড়া জোর কদমে বাহির হইয়া গেল। নাটমণ্ডপের খিলান ছাদে প্রতিহত শব্দের আবর্ত্তে সমস্ত বাড়ীটা গম্ গম্ করিতে লাগিল।

ঘোড়া বরুণ নদীর পাশ দিয়া শালবনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাঁকের কাছে আসিতেই লাগামে সামান্য টান পড়িল। সুশিক্ষিত ঘোড়া চকিতে পাথরে খোদা মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

শীতের মুক্তধারা বরুণের জল তির্ তির্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

কুমারের চোখে জাগিল…বাঁধান নদীর জল ঘুরাইতেছে বড় বড় চাকা। তৈরী করিতেছে হাজার হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ শক্তি। আশে পাশে শ্রমশিল্পের কেন্দ্র!

দূরে নীলগিরির মাথায় তুষার জমিতেছে। অপরাহ্নের রক্তচ্ছটায় স্বর্ণাভ! হাতের মুঠায় লাগাম শ্লথ হইল; পায়ে গতির মৃদু ইঙ্গিত। ঘোড়া কদমে প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোড়া শালবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘোড়াটাকে একটা গাছের সাথে বাঁধিয়া ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ একখানা পাথরের উপর বসিলেন।

দূরে শস্যহীন মাঠে ধূসর সন্ধ্যা নামিতেছে; নির্জ্জন, শব্দহীন। মনের কোনে ধীরে ধীরে চিন্তার প্রতিচ্ছায়া…খণ্ডবিহীন একত্রীভূত জমী…বৈজ্ঞানিক উপায়ে উর্ব্বরা…একটা ট্রাক্টার!

নতমস্তকে চিন্তা করিতে করিতে সহসা তাহার ভূতাত্ত্বিক চক্ষু যেন বৈদ্যুতিক আঘাত খাইল। সামান্য একটুক্‌রা পাথর! ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ ব্যগ্র হস্তে তুলিয়া লইলেন, অনেকক্ষণ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন। তাহার সন্দেহ হইতেছে হয় ব্রাউন হেমেটাইট, নয় ক্রোমাইট। হয়ত বা দুয়েরই সংমিশ্রণ। তাহা হইলে…পৃথিবীর ধাতব বক্ষ পঞ্জরের লৌহময় একখানা অস্থি এই সামন্তপুরের নীচে দিয়াই চলিয়া গিয়াছে।

গ্রামের সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথে প্রাসাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর হইতেই চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর কাছে আলোর রেখা দেখা যাইতেছিল। নিকটে আসিতে ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন একটা বৈঠক জমিয়াছে। সকলেরই মুখে একটা উত্তেজনার আভাস। ঘোড়া থামিতে দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। জোড়হাতে নমস্কার জানাইয়া চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"কুমার বাহাদুর এদিকে—"

—"বেড়িয়ে ফির্‌ছিলাম। তারপর বৈঠক কি জন্যে?"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া চৌধুরী বলিলেন—"আপনি এখানকার সব কিছুই ত জানেন না। পনের বছর আপনি এখানে নেই, এর মধ্যে এখানের একশ' ঘর লোক আজ দাঁড়িয়েছে তিন্‌শ' ঘরে। সামান্য যে জমি আছে, তাতে কুলোয় না। তাই ওরা চায়—"

—"কি চায় ওরা"—

—"ঐ জলের তলায় দশ বর্গ মাইল।"

—"বরুণ বিল!!"

—"কিন্তু ওরা যে খেতে পায় না।"

—"খেতে তাতেও পাবে না। কারণ বত্রিশ হাজার টাকা—

—"তবুও—"

…"না তা না। খেতে তারা পাবে।" আবেগময় কণ্ঠে বললেন—"ঐ রকম বিলকে আমি মুক্তি দেব। তারপর এই সামন্তপুরকে করে তুলব আমি কুবেরের ভাণ্ডার। সবাই খেতে পা'বে চৌধুরী মশাই, সবাই খেতে পা'বে!"

—"কিন্তু রাজাবাহাদুর !"

"আমি বুঝব।"

—"ছিদাম !"

—"ছিদাম, সে আর কুমার বাহাদুর এক নয় !"

আভিজাত্যের জীবন্ত মূর্ত্তির ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপ।

—"তা'হলে ওদের বলব।"

—"হাঁ—"

চৌধুরী মহাশয়ের পাশ কাটাইয়া ঘোড়া ছুটিয়া গেল।

মধ্য রাত্রে খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া কুমার ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ। অন্ধকার রাত্রি। অজস্র তারার দীপ্তিময় আলোর কিছু অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে বরুণবিলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অবচেতন মন রূপায়ণ করিয়া চলিল…এই সামন্তপুর!…মাঝে মাঝে লোহার বড় বড় মই। খনির চিমনি!…বৈদ্যুতিক চুম্বক!…ক্রেন!…ট্রামওয়ে!…বৈদ্যুতিক কেন্দ্র! মুদ্রার মৃদু আহ্বান!

* * * *

কয়েক দিন পরে কয়েকটী জিনিষ পার্শ্বেলে আসিল। একটী মোটর বোট, আর দুইটী বাক্স।

মোটর বোট! সামন্তপুরে যন্ত্রের প্রথম পদার্পণ। দলে দলে লোক আসিয়া জড় হইল।

বরুণ বিলে ভাসমান শুভ্র যান্ত্রিক অর্ণবপোত। যন্ত্রের সংস্থান পর্য্যবেক্ষণে রত সুবেশ ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ। কিছুকাল পরে ত্রিবেন্দ্রনারায়ণের অঙ্গুলি সঞ্চালনে মোটর বোট গর্জ্জন করিয়া উঠিল "ভট্! ভট্!"

পেট্রোলের পোড়া গ্যাসের অদ্ভুত গন্ধের আমেজের মাঝখানে যন্ত্রের বিকট আহ্বান সকলের বুকে যাইয়া আঘাত করিল—"ধক্! ধক্!"

সম্মুখের নিশ্চল বিলের উপর ক্ষুদ্র মোটর বোট তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বরুণবিলের নীল সমতল বুকটাকে ভাঙ্গিয়া সাদা সাদা ফেনার পুঞ্জে ছড়াইয়া ফেলিতেছে।

জনতার চোখে অদ্ভুত বিস্ময়! ছিদাম অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছে।

ভট্! ভট্!

সামন্তপুরের প্রাসাদের জানালা দরজাগুলি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

রুদ্রনারায়ণ চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"হরিহর!"

খিলান ছাদে শব্দের আবর্ত্ত ব্যঙ্গ করিয়া ফিরাইয়া দিল। একটু পর হরিহর আসিল।—"হুজুর"

ক্ষীয়মান ঘৃতভাণ্ড হইতে সামান্য যজ্ঞাহুতি! দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়।

—"সামন্তপুরে আমার অগোচরে—"

মোটর বোটের ভট্ ভট্ শব্দ বেগের গতিতে একটানা চীৎকারের মত হইয়া আসিয়াছে।

—"হুজুর কুমার বাহাদুরের কলের নৌকা।"

—"খোকা।"

অক্ষম দেহটাকে কোনমতে জানালায় আনিয়া দাঁড় করাইলেন।

বরুণ বিলে অশান্ত দৈত্যের মত সাদা ছোট একখানা নৌকা ছুটিয়া বেড়াইতেছে। একটানা হুঙ্কারে প্রাসাদ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

রুদ্রনারায়ণ রায়ের মনে হইল সামন্তরাজা রূপনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ ঐ যন্ত্র দানবকে আর সহ্য করিতে পারিবে না। আপনার ভারে আপনিই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

মহাপ্রতাপ রুদ্রনারায়ণ রায়ের চোখের কোণে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

গভীর রাত্রি। মোটর বোট আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বরুণ বিলের মাঝখানে ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর রেখা ধীরে ধীরে গভীরে তলাইয়া গেল। বরুণ বিলের তলায় ডুবুরির পোষাকে মাটীর রাসায়নিক গুণ পর্য্যবেক্ষণে রত ইউরোপ-ফেরত ভূতত্ত্ববিদ্!

পরদিন রাজকুমারের ঘুম ভাঙ্গিল অনেক বেলায়।

দ্বিপ্রহরে রুদ্রনারায়ণের নিকট বসিয়া তাহার ইচ্ছা নিবেদন করিল। এই সামন্তপুরীর নীচে যে কুবেরের ভাণ্ডার রহিয়াছে আজ সে তাহার সন্ধান পাইয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই সামন্তপুরীর রূপ ফিরাইয়া দিবে।

—"বুঝ্লাম ত বাবা! কিন্তু ঐ বরুণবিলের কথাই ত ভাব্ছি। জানিস্ ত ঐ আমাদের আশীর্ব্বাদ, বেঁচে আছি ওর জোরেই। তারপর ছিদাম! ওকে ত ঠিক জানিস্ নে। আজ চল্লিশ বছর ধরে একান্ত বিশ্বস্তভাবে কাজ করে চলেছে। ওর প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবেসেছে এই বরুণ-বিলকে। এছাড়া ও যেদিন এই বিলের কাজে নেমেছে সেইদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল মহাকালীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে—ওর প্রাণ থাক্তে কেউ বিলের অনিষ্ট করতে পারবে না।"

—"কিন্তু—"

—"না—না এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। একান্ত স্নেহের পাত্র। ছিদামকেও আমি তেমনি ভালবাসি। ওকে এ আঘাত আমি দিতে পারব না। ও যতদিন বেঁচে আছে ততদিন বরুণ-বিল, অসম্ভব! সামান্য কয়টী কথার টুক্রা পুত্রের অভিমানের উপর বজ্রাঘাত করিল। ত্রিবেন্দ্রনারায়ণের মনে পড়িল কয়েকদিন পূর্ব্বের একটা ছবি; যেন চলচ্চিত্রের একটা টুক্রা! ঘোড়ায় ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ, নীচে চৌধুরী মহাশয়। মুখে ব্যঙ্গের হাসি। সামান্য একটা কথার টুক্রা—

—"ছিদাম! সে আর কুমার বাহাদুর এক নয়।"

আর আজ সত্যই রাজা রূপনারায়ণ রায়ের অষ্টম পুরুষকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে ছিদাম। অবজ্ঞার লাঞ্ছনা অভিজাত মনকে পাগল করিয়া তুলিল।

আবার পার্শ্বেল আসিল। এবার আকারে খুব ছোট।

বৈকাল বেলা ছিদামকে লইয়া ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ মোটর বোটে বরুণবিল চষিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। অন্ধকার কাটাইয়া দীপ্তিময় মধুর চাঁদের আলো বরুণের কালো জলকে রূপালি করিয়া তুলিল। বরুণ-বিলের শক্ত বাঁধের কাছে তাহারা নামিল।

ছিদামকে মোটর বোটের কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া নিজে বাঁধের উপর ঘুরিতে লাগিলেন। ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ 'এটাচি কেসের'

মধ্য হইতে দাহ্য গন্ধকে ভিজান রজ্জুতে বদ্ধ ডিনামাইটের ছোট ছোট টিক্ বাহির করিয়া বাঁধের মধ্যে গাড়িলেন।

ছিদাম দেখিতেছিল বরুণ-বিলে চন্দ্রোদয়! আজ তাহার মন একটা মোচড় খাইয়া উঠিল। বহুদিন উপবাসী।......রুদ্র-নারায়ণের ভাসমান বজ্‌রা! আকাশে রূপালি আসরের নেশা... সুন্দরীর নৃত্য!...রক্ত পানীয়ের উৎকট গন্ধ!

পিছনে দাঁড়াইয়া ত্রিবেন্দ্রনারায়ণ ছিদামকে লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। নির্জ্জন প্রান্তর কাঁপাইয়া ত্রিবেন্দ্রনারায়ণের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল। ছিদাম বাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িল।

সময়ের পরিমাপে গন্ধকের দড়ির একটা নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে আগুন লাগাইয়া দিলেন। তারপর মোটর বোটে চড়িলেন। কল্পনাপ্রবণ রাসায়নিক মন!......হিস্ হিস্ শব্দে আরম্ভ হইয়াছে দহন; এরপর বিস্ফোরণ! বদ্ধ বরুণের জলে উদ্দাম মুক্তিপ্রবাহ! সামন্তরাজ্যের মুক্তি!

রেডিয়াম ডায়েল ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা জানাইয়া দেয়—আশু ধ্বংসের লগ্ন। ক্ষুদ্র যন্ত্র দানব জাগিয়া উঠিল—ডট্!...ডট্!

ঘুমন্ত প্রাসাদ আর তুষারগিরিতে যাইয়া প্রতিধ্বনিত হইল —"ধুক্! ধুক্!"

সঙ্গীত, সুর ও ধ্বনি

শ্রীসুধাময় গোস্বামী গীতিসাগর

ভারতবর্ষে সঙ্গীতশাস্ত্রে সঙ্গীত বলতে সুর ও ধ্বনির রূপ-বিশেষকে স্বীকার করা হ'য়েছে। সূক্ষ্মতম "শব্দ জগৎ" থেকে স্থূলে নেমে এসে আমরা সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হই। সঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয় মানুষের ভাব ও ভাষা। ভাব ও ভাষা সুরকে অবলম্বন করে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখনই তাকে বলি সঙ্গীত। শাস্ত্রে আছে—

"গীতংবাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে"

কাজেই উপরোক্ত শাস্ত্রের বচনানুসারেও দেখা যায় যে গীত, বাদ্য, নৃত্যের মধ্যে ভাব, ভাষা ও সুর এই তিনের অথবা কোন না কোনটীর সঙ্গে সংযোজনা অপরিহার্য্য। সঙ্গীতের উপাদান সুর এবং তার প্রাণ, ভাব ও ভাষা। ভাবের গভীরতম আত্মপ্রকাশ হয় সুরে। ভাব স্বরূপতঃ যেখানে রূপহীন সেখানে সুরেই সে নেয় তার সূক্ষ্মতম নিজ স্বরূপ, সঙ্গীতে তার হয় অস্বচ্ছ অভিব্যক্তি। সঙ্গীতের কিন্তু ভাষা আছে; কারণ সাধারণ সঙ্গীত যাহা মানুষ প্রতিনিয়ত শোনে বা শুনে আনন্দলাভ করে, তাতে ভাবের খুব নিবিড়তম প্রকাশ নেই। সেখানে ভাব ও ভাষার সহিত সুরের সংযোজনায় হয় সঙ্গীতের সৃষ্টি। এই জন্যই সঙ্গীত হ'তে সুরের আলাপ আরও বড় জিনিষ। সেখানে ভাষা নেই, ভাব আছে এবং ভাবের অভিব্যক্তি ও স্ফূর্ত্তি আছে। শাস্ত্রে আছে—

"অনিবদ্ধং ভবেদ্গীতং বর্ণাদি নিয়মং বিনা।
নিবদ্ধঞ্চ ভবেদ্গীতং তালমান রসাঙ্কিতং॥"

অর্থাৎ যে সঙ্গীত নিজের ইচ্ছানুযায়ী কেবলমাত্র স্বর-সমন্বিত হয়েই গীত হয় এবং বাক্য প্রভৃতির কোনরূপ নিয়মকানুনের সীমাবদ্ধ নয় তাকেই 'অনিবদ্ধ' সঙ্গীত বলে। এইরূপ প্রক্রিয়াকে সঙ্গীত শাস্ত্রে "আলপ্তি বা আলাপ" বলে। তাল মান প্রভৃতি রসসমন্বিত যথানিয়ম সন্নিবিষ্ট হয়ে যাহা গীত হ'য় তাকে 'নিবদ্ধ' সঙ্গীত বলে। কাজেই আলাপে সুরের উন্মুক্ত স্বচ্ছ প্রবাহের আধিক্য থাকায় ভাবের পুষ্টতার কোন বাধা থাকে না বলেই সঙ্গীত অপেক্ষা বড় বলে স্বীকৃত হয়। ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগ রাগিণীর এইজন্য অত্যন্ত উচ্চ স্থান, কারণ তারাই বিশ্বের ছন্দ লহরী প্রকাশ করে এবং তারাই হচ্ছে বিশ্বের অন্তর তলে স্বতঃ উত্থিত অশরীরী বাণীর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এই জন্য বোধহয় বিশেষ বিশেষ বৈদিক মন্ত্রগুলি সুর সমন্বিত। সঙ্গীত সংহিতায় উল্লেখ আছে যে—

"পূর্ণং চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইদন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥"

অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ হ'তে সম্পূর্ণ সার বস্তু আহরণ করে 'সঙ্গীতাখ্যং' পঞ্চমবেদ রচনা করেছেন। কাজেই বৈদিক মন্ত্রগুলিকে সুর—সার ছাড়া কিছুই বলা যায় না। সুর যখন স্থূলরূপে প্রকাশিত হয় তখনই হয় ভাষার সৃষ্টি। সুর-জগৎই সূক্ষ্ম-জগৎ। সেখানে আছে স্পন্দন (vibration) আছে প্রকাশ; কিন্তু যখনই এই প্রকাশ রূপবিশেষকে গ্রহণ করে, তখনই হয় রাগরাগিণীর সৃষ্টি। রাগ রাগিণী হচ্ছে সুরের অথবা সুর-মিশ্রণের প্রকার ভেদ বা সূক্ষ্মভাবে সুরে আত্ম-প্রতিষ্ঠ। সুরের সমস্ত অবয়ব শক্তির উন্মেষে হয়, রাগ রাগিণীর উৎপত্তি। এই স্বরাবয়বকে সঙ্গীত শাস্ত্রে শ্রুতি বলে—

"শ্রুতির্নাম স্বরারম্ভকাবয়বঃ শব্দ বিশেষঃ।"

অর্থাৎ স্বরবিকাশের আরম্ভে শব্দ যে রূপ পরিগ্রহ করে তাকেই শ্রুতি বলে। এদেরি সূক্ষ্মরূপের স্থূল মূর্ত্তি দেয় সঙ্গীত। এভাবে দেখতে গেলে রাগ-রাগিণীর স্থান সঙ্গীতের উপরে। যাঁরা সুরের রূপকে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরা রাগ-রাগিণীর রূপ দেখতে পান এবং সঙ্গীতের চেয়ে সেই রূপেই তাঁরা আনন্দ বেশী অনুভব করেন। রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি আছে; সুরের মূর্ত্তি নেই। সজ্ঘাত থেকেই মূর্ত্তির সৃষ্টি। যেখানে সুর-সজ্ঘাত উদ্ভূত হয় সেখানেই রাগ রাগিণীর উৎপত্তি; কিন্তু অনাহত সুর জগতে কোন মূর্ত্তি নেই, রাগ-রাগিণী নেই, আছে অব্যাহত, অবাধিত সুরগতি বা ধ্বনি। এই জন্য ধ্বনি বা শব্দ-মূর্চ্ছনা নিত্য, অভিব্যক্ত।

এইখানে সুর ও ধ্বনির ভিতরে পার্থক্য আছে। সুর অব্যাহত হ'লেও তার ক্রমবিকাশ আছে। সুর কখনও বিকাশ ও প্রকাশ ছাড়া থাকতে পারে না। তার স্বভাবই হচ্ছে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা। ধ্বনি কিন্তু মূর্ত্তি নেয় না। সুর ব্যক্ত, ধ্বনি অব্যক্ত। সুর নানাবিধ রূপ গ্রহণ করে বলেই ব্যক্ত। সেই রূপের পিছনে থাকে অব্যক্তেরই রেশ। যদি এই রেশকে আমরা অনুভব করতে পারি সুরের বিচ্ছিন্ন প্রকাশ হ'তে, তবেই আমরা অবিচ্ছেদ্য ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত হই। তন্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রে একেই নাদ বলে। যথা:—

১। "আকাশ সম্ভবো নাদস্তথানাহত উচ্যতে।
"আহতো" নাদমাকৃষ্য তথানাহত সংজ্ঞকাৎ॥"

(ন্যায়শাস্ত্রে শব্দগুণং আকাশং)

অর্থাৎ ব্যোমে অনাহত নাদের স্থিতি এবং সেই অনাহত নাদ হইতে আকর্ষিত হয় আহত নাদ—

২। "আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
নাদঃ প্রকাশতে পিণ্ডে তস্মাৎ পিণ্ডোঽভিধীয়তে।
নাদো ব্রহ্ম-সমাখ্যাতং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদম্॥ ইত্যাদি (সঙ্গীত দর্পণে)

এই নাদের উৎপত্তি ব্রহ্মশক্তি হতে এবং ইহা ব্রহ্মশক্তিরই প্রথম বিবর্ত্ত। কারণ সৃষ্টির প্রাথমিক তরঙ্গে নাদের সঞ্চার। এই নাদই অনাহত সুর-সঙ্গীত। ইহা নিঃশব্দের শব্দ (voiceless voice) শব্দেরপ্রণবধ্বনি। এই নাদ যোগীদেরই অধিগম্য। যোগীরাই এর স্বরূপের সহিত পরিচিত এবং এর নিঃশব্দ সঙ্গীতে উল্লসিত হন। নাদ সংহিতায় আছে যে—

"তত্রানাহতনাদন্তু মুনয়ঃ সমুপাসতে।" (সঙ্গীত দর্পণ)

কাজেই বোঝা যায় যে ইহা সাধারণ প্রকাশ অপ্রকাশের অতীত। মনের সকল স্পন্দন তিরোহিত না হ'লে এর পরিচয় সম্ভব নয়। এই পরাশব্দানুভূতি অতিমানস, মানস প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়।

(৩)

অনেকের বাড়ীতেই ছোট ছোট ছেলেদের দোলনা (Swing) আছে। দোলনাটিকে একবার দুলিয়ে দিলে অনেকক্ষণ ধরে দুলতে থাকে। কিন্তু দোলার পরিমাণ (Amplitude) ক্রমে ক্রমে কমে আসতে থাকে এবং শেষকালে একেবারে থেমে যায়। ঘড়ি ধরে লক্ষ্য করলে একটা বড় মজার ব্যাপার দেখা যাবে। একবার দুলিয়ে ছেড়ে দিলে দোলনাটির দোলার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে বটে, কিন্তু পুরো একবার দুলতে যে সময় লাগে তা সমানই থাকে। যখন দোলার পরিমাণ থাকে বেশী তখন যদি একবার দুলতে সময় লাগে পাঁচ সেকেণ্ড, তাহ'লে দোলার পরিমাণ যখন একেবারে কমে আসে তখনও একবার দুলতে ঐ পাঁচ সেকেণ্ডই লাগবে। একটু বেশীও না একটু কমও না। একবার দুলতে যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় 'দোলনকাল' (Period of oscillation), আর মিনিটে বা ঘণ্টায় যতবার দুলবে তাকে বলতে পারি দোলন সংখ্যা (Frequency of oscillation) যে দোলার জোর ধীরে ধীরে কমে আসছে, তাকে আমরা ব'লব ক্ষীয়মাণ দোলা (Damped oscillation)। পুরো একবার দুলবার সময়—দোলন কাল—আমরা বাড়াতেও পারি আবার কমাতেও পারি। জোরে বা আস্তে দুলিয়ে দিয়ে এই বাড়ানো-কমানো যায় না—এ কাজটি করতে হবে, যে দড়িটি দিয়ে দোলনাটি ঝোলান রয়েছে তাকে আরও লম্বা করে দিয়ে, অথবা আরও খাটো করে দিয়ে। ঝোলান দড়ি যত লম্বা হবে, দোলন-কালও হবে তত বেশী। আবার দড়ি ছোট করে দিলে দোলন-কালও যাবে কমে। এই যে একটু ঠেলা দিয়ে ছেড়ে দিলে দোলনটি দুলতে লাগলো, সে শুধু তার স্বাভাবিক দোলন-প্রিয়তার জন্যই। তাই এই জাতীয় দোলার নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বাভাবিক দোলন' (Free or Natural oscillation)। স্বাভাবিক দোলার সময় দোলনকাল ঠিক করে দেয় দড়ির দৈর্ঘ্যটি—আর কেউ নয়। কিন্তু আর একরকম দোলা আছে। আমরা কেউ যদি হাতে ধরে, না ছেড়ে দিয়ে,
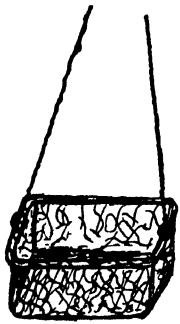
দোলনার ছবি

দোলাতে সুরু করি, তখন কিন্তু কত তাড়াতাড়ি দুলবে সেটা নির্ভর করে শুধু আমাদের নিজেদের উপর। আমরা ইচ্ছা করলে তাকে দ্রুত দোলাতে পারি, আবার খুসী হলে ধীরে ধীরেও দোলাতে পারি। এই জাতীয় দোলনকে বলে 'চাহিত দোলন' যার ইংরাজী নাম হ'ল Forced oscillation স্বাভাবিক দোলন সাধারণত যে ক্রমেই কমে আসতে থাকে, তার কারণ হ'ল বাতাসের বাধা, দড়ির ঘষা (Air resistance, friction of chords) প্রভৃতি আমরা যদি দোলার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই তবে আমাদের কিছুক্ষণ অন্তর দোলনাটিকে ঠেলে দিতে হবে। এলোমেলোভাবে ঠেলে দিলে ফল ত কিছু হবেই না, বরং তাল কেটে যাবে। দোলনাটি যখন আমাদের কাছে আসছে, তখন যদি তাকে দূরে ঠেলে দিই, তাহ'লে ত দোলার পরিমাণ কমেই যাবে। দেখা গেছে সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়, যখন প্রতি একটি দোলায় আমরা একবার ধাক্কা দিয়ে দিই। আবার ধাক্কাটিও দিতে হবে ঠিক এমন সময়ে, যাতে দোলার গতির সাহায্য হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দোলা দেওয়াই হল আসল কথা। এক মিনিটে দোলনাটি স্বাভাবিক ভাবে যতবার দুলছে আমরাও যদি মিনিটে ঠিক ততবার যথা-সময়ে ঠেলা দিই তবে সব চাইতে অল্প পরিশ্রমে দোলনাটি অবিরাম স্বাভাবিক দোলায় দুলতে থাকবে। দোলার পরিমাণ কমবে না একটুও। আর যদি আমরা আমাদের খুসী মত জোর করে হাতে ধরে দোলাতে চাই, তাতে পরিশ্রম হবে বিস্তর, অথচ সেই তুলনায় কাজ হবে অল্প। কোন জিনিষের স্বাভাবিক দোলন-প্রিয়তার সুযোগ নিয়ে খুব অল্প চেষ্টায় যৎসামান্য শক্তিব্যয়ে অবিরাম দোলন সৃষ্টি করা—এটি হল বেতার বিজ্ঞানে খুব বড় একটি কথা। একে ইংরাজীতে বলা হয় Resonance.

দোলা সম্বন্ধে এখানে যা' বলা হ'ল, বৈদ্যুতিক দোলার বেলাতেও তা সমানভাবেই খাটে। দোলনাটি যেমন দুলবার সময়ে এপাশ-ওপাশ করছে, যাতায়াতি বিদ্যুৎও তেমনই কখন একদিকে যাচ্ছে, আবার পরক্ষণেই তার বিপরীত দিকে ছুটছে। এই দিক্-পোল্‌টানা (Alternating current) বিদ্যুৎপ্রবাহ বা ইলেক্‌ট্রন স্রোতকে সাধারণ দোলার সঙ্গে তুলনা ক'রে বৈদ্যুতিক দোলন বলা যেতে পারে (Electrical oscillation) কোন বৈদ্যুতিক চলতি পথে (Electric circuit)

যদি আমরা একটা অলটারনেটারের (Alternator) দুই মাথা জুড়ে দেই, তবে যাতায়াতি প্রবাহ বইতে সুরু করবে। কারণ অলটারনেটরের কাজই হ'ল বারবার ইলেকটন স্রোতের দিক পালটে দেওয়া। এই বৈদ্যুতিক দোলন মোটেই স্বাভাবিক দোলন নয়। সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনেরা যে কতবার দিক্‌পরিবর্ত্তন করবে, তা নির্ভর করছে যে তাদের চালাচ্ছে সেই অলটারনেটারের উপর। এটা হ'ল চালিত দোলন (Forced Electrical oscillation) কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহেরও স্বাভাবিক দোলন আছে। একটা বিদ্যুৎ সংরক্ষকের একটা ফলকের উপর রাখা হল ঋণবিদ্যুৎ (অর্থাৎ ইলেকট্রন) এবং অপর ফলকটির উপর রাখা হল ধনবিদ্যুৎ অর্থাৎ সেইসব পরমাণুদের যাদের কাছ থেকে ইলেকট্রনদের ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এই জড়ো করে রাখবার কাজটি (charging the condenser) করা হয় ব্যাটারী দিয়ে। কাজ শেষ হলে ব্যাটারী নেওয়া হ'ল খুলে। সাধারণত এই খুলে দেওয়া এবং জুড়ে দেওয়া কাজটি করা হয় একটি ছোট সুইচের সাহায্যে। ইলেক্‌ট্রন এবং কাণা পরমাণুরা (Positive Ions) ছট্‌ফট্

চলাচল বৈদ্যুতিক দোলন হ'ল স্বাভাবিক দোলন (Natural Election oscillation)। সেক্ষেত্রে হয়ত লক্ষ লক্ষ বার দুলছে। দোলার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমে আসে বলেই একে আমরা বলি ক্ষীয়মাণ স্বাভাবিক দোলন (Damped oscillation)। এ'দের দোলন কাল অর্থাৎ ইলেকট্রনদের একবার যাতায়াত করতে যে সময় লাগে তা নির্ভর করছে শুধু চলতি পথের গুণাগুণের উপরে, বিদ্যুৎ সংরক্ষকের এবং তারকুণ্ডলের ছোট বড়র উপর। যেমন দোলনার দোলন-কাল নির্ভর করছে ঝোলাবার দড়ির দৈর্ঘ্যের উপরে। একটু ভেবে দেখলেই এর কারণ বোঝা যাবে। তার কুণ্ডল যত বড় হবে, বিদ্যুৎ স্রোতকে মন্থর করে দেবার ক্ষমতা হবে তার তত বেশী। আবার বিদ্যুৎ-সংরক্ষকের আকার হ'বে যত বড়, অর্থাৎ যত বেশী বিদ্যুৎ জমা করে রাখবার ক্ষমতা থাকবে তার, সে বিদ্যুৎপ্রবাহকে তত আস্তে চালাতে চেষ্টা করবে। কারণ তার স্বভাবই হ'ল কৃপণ, শুধু জমা করেই রাখতে চায়, সহজে ছেড়ে দিতে চায়না। বিদ্যুৎ সংরক্ষক এবং তার কুণ্ডল হবে যত ছোট, বিদ্যুৎ দোলাও হবে তত দ্রুত। যে সংরক্ষক
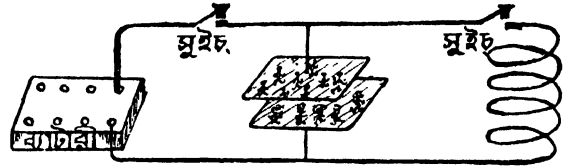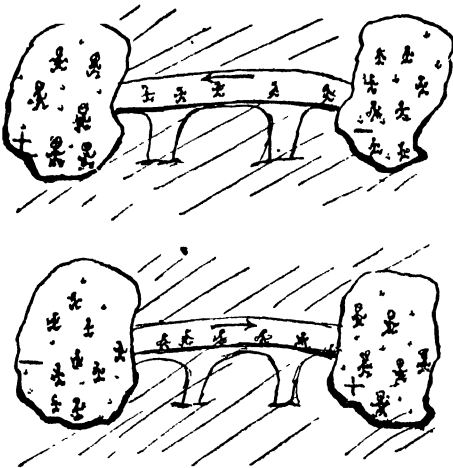
চিত্র নং ১২

করছে ধাতু ফলক দুটির উপরে। ব্যাটারীর সুইচটি এখন রইল খোলা। এখন যদি ফলক দুটির মাঝে তার কুণ্ডল দিয়ে ইলেকট্রনদের জন্য একটি সাঁকো (Bridge) তৈরী করে দেওয়া যায় তাহ'লে কি হয় দেখা যাক্। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ইলেকট্রনেরা ছুটতে থাকবে ধনবিদ্যুতের দিকে। সেখানে গিয়ে মুহূর্ত্তের জন্য তারা দাঁড়ায় স্থির হ'য়ে, একটা হিসাব নিকাশ হয়, কে এলো আর কেইবা এলো না। হিসাবে দেখা গেল, যে সব ইলেকট্রনদের জমা করে রাখা হয়েছিল তাঁরা এসেইছে, তাদের হুজুগে পড়ে আরও অনেক ইলেকট্রন চলে এসেছে সেখানকার অনেক পরমাণুকে কাণা করে দিয়ে। তাই অতিরিক্ত ইলেকট্রন চলে আসার ফলে যে ফলকটি ইলেকট্রন-আবেশে নেগেটিভ্ হ'য়েছিল, সেটি হ'য়ে গেল পজিটিভ্। আর পজিটিভ ফলকটি পরিণত হ'ল নেগেটিভে। এবার অতিরিক্ত ইলেকট্রন যারা চলে এসেছিল তাদের ঘরে ফিরে যাবার পালা। কিন্তু আগের বারের মতই এবারেও হুজুগে পড়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত আরও কিছু ইলেকট্রন চলে যায় প্রথম ফলকটিতে। এবারে যারা বাড়তি চলে গেল, সংখ্যায় তারা কিন্তু প্রথমবারের বাড়তি চলে যাওয়া ইলেকট্রনদের চাইতে ঢের কম। এই রকম ভাবে ইলেকট্রনেরা বার বার যাতায়াত করতে থাকে এবং ক্রমেই তারা সংখ্যায় কমে আসতে থাকে—শেষে ইলেকট্রন চলাচল একেবারে যায় বন্ধ হ'য়ে। এই বিদ্যুৎ-

এবং তার কুণ্ডলযুক্ত বিদ্যুৎ চলপথের কথা আমরা বলেছি, সেখানে যদি অলটারনেটর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করানো হ'ত, তবে চলাচলের—বৈদ্যুতিক দোলনের সময় নির্ভর করত অলটারনেটরের উপর। অলটারনেটরের তাতে পরিশ্রম এবং শক্তিব্যয় হ'ত অজস্র। কিন্তু অলটারনেটরের ইলেকট্রন স্রোতের দিক পরিবর্ত্তন করতে যে সময় লাগে, তা' যদি ঐ চলতি পথের (Electric circuit) বৈদ্যুতিক দোলন কালের সমান হয়, তবে কিন্তু এত শক্তিব্যয়ের কোন প্রয়োজনই হয় না। কারণ ইলেকট্রনেরা ত' স্বাভাবিক দোলায় দুলছেই, অলটারনেটরের তখনকার কাজ হল প্রত্যেক দোলায় ইলেকট্রনদের একটু করে ঠেলে দেওয়া। তা' হ'লেই ইলেকট্রন স্রোত দুলতে থাকবে অবিরাম। এ'টি হ'ল Electeical Resonance.

আমরা আগেই বলেছি, সমস্ত বিশ্বে ইথার ছড়িয়ে আছে। যখন কোন চলতি পথের (circuit) মধ্য দিয়া ইলেকট্রনেরা খুব দ্রুতগতিতে আনা-গোনা করতে থাকে, তখন সেই ইথার সমুদ্রে ঢেউ ওঠে। জলের উপরে সাঁতরালে যেমন ঢেউ সৃষ্টি হয়, অনেকটা সেই রকম মনে করা যেতে পারে। একটু আগেই আমরা বৈদ্যুতিক দোলার কথা বলেছি যার গতিপথ হ'ল, বিদ্যুৎ সংরক্ষক এবং সংযুক্ত তারকুণ্ডল। এই চলপথের চারিদিকের ইথার আলোড়িত হয়ে উঠল ঢেউ, এই ঢেউ পড়ল

চারিদিকে ছড়িয়ে, আর এই ঢেউ দিয়েই পাঠান হ'ল 'বিনাতারে টেলিগ্রাফ'। কী করে, সেই কথাই এখানে ব'লব।

ব্যাটারী শুদ্ধ যে বৈদ্যুতিক চলপথের কথা আমরা বলেছি, এই প্রেরকযন্ত্রটির (Spark Transmitter) চেহারাও তারই মত। পার্থক্য হবার সাথে সাথেই এক ঝাঁক করে ইথারের ঢেউ ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। যতক্ষণ ব্যাটারীর চাবি টেপা (switch on) থাকবে, ততক্ষণই এই ব্যাপার ঘটবে, ততক্ষণই ঝাঁকে ঝাঁকে ঢেউ বেরুতে থাকবে। এরা একটানা অবিরাম ঢেউ নয় (continuous waves),
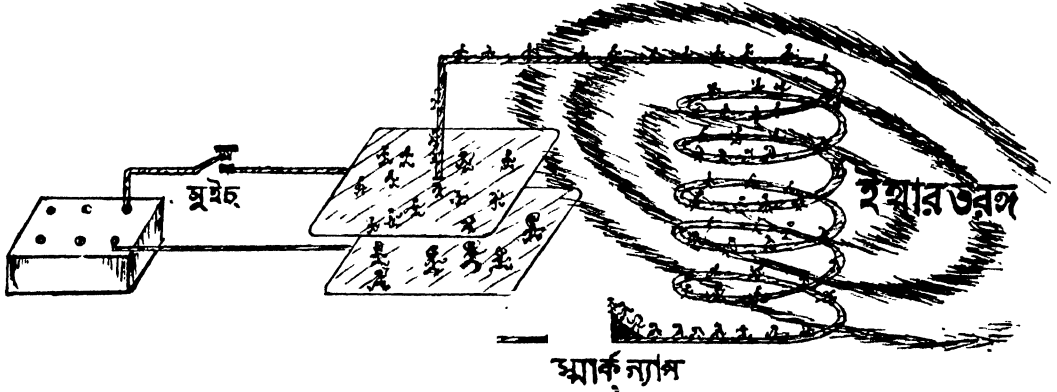
চিত্র নং ১৩

হ'ল এই যে, এখানে চলাচল পথের মধ্যে ছোট একটি ফাঁক রয়েছে, অনেকটা পাহাড়ে খাদের মতই। ইংরাজীতে একে বলে spark-gap. ব্যাটারীর চাবি (Key or switch) টিপে দিলে,ঝাঁকে ঝাঁকে ইলেকট্রন এবং কাণা পরমাণু এসে জমা হয়, সংরক্ষণের ফলকদুটির উপরে। ইলেকট্রনেরা ধনবিদ্যুতের কাছে যেতে পারে না, তার কারণ স্পার্কগ্যাপের উপর কোন সাঁকো নেই। বাতাসের ভিতর দিয়ে ত আর ইলেকট্রনেরা চলতে পারে না। পারে না, তাই বা বলি কি করে! দেখা গেছে বাতাসকে খুব গরম করলে, অনেক বায়ুকণা থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যায়, আবার কোনও কোনও অণু তাদের নেয় কুড়িয়ে। এই সব ইলেকট্রন হারানো পরমাণুর মাথায় চেপে আমাদের ইলেকটন-যাত্রীরা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। যাত্রীরা যেমন নদীর এক পার থেকে অপর পারে যেতে পারে সেতুর উপর দিয়ে, তেমনি তারা ফেরী ষ্টীমারে করেও পার হতে পারে। তপ্ত বায়ুকণারা ইলেকট্রনযাত্রীদের কাছে ফেরী ষ্টীমারের মত কাজ করে।

ব্যাটারী থেকে ইলেকটন এবং পজিটিভ্ কাণা-পরমাণু ত এসে জমা হ'ল সংরক্ষকের ফলকদুটির উপরে। তারা পরস্পর সম্মিলিত হতে পারছে না, তার কারণ হ'ল, স্পার্কগ্যাপের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। কিন্তু কত আর সহ্য করা যায়। ক্রমেই ব্যাটারী থেকে ধনবিদ্যুৎ এবং ঋণবিদ্যুতের রী-ইনফোর্স মেন্ট হচ্ছে ফলকদুটির উপরে'! ভিড়ের ঠেলায় ইলেকট্রনের ছটফট করে আবার ইলেকট্নহারা পরমাণুদের কাছে যাবার ইচ্ছাও দুর্দ্দমনীয়। কিন্তু হলে হবে কী! পথ নেই। ইলেকট্নেরা যখন আর সইতে পারে না, তখন আসে চরম মুহূর্ত্ত। মরিয়া হ'য়ে তারা ঝাঁপ দেয় স্পার্কগ্যাপের টেঞ্চের মধ্যে। একটা বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ দেখা দেয়। এরই প্রবল তেজে বাতাস আগুন হ'য়ে উঠল। তখন সেই তপ্ত বায়ুকণারাই ইলেকট্নদের পারাপারের ভার নেয়। বিদ্যুৎ প্রবাহ (অর্থাৎ ইলেকট্নস্রোত) দ্রুত "যাতায়াত" করতে সুরু করে। চারিদিকের ইথারে উঠল ঢেউ। ক্রমে ইলেকট্ন চলাচল ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ-স্রোতা হয়ে অবশেষে একেবারে থেমে যায়। ইথারের ঢেউও যায় বন্ধ হ'য়ে। স্পার্কগ্যাপের ভিতরকার বাতাস হ'ল ঠাণ্ডা, আবার সেখানে পড়ল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। ফের আবার, ইলেকট ন এবং ধনবিদ্যুৎ জমা হতে লাগল ব্যাটারী থেকে। ফের ইলেকট্নেরা ঝাঁপ দিল টেঞ্চের মধ্যে, ফের ঢেউ উঠল ইথারে! প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ (spark) নির্গত

এরা হ'ল ঝাঁক বাধা (Discontinuous waves) ঢেউ। সৈন্যরা যখন একটা দেশ আক্রমণ করে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা সবাই একটা দল না হ'য়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হ'য়ে অগ্রসর হয়। এই ঢেউগুলিও সেই রকম ঝাঁক বেঁধে বেঁধে ছড়িয়ে পড়ে।

আগেই বলা হয়েছে প্রত্যেকটি স্ফুলিঙ্গের সাথে সাথেই এক ঝাঁক করে ঢেউ সৃষ্টি হয় এবং একটি ঝাঁকে হয়ত হাজার হাজার ঢেউ থাকে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই তার-কুণ্ডল-বিদ্যুৎসংরক্ষক-চলপথ থেকে যে ঢেউ সৃষ্টি হ'ল, তারা খুব বেশী দূর যেতে পারে না। অল্প কয়েক
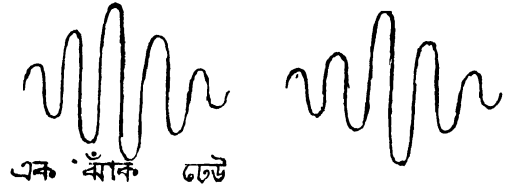
চিত্র নং ১৪

মাইলের পরেই, তার আর কোনও অস্তিত্ব থাকত না। মার্কনি তখন এক নতুন উপায় বাৎলালেন। তিনি দেখলেন, বিদ্যুৎসংরক্ষকের ফলক দুটিকে পরস্পরের কাছ থেকে যত৽বেশী দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, ইথার ঢেউও হবে তত সুদূরপ্রসারী। তিনি শেষে দেখলেন সব চাইতে ভালো ফল পাওয়া যায়, যদি উপরের ফলকটিকে বাড়ীর ছাদের মত, কি তারও বেশী উঁচুতে ধরে রাখা যায়। অত উঁচুতে অবশ্য একটা ধাতুফলকে টাঙিয়ে রাখা অসাধ্য না হলেও, অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই মার্কনি ধাতু ফলকের বদলে কয়েকটি তার দিয়েই কাজ চালাতে লাগলেন এবং তাতে ফলও কিছু খারাপ হ'ল না। তিনি আর একটি কাজ করলেন, তলাকার ধাতুফলকটির কাজ চালালেন মাটি দিয়েই। উপরের ফলকটির বদলে, আমরা যে তার ব্যবহার করে থাকি, তাকে বলা হয় আকাশ-তার (Aerial wire)। এই ব্যবস্থায় যে ইথার-ঢেউ অনেক বেশী দূরে যেতে পারে তার কারণ হ'ল এই যে, এতে দুই ফলকের (আকাশতার এবং মাটি) মধ্যে আগের চাইতে ঢের বেশী ইথার আলোড়িত হ'তে পারছে, আর তারই ফলে ইথার-তরঙ্গও হচ্ছে দূর-প্রসারী। বেতার বিজ্ঞানে

আকাশ তারের উদ্ভাবন মার্কোনির একটি শ্রেষ্ঠ অবদান বলা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, এই বেতার তরঙ্গ দিয়ে আমরা সঙ্কেত পাঠাবই বা কী করে এবং এই তরঙ্গ ধরে সেই সঙ্কেতটি বুঝে নেবই বা কেমন করে।

যাঁরা সঙ্গীত চর্চা করে থাকেন, তাঁরা সুর-বাঁধা (Tuning) কাকে বলে তা' অবশ্যই জানেন। সেতারে একটা তার বাজালে, সুর-বাঁধা থাকলে আর একটি তারও দেখাদেখি বেজে উঠবে। সুর-বাঁধা মানেই হ'ল দুটি তারেরই স্বাভাবিক দোলন প্রিয়তা অর্থাৎ দোলন-কাল যেমন করেই হোক, সমান হওয়া চাই। প্রথম তারটিকে একবার কাঁপিয়ে দিলে সে যদি নিজে নিজে সেকেণ্ডে হাজার বার দুলতে (Vibrate) থাকে, তবে সুর-বাঁধতে হ'লে দ্বিতীয় তারটিকেও এমন করে নিতে হবে যে, তারও স্বাভাবিক দোলন সংখ্যা হবে সেকেণ্ডে হাজার বার। প্রথম তারটি বাজালে বাতাসে যে ঢেউ সৃষ্টি হয়, তার সামান্য আঘাতেই দ্বিতীয় তারটি দুলতে সুরু করে। তবে সুর বাঁধা থাকলে এই দোলার পরিমাণ হয় খুব বেশী, তার কারণ হ'ল এই যে দ্বিতীয় তারটিও ওই দোলায় দুলবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। সুর-বাঁধা না থাকলে সে দু'লত অনিচ্ছুকভাবে—তাই তার দোলার পরিমাণও হ'ত অতি সামান্য। এই সুর-বাঁধা অথবা দোলনকাল সমান করে দেওয়া কাজটি করা চলতে পারে অনেক রকমেই, তারটি আলগা-বা-টাইট করে দিয়ে, অথবা ছোট-বড় করে দিয়ে, আবার কখনও বা মোটা-বা-সরু করে দিয়ে।

শব্দ হ'লে বাতাসের ঢেউ এসে যেমন কাণের পর্দাটি কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, আমাদের গ্রাহক-যন্ত্রেও (Receiver) তেমনি এমন একটি ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেখানে ইথার-তরঙ্গ এসে বৈদ্যুতিক-দোলন অর্থাৎ ইলেকট্রনদের চলাচল সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং দরকার হ'ল একটি বিদ্যুৎ-চলাচল পথের (electric oscillatory Circuit)। এই চলতি-পথ তৈরী করা হল, একটি বিদ্যুৎ সংরক্ষকের সাথে তারকুণ্ডল প্রেরক যন্ত্রের মত (transmitter) এখানেও সংরক্ষকের উপরের ফলকটির বদলে বসানো হ'ল আকাশ-তার এবং নীচের ফলকের কাজ চালান হ'ল মাটি (surface of earth) দিয়েই। এতে সুবিধা হ'ল এই যে অনেকখানি ঢেউ এসে লাগতে পারে চলতি-পথের বিদ্যুৎ-সংরক্ষকের উপর।

বেতার ঢেউ ত এসে পড়ল আমাদের গ্রাহক যন্ত্রের আকাশ তারের উপর। আর তারই আঘাতে, ঢেউ-এর তালে তালে চলতি পথের ইলেকট্রনেরা সুরু করল যাওয়া আসা। একবার আকাশ-তার থেকে তার কুণ্ডলের ভিতর দিয়ে মাটি পর্য্যন্ত আবার মাটি থেকে আকাশতারে। হবে শব্দ, যা আমরা শুনতে পারি। তাই দরকার হ'ল টেলিফোনের। আকাশতারের যাতায়াতি বিদ্যুৎ স্রোত যাতে টেলিফোনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, তারই জন্য তার-কুণ্ডলের পাশে আর একটি পথ করে দেওয়া হ'ল, যে পথের মধ্যে বসান রইল টেলিফোন। ইথারের ঢেউ এসে পড়ল আকাশতারের উপর—তা' থেকে উৎপন্ন হ'ল বিদ্যুৎ প্রবাহ। কিন্তু এই প্রবাহ যাতে শক্তিশালী হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। আকাশ-তার এবং তার-কুণ্ডল অথবা এর যে কোন একটির আয়তন ছোট বড় করে আগত ঢেউ-এর সঙ্গে এর সুর বেঁধে দিতে হবে অর্থাৎ যে ঢেউ আসছে, তার দোলন কাল এবং আকাশ তার ও তারকুণ্ডল নিয়ে যে বৈদ্যুতিক-চলপথ তৈরী হ'ল, তার দোলন কাল সমান হওয়া চাই। সুর বেঁধে নিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ অনেকটা বেড়ে যায়। তবে আরও বাড়ানোর প্রয়োজন হলে অন্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হয়। সে কথা এখন থাক।

একটা কথা বলা হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, যে অনেক রেডিওতে দেখা যায়, সামান্য একটু ডালা (Receiver turning dial) ঘোরালেই ষ্টেশন একদম শোনাই যায় না। আমরা আগেই বলেছি যে বেতার ঢেউ সব চাইতে বেশী সাড়া জাগায়—প্রেরকযন্ত্রের সুর বাঁধা থাকলে এবং সুর বাঁধা যেতে পারে বিদ্যুৎসংরক্ষক অথবা তার-কুণ্ডলের (অথবা দুই-এরই) আয়তন পরিবর্ত্তন করে। বৈদ্যুতিক চল-পথের দোলন-কাল নির্ভর করে সংরক্ষক এবং তার-কুণ্ডলের আয়তনের গুণফলের উপর। তাই একটি বড় করতে হলে, অপরটি ছোট করতেই হবে, যদি দোলন-কাল আমরা সমানই রাখতে চাই। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সব গ্রাহক যন্ত্রে তারকুণ্ডলের আয়তন সংরক্ষকের আয়তনের তুলনায় ঢের বড়, সেই সব যন্ত্রের মজা হল এই যে, শুধু সেই সব ঢেউ এসেই সাড়া জাগাতে পারে যাদের সুরে গ্রাহক যন্ত্রের সুর মেলান রয়েছে। এমন ঢেউ যদি আসে যার দোলন কাল, চলতি পথের দোলন কালের চাইতে অল্প একটুও বেশী বা কম, তারা কখনও সাড়া তুলতে পারবে না। এরা হল প্রবণ-গ্রাহকযন্ত্র (Sharply tuned Receiver)। আবার যে সব যন্ত্রে সংরক্ষকেরই আয়তন বড় তার-কুণ্ডলের চাইতে (কিন্তু দু'টির গুণ আগের বারের সমানই), তারা কিন্তু অত ভাবপ্রবণ নয়। যে ঢেউ-এর সঙ্গে এদের সুর-বাঁধা নেই, তারাও এসে বেশ কিছু সাড়া তুলতে পারে অর্থাৎ বেসুরো ঢেউ এলেও বেশ কিছু বিদ্যুৎ চলাচল সৃষ্টি হয়ই। এরা হল অপ্রবণ-গ্রাহক যন্ত্র (Flat-tuning in Receiver)

চিত্র নং ১৫
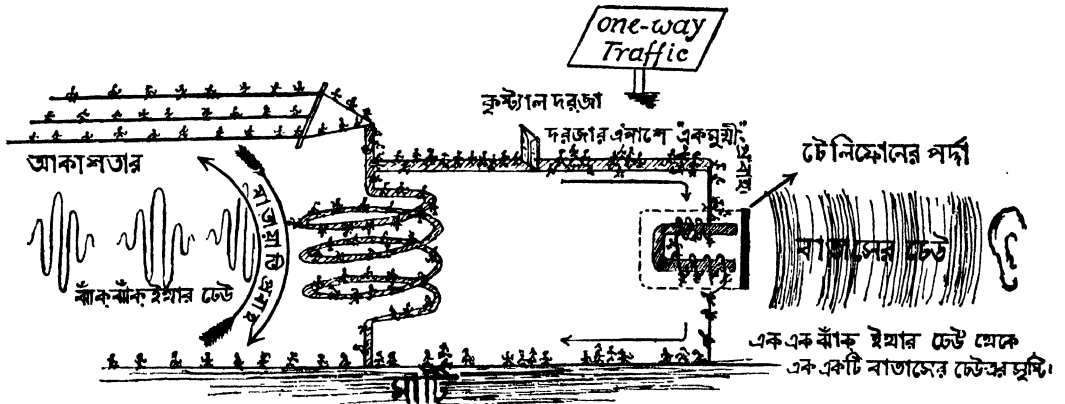
যতক্ষণ ঢেউ আসছে, বিদ্যুৎ চলাচলও চলবে ততক্ষণ। এই যাতায়াতি (oscillating or alternating current) প্রবাহ থেকে সৃষ্টি করতে

আমরা বলেছি যে ঢেউ এসে লাগবার সাথে সাথেই তার-কুণ্ডলের মধ্যে ইলেকট্রন স্রোত যাতায়াত করতে থাকে—ঢেউ-এর তালে তালে।

তারই একটা অংশ চলতে থাকে পাশের গলিটি দিয়ে, যেখানে বসানো রয়েছে টেলিফোন। টেলিফোনে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তখন সে যে দিকেই যাক না কেন টেলিফোনের পর্দ্দাটিকে কাঁপিয়ে দেবেই। সোজা দিকে গেলেও পর্দ্দাটি কাঁপবে, উল্টো দিকে গেলেও ঠিক তেমনি কাঁপবে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ প্রবাহ ত সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ বার যাতায়াত করছে, পর্দ্দাটিও ত ততবারই কাঁপতে চাইবে! কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব হয়! পর্দ্দাটিকে যতবার খুসী দুলতে বল্লেই যে সে তা করতে পারবে তার কোনও মানে নেই। আমাদের যদি সেকেণ্ডে অন্তত পঞ্চাশ বারও হাত দোলাতে বলা হয়, আমরা কি তাই পারি! পারি না, তার কারণ শারীরিকভাবেই (Physically) সেটা অসম্ভব। টেলিফোনের পর্দ্দাটিও অত দ্রুত দুলতে পারে না। যদি বা পারত, তাহলেও বিশেষ সুবিধা হ'ত না। কারণ তখন তার দোলা লেগে বাতাসে যে ঢেউ সৃষ্টি হ'ত, তা'রা হ'ত এত দ্রুত এবং এত ছোট যে আমরা তা শুনতেই পেতাম না। সবরকম আকারের বাতাসের ঢেউ-ই আমরা শুনতে পাইনা, কারণ কান সাড়া দিতে পারে না বলেই। কানেরও শোনবার একটা সীমা আছে (Audible limit)। সেকেণ্ডে অন্ততঃ পনের ষোলটা ঢেউও যদি না জন্মায়, তবে সেই ঢেউ আমরা শুনতে পাই না—আবার তেমনই ঢেউ যদি এত দ্রুত হয় যে সেকেণ্ডে বিশ-পঁচিশ হাজারেরও অধিক হয় তখনও আবার কান কোনও সাড়া দেয় না। এই শোনবার সীমাকে ইংরাজীতে বলা হয় Audible-Range আমরা দেখেছি যে কোন পর্দ্দাই ইথারের ঢেউএর মত অত দ্রুত দুলতে পারে না, শারীরিক অক্ষমতার দরুণই পারে না (Inertia)। কিন্তু এমন যদি হয় যে ঝাঁক বেঁধে যে সব ঢেউ আসছে, তাদের একটি ঝাঁকে যতগুলি ঢেউ আছে তারা সবাই মিলে পর্দ্দাটিকে একবার মাত্র কাঁপিয়ে দেবে, তাহ'লে কিন্তু আমাদের শোনবার কোনও অসুবিধা থাকবে না। প্রতি সেকেণ্ডে যদি হাজারটি (ধরাই যাক হাজার ঝাঁক ঢেউ আসছে সেকেণ্ডে) ঢেউ আসে, তা হ'লে সেকেণ্ডে টেলিফোনের পর্দ্দাটি কাঁপবে হাজার বার মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেও ঢেউ সৃষ্টি হবে সেকেণ্ডে হাজারটি। এই ঢেউ আমরা স্বচ্ছন্দেই শুনতে পারি। যাতে এক ঝাঁক ঢেউ মিলে পর্দ্দাটিকে একবার মাত্র দুলিয়ে দিতে পারে সে জন্য আমাদের একটি কৌশল করতে হবে। যে পথে টেলিফোনটি রয়েছে, সেই পথের মাঝখানে একটি দরজা বসাতে হবে। দরজাটির বিশেষত্ব হ'ল এইখানে যে ইলেকট্রনেরা একদিকে যাবার বেলায়ই শুধু দরজা খোলা পাবে, ফিরবার সময়ে এসে দেখবে দরজা বন্ধ—ফিরে যাবার পথ নেই। অনেক বড় বড় সহরে এমন অনেক রাস্তা আছে যেখানে শুধু "One-way Traffic"ই চলতে পারে। অনেকের বাড়ীতে যেমন স্প্রিং লাগানো দরজা আছে, যাদের শুধু এক দিকেই খোলা যায়। যে পথ বা দরজা দিয়ে শুধু একদিকেই যাওয়া যায় তাদের ইংরাজীতে বলা হয় Valve. আমাদের এখানে যে দরজা লাগানো হ'ল সেটি কিন্তু সাধারণ কাঠের বা লোহার দরজা নয়, ছোট এক টুকরো পাথরের মত জিনিষ—কৃষ্ট্যালই (crystal) ইলেকট্রনদের একদিকে-পথ-দেওয়া-দরজার কাজ করে।

এই কৃষ্ট্যাল-দরজা বসানোর ফলে ঢেউ-এর অর্দ্ধেকটা কাজে আসছে না। কারণ এই দরজা দিয়ে ইলেকট্রনেরা শুধু একদিকেই চলতে পারে—তাই ঢেউ-এর যে অংশের জন্য ইলেকট্রনেরা উল্টো পথে চলতে চাইছিল তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ফল হ'ল এই যে, আগে টেলিফোনের তারের ভিতর দিয়ে চলছিল যাতায়াতি (Alternating current) প্রবাহ, আর এখন বিদ্যুৎপ্রবাহ বইছে শুধু এক দিকেই এবং তা'ও আবার একটানা নয়, থেকে থেকে (Discontinuous spruts of Electricity)। থেকে-থেকে বলছি, তার কারণ হ'ল এই যে, যে সময়ে ইলেকট্রনদের উল্টো দিকে যাবার কথা ছিল সে সময়ে ত কোনও ইলেকট্রনই কোনও দিকেই যাবে না। অতএব এক ঝাঁক ঢেউ যতক্ষণ এসে পড়েছে আকাশতারের উপর ততক্ষণই ছোট ছোট দল বেঁধে ইলেকট্রনেরা শুধু ছুটবে এক দিকেই। তারপর খানিকক্ষণ সব চুপচাপ, যতক্ষণ না আর এক ঝাঁক ঢেউ এসে পড়ে।

আমরা বলেছি, যতক্ষণ একটি ঝাঁক ঢেউ এসে পড়ছে আকাশ-তারের উপর, ততক্ষণ ছোট-ছোট ইলেকট্রন প্রসেশন ছুটবে একদিকে একটা দলের পিছনে আর একটা, এই রকমভাবে। এক ঝাঁক ঢেউ দ্বারা উৎপন্ন এই ইলেকট্রন দলগুলি এত তাড়াতাড়ি একটার পর একটা আসতে থাকে যে, টেলিফোনের পর্দ্দাটি একটা ছোট দলের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে পেছনের দলটি এসে পড়ে। ফলে এক ঝাঁকের সবগুলি দল মিলে পর্দ্দাটিকে একবার মাত্র দুলিয়ে দেয়, অর্থাৎ বাতাসে একটিমাত্র ঢেউ সৃষ্টি হয়। সেকেণ্ডে যত ঝাঁক ঢেউ আসবে, বাতাসেও ঢেউ সৃষ্টি হবে সেকেণ্ডে ঠিক ততগুলি। এক সেকেণ্ডে যদি

চিত্র নং ১৩

হাজার ঝাঁক ইথার-ঢেউ আসতে থাকে, তবে টেলিফোনে আমরা এমন শব্দ শুনতে পাব, যেখানে বাতাস কাঁপছে সেকেণ্ডে হাজার বার, (অর্থাৎ যেখানে বাতাসে হাজারটি করে ঢেউ সৃষ্টি হচ্ছে সেকেণ্ডে)।

যতক্ষণ প্রেরকযন্ত্রের চাবি কাঠি (key) টিপে রাখা যাবে, ততক্ষণই ঝাঁকে ঝাঁক ইথার-ঢেউ বেরুতে থাকবে এবং গ্রাহকযন্ত্রের টেলিফোনে শব্দও শুনতে পাব ততক্ষণ ধরেই। মোর্স অল্পক্ষণ স্থায়ী (Dot) এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী (Dash) শব্দের বিভিন্ন সমন্বয় করে সঙ্কেত আদানপ্রদানের এক অভিনব কৌশল আবিষ্কার করেছেন। তাঁরই নাম অনুসারে এই সঙ্কেতের নামকরণ করা হয়েছে 'মোর্স সঙ্কেত-প্রণালী' (Morse code of signals)।

বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ নিয়ন্ত্রিত যে প্রেরক-যন্ত্রের কথা আমরা আলোচনা করেছি, তা' দিয়ে কিন্তু ঐ সঙ্কেত ছাড়া আর কোনও শব্দ—কথা, গান প্রভৃতি পাঠানো চলেনা। কথা বা গান পাঠাতে হলে চাই একটানা ইথারের ঢেউ (Contiuuous Aether waves) যার গায়ে কথার ছাপ মেরে দিতে হবে। বৈজ্ঞানিক পলসেন এক ধরণের স্ফুলিঙ্গ নিয়ন্ত্রিত প্রেরকযন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা' দিয়ে অবিরাম ঢেউ সৃষ্টি করা যেতে পারে, যাদের মাথায় চাপিয়ে গান, কথা—যে কোন শব্দ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানো চলে। কিন্তু সে সব প্রথা আজকালকার দিনে অচল হ'য়ে গেছে, তাই তাদের আলোচনা না করাই ভাল।

ক্রমশঃ

স্মরণীয়

শ্রীমতী যূথিকা বসু

জীবনের বিশেষ কোন এক মুহূর্ত্তে এমন এক একটা ঘটনার সান্নিধ্য লাভ হয় যে ঘটনা সর্ব্বদা মানুষের মনে নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় জাগরুক থাকে।

ডাক্তারী পাশ করিয়াই যখন ভাগ্যগুণে চাকুরী পাইয়া পাঞ্জাবের ছোট্ট একটী সহরে চলিয়া আসিলাম, তখন ভাবি নাই যে অপরের ট্র্যাজেডী আমাকে দেউলিয়া করিয়া দিবে। ছোট সহর, বাঙ্গালী নাই বলিলেই চলে, যাও বা দুই একজন আছেন তাঁহারাও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ঐ পাঞ্জাবীদেরই আচার-ব্যবহার একান্ত আপনার করিয়া' লইয়াছেন।

এই অবাঙ্গালীর দেশে প্রথমেই আমার পরিচয় হইল পোষ্ট-মাষ্টারবাবুটীর সাথে। ইনিও এখানে নবাগত। বয়সে খানিকটা প্রাচীন হইলেও আধুনিক রুচিসম্পন্ন বলিয়াই বোধহয় বন্ধুত্ব একটু গাঢ়ত্বে পরিণত হইল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে এতদূরে থাকিয়াও তাহাদের অভাব বিশেষ বোধ করি নাই। সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত শরীরটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সন্ধ্যায় শরৎদার বাড়ীতে যাওয়া আমার অভ্যাসে দাঁড়াইল। শরৎদার নানা অভিজ্ঞতার ও দেশভ্রমণের গল্প শুনিয়া ও বৌদির হাতের চা খাইয়া সন্ধ্যাটা মন্দ কাটিত না, যাক্—শরৎদার ইতিহাস বলিতে বসি নাই।

সেদিন কী একটা কারণে ছুটী ছিল। দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রার পর পোষ্টঅফিসে গেলাম। কয়েকদিন আগে কনিষ্ঠভ্রাতার পত্রে জানিয়াছি পিতা হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, ১৩।১৪ দিন হইয়া গেল আর কোনও খবর না পাইয়া মনটাও বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। পোষ্ট-অফিসে গিয়া দেখি সেখানেও শরৎদা গম্ভীর হইয়া হিসাব মিলাইতেছেন; আমি একটা চেয়ারে বসিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিলাম, এমন সময় একজন পিয়ন একটী খাম শরৎদার সম্মুখে ধরিয়া কহিল—"মাষ্টার সাব, আজ ভি ইস্‌কা মালিককো পাত্তা নেহি মিলা।"—শরৎদা মুখ না তুলিয়াই রুক্ষস্বরে বলিলেন—"নেহি মিলা তো উস্‌কো বাহার ফেক্ দেও; বাবা রে আর পারি না তোদের জ্বালায়।"

কি এমন পত্র যাহার মালিককে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমি চিঠিখানা পিয়নের নিকট হইতে চাহিয়া লইলাম। আমার সহিত শরৎদার সৌহার্দ্দ্য সকলেরই জানা ছিল, তাই পিয়নটীও বিনাদ্বিধায় আমার হস্তে খামটী দিল। খামটী হাতে লইয়া দেখি উহা কে এক রমেন ব্যানার্জ্জীর নামে আষ্টেপৃষ্ঠে বহু ছাপযুক্ত একখানা বিলাতী মেলের পত্র। কী জানি কী মনে হইল, চিঠিখানি বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। চিরদিনই বিদেশে মানুষ হইয়াছি তাই শিশুকাল হইতেই আমি চিঠি পাইতে ও পড়িতে ভালবাসিতাম। তবে বন্ধুর স্ত্রী ভিন্ন অন্য কাহারও চিঠি কোনদিন চুরি করিয়া দেখি নাই। কিন্তু আজ এই পত্রখানি পড়িবার জন্য কি জানি কেন আমার অদম্য কৌতুহল জন্মিল। যদি জানিতাম যে এই চিঠিরই আড়ালে এক দুঃখপূর্ণ ইতিহাস অপেক্ষা করিয়া আছে তবে কখনও পড়িতাম না; যাহাই হউক চিঠিটীতে যাহা পড়িলাম তাহা এই—

প্রিয় রমেন

এতদিন পরে তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি ব'লে যদি রাগ করো, তবে আমার দুঃখ হবে অপরিসীম। তুমি লিখেছিলে তোমার চিঠিখানা যদি আমার সাধনায় বিন্দুমাত্র বিঘ্নও ঘটায় তাহলে তুমি সুখী হবে—কিন্তু বন্ধু, চাঁপা বকুলের সৌরভ, বাঙ্গালাদেশের সজল হাওয়া—আর আত্মীয়স্বজনের বার্ত্তা বহন করে যে এলো ভারতের মাটী ও সপ্তসমুদ্র পেরিয়ে, তোমার ক্ষণেকের ভাবনা লাগা সেই চিঠিই কী অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকবে আমার ডেস্কের কোণে, তাই কী তুমি চাও!

তোমার চিঠি পড়ে সত্যি বড় দুঃখ পেলাম—জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে তারপর শূন্য মদের গেলাসের মত পড়ে থাকবে—এ 'থিওরী' তোমার গেল কোথায়? এত অল্পেই

তুমি অধীর হয়ে পড়েছ কেন বন্ধু! নিরাশাবাদীদের দলে তো তুমি ছিলে না? এতদিন ধরে যে সাধনা তুমি করে এসেছ তা কখনও বিফল হবার নয়, বন্ধু!

সুনন্দার সঙ্গে আমার কী করে আলাপ হোল এবং তার পরের ঘটনাগুলোও বিস্তারিত জানাতে বলেছ—'রোমান্সের' গন্ধ পেলে আজও তুমি চঞ্চল হয়ে ওঠ দেখছি, শোন তবে—

নিতান্ত রোমান্টিকভাবেই শরতের সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত একটী দিনে রতনপুর ষ্টেশনে সুনন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় হল;—তুমি নিশ্চয় আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ রমেন, যে এই পরম লাজুক ছেলেটী হঠাৎ এমন সাহসী হয়ে উঠল কি করে? কিন্তু যাক্ সে কথা—রতনপুর গ্রামেই সুনন্দাকে আরও কয়েকদিন দেখেছিলাম—শুভ্রশিষ কাশের গুচ্ছ হাতে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণের শেষে সে বাড়ী ফিরত। একদিন জমিদার-বাড়ীর পূজামণ্ডপে তার সঙ্গে মুখোমুখী দেখাও হয়ে গেল। তখনও আমি জানতাম না যে সুনন্দাই জমিদার সোমনাথবাবুর একমাত্র দৌহিত্রী। নিজে আমি গরীবের ছেলে, তাই বড়লোকদের বড় ভয় করি; কিন্তু তাকে দেখে সে কথা আমার একবারও মনে হয়নি। সেই প্রথম দিনটীতেই আমার চিত্ত বসন্ত-বাতাসে হিল্লোলিত তরুশাখার মত দুলে উঠেছিল; তখন থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিলাম···কিসের স্বপ্ন জান বন্ধু?—হীরে মুক্তো মাণিকের—ছেঁড়াকাঁথায় শুয়েই তো লোকে স্বপ্ন দেখে লক্ষ টাকার, কি বল?

তারপর—

মাকে নিয়ে যেবার পুরী যাই, অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই সেখানে আবার সুনন্দার দেখা পেলাম। মন্দিরের অমসৃণ পাথরের ধাপগুলো সে একের পর এক পেরিয়ে চল্‌ছিল আর আমি দূরের একটা মোটা থামের আড়াল থেকে দেখছিলাম আমার মানসীকে, সুষুপ্ত গভীর রজনীতে ঘুমের ঘোরে যাকে দেখেছি বহুবার, যার মৃদু চরণক্ষেপ শুনেছি কত বিনিদ্র রজনীতে।

সেদিন সুনন্দা আমাকে দেখতে না পেলেও পরদিন সমুদ্রের ধারে আমায় দেখে, ফুলে-ভরা চেরীশাখাশোভিত একটা সুইডিস্ ক্লোক্ গায়ে জড়াতে জড়াতে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল। এই একটী বছরের ব্যবধানেও সে আমায় ভোলেনি।

তারপর ক্রমেই আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লাম—বিশ্বের কোন্ এক রহস্যময় অজানা স্রোতের ঢেউ এসে লাগল আমাদের প্রাণের বেলায়······আমরা ভালবাসলাম পরস্পরকে।

কতদিন সেই সমুদ্রতীরেই ঢেউএর ডাক শুন্‌তে শুন্‌তে দুজনে চলে গিয়েছি কতদূরে। সমুদ্র তীরের কত প্রভাত, কত মৌন সন্ধ্যা সুনন্দার হাসিতে মুখর হয়ে উঠেছে। আজও আমি ভুলিনি সে দিনগুলি—হীরের টুক্‌রোর মত আমার হৃদয়ের মণিহারে জ্বল্‌ছে অনুক্ষণ।

পুরীতে দেড়মাস স্বপ্নের মত কাটিয়ে ফিরে এলাম রাজধানীতে। সেখানে সুনন্দার ঐশ্বর্য্যের আলো আমার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। আমার সেই রঘুনাথ লেনের মেসে বসে কতবার ভেবেছি কী দরকার বড়লোকের সঙ্গে মিশে? কবে হয়ত গরীব বলে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে······বড় লোকদের এও তো একটা বিলাস। সুনন্দার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছি প্রাণপণে, কিন্তু পারিনি। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে আবার ফিরে গিয়েছি তার পাশে। কী জানি, কী লুকানো ছিল তার শ্রাবণ-ছায়া-মেদুর স্বপ্ন শিহরিত চোখে যে আমি এমনি করে আমার সর্ব্বস্ব তুলে দিলাম তার হাতে। বল্‌তে পার রমেন, মানুষের মনের কুঞ্জে যখন এমনি রঙের ছোঁয়াচ লাগে তখন কী সে ভুলে যায় জগৎ সংসার? এমনি করেই কী সে বিলিয়ে দেয় নিজেকে? এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজও খুঁজে পেলাম না বন্ধু।

গরীব বলে সুনন্দা আমায় ঘৃণা করেনি; আমার বহু অযোগ্যতা সত্ত্বেও হাসিমুখেই আমায় গ্রহণ করেছিল, তার সারা অন্তর দিয়ে। জ্যোৎস্না-ঝরা রাতে তার পাশে বসে কত মুহূর্ত্ত কাটিয়ে দিয়েছি, অপরাহ্নের ছায়ায় লেকের ধারের বিসর্পিত পথটীতে দুজনে অনেক বেড়িয়েছি।

এমনি করে আমাদের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল আষাঢ়ের কত নবঘন মেঘকজ্জল দিবস, শরতের মৃণাল ফোটা ঝলমল প্রভাত; দক্ষিণ সমুদ্রের মর্ম্মরিত তপ্তবাতাস, আর রঙীণ স্বপ্ন নিয়ে এল কত বসন্ত।

তারপর এম্-এ পাশ করে পশ্চিমের একটা কলেজে যখন চাকরীর চেষ্টা করছি ঠিক তখনই একটী দিনের একটি ঘটনায় আমার সমস্ত জীবন-ধারা গেল উল্টে। হঠাৎ একদিন সুনন্দার বাবা আমায় জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে আমি যেন আর সুনন্দার পেছনে না ঘুরি। একটাও বিলিতী ডিগ্রী বহন না করে কি করে যে আমি সুনন্দাকে বিয়ে করবার আশা করি তাইতেই তিনি আশ্চর্য্য হয়েছেন। আমার চোখের সামনে দিয়ে তাঁর গ্রে শেভ্রোলেখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। নিঃশব্দে আমি ঘরে ফিরে এলাম। সেই থেকে আমার চিন্তা হোল' কি করে বিলিতী ডিগ্রী একটা আনা যায়। ভেবে ভেবে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম, একবারও আমার মনে হোল না যে আমি দরিদ্র; কোথায় পাব এত টাকা পাথেয় খরচের জন্য? কিন্তু খেয়াল চেপে গেল জয়ী আমি হবই। অবশেষে কত কষ্টে যে টাকা জোগাড় করে এলাম, তা তুমি কিছু কিছু জান।

পশ্চিমের অমন চাকরীটা ছেড়ে হঠাৎ বিলেত আসার কারণ সুনন্দা জানত না; তাই হঠাৎ যখন একদিন ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের প্রাঙ্গণে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তখন আমায় সেও সঙ্কল্প ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু বহু অনুরোধের পরও আমাকে অটল দেখে সুনন্দা নিজের হীরের নেক্‌লেস গলা থেকে খুলে দিয়েছিল আমার হাতে বিলেত যাবার পাথেয় খরচের জন্য। আমার আর্থিক অবস্থা তো তার অজানা ছিল না। সেদিন তার সেই নেক্‌লেস সুনন্দাকেই আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, নিইনি—এখন মনে হচ্ছে ভালই করেছিলাম বোধহয়। এখানে আসার দিনও আমায় বিদায় জানতে এসেছিল সুনন্দা।

তারপর প্রায় দেড়বছর পরে হঠাৎ এখানে একদিন অক্সফোর্ড

ষ্টিট-এ বাস ধরতে গিয়ে ললিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—দেশে থাকতে এই ললিতই ছিল সুনন্দার একজন অন্ধ ভক্ত—তার কাছেই সেদিন সুনন্দার বিয়ের খবর শুনলাম। সিঙ্গাপুর যাত্রার পথে সাগরের বুকে রজত চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে তার আলাপ হয় এবং দেশে ফিরেই নাকি তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সুনন্দা এতদিন আমার সঙ্গে শুধু প্রতারণাই করে এসেছে—এই রকম কী একটা কথাই যেন ললিত সেদিন আমায় বলেছিল। কিন্তু আমি জানি, সুনন্দা মোটেই সে দলের মেয়ে নয়। আমার আগমনে সে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠত, তার চোখের সেই হাসি তুমি দেখনি রমেন; বর্ষাপ্রান্তের স্মিত-হাস্যে উজ্জ্বল শুভ্র রজনীগন্ধার মত সেই হাসির দিকে চেয়ে প্রতারণার কথা মনেই আসে না: তুমি নিশ্চয় ভাবছ বন্ধু, যে আমার জীবন সুনন্দাকে না পেয়ে ব্যর্থতার হাহাকারে ভ'রে উঠেছে, কিন্তু তা নয় বন্ধু; তাকে না পেলেও যে ফুল সে আমার অন্তরে ফুটিয়ে দিয়ে গিয়েছে তাতেই আমি পরম সুখী হয়েছি। প্রতিটী প্রভাত যেন সুনন্দার জীবনে আনন্দবার্ত্তা বয়ে আনে—এই প্রার্থনাই আজ আমি করছি।

কিছুদিন আগে খবর পেলাম আমার মা মাস দুই আগে মারা গেছেন, দেশে হয়ত আর ফিরব না। যেখানে নেই আমার স্নেহময়ী মা আমায় আশীর্ব্বাদ জানাতে—সেখানে ফিরেই বা কী হবে বল? এখানেই যা হোক করে চালিয়ে নেব।

আর ভাই পারছি না লিখতে—মোমবাতিটা প্রায় নিভে এসেছে। বাইরেও আজ প্রচণ্ড অন্ধকার, আকাশে একটি তারা নেই—পৃথিবীর সব আলো যেন নিঃশেষে নিভে গেছে। ভাবছি এ কিসের সূচনা আমার জীবনেও কী কোনদিন ফুটিবে না আলোক রেখা? ইতি—

তোমার সুব্রত

অদেখা যুবকটির ব্যর্থতার ইতিহাস পড়িয়া মনটা বড় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। কত আশা লইয়াই সে যাত্রা করিয়াছিল, ছাত্রাবাসের নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে করিতে কত রাত্রি হয়ত কাটিয়া গিয়াছে, কোন দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, কোনও আমোদপ্রমোদ তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কেবল একটি কথা তাহার হৃদয়ে নিদ্রাহারা তারার ন্যায় জাগিয়া ছিল—কি করিয়া প্রিয়াকে পাশে পাইবে।

কিন্তু প্রকৃতির নির্ম্মম, নিষ্ঠুর পরিহাসে তাসের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মৌন সন্ধ্যায় দরিদ্র যুবক সুব্রতের চিন্তা আমায় কেমন যেন উন্মনা করিয়া তুলিল। যাহাই হউক—কয়েক দিন পরই এদেশ চিরদিনের মত ছাড়িয়া আমাকে স্বগ্রামে ফিরিতে হইল। তখনও ভাবি নাই পাঞ্জাব-সীমান্তের এই ছোট্ট সহরটীতে আর কখনও ফিরিব না।

দেশে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কিছুদিন কাটাইয়া আর কর্ম্মস্থানে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না, দেশেই প্র্যাক্‌টিস্ সুরু করিলাম। বৎসর-খানেক বেশ ভালভাবেই আমার ব্যবসা চলিল কিন্তু তাহার পরই গ্রামস্থ সকলেই আমার এমন আত্মীয় হইয়া উঠিলেন, যে কেহই আর আমার ফি বা ঔষধের দাম দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেন না। বাধ্য হইয়াই আমাকে চাকুরীর সন্ধান করিতে হইল। কিছুদিন পর মধ্যপ্রদেশের একটী সহরের হাসপাতালে চাকুরী পাইলাম।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল এক প্রভাতে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আবার সেই বহুদূর প্রবাসে যাত্রা করিলাম। বাঙ্গালার প্রতিটী পথরেখা বৃক্ষ সেদিন যেন বড় আপনার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাঙ্গালার এই বিচিত্র পুলিনে নদীতটে, বিরাট বনস্পতির ছায়ায় ঘেরা পল্লীপথে আবার ফিরিয়া আসিব কি না কে জানে?

দুইদিন ট্রেণে কাটাইয়া এক অপরাহ্নে আমার নূতন কর্ম্ম-স্থানে পৌঁছিলাম। চারিদিক দেখিয়া জায়গাটীকে ভালই লাগিল। একটী পাহাড়ী চাকর লইয়া আমার সংসার মন্দ চলিতেছিল না। এইরূপে ৩।৪ মাস কাটিয়া গেল।

হাসপাতালের অফিস রুমে বসিয়া সেদিন কী একটা করিতে-ছিলাম এমন সময় মাদ্রাজী ডাক্তার আয়ার আসিয়া আমার সম্মুখের চেয়ারটায় বসিয়া বলিল—'ডক্টর! একটা ভাল খবর আছে, কাল যে নূতন মেয়ে ডাক্তারটী এসেছে আজ তাকে দেখলাম, simply charming; ওর সঙ্গে কিন্তু আমাদের আলাপ জমাতেই হবে, বড্ড গম্ভীর যদিও, তাহলেও চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই—কি বলেন?' ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটীতে কেমন যেন একটা ক্রূর বিশ্রী হাসি ফুটাইয়া আবার চলিয়া গেল।

ডাক্তার আয়ার বর্ণিত মেয়ে ডাক্তারটীর প্রতি সেদিন কোনও কৌতূহল না জন্মিলেও পরদিনই তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ—এমন কি পরিচয় পর্য্যন্ত হইয়া গেল। বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বলিলেও আমি বুঝিলাম সে বাঙ্গালী, কারণ বাঙ্গালী মেয়ের অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয়তা তাহার সুন্দর মুখে পরিস্ফুট ছিল।

হাসপাতালের প্রকাণ্ড সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিতে করিতে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বাঙ্গালা দেশের মেয়ে বলেই বোধ হচ্ছে যেন আপনাকে!'

মৃদু হাসিয়া সে কহিল—'হ্যাঁ, আমার নাম সুনন্দা চৌধুরী।'

—সুনন্দা! কোথায় যেন শুনিয়াছি নামটা, বিস্মৃতপ্রায় একটা ঘটনা আমার মনে চঞ্চল বিদ্যুৎরেখার মত ঝলক দিয়া গেল—এই কী সেই সুব্রতের চিরবাঞ্ছিতা প্রিয়া—সুনন্দা? কিন্তু সে তো ধনীর কন্যা, এই কাজ করিতে আসিবে কি? অন্য মেয়েও তো হইতে পারে, পৃথিবীতে এক নামে কত লোকই তো থাকে।

যাহাই হউক, কয়েকদিনের মধ্যেই সুনন্দার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হইয়া গেল। নানা কার্য্যের এবং পরামর্শের জন্য সে আমাকে প্রায়ই আহ্বান করিত। সুনন্দার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা লইয়া ডাক্তার আয়ার প্রমুখ হাসপাতালের কর্ম্মীবৃন্দ বেশ আলোচনা করিত এবং মনে মনে বোধহয় আমার ভাগ্যকে ঈর্ষাও করিত। এমনিভাবে বর্ত্তমান কর্ম্মস্থানে এক বৎসর কাটাইয়া দিলাম। পূজা আসিয়া পড়িল, কিন্তু এখানে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে নীল আকাশে শুভ্র মেঘের চপলতা দেখিয়া মনে হয় শরৎ বুঝি আসিয়াছে, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে হয়ত এতদিনে পূজার বাজনা সুরু হইয়াছে—শান্ত সরোবর আলো করিয়া অজস্র পদ্ম শালুক ফুটিয়া আছে। শরতের এমন রূপ যে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিব তাহার উপায় নাই। দেশে

যাইতে না পারিয়া মনটা খারাপ হইয়া গেল। কেমন যেন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে আমার দিনগুলি।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন সুনন্দার নিকট হইতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম।

স্নানাদি সারিয়া সুনন্দার গৃহে উপস্থিত হইলাম। আজ আর তাহার পরণে হাসপাতালের পোষাক নাই, কাল পাড় সাদা শাড়ীটাতেই সুনন্দাকে চমৎকার মানাইয়াছে। আমাকে দেখিয়া স্মিত হাস্যে সুনন্দা কহিল—'এত দেরী হল' যে? সেই কখন থেকে রেঁধে বেড়ে বসে আছি।'.

—'খুব দেরী হয়ে গেছে সত্যি'।

—'আর কথা নয়, আসুন একেবারে গিয়ে খেতে বসবেন।' আহার করিতে করিতে আমি কহিলাম—'রান্না কি তোমার ঐ মাদ্রাজী ঝিটিই করেছে নাকি সুনন্দা?'

—হুঁ, ও রাঁধলে কী আর ওসব মুখে দিতে পারতেন, এতক্ষণে লঙ্কার চোটে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলতেন। বলিয়া সুনন্দা একটু হাসিল।

—'তুমি রেঁধেছ? চমৎকার হয়েছে তো?'—

আহার শেষ করিয়া আমি ও সুনন্দা দুজনে গল্প করিতে বসিলাম। হস্তস্থিত পত্রিকাটার পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিলাম—'তোমার রান্নাটা কিন্তু চমৎকার হয়েছিল। অনেকদিন পরে তৃপ্তি নিয়ে আকণ্ঠ খেলাম আজ, কোথায় শিখলে এমন রান্না নন্দা! আমার চাকরটাকে একবার পাঠিয়ে দিই সেখানে।'

হাসিয়া সুনন্দা বলে—'এত আপনার খাওয়ার কষ্ট দাদা।'

—'তা না তো কি? কি অমৃতই যে রাঁধেন আমার দ্রৌপদীটি, সে আর আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। জানতে চাও তো একদিন গিয়ে আমার বাড়ীতে খেয়ে এস। সেইজন্যই তো বলছি, যেখানে তুমি রাঁধতে শিখেছ তার ঠিকানাটা দাও।'

—'কিন্তু দাদা, সে তো এখন আর সম্ভব নয়, আমার রতনপুরের বামুন দিদিটী এখন পরলোকে, সেখানকার ঠিকানাটা তো আমার জানা নেই।'

আমি সুনন্দার কথায় বাধা দিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠি··· 'রতনপুর! তুমি কী রতনপুরের মেয়ে সুনন্দা?'

—'না, রতনপুরের মেয়ে ঠিক নই, তবে সেখানে আমার দাদু সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেই আমি বেশী থাকতাম।'

যে ঘটনা কিছুদিন পূর্ব্বে আমার মনে বিদ্যুতের মত উঁকি দিয়াছিল মাত্র, আজ তবে কী তাহাই সত্য হইল? এই সেই ধনীকন্যা সুনন্দা, যে একদিন একটী দরিদ্র যুবকের আশার মনোরম প্রাসাদ রূঢ় আঘাতে ভগ্ন করিয়াছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যাহাকে আমি সহোদরার ন্যায় ভালবাসিয়াছিলাম তাহার প্রতি মনটা বিমুখ হইয়া উঠিল, তবু একবার শেষটা জানিয়া লইবার জন্য বলিলাম—'তবে কি রজত চ্যাটার্জ্জীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি নন্দা?' আমার একথায় সুনন্দা বিস্ময়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'আপনি কার কাছে শুনলেন এ কথা! আপনি কি চেনেন ললিতকে, সেই তো এই মিথ্যা রটনা করেছিল যার ফলে আমি আজ···। কি একটা কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়া সুনন্দা আবার বলিল—'আপনি বলুন কোথা থেকে জানলেন এ কথা? উত্তেজনায় তার কণ্ঠ তখন কাঁপিতেছে। আমি ধীরে ধীরে সুব্রতের চিঠি সংক্রান্ত সকল ঘটনাই তাহাকে বলিলাম। আমার প্রত্যেকটী কথা নীরবে শুনিতে শুনিতে তাহার শুভ্র কপোল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তাহার এ নীরব ক্রন্দনে কি জানি কেন আমার মনে হইল—সুনন্দা কখনও সুব্রতকে প্রতারিত করে নাই, হয়ত ঐ ললিতের মিথ্যা রটনাই তাহাদের মাঝে যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। তাই তাহার চোখে এ অশ্রুর সমারোহ, আমি ধীরে ধীরে বলিলাম—'দুঃখ কোর না নন্দা, সুব্রত নিশ্চয়ই মিথ্যায় ভুলে আছে, একদিন সে সত্য জেনে আবার তোমারই পাশে ফিরে আসবে জেনো।' এ কথা শুনিয়া দুইহাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া নন্দা কাঁদিয়া উঠিয়া অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—সুব্রত নেই, এ পৃথিবীর আর কোথাও সে নেই, আর কোনদিন সে ফিরে আসবে না। উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে তার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব উহাকে? তাহা ছাড়া আমিও যেন কেমন বিমূঢ় হইয়া গেলাম, সেই দূর অতীতে একটী রহস্যময় চিঠি আমার হাতে আসিল, তারপর তাহারই নায়িকার সহিত দীর্ঘদিন পরে আজ এভাবে কথাবার্ত্তা, সবই যেন কেমন প্রহেলিকার মত মনে হইতেছিল।

যাহাহউক খানিকক্ষণ পরে সুনন্দা নিজেই মুখ তুলিল, তখনও তাহার মুখ হইতে কান্নার চিহ্ন মিলায় নাই। আমি সেই অশ্রুসিক্ত ঈষৎ শিহরিত দীর্ঘপক্ষ্ম চোখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম—'এ কেমন করে হোল নন্দা?' সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুনন্দা বলিতে সুরু করে—'এখান থেকে যাবার প্রায় দু'বছর পর থেকে সুব্রতের চিঠির সংখ্যাগুলো কেমন যেন ক'মে যেতে লাগল, তারপর কমতে কমতে একেবারেই মিলিয়ে গেল। আমি ভাবলাম অন্য ছেলেদের মত সেও সেখানে গিয়ে সুন্দরী মোহিনীদের মোহ এড়াতে পারে নি। তার এ অবহেলা আমার বুকে বড় বেজেছিল, তখন শুধু মনে হোত—যে যাবার দিনটীতে তাকে মনে রাখবার জন্যে এত সকাতর মিনতি জানিয়েছিল, আজ সে নিজেই কেমন করে ভুলে গেল আমাকে? ইচ্ছে হোল মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাকে একবার এই প্রশ্ন করি। এর ছয় মাস পরে আমিও একদিন বিলেত রওনা হয়ে গেলাম। যাবার আগে সুব্রতকে জানাইনি, ভেবেছিলাম তাকে সেই মোহিনীদের দলের ভেতরই আবিষ্কার করব গিয়ে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তার ঠিকানায় খোঁজ নিয়ে জানলুম—একবছর আগে সে ও জায়গা ছেড়ে গেছে পয়সার অভাবে এবং পড়াও ছেড়ে দিয়েছে। বর্ত্তমানে কোন্ একটা কারখানায় সে কাজ করছে। আমি ঠিকানাটা জেনে নিয়ে সেখানে গেলুম। তখন কারখানার ছুটি হয়েছে মাত্র, শ্রমিকের দল একে একে বেরিয়ে আসছে। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলুম; হঠাৎ দেখলুম সেই শ্রমিকের দলের সঙ্গে সুব্রতও এগিয়ে আসছে, পরণে তার সাধারণ শ্রমিকের নীল বেশ। আমি যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না এ সেই সুব্রত? কোথায় গেল তার সেই সুগৌর বর্ণ, কোথায় গেল তার সেই স্বাস্থ্য? কিসের প্রচণ্ড আঘাতে যেন ভেঙ্গে গেছে সব—আমি চেতনা হারিয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। কি যেন ভাবতে ভাবতে সে মাথাটি নীচু করে পথ চলছিল হঠাৎ মাথা তুলে চেয়েই আমার

দেখে সে ছুটে এল,তার ক্লান্তি মাখান চোখে ফিরে এল আগেকার সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ।

আমার অনুরোধে সুব্রত কারখানার কাজ ছেড়ে দিল। আমরা দুজনে আবার সেই আগের মত হাস্যময় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লাম। ভোরের কুহেলিজাল সরে গিয়ে আবার যেন নূতন করে সূর্য্যোদয় হোল আমাদের দুজনেরই জীবনে। আমরা দুজনে বেড়াতে লাগলুম সমুদ্রের ধারে ধারে—কুঞ্জ কাননের মাঝে মাঝে। দু'জনে মিলে বহুদূর হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হ'য়ে হয়ত বা বসে পড়তুম অজস্র ফুলে আনমিত কোনও বিরাট গাছের ছায়ায়—সঙ্গে থাকত' সামান্য খাদ্যসামগ্রী, দুটো পীচ্‌ আর হয়ত দু'খানা স্যাণ্ডউইচ্‌। এমনি করে আমাদের সুখের দিনগুলি শান্ত নদীতে পাল তোলা নৌকার মত ভেসে চল্‌তে লাগল।

তারপর বসন্তের একটি আলোকোজ্জ্বল দিনে আমরা উভয়ে আইনত বিবাহিত হলাম। যদিও আমাদের বিয়েতে কোনও অনুষ্ঠানই পালন করা হয় নি, তবুও অজস্র গোলাপ আর মিগ্‌নোনেট দিয়ে রচিত হোল আমাদের বাসর শয্যা।

বিয়ের পরদিনই আমরা ইউরোপের অন্যদেশগুলো দেখে নেবার জন্য যাত্রা করলাম। রাইন নদীর তটভূমি, পম্পিয়াইর ভগ্ন দেউল, সুইজার্ল্যাণ্ডের গিরি নির্ঝর দেখে বেড়ালুম। ভেনিসের গণ্ডোলায় চড়ে জ্যোৎস্নারাতে অনেক বেড়িয়েছি দুজনে, সেই দিনগুলো আমি কোনও দিন ভুলব না, সত্যি দাদা, এইরকম দিনগুলো জীবনে হয়ত আর আসেই না—কিন্তু স্মৃতির পাতায় এরা কি গম্ভীর, প্রশান্ত মূর্ত্তি নিয়ে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এমনি করে নানাদেশে কিছুদিন কাটিয়ে আমরা লণ্ডনে ফিরে এলাম। আমি ডাক্তারী পড়তে সুরু করলাম, আর সুব্রতও আবার তার ক্লাসে 'জয়েন' করবে ঠিক হোল।

পরমসুখে, হ্যাঁ, পরমসুখেই আমাদের দিনগুলো কাট্‌ছিল। কিন্তু সুব্রত ক্রমশঃই যেন কেমন অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগল, ভেতরে তার যে ক্ষয় সুরু হয়েছিল তাকে আমি রোধ করতে পারি নি ; নদীর জলে ক্ষয়ে যাওয়া তটের মত এও অলক্ষ্যে অনেকটাই ক্ষয় করেছিল ; যখন জানা গেল তখন আর উপায় ছিল না। তবু সুব্রতকে নিয়ে এলাম সুইজার্ল্যাণ্ডে—কিন্তু কিছুই হোল না, সুব্রত ক্রমে ক্রমে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। মৃত্যুর সঙ্গে চল্‌তে লাগল প্রচণ্ড সংগ্রাম, কিন্তু কিছুই ফল হোল না, আমারই হার হোল অবশেষে। শীতের একটি তুহিনার্দ্র সন্ধ্যায় সুব্রত—' উদ্দাম অশ্রু চাপিয়া সুনন্দা আবার আরম্ভ করিল—'হ্যাঁ তারপর আমি নিজে হাতে তাকে সমাহিত করে এলাম তুষার স্তূপের মাঝে।

আজও আমার মনে হয় সেই তুষার স্তূপের তলায় সে ঘুমিয়ে আছে আমারই ঘুম ভাঙ্গানোর অপেক্ষায়।'

কথা শেষ করিয়া সুনন্দা উদাস নেত্রে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমার মনেও কত চিন্তাই যে দোলা দিয়া গেল তার ঠিক নাই। চেতনা যখন হল তখন বেলা আর বড় বেশী নাই। সুনন্দা তখনও তেমনি দূর আকাশের পানে তাকাইয়া আছে—তাহার সেই ধ্যানে লীন মূর্ত্তির পানে চাহিয়া মনে হয়—জটা নাই, গেরুয়া নাই, তবু এ কোন্ তপস্বিনী বসিয়াছে তপস্যায় ?

* * * *

আজও জীবনের এই গোধূলীবেলায় পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলি ভাবিতে বসিলে, প্রথমেই সুনন্দার সেই অপূর্ব্ব পথ হারানো তারার মত দু'টী চোখ আমার সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ভাসিয়া উঠে।

শেষ-সাধ

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

তোমার মাঝারে রেখ না আমারে ঘিরে—
আমারে ভুলাও,
ভুলাইয়া মোরে দাও ;
সংশয়ে শুধু ভাসি যে নয়ন নীরে !
কেন বা দুলাও ?
কেন ফিরে ফিরে চাও ?

কেন বা নয়ন তব নয়নের পানে,
শুধু চেয়ে রয়
ব্যাকুল বাসনা লয়ে।
তব কণ্ঠের শতভাষা শত গানে
কানে কানে কয়
মিষ্টি মধুর হয়ে।

তোমার কোমল ওতনুর মাঝে কবে
অতনুর সম
মিলাইয়া যাব আমি
ঋণ-পরিশোধ কবে হবে এই ভবে
ওগো অনুপম
ওগো অন্তরযামী।

আঁখির পিপাসা মিটিবে না কভু মোর
আলোর মাঝারে
যতদিন পড়ে রব,
ততদিন শুধু ঝরিবে যে আঁখি লোর
কান্নার ছায়ারে
ভুল ক্করে টেনে লব !

তার চেয়ে এস, শেষ করে দিই পালা
শেষ নয়নের
শেষ দেখা দেখে নিয়া—
তোমারে লভিয়া জুড়াক সকল জ্বালা
এই মরমের
সব সাধ পুরাইয়া।

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব গীতিকবিতা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বৈষ্ণব পদাবলী বাঙ্গালা সাহিত্য-কাননের ফুল্ল কুসুম। মাধুরী ও গৌরবে বাঙ্গালীর এ সৌন্দর্য্য-সম্পদ অপরিমেয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদ-কর্ত্তাদের অসাধারণ প্রতিভায় এদেশের গীতি কবিতা অতুলনীয় সু-ললিত ও রসময়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"গীতি কবিতা বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং গীতি-কবিতাই রস-সাহিত্যের প্রধান গৌরব-স্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো, যেমন তাহার ভাবের সৌরভ, তেমনি গঠনের সৌন্দর্য্য।" ব্রজাঙ্গনা-কাব্যে মধুসূদন প্রতিভা রস-সাহিত্যের অঙ্গপুষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের নানা-দিকস্পর্শী প্রতিভার কোনো অবদানে সে সাহিত্য সমৃদ্ধ কিনা, এ প্রশ্ন সহজেই কাব্যামোদীর হৃদয়ে জাগে। আরও জানতে ইচ্ছা হয়, সাহিত্যের সেই অঙ্গ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি অভিমত।

এ আলোচনা সাহিত্যের দিক্ হ'তে। ভক্ত বৈষ্ণব-কবিতাকে ধর্ম্ম-গাথা বলে মানেন। এ প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে ধর্ম্ম-মতের উল্লেখ অপরিহার্য্য। কিন্তু তা মাত্র সাহিত্য-রস আস্বাদনের সহায়তা-কল্পে কর্ত্তে হবে। এ সন্দর্ভের মুখ্য উদ্দেশ্য সাহিত্যিক, ধর্ম্ম-মত বিচার নয়।

ধাতু-গত অর্থে বৈষ্ণব কবিতা বিষ্ণু-বিষয়ক কবিতা। শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীমদ্ভাগবত অবতাররূপে গণ্য করেন। ঐ মহা-গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে উত্তরকালে বুদ্ধ অবতার অবতীর্ণ হবেন। অবশ্য "এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।"

এ বিচারে রামায়ণ-গীতি, বৌদ্ধ-গান ও দোঁহা, হরি-সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্যামসুন্দরের সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর-লীলা-কীর্ত্তন বৈষ্ণবের গান। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর নাম-সঙ্কীর্ত্তন গৌড়ীয় গণ সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান-লাভ করেছে। হরি-সংকীর্ত্তন এবং চৈতন্যদেবের মহিমা-কীর্ত্তন, গায়ক এবং শ্রোতার মন-প্রাণ ভক্তিরসে প্লাবিত করে। তাদের ভাব ও ভাষা সরল পথে শ্রোতার মর্ম্মস্থলে পৌঁছে তাকে আকুল করে। "বল্ মাধাই মধুর স্বরে, হরির নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে।"—এ গান সংখ্যাহীন বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তি-বীজ বপন করেছে। মণ্ডলীর সবাই সমকণ্ঠে সঙ্কীর্ত্তন গাহিতে পারে। তাই তার উন্মাদনা সর্ব্বজনীন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অন্যতম হেতু—যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

"কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার,
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার
আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

কলি-যুগের সাধনা হল নাম জপ। কারণ—

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

কীর্ত্তন-সাধনা অবশ্য প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছিলেন—

নহি তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ক'রে মহাপ্রভু দেশে এক বন্যা এনেছিলেন। নাম-প্রচারে জগতকে মাতিয়ে তোলবার আয়োজনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব প্রেমের অভিযান দেখেছিলেন। তাঁর গর্ব্বের এবং আশ্বাসের আরও কারণ—"আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন।...তিনি বিস্তৃত মানব প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাঙ্গালা পৃথিবীর এক প্রান্তে ছিল। তখন তো সাম্য, ভ্রাতৃ-ভাব প্রভৃতি কথা-গুলোর সৃষ্টি হয় নাই।" সত্যই তো কবির কথায় তখন বাঙ্গালী—"আপন আপন বাঁশ বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসন বাটীর মনসা সিজের বেড়ার" গণ্ডীর ভিতর আহ্নিক তর্পণ করত। বাঙ্গালার সেই গৌরবময় দিনে, "চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাঙ্গালা দেশের গানের সুর পর্য্যন্ত ফিরিয়া গেল।...তখন এক-কণ্ঠ বিহারী বৈঠকী সুর-গুলা কোথায় ভাসিয়া গেল, তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ-হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগ-রাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্ত্তন বলিয়া এক নূতন সঙ্গীত উঠিল। যেমন ভাব, তেমনি তার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার ক্রন্দন-ধ্বনি।"

সত্যই সবার বোধগম্য ভাষায় এক অভিনব গীতি কবিতার যুগ এলো দেশে। সঙ্কীর্ত্তন ও বাউলের গান সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য-রসোন্মাদ পণ্ডিতের গর্ব্ব খর্ব্ব করেছিল। কবি বলেছেন—"সংস্কৃতবাগিশেরা বলিবেন, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাইনা, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, একি বাঙ্গালা।" এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন—"আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা, আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।"

সংস্কৃত তখন বাঙ্গালাকে পাংক্তেয় করতে নাসিকা-কুঞ্চন করত'। তার আভিজাত্য-গর্ব্ব হরণ করেছিল বাঙ্গালার অতি ললিত গীতি-কবিতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ভিখারী আমাদের দ্বারের কাছে গেয়ে বেড়ায় ইউনিভারসাল লাভ সাদা কথায়।" তিনি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়!
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
(ওরে) মার খেয়েছি না হয় আরো খাব;
ওরে—তবু হরির নামটি দিব আয়
ওরে মেরেছে কলসীর কাণা তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়।"

তিনি আর একটি গান সম্বন্ধে বলেছেন——"বাউল বলিতেছে সমস্ত জগতের গান শুনিবার এক যন্ত্র আছে—ভাবের আজগবি কল গৌর-চাঁদের ঘরে। সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর আনছে এক তারে—গো সখি প্রেম তারে। প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িত খেলাইতে থাকে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমেষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়।"

একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মুস্লিম যুগে হিন্দুধর্ম্মের যত নূতন ভাব-তরঙ্গ ভারতবর্ষকে প্লাবিত করেছে, তারা সবাই চলতি ভাষার আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্রজবুলি ব্যতীত বাকী প্রাদেশিক ভাষার রচনা বিভক্তি হীন সংস্কৃত শব্দ। আমি শিখ-গুরু অর্জ্জুনের একটি সুন্দর গাথা উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। কিন্তু এটি বাঙ্গালা কীর্ত্তনের মত চল্তি পাঞ্জাবীতে রচিত নয়।

তোম্ দাতে ঠাকুর প্রতিপালক, নায়ক খসম হামারি।
নিমখ্ নিমখ্ তুম্হি প্রতিপালক হাম বারক তুমরে ভারে।
জিহ্বা এক কমন্ গুণ কহিয়ে বে-সুমার, বে-অন্ত, স্বোয়ামী।
তেরো অন্ত না কিন্হী লেহিয়ে কোঠ্ পরাধ হমারে খণ্ডো।
অন্ত বিধি সমঝাহো।
হাম্ অজ্ঞান অলপ্ মত থোরী
তুম আপন বিরদ্ধ বাখাও।

তুমরি শরণ, তুমরি আশা তুমহি সজ্জন সোহেরে
রাখ রাখ হরদয়ালা নানক ঘরকে গোলে।

মীরার ভজন হিন্দী-ভাষার, ভক্তি-রসের সৌন্দর্য্যের মন্দাকিনী।

সঙ্কীর্ত্তন সাহিত্যে কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান প্রচুর। ব্রাহ্ম-সঙ্গীতে তাঁর বহু সঙ্কীর্ত্তন সন্নিবেশিত। কিন্তু প্রাচীন কীর্ত্তন সাহিত্যে ব্রাহ্ম-সঙ্গীত অশোভন, কবির নিজের এই অভিমত। তিনি বলেছেন—প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঁজিয়া পাই তবে আমাদের কি বিস্ময় কি আনন্দ! আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-ভূমি দেখিতে পাই বলিয়া।......প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে। অতীত কালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায় সে হৃদয় কি মরুভূমি?

কবি একটি গান হ'তে দেখিয়েছেন যে আমাদের হৃদয়ে চলতি যুগের সঙ্গে অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হয়েছে বলে, এই গানটির বিলাপ আমাদের বিষণ্ণ করে।

ঐ বুঝি এসেছে বৃন্দাবন
আমায় বলে দেরে নিতাই ধন।
ওরে বৃন্দাবনের পশু-পাখীর রব শুনি কি কারণ।
ওরে বংশিবট অক্ষয়বট, কোথা রে তমাল বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কোথা গিরি গোবর্দ্ধন।

কবির এ বিশ্লেষণ সমীচীন। বাঙ্গালী গোরাচাঁদকে বৃন্দাবনচন্দ্ররূপে দেখেছিল বলেই তিনি দেশ মাতিয়ে ছিলেন।

সঙ্কীর্ত্তন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান যথেষ্ট, কিন্তু অবশ্য ব্রহ্ম-সঙ্গীত নিয়ে। দু'একটা উদাহরণ দিই।

"তারো তারো হরি দীনজনে
ডাকো তোমার পথে করুণাময়, সাধন ভজন হীনজনে।"

কিম্বা　"হরি তোমায় ডাকি সংসারে একাকী।"

সরল ভাষা। এগুলিও বোধ হয় সহজে বোধগম্য—
"কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ—"

কিম্বা　"হে সখা মম হৃদয়ে রহ"
সংসারের সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ।"

অথবা　"আপনি কবে তোমার নাম ধ্বনিবে সব কাজে।"

কিম্বা—　"ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধন দুর্ল্লভ...
অপরাধ যদি করে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা
তবে পরাণপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।"

এই কীর্ত্তনটি বড় প্রাণস্পর্শী।
"শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে, ফিরি হে দ্বারে দ্বারে"—ইত্যাদি।
এই রকম বহু কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে

যথা—তোমারি গেহে পালিত স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে
আমার প্রাণ, তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে।

অথবা—তারে আরতি করে চন্দ্র তপন দেব মানব বন্দে চরণ
অসীম সেই বিশ্বশরণ, তাঁর জগত-মন্দিরে।

যার শেষ ছত্র—কত কত ভকত প্রাণ—হেরিছে পুলকে গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহ বন্ধ হে।

এও বড় সুন্দর—নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে রয়েছ হৃদয়ে গোপনে।

আর এক মনোরম কীর্ত্তন—
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে জাগে।

ভক্তের দীন নিবেদন—যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো মোর প্রাণে ফিরিয়ে
যেয়ো না প্রভু।

সত্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে সেই-খানেই সন্ধান করিতে হয়।" রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সরল সঙ্কীর্ত্তনে সে ভাষা শুনেছিলেন।

মহাপ্রভু এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গের প্রচারের ফলে উড়িষ্যার সাহিত্য, সংকীর্ত্তন এবং লীলা-কবিতায় পূর্ণ। শুনেছি তেলেগু সাহিত্যের বৈষ্ণব কবিতা মনোরম ও রসময়। এ সব দেশে আজিও চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রচুর। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"যাঁহাদের বড় প্রাণ তাহারা বেশি দিন নিজের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ।"

"বৈষ্ণব-কবিতা" বা "বৈষ্ণব পদাবলী" শব্দ-গুলি ধাতুগত বিষদ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এরা যোগরূঢ় ও পারিভাষিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বৈষ্ণবের গান, রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা-কীর্ত্তন। সে লীলা নিত্যধাম বৈকুণ্ঠের লীলা নয়। গোবিন্দের ব্রজ-সুন্দরীদের সাথে নর-লীলা। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অর্থেই "বৈষ্ণবের গান" কথাটি ব্যবহার করেছেন—

পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন
বৃন্দাবন গাথা।

বৈষ্ণবের সাধন-পথ ভক্তি। ভক্তির পথ—
শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নানা ভাবে ভক্তি জাগে সাধকের অন্তরে। এ চিত্তবৃত্তি ঐকান্তিক হ'লে সর্ব্বগ্রাসী হয়। সাধ্য ও সাধকের মিলন-সূত্র ভক্তি। এ মিলন সকল মনোবৃত্তি অবলুপ্ত ক'রে। তাই ভক্তি, যোগ, চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ। সাধনার দেবতাই তো পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে মনপ্রাণ সঁপে দেওয়াই তো সর্ব্বংখল্বিদম্ ব্রহ্মের উপলব্ধি। তিনি যে ভগবান স্বয়ং। যোগ-যুক্ত বিশুদ্ধাত্মাই চিদ্-ঘন চিরানন্দ লাভ করতে পারে। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে এক-কৃষ্ণ শরণে একনিষ্ঠের মোক্ষ। সে পথে শোক নাই কারণ শ্যামই চিরানন্দ। সে পথে কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণ-স্মরণ, কৃষ্ণ-ভজন বিনা কর্ম্ম নাই—ভক্তের যোগক্ষেম বহনের ভার যে গোবিন্দের। ভারতের সাহিত্য, পুরাণ, ইতিবৃত্ত এমন কি উপন্যাস ও ইতিকথা, ভক্তি-রসের বিভিন্ন রূপের চিত্র এঁকেছে। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, হনুমান, বিভীষণ, অর্জ্জুন, উদ্ধব, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতি বহু ভক্তের তন্ময়তার চিত্রে ভারতের দিক্‌দিগন্ত শোভিত। নানারূপে অচ্যুতানন্দের ভজনা সম্ভব। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ ভজে তৈছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-সাগর। নানা কথার ছলে শ্রীমদ্ভাগবদ্ নিরস দার্শনিক তথ্য ভক্তি-তত্ত্বের সঙ্গে সমাধান ক'রে, দর্শন-শাস্ত্রের কঠোরতাকে মাধুর্য্যে পরিণত করেছে। সে সহস্র-ধারা মঙ্গল-প্রস্রবণের একটি স্রোতকেই বাঙ্গালী বৈষ্ণব, বিশেষ ক'রে শুভ মন্দাকিনী ব'লে আরাধনা করেছে। সেটি মধু-রস-স্রোতস্বতী।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের সারা অঙ্গ ভক্তি-রসে টলটল। বৌদ্ধ-গান, শ্যামা-সঙ্গীত, বাউলের গান প্রভৃতির তুলনায় শ্যাম-সঙ্গীতের সংখ্যা অত্যধিক। কানু বিনা গীত নাই—বাঙ্গালার প্রবচন। আবার কানু-গীতির মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের মিলন সঙ্গীত—অনুরাগ পূর্ব্বরাগ, দূতিয়ালী, বিরহ, মান, সম্ভোগ এবং কুঞ্জ-ভঙ্গের নিরাশা—সু-ললিত গাথায়, মনোরম তরল ভাষায়, সাহিত্য-কাননকে মুখরিত ক'রে রেখেছে।

রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাই বৈষ্ণবের গানের প্রতিপাদ্য বিষয়। শব্দ-চিত্রের অপূর্ব্ব মাধুরী মনপ্রাণ উৎফুল্ল করে। চিত্রের প্রেমের রূপ-

চিত্ত-শুদ্ধির উপকরণ। কারণ প্রেম আত্ম-নিবেদন। সব-ভোলা কানু-প্রেমে হৃদয় পরিপ্লুত হ'লে, মানুষ মনোজের শরকে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু সে প্রেম হওয়া চাই এক-মুখ এক-নিষ্ঠ। দেহের কাম, জীবের আদিম সংস্কার। শুদ্ধ কামের পরিণতি প্রেমে। কিন্তু কাম প্রবল রিপু। সাধন-মুখ না হ'লে মাত্র ভালবাসার সূত্র ধরে কামীর কোমল চিত্তবৃত্তি সহজে প্রেমের চরম পরিণাম, পরা-ভক্তি, আয়ত্ত করতে পারে না। কারণ কাম তাকে পথভ্রষ্ট করে। "ছ' জনাতে মিলে পথ দে'খায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলি।" পথ-চলার সূক্ষ্ম-রেখা হারিয়ে ফেলি। তাই ঐহিক প্রেমকে শুদ্ধ করতে হয়। চণ্ডীদাস নিজে বলেছেন—

গোপন পিরীতি গোপনে রাখিবি
সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি
তবে তো রসিক রাজ।

বৈষ্ণব কবির গানের প্রেমের মহিমা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"প্রেম সাধনার আসল কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেম বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে, পূর্ব্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, তখন যে যত প্রেমিক হইবে, সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, সে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রশ্রয় করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, তখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব
তা বিনু সকলি পর।"

বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথকে কেন মহাত্মাজী গুরুজী বলেন।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ভক্তি-মার্গে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার বাহুল্য কেন, এ প্রশ্ন সহজেই মনে ওঠে।

শ্রীচৈতন্য-মঞ্জুষার টীকাকার বলেছেন—

আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয়:
তদ্ধাম শ্রীবৃন্দাবনম্।
রম্যা কাচিৎ উপাসনা
ব্রজবধুগণৈ র্যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতম প্রমাণমলম্
প্রেম পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমিদম্
তত্রাদর নো পরঃ॥

পরমার্থলক্ষ্যই চিত্তশুদ্ধির আয়োজন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব যুগে বৈষ্ণব পরকীয়া প্রেম সাধ্য করেছিলেন। সহজিয়া সম্প্রদায় তান্ত্রিক বা বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের উত্তরাধিকারী কিনা সে আলোচনা এ সন্দর্ভে অবান্তর। শ্রীচৈতন্য নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন সত্য। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর মতে সকল লীলার মধ্যে গোপিনীকান্তের কিশোর লীলাই উৎকৃষ্ট।

প্রেম নাম প্রচারিতে চৈতন্য অবতার।
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ
আর এক হেতু শুন, আছে অন্তরঙ্গ।

সে অন্তরঙ্গ হেতু রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসে জগৎকে মাতিয়ে কৃষ্ণভক্তির প্লাবন। মধুর রস

স্বকীয়া পরকীয়া রূপে দ্বিবিধ সংস্থান।

পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্ট বুঝিয়েছেন।—

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।

বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝতে গেলে একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রেমের মধুর লীলা শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পক্ষে। নির্গুণ ভগবান গুণাশ্রয়। তিনি চিরকিশোর, চিরানন্দময়। তিনি আত্মতৃপ্ত আত্মারাম। গুণহীন সগুণ হয়ে, শ্রীবিষ্ণু, কপালে আগুন না জ্বালিয়ে, কৃষ্ণরূপে মনে প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে তোলেন।

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ।

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে লীলাকীর্ত্তনের প্রাচুর্য্যের ইহাই কারণ। গৌড়ীয় সাহিত্য গোবিন্দের আরাধনায় শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য রস পরিবেশন করেছে কিন্তু বহুল পরিমাণে মধুরভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বস্তুত অবতারতত্ত্বের গূঢ় ভাব বুঝিয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেছেন—

সেই রাধা ভাব লইয়া চৈতন্যাবতার
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল প্রচার।
সেইভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ॥

রস-সাহিত্যের প্রসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের নরদেহের বিলাস। সুস্পষ্ট ভাষায় কবি সেকথা প্রকাশ করেছেন।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ
ভজন্তে তাদৃশী ক্রীড়াঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।

রায় রামানন্দের সহিত আলোচনায়, স্বধর্ম্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি, প্রেম-ভক্তি, দাস্য-প্রেম, সখ্য-প্রেম এবং বাৎসল্য প্রেমকে বাহ্য ও উত্তম আখ্যা দিয়া মহাপ্রভু বলেছিলেন—

এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা ভাব সর্ব্বসাধ্য সার॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অভিমত—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।

কবিরাজ অন্যত্র বলেছেন—

সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেমনাম কয়।

কিন্তু এই প্রেমময়ী রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা কে?

শ্রীমদ্ভাগবতে রাস-লীলার বর্ণনা আছে কিন্তু রাধার নাম নাই। বৈষ্ণব আচার্য্যেরা নিম্নলিখিত শ্লোকে তাঁর নামের সঙ্কেত দেখেন—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহ।

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ,
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।

বৈষ্ণব কবিরা এই নর-লীলার শৃঙ্গার রস মানুষের কাম সম্ভোগের ভাষায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। কেন এত খুঁটিনাটি বর্ণনা সে

সমস্ত সমাধানের শক্তি আমার নাই এবং সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে অবান্তর।

শ্রীমতীর প্রেম কেবল প্রেমের জন্য—সর্ব্বগ্রাসী সব-ভোলা আত্ম-নিরোধ, নিজের উচ্ছেদ। সাধক-হৃদির একাগ্রতা। বৈষ্ণবের রাধা-কল্পনা নিত্য-সিদ্ধার অনুভূতি। সে প্রেম অহৈতুক, অকৈতব। সে লীলা-সাগরে ডুব দিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে চিত্ত প্রফুল্ল হয়। কবিরাজ গোস্বামী কাম ও প্রেমের পার্থক্য বুঝিয়েছেন—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ
লৌহ-কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

প্রেম বহ্নির মত সর্ব্বভুক। প্রেমানল সকল মনোবৃত্তিকে পুড়িয়ে মারে। কৃষ্ণ-প্রেমের তাৎপর্য্য কৃষ্ণেন্দ্রিয় সেবা। কৃষ্ণই আত্মা। অতএব কৃষ্ণ-সেবা আত্মারাম। অনন্যমন হ'তে হয় কৃষ্ণ প্রেম যাচিঞায়। বস্তুতঃ

লোক ধর্ম্ম বেদ ধর্ম্ম দেহ ধর্ম্ম মর্ম্ম
লজ্জা ধৈর্য্য দেহ-সুখ আত্মসুখ মর্ম্ম
দুস্ত্যজ আর্য্য-পথ নিজ পরিজন
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে সুখ-সেবন।

কবিরাজ গোস্বামীর এ কথা বিস্মৃত হ'লে বৈষ্ণব কবিতা পাঠের আসল আনন্দ লাভ হবে না। কিন্তু এ বিবৃতি ধীর চিত্তে আলোচনা করলে বোঝা যায়, কৃষ্ণ-প্রেমের সাধন, স্বরাজ্য-সিদ্ধি বা মুক্তির সাধন হ'তে ভিন্ন নয়। রাধা-কৃষ্ণের লৌকিক প্রেমকে মোক্ষ-পথ কর্ত্তে গেলে কৃষ্ণদাসের মন নিয়ে প্রেম-শব্দের অর্থ বুঝতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলার মধুর বিলাস শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত। সে মহা-গ্রন্থে রাস-লীলার বর্ণনায় সম্ভোগের পূর্ণ ছবি দেদীপ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের নর-লীলায় মানুষের মনের সকল বৃত্তির বিকাশ। কিন্তু এ বর্ণনায় বেদব্যাস শ্রোতাকে যথেষ্ট সতর্ক করেছেন। সকল ভাবেই তন্ময়তায়, চিন্তা, চিন্তনীয়ে বিলীন হয়। তাই শুকদেব পরীক্ষিতকে বলেছিলেন—

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেবচ
নিত্যং হরৌ বিদধাতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে।

কামে মুক্তি পেয়েছিলেন গোপিনীরা। কাম ক্রোধ প্রভৃতি জীবের সহজ-বৃত্তি। বৃন্দাবনের রাস-লীলা প্রাকৃত। কারণ তিনি যোগমায়া সমাবৃত হ'য়ে এ লীলার নায়ক হ'য়েছিলেন। গোপিনীগণ গোবিন্দকে উপপতি জেনে রমণ করেছিলেন। কেলির প্রাক্কালে শ্রীহরি তাঁদের গৃহ-ধর্ম্মে মনোনিবেশ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। হয়তো সে উপদেশ তাঁদের একাগ্রতা পরীক্ষার জন্য। প্রসঙ্গ বর্ণনায় একদিকে যেমন মহাকবি রাস-লীলায় নরদেহাশ্রিত প্রেমলীলার বর্ণনা দিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি গোবিন্দের নামে তাঁর পরব্রহ্ম স্বরূপ বর্ণনার সকল বিশেষণ সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, গুণাত্মন। তিনি যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ অধোক্ষজ। কিন্তু গোপিনীরা তখন সে স্বরূপ জানতেন না কারণ রাসলীলা যোগমায়া সমাবৃত। আমার দীন অভিমত যে—অজ্ঞানেও ঈশ্বরে তন্ময়তা মুক্তির হেতু। ঈশ্বর এক। তাঁকে যে কোনো ভাবে উপাসনা করলেই সে উপাসনা হয় পরব্রহ্মের। আমাদের গৌর-সুন্দর বলেছিলেন—

এক ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহ ধরে নানাকার রূপ এবং যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ ভজে তারে তৈছে।

দ্রোণাচার্য্য বলেছিলেন—

ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যম্।

অনন্য-মন না হ'য়ে ভজনা করলেও নাম-মাহাত্ম্য ভক্তি জাগায়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি চিত্তাকর্ষক—

"সংসার যবে মন কেড়ে নেয় জাগে না যখন প্রাণ
তখনও হে নাথ প্রণমি তোমায় গাই বসে তব গান।
অন্তরযামী ক্ষম সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন ভক্তি-বিহীন তান।"

যোগমায়া সমাবৃত শ্রীকৃষ্ণকে সকলে চিনিতে পারে না।

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।"

কিন্তু তৎপরতায় তাঁর মায়াকে ভেদ করা যায়। একনিষ্ঠা ভক্তি অপেক্ষা কোনো বৃত্তিতে তৎপরতা জন্মে না। এই ঐকান্তিক চিত্ত-বৃত্তিই চিত্তবৃত্তি নিরোধ। যেমন জ্ঞান হ'তে ভক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তির তেমনি জ্ঞানে পরিসমাপ্তি। সে জ্ঞান যে জানার শেষ।

মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তি চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।

এই ভক্তি, কৃষ্ণে রতি, কৃষ্ণ-কেলি, কৃষ্ণ-পাওয়া, মায়ার নেশা, যোগমায়ার সমাশ্রিতি—এর শেষ কোথা?

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

সে দুস্তর মায়া-সমুদ্রের পরপারে কি? রাস-মণ্ডলের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধি। তাঁর সাথে মিলন।

লীলা বর্ণনার শেষে পরীক্ষিতের মনে সেই কথা উঠ্‌লো, যে কথা আমাদের মনে জাগে। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য যাঁর আবির্ভাব, তাঁর পরস্ত্রী-শৃঙ্গার কি দারুণ এলোমেলো ব্যাপার নয়? শুকদেব বললেন—

নৈনৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ

অজিতেন্দ্রিয় দেহাভিমানী মনে মনেও ঐরূপ আচরণ সঙ্কল্প করবে না।

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং কচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমানং স্তত্তদাচরেৎ।

মহাপুরুষদিগের বাক্যই সত্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের মত আচরণ করবে। তাঁদের যে কার্য্য তাঁদের উপদেশের অনুরূপ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে কাজ করবেন।

গীতাতে বলা হয়েছে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।

এ অসঙ্গতি নয়। কারণ শ্রেষ্ঠজন ঈশ্বর নন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

চলার দিনেরি পরম সাথী—

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্-এ

কত না সুখের, দুখের গানে
ফেলে-আসা-পথ রয়েছে ভ'রে ;—
জলে-আঁকা-ছবি সবি কী বন্ধু,
মুছে যাবে কি গো দু'দিন পরে?

তবু মোরা চলি—চলার ছন্দে
জ্বেলে দিই দীপ, আশার বাতি—
আঁকা-বাঁকা পথ পথিকের শুধু
চলার দিনেরি পরম সাথী।

শিল্পীর মৃত্যু

শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

আর্ট একৃজিবিশনে ছবি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ অশোকের মনে হইল এতক্ষণ বাসা ছাড়িয়া থাকা তাহার উচিত হয় নাই। বেলা দু'টার সময় যখন সে বাহির হয় তখন খোকার জ্বর দেখিয়া আসিয়াছে, এখন রাত আটটা। জ্বর তখন ৯৯ ডিগ্রী ছিল কিন্তু বৃদ্ধি পাইতে কতক্ষণ? যে দিনকাল পড়িয়াছে, ঘরে ঘরে মেনেঞ্জাইটিস্—টাইফয়েড্।

অশোক বাসায় রওনা হইল। বাসার গলিটার কাছে আসিয়া তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল—এখুনি বুঝি কেহ আসিয়া খবর দিবে যে খোকার অসুখ বাড়িয়াছে। সভয়-পদক্ষেপে তাহার বাসার একতলা কোঠার জানালাটির কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল। রাস্তার পাশেই তাহার ঘর; রাস্তা হইতে ঘরের সবই দেখা যায়। অশোক দেখিল সবিতা পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ঘুমাইয়া আছে, শিয়রের কাছে হ্যারিকেনটি মৃদু জ্বলিতেছে।

শিল্পী অশোকের দৃশ্যটি বড় ভাল লাগিল। তাহার মনটা হাল্কা হইল এই ভাবিয়া যে, খোকার অসুখ নিশ্চয়ই সারিয়া গিয়াছে, হাঁ নিশ্চয়ই, নইলে সবিতা এত নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারিত না। অপলক দৃষ্টিতে সে সবিতার দিকে চাহিয়া রহিতেই তাহার মনে হইল সবিতার চোখে মুখে যেন একটা অসুস্থতার ছাপ পড়িয়াছে। ওর শরীর এত খারাপ হইয়া গেছে, অথচ এতদিন তাহার নজরে পড়ে নাই। অদ্ভুত মেয়ে সবিতা! একদিনের তরেও সে তাহাকে অসুস্থতার কথা জানায় নাই। না, সবিতাকে এবার সে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম দিবেই। ছবি দুইটা বিক্রয় হইলে অন্ততঃ একমাসের জন্য বাইরে কোথাও তাহারা ঘুরিয়া আসিবে। সবিতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা অশোকের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইয়াছে।

সবিতা চোখ মেলিয়া এমন ভাব দেখাইল যে ঘুমান তাহার উচিত হয় নাই। উঠিয়া বসিয়া খোকার গায়ে হাত দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া জানালার দিকে নজর দিতেই অশোক বলিল; "আমি—আমি এসেছি। খোকা কেমন আছে?"

"ভাল। তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ বুঝি?"

"অনেকক্ষণ নয়। এইত আসছি।"

অশোক ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আজ হঠাৎ খোকার জন্যে মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে একৃজিবিশনে একমিনিটও থাকতে ইচ্ছে হ'ল না।"

স্মিতমুখে সবিতা বলিল, "জানি, খোকাকে তুমি ভালবাস"

"আর তুমি?"

"আমিও, তবে তোমার মত অতটা নয়।"

অশোক জামা খুলিতে খুলিতে বলিল, "খুব বলেছ। খুব খোসামোদ করতে শিখেছ ত? এখন আমার একটা কাজের কথার জবাব দাও দিকি। ক'দিন থেকে তোমার শরীর খারাপ?"

অশোক বিছানার উপর সবিতার পাশে বসিল। তাহার প্রশ্নে অসম্ভব উৎকণ্ঠা।

সবিতা হাসিয়া বলিল, "শরীর আমার খু-ব ভাল আছে, তোমার হঠাৎ একথা মনে হ'ল কেন? যত সব বাজে কথা।"

অশোক গম্ভীরভাবে কহিল, "বাজে কথা মোটেই নয়, খুব কাজের কথা। আমি নিতান্ত গরিব, উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে পারব না বলে তুমি আমার কাছে তোমার অসুখের কথা গোপন করছ। এইমাত্র হ্যারিকেনের আলোতে ঘুমন্ত তোমার যে অসুস্থ রূপ আমি দেখেছি, তাতে আমি বড্ড ভয় পেয়েছি সবিতা।"

সবিতা যথাসম্ভব জোরের সহিত বলিল, "না গো, না। ভয়ের কিছু নেই। আমার শরীর ভালই আছে, অসুখ হলে কি আর তোমায় না জানিয়ে পারি?

"তোমরা, মানে তুমি তা পার।" অশোককে শুইয়া পড়িতে দেখিয়া সবিতা ব্যস্ততার সহিত বলিল, "ওকি, খাবে না?"

অশোক একটা হাই তুলিতে তুলিতে বলিল, "না। অতুল না খাইয়ে ছাড়লে না। ওর ছবিখানা দেড়শ' টাকায় বিক্রি হয়েছে, সুখবর, না সবিতা?"

সবিতা খুশী হইয়া কহিল, "নিশ্চয়ই সুখবর। যাক্ বেচারার দুঃখ একটু ঘুচ্‌লো।"

"তা ঘুচ্‌লো। কিন্তু তোমার স্বামী-দেবতার ভাগ্যের খবর জানো? তার ছবি একখানাও বিক্রি হয়নি, বোধহয় হবেও না।"

"বয়ে গেছে। বিক্রি না হলে বুঝবো, মানুষের চোখ নেই।"

অশোক পাশ ফিরিতে ফিরিতে বলিল, "বিক্রি না হওয়ার অর্থ মহা-অনর্থ অর্থাৎ অনাহার কিম্বা স্ত্রীপুত্র সহ ফুটপাথে বাস।"

খিল খিল করিয়া হাসিয়া সবিতা কহিল, "সে কিন্তু খুব ভাল হবে। গঙ্গার পারে রেল লাইনের ধারে তিনখানা ইট দিয়ে উনোন তৈরি করে রান্না করব—বেশ হবে।"

"পাগল! তোমারই বা দোষ কি? পড়েছ ভ্যাগাবণ্ডের হাতে।"

সবিতা ধমক দেয়, "তুমি থামবে কিনা বলো?"

অশোক হাসে, "বেশ থামছি। ও ভাল কথা, কাল ভোর থেকে একখানা নূতন ছবি আঁকা সুরু করব। এখানা হবে আমার সেরা-সৃষ্টি magnum opus—ছবিখানার কি নাম দেব জান? 'নিয়তির হাতছানি।"

সবিতা বলে, "বেশ।"

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। অশোক খোকার গায়ে সস্নেহ হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করে, "মিণ্টুর বয়স পাঁচ বছর হয়ে গেছে না?"

"না, এই শ্রাবণে পাঁচে পড়বে। দেখো, খোকা তোমার চেয়ে ঢের বড় আর্টিষ্ট হবে, এ বয়সেই যা নমুনা দেখাচ্ছে। কাল সকালে দেখাব—তোমার গেঞ্জিটায় কত রকমের রঙ্ ফলিয়েছে।"

অশোক হাসিয়া বলে, "তাই নাকি? ব্যাটা ত ভারী দুষ্টু হয়েছে। মাতুল বংশের ধারা পেয়েছে।"

"মোটেই না। ওর মাতুল বংশ পাটের দালাল, আর্টের ধার তারা ধারে না। পিতৃবংশের গুণ পেয়েছে।"

"বেশ করেছে। এখন ঘুমোও।"

অশোকের বয়স ত্রিশ, সবিতার ছাব্বিশ। দশবছর হইল তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। সবিতা সুন্দরী নয় কিন্তু কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে তাহাকে অসুন্দর বলা চলে না। বোধহয় তাহার মনের অনাবিল সৌন্দর্য্য তাহার মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। অশোক তাহাকে পাইয়া নিজের শিল্প-সাধনা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সবিতাও অভাব-অভিযোগের ঢেউ নিজের বুক পাতিয়া লইয়াছে, স্বামীর মনে একটু ধাক্কাও লাগিতে দেয় নাই।

চিত্রকর অশোক পরদিন ভোরে ছবি আঁকিতে বসিল। সবিতার প্রচ্ছন্ন অসুস্থতার যে রূপ সে কাল রাত্রিতে দেখিয়াছে তাহাই সে তুলির আঁচড়ে ফুটাইয়া তুলিবে। ইজলের বুকে কাগজ আঁটিল, তারপর সুরু হইল শিল্প সৃষ্টির পর্ব্ব। সবিতা পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। তুলির প্রতিটি আঁচড়ের তালে তালে তাহার মনে জাগে বিস্ময়। আশে পাশে একটু শব্দ হইলেই তাহার ভয় হয়, এই বুঝি শিল্পীর সাধনার ছন্দ পতন হইল। খোকা বাপের কাছে বসিয়া লাল বলটা লইয়া খেলায় মাতিয়া আছে। সহজ জ্ঞানে সে-ও বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে এমন সময় গণ্ডগোল করিতে নাই।

কিছুক্ষণ পর অশোক সবিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "বলতে পার মেয়েটির চেহারা কার মত হবে?"

সবিতা বিস্ময় মাখানো হাসি হেসে বলিল, "এখন কি করে বলি?"

"হাঁ, তবে এটুকু আমি জানি যে, আমার চেহারার ভাব খানিকটা আসবেই। কেমন?"

অশোক তুলিটা রাখিয়া বলিল; "ঠিক ধরেছ। কিন্তু সব চিত্রশিল্পীর তা হয়না। ইতালীর একজন আর্টিষ্টের গল্প তোমার কাছে করছি। নাম তার এণ্ড্রিয়া ডেল সর্টো (Andrea Del Sorto)। তার ছবিতে মন এবং আত্মা তুমি খুঁজে পাবেনা, অথচ তিনি একজন ওস্তাদ শিল্পী ছিলেন। জান, কেন এমন হ'ল?"

"কেন?" সবিতা উৎসাহ বোধ করিল।

"তার কারণ বেচারা স্ত্রীর কাছে উৎসাহ, শিল্প প্রেরণা বা ভালবাসা কিছুই পায়নি। যদি তোমার মত স্ত্রী সে পেত তা হলে সে অপরাজেয় চিত্রশিল্পী হতে পারত ব'লে আমার ধারণা।"

সবিতা হাসিয়া বলে, "খুবত বল্লে। দোষ তার নিজের। সে যদি তোমার মত হোত তা হ'লে তাঁর স্ত্রী তাকে ভালবাসতই।"

কথাটা অশোকের ভাল লাগিল। তুলি দিয়া সবিতার গালে একটা খোঁচা দিয়া বলিল, "দুষ্টু। যাও এখন তোমার ছুটি, রান্না করগে।"

ছয়দিনের পর আজ ছবির কাজ শেষ হইবে। অশোক ছবি আঁকিতেছে, সবিতা ঠিক তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। চোয়ালের হাড়খানাকে একটু বড় করিয়া দেখাইতে হইবে কাজেই অশোক পিছন ফিরিয়া সবিতাকে শিল্পীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া একবার দেখিয়া লইয়া আবার কাজে মন দিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর অশোক সবিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হ'ল, সবিতা?"

"ঠিক আমারই মত দেখতে হয়েছে।"

তুলি বুলাইতে বুলাইতে অশোক খুশী হইয়া বলে, "তা না হয়ে যে উপায় নেই। তুমি আমার সারা মন জুড়ে বসে আছ যে। বুঝলে সবি, এ ছবিখানা আমি যা-তা দামে এবং যে আর্ট বোঝে না তার কাছে বেচব না। এ ছবিখানা বেচে যা পাব তা দিয়ে আমরা কোলাহলভরা এই রাজধানী ছেড়ে—অন্ত কোথাও অন্ততঃ একমাসের জন্ম যাব।"

অশোক চুপ করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কাজ করে। হঠাৎ সবিতার বুকটা যেন কেমন করিয়া উঠে। বুকের নিভৃত প্রদেশ হইতে আসিল মারাত্মক কাশি—সে চাপিতে গেল কিন্তু পারিল না। একটা বিকট শব্দ হইল, তাহার পরই কাশির চোটে বড় এক ফোঁটা রক্ত ছিট্‌কাইয়া গিয়া পড়িল ছবিটির ঠিক চিবুকের নীচে; অশোক তাহা দেখিয়া চম্‌কাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, সবিতার কাঁধ দুটা সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "এ কী সর্ব্বনাশ করলে তুমি!"

সবিতা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "ছবিখানা নষ্ট হয়ে গেল, আমায় ক্ষমা করো।"

অশোক সবিতার চোখের দিকে চাহিয়া হৃতসর্ব্বস্বের মত কহিল, "ছবি নষ্ট হয়নি সবিতা, নষ্ট হয়ে গেল আমার জীবন, চুরমার হয়ে গেল আমার স্বপ্নসৌধ। কিন্তু এ রক্ত কি করে এলো?"

সবিতা জবাব দিলনা, দিতে পারিল না।

অশোক পাগলের মত বলিল, "আমি জানতাম তুমি আমায় ছেড়ে যাবে, কিন্তু বলার সময় সুযোগ পেয়েও তুমি আমায় না জানিয়ে যাবে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি সবিতা।"

অশোকের বুকে মুখ লুকাইয়া সবিতা কাঁদিতে লাগিল, "আমার কিছুই হয়নি, আমায় বিশ্বাস করো। আমি কোন দিন তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি। রক্ত আজই প্রথম পড়ল, আমায় বিশ্বাস করো।"

অসহায়ের মত অশোক বলিল, "তোমায় আমি বিশ্বাস করি। আজ বুঝছি সবিতা নিয়তির হাতছানি; ছবিখানি আঁকার মধ্যে আমার খেয়ালই শুধু ছিল না, বিধাতার একটু ইঙ্গিতও ছিল। রইল পড়ে ছবি।"

"তোমার পায়ে পড়ি, রক্তের দাগ মুছে ফেলো—দাগ উঠ্‌বে না?"

সবিতার স্বরে অকৃত্রিম কাতরতা।

অশোক মাথা নাড়িয়া কহিল, "এ দাগ ত মুছবার নয়··· সবিতা, এ দাগ পড়েছে আমার জীবনে। এ রক্তের ফোঁটা থাকবে এ চিত্রের বুকে—কারণ এ চিত্রের জন্মরহস্য শুধু ঐ এক ফোঁটা রক্তই বল্‌তে পারবে। ছবিখানা আমি হাতছাড়া করব না।"

অত যে শান্ত সংযত অশোক সে যেন পাগল হইয়া গেল—তাহাকে দেখিলে মনে হয়; একটা প্রচণ্ড টাইফুন। এইমাত্র তাহার জীবনটাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল। ঘরে একটা ভয়ঙ্কর নীরবতা। অশোক কপালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, চোখের দিকে চাহিলে মনে হয় দুঃখের অসহনীয় বেগে চোখ ফাটিয়া যাইবে বুঝি। অশোক ভাবে, সবিতা কি সত্যই বাঁচিবে না? অনেকের ত গলনালি চিরিয়া রক্ত পড়ে,

সবিতারও হয়ত ঐ কারণেই পড়িয়া থাকিবে। না, তাহার এতটা অধীর হওয়া অপরাধ। তাহার অযৌক্তিক কাতরতায় সবিতা বড় ভয় পাইয়াছে।

সবিতাকে সাহস দিতে যাইয়া অশোক বলিল, "তোমায় কেবল চুপ করে সাতটি দিন শুয়ে থাকতে হবে লক্ষীটি। দেশ থেকে পিসিমাকে আনিয়ে নিচ্ছি, কেমন ?"

অশোকের চরিত্রের স্বাভাবিকতা ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সবিতার মনটা বেশ হাল্কা হইল।

"কি ভয়ই না তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলে। আমি সেরে উঠবই।"

"তাহলে শুয়ে থাক। আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।"

সবিতা শান্ত মেয়েটির মত অশোকের কথা শুনিল। বিছানায় শুইয়া সে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল, "আমায় বাঁচিয়ে রাখ প্রভু। ওঁর জন্যে আমায় বাঁচিয়ে রাখ, শুধু ওঁর জন্যে।"

কিন্তু এ প্রার্থনা ভগবানের কানে পৌঁছাইল না। সবিতা মরিল।

অশোক চিকিৎসার ত্রুটী করে নাই। ঘরের সমস্ত জিনিস বিক্রি করিয়াছে, 'নিয়তির হাতছানি' ছবিখানা যাহা সে বিক্রি করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহাও সে সবিতার চিকিৎসার জন্য কেবল দশ টাকায় বেচিতে বাধ্য হইয়াছে।

খোকার ভার পিসিমা নিয়াছেন। বেশী কান্নাকাটি করিলে পিসিমা বুঝায় যে তাহার মা হাসপাতালে আছে, কাল পরশু আসবে।

অশোক পাগলের মত একটি মাস রাস্তায় ঘুরিয়া কাটাইল। ছবি সে আর আঁকিবে না। তাহার উৎসাহ প্রদীপ চিরতরে নিভিয়া গিয়াছে।

অতুল একদিন বলিল, "অশোক, এমন করে ক'দিন চলবে ভাই ? একটা কিছু করতে হবে ত ? তোর সংসার যে অচল হয়ে উঠলো।"

অশোক উদাসীনের মত বলিল, "হাঁ, একটা কিছু করব—তবে ছবি আঁকা নয়।"

অতুল বিস্মিত হইয়া বলিল, "বলিস্ কি !"

"ঠিকই বলছি, বাজে কথা আমি বলি না। অন্য কাজ করব।"

অতুল অশোককে ভাল করিয়াই জানে। শত অনুনয়, অনুরোধেও অশোক মত বদলাইবে না। তাহার মতে সায় দেওয়াই উচিত, হয়ত তাহাতে তাহার মন একটু শান্ত হইবে।

অতুল বলিল, "কাকার অফিসে একজন কেরাণী নেবে। বলব তোর কথা ?"

অশোক নির্বিকার ভাবেই বলে, "আজ বলতে পারছি না। কাল বিকেলে খবর পাবি।"

পরদিন সকালে। অশোক নোটবুক খুলিয়া যে ভদ্রলোক নিয়তির হাতছানি ছবিখানা ক্রয় করিয়াছেন তাহার ঠিকানাটি জানিয়া তাহার বাড়ির উদ্দেশে বাহির হইল। ভদ্রলোক জমিদার, বৈঠকখানাটিকে বিলাস উপকরণে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। দারোয়ান অশোককে বৈঠকখানায় বসাইয়া রাখিয়া জমিদার-বাবুকে খবর দিতে গেল। অশোক পর পর দেওয়ালে টাঙান ছবিগুলি দেখিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার ছবিখানি কোথায় ? তবে কি বাবু শ্রেষ্ঠ চিত্র বোধে ছবিখানিকে তাহার খাস কোঠায় রাখিয়াছেন ? কতক্ষণ পর সে দেখিল দুইখানি অতি কুৎসিত বিলাতী ছবির চাপে পড়িয়া তাহার চিত্রটি যেন আর্ত্তনাদ করিতেছে। চিত্রশিল্পী অশোক গর্জ্জিয়া উঠিল—এ কি অবিচার ! এ কি অসম্মান ! সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া ছবিখানা নামাইয়া আনিতে-ছিল এমন সময় জমিদারবাবু বিকট একটা ধমক দিয়া বলিল, "ওকি হচ্ছে মশাই ? ছবি চুরি করছেন নাকি ? বলিহারি আপনার সাহস—দারোয়ান, দারোয়ান।"

দারোয়ান হাজির হইল।

ছবিখানা হাতে করিয়া অশোক টেবিল হইতে নামিল ; একটু ভীত এবং লজ্জিত হইয়া বলিল, "ক্ষমা করবেন। অনেকদিন ছবিখানা দেখিনি, তাই দেখতে এসেছিলুম। ছবিখানা যত্নের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে।"

জমিদারবাবু ক্ষেপিয়া বলিলেন, "ছবির যত্ন বুঝি আপনার কাছে শিখতে যাব ? বলুন, চুরির মতলবে এসেছেন কিনা ?"

অশোক দৃঢ়ভাবে কহিল, "আমি ছবিখানা দেখতে এসেছি এবং জানতে এসেছি যে গুণীর সমাদরলাভ ওর ভাগ্যে জুটেছে কিনা। সমাদার সে পায়নি। ওকে যে জনতার মধ্যে আপনি রেখেছেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয়না যে আপনি চিত্রশিল্পের কিছুই বোঝেন না। এ ছবিখানা আমার সেরা সৃষ্টি।"

জমিদার নির্দ্দয়ভাবে তাহার হাত হইতে ছবিখানা কাড়িয়া লইয়া যেন মুখ ভ্যাংচাইয়াই বলিল, "আহা কি ছবিই এঁকেছেন ? আপনি আনাড়ি তাই চিবুকের নীচে একটা বিশ্রী দাগ রেখে দিয়েছেন। ওটা কি বিউটি স্পট্ নাকি ? আপনার নিজেকে ধন্য মনে করা উচিত যে, এরকম একখানা কুৎসিত ছবি এতগুলো ভাল ছবির মধ্যে স্থান পেয়েছে ?"

অশোক ভাবে চিবুকের নিচের কালো দাগ ? কি লাভ তাহার করুণ ইতিহাস ইহাকে শুনাইয়া। এখানা সবচেয়ে বিশ্রী ছবি ! টাকা আছে বলিয়াই আজ উনি একজন আর্টের সমঝদার ; ঘৃণায় বিরক্তিতে তাহার মনটা তিক্ত হইয়া গেল। ছবিখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল, তাহার পর জমিদারের কাছে ক্ষমা চাহিয়া রাস্তায় নামিল।

বিকালে সে অতুলকে জানাইয়া দিল যে, সে কেরাণীগিরি করিতে রাজী আছে—অতুল যেন তাহার কাকাকে চাকুরির জন্য অনুরোধ করে।

বাংলার নদী-সমস্যা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এম্‌-এস্‌সি

সম্প্রতি নদী-সমস্যা লইয়া আমাদের দেশে অনেকেই মাথা ঘামাইতেছেন। নদী শাসনের অপরিহার্য্যতা বহুদিন হইতে একবাক্যে স্বীকৃত হইলেও ইহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক উঠিয়াছে প্রচুর। এই বিরাট দক্ষযজ্ঞের প্রথম পর্ব্বটা আরম্ভ করা যায় কিরূপে—সেই মতলব আঁটিতেই বছরের পর বছর কাটিয়া যাইতেছে। সম্প্রতি অনেকে মনে করিতেছেন আমাদের নদী-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে নদী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক গবেষণার প্রয়োজন। শাসন করিব বলিলেই হয় না; প্রকৃতির এই বিরাট শক্তির বিরুদ্ধতা করিতে গেলে নদী সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের চুলচেরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণা যে অপরিহার্য্য একথা আজিকার বৈজ্ঞানিক যুগে অবৈজ্ঞানিকগণও বুঝিবেন। অন্ততঃ পাশ্চাত্যের নজির যখন হাতের কাছেই রহিয়াছে, তখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নদী সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান কল্পে বিশেষজ্ঞদিগের এইরূপ পরামর্শ সম্প্রতি অনেকের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এদেশে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণে সহায়তা করে এইরূপ মহৎ কার্য্যের অন্তরায় আছে। বহু ক্ষেত্রের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও সে নিয়মের এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত, বন্যা-পীড়িত বাংলাদেশের নদীশাসনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বাংলার ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা দেখিয়াছেন—বিভিন্ন শতাব্দীতে বাংলার বিভিন্ন অংশের বিচিত্র ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত ইহার নদনদীগুলির নিবিড় সম্বন্ধ। নদীর ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার তীরবর্ত্তী বহু নগর, বন্দরের ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ গৌড়, বাক্‌লা, শ্রীপুর, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম, স্বর্ণগ্রামের কথা ইতিহাসের পাতা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, প্রকৃতির ভাঙ্গা-গড়ার বিপুল শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা অনেক সময়েই মানুষের সাধ্যাতীত। তাই বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া প্রকৃতির খেয়াল নিরীক্ষণ করা ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নাই এ কথাও স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না। বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্তের চেষ্টায় আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতি যে সকল নগর, বন্দর ও জনপদ আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের রক্ষা করিবার দায়িত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এই কর্ত্তব্য পালন করিতে যে পরিমাণ দূরদর্শিতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী ঘটিতে দেওয়া হয় নাই, এ কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিবে না। উইলকক্স সাহেবের "সয়তানী বাঁধের" কথা জানে না এমন লোক বিরল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ও মধ্য বাংলার শ্রীবৃদ্ধিতে প্রকৃতি যে বাদ সাধিতে আরম্ভ করে তাহাকে ঠেকান কঠিন ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতা, নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার ইন্ধন না যোগাইলে, যেখানে এককালে সমৃদ্ধ জনপদ প্রাচ্যের গৌরব দেশবিদেশে ঘোষণা করিত তাহা বাসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে বোধহয় পরিণত হইত না।

বর্ত্তমান বাংলাদেশের নদনদীর এইরূপ খাপছাড়া অসমান প্রবাহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলার নদী-উপনদীগুলি এইরূপ ভাবে ছড়ান ছিল যে পলির অভাবে কোন একটী বিশেষ অংশ আবাদের একেবারে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইতে পারে নাই। নদীগুলি আজ একে একে পশ্চিমবঙ্গ হইতে সরিয়া গিয়া পূর্ব্ববঙ্গে কল্লোল তুলিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কপাল ভাঙ্গিল বটে, পূর্ব্ববঙ্গও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিল না। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার মিলিত স্রোতের সংঘাতে পূর্ব্ববঙ্গের বহু অংশ আজ নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। বন্যা ত একরূপ বাৎসরিক ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। এমন কোন বৎসর নাই যে কলিকাতার রাজপথে বন্যা-পীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে গেরুয়াধারী স্বেচ্ছাসেবকদিগের 'ভিক্ষা দাও গো' রোদন শুনা যাইবে না। ১৯২২ ও ১৯৩১ সালের তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের বন্যার স্মৃতি এখনও ঝাপ্‌সা হইয়া যায় নাই। ১৯৩১ সালে ব্রহ্মপুত্রের বন্যা সম্পর্কে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা লিখিয়াছিলেন,

"From newspaper reports it appears that the whole of the Brahmaputra basin covering an area of 25000 sq. miles was visited last year (1931) by the most terrible flood within living memory. As the population in this part is nearly 800 per sq. mile, the total number of persons affected is not less than two millions, i. e., about four hundred thousand homesteads. From the writer's experience of such floods and from news-paper reports of the havoc caused by the flood, it is estimated that the total loss in money to Bengal will not be less than eight to ten crores of rupees, if we suppose that the average value of a Bengal homestead is from Rs. 200 to Rs. 250. But there is every chance of that this might be an underestimate."—অর্থাৎ "সংবাদ-পত্রের খবরে জানা যায় গত বৎসর ২৫০০০ বর্গমাইল জুড়িয়া সমগ্র ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় যে ভীষণ বন্যা নামিয়া আসিয়াছিল এইরূপ আর একটী বন্যার কথা স্মরণে আসে না। এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৮০০ জন হইবে এবং সমস্ত মিলিয়া কম করিয়া বিশ লক্ষ লোক অর্থাৎ প্রায় ৪ লক্ষ গৃহস্থ ইহার প্রকোপ উপলব্ধি করিয়াছে। এই ধরণের বন্যা সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বন্যার ধ্বংসলীলার বিবরণ হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায়, বাংলা দেশে প্রতি গৃহস্থালীর মূল্য গড়পড়তা দুই শত হইতে আড়াই শত টাকার মত ধরিলে উক্ত বন্যার মোট ক্ষতির পরিমাণ আট দশ কোটী টাকার কম হইবে না। তথাপি এই অঙ্ক প্রকৃত হিসাব হইতে কম হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।"

ইহার পর আর কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন।

স্যর এফ্‌, স্প্রিং (Sir F. Spring) হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন পরিপূর্ণ বন্যার সময় হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট পদ্মা দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে প্রায় দুই কোটী কিউবিক সিসি জল প্রবাহিত হয়। এই জলপ্রবাহ ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নদী টেম্‌সের প্রবাহের প্রায় ছয় শত গুণ। ইহার কাছে নিউ অর্লিন্সের নিকট পরিপূর্ণ বন্যার সময় মিসিসিপির জলপ্রবাহও হার মানিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের জলপ্রবাহের পরিমাণ আবার পদ্মাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলপ্রবাহকে এক আমাজান ছাড়া পৃথিবীর আর কোন নদী অতিক্রম করে নাই। ইহা হইতে আমাদের নদী-শাসনের গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে।

বাংলাদেশ একটী বিরাট বদ্বীপ। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস খুব বেশী দিনের হইবে না। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন মাত্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বদ্বীপ রচনার কার্য্য রীতিমত আরম্ভ হয় নাই। সমুদ্র তখনও রাজমহল পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের

বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের উপর প্রবাহিত গঙ্গার পলিমাটী রাজমহল পর্ব্বতের নিকট সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে এই নূতন ভূখণ্ড গড়িয়া তুলে। পশ্চিম ও মধ্য বাংলা গঙ্গার বদ্বীপের প্রাচীনতম অংশ; পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষাকৃত নূতন বদ্বীপ। বলা বাহুল্য এই বদ্বীপ সৃষ্টির কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে বদ্বীপের উপর দিয়া প্রবাহিত নদীগুলির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। নদীগুলি স্থিতিলাভ করিতে পারে নাই; তাহারা ক্রমাগতই নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। নদীগুলির বিরাট বিচিত্র পরিবর্ত্তন বাংলাদেশের ভাগ্যকে প্রায় প্রতি শতাব্দীতেই একরূপ নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিয়াছে। বাংলার এই ক্রমাগত ভৌগলিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াই অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বলিয়াছিলেন—বাংলার ইতিহাস লিখিবার সময় ঐতিহাসিকগণ যেন ইহার পরিবর্ত্তনশীল ভূগোলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। বঙ্গদেশের নদনদীর পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস যাহাদের পরিচিত অধ্যাপক সাহার মতের গুরুত্ব তাহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুতরাং এই দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক পরিস্থিতি বুঝিতে হইলে ইহার নদনদীর ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাসের সহিত আমাদের পরিচয় আবশ্যক।

এই ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিয়া বহু প্রাচীন কালের কথা টানিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই। অবশ্য সেই সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। গত কয়েক শত বৎসরের কথা আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। এইখানে বলিয়া রাখা দরকার আমাদের এই তথ্যের ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নদনদী প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কালক্রমে নানারূপ নৈসর্গিক উৎপাতে উহাদের প্রাধান্য এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন নদী উপনদীর সৃষ্টি ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক সময় এই পরিবর্ত্তন এইরূপ দ্রুত সাধিত হইয়াছে যে বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত মানচিত্রে উহা ধরা পড়ে নাই। তবে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র কোনও না কোন সময়ে প্রচলিত নানারূপ ছড়া, গাথা, গীতিকাব্য ও লোক-সাহিত্যের উপর অনেক সময় উহার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। তারপর বিদেশীদিগের ও তদানীন্তন রাজকর্ম্মচারী-দিগের বিবরণীতেও ঐ সব লুপ্ত নদনদীর সন্ধান মিলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ রাল্ফ্ ফীচের কথা (১৫৮৫) বলা যাইতে পারে। তাহার মূল্যবান বিবরণীতে আমরা জানিতে পারি ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম কিরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তিনি শ্রীপুর ও স্বর্ণগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত কবি কৃত্তিবাসের লেখনী হইতে ভৈরবের প্রাধান্য জানিতে পারা যায়। চাঁদ সওদাগর, ধনপতি ও শ্রীমন্তের কথা সে যুগের গীতিকাব্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে বহু লুপ্ত নদনদীর সন্ধান অল্প বিস্তর মিলিয়াছে। তবে বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট ভৌগলিকগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র হইতেই অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ডি বেরো (de Barro), ভ্যান দেন ব্রুক (Van den Broucke) ও মেজর রেনেলের (Major Rennell) অঙ্কিত মানচিত্রই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে নদী সংস্থানের অধিকাংশ সংবাদ ডি বেরোর মানচিত্র হইতেই পাওয়া গিয়াছে; সপ্তদশ শতাব্দীতে নদনদীর অবস্থান ভ্যান দেন ব্রুকের মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের নদী উপনদীর বিরাট পরিবর্ত্তন মেজর রেনেলের ম্যাপে দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত গ্যাস্টাল্ডী (১৫৬১), হারমান মোল (১৭১০), থর্টন প্রভৃতি যে সব মানচিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

এই সকল পুরাতন মানচিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় রাজ-মহলের নিকট গঙ্গা বাংলায় প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তরে বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথম যুগে বোধ হইতেছে গঙ্গার দক্ষিণমুখী প্রবাহই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই প্রাধান্য যে বহু শতাব্দী ধরিয়া অক্ষুণ্ণ ছিল তাহার যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গার বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভৈরব, সরস্বতী ও ভাগীরথীর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। এই নদীত্রয়ের মধ্যে কোন না কোন একটী আবার বিশেষ বিশেষ শতাব্দীতে সকলকে ছাপাইয়া উঠে। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভৈরব প্রধানতম নদ হিসাবে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, খুলনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বহু শত বৎসর মধ্য বাংলার শ্রীবৃদ্ধি অটুট রাখে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতেই ভৈরবের ভাঙ্গন আরম্ভ হয় এবং সরস্বতী ধীরে ধীরে ভৈরবের প্রাচীন গৌরব অপহরণ করিয়া দক্ষিণমুখী নদীদিগের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠে। সরস্বতীর এই প্রাধান্য ষোড়শ শতাব্দীতেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহার তীরে অবস্থিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম তখন প্রাচ্যের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সরস্বতীর পতন ও ভাগীরথীর উত্থান দক্ষিণ-গামী নদীদিগের মধ্যে বিশেষ পরিবর্ত্তন সূচিত করে। গঙ্গার কয়েকটী শাখা উত্তর দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে একটী বোধ হয় আধুনিক যুগে কালিন্দী যেখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে সেইখানে প্রবাহিত হইত। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে গঙ্গার পূর্ব্বমুখী শাখাটী বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যতদূর মনে হয় এইরূপ কয়েকটী শাখা পূর্ব্ব দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পরিশেষে ঝিল, বিল বা অনুরূপ জলাশয়ে নিঃশেষিত হইয়াছিল অর্থাৎ পদ্মা তখনও আত্ম-প্রকাশ করে নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে ডি বরোর মানচিত্রে দেখা যায় পদ্মা বঙ্গ দেশের নদী সমাজে আপনার বৈশিষ্ট্যটুকু ইতিমধ্যেই অধিকার করিয়া লইয়াছে। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীর পদ্মার সহিত আজিকার পদ্মার মিল খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। পদ্মার এই আবির্ভাব বাংলার ভূগোলে যুগান্তর আনয়ন করে। বাংলার নদী সংস্থানের এই যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, ইহার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার মানচিত্র আঁকিতে গিয়া দেখা যায়, সে বাংলা ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা নহে।

এই প্রসঙ্গে পদ্মার উৎপত্তির কারণসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু প্রাচীন কাল হইতে উত্তর বঙ্গে কসী (Kosi) একটী প্রধান নদী হিসাবে পরিগণিত ছিল। কসী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া পরে মহানন্দা ও আত্রেয়ীর সহিত মিলিত হয়; এই নদীত্রয়ের মিলিত স্রোত লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিশিয়া যায়। (লোহিত্য ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম) প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হিমালয়ের নদীগুলিতে বিরাট পরিবর্ত্তন সুরু হয়। ইহার ফলে বহু শতাব্দী ধরিয়া পুরাতন পথে প্রবাহিত হইবার পর অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কসী তাহার সাবেক পথ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে আপনার পথ কাটিয়া লয় এবং ব্রহ্মপুত্রের পরিবর্ত্তে গঙ্গায় আসিয়া মিশে। ক্রমশঃ গঙ্গা ও কসীর এই মিলিত স্রোত গঙ্গার পূর্ব্বমুখী ক্ষীণ স্রোতস্বিনীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। রাধাকমলবাবু লিখিয়াছেন,

"Mighty changes took place in the course of these (Kosi, Mahanaddi & Atrai) and other Himalayan rivers, which might have been due to the silting up of the drainage basins along the Himalayas by the debries from the hill slopes and sudden seismic disturbances until these rivers swerved westward, discharged into the Ganges, and became responsible for the mighty force of the new channel of Padma." [Changing Face of Bengal.] অর্থাৎ—"এই সকল (কসী, মহানন্দী ও আত্রেয়ী) ও হিমালয় প্রদেশের অন্যান্য নদীতে বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছিল। যতদূর মনে হয়, পার্ব্বত্য ঢালু প্রদেশ হইতে নানারূপ আবর্জ্জনা স্রোতের

মুখে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশ: হিমালয়ের নদীগর্ভগুলি ভরাট করিয়া তোলায় এবং অতর্কিত ভূকম্পন প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাত সংঘটিত হওয়ায় এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। ইহার ফলে নদীগুলি শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমে সরিয়া আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হয় এবং পদ্মার এই নূতন স্রোতকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সহায়তা করে।" প্রধান হইলেও পদ্মার আবির্ভাবের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। প্রায় সেই সময়েই ছোটনাগপুরের পূর্ব্বদিকের ঢালু জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উহাকে ধানজমিতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এইরূপে জঙ্গলের বাধা হইতে নিস্তার লাভ করায় পূর্ব্বমুখী নদীগুলির অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইবার যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত সেই সময় হইতে জমির ঢাল ক্রমশঃই পূর্ব্বমুখী নদীগুলির অনুকূলে গঠিত হইতেছিল।

এইরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতেই পদ্মা তাহার বিরাট ভবিষ্যতের ইঙ্গিত কিছু কিছু প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। ঐ শতাব্দীতে পদ্মার এক অংশ উত্তর দিকে রাজসাহী ও পাবনা জেলায় প্রবাহিত হইল। পরবর্ত্তী কালে উহা শুকাইয়া যায়। জাফরগঞ্জের নিকট পদ্মার মূলপ্রবাহ আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া ঢাকায় প্রবেশ করে এবং পরে দক্ষিণে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হয়। বোধহয় ইহাই ধলেশ্বরীর আদি প্রবাহ। ধলেশ্বরীর পশ্চিমে পদ্মার আর একটী শাখা ফরিদপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণে বাখরগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হয়।

এইখানে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের কথা কিছু উল্লেখ করা দরকার। অবশ্য আধুনিক বাংলার ভৌগোলিক গঠনে ব্রহ্মপুত্রের কাজ অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছিল। পদ্মার ন্যায় ব্রহ্মপুত্রও বাংলার ভাগ্য গঠনে কোন অংশে কম দায়ী বলিয়া মনে হয় না। বহু প্রাচীন কালে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্য নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন গ্রন্থে, এমন কি পুরাণেও এই নামেই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে বিদেশী মানচিত্রকরের হাতে পড়িয়া ইহার নাম হইয়াছিল কেওর (Caor). ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র সরাসরি বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িত। বঙ্গোপসাগরের অনতিদূরে বান্দের (Bander) বা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রীপুরের নিকট গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ভ বরোর মানচিত্রে দৃষ্ট হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ষোড়শ শতাব্দীতে সরস্বতী, ভাগীরথী, গঙ্গা (পদ্মা) ও ব্রহ্মপুত্রই প্রধান। তন্মধ্যে আবার সরস্বতীর প্রাধান্য বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। উহাদের তীরে অথবা সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সপ্তগ্রাম, চন্দেকান (Chandecan), শ্রীপুর, স্বর্ণগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সেকালের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বন্দর হিসাবে চট্টগ্রামের খ্যাতি সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। পর্টুগীজ নাবিকগণ ইহার নাম দিয়াছিলেন Porto Grande বা বৃহৎ বন্দর। সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে রাল্ফ ফীচ লিখিয়াছেন, "A faire citie for a citie of the Moores, and very plentiful of all things." বন্দর হিসাবে ইহা চট্টগ্রামের তুলনায় নিকৃষ্ট হওয়ায় পর্টুগীজগণ ইহাকে Porto Pequeno বলিত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই সকল নদ নদীর আবার বহুল পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গা পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইবার পর ঐ দিকে উহার আকর্ষণ ক্রমশই প্রবলতর হইতে থাকে। ইহাতে দক্ষিণে প্রবাহিত গঙ্গার শাখানদীগুলি প্রমাদ গণিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পশ্চিমে গঙ্গার সহিত কসী নদীর সঙ্গমই ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এই সঙ্গমের ফলে শুধু গঙ্গারই আবির্ভাব হয় নাই, বোধ হইতেছে ইছামতী, জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি কতকগুলি পূর্ব্বমুখী নদীরও উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ভ্যান দেন ব্রুকের ম্যাপে ইহা সুপরিস্ফুট। ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতেই সরস্বতীর প্রাধান্য সঙ্কুচিত এবং ভাগীরথী ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু তাহাও বেশী দিনের জন্য নহে ; সরস্বতীর ত পতন হইলই, ভাগীরথীও ধীরে ধীরে শুকাইয়া এমন হইল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা আর বাধা রহিল না। ভৈরব বহু পূর্ব্বেই তাহার প্রাধান্য হারাইয়াছিল ; জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা উহাকে ত্রিধা বিভক্ত করিবার পর উহার উত্তর দিকের অংশ একেবারে শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ

আপ-টু-ডেট্

শ্রীমোহিতকুমার গুপ্ত

নূতনের আমেজেতে মজে গেছে বাংলা।
জর্জ্জেট শাড়ী চলে, কালো পাড় জংলা,
বেনারসী, গোদাবরী বড় বেশী পুরোণো ;
বিলিতী ফরাসী চাল, হয় তাই কুড়োনো।
'স্কার্ট', 'ক্রেপ' নাম কত থাকে নাক স্মরণে ;
ফিন্‌ফিনে শাড়ী দেখি সকলের পরণে।
সায়া, জামা দেখা যায়, শাড়ী তার উপরে—
শোভা নাকি তাতে বাড়ে—দিনে, রাতে, দুপুরে।
হাতকাটা ব্লাউজেতে দেয় কাঁধ পাহারা,
ন্যাঙোর গেঞ্জীকে লাজ দেয় তাহারা।
'ফুল-হাতা' তাই বলে মেয়েরা তো ভোলেনি।
গলাতে রুমাল বাঁধে যদিও তা ফোলেনি।

রুমাল জড়ায় তারা মাঝে মাঝে 'রিষ্টে',
শতধারা বেণী নেমে শোভা পায় পৃষ্ঠে।
পাউডার মেখে তারা হয়ে ওঠে ঘোলাটি'
ময়দার বস্তার যেন আরসোলাটি।
লিপষ্টিক্ ঘষা দুই কোমল ও ওষ্ঠে
মুস্কিল কথা কওয়া, রং ওঠে ঘষ্টে।
সর্ব্বদা কাছে থাকে ভ্যানিটির ব্যাগটি,
চটপট্ সেরে নেন্ 'রংচটা' কাজটি।
দোলে কানে কানবালা বোঝা অতি মস্ত ;
ব্যথা তাতে হয় হোক, হতে হবে চোস্ত।
হাই-হীল্ জুতো পরে হোক্ যত কষ্ট
'এটিকেটে' বাধে ব'লে বলে না তা পষ্ট।

ফ্যাসানের কি যে মোহ ছেয়ে গেছে বাংলা,
চ রদিকে দেখি শুধু ফ্যাসানের হ্যাংলা।

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

ঘট্—ঘট্—ঘটাং……ঘট্—ঘট্—ঘট্…সিংগাপুরে জাপানীদের নতুন রণকৌশল…দিবাভাগে পুনঃ পুনঃ বিমান-আক্রমণ…মালয়ে বৃটিশ সৈন্যগণের পশ্চাদপসরণ…বিভিন্ন রণাংগণে রুশ-বাহিনীর সাফল্য…পূর্ব রণাংগণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অবরোধ…কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন…স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্যের সামান্য সংশোধন…ঘট্—ঘট্—ঘটাং…ঘট—ঘট্—ঘট্…

…স্বপ্ন ভেঙে গেল। অন্ধকার নির্জন ঘর। মফস্বল সহরের একপ্রান্তে একটি স্কুলের বোর্ডিং। কোথায় কলকাতা! কোথায় সংবাদপত্রের আপীস! কোথায় টেলিপ্রিণ্টারের আর্তনাদ! ঘট্—ঘট্—ঘটাং—ঘট্!

শিয়রে টেবিলে মোম-বাতিটা ধরালাম। মশারি-ঢাকা ছোট তক্তপোষ। টেবিলে আয়না-চিরুণী, লিখবার সরঞ্জাম, কতকগুলি বই কাঁচের গ্লাস, ডিস, ছোট টর্চ, টুকিটাকি জিনিস-পত্র। মাঝখানের ছোট টেবিলে ফুলদানীতে বাসী ফুল, কালকের খবরের কাগজ, ভুক্তাবশিষ্ট আহার্য। আলনায় কয়েকটি জামাকাপড়। এক কোণে ছাতি, লাঠি ও জুতা। আরেক কোণে জলের কুঁজো, বালতি, প্রয়োজনীয় সাংসারিক দ্রব্যাদি।

চেয়ারে বসে বাঁ-হাতের কাছে জানালাটি খুলে দিলাম। বাইরে কৃষ্ণা নবমীর মেঘম্লান জ্যোৎস্না। অস্পষ্ট আবছা রাত্রি। কিন্তু রহস্যময়। দূরগ্রামের অস্পষ্ট রূপরেখা হাতছানি দেয়।

একটা শিরশিরে ঠাণ্ডা বাতাসে ঘরখানি শিউরে ওঠে। আস্তে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। আবার সেই ছোট ঘর। ও-পাশের টেবিলে পুরানো খবরের কাগজ। অনেকদিনের অনেক খবরের স্তূপ; সাংহাই-র পতন…তারাকান দুর্গের আত্মসমর্পণ…সিংগাপুরে গুরুতর পরিস্থিতি…সংবাদপত্র আপীসের নৈশ-কর্তব্য…নিদ্রাহীন চোখে নিশাচরবৃত্তি…টেলিপ্রিণ্টারের ঘট্—ঘটাং—ঘট্…

নির্বৈচিত্র্য এই ঘরে বসে আজকের স্বপ্ন ভাঙা রাতে অতীতের অনেকগুলি রাত্রি-দিনের কথাই মনে পড়ছে: কালের কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে অতীত স্মৃতির প্রেতদল।

এম-এ পাশ করে নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন। চা ও সিগ্রেটের বদ অভ্যাস নিয়ে গর্ব করি। সাড়ে চার আনায় সিনেমা দেখি। রেস্তোরাঁয় বসে রাজা-উজীর মারি। আর মেসের চার-সিটওয়ালা ঘরে ভাঙা খাটে শুয়ে আধুনিক টেক্‌নিকে সাহিত্যসাধনার এক্সপেরিমেণ্ট করি।

শ্যামবাজার বাস-ট্যাণ্ড্। দোতালা বাসের ছাতে উঠেই দেখি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তড়িৎদা বসে। আধখাওয়া সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম: আরে তড়িৎদা যে—

তড়িৎদা ফিরে চাইল। আরো রোগা হয়ে গেছে। সমগ্র কপাল জুড়ে কয়েকটি দীর্ঘ রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। জীবনের রণক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের সমাবেশ।

ম্লান হেসে তড়িৎদা বলল: কে—নারাণ। বসো।

পাশেই বসে পড়লাম: তারপর কি করছ এখন? চলেছ কোথায়?

যাচ্ছি একটু বৌ বাজারের দিকে। সন্ধ্যেয় একটা ট্যুইশানী আছে। তা—তুমি কোথায় এদিকে?

হেসে বললাম: ওই অন্নপরত্তনেরই সন্ধানে। আচ্ছা তড়িৎদা, দিতে পার একটা ট্যুইশানী আমায় বাগিয়ে? বড়ই অসুবিধেয় পড়েছি।

তড়িৎদা করুণ চোখ তুলে চাইল। কালো দুটি টানা চোখের নীচে মোটা করে কালির আঁচড় টেনে দিয়েছে কোন্ নির্মম শিল্পী! বলল: তোমাদের মত ভাল ছেলের আবার ট্যুইশনীর ভাবনা, কি যে বলো।

স্কুল-কলেজের ভাল ছেলে হয়েও বি-এ পাশ করেই তড়িৎ-দাকে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ দুঃখ সে ভুলতে পারেনি।

বললাম: সত্যি বলছি তড়িৎদা, একটা ট্যুইশনীও এখন হাতে নেই। যদি তোমার হাতে থাকে—

তড়িৎদা বাধা দিল: ট্যুইশনী কি ব্যাংকের চেক—যে হাতে মজুত থাকবে। তবে তোমার মত ছেলের জন্যে ট্যুইশনীর জোগাড় করে দিতে আমি পারব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলরত্ন তোমরা।

হেসে বললাম: তবে মেকী এই যা দুঃখ।

তড়িৎদা জোর গলায় বলল: না না মেকী নয়, সত্যই রত্ন, আজকের সমাজের মাপ কাঠিতে তোমরা মূল্যহীন হয়ে পড়েছ বলেই তোমাদের প্রতিভা মিথ্যা হতে পারে না। আমাদের বর্তমান সমাজ প্রতিভার মূল্য দিচ্ছে না অথবা দিতে পারছে না। কিন্তু ঠিক জেনো নারাণ, এর ফল এ সমাজকে ভোগ করতেই হবে।

তড়িৎদার চোখ মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কণ্ঠে লাগল দৈববাণীর ছোঁয়াচ। একটু বিস্মিত হলাম। অতিরিক্ত ভাল ছেলে বলে স্কুল-কলেজে তড়িৎদার দুর্নাম ছিল। কোনদিন কোন আন্দোলনে ও যোগ দেয় নাই। জীবনে একটি দিন পিকেটিং পর্য্যন্ত করে নাই। অথচ আজ ওর কণ্ঠে সমাজ-বিপ্লবের সুর।

বাস বৌবাজারের মোড়ে আসতেই তড়িৎদা উঠে পড়ল। শুধালাম: তাহলে কবে তোমার সঙ্গে দেখা করব?

শ্যাম স্কোয়ারের একটা ঠিকানা দিয়ে তড়িৎদা বলল: যে-কোন দিন দেখা করো। কিন্তু—কোন্ সময়ে যে দেখা করবে, সেই তো হচ্ছে সমস্যা।

কেন সকালে ?

সকালে তো দেখা হবে না। আমি আবার সকালে ল' কলেজ attend করতে সুরু করেছি কি না।

অপেক্ষা করবার সময় নাই বাস ছেড়ে দেবে। অগত্যা আমিও বৌবাজের মোড়েই নেমে পড়লাম। বললাম : তাহলে কখন তোমার সুবিধা হবে ?

তড়িৎদা বলল : তাইতো ভাবছি। আচ্ছা—রাত গোটা দশেকের সময় 'দেশবাণী' পত্রিকার আপীসে যেতে পার না একদিন ?

হেসে বললাম : 'দেশবাণী' আপীসে আবার কি ? চাকরী পেয়েছ নাকি তড়িৎদা ?

তড়িৎদা আমতা আমতা করে বলল : না না, চাকরী ঠিক নয়। রাত্তিরে সেখানে কাজ করি, গোটাকয়েক টাকা দেয়।

সে কি ? রোজ রাতে ?

তা বই কি, night-duty যে।

বল কি তড়িৎদা, এই শরীর নিয়ে তুমি রোজ রাত জেগে কাজ কর ?

না করে উপায় কি ভাই, শরীরের চেয়ে সংসারের দাবী অনেক বড়।

ট্যুইশনীর কথা ভুলেই গেলাম। আবার শুধালাম : কতক্ষণ কায করতে হয় রাতে ?

ম্লান হেসে তড়িৎদা জবাব দিল : তা মন্দ নয়। মোটামুটি সাড়ে ন'টা থেকে রাত তিনটে সাড়ে তিনটে অবধি।

রোজ ?

না, সপ্তাহে একদিন ছুটি আছে।

দেখা করবার একটা দিন ঠিক করে তড়িৎদাকে ছেড়ে দিলাম। বেশ একটু রাত হয়েছে। আলোকখচিত কলকাতা সহস্রাক্ষ দানবের মত ওৎপেতে বসে আছে যেন। দারিদ্র্যতাড়িত অসহায় নরনারী। নিরুপায় হয়ে অজ্ঞাতসারে তার করাল গহ্বরে আত্মসমর্পণ করে চলেছে দিনের পর দিন। পাদপথে আশ্রয়হীন বেকার। খোলার বস্তীতে অর্ধভুক্ত মজুর। স্যাঁতসেতে এক-তলায় অল্প মাইনের কেরাণী-পরিবার। মেসের ভাঙাখাটে ট্যুইশনীসম্বল আহতস্বপ্ন যুবকদল। কে জানে হয়তো সংবাদপত্র আপীসের ল-কলেজগামী নৈশ-সম্পাদক তড়িৎদা-ও। সবার-পথের একই ঠিকানা।

স্কুল-জীবনের একটি রাতের কথা মনে পড়ছে। বার্ষিক পরীক্ষা আগতপ্রায়। সন্ধ্যার পরেই বই-পত্তর নিয়ে তড়িৎদার বাসায় হাজির হলাম। একা একা পড়তে বসলেই ঘুম পায় বলেই এই দ্বৈত-পঠনের ব্যবস্থা।

মাথার কাছে হ্যারিকেন জেলে সেই ভর সন্ধ্যাবেলা তড়িৎদা সটান ঘুমিয়ে আছে। ডেকে তুললাম : ব্যাপার কি তড়িৎদা, আজ যে সারারাত কাবার করবার কথা।

আড়মোড়া ভেঙে তড়িৎদা বলল : তাইতো একদফা ঘুমিয়ে নিলাম। যা বড় রাত আজকাল।

হেসে বললাম : আর যা কুম্ভকর্ণ আমরা দুজন।

কলরব করে দুজনে মুখোমুখী হয়ে পড়তে বসলাম। বলা বাহুল্য সে-রাতে আমাদের দুজনকে খাবার জন্য ডেকে তুলতে তড়িৎদার মাকে যা ডাকাডাকি করতে হয়েছিল তাতে একটা পাড়ার লোক জড়ো করা চলে।

অথচ আজ তড়িৎদা night duty করে সারারাত জেগে কাজ করে। আর সপ্তাহে একদিন ছুটি নিয়ে আনন্দবোধ করে। কালের কুটীল গতি !

কয়েকদিন পরে। থিয়েটার দেখে ফিরবার পথে 'দেশবাণী' আপীসে হাজির হলাম। রাত প্রায় এগারটা।

সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠেই একখানা লম্বা ঘর। ঘরের দু' পাশে সার বেঁধে টেবিল সাজানো। টেবিলের দু'পাশে সাজানো চেয়ার। মাথার উপর উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক আলো। তারি নীচে কাজ করছে বহু লোক। টেবিলের উপর মাথা গুঁজে রয়েছে অনেক লেখনীধারী। সংবাদপত্র আপীসের সহকারী সম্পাদকমণ্ডলী। আমার মনে হল : জীবিকা-দেবীর বেদীমূলে অনেক প্রাণের আত্ম-নিবেদনের করুণ চিত্র।

টেবিলের সারি পার হয়ে তড়িৎদার আসন। টেবিলের উপর একরাশ কাগজপত্র ছড়ানো। ডানদিকে একটা টেলিফোন। বাঁ দিকে অনেকগুলো ইংরেজী-বাঙলা সংবাদপত্র। তড়িৎদার চোখের সামনে খোলা রয়েছে একখানি 'দেশবাণী'। তার উপর অনেকগুলি ছাপানো সরু কাগজের ফাইল পিন দিয়ে আঁটকানো। পরে জেনেছিলাম—সে গুলোর নাম 'প্রুফ' : সংবাদপত্রে যে সব সংবাদ ছাপা হয় তাদের ভ্রূণ-সংস্করণ।

তড়িৎদা।

ব্যস্তসমস্ত হয়ে তড়িৎদা বলল : বসো।

টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে উঠল। ডান হাত দিয়ে রিসিভারটা কানে লাগাল তড়িৎদা : হেল্-লো—হ্যাঁ, দেশবাণী থেকে বলছি…আজকের খেলার খবর ?…আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন……

তড়িৎদা খোলা কাগজের একটা পাতা উল্টে আবার বলল : হেল্—লো—…মোহনবাগান জিতেছে থ্রি টু নীল… আর কাষ্টমস এবং ডালহৌসি ড্র…না, গোললেস ড্র…আচ্ছা নমস্কার…

রিসিভার রেখে তড়িৎদা বলল বিরক্তগলায় : ভালো জ্বালা। মাঠে যাবে না অথচ খেলার খবরটি জানা চাই।

আমি বললাম : আর নমস্কারটা জানাল বুঝি শেষে ?

আর বলো কেন। নমস্কার কি আর আমাকে জানালো। নমস্কার জানাল ওর আত্মতৃপ্তিকে।

হাফ-সার্ট-পরা একটি লোক এসে বলল : দশ-এর পাতা তাহলে ছেড়ে দি, কি বলেন ?

তড়িৎদা শুধাল : এরি মধ্যে রেডি হয়ে গেল দশ ? কি কি দিলেন ?

লোকটি কতকগুলি সংবাদের নাম করতে করতেই আবার টেলিফোন ডেকে উঠল।

হেল্—লো : অদ্ভুতভাবে তড়িৎদা শব্দটা উচ্চারণ করে তো : হ্যাঁ, দেশবাণী আপীস, কি চাই আপনার ?…কি ?

Strike? কোথায়?…কি বললেন?…হাওড়া জুট মিলে শ্রমিকরা Strike করেছে?

তড়িৎদার কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ও উত্তেজনা: কত জন শ্রমিক Strike-এ যোগ দিয়েছে?…কি? তা জানেন না?… তবে?…ওঃ…

বিরক্তিতে ভরে উঠল তড়িৎদার গলা: ওঃ…আপনি শুনেছেন মাত্র ‥সঠিক কিছুই জানেন না…আমরা? না, আমরা এখনো কোন খবর পাই নি।…নমস্কার…

রিসিভারটা আছড়ে ফেলে দিয়ে তড়িৎদা বলল: আচ্ছা, দিন দশ-এর পাতা ছেড়ে। বাকী চারটি পাতা আমি রেডি করছি। আট-এর পাতায় ডাক হবে। ভুলবেন না যেন। News-Editor বারবার বলে গেছে।

লোকটি চলে গেল।

আমি বললাম: অদ্ভুত তোমাদের কথাবার্তা।

তড়িৎদা হেসে বলল: কেন?

বাঙলা ভাষাতেই আলাপ করলে, অথচ তার অনেক কিছুই আমি বুঝতেই পারলাম না। আশ্চর্য্য নয়?

ঘচ্—ঘচ্—ঘচ্—ঘচ্—

চমকে উঠলাম! অদ্ভুত শব্দ! তড়িৎদার বা-হাতের পাশে একটা কাঠের বাক্স। এতক্ষণ নজরেই পড়েনি। হঠাৎ সেটা আর্তনাদ করে উঠল। যন্ত্রযুগের সীমাহীন বিস্ময়। শুধালাম: ওটা কি তড়িৎদা?

সাদা কথায় ওটাকে বলতে পার সংবাদপত্র আপীসের টরে-টক্কা অর্থাৎ টেলিগ্রামের যন্ত্র। তবে বৈজ্ঞানিক ভাষায় এটার নাম টেলিপ্রিণ্টার।

শুধালাম: কিন্তু আসলে জিনিষটা কি?

ঘচ্—ঘচ্ শব্দের সংগে সংগে বাক্সটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে একখানি কাগজ, ছোট ছোট অক্ষরে সাজানো।

অক্ষরগুলোর দিকে চোখ রেখে তড়িৎদা বলল: এই যন্তরটাই হল আমাদের প্রধান সংবাদদাতা। ডালহৌসি স্কোয়ারে যে সংবাদ-আপীস আছে, world-এর সমস্ত দেশ হতে সেখানে সংবাদ আসে। আর সেইসব সংবাদ সেখানে যেমন টাইপ করা হয়, ঠিক সংগে সংগে সেগুলি এই যন্তরটার ভিতর দিয়ে টাইপ হয়ে বেরোয়।

বলো কি তড়িৎদা, টাইপ-রাইটার চলেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে, আর typed copy বেরুচ্ছে এখানে?

তড়িৎদা হেসে বলল: শুধু এখানে নয়, কলকাতার যেখানে যেখানে এই যন্তরটি আছে, সে সব জায়গাতেই একই খবর typed হচ্ছে।

ঘচ্—ঘচাং—করে যন্ত্রটি থেমে গেল। তারপর শুধু একটা অবরুদ্ধ আক্রোশ। বন্দী দানবের নিস্ফল আস্ফালন যেন।

একটানে টাইপ-করা কাগজখানি ছিঁড়ে তড়িৎদা বলল: ভাখো।

পরম বিস্ময়ে তাকালাম: অতি সংক্ষেপে চীন-যুদ্ধের সংবাদ লেখা রয়েছে। কোথায় দেশবাণী আপীস, কোথায় ডালহৌসি স্কোয়ার, কোথায় কলকাতা, কোথায় টোকিও! ভেনেস্তা কাঠের একটা চতুষ্কোণ বাক্সের ভিতরে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিম্বিত। আকাশ ও গোষ্পদের সম্পর্ক মনে পড়ে গেল।

আবার টেলিফোন: হেল্—লো—হ্যাঁ, দেশবাণী আপীস… এঁ্যা, কি বললেন?…মোটর accident?…কোথায়?… কালীঘাটে?…ওঃ, আচ্ছা…আচ্ছা…আচ্ছা…নমস্কার…

তড়িৎদার সমস্ত শরীর উত্তেজনায় অধীর। রিসিভার রেখেই সে বলল: ননীবাবু, আপনি শিগগির একবার বেরুন তো মশাই।

ও-পাশের একটা টেবিল হতে উত্তর এল: কোথায় আবার এত রাতে?

যেতে হবে একবার কালীঘাট। হাজরা রোডের মোড়ে। একটা serious motor accident, একজনের অবস্থা নাকি আশংকাজনক। ঘটনাস্থলে আহতদের না পেলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালেও একটা ঢু মারবেন। মোট কথা সংবাদটা বেশ ভালভাবেই সংগ্রহ করা চাই। বুঝলেন?

বিড়িতে আগুন ধরিয়ে ননীবাবু বেরিয়ে গেলেন। এতটুকু আপত্তি তুললেন না। রাত বারোটা বাজে। যেতে হবে সুদূর কালীঘাটে—একা। কোন আনন্দ-উৎসবে নয়, একটা অনিশ্চিত দুর্ঘটনার সংবাদ সংগ্রহে। অথচ লোকটার হাবভাবে তিলমাত্র দ্বিধা সংকোচ নাই। যেন নৈশাহারের পরে সুখশয্যার আহ্বানে যাত্রা। আশ্চর্য মানুষের মন!

ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। অনেকগুলি চেয়ারই ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে। এখানে ওখানে কাজ করছে জনছয়েক লোক। শব্দায়মান ঘড়িটার দিকে সবাই একবার তাকাল। আবার যার যার কাযে মন দিল। সময়ের নদী এদের পায়ের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে নিঃশব্দ গতিতে। চলবেও। ক্রমে একটা বাজবে। দু'টা বাজবে। এদের লেখনীর গতি দ্রুত হতে হবে দ্রুততর। তারপর একসময় থেমে যাবে। বাইরের জগতের বুকে যখন বাজবে নতুন দিনের পদধ্বনি, এদের জগতে তখন সুপ্তিমগ্ন মধ্যাহ্ন নিশি। অদ্ভুত এদের জগৎ, বিচিত্র!

ওদিকে হতে একজনের জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এল: কাজের চাপ কি খুব বেশী তড়িৎবাবু?

তড়িৎদা চোখ তুলে বলল: না। তবে রয়টারের কয়েকটা সংবাদ রয়েছে, চীনযুদ্ধের সংগে add করতে হবে। কেন বলুন তো?

শরীরটা কদিন ধরেই ভাল নয়। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

তা' বেশ। এটা আমিই করে দিচ্ছি। রয়টার-page-এর নক্সাটা আর 'স্নারো'গুলো পাঠিয়ে দিন আমার টেবিলে। আপনি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিন। একটা পর্য্যন্ত আপনার ছুটি।

আঃ বাঁচালেন আপনি। ওরে, এককাপ চা দিস তড়িৎ-বাবুকে, আমার নামে লিখে।

কাগজপত্তরগুলি পাঠিয়ে ভদ্রলোক ঘুমের ব্যবস্থা করলেন। বিচিত্র নিদ্রা-ব্যবস্থা। চেয়ারটাকে দেয়ালের সংগে হেলান দিয়ে পা দুটো তুলে দিলেন টেবিলের উপর। দেয়াল-চেয়ার-টেবিলে মিলে সে এক অপূর্ব শয্যা। প্রয়োজন বহু আবিষ্কারের জননী

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় অনেকের নয়ন নিদ্রাহীন ; ফুটপাথে অনেকের সুখশয়ন ; রণক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের মাঝে ঘুমায় সৈনিক ; বন্দুকের নলে মাথা রেখে পাহারাওলা ভোগ করে ক্ষণিক-নিদ্রা ; আর দেয়াল-চেয়ার টেবিলের শরশয্যায় ঘুমায় সংবাদপত্রের নৈশকর্মী। প্রয়োজন মানে না আইন। প্রয়োজন সর্বশক্তিমান।

তড়িৎদার কাছ থেকে ট্যুইশনী সংক্রান্ত একখানি চিঠি নিয়ে অনেকরাত্রে বাসায় ফিরে এলাম। মাত্র একটি ঘণ্টা সময়। অথচ জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধি যেন যোজনপথ বিস্তৃত হয়ে গেছে। তারায় তারায় আকাশ যখন ছেয়ে যায় ; কর্মপাগল কলকাতাও যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে ঝিমায় ; সাধারণ মানুষ যখন সুখশয্যায় নিদ্রামগ্ন ; তখনও সময়ের নদী বয়ে চলে অবিরাম গতিতে ; তখনও অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলে পৃথিবীর কর্মস্রোত ; তখনও কত মানুষ কাজ করে যায় নিদ্রাহীন চোখে : কত সংবাদপত্র-সেবী বাক্যহীন কর্মী : কত টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অপারেটার ; কত ট্রেণচালক : জীবন দেবতার পূজায় কত জীবনের একান্ত আত্মনিবেদন !

কিন্তু কোথায় এর পরিণতি ? জীবনের প্রসার না সংকোচ ? জীবনরক্ষার এই অমানুষিক সাধনা ; প্রকৃতির এই প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচরণ ; দিন-রাত্রির এই অস্বাভাবিক রূপান্তর : জীবনের পথ এতে দীর্ঘতর হবে, অথবা হবে খণ্ডিত ?

এ-প্রশ্নের উত্তর পেতেও বেশী দেরী হল না। অকস্মাৎ এক দিন খবর পেলাম, তড়িৎদার টি-বি হয়েছে। টি-বি। Tuberculosis—যক্ষ্মা। অন্তত একটি পথে জীবনের পদচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কে জানে হয়তো নিশ্চিহ্নই হয়ে যাবে।

ঘরের ভিতরে বড় গুমোট গরম। অথবা ব্যথিত স্মৃতির অগ্নিস্পর্শে মস্তিষ্কের কোষগুলি হয়েছে উত্তেজিত। তাই স্নায়ুতন্ত্রের এই তীব্র উষ্ণতা। তাই এই গরম।

হাত বাড়িয়ে জানালাটা খুলে দিলাম। বাইরে অন্ধকার। একখণ্ড কালো মেঘে চাঁদ ঢেকে গেছে। দূর-দিগন্ত কালো হয়ে জানালায় মিশেছে। বোর্ডিং-য়ের পিছনেই একটা খাল। এখন শুকিয়ে গেছে—প্রাণহীন। তার ওপার দিয়ে একটা পায়েচলা পথ মাঠের ভিতর দিয়ে গ্রামে চলে গেছে। অন্ধকারে সে-পথটিও ঢেকে গেছে। জানালা দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলেও তাকে দেখতে পেলাম না। কোথায় সে পথ ? কোথায় তড়িৎদার প্রাণ-রেখা ?

মনে পড়ছে। রাণুদাই প্রথম সংবাদ দিল, তড়িৎদার টি-বি হয়েছে।

ট্যুইশনীর পাথর ফেলে ফেলে বেকার জীবন-সমুদ্রে সেতুবন্ধের বিফল প্রচেষ্টায় প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি, এমনি সময় একদিন 'ভাস্কর'-সম্পাদকের সংগে ট্রামে দেখা হয়ে গেল। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন 'নবারুণ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক, আর আমি তার নবাবিষ্কৃত গল্প-লেখক। সেই সূত্রেই পরিচয়। পুরানো পরিচয়ের সুতো ধরে 'ভাস্কর'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে উত্তীর্ণ হলাম এবং দেখা পেলাম রাণুদার।

সাংবাদিক জীবনের প্রথম দিন। ভাস্কর-সম্পাদক যথারীতি পরিচয় করিয়ে দিলেন : ইনি বাবু নারায়ণ নন্দী। গ্রাজুয়েট। promising গল্প-লেখক। 'নবারুণ'-এ এখন 'তীর্থ পথিক' নামে যে ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসখানা চলছে, তা এরি লেখা। ইনি দয়া করে আমাদের এখানে কাজ করতে এসেছেন। আপনারা সবাই এঁকে preliminary জিনিষগুলো একটু বুঝিয়ে দেবেন। ব্যস, তাহলেই দুদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সহ-সম্পাদকমণ্ডলী 'আসুন আসুন' বলে একখানি আসন ছেড়ে দিলেন। কুণ্ঠিতচরণে আসন গ্রহণ করে তাঁদের নির্দেশমত কাজ আরম্ভ করলাম। ইংরেজীতে লেখা সংবাদের বাঙলা তর্জমা। উপরে একটা জায়গার নাম ও তারিখ, নীচে ইউ-পি অথবা এ-পি। আরো একটু কাজ আছে : সংবাদের শিরোনামা বসানো। তবে সহকর্মী বন্ধুর নির্দেশমতে সে কাজ এখনো আমার ক্ষমতার বাইরে, অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। অতএব তর্জমা করেই আমি খালাস।

নানা সংবাদ : কোথায় উটকামণ্ডে গৃহদাহের ফলে তিনজন ভস্মীভূত হয়েছে ; কোন্ পার্বত্য অঞ্চলে অতিবৃষ্টির ফলে পাহাড় ধ্বসে রেললাইন বন্ধ হয়েচে, কোথায় একজন জমকালো নেতা পরিষদ-সদস্য হবার আশায় সফরে যাত্রা করেছেন। বসে বসে একের পর এক এই সব তর্জমা করছি আর ভাবছি : এই কি সাংবাদিকতা। তড়িৎদার আপীসের কথা মনে পড়ল। সেখানে যে দেখে এলাম সাংবাদিকতার সংগে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক, বহু বৈচিত্র্য ও দারুণ উত্তেজনা। তবে ?

আরে এসো—এসো, রাণুদা এসো।

সহ-সম্পাদকমণ্ডলীর মিলিত আহ্বানে চমক ভাঙল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো রাণুদা নামক সর্বসমাদৃত একটি মানুষ। আপাদমস্তক লক্ষ্য করলাম। অসাধারণও নয়, বিশিষ্টও নয়। হাতে ছাতা। কপালে ঘাম। গায়ে ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবী। পায়ে কালো নিউকাট। চেহারায় ভালোমানুষেমীর স্পষ্ট ছাপ।

স্মিতহাস্যে সকলকে আপ্যায়িত করে রাণুদা বসল এসে আমার পাশে। অজ্ঞাতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ক্রমে পরিচয় হল। নামধাম জেনেই বুঝলাম, তড়িৎদার সংগে রাণুদার ভৌগোলিক আত্মীয়তা আছে। নতুন কর্মক্ষেত্রে এই সর্বজনপ্রিয় লোকটির সংগে একটু ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছা নিয়েই শুধালাম : আপনি তড়িৎকান্তি রায়কে চেনেন ?

রাণুদা চমকে উঠল। স্মিত মুখের উপর বর্ষার কালো ছায়া পড়ল। বলল : চিনি। আপনার সংগে তার পরিচয় আছে বুঝি ?

ভয়ে ভয়ে বললাম : আছে।

সম্প্রতি তড়িৎবাবুর সংগে আপনার দেখা হয়েছে কি ?

আজ্ঞে না। বাড়ী গিয়েছিলাম। কয়েক দিন হল ফিরেছি। অনেক দিন তড়িৎদার সংগে দেখা হয়নি। কিন্তু কেন বলুন তো ?

গম্ভীর গলায় রাণুদা বলল : তড়িৎবাবুর টি-বি হয়েছে। হপ্তাখানেক আগে তিনি যাদবপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

টি-বি। মনে পড়ল শ্যামবাজারে বাস-ষ্ট্যাণ্ড। তড়িৎদাকে বড় রোগা দেখেছিলাম সেদিন। চোখের নীচে কালিমার আঁচড়।

আরেকটি মুখ মনে পড়ল। আর একজোড়া চোখ। তারো নীচে কালির আঁচড়—গাঢ় কালি। মাত্র দুটি ছোট চোখের ভিতরে কারো জীবনের অশ্রুসিক্ত ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকতে পারে, সে-কথা এই দুটি চোখ না দেখলে বিশ্বাস করতাম না কোনদিন। কিন্তু সে চোখ তো যক্ষ্মা রোগীর নয়। সে চোখ এক জীবন্মৃত বৃদ্ধের। সে চোখ শশীবাবুর।

ভাস্করের রয়টার এডিটর শশীবাবু। ফর্সা ছোট মানুষটী। মাথায় ফাঁকা ফাঁকা কয়েকগাছি চুল। চিকণ শনপাটের মত ধূসর। কোটরগত দুটি গোল চোখ। হলদে বিবর্ণ। সব সময়ই যেন জলে ভরে আছে। মোটা ভ্রূদুটি পদ্মার তল-খাওয়া পারের মত উন্নত। শশীবাবুর জীবন নদীও কীর্তিনাশা। আশা-আকাংখা, স্বপ্ন-সাধ সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তবু তার সর্বনাশা নেশা শেষ হল না। দুটি কাঁদনভরা চোখের উপর উদ্যত হয়েছে ভাঙনের খড়্গ।

দুটি চোখের নীচে প্রায় ইঞ্চিখানেক জায়গা অর্ধবৃত্তাকারে ফুলে উঠেছে। তার নীচে গালের কোঁকড়ানো মাংস ঝুলে পড়েছে গভীর শ্রান্তিতে। সব মিলে চোখ দুটোকে মনে হয় পাহাড়ঘেরা হ্রদ। বিরাট জীবন-আকাশ তাতে প্রতিবিম্বিত। বেদনায় ম্লান, আহত স্বপ্নের ধূসর রঙে উদাস।

কার্য্যোপলক্ষেই শশীবাবুর সংগে প্রথম আলাপ হল। আমার চেয়ারের ঠিক পিছনেই একটা খোলা জানালা। শশীবাবুর আলাদা টেবিল আপীসের মাঝখানে। একটু অন্ধকার।

জানালার পাশে উঠে এসে শশীবাবু একখানি news-slip বারকয়েক চোখের খুব কাছে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। তারপর কুণ্ঠিত গলায় বললেন আমাকে; দেখুন তো শব্দটা কি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

News-slipটা তাঁর হাত থেকে নিলাম। রয়টারের একটা সংবাদ: Enemy division skeletonised শেষের কথাটার নীচে দাগ দেওয়া। বললাম: শব্দটি তো skeletonised বলে মনে হচ্ছে।

শশীবাবু slipটাকে আবার চোখের সামনে তুলে ধরলেন। অতিরিক্ত পাওয়ারের জন্ম চশমার কাঁচ ঝকমক করছে। তবু কোন কিছু পড়তে হলে শশীবাবু তাকে একেবারে চশমার কাঁচের সংগে মিশিয়ে না ফেলে পারেন না।

বললেন ইতস্তত করে: আমিও তো তাই দেখছি। কিন্তু শব্দটা যে অভিধানে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ভাবলাম বুঝি ভুলই দেখলাম। নিজের চোখকেও আর বিশ্বাস হয় না ম'শায়। নইলে এই কাজ করেই তো চুল পাকালাম।

নতুন চাকরীর মোহে খুব সকালেই আপীসে এসেছি। আপীস খালি। ও-পাশের টেবিলে দু'জন বসে কাজ করছে। এখনো আলাপ হয়নি। পাশের চেয়ারটা একটু টেনে দিয়ে শশীবাবুকে বললাম: বসুন।

শশীবাবু বসলেন। পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরালেন। হাতটা একটু কাঁপে।

শুধালাম: আপনি বুঝি অনেক দিন সংবাদপত্রে কাজ করছেন?

শশীবাবু দম-দেওয়া পুতুল হয়ে উঠলেন: আর বলেন কেন। সেই সুরেন বাঁড়ুয্যের 'বেংগলী' থেকে এই কাজেই হাত পাকাচ্ছি। এই হাড়-বেরকরা হাত দিয়েই কত কাগজের জন্ম হল।

টেবিলের উপর হাতখানি মেলে ধরলেন। হাড়-বেরকরা হাত সত্যি। শক্ত হাত ও মোটা নীল শিরাগুলোর উপর পাতলা একটা চামড়ার আবরণ মাত্র। মাংস নাই। রক্তও বুঝি নিঃশেষ।

আজি না হয় গলিতনখনয়ন জরদ্গব হয়ে পড়েছি। তাই শশী সান্যালের আজ এত অবহেলা। নইলে আমারো দিন ছিল। সুরেনবাবু তো শশী বলতে অজ্ঞান। কতদিন বলেছেন: শশী যা news edit করে, এমনটি অনেক বিলিতী কাগজেও পাওয়া যায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। জলভরা চোখ দুটি আরো ছলছল করে উঠল। প্রসংগটা চাপা দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার ছেলে পুলে কি শশীবাবু?

এক ছেলে, দুটি মেয়ে। ওই তো হয়েছে বিপদ মশায়। মেয়ে দুটি বড় হয়েছে। অথচ বিয়ে দেবার সংস্থান নাই। ছেলেটাও যদি মানুষ হত—

কি করেন তিনি?

শশীবাবু ব্যর্থ আক্রোশে ফেটে পড়লেন: সে ব্যাটাচ্ছেলে এক মহা হতচ্ছাড়া। কি একটা ইলেকট্রিক কোম্পানীতে নাকি চাকরী করে। কি করে মাথামুণ্ডু তার কপালই জানে। সংসারে একটা পয়সা ছোঁয়াবার নামও নাই। তা নইলে কি আর পয়ত্রিশটে টাকার জন্যে ভাস্করের গোলামী করে মরি দিনরাত।

হঠাৎ শশীবাবু কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠলেন: হ্যাঁ, শব্দটা তাহলে Skeletonised কি বলেন?

ঘাড় নাড়লাম: আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু এর মানেটা কি? অর্থাৎ অভিধানে তো লেখে Skeleton মানে কংকাল। তাহলে armyটা skeletonised মানে কি সব সৈন্য মরে কংকালে পরিণত হল? তাই বা কেমন করে হয়?

একটু ভেবে বললাম: আমি তো এ-লাইনে একেবারে নতুন। ঠিক বুঝতে পারছিনা। তবে আমার মনে হয় sentenceটার মানে, সেনাদলের অধিকাংশই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। মার খেয়েছে খুব আর কি। আমরা বলি না, মেরে হাড় বের করে দেব, তাই আর কি।

শশীবাবু উল্লসিত হয়ে উঠলেন: ঠিক বলেছেন। তাই হবে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। হবেই। নতুন হলেও আপনি হলেন একজন শিক্ষিত লোক। আপনার মাথাই আলাদা।

আপ্যায়িত হয়ে একটু হাসলাম।

শশীবাবু বললেন: আচ্ছা, উঠি তাহলে। বড় আরাম পেলাম আপনার সংগে কথা বলে। তাই তো গল্পে গল্পে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। এক্ষুণি হয়তো কাপির তাড়া আসবে প্রেস থেকে। তাছাড়া আবার জবাবদিহির ভয় আছে।

জবাবদিহি?

শশীবাবু হেসে উঠলেন: ও হরি, তা জানেন না বুঝি। জানবেন, ক্রমে সবি জানবেন। এ নরকে সবে পা দিয়েছেন, অগ্নিকুণ্ড—কুম্ভিপাক—ক্রমে সবি দেখতে পাবেন।

তারপর গলা নামিয়ে মাথা নীচুকরে বললেন: গেজ·দিয়ে মেপে এখানে কাজ আদায় করে নেয় ম'শায়, কার ক' কলাম কাজ হল।

বিস্মিত হলাম। সংবাদপত্রসেবা দেশ সেবারই নামান্তর বলে জানি। সেখানেও কাজ মাপবার ব্যবস্থা। মনের জমিনেও জরীপ। কেরাণীগিরি হতে তাহলে এর তফাৎ কোথায়?

বললাম: বলেন কি?

আর বলি। সব ব্যবসা ম'শায়, স্রেফ ব্যবসা। বাইরেই শুনবেন সব বড় বড় বুলি, ভিতরে সব আলকাত্‌রা। নইলে কি আর বেলা বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত মাথাগুঁজে হাত চালাই, দুটো কথা বলবার অবসর পর্য্যন্ত নাই।

পরে দেখেছি, অবসর করে নিলেই আছে। সংবাদপত্রের কাজ বারোয়ারী ব্যাপার। যে খাটছে সে খাটছেই, আর ফাঁকির বীজমন্ত্র যে শিখেছে তার পোয়াবারো।

তবে শশীবাবুর কথা আলাদা। রোজ বারোটা-আটটা তিনি একটানা কাজ করেন। বারোটা বাজ্‌বার কয়েকমিনিট আগেই তিনি আসেন। ছাতাটা একপাশে রেখেই চেয়ারের উপর পা-দুটো তুলে হাঁটু গুঁজে বসেন। সে এক অদ্ভূত ভংগী। সরু হাঁটু দুটি ঘাড়ের উপর দিয়ে মাথা উঁচু করে থাকে। লম্বা শিরাবহুল গলাটা বেরিয়ে ঝুঁকে পড়ে টেবিলে। প্রেসের কম্পোজিটারেরা শশীবাবুকে তাই বলে গিন্নি শকুন।

শকুনই বটে। সারা পৃথিবীর সংবাদের ভাগাড় খুঁজে বেড়ানোই তার কাজ। নখের মত শুকনো আঙুল গুলোর ফাঁকে কাল কলমটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলে অবিশ্রাম গতিতে। মহাকালের শবদেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেশের দিকে দিকে। দুর্ভিক্ষ-মহামারী, দাংগা-হত্যাকাণ্ড, মহাযুদ্ধের বীভৎস বিবরণ, বিষবাষ্পের আক্রমণে অসহায় শিশুর মৃত্যুনীল মুখ: শকুনির নখের আঁচড়ে কালের পাকস্থলী হতে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। বীভৎসতায় মানুষ শিউরে ওঠে। দুর্গন্ধে দম আটকে আসে।

শশীবাবু কাজ করেন বিশ্রামহীন। news slipটা চশমার সংগে মিশিয়ে খানিকক্ষণ পড়েন। তারপর অবিরাম লিখে যান। মাঝে মাঝে শুধু বিড়ি খান। কখনো বা অস্পষ্ট শব্দ পড়বার জন্য জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

বাইরের জগৎ হতে দিনের আলো বিদায় নেয়। আপীসে ইলেকট্রিক্ আলো জ্বলে ওঠে। শশীবাবুর কাছে এ পরিবর্ত্তন অর্থহীন। আলোর প্রয়োজন news-slip পড়বার জন্য। সূর্যের আলোর চেয়ে ইলেকট্রিকের আলোই তার পক্ষে ভাল। সূর্য যদি পৃথিবী থেকে চির-বিদায় নেয়, তাতেই বা শশীবাবুর ক্ষতি কি? ক্রমশঃ

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্-এ (ক্যান্টাব)

আয়নার সামনে একটা দীপ রাখলে তার ছায়া পড়ে আয়নার পিছনে। প্রদীপটি নিভ্‌লে তার ছায়াচ্ছবিও সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়। স্থূল চক্ষে বস্তু সত্য, ছায়া মিথ্যা। কিন্তু আয়নার যদি স্মরণশক্তি থাকত তাহলে ছায়াটি মুছে যেত না। তখন নির্বাপিত দীপশিখা হ'ত মিথ্যা, তার প্রতিবিম্ব-খানি হ'ত অমর। যাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবো তাঁর স্মৃতি রয়েছে আমাদের অন্তরে। শুধু নশ্বর দেহের নয়, তাঁর আত্মিক প্রতিকৃতির বিচিত্র ছায়াসম্পাত রয়েছে তাঁদের অন্তরে যাঁরা শরৎচন্দ্রকে দেখেছিলেন নানা পরিস্থিতির মাঝখানে। আমাদের অন্তর্লোক নানা অভিজ্ঞতার সমষ্টিতে রচিত এবং অন্তরতম অনুভূতির ভিতর যা কিছুর পরিচয় আমরা পাই, তার একটা বহির্নিরপেক্ষ স্বয়ংপ্রভ দীপ্তি আছে, সেই আলোর বাহিরে থাকে হারাই অন্তস্তলে তার দর্শন মেলে।

প্রত্যেক শিল্পী ও স্রষ্টা আত্মরচনার মধ্যে আত্মপরিচয় রেখে যান। স্বল্পায়ু জীবনে যেটুকু শাশ্বত তা এমনি ক'রেই মৃন্ময় দেহীকে অতিক্রম ক'রে তার চিন্ময় স্বরূপটিকে মানবের ইতিহাসে চিরস্থায়ী করে। শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মিক মূর্তির কিয়দংশ রেখে গেছেন তাঁর রচনার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কথাশিল্পী হিসাবে। তাঁর দান রইল আমাদের ঘরে ঘরে, কিন্তু সে দান-সত্র আর নেই। শরৎচন্দ্রের পার্থিব জীবনের ছিন্নাংশগুলি নানা দেশে নানা কালে বহু নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আজ সেই সেই স্থান ও ব্যক্তিগুলি শোকার্ত বাংলার স্মৃতিপীঠ। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মুখে তাঁর কথা শোনবার জন্য আজ আমরা ব্যাকুল।

প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কথা। তখন আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে বাস করতাম অধ্যাপক হিসাবে। শরৎচন্দ্র থাকতেন বাজে শিবপুরে আন্দাজ মাইল তিনেক দূরে। একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন আমার এক পরম স্নেহাস্পদ তরুণবন্ধুর সঙ্গে। লোহা যেমন চুম্বকে আকৃষ্ট হয় তেমনি প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। টানবারই কথা। আমি ছিলাম তাঁর লেখার ভক্ত। সশরীরে যখন দেখা দিলেন তখন তাঁর কল্পমূর্তিটি পেল তার বাস্তবভিটা আমার উৎসুক দৃষ্টিতে। ভক্তের সঙ্গে ভক্তবৎসলের প্রীতি স্বাভাবিক, অল্পদিনেই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হ'ল। আমি আজন্ম সহরে বন্দী, তিনি চলতি পথের উদ্‌ভ্রান্ত পথিক। আমার পল্লীবুভুক্ষু মন তাঁর মুক্তপ্রাণের খোলা হাওয়ায় হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। এই খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর হল মিতালী। পরিচয় হ'ল এমন একটি জলজ্যান্ত প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ নদীর মত স্বখাত ধারা পথটি আপনার দুর্বার আবেগে কেটে প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। তাঁর রচনা যে আপামর সাধারণের হৃদয় হরণ করতে পেরেছে অনায়াসে, তার প্রধান কারণ বোধকরি ওই প্রাণসম্পদ। লেখার পশ্চাতে যদি সত্যিকার অভিজ্ঞতা না থাকে তবে সেটা হয় অবাস্তব ও অনুপ্রাণনাহীন। সাহিত্য জীবনবেদ। এর ঋকমন্ত্রগুলি তাঁরাই রচনা করতে পারেন যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা। এর জন্যে চাই সাধনা এবং সর্বোপরি চাই জীবন নিয়ে Experiment বা পরখ করে দেখবার দুঃসাহস। এ বস্তু কেবল নকল ক'রে বা পরের ধনে পোদ্দারি ক'রে পাবার নয়। অপটু অনভিজ্ঞ লেখক

লেখেন অনেক কথা, কিন্তু বলেন না যে কিছুই। শরৎচন্দ্রের ভাষায় বক্তব্যের অস্পষ্টতা বা বাহুল্য নেই, যেন ষোল ছটাক মাধ্যমে ষোল ছটাক ঘি। এই প্রসাদ গুণে তাঁর রচনা সর্বসাধারণের এমন উপভোগ্য হয়েছে।

চকমকি পাথরে সুপ্ত বহ্নি থাকে। আর একটা চকমকির সংঘাতে ও সংঘর্ষে যেমন তাতে ক্ষণিক আভা জাগে তেমনি আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যাদের সংস্পর্শে আসি তারা যেন আমাদের সুপ্ত চেতনার পাষাণ ঠুকে ঠুকে নানা রঙ বেরঙের ক্ষণপ্রভা উদ্দীপ্ত করে। সেই ক্ষণিক আলোকে আমরা পরস্পরের পরিচয় পাই। আমাদের ভাব চিন্তা সংস্কার শক্তি দুর্বলতা সব ধরা পড়ে সে বিচিত্র আভাসে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল তাঁরা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর আত্মপ্রকাশের সহায়তা করেছেন, নানা আলাপন ও আদান-প্রদানের উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলী রইল আগামী যুগের অধ্যয়ন আলোচনার জন্যে। যে পরিবৃত্তির সুখ-দুঃখময় বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ও অনুকম্পা উৎসারিত হয়েছিল তাঁর লেখনীর অমৃতধারায়, সেই পটভূমির নর-নারীও ঘটনাবলীর তথ্য-নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। এইসব বিবরণী হবে তাঁর রচনার ভাষ্য। শরৎচন্দ্র গৌড়জনের জন্যে যে মধুচক্র নির্মাণ ক'রে গেছেন তার উদার সঞ্চয়ন ক্ষেত্র বাংলা বিহার ও ব্রহ্মদেশের সুবিস্তীর্ণ মালঞ্চে প্রসারিত। ঘাসের ফুল থেকে বেলা চামেলি পদ্ম গোলাপের মধুকণা তাতে আছে।

বাংলার সাধারণ ভদ্র সন্তানের মত শরৎচন্দ্র দারিদ্র্যের মধ্যেই বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। বাহিরের সম্বলের মধ্যে ছিল কেবল কাগজ কালি কলম, আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তর্গূঢ় সমুজ্জ্বল প্রতিভা। নিছক আত্মশক্তি ও নিরন্তর সাধনার বলে তিনি বাংলার উপন্যাস সাহিত্যের আসরে আপনার শীর্ষস্থানটি অধিকার করেছিলেন। তিনি যে সময়ে জন্মেছিলেন সেটা পরিবর্তনের যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ও অর্থনৈতিক চাপে তখন বাংলার একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন লেগেছে। প্রাচীন সংস্কারে গঠিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তনের লক্ষণ সর্বত্র উঠেছে জাজ্বল্যমান হয়ে। গত পঞ্চাশ বৎসরের স্মৃতি যাঁদের ম্লান হয়নি তাঁদের চোখের সামনে দেখতে দেখতে সব কিরূপ ওলট পালট হ'য়ে যাচ্ছে সে কথা তাঁরাই শুধু বলতে পারেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে এই আমূল পরিবর্তনের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে। তাঁর লেখায় মোটামুটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ থেকে বিংশ শতকের প্রথম পঁয়ত্রিশ বৎসরের নরনারীদের সবাক্ চিত্রাবলী সম্বলিত দৃশ্যপট, আগামীকাল বিস্মিত হ'য়ে যখন দেখবে তখন তার প্রত্যক্ষগোচর নিদর্শন ঘরে বাইরে আর মিলবে না। অধুনাতন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি পর্বাধ্যায় শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে গ্রথিত হয়ে রইল, যেটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনুস্যূত।

শিবপুর কলেজে যখন থাকতাম তখন কিছুকাল প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমার কাছে আসতেন। ছুটিরদিন দুপুরবেলা থেকে প্রায় দুপুররাত পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমাদের আড্ডা জমত। অনেক তরুণ বন্ধু কখনো কখনো এসে জুটতেন। মনে পড়ে সমস্তদিন ব্যাপী গল্প তর্ক রসচর্চার পরে অফুরন্ত কথার জের টানতে টানতে তাঁর বাসা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছি। তারপর সারাদিনের আলোচনার স্মৃতিরোমন্থন করতে করতে গভীর রাত্রে ফিরেছি ঘরে। বেশীর ভাগ কথাবার্তা হ'ত সমাজ সংস্কার প্রেমতত্ত্ব ও পল্লী-সঙ্গঠন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। একজন মাড়োয়ারী নাকি দু'লাখ টাকা তাঁর হাতে দিতে চেয়েছিলেন নবপল্লী সৃজনকল্পে। তাই নিয়ে আমাদের দুজনে অনেক জল্পনা কল্পনা চলত। জানি না এ বিষয়ে তাঁর আর কারুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল কি না। এই সব আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের স্বপ্নলোকের নীহারিকা আমার চোখে ফুটে উঠত। আলাদীনের দীপটি যদি তখন আমরা হাতে পেতাম তবে তার দৈত্যকে দিয়ে এই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বাংলা দেশে যে একটা অপূর্ব পল্লীর উদ্ভব হ'ত তার সন্দেহ নেই। তবু মনে হয় তাঁর সেই পল্লী-পরিকল্পনা হয়ত একদিন সফল হবে।

শরৎচন্দ্রের কাছে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা জীবনের বিচিত্র কাহিনী শুনেছি। তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে বর্ণিত আখ্যায়িকার মূল ঘটনাগুলির কথা অনেক সময়ে আমাকে বলতেন। জাতিভেদ-প্রথার বিকৃতি আমাদের দেশে কি ভীষণ আকার ধারণ করেছে সে সম্বন্ধে তাঁর বহু অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত শুনেছি। উঁচু নীচুর ভেদ যদি ন্যায় ও সত্যাশ্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে তা হলে সমাজে কী দুর্গতি হয় আন্তরিক বেদনার সঙ্গে সেই সব অত্যাচার ও ব্যাভিচারের ব্যাখ্যা করতেন।

বর্তমানকালের পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব কতকটা পেলেও শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল রক্ষণশীল। দেশাচার ও দৃঢ়বদ্ধ সংস্কারের ভালমন্দ দুই-ই তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টির অবিদিত ছিল না। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, ছিলেন লিপিকুশলী শিল্পী। তাঁর লেখায় অপসৃয়মান্ ও বর্তমান হিন্দু সমাজের নরনারীর ছবি নিখুঁৎ রেখায় ফুটেছে। চিন্তাশীল ও কিংকর্তব্যনির্ণয়ী পাঠকপাঠিকা অবস্থা বুঝে যথাভিরুচি ব্যবস্থার কথা ভাবুন, সে সম্বন্ধে উপদেষ্টার আসন তিনি গ্রহণ করেন নি। ব্যবহারিক জীবনে লোকাচার সাধারণত মেনেই চলতেন। কিন্তু হৃদয়াবেগের বশবর্তী হ'য়ে বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করতেও পিছপাও হতেন না। সহরে লোকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেও দরিদ্র বাঙালীর চালচলন হারান নি, তাই অনায়াসে গ্রামের অশিক্ষিত চাষা-ভুষোদের সঙ্গে অকৃত্রিম আত্মীয়তা ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন তাদের 'দাদাঠাকুর'। স্নেহে হিতসাধনে চিরপ্রচলিত আচার আচরণের সহজ ছন্দানুবর্তিতায় গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে বেমালুম মিশে যেতে পারতেন, শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে সচরাচর যা এক রকম অসাধ্য। তাঁর কাছে শুনেছি তিনি একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে জুংকে মশারি আর কাপড় গামছা নিয়ে যখন পল্লী সফরে বাহির হতেন তখন সেই ব্রাহ্মণ অতিথির জন্যে সসম্ভ্রমে দরিদ্রের রুদ্ধদ্বার ও আঙিনা উন্মুক্ত হ'ত তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্যে। এইভাবে কত অজানা কুটীরে কখনো ঘটকঠাকুর হ'য়ে কখনো বা পথহারা পথিক হ'য়ে ঠাঁই পেয়েছেন এবং কুটীরবাসীদের সংশয় ও কুণ্ঠা জয় ক'রে তাদের সশ্রদ্ধ পরিচর্যার সঙ্গে সুখদুঃখের বহু সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর গায়ে শিক্ষাভিমানীর বোঁটকা গন্ধ ছিল না। শুনেছি এমন ঘটনাও হয়েছে যে, মণিঅর্ডার লিখানো বা টেলিগ্রাম পড়ানোর প্রয়োজন হ'লে তাঁকে ইংরাজি-অনভিজ্ঞ জ্ঞান ক'রে গাঁয়ের লোক গ্রামান্তরে উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধানে ফিরেছে। পল্লীবাসী-প্রদত্ত তাঁর এই সার্টিফিকেটটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধির চেয়েও মূল্যবান্। বিদ্যার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ যে বিনয় সেটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ গুণ ছিল, তাই পল্লীবাসীরা তাঁকে আপনাদেরই সমতুল্য একজন ভাবত। বিদ্যার আঁচে তাদের তফাতে রাখেন নি। বনের পাখীরা ঋষিমুনিদের এমনি আত্মীয় জ্ঞান করে, পালাবার চেষ্টা তাদের মনে জাগে না নিরুপদ্রব অভয়ের আশ্বাসে।

একজন রুশীয় দার্শনিক নারীজাতিকে মাতৃলক্ষণা ও নটীলক্ষণা এই দুই ভাগে ভাগ ক'রেছেন। প্রথমা মমতাময়ী, আত্মবিলোপে উন্মুখিনী, সংযতা। দ্বিতীয়া মৃগয়াশীলা, স্বার্থান্বেষিণী, অসম্বৃতা। প্রথমার উদ্দেশে আমাদের কবির বাণী—

'তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।'

দ্বিতীয়াকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন—

'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।'

বলা বাহুল্য প্রত্যেক নারীপ্রকৃতিতে উভয়েরই অল্পাধিক সংমিশ্রণ আছে। তবে তারতম্যের ফলে তার মূলস্বরূপটি নির্দ্ধারিত হয়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকারা অবস্থাচক্রে কুললক্ষ্মীই হোন্ বা কুলত্যাগিনীই হোন্, প্রিয়চ্ছন্দানুবর্ত্তিনীই হোন্ কিম্বা বিদ্রোহিনীই হোন্, তাঁদের মৌন মাতৃপ্রকৃতির অন্তস্তলে শক্তি ও স্নেহের উৎসমূলটি পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন।

সহানুভূতির তৃতীয় নয়ন ছিল তাঁর ললাটে নয়, বক্ষস্থলে। সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির প্রসাদে তিনি ছিলেন মানব-চিত্তের ডুবুরি। ভূতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন একদিন যা ছিল অরণ্যানী, তারি দগ্ধাবশেষ পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে ভূগর্ভের অঙ্গারস্তূপে। বিপুল চাপে নিষ্পিষ্ট অঙ্গার জলকণার সহিত মিলিত হ'য়ে পরিণত হয় স্ফটিক স্বচ্ছ হীরকে। বহু বেদনার পেষণে ও দহনে মানুষের হৃদয়েও বুঝি কয়লার খনির মধ্যে হীরা ফোটে। অন্তর্জগতে অভিজ্ঞ খনক শরৎচন্দ্র এই হীরকের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রে হীরকদীপ্তি আছে কি না, সাহিত্যের জহুরী যাঁরা পরখ ক'রে দেখবেন। তবে আমি তাঁর কথাবার্তায় যে সত্যটি লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে নারীত্বের প্রতি তাঁর অকপট শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে হিন্দুনারীর একটি বিশেষ রূপ ফুটেছে তাঁর রচনায় যার মৌলিক আদর্শ বঙ্গগৃহে আজও দুর্লভ নয়। ভারতে নবযুগ যদি কোনোদিন আসে তা আনবেন আমাদের নারীরা। স্বরাজ সাধনায় নারীর স্থান শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তিনি আমার অনুরোধে শিবপুর কলেজের ছেলেদের সমিতিতে পাঠ করেছিলেন। সে সময়কার 'নব্য ভারত' পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।

মানুষের—শুধু মানুষের কেন—জীব মাত্রেরই উপজ্ঞা বা সহজ জ্ঞান, কে শত্রু কে মিত্র যেন টের পায়। একটা কুকুর কাউকে দেখে আনন্দে ল্যাজ নাড়ে, কাউকে দেখে করে ঘেউ ঘেউ। শরৎচন্দ্রের নারী-প্রকৃতির সম্বন্ধে শ্রদ্ধা তাঁকে স্ত্রীজাতির প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল। স্বদেশে বিদেশে পল্লীতে সহরে সব বয়সের ও অবস্থার মেয়েরা তাঁকে অল্প পরিচয়েই আত্মীয় জ্ঞান করতেন।

অনেক অবরোধপ্রথানিষ্ঠ হিন্দু পরিবারে তাঁর আত্মীয়সুলভ প্রবেশাধিকার ছিল। আরও বিস্ময়ের কারণ এই যে, প্রচলিত বিধি-নিষেধের ব্যতিক্রম তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে ছিল তা সর্বসাধারণের অজ্ঞাত ছিল না। তবুও তিনি মহিলাবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে যে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ এই যে, তাঁর রচনায় মাতৃজাতির প্রতি যে অকৃত্রিম দরদ ও শ্রদ্ধা ফুটেছিল, তাঁর ব্যবহারিক সৌজন্যে ও সংযমে তা দৃষ্টিমাত্রেই মেয়েরা অনুভব করতেন। তাঁর কাছে অনেক তরুণী ও প্রবীণা অকপটচিত্তে তাঁদের দুঃখ-দৈন্য দৌর্বল্যের কথা জানিয়েছেন তা শরৎচন্দ্রের মুখেই শুনেছি। তিনি তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রেখে তাঁদের জীবনের জটিল সমস্যার কথা আমার কাছে ব্যক্ত করেছেন। অহমিকা বা কুৎসার লেশ ছিল না সে সব কথায়, ছিল অকৃত্রিম সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনা। গুরুর কাছে, চিকিৎসকের কাছে এইরূপ নিশ্চিন্ত নির্ভরে আত্মকথার নিরাবরণ প্রকাশ কেবল সম্ভবপর ও বৈধ, অন্যত্র নিষিদ্ধ। আমার বিশ্বাস আমার কাছে তিনি আত্মগোপন করেন নি। তাঁর সরল আত্মোক্তি শ্রদ্ধাও দরদের সঙ্গে শুনেছি। আমার অকুণ্ঠিত অভিমত যখন চেয়েছেন, ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যা বুঝেছি নির্ভয়েই বলেছি, অপ্রিয় সত্য বলতে গিয়ে কখনো অণুমাত্র মনোমালিন্য হয়নি আমাদের মধ্যে।

প্রবল অনাত্মীয় পরিস্থিতির মধ্যে আত্মরক্ষা করতে হ'লে দুর্বলের একমাত্র সম্বল 'কামুফ্লাজ' বা ছদ্মাবরণ। শরৎচন্দ্র বিগতভীঃ বীরপুরুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন হিন্দু সংস্কৃতি ও পরিবৃতির উৎপন্ন বাংলার আধুনিক যুগের একটি প্রতীক। তাই তাঁর লেখা আমাদের সকলের অন্তরেই একটি গোত্রতান্ত্রিক প্রতিধ্বনি উদ্বুদ্ধ করেছে। দোষে গুণে দেহমনে তিনি বর্তমান বাংলার দেশকালের সঙ্গে নিকটতম জ্ঞাতিত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাই ধনীদরিদ্র ইতরভদ্র পাপীপুণ্যাত্মা সকলেরই কাছে যুগপৎ আভিজাত্যেও সাধারণত্বে আপনার জন বলেই পরিগণিত হয়েছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁর অসাধারণত্ব। এই জন্যই সর্বত্র তাঁর গতিবিধি ছিল বাতাসের মত অবারিত।

যে পথ বিপদসঙ্কুল, সাধারণের অগম্য ও নিষিদ্ধ সেখানে ছিল তাঁর অপ্রতিহত গতি। প্রাণের প্রেরণা স্থানে অস্থানে তাঁর জীবন তরীকে নিয়ে গেছে। কত ঝড় ঝঞ্ঝা নৌকাডুবির দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করে তিনি যে দুর্লভ পসরাটি পূর্ণ করেছিলেন আমরা নির্ব্বিঘ্নে ঘরে বসেই তার আনুকূল্য ভোগ করেছি। প্রমিথিউস স্বর্গ হ'তে বহ্নি অপহরণ করেছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছিলেন গিরিগহ্বরে বন্দিদশা ও চিল শকুনের চঞ্চু প্রহরণ। কিন্তু তাঁর কল্যাণে ঘরে ঘরে জ্বলল দীপশিখা, পাকশালার উনানে জ্বলল রন্ধনের আগুন। ডুবুরী যদি প্রাণের ভয় বিসর্জ্জন ক'রে অতলস্পর্শে ডুব না দিত তবে সাগরের রত্নরাজিকে উদ্ধার করত কে?

আমরা সব রকমেই আজ দরিদ্র। তবু বিধাতা আমাদের একেবারে বঞ্চিত করেন নি। ন্যূনাধিক এক শতাব্দীর মধ্যে আমরা পেয়েছি রামমোহনকে, বিদ্যাসাগরকে, বঙ্কিমচন্দ্রকে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে, রবীন্দ্রনাথকে, শরৎচন্দ্রকে, শ্রীঅরবিন্দকে। শ্রদ্ধার দ্বারাই এঁদের অমর করতে পারব আমাদের জাতীয় জীবনে, নতুবা আমাদের মহাবিনষ্টি।

পৌষালি

শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

কাস্তে চালায় মাঠে মাঠে আজ চাষী—
মুঠো মুঠো ধরি সোনার ধানের রাশি।
আজ মনে তার থরে থরে হাসে সোনা—
বড় ভালো লাগে আলি পথে আনাগোনা।
এতদিন ধরি ঘরে ছিল হাহাকার—
পায়নিক স্নেহ—ফসল লক্ষ্মীমার।
সাগর-শুকানো করুণ চাহনি তাই—
ঘর ভরা সব দেখিয়াছে, 'নাই নাই'।

* * *

গোধন চরায় ডহরে রাখাল ছেলে—
দেখে তার রূপ কৃষক নয়ন মেলে।
ফুঁ দিয়া ঝরায় মেঠো রাখালিয়া সুর—
সুরলোকে জাগে সুন্দর সুমধুর।

* * *

গ্রামে গ্রামে আজ দুঃখের মহানিশি
বেদনায় তবু মধুময় দশ দিশি।
আনে যে মাধুরী মায়াময়ী বিভাবরী—
নীরবে সে আসে পরাণের পথ ধরি।

* * *

চাষী কাটে ধান ; এলো "পৌষালি" পথে ?
স্মৃতি কত জাগে অতীতের দিন হ'তে !

কুল্যবাপ এবং কুলবায়

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ্-ডি

আশ্বিনের ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের 'কুল্যবাপের পরিমাণ' শীর্ষক ক্ষুদ্র নিবন্ধটী পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। কারণ এই প্রসঙ্গে অপর একটী সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিবার সুযোগ পাওয়া গেল।

ভাদ্রের ভারতবর্ষে, প্রাচীন বাংলায় কুল্যবাপের ভূমি-পরিমাণ কিরূপ ছিল, তৎসম্পর্কে আমার একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মূল কথাটী এই—পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, যে এক কুল্য পরিমাণ ধান্যবীজের চারাগাছ যে-পরিমাণ ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইত, প্রাচীন যুগের বাংলায় মূলতঃ সেই ক্ষেত্র-পরিমাপের নাম ছিল কুল্যবাপ। বাংলা দেশের নানা যুগের মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তগণের গ্রন্থের সাহায্যে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ৮১৯২ মুষ্টি ধান্যে এক কুল্য গণনা করা হইত। স্মার্ত্তগণের রচনা ও গুরুপরম্পরাগত হিসাব এবং ব্যবহারিক মাপ হইতে দেখা যায়, যে ৮১৯২ মুষ্টিতে আধুনিক মাপে ধান্য হয় ১২ মণ ৩২ সের হইতে ১৬ মণের মধ্যে। কোন্ আয়তনের ক্ষেত্রে কত পরিমাণ ধানের চারা লাগাইতে হয়, চাষী গৃহস্থেরা তাহার নির্দ্দিষ্ট হিসাব জানে। তদনুসারে দেখাইতে চাহিয়াছি, যে এক কুল্য অর্থাৎ পৌনে তের হইতে ষোল মণ ধান্য বীজে ১২৮ হইতে ১৬০ বিঘা পর্য্যন্ত জমিতে ধান্য লাগান যায়। সুতরাং আমার সিদ্ধান্ত এই যে এক কুল্যবাপ ভূমির পরিমাণ মূলতঃ আধুনিক মাপের ১২৫ বিঘার কম ছিল না। অবশ্য হাত এবং নলের দৈর্ঘ্যের তারতম্যবশতঃ পরবর্ত্তী কালে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে এই পরিমাণ কমবেশী হইবার সম্ভাবনা ছিল।

এই সম্পর্কে আমি কয়েকটী প্রাসঙ্গিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলাম। প্রাচীন কালে টাকার ক্রয়শক্তি বর্ত্তমানের অপেক্ষা বহুগুণে অধিক ছিল। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর অঞ্চলের সর্ব্বত্র এক কুল্যবাপ আবাদী সরকারী জমির বাঁধা দাম ছিল ৬৪ রৌপ্যমুদ্রা; ক্রয়শক্তিতে উহা আধুনিক যুগের অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচ ছয় শত টাকার সমান ছিল। একে ত ঐরূপ একটী সরকারী গড় মূল্য ভূমির তৎকালীন সাধারণ দাম অপেক্ষা অনেক কম থাকাই অর্থবিদ্যাসম্মত; আবার আজিও ঐ অঞ্চলে জমির গড় মূল্য বিঘা প্রতি ২০।২৫ টাকার অধিক নহে;—এমন কি, কৃষকবিরল কোন কোন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রতি বিঘা জমির দাম ৫।৭ টাকার অধিক নহে। সুতরাং সেকালের ৬৪৲ টাকা মূল্যের এক কুল্যবাপ ভূমি আধুনিক হিসাবের ১২৫ বিঘার কম হওয়া সম্ভব নহে।

আশ্বিনের ভারতবর্ষে প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আমার সিদ্ধান্তটীকে এবং প্রাসঙ্গিক যুক্তিগুলিকে আনুমানিক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ৮১৯২ মুষ্ট্যাত্মক কুল্য এবং চাষীদিগের হিসাবানুসারে ঐ পরিমাণ ধান্য-বীজ রোপণের ক্ষেত্রপরিমাণ নির্দ্দেশের মধ্যে কতখানি অনুমানের অবসর আছে, প্রাচীন ঐতিহাসিক মহাশয় তাহা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি নিজেও কোন যুক্তিপ্রয়োগ করেন নাই, আমার কোন যুক্তিকেও বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অধিকন্তু তাঁহার নিজের সমর্থিত সিদ্ধান্তটীর মূলে যে সমস্তটাই অনুমান এবং বিন্দুমাত্রও যুক্তি নাই, তাহা তিনি অনুধাবন করেন নাই।

ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন, যে কাছাড়ে ১৪ বিঘা জমিকে এক কুলবায় বলে; কুলবায় এবং কুল্যবাপ অভিন্ন; সুতরাং প্রাচীন কুল্যবাপের ভূমি পরিমাণ ১৪ বিঘা ছিল। তাঁহার মতে, এই সিদ্ধান্তের উপর আর কোন কথা চলিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, সিদ্ধান্তটী প্রচার করিতে গিয়া প্রাচীন পণ্ডিত মহাশয় স্মরণ করেন নাই, যে বাংলাদেশেরই বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আয়তনের দ্রোণ (প্রাচীন দ্রোণবাপ অর্থাৎ কুল্যবাপের অষ্টমাংশ) এবং আঢ়া (প্রাচীন আঢ়বাপ অর্থাৎ কুল্যবাপের দ্বাত্রিংশাংশ) নামক ভূমিমাপ প্রচলিত আছে। এই সম্পর্কে নিশ্চয়ই কাছাড়ের কুলবায় অপেক্ষা বাংলার দ্রোণ বা আঢার দাবী বেশী ছাড়া কম নহে। কাছাড়ের ১৪ বিঘাত্মক কুলবায় যদি ভূমি পরিমাণে প্রাচীন কুল্যবাপের সমান হয়, তবে বাংলা দেশের কোন অঞ্চলের দ্রোণ কেন প্রাচীন দ্রোণবাপ অর্থাৎ কুল্যবাপের অষ্টমাংশের সমান হইবে না? ভট্টশালী মহাশয়ের অনুরূপ যুক্তি-বলে সন্দীপবাসী কোন প্রবীণ পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, যে যে-হেতু সন্দীপের আধুনিক দ্রোণ ৭৬ বিঘা, সেই জন্যই প্রাচীন বাংলার দ্রোণবাপকে ৭৬ বিঘা এবং কুল্যবাপকে ৬০৮ বিঘা বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এই সম্পর্কে আসল কথাটী শ্রদ্ধেয় ভট্টশালী মহাশয়ের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। কুল্যবাপ, দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপের মৌলিক ভূমি-পরিমাণ নির্ণয় ব্যাপারে কুল্য, দ্রোণ এবং আঢ়কের বীজ পরিমাণ এবং উহার রোপণযোগ্য ক্ষেত্র পরিমাণ জানাই প্রয়োজন। এ বিষয়ে অধুনা প্রচলিত কুলবায়, দ্রোণ এবং আঢার ভূমি পরিমাণ নিতান্তই মূল্যহীন। কারণ, হাত ও নলের দৈর্ঘ্যের তারতম্যানু-সারে যে এই সকল পরিমাপের ভূমি পরিমাণ নানাস্থলে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। আর একটী কথা আছে। মনুসংহিতায় উল্লিখিত ধান্যদ্রোণ কথার ব্যাখ্যায় কুল্লুকভট্ট প্রমুখ বাঙালী স্মার্ত্তগণ যে ধান্য পরিমাপরীতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কাছে ভট্টশালী মহাশয়ের উদ্ধৃত লীলাবতীর মতের মূল্য অধিক নহে। কারণ লীলাবতীকার বাঙালী ছিলেন না। আজিও মাদ্রাজের মণ এবং বোম্বের বিঘার সহিত কলিকাতার মণ এবং বিঘার সামঞ্জস্য নাই।

এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত অপর একটী বিষয়ের প্রতি ভট্টশালী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। চৈত্রের ভারতবর্ষে তাঁহার কুলকুড়ি লিপির পাঠ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া উহার সহিত আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অভিধানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারি নাই। সম্প্রতি আবার প্রবীণ

পণ্ডিত মহাশয়ের ভাষাতত্ত্বঘটিত সিদ্ধান্তসমূহের সহিত আমাদের জানা প্রাকৃতব্যাকরণগুলির সূত্র মিলাইতে পারা যাইতেছে না। গত বৎসর সায়ান্স্ এ্যাণ্ড কাল্চার পত্রিকার একটী প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে সংস্কৃত 'অন্তর্ব্বল' হইতে আড়িয়ল এবং 'অন্তর্ব্বলক' হইতে আড়িয়ল খাঁ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। দুঃখের বিষয় স্বার্থিক ক-প্রত্যয় হইতে 'খান্' শব্দের উদ্ভব হইতে পারে, এরূপ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত কোন প্রাকৃতব্যাকরণে পাওয়া গেল না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রবন্ধটীতে তিনি প্রসঙ্গতঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে সংস্কৃত ল-বর্ণ হইতে প্রাকৃত ভাষায় ড়-বর্ণের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমাদের জানা প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সমূহে এইরূপ বর্ণবিকারের উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। যথা, সংস্কৃত তাল = হিন্দী তাড়; সংস্কৃত তালী = বাংলা ও হিন্দী তাড়ী; ইত্যাদি।

৺কুমারকৃষ্ণ মিত্র

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল

বঙ্গমাতার যে সব সুসন্তান নানা বিষয়ে বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। হুগলী জেলার বেঙ্গড়া গ্রামের মিত্রগণ বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। সেই বংশের গৌরমোহন মিত্র মহাশয় কলিকাতার আহিরীটোলায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই গৌরমোহন মিত্র মহাশয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর দেওয়ান ছিলেন। এই গৌরমোহন মিত্র মহাশয় কুমারকৃষ্ণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ। কুমার কৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পিতা ক্ষীরোদগোপাল মিত্র স্বাবলম্বী ও অধ্যবসায়ী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ব্রিটিশ এড্মিরেলটী ও জার্ম্মাণ রণতরীসমূহের কলিকাতার একমাত্র এজেণ্ট ছিলেন। তিনি সত্যবাদী, দাতা ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। কালীঘাটে স্নানার্থিগণের জন্য স্নানের ঘাট ও গঙ্গাযাত্রীনিবাস এবং শালিখায় "রাজেন্দ্রেশ্বর শিব" বিগ্রহ ও তৎসংলগ্ন ঠাকুরবাড়ী—তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় পুণ্যাত্মা ক্ষীরোদগোপাল মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৭৬ খৃঃ ২০শে জুলাই কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে কুমারকৃষ্ণের মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাতি ছিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতে ব্যবসায়ে তাঁহার খুব ঝোঁক থাকায় তিনি মাত্র ২০ বৎসর বয়সে কলেজ ছাড়িয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৮৯৬ খৃঃ তিনি Tomas Sinclair & Co. নামে অফিস স্থাপন করিয়া জন সাহেবের সহিত চা-বাগান ও মিলের Stores সরবরাহ এবং বিলাত ও জার্ম্মানী হইতে Stores আমদানী করিতেন। ১৯১৬ সালে তিনি অভ্র (Mica) ব্যবসায়ের পত্তন করেন ও নিজ অধ্যবসায়ের গুণে এই অভ্রের রপ্তানী কারবারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর নানাস্থানে যত অভ্র রপ্তানী হইত তাহার এক চতুর্থাংশ তিনি সরবরাহ করিতেন। তিনি লণ্ডনে একটী ব্রাঞ্চ অফিস করিয়াছিলেন। কুমারকৃষ্ণ বাজারে Mica Prince নামে অভিহিত হইতেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। এই বর্ত্তমান যুদ্ধেও তিনি আমেরিকা ও লণ্ডনে বহু অভ্র-রপ্তানী করিয়াছেন। তাঁহার এই কারবার এক সময়ে এত বড় ছিল যে, মাসিক ৩০,০০০্ টাকা লোকজনের মাহিয়ানা বাবদ খরচ করিতে হইত। এতবড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও কুমারকৃষ্ণ তাঁহার জন্মভূমিকে ভুলেন নাই। তিনি দেশমাতৃকার অকৃত্রিম সেবক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর যখন বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন ও স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ ব্রতে বঙ্গবাসী কৃতসংকল্প হয়েন তখন কুমারকৃষ্ণ "গণেশ ক্লথ মিল" নামে একটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই বাঙ্গালাদেশের কাপড়ের কলের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা; ১৯০১ সালে কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ নিজ বাটীতে প্রথম "স্বদেশী মেলার" উদ্বোধন করেন। কুমারকৃষ্ণ এই মেলার প্রথম প্রবর্ত্তক। বঙ্গের জাতীয় মন্ত্রের প্রথম পুরোহিত সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুমারকৃষ্ণকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। সার সুরেন্দ্রনাথ মেলার সভাপতি ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উহার সদস্য ছিলেন কুমারকৃষ্ণ স্বয়ং সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি মেলার জন্য তাহার বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ উক্ত বাটী ছাড়িয়া দেন ও উহা পরিচালনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন। গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে এই মেলা বন্ধ হইয়া

৺কুমারকৃষ্ণ মিত্র

যায়। কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় জাতীয় কংগ্রেস মহাসভার অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি ১৯১২ সনে এলাহাবাদে নিখিল ভারত-কংগ্রেস কমিটীর বিশেষ অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্যরূপে এবং কলিকাতার প্রতিনিধি হিসাবে সভায় যোগদান করেন। ১৯১৮ সনে দিল্লীতে যখন কংগ্রেস-অধিবেশন হয়, তখন সবেমাত্র মণ্টেগু চেমস্-

ফোর্ড প্রবর্ত্তিত Reform Soheme ভারতে আসে—এই নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতদ্বৈধ হয় এবং নরম (Moderate) ও চরমপন্থী (Extrimist) এই দুই দলের সৃষ্টি হয়। সুরেন্দ্রনাথ নরমদলের নেতৃত্ব লইয়া দিল্লী কংগ্রেস বর্জ্জন করেন। তখন সুরেন্দ্রনাথকে দিল্লীকংগ্রেস অধিবেশনে আনিবার জন্য তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে অনুরোধ করেন। কুমারকৃষ্ণের অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা একটী ঐতিহাসিক কাহিনী। বঙ্গের তথা ভারতের গৌরব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কুমারকৃষ্ণের অতীব অন্তরঙ্গ ও অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার সহকর্ম্মী হিসাবে তিনি দেশের ও দশের সেবা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। কুমারকৃষ্ণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আগ্রহে দেশবন্ধুর বাসভবন আজ "চিত্তরঞ্জন সেবাসদন"রূপে পরিণত হইয়াছে।

কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ও নাট্যামোদী ছিলেন। যৌবনে বিখ্যাত ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত ও যন্ত্র শিক্ষা করেন। তিনি ভারতসঙ্গীত সমাজের সম্পাদক ছিলেন এবং নিজে একজন ভাল অভিনেতা ছিলেন। তিনি বহুবার ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের বিখ্যাত নাট্যশালাসমূহ পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা সহরে বর্ত্তমান রুচিসম্পন্ন একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ১৯২১ সালে সুবিখ্যাত নাট্যকার ৺অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত এ্যাটর্নী ৺সতীশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত গণদেব গাঙ্গুলী প্রমুখ নাট্যামোদী ব্যক্তিবৃন্দ মিলিয়া ষ্টার থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে "আর্ট থিয়েটার" লিঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনব যুগ আনয়ন করেন ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এই থিয়েটার কর্তৃক প্রথম নাটক "কর্ণার্জ্জুন" ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" মহাসমারোহে অভিনীত হইয়া নাট্যজগতের গতানুগতিক ভাবধারার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের সংস্কার উদ্দেশ্যে "করদাতা-বান্ধব সমিতি" গঠন করেন। "যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ" ও "যামিনীভূষণ যক্ষ্মা-হাসপাতালের" প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তিনি এই দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মিত্র মহাশয়ের ধর্ম্মানুরাগ অসাধারণ ছিল। তিনি বেদান্ত, উপনিষদ, ষড়দর্শন, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং "জাগরণ" নামক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি দানে মুক্ত হস্ত ছিলেন—অনেক নিঃস্ব পরিবার ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ক্ষিরোদগোপাল মিত্র মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে আহিরীটোলার বাটীতে প্রত্যহ ৪০জন দরিদ্র ভদ্রলোকের ও ৫জন কাঙ্গালী ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তিনি অনেক সময় নিজে উপস্থিত থাকিয়া এই দরিদ্রনারায়ণের সেবাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইনি অতি সামাজিক, সদাহাস্য ও অমায়িক স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য অতুলনীয় ছিল।

গত তিনবৎসর যাবৎ তিনি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন—সেই অবস্থাতেও তিনি দেশের ও দরিদ্রের সেবা করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। গত ১২ই অক্টোবর তারিখে এই মহানুভব ব্যক্তি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সজ্ঞানে অক্ষয় স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে ও নিমতলা শ্মশানে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুরের কাহিনী

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

বিশ্বের দিকে দিকে আজ মহামায়ার প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা। দশপ্রহরণধারিণী রণরঙ্গিণী, করালবদনা চামুণ্ডা আজ সংহারিণী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা। শোক দুঃখ, হাহাকার, আর্ত্তনাদ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝটিকা, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্য দিয়া চারিদিকে শুধু মৃত্যু মহোৎসব।

সপ্তমী পূজা—হিন্দুর ঘরে ঘরে মহা উৎসবের আয়োজন। হিন্দু নরনারী, বালবৃদ্ধ, কিশোর যুবক আনন্দে আত্মহারা। মা আসিবেন, তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে। মা আসিলেন—স্থূল মূর্ত্তিতেই; কিন্তু এ কি! মায়ের এই ভয়ঙ্করী রূপ কেন? শক্তি-সাধক হিন্দু শুধু জননীকে করুণাময়ী, বরাভয়দায়িনীরূপে ধ্যান করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; পরন্তু তাঁহার সংহারিণী মূর্ত্তিকেও নির্ভীকচিত্তে পূজা করিয়াছে। মায়ের এই রুদ্র আশীর্ব্বাদ এবারও সে নতমস্তকে গ্রহণ করিল।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের একজন দীন সেবকরূপে আজ প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ বহু বন্যা; দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মহামারী ও দাঙ্গাহাঙ্গামায় দুর্গত জনগণের সেবার সুযোগ পাইয়াছি; কিন্তু গত ১৬ই অক্টোবরের প্রবল ঝটিকা ও বন্যার ফলে মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তেমন শ্মশান দৃশ্য আর কখনো দেখি নাই। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহা এক অভিনব ঘটনা।

প্রায় দেড় সপ্তাহপর এই দুর্য্যোগের কথা সর্ব্বপ্রথম আমাদের কর্ণগোচর হয়। এই সময় মহিষাদলের রাজাবাহাদুর একদল অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী কর্ম্মীর জন্য সঙ্ঘের নিকট আবেদন করেন। তদীয় দুস্থ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে তিনি স্বয়ং সাহায্য বিতরণ করিতেছিলেন। ঝটিকার বিস্তৃত সংবাদ তখনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই।

গত ২৯শে অক্টোবর স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ ও আরো দুই একজনকে সঙ্গে করিয়া নদীপথে মেদিনীপুর রওনা হইলাম। পথে তীরবর্ত্তী বিধ্বস্ত কুটীর শ্রেণী ও ভূপাতিত বৃক্ষমালার শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়াই ঝটিকার তাণ্ডবলীলা অনুমান করিয়া লইলাম। ষ্টীমারখানি রূপনারায়ণ নদীতে পড়িলে যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল উহা অতীব মর্ম্মান্তিক। দেখিলাম, শত শত নরনারী শিশু ও গবাদি পশুর বিকৃত মৃতদেহ নদীর প্রচণ্ড স্রোতে অবিরাম ভাসিয়া চলিয়াছে—কোন্ মহাসমুদ্রের উদ্দেশ্যে কে জানে!

বাঁকা ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। পদব্রজেই রওনা হইলাম। দুর্গন্ধে পথ চলা দুষ্কর। খালের স্রোতেও অজস্র মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতেছে; খালের উচ্চ পাড়ে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া কোথাও কোথাও বা ২০।২৫টি করিয়া একত্র স্তূপীকৃত হইয়া আছে। এক স্থানে দেখা গেল ৭টী মৃতদেহ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে। ইহার রহস্য কি?—সহচর জনৈক সন্ন্যাসী জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। জলের প্রবল স্রোতে পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিতে যাইয়াই এই বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান হইল। আর এক স্থানে খালের পাড়ে ডাঙ্গার উপর দুইটী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হইল। উহাদের চেহারা ফুলিয়া এমন বিকট আকার ধারণ করিয়াছে যে, দেখিলে শরীর

রোমাঞ্চিত হয়। আমরা হস্তধৃত দণ্ড সহযোগে মৃতদেহ দুইটী খালের জলে ঠেলিয়া ভাসাইয়া দিয়া আবার অগ্রসর হইলাম। অজ্ঞাতপরিচয় অধিকাংশ মৃতদেহগুলিই গ্রামবাসীগণ এইভাবে জলের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে বলিয়া পরে অবগত হইলাম। খাল অতিক্রম করিয়া সেইগুলিই ক্রমে নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। মৎসাদি জলচর জীব কোন কোন মৃতদেহ ঠোক্রাইয়া খাইয়া সেগুলিকে অধিকতর বিকৃত করিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! একটা শকুনীরও আমদানী হয় নাই! এই বিরাট মৃত্যু মহোৎসবে মহাকাল কি উহাদিগকে আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন নাই? অথবা উহারাও সবংশে কালের কবলে নিপতিত হইয়াছে?

বন্যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে উচ্চভূমি ব্যতীত মাঠ-ঘাট তখনো জলময়। খালের দুইটী পাড় খুব উচ্চ। শত শত নরনারী উক্ত উচ্চভূমিতে আশ্রয় লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। সেগুলি অধিকাংশই ঝটিকা বিধ্বস্ত গৃহগুলির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা জলস্রোতে ভাসমান টুক্রা অংশ দ্বারা নির্ম্মিত।

আমরা সর্ব্বপ্রথম মহিষাদল রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া ঝটিকার আদ্যোপান্ত বিবরণ অবগত হইলাম। শুনিতে পাইলাম, ঐদিন সকাল হইতেই আকাশের অবস্থা ভাল ছিলনা এবং অল্প অল্প বারিপাত হইতেছিল। বেলা আনুমানিক ১০টার সময় হইতে চারিদিক অন্ধকার করিয়া প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে থাকে—মনে হয় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্কর নিনাদে অশনিপাত; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ঝড়। তার উপর সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাস। প্রায় সমস্তদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি একটু কম হয় কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডব প্রায় রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ভীমবেগে চলিতে থাকে। গাছপালা পতিত, ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত ও সহস্র সহস্র মানুষ ও গবাদি পশু বিনষ্ট নয়। ঐদিন রাত্রে নিরাশ্রয় কয়েক সহস্র নরনারী মহিষাদল রাজপ্রাসাদে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজবাটী হইতে তাহাদিগকে চাউল, ডাউল, চিড়া, গুড় প্রভৃতি দেওয়া হয়। অতঃপর রিয়াপাড়াতে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া রাজষ্টেট্ হইতে নিয়মিতভাবে রিলিফ দেওয়া হইতেছিল। রাজা বাহাদুরের অনুরোধে আমি সদলবলে রিয়াপাড়া যাত্রা করি। পথে একদল বুভুক্ষু নরনারীর কাতর আর্ত্তনাদ আমাদের গতিভঙ্গ করিল। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়াই তাহারা বুঝিয়াছে—আমরা কোন না কোন সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী। তাহারা আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়া সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করিতে লাগিল। পরিধানে তাহাদের শতধা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, কেহবা কৌপীন সম্বল; ক্ষুধায় তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। আমরা সাহায্যার্থীদিগকে রিয়াপাড়া সেবাকেন্দ্রে উপস্থিত হইতে নির্দ্দেশ দিয়া অগ্রসর হইলাম।

মাঠের জল তখনো একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। সেই জলে মানুষ ও গবাদি পশুর গলিত মৃতদেহ ভাসমান। গ্রাম পরিদর্শন কালে এই গর্ত্তগুলি গামছা পরিয়া সাঁতরাইয়া পার হইতে হইত। ইহাতে জলে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইত তাহা দ্বারা পচা জলের দুর্গন্ধ এত অধিক পরিমাণে নির্গত হইত যে মনে হইত যেন ভিতরের নাড়ি-ভুঁড়ি সব উলটাইয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ সন্নিকটস্থ কোন পুষ্করিণীতে স্নান না করিলে নিস্তার নাই। এই ভাবে দিনে প্রায় ৬।৭ বার স্নান করিতাম।

রিয়াপাড়া পৌঁছিয়া প্রথমেই গ্রামখানির অবস্থা পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম। গ্রামটী বেশ বড়—কিন্তু অধুনা শ্মশানে পরিণত। মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ লোক কাঁচা ঘরে বাস করে। বন্যার বেগে ঘরের দেওয়ালগুলি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং আংশিক গলিয়া গিয়া মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। দুই একখানি ঘর যাহা দাঁড়াইয়া আছে তাহাও এমন ভাবে ফাট ধরিয়া আছে যে উহার ভিতর বাস করা আদৌ নিরাপদ নহে। যাহারা দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া উহার ভিতর বাস করিতে গিয়াছে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাহাদেরই জীবন বিপন্ন হইয়াছে। বন্যার প্রায় ১৫ দিন পরেও আমরা এইরূপ দুর্ঘটনার কথা প্রায়ই লোক মুখে শুনিতে পাইতাম। বন্যার প্রায় ১০।১১ দিন পরে একটি গ্রামের জনৈক পোষ্টমাষ্টার পরিবারের ৬।৭ জন লোকসহ মাটির ঘর চাপা পড়িয়া রাত্রিতে নিদ্রা ঘোরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহা হউক গ্রামের অন্যান্য অবস্থা

মেদিনীপুরে ঝড়ে ভগ্ন একটি শিবমন্দির
ফটো—ভারত সেবাশ্রম সংঘ

পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে আরো তিনটী বিশেষ কার্য্য হইল—(১) মৃতব্যক্তি ও গবাদি পশুর সংখ্যা নির্ণয় (২) বিপন্নগণের মধ্যে প্রাথমিক সাহায্য বিতরণ ও (৩) যাহাদিগকে স্থায়ীভাবে সাহায্য করিতে হইবে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত। এই উদ্দেশ্যে অতঃপর আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

আমরা দুই সপ্তাহে প্রায় ৮৬খানি গ্রাম পরিদর্শন করি। সর্ব্বত্র একই দৃশ্য—শুধু ধ্বংসের মর্ম্মন্তুদ নিদর্শন; কোথাও বিক্ষিপ্ত, কোথাও বা স্তূপীকৃত। কোন কোন স্থানে পাকা বাড়ীরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। গেঁয়োখালিতে একটা প্রকাণ্ড শিবমন্দির বন্যার স্রোতে চূর্ণীকৃত হইয়াছে; রূপনারায়ণ নদীর কূলে চড়াতে একটা পাকা বাড়ী এমন ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে যে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ইটের পাঁজা ভিন্ন সেখানে আর কিছুই নাই। সমুদ্রোপকূলের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। সেখানে এমন ধ্বংস লীলা সংঘটিত হইয়াছে যে, কোন কালে উক্ত অঞ্চলে মানুষের বসতি ছিল বলিয়া মনে হয় না।

এই দুর্য্যোগে কত লোক ও গবাদি পশুর প্রাণহানি ঘটিয়াছে তাহা সঠিক বলা কঠিন। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—আনুমানিক ১০ সহস্র মানুষের প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। স্থানীয় লোকের ধারণা মৃত মানুষের সংখ্যা অন্যূন ৩০ সহস্র, কেহ কেহ ৪০ সহস্রের কথাও বলেন। সরকারী রিপোর্টের সহিত স্থানীয় লোকের মতের এত পার্থক্য কেন? কারণ এই দুই-এর মতই আনুমানিক। বর্ত্তমানে সরকার পক্ষ হইতে বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ জরিপের আয়োজন চলিতেছে। সরকারের এই উত্তম প্রশংসনীয়।

ইহা দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ ও মৃতের সংখ্যা নির্ভুল ভাবে প্রতিপন্ন হইবে। সরকার পক্ষ হইতে আমরা ইহাই প্রত্যাশা করিতেছিলাম। আমরা কতকগুলি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা পাইয়াছি। যথাসম্ভব নির্ভুলভাবেই উক্ত সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। তবে পুনর্গণনা করিলে কিছু কিছু ব্যতিক্রম হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

একটি গ্রামের মৃতব্যক্তির মানুষ সংখ্যা ৩২জন। এই গ্রামে একটা পরিবারে একটী অল্প বয়স্ক বালক ব্যতীত কেহই জীবিত নাই। অন্য একটী পরিবারের ৮জন লোকের মধ্যে সকলেরই প্রাণান্ত ঘটিয়াছে। আর একটি গ্রামের মৃতব্যক্তির সংখ্যা ৯১জন। নন্দীগ্রাম থানার মাত্র ৮, ৯, ১০ ও ১১ নং ইউনিয়নে অনুসন্ধান করিয়া মৃতের সংখ্যা এই পর্য্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে উহা ৪০০শতের কিছু বেশী।

গবাদি পশুর মৃত্যুর কোন হিসাব-নিকাশ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহাদের আনুমাণিক সংখ্যা শতকরা ৯০টী।

মোট ২৮টী গ্রামে ১৫৮০টী গোধন বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতেই সমগ্র বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা অনুমান করা যায়।

মৃতদেহগুলি লোকালয় হইতে খাল ও নদীপথে যথাসম্ভব শীঘ্র অপসারিত হয়, কিন্তু একটি খালের চড়াতে সাতশত মানুষ ও গবাদি পশুর মৃতদেহ বহুদিন পর্য্যন্ত আটকাইয়া ছিল।

বন্যা ও বাত্যার ফলে ঘরবাড়ীর যেমন ক্ষতি হইয়াছে তেমনি গৃহের আসবাব পত্র ও সঞ্চিত ধান্য বা চাউল হয় ভিজিয়া গিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, না হয় ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে—ঠিকানা নাই। শত শত নরনারী বিয়োগ-বেদনাকাতর, সহস্র সহস্র লোক সহায়-সম্বলহীন, লক্ষ লক্ষ লোক নিরন্ন, পথের কাঙ্গাল, অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীর্ণ-কঙ্কালসার, পরিধানে ছিন্নবাস—কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করিয়া আছে। লক্ষ লক্ষ তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে কাতর আর্ত্তনাদ! বাহির হইতে কোন জিনিষের আমদানী নাই, হাট-বাজার বসে না। এই অবস্থায় পয়সা থাকিলেও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিলে না। এমন কি নৌকার অভাবে আমাদের সংগৃহীত তণ্ডুল ও বস্ত্র বহুদিন পর্য্যন্ত গুদামেই আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট হইতে কয়েকখানি নৌকার অনুমতি পাওয়ায় সে অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলের প্রবল উচ্ছ্বাসে শস্যাদি বিনষ্ট প্রায়। উচ্চ ভূমির ধান্য কিছু কিছু পাওয়া যাইবে; কিন্তু যে সকল নিম্নভূমিতে লবণাক্ত জল এখনো পর্য্যন্ত আটকাইয়া আছে সেই সকল ক্ষেত্রের শস্য এক আনাও পাওয়া যাইবে না। গবাদি পশু নির্বংশ হওয়ায় শিশুদিগের আহার্য্য দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে মাতৃবক্ষে স্তন্যধারা শুষ্কপ্রায়! কি নিদারুণ অদৃষ্টের পরিহাস!
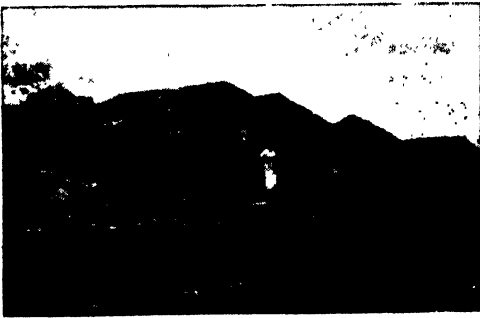
রূপনারায়ণ নদের চরে বন্যার স্রোতে ভগ্ন পাকাবাড়ী
ফটো—ভারত সেবাশ্রম সংঘ

প্রত্যহ দিবারাত্র জলকাদা ভাঙ্গিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সদলবলে পরিভ্রমণ করিয়া এই শ্মশান দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। কেহ কেহ শরীরের উপর এতটা অত্যাচার করিতে নিষেধ করিলেন—কিন্তু নিজ শরীর রক্ষার প্রশ্নটাকে তখন কিছুতেই প্রাধান্য দিতে পারি নাই। আহার-নিদ্রার কিছুরই প্রায় ঠিক-ঠিকানা রহিল না। কোন কোনদিন রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত বিলের মধ্য দিয়া গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছি। গভীর রাত্রি—চারিদিক নিঝুম; ঝিল্লীরব—নিস্তব্ধ; ভেকেকণ্ঠের উৎকট চীৎকার মন্দীভূত; শিবাকুল মৌন। আমরা মহাশ্মশানের সহিত শিবাকুলের কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু যেখানে শৃগালের আনন্দ কোলাহলও বিরল—তেমন শ্মশান কে কবে কল্পনা করিয়াছে? মেদিনীপুরে উহাই এইবার প্রত্যক্ষ করিলাম।

যাহা হউক, বন্যা ও ঝটিকার ফলে উক্ত অঞ্চলের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে উহা বিবেচনা করিয়া শুধু একখানি গ্রামে সহস্র সহস্র টাকা দিলেও সেক্ষতি অপূরণীয়। যে কোন সেবাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষেই উহা অসম্ভব। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হইল—কেমন করিয়া এই লক্ষ লক্ষ দুর্গত নরনারী—যাহারা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সহিত সংগ্রাম করিয়া এখনো বাঁচিয়া আছে—তাহাদিগকে অন্ন, বস্ত্র ও পানীয় জল সরবরাহ করিয়া কোন প্রকারে বাঁচাইয়া রাখা যায়। হেড অফিস হইতে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ আসিতে লাগিল—স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপনপূর্ব্বক নিয়মিত সেবাকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিতে। ৯ই নভেম্বর তারিখে মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলাতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া এক আলোচনা বৈঠক বসে। উহাতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটী, হিন্দুমহাসভা ও নববিধান রিলিফ মিশন মেদিনীপুরে সেবাকার্য্যের অনুমতি পাইয়াছেন। কাহারা কোন অঞ্চলে কার্য্য করিবেন উহারও সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থা অনুসারেই বর্ত্তমানে সেবাকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

বর্ত্তমানে উক্ত অঞ্চলে প্রধানতঃ বাসস্থান, অন্ন, বস্ত্র ও পানীয় জলের সমস্যা উদগ্র। গত ১০ই নভেম্বর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ মেদিনীপুরের বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন ও সঙ্ঘের সেবাকেন্দ্রসমূহ তত্ত্বাবধান করিতে গমন করেন। তিনি গেঁওখালি পৌঁছিয়া স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট অনন্তকুমার দাস, ডি-এস-বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃপাসিন্ধু মাইতি ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পঞ্চানন দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া কয়েকখানি গ্রাম স্বয়ং পরিদর্শন করেন। উড়িষ্যা ক্যানেলের উচ্চ বাঁধের উপর তিনি প্রায় ২০টী পরিবারকে তখনো নিরাশ্রয় অবস্থায় দেখিতে পান। একটি গ্রামে তিনি যে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া প্রত্যক্ষ করেন উহা সত্যই অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। দ্বিপ্রহরে উক্ত গ্রামে পৌঁছিয়া তিনি জনৈক মুসলমান পরিবারের গৃহে দেখিতে পান উক্ত পরিবারের ৫ জন লোকের দুই বেলার জন্য মাত্র অর্দ্ধ সের চাউল প্রচুর জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া বার্লির মত তরল করিয়া পাক করা হইয়াছে। সেক-পত্নী উক্ত মণ্ড আনিয়া স্বামীজীকে দেখায় এবং সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করিতে থাকে। উক্ত গ্রামের আর একটী মুসলমান পরিবারের ৮ জন লোককে তিনি চিংড়ি মাছ পোড়াইয়া খাইতে দেখেন। সংবাদ লইয়া জানিতে পারেন—ঐ দিন তাহাদের আর কিছুই জোটে নাই। আর একটী পরিবারের ৫ জন লোককে কচুর শাক ও জনৈক বৈষ্ণবকে ৫ জন পোষ্যসহ তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতে দেখেন। এইরূপ অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া উক্ত গ্রামে কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়াছে এবং এই পর্য্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। স্বামীজী উক্ত গ্রামের কয়েকটী দুস্থ পরিবারের পুরুষদিগকে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ও স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের জামা পরিয়া থাকিতে দেখেন। যুবতী বউঝিদের অবস্থাও একই প্রকার। ঊর্দ্ধবাসের অভাবে সচরাচর তাহারা বাহিরে বাহির হয় না। এই দৃশ্য প্রত্যেক গ্রামেই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

অন্ন ও বস্ত্রাভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পুষ্করিণীর জল লবণাক্ত; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছপালা পড়িয়া ও মৃত পোকা মাকড় পচিয়া উহা অধিকতর পূতিগন্ধময় ও অস্পৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে। ৩।৪ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামে কচিৎ দুই একটী ভাল পুষ্করিণী বা নলকূপ দেখা যায়। Irrigation Dept-এর জনৈক অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট অবগত হইলাম—উক্ত অঞ্চলে সাধারণতঃ ৩০০।৩৫০ শত ফিট গভীর না করিলে কোন নলকূপেই সুমিষ্ট জল সহজলভ্য নয়। বর্ত্তমান যুদ্ধপরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক নলকূপ খনন অসম্ভব। ব্লিচিং পাউডার দুষ্প্রাপ্য। পুষ্করিণীর জল সংশোধনের উপায় কি? কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত শিবকালী নগরে সঙ্ঘের যে সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে উহার ভারপ্রাপ্ত স্বামীজীর নিকট শুনিলাম যে উক্ত অঞ্চলে কয়েকটী পুষ্করিণীর জল সেঁচিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল—কিন্তু উহা কার্য্যকরী হয় নাই। কোন কোন অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট নৌকাযোগে পানীয় জল সরবরাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু এইভাবে কয়জনের অভাব কতটুকুই বা দূর করা সম্ভব? অথচ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে কলেরাদি সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপকভাবে দেখা দিবে—আমরা সেই দুর্ভাবনাতেই অস্থির হইয়া পড়িতেছি। দেশের সহৃদয় জনসাধারণ যদি দুই একটী করিয়া নলকূপ খননের ভার বহন করেন তবে খুবই উপকার হয়।

যাহা হউক গত ৯ই তারিখের ব্যবস্থা অনুসারে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার ২টী ইউনিয়ন, মহিষাদলের একটী ও নন্দীগ্রাম থানায় আর একটী ইউনিয়নে কার্য্য করিবার ভার পাইয়াছেন। গেঁয়োখালি, হোরখালি, দুর্গাচক, বাণেশ্বরচক, কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র দুর্গত নরনারীকে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে তণ্ডুল, বস্ত্র, কম্বল, মাদুর, ঔষধপথ্য প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। স্বামী যোগানন্দজী ও মুক্তানন্দজীর নেতৃত্বে একদল সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবক উক্ত কেন্দ্রগুলি পরিচালন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত ২৪ পরগণা জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বিধ্বস্ত অঞ্চল কাকদ্বীপ থানার শিবকালী নগরে একটী ও উড়িষ্যার জলেশ্বর থানার ৮, ৯, ১০ নং ইউনিয়নে ও ভগরী থানার ৮নং ইউনিয়নে অনুরূপ কার্য্য চলিতেছে। সঙ্ঘ-সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দজী স্বয়ং ঘুরিয়া ঘুরিয়া উক্ত কেন্দ্রগুলির কার্য্য পরিদর্শন ও কর্ম্মীগণকে সময়োপযোগী উপদেশ ও নির্দেশ দিতেছেন।

উক্ত সেবাকার্য্য দীর্ঘকাল চালাইতে হইবে। তজ্জন্য প্রতি সপ্তাহে সহস্র সহস্র টাকার আবশ্যক। আমরা জনসাধারণের নিকট হইতে যে সাহায্য পাইতেছি—প্রয়োজনের তুলনায় উহা নগণ্য। আশাকরি,

ঝড়ের পর গৃহের অবস্থা ফটো—ভারত সেবাশ্রম সংঘ

সহৃদয় দেশবাসীগণ লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ভ্রাতাভগ্নীর দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া যথাকর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইবেন। জাতির এই দুর্দ্দিনে ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিলে অর্থকৃচ্ছতার অজুহাত থাকিবে না। আমরা সকলে যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে এইরূপে আর্ত্তত্রাণের দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করি, তবেই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্-ডি

(৩)

এইখান হইতে পূর্ব্বস্মৃতি-রোমন্থনের চক্রাবর্ত্তনে আখ্যায়িকার অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়াছে। কোনরূপ মুখবন্ধ না করিয়া পরিবর্ত্তনের কোন সূচনা ব্যতিরেকেই আখ্যায়িকা আবার পিছন ফিরিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রথম পরিচয় ও মিলনের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে।* দীন চণ্ডীদাসের সংগৃহীত পদাবলীতে এই অত্যাবশ্যক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। মণীন্দ্রবাবুর ১০২ ও ১০৩ সংখ্যক পদের মধ্যে যে বিরাট ঘটনা-গত ব্যবধান আছে তাহা পূরণ করিবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম পরিচয় না ঘটিলে গোষ্ঠলীলায় মধ্যে তাঁহাদের যে প্রণয়বিলাস বর্ণিত হইয়াছে তাহার সংঘটন অসম্ভব। সুতরাং ১০২ ও ১০৩ পদের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রথম-পরিচয়-সূচক কতকগুলি পদের অস্তিত্ব-কল্পনা আখ্যায়িকার ক্রম-পরিণতির দিক দিয়া অপরিহার্য্য। ভাবা ও পরিকল্পনার দিক দিয়া নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস-পদাবলী হইতে আহৃত ও মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে সন্নিবিষ্ট ৬৭৬-৭১৩ সংখ্যক (উচ্ছ্বসিত রূপবর্ণনার কয়েকটী পদ বাদ দিয়া) প্রায় ৩০টী পদ দীন চণ্ডীদাসের প্রতি আরোপিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় ও ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যের হিসাবে ১০২এর পরে ইহাদের স্থান-নির্দেশ সঙ্গত। এই কয়েকটী পদে বর্ণিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ হঠাৎ রাধিকাকে দেখিয়া তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইলে তিনি সুবলকে তাঁহার মনের কথা জানাইয়াছেন ও সুবল বাজিকর বেশে বৃকভানুপুরে গিয়াও রাধাকে দশ অবতারের ছায়াচিত্র দেখাইয়া নায়িকার মনে নায়কের রূপ গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়াছে। আবার সুবল অপগত-মূর্চ্ছা রাধিকাকে যমুনা-স্নানের উপদেশ দিয়া নায়ক-নায়িকার প্রথম-দর্শনের সুযোগ দিয়াছে ও পরবর্ত্তী ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। ৭১৩ পদে 'সূর্য্য-পূজা ছলে আনি মিলাইব' ইত্যাদি উক্তিতে আখ্যায়িকার ভবিষ্যৎ পরিণতির ইঙ্গিত আছে বলিয়া এই পরিচ্ছেদটাকে আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু বনপাশ পুঁথির ৮৯৩ পদ হইতে যে অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবরণ পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ণমাসী মিলনের প্রধান উদ্যোক্ত্রী; স্নানার্থিনী রাধা যমুনা-তীরবর্ত্তী এক উপবনের মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া উদ্যান-স্বামীর পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন ও পূর্ণমাসী কৃষ্ণকে বনদেবতা-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া

তাঁহার অলৌকি-রূপৈশ্বর্য্যের এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়াছে। পূর্ণমাসী মুগ্ধা রাধিকার নিকট নিম্নলিখিতভাবে সেই বনদেবতার রূপবর্ণনা করিতেছে।

এমন বরণ যেন নবঘন
মেঘের আকার হয়।
কোটি আঁখি ভরি যদি নিরখএ
তবু (?) সে লখিল নয়॥
কাম কোটি নিছি যাহার বরণ
কত লাখ কোটি চান্দে।
অথির হইয়া যত বিধুবর
চরণ ধরিয়া কান্দে॥
... ...
আর বলি তার মউরিয়া পাখী
তাহার আনিয়া পুচ্ছ।
মালতি দুসারি বেড়ি নানা দামে
তাহাই পরয়ে উচ্চ॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
বাজন নূপুর পায়।
আর আছে হাতে একটী মুরলী
মন্দ মধুর গায়॥ (৮৯৫)

কৃষ্ণনাম প্রথম শ্রবণে রাধিকার ধ্যান-তন্ময় অবস্থা পরবর্ত্তী পদে বর্ণিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধের ফলে পূর্ণমাসী কৃষ্ণমূর্ত্তি পটাঙ্কিত করিয়া রাধাকে দেখাইয়াছে। এই মূর্ত্তি বর্ণনা গতানুগতিক প্রথা অতিক্রম না করিলেও উচ্চাঙ্গের কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন।

কে ইহা গড়ল অঙ্গ নিরমল
রসেতে নাহিক ওর।
হেন লয় মন লুবুধ মানস
চাহেন (?) করিতে কোর॥
মধু কি মিশায়্যা দিয়াছে ঢালিয়া
শ্রী অঙ্গে যেমত মাখি।
যেন নবঘন কিবা নীলমণি
তেমত পাইয়ে সখি॥
যেন মরকত মুকুর আকৃতি
কানড় কুসুম কিবা।
লখিতে কি লখি পুন শুন সখি
এই কিবা নরদেবা॥
... ...
কোনখানে নাহি নিন্দুক এ দেহা
চৌয়স কপাল ভালি।
কত সুধা যেন গাগরি ভরিয়া
দিয়াছে অঙ্গেতে ঢালি॥
যেন খগ পাখি (?) জিনিয়া নাসার
অধিক উপমা দেখি।
সরোরুহ জিনি দেখিয়ে তেমনি
সজল নয়ন (?) আঁখি॥
বাহু দেখি যেন করি-কুম্ভ সম
মধুর ভঙ্গিম অতি।
চণ্ডিদাস বলে এই সে ত্রিভঙ্গ
ইঁহো সে জগতপতি॥ (৯০৩)

চিত্রপট দর্শনে রাধার

"হেন মনে লয় এরূপ মাধুরী
অঞ্জন করিয়া পরি॥
নয়নের কোনে নাহি ধরে রূপ
রাখিতে নাহিক ঠাঁই।
ওরূপ হৃদয়ে কত বা রাখিব
আন স্থান মোর নাই॥"
"ঐছন প্রেমের অঙ্কুর জন্মিল
এ কথা না জানে কেহ।
শুপতে দেখল চিত্রপট পরে
হইয়া কুলের বহু॥" (৯০৪)

এদিকে যেমন রাধার দর্শনোৎসুক্য বাড়িতে লাগিল, সেইরূপ কৃষ্ণও একদিন 'জাবট যাইতে' অকস্মাৎ 'যেমন বিজুরি চমকে মেঘেতে' রাধার রূপ দর্শন করিয়া 'সবা হতে মরমে মরমি' সুবলকে নিজ মনোবেদনা জানাইলেন। দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকাতে সুবলের প্রতি প্রাধান্য-আরোপ একটা অপরিবর্ত্তনীয় বৈশিষ্ট্য। সুবল আবার পূর্ণমাসীর শরণাপন্ন হইতে সখাকে উপদেশ দিয়াছে। রাধার রূপবর্ণনাও প্রথানুযায়ী হইলেও কাব্যসৌন্দর্য্য-মণ্ডিত ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের নিগূঢ় ইঙ্গিতে গতিশীল ও প্রাণবান।

বেড়ি কালজাদ বেণীর বন্ধনে
সন্ধান লাখেক অলি।
ফুলের সুগন্ধ পাই মধুকর
উড়ি উড়ি ফিরে ভালি॥
সোণার খোপনা তাথে ঝাপাবলি
দুলিছে পিঠের মাঝে।
তা দেখি আকুল চিত্ত বেয়াকুল
নাচে মনমথ রাজে॥
দোসারি মুকুতা সিঁথার খেচনি
মণি মাণিকের চুণি।
সরস কপালে সিন্দুর-রচনা
চান্দ মুখ শোভা ভালি॥
তার মাঝে মাঝে মলয়ের বিন্দু
কি তাহা কহিমু রঙ্গ।
বিধুরে বেড়িয়া তারার গাঁথুনি
চান্দ লাজে দিছে ভঙ্গ॥
...
কটাক্ষ চাহিতে চিত নহে থির
মনোমথ-মাঝে ডুবে।
না পাই সাঁতার উঠু ডুবু করি
তোমারে কহিল এবে॥
সে রস চাহনি কিবা সে লাবণি
নয়ন চঞ্চল রাগে॥
হিয়ার পুতলি মরম যেখানে
সেখানে যাইয়া লাগে॥
রাতুল চরণ যেমন যাবক
তাহাতে নূপুর সাজে।
যেন রাজহংস গমন মাধুরী
কত রাগ-ধ্বনি বাজে॥
... ...

(৯১১)

স্নানকালে যমুনা-তটে নায়ক-নায়িকার প্রথম দৃষ্টি-বিনিময় ঘটিয়াছে। এখানে কিন্তু নায়িকার অবগাহন-স্নিগ্ধ, সিক্ত-বসনান্তরালে সমধিক-স্ফুরিত দেহ-লাবণ্যের কোন পূর্ব্বরাগ-সুলভ ভাবোচ্ছ্বাসময় বর্ণনা নাই ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রেমিকের সৌন্দর্য্য-মত্ত ভাবাবেগের দ্বারা ক্ষুণ্ণ ও

খণ্ডিত হয় নাই। বোধ হয় পূর্ব্বে কোন স্থলে এরূপ উচ্ছ্বাস অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়া কবি এখানে অপ্রত্যাশিত সংযম অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম দর্শনের ফলে উভয়ের, বিশেষতঃ নায়িকার ভাব-মুগ্ধতা ও হৃদয়-ব্যাকুলতা বিশেষ ভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছে।

"দোঁহে দোঁহাপরি দিঠি পরশল
লাগল মরমে তায় ॥
মরম ভেদল সজল নয়ান
আর কি বারণ হয়।
হিয়ায় হিয়ায় যেমন মিলল
সোণায় সোহাগা পায় ॥
চণ্ডিদাস কহে দোঁহার রূপেতে
দোঁহে সে হইলা ভোরা।
নয়নে নয়নে মিলল সঘনে
চেতন নাহিক কারা ॥ (৯১৬)
সই কেন বা লইয়া আল্যে মোরে।
না দেখিয়ে ছিনু ভাল বড় পরমাদ ভেল
মনের মরম কহি তোরে ॥
দেখিতে করিত সাধ শুনিনু বংশীর নাদ
রূপখানি হেরিতে হেরিতে।
নয়নে না ধরে রূপ উঠিল রসের কূপ
নয়ন-চাতক চাহে পিতে ॥
পাইয়া বিধুর লাগ চকোরের মনে রাগ
যেন শশধরের কারণ।
তেমত আমার মন পিতে চাহে সর্ব্বক্ষণ
শুন সখি মনের কথন ॥
... ...
মধুর মুরলী যবে মরমে পশিল তবে
যেন দংশে সে কাল সাপিনী।
বহু ভাগ্যে আনু ঘর না চিনি আপন পর
ঘরে যাত্যে পথ অকুরাণী ॥ (৯১৭)

প্রথম প্রেমের মধুর আত্ম-বিস্মৃত ভাবের কি চমৎকার অভিব্যক্তি! নায়কের চিত্ত-বিক্ষোভ অপেক্ষাকৃত মৃদুতর গুঞ্জরণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। (৯১৮)

বংশীধ্বনি এই রূপ-বিহ্বল তন্ময়তাকে ঘনীভূত করিয়াছে। আর একদিনের কাহিনী।

কনক গাগরী লইয়া সুন্দরী
চলল সিনান-রঙ্গে।
কানুর চরিত্র গুণকথা কিছু
কহেন সখির সঙ্গে ॥
কি রূপ-মাধুরী মোরে দেখাইলে
সে দিন অবধি মোরে।
যমুনার ঘাটে আসিতে সদাই
হেন মন মোর করে ॥
নবঘন বেশ হিয়াতে পশিল
স্বপনে দেখিয়ে কালা।
লুবুধ চরিত্র কিবা না হইল
তোমারে কহিল জ্বালা ॥
মনোহর চূড়া তাই মনে পড়ে
মধুর বঙ্কিম হাসি।
দূতের সমান বেকত করিয়া
কাণে কথা কহে বাঁশী ॥
ভাবিতে গুণিতে সে রূপ মাধুরী
আইল নয়নে ঘুম।
হেনক সময়ে সেই সে মুরলী
শুনিতে লাগিল ভ্রম ॥
চণ্ডিদাস বলে নবোঢ়া রসের
এখন পুষ্টিত নয়।
পরিচয় ভেল না হএ মিলন
তবে পরিতোষ হয় ॥ (৯২২)

বাঁশী অচেতন পদার্থ হইয়া কিরূপে দূতিপণা করে, রাধিকা এই প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সখী বংশীর পৌরাণিক উৎপত্তি-কথা শুনাইয়াছে। দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনকালে যে সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী 'এক করে সুধাভাণ্ড, বিষ-পাত্র ধরি আর করে' সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। পৌরাণিক সঙ্কীর্ণ আবেষ্টন হইতে মুক্ত ও উর্ব্বশী নামে অভিহিত যে ভুবনমোহিনীর জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবের বিকশিত বাসনা-শতদলের উপর সনাতন ও সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠা-বেদী রচনা করিয়াছেন, ভক্তিরস-বিহ্বল বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাস তাহাকেই মুরলীরূপে পরিকল্পনা করিয়া তাহাকে চিরসুন্দর শাশ্বত প্রেমিকের ওষ্ঠ-সংলগ্ন ও ফুৎকার বায়ুমন্ত্রিত করিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, সাধনা ও মানস প্রতিবেশের তারতম্যে কবি-কল্পনার কি আশ্চর্য্য ভিন্ন-মুখীনতা!

কৃষ্ণ পূর্ণমাসীকে রাধার প্রতি নিজ গভীর প্রেমের কথা জানাইয়া তাহার সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। পূর্ণমাসী রাধার সহিত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইতে স্বীকৃত হইয়াছে ও রাধা যে ইতিপূর্ব্বেই কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছে। তার পর সে রাধাকে কৃষ্ণের প্রস্তাব শোনাইয়া কৃষ্ণের নিকট আত্ম-নিবেদন করিতে তাহাকে প্রণোদিত করিয়াছে। নায়ক তাহার প্রতি প্রেমে ও নিষ্ঠায় অবিচলিত থাকিবে এই সর্ত্তে রাধিকা প্রণয় প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। (৯৩২)

(৪)

ইহার পরবর্ত্তী পদগুলিতে পারিবারিক প্রতিকূলতার মধ্যে, শাশুড়ী-ননদীর অতি-সতর্ক সন্দেহ দৃষ্টি এড়াইয়া প্রেমিক-প্রেমিকার প্রথম মিলন ও পরবর্ত্তী প্রেমলীলার অগ্রগতি বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলিতে কবি নবোঢ়া, বাসক-সজ্জিতা ও উৎকণ্ঠিতা—নায়িকার ত্রিবিধ অবস্থান্তরের উদাহরণ দিয়াছেন। যুগল-মিলনের কয়েকটী উৎকৃষ্ট পদ এই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (৯৩৬ ৯৩৮)। মিলনের পর ও বিদায়ের পূর্ব্বে পরস্পরের ঐকান্তিক আত্মনিবেদন তাহাদের প্রেমের পরিপূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। বিদায়ের পর উৎকণ্ঠিত রস বর্ণনা উপলক্ষে আক্ষেপানুরাগের সুপরিচিত মর্ম্মস্পর্শী সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

কারে নিবেদিব যেবা করে মন
কি হল্য মরমে মোর।
কি খেনে কুদিনে দেখিনু সেজনে
দরশে হইল ভোর ॥
ক্ষণেক আঙ্গিনা ক্ষণেক বাহির
ক্ষণেক যমুনা তীর।
ক্ষণ করে মন ঘন উচাটন
ক্ষণেক না হই স্থির ॥
আঁখি মুদইতে সদা কানু দেখি
কি হল্য কালিয়া কানু।
ভোজনে বসিলে নিরবধি দেখি
ও নব রসের তনু ॥
ক্ষণেক নয়নে যদি ঘুম আসে
চকিতে ভাঙ্গিয়া যায়

নিশিতে উঠিয়া থাকয়ে বসিয়া
দীন চণ্ডীদাস গায়। (২৪৬)
যে জন না জানে লেহ প্রেমরতি
সে জন আছএ ভাল।
পরের পিরীতি যে জনা কর‍্যাছে
তাহার পরাণ গেল॥
তাথে শ্যামপ্রেমে যেজন ডুবল
অথই রসের সিন্ধু।
লাখেক গুণের কেবল কিঞ্চিৎ
তাহার পাইলে বিন্দু॥
... ...
শুনহ সুন্দরি রাজার কুমারি
যা সনে তোমার মেলা।
গোলক-ঈশ্বর গোলক ত্যজিয়া
করিতে ব্রজেতে খেলা॥
বড় ভাগ্য মানি শুন বিনোদিনি
হইল তো সনে মেলা।
কেন উৎকণ্ঠিত কর বিপরীত
আর সে জানিবে জ্বালা॥
চণ্ডিদাস কহে শুন সুকুমারি
কি তার ভাবনা কর।
কালার পিরিতি কলঙ্কের মালা
হৃদয়ে যতনে পর॥ (২৪৮)

রাধার সহিত পূর্ণমাসীর ঘনিষ্ঠতার কথা সখী-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে—তাহাতে রাধা পাছে তাঁহার গোপন প্রেমের কাহিনী প্রকাশ হয় এই ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কবি মৃদু স্নিগ্ধ পরিহাসে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন :—

কহে চণ্ডিদাস বেকত হইল
গুপত পিরিতিখানি।
বেকত না হল্যে এ সব চরিত্র
আমি কোথা হতে জানি॥ (২৫০)

সখী-প্রবোধাত্মক পদগুলির মধ্যে একটা কবিত্বের দিক দিয়া উল্লেখ-যোগ্য। সখী শ্রীকৃষ্ণের অপরিবর্ত্তনীয় প্রেমনিষ্ঠার কথা বলিয়া রাধার উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতেছে।

গুণ কি নিগুণ না হয় কখন
চান্দ কি তেজয়ে সুধা।
অমিয়া গরল না হয় কখন
শুন সুকুমারি রাধা॥
মধু কি কখন কটু কষায়ন
সুজন কুজন নয়।
বিষধর কভু না হয় অমৃত
আপন স্বভাব হয়॥
ভানু কি শীতল না হয় সরল ?
কটু কি মধুর হয়।
সুজন কখন না হয় বিমুখ
বেদের বিহিতে কয়॥

আয়ানের গৃহ হইতে প্রস্থানকালে একদিন কৃষ্ণের মূর্ত্তি কুটিলার চোখে পড়িয়া গেল। রাধা কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিতেছেন যে গ্রীষ্মাধিক্যে তাঁহার শরীরে যে স্বেদ বিন্দু সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাতেই কুটিলা নিজ মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে কৃষ্ণ মনে করিয়াছে। এ কৈফিয়ৎ ঠিক সন্তোষ-জনক নহে এবং কুটিলাও ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার অবিশ্বাস তীব্র ব্যঙ্গাত্মক বাক্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

জটিলা (কুটিলা ?) তখন কহিতে লাগল
শুনহ আমার বাণি।
আমার আকার ছায়ার বিকার
আমি সে সকলি জানি॥
আমার কোথায় কালিয়া বরণ
আমার কোথায় চূড়া।
আমার কোথায় মুরলী ধুরলী
পিঁধন কটির ধড়া॥
আমার কোথায় পীতের বসন
বাজন নূপুর পায়।
প্রতিবিম্ব বলি করিলে উত্তর
মোরে ভুলাইলে ঠায়॥
কেমত তোমার চরিত্র বিষয়
দেখিয়ে কঠিন ধায়া।
আকাশের চান্দ সুরজ আনিতে
পারহ শতেক তোরা॥
বচন সচন সুমেরু শিখর
নিঃশ্বাসে উড়াত্যে পার।
তোমার চরিত্র দেখিল নয়ানে
কত যেন ছলা ধর॥
আক্ষের-পলকে এ দধিসায়র
লঙ্ঘিয়া যাইতে কি।
তুমি সে পারহ এ সব করিতে
হইয়া রাজার ঝি॥
... ...
এমন বয়সে এতেক চাতুরী
আর সে বয়স আছে।
কোন বা চেতনি কোন গোয়ালিনী
দাণ্ডাবে তোমার কাছে॥ (২৬১)

এই সমস্ত ঘটনা কবি উৎকণ্ঠিতা-রসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ২৬২ পদ শেষ হইবার পূর্ব্বে পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে ও ২৮১ পদের শেষার্দ্ধ হইতে আবার নূতন বিষয়ের অবতারণা লক্ষিত হয়।

২৬৩—২৮০ পদের মধ্যে ছেদ কবি কি ভাবে পূরণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। ২৮১—২৮৫ পদে মনঃশিক্ষা শীর্ষক অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণের অচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ রাধাকে আরাধ্যা দেবীর ন্যায় স্তুতি ও উপাসনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধ যে জন্ম-জন্মান্তরের তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

"বহু অবতারে তোমার মহিমা
জানিতে নারিয়াছি।
কাল সে বরণ ধরিয়া যতনে
জনম লভিয়াছি॥
তোমারে ভাবিতে কাল তনুখানি
এ দেখ কালিয়া দেহ।
কালিয়া বরণ তখির কারণ
এ কথা না জানে কেহ॥
চণ্ডিদাস বলে অদ্ভুত কথা
পুরাণ অনেক সাঁচি।
ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত নিগূঢ় আখ্যান
তুলিল অধ্যায় বাছি॥ (২৮২)

কবি রাধাকেও কৃষ্ণ-সেবা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এ পদগুলি আধ্যাত্মিকতার উঁচু সুরে বাঁধা

(৫)

৯৮৬ পদ হইতে 'রসোদগার' অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ও ১০০০ পর্য্যন্ত ইহারই আলোচনা চলিয়াছে। এই পদগুলি ভাব-গভীরতা ও কবিত্বশক্তির দিক দিয়া উচ্চাঙ্গের। ইহারা চণ্ডীদাসের অনুরূপ সুপরিচিত পদাবলীর সহিত একই শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবার উপযুক্ত। রাধা নায়কের সন্ত-উপভুক্ত অপরিমিত আদর-সোহাগের বর্ণনায় গদ্‌গদ-কণ্ঠে প্রেমের অসহনীয় সুখস্মৃতি রোমন্থনের প্রক্রিয়ায় যেন তীব্র জ্বালাময় বেদনায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

নাগর চতুর রসিক রায়।
বুক চিরি মোরে থুইতে চায়॥
হিয়ার পদক যেমত পরে।
অঙ্গের ভূষণ রাখিয়ে মরে॥?
যেখানে আছয়ে আঁখের তারা।
সেখানে রাখিতে করয়ে ধারা॥
পরাণ-পুতলি যেখানে রয়।
সেখানে রাখিতে মনেতে হয়॥
দেখিলে আমারে পরাণে জিয়ে।
রাঁকে ধন যেন পাইলে নিয়ে॥
কত নিধি যেন আঁচলে দেই।
পায়না নাগর আনন্দ থেই॥ (৯৯৬)

আবার

কালি সে গিছিনু যমুনা সিনানে
মাজিতে আছিনু অঙ্গ।
হেনক সময়ে নাগর চতুর
মিলল আমার সঙ্গ॥
একেলা আছিয়ে নাহিক দোসর
কাহারে কহিব কথা।
কূলে দাণ্ডাইয়া মোর পানে চায়্যা
মুরলী পুরল হোথা॥
আকার ইঙ্গিতে নানা ছন্দোবন্ধে
কহেন রসের বোল।
আচম্বিতে আসি নাগর-শেখর
করল আপন কোর॥
ভাগ্যে কোন লোক না ছিল সেখানে
এ কি এ বিষম জ্বালা।
নগরের লোক দেখিলে কি হত্য
উঠিত কলঙ্কমালা॥ (১০০০)

১০০১ পদ হইতে বিপ্রলম্ভ রসের অবতারণা। এই পদ-বিন্যাস-রীতি হইতে বুঝা যায় যে কবি এখন আর ধারাবাহিক আখ্যায়িকা বিবৃতির কার্য্যে সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি এখন আখ্যান ছাড়িয়া রস-আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক মাথুরের পর আখ্যান-বস্তু নিঃশেষ হইয়াছে। দূত-প্রেরণ-পরিচ্ছেদ প্রকৃত পক্ষে আখ্যায়িকার বিবৃতি নয়; ইহা পূর্ব্বস্মৃতি পর্য্যালোচনা ও বিরহ-ব্যাকুলতার পূর্ণতর প্রকাশের উপায় মাত্র। আখ্যায়িকা-সূত্র ৮৯৩ পদ হইতে ছিন্ন হইয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন রসের কাব্যাস্বাদন আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে পদগুলি মূলতঃ গীতি-ধর্ম্মী! ঘটনা-বিবৃতির বোঝা কাঁধ হইতে নামাইয়া কবি এখন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন ও তাঁহার পদ-বিক্ষেপ দৃঢ়তর ও স্বচ্ছন্দতর হইয়াছে। যে সংযোজক সূত্রগুলি ধারাবাহিক আখ্যায়িকার প্রধান লক্ষণ সেগুলির নিদর্শন আর মিলে না। কাজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সংক্রমণ আর তথ্য-বিবৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যদৃচ্ছা-প্রণোদিত। গীতি-কবিতার প্লাবনে আখ্যায়িকার দৃঢ় বেষ্টনরেখা বিদীর্ণ ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মণীন্দ্রবাবু তাঁহার পদাবলী-সংস্করণের ভূমিকায় আখ্যায়িকার অনুবর্ত্তনকে চণ্ডীদাসের পদের কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতা নিরূপণের যে অভ্রান্ত মানদণ্ডরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই বিচার-নীতি এই পুঁথির আবিষ্কারের পর অচল হইয়া পড়িতেছে।

১০০১—১০১৬ পদে বিপ্রলম্ভ রস আলোচিত হইয়াছে। ১০১৭ পদের প্রথম তিন পংক্তির পর পুঁথি খণ্ডিত। সঙ্কেত-মাধবীতলে মিলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাধা সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মিলনাকাঙ্ক্ষায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ভগ্নহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছেন। সখীরা রাধার ব্যাকুল অস্থিরতা দেখিয়া কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়াছে ও প্রথমে ললিতা ও পরে রসমঞ্জরী প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের হেতু জানিতে কৃষ্ণের নিকট গিয়াছে। কৃষ্ণ দুই সখীর নিকট দুই রকম কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—ললিতাকে বলিয়াছেন গাভী হারাণোর কথা ও রসমঞ্জরীকে যশোদার জ্বর-বিকারের কাহিনী। উভয় সখীই কৃষ্ণের অনুপম প্রেম সম্বন্ধে বিগত-সংশয় হইয়া ফিরিয়াছে ও রাধাকে সান্ত্বনা দিয়াছে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ১০০৩—১০০৫ পদে, সেই শুকপক্ষী-আহৃত, চারি খণ্ড হইয়া চতুঃসমুদ্রে পতিত ও সমুদ্র মন্থনের দ্বারা পুনরুদ্ধারিত রাধাকৃষ্ণরূপ চতুরক্ষরাত্মক কল্পতরু—ফলের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। এই পদ গুলিতে কবিত্ব-বৈশিষ্ট্য সেরূপ নাই—কোন কোন পদের দুই একটী পংক্তি মাত্র কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ।

সুজন ও কুজনের ব্যবহারগত পার্থক্য কবি একটী নূতন উপমার দ্বারা বিশদ করিয়াছেন।

কুঞ্জর দশন সম বচন না হয় ভ্রম
সুজনের এমত সুবোল।
কুজন বিষের কাঁটা বিষম তাহার লেঠা
কূর্ম্মগ্রীব যেমত সুতোল॥ (১০০১)

রসমঞ্জরী রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ, বিনয়-মধুর ব্যবহারের কথা বলিতেছেন

বহুত বিনতি আদর পিরিতি
কত না কহিব মুখে।
একমুখে তাহা কত না কহিব
বেদনা হইল বুকে।
শুনিতে শ্রবণে মধুর বচনে
সিঞ্চিল আমার দেহা।
হেন মনে ভেল জনমে জনমে
থাকুক তাহার লেহা॥
দাসী হয়্যা রই শুন ওগো সই
সে দুটি চরণতলে।
কত শত শত কলসী ভরিয়া
অমিয়া ঢালিব ভালে॥ (১০১৫)

ক্রমশঃ

ভ্রমরবাসিনী

(চিত্র-রূপিকা)

বাণীকুমার

সূচনা

দেবী মহামায়া যুগে যুগে আবির্ভূতা হ'য়ে ত্রিসংসারকে রক্ষা করেন। তিনি সর্ব্বভূতের জননী। তিনি সর্ব্বমঙ্গলা ভদ্রকালী। তিনি জগতের কল্যাণ ও অকল্যাণ দুই হাতে নিয়ে নৃত্য করেন ব'লে দেবী কপালিনী। তিনি সংসারে জয় আনেন—তাই তিনি জয়ন্তী। তিনি সর্ব্বসংহারিণী কালী। তিনি মহাশক্তি দুর্গা। সকলের অপরাধ ক্ষমা করেন ব'লে তিনি ক্ষমা। তিনি শিবা। সর্ব্বজীবকে ধারণ ক'রে তিনি জগদ্ধাত্রী। তিনি দেবপোষিণী স্বাহা, পিতৃপোষিণী স্বধা। তিনি বিধাতাকে করেন বরদান। তিনি পালনকারিণী মহালক্ষ্মী, জ্ঞানদাত্রী মহাসরস্বতী।

মহাশক্তি দুর্গা বারংবার অসুর সংহার ক'রে অখিল বিশ্বে কল্যাণ এনে দেন। ভগবতী চণ্ডিকাদেবীর বন্দনা-সুর যুগ-যুগান্তর কীর্ত্তিত। মহাদেবী তিন লোককে রক্ষা করবার জন্য নিজ অবতারের সূচনা করেছেন।

মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, দেবী নারায়ণী, দেবী ব্রহ্মশক্তি-রূপা ব্রহ্মাণী, তিনি মাহেশ্বরী-রূপে ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র ও সর্প ধারণ ক'রে আছেন, তিনি নির্ম্মলা কৌমারী-রূপ-ধারিণী। পরমা দেবী বৈষ্ণবী-রূপে বিরাজ করেন শঙ্খ-চক্র-গদা-খড়্গ-হাতে। তিনি সলিল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার ক'রে বরাহ-রূপিণী। তিনি ত্রৈলোক্যত্রাণকারিণী, দৈত্যগণের বিনাশে ধারণ করেন ভীষণ নৃসিংহ-মূর্ত্তি। মহাবজ্রধারিণী তিনি ঐন্দ্রী। তিনি উগ্রা শিবদূতী, নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা, তিনি তমোময়ী নিয়তি।

বন্দনা-গান

নমি নমি কালরাত্রিরূপিণী
করো দেবী বরদান।
কৃষ্ণের তুমি ইষ্ট-সাধনা—
মহেশের যশোমান।
হে মহালক্ষ্মী দেহো বাহুবল,
দেহো জয়, দেহো কর্ম্মে সুফল,
অখিল-জনের তুমি আনন্দ—
অমৃতের সন্ধান॥
ব্রহ্মা-বাসব-বন্দিতা দেবী—
চরণে নমস্কার।
তুমি করো পার চঞ্চল-জল
সংসার-পারাবার।
লোকে লোকে তুমি কান্তিরূপিণী,
ভবনে ভবনে লক্ষ্মীরূপিণী,
জনে জনে তুমি বৃত্তি-রূপিণী,
চিরশরণের স্থান॥

বর্ত্তমানে শ্বেতবরাহকল্পের অন্তর্গত বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগ। এই শেষ কলিযুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই মহাসুর উৎপন্ন হ'বে। দেবী যোগমায়া 'নন্দা'-রূপে এই অসুরদের নিধন করবেন। তারপর 'রক্তদন্তিকা'-রূপে বৈপ্রচিত্ত দানবগণকে করবেন সংহার।—আবার শতবর্ষ ধ'রে অনাবৃষ্টির জন্য পৃথিবী জলশূন্যা হ'বে—সেইকালে 'শতাক্ষী'-রূপে দেবী আবির্ভূতা হ'য়ে সংসারে কল্যাণ এনে দেবেন। এই সময়েই 'দুর্গম'-দৈত্য নিহত হ'বে। তখন দেবীর অবতার 'শাকম্ভরী' নামে অভিহিতা হবেন। এর পর ভীষণা মূর্ত্তি 'ভীমাদেবী' অবতীর্ণা হ'য়ে রাক্ষসদের বিনাশ করবেন। আর দেবীর প্রতিজ্ঞাত শেষ অবতার ষষ্ঠিতম মহাযুগে—অর্থাৎ তিন চার কোটি বৎসর পরে—আবির্ভূতা হবেন। যখন অরুণ নামে মহাসুর ত্রিলোককে প্রপীড়িত ক'রে তুলবে, তখন দেবী অতি অদ্ভুত 'ভ্রামরী'-রূপে প্রকাশ পাবেন। তাঁর দেহ অসংখ্য ভ্রমরে সমাকীর্ণ থাক্‌বে। এই মূর্ত্তিতে অরুণাসুরকে বধ করলে দেবীর নাম হ'বে 'ভ্রামরী'। ইনি বিচিত্র কান্তিমতী ও জ্যোতির্ম্ময়ী। এঁর দেহ তেজের আধার, সহজে দর্শন মেলে না, সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধ-লেপনে মনোহর, আর অপরূপ উজ্জ্বল অলঙ্কারে শোভিত। হাতগুলি নানাজাতির ভ্রমরে পরিপূর্ণ। এঁরই অন্য নাম 'মহামারী'।—দেবী ভ্রামরী বিন্ধ্যাচলবাসিনী। দেবী সেখানে নিত্য উদ্বোধিতা।

স্তব

একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদাস্তুতা।
তেজো-মণ্ডল-দুর্দ্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ।
চিত্রানুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা।
চিত্রভ্রমরসঙ্কাশা মহামারীতি গীয়তে॥

কিন্তু দেবীর প্রকাশ যুগে যুগে হ'য়ে থাকে। তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন। তাঁর লীলা বিশ্বলোকে কৌতূহলের সৃষ্টি করে।—তাই সুদূর অনাগত যুগের সঙ্গে অতীত যুগের যোগ-সাধন করা হয়েছে—ভ্রমরবাসিনী দেবী সম্বন্ধে কাশ্মীরের কবি ও ঐতিহাসিক কহ্লনের এক অপূর্ব্ব আখ্যানে। *

*　　*　　*　　*

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভের কথা।

কাশ্মীরের দ্যূতকর উপমন্যু জীবনে প্রতারিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হ'য়ে বিন্ধ্য-পর্ব্বতে দেবী ভ্রমরবাসিনীর সন্ধান এনে দিলে। সেই সময়ের পূর্ব্ব ঘটনা।—

[সংলাপিকা

* শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত শ্লোক :—

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়-ষট্‌পদম্॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥
ইত্থয়ং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

*　　*　　*　　*

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত এই ভ্রমরবাসিনী দেবী বা ভ্রামরী দেবী সম্বন্ধে কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'র রচয়িতা কহ্লন-কবি এক অপরূপ আখ্যানের উল্লেখ করেছেন। এই আখ্যায়িকাটি মূল সংস্কৃত থেকে গ্রহণ ক'রে সুহৃদ্বর পণ্ডিত শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী নিবন্ধরূপে রচনা করেন। সেই উৎকৃষ্ট রচনা অবলম্বন ক'রে আমার এই 'নাট্য-বিচিত্রা'র প্রয়াস।

এস্থলে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। এই নাট্য-রচনার রীতি একপ্রকার মৌলিক ও নূতন, অনেকটা "Mosaic"-নাট্যের অনুকৃতি, যার মধ্যে তিনটি 'সন্ধি' আছে—'মুখ', 'শীর্ষবিন্দু' ও 'উপসংহৃতি'। এই নাট্যের পর্য্যায় নির্দ্দেশ করা হ'ল "চিত্র-রূপিকা" নামে। আর এইটি হ'ল বেতার-নাটকের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। —লেখক

মাথুর। দেখুন—দেখুন—ম'শায়রা, ঐ উপমন্যুটা দশ দশটা সোনার মুদ্রা জুয়াখেলায় হেরে গেছে, এখন অষ্টরম্ভা দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্চে। ওরে বীরক—ওরে চটুল—ওকে ধর্ ধর্।—আমি হ'চ্চি আড্ডাধারী মাথুর—আমার চোখ এড়িয়ে যাবে কোথা'?

[দূরে অপসরণ

ব্যস্তভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে উপমন্যুর প্রবেশ—

উপমন্যু। ওঃ—কি যন্ত্রণা! দ্যুতকরদের শেষে এই দুর্দ্দশাই ঘটে! আমি উচ্চকুলে জন্মেছি—কিছু ধন সম্পত্তিও ছিল—শুধু এই হতভাগাদের সংসর্গে এসে সব দু'দিনে কর্পূরের মত উবে গেল—কুলে-ও দিলুম কালি। এরা তো আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে নিয়েছে, এখন-ও কি চায়! করি কি! এখন আশ্রয় কোথায় পাই? মাথুর, বীরক—সকলেই আমার পিছু নিয়েছে—আমার এ-ছদ্মবেশ ধ'রে ফেলতে কতক্ষণ—জুয়াড়িদের ঘুঁটিচালা চোখ, যেন বাজপাখীর দৃষ্টি। এই সময় আমি পিছু হেঁটে এই শূন্য দেবমন্দিরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে মন্দিরের ঠাকুর হ'য়ে বসি। ঐ এসে প'ড়লো বুঝি!

মাথুর ও বীরক দ্রুত প্রবেশ করলে—

মাথুর। কোথায় পালালো—উপমন্যু? আমার মত সুজন জুয়া-আড্ডার অধিকারীকে ঠকানো? এই দিকেই তো সে এলো! কই তবুও আমার চোখ এড়ানো কঠিন—স্বয়ং শিবও তা'কে রক্ষা ক'রতে পারবে না। ওকে ফাঁদে ফেলবো দেখ্!—এই তো পায়ের দাগ।—দেখি—দেখি!—আরে—এইখান থেকে উল্‌টো পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করা যাচ্চে।—বুঝেছি—বোধ হয় পিছু হেঁটে ঐ পোড়ো মন্দিরটার মধ্যে ঢুকেছে সেই ধূর্ত্ত।—আচ্ছা—তা'র বুদ্ধির প্যাঁচের ওপর দ্বিগুণ প্যাঁচ কস্‌বো। চল্ সন্ধান করি।

উপমন্যু। ওই—পায়ের দাগ ধ'রে ধূর্ত্তরা যে এইদিকেই আসচে! শেষে কি জুয়াড়িদের হাতে আমার মত ভদ্রসন্তানের অশেষ লাঞ্ছনা আছে!

মাথুর ও বীরক কাছে এগিয়ে এলো

বীরক। আরে—এ-মন্দিরে দেব্‌তা ছিলনা—আজ্‌কে আবার এই নতুন দেব্‌তাটি কোথা থেকে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ো ব'স্‌লো? স্বর্গের নাম-কাটা দেব্‌তা না উপদেব্‌তা! পূজোর নৈবিদ্যি খেতে পায়নি ব'লে—দেব্‌তাটির মুখখানি শুকিয়ে আম্‌সি হ'য়ে গেছে! (আঘাত ক'রে) এটা কি কাঠের মূর্ত্তি?

মাথুর। কই হে দেখি! না হে না—এটা পাথরের মূর্ত্তি। যাক্‌গে—এসো আমরা এইখানে ব'সে জুয়া খেলি। চালো ঘুঁটি!

উপমন্যু। আজ আমি এই জুয়াখেলায় সর্ব্বস্বান্ত। তবু এই 'কর্‌তা—কর্‌তা'-রব আমার মত নির্ধনেরও মন অস্থির ক'রে তুলচে! আর যে ঠিক থাক্‌তে পাচ্ছি না।

বীরক। আমার 'পাঠে'—

মাথুর। আমার 'পাঠে'—

বীরক। না-না—আমার 'পাঠে'—

মাথুর। না হে না—এই আমার 'পাঠে'।

উপমন্যু। যা' থাকে বরাতে—আর থাকা যায়না।—(চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো) কখনো না—আমার 'পাঠে'—!

মাথুর। বারে দেব্‌তা, জুয়ার নেশাও আছে? ফাঁদে পড়েছ যাদু। এই কি সেই লোক্‌টা—বীরক?

বীরক। হ্যাঁ—এই তো সেই লোকটা হে! ধর্—ধর্—পালাবার জন্যে ও-র পা'দুটো চুল্‌বুল্ করছে।

মাথুর। পায়ে দড়ি দিয়ে দিচ্চি, থাম্! জুয়াচোর কোথাকার, এইবারে জালে ফেলেছি। এবার দে' সেই দশটা স্বর্ণমুদ্রা! ফাঁকি দিবি—না? (প্রহার)

উপমন্যু। ওঃ—ওঃ—ছাড়ো—ছাড়ো! আমি সব শুধে দোবো, বল্‌চি। আমার মাথা ঘুরচে! ওঃ—কুলমান জলাঞ্জলি দিয়ে খুব শাস্তি হোলো! আর পারিনা!—এ কি জীবন!—

মাথুর। ওরে মাটি আঁক্‌ড়ে পড়্‌লো যে! আমাদের ফাঁকি দেবার জন্যে শেষে ম'রে যাবে না কি? মতলব সুবিধের নয়—বীরক!—ওরে এই—দেনা শোধ কর্—নইলে—

উপমন্যু। আর কেন? আমার দেহটা বিক্রী ক'রে দাম তুলে নিয়ো।

মাথুর। বলিস্ কি!—দে'—দে' দমাদ্দম্ ঘাড়ে পিঠে! (প্রহার)—ওঃ, আমাদের হাত দু'টো ঝন্‌ঝন্ করচে, ও বেটার পিঠটা যেন পুরু চাম্‌ড়ার জয়ঢাক, যত বাজাও ততই বাজে। আচ্ছা জুয়াড়িদলের কাছে তুই আবদ্ধ থাক্।

উপমন্যু। সে কি? গণিকার উৎকট গন্ধ-দুষ্ট তোমাদের সেই অন্ধকূপে আমাকে বন্দী থাক্‌তে হ'বে? সে যে জীবন্ত-মরণ! এই জুয়াখেলার নিয়ম লঙ্ঘন করা যে দায়—দেখ্‌ছি! এখন সমস্ত হেরে গেছি, অর্থ কোথা থেকে দিই?

মাথুর। তা'হ'লে এক্‌টা বন্দোবস্ত কর্।

উপমন্যু। বেশ—অর্দ্ধেক্ তোমাদের দিচ্চি, আর বাকি অর্দ্ধেক্ ছেড়ে দাও।

মাথুর। কেন? তুমি আমার প্রণয়িনীর পাতানো ভাই নাকি?

উপমন্যু। তোমরা তো আমার সর্ব্বস্ব খেয়েছ, এ-টুকু পার্‌বেনা—মাথুর? বীরক—তুমিও কি আমার কম অর্থ ভোগ ক'রেছ, আজ্‌কে আমার কথাটা ভাবো!

বীরক। আচ্ছা তোমার কথাই থাক্। অর্দ্ধেকই শোধ করো।

উপমন্যু। তা'হ'লে মাথুর—অর্দ্ধেক্ নাও, আর অর্দ্ধেক্ আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক্।

মাথুর। আপত্তি নেই। তাই দাও।

উপমন্যু। মাথুর—তা'হ'লে অর্দ্ধেকটা ছেড়ে দিলে তো?

মাথুর। উপায় কি, পুরোপুরি পাচ্ছি কোথা?'

উপমন্যু। বীরক—তুমিও অর্দ্ধেক্ ছেড়ে দিলে তো?

বীরক। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, নইলে সবখানিই ফাঁকি।

উপমন্যু। বেশ ভালো কথা। তোমাদের কথামতই দেনা-পাওনা সব চুকে গেল। এখন তবে বিদায় নিচ্চি।

মাথুর। অ্যাঁ—যাবে কোথায়? দেনা সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়ে তবে যেতে পাবে।

উপমন্যু। এ কী বিপদ! জুয়াড়ি হ'লেই কি কথার ঠিক

থাকে না। এইমাত্র অর্দ্ধেকের ব্যবস্থা ক'রে ভালো কথায় বাকি অর্দ্ধেক্ থেকে মুক্তি পেলুম, তবু এখনো—তোমরা এই নিঃসম্বলের কাছে দাবী জানাচ্ছো ?

মাথুর। ধূর্ত্ত কোথাকার! আমি তোর চালাকি সব বুঝি। আমার নাম মাথুর—আমাকে ফাঁকি দেওয়া! সোনাগুলো এই মুহূর্ত্তে দে বল্‌ছি।

উপমন্যু। কিন্তু আমার আর এক কপর্দ্দকও নেই।

মাথুর। নিজের কামিনীকে বেচে দেনা শোধ্ কর্!

উপমন্যু। হ্যাঁ—কাঞ্চন গেছে—এবার কামিনীতে লক্ষ্য পড়েছে! তোমরাই ধন্য হ'য়ে থাকো—যতদিন না তোমাদের ধ্বংস হয়! লোভ দেখো ?

মাথুর। তাতো সত্যিই! জেনে-শুনে তবে জুয়া খেল্‌তে এলি কেন ?—তোর সামান্য ধন ঢেলে এতো কাতর হ'য়ে পড়্‌লি!—আমার মুদ্রাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যমের সঙ্গে আলাপ করুগে যা'। নইলে এক পা' আকাশে তুলে দোবো—আর এক পা' মাটিতে বাঁধা থাক্‌বে—বুঝ্‌বি কেমন সুখ!

উপমন্যু। কেমন ক'রে দোবো—তা'তো জানিনা!

মাথুর। বাজে কথা রাখ—উপমন্যু! আমি অতিধূর্ত্তের রাজা মাথুর—জুয়াখেলায় অন্য লোককে ঠকিয়ে ফতুর ক'রে ছাড়ি—আর আমার কাছে চালাকি? বীরক—ও-কে আরও উত্তম-মধ্যম প্রহার দে'!

উপমন্যু। এতোদূর! নীচ দ্যূতকর! পরান্নভোজী কুকুর! চোরের রাজা জুয়াচোর! (দ্বন্দ্ব)

বীরক। ওরে মুখ্যু—তুই আমাকে রাজপথে মার্‌লি, আচ্ছা' কাল আমাকে রাজবাড়ীতে গিয়ে মারিস্, তখন মজাটা দেখ্‌তে পাবি।

উপমন্যু। আচ্ছা—তা' ভালো ক'রে দেখা যাবে।

মাথুর। কেমন করে দেখা যাবে রে—গর্দ্দভ! এই এম্‌নি ক'রে ড্যাবা ড্যাবা চোখদুটো বা'র ক'রে ?

উপমন্যু। হ্যাঁ হে বন্ধু! এই নাও—ড্যাব্‌রা চোখের ওষুধ—! (ধূলি-বৃষ্টি ক'রে পলায়ন)

মাথুর। উরে—বাপ্—চোখে ধুলো দিয়ে পালালো—কি ধূর্ত্ত—কি শঠ—!

উপমন্যু। (দূর থেকে চীৎকার ক'রে) তোরা ধূর্ত্ত—চোর—প্রতারক—!

কথা-সূত্র

কিন্তু কাশ্মীরের এই দ্যূতকর উপমন্যু ধূর্ত্ত দ্যূতকরগণের কাছে প্রতারিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হ'য়ে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়্‌লো। নিঃস্ব অবস্থায় দীর্ঘকাল জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র ভেবে উপমন্যু আত্মহত্যা করতে উদ্যত হোলো। উপমন্যু ছিল সরল-চেতা ও উচ্চকুলজাত—সে একেবারেই নির্গুণ ছিল না। স্নেহ দয়া-মমতায় তার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ, তাই সে এক প্রেমময়ী নারীর অন্তর অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল।—আজ পরের কৃপাপাত্র দরিদ্র উপমন্যু জীবন রাখতে চায় না। সেই ঘটনা—

ঘটনার প্রকাশ

উপমন্যু। মদনিকা—আমার জীবনে ধিক্কার এসেছে। এ-জীবন এখন মনে হচ্চে ভারের মত। নিঃস্ব দরিদ্রের জীবনে কোনো সুখ নেই। আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌তে চাই না! দ্যূতক্রীড়া আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

মদনিকা। এখন এই দুঃখকেই আপনার ক'রে নিতে হবে—উপমন্যু! সুখের দিন গেছে ব'লেই কি কাপুরুষের মত জীবন বিসর্জ্জন দিতে হ'বে!

উপমন্যু। আমার আর অন্য কোনো পথ নেই। উচ্চ-কুলে জন্ম নিয়েছি, নিজের দোষে আমি সর্ব্বহারা, আমার মান গেছে, কুল গেছে, আমার ধন-অর্থ সব গেছে! মনে হয়—স্নেহ-মমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। তা'হ'লে আর বেঁচে কি ফল ?

মদনিকা। আজ কি সকল চেষ্টার অতীত হ'য়ে উঠ্‌লে—তুমি ? এ কি তোমার দুর্ব্বলতা! আত্মহত্যা করা মহাপাপ! সৃষ্টিকর্ত্তাকে তুমি এই হীন কাজে অপমানিত করবে। এ অধীরতা তোমায় শোভা পায় না।

উপমন্যু। অধীরতা শোভা পায় না! আমার দুঃখের অবধি নেই কি-না! আমার মত দুর্ভাগার কি কর্ত্তব্য—বলো মদনিকা! ভিক্ষার অন্নে জীবন রাখা ভিন্ন এখন আর কোনো গতি নেই! সে আমার অসহ্য! কেন আর তুমি আমার পিছু ডাকো! আমাকে ভুলে যাও···ভুলে যাও!

মদনিকা। আজ এক নিমেষের ভুলে সমস্ত বাঁধন ছিন্ন হ'বে? তুমি আজ দরিদ্র হ'লেও তুমি তো মানুষ! তোমার কি বুদ্ধি পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছে? দেবতার শরণ নাও, সকল দুঃখ ঘুচে যাবে।

উপমন্যু। আজ দেবতা-মানব সব রসাতলে গিয়েছে। শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্র-বিধি সব ডুবিয়ে দিয়েছি বিস্মৃতির তলে। এখন নতুন ক'রে দেবতাকে ডাকবার মত মনের অবস্থা নয়—এই চঞ্চল মন দেবতার ধ্যান-ধারণা করতে অসমর্থ। আর না—আমাকে বিদায় দাও!

মদনিকা। কোন প্রাণে বিদায় দোবো! তুমি কি জানো না—কাশ্মীরে এক জাগ্রতা দেবীর মন্দির আছে! দেবীর কৃপায় সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

উপমন্যু। সত্য—সত্য! এবার মনে প'ড়েছে—শুনেছি বিন্ধ্যাচলে দেবী ভ্রমরবাসিনী নিয়ত অধিষ্ঠিতা আছেন, তাঁর দর্শন কখনো নিষ্ফল হয়না! একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো—যদি কোনো উপায়ে এই ধিক্কৃত জীবনে কিছু লাভ করা যায়! আমার অদৃষ্টে যাই থাক্···প্রাণপণ ক'রেও একবার দেবীর দুর্লভ দর্শন পাবার চেষ্টা করবো!

মদনিকা। কিন্তু তুমি সেই দুর্গম স্থানে পৌঁছুবে কি ক'রে? এ-কথা শুনেছি—দেবী ভ্রমরবাসিনীর কাছে যাওয়া মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। কারণ—দেবী মন্দিরের চারদিকে পঞ্চযোজন স্থান সকল সময়েই ভ্রমরের দলে পরিপূর্ণ থাকে। আর এই সমস্ত ভ্রমর নানা জাতির, অতি ভীষণ প্রকৃতির।

উপমন্যু। জানি—কোনো শ্রেণীর ভ্রমর শঙ্কুপুচ্ছ—কারণ এদের পুচ্ছ শঙ্কুর মত তীক্ষ্ণ—আবার কোনো কোনো ভ্রমর-কুল পুচ্ছে বজ্রের শক্তি ধরে ব'লে বজ্রপুচ্ছ নামে খ্যাত। এরকম বহু জাতির ভীষণ ভ্রমর সেখানে সর্ব্বদাই সতর্ক প্রহরীর মত জেগে রয়েছে। কিন্তু তাই ব'লে কি এই দুঃসাহসের কাজ

করতে যাওয়া আমার পক্ষে অন্যায়? আত্মহত্যার চেয়ে তো ভালো!

মদনিকা। প্রভু, এ-ওতো আত্মহত্যারই সমান! ঐ সব ভ্রমরের দংশনে দেবীর দর্শন অভিলাষী পথিকের দেহ খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে যায়। এই ভ্রমর দু'চারটী একযোগে দংশন করতে থাকলে প্রাণরক্ষার আর কোনো উপায় থাকে না। তুমি এ-সঙ্কল্প ত্যাগ করো।

উপমন্যু। সব কাজেই তুমি বাধা হ'য়ে দাঁড়াও কেন, মদনিকা! আমি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকতে পারি না। দেবী-দর্শনের জন্যে আমি এই দুর্গম যাত্রা আরম্ভ করবো—তা'তে আমার প্রাণ যায় যাক্।

মদনিকা। প্রাণ কি এতোই তুচ্ছ?

উপমন্যু। প্রাণ দিতে তো আমি বিন্ধ্যাচলে যাত্রা করছি না। বুদ্ধি আমার অস্ত্র। আমি দেবীর কাছে পৌঁছুবোই। আমি দেবী-দর্শন আশায় মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করতে পারি। শঙ্কুপুচ্ছ বজ্রপুচ্ছ ভ্রমরের দংশন আমি ব্যর্থ করবো—তা'র উপায় আমার জানা আছে।

মদনিকা। ওগো—এই অসম সাহসের কাজ করতে যেয়োনা। পায়ে ধ'রে মিনতি করছি—যেয়োনা—যেয়োনা—

উপমন্যু। নারীর কান্না আজ আমার কাছে মূল্যহীন। দেবী ভ্রমরবাসিনীর দেখা আমার চাই। আমাকে যেতেই হ'বে।

কথা-সূত্র

দ্যূতকর উপমন্যু কোনো বাধা মানলে না। সে পণ ক'রে বসলো—দেবী ভ্রমরবাসিনীর দর্শন চাই। উপমন্যু ছিল খুবই বুদ্ধিমান। দেবী-দর্শন আশায় একরূপ মরিয়া হ'য়ে—সে ভীষণ ভ্রমরদলের আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় স্থির করলে।

প্রথমে একটি সুদৃঢ় লৌহবর্ম্মে আবৃত ক'রে দিলে আপাদমস্তক—তার ওপর কয়েকপাট ক'রে মহিষ-চর্ম্মের আচ্ছাদন দেওয়া হোলো। সেই চর্ম্ম-বর্ম্মের 'পরে গোময়-মেশানো মাটির প্রলেপ দিয়ে সেটিকে রৌদ্রে সে শুকিয়ে নিলে, পরপর এর ওপর কয়েকটি প্রলেপ দেওয়া হোলো। এই বিচিত্র সাজ-সজ্জা ক'রে উপমন্যু পথ চলতে আরম্ভ করলে। দূর থেকে দেখে সকলেই বিস্মিত-মনে ভাবলে যে—একটি প্রকাণ্ড মাটির স্তূপ সচল-গতি পেয়েছে।

কিন্তু তার সারা দেহের ওপর এরূপ একটি বিপুলভার সর্ব্বক্ষণ বহন ক'রে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। দুই এক পদ অগ্রসর হ'য়ে সে দারুণ কষ্টে হাঁপাতে লাগলো। তবু উপমন্যু উদ্দেশ্য ত্যাগ করলে না।—তার গতির বিরাম নেই।—পথিমধ্যে উপমন্যু।—

ধীরে ধীরে ভারী পদক্ষেপ—
গতি ভঙ্গে বিচিত্র শব্দ—
উপমন্যু অতি কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করছিল।

উপমন্যু। আর যে চলতে পারিনা! পথেই কি প্রাণ হারাবো? আমার উদ্দেশ্য কি বিফল হ'বে? দেবী কৃপা করো—শক্তি দাও—!

মদনিকা। প্রভু—উপমন্যু—

উপমন্যু। কে তুমি? মদনিকা! তুমি এখানে কেন? আমি যদি যমদ্বারে যাই—সেখানেও কি আমার সঙ্গ নেবে?

মদনিকা। তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাবো? কোথায় আমার স্থান? তুমি যদি পথে এসে দাঁড়াও, সেই পথই হ'বে আমার আপনার। তাই আমি তোমার পথের সঙ্গিনী হ'য়েছি। তোমার পিছনে পিছনে তোমার অগোচরে এসেছি পথ চিনে।

উপমন্যু। তুমি পথের বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছ! তুমি কি সাহসে আমার সঙ্গ নিতে চাও? ভ্রমরদের অতিক্রম ক'রে তুমি কেমন ক'রে পথ চলবে? এ তোমার দুরাশা! ফিরে যাও!

মদনিকা। কোথায় ফিরবো—উপমন্যু! আমি ভ্রমরের দংশনেই প্রাণ দোবো।

উপমন্যু। না—না—দূর হও।

মদনিকা। সুখের দিনে আমাকে তুমি বরণ ক'রে নিয়েছিলে, দুঃখের দিনেও কি আমি সঙ্গিনী হ'তে পারবোনা?

উপমন্যু। না···না—! আমাকে পাগল ক'রে দেবে—এই নারী! তোমাকে পথের ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আমি দেবীর মন্দিরের পানে এগিয়ে চলবো। আর আমার দয়া-মায়া কিছু নেই। আমার সঙ্গ ছেড়ে চ'লে যাও। তোমার ঐ দেহকে করো উপজীবিকা, প্রণয়ীর অভাব হ'বে না।

মদনিকা। আমার সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা!—শোনো, সঙ্গ তোমার যদি ছাড়তে হয়—আমি আর এ-জীবন রাখবো না!—যে দেবীর মন্দির-দ্বারে তুমি একলা পৌঁছুবে ব'লে আমাকে দূর ক'রে দিচ্চো, সেই দেবীর কাছে অন্তরের প্রার্থনা জানাবো—যেন পরজন্মে-ও তোমার সঙ্গহারা না হই। মা-গো—দেবী ভ্রমরবাসিনী, যদি তুমি জাগ্রতা হও—যদি তুমি করুণাময়ী হও, কৃপা করো মা—আমার পতি-কামনা পূর্ণ করো। মা-গো ভ্রামরী!

দিব্য-সঙ্গীতে দেবীর আবির্ভাব সূচিত

দেবী-কণ্ঠ। তুমি পরজন্মে মায়াময়ী নারীরূপে সৃষ্ট হ'বে। তোমার কামনার স্বামীকে লাভ করবে। তোমার এ জীবনের আজ শেষ। অপূর্ব্ব এ আশা তোমার পূর্ণ হোক্।

মদনিকা। দেবী করুণাময়ি—ভ্রমরবাসিনী!

মদনিকার দেহত্যাগ

উপমন্যু। এ-কি! মদনিকা সত্যই প্রাণত্যাগ করলে! চিত্ত দুর্ব্বল করবার এখন সময় নয়, অন্যথায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবেনা। এগিয়ে চলি—আর নয়—এগিয়ে চলি।

এস্থলে মৃদু ভ্রমরগুঞ্জন শোনা যাবে—ভারী পদক্ষেপের একঘেয়ে ঝনৎকার শব্দ—

—ঐ বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী! ওরই কেন্দ্রস্থানের দ্বার দেখা যাচ্ছে। ঐ দ্বার দিয়ে কি ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হ'বে! তাই যাবো—এই পথ ধ'রেই যাবো।

ভ্রমরের ডাকের সামান্য বৃদ্ধি

লক্ষ লক্ষ ভ্রমর-গুঞ্জনের শব্দ শোনা যাচ্চে! হ্যাঁ—ঠিক পথেই এসেছি। এবার সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করি।

ভ্রমর-ডাক ক্রমোচ্চ

ওঃ—ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ছুটে আসচে! ভয় কি—আমার দেহের বর্ম্ম ভেদ করা ভ্রমরদের সাধ্য নয়! অসংখ্য ভ্রমরের ডাক কি আমাকে বধির ক'রে দেবে!

ভ্রমর-ডাক অতি উচ্চ

—আয়—আয়—শত শত কোটি কোটি ভ্রমর ছুটে আয়, আমার কোনো ক্ষতি কর্‌বার শক্তি তোদের নেই। আমার গায়ের মাটির বর্ম্ম বারবার আঘাত ক'রে ধূলো উড়িয়ে নিজেদেরই অন্ধ ক'রে তুল্‌চিস্—

ভ্রমরের ডাক

পথ কি দীর্ঘ! আর সারাপথ নানাজাতির ভ্রমরে পূর্ণ। এই ভ্রমরের ব্যূহ ভেদ ক'রে অগ্রসর হওয়াই তো কঠিন!—একি—মাত্র তিন যোজন পথ পৌঁছুতেই বর্ম্মটি ভ্রমরদের আঘাতে জীর্ণ হ'য়ে খ'সে পড়্‌লো।

ভ্রমরগণের মহিষচর্ম্মে আঘাত

এবার দুর্দ্দান্ত ভ্রমর-দৈত্যেরা আমার চর্ম্ম আবরণ কেটে ফেল্‌চে। এখনো চার যোজন পথ সম্পূর্ণ হ'তে অর্দ্ধেক বাকি। এ-কি চর্ম্মের বর্ম্মটিও যে মাটিতে প'ড়ে গেল!

সুস্পষ্ট রণৎকার শব্দ

—হায়—হায়—লোহার বর্ম্মটির ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর এসে আক্রমণ করেছে! এখন কি উপায়! এই আমার শেষ বর্ম্ম। এই বর্ম্মকেও ওরা কেটে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌চে! এ-যে দারুণ বিপদ উপস্থিত! ছুটি—ছুটি, ওঃ—ওঃ—আর পারিনা—তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত!

কষ্টে শ্বাসগ্রহণ

—আর কত পথ—আর কতদূর? এখনো দেবীর মন্দিরে পৌঁছুতে আধযোজন পথ! ওঃ—কি যন্ত্রণা! বজ্রপুচ্ছ ভ্রমরগুলো তীক্ষ্ণ পুচ্ছের আঘাতে আমার শেষ আশ্রয় লোহার বর্ম্মটিও খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলেছে! ওঃ—ওঃ—দেবী এই কি আমার অসম সাহসের শাস্তি!

দ্রুত পাদক্ষেপ

—এই দু'টি মাত্র হাতে আর কতক্ষণ ভ্রমরদের তাড়িয়ে প্রাণ বাঁচাবো! আমার দেহের মাংস ওরা কেটে ফেল্‌চে। গা' বেয়ে রক্তের প্লাবন! আর কতদূর! শুধু চোখ দু'টো রক্ষা পাক্, নইলে দেবীকে দেখ্‌তে পাবো না।

সাধ্যমত ত্বরিত গতি

—ঐ—ঐ—দেবীস্থানে বোধহয় পৌঁছুতে পেরেছি।

ভ্রমরের ডাক দূরে সরে' যাবে—ক্ষণপরে স্তব্ধ—

—এই দেবী-মন্দির!—কি ভীষণা দেবী-মূর্ত্তি! দেবী ভ্রমরবাসিনী!

অসহ্য বেদনায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূমিতে পতিত হোলো

দিব্যসঙ্গীত মন্দ্র

ভ্রামরীদেবী। এই দুর্গম মন্দিরে মানুষের আবির্ভাব! ভ্রমর-দংশনে ওর সকল অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেছে। ও এখন জ্ঞানহারা, তবুও ভক্তটি প্রাণ হারায়নি। কিন্তু আজ আমার মনে অহেতুকী কৃপা জেগে উঠ্‌লো কেন? নিশ্চয় এ-ভক্তের পরম নিষ্ঠা আছে। আমি এই মুহূর্ত্তে আমার করের স্পর্শে এর দেহে শান্তি-সুধার প্রলেপ এনে দোবো। তুমি জেগে ওঠো—উৎসাহী মানব-সন্তান! অভিনব সুন্দর দেহ লাভ করো। আবার উজ্জীবিত হও। তুমি নিষ্ঠার জোরে রক্ষা পেয়েছ।

সঙ্গীত—উচ্চগ্রামে ও পরক্ষণেই গীত-সুরে পরিস্থিত

সিন্ধুভৈরবী

গান

জয় জয় চেতনা-রূপিণী দেবী নমি নমি।
জয় জয় ভ্রমর-বাসিনী দেবী নমি নমি।
জয় জয় কামদা বিশ্ব-ধারণা,
চিত্র-বরণা দেবী নীলিম-লোচনা,
তেজোদীপ্তি-ধারিণী দেবী নমি নমি॥
নানাবর্ণ-ভূষণা দেবী নমি নমি।
বিচিত্রভ্রমরপাণি শিবা নমি নমি।
অখিল সুষমার পারাবার—
ভ্রামরী-রূপিণী দেবী নমি নমি॥

গীত-শেষে—মৃদুমধুর সঙ্গীতালাপ

উপমন্যু। কোথায় আমি! এই সেই দেবীমন্দির! দেবীর স্তব-গানে এই বিন্ধ্যাচল মুখর হ'য়ে উঠেছে। কোথা' থেকে আসে গান, কোথায় ভেসে যায়, কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! কি আশ্চর্য্য! আমি এমন সুন্দর দেহ লাভ করেছি—কেমন ক'রে? নিশ্চয় দেবীর কৃপা! ধন্য দেবী! কিন্তু দেবী কই? সেই ভয়ঙ্করী দেবীমূর্ত্তি কোথায় লুকালো?

চারিদিকে অবলোকন

—ঐ যে—ও কে? ঐ মন্দির উপবনে সরোবর-তীরে লতা-বিতানে কে ঐ অপরূপা কমল-লোচনা বরবর্ণিনী! নিশ্চিত—ঐ পরমাসুন্দরী স্বর্গের কোনো অপ্সরা—দেবীর কৃপা-লোভী! তবে এ-কি দেবীর দয়া! আমার উদ্যমের পুরস্কার?

অগ্রগমন

—হে অপরূপা!

ভ্রামরী। সৌম্য, কি তোমার অভিপ্রায়?

উপমন্যু। আমি দেবী ভ্রমরবাসিনীর চরণে আমার অভিলায নিবেদন কর্‌বো। তাই সমস্ত বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ ক'রে এখানে এসেছি।

হঠাৎ চারিদিক থেকে অট্টহাস্য ভেসে এলো। উপমন্যু ত্রস্তচিত্তে বিহ্বল দৃষ্টিতে হাস্যকারীদের সন্ধান কর্‌তে উদ্যত হোলো—পরে—দেবীর ইঙ্গিতে নিরস্ত হোলো উপমন্যু

—এ-কি মায়া-বিভীষিকার সৃষ্টি কর্‌চো!—আমি কিছুতেই ভীত হ'বো না।—দেবী কই? আমি তাঁর কাছে আমার অন্তরের কামনা জানাবো।—

ভ্রামরী। দেবী তোমাকে দয়া করেছেন। তুমি পথে অনেক যাতনা ভোগ করেছ, এখন সুস্থ হও। পরে শান্ত মনে আমার কাছে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কোরো। তোমার এখানে অবাধ গতি।

উপমন্যু। ভদ্রে, তোমার দর্শনেই আমার সকল কষ্ট দূর

হয়েছে। কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে, তুমি তো দেবতা নও—তবে কেমন ক'রে বর দিতে পারো ?

ভ্রামরী। (সহাস্তে) তোমার মনে সন্দেহ উঠেছে? আমি দেবতা কি অন্য কোনো ললনা—তা' নিয়ে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। তোমার বর পেলেই তো হোলো!—

উপমন্যু। তা' হ'লে তুমি অঙ্গীকার করো, যা' আমার কাম্য তোমার বরে তা' সিদ্ধ হ'বে।

ভ্রামরী। তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করবো—ভদ্র!

উপমন্যু। ভদ্রে, তুমি আমাকে পত্নীভাবে ভজনা করো।

ভ্রামরী। নির্বোধ! অজ্ঞ মানুষ!

প্রাকৃতিক দুর্দ্দামতা—

—শান্ত হও!

কঠিন নিস্তব্ধতা

ভ্রামরী। নির্বোধ, এ-কি তোর অযোগ্য প্রার্থনা! আমি তোর পথের ক্লেশ স্মরণ ক'রে দয়ায় মোহাবিষ্ট হ'য়ে পড়েছিলুম, তাই তোর মনের দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা জানতে চেষ্টা করিনি। জ্ঞানহীন, তোর কামনার কি সীমা নেই! আমি স্বয়ং বিষ্ণু-শক্তি—ভ্রমরবাসিনী দুর্গা! এ অসঙ্গত বর ত্যাগ ক'রে অন্য যে-কোনো বর প্রার্থনা কর্!

উপমন্যু। দেবী, তুমি স্বয়ং ভবানী হও বা সাধারণ মানবী হও—তা' জানতে আমি ব্যাকুল নই। আমার অন্য কোনো প্রার্থনা নেই। হয়তো তুমি ক্রোধের বশে এই দণ্ডে আমার প্রাণনাশ ক'রতে পারো, কিন্তু সে-ভয়েও আমি কুণ্ঠিত হ'বোনা। আর যদি তুমি আমার অভীষ্ট বর না দাও, তা' হ'লে তোমাকে সত্যভঙ্গের পাপ স্পর্শ করবে। তোমার দুর্ণাম সংসারে ঘোষিত হ'বে।

ভ্রামরী। বুঝেছি—আজ অপাত্রে দয়া ক'রে এই সত্যে বদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। উদ্ধারের কোনো আশা নেই। শোন্ দ্যূতকর উপমন্যু—আগামী জন্মে তোর এই অবৈধ অভিলাষ পূর্ণ হ'বে। এখন বিদায় নাও।

দেবীর মধুর রূপ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বরূপে

উপমন্যু। দেবী! কোথায় দেবী! আর তো অপেক্ষা করা যায় না। আমার এ অচিন্ত-আশা পূর্ণ হ'তে আর কত দেরী? কবে মৃত্যু দয়া ক'রে আমার দ্বারে আসবে—ততদিন তা'র প্রতীক্ষা করতে পারি না। দেবীকে স্ত্রী-রূপে পাবো—এই কামনা অন্তরে জাগিয়ে রেখে, প্রয়াগ-সঙ্গমে গিয়ে প্রাণ বলি দোবো। এ জন্মের মত বিদায়, দেবী! পরজন্মে তোমারই বরে তোমাকে পাবো—এই আমার পরম সান্ত্বনা, পরম আনন্দ। আমি মানুষ হ'য়ে দেবীকে করেছি জয়।

প্রস্থান

ভ্রামরী-কণ্ঠ। ওরে সিদ্ধ—আজ সারা নিখিলে মহামায়ার বন্দনা-গানে দশদিক্ মুখর ক'রে তোল্। কামনার কলুষ দূর হোক্—বিশ্ব-সংসারে ফুটে উঠুক্ পুণ্য আলো।

শঙ্খনাদ ও সঙ্গীত

সিদ্ধ ও অপ্সরা

গান

গভীর শঙ্খরবে সারা নিখিল ধ্বনিত।
আকাশ-তলে, অনিলে-জলে, দিকে দিগঞ্চলে,
সকল লোকে গিরিবন-পর্ব্বতে,
নৃত্য-গীত-ছন্দে নন্দিত।
বিশ্ব-নিখিল উল্লাসে উৎসব-গানে,
চির-সুন্দর চিরসুন্দর
চিত-সুন্দর বন্দন-রাগে—
ভুবনে জাগে ভ্রমরবাসিনী আনন্দে।
জাগে ভ্রমর-গুঞ্জন নব নব রাগে রাগে ছন্দিত॥

সঙ্গীত—বিকাশ

কথাসূত্র

এই ঘটনার পরে কিছুকাল অতীত হয়েছে।

পরজন্মে দ্যূতকর উপমন্যু কাশ্মীরের রাজবংশে রণাদিত্য তুঞ্জী রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর ভালদেশে এক অপূর্ব্ব শঙ্খ-চিহ্ন শোভা পেতো। ঐ সময়ে চোল দেশের অধিপতি রতিসেন অনন্ত সমুদ্রের পূজা করতে গিয়ে তরঙ্গ-শিরে সমুজ্জ্বল রত্ন-কণিকার মত দিব্যরূপা এক কন্যারত্ন কুড়িয়ে পেলেন। কন্যার নাম দেওয়া হোলো—রণারম্ভা।

কালক্রমে শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম ক'রে কন্যা রণারম্ভা নবযৌবন-সম্পন্না হ'য়ে উঠ্‌লেন। এবার বিবাহের পর্ব্ব।—

[সংলাপিকা]

রতিসেন। মা রণারম্ভা, জানিনা—তোমার যোগ্য বর পাবো কিনা! তুমি বিবাহ-যোগ্যা হয়েছ, তবুও আমার উদ্বেগের কোনো কারণ জাগেনি।

রণরম্ভা। পিতা—আমার পতি অন্বেষণ করা বৃথা। যিনি আমার পতি হবেন, তাঁর ললাটে অঙ্কিত থাক্‌বে বিধাতার বর-চিহ্ন।

রতিসেন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তোমার কথা—মা! আমার ধারণা—কোনো দেবীর অংশে তোমার সৃষ্টি, নইলে শৈশবকাল থেকেই তোমার মুখে দিব্যবাণী কি ফুটে ওঠে?

রণারম্ভা। সে মহাশক্তির করুণা—পিতা! আমি যেন অন্তরে পাই দেবীর নিত্য প্রেরণা। আমার ভুবন যেন অন্যরূপে ভিন্ন সুরে গ'ড়ে উঠেছে!

রতিসেন। আমার লক্ষ্য এড়িয়ে যায়নি—কন্যা! তোমার পবিত্র পাণি প্রার্থনা ক'রে এসেছে কত রাজা, কত রাজকুমার—কিন্তু আমি প্রত্যেকেরই আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধাবোধ করিনি। এখন আবার এসেছে কাশ্মীর-পতি রণাদিত্যের মন্ত্রী বিবাহ-প্রস্তাব নিয়ে। তা'রই আগমন প্রতীক্ষা করছি। জানিনা—কি তা'কে উত্তর দোবো! কাশ্মীরপতি বীর। তাঁর অসন্তোষও আমার কাম্য নয়।

দ্বারপাল। মহারাজাধিরাজ—কাশ্মীরের মন্ত্রীবর দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

রতিসেন। এখানে সসম্মানে নিয়ে এসো। রণারম্ভা, তুমি ক্ষণেক অন্তরালে যাও।

দ্বারপাল। কাশ্মীরাধিপতির মহামন্ত্রী।

কাশ্মীর-মন্ত্রী। মহামান্য চোল্‌রাজ—আমার অভিবাদন জানাচ্ছি।

রতিসেন। এসো, মন্ত্রীবর! তোমার আগমনে আমি আনন্দিত হয়েছি। কাশ্মীর-অধিপতির কাছ থেকে কোনো বার্ত্তা আছে?

কাশ্মীর-মন্ত্রী। চোল্‌রাজ রতিসেন—আমি এসেছি একটি শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে।

রতিসেন। কি তা'র মর্ম্ম—আমি জানতে ইচ্ছা করি, মন্ত্রী!

কাশ্মীর-মন্ত্রী। আমার প্রভু কাশ্মীররাজ রণাদিত্যের গুণাবলীর বৃত্তান্ত আপনার অবিদিত নেই। কিন্তু সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণীর অভাবে তাঁর মহিষীর আসন আজও শূন্য রয়েছে। এই সংবাদটুকু তোমাকে জানাতে চাই—সেই শূন্য স্থান তোমাকেই পূর্ণ ক'রে দিতে হ'বে।

রতিসেন। তুমি তো জানো মন্ত্রী—আমার ঐ একটী মাত্র কন্যা রণারম্ভা। আর তো আমার কন্যা নেই।

কাশ্মীর-মন্ত্রী। আমি জানি। আমার প্রভুর জন্যে তোমার ঐ কন্যাটিকেই প্রার্থনা করতে এসেছি।

রতিসেন। এক এক সমস্যা! এ সমস্যা সমাধান করবার মত শক্তি আমার নেই—মন্ত্রীবর! জানো বোধ হয়, আমার কন্যা অনন্যসাধারণ, দেবতার বরে তা'কে পেয়েছি। তাই—দেবতার আদেশ না পেলে—তোমার এ প্রস্তাবে কোন্ সাহসে অভিমত দিই?

কাশ্মীর-মন্ত্রী। তা' হ'লে আমার এই পুণ্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে চাও চোল্‌রাজ? আর একবার ভেবে দেখো। আমার প্রভু রণাদিত্যের মধ্যেও কিছু অসাধারণ লক্ষ্য করা যায়। তিনিও সাধারণ মানুষের পর্য্যায় থেকে অনেক উচ্চে।

রতিসেন। আমি সমস্তই স্বীকার করি। তথাপি—আমি কন্যার পাণি কাশ্মীর-রাজের পাণিতে যুক্ত ক'রে দিতে অসমর্থ।

রণারম্ভার আগমন

রণারম্ভা। পিতা!

রতিসেন। রণারম্ভা! কি বলচো—মা?

রণারম্ভা। পিতা—আমাকে মার্জ্জনা করো, আমার এস্থলে কিছু বক্তব্য আছে।

রতিসেন। দ্বিধা কেন? বলো।

রণারম্ভা। মহামাত্যের এ প্রস্তাব তুচ্ছ করবার নয়।

কাশ্মীর-মন্ত্রী। আহা—সত্যই দেবী-প্রতিমা! অপূর্ব্বা তুমি—রাজকন্যা! তুমি ভাগ্যবতী, তুমি চিরধন্যা হও! আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে জননী যেন জগদ্ধাত্রী-রূপে আবির্ভূতা হলেন।

রতিসেন। রণারম্ভা—কেন তুমি আমাকে এই প্রস্তাব মেনে নিতে বলচো?

রণারম্ভা। পিতা—কাশ্মীরের মন্ত্রী-মিলনের অপ্রদূত। তাঁর প্রস্তাব অবৈধ নয়।

রতিসেন। কেমন ক'রে জানলে তুমি?

রণারম্ভা। আমার অন্তরের ভগবান বলেছেন—কাশ্মীরাধিপতি রণাদিত্যই আমার চিহ্নিত স্বামী।

রতিসেন। তা'হ'লে আর বাধা কিসের? মন্ত্রীবর—আমি সম্মতি দিচ্ছি।

কাশ্মীর মন্ত্রী। অনুগৃহীত হলুম—চোল্‌রাজ! ভাগ্যলক্ষ্মী লাভ ক'রে কাশ্মীর হ'ক ধন্য।

মধুর সঙ্গীত-ব্যঞ্জনা

কথা-সূত্র

যথাকালে রণাদিত্যের সঙ্গে রণারম্ভার বিবাহ সম্পন্ন হোলো। এই রণারম্ভাই দেবী ভ্রমরবাসিনীর মানবী-মূর্ত্তি।

রণাদিত্যের পত্নীত্ব স্বীকার করলেও দেবী স্বামীকে এমনি মায়ায় মোহিত ক'রে রাখতেন যে—রণাদিত্য কোনোদিন তাঁকে স্পর্শ করবারও অবসর পান্ নি।

মায়াবলে মহিষী রণারম্ভা নিজের অনুরূপা এক মায়াময়ী নারীমূর্ত্তি-সৃষ্টি করলেন। এই নারীই পূর্ব্ব জন্মের পতিপ্রাণা মদনিকা।

এবার সেই ঘটনারই প্রকাশ।

মায়াতত্ত্ব-প্রকাশক মৃদু ঝিমিয়ে-পড়া সঙ্গীতের অভিব্যক্তি

সংলাপিকা

রণারম্ভা। মায়াময়ী, তুমি আমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তুমি অনুরূপা—এই তোমার পরিচয়।

অনুরূপা। রমণীর সমস্ত মোহ, কামনা, বাসনা দিয়ে আমার অন্তর পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছ। আমার আকাঙ্ক্ষা কি সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকবে? তাই কি তোমার আদেশ?

রণারম্ভা। মহারাজের হ'বে তুমি শয্যা-সঙ্গিনী, তাঁর নর্ম্মসখী। হোমাগ্নি সাক্ষী ক'রে তুমি তাঁর পাণি বরণ করবার সুযোগ পাওনি। রাজার যৌবনের কামনা-বহ্নিতে তোমার সকল প্রণয়-অভিলাষ ইন্ধন যোগাবে—সেই হ'বে তোমার কাজ, তোমার অভিনয়। মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের কোঠায় তুমি কি পৌঁছুবার অবসর পাবে—নারী? তোমার অস্তিত্ব তো শুধু রাত্রের অন্ধকারেই! তুমি অভিনেত্রী।

অনুরূপা। তবে কেন আমায় সৃষ্টি করলে—দেবি! আমাকে কামনা দিয়ে এ-কি সীমায় বেঁধে দিচ্ছো? অভিনয়-লীলাই আমার কাজ?

রণারম্ভা। ব্যাকুল হ'চ্চো কেন? তোমার জন্ম-জন্মান্তরের বাসনা পূর্ণ করবো···আর আমারও উদ্দেশ্য সফল হ'বে। তাই তোমার প্রকাশ।

অনুরূপা। আমি কৃতার্থ, দেবি! কিন্তু আমাকে কি দেবতার পূজার ডালি দেবে, কিংবা মানুষের নর্ম্ম-সঙ্গিনী হ'বো?

রণারম্ভা। রমণী, তুমি আমার অনুরূপা হ'লেও—তোমার অন্তরে কামনা-বাসনা জাগিয়ে তুলেছি, সাধারণ নারীর মতই তোমার মনোবৃত্তি। তুমি হ'বে মহারাজ রণাদিত্যের অন্তরচারিণী, রজনীর সহচরী। কারণ—আমি তাঁকে স্বামী-রূপে বরণ করলেও—আমাকে স্পর্শ করবার অধিকার দিতে পারি না। লোকে জানে—আমি মহিষী রণারম্ভা, কিন্তু আমার প্রকৃত স্বরূপের কেউ সন্ধান রাখে না। আমিই দেবী ভ্রামরীর মানবী মূর্ত্তি।

অনুরূপা। দেবী প্রসন্ন হও, আমি যেন তোমার সৃষ্টি সার্থক ক'রে তুলতে পারি।

রণারম্ভা। তুমি শ্রেষ্ঠা নারীর মন নিয়ে জন্মেছ! তুমি

রাজাকে স্নেহ-প্রেমে মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌বে—তোমাকে আমি সেই শক্তির প্রেরণা দান করলুম।

অনুরূপা। কিন্তু দেবী—নারীর মন দুর্ব্বল, যদি রাজার রূপে গুণে প্রেমের দাক্ষিণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি, তখন আমাকে কে রক্ষা করবে?

রণারম্ভা। সে চিন্তা তোমার নয়—অনুরূপা! তুমি শুধু আমার কাজের সহায়। প্রতি রাত্রে তোমাকে আমি স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দোবে—আর আমি নিজে ভ্রামরী-রূপ ধ'রে প্রস্থান করবো বিন্ধ্যাচলে। আবার উষাকালে আমি ফিরে এলে—তোমার মায়াময়ী মূর্ত্তি গোপনে থাকবে।

অনুরূপা। এ গুরুভার কেন আমাকে দিলে? আমি যদি তোমার আদেশ-পালনে বিফল হই, আমার সে-অপরাধ কি ক্ষমা করবে—মহিষী?

রণারম্ভা। মনে সন্দেহ রেখোনা—রমণী! তুমি শুধু রাজার রাত্রির বাসর সাজাবে—দিনে তুমি তাঁর কেউ নয়, তোমার কোনো পৃথক্‌ সত্ত্বা থাকবে না। রাজা তোমাকে মহিষী রণারম্ভা ভ্রমেই গ্রহণ করবেন। তুমি কলাবতী, নৃত্যে-গানে স্বামীকে মাতিয়ে দেবে—এই তোমার কাজ।...ঐ মহারাজ রণাদিত্য আমার খোঁজে আসছেন। তুমি ওঁকে প্রথম অঞ্জলি দান করো—গীত-রাগে নন্দিত ক'রে তোলো। তারি চাই সার্থক্‌ অভিনয়। তুমি হও রাজার অন্তর-কামনার চিত্রলেখা। সেই ডোরে ওঁকে বাঁধো।

অনুরূপা

গান

তোমায় বরণ করি প্রাণের ধূপে!
বিজয়-মুকুট-শোভন শিরে
রাজোগো ঐ মোহন রূপে।
প্রেমের সুধা-সাগর-কূলে—
করবো পূজা চরণ-মূলে—
আমার রাজা অখিল-ভূপে॥
নাচের নেশা লাগ্‌লো চিতে,
কামনারি গোপন মুকুল
জাগবে কি গো মঞ্জরীতে!
এসোহে আজ হৃদয়-ভরা—
বিকাশি' দাও আমার ধরা—
এসো প্রাণে চুপে চুপে॥

রণাদিত্য। মহিষী—! তোমার অভিনন্দনে আমি ধন্য!

অনুরূপা। তোমারই করুণার পুণ্যে তোমাকে আনন্দ দিতে পেরেছি, প্রভু!

রণাদিত্য। আজ এ-কি ভুবন-মোহন তোমার সাজ! আমাকে বরণ-মালায় ভূষিত করবে ব'লে—তোমার কি সুন্দর আয়োজন! তুমি এসেছ আমার জীবনে মঙ্গললক্ষ্মী হ'য়ে পরমোৎসবের সুর তুলে। আমি অনেক উপহার পেয়েছি—অনেক ফুল—অনেক মালা—কিন্তু তোমার মালা আমার কাছে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান।

অনুরূপা। আমার সৌভাগ্য! তুমি আমার স্বামী—তোমাকে যেন স্নেহে, প্রেমে, মায়ায় অভিভূত ক'রে দিতে পারি। জানি না—কোন্‌ অতীতের মায়া আমার এই বর্ত্তমানকে পূর্ণ ক'রে তুলেছে—আমার কাছে ধরা দিয়েছে পরম সত্যের মত।

সংলাপের 'পরে প্রভাতী রাগিনীর আলাপ পরিস্থিত

রণাদিত্য। মহাদেবী, তুমি আমার জীবনের কল্যাণী, রাজ্যশ্রী! তোমার প্রেমে আমি আত্মলোপ ক'রে দিতে চাই, তুমিও আমার প্রেম তুলে নাও, আমার জীবন আরও মধুর হ'য়ে উঠুক্‌।

অনুরূপা। আমার এ-প্রেমের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে—শুধু রাত্রে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহিষী রণারম্ভা লোকেশ্বরীরূপে বিরাজ করবে।...আকাশের গায়ে শুকতারা ফুটে উঠেছে! এখন যাই—মহারাজ!

পূর্ব্ব প্রভাতী রাগিনী মন্দ্রিত

কথা-সূত্র

কিছুদিন এইভাবে কেটে গেল। রাজা রণাদিত্য শিব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করলেন। এই উপলক্ষে বহু উৎসবের আয়োজন হোলো।

উৎসব-সূচক সঙ্গীত আরম্ভ—মৃদুসুরে—

—প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে শিল্পী প্রতিষ্ঠা-যোগ্য দু'টি শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ ক'রে আনলে। কিন্তু এই শুভ কার্য্যে বাধা লাগ্‌লো।—

সঙ্গীতের মৃদুতান

সংলাপিকা

রণাদিত্য। আজ ঘরে ঘরে উৎসব হোক্‌। আমার পরম দেবতা শিবের প্রতিষ্ঠা হ'বে, এই পুণ্যকাজ তাঁরই কৃপায় সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠুক্‌। শিল্পী-নির্ম্মিত শিব-লিঙ্গ দু'টী অপূর্ব্ব শোভায় শোভাশালী। আমার এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে সকল বিঘ্ন দূর হোক্‌।

দৈবজ্ঞ। মহারাজ! এ লিঙ্গ দু'টী প্রতিষ্ঠা-যোগ্য নয়।

রণাদিত্য। কেন—দৈবজ্ঞ?

দৈবজ্ঞ। এদের মধ্যভাগ ফেটে গেছে, সেই গর্ত্তে লুকিয়ে আছে কয়েকটি ভেক।

সঙ্গীত—স্তব্ধ

রণাদিত্য। দৈবজ্ঞ—তোমার গণনায় কোনো ভুল হয়নি?

দৈবজ্ঞ। পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারো—মহারাজ!

রণাদিত্য। অবশ্য পরীক্ষা করবো, কিন্তু যদি মিথ্যা হয়!

দৈবজ্ঞ। মিথ্যা হবেনা, কাশ্মীরপতি!

রণাদিত্য। তবে ঐ লিঙ্গ দু'টিকে চূর্ণ করো।

দু'টি প্রস্তরময় লিঙ্গ চূর্ণ করা হোলো

দৈবজ্ঞ। ঐ দেখো মহারাজ—ঐ শিবলিঙ্গ দু'টির অন্তর-দেশ ভেকের আবাস-স্থল।

রণাদিত্য। তোমার কথাই সত্য! কিন্তু এখন আর অন্য শিব-লিঙ্গ নির্ম্মাণের সময় নেই। প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘট্‌লো, উৎসবের সকল আয়োজন হোলো ব্যর্থ। গত জন্মের কি পাপে আমি আমার আরাধ্য দেবতার প্রতিষ্ঠা করতে পারলুম না! দেবতার অভিশাপ যে আমার শিরে লাগবে—আমার রাজ্যকে রসাতলে দেবে। এমন মর্ম্মপীড়া আর কোনোদিন পাইনি। কে আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবে!

নিরাশার মধ্যে আশার সঙ্গীত-ব্যঞ্জনা

রণারম্ভা। মহারাজ, হতাশ হয়েছ কেন?

রণাদিত্য। মহিষী! আজ সর্ব্বনাশ হয়েছে, শিব-প্রতিষ্ঠা কর্‌বার মত আমার সুকৃতি নেই! আজ আমি অভিশপ্ত।

রণারম্ভা। কোনো ক্ষোভের কারণ নেই, কোনো চিন্তা কোরোনা, কাল প্রাতে তোমার প্রতিষ্ঠা-যোগ্য দেবমূর্ত্তি আমি এনে দোবো।

রণাদিত্য। কেমন ক'রে তা সম্ভব—রাণী?

রণারম্ভা। আমার দৈববলে তা সম্ভব হ'বে।

রণাদিত্য। কি বিশ্বাসে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি! মহাদেবী—সত্য-বাণী শুনিয়ে আমাকে শান্ত করো।

রণারম্ভা। শোনো, এক অতি প্রাচীন কাহিনী বল্‌ছি, শোন্‌বার পর আর অবিশ্বাসের কোনো কারণ থাকবে না। গিরিনন্দিনী পার্ব্বতীর বিবাহে ব্রহ্মা হন্ পুরোহিত। তিনি নিত্য পূজার সময় তাঁর নিত্য-অর্চ্চিত বিষ্ণুমূর্ত্তি নিজ পূজার আধার থেকে বা'র কর্‌লেন। এই দেখে মহেশ্বর বলেন—"পিতামহ, শিবপূজা ভিন্ন শুধুমাত্র বিষ্ণুপূজা অসিদ্ধ। কারণ—হরি-হর যুগল-দেবতা, তা'র মধ্যে বিষ্ণু-প্রতিমা শক্তিরূপা, আর শিবপ্রতিমা চৈতন্যস্বরূপ। শিব-শক্তির মিলন ভিন্ন যেমন পূর্ণ পূজার ফল লাভ হয়না, সেরূপ হরি-হরের মিলিত পূজা না হ'লে—সকল অর্চ্চনাই নিষ্ফল।"—তখন সেই বিবাহে দেবাসুরগণ যে-সকল রত্ন উপহার পাঠিয়েছিল, সেই রত্ন দিয়ে বিশ্ব-বরেণ্য এক শিব-লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা হোলো। কিছুকাল পরে রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি আর রত্নময় শিবলিঙ্গ হিমাচল থেকে লঙ্কায় নিয়ে যায়। রাবণ-বধের পর বানররা কৌতূহলী হ'য়ে ঐ দু'টি মূর্ত্তি দেখার পর উত্তর-মানস-সরোবরের জলে ফেলে দেয়। সেই দু'টি লোক-প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি আমি শিল্পকারদের সাহায্যে তুলে এনেছি। প্রতিষ্ঠার দিন পূর্ব্বাহ্নের মধ্যেই ঐ যুগল-মূর্ত্তি রাজ-প্রাসাদে এসে পৌঁছুবে।

রণাদিত্য। ধন্য দেবী! তুমি মানবী হ'লেও দেবীর মত তোমার আচরণ! মহারাজ রতিসেনের কাছে শুনেছি তোমার কোনো দেবীর অংশে জন্ম। তাই তোমার এই মহিমা!

উৎসব-সঙ্গীত উচ্চগ্রামে

কথাসূত্র

গভীর রাত্রে রাজ্ঞী রণারম্ভা আকাশ-পথ-চারী সিদ্ধদের আহ্বান করলেন।—দেবীর আদেশে সিদ্ধগণ উপস্থিত হ'য়ে মানস-সরোবর থেকে সেই হরিহর মূর্ত্তি দু'টি উঠিয়ে আন্‌লেন।—

পরদিন ভোরে সকলে উঠে দেখ্‌তে পেলে—রাজপ্রাসাদে পারিজাত প্রভৃতি দিব্যপুষ্পে শোভিত সেই অপরূপ হরিহর-প্রতিমা। সকলের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। সকলেই মহিষী রণারম্ভার স্তুতিগান করতে লাগ্‌লো।—দেবীর নিত্য দর্শন-কামী ব্রহ্মা নামে এক সিদ্ধ দেবীর অভিনন্দন গান কণ্ঠে মুখর ক'রে তুল্‌লেন।—

সিদ্ধব্রহ্মা

গান

মম জীবনের গোপন মানস-সরে—
ফোটাও পূজার কমল অমৃত-বরে—
হে দেবি লহো অঞ্জলি লহো লহো।
হৃদি-মন্দির খুলে রাখি দিবা-যামী—
যুগ-যুগান্ত দাঁড়ায়ে র'য়েছি আমি—
হে দেবি লহো অঞ্জলি লহো লহো।
আমার চিত্তে তব রূপ নব নব,
নৃত্য সৃজনে জাগে চারু বৈভব—
হে দেবি লহো অঞ্জলি লহো লহো।
রচেছে আকাশ আরতির তারা-মালা,
শোভে শুকতারা তোমার হাসির আলা,
হে দেবি লহো অঞ্জলি লহো লহো।
বিশ্ব আজিকে চঞ্চল তব গানে—
সে-ধ্রুববাণীর সঙ্গীত জাগে প্রাণে –
হে দেবি লহো অঞ্জলি লহো লহো।
কণ্ঠে আমার দাও ভরি' মহাগীতি,
বন্দনা তব গাহি যেন নিতি নিতি—
হে দেবি লহো অঞ্জলি লহো লহো।

রণারম্ভা। সিদ্ধব্রহ্মা!—

ব্রহ্মা। দেবী!

রণারম্ভা। তোমার স্বরূপ আমি পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছি। তোমার ভক্তির তুলনা নেই।

ব্রহ্মা। দেবী—আমি তোমার দর্শন নিত্য পাবো ব'লে এখানে প্রচ্ছন্ন থেকে তোমার জলের ভার বহন ক'রে থাকি। তবু আমাকে চিন্‌তে পেরেছ!

রণারম্ভা। পরম ভক্ত কোনোদিনই লুকিয়ে থাকতে পারে না। তোমার ভক্তির পুরস্কার আজ দোবো। রাজার দেব-প্রতিষ্ঠায় তোমাকে প্রধান পুরোহিতের পদে ব্রতী হ'তে হ'বে।

ব্রহ্মা। মহাদেবী, তোমার আদেশ পালন করার মত ভাগ্য ক'জনের হয়? আমি আর বিলম্ব সইতে পার্‌ছি না। আকাশ-পথে দেব-মন্দিরের কাছে গিয়ে পৌঁছুবো।

রণারম্ভা। তোমার সাধনা সফল হোক্। আমিও দেব-মন্দিরে এখ্‌নি উপস্থিত হ'বো।

আরতি-সঙ্গীত

সমবেত কণ্ঠ। জয় রণেশ্বর শিবের জয়!

রণাদিত্য। পুরোহিত—প্রথমে শিব-প্রতিষ্ঠা করাই আমার অভিপ্রায়।

ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা সকলের আগে হ'য়ে থাকে মহারাজ!

রণাদিত্য। আমি পরম শৈব—আমি আমার আরাধ্য দেবকে আগে প্রতিষ্ঠা করতে সঙ্কল্প করেছি।

ব্রহ্মা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। হে রণস্বামী বিষ্ণু—আমাকে ক্ষমা করো।

রণাদিত্য। জয় রণেশ্বর মহাদেবতা!

উল্লসিত আরতি সঙ্গীত হঠাৎ মধ্যপথে নিরুদ্ধ—সঙ্গে সঙ্গে পাষাণ-বেদী বিদীর্ণ হবে

রণারম্ভা। আমার প্রভাবে পীঠ বিদীর্ণ হোক্। হে বিষ্ণুমূর্ত্তি—আবির্ভূত হও!

রণাদিত্য। এ কি অসম্ভব ঘটনা! শিবমূর্ত্তির পূর্ব্বেই বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব!

রণারম্ভা। মহারাজ, বিষ্ণুই শক্তি—তাঁরই প্রতিষ্ঠা আগে কর্ত্তব্য। শিবপ্রতিষ্ঠা হ'বে পরে।

রণাদিত্য। আমার ভুল হয়েছে! ভগবান বিষ্ণু আমার এই প্রমাদ মার্জ্জনা করুন।

রণারম্ভা। তোমার এই পুণ্য কাজে আর কোনো বাধা জাগ্‌বে না। রণস্বামী বিষ্ণু ও রণেশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠা ক'রে ধরণীকে ধন্য করো।

আরতি-সঙ্গীত পুনর্ব্বার মন্দ্রিত

এইরূপে মহাসমারোহে রণস্বামী বিষ্ণু ও রণেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হোলো। রণারম্ভার কার্য্য দর্শনে রাজার অন্তর আরও মুগ্ধ হ'য়ে গেল। তিনি মহিষীকে আরও নিবিড় ক'রে পেতে চান। সেদিন রজনীতে প্রতিদিনকার মত মায়াময়ী অনুরূপা রাজার কাছে উপস্থিত হোলো। তা'র নারীচিত্ত এতোদিনের প্রেমাভিনয়ে ও পুরুষের সঙ্গলাভে জেগে উঠেছে। সে পরিপূর্ণভাবে রাজাকে পেতে চায়। যৌবন-বেদনায় ব্যাকুলা রমণীর মর্ম্ম আজ প্রকাশ পেলো।—

সংলাপিকা

অনুরূপা। আমার এই নারী-জীবন কেন এই ক্ষণেক সুখের স্বপ্ন দিয়ে রচিত হোলো? রাজা আমার গলায় বরণ-মালা পরিয়ে দেন—সে-মালা যেন সাপের মত আমাকে দংশন করে। শুধু ক্ষণেকের মোহ—ক্ষণেক আশা! দেবীর এই কঠিন আদেশ আমায় আর কতকাল পালন ক'র্‌তে হ'বে। এ পাওয়া আমার না-পাওয়ারই সমান! কোনো তৃপ্তি নেই—শুধু বিরহের সাধনা করা!

গান

কোমল আলোর ভর্‌লো আকাশ
নাচের পুলক লাগে।
আমার গোপন প্রেমের কমল
রূপে-রসে জাগে।
আজ্‌কে রাতের নিমেষগুলি
মোহন সুরে উঠুক্ দুলি'—
বরণ-মালার গন্ধ মিলুক্ প্রাণের অনুরাগে॥
ক্ষণিক আমার সুখের রাতি!
কেন রজনী মোর সাজায় বাসর
বিরহ মোর দিনের সাথী।
পুর্ণিমা-চাঁদ উঠ্‌লো নভে
মিলন-ক্ষণের বাঁশীর রবে—
সুর মিলালো আনন্দ মোর করুণ-বিধুর রাগে।

রণাদিত্য। মহারাণী—অকারণ এই বিরহের সুর তোমার কণ্ঠে জেগে উঠেছে কেন?

অনুরূপা। স্বামী—আমার সব সময়েই মনে হয়—তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার নেই।

রণাদিত্য। মহিষী—মিথ্যা তোমার আশঙ্কা! তুমি আমার জীবনের একমাত্র গৌরব—একটি আনন্দ!

অনুরূপা। কিন্তু এ আনন্দ কি চিরদিনের হ'য়ে উঠ্‌বে না?

রণাদিত্য। যতদিন জীবন—ততদিন এই আনন্দের পরমায়ু—দেবী!

অনুরূপা। স্বামী—তুমি শুধু একবার বলো—আমাকে কোনোদিন ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে না।

রণাদিত্য। কেন এ সন্দেহ—রাণী! শুধু মুখের কথাই কি তুমি বড় ক'রে জান্‌বে? অন্তরের বাণী কি তোমার কাছে পৌঁছোয় নি?

অনুরূপা। প্রভু, আর আমার গর্ব্ব নেই। আজ যেন সব নির্ভরতা হারিয়ে ফেলেছি। এই নারীকে তোমার হৃদয়-সিংহাসনে তুলে নাও।

রণাদিত্য। মহাদেবী—আমাকে বিস্মিত করেছ! কেন তোমার এই ব্যাকুলতা!

অনুরূপা। এর-কারণ কেমন ক'রে বলি? সে-শক্তি আমার নেই।—ঐ—সুখের রাত্রি চ'লে যায়।

গান

আহা মধু-জীবনের সোনার কুসুম
পথ-ধূলি 'পরে ঝরে যায়।
ওগো ভেসে চলে সে-যে অসীমের পানে
কালের মায়ার ঝরণায়।
চির-বিরহের করুণ বারতা
বাজায় নিখিলে সে কোন্ দেবতা—
হায় শেষ কলি যে-গো ওঠে নাই ফুটে—
শোভে নাই ভরা সুষমায়॥

গান দূরে অপসরণ ও অবসিত

রণাদিত্য। এ কি—কোথায় মিলিয়ে গেল আমার মহিষী!—মহারাণী—রণারম্ভা!—

রণারম্ভা। দেব—!—

রণাদিত্য! এ কি তোমার রূপ! এই ছিলে প্রেমময়ীরূপে—আর পরমুহূর্ত্তেই জ্যোতির্ম্ময়ীরূপে প্রকাশিত হ'লে!

রণারম্ভা। স্বামী—আমি তোমার নর্ম্ম-সখী নই, কর্ম্ম-সঙ্গিনী!—শোনো প্রভু! তোমার 'পরে আমি অনুকূল হ'য়ে তোমাকে তিন শত বৎসর পরমায়ু জগদীশ্বরের শক্তিতে দান কর্‌ছি। আর তোমাকে একটি মন্ত্রসিদ্ধি দান কর্‌বো।—সিদ্ধব্রহ্মা!—

গম্ভীর সঙ্গীত-মন্দ্র

ব্রহ্মা। দেবী!

রণারম্ভা। রাজাকে হাটকেশ্বর মন্ত্রসিদ্ধি দান করো।—শোনো—এই মন্ত্র।

কানে কানে মন্ত্র-দান

ব্রহ্মা। (বেদমন্ত্র)

হাটকেশং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।

রণারম্ভা। মহারাজ—তুমি এই মন্ত্রজপে পরম সিদ্ধিলাভ কর্‌বে। আর সাধনার বলে তুমি পাতাল-রাজ্যের অধিকার পাবে। আমি আজ সত্যমুক্ত। তুমি এই প্রেমময়ী ললনা মহিষী রণারম্ভার অনুরূপাকে বরণ করে ধন্য হও। আমার ধরণীর কার্য্য শেষ হয়েছে। জেনো রাজা, আমি বিষ্ণুশক্তিরূপা ভ্রমরবাসিনীর অবতার। এবার আমি শ্বেতদ্বীপে প্রয়াণ কর্‌বো। যেদিন এই সংসার অরুণ দৈত্যের অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে উঠ্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে আবার হ'বে আমার আবির্ভাব—ভ্রামরীরূপে।

ব্রহ্মা। ধন্য দেবীর মহিমা! দেবী ভ্রামরীর গৌরব-গান আজ বিশ্ব-নিখিলে মুখর হ'য়ে উঠুক্।

গান

তব মহিমা কি যে রাগিণী
মর্ম্ম-বীণা-তারে ঝঙ্কারি' তোলে।
সে-গীতিকা ভবনে ভবনে গুঞ্জরে,
সুন্দর-রাগে বিশ্ব-হিয়া দোলে।
অনুখন জাগি তন্দ্রাহারা রজনী—
তব মন্দির-দ্বারে বন্দনা-তরে
মনোমোহিনী জননী।
তৃষিত ভুবন প্রেম-অঞ্জলি রচিছে উন্মন।

সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস—ক্রমাবসান—
শেষ বন্ধ

দেবী রণারম্ভা স্বামীর পরে অনুকূল হ'য়ে তাঁকে সুদীর্ঘজীবন ভোগ কর্‌বার মত বহু বৎসর পরমায়ু ও হাটকেশ্বর মন্ত্রসিদ্ধি দানে পরমানন্দ নিয়ন্ত্রিত করেন। এরই ফলে ইষ্টকাপথ ও নন্দিশিলা খ্যাত দুই স্থানে সাধনা ক'রে মহারাজ রণাদিত্য পাতাল-পুরীর আধিপত্য লাভ করলেন। চন্দ্রভাগা নদীর জলমধ্যে ছিল নমুচি দানব নির্ম্মিত পাতাল-প্রবেশের বিবর-দ্বার। সেই পথ দিয়ে মহারাজ প্রবেশ করলেন পাতালে। ঐ গুহামুখ একুশ দিন উন্মুক্ত ছিল। ঐ দ্বার দিয়ে কেবল রাজা নয়, তাঁর প্রজাপুঞ্জও পাতালে গমন ক'রে নাগকন্যা ও দানব-রমণীগণের সঙ্গে নানারকম অলৌকিক ভোগ-সুখে তৃপ্ত হলেন। এই হোলো প্রসিদ্ধি।

নরপতি রণাদিত্য প্রজাদের নিয়ে পাতাল-রাজ্যে প্রবেশ কর্‌বার পরে বিষ্ণুশক্তিরূপা ভ্রমরবাসিনীর অবতারভূতা মহিষী রণারম্ভা মর্ত্ত্যের জীবনে সমাপ্তি এনে দিয়ে শ্বেতদ্বীপে প্রস্থান করলেন।

আরশি-ধারী

লোকটি একখানা ছোট আরশি নিয়া ঘোরে···পাগল নয় তো? কয়দিন কলেজ বন্ধ···কাগজ গল্প চা খাওয়া গুজব···কিছুতে আর মন বসে না···লোকটার সঙ্গ নিলাম। বিচিত্র ধরণের লোক।

বেলা বোধ হয় চারটা সাড়ে চারটা। লোকটার দূরে দূরে চলিয়াছি। সে থমকিয়া দাঁড়াইল একটা ভাড়াটে বাড়ির কাছে। ভিখারীর দল দুয়ারে ধন্না দিতেছে। ভাড়াটে এই হাপ-সহরটির উপর ভারি চটিয়া আছে। গরীবের দেশ···সব ব্যাটা চোর···না আছে ফোন্—না আছে পুলিশ। বাড়ির দুয়ারে ভিখারী আসিলেই তাড়া করে। বেয়ারাকে নিয়া বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইতেছে···দরজা খুলিতেই ভিখারীরা তাহাদের গালি দিয়া মারিতে লাঠি তুলিল। পাগল আরশি নিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাবু বলিল—কি চাও? পাগলা বলিল—একবার চান তো এ দিকে! বাবু 'শালা' বলিয়া তাড়া করিয়া আসিল। পাগলা হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া বলিল—চেয়েছে চেয়েছে। বাবু বলিল—ভয় দেখাতে এসেছ···পুলিশে খবর দেবো। পাগলা আবার হাসিল হোঃ-হোঃ-হোঃ। বলিল—চেয়েছে···চেয়েছে যখন আর রক্ষে নেই! বাবুর বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইল···বাড়ি থেকে চাউল আনাইল···ভিখারীদের চাউল দিল পয়সা দিল। পাগলা আবার বাবুর মুখের কাছে আরশি নিয়া ধরিল। বাবু বলিল—আবার কি? পাগল বলিল—এবার ঠিক ছবি দেখুন···মানুষের ছবি···প্রতিবেশী এরা···এরা পাহারা দেবে···প্রতিবেশী পাহারা। সে আবার ছুটিল···আমি ছুটিয়া পারি না। আসিতেছিল একটা কীর্ত্তনের দল···অনেক মেয়ে পুরুষ—বাবাজী মাতাজী। আরশি নিয়া সে ছুটাছুটি করিতেছে। মুখে বলিতেছে—ঠিক যেন ল্যেংড়া আম···টক্‌ও আছে মিষ্টিও আছে···যেন শনি মঙ্গলের অনাসৃষ্টি পুলিস গুণ্ডা গোয়েন্দা···গাধা ঘোড়ার গোষ্ঠী এত বাড়ছে যে সৃষ্টি ছেয়ে যাবে! আবার সে ছুটিল।

সন্ধ্য পূজা হইয়া গিয়াছে···বলির রক্ত খাইতেছে কুকুরের দল···সিন্দুরের টিপ পরিয়া কালী মূর্ত্তি। পাগল তার আরশি নিয়া ধরিল। বলিল—চোখে হুতাশ আছে কি···দেখ দেখ পঞ্চদশীর অপমান···শুধুই বিকৃতি···বারে সেবা নিচ্ছিস বেশ। বেশ্যার বাড়ি পূজা···বেশ্যা বাহিরে আসিয়া কটু গালি দিল···তার সহচর মাতাল দল ইট ছুড়িল···পাগলের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। পাগল ছুটিয়া চলিল। শোনা গেল বেশ্যার চিৎকার—বাবা বাবা···শ্মশান-বাবা···। ছুটিতে ছুটিতে পাগল আরশিকে বলিতেছে—আত্মদর্শন কি দেখাল?···ওরা ফিরবে ফিরবে···প্রাণ আছে যে···মরা তো নয়···মরা ফেরে না!

আমি এখনো ছুটিতেছি তার সঙ্গে। শ্মশানের ধারে একটা বট গাছের কাছে তার আরশি নিয়া দাঁড়াইল। গাছের আবছা ছবি তাহাতে পড়িল। আমায় দেখিয়া বলিল—দেখ দেখ কেমন দাঁড়িয়ে আছে···আসল লোকের মতো দাঁড়িয়ে আছে···দিচ্ছে সবাইকে আশ্রয়···খেতে দিচ্ছে তার ফল···আদি যুগের নিদর্শন কি-না···।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে···ফিরিবার চেষ্টা করিতেছি পাগল বলিল—আরশিতে মুখ দেখবি না?···দেখ দেখ। জন্মকালে তোর চন্দ্র কিন্তু শনির দৃষ্টি—সাধু হবি···চন্দ্র সূর্য্য কবিত্ব দেয়—কবি হবি···জন্মের দ্বিতীয় দ্বাদশ ঘরে এক গ্রহ—কে তুই রে? পাগলের চিৎকারে কাঁপিয়া উঠিলাম···দেখি সে লাফাইয়া নদীতে গিয়া পড়িল। পাশ দিয়া দুইটা শিয়াল ছুটিয়া গেল···শিহরিয়া উঠিলাম। ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটিতেছি।

চল্‌তি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

উত্তর আফ্রিকা

গত এক মাসে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে যথেষ্ট পরিবর্তন আসিয়াছে। ২৩শে অক্টোবর মিত্রশক্তি জেনারেল রোমেলের বাহিনীকে অপ্রত্যাশিত না হইলেও অতর্কিতভাবে যে আক্রমণ করেন, জেনারেল রোমেল আজও সে আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন নাই। আক্রমণারম্ভের পূর্বে বৃটিশ বাহিনী আপনাকে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। রোমেলের সমর সম্ভার অপেক্ষা মিত্রশক্তিবাহিনীর সমরোপকরণের সংখ্যা বর্তমানে অধিক। তাহার উপর ভৌগলিক সুবিধাও বৃটিশ বাহিনীর অনুকূলে। হাজার মাইল ব্যাপী সরবরাহসূত্রের সকল সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া সাফল্যজনক আক্রমণ পরিচালন যথেষ্ট দুঃসাধ্য নিঃসন্দেহ; সে স্থলে বৃটিশ বাহিনীর প্রধান সরবরাহকেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া হইতে রণাঙ্গন পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব যথেষ্ট অল্প এবং সরবরাহসূত্র রক্ষাও অল্পায়াসসাধ্য। ফলে জেনারেল রোমেলকে অতর্কিত প্রচণ্ড আক্রমণে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। জেনারেল রোমেলের আশা ছিল হালফায়া গিরিবর্ত্মে মিত্রশক্তিকে প্রতিরোধার্থ হয়ত তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং সেই-খানেই তাঁহার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিবর্তিত হইবে আক্রমণাত্মক সংগ্রামে। কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হয় নাই। মিত্রশক্তির প্রবল আক্রমণের চাপে এবং আত্মরক্ষার্থ রণকৌশল পরিচালনের উপযোগী স্থানের সন্ধানে জেনারেল রোমেলকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতে হইতেছে। বার্দিয়া, সালাম, তব্রুক, বেনগাজী একে একে মিত্রশক্তির হাতে আসিয়াছে। এগ্‌দাবিয়া এবং গিয়ালো মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে লিবিয়ার অভ্যন্তরে এল্‌ আঘেলিয়ার ৩০ মাইল পূর্বে। মিত্রশক্তির লক্ষ্য ত্রিপলি।

জেনারেল রোমেলের বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়া মিত্রশক্তির এই অগ্রসর যথেষ্ট কৃতিত্বের। মিত্রশক্তির সুবিধার বিষয়গুলি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মিত্রশক্তির বাহিনী বর্তমানে লিবিয়ার পশ্চিমাংশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ তাহার মধ্যেও দীর্ঘ সরবরাহ সূত্র রক্ষার প্রশ্ন আছে। বার্দিয়া অধিকারের সময় মিত্রশক্তির দ্রুতঅগ্রসরও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে মাত্র দুই দিনে মিত্রশক্তির বাহিনী ১৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। জেনারেল রোমেলের বাহিনী আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার দ্বারা অগ্রসর হইবার কালে কোনদিন এই অনুপাতে পথ অতিক্রম করিতে পারে নাই। অবশ্য এই স্থলে অনেকে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রোমেলের বাহিনী এখন দ্রুত পশ্চাদপসরণেই সচেষ্ট। কিন্তু তাহাতে কি এই কথাই প্রমাণিত হয়না যে, রোমেলের আক্রমণের সময় মিত্রশক্তি বাহিনী দীর্ঘকাল ধরিয়া জার্মান সৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে!

এতদ্ব্যতীত মিত্রশক্তির এই দ্রুত বিজয়লাভ এবং রোমেলের পশ্চাদপসরণের মধ্যে আরও কারণ বর্তমান। মিত্রশক্তিবাহিনীর নৈতিক শক্তি বর্তমানে যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই অনুপাতেই তাহার অভাব ঘটিয়াছে জার্মান বাহিনীতে। ইহার কারণ উত্তর আফ্রিকায় মার্কিন সৈন্যের অবতরণ।

নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষভাগে মার্কিন সৈন্য উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় অবতরণ করিতে সুরু করে। একই সঙ্গে মরক্কো এবং অ্যালজিরিয়াতে সৈন্য অবতরণ করান হয়। মার্কিন সৈন্য অবতরণের পরই সাফি, রাবাৎ এবং সিদিফেরুক দুর্গ অধিকার করে। নভেম্বরের ১০ তারিখেই মার্কিন সৈন্য ওরান-এ প্রবেশ করে এবং টিউনিস্‌-এর দিকে অগ্রসর হয়। টিউনিস সীমান্তের একশত মাইল দূর হইতেই মার্কিন বাহিনী জার্মান সৈন্য কর্তৃক উল্লেখযোগ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। টিউনিস এবং বিজার্টায় জার্মান ও ইটালীয় বাহিনী অবতরণ করিয়াছে। বিমান হইতে জার্মান সৈন্যের জন্য ট্যাঙ্ক নামান হইয়াছে। বর্তমানে মার্কিন সৈন্য বিজার্টার নৌঘাঁটি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে সচেষ্ট।
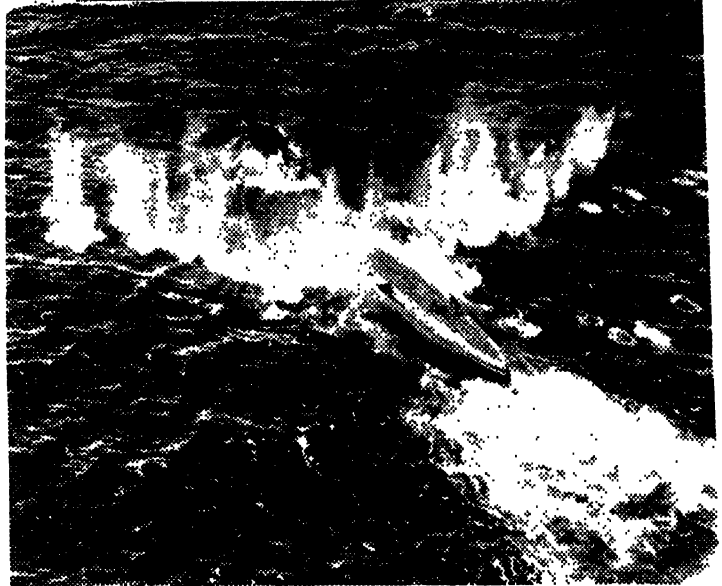
রাজকীয় বিমান বাহিনীর "সানডারল্যাণ্ড এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্‌" কর্তৃক ইউ-বোট আক্রমণ

মার্কিন সৈন্য উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ ও জার্মান সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করায় অনেকে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। মিত্রশক্তি কর্তৃক অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্ট হইল বলিয়াও অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রণনীতি চলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাবাবেগের স্থান সেখানে নাই। মিত্রশক্তির আক্রমণ পর্যায়ের সূচনাতেই অতি দ্রুত মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার রণাঙ্গনের গুরুত্ব ও জার্মানীর সম্ভাবিত রণকৌশল ও পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রথমে মনোযোগ প্রদান আবশ্যক।

মার্কিন সৈন্য আফ্রিকায় অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী যে

টিউনিস ও বিজার্টায় কেবল সৈন্য ও সমর সম্ভার প্রেরণ করিয়াছে তাহা নহে, অনধিকৃত ফ্রান্সেও জার্মান সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। ১৯৪০ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের পতনের পর অধিকৃত ও অনধিকৃত ফ্রান্সের মধ্যে যে একটি কৃত্রিম ভেদ রেখা ছিল, জার্মান সৈন্যের প্রবেশারম্ভের সঙ্গে তাহার অবসান ঘটিয়াছে। ফ্রান্সের সহিত জার্মানীর যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হইয়াছিল জার্মান বাহিনীকে অনধিকৃত ফ্রান্সে প্রবেশের আদেশ দানে যে হিটলার সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছেন একথা উল্লেখ না করিলেও চলে। এই আদেশের কারণ প্রদর্শন করিয়া হিটলার ভিসি সরকারকে যে পত্র প্রদান করেন তাহাতে প্রকাশ যে, জার্মান সরকার সৈন্য পরিচালনার আদেশ প্রদানের মাত্র ২৪ ঘণ্টা পূর্বে জানিতে পারেন যে 'শত্রুপক্ষ' কর্সিকা এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাহাদের পরবর্তী আক্রমণ পরিচালনার উদ্যোগ করিতেছে। জার্মান বাহিনী অনধিকৃত ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করার পর ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের সকল লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়। কর্সিকাতেও বহু জার্মান সৈন্য ও বিমান আনীত হইয়াছে। নিস্‌-এ ইটালীয় বাহিনী প্রবেশ করিয়াছে। হিটলার যে আফ্রিকার যুদ্ধে সহজে পশ্চাদপসরণে অনিচ্ছুক তাহা জার্মানীর উদ্যোগ আয়োজনেই প্রকাশ। যখনই সামরিক দিক হইতে কোন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অধিকার লইয়া সংগ্রাম হইয়াছে তখনই আমরা জার্মান বাহিনীকে অজস্র সমর সম্ভার ও সৈন্য ক্ষয়ের বিনিময়েও সেই অঞ্চলে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা বা দখল কায়েম রাখিবার জন্য যুদ্ধ চালাইতে দেখিয়াছি। আর বর্তমান ক্ষেত্রে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার গুরুত্ব যে অত্যন্ত অধিক ইহাও হিটলার জানেন। ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মিত্রশক্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ইটালী এবং দক্ষিণ ফ্রান্স বিপন্ন হইবে। তুলোঁতে যে সকল ফরাসী রণতরী আছে সেগুলিরও মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদানের আশঙ্কা হিটলার মনে মনে পোষণ করেন। ফরাসী রণতরী সকল যাহাতে মিত্রশক্তির নৌবহরের সঙ্গে যোগদান করিতে না পারে সম্ভবতঃ সেই জন্যই হিটলার অত দ্রুত সমগ্র অনধিকৃত ফ্রান্সে জার্মান বাহিনী সমাবেশ করিয়াছেন। সিসিলি এবং সার্ডিনিয়াতে বহু সৈন্য ও বিমান সমাবেশ করা হইয়াছে। ইটালী এবং ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন। এই সকল কারণেই হিটলার কর্তৃক টিউনিস এবং বিজার্টায় এত অধিক সৈন্য প্রেরিত হইতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সিসিলি হইতে টিউনিসের দূরত্ব মাত্র দেড়শত মাইল। এদিকে সিসিলির কিঞ্চিদধিক ৫০ মাইল দক্ষিণে প্যাণ্টালেরিয়া দ্বীপ ইটালীর অধীন। হিটলার যদি এই অঞ্চলে আপন প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারেন

মল্টায় আক্রমণকারীদের প্রতিহত করিবার জন্য বেড়া বাঁধা হইয়াছে

তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব হইবে। সিসিলি এবং প্যাণ্টালেরিয়ার মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ জাহাজ গমনাগমনের পথ। উক্ত পথ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে পারিলে জিব্রাল্টার ও আলেকজান্দ্রিয়ার যোগাযোগ ব্যাহত করা সম্ভব। এদিকে টিউনিস ও বিজার্টা হইতে প্যাণ্টালেরিয়া, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, কর্সিকা হইয়া ইটালী এবং ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ রক্ষা অধিকতর সহজ। একে এই স্থানে ভূমধ্যসাগর অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, তদুপরি দ্বীপগুলি অধিকারে থাকায় সরবরাহ প্রেরণ ও রণক্ষেত্রের সহিত সংযোগ রক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

আরও এক কারণে পশ্চিম ভূমধ্য সাগরের উক্ত অঞ্চলে জার্মানীর পক্ষে তৎপর থাকা প্রয়োজন। একদিকে যেমন ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূল এবং তুলোঁস্থিত ফরাসী নৌবহর রক্ষা করা প্রয়োজন তেমনই স্পেনের দিকেও নজর রাখা আবশ্যক। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নাৎসী প্রীতি সন্দেহের বিষয় না হইলেও যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় স্পেন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে সে বিষয়ে যুধ্যমান রাষ্ট্রগুলির যথেষ্ট নজর আছে। সুইজারল্যাণ্ড-এর ন্যায় স্পেনও বর্তমান যুদ্ধে এ পর্যন্ত নিরপেক্ষ আছে এবং সম্প্রতি জেনারেল ফ্রাঙ্কো জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধরত যে রাষ্ট্র স্পেনের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিবে স্পেন তাহার বিপক্ষের সহিত যোগদান করিবে। কিন্তু পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধে স্পেন যে পক্ষের সহিত যোগদান করিবে রণকৌশল পরিচালনার দিক হইতে সেই পক্ষ সুবিধা লাভ করিবে যথেষ্ট বেশী। স্পেনের অধিকারভুক্ত ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ এবং বেলিয়ারিক দ্বীপের গুরুত্ব বর্তমানে অত্যন্ত অধিক। স্পেন সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য জার্মানী পিরানিজ-এ দীর্ঘ ১৪০ মাইল ব্যাপী ফ্রান্স-স্পেন-সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। এদিকে জিব্রাল্টার প্রণালীতে জার্মান সাবমেরিণের তৎপরতা সম্প্রতি অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্তমানে টিউনিসিয়াতে জার্মান বাহিনীর সহিত মার্কিন বাহিনীর সঙ্ঘর্ষ ক্রমশই প্রবলতর আকার ধারণ করিতেছে। মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতি যথেষ্ট মন্দীভূত। মিত্রশক্তির বিমান বহর বিজার্টার উপর দিবারাত্র বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। নাৎসী সৈন্যের সাহায্যার্থ টিউনিস্ এবং বিজার্টায় যথেষ্ট বিমান আনীত হইয়াছে। রণাঙ্গনে বিমান প্রাধান্য স্থাপনে উভয় পক্ষই যথেষ্ট সচেষ্ট। স্থল ও বিমান বাহিনীর সহিত নৌশক্তির উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম ভূমধ্য সাগরে প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইলে নৌ সংগ্রাম অনিবার্য এবং বর্তমান সমষ্টি সংগ্রামে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষা ব্যতীত সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, মিত্রশক্তি প্রবল জার্মান বাধা ভেদ করিয়া টিউনিস্-এর ১০ মাইল দূরে উপস্থিত হইয়াছে। এদিকে তুলোঁ-স্থিত ফরাসী নৌবহর জার্মানীর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আত্মনিমজ্জন করিয়াছে। ভিসি রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, হিটলার মার্শাল পেতাঁকে লিখিত পত্রে অভিযোগ করিয়াছেন যে, যদি তুলোঁতে মিত্রশক্তির বাহিনী অবতরণ করে তাহা হইলে যেন তাহাদের বিরুদ্ধে গুলি গোলা ছোড়া না হয় এই মর্মে তুলোঁর রক্ষী বাহিনী ফরাসী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রতিবিধানের জন্যই নাকি হিটলার ঐ বাহিনী অবিলম্বে ভাঙিয়া দিতে আদেশ দিয়াছেন এবং ফন্ রুন্‌সটেড্-এর উপরই সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সে সামরিক শক্তির মধ্যে যে বিভেদ আসিয়াছে তাহা স্পষ্ট। অ্যাড্‌মিরাল্ দারলাঁ সম্বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রিসভা বর্তমানে বিশেষ কিছু নির্দিষ্টভাবে জানাইতে অনিচ্ছুক হইলেও

দারলাঁর কার্যকলাপ যে বর্তমানে মিত্রশক্তির অনুকূল তাহা নিঃসন্দেহ। টিউনিসিয়াতে মার্কিন সৈন্তের সহিত করাসী সৈন্তও জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। তুলোঁয় করাসী নৌবহরের আত্মনিমজ্জন সম্বন্ধে যে সংবাদ রয়টার আমাদিগকে পরিবেশন করিয়াছেন ত'হার গুরুত্ব আদৌ অল্প নয়। ভূমধ্য সাগরে প্রাধান্ত রক্ষা করিতে হইলে নৌশক্তির একান্ত প্রয়োজন এবং করাসী নৌবহরের উপর জার্মানী অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার যুদ্ধে টিউনিস্ এবং বিজার্টার গুরুত্ব যেমন যথেষ্ট, ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী ও ভূমধ্য সাগরের প্রশ্নও তেমনই ইহার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই সকল কারণে মার্কিন সৈন্ত উত্তর আফিকায় অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল সমালোচক 'সকল সমস্তার আশু সমাধান হইল' বলিয়া উল্লসিত হইয়াছেন, সকল বিষয় পর্যালোচনের পূর্বেই ঐ ধরণের মত প্রকাশ অসমীচীন বলিয়া আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভে অভিমত প্রকাশ করিয়াছি। দূরদর্শী এবং স্পষ্ট বক্তা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সেদিন স্বয়ং আফিকার যুদ্ধ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ইহা শেষের আরম্ভ নয়, আরম্ভের শেষ। অর্থাৎ নাটকের পঞ্চম অঙ্কের ইহা সূচনা নয়, ইহা তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশ মাত্র। উত্তর আফিকায় মিত্রশক্তির প্রধান সৈন্তাধ্যক্ষ জেনারেল আইসেনহাওয়ার-এর সহিত আলোচনান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া জেনারেল স্মাটস্-এর অভিমত—I do not want the impression spread that it is a clear road to victory, but it is a clear road away from defeat. ইহা বিজয়ের প্রশস্ত পথ এই ধারণার প্রচার আমি চাহি না, কিন্তু ইহা পরাজয় হইতে দূরে সরিবার রাজপথ। দ্বিতীয় রণাঙ্গন হিসাবে এই যুদ্ধের মূল্য কতখানি রুশ-জার্মান সংগ্রাম আলোচনা কালে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

ব্রিটিশ মহিলা বিমান বাহিনীর কর্ম্মিগণ কর্তৃক একটি কারখানায় "ওয়েলিংটন" নামক যুদ্ধ-বিমানের কলকব্জা পরিষ্কার

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

'ভারতবর্ষ'-এর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্ট্যালিনগ্রাডে জার্মান বাহিনী সম্বন্ধে আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। রুশিয়ায় তুষারপাত আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালফৌজ আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা সুরু করিয়াছে। গত বৎসর শীতের প্রারম্ভ হইতে দেড় হাজার মাইল বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে রুশিয়ার যে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হইয়াছিল, এ বৎসরও সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসরের মত শীত এখনও রুশিয়ায় পড়ে নাই, অথচ এই বৎসরের আক্রমণাত্মক অভিযানের প্রচণ্ডতা যেমন গত বৎসর অপেক্ষা ভীষণতর, তেমনই বর্তমান বৎসরে পুনরাঘাত সহ্য করা জার্মানীর পক্ষে আরও কঠিন। মস্কোর উত্তর-পশ্চিমে কালিনিন রণক্ষেত্রে রুশিয়ার আক্রমণের তীব্র বেগ নাৎসী বাহিনী প্রতিহত করিতে পারে নাই। লালফৌজ যে নাৎসী বাহিনীকে ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে বার্লিন হইতে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে। স্ট্যালিনগ্রাড অঞ্চলে জার্মানীর অবস্থা আরও শোচনীয়। স্ট্যালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী প্রবল প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে; 'ট্যাঙ্ক-সহরের' অভ্যন্তরে কারখানা অঞ্চলে যেখানে নাৎসী আক্রমণ অতি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল সেই স্থানেও রুশবাহিনী নাৎসী বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে। ভলগা এবং ডনের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যুদ্ধরত জার্মান বাহিনী অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম। কাচালিন্স্ক-এর নিকটস্থ ডনের সুদীর্ঘ বাঁক হইতে স্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত অঞ্চলে যে নাৎসী বাহিনী 'ট্যাঙ্ক-সহর' দখলের শেষ চেষ্টা করিয়াছে, লালফৌজের সাঁড়াশী অভিযানের চাপে সেই ৪০০,০০০ নাৎসী সৈন্তের বন্দী হইবার আশঙ্কা উপস্থিত। স্ট্যালিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ রেলপথ দুইটি রুশবাহিনী পুনরধিকার করায় ককেশাসস্থ জার্মান বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও সরবরাহ ব্যাহত হইয়াছে, বার্লিন হইতে রুশ আক্রমণের গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। জার্মান বাহিনী যাহাতে ডন অতিক্রম করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতে সক্ষম হয় উৎকণ্ঠিত নাৎসী সৈন্তাধ্যক্ষমণ্ডলী তাহারই চেষ্টায় বিব্রত! প্রচণ্ড নাৎসী আক্রমণ এবং তাহার বেগ সহ্য করিয়া স্ট্যালিনগ্রাডের আত্মরক্ষা যেমন ঐতিহাসিক ব্যাপার, রুশ বাহিনীর এই বেষ্টনী বিফল না হইলে জার্মান বাহিনীর এই অবরোধ তেমনই ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই বলিয়াছিলাম যে, জার্মানীর স্ট্যালিনগ্রাড আক্রমণ ও অধিকার প্রচেষ্টা বর্তমানে এক সমস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিরাট নাৎসীবাহিনীকে যদি সাফল্যের সহিত অপসারিত করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে জার্মানীর পক্ষে এই আঘাত হইবে অপূরণীয়। গত বৎসর রুশ আক্রমণে শীতের সময় জার্মানীর যে ক্ষতি হইয়াছে এই বিপর্যয়ের তুলনায় তাহা অত্যল্প। তুয়াপ্‌সে অভিমুখী জার্মান বাহিনীও বর্তমানে আত্মরক্ষামূলক অভিযান পরিচালনা করিতেছে। ফলতঃ, সমগ্র ককেশাসে জার্মান বাহিনী আসন্ন বিপদের সম্মুখীন।

গত ৮ই নভেম্বর বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিটলার জানাইয়াছেন যে, ১৯১৮ সালেই জার্মানী যুদ্ধ জয় করিতে পারিত, কিন্তু জার্মানী তখন জয়ের উপযুক্ত ছিল না। বর্তমানে ভাগ্যদেবী যোগ্যের কণ্ঠেই বিজয়মাল্য অর্পণ করিবেন। যদি কেহ প্রশ্ন করে স্ট্যালিনগ্রাড অধিকার করা

হইল না কেন, তাহার উত্তর—স্ট্যালিনগ্রাড দ্বিতীয় ভার্দুনের উপযুক্ত নয়। ১৯৪১ সালের শেষ পর্যন্ত হিটলারের বক্তৃতার সহিত যাঁহারা পরিচিত, হিটলারের এই প্রলাপোক্তির সুর যে আজ কোথায় নামিয়াছে তাহা তাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট। দ্বিতীয় ভার্দুনের উপযুক্ত নয় বলিয়া ঘোষণা করিলেও বিরাট নাৎসী বাহিনীর আত্মরক্ষার উপায় বিঘ্নসঙ্কুল করিয়াও হিটলার তাহাদিগকে স্ট্যালিনগ্রাডে অভিযানে পরিচালনা করিতে বাধ্য করিয়াছেন। বর্তমান মহাযুদ্ধে ভার্দুনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে না বলিয়া দম্ভোক্তি করিলেও আজ স্ট্যালিনগ্রাড নাৎসী ক্ষতির প্রচণ্ডতার দিক দিয়া দ্বিতীয় ভার্দুনে পরিণত হইতে চলিয়াছে। লালফৌজের প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ৬৩,০০০ নাৎসী সৈন্য বন্দী হইয়াছে। বিনষ্ট ও রুশবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত রণসম্ভারের পরিমাণ অপরিমিত।

জার্মানীর বর্তমান বিপর্যস্ত অবস্থার জন্য হিটলারের দুইটি ভুল হিসাবই মূলতঃ দায়ী। ১৯৪১ সালে ২২-এ জুন হিটলারের রুশিয়া আক্রমণ উক্ত দুই ভুলের একটি। দশ সপ্তাহের মধ্যে হিটলার রুশ যুদ্ধের চরম পরিণতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। কিন্তু আজও হিটলারকে সেই যুদ্ধের জের টানিয়া চলিতে হইতেছে। জার্মানীর প্রভূত রণসম্ভার বিনষ্ট হইয়াছে, অসংখ্য নাৎসী সৈন্য প্রাণ দিয়া আজও হিটলারের এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চলিয়াছে। হিটলারের দ্বিতীয় ভুল আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। একই সঙ্গে একাধিক রণাঙ্গনের সৃষ্টি যে বিপজ্জনক এবং সাফল্যের পরিপন্থী গত মহাযুদ্ধেই জার্মানী সেই শিক্ষালাভ করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধে হিটলার তাই একই সঙ্গে একাধিক রণাঙ্গন সৃষ্টির অবস্থা সযত্নে এড়াইয়া চলিয়াছেন। একই সঙ্গে দুই রণক্ষেত্রের সৃষ্টি করিয়া সংহত শক্তিকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া জয়ের সম্ভাবনাকে সন্দেহের মধ্যে আনেন নাই; হিটলারের রণনীতির এই কৌশল সম্বন্ধে আমরা 'ভারতবর্ষ'-এ বহুবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। কিন্তু আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া হিটলার এই দুই রণাঙ্গনের বিপদকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অ্যাটলান্টিকে

ব্রিটেন আর্মি-কাউন্সিলের নূতন সভ্য লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল আর-এম-উইকম্

মার্কিন নৌবহরকে অবাধে ঘায়েল করিবার সুযোগ গ্রহণ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৃটেন অভিমুখী রণসম্ভার ও পণ্যবাহী জাহাজগুলিকে অবাধে বিনষ্ট করিবার পথ এই যুদ্ধঘোষণার দ্বারা প্রশস্ত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ ঘোষণার ফলে 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' যে জার্মানীর বিরুদ্ধে অন্য কোন রণাঙ্গনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইতে পারে সে বিপদকে হিটলার উপেক্ষা করিয়াছিলেন। অক্ষশক্তির অন্যতম সহযোগী জাপান কিন্তু আজও সেই ঝুঁকি আপনার স্কন্ধে গ্রহণ করে নাই। বৃটেন ও আমেরিকার সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকিলেও রুশিয়ার বিরুদ্ধে সে আজও যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, তাহার সহিত বাহ্যিক মিত্রতা আজও সে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

আফ্রিকায় মিত্রশক্তির দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সার্থকতা এইখানেই। সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণ মিত্রশক্তিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবার দাবী একাধিকবার জানাইয়াছে। মিত্রশক্তির একত্র বহনের বোঝার যে সমগ্র অংশ রুশিয়া একাকী বহন করিয়া চলিয়াছে তাহার সেই ভার লাঘব করা প্রয়োজন, প্রয়োজন নাৎসী শক্তির ধ্বংসের কাল আরও দ্রুত আগাইয়া আনা। কিন্তু উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির এই যুদ্ধ সৃষ্টিতে রুশিয়া কতখানি সাহায্য লাভ করিয়াছে, রুশ রণাঙ্গন হইতে জার্মানী কোন বাহিনী অথবা সমর সম্ভার আফ্রিকাতে আনয়ন করিয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে কোন সমর্থিত সংবাদ আজও জানা যায় নাই। নাৎসী অধীন ইয়োরোপের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ এখনও এই যুদ্ধে আপন মুক্তির পথ খুঁজিয়া পায় নাই। তবে উত্তর আফ্রিকার এই যুদ্ধ যদি মিত্রশক্তির সাফল্যের মধ্য দিয়া ইটালী এবং ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এই সংগ্রামই অদূর ভবিষ্যতে রূপান্তরিত হইবে বহু প্রার্থিত দ্বিতীয় রণাঙ্গনে।

সুদূর প্রাচী ও ভারতবর্ষ

অক্টোবরের শেষ দিকে সলোমন অঞ্চলে জাপ নৌবাহিনী মার্কিন নৌবহরের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিল তাহার বিবরণ আমরা 'ভারতবর্ষ'এর গত সংখ্যাতেই দিয়াছি। সলোমন হইতে জাপ নৌবহরের আপন ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনের সংবাদও কর্ণেল নক্স কর্তৃক ৩১এ অক্টোবর ঘোষিত হয়। কিন্তু সেই সময় একথাও জানান হইয়াছিল যে উহাই আক্রমণের চরম পরিসমাপ্তি নয়, প্রথম পর্য্যায়ের শেষ মাত্র।

জাপ আক্রমণের দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হয় ১৩ই নভেম্বর। নিউগিনিস্থ জাপবাহিনী এবং সলোমন অঞ্চলে জাপ নৌবহর তিন দিন তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু প্রথম আক্রমণের ন্যায় তাহা পর্যবসিত হয় জাপানের প্রভূত ক্ষতি স্বীকারে। ১০,০০০ জাপ সৈন্য এই যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। রণতরী এবং সরবরাহ জাহাজে মিলিয়া ২৮খানি জাপ জাহাজ উক্ত তিন দিনে সলিল সমাধি লাভ করিয়াছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজের সংখ্যা দশ। গুয়াদালকানারে কোলিপয়েন্টএর পূর্বে গত ২রা ও ৩রা নভেম্বর যে ১৫,০০০ জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল তাহাদের অর্দ্ধাংশ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অরণ্য অঞ্চলে পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। নিউগিনির গোরি অঞ্চলে ৫০০ জাপসৈন্য নিহত হইয়াছে। বুনা-গোনা অঞ্চলে যে তীব্র সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতেও জাপবাহিনী সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। অষ্ট্রেলিয়ানবাহিনী গোনায় প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে নিউগিনির উপকূলে জাপান যে দুইটি সুদৃঢ় ঘাঁটি লাভ করিয়াছিল তাহারই একটিকে হারাইতে হইল। ডারউইন্ বন্দরেও জাপবাহিনী বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। সপ্তাহকাল পূর্বে অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের উপরেও জাপ বিমানের তৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। জাপান যে সলোমন অভিযানের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বুনা অঞ্চলে তাহার প্রচণ্ড সংগ্রামেচ্ছার পরিচয় পুনরায় সৈন্য সমাবেশ ব্যবস্থা হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

পপুয়া অঞ্চলস্থ মিত্রশক্তি বাহিনীকে যে শীঘ্রই পুনরায় প্রবল সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহার আভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। নিউগিনি অঞ্চলে সম্প্রতি যে সকল জাপবাহিনী আসিয়াছে তাহাদের বলা হয় 'বিঘাত বাহিনী' (Shock troops) ; নাৎসী ঝটিকা বাহিনীর সহিত ইহাদের তুলনা করা চলে। সাধারণ জাপানী অপেক্ষা এই বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্যের উচ্চতা অধিক, শ্রমশক্তি এবং কষ্ট-সহিষ্ণুতাও সেই পরিমাণে অধিক। সামরিক শিক্ষাদানও তাহাদিগকে বিশেষভাবে করা হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা তাহারা যে ভাবে নিজেকে সজ্জিত করে তাহাতে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া ১১।১২ দিন পর্য্যন্ত তাহারা সচ্ছন্দে সংগ্রাম পরিচালনায় সমর্থ হয়। এই ধরণের কিছু সৈন্যই বাতানে সংখ্যাধিক মার্কিন বাহিনীকে এক পক্ষকাল ধরিয়া ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। বুনা অঞ্চলেও জাপান এই ধরণের বাহিনী আনয়ন করিয়াছে। নিউগিনিতে মিত্রশক্তির আক্রমণের প্রচণ্ডতায় দ্রুত পলায়ন কালে জাপ বাহিনী যে সকল পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে গুলি নিবারক জামাও পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া জাপান যে আপনাকে পুনরায় আক্রমণ পরিচালনার্থ প্রস্তুত করিয়া লইতেছে জাপানের কার্যক্রমই তাহার প্রমাণ।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানের অভিপ্রায় কি সে বিষয়ে আমরা 'ভারতবর্ষএর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যাহা বলিয়াছি তাহা এখনও পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। রাজকীয় বিমানবাহিনী ব্রহ্মদেশের বহু জাপ ঘাঁটিতে বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। মিঙ্গালাদন, টঙ্গু, মেইকটিলা, রেঙ্গুন প্রভৃতি বিভিন্ন ঘাঁটিতে বোমা বর্ষিত হইতেছে। জাপানও ব্রহ্মদেশে আপন শক্তি সমাবেশে যত্নবান। সালুইন নদীর পশ্চিম তীরে যথেষ্ট সৈন্য, ট্যাঙ্ক এবং নৌকাদি জাপান আনয়ন করিয়াছে। স্থলপথে ইন্দোচীনের মধ্য দিয়াও কিছু কিছু সমরোপকরণ থাইল্যাণ্ড এবং ব্রহ্মদেশে আনীত হইতেছে। একমাত্র সাইগনেই জাপবাহিনী ৩০০ বিমান আনয়ন করিয়াছে। কোয়াংচৌয়াংএ জাপ রণতরী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারত মহাসাগরে ১০,০০০ টনের একটি জাপ রেডার দুইখানি বিমান সহ সলিল সমাধি লাভ করিয়াছে। এই সকল আয়োজন এবং কার্যক্রম যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাহা নিঃসন্দেহে এবং জাপানের এই কার্যধারা 'ভারতবর্ষ'এর গত সংখ্যায় প্রকাশিত আমাদের বিশ্লেষণ ও অভিমতকেই সমর্থন করিতেছে। জাপান আপনাকে যতই শক্তিশালী মনে করুক না কেন, আপন স্বার্থ বিষয়ে সে অন্ধ নহে ; তাই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জার্মানী যে ভুল করিয়াছে, রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা অথবা সাইবেরিয়া আক্রমণ দ্বারা জাপান আজও সেই ভুল করে নাই। তাহার উপর আফ্রিকা এবং রুশিয়ার যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা দ্বারা জাপ রণনীতি এবং কার্যধারা যে প্রভাবান্বিত হইবে ইহাও অনস্বীকার্য। তাই আজও জাপান প্রকৃত সংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়া অপেক্ষা স্নায়ুযুদ্ধের দিকেই অধিক মনোযোগী। ভারতবর্ষের গুরুত্ব কতখানি তাহা জাপান জানে, ভারতবর্ষ লাভে তাহার সামরিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সুবিধা কি তাহাও জাপানের অজ্ঞাত নয়, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক অবস্থা জাপানের কতখানি অনুকূল অথবা প্রতিকূলে যাইবে সে হিসাবেও জাপান নিশ্চয় আজও বাকি রাখে নাই, তাহার সামরিক শক্তির বিচ্ছিন্ন অবস্থান সম্বন্ধেও সে সজাগ, ভারতের বর্তমান বর্দ্ধিত প্রতিরোধ শক্তির সংবাদও নিশ্চয় তাহার নিকট অসংগৃহীত নাই, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অনুপেক্ষনীয় গুরুত্ব সম্বন্ধেও সে নিশ্চয়ই উদাসীন নয়, ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে বর্ষারম্ভের পূর্বেই যে তাহা শেষ করিতে হইবে ইহাও জাপান বোঝে—তবুও জাপান কেন ব্রহ্মদেশে শক্তি সঞ্চয় ও আসাম অঞ্চলে বিমান আক্রমণ করিতেছে তাহা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় হইলেও 'ভারতবর্ষ'-এর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। 'ভারতবর্ষ'-এর পাঠকগণের নিকট উক্ত আলোচনা এবং অভিমত অজ্ঞাত নয় এবং আজও আমাদের উক্ত ধারণা পরিবর্তনের কোন উল্লেখযোগ্য কারণ ঘটে নাই। আফ্রিকা এবং ইয়োরোপের যুদ্ধে অক্ষশক্তির প্রতিকূল অবস্থা জাপান যেভাবে গ্রহণ করিবে তাহারই উপর জাপানের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি বর্তমানে যথেষ্ট নির্ভরশীল এবং জাপান সম্বন্ধে বর্তমানে উহাই প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়। ২৯.১১.৪২.

"…ধূসর ধূলায় ঢাকা রবে…"

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বন্ধু আমার ! দূর স্বপনের স্বর্ণশিখর দেশে,
উদয়-উষার প্রথম আলোক যদি না দেখিতে পাও,
অনন্ত অম্বরে,
রক্ত রবির রাগ লিপি যদি হারায় নিরুদ্দেশে,
তারেই আবার বারে-বারে কেন ফিরে ফিরে পেতে চাও
।?

কবে চলে গেছে কার কোন্ রথ !
কঙ্কর ভরা ধূলিময় পথ
চক্র চিহ্নে ক্ষত বিক্ষত—জীর্ণ বুকের মাঝে
শীর্ণ বাহুর বন্ধনে যদি বিদায়ের ব্যথা কাঁদে,—
গুঞ্জন-হীন কুঞ্জে তাহ'লে এসো না প্রাতে কি সাঁঝে
পূর্ণ ক'রো না জীবন তোমার আশাহীন অবসাদে।

সম্মুখে তব বিস্তৃত ঐ অদূর ভবিষ্যৎ—
দিগন্তে তার আলিপনা আঁকে আলো ছায়া মিশাইয়া,—
—হাসি আর ক্রন্দনে,—
সুরু হ'তে শেষে মিশে মিশে গেছে সেই দূর বন্ধুর পথ .
অন্তর আর বাহির মিশেছে যা কিছু গোপন নিয়া—
মুক্তি ও বন্ধনে।

যেটুকু লজ্জা. যেটুকু বা ভয়,
তারি এতটুকু ক্ষীণ সংশয়
এ পথে চলিতে ফেলে চলে যেও আবর্জ্জনার মাঝে,
যেমন সকলে যায়—
বহু পদরেখা অঙ্কিত পথ আবার প্রাতে কি সাঁঝে
ধূসর ধূলায় ঢাকা রবে পুনরায়।

জঙ্গম

বনফুল

৩১

করালিচরণের আকস্মিক অভ্যাগম ও অন্তর্দ্ধানে ভন্টু শঙ্করের বাবার উইল সম্বন্ধে প্রথমে হঠাৎ যতটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, পরে ততটা উদ্বিগ্ন সে আর রহিল না। প্রথম কারণ শঙ্করের নাগাল সে পাইল না—শঙ্কর বাড়িতেই থাকিত না, মুমূর্ষু ছবিকে লইয়া ব্যস্ত থাকিত। দ্বিতীয় কারণ ইন্দুমতী, ইন্দুমতীর বাবা, বাবাজী ওরফে মুক্তানন্দ স্বামী এবং আপিসের কাজকর্ম্ম তাহাকে এমন ব্যাপৃত করিয়া রাখিল যে শঙ্করের কথা তাহার আর মনেই রহিল না। অন্তর এবং বহির্লোকের নানা ঘটনা-পরম্পরা এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিল যাহাকে উপমার সাহায্যে পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হয় ঘূর্ণাবর্ত্ত।

ইন্দুমতী বড়লোকের মেয়ে, চিরকাল সুখে মানুষ হইয়াছে, বাপের বাড়িতে সর্ব্বদা তাহার সহিত ঝি-চাকর ঘুরিত। সম্প্রতি সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে, ঝি-চাকরের সংখ্যা দ্বিগুণিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু ভন্টু একটি চাকর ছাড়াইয়া দিয়াছে অর্থাৎ দিতে বাধ্য হইয়াছে। অসুস্থ বেতনহীন দাদার চেঞ্জের খরচ, শন্টু নন্টুর পড়ার খরচ, বিশাল বাড়িভাড়া, এতগুলি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন, ঔষধপত্র, লোক-লৌকিকতা এসব তো আছেই—তাহার উপর চাপিয়াছে বাবাজির গব্যঘৃত আলোচাল এবং বাকুর দুধ ও ঔষধ। বাকু অসুস্থ। তাঁহার শোথ হইয়াছে, কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। কবিরাজ মহাশয় অন্ন পথ্য নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ভন্টুকে চাকর ছাড়াইয়া দিতে হইয়াছে। ইন্দুমতীকেই সদ্যপ্রসূত শিশুর কাঁথা কাপড় স্বহস্তে কাচিতে হইতেছে। ইন্দুমতী অবশ্য কাচিতে আপত্তি করে নাই, হাসিমুখেই সে সব করিতেছে, কিন্তু ওই হাসির অন্তরালেই কি যেন একটা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হইতেছে যাহাতে বাবাজি ক্রুদ্ধ, বৌদিদি ভীত এবং ভন্টু উতলা হইয়া পড়িয়াছে। বৌদিদির অসংখ্য কাজ। তিনি ওঠেন ভোর পাঁচটায়, শুইতে যান রাত্রি এগারোটায় কিম্বা তাহারও পরে—ইহার মধ্যেও সময় করিয়া ইন্দুমতীর কাঁথা কাপড় কাচিয়া দিতে তিনি রাজি আছেন—কিন্তু ইন্দু কিছুতেই তাহা করিতে দিবে না, নিজেই কাচিবে। তাহার গোঁ দেখিয়া বৌদিদি হাসেন, একটু ভয়ও পান—বড়লোকের মেয়ে মনে মনে না জানি কি ভাবিতেছে।

সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বাবাজী একদিন আপিস-গমনোন্মুখ ভন্টুকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন—"তোর কি চোখ নেই? দেখতে পাস না, মেয়েটা খেটে খেটে ম'ল যে"

ভন্টু একটু হাসিল। তাহার পর বলিল, "কি আর এমন খাটছে ও। বৌদি ওর চেয়ে ঢের বেশী খাটেন"

"একটা মহিষের পক্ষে যা সহজ, বুলবুলির পক্ষে তা সহজ নয়। তুমি বিবাহ করেছ একটি বুলবুলিকে, তাকে দিয়ে ঘানি টানালে চলবে কেন বাপু"

ভন্টু চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটিল।

বাবাজী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "তবু খুব করছে। খুব—"

আবার কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, "একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার—জীবাত্মাকে কষ্ট দিলে ভগবচ্চরণে অপরাধী হতে হয়। ও না হয় গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগে কর্ম্মফল বশত তোমার স্ত্রী হয়েছে, তাই বলেই যে তাকে নির্য্যাতন করতে হবে এ একটা কোন যুক্তি নয়—"

গত কয়েক দিন হইতে ভন্টুর মনেও ঠিক এই কথাগুলি জাগিতেছিল, হঠাৎ বাবাজির মুখে তাহার প্রতিধ্বনি শুনিয়া বাবাজির প্রতি সহসা তাহার যেন একটু শ্রদ্ধাই হইল।

বলিল, "কি করব আপনিই বলে' দিন"

"আমি কি বলব বল, আমি সন্ন্যাসী মানুষ। আমার কাছে তুমিও যা তোমার দাদা বিষ্ণুও তাই। উভয়েরই মঙ্গল আমি কামনা করি, কিন্তু তাই বলে' যা ন্যায্য বলে' বুঝেছি, মনে-প্রাণে যেটা সত্য বলে' অনুভব করছি তা যদি না বলি তাহলে বিবেকের কাছে অপরাধী হতে হবে আমাকে। তাই বলছি বউমাকে কষ্ট দিও না"

"আমি কি ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্ছি"

"তোমার এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাতে উনি কষ্ট না পান"

"কি করব বলুন"

"তোমার দাদাকে চিঠি লেখ কাজে এসে 'জয়েন' করুক। সে সমুদ্রের ধারে বসে' বসে' সিনারি দেখবে আর তুমি তার সংসার ঘাড়ে নিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অবিচার করবে এটা তো ন্যায্য কথা নয়—"

ভন্টু চুপ করিয়া রহিল।

বাবাজী তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "দঁকে যে পড়বে তা আগেই বোঝা উচিত ছিল তোমার। আমি কতকাল ধরে' আশা করে' ছিলাম যে তোমাকে সঙ্গী করে' নিয়ে কোন তীর্থস্থানে বাকী জীবনটা নাম-জপ করে' কাটিয়ে দেব। ও ছাড়া আর কি করবার আছে বল। সংসারে এসে তাঁর মহিমাই যদি না কীর্ত্তন করতে পারলাম, শুয়োরের মতো পাঁকে নাক ডুবড়েই যদি মানব-জীবনটা কাটিয়ে দিতে হ'ল, তাহলে আর হ'ল কি। কিন্তু কথা নেই বার্ত্তা নেই তুমি ফট্ করে' বিয়ে করে' বসলে—এইবার মজাটা বোঝ—"

ভন্টু সহসা সচেতন হইল—বাবাজি যে পথে এইবার তাঁহার চিন্তা-ধারাকে চালিত করিয়াছেন সে পথ অন্ত-হীন। তাহার আপিসের বেলা হইয়া যাইতেছে। সে বাইকে সওয়ার হইয়া পড়িল। তাহার আজ অনেক কাজ। আপিসের অনেকগুলি ফাইল ক্লিয়ার করিতে হইবে, খোকার জন্য সোয়েটার কিনিতে হইবে, বাকুর জন্য কবিরাজের বাড়ি যাইতে হইবে, একজন স্বর্ণকারের নিকট ইন্দুর জন্য একটি হাল-ফ্যাসানের হার গড়াইতে দিয়াছে, তাহাকে একবার গিয়া চুমরাইতে হইবে,

কারণ তাহাকে এখন নগদ টাকা সে দিতে পারিবে না। হার হইলে আবার এক ফ্যাসাদ আছে, বৌদিদি ও বাকুর নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইবে যে হারটা তাহার শ্বশুর দিয়াছেন। হঠাৎ ভন্টুর মনে হইল এত সব চাতুরীর কি প্রয়োজন—সে তো কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছে না। বাবাজীর কথাগুলি তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

৩২

হাসি অপেক্ষা করিতেছিল।

পড়াশোনায় সে ক্লাসের মেয়েদের ও শিক্ষয়িত্রীদের তাক লাগাইয়া দিয়াছে। তাহাদের ধারণাই ছিল না যে, একজন গৃহস্থ ঘরের বউ হঠাৎ স্কুলে ভরতি হইয়া এতটা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে। গৃহস্থালীর নানা কাজকর্ম্মের অবসরে নিশ্চয়ই সে পড়াশোনার চর্চ্চা রাখিয়াছিল তাহা না হইলে হঠাৎ এতটা উৎকর্ষ লাভ করা অসম্ভব ব্যাপার। তাহার যে হাতের লেখা সে একদিন প্রবাসী মৃন্ময়কে চিঠি লিখিবার জন্য চিন্ময়ের সহায়তায় সুরু করিয়াছিল, যে হাতের লেখার জন্য মৃন্ময়ের চাকরি গিয়াছিল, যে হাতের লেখায় সে আজও মৃন্ময়কে প্রত্যহ পত্র লেখে সর্ব্বাপেক্ষা সেই হাতের লেখাই সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। সত্যই মুক্তার মতো লেখা। পড়াশোনায় কোন বিষয়ে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। অথচ ব্যবহারে সে অতিশয় অনাড়ম্বর ও সপ্রতিভ। অহঙ্কারী নয়, গম্ভীর নয়, স্বামী চুরি করিয়া জেলে গিয়াছে বলিয়া বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত নয়। অতিশয় সহজভাবে সে সকলের সঙ্গে মেশে হাসে কথা কয়। কাহারও সহিত তাহার শত্রুতা নাই, সকলেই তাহাকে ভালবাসে। অনেকেই বিস্মিত হয়। যাহার স্বামী জেলে সে কি করিয়া এমন সহজ ভাবে থাকে, যেন কিছুই হয় নাই! হাসি নিজেই মাঝে মাঝে নিজেকে চিনিতে পারে না, নিজের এই বিবর্ত্তন দেখিয়া নিজেই সে বিস্মিত হইয়া যায়। বাল্যকালে সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া যখন দুর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ হইতেছিল তখন সে সঙ্কোচে মরিয়া থাকিত, মুকুজ্যে মশায়ের চেষ্টায় যখন মৃন্ময়ের সহিত তাহার বিবাহ হইল সে যেন বাঁচিয়া উঠিল—রাজপুত্রের স্পর্শে যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল—ভীরু নয়ন তুলিয়া সে দেখিল সম্মুখে দেবতা দাঁড়াইয়া আছে, যে দেবতা তাহারই আর কাহারও নয়। তার পর দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে আপন মহিমায় বিকশিত হইয়া আপন অধিকারে প্রমত্ত হইয়া ভীরু রাজকন্যা যখন রাজেন্দ্রাণী হইয়া উঠিয়াছে তখন তাহার সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সহসা আবির্ভূত হইল নেপথ্যবাসিনী মৃত স্বর্ণলতার প্রেতাত্মা ও তাহার বিস্ময়কর ইতিহাস—আকস্মিক বজ্রপাতের নিদারুণ প্রহারে তাহার সুখ-প্রাসাদ নিমেষে যেন দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে অবলুণ্ঠিত হইল, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিল। যাহাকে ঘিরিয়া তাহার হৃদয়ের শতদল বিকশিত হইয়াছিল তাহাকেই ক্ষোভে দুঃখে লাঞ্ছিত করিল, ক্রোধে ঈর্ষায় সমস্ত অন্তর পুড়িয়া গেল, মনে হইল এই বুঝি শেষ, সমস্ত মহিমার উপর অন্ধকারের যবনিকা নামিল। কিন্তু অন্ধকার ভেদ করিয়া আবার নূতন জ্যোতি দেখা দিয়াছে। সহসা সে মৃন্ময়কে, চিন্ময়ের অগ্রজ মৃন্ময়কে, নূতন রূপে নূতন মহিমায় আবিষ্কার করিয়াছে।

সমস্ত অন্তর দিয়া সে অপেক্ষা করিতেছিল। অপেক্ষা করিতেছিল কবে তাহার পরম গৌরব ও চরম সর্ব্বনাশের সংবাদ বহন করিয়া তাহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিবসটি আসিবে যেদিন সে বুঝিতে পারিবে যে জীবনের প্রদীপটি জ্বলিল কি না।

দ্বার-পথে শব্দ হইল।

হাসি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, সুচারু প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে একখানা কাগজ।

"কি সুচারু"

সুচারু কোন কথা বলিতে পারিল না। অথচ সে খবরটা দিতেই আসিয়াছিল, কিন্তু হাসিকে দেখিয়া তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

"ওটা কি আজকের কাগজ?"

"হ্যাঁ—"

"দেখি"

কাগজ দেখিয়া সে মন্ত্রমুগ্ধবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরার রক্ত-ধারা যেন হিমানী-স্রোতে রূপান্তরিত হইল। প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল। মৃন্ময়ের তপস্যা সফল হইয়াছে—এতদিনে ধর্ষিতা স্বর্ণলতার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিল—মৃন্ময় জেলে নৃশংসভাবে অচিনবাবুকে হত্যা করিয়াছে। হাসির মুখ ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া আবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

প্রদীপ জ্বলিল।

৩৩

সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর বিহ্বল হইয়া পড়িল। মৃন্ময়ের মধ্যে যে এ সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা কে জানিত। আমরা মানুষকে কতটুকু চিনি।

পুরাতন পুস্তকের দোকানে বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মৃন্ময়ের মুখখানাই বারম্বার তাহার মনে পড়িতে লাগিল। গত কয়েক দিন নীরা বসাক ও অনিল তাহার সমস্ত চিত্ত অধিকার করিয়া বিরাজ করিতেছিল। অনিল সান্যালের উপর সে প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু নীরার সংস্পর্শে আসিয়া সে অপ্রসন্নতা কাটিয়া গিয়াছিল। To know all is to forgive all. সমস্ত শুনিবার পর আর রাগ করিয়া থাকা চলে না। কি করিলে ইহারা সুখী হইবে এই চিন্তাই তাহার মনকে অধিকার করিয়া তাহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছিল। সহসা ইহাদের অবলুপ্ত করিয়া মৃন্ময় ও হাসি আসিয়া দাঁড়াইল। নীরা বসাক ও অনিলের সহিত তাহার যে সম্পর্ক মৃন্ময় ও হাসির সহিতও তাহাই। এখন কিন্তু মনে হইতে লাগিল উহারা তাহার বেশী আপন। উহাদের সহিত বেশী আত্মীয়তা অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত অজ্ঞাতসারে গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

...হঠাৎ এককোণে একগাদা পুরাতন মাসিকপত্র নজরে পড়িল—নাম 'বান্ধব'। কৌতূহল হইল। উবু হইয়া বসিয়া সে উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিতে লাগিল। সহসা দেখিতে

পাইল একটি প্রবন্ধের নাম "প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে দুটি কথা"—সহসা কে যেন তাহাকে চাবুক মারিল।

চণ্ডীচরণ দস্তিদার চোর! ইহারই ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতা লইয়া সে সভায় সভায় গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সমস্ত উৎসাহ যেন নিবিয়া গেল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাড়ি ফিরিয়া অমিয়ার নিকট শুনিল তাহার মামাতো ভাই নিত্যানন্দ টাকা লইয়া বাজার করিবার জন্য বাহির হইয়াছিল—মদ খাইয়া ফিরিয়াছে, পাশের ঘরে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর এমন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল যে চুপ করিয়া চাহিয়াই রহিল। তাহার পর হঠাৎ যেন তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। সক্রোধে পাশের ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ঢুকিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। উলঙ্গ নিত্যানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। শঙ্করের মনে পড়িল সেও তো কিছুদিন আগে মদ খাইত। কিছু বলিল না, সন্তর্পণে কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গভীর রাত্রি।

শঙ্কর লেখনী-হস্তে একা জাগিয়া আছে, পাশের ঘরে অমিয়া ঘুমাইতেছে। চতুর্দ্দিকের নিবিড় নীরবতা তাহাকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে সে একটি কথাও লিখিতে পারিতেছে না, লেখনী হস্তে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মনে হইতেছে গভীর রাত্রির নিবিড় নীরবতার মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যাহা নীরব বলিয়াই উপেক্ষনীয় নহে, মনে হইতেছে অদৃশ্য অসংখ্য চক্ষু যেন নির্নিমেষে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, নামহীন নির্দ্দেশহীন অগণ্য অনুভূতিপুঞ্জ আশে পাশে ঊর্দ্ধে-নিম্নে চতুর্দ্দিকে যেন স্পন্দিত হইতেছে, ধরণীর ধূলিকণা ও মহাকাশের নীহারিকাপুঞ্জ শ্রুতি-অগম্য যে বিরাট ছন্দে ছন্দিত অন্ধকারে তাহার কিছু আভাস যেন পাওয়া যাইতেছে, অন্ধকার-অবলুপ্ত সৃষ্টি অদৃশ্য অন্তরলোকে নব-রূপে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিতেছে, নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর আত্মা স্বপ্নের পাখায় ভর করিয়া জ্যোতির্ম্ময় আকাশ-লোকে যাত্রা করিয়াছে, অস্ফুট হাসি কান্নার অসংখ্য অমূর্ত্ত তরঙ্গ নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—নির্ব্বাক শঙ্কর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে।

পাশের ঘরে চুড়ির শব্দ হইল। সহসা সমস্ত মায়ালোক যেন মিলাইয়া গেল। সে মর্ত্ত্যলোকে নামিয়া আসিল। মনে হইল অমিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পতনের শব্দও যেন শোনা গেল। খোলা জানালা দিয়া একটা দমকা বাতাস ঢুকিল, টেবিল হইতে একটা কাগজ উড়িয়া গেল। শঙ্কর তুলিয়া দেখিল বাড়ি ভাড়ার বিল। দুই মাসের ভাড়া বাকি পড়িয়াছে।

শঙ্কর লেখনী লইয়া আবার লিখিবার উদ্যোগ করিল, ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল কি লেখা যায়। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল—কিছুই লেখা গেল না। কি লিখিবে? গতানুগতিক নিয়ম বজায় রাখিয়া কতকগুলা চটুল কথার জাল বুনিয়া যাইবে? এতদিন তো ইহাই করিয়াছে, সাহিত্য-সেবার ছুতায় মনিহারী দোকান সাজাইয়া লোক ভুলাইয়াছে। জীবনের কোন নিগূঢ় রহস্য তাহার কবি-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে? সাহিত্যের ভিতর দিয়া জীবনের কি আদর্শ সে দেশের লোকের সম্মুখে ধরিতে চায়? সে আদর্শের পথে সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? সে আদর্শের জন্য সে কতটা স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে? সে তো এতকাল কেবল লোকের মনোরঞ্জন করিয়া, সাহিত্যের নামে অনুষ্ঠিত যত সব বাজে সভার সভাপতিত্ব করিয়া, হাততালি মালা এবং প্রশংসা কুড়াইয়া অতি শস্তা মেকি জিনিসের বেসাতি করিয়াছে মাত্র।

মৃন্ময়ের কথা মনে পড়িল। আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া সে অবলীলাক্রমে ফাঁসি-কাঠে উঠিয়াছে। তাহার টাকা চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল জেলে গিয়া অচিনবাবুর নাগাল পাওয়া। আদর্শের জন্য মৃন্ময় স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিল। সে পারিবে কি? ক্রমশঃ

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

আমার মনের বনে জাগে নাক' ফুলভরা বাসন্তী-উচ্ছ্বাস:
পাণ্ডুর নয়নপ্রান্তে ভীড় ক'রে আসে নাক' নীলাভ স্বপন,
নগণ্য মূষিক আমি: ম্লান চোখে দেখি শুধু ধ্বংসের মাতন:
স্থলে,জলে অগ্নি আর, আকাশে বাতাসে ঝরে মৃত্যুর নিঃশ্বাস।

তারি মাঝে চেয়ে দেখি পথের শ্মশানতলে অমৃত-সন্তান
অগস্ত্যের তৃষা ল'য়ে প্রাণ ভ'রে পান করে অপানীয় জল,
চর্ম্ম-আবরণে ঢাকা, মানুষ নহেক, শুধু কংকালের দল—
কুকুরের মুখ হ'তে কেড়ে খায় এঁটো ভাত, নাহিক' সম্মান।

বর্ব্বর জাপানী সেনা কবে এসে হানা দেবে নগরীর শিরে:
বহুদূর প্রাচ্য হ'তে ক'খানা জাহাজে ক'রে কতলোক আসে:
এ-সব চিন্তার মেঘ কালো হ'য়ে আসেনাক' এদের আকাশে—
একখানি রুটী লাগি রণক্লমে ছোটে এরা শিবিরে বাহিরে।

মহেশের মহানৃত্যে হয়ত' বা সারা ধরা হবে খান্ খান্—
আবার আসিবে বন্যা: থই থই কালো জল দিগন্তে বিলীন!
মেদুর অম্বর হ'তে কপোত নোয়াবে মাথা সম্বল বিহীন:
হয়ত তাদেরই কেহ খুঁজে পাবে এই সব অমৃত-সন্তান্।
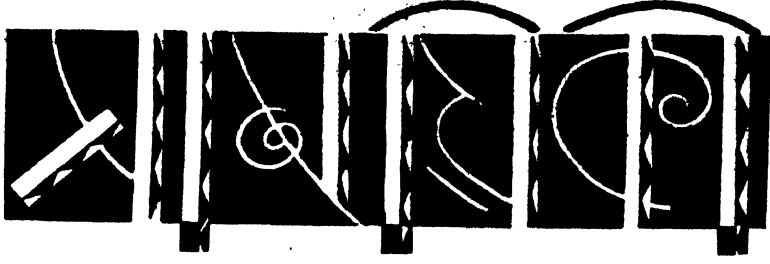
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

বাংলার অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। এই মন্ত্রিত্বত্যাগের কারণ দলগত বৈষম্য অথবা মতানৈক্য নহে। ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার বিবৃতিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"* * * কোন প্রকার সন্দেহ না রাখিয়া পরিষ্কারভাবে বলিতে চাহি যে, প্রধান সচিব বা প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের কোন সহকর্ম্মীর সহিত আমার মতবিরোধ আমার পদত্যাগের কারণ নহে। গত এক বৎসর আমরা একত্রে যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কাজ করিয়াছি, তাহা আমি যথেষ্ট মূল্যবান বলিয়া মনে করি।" সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে সকল কারণে বাংলার সচিব-সঙ্ঘের ভাঙন ধরিয়াছিল তেমন কোন কারণ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগে ঘটে নাই। কিন্তু বিবৃতির অন্যত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ জানাইয়াছেন—"এগার মাস ধরিয়া একটী দেশের সচিবরূপে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা হইতে আমি স্পষ্টই বলিতে পারি যে, সচিবগণের উপর যখন জনসাধারণ এবং আইনসভার নিকট কৈফিয়ৎ দিবার মত যথেষ্ট দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে, তখন

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশে বিশেষতঃ জনসাধারণের অধিকার এবং স্বাধীনতা সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে তাঁহাদিগের স্বল্পমাত্র ক্ষমতা রহিয়াছে। গত এক বৎসর ধরিয়া দ্বৈতশাসন চলিয়াছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গভর্ণর সচিবগণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া কতিপয় স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীর পরামর্শের উপর নির্ভর করিয়াছেন।" সুতরাং মন্ত্রীদের অপেক্ষা স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর সরকার কিরূপ আস্থাবান ও নির্ভরশীল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্বের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া বলিয়াছেন—"গভর্ণরের ভাবগতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ অসন্তোষের কথা বাদ দিলেও বিশেষ দুইটী বিষয়ে আমার প্রতীকারের চেষ্টা আংশিকভাবেও সফল হয় নাই। এই দুইটী বিষয়—পাইকারী জরিমানা ও মেদিনীপুর সংক্রান্ত ব্যবস্থা। আমি সবিস্তারে কোন কথা উল্লেখ না করিয়াও সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, বাঙ্গালায় অর্ডিনান্সের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে। দোষী এবং নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে প্রধানতঃ হিন্দুদিগের উপর এই জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে। আমরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্বেও গভর্ণর নিজ বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া বর্ত্তমান নীতি সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা অথবা এই অবস্থার প্রতীকার করিতে সম্মত হন নাই।"—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগের ইহাই অন্যতম কারণ। শ্যামাপ্রসাদের পদত্যাগে বাংলার সচিব-সঙ্ঘের হয়ত শক্তি হ্রাস হইল; কিন্তু আজ এই দুর্দ্দিনে চারিদিক হইতে যখন জনসেবার অনিবার্য্য আহ্বান আসিয়াছে তখন সরকারী দপ্তর-খানার বাহিরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে পাইয়া জনসাধারণ লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই।

সমস্যা—

সকল সমস্যা এখন আমাদিগকে এরূপ ভীষণভাবে ঘিরিয়াছে যে তাহা হইতে মুক্তির কোন উপায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। সাধারণতঃ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এদেশে নূতন ধান উঠে বলিয়া ধান চাউলের দাম কমিয়া যায়; এ বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চাউলের দাম বাড়িয়া ১০টাকা মণের স্থানে ১৪টাকা মণ হইয়াছে। মফঃস্বলেও নূতন ধান ৮টাকা ৯টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে; ফলে মধ্যবিত্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে দুই বেলা ভাতের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আটার দাম বাড়িয়াছে—যে আটার মণ ছিল ৫টাকা, তাহা ২০টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে; তাহাও পয়সা দিয়া সকল দোকানে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় বহু পশ্চিমা লোকের বাস, তাহারা শীতকালে ২ বেলা রুটী খাইত, তাহারা আটার অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ২ বেলা ভাত খাইয়া কোন রকমে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কয়লার

মণ কিছুদিন পূর্ব্বেও ছিল ৬ আনা—সেই স্থলে ২৲ টাকা মণ দরে কলিকাতায় কয়লা বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতা হইতে মাত্র ১০০ মাইল দূরে বহু কয়লার খনি আছে, সেখানে কয়লাও প্রচুর পরিমাণে মজুত আছে। কিন্তু আনিবার যানের অভাবে আজ দেশের লোক এক বেলা রান্না করিয়া দুই বেলা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কারণ দরিদ্র জনগণের পক্ষে ২টাকা মণ দরে কয়লা কিনিয়া ২ বেলা রান্না করা সম্ভব হয় না। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি কাঠের দামও বাড়িয়াছে। কয়লা সুলভ বলিয়া সহরের লোক এতদিন কাঠ আদৌ ব্যবহার করিত না—এখন আবার ব্যবহার আরম্ভ করিলেও কাঠ দেড় টাকার কম মণ দরে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাদেশে অনাবশ্যক জঙ্গলের অভাব নাই—এই সুযোগে যদি সে সকল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেগুলি জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দেশের বহু অস্বাস্থ্যকর স্থান পরিষ্কৃত হইতে পারিবে। এদিকেও দেশের ব্যবসায়ীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা সহরে অধিবাসীর সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে তরিতরকারী ও মাছের চাহিদা খুবই বাড়িয়াছে। তাহার ফলে শীতের সময়েও তরকারী বা মাছ সুলভ হয় নাই—পরন্তু মাছ ক্রমে বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। মাছের অভাবের আরও নানারূপ কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশীয় আলুর আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং মাদ্রাজের আলু আনার অসুবিধা হেতু এবার কলিকাতার বাজারে আলুর মণ ২০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল—কাজেই দাম যে আবার পূর্ব্বের মত কমিয়া ২ টাকা মণ হইবে, সে আশা সুদূর পরাহত। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অধিক পরিমাণে খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য আন্দোলন করা হইতেছে বটে, কিন্তু একদিকে চাষীরা বিলাসী হইয়া পড়িয়াছে, অন্যদিকে চাষের সুযোগ সুবিধা কম বলিয়া সে আন্দোলনও সম্পূর্ণভাবে সাফল্যলাভ করে নাই। বাঙ্গালায় নানারূপ ডাল কলাইয়ের চাষের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ডালের জন্য আমরা বিহার ও যুক্ত প্রদেশের মুখাপেক্ষী, সেজন্য ডালের দাম দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। এই শীতকালেও যে বাঙ্গালাদেশে অন্য বৎসরের অপেক্ষা খুব বেশী ডাল কলাইয়ের চাষ হইবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বাঙ্গালা দেশে যে সকল স্থানে কলাই, মুগ, মুসুর, খেঁসারি, কালীকলাই প্রভৃতি—প্রচুর উৎপন্ন করা সম্ভব, যদি সেগুলিরও চাষ হইত, তাহা হইলে মাঘ ফাল্গুনে ডালের দাম কমিয়া যাইত; কিন্তু তাহাও হয় নাই। বাঙ্গালা দেশ সমুদ্রের কূলে অবস্থিত; কিন্তু লবণ তৈয়ারী সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের বিধিনিষেধ বর্ত্তমান থাকায় এখানে দেশী লবণ প্রস্তুত হয় না ও এ দেশের অধিবাসীদিগকে ৭টাকা মণ দরে আমদানী করা লবণ ক্রয় করিতে হয়। বাঙ্গালায় খেঁজুর গাছের অভাব নাই—আখ চাষও বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু এ বৎসর লোককে ২০ টাকা মণ দরে গুড় ও ৩০ টাকা মণ দরে চিনি কিনিয়া খাইতে হইতেছে। বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে তালের গুড় প্রস্তুত করারও সুযোগ সুবিধা আছে। দেশের লোক যদি সে সুবিধাও গ্রহণ করিত, তাহা হইলে দরিদ্র জনগণ সুলভে তালের গুড় ব্যবহার করিয়া মিষ্ট দ্রব্যের অভাব পূরণ করিতে পারিত। কাপড়ের মূল্য এত অধিক বাড়িয়াছে যে দরিদ্রের পক্ষে লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় সংগ্রহ করা কষ্টকর এমন কি অসাধ্য হইয়াছে। যে কাপড় পৌনে দুই টাকা জোড়ায় পাওয়া যাইত তাহার মূল্য ৪ গুণ হইয়া ৭ টাকা জোড়া হইয়াছে। শীতকালে শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। না খাইয়া বা ছেলেমেয়েদের অনাহারে রাখিয়া জীবিত থাকার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। এই অসাধারণ অবস্থার ফলে বহু লোক অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে; তাহার ফলে কলেরা প্রভৃতি মহামারী চারিদিকে ব্যাপকভাবে দেখা যাইতেছে। সকলের মুখেই এখন এক কথা—ইহা অপেক্ষা বোমা পড়িয়া মরা ঢের ভাল ছিল। এ অবস্থার প্রতীকারের ভার যাহাদের হাতে, তাহারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়াই মনে হয়। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে তিলে তিলে মরণকে বরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

৺মন্মথনাথ বসু এম-এল-সি (গত মাসে আমরা ইঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি)

খাদ্যসমস্যা—

বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করেন না, এমন লোক কেহই নাই। সম্প্রতি খাদ্য-সরবরাহ সম্বন্ধে অধ্যাপক ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তিকাতে তিনি দেখাইয়াছেন—যুদ্ধের জন্য ভারতে খাদ্যাভাবের সমস্যা বেশী জটিল হইয়া উঠাতেই বর্ত্তমানে এ সম্পর্কে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আসলে এই সমস্যা কিছুমাত্র আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই এদেশে এই সমস্যার সূচনা লক্ষ্য করা যাইতেছিল। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দিন দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু এদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়িতেছে না। এই মূলগত অসামঞ্জস্য হেতু দেশে ক্রমেই খাদ্যের অকুলান ঘটিতেছে। গত ১৯৩০-৩১ সাল হইতে এই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাব লইয়া দেখা যায়, ঐ বৎসর এদেশে উৎপন্ন খাদ্য-সামগ্রীর পরিমাণ এদেশের লোকদের সত্যিকার প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ১৫ভাগ কম হইয়াছিল। এতদিন বাহির হইতে চাউল ও গম আমদানীর সুবিধা থাকায় এই ধরণের ঘাটতি অনেকের কাছেই তেমন জটিল মনে হয় নাই। অধ্যাপক মহাশয় যে সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এতদিন কেহ

কিছুই বলেন নাই। এখন এ বিষয়ে কি করা উচিত, তাহা সকলেই চিন্তা করিতেছেন।

কাগজ সমস্যা—

গত ১লা ডিসেম্বর সরকার হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে ভারতে কাগজের কলসমূহে যে কাগজ প্রস্তুত হয়, অতঃপর গভর্ণমেণ্ট তাহার শতকরা ৯০ ভাগ সরকারী প্রয়োজনের জন্য গ্রহণ করিবেন, এবং বাকী ১০ ভাগ সাধারণের কাজের জন্য বাজারে দেওয়া হইবে। এই সংবাদে চারিদিকে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা হইলে দেশে যে কত অসুবিধা হইবে তাহার সংখ্যা নাই। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ পাঠ্য পুস্তক পাইবে না; অফিসে কাজের জন্য আবশ্যক কাগজ পাওয়া যাইবে না; সাময়িক পত্রিকাগুলি কাগজের অভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। (কতকগুলি সংবাদপত্রই শুধু বিদেশী নিউজ প্রিণ্ট কাগজ ব্যবহার করে—বাকী সকল দৈনিক,সাপ্তাহিক,মাসিক পত্র দেশীয় মিলে প্রস্তুত কাগজ ব্যবহার করে)—সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানার কম্পোজিটার, প্রেসম্যান, দপ্তরী প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার হইয়া যাইবে। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ নষ্ট হইলে দেশের মধ্যে অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইবে। গভর্ণমেণ্টের এই নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদে সর্ব্বত্র সভা সমিতি ও আবেদন করা হইতেছে। সাংবাদিক সংঘ, পুস্তক প্রকাশক সমিতি, কাগজ ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেণ্টকে আদেশটি পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এদিকে বাজারের কাগজ বিক্রেতাগণও ইহার সুযোগ লইয়া কাগজের দাম ৪।৫ গুণ বাড়াইয়া দিয়াছেন; ফলে বার্ষিক পরীক্ষার সময় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পাইতেছেন না, অনেক স্থানে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ মৌখীক পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্র প্রেস কর্ম্মচারী, সাংবাদিক, দপ্তরী প্রভৃতির পক্ষ হইতে এই ব্যবস্থার প্রতিকার বিধানে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবকে এ বিষয়ে তার ও পত্র প্রেরণ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। একদল লোক এ সময়ে দেশী কাগজ প্রস্তুত ব্যবস্থাকে উৎসাহ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের সে উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগে সেভাবে কাগজ প্রস্তুত করিয়া বাজারের চাহিদা মিটানও যেমন অসম্ভব, মিলে প্রস্তুত কাগজের সহিত প্রতিযোগিতায় মূল্য স্থির করাও তেমনই কষ্টকর। যাহা হউক, বর্ত্তমান কাগজ-সমস্যার সমাধান করা না হইলে দেশে যে দারুণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

রাওলপিণ্ডিতে দুর্গোৎসবে সমবেত বাঙ্গালীগণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন—

আজকাল সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষই বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা দিবার জন্য একজন করিয়া প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া থাকেন। এবার ২রা ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে প্রসিদ্ধ মুসলেম মনীষী সার মির্জা ইসমাইল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি তৎপূর্ব্বে পাটনায় পাকীস্থানের নিন্দা করিয়া হিন্দু মুসলমানকে সমবেতভাবে অখণ্ড ভারত গঠনের উপদেশ দিয়াছিলেন। ঢাকার মুসলমান অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ সার মির্জার ঐ উক্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে যোগদান করেন নাই—পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—এবং উৎসবের সময় বাহিরে পিকেটিং করিয়াছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ভাইস চ্যান্সেলার একাই শুধু সার মির্জাকে সর্ব্বত্র সম্বর্দ্ধনা করেন, অবশ্য সঙ্গে হিন্দুরা সকলেই ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান রেজিষ্ট্রারকেও অতি কষ্টে উৎসব সভায় আসিতে হইয়াছিল, এই ব্যাপারে শুধু ঢাকার মুসলমানদিগের নহে, সমগ্র বাঙ্গালার পক্ষে কলঙ্কের বিষয় হইয়াছে। সার মির্জার পাকীস্থান সম্বন্ধে অভি-মত যাহাই হউক না কেন, তিনি যে মুসলমান সংস্কৃতিতে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, সে বিষয়ে সকলেই একমত হইবেন।

তাহা ছাড়া তাঁহাকে সম্মানিত অতিথিরূপে ঢাকায় আনা হইয়াছিল।" এ অবস্থায় তাঁহাকে অপমানের চেষ্টা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নহে। সার মির্জা অবশ্য ঐ সকল বিক্ষোভে বিচলিত হন নাই বা সে সকল গ্রাহ্য করেন নাই। ঢাকার মুসলমানছাত্রদের এই ব্যবহারে সকলেই মর্মাহত হইয়াছেন।

আসামে মহিলা প্রেসিডেণ্ট—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পরলোকগত আবদুল মজিদের কন্যা ও আসামের লখিমপুর জেলার ডেপুটী কমিশনার মিঃ আতাউর রহমনের পত্নী শ্রীযুক্তা জুবেদা আতাউর রহমন সম্প্রতি সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসাম ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। তিনি ১৯৩৭ সালে নূতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াই তথায় ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। তিনি আসামের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

মেজর জয়কৃষ্ণ মজুমদার—

দার্জ্জিলিংয়ের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার পি-কে মজুমদারের পুত্র মেজর জয়কৃষ্ণ মজুমদার সম্প্রতি করাচীতে বিমান দুর্ঘটনায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার জননী প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ব্যারিষ্টার ডবলিউ সি-ব্যানার্জ্জির কন্যা। ১৯৩০ সালে মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে জয়কৃষ্ণ বিমান বিভাগে এ ক্লাস লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া ভারতের 'সর্ব্বকনিষ্ঠ পাইলট' বলিয়া অভিহিত হন। ১৯৩১ সালে স্যাণ্ডহার্ষ্টে জেণ্টেলম্যান ক্যাডেটরূপে ভর্ত্তি হইয়া ১৯৩৩ সালে তিনি কিংস কমিশন প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৩৪ সালে কোয়েটার ১৬শ লাইন ক্যাভেলরীতে যোগদান করেন। ১৯৩৫

জয়কৃষ্ণ মজুমদার

সালে ভীষণ ভূমিকম্পের সময় তিনি কোয়েটায় উপস্থিত ছিলেন এবং সাহায্য দান কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথমে তিনি ভারতীয় বিমান বিভাগে যোগদান করিয়া ১৯৪০ সালে ক্যাপ্টেন ও ১৯৪২ সালে মেজর উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি সামরিক ইণ্টেলিজেন্স স্কুলে শিক্ষকের পদপ্রাপ্ত হন। এই বিভাগে তিনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রথম ভারতীয়—তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দিল্লীর প্রধান বিমানকেন্দ্র তাঁহাকে সম্মানিত করেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যুতে আমরা নিদারুণ ব্যথিত হইয়াছি।

মেদিনীপুরের প্রকৃত অবস্থা—

প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগের এডিসনাল কমিশনার মিঃ বি-আর-সেন আই-সি-এস্ মহাশয় সম্প্রতি মেদিনীপুরের বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়া যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহা সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটীর এক সভায় গভর্ণর কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছে। মিঃ সেনের রিপোর্টের একস্থানে বলা হইয়াছে যে, একটী গ্রামের ১৫০জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র একজন বাঁচিয়া আছে এবং অপর একটী গ্রামে ১৩৬জনের মধ্যে ১৩২জন অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বিধ্বস্ত এলাকায় পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। বহুদূর হইতে নৌকাযোগে পানীয় জল আনিয়া জীবনধারণ করিতে হইতেছে। আবালবৃদ্ধ-বনিতা এক গ্লাস জলের জন্য বহুদূর হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। শতকরা ৫০জন লোক জলের অভাবে বাসভূমি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। মিঃ সেন বলিয়াছেন—যেখানে গিয়াছি সেখানেই শত শত লোক পানীয় জল, শীত বস্ত্র ও পরণের কাপড়ের জন্য কাতর নিবেদন জানাইয়াছে। যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি, সর্ব্বহারা হইয়া জনসাধারণ উন্মুক্ত মাঠের মাঝে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনধারণ করিয়া আছে। সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী গ্রামসমূহে খুব অল্পসংখ্যক শিশুই নজরে পড়িয়াছে। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বহু শিশু প্রাণ হারাইয়াছে। যে শিশুগুলি বাঁচিয়া আছে তাহারাও উদরাময় রোগে ভুগিতেছে। বহু মাইল অতিক্রম করিয়াও একটীও গরু নজরে পড়ে নাই। মিঃ সেনের এই মর্ম্মন্তুদ বিবরণী হইতে মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায়। মেদিনীপুরের অধিবাসীদের বাঁচাইতে হইলে, পানীয় জল, আহারের ব্যবস্থা, নূতন করিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ, শিশুদের জন্য দুগ্ধ, নরনারীর পরিধেয় এবং শীতবস্ত্রের যেমন একান্ত প্রয়োজন তেমনি বিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা, চিকিৎসক, ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থাও অবিলম্বে করা প্রয়োজন।"

কিন্তু যে কারণে মেদিনীপুরের অবস্থা অতীব শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে তাহা পদত্যাগী মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিশদভাবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিয়াছেন—ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারীর ঔদাসীন্যের ফলে, আশু প্রতিকারকল্পে কোনরূপ সেবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীগণের সহানুভূতিহীন মনোভাব পরিবর্ত্তিত না হইলে মেদিনীপুরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব নহে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি ও বিধ্বস্ত অঞ্চলের বহুলোকের সহিত জেলের ভিতরে ও বাহিরে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি সেবাকার্য্যে সরকার জন-

মেদিনীপুরের বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা

কাঁথি রিলিফ কমিটী কর্তৃক পানীয় জল বিতরণ
ফটো—তারক দাস

শবগুলি মাটীতে পোতার ব্যবস্থা করা হইতেছে
ফটো—তারক দাস

ঝড়ের পরে—গৃহের অবস্থা ফটো—তারক দাস

ঝড়ের পরে—পাকা বাড়ীর অবস্থা ফটো—তারক দাস

মানুষ ও পশুর শব ফটো—তারক দাস

বিপন্নগণের বর্ত্তমান বাসস্থান ফটো—তারক দাস

সাধারণকে বিশেষভাবে সুযোগ প্রদান না করিলে এবং পাইকারী জরিমানা হইতে অব্যাহতি না দিলে মেদিনীপুরের অবস্থার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে না।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ ও মিঃ সেনের বিবৃতি হইতে মেদিনীপুরের প্রকৃত অবস্থা প্রতীয়মান হয়। আমরা মিঃ সেনের সিভিলিয়ান চোখে দেখা সরকারী বিবরণী ও সম্প্রতি লাটদপ্তর ত্যাগী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতি আজ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া শুধু এই কথাই বলিব, সেবার অধিকার মানুষের জন্মগত, সে অধিকার হারাইয়া মানুষ যেখানে নিষ্ক্রিয়, সেখানে বিধাতার অভিশাপ নত মস্তকে গ্রহণ করা ব্যতীত আর উপায় কি ?

ইলিশ ও রোহিত মৎস্যের চাষ—

সম্প্রতি বাংলা দেশের ডিরেক্টর অব্ পাবলিক ইন্‌ফরমেশন্ কর্ত্তৃক বাংলা দেশে অপরিণত ইলিশ ও রোহিত মৎস্যের চাষ সংরক্ষণের জন্য সাময়িক সুপারিশ নামক এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—পোনা মাছগুলি ধ্বংসের দ্বারা খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থার মূলে যে আঘাত করা হইতেছে, ইহার কারণ এই যে, বর্ষা ঋতুর পর যখন বন্যার জল চাষীদের জমিতে গিয়া জমে তখন জাল বা ঐরূপ কোন কৌশলে পোনা-গুলিকে ধরা খুব সহজ ব্যাপার। এইরূপে জাতীয় সম্পদের বিরাট ক্ষতিসাধন করা হইতেছে। এই অপচয় নিবারণার্থ সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এবং এই উদ্দেশ্যে যে সকল মিউনিসিপ্যালিটীর জলকলসমূহে আকস্মিকভাবে পোনা মাছ আসিয়া পড়ে, সঞ্চয় কেন্দ্র (settling tanks) এবং শোধন কেন্দ্র (filter-beds) সমূহ সংস্কারের জন্য খালি করিবার সময় যেন পোনা মাছগুলি নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এই অনুরোধও জানান হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের পলতার জলের কল হইতে অসংখ্য ছোট ইলিশ ও পোনা মাছ হুগলী নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। চারা মাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ডিরেক্টর বাহাদুরের প্রস্তাব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু চাষীদের ক্ষেতে বর্ষাকালে অনিবার্য্য ও আকস্মিকভাবে যে সকল পোনা আসিয়া পড়ে, তাহাদের পুকুরে জমায়েৎ করিবার যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—তাহা চাষীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। কারণ বেশীর ভাগ চাষী গৃহস্থেরই নিজস্ব পুকুর নাই। সুতরাং কাহার পুকুরে তাহারা মাছ জিয়াইয়া রাখিবে? দ্বিতীয়তঃ বর্ষায় তাহাদের বৎসরের পর বৎসর আবাদের যে ক্ষতি হইতেছে তাহার জন্য অনন্যোপায় হইয়া উদরপূর্ত্তির জন্য চাষীরা মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় তাহাদের দ্বারা মাছ জিয়াইয়া রাখিয়া অধিক লাভের আশায় ছমাস বা এক বৎসর অপেক্ষা করাও সম্ভব নহে। আমাদের মনে হয়, সরকার উন্নততর মৎস্য চাষের জন্য 'মিউজিয়াম' ও চারা মাছ জমায়েত রাখিবার জন্য বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিতে পারিলে উদ্দেশ্য ফলবতী হইতে পারে। উন্নততর মৎস্য চাষের জন্য মাদ্রাজে 'মিউজিয়াম' আছে। বাংলা দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় মাছের ব্যবসা ভালই চলে। সুতরাং মৎস্য সংরক্ষণ ও তাহার উন্নততর প্রণালীতে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই ব্যবসাকে অধিকতর উন্নত করা সম্ভবপর হইতে পারে। গতানুগতিক ব্যবসায়ের মোড় ফিরাইতে হইলে এবং চারা মাছগুলিকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে জেলে ও মৎস্য-ব্যবসায়ীদের শুধু অনুরোধ অথবা সুপারিশ করিলে চলিবে না। সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবায় বিভাগ হইতে কিছুকাল পূর্ব্বে একজন অডিটরকে সমবায় মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করিবার জন্য ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষালাভের নিমিত্ত পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে যে কিছু শুভ হইয়াছে অথবা সমবায় মৎস্য ব্যবসায় কেন্দ্রগুলির উন্নতি হইয়াছে, এমন কথা শুনি নাই। কারণ সেখানে গতানুগতিক ভাবেই ব্যবসা কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শিল্পোন্নতি ও ভারতবর্ষ—

সার এম-ভি-বিশ্বেশ্বরার্য্য সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা লিখিয়া শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন—ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যথাক্রমে মাথা পিছু বার্ষিক আয় ৫৩১ ও ১০৪৯ টাকা—আর ভারতবাসীর মাথা পিছু বার্ষিক আয় মাত্র ৬০ টাকা। তাহার প্রধান কারণ এদেশে শিল্পের অভাব। ইংলণ্ডের শতকরা ৮ভাগ লোক ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ২০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভর করে, কিন্তু ভারতে এখনও শতকরা ৬৭ ভাগ লোক কৃষিতে নির্ভরশীল। আমেরিকার লোকেরা এ পর্য্যন্ত শিল্পে ২৩ হাজার কোটি টাকা নিযুক্ত করিয়াছে, ইংলণ্ডে ৭হাজার ৬৭ কোটি টাকা লাগান হইয়াছে, আর ভারতবর্ষে মাত্র ৭৫০ কোটি টাকা ব্যবসায়ে খাটান হয়। ইহার ফলে ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর্ত্তমান যুগে দেশ শিল্পপ্রধান ও শিল্পপ্রবণ না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতির অন্য কোন উপায় নাই।

অভাবের অজুহাত—

কিছুদিন হইতে রেজগী ও খুচরা পয়সার অভাবে জনসাধারণ যে নিদারুণ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তৎসম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বহু আবেদন নিবেদন জানাইবার পর সম্প্রতি ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল কারণে রেজগী ও পয়সার অভাব দেখা দিয়াছে তাহার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়া ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে ১৯১৪-১৯১৮ সন পর্য্যন্ত বিগত মহাযুদ্ধের সময় আধুলী ছাড়াও মোট ৫ কোটী টাকার রেজগী ও খুচরা পয়সা বাজার হইতে নাকি নিখোঁজ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রথম আড়াই বৎসরে ৮ কোটী টাকার এবং গত এপ্রিল—সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সওয়া তিন কোটী টাকার রেজগী ও পয়সা আবার নাকি নিখোঁজ হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আরম্ভ হওয়ায় দেশে অনেক সৈন্য মোতায়েন করিয়া রাখিতে হইয়াছে এবং দেশে নানারূপ কাজকর্ম্মও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং রেজগী ও খুচরা পয়সার যে চাহিদা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে সরকার তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সরকার মনে করেন না যে, এরূপ ভাবে পয়সার অভাব হইতে পারে। সরকারের বিশ্বাস ধানচাল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রীর ন্যায় একশ্রেণীর লোক রেজগী ও খুচরা পয়সা নিজেদের কাছে জমায়েত করিয়া রাখিতেছে। সরকার মনে করেন, এইভাবে এক শ্রেণীর লোক যদি পয়সা মজুত করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহাতে দেশে এক উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে এবং এর ফলে সরকারকে বিব্রত করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে আতঙ্কিত করিয়া তোলা হইবে। পয়সা ও রেজগী জমায়েত রাখিবার কারণ সম্বন্ধে সরকারের ধারণা যে, তাহা জমায়েতকারীরা ধাতুর দরে বিকাইতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে সরকার ভারত রক্ষা আইনের ধারায় কথা উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, অনুরূপ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে ভারত রক্ষা আইনে অভিযুক্ত করা হইবে। সরকার অভাবের অজুহাত দেখাইতে গিয়া যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা

আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম—যদি জনসাধারণ এক পয়সার যেখানে প্রয়োজন সেখানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই অভাব অনটনের দিনে দুই বা ততোধিক পয়সা না খরচ করিয়া বসিত। রাই মিলিলে তাহা কুড়াইয়া বেল করা সম্ভব, কিন্তু রাই না মিলিলে? আমরা সরকারকে বলি, যদি কেহ পয়সা অথবা রেজগী সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া শাস্তি বিধান করা হউক, কিন্তু কয়েকজন অদূরদর্শী ভুঁড়িওয়ালা যদি এরূপভাবে পয়সা জমানর ব্যবসা সুরু করিয়া দিয়া থাকে তাহার জন্য শত সহস্র মুড়িওয়ালা যে প্রতিপদে অসুবিধা ভোগ করিতেছে—সরকার তাহার আশু প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

ক্ষিতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—

ভাগলপুরের স্বনামধন্য চিকিৎসক ক্ষিতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-বি (রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন, আই-এম-এস) মহাশয় বিগত ৯ই কার্ত্তিক সোমবার নশ্বরদেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শুধু যে সুচিকিৎসক ছিলেন তাহাই নয়, তিনি সর্ব্বতোভাবে ভদ্র ছিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতার সহিত তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার পরোপকার, তাঁহার প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত উদারতা

ক্ষিতীন্দ্র দাশগুপ্ত

তাঁহাকে ভাগলপুরবাসীর হৃদয়ে যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহা সহজে অথবা অল্পদিনে বিচলিত হইবে না।

পরেশনাথ মাইতি—

মেদিনীপুর জেলার খড়িগেড়িয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী পরেশনাথ মাইতি মহাশয় গত ১৫ই নভেম্বর ৫৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন এবং ১৯২১ সাল হইতে কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে তেরপেখিয়া হইতে গড়গ্রাম পর্য্যন্ত ১০ মাইল খাল খনন ও
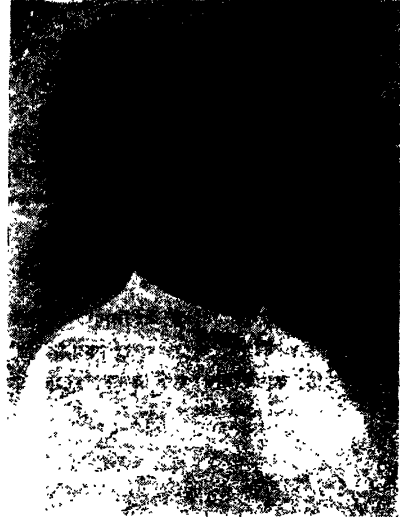
পরেশনাথ মাইতি

৪০ ফিট প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছিল। জেলা বোর্ডে তিনি যে কর্ম্মনিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অসাধারণ।

যাদবপুর হাসপাতাল—

সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যাদবপুর হাসপাতালে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ টাকায় তথায় নূতন ২০টি রোগীকে বিনা খরচে থাকিতে দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। কলিকাতার বাহিরের মফঃস্বলের রোগীদিগের জন্য ঐ ২০টী স্থান সংরক্ষিত থাকিবে। গত বৎসর যাদবপুরে মোট ৩৯৯জন যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল তন্মধ্যে ২৩৫জনকে নূতন ভর্ত্তি করা হইয়াছিল। কার্সিয়াংয়ের হাসপাতালে ৩৩টি রোগীর স্থান আছে—বেশী প্রয়োজন হওয়ায় আরও ১০জনকে তথায় লওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসর স্থানাভাবে বহু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসিত হইবার সুযোগ পায় না। সেজন্য প্রত্যেক মিউনিসিপালিটী জেলা বোর্ড প্রভৃতি হইতে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালকে সাহায্য করা উচিত।

বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলে সমস্যা—

ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার পর মন্ত্রিমণ্ডলে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের মন্ত্রী শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহাদের বক্তব্য জানাইয়া এক পত্র দিয়াছেন। পত্রে বলা হইয়াছে—যদি পাইকারী জরিমানা আদায়, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান প্রভৃতি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্ত্তন করা না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব

হইবে না। পত্রে মেদিনীপুরে সাহায্য দান সম্পর্কে অধিকতর উদার নীতি গ্রহণের কথাও বলা হইয়াছে।

শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়—

বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়কে গত ২২শে নভেম্বর ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল—গত ৩রা ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের চেষ্টায় কিরণবাবুর মুক্তিলাভ সম্ভব হইয়াছে, আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। কিরণবাবুর মত লোককেও দেশে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়—ইহাই বিচিত্র।

পরলোকে খগেন্দ্রনাথ পাল—

কলিকাতা খিদিরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খগেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় সম্প্রতি ৪৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গার্ডেন রীচ কারখানার কণ্ট্রাক্টর ছিলেন এবং স্থানীয়
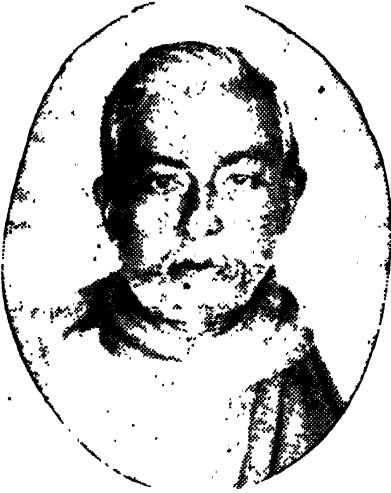
খগেন্দ্রনাথ পাল

বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল। তাঁহার নেতৃত্বে প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলায় সেবকদল ও ঔষধাদি প্রেরিত হইত।

মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী—

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ সোমবার ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। বি-এ পাশ করিয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর ১৩০৮ সালে তিনি ঢাকা শক্তি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বৃহদাকারে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। পরে সেই ব্যবসা ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সুলভ মূল্যে ও সহজে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদ জগতে সত্যই যুগান্তর আনিয়াছিলেন। মথুরামোহন দানশীল ব্যক্তি ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে নিজের আয়ের কতকাংশ দান করিতেন।

শ্রীমান তড়িৎকুমার ঘোষ—

কলিকাতা ৪৫ নং ক্রীক রোর ডাক্তার কে, ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তড়িৎকুমার ঘোষ এ বৎসর সম্মানের সহিত ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তড়িৎকুমার এখন কেমব্রিজে এক ফার্ম্মে 'ল' এড্ভাইসারের কাজ করিতেছেন।

তড়িৎ ঘোষ

সার মির্জ্জা ইসমাইল—

গত ২রা ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা উচিত। তিনি এক-স্থানে বলিয়াছেন—"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা যদি পৃথিবীতে সত্য ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া সততার সহিত সেই আদর্শকে ধরিয়া রাখিতে পারে তবে তাহাই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের সমাজ দেহে যে মারাত্মক ব্যাধি রহিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি না পড়িলে কোন নেতৃত্বই সফলকাম হইতে পারে না। আমাদের সমাজ দেহের সেই ব্যাধি—জনগণের ভয়াবহ দারিদ্র্য। আমি একথা আপনাদের দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে আধুনিক বিজ্ঞান এরূপ দারিদ্র্য একান্তই নিরর্থক করিয়া দিয়াছে। ধ্বংস ও হত্যার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের অপব্যবহার সত্ত্বেও জাতির সেবায় ও মনুষ্য-প্রতিভা বহু সম্ভার দিয়াছে।" অভিভাষণের শেষদিকে সার মির্জ্জা ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"একতার মধ্যেই মুক্তির সন্ধান রহিয়াছে এবং এই মুক্তিই আমাদিগকে প্রকৃত জীবন ও আনন্দ দান করিবে।"

পরলোকে কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত—

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় ৭১ বৎসর বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি শিক্ষকতা কার্য্যে ইস্তফা দিয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। কালীপ্রসন্নবাবু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কার্য্যকরী সভার অন্যতম সদস্য এবং বসু-মল্লিক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি পল্লী উন্নয়ন ও সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কয়েকখানি

কালিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

পুস্তক রচনা করেন। ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বহুজনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সেবী ও কর্ম্মীর তিরোভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আকবর ও ভারত সচিব আমেরী—

সম্প্রতি বিলাতে ভারত-সচিব আমেরী সাহেবের নেতৃত্বে লোকমান্য ভারতসম্রাট আকবরের চারিশততম জন্মবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আমেরী সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহানুভবতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় সম্রাটের অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার অনুকরণীয় চরিত্রের কথা খুব জোরের সহিত ভারতবাসীকে স্মরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমেরী সাহেব যাহা বলিয়াছেন, ভারতবাসী তাহাতে কৃতজ্ঞতা জানাইবে সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের পূত-চরিত্র পুণ্যশ্লোক সম্রাটের গুণাবলী আজ সশ্রদ্ধচিত্তে আমেরী সাহেবই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু আমাদের স্নেহশীল প্রজাবৎসল সম্রাট আকবর যে জিজিয়া কর হইতে প্রজাদের নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন—ভারত-সচিব মহাশয় কি ভারতীয় প্রজাদের জন্য তেমনতর কিছু অনুকরণ করিয়া স্বর্গগত সম্রাটের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাইবেন ?

নূতন বিচারপতি এস-আর-দাশ—

যশস্বী ব্যারিষ্টার মিঃ এস-আর (সুধীরঞ্জন) দাশ গত ১লা ডিসেম্বর হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ দাস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ পি-আর-দাস প্রভৃতির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এল-এল-বি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৮ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম হইয়া তিনি কলিকাতার ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। বহু দিন পরে কলিকাতার ভারতীয় আইন ব্যবসায়ী ব্যারিষ্টারদিগের মধ্য হইতে হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত করা হইল। সে জন্য মিঃ দাসের নিয়োগে সকল সম্প্রদায়ের আইন ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মিঃ এস, আর, দাশ

বিনামূল্যে কুইনাইন

বাংলার ২৬টী জেলায় বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন বিধায় কুইনাইন ব্যবহারের জন্য সরকার আরও ৪২ হাজার টাকা জনস্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট ২৪ হাজার টাকা কুইনাইন বিতরণ উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারের এ সাধু প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

আলুর চাষে ঋণদান—

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমায় আলু চাষের জন্য বাঙ্গালা সরকার চাষীদিগকে ২০ হাজার টাকা ঋণদান করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের সর্ব্বত্রই কি এইভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা হইয়াছে ? দেশবাসী তাহাই জানিতে চাহে।

পরলোকে জননায়ক সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ২০শে অগ্রহায়ণ (ইং ৬ই ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটের সময় বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট হিন্দুনেতা ও জননায়ক সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মন্মথনাথ দীর্ঘায়ু না হইলেও সল্লায়ু বাঙ্গালীর পক্ষে ইহাকে পরিণত বয়স বলা যাইতে পারে।

গত কয়েক মাস হইতে সার মন্মথনাথ অসুস্থ হইয়া পড়েন। কিন্তু এই অসুস্থ দেহমন লইয়াও মন্মথনাথ তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন নাই। মন্মথনাথের তিরোভাবে বাংলা ও বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। মন্মথনাথ মনে প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উপর তাঁহার গভীর অনুরাগ ও আস্থা ছিল। তাঁহার অমায়িক শিশুসুলভ সরল ব্যবহার সকলকেই আকৃষ্ট করিত।

মন্মথনাথ আইন ব্যবসায়ী হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পরে বিশিষ্ট ব্যবহারাজীব হিসাবে ১৯২৪ সালের ২রা জানুয়ারী তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে তিনি এই পদ লাভের জন্য আহুত হইলেও, তখন তাঁহার ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও পসার পরিত্যাগ করিয়া ঐ পদ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারপতি পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর সার মন্মথ ঐ পদ গ্রহণে সম্মত হন।

বিচারকের আসনে বসিয়া সার মন্মথ নিরপেক্ষ বিচারকরূপে অচিরেই খ্যাতিলাভ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে সমাসীন হইয়াও তিনি দেশীয় পোষাক চোগাচাপকান পরিত্যাগ করিয়া কোনোদিন ইউরোপীয়ান্ পোষাক পরিধান করেন নাই। চিরদিনই দেশীয় বৈশিষ্টকে তিনি বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার দশ বৎসর পরে ১৯৩৪ সালে তিনি প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন এবং ইহার এক বৎসর পরে ১৯৩৫ সালে 'নাইট্' উপাধি লাভ করেন।

বিচারকরূপে তিনি 'তারকেশ্বর মামলা'র মীমাংসা ও তারকেশ্বরের সেবাকার্য্য পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। তারকেশ্বরের মামলার ব্যাপারে তাঁহাকে অপরিসীম পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার

নিরপেক্ষ সুক্ষ্ম বিচারের নিদর্শন পাইয়া শুধু যে বাংলার অধিবাসীরাই তাঁহার উপর আস্থাবান ছিল তাহা নহে, সমগ্র ভারতবাসীই তাঁহার বিচারে আস্থাবান ছিল। যখন মধ্য প্রদেশের অন্যতম কংগ্রেস মন্ত্রী মিঃ শরীফের কার্য্যে প্রবল আপত্তি উঠে, তখন তাহার মীমাংসার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ সার মন্মথনাথের উপরই বিচারভার অর্পণ করেন।

হাইকোর্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি গভর্ণমেণ্টের আহ্বানে কয়েকবার রাজকার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ভারত সরকারের আইন সচিবের পদ হইতে কিছু দিনের জন্য ছুটী লইলে, সার মন্মথ উক্ত পদেও সাময়িকভাবে নিযুক্ত হন।

সার মন্মথনাথ বাংলাদেশের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ব্যবসাক্ষেত্রে, বিচারকরূপে এবং সামাজিক জীবনে তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৯ সালে বীর সাভারকরের সভাপতিত্বে কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে যে চিন্তাশীল অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজন আদৃত হইয়াছিল। তিনি

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৯-৪০ সালে বিহার প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ঐবৎসর কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভারও তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। দিনাজপুরে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পর্কে এবং গত বৎসর ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন সম্পর্কে মহাসভা নেতাদের গ্রেপ্তারে এবং বিশেষ করিয়া বাংলার অন্যতম হিন্দু নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদকে মহাসভা অধিবেশনে যোগদানে বাধা প্রদান করায়, তিনি যে তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেশবাসী চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে একবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

তিনি আইন সম্পর্কে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি তথায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবরূপে পরিগণিত হন।

নবদ্বীপের বঙ্গ-বিবুধ-জননী সভা "ন্যায়রঞ্জন," কাশী হিন্দু ধর্ম্ম মহামণ্ডল "ধর্ম্মালঙ্কার" এবং কলিকাতার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় তাঁহাকে "ন্যায়াধীশ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর নদীয়া জেলার জগতী গ্রামে সার মন্মথনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মন্মথনাথের পিতা স্বর্গীয় অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায় ই. বি. রেলের ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।

মন্মথনাথ শৈশবে গোয়ালন্দ হাই স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। "ভারতবর্ষে"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় রায় জলধর সেন বাহাদুর তখন উক্ত স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। পরে কলিকাতা এলবার্ট কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ ও এম্-এ পাশ করেন এবং রিপণ কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

তিনি ঠাকুর আইন বিষয়ক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং তদানীন্তন সরকারী উকিল রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহকারীরূপে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন।

মন্মথনাথ আইন ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একজন কৃতী ব্যবহারাজীবরূপে পরিগণিত হওয়ার পক্ষে প্রচুর অন্তরায় আছে এবং বহুদিন অপেক্ষা না করিলে ব্যবসায়ে খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ করা সম্ভব নহে। ই. বি. রেলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার পিতার বিশেষ প্রতিপত্তি থাকায় মন্মথনাথ ১৫০৲ বেতনে ঐ রেলে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু মন্মথনাথের এ চাকুরী মনোমত হইল না। তিনি এক সপ্তাহকাল মাত্র চাকুরী করিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল উকিলের কার্য্য গ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত পদ গ্রহণে তিনি সমর্থ না হওয়ায় মুন্সেফী চাকুরীর জন্য চেষ্টা করেন। তদানীন্তন বিচারপতি আমীর আলি মন্মথনাথের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হন এবং মন্মথনাথ যাহাতে উক্ত পদলাভে সমর্থ হন, তজ্জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু দেড় বৎসর বয়স কম হওয়ায় উক্ত চাকুরীলাভে মন্মথনাথ অসমর্থ হন এবং পুনরায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি ব্যবসায়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

শ্রুতকীর্ত্তি স্যার্ মন্মথনাথ !

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

দশ-দেশ-জাতি-ধর্ম্ম স্বজন ও স্বগণের সাধিয়া কল্যাণ,
হে মন্মথ, মন মথি' হ'য়েছিলে অপ্রমেয়, বিরাট্-মহান্ !
আজ তুমি নাই সথে, মৃত্যুহীন আত্মা ল'য়ে গেছ অমরায়,
স্মৃতি-অর্ঘ্যে, শ্রুতকীর্ত্তি, জনগণ শ্রদ্ধাভরে প্রণমে তোমায় !

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়
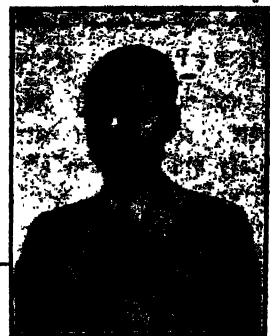
ক্রিকেট ঃ

উপযুক্ত শিক্ষা এবং সুযোগ দিলে আমাদের দেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ভবিষ্যতে যে বিদেশে গিয়ে খেলোয়াড় হিসাবে সম্মানলাভ করবে না এরূপ্ ধারণা করবার কোন কারণ নেই। অবশ্য সাধারণের ধারণা, 'Good batsmen are born and not made.' কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যদিও খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড়রা নির্ভুল বল নিক্ষেপে, দৃষ্টি শক্তিতে এবং হাতের কব্জির দক্ষতায় যে ব্যাট চালনার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখায় তা জন্মগত প্রতিভার জন্যই অনেকাংশে সম্ভব হয়। কিন্তু একমাত্র জন্মগত প্রতিভা থাকলেই প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জ্জন করা যায় না। কারণ অন্যান্য খেলার মতই ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যত নির্ভর করে খেলোয়াড়ের অধ্যবসায় এবং অনুশীলন চর্চ্চার উপর। বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষার অভাব থাকলে প্রতিভাশালী খেলোয়াড়রা দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত নিজদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না, খেলার দোষ ত্রুটীগুলি শেষ পর্য্যন্ত খেলার সৌষ্ঠবকে অনুজ্জ্বল করে দেয়। ক্রিকেট শিক্ষকেরা বলেন, শৈশব অবস্থা থেকে যদি উৎসাহী খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষাধীনে অনুশীলন চর্চ্চার ভার দেওয়া হয় তাহলে খেলার দোষত্রুটীগুলি সংশোধিত হ'য়ে খেলার ভঙ্গীকে সৌষ্ঠবযুক্ত করে। প্রতিভা সম্পন্ন না হয়েও উপযুক্ত শিক্ষার সহযোগিতায় খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের সম্মান যে লাভ করা যায় তার প্রমাণ আমরা পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষায়তনগুলি থেকে পাব। তবে ক্রিকেট খেলার উপর যাদের কোন আকর্ষণ বা 'ন্যাক' নেই তাদের কাছ থেকে খুব বেশী আশা করা বৃথা। সকলেরই চৌখস খেলোয়াড় হবার সম্ভাবনা নেই বলে হতাশ হ'য়ে রণে ভঙ্গ দেওয়ার যুক্তিকে সমর্থন করা যায় না। মনের আনন্দ রক্ষার জন্যই খেলাধূলা এবং মাত্র আনন্দ লাভের জন্যই খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য্য। খেলায় দক্ষতা লাভের জন্য কতকগুলি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করতে ক্রিকেট খেলোয়াড় বাধ্য। এই পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলন চর্চ্চা না করলে কোন দিন ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড়ের সম্মান পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশে খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেমন কোন ব্যবস্থা নেই তেমনি 'কোচের'ও যথেষ্ট অভাব। তাছাড়া খেলোয়াড়রা খেলাধূলার বাংলা বইয়ের অভাব একান্তভাবে অনুভব করছেন। এই অভাব লক্ষ্য ক'রে ধারাবাহিকভাবে ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং শিক্ষকদের অবলম্বিত পদ্ধতিগুলি সন্নিবেশিত করা হবে।

খেলার সরঞ্জাম (EQUIPMENT) ঃ

খেলার পদ্ধতি আলোচনার পূর্ব্বেই সর্ব্বপ্রথম খেলার সরঞ্জাম সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ক্রিকেট খেলার ভাল সরঞ্জাম তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়ের খেলাকে উন্নত করতে পারে না। কিন্তু যে খেলোয়াড় খেলায় ভাল সরঞ্জাম পেলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারত খারাপ সরঞ্জামের জন্য তার খেলা আশানুরূপ না হ'তেও পারে।

পোষাক ঃ

ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পোষাক পরিচ্ছদের সব থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় খেলোয়াড় পায়েতে কি ব্যবহার করে। প্রত্যেক ক্রিকেট খেলোয়াড় ক্রিকেট বুট ব্যবহারের ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। তবে যে কোন শ্রেণীর জুতোই ব্যবহার করা হউক না কেন, তা যেন মজবুত হয় এবং মাটিতে জুতোর গ্রিপ সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয় এবং সর্ব্বোপরি খেলোয়াড় জুতো পায়ে দিয়ে যেন বেশ স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে; আড়ষ্টতায় খেলায় অনেকখানি ক্ষতি করে। ক্রিকেট খেলায় সোয়েটার (sweater), ক্যাপ (cap) ফ্লানেল সার্ট, ক্রিম ট্রাউজার, সক্‌স্ (socks) এবং ক্রিকেট বুট ব্যবহার প্রত্যেকের সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটির ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন। সাধারণ পোষাকে নেট প্রাক্‌টিস করবার সময় খেলোয়াড়রা খেলায় বিশেষ শারীরিক স্বাচ্ছন্দ লাভ করেন না যতখানি ক্রিকেটের পোষাকে লাভ করা যায়। খেলোয়াড়ের socks হবে খুব পুরু আর বুটের প্রয়োজনীয়তা সব থেকে বেশী। বুটের গোড়ালির তলায় পাঁচটি এবং সোলের তলায় সাত থেকে আটটি মজবুত পেরেক থাকবে। পেরেকগুলি সাধারণত একের ছ ইঞ্চি পরিমাণ বাইরে রেখে দৃঢ়ভাবে আটকান থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার বেশীর ভাগ ক্রিকেট খেলাই ম্যাটিং উইকেটের উপর হয়। এই অবস্থায় রবার সোলযুক্ত বুটই ব্যবহার করা বিশেষ নিরাপদ।

প্যাড (PAD) ঃ

খেলোয়াড়ের পায়ের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী একজোড়া প্যাড দরকার। নেট প্রাক্টিস সময়ে এবং ক্রিকেট ম্যাচ খেলায় দুর্ঘটনার হাত থেকে পা দুটী রক্ষার জন্য প্যাডের বিশেষ প্রয়োজন। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়াও প্যাড ব্যবহারে খেলোয়াড় সব রকম বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হবার সাহস পায়, এবং নিজের দক্ষতার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারে। প্যাড দুটী খুব পরিষ্কার রাখা উচিত। প্যাড পরিধানের পর আরামপ্রদ হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। দৌড়বার সময় তা না হলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করে, খেলোয়াড় খেলাতে মন দিতে পারে না।

গ্লভস (GLOVES) ঃ

গ্লভসের প্রয়োজন খুব বেশী না হলেও যদি শিক্ষার্থীরা গ্লভস সংগ্রহ করবার সুবিধা পায় তাহলে দুর্ঘটনার হাত থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে এবং ভবিষ্যতে তারা নিজের উপর আস্থা স্থাপন করতে অভ্যস্ত হয়; বিশেষত খারাপ উইকেটে গ্লভসের প্রয়োজন বেশী।

ব্যাট (BAT) ঃ

ব্যাটের প্রয়োজনীয়তা ক্রিকেট খেলায় যেমন তেমনি কি ধরণের ব্যাট ব্যবহার করা উচিত সে সম্বন্ধে খেলোয়াড়দের

ব্যাটের হাতল ধরার নির্ভুল পন্থা; বাঁ হাতের পিছন দিক 'mid-off'-এর দিকে রেখে হাত দুটি কাছাকাছি ধরতে হবে

ব্যাটের হাতল ধরার ভুল পন্থা

ভাল রকম ধারণা থাকা উচিত। অনেক সময় পনর ষোল বছরের স্কুলের ছেলেদের প্রমাণ মাপের ব্যাট ব্যবহার করতে দেখা গেছে। খেলোয়াড় দৈহিক শক্তিতে যতই উপযোগী হউক না কেন যখন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানের মত খেলোয়াড়রা ছোট হাতলযুক্ত ব্যাট ব্যবহার করেন তখন খেলার সূচনাতে ছাত্রদের পক্ষে বড় ব্যাটে খেলা খুবই ভারী এবং বড় হয় না কি? ব্যাটের দৈর্ঘ্য এবং ওজন দুই দিক লক্ষ্য রেখে বিশেষজ্ঞরা ব্যাট ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিয়েছেন।

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং সমালোচক এক এ ওয়ার্ণার বলেছেন, খুব বেশী ভারী ব্যাটের থেকে খুব হাল্কা ব্যাটে খেলা সহস্রগুণ সুবিধাজনক। ভারী ব্যাট সময়ে নির্ভুল বল মারতে খুবই অসুবিধার সৃষ্টি করে তাছাড়া ভারী ব্যাটে খেলা অভ্যাস করলে সোজাভাবে ব্যাট চালিয়ে খেলা (Straight play) হয় না। অথচ ব্যাটিংয়ে পারদর্শিতা লাভ করতে হ'লে Straight batএ খেলার অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন। খুব শক্তিশালী না হ'লে দু' পাউণ্ডের বেশী ওজনের ব্যাট ব্যবহার না করাই উচিত।

আমরা বর্ত্তমান কালের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের মধ্যেও কতকগুলি বিষয়ে কুসংস্কার দেখতে পাব। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের Lucky Shirt আছে, তাদের মধ্যে অনেকে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাটিং ট্রাউজার ছাড়া অন্য রকম ব্যবহার করে না। কবে কোন্ পোষাক পরে সেঞ্চুরী করেছিল সে পোষাকের উপর তাদের এমন বিশ্বাস এবং আস্থা এসে যায় যে,তা সহজে ত্যাগ করতে পারে না। বর্ত্তমান কালের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের থেকে বোধ হয় কুসংস্কারাপন্ন লোক আর নেই বললেই চলে। তবে ক্রিকেট খেলোয়াড় যখন ক্রিকেট ব্যাটের ওজন ব্যাপারে বিশেষ নীতি অবলম্বন ক'রে চলে তখন তাকে কুসংস্কার বলা চলে না; কারণ অভিজ্ঞতার মধ্যেই খেলোয়াড় বুঝতে পারে কোন্ বিশেষ ওজনের ব্যাট তার খেলার ষ্টাইল রাখতে পারে এবং ঐরূপ কাছাকাছি ওজনের ব্যাট ব্যবহার করাই তার পক্ষে খুবই যুক্তিসঙ্গত। খর্ব্বাকৃতি ক্রিকেট খেলোয়াড়, যারা উইকেটের পিছনে এবং স্কোয়ারে বল পাঠিয়ে রান সংগ্রহ করে তারা হাল্কা ওজনের ব্যাট ব্যবহার করে আর লম্বা খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা উইকেটের সামনে বল পিটিয়ে খেলতে অভ্যস্ত তারা সাধারণত ওজনে ভারী ব্যাট ব্যবহার করাটাই সুবিধা মনে করে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যয় সঙ্কুলানের দিক থেকে ছেলেরা ভারী ব্যাট ব্যবহার করে। ভারী ব্যাট অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করা চলে সত্যি, কিন্তু ভারী ব্যাটে খুব কম খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারে। পূর্ণ বয়সের খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই পাউণ্ড ২ আউন্সের বেশী ভারী ব্যাট ব্যবহার করে না সুতরাং স্কুলেদের এর থেকে অনেক কম ভারী ব্যাট নিয়ে খেলার অভ্যাস করা উচিত; অবশ্য অনেক নামকরা ক্রিকেট খেলোয়াড় ভারী ব্যাট চালিয়ে ব্যাটিংয়ে যথেষ্ট সুনাম করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যায়—বিল পুলফোর্ডের। পুলফোর্ড ২ পাউণ্ড ৮ আউন্স ওজনের ব্যাট ব্যবহার করতেন। বিখ্যাত খেলোয়াড় ভক্টর ট্রাম্পার ভারী ব্যাট পছন্দ করতেন। এজার মেইন এককালে নামকরা ব্যাটসম্যান ছিলেন। তিনি দুখানি ব্যাটের অর্ডার দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটির ওজন ৩ পাউণ্ড এবং অপরটির ততোধিক।

ব্যাটের সাইজ এবং ওজন বিবেচনাযোগ্য হ'লে পর ব্যালেন্স পরীক্ষা করতে হবে। ব্যাটিংয়ের অভ্যস্ত পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে ব্যাটটি পিছনের দিকে ধীরে ধীরে তুলতে হবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্যাটটি মাটির সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল অবস্থায় না আসে। যদি ব্যাটের ওজন ঠিকভাবে ছড়িয়ে থাকে তাহলে ব্যাটসম্যান এই অবস্থা থেকেই বুঝতে পারবে। এখানে মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র হাতলের উপর সমস্ত ভার দিয়ে ব্যালেন্স পরীক্ষা করা চলে না।

ব্যাটের ব্যালেন্স সম্বন্ধে কোনরূপ বর্ণনা চলে না। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই ব্যালেন্স অনুধাবন করা যায়। যদিও কোন্ ব্যাট আপনার পক্ষে খুব ভারী হ'চ্ছে কি না তা নির্ণয় করবার একটি সহজ উপায় আছে। ডান হাতে একটি ব্যাট নিয়ে হাতলের শেষ প্রান্তটি ধরে ব্যাটটিকে সহজভাবে চালনা করতে পারছেন কি না দেখুন। যদি তা পারেন তাহলে বুঝতে হবে ব্যাটের ওজন আপনার পক্ষে প্রায় ঠিকই হয়েছে।

আপনার পছন্দসই ব্যাটটিকে যদি দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত ব্যবহারের উপযোগী ক'রে রাখতে চান তাহ'লে ব্যাটের উপর বিশেষ যত্ন প্রয়োজন। ভাল ব্যাট অনেকদিন পর্য্যন্ত কাজ দেয় যদি তা যত্ন নিয়ে রাখা যায়। খেলোয়াড়রা 'Lucky Bat' সহজে হারাতে চায় না। সুতরাং একটি পছন্দ মত ব্যাটকে নতুন অবস্থায় প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে লিনসিড তেল অথবা ব্যাটের ব্যবহার উপযোগী কোন তেল নিয়মিতভাবে মাখাতে হবে। ব্যাটের সামনে দিক (face) ও ধারগুলিতে (edges) প্রচুর পরিমাণ তেল দিতে হবে কিন্তু spliceএ কোন তেল দেবেন না, অথবা তেলের মধ্যে ব্যাটটিকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। এই রকম ব্যবস্থার ফলে ব্যাটের তলাটা খুব ভারী হয়ে পড়ে এবং যে জায়গাটা কঠিন হওয়া দরকার সেখানটা নরম হয়ে যায়। কয়েকবার তেল মাখানোর পর পুরোণো বল দিয়ে আস্তে আস্তে ব্যাটের সামনের দিকটা এবং ধারগুলি ঘা দিতে হবে। ক'দিন এই ব্যবস্থার পর ব্যাটটিকে প্রাক্‌টিশ ম্যাচে ব্যবহার করতে পারা যায়; প্রথমে ব্যাট চালিয়ে ক্যাচ লুফতে দিয়ে ব্যাটটিকে উপযোগী ক'রে তুলুন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে বলের আঘাতে যেন ধারগুলি নষ্ট হ'য়ে না যায়। নতুন ব্যাট প্রথম খেলার পর মাসে দু' একবার তেল মাখিয়ে নিতে হয় এর পর বছরে কয়েকবার তেল ব্যবহার করলেই যথেষ্ট।

এবার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে উইকেটের সামনে ব্যাট নিয়ে আসা যাক।

ব্যাটিং পদ্ধতি আলোচনার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। হাত এবং বাহুর ব্যবহার অপেক্ষা আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর ব্যাটিংয়ের উৎকর্ষতা নির্ভর করছে। খেলোয়াড়ের মাথা এবং পা চোখের সহযোগিতায় দিক্ নির্ণয় করে। ক্রিকেট সমালোচকরা বলেন, হাত, বাহু এবং কব্জির মতই মাথা এবং পায়ের অবস্থান গুরুত্ব বিশিষ্ট।

ষ্ট্যান্স (STANCE) ঃ

উইকেটের সামনে স্বচ্ছন্দভাবে দাঁড়ানোই ব্যাটসম্যানের প্রধানতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। দাঁড়ানোর যে পদ্ধতি কষ্টদায়ক তাই ভুল বুঝতে হবে।

পা, ব্যাট এবং বাহুর অবস্থান সম্বন্ধে খেলোয়াড়দের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। প্রথম শ্রেণীর ব্যাটিং সম্পূর্ণ নির্ভর করছে

উইকেটের সামনে দাঁড়াইবার নির্ভুল পন্থা

'ফুটওয়ার্কে'র উপর। পা দুটী যদি নির্ভুলভাবে মাটির উপর রাখা না হয় তাহলে কোন খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে আশানুরূপ সাফল্যলাভ করতে পারে না। উইকেটের সামনে ঠিক কি ভাবে দাঁড়ানো উচিত সে সম্বন্ধে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই তবে স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়াতেই ক্রিকেট শিক্ষকেরা উপদেশ দিয়ে থাকেন।

উইকেটের সামনে দাঁড়ানোর সব থেকে প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে, ডান পা পপিং ক্রীজের (Popping Crease) ঠিক ভিতরে এবং বাঁ পাটি প্রায় বাইর দিকে রাখা। ডান পায়ের মুখটি থাকবে 'Point'এর কিছু পিছনে 'Thirdman'এর দিকে লক্ষ্য করে। বোলার বাঁ-পাটী অথবা 'Mid-off'এর দিকে মুখ করে থাকবে। দুই পায়ের গোড়ালি ৪ থেকে ৭ ইঞ্চি ব্যবধানে থাকবে এবং পায়ের উপর শরীরের ভার সমানভাবে দিতে হবে। এই অবস্থায় খেলোয়াড়কে একটি নিয়ম পালন করতে হবে। বোলার বল ছোড়ার জন্য দৌড়তে আরম্ভ করার পর থেকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না 'ষ্ট্রোক' শেষ হচ্ছে ততক্ষণ ব্যাটসম্যানকে মাথাটি যতদূর সম্ভব স্থিরভাবে রাখতে হবে। এইরূপ নিয়ম পালনের অনেক কারণ আছে। প্রথমই চোখের কথা আসে। যতদূর সম্ভব ভাল ক'রে চোখ দিয়ে বলটিকে নিরীক্ষণ করা খেলোয়াড়ের প্রধানতম কর্ত্তব্য। এবং চোখদুটী মাথায় অবস্থান করায় খেলোয়াড়কে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাথাটি স্থির থাকে। মাথাটি ইতস্তত: সঞ্চালন করলেই খেলোয়াড় লক্ষ্য বস্তু হারিয়ে ফেলবে ফলে দর্শনীয় 'ষ্ট্রোক' ত হবেই না উপরন্তু আউট হবার সম্ভাবনা বেশী। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে 'ব্যালেন্স'। শরীরের অন্য সকল অঙ্গ থেকে মাথাই সব থেকে ভারী, এবং মাত্র একটু সঞ্চালনের ফলে পায়ের উপর ভারকেন্দ্রের পরিবর্ত্তন এসে যায়। আপনাকে নির্ভুলভাবে এবং সুচারুরূপে কাজ করতে আপনার চোখ সহযোগিতা করবে কিন্তু আপনি যদি 'ব্যালেন্স' হারিয়ে ফেলেন তাহলে আপনি চোখের কাছ থেকে কোনরূপ সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন না।

উইকেটের সামনে পায়ের অবস্থান। ডান পায়ের কাছে কাল দাগটি ব্যাটের স্থান

গ্রিপ (GRIP) ঃ

ক্রিকেট খেলার সূচনাতেই ব্যাটের হাতলটি ভুল পদ্ধতিতে ধরবার সম্ভাবনা বেশী। একবার ভুল পদ্ধতি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে সহজে ত্যাগ করা যায় না। খেলোয়াড় ভুল পদ্ধতিকেই সহজ এবং আরামদায়ক মনে করে। সব থেকে প্রচলিত ভুল পদ্ধতি হ'চ্ছে বাঁ হাত এবং ডান হাতের মাঝে অনেকখানি স্থান ছেড়ে দিয়ে ব্যাট ধরা। অন্যের ভুল পদ্ধতি দেখে কিম্বা ব্যাট খুব ভারী হওয়ার দরুণ এইরূপ ভুল পদ্ধতিতে ব্যাট ধরতে খেলোয়াড়দের দেখা যায়। এই সঙ্গে নির্ভুল পদ্ধতিতে ব্যাট ধরবার ছবি দেওয়া হ'ল; সব থেকে উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়ের বাঁ হাতটি হাতলের উপরের দিকে থাকবে। বাঁ হাতের পিছন দিক 'Mid-off'-এর দিকে হবে। হাত দুটী কাছাকাছি রেখে ব্যাট ধরতে হবে।

ক্রিকেট খেলার সব থেকে আকর্ষণ ব্যাটিং সম্বন্ধে আগামীবার আলোচনা করা যাবে।

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

অবশেষে রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। নীচে প্রতিযোগিতার ফলাফল দেওয়া হল।

রাজপুতানা : ১৮০ ও ২০৭
দিল্লী ঃ ১২৪ ও ১১৩

রাজপুতানা ১৫০ রানে দিল্লীদলকে পরাজিত করেছে।

পশ্চিম ভারতরাজ্য : ৩৪৯ ও ৮৪ (২ উইকেটে)
নবনগর দল : ২২৫ ও ২০৭

পশ্চিম ভারতরাজ্য ৮ উইকেটে নবনগর দলকে পরাজিত করেছে। নবনগর দলের প্রথম ইনিংসে জে ওঝা (পশ্চিম ভারতরাজ্য) ৯৩ রানে ৫টি উইকেট পান। পশ্চিম ভারতরাজ্যের প্রথম ইনিংসে পৃথিরাজ ১০৯ রান করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। নবনগর দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কিবেণচাঁদ (পশ্চিম ভারতরাজ্য) ৬৯ রানে ৫টি উইকেট দখল করেন।

পরলোকে ল্যাংটন ঃ

বিমান দুর্ঘটনায় দক্ষিণ আফ্রিকার খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় এ বি সি ল্যাংটন পরলোক গমন করেছেন। ল্যাংটন দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল দলের ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন। ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১০।১২।৪২

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত উপন্যাস "ঝরঝরা"—২৲
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "যাদুকরী"—২৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "মাটির প্রেম"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মানুষ সত্য"—২৲, "সন্ত্রাসবাদী"—২৲
দীন সেবক প্রণীত "সেবকের দিনলিপি"—৸৹
বগুড়া সারস্বত সঙ্ঘ-প্রকাশিত "নিগম-স্মৃতি"—৷৹
শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত উপন্যাস "চলার পথে"—২৲
প্রবোধ সরকার প্রণীত উপন্যাস "ছাত্রী"—১৲, "মাটি ও মানবী"—২৲
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দত্ত প্রণীত "বিলাতে বঙ্গনারী"—১৷৹
কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "শান্তিপুর-পরিচয়" (২য় ভাগ)—২৷৹
সতীকুমার নাগ প্রণীত স্ত্রীভূমিকা-বর্জ্জিত নাটক "বাংলার ছেলে"—৷৵৹
শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত স্বরলিপি-গ্রন্থ "গানের বলাকা"—২৲
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "প্রতিদিনের তীরে"—৷৵৹, "দিনে দিনে"—৷৹
শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "মেঘ ও জ্যোৎস্না"—১৷৹
নবগোপাল দাস প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "হে আত্মবিস্মৃত"—১৷৹
শ্রীমধুসূদন সর্ব্বাধিকারী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "ভৈরব শিঙা"—৷৹
"বনফুল" প্রণীত নাটক "মধ্যবিত্ত"—৬৹
চীন পাবলিশিং কোম্পানী প্রকাশিত "চীনরাষ্ট্র ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাঁচ বৎসর"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—পি. সি. ভট্টাচার্য্য

লামাদের অবতরণ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
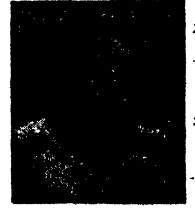
মাঘ—১৩৪৯

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

অতীতের কথাই বলিব। কেন না বর্ত্তমান যে বিভীষিকা দেখাইতেছে তাহা সতী শিবকে যে দশমহাবিদ্যা দেখাইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। কিন্তু আমি যে অতীতের কথা বলিব সে আজ প্রায় ১৩৫০ বৎসরের অতীত। বাংলাদেশের তখন নাম ছিল গৌড়। ভারতবর্ষ এবং চীনে এমন কি সমগ্র এশিয়াখণ্ডে গৌড় বলিতে বাংলাদেশকেই বুঝাইত। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে গৌড়ের রাজধানীর নাম ছিল 'কর্ণসুবর্ণ'। কর্ণসুবর্ণ ছিল ভাল নাম, আর ডাক নাম ছিল 'রাঙামাটী'।

নবদ্বীপ হইতে মুর্শিদাবাদ বেশী দূর নয়। এই মুর্শিদাবাদের মাত্র বার মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান মালদহ জেলার সীমান্তে যে স্থানটী—তাহাই কর্ণসুবর্ণ নামে প্রাচীন ইতিহাসে বিখ্যাত ছিল। রাজা শশাঙ্ক তখন গৌড়াধীপ। তাঁহার ইতিহাসবিশ্রুত রাজধানী, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ সমস্তই ছিল ঐ কর্ণসুবর্ণে। সুতরাং কালের দূরত্ব যতই বেশী হউক স্থানের দূরত্ব নবদ্বীপ হইতে খুব বেশী নয়।

শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা ইহা সর্ব্বজনবিদিত। শুধু "গৌড়" বলিলেই তখন শশাঙ্ককে বুঝাইত। কিন্তু ১ম প্রশ্ন—শশাঙ্ক কোন বংশের? তাঁহার জন্মস্থান কোথায়? তিনি আসিলেন কোথা হইতে? কবেই বা মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার সংযোগস্থলে রাজধানী স্থাপন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে একচ্ছত্র একটা সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও ধর্ম্ম-বিপ্লবের প্রলয়াগ্নি ছড়াইয়া দিলেন? এই প্রশ্ন যত সহজ, ইহার উত্তর তত সহজ নয়।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন শশাঙ্ক প্রাচীন গুপ্তবংশসম্ভূত। ইহার জন্য তাঁহারা প্রমাণও দিয়া থাকেন। কিন্তু আবার কেহ কেহ মনে করেন যে এই প্রমাণ যথেষ্ট নয়। শশাঙ্ক গুপ্তবংশসম্ভূত ইহার যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাস ছাড়িয়া শশাঙ্ক সম্বন্ধে এক উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন। সেই উপন্যাসে শশাঙ্ককে গুপ্তবংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমার আলোচ্য শশাঙ্ক উপন্যাস নয়, ইতিহাস। ইতিহাসেও কল্পনার স্থান আছে সত্য, কিন্তু উপন্যাসের মত নয়। শশাঙ্কের পিতার নাম অজ্ঞাত। তাঁহার পুত্রের নামও অজ্ঞাত। এমন কি যদি কেহ বলেন যে, শশাঙ্ক অবিবাহিত ছিলেন তবে তাহার উত্তরে তিনি যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা প্রমাণ করা কঠিন। বংশ সম্পর্কে শশাঙ্কের অতীতও নাই, ভবিষ্যতও নাই। কেননা রাজকীয় কোন বংশের তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। তথাপি শশাঙ্ক ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের অতীতও আছে, ভবিষ্যতও আছে। যাহা ইতিহাস তাহা কখনও শুধু বর্ত্তমানে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

শশাঙ্কের পিতার নাম যেমন অজ্ঞাত, তাঁহার জন্মস্থানও তেমনি অজ্ঞাত। কিন্তু শশাঙ্কের পিতাও ছিলেন এবং তাঁহার একটী জন্মস্থানও ছিল। অথচ ইতিহাস তাহা জানে না। ইহা বাংলার ইতিহাসের পক্ষে অপরাধজনক ত্রুটী। যাঁহারা শশাঙ্ককে গুপ্তবংশের বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন তাঁহারা পাটলিপুত্র কিম্বা ঐরূপ কোন স্থানে শশাঙ্কের জন্মস্থান আন্দাজ করিয়াছেন। ইহাও কল্পনা। সত্য নাও হইতে পারে। খাস

গৌড়দেশে তাঁহার জন্ম, কিম্বা গৌড়ের বাহিরে অন্য কোন প্রদেশে তাঁহার জন্ম। এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর নাই। তিনি গৌড়ের রাজা ইহা ঠিক, অথচ গৌড় তাঁহার জন্মভূমি কিনা, তিনি বাঙ্গালী কি না ইহা আমরা জানি না।

যাঁহারা ভিন্ন প্রদেশে শশাঙ্কের জন্ম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহারা শশাঙ্ককে মগধ হইতে যে মালদহ জেলায় আনিবেন ইহা বিচিত্র কি! কিন্তু ইতিহাস এখানেও অন্ধকার। শশাঙ্ক যেখান হইতেই আসুন না কেন তিনি গৌড়ের রাজা আমরা এই সত্যটুকুই জানিয়া আত্মশ্লাঘায় বিভোর হইতেছি। আর ভাবিতেছি, শশাঙ্ক বাঙ্গালীর রাজা। শশাঙ্ক বাঙ্গালীর ইতিহাস।

শশাঙ্কের পূর্ব্বে গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ছিল কিনা জানা যায় না। রাজধানী না থাকুক, সম্রাট অশোকের সময়েও যে কর্ণসুবর্ণ একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল—তাহার প্রমাণ অশোক এই নগরে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের সময়েও সেগুলি বিদ্যমান ছিল। যদি রাজধানী না থাকিয়া থাকে, তবে সম্ভবতঃ শশাঙ্কই গৌড়রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিস্তৃত গৌড়রাজ্যে এত জায়গা থাকিতে কর্ণসুবর্ণে তিনি কেন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা আজ শুধু সেই সময়ের ইতিহাসের গতি অনুসরণ করিয়া আমরা কিছুটা অনুমান করিতে পারি মাত্র। তার বেশী নয়।

শশাঙ্কেরও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলাদেশ ছিল, গৌড়রাজ্য ছিল। ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

(১) "বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে বঙ্গরাজ্যেরই একটি ত্যজ্যপুত্র ৭০০ লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন।" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ইতিহাসজ্ঞ মাত্রই তাহা বিদিত আছেন। সুতরাং বলিতে হইবে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে, শশাঙ্ক যে দেশের এবং যে জাতির রাজা হইয়াছিলেন, সেই দেশের এবং সেই জাতির শশাঙ্কের সময়েও দুইহাজার বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস আছে। শশাঙ্ক কতকগুলি বুনো জাতি লইয়া একটা ভুঁইফোড় দেশে রাজত্ব করেন নাই। যে দেশের রণসম্ভার ও সৈন্যবলের পরিচয় পাইয়া পঞ্চনদজয়ী দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার শশাঙ্কের কিছু কম এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ পূঃ ৩৩০) বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস্ "গাঙ্গারিডি" রাজ্য বলিতে—বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাঢ় দেশকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা কখনও কোন শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তীসৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না।—(বঙ্কিম পৃঃ ২৪৭) সর্ব্বজয়ী আলেকজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেক-জাণ্ডার বাংলাকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।"

আলেকজাণ্ডারের হাজার বৎসর পরে শশাঙ্ক সেই দেশে সেই জাতির রাজা হইয়াছিলেন। যে জাতি যুদ্ধবিশারদ এবং সামরিক শক্তিতে অত্যন্ত পরাক্রমশালী সে জাতির খুব একটা প্রাচীন ইতিহাস আছে। ভারতবর্ষে গুপ্তসাম্রাজ্য পতনের পর শশাঙ্ক সেই জাতির রাজা হইয়াছিলেন। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন একটা কারণ—যাহা বাংলাদেশে শশাঙ্কের মত একজন দিগ্বিজয়ী রাজাকে সম্ভব করিয়াছে। গুপ্তসাম্রাজ্যের গৌরব-রবি যেদিন মধ্যাহ্ন গগনে সেদিন গৌড়ের আকাশে শশাঙ্কের উদয় সম্ভব ছিল না। যুগ-প্রয়োজন ব্যতীত ইতিহাসে কোন শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব দেখা যায় না। শশাঙ্ক শক্তিমান পুরুষ। তিনি যুগপ্রয়োজনেই আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার সংযোগস্থলে কেন শশাঙ্কের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল?—ইহারও ঐতিহাসিক কারণ আছে। অকস্মাৎ বিনা-কারণে একটা রাজার রাজধানী যেখানে সেখানে স্থাপিত হয় না। শশাঙ্ক মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

২য় প্রশ্ন এই—শশাঙ্ক কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন? কখন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং কখন কিসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল?

শশাঙ্কের জন্মও হইয়াছিল মৃত্যুও হইয়াছিল, কিন্তু এই দুই তারিখের একটাও আমাদের জানা নাই। এখন এক অনুমানের উপর নির্ভর। তবে কোন সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি। কেন না কোন সময়ে তিনি বোধিদ্রুম উৎপাটন করিয়াছিলেন এবং কোন সময়ে তিনি কোথায় গিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে বধ করিয়াছিলেন এবং তাহার বন্দিনী ভগ্নী কনৌজের রাণী রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন—তাহা প্রাচীনেরা লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই গৌড়াধীপ শশাঙ্কের রাজত্বের ইতিহাস ভারত ইতিহাসের বুকে ভৃগুপদচিহ্নের ন্যায় স্মরণীয় হইয়া আছে। শশাঙ্কের রাজত্বের ইতিহাস আছে। তিনি মিথ্যা রাজত্ব করেন নাই, সত্যি রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ইহার উত্তরে শুধু বলা যায় যে, হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে বধ করিতে পারেন নাই। স্বাভাবিকভাবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আর কেহ নয়, হিয়ান্ চুয়াং তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

৩য় প্রশ্ন—শশাঙ্কের ইতিহাস আমরা জানি কোথা হইতে? স্কুলে বা কলেজে যে ইতিহাস পড়ান হয় তাহা হইতে যে জানি না ইহা নিশ্চয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকে হয়ত শশাঙ্কের নাম আছে কিন্তু ইতিহাস নাই। আধুনিকদের মধ্যে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ যতটুকু আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনুমান করিয়াছেন অনেক বেশী।

প্রাচীনদের মধ্যে (ক) কবি বাণভট্ট (খ) চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-চুয়াঙ শশাঙ্ক সম্পর্কে বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াও কিছুটা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নূতন কিছু আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে শশাঙ্ক সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানিবার উপায় নাই। এখন এক অনুমানের উপর নির্ভর। আর ভবিষ্যতে যদি কিছু আবিষ্কার হয়, তবে তখন তার উপর নির্ভর করা যাইবে।

হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের শত্রু। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি। সুতরাং রাজ অনুগ্রহে প্রতিপালিত। তিনি তাঁহার আশ্রয়দাতার শত্রু সম্পর্কে খারাপ কথাই লিখিবেন। সুতরাং শশাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার ব্যাপার সম্বন্ধে কবি বাণভট্ট যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হুবহু স্বীকার করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার অন্যদিকে হিউ-য়েন-চুয়াঙকে বলা হইল যে, শশাঙ্ক বোধিদ্রুম উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছেন। বুদ্ধ-পদচিহ্ন যে প্রস্তরে ছিল তাহা চূর্ণ করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছেন। অতএব এই চীনা ভদ্রলোক যাঁহার বুদ্ধের প্রতি এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার জন্য সুদূর চীন হইতে কত কষ্ট করিয়া এদেশে আসিয়াছেন তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী শশাঙ্কের উপর লেখনীমুখে খড়্গাঘাত করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং বাণভট্ট অথবা হিউ-য়েন-চুয়াঙ কাহারও নিকটেই আমরা শশাঙ্ক সম্বন্ধে সত্য ইতিহাস জানিতে পারি না। কেননা ইহারা উভয়েই হর্ষবর্দ্ধনের প্রশংসা এবং শশাঙ্কের নিন্দা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, গৌড়াধীপ শশাঙ্ক এতবড় বীরপুরুষ, অথচ ইতিহাসকে প্রশংসা করিবার জন্য তাহার পৌরুষে, চরিত্রে, রাজ্যশাসনে কিছুই পাইবে না।

৪র্থ প্রশ্ন—শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন কিনা? যদি সত্যই তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী হইয়া থাকেন, তবে তাহা অস্বীকার করিলে ভুল করা হইবে।

ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন ৬০০ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক বোধিদ্রুম উৎপাটন করিয়াছিলেন এবং পাটলিপুত্রে বুদ্ধ পদচিহ্নের প্রস্তর খণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা অতি ভয়ঙ্কর কথা। সেদিন

শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র এশিয়াখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ। প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই বৌদ্ধ জগৎ শশাঙ্কের এই নৃশংস কার্য্যে সেদিন চমকিত ভীত, স্তম্ভিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে যে, ৫ম শতাব্দীর প্রথম হইতে ভারতবর্ষে যে হুন আক্রমণ চলিয়াছিল, তাহা শশাঙ্কের সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছিল। শশাঙ্কের এই অমানুষিক কার্য্য নৃশংসতায় ও বর্ব্বরতায় গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসকারী হিংস্র হুনদিগকেও পরাস্ত করিয়াছে। শশাঙ্ক যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। হিউ-য়েন-চুয়াঙকে ভারতবর্ষের লোকেরা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এত বড় একটা মিথ্যা কথা কল্পনা করিয়া বলিতে পারিত না।

অবশ্য ইউ-য়েন-চুয়াঙকে শশাঙ্ক সম্পর্কে হর্ষবর্দ্ধনের লোকেরা একটাও মিথ্যা কথা বলেন নাই, ইহা মনে করিতে পারি না। তারপরে প্রশ্ন হইতেছে শশাঙ্ক এরূপ বর্ব্বরোচিত কার্য্য কেন করিলেন? তিনি যে সে দেশের রাজা নন—গৌড়ের রাজা। রাজার কার্য্য যুদ্ধ করা। তা তিনি করুন। দেশের পর দেশ জয় করুন। জাতির পর জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দী করুন। সমগ্র ভারতবর্ষে গুপ্তসাম্রাজ্যের পর আবার তিনি একটা নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করুন। ইহাতে কেহই কিছু বলিবে না, বরং প্রশংসাই করিবে। উত্তরে বলা যায় তিনি ত তাহাই করিতেছিলেন। মালদহ জেলার রাজা বোধগয়া ও পাটলিপুত্রে দেশজয় করিতেই ত গিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ জয়ও করিয়াছিলেন। নতুবা বোধিদ্রুম উৎপাটন ও বুদ্ধ পদচিহ্ন নদীতে নিক্ষেপ, ইহা কি তিনি বিনা বাধায় করিতে পারিতেন। বিনা বাধায় এই কার্য্য তিনি সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। প্রচণ্ড বাধাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল এবং দেশজয়ের এই বাধা অতিক্রমের গতিমুখে বোধিদ্রুম উৎপাটন ও বুদ্ধ পদচিহ্ন চূর্ণীকরণ অপরিহার্য্য হইয়াছিল। কি বিশেষ কারণে ইহা অপরিহার্য্য হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কল্পনা করিয়াছেন যে, বোধগয়া ও পাটলিপুত্রের বৌদ্ধেরা শশাঙ্কের শত্রুকে ষড়যন্ত্রমূলে গোপনে সাহায্য করিয়াছিল। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর মিরকাশিম, জগৎশেঠ প্রভৃতিকে যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম থলির মধ্যে পুরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইউরোপে হিট্‌লার যেমন ইহুদীদের বিতাড়ন করিয়াছে, শশাঙ্কের পক্ষেও ইহা সেইরূপ একটী অভিযান। দেশজয় করা যদি রাজার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, বীরত্ব বলিয়া রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ইতিহাসে স্থান পায়, তবে সেই রাজকার্য্যের জন্যই শশাঙ্কের পক্ষেও এইরূপ কার্য্য করা প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং ইহা রাজকার্য্য, ধর্ম্মবিদ্বেষ নহে।

কিন্তু ইহাতেও প্রশ্নের সমাধান হইল না। সত্যই কি শশাঙ্কের চরিত্রে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না? তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন না। গুপ্তবংশীয়দের মত তিনি বৈষ্ণবও ছিলেন না। বিষ্ণু তাঁহার উপাস্য নহেন। তাঁহার উপাস্য শিব। তিনি শৈব ছিলেন। তাঁহার প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রায় বৃষ ছিল, নন্দী ছিল, শিব ছিলেন। যে দণ্ড হস্তে তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন রজতনির্ম্মিত সেই প্রকাণ্ড প্রচণ্ড দণ্ড শিবের মূর্ত্তিকেই বহন করিত। তাঁহার নিজের ধর্ম্মে তিনি গোঁড়া ছিলেন—যেমন আওরঙজেব মুসলমান ধর্ম্মে অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং গোঁড়া ছিলেন। শশাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনও ধর্ম্মমতে গোঁড়া ছিলেন না। ইতিহাসে দেখা যায় যে সকল রাজা নিজ ধর্ম্মমতে গোঁড়া তিনি নিজের ধর্ম্ম দেশের মধ্যে প্রচলিত করিতে উৎকট চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ প্রচলিত অপর ধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণু; হর্ষবর্দ্ধন বা আকবর চরিত্রে পরধর্ম্মের প্রতি যে সহিষ্ণুতা দেখা যায়, শশাঙ্ক ও ঔরঙজেবের চরিত্রে তাহা দেখা যায় না। ঔরঙজেব যে যে কারণে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন সম্ভবতঃ সেইরূপ কারণেই শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষী ছিলেন। ধর্ম্মপ্রচার এবং সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা একসঙ্গে করিতে গিয়া হয়ত ইঁহারা উভয়েই তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সুতরাং শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ মিথ্যা কল্পনা নাও হইতে পারে। তিনি হয়ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে মূলসহ উৎপাটন করিয়া পাথরে অঙ্কিত বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন লুপ্ত করিয়া সেই সকল স্থানে শৈব ধর্ম্ম প্রচলনের প্রয়াস করিতেছিলেন।

শশাঙ্কের পূর্ব্বে গুপ্তবংশীয়েরা সাম্রাজ্যস্থাপনকালে বৌদ্ধধর্ম্মকে নিরসন করিয়া কি সেই স্থানে পুনরায় বিষ্ণু উপাসক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন নাই? এতবড় যে সম্রাট অশোক, পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁহার তুলনা মিলে না, তিনিও কি সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলন করিবারকালে ব্রাহ্মণপ্রধান হিন্দু-ধর্ম্মকে দূরীভূত করেন নাই এবং এই বৌদ্ধধর্ম্ম যখন চীন দেশে প্রেরিত হইল, তখন কি ইহা চীনদেশের কনফিউসিয়াসের ধর্ম্মকে আঘাত করে নাই। বিনা আঘাতে বিনা সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম এশিয়াখণ্ডে প্রচার হয় নাই। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক যদি ব্রাহ্মণ্যপ্রধান শৈবধর্ম্মের পক্ষ হইতে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মকে আঘাত করিয়া থাকেন, তবে সেই ঘটনা যতই ভয়ঙ্কর হউক আপাতঃদৃষ্টিতে যতই নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত হউক, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিমুখে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পর বৌদ্ধ, বৌদ্ধের পর পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম ইতিহাসের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াই ঘটিয়াছে। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের কার্য্য নূতনও কিছু নহে এবং আশ্চর্য্য হইবারও ইহাতে কিছু নাই। মোগলসম্রাট ঔরঙজেব কি হিন্দুধর্ম্মের মূল উৎপাটন করিয়া ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলনের চেষ্টা করেন নাই। ঔরঙজেবের চেষ্টা যতটা ব্যর্থ হইয়াছে, শশাঙ্কের চেষ্টা ততটা ব্যর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষে আজ কয়জন বৌদ্ধ আছে। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ আচার্য্য শঙ্কর যে কার্য্যে দুই শতাব্দী পরে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, শশাঙ্ক তাহা দুই শতাব্দী আগে করিয়াছেন এই যা। আচার্য্য শঙ্করকে যাঁহারা প্রশংসা করেন শশাঙ্ককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন কেন? হয় দুইজনকেই নিন্দা করুন, না হয় দুইজনকেই প্রশংসা করুন। আর তাও যদি না পারেন তবে শশাঙ্কের প্রতি পক্ষপাতদোষে দুষ্ট যে নিন্দা তা পরিত্যাগ করুন। শশাঙ্কে আর আচার্য্য শঙ্করে একটা আশ্চর্য্য মিল দেখিতেছি। এরা দু'জনেই শৈব। তবে একজন রাজা, ব্যবসা যুদ্ধ ও রাজ্যপালন; আর একজন দার্শনিক, ব্যবসা শাস্ত্রের অভিনব ব্যাখ্যা ও তাহার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন।

শশাঙ্ক না হয় হিন্দু ঔরঙজেবই ছিল, কি আসে যায়। ইতিহাস ত ফরমাস দিয়া তৈয়ারী হয় না। শশাঙ্কের আবির্ভাব যে যুগপ্রয়োজনে মালদহ জেলায় এক হাজার তিনশ পঞ্চাশ বৎসর আগে অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য হইয়াছিল সে যুগপ্রয়োজন আমরা জানি না এবং এতাবৎ জানিবার কোন চেষ্টাও আমরা করি নাই। (আগামীবারে সমাপ্য)

উচ্ছ্বাস

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

নিষ্প্রদীপের জ্বালায় আর জীবনটাও যেন আলো পাইতেছে না। অতএব নবীন তাহার ছত্রিশ বৎসর বয়সের বিচ্ছিন্ন ছন্নছাড়া মন লইয়া নূতন করিয়া জীবনের বীণা-তন্ত্রে তার চড়াইয়া বাঁধিতে বদ্ধপরিকর হইল। বিবাহ—হাঁ, সে বিবাহ করিবে। কেন, কেন সে বিবাহ করিবে না? সে সর্ব্বপ্রথমে অমরেশকে লিখিল—'আমার জীবন-পূর্ণিমার উদ্বোধনের উৎসব-রজনীতে তোমায় সর্ব্বাগ্রে আহ্বান করি।'···এসো—ইত্যাদি।

অমরেশ নবীনের কলেজ-কালের বন্ধু। বহুদিন ধরিয়া সে নবীনকে বলিয়া আসিয়াছে যে বিবাহটা জীবনের একটা বড় 'ফ্যাক্টর'। নবীনও সে কথা স্বীকার করিয়াছে এবং তাহার সহিত পূর্ণিমার যে অন্তরঙ্গতা গোপনে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও সে জানাইতে দ্বিধা করে নাই। কিন্তু তবু এতদিন ধরিয়া ঘনিষ্ঠভাবে কাটাইয়াও ইহারা যে বিবাহিত হয় নাই কেন—তাহা অমরেশ বুঝিত না বা তাহার ওই সব বাজে ব্যাপারে মাথা গলাইবার মত যথেষ্ট বাজে সময় হাতে থাকিত না বলিয়া সে তেমন বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই।

কিন্তু আজ—আজ যে নবীন পূর্ণিমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া ফতোয়া দিয়াছে। অমরেশের মনে বেশ আনন্দ হইল। অনেকদিন পরে সে যেন আবার কলেজের আঙিনায় চলিয়া গেল। তারপর সেখান হইতে একাকী লেকে বেড়াইতে যাওয়ার কথাটা তাহার মনে পড়িল।···একদিন বিকালে তাহার সঙ্গে নবীন আর পূর্ণিমার দেখা। তাহারা জলের কাছে নারিকেল বৃক্ষের নীচে বসিয়া আছে, নবীনের এক হাতে তাহার বাঁশের বাঁশি, আর এক হাত পূর্ণিমার মুঠার মধ্যে—সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আর পূর্ণিমার কণ্ঠে খেলিয়া বেড়াইতেছে সুরের লহর। তাহাদের সঙ্গে বসিয়া আছে এক পাশে রবীন্—রবীন্ পূর্ণিমার দাদা, প্রায় সমবয়স্ক এবং তাহাদের চেয়ে একবছরের 'সিনিয়র'।

আর একদিন, অমরেশ গিয়াছিল ওইরকমভাবেই আনমনে বেড়াইতে রেস্-কোর্সের মাঠে···সেখানেও সেই তিনজন। নবীনদের আসরে অমরেশের যাওয়া-আসা ছিল সামান্যই—কারণ সে বাজে সময় নষ্ট করিত না বড় একটা।

অমরেশ আসিয়াছিল বাহিরের হাওয়া লাগাইয়া স্বাস্থ্যোদ্ধার করিতে। তা এখানেও ত কাজের কামাই নাই। মাঝে মাঝেই মক্কেলরা ধাওয়া করিয়া আসে পরামর্শ লইবার জন্য। আজ সকালের ডাকে রামহরি পোদ্দার, হরগোবিন্দ মাইতি, দীননাথ কর্ম্মকার এবং আরও কা'র কা'র চিঠি আসিরাছে—হঠাৎ একখানা রঙীন খাম দেখিয়া একটু চম্‌কাইয়া গিয়াও সে প্রথমে ওখানা খুলিতে ভরসা করে নাই। ওরকম নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া আনন্দের চেয়ে দুর্ভাবনাটাই বেশি হয়—বিশেষ করিয়া আবার এই দুর্দ্দিনে, তার বিদেশে বসিয়া আর মোটে নাই যেখানে। শেষকালে ভয়ে ভয়ে সে খামখানা খুলিয়াই ফেলিল—কারণ মক্কেলদের সব চিঠিই শেষ হইয়া গিয়াছে।

তারপর অমরেশের সে কী বিস্ময়।··নবীনের বিবাহ! পূর্ণিমার সঙ্গে নবীনের বিবাহ! এতদিন পূর্ণিমা তবে বিবাহ করে নাই?·· ও, হ্যাঁ, ঠিক ত', একদিন নবীন বলিয়াছিল যে পূর্ণিমা কোথাকার স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্ হইয়াছে না ঐ রকম একটা কি··· আশ্চর্য্য! অমরেশের বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে চায় না কেন?

সেদিন দুপুরে আষাঢ়ের ঘন মেঘনিবিড় কালো অঞ্জনেআকাশখানাকে আঁধার করিয়া দিল। তারপর সে কী অসম্ভব বর্ষণ! মনে হইল আকাশখানা বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িল। ধরণীর চোখে মুখে আতঙ্কের ছায়া। বড় বড় গাছগুলো সব ঝঞ্ঝার বেগে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। ইউক্যালিপ্‌টাসের সুউচ্চ চূড়া বুঝি লুটাইয়া পড়িবে মাটীর বুকে। মাধবীলতা প্রাণপণে জড়াইয়া আছে দেউড়ীর থামটাকে—তার ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি। এমন বর্ষা অমরেশ জীবনে দেখে নাই। সে জানালার উন্মুক্ত পথ দিয়া দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে চাহিয়া আছে।···হঠাৎ নবীন আর পূর্ণিমার কথাটা মনে পড়িয়া গেল। তাহাদের জীবন মধুময়···তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বেকার পূর্ব্বরাগ আছে—কতদিনের কত স্মৃতি জড়াইয়া আছে ইহাদের জীবনের ইতিহাসে। আর তার—? অমরেশ কী করিল সারাটা জীবন ধরিয়া? বিবাহ একটা তাহার হইয়াছে বটে। অমরেশ আর বিভার যুক্ত জীবনের সঙ্গে ওই মধুমতী নদীটার বুঝি বা মিল আছে কিছু। বর্ষার সময় নদীটার মাঝখানে কোনরকমে হাঁটু ডোবে।···অকালেই তাহাদের মনের রঙ, রস সব কি শেষ হইয়া গিয়াছে ওই মজিয়া-যাওয়া নদীটার মত। দিন কাটে গতানুগতিকতার বাঁধা পথ বাহিয়া একঘেয়ে একটানা।···ছোটবেলায় স্কুল, যৌবনে কলেজ, তারপর বিবাহ—এইটুকু মাত্র জীবনের মূলধন—ব্যস্!

বাহিরে তখন প্রবল ঝড়ের মাতন চলিয়াছে। খোলা জানালাটার মধ্য দিয়া জলের ছাট আসিয়া ঘরটা ভিজাইয়া দিতেছে। অন্যদিন হইলে অমরেশ উঠিয়া গিয়া বন্ধ করিয়া দিত কিন্তু আজ যেন বাহিরের উন্মত্ততার আহ্বানে সে সাড়া দিয়াছে, বাহিরকে ডাকিতেছে অন্তর খুলিয়া—এসো, এসো, নূতন এসো।

বিভা আসিয়া গম্ভীরভাবে জানালটা বন্ধ করিয়া দিল, বলিল, মানুষ এত কুড়েও হয়! হাতের কাছে জানলাটা যে একটু হাত বাড়িয়ে—

অমরেশ বলিল, থাক্ না খোলা ওটা, একটু জল এলে ক্ষতি কি?

—বেশ তাই থাক—বলিয়া বিভা সেটা খুলিয়া দিয়া যেমন ঝড়ের মত আসিয়াছিল তেমনি সবেগে চলিয়া গেল।

অমরেশ একখানা উপন্যাসের মধ্যে ডুবিয়া গেল। খানিকদূর অগ্রসর হইতেই মনে হইল, আচ্ছা, উপন্যাসের মূলে ত কিছু সত্য আছে? সামান্য হইলেও তা সত্য বই আর কিছু নয় ত।

আচ্ছা উপন্যাসের নায়কের জীবনের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য কোথাও আছে কি? তাহার জীবনের শাখাপ্রশাখায় সে কল্পনার সবুজ পত্র, গন্ধমদির পুষ্প, কিছুই ত দেখা দিল না। ওকালতীর হিসাব-নিকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটা ছাপানো কাগজ আর টাকার মোটা অঙ্ক এই লইয়াই ত তাহার জীবন।···আর নবীন, পূর্ণিমা, জগতের আরও সকলে জীবনের আসল রূপ ও রসের সন্ধান পাইয়াছে।

অমরেশ বইএর পাতা মুড়িয়া কল্পনা করিতে লাগিল, সে উপন্যাসের নায়ক হইয়াছে—। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই মনে পড়িল নায়িকা কই—যে তাহার জন্য বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া থাকিবে, যে তাহার সঙ্গে মাঠে বেড়াইতে যাইবে, যে শুধু তাহারই জন্য আজীবন ধ্যান করিয়া কাটাইয়া দিবে তপস্বিনী উমার মত, সে কই।

অকস্মাৎ বিভার প্রবেশ। সে বলিল, ওগো, শীগ্‌গির এসো, একটা মজা দেখ্‌বে এসো। ওঠো না।

—কী।

—এসোই না আগে। খিড়কীর দোরের দিকে একটু চলো।

তারপর সে অমরেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। অমরেশ পিছনে পিছনে চলিল। সেখানেও সেই একই নাটকের অভিনয় চলিয়াছে। ওপাশের গাঙ্গুলীদের বাড়ীর অনীতা আর কলিকাতা-প্রত্যাগত একটি যুবক রমেশ এই বৃষ্টিতে হাত ধরাধরি করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে, আর ফলসা গাছের দু একটা ফল মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। বিভা বলিল—দুটীতে কেমন মানিয়েছে দেখেচ। ওদের আস্‌ছে মাসে বিয়ে গো।

—হুঁ। বলিয়া অমরেশ আবার ফিরিয়া আসে আপনার কক্ষে।···নায়ক হওয়ার আগে নায়িকাকে পাওয়া চাই! কিন্তু তাহার জীবন-নায়িকা কোথায়? বিভা!···কথাটা প্রথমে অমরেশের মনে সায় পায় না। কোথায় পূর্ণিমা, অনীতা আর কোথায় বিভা! সে নিজেই মানিতে চায় না, এটা কেমন করিয়া সম্ভব? অসম্ভব।

বাদলের ধারায় ভিজিতে ভিজিতে অনীতা আর রমেশ চলিয়াছে ওই সুমুখের লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়া। অনীতার মাথার খোঁপায় গোঁজা নাম-না-জানা ফুলের গোছা। অমরেশ চাহিয়া থাকে।

তারপর সে বিভাকে ডাকে—নন্দিতা! ওগো, ও অনন্দিতা।

বিভা আসিয়া সঝঙ্কারে কহিল, তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল। বলি বাড়ীতে ঝি চাকরদের সামনে কী যে করো।

কিন্তু বিভার আর গাম্ভীর্য্য থাকে না, সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলে। অমরেশ মনে মনে আশান্বিত হয়। তাহার মনে হয় বিভাকেও প্রিয়াপদে অভিষিক্ত করা যায় বোধহয়। নিশ্চয়ই যায়, সেও তো নারী। তবে এতদিন বুঝি অমরেশেরই দোষে, তাহারই পটুতার অভাবে হয়ত অনাদৃতা বিভা তাহার নারীসুলভ মাধুর্য্য বা উজ্জ্বলতা দেখাইতে পারে নাই। হয় ত বিভাই তাহাকে পৃথিবীতে সব চেয়ে সুখী মানুষ করিয়া দিতে পারিত যদি সে সাড়া পাইত অমরেশের তরফ হইতে। অমরেশ মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দেয়, লজ্জিত হয়। এ তাহার কতবড় অপরাধ—নারীর অন্তরের অন্তঃপুরকে অমর্য্যাদা সে করিয়াছে!··· সারাটা দুপুর অমরেশ আপনার মনে এই কথাগুলিই ঘুরাইয়া ফিরাইয়াদেখিল···।

সারাদিন অবিশ্রাম বর্ষণের পর বৈকালের দিকে মেঘটা যেন শ্রান্ত হইয়া পড়িল। আকাশে দিবাশেষের শেষ আলোর রেখা রাঙায়িত করিয়া দিয়াছে দিগন্তকে।

বিভা আসিয়া অমরেশকে বলিল, একটা কথা ব'ল্‌ব গো?

অমরেশ হাসিমুখে বলিল—তোমার কথা শোনবার জন্যেই ত—

বিভা রাগিয়া চলিয়া যাইতেছিল অমরেশ খপ্ করিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আটকাইয়া দিল, বলিল—দেবী, যদি প্রসন্ন হও ত আমি একটা আবেদন জানাই।

বিভা সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, তোমার আজ হয়েছে কি গো। আমার বাপু ভয় করে। শেষে কী মাথাটাথা—।

—এই ঠিক ধরেছো। মাথা খারাপ হয়েছে। দেখ্‌ছো না যা বৃষ্টি, মাথাটা ধরেছে। তাই বল্‌ছিলাম যে চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

—যাবে, সত্যি ব'ল্‌ছ? না লাহিড়ী মশাইএর আড্ডায় ঢুকবে গিয়ে।

—না গো না। এই তোমার গা ছুঁয়ে—।

—ওঁ-ওঃ, পরের মাথায় দিয়ে হাত—কিরে কাটি নির্ঘাত। আমার গায়ে হাত দিয়ে উনি দিব্যি গাল্‌তে এলেন।

—তুমি কি আমার পর গো। আজ সত্যি বল্‌ছি তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবো। কিন্তু একটা কথা আছে তার আগে—

বলিয়া অমরেশ বিভার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া কানে কানে কি বলিতে লাগিল।

* * *

মধুমতী নদীর ধারে অমরেশ বিভাকে লইয়া বেড়াইতে আসিল। আসলে নদীটার নাম কিছু নাই, কেহ বলে তটিনী, কেহ বা মিতাই বলে, আবার মধুপুরের গা বাহিয়া নদীটা বহিতেছে বলিয়া অনেকে মধুমতী বলিয়া থাকে। এককালে বেশ বড় নদী ছিল এটা, এখন হাঁটুভোর জল হয় মাঝখানে। বিস্তৃত বালির চড়া কত দিনের যৌবন-স্মৃতি বুকে করিয়া পড়িয়া আছে। ওপারে একটা মাঠ দেখা যায়, শেষ নাই বলিয়া মনে হয়—এমনই বিস্তৃত তার আয়তন। মাঝে মাঝে দু'চারিটী আম আর মহুয়ার গাছ মাঠের দিগন্ত-প্রসারী শূন্যতাকে পূর্ণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে।

দূরদিগন্তে সন্ধ্যা নামিয়াছে। বিভা চলিয়াছে অমরেশের হাত ধরিয়া—বিভা চঞ্চলা কুরঙ্গীর মতই লঘু পদে পলকে পলকে হাওয়ার আগে আগে চলিতেছে। অমরেশ তার চেয়েও জোরে। বিভার মাথায় ঘোমটা নাই, সিঁথিতে সিঁদুরের চিহ্ন দেখা যায় না, দীর্ঘ কেশদাম অবেণীসংবদ্ধ, এলোমেলোভাবে উড়িয়া আসিয়া মাঝে মাঝে অমরেশের চোখ মুখ ঢাকিয়া দিতেছে।—তার সঙ্গে মৃদু সৌরভ। অমরেশের বলিষ্ঠ বাহুর কনুই পর্য্যন্ত জামার হাতাটা তুলিয়া গুটানো, চোখের উপর তাহার সেই আদিকালের

মোটা কালো শেলের চশমাটা নাই। এ তার অভিযান—অভিনব কিন্তু অভিনয় নহে। বিভা সাজিয়াছে অবিবাহিতা তরুণী—আর সে তার প্রিয়তম প্রেমিক।

সামান্ত জল, সহজেই তাহারা হাঁটিয়া নদীটা পার হইয়া গেল। সমস্ত পৃথিবীতে আলো আঁধারের রহস্য রচনায় দিগ্‌বধূর রূপ বদ্‌লাইয়া গিয়া মায়াপুরীর ছায়া পড়িয়াছে চারিদিকে। চলিতে চলিতে অমরেশ বিভার হাত ধরিয়া টানিল—মৃদু আকর্ষণ। তারপর তাহারা বসিয়া পড়িল সেই মহুয়া গাছটার তলায়। এখন ফুল ফোটে না, তবে বেশ মখমলের মত মসৃণ ফল ধরিয়াছে গাছে গোছাগোছা। তাহাদের সম্মিলিত গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া পাতার মদির-স্মৃতি-মিশ্রিত সুবাস যেন বাতাসকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।

তাহারা দু'জনে মুখোমুখি বসিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া সেই আঁধারেও দু'জনের কালো চোখের গভীর আবেগমাখা দৃষ্টির বিনিময় ঘটিতেছে—অমরেশের মনে বেশ স্বপ্ন রচিত হয়। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, চুপচাপ কাটিয়া গেল কতক্ষণ।

এক সময়ে অমরেশ বিভার হাতটা ধরিয়া তুলিল আপনার বক্ষের কাছে। হাতটা তাহার কাঁপিয়া গেল, বুক যেন দুলিয়া উঠিল অননুভূত কোন শিহরণে। এ কী জোয়ার না বন্যা—তাহার মনের এত উচ্ছ্বাস কিসের?···তবে কি সে কিছু পাইয়াছে! তৃপ্তিতে, তৃষ্ণায় সে যেন ভরপুর। তৃপ্তি পাওয়ার—দেখা পাওয়ার। আর তৃষ্ণা—কই, আর কই।—আরও দাও; মানুষের অনন্ত তৃষ্ণা, এ তৃষ্ণা মিটিবে কিসে!···অমরেশ দেখিল—বিভা সুন্দরী, বিভা ভাবাকুললোচনা, বিভা মানসী—তাহার চোখের দৃষ্টি বিহ্বল, তাহার ওষ্ঠ, কপোল, কপাল সবটা মিলিয়া যেন ইন্দ্রপুরীর তোরণদ্বার রচনা করিয়াছে, সকলের মধ্যে সেই অন্তরালবর্ত্তী অন্তরের গভীর গোপন কথাটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নদীর কোল বাহিয়া যে রাস্তাটা মাঠ দিয়া আঁকাবাঁকাভাবে চলিয়া গিয়াছে প্রান্তরের প্রান্তদেশের অজানা গ্রামের উদ্দেশে, সেই পথ দিয়া একটু আগে একটি সাঁওতাল আপনমনে বাঁশি বাজাইয়া চলিয়া গিয়াছে—অমরেশের মনে তাহার নেশা লাগিয়াছে। যে সুরের রেশ রহিয়া গেল এইখানে, কে তাহার খবর রাখে।···অমরেশের ইচ্ছা করে বিভাকে বুকের কাছে আনিয়া বলে—ওগো, আমি তোমায় ভালোবাসি।

সে হাত বাড়াইয়া ধীরে ধীরে বিভাকে কাছে টানিল। প্রসাধনের মিঠে গন্ধ নেশাটায় যেন রসদ জোগান দেয়। অমরেশ প্রবলভাবে কাছে আকর্ষণ করে বিভাকে। তাহার বুকটায় যেন উত্তাল তরঙ্গের দুর্দ্দাম বেগ, এখনই বুঝিবা বিভাকে আদর করিয়া ভাসাইয়া দিবে।

সে আস্তে আস্তে বিভার মুখটা তুলিয়া ধরিল। চোখে চোখে চোখ মিলিল। অমরেশ তাহার মানসীকে চুম্বন করিবার জন্য সাগ্রহে অধীরভাবে অগ্রসর হইল। খুব কাছাকাছি সে ঝুঁকিয়া পড়িল।

তারপর সে বলিল, নন্দিতা গো, আজ আমাদের উৎসব-রজনী—কি বলো! চলো বাগান থেকে ফুল তোলা যাক্।

তাহার পর যে কী হইবে সেকথা অমরেশ মুখে কিছু বলিল না, তবে তাহার চোখে মুখে সেকথা লেখা ছিল। বিভা বলিল, চলো তাহলে ফেরা যাক্।

অমরেশ অন্ধকারেই বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। সে খেয়াল করে নাই বাগানে কেহ থাকিতে পারে। হঠাৎ কাহাদের মৃদু গুঞ্জনে তাহার চৈতন্য ফিরিল—ঝাঁকড়া ঝাউ গাছটার পাশে দুটি মানুষ বসিয়া আছে। অমরেশ কাছে আসিয়া দেখিল—অনীতা আর রমেশ। তাহাকে দেখিয়া উহারা আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। পিছন দিক হইতে বিভা বলিল, তুমি ততক্ষণ ফুল তোলো আমি একবার দেখে আসি ভূতেদের কাণ্ডকারখানা। যেমন বুধন্, তেমনি ঠাকুর—দু'জনে ঠোকাঠুকি লেগেই আছে।

অমরেশ বাগানের ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। পরক্ষণেই তাহার মনে যে গোলাপ, চামেলী, মালতী, বেল, রজনীগন্ধা সকলে যেন তাহাকে আদর করিয়া ডাকিল। ফুলের গন্ধে বাগানের বাতাস সুরভিত। অমরেশ আস্তে আস্তে ফুলগুলি দেখিয়া দেখিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার গাছটায় বোধহয় ফুল ফুটিয়াছে, বেশ মৃদু অনুগ্র মোলায়েম সুবাস আসিতেছে—অমরেশ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল চুপ করিয়া। এই বাগান তাহারই বাড়ীতে অথচ সে এতদিন ফিরিয়াও চাহে নাই। এখানে এত সম্পদ? বিভাকেও সে এমনি করিয়া না দেখিয়া কাটাইয়া দিল এতকাল।

অমরেশ আগাইয়া আসিয়া ভেনিসিয়ান গোলাপ গাছটার আধ-ফোটা ফুলটা তুলিল, তারপর দেখিতে দেখিতে একগাদা ফুল জড়ো করিয়া ফেলিল সে। আর হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখা চলে না অনেক ফুল তুলিয়া ফেলিয়াছে। অগত্যা সে চীৎকার করিয়া ডাক দিল—বিভা, বিভা, ও বিভা।

বাড়ীর ভিতর হইতে বিভার সাড়া আসিল—দেখ্‌গে যা বুধ্‌না, বাবু ডাকেন কেন। আমার বাপু মরবার ফুরসৎ নেই। আমার কি কোথাও যাওয়া চলে, বাড়ীতে আমার ভূত বাঁদর পোষা হ'য়েছে। যে কাজটা ব'লে না যাবো—সেটি হবার উপায় নেই। রাত দুপুরে বাবুদের গালগল্প ফষ্টিনাষ্টি হ'চ্ছে, উনুনে আগুন কে দেয়, রান্নাই বা করে কে—ওই আমি বলিনি আর হয়নি। আমি তোমাদের সংসারে বাঁদী হ'য়ে আছি।···ওদিকে আবার আর একজনের রং লেগেছে। ইস্—

বিভা যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। অমরেশ বাগানে দাঁড়াইয়া তাহার উচ্চকণ্ঠের উক্তিগুলি সবই শুনিল। তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেন এক নিমেষে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হাতের মধ্যে ফুলগুলি তাহাকে যেন তীব্র তীক্ষ্ণ ফলার মত বিঁধিতে লাগিল।

ওদিক হইতে আবার শোনা যায়—যাও দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি হাঁ করে? একটা আলো নিয়ে যাও বাবুর হুকুম তামিল ক'রে এসো। বলোগে আমি ব্যস্ত আছি। আর হ্যাঁ, বাগানে যখন তখন যাকে তাকে ঢুক্‌তে দিস্ কেন। এটা সরকারী পুকুর নয়, ব'লে দিস্ তাদের। যাও।

বুধন আলো হাতে করিয়া অমরেশের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মুখ চোখ ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। সে আস্তে আস্তে বলে, বাবু!—

—হ্যাঁ যাই রে।

ফুলগুলি যেন তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়ে। মাটির

উপর ছড়াইয়া ছিটাইয়া পড়িয়া ফুলগুলি এক ঝলক মিষ্ট গন্ধ ঢালিয়া দেয় চারিদিকে বাতাসে। অমরেশ পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসে। হাতে বুঝি একটা চামেলি লাগিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি হাতটা ঝাড়িয়া ফেলে। নাঃ কই ফুল ত ছিল না। সে নাকের কাছে হাত আনিয়া শুঁকিল—ফুল নাই, শুধু ফুলের গন্ধ। সে হাতটা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলে তবু গন্ধ রহিয়া গেল।

অমরেশ আসিয়া বসিয়া পড়িল নথীপত্র খুলিয়া। সারাটা দিন কোন কাজই করা হয় নাই। রামহরি পোদ্দারের চিঠির জবাবটা জরুরী, সেটা আগে লেখা দরকার—অমনি একটা বিল করিয়া দিতে হইবে আড়াইশ' টাকার।…নথীপত্রের আড়াল হইতেও নবীন, পূর্ণিমা, অনীতা, রমেশ যেন উঁকি মারিতেছে। অবশেষে সে বুধনাকে ডাকিয়া বলিল—ওই বাসি ফুলগুলো ফুলদানী থেকে ফেলে দে। শুয়ার কেবল খৈনী খাবে আর ঝিমোবে। কাল থেকে আর ফুল দিবি না।

বেচারী বুধন একবার বলিল, আজ্ঞে ওটা টাট্‌কা তোড়া, আমি আজই বিকেলে—

—তর্ক, ফের তর্ক। আমায় তুমি টাট্‌কা বাসি চেনাবে? আর ছাখ, কাউকে বাগানে ঢুকতে দিয়েছো কি চাকরী গিয়েছে তোমার। বড় ফাঁকিবাজ হ'য়েছিস্ তোরা।

আবার তাহার কলম চলিতে থাকে। রাত্রি গভীর হইয়াছে। চাকরেরা আসিয়া দু' তিনবার ডাকিয়া গিয়াছে—খাবার প্রস্তুত। অমরেশ বলিয়াছে, এই হাতের কাজটা—।

হাতের কাজ যখন সারা হইল তখন সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অমরেশ খাবার ঘরে আসিয়া আলোটা উস্কাইয়া দিয়া ঠাণ্ডা ভাতের থালাটা টানিয়া খাইতে বসিল। সে নামমাত্র বসা, খাওয়ায় তেমন আসক্তি নাই তাহার আজ।

এ রকম রাত করিয়া খাওয়া অমরেশের জীবনে নূতন কিছু নহে। তাহার খাইতে প্রায়ই রাত হয়, বিভা সব সারিয়া খাবার ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়ে। অমরেশ শুইবার সময় তাহাকে ডাকিয়া তুলিলে বিভা খাইতে যায়—এটা অনেক দিনের অভ্যাস তাহাদের।

অমরেশ আসিয়া ডাকিল—ওগো ওঠো।…

এক ডাকেই বিভার ঘুম ভাঙে। সে উঠিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, তোমার খাওয়া হ'য়ে গেছে?

অমরেশ সংক্ষেপে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

ঘরের এক পাশে একটা আলো মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, বিভা সেটার দম্ বাড়াইয়া দেয়; এখান হইতে খাবার ঘরে যাইতেও তাহার ভয়—যা অন্ধকার বাব্বাঃ।

হঠাৎ উজ্জ্বল আলোতে অমরেশ বিভার পানে চাহিয়া দেখে, —পত্নী!

বিছানায় শুইয়া তাহার চোখের সামনে আজিকার গোটা দিনটার ছবি ছায়া-চিত্রের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অমরেশ দেখিল সব, কিন্তু সন্ধ্যার সেই চুম্বনটার কথা মনে পড়িতেই তাহার মনে হইল যে চুম্বনটা মাঝপথে আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল তাহা ত সমাপ্ত হয় নাই। তাহার প্রিয়াকে বোধহয় সে দেখিতে পায় নাই। সে চুম্বন করিয়াছে পত্নীকে। প্রিয়ার রূপ, রস, স্পর্শ, সৌরভ—সবই তাহার স্ব-কল্পিত উচ্ছ্বাস। একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস অমরেশের বুকের মধ্যে পথহারার মত পাক খাইতেছে। সে দেখে সিমন্তিনী বিভা তাহার পাশে। তাহার উন্মুখ চুম্বন মুখেই রহিয়া যায়।

বিভার খাওয়া দাওয়া সারা হইয়াছে, সে ফিরিয়া আসিল। অমরেশ চুপ করিয়া শুইয়া থাকিল। বিভা আপনার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় শুইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে অমরেশ ঘুমাইতে পারিল না। পরদিন উঠিতে তাহার বেলা হইয়া গেল।

এক সময় বিভা জিজ্ঞাসা করিল, কাল কি তোমার পেটের গোলমাল হ'য়েছিল? খাওনি যে কিছু। আজ কি খাবে?

—ভাতই খাবো।

—তবে দই আনাই, কি বলো?

অমরেশ কিছু জবাব না দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। বিভা ডাকিল—তা ছাখো, তোমার আর কল্‌কাতা গিয়ে কাজ নেই।

একটু বিস্মিতভাবে অমরেশ বিভার দিকে ফিরিয়া চাহিল —ক'লকাতা?

—এই ত' কাল বললে কি একটা মামলা আছে। আমি বলি কি, একখানা চিঠি দিয়ে দাও তাদের, তারা দিন ফেলে সময় নিক্।

অমরেশের মনে পড়িল, নবীন আর পূর্ণিমার কথা। তাহাদের বিবাহে যাইবার জন্যই তাহার এই মামলার অছিলা। একবার মনে মনে ভাবিল—এ সেই মামলাই বটে, দিন ফেলে ওরা অনেক সময় নিয়েছে। কালকেই ত শেষ তারিখ ওদের মামলার।

সে শুধু বলিল—দেখি।

তারপর বসিবার ঘরে গিয়া, দেরাজের চাবি খুলিয়া সে রঙীণ খামখানা টানিয়া বাহির করিল। একবার চিঠিখানা পড়িল। সেটা ছিঁড়িতে গিয়া মায়া হইল, রাখিতেও ভয় একটু হইল বইকি, বিভা যদি ছেঁড়া টুকরাগুলি দেখিতে পায়! সে দেশলাই জ্বালিয়া কাগজখানা তাহার উপর তুলিয়া ধরিল। রঙীন কাগজখানা পুড়িয়া কালো ছাই ও গুঁড়া হইয়া হাওয়াতে রেণু রেণু হইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশাইয়া উড়িয়া গেল অমরেশের চোখের সাম্‌নে।

তবু অক্ষরগুলা যেন তাকাইয়া আছে! কালির ছাপ যেন মিলাইয়া যায় নাই। অমরেশ হাতের মুঠার মধ্যে পোড়া ছাইকেও গুঁড়া করিয়া ফেলিল। তারপর আপন কাজে মন দিল।

স্নান করিতে বাড়ীর মধ্যে অমরেশ আসিতেই বিভা হাসিতে হাসিতে গিয়া আল্‌মারীর গায়ে ঠেসান দিয়া দম লইয়া হাঁফাইতে লাগিল।

অমরেশ অবাক হইয়া গেল—ব্যাপার কী।

বিভা তাড়াতাড়ি একখানা আয়না আনিয়া তাহার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিল।

এ কী—তাহার মুখে কালী কিসের! মনে পড়িল, ছাই, চিঠির ছাই!

বিভার মুখের উপর ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে অমরেশ যেন কী পড়িয়া দেখিল এবং পরক্ষণেই হো—হো করিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাসি যেন আর থামিতে চাহে না।

হিন্দু-উত্তরাধিকার ও বিবাহ-বিধি সংশোধন

শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল্

ভারতবর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমরা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় আনীত ২৬ সংখ্যক 'বিল' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। আর একটী মাত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আমরা উক্ত 'বিল'-এর আলোচনা শেষ করিব।

উক্ত বিলের তৃতীয় ধারার উপসংহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃষি-ভূমি প্রস্তাবিত আইনের আমলে আসিবে না (১)। কৃষিভূমি কোন আইনের আমলে আসিবে তাহারও কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, আইনের খসড়াকারীদিগের মতে কৃষিভূমি বর্ত্তমানে প্রচলিত আইনের আমলেই আসিবে।

খসড়াকারীগণ অথচ কৈফিয়তের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে সমগ্র ব্রিটীশ ভারতে উইলকারী ব্যতীত হিন্দুগণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধারার সমতা আনিবার জন্যই তাঁহারা এই আইনের খসড়া করিয়াছেন।(২) বর্ত্তমানে দেখা যাউক তাঁহারা কতদূর পর্য্যন্ত এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষিভূমি এই আইনের আমলে আসে না ও কোন আইনের আমলে উহা আসিবে সে সম্বন্ধে খসড়া নীরব। সুতরাং ধরিয়া লইতে পারি যে, উহা বর্ত্তমানের আইনের আমলেই আসিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে এই স্থানে তাঁহারা তাঁহাদিগের নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। কৈফিয়ৎ স্বরূপ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, গভর্ণরের প্রদেশসমূহের কৃষিভূমি-উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার নাই, সেই কারণেই কৃষিভূমির উত্তরাধিকার ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই।(৩) কিন্তু কারণ যাহাই হউক তাঁহারা কি সমতা আনিবার চেষ্টায় (?) অধিকতর অসমতারই সৃষ্টি করিলেন না?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে—কৃষিভূমি প্রস্তাবিত আইনের আমলে আসিবে না ইহা বলিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত; কিন্তু কৃষিভূমি বা অকৃষিভূমি বলিতে আমরা কি বুঝিব সে সম্বন্ধেই বা খসড়া নীরব কেন? যে ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম হয় তাহাই কৃষিভূমি ও যে ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম হয় না তাহাই অ-কৃষিভূমি—ইহাই কি তাঁহারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন? তাহা হইলে পল্লী অঞ্চলে কি চাষের জমির উত্তরাধিকারত্ব এক আইনের আমলে আসিবে ও বাস্তভিটা অপর আইনের আমলে আসিবে? জমিদারের জমিদারীতে কৃষিভূমিও রহিয়াছে বাস্তু ভিটাও রহিয়াছে; অথচ জমিদার নিজে কৃষিকর্ম্ম করেন না সেই জমির আয় ভোগ করেন মাত্র—এক্ষণে প্রশ্ন এইরূপ জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব নির্ণীত হইবে কোন আইন অনুসারে? পল্লীর জমিদারী কি কৃষিভূমি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? মোটকথা কৃষিভূমির সংজ্ঞা বর্ত্তমান খসড়ায় দেওয়া না থাকায় মামলা মোকর্দ্দমার সংখ্যা বাড়িতেই থাকিবে।

প্রস্তাবিত 'বিল'-এর তৃতীয় ধারার কৈফিয়তের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—"We have, for obvious reasons, excluded Hindus governed by the Marumakkattayam, Aliyasantana or Nambudri Law of Inheritance." কিন্তু এই "obvious reason"টি যে কি তাহা জানাইবার কোন প্রচেষ্টা তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে হয় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রেও তাঁহারা আপনাদিগের বহুপ্রচারিত নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন।

এইবার আমরা পুনরায় ২৭ সংখ্যক বিলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই বিলের আলোচনা আমরা পূর্ব্বেও কিছু কিছু করিয়াছি (৪)।

২৭সংখ্যক 'বিল'-এর চতুর্থ ধারার (a) চিহ্নিত অংশ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে (৫)। এক্ষণে (b), (c) ও (e) চিহ্নিত অংশ (৬) সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(b) চিহ্নিত অংশে বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, বিবাহে উভয় পক্ষ একই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত না হইলে চলিবে না অর্থাৎ বর্ত্তমান খসড়া অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করে না। (অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আমরা ভারতবর্ষের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।) কিন্তু এই খসড়ারই সপ্তম ধারায় (৭) দেখিতেছি যে কোনরকমে যদি বিবাহ হইয়া যায় তাহা হইলে পাত্র পাত্রী একই বর্ণের নহে—মাত্র এই কারণে বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। ইহার দ্বারা কি প্রকারান্তরে অসবর্ণ বিবাহকে সিদ্ধ হিন্দু-বিবাহ বলিয়া ঘোষণা করা হইল না? আমরা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের এক অংশ অসবর্ণ বিবাহকে অসিদ্ধ বিবাহ বলিয়া মনে করি না সেই হিসাবে আইনের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্টই হইব; কিন্তু আমাদিগের বক্তব্য বিষয় হইতেছে ইহাই যে, আইন অসবর্ণ বিবাহকে সোজাসুজি স্বীকার করিলেই পারিত। সপ্তম ধারায় এই ব্যবস্থার ফলে চতুর্থ ধারার (b) চিহ্নিত অংশ কি অর্থহীন হইয়া যাইতেছে না? যাহার কোন মূল্য নাই সেইরূপ কোন কিছু লিপিবদ্ধ না করাই যুক্তিসঙ্গত—অন্ততঃ আমাদিগের এই মত।

বর্ণ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল গোত্র সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলিতে হয়। খসড়ায় সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ—যদিও সমগোত্রে বিবাহ হইলে

(১) Provided that this Act shall not apply—

(i) to agricultural land—Sec. 3 of L A. Bill no. 26 of 1942.

(২) The main features of the Bill are—

(i) that it embodies a common law of intestate succession for all Hindus in British India—Explanatory note.

(৩) "In clause (i) of the first proviso to the clause we have excluded agricultural land, because the Central Legislature cannot legislate upon succession in respect of agricultural land situated in Governor's Provinces."—Explanatory note.

(৪) ভারতবর্ষ আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

(৫) ভারতবর্ষ আশ্বিন ১৩৪৯

(৬) (b) both the parties must belong to the same caste.

(c) if the parties are members of a caste having gotras and pravaras, they must not belong to the same gotra or have a common pravara.

(e) if the bride has not completed her sixteenth year, her guardian in marriage must consent to the marriage. Sec. 4. of the L. A Bill no 27 of 1942.

৭—৮ No sacramental marriage solemnized after the commencement of this Act shall, after it has been completed, be deemed to be, or ever to have been,

কি পরিমাণে পাণ্ডিত্য হয় তাহা আমাদিগের জানা নাই ও যে হিন্দুসমাজের প্রগতিশীল সম্প্রদায় বিবাহ ব্যাপারে বর্ণকেই বাধা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা গোত্রকে কি স্থান দেয় তাহাও বুঝিতে পারা কষ্টকর নয়।

চতুর্থ ধারায় সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও সপ্তম ধারায় (৮) বলা হইয়াছে যে, বিবাহ হইয়া গেলে গোত্রের প্রশ্ন তুলিয়া পরে অনুষ্ঠিত বিবাহকে অসিদ্ধ বলা চলিবে না—এক্ষেত্রেও কি চতুর্থ ধারার ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না ?

কৈফিয়তে বলা হইয়াছে যে, পিতা বা অন্য কাহারও ভ্রমে যে কন্যার সমগোত্রে বা ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইয়া গিয়াছে—তাহার কি হইবে—এই বিবেচনায় তাঁহারা বহু-প্রসিদ্ধ আইনের factum valet বা যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা খসড়া-কারীদিগের বিবেচনার প্রশংসাই করি এবং তাঁহাদিগেরই মত স্যার গুরুদাসের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলি "The position of the woman whose marriage is void *ab initio* seems to be singularly unfortunate under the Hindu Law." সত্যই বিবাহিতা হিন্দু নারীর বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইলে তাহার অবস্থা হয় করুণতম। কিন্তু আমাদিগের বক্তব্য হইতেছে ইহাই যে, কৈফিয়তে যাহাই থাকুক না কেন, আইনের মধ্যে কুত্রাপি উল্লেখ নাই যে "ভ্রমবশতঃ এইরূপ বিবাহ হইলে" সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে যে ভ্রমবশতঃ না হইয়া এইরূপ বিবাহ যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তাহা হইলে কি হইবে ? উক্ত বিবাহ কি অসিদ্ধ হইবে ? এ বিষয়ে আমরা আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ চাই।

অনুমতি প্রসঙ্গে চতুর্থ ধারায় বলা হইয়াছে যে কন্যার বয়স ষোড়শবর্ষ পূর্ণ না হইলে তাহার বিবাহ ব্যাপারে তাহার বিবাহ বিষয়ক অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন (৯)। কিন্তু পরক্ষণেই সপ্তম ধারায় বলা হইয়াছে যে বলপূর্ব্বক বা তঞ্চকতা পূর্ব্বক না হইলে কন্যার বিবাহ বিষয়ক অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া বিবাহ হইয়া গেলে—মাত্র এই কারণে উক্ত বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না (১০)। গোত্র বা বর্ণ ব্যাপারে যে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে অনুমতি গ্রহণ ব্যাপারেও সেই কথাই বলা হইয়াছে ; কিন্তু আমরা বলি যে অনুমতি ব্যাপারে আর একটু সাবধান হওয়া উচিৎ। যে কন্যার বয়স ষোড়শবর্ষের অনধিক আমরা ধরিয়া লইতে পারি তাহার বুদ্ধি অপরিপক্ব। কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কারণে মাত্র সেই কন্যার সম্মতি আদায় করিয়া (এইরূপ সম্মতি আদায় করিতে বলপ্রকাশের বা তঞ্চকতার প্রয়োজন নাও হইতে পারে) তাহার অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে তাহাকে বিবাহ করিলে দণ্ডনীয় হইবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকাই উচিৎ।

invalid merely by reason of one or more of the following causes, namely :—

(a) that the parties to the marriage do not or did not belong to the same caste ;

(b) that the parties belonged to the same gotra or had a common pravara ; or

(c) Unless there was force or fraud, that the consent of the bride's guardian in marriage to the marriage was not obtained.

(৯) পাদটীকা (৬) (৩) চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য।

ভ্রমবশতঃ কোন কার্য্য হইলে তাহার প্রতিবিধানকল্পে খসড়া প্রণয়ন-কারীগণ যাহা করিয়াছেন আমরা তাহার বিরোধিতা করি না বরং প্রশংসাই করি ; কিন্তু ভ্রমবশতঃ না করিয়া যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ এই সকল বিধি লঙ্ঘন করে তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। অনুমতি গ্রহণ ব্যাপারে ইহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ও কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োজন। বর্ণ ও গোত্র ব্যাপারেও ইহার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ প্রয়োজন ও ইচ্ছাপূর্ব্বক চতুর্থ ধারা (প্রথম অংশ ব্যতীত) লঙ্ঘন করিলে যদি কোন অপরাধ না হয় তাহা হইলে উক্ত ধারাও খসড়া হইতে তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

আমরা মোটামুটিভাবে ১৯৪২ সালে উপস্থাপিত লেজিস্লেটিভ্ এ্যাসেমব্লীর ২৬ ও ২৭ সংখ্যক বিলের আলোচনা করিলাম। আমাদিগের বিবেচনায় হিন্দু সমাজের এইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কোন কোন যুক্তিতে ২৬ সংখ্যক বিল পরিত্যাগ যোগ্য তাহাও মোটামুটী আলোচনা করিয়াছি। হিন্দু সমাজের কর্ত্তব্য এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া মতামত ব্যক্ত করা। উক্ত সংখ্যা ভারতবর্ষে বলিয়াছি ২৭ সংখ্যক বিলের সংস্কার প্রয়োজন—কোন কোন বিষয়ে সংস্কার প্রয়োজন তাহাও ভাবিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য।

হিন্দু আইনের সংস্কার কোন কালে হইবে না ইহা কোন কাজের কথা নহে ও শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে হিন্দু ঋষীরাও সংস্কারের অপক্ষপাতী ছিলেন না। বর্ত্তমানেও পুনরায় সংস্কারের সময় আসিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সংস্কার কি ভাবে ও কতটুকু হইবে। আমাদের বক্তব্য, সংস্কার প্রয়োজন, কিন্তু ২৬ সংখ্যক বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্কার আমরা সমর্থন করি না ও ২৭ সংখ্যক বিলের প্রস্তাব আবশ্যক স্থলে পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হইলে আমরা তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত।

(১০) পাদটীকা (৭-৮) (৩) চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য।

সরল রেখা

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

বিন্দুর সমষ্টি লইয়া রেখা—যে রেখা এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু পর্য্যন্ত আপন গতিভঙ্গী পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রসারিত হয় তাহারই নাম সরল রেখা। জ্যামিতিক্ এই নিয়ম বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক কষিয়া গণিত শাস্ত্রের সত্য নিরূপণ করিতেছে—কিন্তু মানুষের জীবন-রেখা মুহূর্ত্ত-বিন্দুর সমষ্টির মাঝে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে—মধ্যে মধ্যে শুধু তাহার ছেদ পড়ে। গতি কখনও বা দ্রুত, কখনও অলস মন্থর ধারায় প্রবাহিত—তবুও তাহারা সরল রেখা—কারণ এ গতি বিসর্পিল নহে—কিংবা এ গতির মাঝে অসমতল ভাব নাই। জীবনের বক্র রেখাও আছে, তাহা অসমতল ক্ষেত্রে বন্ধুর পথে বৈচিত্র্যময় গতিপথ ধারায় প্রবাহমান।

আমি সে তরঙ্গ-মুখর ঘটনাবহুল জীবনের কথা বলিতেছি না। অতি সাধারণ জীবনের কথা, মুহূর্ত্তের গতিপথে যাহা বিস্ময় আনে না—অতি মন্থর এবং শ্লথ একটানা প্রবাহ যাহার, এ তাহার কথা।

আমার দক্ষিণের জানালা দিয়া সামনের বাড়ির যে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণটুকু দেখা যায়—সেখানে ইতিপূর্ব্বে বহু পরিবারের জীবন

রেখা মুহূর্ত্ত-বিন্দুর মাঝে মিলাইয়া গেছে—সে কাহিনী বলিবার প্রয়োজন আজ নাই।

সম্প্রতি যে তরুণ এবং তরুণী দম্পতি ওই ছোট ঘরখানিতে নীড় বাঁধিয়াছে তাহারই জীবন-আলেখ্য আঁকিতেছি।

ছোট তাহাদের সংসার—পরিচ্ছন্ন জীবনধারা—অনাবিল হাসি-খুসি সুখশান্তিতে জীবনের ক্ষুদ্র তরঙ্গদলগুলি একটানা ছন্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ওই ছোট নীড়টুকু জীবনের উষ্ণতায় সজীব।

একটি পরিচ্ছন্ন শয্যার মাঝে রাত্রির অন্ধকারে তিনটি প্রাণী কলধ্বনির কল-কাকলিতে মুখর হইয়া থাকে। স্বামী, স্ত্রী এবং তাহাদের মাঝখানে জীবনকে আরও ঘনতররূপে বাঁধিয়া দিয়াছে একটি শিশুপুত্র।

রাত্রির গভীরতায় নিদ্রিত শহরের বুকে যখন নিস্তব্ধতা এবং নিস্তরঙ্গতার পুলক শিহরণ জাগে, দিবসের যান্ত্রিক্ কোলাহল-মালিন্য যখন মুছিয়া যায়—তখন ওই সঙ্কীর্ণ শয্যার পর নগরীর জ্যোৎস্না আকাশের ভাঙা চাঁদের খানিকটা আলো ছড়াইয়া পড়িয়া মোহ বিস্তার করে।

শিশুটি হয়ত জাগিয়া উঠিল—কাঁচা ঘুমে বায়না ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বধূটি মৃদু তিরস্কার করিল—আদর করিল—পিঠ চাপ্ড়াইল—গুন্ গুন্ কণ্ঠে ঘুম পাড়ানি গান ধরিল—আয় চাঁদ আয় খোকার কপালে টি দিয়ে যা—

তরুণটি উঠিয়া কোনদিন বা হাতে কোন রঙিন্ খেলনা দিল—লজেন্স, বিস্কুট আর চকলেট দিয়া অপত্য স্নেহ প্রকাশ করিল।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বামী-স্ত্রীর প্রেম গুঞ্জনের মাঝে ভাঙা জ্যোৎস্নার আলো আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর খোকাকে মাঝখানে রাখিয়া জীবনের পরিপূর্ণতার মাঝে তরুণতরুণী দম্পতিযুগল সুখ নিদ্রায় নিমগ্ন হইল।

রাত্রির পর প্রভাত আসে।

নিদ্রিতা নগরী জাগিয়া ওঠে জীবনের কলরবে—মুহূর্ত্ত আগাইয়া চলে সময়ের নির্দ্দেশে।

তরুণী বধূটি জাগিয়া উঠিল। ঘুমন্ত শিশুটির মুখ চুম্বন করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় দেওয়ালের গায়ে টাঙানো লক্ষ্মীর পটে প্রণতি জানাইল।

তরুণ স্বামীটি তখনও গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। রাত্রির নগ্ন-মাধুর্য্য তাহার ঘুমন্ত মুখখানিতে পরিপূর্ণরূপে জাগিয়া আছে।

প্রভাতের সূর্য্যালোক শহরের প্রাসাদশিখর ভেদ করিয়া রাজপথে নামিয়া আসে।

তরুণী বধূটি স্নান সারিয়া এলোচুলে আবার সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়ায়। এলায়িত কুন্তল রাশিকে আলগা খোঁপায় বাঁধিয়া নিয়া কপালে সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া সিঁথিমূলে প্রশস্ত সিন্দুর রেখায় এয়োতির মঙ্গল-চিহ্ন আঁকিয়া দেয়।

ঘুমন্ত শিশুটি জাগিয়া উঠিল এইবার। তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া নিদ্রিত স্বামীকে সে জাগাইয়া তোলে—ওগো শুন্ছো—বেলা যে দুপুর হোল—ওঠো! বাজার যেতে হবেনা—আফসের দেরী হয়ে যাবে যে? ওঠো—ওঠো—আমি চায়ের জল চাপাচ্ছি।

আলস্য ভাঙিয়া তরুণটি প্রশান্ত দৃষ্টি মেলিল।

—কী ঘুম বাবা—এত ঘুমোতেও পারো তুমি?

তরুণটি স্মিত হাসি হাসিয়া বলে—রাত্রে তো তোমার জ্বালায় ঘুমোবার উপায় নেই—এইটুকুই যা কিছু আসল ঘুম।

তরুণীটি প্রতিবাদ জানায়—ইস্ মিথ্যেবাদী কোথাকার—মিথ্যে কথা বলতে এই সাত সকালে তোমার মুখে বাধলো না? আমি ঘুমোতে দিই না—না তুমি খুনশুড়ি করে জেগে থাকো। নিজে তো ঘুমোবে না, আর আমাকেও ঘুমোতে দেবে না।

—আচ্ছা দেখবো আজ রাত্রে—

তরুণীটি হাসিয়া কহিল—হেরে গেলে কিন্তু জরিমানা দিতে হবে বলে দিচ্ছি।

মিষ্টি হাসির দীপ্ত কিরণ ছড়াইয়া তরুণী বধূ চলিয়া গেল।

তারপর মুহূর্ত্তের দ্রুত গতির সাথে সাথে জীবনের গতি পাল্লা দিয়া চলিতে থাকে।

স্বামীটি চা পান করিতে করিতে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখে।

বধূটি রান্নাঘরে গৃহস্থালী কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে। বাজারের মোট নামাইয়া তরুণটি স্নান ঘরে প্রবেশ করে, তরুণীটি ভাত বাড়িয়া দিয়া পরিচ্ছন্ন আসন বিছাইয়া পরিবেশন করে—হাত পাখা লইয়া গরম ভাত তরকারিতে বাতাস করে।

আহারান্তে স্বামী-স্ত্রীতে আবার সেই ক্ষুদ্র ঘরটিতে ফিরিয়া আসে।

বধূটি স্বামীর টিফিনের বাক্স জামার পকেটে ভরিয়া দেয়—হাত ঘড়িটির পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তরুণটি ব্যস্ত হইয়া ওঠে।

অফিস যাইবার কালে শিশুটিকে আদর করিয়া তরুণী বধূর প্রতি মধুর প্রেম দৃষ্টি হানিয়া তরুণটি দ্রুত গতিতে নগরীর ব্যস্ত জনতার পথে মিশিয়া যায়। বধূটি স্বামীর গতি পথের পানে তাকাইয়া থাকে।

দ্বিপ্রহরের অলস মন্থর মুহূর্ত্তগুলি বধূটির নিকট দীর্ঘ ভারাক্রান্ত বলিয়া অনুভূত হয়। এ বাড়ি ও বাড়ির প্রতিবেশিনীদের সহিত গল্পগুজব করিয়া নাটক নভেল পড়িয়া সংসারের শতবিধ কাজ কর্ম্ম সারিয়া—শিশু পুত্রটিকে লইয়া খেলা করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া কোন রকমে সময় কাটানো!

ওদিকে স্বামীটির তখন কর্ম্মময় জগৎ—ঘড়ির কাঁটার মাঝে অঙ্কের হিসাব করিয়া জীবনের আয় উপার্জ্জন করিতে হয়।

দ্বিপ্রহর, বিকাল কাটিয়া গিয়া সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসে।

পরিচ্ছন্ন বেশভূষার মাঝে সংসার নীড়টিকে সাজাইয়া গুছাইয়া সুসংস্কৃত করিয়া তরুণী বধূটি বাতায়ন পথে আসিয়া দাঁড়ায়। উৎসুক দৃষ্টি মেলিয়া তরুণীটি নগরীর রাজপথের দিকে তাকাইয়া থাকে।

চাকরের কোলে চড়িয়া শিশুটি খানিকটা বেড়াইয়া আসিল।

কর্ম্মান্তে স্বামী গৃহে ফিরিল। হাতের মোটঘাট, তৈজসপত্র, এটাওটা টুকিটাকি সংসারের প্রয়োজনীয় সব কিছু, সৌখীন দু'একটা প্রসাধন দ্রব্য, শিশুটির জন্য রঙিন-খেলনা চকলেট বিস্কুট-লজেন্স স্বামীর কাছ হইতে গ্রহণ করিয়া বধূটি ক্লান্ত স্বামীর পরিচর্য্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

শঙ্খধ্বনির মাঝে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইয়া লক্ষ্মীর ঘটে প্রণাম করিয়া বধূটি আবার সংসারের কাজে মন দিল।

ইহারই মাঝে রহস্য চলে। মান, অভিমান, হাসি-অশ্রুর লীলা তাহাদের সংসার চিত্রপটে নিত্য নৈমিত্তিক রঙের পট-ভূমিকায় রেখার চিত্র আঁকিয়া যায়।

ছুটির দিনে সপ্তাহ শেষে রবিবারে যেন উৎসবের মেলা চলে। সেদিন জীবনের এক ব্যতিক্রম—বস্তুতান্ত্রিক্ জগৎ হইতে সেদিন তাহারা যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সকাল হইতে উৎসাহের আর অন্ত নাই। সংসারের কাজ-কর্ম্ম যত সত্বর সারা যায়—কোন আত্মীয় মহলে বেড়াইতে যাইবার পালা হয়ত! কোনদিন বা বোটানিকল গার্ডেন। না হয় লেকের ধারে কিংবা সিনেমা থিয়েটার কিংবা কোন বন্ধু-আবাসে হাসিতে খুঁসিতে সমস্ত দিনটা কাটিয়া গেল।

কোন ছুটির দিনে হয়ত অলসগতি ভঙ্গিমা—গল্পগুজব করিয়া মন্থর ধারায় রূপে রঙে প্রণয়ভাষণে মুহূর্ত্তকে উপভোগ করে।

ক্ষুদ্র একটি গৃহনীড় তরুণ জীবনের ছন্দমান সুরে এইরূপে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

দুঃখ আছে—অভাব অভিযোগও আছে—গতির তারতম্য আছে—তবুও তাহার মাঝে সাবলীলা ছন্দ ছোট সংসারটিকে সুরে সুরে ভরাইয়া রাখিয়াছে।

মুহূর্ত্ত বিন্দুর মাঝে জীবনের একটি সরল রেখা ধাবমান!

কিন্তু ইহার মাঝে একদিন ছেদ পড়িল। শান্ত নীড়টিতে বৈশাখী ঝড়ের আঘাত লাগিল। ক'দিন ধরিয়া বধূটির অসুখ। প্রথমে সহজ হইতে ক্রমশঃ জটিল হইয়া জটিলতররূপ পরিগ্রহ করিল। আত্মীয়স্বজন হিতকামী বন্ধুর দল আসিল—ডাক্তার, ঔষধ, সাধ্যমত কোন কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটিল না।

বধূটির চক্ষে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া—স্বামীটির চক্ষে আকুল মিনতি। শিশু-পুত্রটিই কেবল তেমনি চঞ্চল! কিন্তু ইদানিং তাহার বায়না এবং ক্রন্দন-স্বভাব বাড়িয়া গেছে যেন। সর্ব্বদাই কেউ না কেউ তাহাকে ভুলাইতে থাকে। পীড়িতা জননীর নিকট যাইবার জন্য কেবলই সে জেদ ধরে। তরুণীটি শীর্ণবাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে ডাকে। আত্মীয়-স্বজন শুশ্রূষাকারীরা বাধা দেন—সেরে ওঠো, তারপর নিও তোমার ছেলে, এখন রুগ্‌নো শরীর—দুষ্টু ছেলের ঝক্কি কী সাম্‌লাতে পারো?

বিশীর্ণ হাসি হাসিয়া তরুণীটি নৈরাশ্যের ভাব দেখায়, অদৃষ্টের বিধিলিপি সে বুঝিবা পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে!

বলে—এ যাত্রা হয়ত আর সেরে উঠতে পারবো না—দিন্ ওকে আমার কাছে, একটু বুকে নিই!

হিতকামী আত্মীয়ের দল সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া উঠিল—ষাট্, ষাট্ অমন অলুক্ষণে কথা কী মুখে আনতে আছে? কিসের অভাব তোমার? তোমার এমন সোনার সংসার—সোনা দানা-সুখ সম্পদে ভরে উঠুক! পোড়া কপালী যারা, সর্ব্বনাশ হোক্ তাদের! অসুখ কী কারুর আর করেনা? দেখবে শীগ্‌গীরই কেমন তুমি সেরে ওঠো!

বধূটির রোগক্লিষ্ট নিষ্প্রভ নয়নে অশ্রুবন্যা নামিয়া আসে।

তরুণ স্বামী অশ্রু ছল ছল নয়নে তখন তাহাকে সান্ত্বনা দেয়!

কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্যলিপি অলঙ্ঘনীয়। শ্রাবণের এক অশ্রুমলিন বর্ষণ-মুখর প্রভাতে বধূটির জীবনপ্রদীপ নিভিয়া গেল!

সামনের বাড়ির সেই রেখান্বিত জীবন কাব্যে ছন্দপতন ঘটিল।

মাতৃহারা শিশুটি দিনরাত চীৎকার করিয়া কাঁদে। তরুণটি শোক-দুঃখের ক্লান্তির জের টানিয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে। সংসারের সব কিছুই আছে—শুধু তাহার মধ্যে কোন প্রাণের স্পন্দন নাই।

সংসারের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন একজন বৃদ্ধা আত্মীয়া।

সকালে নিত্য বাজার যাইবার আর প্রয়োজন নাই। খুঁটি-নাটি সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া সংসারটি ঝক্‌ঝকে সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিবারও আর কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া চা খাইয়া দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখা তাহাও প্রতিদিন আর হইয়া ওঠে না। ঘুম ভাঙিতে হয়ত দেরী হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কলঘরে ঢুকিয়া দু'বালতি জল মাথায় দিয়া আহারে বসা, দুচার গ্রাস মুখে দিয়া উঠিয়া পড়া, তারপর ছেঁড়া পাঞ্জাবীটি গায়ে চড়াইয়া ছাতাটি টানিয়া লইয়া নগরীর জনতার স্রোতে মিশিয়া যাওয়া!

সন্ধ্যার সময় একমোট বাজার লইয়া ক্লান্ত চরণে তরুণটি আসিয়া পৌঁছিল, বাজারগুলি নামাইয়া দিয়া শয্যার আশ্রয় নিল।

গাঢ় ক্লান্তির জর্জ্জরতা জীবনকে তাহার পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। কমনীয় মুখখানিতে ক্লিষ্টতার ছায়া! কপালে গাঢ় কালিমার রেখা! বার্দ্ধক্য যেন অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে!

বৃদ্ধা আত্মীয়াটি প্রত্যহ অভিযোগ প্রকাশ করিয়া থাকেন—এইবার একটা দেখে-শুনে বিয়েথা করো বাবা। যে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না—আর তোমার নিজের জন্যে না হোক্—বাচ্ছা ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখো দিকি?

তরুণটি প্রশ্ন করে—কেন খোকার কী আদর যত্নের ত্রুটি হচ্ছে? আর একজন কাউকে তা হলে আনাই?

বৃদ্ধটি কপালে হাত দিয়া বলেন—আ আমার পোড়া কপাল! আমি থাকতে খোকার আদর যত্নের অভাব হয়? অভাব শুধু ওর মার—সে অভাব আর কারুর দ্বারা তো পূরণ হবার নয় বাবা।

তরুণটি গম্ভীরভাবে নির্ব্বাক হইয়া থাকে। পাষাণের মতন কঠিন দৃষ্টি শুধু প্রসারিত করে দেওয়ালের গায়ে টাঙানো পরলোকগতা তরুণী বধূটির ফটোখানির পানে।

গত রজনীর যুঁইয়ের মালা-ছড়াটি শুকাইয়া ম্লান হইয়া গেছে।

ভাঁটার পর আবার জোয়ারের প্লাবন আসে। যে সরল রেখাটির মাঝে ছেদ পড়িয়াছিল—তাহা আবার মুহূর্ত্ত-বিন্দুর মাঝে অগ্রসর হইয়া চলে—মধ্যবিন্দু হইতে শেষ বিন্দুর দিকে।

সেই ছোট গৃহ-নীড়টি আবার ভরিয়া উঠিয়াছে—আরও চঞ্চল ছন্দের গতি উচ্ছ্বলতায়। সংসারের মাঝে আরও শৃঙ্খলা, বেশ-ভূষা শয্যা সামগ্রীর মাঝে আরও পরিচ্ছন্নতা—জীবনের মাঝে আরও পরিচ্ছন্নতা—আরও নেশার উগ্রতা—তরুণটি যেন নেশাতুর হইয়া ওঠে!

নববধূর মাঝে সেই সূক্ষ্ম সৃজনতা নাই বটে, তবে চঞ্চল যৌবনের উগ্র মদিরতা আছে—সংসার নীড়টিকে সে উপভোগ্যের উপাদানে ভরাইয়া রাখিতে চায়!

অফিস হইতে ফিরিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় বেড়াইতে যাওয়া বন্ধুবান্ধবীদের মাঝে, চায়ের আসরে, হাসি পরিহাসে, গল্পগুজবে, সিনেমা থিয়েটারের রঙিণ রূপালোকে স্বামী-স্ত্রীতে জীবনের মাধুর্য্য সঞ্চয় করা—সংসারের প্রতি ঘন নিবিষ্টতা সামনের বাড়ির ছোট পরিবারটিকে জীবন ছন্দে মুখর করিয়া রাখে।

শিশুটি এ দম্পতিযুগলের মাঝখান হইতে কিছুটা দূরে সরিয়া গেছে যেন! চাকরের তত্ত্বাবধানেই সে অধিকক্ষণ থাকে। ফলে স্বামীস্ত্রীর মাঝে মিলনের সেতু আরও সুদৃঢ় হইয়াছে।

কলহ বিবাদ, মান অভিমানের কালো মেঘও তাহাদের সংসার আকাশে ঘনাইয়া আসে।

স্বামীটি অনুনয় জানাইয়া বলে—তুমি আমাকে ভুল বুঝ্‌ছো কেন?

বধূটি শ্লেষ করিয়া বলে—আমি যে দ্বিতীয়া—প্রথমা তো নই, একটু তফাৎ যে থাকবেই! আমাকে তো ভালোবাসার জন্যে বিয়ে করো নি, আমাকে বিয়ে করেছো তোমার প্রয়োজনে। তোমার সংসারের আমি আপনজন হতে পারি—কিন্তু তোমার আপনজন হবো কেমন করে বলো? বধূটির চক্ষু অশ্রুরেখায় চিক্‌চিক্ করিয়া ওঠে!

তরুণটি স্তব্ধতার গাম্ভীর্য্যে গম্ভীর হইয়া যায়। সংসারের আয়ব্যয় সম্পর্কে হয়ত বা কোনদিন বিবাদ বাধিল।

তরুণটি বলে—একটু যদি বুঝে সুঝে খরচ করো। এই দুর্দ্দিনের বাজার, আর আয় তো শুধু মাসমাইনেটুকু। শেষকালে দেনদার হয়ে পড়তে হবে যে।

বধূটি গর্জ্জন করিয়া ওঠে—এর চেয়ে কমে আমি পারব না।

তরুণটির কণ্ঠস্বর হইতে হঠাৎ বে-হিসাবী একটা কথা বাহির হইয়া পড়ে—অথচ এর থেকেও কিছু কম আয়ে তো একদিন সংসার চল্‌তো এবং এর চেয়ে খারাপ কিছু চল্‌তো না।

বধূটি একথায় ফাটিয়া পড়ে—তখন যে সংসারে তোমার লক্ষ্মী ছিল—সংসারও তাই তখন লক্ষ্মীশ্রীতে ভরা থাকতো! লক্ষ্মী গিয়ে এখন যে অলক্ষ্মী এসেছে, সংসারেও তাই বিশৃঙ্খলা। জেনেশুনে অলক্ষ্মী যখন বরণ করেছো, তার ফল ভোগ করতে হবে বৈকি!

তরুণটি শান্তকণ্ঠে কহিল—আমি কি তাই বলেছি? এসব কথা মনে করে কেন তুমি মিথ্যে মিথ্যে কষ্ট পাও বলতো?

আবার কী করে মানুষ বলে বলো তো? আমার মরণও হয় না—তুমিও বাঁচো, আর আমিও বাঁচি। বধূটি কান্নায় ভাঙিয়া পড়ে!

তরুণটি চঞ্চল হইয়া তরুণীটিকে বুকের কাছে টানিয়া নেয়—অনুনয় সজল দৃষ্টি মেলিয়া কাতর কণ্ঠে বলে—তোমাকে মিনতি জানাচ্ছি, লক্ষ্মীটি অমন অলুক্ষণে কথা খবরদার তুমি মুখে এনো না। তুমি জানো না, ওখানে আমার কত ব্যথা!

অভিমানের অশ্রু ঝরিয়া গিয়া মিলনের রাখীবন্ধনে দুইটি যুগল হিয়া বন্ধন প্রাপ্ত হ'য়ে।

সামনের বাড়ির ছোট নীড়টি ভরিয়া ওঠে জীবনের স্পন্দনে।

মুহূর্ত্ত-বিন্দুর মাঝে জীবনের রেখা একটানা গতি ভঙ্গীমায় প্রসারিত হইয়া চলে।

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব-গীতিকবিতা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্

আমি কাব্য ছেড়ে দর্শনের মাঝে পড়েছিলাম, এ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার রস বুঝতে গেলে মোটামুটি তাঁর আধারটুকুর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের রচনা ভানুসিংহের পদাবলী। শ্রীরাধা বা শ্যামসুন্দরের নাম বাদ দিলে সে কবিতা লৌকিক বিরহ মিলনের গীতি-কবিতা। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রায়বসন্ত প্রভৃতির সুললিত পদাবলী রস-সাহিত্যে অপরিমেয়মধুর সৃষ্টি। তাদের মাধুরী অনুপমেয় অনতিক্রম্য। কিন্তু সে রচনা সম্বন্ধেও এ সমালোচনা নিরর্থক নয়। ভক্ত তাতে সাধনার মন্ত্র পেতে পারে, কাব্য-রসিক তার কাব্য-রসে সৌন্দর্য্য-পিপাসা মেটাতে পারে। কোনো সংস্কৃত কাব্য জয়দেব গোস্বামীর শব্দ-লালিত্য পরাভূত করতে পারে না। কিন্তু শ্রীবাসুদেব-রতিকেলিকথা-সমেত, মধুর কোমল কান্ত পদাবলী, মানুষের প্রেমের ভাব, ভাষা এবং রীতি অবলম্বনে রচিত। সুতরাং ব্রজ-সুন্দরীর শৃঙ্গার-সমাচার শুনতে গেলে গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশ মত চিত্তশুদ্ধি আবশ্যক। পারিভাষিক অর্থে "প্রেম" না বুঝলে বৈষ্ণবের গান বিষ্ণুভক্তি উৎপন্ন বা প্রসার করতে পারে না। ভানুসিংহ ঠাকুরের কবিতাকে ঐ গণ্ডীর মাঝে রেখে বিচার করতে হবে।

অন্য দিকের বিচারে গভীর প্রেমের কবিতার নায়ককে কানু এবং নায়িকাকে রাই বিনোদিনী ভাবলে, তাতে ভক্ত চিত্ত-প্রসাদ লাভ করতে পারে। আমি নিজ জ্ঞানে জানি তাঁরা সুখী হন। কাব্যের ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। সঙ্গীতের ভাষা কোন্ অর্থে গ্রাহ্য, তার বিচারক মানুষের বুদ্ধি। একটা দৃষ্টান্ত দিই। রস-সাহিত্য কাননের মধুকর চণ্ডীদাস শ্যামের পূর্ব্ব-রাগ বর্ণনা করে গেয়েছেন—

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখির সহিত যায়।
সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ
হসিত বদনে চায়।
কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরী
বানালে কেমন ধাতা—ইত্যাদি।

এই সরস বর্ণনা সাধারণ অর্থে গ্রহণ করলে বলতেই হবে যে এর রুচি ও বর্ণনা কামাতুর নায়কের রাগের অনুকূল। অত্যন্ত সংযত ভাবে পাঠ না করলে এ কবিতার বিমোহন কাব্য-রসেই পাঠকের প্রাণ পরিপ্লুত হবে—ভক্তি-রসের উদ্রেক হ'বেনা। রবীন্দ্রনাথের—

যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সু-গভীর, নাহি তল, নাহি তীর
মৃত্যু সম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ
সে অতলে গীত গান কিছু না বাজে।

যাও যাও যাও ভুলে নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কুলে সকল কাজে
যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল মাঝে।

দরদী প্রেমিকের আন্তরিক আহ্বান। এতে শ্যাম নাই, রাই নাই। সলিল আছে কিন্তু কালিন্দীর উল্লেপ নাই। কৃষ্ণ-প্রেমে মাতোয়ারা সাধকের প্রাণে নিশ্চয় এ কবিতা সরস কুঞ্জ-লীলার ঝঙ্কার দেয়। হরি-ভক্তি-হীন কাব্যামোদী এর কাব্য-মদিরায় মত্ত হয়। সংসারী পাঠক সাধন ভজন বা জীবাত্মা-পরমাত্মা মিলনের ঝঞ্ঝাটে বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত না ক'রে আনন্দ সলিল মাঝে ঝাঁপ দিতে চায়। রবীন্দ্রনাথের যৌবনের এমন অনেক কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে যার অন্তরে বৈষ্ণব কবিতার রস নিহিত।

সখি ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি মন মাঝে।
যাব কি যাব না—মিছে এ ভাবনা—মিছে মরি লোক লাজে।

কিম্বা—এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াসা কেমনে আছে সে পাশরি—ইত্যাদি। খেদের পর—নিয়ে যা রাধারে বিরহের ভার কত আর ঢেকে রাখি বল
পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে এক ফোঁটা তার আঁখি জল।

যেমন সরস কবিতা তেমনি জ্বলন্ত চিত্র। আর একটি উদাহরণ দিই। এটি বিপ্রলম্ভের কবিতা—

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ান আকুল পরাণ রে—ইত্যাদি।

শেষে—আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতে চরণে ধরিব।
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল দেখে তারে আমি মরিব।

কিম্বা—দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুল ফুল হার—ইত্যাদি আর একটি উদাহরণ দিই। কুঞ্জ-ভঙ্গ কল্পে চণ্ডীদাস গেয়েছেন—

পদউধ কাক কোকিলের ডাক
জানাইল রজনীর শেষ।
ত্বরীতে নাগরী গেল নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ।
অলস আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি
বসন ভুষণ হৈয়াছে বদল
তখন উঠিয়া দেখি।

এটি বৈষ্ণব কবিতা। কারণ নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধার নাম এর ভণিতায় বিদ্যমান। এই মর্ম্মের রবীন্দ্রনাথের কবিতা

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হ'ল মরি লাজে
সরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিয়া যাইব
পথেরি মাঝে।

বৈষ্ণব কবিতা নয়। কিন্তু বৈষ্ণব প্রথমটি থেকে যদি সুখ পায়, এ কবিতা হ'তেও আনন্দ পেতে পারে। হয়তো প্রাচীনের প্রভাব এতে বর্ত্তমান। চণ্ডীদাসের নায়িকার প্রভাতের সমাচার দিয়েছিল—তিত্তির, কাক, কোকিলের ডাক। রবীন্দ্রনাথের নায়িকার সলজ্জ উষাকে আবাহন করেছিল বিহঙ্গম

পাখি ডাকি বলে গেল বিভাবরী।

কাব্যামোদী কাব্য-রস উপভোগ করে। কবিতার শব্দ ও ছন্দ তার মনে ভাব জাগায়। কারণ চিত্তের গোপন কুঞ্জের সুপ্ত ভাবের বীণার তারে কবিতা টোকা মারে। প্রেম সংস্কার। তাই মধুর ডাকে প্রেম জাগে। কবিতা রস-পরিবেশন। বৈষ্ণব কবিতার কাম-জাগানো ভাষা অদীক্ষিতের বৈঠকে ভালবাসার গীতি-কবিতা বলে গৃহীত হ'লে তার সঙ্গে বিরোধ কিসের। কাব্যের ভাষা যে চিত্র আঁকে, তার গভীর তলে প্রবেশ করতে পারে প্রজ্ঞা। কিন্তু ভাষা যা বলেনা, তেমন অর্থ কবিতায় প্রক্ষেপ করতে গেলে, ভাষায়-রচা চিত্র মুছে ফেলতে হয়। সে ক্ষেত্রে কবিতা লেখা বা পড়ার সার্থকতা কোথায়?

একটা উদাহরণ দিই। বিদ্যাপতির

করে কুচ-মণ্ডল রহলি হু গোয়।
কমলে কনক গিরিঝাঁপি না হোয়।
তখনে হরল হরি অঞ্চল মোর
রসভরে সসরু কসণিক ডোর।

মনে সম্ভোগের পূর্ব্বচিত্র আঁকে। শরমে ভরমে নায়িকা বক্ষঃস্থল গোপন রাখবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার কমলের মত সোনার গিরি লুকাতে পারলে না। তখন নায়ক রসভরে বস্ত্রের অঞ্চল ধরে টানলে। নায়িকার কোমর হ'তে শাড়ির কসির বাঁধন খুলে গেল। লীলাচাঞ্চল্যের বেশ মনোরম ছবি। নিশ্চয় দার্শনিক এ থেকে অর্থ করতে পারেন—মানুষ আরাধ্যের নিকট প্রথমে সাংসারিকভাবে-ভরা নিজের মন দেখাতে লজ্জা পায়। কিন্তু ভগবদ্ প্রেমের অমোঘ স্পর্শে দেহ মনের কিছুই গোপন থাকে না। লৌকিকতার নিবিবন্ধন খসে পড়ে। ঠিক এই মর্ম্মের রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকসিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।

কিন্তু কড়ি ও কোমলের কালের (১২৯৩) নবীন কবি তাতে রবীন্দ্রীয় ছাপ দিয়ে শেষ করেছেন এই বলে—

কত না মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস-বায়ু বসন্ত সন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দু'টি অশ্রুকণা।
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে।

বিদ্যাপতি সাধক ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, কবি ছিলেন। তিনি মনের পটে কথা সাজিয়ে ছবি এঁকে খালাস। সে ছবি কার মনের পটে ফুটবে তার তোয়াক্কা কবি রাখেননি। পাখী গান গায় প্রেরণায়। পাপিয়া গায় নিজ বধূর মনস্তুষ্টির জন্য। তার গান শুনে কেহ বলে—ও চোখ গেল বলে ফুকারিছে, কেহ বলে ও জ্বালাতন করছে ব্রেণ-ফিভার, ব্রেণ-ফিভার ব'লে চেঁচিয়ে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নিখুঁত ছবিতে ভক্ত কৃষ্ণ-বিলাস উপলব্ধি করে। সেই দর্শন-ভঙ্গিতে তার সুখ। কৃষ্ণ-সুখের কল্পিত পরশে তার কৃষ্ণ-প্রেম বিমল হয়। প্রেমিক তরুণ লৌকিক প্রেমের ছবিতে যদি নিজের প্রেমের ছায়া দেখে, তাতে কার ক্ষতি?

বৈষ্ণব-কবিতার শেষোক্ত পরিণাম, বিজ্ঞ পণ্ডিতের অমনোনীত, তাই সে অধিকারী ভেদের কথা তোলে। এ গণ্ডী নিশ্চয় আধুনিক। এর জড় ইংরাজের শেখানো রুচি অরুচির ব্যাখ্যায়। কেহ চান কবিতার রসকে দর্শনের কড়ায় গরম করে, স্বাদহীন তপ্ত সলিল পরিবেশন করতে। ইতিহাসের দিক থেকে তাঁদের এ অনধিকারের ধূয়া ইতিকথা। হাটে বাজারে, উৎসবে ব্যসনে সভা মাতিয়েছে চিরদিন—বৈষ্ণবলীলা-কীর্ত্তন—পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, মাথুর, সম্ভোগ।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতার সার্ব্বজনীন চিত্তপ্রসাদ মেনে নিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রশ্ন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান? এ-কি শুধু দেবতার? সে কাব্য-সম্ভার গোলকপতির নিত্য সিংহাসনের পাদমূলে ভক্ত কবির প্রেমের অর্ঘ্য।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে।

আমার মতে এর দুটা অর্থ আছে। প্রথম—বৈষ্ণব কবিতা কেবল চিন্ময়ের স্তুতি। দ্বিতীয় অর্থ—কবি পরে নিজেই বিশদভাবে বুঝিয়েছেন।

বৈকুণ্ঠ চিন্ময় ধাম—

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়।
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ
যার এক কণা গঙ্গা পতিত-পাবন।

চিদিন্দ্রিয় সেই চিন্ময়ধাম উপলব্ধি করতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সে ধামের পরিচয় দিয়াছেন—

ন তদ্ ভাষয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।

কবির বক্তব্য বৈষ্ণব কবিতা প্রধানত সাধকের। কিন্তু সে কেবল সাধকের জন্যই নয়। মহাপ্রভুর প্রেম বিলানোর অন্তরের সঙ্কেত তো তাই।

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান।
লুটিয়া খাইয়া দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে—
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার। প্রেম শত-গুণ বাড়ে।
উছলিয়া প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলি ডুবায়।
সজ্জন দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অনুগণ
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে বৈষ্ণবের গান, কেবল সাধকের সাধনা নয়। তাই তিনি নিবেদন করেছেন—

সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বাম বাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর, হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে বহি তার মৌন ভালবাসা
ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা
যদি তার মুখে ফোটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি
তোমার কি তাঁর, বন্ধু তাহে কার ক্ষতি।

রবীন্দ্রনাথের দর্শন—মানব প্রকৃতি দুমুখো। তার বৈষয়িক প্রকৃতিকে অতিক্রম করে তার বিশ্বপ্রেমিক প্রকৃতি। প্রেম সত্য। গ্রাম্য গায়কের গানের প্রার্থনা বেদে আছে। মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ—এ গানের বৈদিক মন্ত্র—আবিরাবীর্ম্ম এধি—পরম মানবের বিরাট রূপে যাঁর স্বতঃ প্রকাশ, আমারি মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হ'ক।

প্রেম কবিতার স্বচ্ছ সরোবরের ঘাটে আগল দেবার ব্যবস্থা নিদারুণ। কাব্যের ললিত আদি রস আত্মপ্রতিষ্ঠাতৎপর। প্রেম সত্য। তাই রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম চণ্ডীদাসের ছিল প্রেরণা। সে প্রেমের ভিতর দিয়ে তিনি রাধাকৃষ্ণ-প্রেম উপলব্ধি করেছিলেন। জয়দেব গোস্বামীর দেবী পদ্মাবতীর প্রেম ইতিহাস প্রসিদ্ধ। বোধহয় সেকথা স্মরণ করেই কবি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্ত রাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে।
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি।

সত্যই প্রাচীন কবির রচনায় এ কথা স্বতই মনে ওঠে যে তার মূলে ছিল বস্তুতন্ত্রতা, এক্ষেত্রে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা। চণ্ডীদাসের—নয়ানের নয়ানে লেগেছে কালোর উপরে কালো ; কিম্বা বলরাম দাসের—

নয়ানে নয়ানে যাকে দিনে রাতে
দেখিতে দেখিতে ধান্দে
চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে

চোখের উপর আলোক-চিত্র এনে ধরে।

বলা বাহুল্য এ-প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে—সত্যই কি ভক্তি-সিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য প্রভুরা পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণে মানবতা আরোপ করে, তাঁকে মানসোপচারে পূজা না করে, প্রিয় মানুষরূপে ভজনা করেছিলেন? বলা বাহুল্য অবতার তত্ত্বের মূল নির্দ্দেশই তো তাই। বেদব্যাস কেশবের লোকচরিতমদ্ভুতম্ বর্ণনা করেছেন। রাসলীলা প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন—

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তি ভগবতো নৃপ।
অব্যয়াস্যপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মন।

হে নৃপ মনুষ্যের পরম মঙ্গলের জন্যই, অব্যয়, অপ্রমেয়, গুণাত্মা এবং গুণাতীত ভগবানের আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র দৈবশক্তিতে চোখের পলকে রাবণের দশটি মুণ্ড চূর্ণ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কারাগারে জন্মেছিলেন। নাড়ুগোপাল মা যশোদার মাতৃ-স্তন রসে পুষ্ট হয়েছিলেন। গোবিন্দ গোপ-গৃহে গো-দোহন শিক্ষা করেছিলেন। পরে একদিন উপনিষদ গাভী হ'তে গীতামৃত দোহন ক'রে সুধী ভক্তের শাশ্বত তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন। প্রভু যীশু আপনাকে মানব-পুত্র বলে পরিচয় দিতেন। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের কথা বলেন নি, কাজেই নিজে ঈশ্বরত্বের দাবী করেন নি। সে উপাধি তাঁকে শ্রীমদ্ভাগবদ্ দিয়াছেন।

মানবের ঈশ্বরত্বের উপলব্ধি হয়, ঈশ্বরে মানবতা আরোপ করে। আত্মা জগতের আবেষ্টনী অতিক্রম করে নিজের চিরানন্দ, চিরস্থিতি, চিরচেতন সত্ত্বা উপলব্ধি করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি—"সমস্ত মানুষের সেই এক আত্মাকে নিজের মধ্যে অনুভব কর্ব্বার উদার-শক্তি যাঁরা পেয়েছেন তাঁদেরি তো বলি মহাত্মা।......তাঁরাই তো এক গূঢ় আত্মার প্রতি লক্ষ্য করে বলতে পারেন, তদেতৎ প্রেয়ঃ, পুত্রাৎ প্রেয়ো, বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ্ অন্তরতরম্ যদয়মাত্মা—যিনি পুত্রের চেয়ে প্রিয়, বিত্তের চেয়ে প্রিয়, অন্য সকল হতে প্রিয়, এই আত্মা যিনি অন্তরতম। বৈজ্ঞানিক এই কথা শুনে ধিক্কার দেন, বলেন দেবতাকে প্রিয় বললে, দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি—মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁচেছে। মানবের মন আপন দেবতায় আপন মনুষ্যত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না। করা তার পক্ষে সত্যই নয়।"

অবশ্য কবির এ দর্শন অদ্বৈতবাদ। বৈষ্ণব দার্শনিক এর চরম মীমাংসার সঙ্গে একমত হবেন না। তবে মানুষের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধামের সিংহাসনের পাদমূলে পৌঁছানো, তাঁরা মানেন। কবির এ কথার সঙ্গে সকল তত্ত্ব একমত হবেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

কবির শেষ জীবনের অভিজ্ঞতায় এ উপলব্ধি আরও স্পষ্ট হ'য়েছিল—

মর্ত্ত্যের অমৃতরসে দেবতার রুচি
পাই যেন আপনাতে, সীমা হতে সীমা যায় ঘুচি। (দেবতা ১৩৪২)

বিশ্বমানবতার সংস্কার কবির চিরদিনের। তাঁর মতে তাঁর এ-উপলব্ধি প্রথম বিকশিত হয়েছে প্রভাত সঙ্গীতে, যার প্রকাশকাল ১৩০০ বঙ্গাব্দে। তাঁর বৈষ্ণব গীতিকবিতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রথম যৌবনের।

রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রবন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ দুই মহা-কবির মধ্যে পার্থক্যের সূত্র ধরেছেন। সে বিবৃতি অতি চিত্তাকর্ষক। তার দৃষ্টিভঙ্গি অপূর্ব্ব। তিনি চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির বহু উচ্চে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগত বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ এবং দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ…চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর…তাঁহার প্রেম, "কিছু কিছু সুধা বিষগুণ আধা," তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও বিষামৃত একত্র করিয়া।

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

চণ্ডীদাসের কবিতার গভীরতা সত্যই তাকে এত উচ্চ করেছে। রাধাশ্যামের মিলনেও—দুহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

শ্রীকৃষ্ণকে ষোলো আনা নিজস্ব করবার জন্য রাধিকার অনুরাগ চণ্ডীদাসের অমর তুলিকা উজ্জ্বল করে এঁকেছে।

রবীন্দ্রনাথ—"সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।"

ছত্রদুটির উপর মন্তব্য করেছেন—"যদিও তাহার বধুকে এখনও কেহ ভাঙ্গায়নি, কিন্তু তা বলিয়া সে সুস্থির হইতে পারিতেছে কৈ ?"

আর একটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—যখন শ্যাম তাহার সম্মুখে রহিয়াছে, তখনো সে শ্যামকে কহিতেছে—

"কি মোহিনী বঁধু, কি মোহিনী জান
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি,
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও।"

"রাধার আর সোয়াস্তি নাই।…রাধা একটি যদি-কে গড়িয়া তুলিয়া একটা যদি-কে জীবন দিয়া কাঁদিয়া সারা হইল।"

তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রেমের তত্ত্ব বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারা যায় তাঁর কবি-প্রাণ। অনেক কবিতার নমুনা দিয়া রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন।

বলেছি, তিনি বিদ্যাপতিকে চণ্ডীদাসের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসতে দিতে চাননি। তাঁর এ অভিমত পরে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু সেদিন তিনি বিদ্যাপতির মাত্র একটি কবিতা দেখেছিলেন যার চণ্ডীদাসের কবিতার সঙ্গে তুলনা হতে পারে।

সখিরে কি পুছসি অনুভব মোর
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ানু,
না বুঝনু কৈছন কেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রস অনুমগন,
অনুভব কহে, না পেখে,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক।'

চণ্ডীদাসের—রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।

ছত্রের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"চণ্ডীদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ ছিল। তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন 'কামগন্ধ নাহি তায়'।"

বসন্ত রায়কে বিচার করে কবি বলেছেন—বসন্ত রায় ও বিদ্যাপতি এক ব্যক্তি এ ধারণা নির্ভুল নয়। কারণ বসন্ত রায়ের ভাষা ও ভাব সরল। আড়ম্বর ভাষা, সরল ভাবকে আড়ালে ফেলে দেয়। "অনেক স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ঘোমটার চেয়ে অধিক কাজ করে। তাহার হীরার সিঁথিটার দিকে লোকে এতক্ষণ চাহিয়া থাকে যে তাহার মুখ দেখিবার আর অবসর থাকে না।"

রূপ বর্ণনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"সৌন্দর্য্য ও ভোগ একত্র থাকে এবং ইহা ও সত্য উভয়ে এক নয়।"

সম্ভোগ-বর্ণনাতেও কবি বসন্ত রায়কে বিদ্যাপতি হ'তে উচ্চ স্থান দিয়াছেন।

একথা শুনলে মনে হবে যে কবি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। তাঁর অভিমত

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল—

অপেক্ষা নিম্নলিখিত কবিতাটি বড়, কারণ তাতে আকুলতা আছে—

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি ?

কিন্তু যখন দেখি তৃপ্তির চেয়ে অতৃপ্তিকে কবি উচ্চস্থান দিয়াছেন, পাওয়ার চেয়ে পেয়ে-হারানোর-ভয়কে আরও গভীর অন্তরের আবেগ বলে বুঝেছেন, তখন আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কলহ থাকে না। এই গভীরতা তাঁর এক উৎকৃষ্ট কবিতায় প্রকটিত।

দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।
তাই চমকিত প্রাণ, চকিত শ্রবণ ব্যাকুল তৃষিত আঁখি।

এ গানের শেষ ছত্রটি চমৎকার ও গভীর—

এত ভালবাসি এত যারে চাই
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই ;
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি।

পতন অভ্যুত্থান বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী—এ-পতন অভ্যুত্থান জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গ ঘিরে পর্য্যবিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুত্থানের পর বাঙলার জীবন-কুসুম সগৌরবে ফুটে উঠেছিল। ভারতের দিকে দিকে প্রেম-সৌরভ বিকীর্ণ হ'ল। বাঙলীর গীতি-কবিতা দক্ষিণ ভারতের ভাব, ভাষা ও সাহিত্যকে পুষ্ট করলে। উড়িষ্যায় চণ্ডীদাস ও জয়দেব ঠাকুরের গান নূতন আগ্রহে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করলে। কারণ চৈতন্যদেব স্বয়ং এঁদের লীলা-কীর্ত্তনে যে সুখ পেতেন সে সুখ তাঁর সংস্কৃত ন্যায় ও দর্শন দিতে পারে নি। কিন্তু সেই রস-মদিরার মাঝে যে বিষটুকু ছিল ধীরে ধীরে সে লোক-সাহিত্যকে বিষাক্ত করলে।

অরসিকের হাতে পড়ে সামাজিক জীবনের কোনো কোনো অঙ্গ বিনাক্ত হ'ল। মোট কথা কীর্ত্তনের সুর নেমে গেল। যা' ছিল বৈকুণ্ঠর তরে, তা হ'ল পঙ্কিল। সু-সাহিত্য কদর্য্য-রূপ ধরলে। কারণ সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব-প্রেম প্রচার করবার ভার পড়লো তরজা ও কবিওয়ালাদের মুখে।

কবি ও পাঁচালীওয়ালাদের মধ্যে দাশরথি রায়, হরু ঠাকুর, মধুসূদন কান্ প্রভৃতি সু-সাহিত্যিকদের কাছে বাঙলা সাহিত্য ঋণী। কিন্তু এঁদের রচনাতেও হেটো লোকের মনস্তুষ্টিকর অশ্লীলতা দৃষ্ট হয়। আমি মাত্র কটা উদাহরণ দিচ্ছি এঁদের প্রতিভার নমুনা স্বরূপ।

দাশরথি রায়ের বস্ত্র-হরণ পালার শেষের গান—

"আমাদের চিত্ত সকল নির্ম্মল গঙ্গার জল
জেনে পাদ্য দিয়াছি চরণে।
ছিল ষোড়শদল হৃদিপদ্মে পুষ্প করি সেই পদ্মে
পদ্ম আঁখির পাদ পদ্মে দিলাম।
বস্ত্র কি হরিলেন হরি আমরাই বস্ত্র প্রদান করি
ষোড়শোপচারে বস্ত্র লাগে।
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমার্ণবে যে না ডোবে সেই ডোবে
যে ডোবে সে ডুবে হয় মুক্ত।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে
কাজ কি গোকুল কাজ কি গো কুল
আমি তো সঁপিয়াছি কুল অকুল-কাণ্ডারীর করে।"

অনুপ্রাশ কাব্য-রসকে নিশ্চয়ই বাড়িয়েছে। এ শুধু অর্থহীন শব্দ যোজনা নয়।

মধুসূদন কানের দর্শন-জ্ঞান প্রকটিত হয়েছে এই কবিতায়। তিনি বালিকা রাধিকাকে বলেছেন—

তুমি সৃষ্টি তুমি লয় মা তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্য
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি পঞ্চতত্ত্ব,
ভক্তজন চরাচরে তুমি গো সাকার
পঞ্চে পঞ্চ লয় হলে তুমি নিরাকার।

ভনিতায় বলেছেন—হর-শক্তি হর শক্তি সুদনের এইবার।

কিন্তু একদল কবি অনুপ্রাশ এবং সস্তার রসিকতার দ্বারা হাটের মাঝে হাততালি পাবার জন্য বঙ্গসাহিত্যের দুর্গতি করেছে। পরস্পর পরাজয়ের সুলভ অস্ত্র হ'ল অশ্লীল গালাগালি—যার কিছু কিছু পরম্পরায় আমরাও শুনেছি। খেউড় জনপ্রিয় হ'ল, কারণ নরম সুর শুনতে মস্তিষ্ককে কসরত করতে হয় না। এ গীতি-কবিতা ধর্ম্মের প্রলেপের ভানে রাধা-কৃষ্ণ, রুক্মিণী, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি পবিত্র নাম অপবিত্র করলে। সতিনীর ঈর্ষা এক অপরূপ রূপ ধারণ করলে। দূতিয়ালী হ'ল দালালী। চণ্ডীদাসের সবার উপরের সত্য মানুষ, এদের হাতে পশু হ'ল। চরণ ও পরাণের মধুর ফাঁসি গলগ্রহ হ'ল। মানুষ পাঁকে পড়লো—তার সঙ্গে তার আরাধ্যদের টেনে নিলে। অসূয়ার সোনার ছবি—

সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন ঘরে যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া—

বারোয়ারি-তলার কবির হাতে পড়ে অশ্লীলতা-কাতর হ'ল। এঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"স্থানচ্যুতি বিকৃত এবং দূষণীয় হইয়া উঠে। ...এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্ম্মল নয়। কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহা শোভা পাইয়া গিয়াছে। কবিওয়ালারা সেইটিকে তাহার সজীব আশ্রয় হইতে, তাহার সৌন্দর্য্য পরিবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতর ভাষা এবং শিথিল ছন্দ সহযোগে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিলে তাহা গলিত পদার্থের ন্যায় কদর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করে।

বৈষ্ণব-কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোনো বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্য-হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণ-রাধার প্রেম-কাব্যের সৌন্দর্য্যও খণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্য-শ্রী অবমানিত হইয়াছে।

"কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে এ সকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখিনা—সমগ্রের প্রভাবে তাহার দুষণীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে, বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত হইয়াছে। তথাপি সমগ্র পাঠের পর যাহার মনে একটা সুন্দর এবং উন্নত ভাবের সৃষ্টি না হয়, সে হয় সমস্তটা ভালো করিয়া পড়ে নাই, নয় সে যথার্থ কাব্য রসের রসিক নয়।"

কবির বৈষ্ণব-কবিতা ভানুসিংহের পদাবলী তাঁর তারুণ্যের অবদান। কিন্তু কাব্য-প্রতিভা তাতে স্পষ্ট প্রতিভাত। কবিতার ভিতর কবিকে এবং কবির ভিতর কবিতাকে ভাল বুঝতে পারা যায় কবির মানে কবিতা মাপলে। আমি বলছি না—কাব্য-রস-উপভোগের এ প্রকৃষ্ট পন্থা। অনাগত কালের পাঠক কবিকে চাইবে কাব্যে। আমরা আজও তাঁর আত্মীয়তার গৌরব ভুলতে পারিনি, তাই কবিকে জানতে চাই।

ভানুসিংহ ঠাকুর নাম দিয়ে কবি বহু কবিতা লেখেন নি। এ কবিতাগুলি ১২৯১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের রচনা কালে কবির বয়স তেরো হতে আঠারো। জীবন স্মৃতিতে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ তরুণ রবীন্দ্রের ভানুসিংহের কবিতার সমালোচনা করেছেন। কবি স্বয়ং দুটি কবিতা স্বীকার-যোগ্য বলেছেন।—"মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান" আর "কো তুহুঁ বোলবি মোয়।" আমি তাঁর নিজের মত যথাসম্ভব উদ্ধৃত ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, কবিতা কোন সম্পদে সম্পন্ন হ'লে অমর হয়। কিন্তু বাটখারার ভার অত অধিক না করলে, কবিতাগুলি সুখ-পাঠ্য এবং উপভোগ্য।

মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

এ কবিতা অপূর্ব্ব। রবীন্দ্রনাথের অমৃত প্রস্রবনের এ উৎকৃষ্ট রস—অনাবিল, মনোমুগ্ধকর. চিরানন্দের পট-ভূমিতে-বিরহ-বেদনার ছবি। বিরহের হ'তে মরণ ভালো—বিপ্রলম্ভের এ মনোভাব চিরন্তন। এ রচনার অব্যবহিত পুর্ব্বেই রামনিধি গুপ্ত গেয়েছিলেন—বিরহ বেদনা হ'তে, মরণ যন্ত্রণা ভাল। কিন্তু প্রেমিকের গোপন প্রাণের এই চিরন্তন ব্যাকুলতাকে কবি অমর তুলিতে এঁকেছেন। শ্রীমতীর একনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের বিনা কারও আলিঙ্গন চাহেনা—কারণ জগৎ যে কৃষ্ণময়। তাই বিরহ-বিকলা রাধা হতাশার দীর্ঘশ্বাসে মরণকে ডাকবার সময়ও তাকে শ্যামরূপে রঙিয়ে নিয়েছেন। তাই মরণ আর বিভীষিকা-ময় নয়। শ্যামের বুকে মুখ লুকিয়ে, তাঁরি বাহু-পাশে বদ্ধ হয়ে, যেমন রাধা বিরহতাপ জুড়াতেন, মরণের তেমন শীতল স্পর্শ আকাঙ্ক্ষা করলেন। মরণ আর কৃষ্ণকে এক ক'রে তিনি আলিঙ্গন চাহিলেন। কিন্তু মনে, জ্ঞানে, প্রাণে, শয়নে স্বপনে, শ্যাম-সোহাগিনী কৃষ্ণ বই তো কারেও জানেন না। রূপ এক হ'লেও নামতো বিভিন্ন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। মরণ মরণ। মণিময় পৃথিবীর কোনো মণি তো সে কৃষ্ণ-মণি নয়। কবি শ্রীরাধার এ চপলতাটুকু ক্ষমা করলেন না।

ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তুহারি।
মাধব পহু সম পিয় সে মরণসে
অব তুহুঁ দেখ বিচারি। কি সুন্দর!

কাজেই মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান বাঙ্গালার প্রবচন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কো তুঁহু বোলবি মোয়।

বিশ্ব-প্রেম কবির প্রাণে চিরদিন জাগরণ প্রতীক্ষা করছিল—তাঁর তরুণ দিনের এ কবিতাটি আলোচনা করলে বোঝা যায়। শ্রীরাধার দরদী মন কেবল নিজের পুলক শিহরণে আপন ভোলা নয়। অমিয় গরল বাঁশরী-ধ্বনি ভুবন-মাতানো। মধুঋতু, পিককুল, বিকল ভ্রমর-কুল,

গোপ-বধূজন, পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন, নীল নীর, ধীর সমীরণ সবাই—পলকে প্রাণ মম খেয়ে। কাজেই কবি স্বয়ং আত্ম-সমর্পণ করলেন—

যাচে ভানু সব সংশয় ঘুচরি
জনম চরণ পর গোয়
কো তুঁহু বোলবি মোয়।

পরে তিনি রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে অতুল রতন তুলেছিলেন।

সকল কবিতার উল্লেখ এ-প্রবন্ধে সম্ভব নয়। অতি শিশুকালে বৈরাগী বৈষ্ণবের মুখে শুনেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

"বাজাও রে মোহন বাঁশী" আর
গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি, আও আওলো।

তারা রবি ঠাকুরের কবিতা বলে এদের জানতো না নিশ্চয়। ভানু সিংহ ঠাকুর এদের আভিজাত্য দিয়েছিল।

হৃদয়ক সাধ মিশায়ল হৃদয়ে
কণ্ঠে বিমলিন মালা।

কিম্বা গহন তিমির নিশি ঝিল্লি মুখর দিশি
শূন্য কদম তরুমূলে।
ভূমি শয়ন পর আকুল কুন্তল
কাঁদয় আপন ভুলে।

অথবা সজনি অব উজার মন্দির
কনক দীপ জ্বালিয়া
সুরভ করহ কুঞ্জ ভুবন
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।

এগুলি রসে টলমল। এরা কবির গ্রহণ-যোগ্যতা সম্পর্কীয় সমালোচনা হ'তে আমাদের ভিন্ন মত করে। অন্য ভণিতার মধুর রসের পরিচয় দিব।

ভানু কহত অব রবি অতি নিঠুর
মলিন মলিম অভিলাবে
কত নরনারীক মিলন টুটায়ত
ভারত বিরহ হুতাপে।

বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে নবীন সমাজের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। সে ধারণাকে সরল পথ দেখাবার জন্য কতকগুলি নমুনা ও মতামত দিলাম। তাদের দুটা দিক আছে। এক কান্ত মনোরম চিত্ত-প্রসাদ অদীক্ষিত কাব্য-রসিকের পক্ষে। এ মতে অসন্তোষের কারণ নাই। কারণ কবির কথায়,

তোমার কি তাঁর বন্ধু তাহে কার ক্ষতি।

কিন্তু এর এক আধ্যাত্মিক দিক আছে—বৈষ্ণব সাধক সেই ভাবে তাকে দেখে। সে কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। সে সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেছেন—নির্ব্বোধ কেবল দেহের দিক থেকে প্রেমকে দেখে, তাই তারা এর আধ্যাত্মিকতা বোঝেনা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্য এক শিষ্য গিরীশচন্দ্র, ছবি এঁকে দেখিয়েছেন যে তুচ্ছ গণিকার প্রতি কামুক প্রীতি রাধাকৃষ্ণের নিত্য-প্রেমের সন্ধান দিতে পারে।

বৈষ্ণব কবিতায় গাঢ় ভক্তিরস উৎপন্ন হয়। সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্যও শ্রীকৃষ্ণের "রাধিকা-রমণ রম্য সুমূর্ত্ত" রূপ ধ্যান করেছেন এবং বলেছেন—

গোপিকা বদন চন্দ্র-চকোর
নিত্য নির্গুণঃ নিরঞ্জন জিঙ্কো।
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর সর্ব্ব
শ্রীপতে সময় দুঃখমশেষম।

অদ্বৈত

কবিরঞ্জন শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম্-এ

এক আকাশে হাজার তারা,
চাঁদ উঠে তায় একটি শুধু,
একটি কমল বিনা যে হায়,
গোটা তড়াগ দেখায় ধূ ধূ!
থাক্ না টগর চম্পা—বেলী—
হাস্নুহানা—জুঁই—চামেলী,
গুল্বাগিচার ভ্রমর জানে
'গুল্সানে' তার মিলবে মধু!

২

হাজার লোকের ভিড়ের মাঝে
উজল হ'য়ে সদাই জাগে,
একখানি মুখ—একটি চাওয়া
বারেবারেই আঁখির আগে!
কোটি কথার কলধ্বনি
বাজছে কানে দিনরজনী,
একটি তবু 'ওগো' মত
অত মধুর আর কি লাগে?

৩

সংসারের এই রঙ্গশালায়
লক্ষ মানুষ নিত্য জোটে,
একটি বিনা মনের মানুষ
দেখ্তে না পাই চক্ষে মোটে!
হাটের মাঝে সঙ্গীহারা
কাঁদে পরাণ পাগল-পারা,
স্বাতীর সলিল বিনা কি হায়
শুক্তি বুকে মুক্তা ফোটে!

সূর্যোদয়ের আগে

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

(২)

প্রভাতের কথা মনে পড়ছে।

প্রভাত বলত: সূর্যাস্ত না দেখলে কখনো জীবন বাঁচে! সূর্যের নানারূপই তো জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। প্রাতঃসূর্যের নরম আলো; দ্বিপ্রহরের প্রদীপ্ত ভাস্বর; বিকালের সোনালী রোদ: আর সন্ধ্যার রঙিন্ আলো: এই যদি না দেখলাম দুটি চোখ ভরে, তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থেকে লাভ কি?

কথাগুলো কবিতার মত। কিন্তু প্রভাত কবি নয়। কর্মী। স্বপ্ন দেখে,কিন্তু স্বপ্নালু নয়। ওর সমগ্র জীবন একখানি সূর্য-প্রণাম!

'মহাকাল' পত্রিকায় প্রভাতের সংগে দেখা। বাঙলা দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দৈনিক কাগজ 'মহাকাল'। আমি তার সহকারী নৈশ-সম্পাদক। সেই কাগজেই রাত্রের staffএ কাজ করবার জন্ত প্রভাতের আবির্ভাব হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী যুবক। বছর চব্বিশ বয়স। একহারা পাতলা চেহারা। লম্বা লম্বা চুল ব্যাকব্রাসকরা। ছোট মুখখানি তাতে আরো ছোট দেখায়।

রাতপ্রায় একটা বাজে। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কোথায় চক্র-শক্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। তারি বিশদ বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।

প্রভাত একটুকরা কাগজে লেখা একটা সংবাদ আমায় দিয়ে বলল: এই সংবাদটা দয়া করে দিয়ে দেবেন কালকের কাগজে।

সংবাদটা কাষ্ঠ কারিগর ইউনিয়নের একটা সভার বিবরণ।

বললাম: কালকের কাগজে তো জায়গা হবে না।

কেন?

প্রশ্ন শুনে রাগ হল: কারণ unimportant pageগুলো ছাপা হয়ে গেছে। এখন যেসব page ছাপা বাকী আছে, তাতে কাষ্ঠ কারিগর ইউনিয়নের সংবাদ ছাপালে কাগজ চলে না!

প্রভাত কিন্তু দমল না, বলল: কাগজ যদি চলে তো কাষ্ঠ-কারিগরদের সংবাদের জোরেই চলে! যাঁদের সংবাদ নিয়ে আপনারা মাথাব্যথা করেন, তাঁরা কি ভুলেও বাঙলা কাগজ পড়েন। অথচ যাদের আপনারা অবহেলা করেন, তারাই পয়সা দিয়ে কাগজ পড়ে, তাদের নিয়েই দেশের জনসাধারণ।

প্রথমটা ভারী রাগ হল। পরক্ষণেই পেল হাসি। মনে মনে বললাম: কম্যুনিজমের প্রথম পাঠের উগ্র প্রতিক্রিয়া। জীবনের বাতাস লাগলেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন জানতাম না যে, পরিপক্ক বুদ্ধির কাছে যা ক্ষণিক উত্তেজনার উচ্ছ্বাস, অনেকের কাছে তাই গভীর আত্মপ্রত্যয়ের বস্তু, জীবন-সাধনার আদর্শ।

আরোপিত বিজ্ঞতার আবরণে তখন চোখ ঢাকা ছিল, তাই দেখতে পাই নি। পরবর্তীকালে দেখেছিলাম: প্রভাতের চোখে স্বপ্ন-সাধনার হোমাগ্নি-শিখা।

রাত সাড়ে তিনটায় কাজ শেষ হল। লিখবার টেবিলগুলি পরিষ্কৃত হয়ে তক্তাপোষে পরিণত হল। সারি সারি পড়ে গেল বিছানা। দু'একজন শুয়েও পড়ল। বাকী সবাই টেবিলের চার পাশে গোল হয়ে বসল চা ও বিড়ি নিয়ে। প্রভাত নবাগত সহকর্মী। তাকে নিয়েই আলোচনা সুরু হল।

প্রশ্ন করলাম: এম-এ পাশ করে আপনি শেষটায় খবরের কাগজে কাজ করতে এলেন কেন?

প্রভাত বলল: কি আর করি বলুন। চাকরী-বাকরীর যা বাজার পড়েছে আজকাল। অন্ত কোনদিকেই সুবিধা হল না তাই!

পরে জেনেছিলাম: প্রভাতের সংবাদপত্রে ঢুকবার কারণ আলাদা। মানুষ হয়েও যারা মানুষের অধিকারে বঞ্চিত, সেই সব মজুরদের মুক্তি-সমস্যায় ওর তরুণ মন তখন আচ্ছন্ন। কোন ভাল সংবাদপত্রে কাজ করলে তাদের দুঃখদুর্দশার ইতিহাস বাইরে প্রকাশ করবার, তাদের মনুষ্যত্বের দাবীকে বিশ্ব-সমক্ষে ঘোষণা করবার সুবিধা হবে, এই আশাতেই ও খবরের কাগজে চাকরী নিয়েছে। অন্যত্র চাকরীর অভাব অজুহাতমাত্র।

প্রভাতের জবাবের উত্তরে বললাম: খবরের কাগজে রাত কাবার করাটাই তাহলে জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করে নিয়েছেন।

প্রভাত আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিল: আজ্ঞে, তা নয়। তবে আপাতত এখানেই আছি কিছুদিন। পরে সুবিধামত অন্যকোথাও—

বাধা দিল রাণুদা। বর্মাচুরুটের ধোয়া ছেড়ে বলল: সে আশা মনে স্থান দেবেন না মশাই, তাহলে আখেরে পস্তাতে হবে! অন্ত কিছু করবার বাসনা থাকে তো এইবেলা সরে পড়ুন। নইলে একবার এ গর্তে পা ঢোকালে আর নট্ নড়নচড়ন।

সীতেশবাবু সন্ত বি-এল্ পাশ করেছেন night-duty করতে করতেই। মনে আশা আছে শীঘ্রই এসব ছেড়ে বটতলা আলো করে বসবেন। তিনি বললেন: তার কোন নিশ্চয়তা নেই রাণুদা। তুমি সাতঘাটের জল খেয়ে এখানে এসে ডুবে মরেছ বলে, সবাই যে মরবে তার কি মানে আছে?

আছে বাবা, কথা আছে। খবরের কাগজের চাকরী হল হাঙর মাছের দাঁত। কখন যে তোমার কোমর কেটে দুখণ্ড করেছে, জানতেও পারবে না। টের পাবে জল থেকে উঠতে চেষ্টা করলে। এই শর্মাই তার জীবন্ত উদাহরণ।

সত্যি, বিচিত্র রাণুদার জীবন-কাহিনী। আই-এসসি পাশ করে ঢুকল মেডিক্যাল কলেজ। দুবছর ডাক্তারী পড়ে ঢুকল আর্ট স্কুলে। বছর দুই ছবি এঁকে মাসিমার টাকায় গেল বিলেত। ফিরে এল স্রেফ কিছু না করে। কিছুদিন ঘুরে বেড়াল নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কর্পোরেশন স্কুলে মাষ্টারী পেল। সে চাকরী করতে করতেই ছদ্মনামে ঢুকল ভাস্করের নৈশ-বিভাগে।

তারপর তো জানোই বাবা, ছায়াই কায়াকে গ্রাস করল। স্কুলমাষ্টারী চুলোয় গেল, হলাম সুপরিস্ফুট সাংবাদিক অর্থাৎ fullfledged journalist.

রাণুদা হো-হো করে হেসে উঠল। সবাই একসংগে চায়ের কাপ ঠোঁটে তুলে তার স্বাস্থ্যপান করলাম।

তাল ভংগ করল বেরসিক টেলিপ্রিণ্টারটা; সীতেশবাবু ঘাড় কাত করে তাকিয়ে বললেন: আস্তে বাবা, আস্তে কথা কও।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ভোর হয়ে গেছে। ঘড়িতে ছ'টা বাজে। টেলিপ্রিণ্টারের মুখে সংবাদের আক্ষরিক শোভাযাত্রা এগিয়েই চলেছে।

অন্য সবাই নিদ্রামগ্ন। প্রভাতের বিছানা শূন্য। এত সকালে কোথায় গেল ছোকরা? নিশ্চয় ঘুমুতে পারে নি—এই অপরিচিত অনভ্যাস আবহাওয়ায়। একটু দুঃখ হল। হাসিও পেল। প্রথম প্রথম night-dutyর পরে আমারো ঘুম হত না। আর এখন? দেয়াল-চেয়ার টেবিলের শয্যায় শায়িত তড়িৎদার আপীসের সেই ঘুমকাতর ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ে। what man has made of man!

কি মনে করে আপীসের ছাদে গিয়ে উঠলাম। ছাদের এককোণে প্রভাত দাঁড়িয়ে। রেলিংয়ে ভর দিয়ে পূব আকাশের দিকে চেয়ে আছে। ধ্যানমগ্ন দৃষ্টি। প্রথম মানবের সূর্যপ্রতীক্ষা।

নিঃশব্দ পায়ে নীচে নেমে এলাম।

বাইরে তাকালাম। অন্ধকার গাঢ়তর। মেঘে মেঘে আকাশ মহাকালী মূর্ত্তি ধরেছে। দিগন্ত হতে দিগন্তে তার এলোকেশ ছড়ানো। অকস্মাৎ মহাকালীর হাতে ঝলসে উঠল তড়িৎ-খড়্গ। স্মৃতির কালো আকাশও উঠল ঝলমলিয়ে। তড়িৎদাকে মনে পড়ল।

যাদবপুর হাসপাতাল। একতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে তড়িৎদা। পাশে আমি আর রাণুদা।

পশ্চিমাকাশে শোণিত-রাঙা ছিটে লাগিয়ে সূর্য অস্তোন্মুখ। ইউক্যালিপটাস্ গাছের পাতাগুলো মৃদু হাওয়ায় দুলছে। নীচের পুকুরে কাঁপছে তারি ছায়া। চারিদিকেই তন্দ্রাতুর বিরতির আমেজ। চলমান পৃথিবীটা এখানে এসে যেন অকস্মাৎ থমকে থেমে গেছে। প্রাণ-প্রবাহ এখানে অবসন্ন—রুদ্ধ।

তড়িৎদা আরো শুকিয়ে গেছে। মুখখানি ফ্যাকাসে। চোখের দৃষ্টি উদাস। গলার স্বর ভাঙা। কথা বলতে গেলে ভাঙা হার্মোনিয়মে বেলো করবার মত একটা আওয়াজ হয়।

কথা বললাম: night-duty করেই তুমি অসুখে পড়লে। এবার এখান থেকে ছাড়া পেলে আর তোমাকে night-duty করতে দিচ্ছি না জেনো।

তড়িৎদার ঠোঁঠে পাণ্ডুর হাসি: পাগল্ night-duty কি আর কেউ করে না নাকি? এই তো রেলকোম্পানীর কর্মচারীরা, টেলিগ্রাফ্ টেলিফোন অপারেটাররা, ইলেকট্রিক কোম্পানীর লোকেরা—সবাই তো রাত জেগে কাজ করে। এ কাল রোগ আমার অদৃষ্টে ছিল, night duty না করলেও হতো।

বললাম: অন্য জায়গায় কাজ করা, আর খবরের কাগজে রাত্রে কাজ করায় অনেক তফাৎ।

রাণুদা সায় দিল: একথাটি কিন্তু ঠিকই বলেছেন নারাণবাবু। খবরের কাগজে রাতে কাজ করা যেন আফিমের নেশা। কাজ করছেন তো করেই যাচ্ছেন। শ্রান্তি নাই। ক্লান্তি নাই। কিন্তু টের পাবেন হাতের কলমটি ছেড়ে উঠলে। সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসে। মনে হয় জীবনের প্রথম দিন থেকে অবিশ্রাম কাজ করতে করতে এই যেন প্রথম থামলাম।

ধীর গলায় তড়িৎদা বলল: তাহলেই বা উপায় কি?

বললাম: উপায়, night duty তুলে দেওয়া।

তাহলে যে খবরের কাগজই বন্ধ হয়ে যাবে।

কেন? সকাল হতে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করলেই হলো।

সন্ধ্যায় কেউ খবরের কাগজ পড়বে না।

কেন পড়বে না? খবর জানা নিয়ে কথা। তা সে সন্ধ্যায়ই হোক্ আর সকালেই হোক্।

একটু চুপ করে থেকে তড়িৎদা আবার বলল: যুক্তির দিক দিয়ে যাই হোক, অভ্যাসের দিক দিয়ে মানুষ সকালেই খবরের কাগজ পড়তে চায়। সুতরাং কাগজ চালাতে হলে সকালেই তা বের করতে হবে।

ব্যথিত কণ্ঠে বললাম: তার জন্যে যদি অনেক মানুষকে প্রাণে মরতে হয়, তবুও?

প্রাণ বাঁচাবার জন্যে অন্য কত জায়গাতেই তো মানুষ দিনের পর দিন প্রাণ বলি দিচ্ছে। যাও কয়লার খনিতে, যাও লোহা-লক্কড়ের ফ্যাক্টরীতে, যাও প্রেসে, যাও কারখানায়। অসংকোচ মৃত্যুলীলার অভাব কি পৃথিবীতে।

এক সংগে অনেকগুলি কথা বলে তড়িৎদা একটু হাঁপিয়ে উঠছিল। তার হাতের উপর চাপ দিয়ে বললাম: আচ্ছা, তুমি চুপ করে থাক তড়িৎদা, ও কথা এখন থাক।

রাণুদা কখন উঠে গেছে হাসপাতালটা দেখতে। আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তড়িৎদা আবার বলল: তুমি যা বলেছ, তা খুব সত্যি। খবরের কাগজের night dutyর খাটনী অনেকের পক্ষেই সহ্যের অতিরিক্ত। সকালে কাগজ পড়াও মানুষের একটা নিছক অভ্যাস। মফঃস্বলের এমন অনেক সহর আছে যেখানে মানুষ বাধ্য হয়ে দুপুরে বা রাতে কাগজ পড়ে। সবই সত্যি। কিন্তু এতদিনের এই বিধি-ব্যবস্থা পাল্টে দেবার ক্ষমতা যখন তোমার আমার হাতে নয়, তখন চাকরীর খাতিরে একে মেনে না নিয়ে উপায় কি?

পৃথিবীর কোন অন্যায়ই প্রতীকারের উর্ধে নয়, আর এই জীবননাশা ব্যবস্থার কোন প্রতীকার হবে না?

প্রতীকার নেই এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু সে প্রতীকার night duty তুলে দেবার চেষ্টা নয়। একে রেখেই এর সংশোধন করতে হবে।

তড়িৎদা দম নেবার জন্য একটু থামল। আমি চুপ করেই রইলাম। একটু পরে তড়িৎদা মুখ খুলল: আমার কি মনে হয় জানো নারাণ, night duty নয়, তার সংগে ল-কলেজ, প্রাইভেট ট্যুইশনী প্রভৃতি এটা-ওটা কাজের চাপেই বোধহয় শরীরটা আমার এত শীগ্‌গির ভেঙে পড়ল।

শরীর যা সহ্য করতে পারবে না, জেনেশুনে তা তুমি করতে গেলে কেন?

আচার্য্য সুশ্রুত

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

অতি প্রাচীনকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন—

(১) ভরদ্বাজ বা আত্রেয় সম্প্রদায়।

(২) ধন্বন্তরি সম্প্রদায়।

প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ জ্বর, অতিসার প্রভৃতি ভেষজ-সাধ্য রোগের চিকিৎসক ছিলেন এবং কায়চিকিৎসক নামে অভিহিত ছিলেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ প্রধানতঃ শস্ত্রকর্ম্মে নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহারা শল্য চিকিৎসক নামে পরিচিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন আর এক সম্প্রদায়ের চিকিৎসকের উল্লেখ দেখা যায়, ইঁহারা "শালাকী" নামে পরিচিত ছিলেন এবং উর্দ্ধজত্রুগত অর্থাৎ নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, মস্তক ও মুখগত রোগের চিকিৎসা করিতেন। এই শালাক্যতন্ত্রবিদ্ চিকিৎসকগণও ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। চরক সংহিতা ভরদ্বাজ বা আত্রেয় সম্প্রদায়ের যেমন প্রামাণ্য গ্রন্থ, আচার্য্য সুশ্রুত প্রণীত সুশ্রুত সংহিতা তেমনই ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য সংহিতা। আজ আমরা সেই আচার্য্য সুশ্রুতের পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিব। কথিত আছে যে, ভগবান ধন্বন্তরি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কাশীরাজ দিবোদাসরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর রক্ষিত ও সুশ্রুত প্রভৃতিকে শল্যতন্ত্র প্রধান আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সুশ্রুত সংহিতার প্রথমেই দেখা যায় যে, সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণ ভগবান ধন্বন্তরির নিকট প্রজাকুলের হিতার্থে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে অভিলাষ জানাইলে তিনি উক্ত মহর্ষিদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই সুশ্রুত তাঁহার সংহিতায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত সুশ্রুত কে ছিলেন এবং তিনি কি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায় যে, তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র ছিলেন। ঋক্‌বেদের কোন কোন মন্ত্রদ্রষ্টা বিশ্বামিত্র ঋষি। রামায়ণে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রাচীনতর। মহাভারতে এক বিশ্বামিত্রের উল্লেখ দেখা যায়। ইঁহার অন্যতম পুত্রের নাম সুশ্রুত। এই বিশ্বামিত্র তদীয় পুত্র সুশ্রুতকে ধন্বন্তরিরূপী কাশীরাজ দিবোদাসের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগের। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিশ্বামিত্র সুশ্রুতের পিতা হইতে পারেন না। ধন্বন্তরির সময় খৃঃ পূঃ ৩০০০ হাজার বৎসর। সেই হিসাবে ধন্বন্তরি শিষ্য সুশ্রুতও ঐ সময়ের। কেহ কেহ বলেন যে, সুশ্রুত সংহিতায় শস্ত্র কর্ম্মাদি কার্য্য প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে করণীয় এইরূপ উপদেশ আছে। কিন্তু সোম মঙ্গল প্রভৃতি বারের শুভাশুভ বিচার নাই। জ্যোতির্বিদদিগের মতে শুভাশুভ বার গণনার প্রচলন ভারতবর্ষে শকাব্দের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে হইয়াছে। এখন শকাব্দ ১৮৭৩। অতএব আজ হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে বার গণনার প্রচলন হইয়াছে। সেই হিসাবে আমরা দেখিতে পাই যে, সুশ্রুতসংহিতা অন্ততঃ তিন হাজার বৎসরেরও অধিকপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুত সংহিতার অনেক স্থলে বৃদ্ধ সুশ্রুতের নামোল্লেখ দেখা যায় ইহাতে সুশ্রুত সম্বন্ধে অনেকে নানারূপ ধারণা করিয়া থাকেন। সুতরাং এ সম্বন্ধেও আলোচনা করিবার আছে।

কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে, প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতাই আদি সুশ্রুত সংহিতা অথবা উহা সংস্কৃত হইয়া বর্ত্তমান রূপ পাইয়াছে। ইহার উত্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, ডল্লনাচার্য্য তাঁহার নিবন্ধ সংগ্রহ নামক টীকায় লিখিয়াছেন "প্রতি সংস্কর্ত্তাপি ইহ নাগার্জ্জুন এব" অর্থাৎ নাগার্জ্জুন সুশ্রুত-সংহিতার সংস্কার করিয়াছিলেন। এই নাগার্জ্জুন কে ইহা লইয়া বহুমত-ভেদ দেখা যায়, কারণ ভারতের ইতিহাসে কয়েকজন নাগার্জ্জুনের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় কয়েকজন নাগার্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীর দেশ নাগার্জ্জুনের জন্মভূমি। যথা—

> "ততঃ ভগবতঃ শাক্যসিংহস্য পুরনিবৃতেঃ।
> অস্মিন্ মহলোক ধাতৌ সার্দ্ধং বর্ষশতং হ্যগাৎ
> বোধিসত্ত্বশ্চ দেশেঽস্মিন একভূমীশ্বরোঽ ভবৎ
> স তু নাগার্জ্জুনঃ শ্রীমান ষড়ই বনসংশ্রয়ী॥"

ভগবান বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের দেড়শত বৎসরের পর কাশ্মীর দেশে নাগার্জ্জুন প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় গ্রন্থ "জাম-পাল-র্চ-গু'ই" প্রামাণিক বলিয়া বিখ্যাত। এই গ্রন্থে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

> "দে-সিন্-শেগ-প-ঙ-দেশ-নেস্
> লো-নি-ধি-গু'া-লোন-পন।
> গে-লোঙ-লু-রিস্-দো-বোদ জুঙ
> তন-প-ল-দম্ চিঙ্ কন্॥"

ইহার অর্থ বুদ্ধদেব ইহজগৎ হইতে মহাপ্রস্থান করিবার চারিশত বৎসর পরে ভিক্ষু নাগার্জ্জুন জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই তিব্বতীয় গ্রন্থের মতে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিদর্ভ দেশ নাগার্জ্জুনের জন্মভূমি। তিনি ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়া, প্রথম যৌবনেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।...নাগার্জ্জুন বৌদ্ধাচার্য্য শরহের শিষ্য ছিলেন। নালন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে নাগার্জ্জুন বিদ্যা শিক্ষা করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পরোপকারবৃত্তিপ্রণোদিত হইয়া তিনি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভাবলে আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।" শ্রীযুত কাব্যতীর্থ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিয়াংসাং তদীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "যে চারিটী সূর্য্যের উদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, 'নাগার্জ্জুন' তাহাদের একটী।" চীন ভাষায় নাগার্জ্জুনের একখানি জীবন-চরিত রচিত হইয়াছিল। একজন জাপানী পণ্ডিত বলেন, ঐ জীবনচরিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাগার্জ্জুন কাহিনীর অনুবাদ। খৃঃ ৪০০ অব্দে বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত কুমারজীব ঐ গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

নাগার্জ্জুন প্রণীত অনেকগুলি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। যথা—

(১) নাগার্জ্জুন কক্ষপুট (২) সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার (৩) প্রজ্ঞাপারমিতা টীকা (৪) দ্বাদশ নিকায় শাস্ত্র (৫) ধর্ম্মসংগ্রহ (৬) প্রজ্ঞাদণ্ড (৭) প্রজ্ঞাশতক (৮) মাধ্যমিক সূত্র।

মহামতি চক্রপাণি সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের নাম করিয়াছেন। ইনিই সুশ্রুত সংহিতার সংস্কারক এবং ইনি বিভিন্ন প্রাচীন তন্ত্র হইতে সার সংগ্রহ করিয়া সুশ্রুত সংহিতার উত্তর তন্ত্র যোজনা করিয়াছিলেন। নেপাল রাজগুরু পণ্ডিত হেমরাজের সিদ্ধান্ত এই যে এই সিদ্ধনাগার্জ্জুন রসবিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন এবং ইনি শাতবাহন নৃপতির সহসাময়িক।

শাতবাহন রাজার সময় বুদ্ধ জন্মের দুইশত বৎসর পরে ইহা ঐতিহাসিকদিগের মত। ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বে বুদ্ধের মহানির্ব্বাণ হয়। অতএব আজ হইতে দুই হাজার বৎসরেরও কিছু পূর্ব্বে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন বর্ত্তমান ছিলেন। তান্ত্রিক যুগে বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনের উল্লেখ দেখা যায়। শাবর তন্ত্রে দ্বাদশ শিবের মধ্যে নাগার্জ্জুনের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এই দুইজন নাগার্জ্জুনের একজন সিদ্ধ নাগার্জ্জুন, অপরজন বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন। সিদ্ধনাগার্জ্জুনই আমাদের সুশ্রুত সংহিতার সংস্কারক ও সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের লেখক। নাগার্জ্জুন সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন, বৌদ্ধ যুগে ভোজভদ্র নামে একজন প্রবল প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। একবার নাগার্জ্জুন ভোজভদ্রের চিকিৎসার জন্য আহূত হন। নাগার্জ্জুন রাজাকে আরোগ্য করিয়া তাঁহার অনুরাগী করেন। ক্রমে নাগার্জ্জুন রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ দেন ও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করাইয়া তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ যদি এ সম্বন্ধে গবেষণা করেন তাহা হইলে নাগার্জ্জুন কয়জন ছিলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় দিতে পারিবেন।

সুশ্রুতের টীকাকারগণ—সুশ্রুত সংহিতা এমনই একখানি বিরাট গ্রন্থ যে উহার বহু টীকা লিখিত হইয়াছিল। আমরা সুশ্রুত সংহিতার বহু টীকাকারের নাম দেখিতে পাই। (১) জেজ্জট বা জৈয়ট (২) গয়দাস বা গয়ী (৩) ভাস্কর (৪) শ্রীমাধব (৫) ব্রহ্মদেবচ প্রভৃতি কয়েকজন টীকাকারের নাম ডল্লনাচার্য্য তাঁহার টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম টীকাকারগণের পাঠ পর পর টীকাকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের পূর্ব্বাপরভাব সহজেই জানা যায়। এই সমস্ত টীকার মধ্যে বর্ত্তমানে ডল্লনকৃত "নিবন্ধ সংগ্রহ" নামক ব্যাখ্যাই সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। অপর দুইখানি টীকা—(১) গয়দাস কৃত "ন্যায়-চন্দ্রিকার" নিদান স্থান এবং (২) চক্রপাণি কৃত "ভানুমতী" টীকার সূত্র স্থান মাত্র পাওয়া যায়। অপরাপর টীকাগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা উপরি উক্ত টীকাকারগণের মধ্যে চারিজনের পরিচয় যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদত্ত করিতেছি।

জেজ্জট—সুশ্রুত টীকাকারদিগের মধ্যে জেজ্জট বা জৈয়ট সর্ব্বপ্রাচীন। তৎকৃত নিরন্তর পদব্যাখ্যা নামক টীকার পাণ্ডুলিপি মান্দ্রাজের রাজকীয় গ্রন্থাগারে আছে। পণ্ডিত শ্রীযুত যাদবজী ত্রিকমজী মহোদয় উহা দেখিয়াছেন। জৈয়ট প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কৈয়ট এবং কাব্যপ্রকাশ রচয়িতা মম্মটের সহোদর এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। বাগভট, তীসট, চন্দ্রট প্রভৃতির ন্যায় জৈয়ট ও সিন্ধুদেশের অধিবাসী ছিলেন। জৈয়ট বা জেজ্জটের টীকা তীসট পুত্র চন্দ্রটের সময়ও প্রসিদ্ধ ছিল ইহা চন্দ্রটের দ্বারা সুশ্রুতের পাঠ শোধন হইতেই বুঝা যায়। যথা—

"শ্রৌশ্রুতে চন্দ্রটেনেহ ভিষক্‌তীসট্‌ সূনুনা।
পাঠশুদ্ধিঃ কৃতা তন্ত্রে টীকামালোক্য জৈজ্জটীম্ ॥"

অর্থাৎ ভিষক্ তীসটের পুত্র চন্দ্রট্ জেজ্জটের টীকা দেখিয়া সুশ্রুত তন্ত্রের এই পাঠশুদ্ধি করিলেন। এই প্রমাণটী শ্রীযুত যাদবজী ত্রিকমজী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সুশ্রুতের উপদ্ঘাতে উল্লেখ করিয়াছেন। তীসট বাগভটের পুত্র অথবা শিষ্য এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সেই হিসাবে বাগভটের সময়ের প্রায় দুইশত বৎসরের পরে জেজ্জটের সময় ইহা অনুমান করা যায় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ শতাব্দী। অতএব জেজ্জট আজ হইতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বের ব্যক্তি ছিলেন। জেজ্জট ভট্টার হরিচন্দ্রের নাম করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে জেজ্জট অপেক্ষা হরিচন্দ্র অধিক প্রাচীন।

গয়দাস বা গয়ী—ডল্লনাচার্য্য তাঁহার লিখিবার সময় প্রধানভাবে গয়দাসের টীকা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন। কারণ বহু স্থলে তিনি গয়দাস সম্মত পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুত যাদবজী ত্রিকমজীর সম্পাদনে বোম্বাই হইতে গয়দাসের সুশ্রুতের নিদান স্থানের টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। গয়দাস ডল্লন অপেক্ষা প্রাচীন এবং জেজ্জট অপেক্ষা নবীন অর্থাৎ ইঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী। ডল্লনের সময় ১০ম শতাব্দী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আবার জেজ্জট বাগভট অপেক্ষা নবীন। এই হিসাবে এই দুইটার মধ্যবর্ত্তী সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দী গয়দাসের সময় ধরা যাইতে পারে। ডল্লনাচার্য্য—সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লন বা ডল্‌হন খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা যায়। সুশ্রুতের ডল্‌হন কৃত টীকা নিবন্ধ সংগ্রহে দেখা যায় যে, ডল্‌হন ভাদানক দেশের রাজা সাহলের প্রিয় ছিলেন। এই সাহল বা সহপাল মথুরা প্রদেশের অন্তবর্ত্তী কোন দেশের সামন্ত নৃপতি ছিলেন।

চক্রপাণিদত্ত—চক্রপাণি সুশ্রুত টীকাকারদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়াধিনাথের মন্ত্রী নারায়ণের পুত্র এবং শ্রীনরদত্তের শিষ্য। শিবদাস সেন "চক্রদত্তের" টীকায় এই গৌড়রাজের নাম বলিয়াছেন নয়পাল দেব। ঐতিহাসিকদিগের মতে গৌড়রাজ নয়পাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চক্রপানি লিখিত সুশ্রুতের "ভানুমতী" টীকা ব্যতীত চরকের "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" নামক টীকা আছে। ইহা ভিন্ন ইঁহার "চক্রদত্ত" ও "দ্রব্যগুণ সংগ্রহ" গ্রন্থ দুইখানি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। চক্রপাণি বাঙ্গালা দেশের অধিবাসী ও বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুশ্রুতের সমাদর—সুশ্রুত সংহিতার যেমন বহু টীকা রচিত হইয়াছিল সেইরূপ সুশ্রুতের মতের বহুল প্রচার উদ্দেশ্যে ইহার অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল। ৭ম শতাব্দীতে খালিফ্ আল্ মন্ সুরের আদেশে "সুশ্রুত সংহিতা" আরবী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ "খালেল সাশুর আল হিন্দি" (Khalale shaw Shooral Hindi) নামে বিখ্যাত। এই সময় "চরক সংহিতা"ও আরবীয়েরা "সরক" নামে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুবাদ আবার লাটীন্ ভাষায় অনুদিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিকট বিশেষভাবে ঋণী একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। শুধু তাহাই নহে, ঐ সকল অনুদিত গ্রন্থই ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান-প্রসারের মূল ভিত্তি। খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভে আরবের খ্যাতনামা চিকিৎসক সিরারিয়ন তাঁহার প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থে সুশ্রুত ও চরক হইতে বহু মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। নবম শতাব্দীতে বিখ্যাত মুসলমান চিকিৎসক আফ্‌লাটুন্ প্রণীত গ্রন্থেও সুশ্রুতের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্রাট সাজাহানের চিকিৎসক নুরুদ্দীন মহম্মদ আবদুল্লা সিরাজী সাহেব ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে যে আল ফাজেল আদ্বিচ (Al fazl Adwich) নামক যে বিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহাতেও সুশ্রুত হইতে বহু ঔষধ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্রাট ঔরংজেবের প্রথিতযশা হাকিম মহম্মদ আকবর মাৰ্জ্জানি সাহেব ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে "কারাবাদিন্ কাদেরি" (Karabadine kaderi) নামক যে পুস্তক রচনা করেন, তাহাতেও সুশ্রুত হইতে বহু বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় নবম শতকে প্রসিদ্ধ আরব চিকিৎসাশাস্ত্রকার রাজী (Razi) সুশ্রুত ও চরক হইতে বহু ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, "সুশ্রুত সংহিতার" কিরূপ সমাদর হইয়াছিল। কবিরাজ ৺কুঞ্জলাল ভিষগ্‌রত্ন মহাশয় "সুশ্রুত সংহিতার" ইংরাজী অনুবাদ (An English Translation of the Sushruta Samhita) বাহির করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বিদেশে সুশ্রুতের মত বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। সুশ্রুত তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার গ্রন্থের অনুবাদ ও বহু মনীষী তাঁহাদের গ্রন্থে সুশ্রুত সংহিতা হইতে অনেক বিষয় আহরণ করিয়া সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিতে হইলে একখানি বিরাট গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, চিকিৎসা বিষয়ে এমন কোন বিষয় নাই যাহা সুশ্রুত তাঁহার গ্রন্থে আলোচনা করেন নাই। তবে তাঁহার গ্রন্থে শল্য চিকিৎসারই

প্রাধান্ত দেখা যায়। শারীর পরিচয় (Anatomy), শল্যতন্ত্র, (Surgery) এবং ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) বিষয়ে এমন বিশদভাবে আলোচনা প্রাচীন আর কোন ঋষি করেন নাই। আধুনিককালে শল্য-তন্ত্র ও ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাও যেন আচার্য্য সুশ্রুতের জানা ছিল, তাহা সুশ্রুত সংহিতা পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে' "আয়ুর্ব্বেদ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা' নামক আমার লিখিত অপর একটি প্রবন্ধে সুশ্রুতের অস্ত্র চিকিৎসার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছিলাম। অস্ত্র চিকিৎসায় সুশ্রুতের অসাধারণ পারদর্শিতা যেমন ছিল, ধাত্রী বিদ্যাতেও তাঁহার জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া এবং অস্ত্র-চিকিৎসায় ও প্রসবাদি কার্য্যে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানলাভ করিয়া সুশ্রুত তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য আজও পর্য্যন্ত তিনি অমর হইয়া আছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের চর্চ্চার অভাবে সুশ্রুতের শরীর স্থান ও ধাত্রী-বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, কালের পরিবর্ত্তনে মানুষের রুচিরও পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাই বর্ত্তমান সময়ে বহু মেধাবী ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারা পাশ্চাত্য শল্য তন্ত্র ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সুশ্রুতের শারীর পরিচয়, শল্য তন্ত্র ও ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সুশ্রুতের অমূল্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়া ইঁহারা দেশের প্রভুত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন।

পরিবহন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

জাপানী বোমার ভয়ে অনিতা কলিকাতা হইতে পলাইয়া দেওঘর আসিয়াছে—স্বামী কলিকাতাতেই আছে। অনিতা সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। সন্তানের দিক দিয়াও সুখী—একটি মেয়ে কল্যাণী আই-এ পড়ে, একটি ছেলে অজয় সেও আই-এ পড়ে। এই দুইটি সন্তানের পর আর কোন সন্তান হয় নাই।

অনিতার বয়স ৩৭ হইবে কিন্তু মা ও মেয়েকেএকসঙ্গে দেখিলে দুই বোন বলিয়াই ভ্রম হয়। ভগবানের আশীর্ব্বাদে অর্থ, বিত্ত, সহৃদয় স্বামী লইয়া সে দুর্লভ আনন্দময় গৃহস্থালী করিতেছিল। কিন্তু যুদ্ধের কল্যাণে নীড় আজ স্থানভ্রষ্ট—তবে শনি রবিবার স্বামী কলিকাতা হইতে আসেন।

বাড়ীতে লোক তিনটি—সঙ্গে বিশ্বস্ত ঠাকুর চাকর এবং ঝি—দুর্দিনে প্রভুকে তাহারা ত্যাগ করে নাই।

বাড়ীটা অনিতার বাবার—তাঁরা অন্যত্র আছেন, তাই অনিতাকে ওই বাড়ীতে যাইবার উপদেশ তিনিই দিয়াছেন।

ভাই বোনের পড়ার অসুবিধা তাই স্বামীস্ত্রী যুক্তি করিয়া একজন টীউটরের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া দিল। যথাসময়ে রমেনবাবু নামে এক ডবল এম-এ কে আসিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল এবং তিনি জানুয়ারীতে পৌছিবেন জানাইলেন।

বাড়ীটা সহরের প্রান্তে, রোহিণী রাস্তার ধারে। পিছনে অদূরে শুষ্ক ধূসর পাণ্ডুর একটা পাহাড়—শুষ্ক নদীর পারে অসমতল বন্ধুর মাঠ। বারান্দায় রোদে বসিয়া কল্যাণী ও অজয় পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল—এক ভদ্রলোক সুটকেশ ও গোটাচারেক কম্বল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই জানিত ইনি রমেন-বাবু। অজয় প্রশ্ন করিল—আপনি কি রমেনবাবু?

রমেনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন—'হু' এবং মাষ্টারী ঢংএ প্রশ্ন করিলেন—তোমরাই ছাত্র-ছাত্রী?

—হ্যাঁ।

অজয় মা'কে খবর দিতে গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল—চা খান ত?

—হ্যাঁ। ব'সো।

ভদ্রলোকের মুখশ্রী দেখিয়া মনে হয় বয়স বছর ৪৫এর উপরে নয়। কিন্তু মাথার চুল পাকিয়াছে এবং দাড়িও দুই চারিটা সাদা হইয়া আসিয়াছে! পাকানো বেতের মত শীর্ণ সহিষ্ণু চেহারা—যৌবনের গৌরবর্ণ আজ ম্লান, তবুও তাহা গৌর। মুখে একটা দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট—দেখিলে ভয়ে ও শ্রদ্ধায় বাজে কথা বলিতে সাহস হয় না।

কল্যাণী বলিল—আপনি কোন গাড়ীতে এলেন?

—এসেছি রাত ১২টায়, ষ্টেশনেই ছিলাম। বাড়ী খুঁজে সকালে এলাম।

অনিতা চা' ও খাবার লইয়া আসিতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল এবং কল্যাণী লক্ষ্য করিল তাহার মা'য়ের মুখের সমস্ত রক্ত যেন অকস্মাৎ নিঃশেষে নামিয়া গিয়াছে। ভীত শঙ্কিত বিহ্বল দৃষ্টিতে মাষ্টার ম'শায়ের পানে চাহিয়া আছেন এবং এদিকে রমেনবাবুও যেন হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া সম্বিত হারাইয়া একদৃষ্টিতে তাহার মায়ের মুখের পানেই চাহিয়া আছেন।

একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সসারের উপর হইতে চা'এর বাটি গড়াইয়া পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

অনিতা টেবিলে খাবারটা নামাইয়া রাখিয়া ক্ষুদ্র একটু নম-স্কারের সহিত প্রশ্ন করিল—আসতে, বাড়ী খুঁজে বের ক'রতে কষ্ট হয়নি ত?

রমেনবাবু প্রতি নমস্কার করিয়া কহিলেন—না।

অনিতা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কল্যাণী, আর একটু চা' আনতো।

কল্যাণী চলিয়া গেল কিন্তু সে বিমনা হইয়া ভাবিতেছিল—তাহার মা গ্রাজুয়েট এবং কলেজে পড়ার সময় স্মার্ট বলিয়া খ্যাতি ছিল। এমনিভাবে রক্তশূন্য মুখের মাঝে ভীত চাহনি সে কোন-দিন দেখে নাই; তাই মনে হয় রমেনবাবুর সঙ্গে তাহার মাতার জীবনের যেখানেই হোক একটা যোগসূত্র আছে।

কল্যাণী চা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং রহস্যটার সম্বন্ধেই ভাবিতেছিল কিন্তু রমেনবাবু রহস্য উদ্ঘাটন করিলেন। সে শুনিল—

রমেনবাবু বলিতেছেন—অনিতা, তোমাকে আজ অনিতা বললে অসম্মান করা হবে কিনা জানি না। তবে আমার পক্ষে অন্য কিছু বলা সম্ভব নয়। এই বাড়ীটায় যখন একদিন বাস

করেছিলাম তখন—মানে সেই দিনগুলি আমার জীবনে অক্ষয় হ'য়ে আছে। আজ বিশবছর পরেও এই বাড়ীটায় আর একবার বাস ক'রবার প্রলোভন ত্যাগ ক'রতে পারলুম না—তাই এই ঠিকানা দেখেই চাকরী নিয়ে এসেছি—কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েকে পড়াতে হবে একথা স্বপ্নাতীত ছিল। পুরাতন সেই দিন-গুলো আজ যেন নূতন ক'রে হাতের মাঝে পেয়েছি—না?

রমেনবাবু উদাস দৃষ্টিতে অদূরের ধূসর বন্ধুর মাঠের দিকে চাহিলেন। অনিতা কাঠের মত শক্ত হইয়া চেয়ারের উপর বসিয়াছিল। অত্যন্ত নিষ্প্রভ চোখটাকে ফিরাইয়া লইয়া কেবল মাত্র কহিল—ভালই হ'লো।

কল্যাণী প্রশ্ন করিল—এ বাড়ীতে এর আগে আপনি ছিলেন?

রমেনবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—এবং তোমারই মার মাষ্টাররূপে—যে সম্বোধন আজ তোমরা ক'রছ—

রমেনবাবু হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর মত লোক যে এমনিভাবে হাসিতে পারে তাহা যেন না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। মনে হয় রমেনবাবু জগতের সংঘাতে, তিক্ত অভিজ্ঞতায় এমনি একটা স্তরে পৌছিয়াছেন—যেখানে আসা বা চোখের জল ফেলা একটা অবান্তর ব্যসনমাত্র।

রমেনবাবু বলিলেন—ব'সো কল্যাণী। অনিতার বাবা এখানে ওকে পড়ানর জন্যে আমাকে এনেছিলেন, কিন্তু সেই পরিবারের মাঝে কোনদিন আমি মনে ক'রতে পারিনি যে আমি অনাত্মীয়—এমনি স্নেহ ক'রতেন 'মা'। তোমার মা বেঁচে আছেন অনিতা?

—না।

—জীবনে সেই আমার প্রথম আনন্দ, তাই তাঁকে ভুলতে পারি না। বারবার আমার মন সেই পরিবেষ্টনীর মাঝে ফিরে যেতে চায় কিন্তু আজ—বুড়ো হ'য়ে গেছি ত?

অনিতা বলিল—চুলও ত অস্বাভাবিকভাবে পেকেছে, কেন?

—ওরা অমনি পাকে। নোটিশ না দিয়েই—

রমেনবাবু ম্লান একটু হাসিলেন। পরে নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া বলিলেন—ভালই হ'ল, তোমার মেয়েকেও পড়িয়ে যাই, বিশ বছর পরে এমনি ক'রে ঘুরে ফিরে আবার এই বাড়ীতেই আসব তা কে ভেবেছিল। হ্যাঁ কল্যাণী, ছাতে উঠবার সিঁড়িটার মাঝে যে ভাঙ্গাটা ছিল সেটা আছে—না?

কল্যাণী সবিস্ময়ে বলিল—এখনও আপনার মনে আছে! সেটা তেমনি আছে'—

রমেনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন—ওটা আমারই কীর্ত্তি কিনা।

অনিতা বলিল—যাক্, সকাল সকাল খাওয়ার বন্দোবস্ত করি। গরম জলেই স্নান ক'রবেন ত?

না, ঠাণ্ডা জলই ভাল।

দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের পর রমেনবাবু চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। কখন শীতের রৌদ্র নিস্তেজ হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করেন নাই, কল্যাণী এককাপ চা ও কিছু খাবার আনিয়া বলিল—তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন, বেড়াতে যাবেন না?

রমেনবাবু খাবারের প্লেটটা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, এটা নিয়ে যাও। চল বেড়িয়ে আসি।

রেললাইনের ধারে মস্ত বড় একটা পাথর—তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া কল্যাণী বলিল—আসুন এখানে বসা যাক্।

অজয়, রমেনবাবু, কল্যাণী সকলেই বসিল। কল্যাণী প্রশ্ন করিল—এখানে কতদিন আগে ছিলেন।

—কতদিন, বলা কঠিন—তবে তোমার মাকে আই-এ আমি পড়াই, তখন ওর বয়স বছর আঠার হবে সম্ভব।

—আমাদের খুব ভাগ্য আপনার কাছেই পড়তে পাবো।

রমেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ।

তাঁর মনে পড়ে অনিতা একদিন এমনি বলিয়াছিল—আপনার কাছে পড়া সৌভাগ্যের কথা।

—এর আগে আপনি কি ক'রতেন?

—চাকুরী করি এক মফঃস্বল কলেজে, ছুটি নিয়ে এসেছি। অর্থাগম ও বায়ু পরিবর্ত্তন দু'টোই হবে। যুক্তিটা বেশ হ'য়েছে—

—এই বাড়ীতেই ছিলেন?

—হ্যাঁ ঠিক ওই ঘরেই। আর নিত্য ভোরে ওই আমলকীর গাছটাকে দেখেই উঠতাম। তোমার মার চেহারা কিন্তু একটুও বদলায় নি—আশ্চর্য্য। নইলে হয়ত চিনতামই না।

কল্যাণী রমেনবাবুর নিষ্প্রভ চোখ দুইটির দিকে চাহিল—দূরে নন্দন পাহাড়ের দিকে চাহিয়া তাহারা দুইটি যেন কি স্বপ্নের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

—দিদিমা আপনাকে খুব স্নেহ ক'রতেন।

—হ্যাঁ, ছেলের মত। তিনি বলতেন আমাকে নাকি ভাল না বেসে পারা যায় না। তোমার দাদামশায়ও তাই ব'লতেন, আমার স্বভাব এমনি।

রমেনবাবু আপনাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যেই হয়ত হাসিয়া উঠিলেন—এ কথা আজ যেন একেবারেই অবিশ্বাস্য।

পরদিন বেলা দশটায় অজয় গিয়াছে চাকরকে লইয়া বাজারে এবং কল্যাণী গিয়াছে পাশের বাড়ীতে কোনো বান্ধবীর সহিত দেখা করিতে। অনিতা এই ফাঁকে রমেনবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিল। রমেনবাবু একটী চেয়ারে বসিয়া দূরের পানে চাহিয়াছিলেন। অনিতার পদশব্দে ফিরিয়া চাহিয়া অভ্যর্থনা করিলেন—এসো অনিতা।

অনিতা শূন্য চেয়ারটায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কেবল-মাত্র এই বাড়ীটায় বাস ক'রবার জন্যই কি আসা হ'ল—

রমেনবাবু পাংশু একটু হাসিয়া বলিলেন—তা ছাড়া আর কি। তোমরা এখানে আছ একথা ত ভাবতেই পারি নি।

—বাড়ীটাই শেষে এত আপনার হ'ল।

রমেনবাবু বলিলেন—আমার কি মনে হয় জানো। মানুষ কোন দ্রব্য বা মানুষকে ভালবাসে না; সে ভালবাসে তার মনের কল্পনাকে—আর তাকে পৃথিবীতে মূর্ত্ত ক'রবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়। সে কল্পনা একবার এইখানে প্রাণ পেয়েছিল তাই এর মোহ আমাকে পেয়ে বসেছে। মনটা এই বয়সেও ঘুরে ফিরে সেই জায়গায়ই কেন্দ্রীভূত হ'য়ে পড়ে—

অনিতা বলিল—ছেলেমেয়ের সামনে এ সব কাব্যের কিন্তু কদর্থ্য হবে—সেটা খেয়াল রাখবেন।

—অবশ্যই।

অনিতা কষ্টে হাসিয়া প্রশ্ন করিল—ছেলেপুলে কি ?

—নেই বললেই হয়।

অনিতা যেন একটু চমকাইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—বিয়ে করেন নি নাকি ?

—করেছিলাম, বছর দু'এর মাঝেই তিনি মারা গেছেন, তার পর আর বিয়ে করা হয় নি।

একটু সহানুভূতির সুরে অনিতা বলিল—ভবঘুরে ভাবটা এখনও যাইনি তাহলে।

—ও রোগটা ত যাবার নয়, যাদের পেয়ে বসে—তারা সারা জীবনই ঘুরে বেড়ায়।

অনিতা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—কি ছেলেমানুষীই করেছিলাম, আপনার যাওয়ার দিনে কিছুতেই যখন থাকলেন না, ওই লোহার গেটটা ধ'রে চোখের জল ফেললাম।

অনিতা হাসিয়া উঠিল—আজ সেকথা মনে পড়লে যেন হাসিই পায়।

—আচ্ছা সেদিন কেন চলে গেলেন, জানতে ইচ্ছে করে।

রমেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—হঠাৎ মনে হ'ল যে আমার আর থাকা চলে না। আমার মঙ্গলের জন্যে যতটা না হোক্ তোমার মঙ্গলের জন্যে। আর আজ তা স্পষ্টই মনে হয়—

—নিজের মঙ্গল কিছু হ'য়েছে ?

—যদি হত তবে কি আবার ঘুরে ফিরে এই বাড়ীতে আসতে হ'ত ?

একটু শঙ্কিতভাবে অনিতা বলিল—কিন্তু—

—ভয় নেই তোমার, আমাকে দেখে তুমি যে ভয় পেয়েছ তা আমি বুঝি। আমি চেয়েছি আমার যৌবনের সেই স্বপ্ন-রঙীণ দিনগুলিকে অক্ষম অন্তর দিয়ে আর একবার অনুভব ক'রতে, আমার মন-সঙ্গিনীকে নিয়ে এই মোহ-মধুর পরিবেষ্টনীতে আর একবার আপনার মনকে ভোগ ক'রতে—সেখানে তুমি একান্তই অবান্তর অন্ততঃ আজ। সেইদিনের সেই পরিবেশের মাঝে যদি আমরা আবার বয়সকে ফেলে রেখে যেতে পারি, তবেই সেটা হবে ভয়ের—কিন্তু কেমন ক'রে আমি ভুলবো যে আমি বুড়ো—

রমেনবাবু তাই ব্যঙ্গ করিলেন—আজ তুমি নির্ভয়ে বিচরণ ক'রতে পারো। আর তোমার ছেলেমেয়ে সেও যেন নতুন ক'রে আমাকে আকর্ষণ ক'রছে। কল্যাণী তোমার মেয়ে বলেই আমার চোখে সুন্দরী।

অনিতা বলিল—আমার মেয়ে বলেই।

—হ্যাঁ।

কেন যেন দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। জীবনের এই প্রান্ত-সীমায় আজ এই সৌন্দর্য্যবোধ যেন নিতান্তই হাস্যকর।

কয়েক দিনের মধ্যেই অজয় ও কল্যাণীর অন্তর রমেনবাবু প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। যেমন মহৎ উদার, তেমনি বিজ্ঞ ও পণ্ডিত। সঙ্গে সঙ্গে আসিল—সহানুভূতি। এত পাণ্ডিত্য ও মহত্বের অন্তরালে ভুলো বেদনার্ত্ত মনটা মাঝে মাঝে শিশুমনের মত ব্যক্ত হইয়া পড়ে—কিন্তু কল্যাণী খুঁজিয়া পায় না কোথায় তাহার এই বেদনা। তাই বার বার নানা প্রশ্নে তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিয়া তুলে, রমেনবাবু হাসিয়া অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর জবাব দেন।

ইতিহাস লজিক সিভিক্স্ ইংরাজি তিনি সমান দক্ষতার সহিত পড়াইতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে বিমনা হইয়া ইতিহাস হইতে কাব্যে, কাব্য হইতে অর্থনীতিতে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। সেদিন লজিক পড়াইতে পড়াইতে তিনি সহসা চুপ করিয়া থাকিয়া অদূরে শুষ্ক বালুকাময় নদীটির দিকে চাহিয়া বলিলেন—জানো কল্যাণী, কোনও কবি ব'লেছেন যে মানুষের মন এক একটা দ্বীপের মত—অশ্রুর লবণাক্ত জলের প্রাচীরে একাকী। কথাটা আমার সত্যি মনে হয়—মানুষ সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা একাকী।

কল্যাণী প্রশ্ন করিল—কেন ?

—কারণ, মানুষ যেমন ক'রে যা চায় তা সে কখনই পায় না, —এই যে না পাওয়ার বেদনা এটা চিরন্তন, এই অতৃপ্তিই তাকে একান্ত একাকী ও নিঃসঙ্গ ক'রে তোলে—

কল্যাণী কিছু বুঝিল না, বুঝিবার মত বয়স তাহার হয় নাই। সে অবান্তর প্রশ্ন করিল—সবই কি এ জগতে না-পাওয়া থেকে যায়—

—হ্যাঁ, পৃথিবীতে কেউ তেমনি ক'রে আসে না, কারণ সে আসে তার মত ক'রে। তার তৃপ্তির দিকে চেয়ে তাই সে নিজেও থাকে নিঃসঙ্গ এবং যার কাছে আসে তাকেও করে নিঃসঙ্গ। ধর, তোমরা তোমাদের এই মাষ্টার মশায়কে চাইচ তোমাদের মনের মত ক'রে, আমি তোমাদের চাই আমার মনের মত ক'রে। এই দুই চাওয়া ত এক নয়, তাই সংঘাত, তাই অতৃপ্তি—

কল্যাণী না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল—কেন আমরা কি অবাধ্য হ'য়েছি—

রমেনবাবু বুঝিলেন, কল্যাণী তাঁহার কথার মর্ম্ম আদৌ বুঝে নাই ; তাই চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে একটা মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—থাক্ আজ, ওবেলা পড়িয়ে দেব।

এমন হঠাৎ পড়া বন্ধ হইয়া যাওয়ায় দুই ভাই-বোনই বিস্মিত হইল। বদমেজাজী রমেনবাবুর তুষ্টি কিসে হয় তাহারা তাহা বুঝে না। কল্যাণী রমেনবাবুর শুষ্ক ব্যথিত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—বড্ডো শীত না ? আর একটু চা নিয়ে আসি—

রমেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—আনো।

কল্যাণী চা লইয়া ফিরিল সঙ্গে সঙ্গে আসিল অনিতা। শূন্য চেয়ারে বসিয়া বলিল—মাছ যে পাওয়াই যাচ্ছে না—আপনার খেতে যে কষ্ট হবে, কি করি ?

রমেনবাবু হাসিয়া উঠিলেন ও অত্যন্ত অশোভনভাবে কহিলেন, —তুমি ভুলে গেছ অনিতা, আমি কি দিয়ে খাই তাই মনে থাকেনা। তা মাছ নেই এটা কি কেবল আমারই অসুবিধা হ'ল শেষ পর্য্যন্ত।

অনিতা হঠাৎ একটু যেন থতমত খাইয়া গেল। বলিল—খেয়ে ত সকলই যাবে, কিন্তু আমি হাতে করে দেব কেমন ক'রে।

—আমার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। না হয় পরীক্ষা ক'রে দেখ দু' একদিন উপবাস করিয়ে—

অনিতা হাসিয়া বলিল—তা ত জানি, কিন্তু সকলে ত আর উপোস ক'রতে পারে না।

কল্যাণী মাতাকে প্রশ্ন করিল—মা, তুমি ত ওঁর কাছেই আই-এ পর্য্যন্ত পড়েছিলে।

—প্রায়। তিনমাস পরে ত, পরীক্ষার সামনে চ'লেই গেলেন।

—মাষ্টার মশায় অমন হঠাৎ চলে গেলেন কেন? দেখবেন আমাদের ফেলে পালাবেন না।

অনিতা বলিল—বিশ্বাস নেই, হয়ত মাস খানেক বাদেই বলবেন চল্লুম—

রমেনবাবু বলিলেন—ভগবান্ না করুন, ও বিশ্বাস আমারও নেই। তবে কল্যাণী শেষ পর্য্যন্ত বেঁধে না ফেলে। জগতে যার কেউ নেই, সে সামান্য স্নেহেই বাঁধা পড়ে কিনা!

কল্যাণী ব্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিল—আমি কি করলুম?

রমেনবাবু হাসিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিলেন—পড়াতে পড়াতে বিমনা হ'য়েছিলাম। ও মনে ক'রলে আমার মন ভারী খারাপ হ'য়ে গেছে তাই চা' দিয়ে মনটাকে চাঙ্গা ক'রে তুলতে চাইল।

অনিতা হাসিল না—এমনি করিয়া চা' ও কথায় ভুলাইয়া সেত কতদিন তাহাকে আনন্দিত করিতে চাহিয়াছে। এই লোকটির চরিত্র এমনি যে এঁকে সেবা করিয়া যেন সকলেই তৃপ্তি পায়।

অনিতা কল্যাণীর উদ্দেশ্যে কহিল—আমার ত' দেখবার শুনবার সময়ই হয় না। তোমরা দেখো ওঁর যেন কোন অসুবিধা না হয়।

কল্যাণী হারানো প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ করিল—অমন হঠাৎ চলে যান কেন—মাষ্টার মশায়?

—যাই কেন? হঠাৎ যেমন ছুটি নিয়ে এসেছি এমনি হঠাৎ তোমাদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে যাবো। এর কারণ সম্ভবতঃ মনের উপর আমার এতটুকুও জোর নেই, কোন সংযম নেই, আপনার ইচ্ছাকে সংযত ক'রে অন্যের উপযোগী ক'রতে পারি না।

—কিন্তু আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না।

—রমেনবাবু আবার একটু হাসিলেন—অনিতাও একদিন এমনি বলিয়াছিল কিন্তু তাহাকে রাখিতে পারে নাই। অনিতা ব্যথিত হইল—তাহার মত কল্যাণীও হয়ত তাহাকে বাঁধিতে পারিবে না।

দ্বিপ্রহরে ঘুম হইতে উঠিয়া রমেনবাবু দূরের পানে চাহিয়া ছিলেন—

যৌবনের সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন দিনগুলির সহস্র স্মৃতি এই বাড়ীটার অঙ্গে শিশিরের মত টলমল্ করিতেছে। ওই আমলকী তলায় দাঁড়াইয়া অনিতা একদিন বলিয়াছিল—মেয়েরা কি শুধু অর্থই চায়! গাড়ী আর বাড়ী দেখেই বিয়ে ক'রে, তাদেরও হৃদয় আছে, হৃদয় চিনবার ক্ষমতা আছে। রমেনবাবু বলিয়াছিলেন—যতই থাক্ কিন্তু সে হৃদয়কে গাড়ীর মোহে তোমরা বিসর্জ্জন দিতে পারো—

সে যৌবন নাই, সে অনিতা নাই—তবুও রমেনবাবু সেই অতীতকে, নিজের যৌবনবাসনাময় মন ও অনিতার যৌবন-উচ্ছল দিনগুলিকে মনে মনে নিঃশেষে পান করিতেছিলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরিয়া বাহির হইয়া বার বার বলিতেছিল—এ সকলই ব্যর্থ, স্বপ্ন মাত্র:

কল্যাণী কখন আসিয়াছে তাহা তিনি জানেন না, হঠাৎ ফিরিতেই কল্যাণী প্রশ্ন করিল—কি এত ভাবেন দিনরাত?

রমেনবাবু হাসিলেন—এমনি নিঃশব্দে অনিতাও আসিয়া এমনি অশোভন প্রশ্ন করিত। বলিলেন—মানুষের ভাবনার কি পারাপার আছে? কত কথা ভাবি—

—আচ্ছা সিঁড়ির ওই জায়গা ভাঙলেন কেমন ক'রে ব'ললেন না ত?

রমেনবাবু বলিলেন—কারণ সামান্য, উপরের ওই ঘরে থাকতো মুরগী, একদা পলাতক এক মুরগীর প্রতি বৃহৎ লোষ্ট্র নিক্ষেপ ক'রে ও জায়গাটা ভেঙ্গে দিলাম।

কল্যাণী হাসিয়া উঠিল। বলিল—এই মাত্র?

—হ্যাঁ, অবশ্য সে ইটটা কে ছুঁড়েছিল তা আজও সমাধান হয়নি—তোমার মাও হ'তে পারেন।

—তার মানে?

—যুগপৎ আমরা ছুঁড়েছিলাম—কারটা এমনি যে দুর্দ্দৈব ঘটিয়েছিল তা বলা কঠিন।

কল্যাণী আবার হাসিল। রমেনবাবু কল্যাণীর কোমল মসৃণ শুভ্র হাতখানিকে স্পর্শ করিবার জন্য একটা আকুল আগ্রহ বোধ করিতেছিলেন—তাই হাতখানিকে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—তুমি মাঝে মাঝে এমন একা একা আমার কাছে এসে এসব প্রশ্ন কেন কর বল ত?

কল্যাণী আনত আঁখির দৃষ্টি রমেনবাবুর মুখের দিকে না তুলিয়াই বলিল—ইচ্ছে করে তাই।

—আমি বুড়ো মানুষ, আমাদের কাছে আসা ত তোমাদের বয়সের ধর্ম্ম নয়।

—ভাল লাগে তাই আসি—আপনি বিরক্ত হন?

—ছি ছি, তোমরা আমার কাছে আসবে এ আমার কত বড় আনন্দ তা জানো না তাই এ কথাটা বলে দুঃখ দিলে—যার মোহে আজ এখানে ফিরে আসতে হ'য়েছে তাকে পরিপূর্ণ ক'রেছ ত তুমি—নইলে এ ঘর দুয়ার হত তোগলকের পরিত্যক্ত দিল্লীর মত আবর্জ্জনাময়—

কল্যাণী সবিস্ময়ে বলিল—আমি?

রমেনবাবু জবাব দিলেন না।

কল্যাণী নানা প্রশ্নে ওই রহস্যাবৃত কথা কয়েকটির অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রমেনবাবু তাহার কোন উত্তর দিলেন না।

কল্যাণী মুখভার করিয়া দাঁড়াইয়া; কত কি ভাবিয়া যাইতেছিল।

রমেনবাবু বলিলেন—চল, বেড়াতে যাওয়ার সময় হ'ল।

সেদিন অনিতার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে রমেনবাবু অকস্মাৎ বলিলেন—আমার মনের কাছে তুমি এত পর হ'য়ে গেলে কেমন ক'রে তা বুঝতে পারি না!

—তার মানে?

—যতবার তোমার কথা মনে হয় ততবার তোমার এই দেহের দিকে চেয়ে মনে হয় এ তুমি নও। তোমার সেই ছাত্রী-জীবনের নীলাম্বরী-পরা দেহটির কথা মনে হয়—সেটি ছিল সঙ্গিনী, আজ তুমি যেন অত্যন্ত দূরের—কেন এমন হয়?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—মাঝে মাঝে কল্যাণীর দিকে চেয়ে মনে হয়, এই বুঝি তুমি—যাকে খুঁজতে দীর্ঘ বিশ বৎসর পরে এখানে আর একবার আসতে হ'য়েছে।

অনিতা হাসিয়া বলিল—আপনার এসব হেঁয়ালি ত বুঝতে পারি না। সেদিনও পারিনি, আজও পারিনা। শেষে কল্যাণীর মায়াবদ্ধ হবেন নাকি?

রমেনবাবু বলিলেন—কল্যাণী ব'লে না হোক্, তোমার মেয়ে ব'লে ত নিশ্চয়ই। তাই আজ ভাবি, গৃহ আমার ছিল, সন্তান আমার আছে, তা সত্ত্বেও এমনি ক'রে আমি এখানে ছুটে এসেছি কেন?

অনিতা বলিল—সে সব দু'দিনের সেই সামান্ত পরিচয়—একি ভুলতে পারলেন না ?

—না, পারলুম কৈ ? আচ্ছা অনিতা এ বাড়ীতে এসে থাকার কথা কি তোমার মনে হয়নি কোন দিন, কোন ক্ষেত্রে, কোন ঘটনায়।

অনিতা বলিল—তা হিসেব ক'রে আজ লাভ কি ? আর যদি মনে পড়েই থাকে, তবে তা আজ স্বীকার করা কি সঙ্গত হবে ?

রমেনবাবুর মনে পড়িল, আগে কথার ফাঁকে মাঝে মাঝে সে 'তুমি' বলিয়া ফেলিত আজ সে আপনি বলে এবং কখনও ভুল করে না। তিনি বলিলেন—লাভালাভ বিচার করিনি, তা হ'লে চাকুরীতে ছুটি নিয়ে এখানে আসতাম না।

—কিন্তু ভুলে যাওয়াই ত উচিত ছিল।

রমেনবাবু জবাব দিলেন না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আর একবার তোমাকে বলি, আজিকার তুমি আমার জীবনে অবান্তর। বিশ বছরের আগের 'তুমি'কে আমি খুঁজি তাই সম্ভবতঃ তোমার মেয়ে কল্যাণী আজ দুই বাহু দিয়ে দুর্ণিবার আকর্ষণ ক'রছে—

অজয় ও কল্যাণীর বাবা কলিকাতা হইতে কাল আসিয়াছেন, তাই আজ সারা রবিবার বাড়ীতে আহার ও বিহারের একটা উৎসব চলিয়াছে। অকারণেই রমেনবাবুর অন্তর আজ এত উৎসবের মাঝেও বিষণ্ণ হইয়াছিল। বৈকালে তাই একান্ত একাকী চুপে চুপে বেড়াইতে যাইতেছিলেন—

কিন্তু কল্যাণী তাহার বাবা ও মায়ের সম্মুখেই প্রশ্ন করিল—একা একা কোথায় যাচ্ছেন, মাষ্টার মশায় ?

—আজ ওই মাঠের দিকে যাবো—ও দিকটা যাওয়া হয়নি।

অজয়ের পিতা বলিলেন—ওদিকে ত রাস্তা নেই—যাবেন কি ক'রে ?

—রাস্তা নেই বলেই ত যাবো। এতদিন ওই কারণেই যাওয়া হয়নি।

কল্যাণী কহিল—আমিও যাবো বাবা।

পিতার সম্মতি পাইবার পূর্ব্বেই রমেনবাবু বলিলেন—তুমি যাবে কি ক'রে, রাস্তা নেই—শেষে আছাড় খেয়ে একটা কীর্ত্তি ক'রে ফেলবে—

পিতা ও মাতা একসঙ্গে বলিলেন—ইচ্ছে হয় যাও।

অতএব কল্যাণী আজ একাকী রমেনবাবুর সহিত চলিল, কিন্তু কল্যাণীর সঙ্গটী আজ রমেনবাবুর কাছে খুব আকাঙ্ক্ষিত নয়, তাই মৌনভাবেই তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন—

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সূর্য্যের প্রতিবিম্বিত আলো পৃথিবীকে সোনার রঙে রঙীণ করিয়া দিয়াছে। রমেনবাবু চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—কি সুন্দর, এস এই পাথরটায় বসি।

কল্যাণী রমেনবাবুর পাশে কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল, —আচ্ছা, আপনি সেই বিপদের আগে এখানে কোনদিন বেড়াতে এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ—এসেছি।

—সঙ্গে কে ছিল সেদিন, মনে আছে ?

রমেনবাবু বলিলেন—একদিন সম্ভবতঃ তোমার মা ও ছোট মাসি ছিলেন।

কল্যাণী সস্নেহে সযত্নে রমেনবাবুর হাতখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—আচ্ছা আপনি সেবার চলে গেলেন কেন ?

—কেন ? বলা বড় কঠিন। কেন গেলাম জানি না, তবে না গিয়ে পারি নি এই জানি।

—এবার কিন্তু যেতে পাবেন না কিছুতেই।

—কে আমাকে রাখবে ?

—কেন আমি ! কিছুতেই যেতে দেব না। আমাকে কি আপনি একটুও ভালবাসেন না যে আমার কথা রাখবেন না।

রমেনবাবু কল্যাণীর কাঁধের উপর সস্নেহে বাম হাতখানি রাখিয়া বলিলেন—ভালবাসি বলেই ত আমাকে চলে যেতে হয়, তা নইলে যুগযুগান্ত থেকে যেতে পারতুম তোমাদের এখানে—

—আমার এই শ্রদ্ধার কোন মূল্য কি আপনি দেবেন না ?

—সম্ভবতঃ পারবো না।

—আমাকে কি একটুও ভালবাসেন না—

রমেনবাবু হাসিয়া বলিলেন—অবশ্যই স্নেহ করি, যেমন তোমার মাকে একদিন ক'রেছি—আর তুমি তার মেয়ে বলে তোমাকেও আজ ক'রছি ; কিন্তু তা'তে ত যাওয়া আমার আট্‌কে থাকে নি। ওইটাই আমার জীবনের অভিশাপ।

কল্যাণী কথা বলিল না, অভিমানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রমেনবাবু সস্নেহে বলিলেন—আমি চ'লে গেলে কি তোমার খুব কষ্ট হবে, কল্যাণী।

—আপনি বুঝ্‌তে পারেন না ?

—পারি, কিন্তু তুমি আবার ভুলে যাবে। তোমার বাবা যেমন কাল যাবেন তোমার দুঃখ হবে, আবার তার পর তাঁর পুনরায় আসবার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রবে। আমরা ঠিক এমনি ক'রে এককে বিদায় দিয়ে অন্যকে খুঁজে ফির্‌ছি। তাই থাকা চলে না, আর থাকলে বিশ বছর বাদে আবার ঘুরে আর একবার এখানে আস্‌তে হবে।

—না হয় তাই আস্‌বেন।

রমেনবাবু হাসিয়া উঠিলেন। জোর করিয়া সমস্ত আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—চল, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, এর পরে পথ দেখা যাবে না।

কয়েকটি দিন রমেনবাবু অত্যন্ত বিমনা ও বিমর্ষভাবে কাটাইয়া অবশেষে অনিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন—আমাকে আবার যেতে হ'ল অনিতা, কাল সকালেই যাবো স্থির ক'রেছি।

অনিতা অজয় কল্যাণী সকলেই অনুরোধ করিল, কিন্তু রমেনবাবু শুধু দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—যেতেই হবে।

ক্রোধ-অভিমান স্ফুরিত অধরে কল্যাণী বলিল—কেন ? আমরা কি অপরাধ ক'রেছি যে আপনাকে যেতেই হবে—আর তাই যদি হয় তবে এসেছিলেন কেন ?

রমেনবাবু সস্নেহে তাহার কোঁকড়া চুলভরা মাথাটায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—মা লক্ষ্মী, কেন যেতে হবে তা তুমি বুঝবে না, কিন্তু যেতেই হবে। আমার উপর রাগ ক'রো না,—জগতে সকলেই ত বিবেচক ভাল মানুষ হয় না, কাজেই মন্দ বলে আমায় ভুলে যেও—

পরদিন সকালে—

প্রভাতের তপ্ত রৌদ্রে শীতার্ত্ত পৃথিবী সবেমাত্র আলস্য ত্যাগ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে; রমেনবাবু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গাড়ী ন'টায়।

বারান্দার উপরে অনিতা, অজয়, কল্যাণী দাঁড়াইয়াছিল—এই অকস্মাৎ প্রস্থান সকলকেই বিস্মিত ও ব্যথিত করিয়া দিয়াছে।

রমেনবাবু একটু হাসিয়া অনিতার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—অনিতা, তা হ'লে আসি, জানো ত এমনি ক'রেই আমাকে বার বার যেতে হয়—

অনিতা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল—জানি, যখন থাক্‌বেন না, তখন দুঃখ করা ছাড়া আর কি উপায় আছে!

রমেনবাবু সিঁড়ি দিয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন, কল্যাণী সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে গেট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যই যাবেন?

—হ্যাঁ। আমার যাওয়া বড় দুঃখের কল্যাণী, তা বুঝবে না তুমি। জগতে এমনি ক'রে বারবার ফিরে যেতে হয়, আবার আসতে হয়—

লোহার গেটটা ঠেলিয়া রমেনবাবু বার হইলেন। কল্যাণী গেটের অপরার্দ্ধের ওপাশে লোহার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল একটু ইতস্ততঃ করিয়া রমেনবাবু বলিলেন—আসি কল্যাণী।

কল্যাণী কম্পিত কণ্ঠে কহিল—সত্যই চলে গেলেন!

সঙ্গে মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু তাহার গণ্ডে নামিয়া আসিল—প্রভাতের কিরণ সম্পাতে শুভ্র গণ্ডের উপরে তাহা ঝলমল করিয়া উঠিল।

প্রবল চেষ্টায় আত্ম সংবরণ করিয়া রমেনবাবু কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। কল্যাণীর প্রতি আর একবার চাহিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলেন।

তাহার মনে পড়ে, বিশ বছর আগে ঠিক এমনি করিয়া এই কঠিন লোহার রেলিং ধরিয়া অনিতাও একদিন তাহাকে চোখের জলে বিদায় দিয়াছিল—আজ কল্যাণীও দিয়াছে।

অদূরের বারান্দায় অনিতা তখনও যে আর্দ্র চোখে তাহারই গমন পথের দিকে চাহিয়াছিল সে কথা রমেনবাবু জানিলেন না—জানিবার জন্য একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

দুর্দ্দমনীয় বেদনায় তিনি চলিতে লাগিলেন।

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ্-ডি

১০১৭ হইতে ১০৮৫ পর্য্যন্ত পুঁথি খণ্ডিত থাকায় আখ্যায়িকার আবার একটা বিরাট ছেদ পড়িয়াছে। ১০৮৬ পদে রাধা ও তাহার সখিগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন ও এই বিদায় মুহূর্ত্তে রাধার মুখে একটী সুন্দর আত্ম-নিবেদন-মূলক পদ আরোপিত হইয়াছে। ১০৮৯ পদে বলা হইয়াছে যে এবার বর্ষা-অভিসার শেষ হইয়া পরবর্ত্তী পদ হইতে জ্যোৎস্নাভিসার আরম্ভ হইবে। ১০৯২ পদে কৃষ্ণ একটী স্তুতি-মূলক পদে রাধিকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন ও এই পদের শেষার্দ্ধ মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১০৭৭ সংখ্যক খণ্ডিত পদের সহিত এক। ১০৯৪ (সংস্করণ ১০৭৯) পদে এই লীলা সমাপ্ত হইয়াছে ও পরবর্ত্তী পদে (বিঃ বিঃ ১০৯৫) গৌণরাস শেষ হইয়া মহারাস আরম্ভ হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পালা সংস্থাপন-রীতি বুঝিবার পক্ষে এই পদটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। তৎপূর্ব্বে মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে ১০৪৫—১০৫১ সংখ্যক পদে (৫১২—৫১৮) কৃষ্ণের স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে রাধিকার গৃহে দিবাভিসার। সেখানে উভয়ের লীলা-বিহার ও যমুনায় জল আনিবার উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে সঙ্কেত-বিনিময় ও স্ত্রীবেশধারী নায়কের সঙ্গে কদম্বতলে রাধিকার মিলন-প্রস্তাব—গৌণরাসের অন্তর্ভুক্ত আরও দুইটি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলি বনপাস পুঁথিতে থাকিলে তাহাদের ক্রমিক সংখ্যা সম্ভবতঃ ১০৬০—১০৬৬ হইত। দিবাভিসার, বর্ষাভিসার, জ্যোৎস্নাভিসার—এ সমস্ত একই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ও গৌণরাসের অন্তর্ভুক্ত তাহা সহজেই বুঝা যায়। গৌণরাসের মধ্যে প্রকৃত রাস বা মণ্ডলীনৃত্য সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছিল কি না, তাহা অনুমানের ব্যাপার। হইয়া থাকিলে ১০১৭—১০৫৯ পদের মধ্যে অনায়াসেই উহার স্থান নির্দ্দেশ করা যায়। মণীন্দ্রবাবু অনুমান করেন যে ১০৫১ পদে মিলনের যে সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে 'নাপিতানী বেশে মিলনের' মধ্যে সেই সঙ্কেত চরিতার্থ হইয়াছে। এই অনুমান ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। কেননা নাপিতানীর প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে 'তৈল হলদি'র কোন উল্লেখ নাই ও সঙ্কেত-নির্দ্দিষ্ট মিলনের স্থান যমুনা-তট, রাধিকার গৃহ বা বৃকভানুপুর নহে। ১০১৭ পদের পূর্ব্বে বিপ্রলম্ভরস আলোচিত হইয়াছে—সুতরাং ইহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েকটী পদে 'খণ্ডিতা' ও 'কলহান্তরিতা' রস বর্ণিত হইতে পারে, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে মহারাসের অন্তর্গত কতকগুলি বিষয়—যথা 'বংশী শিক্ষা', 'নিধু বনে কিশোরী রাজা' 'মুগ্ধরূপ' 'কুঞ্জর-লীলা' প্রভৃতি (৫৯২—৬২৬) গৌণরাসের মধ্যে যুক্তি-যুক্তভাবেই সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে।

১০৯৫ পদটী (মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণে ১০৮০) চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করে বলিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। মণীন্দ্রবাবু এই পদটীকে সম্পূর্ণ অবস্থায় পাইলে মহারাস ও গৌণরাসের মধ্যে তিনি যেভাবে পদ-বিভাগ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইত। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে পদটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল। প্রয়োজনীয় স্থলগুলি নিম্নে চিহ্নিত করা হইল।

কহিল এক গৌণরাস এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্মরাত্রি হয় তথি॥
ব্যাসের বর্ণনা অতি সে উপমা
মহারাস তার নাম।
এবে কহি কিছু স্থানের বর্ণনা
মহারাস অনুপাম॥
যদি বা কহিলে দ্বিরুক্তি বর্ণনা
পুন কেন আর রাস।
রসের উপরে অতএ বর্ণিল
শুনহ এ ইতিহাস॥

মহারাস কহি রসপোষ্টা লাগি
এই তত্ত্বকথা লীলা।
শুনহ ভকত রসিক সকল
এ তত্ত্ব গোপনে ছিলা॥
রসের চাতুর্য্য কেবল মাধুর্য্য
অতি সে রসের সার।
গৌণরাস পর এই অভিসার
বর্ণিল দ্বিতীয় বার॥
চৌষট্টি রসের ভোক্তার কারণে
নায়ক ভোক্তার গুণ।?
চণ্ডিদাস বলে এ সব মধুর
শুন মনোরথপুর॥ (১০৯৫)

ইহা হইতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি অনুমান করা যায়—

(১) ইতিপূর্ব্বে মূলতঃ ব্যাসদেবকে অনুসরণ করিয়া মহারাস আখ্যাত হইয়াছে। এবার স্থানের বর্ণনার উপর বিশেষ জোর দিয়া লীলাটী পুনরায় বর্ণনা করা হইতেছে। পরবর্ত্তী দুই পদে বৃন্দাবন-সৌন্দর্য্য ও রাস-মঞ্চের মণি-মাণিক্য-বিচ্ছুরিত দীপ্তি বর্ণিত হইয়াছে।

(২) দ্বিরুক্তি বর্ণনার অভিযোগ হইতে কবি আত্মপক্ষ-সমর্থন করিতেছেন। প্রথমবারের বর্ণনা ঘটনা-পারম্পর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—লীলার ক্রম অনুসারে আখ্যায়িকা মধ্যে ইহার স্থান নির্দ্দিষ্ট। এবার কেবল রসের দিক হইতে আলোচনা—বিবৃতির প্রয়োজন-শৃঙ্খলে ইহা আবদ্ধ নহে। দ্বিরুক্তি বলিয়াই এই দ্বিতীয় আলোচনা সংক্ষিপ্ত।

(৩) প্রথমবারে যাহা বর্ণিত হইয়াছে ও যাহাকে মণীন্দ্রবাবু ৬২৭—৬৭৫ পদে 'রাস-লীলা' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে মহারাস ও তাহার স্থান লীলা-পর্য্যায়ে অক্রূরাগমনের পূর্ব্বে। সুতরাং মান পর্য্যায়ের সমস্ত পদগুলি (৫৪৪ হইতে) প্রথম মহারাসে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। প্রথম মহারাসের উপলক্ষে কবি ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়ের উল্লেখ করিলেও তিনি যে খুব নিখুঁত ভাবে ভাগবতোক্ত কাহিনীর অনুসরণ করিয়াছেন ও ভাগবত-বহির্ভূত কোন পরিকল্পনাই কাব্য মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এইরূপ অনুমান কবির স্বাধীনতাকে অনুচিত ভাবে খর্ব্ব করে। সেইজন্য মনে হয় যে রাসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের ছদ্ম ঔদাসীন্যে নায়িকার মান এবং রাসের পর রাধার ও আর এক গোপরমণীর স্কন্ধারোহণের অসঙ্গত অনুরোধে নায়কের অভিমান ও অন্তর্দ্ধান—পরস্পরের পরিপূরক পরিকল্পনারূপে একই আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই দ্বিতীয়বার মহারাস বর্ণনায় পুঁথির প্রথম তিনটী পদ (১০৯৫—১০৯৭) মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের সহিত অভিন্ন (১০৮০—১০৮২)। ১০৯৮ পদটী পুঁথিতে নূতন সংযোজনা—বাঁশী শুনিয়া রাধার ব্যাকুলতা ও কৃষ্ণের প্রতি বংশী-সম্বরণের জন্য অনুরোধ। আখ্যায়িকার পরিণতির দিক দিয়া পদটী এই স্থানে ঠিক উপযোগী বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু রসপুষ্টি কবির উদ্দেশ্য হইলে ইহার সংস্থাপনে আপত্তিজনক কিছুই নাই। ১০৯৯—১১০০ পদ সংস্করণের সহিত এক (১০৮৩—১০৮৪)। ইহার পর পুঁথিতে যে তিনটী পদ আছে (১১০১—১১০৩), তাহা মণীন্দ্রবাবুর অনুমান-সিদ্ধ পদ-সংস্থাপন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কবি মুখবন্ধে যে পূর্ব্বাভাষ দিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহাই নিখুঁতভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। এখানে নায়িকার মান, নায়ক কর্ত্তৃক সেই মানভঞ্জন প্রভৃতি আখ্যান-বস্তু-বিস্তার মূল মহারাস হইতে পৃথক করা হইয়াছে। ১১০১ পদে নায়কের হর্ষোচ্ছ্বাস, নায়িকার প্রতি স্তুতি ও কুঞ্জগৃহে মাঙ্গল্যানুষ্ঠানের সহিত সখি কর্ত্তৃক উভয়ের বরণ। ১১০২ পদে যুগলরূপ বর্ণনা ও ১১০৩ পদে নূতন ছন্দে রাসনৃত্যের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-হিল্লোলের অভিব্যক্তি। বর্ণনার শেষাংশ এইরূপ :—

ঐছন করল পুনহি রাস
রসের উপরে এ অতি হাস
রসপোষ্টা লাগি পুন সে কহিল (?)
শুনহ শ্রবণ পাতিয়া।
আগে সে কহিল রসের রীত
এবে কহি শুন রসের চিত
কি রূপ-মাধুরী নাগর নাগরী
চণ্ডিদাস কহে মোহিয়া॥ (১১০৩)

'রসের রীত' অর্থ বোধ হয় আলঙ্কারিক রীত্যনুযায়ী ও ভাগবতের অনুসরণে ঘটনা-বহুল বর্ণনা; 'রসের চিত' অর্থে নাগর-নাগরীর হর্ষাপ্লুত, আবেশ-কণ্টকিত, মুগ্ধ-বিবশ মানসিক অবস্থা লক্ষিত হইয়াছে।

১১০৪—১১১৯ পদে 'স্বয়ংদূতী' অধ্যায়ে মানের অবতারণা ও মানভঞ্জনের পরে নর্ত্তক-রাস প্রবর্ত্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। মনে হয় যে পূর্ব্বে যে মানের পালা আখ্যায়িকা সূত্রে গ্রথিত হইয়া মহারাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখানে কবি তাহাকে পৃথক ও আখ্যান-নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি রাসের সঙ্গে মানের যে নিত্যসম্বন্ধ তাহা কবি প্রকারান্তরে আত্মসমর্থন-ব্যপদেশে স্বীকার করিয়াছেন।

কহিবে সবাই রাস আগে ভেল
পশ্চাৎ কেন সে মান।
এ চারি মান সে মান উপজল
শুন কহি বিদ্যমান॥
পরোক্ষে শ্রবণে কোন সখি দ্বারে
সাক্ষাৎ এ চারি হয়।
কখন কখন কোন কোন স্থানে
অভিমান অতিশয়॥
এই চারি মান যখন হৃদয়ে
পৈসয়ে হিয়ার মাঝে।
এই চারি যবে সমূহ হইলে
মানে হয় আন কাজ॥
তবে হয় শুন মান সে দুর্জ্জয়
কহিল মানের রীত।
চণ্ডিদাস কহে রসের চাতুরী
শুন হয়্যা এক চিত॥ (১১১৮)

অর্থাৎ রাস ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও কয়েকটী কারণে মানের উদ্ভব হয় ও এই কারণসমূহের সমাবেশে দুর্জ্জয় মানের উৎপত্তি। রাসের সহিত মানের সম্বন্ধের ইঙ্গিত অন্য এক স্থলেও পাওয়া যায়।

শরৎ পূর্ণিমা রাস রসে চিত
মুগধ রসিক রায়।
গোপিযূথ মিলি শ্যাম বনমালি
পুন রাস কৈল যায়॥
জাবটের এক গোপের রমণী
তার নাম হয় রাধা।
কৃষ্ণের বড়ই সেই সে প্রেয়সী
মরমে মরমে বাঁধা।
নব নিধুবনে মান অভিমানে
ভেল সে দুর্জ্জয় মান।
অনেক প্রকারে মান ভাঙ্গাইতে
দীন চণ্ডিদাস গান॥ (১১১২)

কৃষ্ণ নীলমুকুর লইয়া স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া রাধার মান ভাঙ্গাইতে আসিয়াছেন। তিনি আপনাকে বৃকভানুরাজা-প্রেরিতা দূতীরূপে পরিচিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণের রাস-সহচরী রাধানামে আর

এক প্রতিদ্বন্দ্বিনী গোপরমণীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত রাধা নীলমুকুরে নিজের পার্শ্বে কৃষ্ণের নবঘনশ্যামরূপ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া নায়কের ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও উভয়ে মিলিত হইয়া নর্ত্তক রাসের অভিনয় করিয়াছেন।

১১১৯ পদে বর্ত্তমান লীলা-বর্ণনার মধ্যে নিগূঢ় বৈষ্ণব ভক্তিরসের প্রাধান্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি পাওয়া যায়।

কমল মাধুরী সুধারসখানি
ভ্রমর তাহাই জানে।
রাধাকৃষ্ণ পদ রসের অমিয়া
পিবই ভকতগণে॥
কোন জন পাএ কোনজন লএ
খুঁজিয়া খুঁজিতে নারে।
কোন কোনজন ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
কত কত জন ফিরে॥
সাধক সাধিতে উপাসনা আদি
করয়ে ভকত-সঙ্গ।
কোন কোনজন কৃপা বল পায়্যা
ভুঞ্জয়ে রসের রঙ্গ॥
ঐছন কেহ সে পায়্যা মধুরস
খাইয়া বিলায় কত।
কেহ সুখে করি মধুর গাগরি
ভরিয়া রাখয়ে যুত॥
অষ্ট মুখ্য সখি আট রস হয়
আট আট গুণ হয়।
কোন রসে হয় নায়কের গুণ
টানয়ে এ অতিশয়॥

পদটীর উপর চৈতন্য প্রবর্ত্তিত প্রেম-ধর্ম্মের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।

১১২০—১১৩২ পদে হাস্যরসের অন্তর্গত বংশীহরণলীলা। ইহা ও পরবর্ত্তী জলকেলি, ঝুলন প্রভৃতিও রাসের আনুষঙ্গিক ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। নর্ত্তন রাসের পর নিদ্রায় অচৈতন্য কৃষ্ণের বাঁশী সখিরা লুকাইয়া রাখিয়াছে—তাঁহার ব্যাকুল অনুসন্ধানে বক্র, পরিহাসাত্মক উত্তর দিতেছে। বলিতেছে "বাঁশি হারাইয়াছে, ভালই হইয়াছে; আমরা এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিব।" চণ্ডীদাস তদুত্তরে বলিতেছেন:

"চণ্ডিদাস বলে এক বাঁশি গেল
আর বাঁশি আছে হোথা।
এ দুটি আঁখের চঞ্চল কোণেতে—
চোর পালাইবে কোথা॥ (১১২২)

বাঁশীর অবর্ত্তমানে কটাক্ষই স্বয়ং-দৌত্যের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কবিত্বপূর্ণ পদে বাঁশীর মহিমা বর্ণনা করিতেছেন।

"যদি বল তার শত ঠাঁই ছেদ
সেই সে তাহার গুণ।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার আছে রসসার
নিপুণ হইয়া শুন॥
রন্ধ্রে রন্ধ্রে কয় কিছু নাহি ভয়
সপ্ত রন্ধ্রে আছে সুধা।
মুরলীর গুণ একে একে কহি
শুন বিনোদিনী রাধা॥
যখন মুরলী তখন সেই সে
বাজয়ে কতেক তান।
ত্রিভুবন সখি (!) তরু-লতা-পাখী
কেহ সে না ধরে প্রাণ॥
দেবগণ সুখি শুনিতে শবদ
পুলকিত সবে রঙ্গ।
মৃত শাখাগণ মিলয়ে পল্লব
যোগীর ধেয়ান ভঙ্গ॥
মুনি ঋষিগণ রহে এক মন
যবে সে পায়এ রব।
যমুনার জল উজান বহয়ে
পাষাণ হয়এ দ্রব॥
বনের হরিণ করি এক মন
কাননে ফিরিয়া বুলে।
আকাশ-মণ্ডলে রবিরথখানি
সেহ সে নাহিক চলে॥
ব্রহ্মার ধেয়ান ভাঙ্গয়ে তখন
সুরাসুর আদি গণে।
শুনিলে এ ধ্বনি দেবের ঘরণী
পুলক করিয়া মানে॥ (১১২৮)

এই পদে যে কবিত্বশক্তির পরিচয় মিলে তাহা মোটেই তৃতীয় শ্রেণীর কবির বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

শেষ পর্য্যন্ত রাধা লুকান বাঁশী ফিরাইয়া দিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীর শক্তি পরীক্ষার জন্য আবার তাহাতে ফুৎকার দিলেন।

আষাঢ় শ্রাবণে মেঘ বরিষণে
তেমত দুর্ব্বার বয়।
আকর্ষণ কৈল অবলা পরাণে
ধৈরজ নাহিক রয়॥ (১১৩২)

শেষ পর্য্যন্ত অশেষ স্তবস্তুতি করিয়া শ্রীমতী কৃষ্ণকে বাঁশী বাজান হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন ও এইরূপে পালার উপসংহার হইল।

১১৩৩—১১৩৯ পদে জলকেলিবর্ণনা। এই ক্রীড়াতে নায়কের দুরবস্থা-বর্ণনাত্মক একটী ব্রজবুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। চণ্ডীদাসের সঙ্কলিত পদাবলীর মধ্যে ব্রজবুলি পদ খুব কমই দেখা যায়। কাজেই পদটী সেই হিসাবে কৌতুহলোদ্দীপক।

নব নব রঙ্গিণী প্রেম তরঙ্গিণী
পৈঠল সলিল গভীর।
ফেঁকত সলিল শত শত নিকর (? শীকর)
ডারহি আহীর সুধীর॥
সখি হে কি কহব আজুক রঙ্গ।
জল মাহে পৈঠল (?) কানু সমাগম
ভাগল শ্যামর চন্দ॥
তোড়ল বেশ বসন মলয়ানিল (?)
মৃগ মদ সৌরভ পঙ্ক।
ভাঙ্গল হি কাঁহা পড়ল তহি মালতী
গুঞ্জা-বরিহা আসঙ্ক॥
নয়ন কমল দল রাতুল লৌসর
কাঁহা গেল ফুলশর সাজ।
চরণক নূপুর কাঁহা গেএ সো দূর
মুরলী গড়্যায় তহি মাঝ॥
জলরস কেলি ভেলি সমর সুখ
আর কত বিথিরি (?) বিথার। (তুঃ রায় শেখর)
হরিকর হার পায়সু হাম নিজকর
কোথাহ চলল বাটপার॥
ধোঁয়ল সলিল সব হি সখি সঙ্গিনী
রঙ্গিণি চপল পরাণ।
পুন হি চলল সব গোপ রমণিগণ।
চণ্ডিদাস পরমাণ॥ (১১৩৭)

সখিগণের ব্যঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিয়া আবার জলযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং পরিশেষে রমণীরা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার ও শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিহারান্তে গৃহে ফিরিল।

ক্রমশঃ

সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মৈত্র

শরৎচন্দ্র ও তাঁহার সাহিত্য নিয়ে এই প্রবন্ধ লিখব না। সাধারণতঃ সাহিত্য জিনিষটা কি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত মত কি—মূলতঃ এই আলোচনা করারই ইচ্ছা। আমরা সকলেই জানি এক 'স্বদেশ ও সাহিত্য' ছাড়া শরৎচন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ লেখেন নি। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত বন্ধুদের নিকট অথবা কোন বক্তৃতায় কিছু কিছু ব্যক্ত করেছেন।

সাহিত্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর ভাবে দিয়াছেন—'অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।' আমরা সকলেই ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সংসারের যাবতীয় বস্তু দেখি, কিন্তু সেটিকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে আনতে গেলে চাই আর একটি জিনিষ—সেটি কল্পনা। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে কল্পনা শক্তির প্রয়োজন। কেবল বাস্তব সাহিত্য নয়। বাস্তবে আমরা যাহা প্রত্যহ লক্ষ্য করি, তাহা হয়ত সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য নয়। মোট কথা সংক্ষেপে বলতে গেলে সাহিত্য হচ্ছে বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণ। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'বাস্তব ও কল্পনার মাঝে একটি মরু রেখা আছে—সেটি হচ্ছে সাহিত্যের পথ।' বাস্তব থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে কল্পনার আশ্রয়ে তিনি যেটা সৃষ্টি করেন সেইটাই সাহিত্য। তাই একবার তিনি বলেছিলেন—'অন্ত লেখকদের যা বিপদ—প্লট না পাওয়া—সেই প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনোদিন চিন্তা করতে হয় নি। জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি—দেখেছি, তাদের মধ্যে অনেক কিছুই—সেগুলো নিয়েই আমার সাহিত্য।' এই প্রসঙ্গে Hudson সাহেবের একটা কথা মনে পড়ল—'Literature is a vital record of what men have seen in life, what they have experienced of it, what they have thought and felt about those aspects of it, which have the most immediate and enduring interest for all of us. It is thus fundamentally an expression of life through the medium of language.'

সাহিত্য সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিমত কি? একবার কাশীতে শ্রীযুক্ত কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি একটি কথা বলে ছিলেন—'লেখার মধ্যে উচ্ছাস না বাড়ানই ভাল—ওটা বক্তাদের মুখেই থাক।' তার মানে তিনি বলতে চান যে, সাহিত্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে—সংযম। তাঁর নিজের বিষয়ে বড় মনোরম কথা তিনি বলেছিলেন—'ঐ আমার মূলধন সাহিত্যের। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ আর পরীক্ষণ করে বাস্তবটাকে আমি আয়ত্ত করি। তারপরে তারই অনুপাতে আদর্শকে ধরি; ওটার গরমিলে গল্প বড় অসঙ্গত হয়। আর শেষ হয় পরিশ্রম। সেখানে আমি কোনোদিন কুড়েমি করি না। আমার কথার লোভ নেই, আইডিয়ার মোহ নেই, শুধু কঠোর সংযম। একটাও বেশী কথা বলিনে; একটাও বে-ফাঁস কথা ঢুকতে দিই না। দরকার হলে কি পছন্দ না হলে পাতাকে পাতা উড়িয়ে দিতে কোন দরদ নেই—নিজের লেখার ওপর নির্দ্দয়তার শেষ নেই আমার।' শরৎ-সাহিত্যের মূলকথা—বোধহয় সকল সাহিত্য সম্বন্ধে এই কথা বলা চলে।

অনেকে বলেন শরৎচন্দ্র খাঁটি বস্তুতন্ত্রবাদী (Realist) এবং বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শবাদী (Idealist). এই যুক্তির অসারতা প্রমাণ করতে গেলে এ কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, আদর্শ ও বস্তু না মিললে যথার্থ সাহিত্য হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে Realist ও Idealist শ্রেণীবিভাগ করা যায় না।

আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটা অ[illegible]ক কৌতূহল জাগে, সত্যিই কি শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক আছে? অনেকে অনেকবার তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। একবার তাঁর মাতুল সাবিত্রীর চরিত্র সম্পর্কে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন, শরৎচন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন—'মানুষটা সত্যি: ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ওর ভাল জানি, মন্দ জানি। ও কি ভাবে জানি; ও কাকে পছন্দ করে জানি। ও মানুষের ঐশ্বর্য্যের কোন তোয়াক্কা রাখে না—ও গরীবের মধ্যে সত্যি থাকলে বেছে নিতে পারে। এই গুলো সব বাস্তব, আর ওর চরিত্রের উপকরণ: মেসের বাসায় নিয়ে যাওয়া এবং সতীশের সঙ্গে এক করে দেওয়া—ওটাই লেখকের গল্পসৃষ্টির কেরামতি। যাকে বলে সিচুয়েশন। যদি একটা মেসের ঝি একটা বড়লোকের ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, এই আমার গল্প হতো, তাহলে হয়ত তা বাস্তব হত। কিন্তু ওটাকে আমি সাহিত্য বলতে রাজী নই। আর্ট ফর আর্ট আমি মানিনে। বাস্তব ও আদর্শের মাঝামাঝি পথ সাহিত্যের পথ। সেটাকে ধরতে পারা নির্ভর করে, লেখকের প্রতিভার ওপর। ওখানে সহজে সন্তুষ্ট হলে চলবে না। ঐখানে যে যত ধৈর্য্য ধরে আদর্শকে সত্যের স্বরূপে রূপান্তরিত করতে পারে—সেই তত বড় আর্টিষ্ট...'

সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা আমাদের মেনে নিতে হবে। 'সংযম' সাহিত্যের প্রধান জিনিষ। এই সংযমের অভাবে অনেক বড় লেখক সত্যিই বড় আর্টিষ্ট হতে পারেন না। তাঁরা 'আর্ট ফর আর্টস্ সেকের' পূজারী। সুতরাং 'সংযম' তাঁদের মানতে গেলে চলবে না। তাঁরা চান লেখার মধ্যে স্বাধীনতা—অথচ এটুকু তাঁরা বুঝতে পারেন না যে স্বাধীনতার চাপে আসল রসবস্তুটা চাপা পড়ে যায়। তাই তিনি একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন—'আধুনিক সাহিত্যিকদের অধিকাংশ সাহিত্যে—রস থাকে না, গ্লানি থাকে।'

আধুনিক সাহিত্য যা গড়ে উঠছে সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র একবার স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছিলেন—'গত কয় বৎসর তরুণদের সকল লেখা পড়ে আমার যে ধারণা হয়েছে, তাতে তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ এই যে, তাঁরা প্রকৃত রসবস্তু কি তা লিখতে চেষ্টা করুন। অবশ্য তাঁদের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী খুব উঁচুদরের। আমার ত মনে হয়, আমাদের অনেকের চেয়ে এঁদের লেখার ভঙ্গী ঢের ভাল। কিন্তু তাঁদের সাহিত্যে রসবস্তু না থাকলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাঁদের সংযমের সীমা অনেকখানি উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, যে সাহস দেখালে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেদিকে সাহস দেখালেই এঁদের বীরত্ব প্রকাশ পেত। কিন্তু তা হচ্ছে না—যেন অনেকটা জেদের বশেই তরুণেরা সাহিত্য রচনা করেছেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে তাঁরা সীমা অতিক্রম করে গেছেন।'

আশাকরি তরুণ সাহিত্যিকগণ এই কথাগুলো স্মরণ করে ভবিষ্যতের পথ বেছে নেবেন।

বনফুল

৩৪

অনিল ও নীরা বসাক, মৃন্ময় ও হাসিকে লইয়া শঙ্করের কয়েকদিন বেশ কাটিয়া গেল অর্থাৎ এ কয়দিন উহাদের লইয়া শঙ্কর নিজেকে বেশ ভুলিয়া রহিল। ইহার পূর্ব্বে ভুলিয়াছিল ছবিকে লইয়া। সহসা সে আবিষ্কার করিল কোন কিছু লইয়া নিজেকে ভুলিয়া থাকিবার উপলক্ষ পাইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়, তা' সে উপলক্ষ যতই না কেন তুচ্ছ হউক। বস্তুত কিছুদিন হইতে এই উপলক্ষই সে যেন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে লোকনাথবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণ করে, নিপুদার সহিত সোৎসাহে কমিউনিজম-বিষয়ক আলোচনায় যোগ দেয়, যেখানে-সেখানে সভাপতিত্ব করিতে ছুটিয়া যায় কেবল অন্যমনস্ক হইয়া থাকিবার জন্য। যে প্রশ্নটা কিছুদিন হইতে বারম্বার তাহার মনে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে, যে প্রশ্নের তীক্ষ্ণতায় তাহার সমস্ত অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, যে প্রশ্নের সদুত্তর সে কিছুতেই নিজেকে দিতে পারিতেছে না—সেই দুরূহ প্রশ্নটাকে এড়াইবার জন্যই সে বাহিরের একটা-কিছু লইয়া মাতিয়া থাকিতে চায়। লোকনাথবাবুর প্রবন্ধ মনোহারী, নিপুদা'র সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিয়া আনন্দ আছে। নীরা বসাকের প্রশংসা মাদকতা-ময়, সাহিত্য-সভার হাততালি শিরা-উপশিরায় উন্মাদনা-সঞ্চার করে—সবই ঠিক—কিন্তু কেবল ওই সব কারণেই সে যে উহাদের লইয়া উন্মত্ত হইয়া ওঠে তাহা ঠিক নয়। সে নিজেকে ভুলিয়া থাকিতে চায়, নিজের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া বাহিরের ভীড়ে আত্মগোপন করিতে চায়, নিজের মনের অনিবার্য্য প্রশ্নটাকে বাহিরের কোলাহলে নীরব করিয়া দিতে চায়। তাহার একা থাকিতে ভয় করে।

অনিলের চাকরি হইয়া গিয়াছে। তিন আইন অনুসারে নীরা বসাকের সহিত তাহার বিবাহও হইয়া গেল। উপস্থিত হাতে উত্তেজক কোন কাজ নাই। এমাসে 'সংস্কারক' পত্রিকার কাজও যাহা ছিল তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। আপিস হইতে শঙ্কর বাড়ি ফিরিতেছিল। সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নটি সহসা শতমূর্ত্তি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। ইহার নাম কি সাহিত্য-সাধনা? আর যদি সত্যই সে সাধনা করিবার সুযোগ পাও তাহা হইলেই বা কাহার কতটুকু উপকার করিতে পার? বড় জোর তাহা কতকগুলি প্রকৃষ্টমনা ব্যক্তির মানসিক বিলাসের উপকরণ যোগাইবে। কিন্তু তোমার যে উদ্দেশ্য ছিল দেশ-সেবা করা? দেশের উন্নতি-কল্পেই একদা তুমি চরকা ঘাড়ে করিয়াছিলে, চরকা ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞান পড়িতে গিয়াছিলে, বিজ্ঞান ছাড়িয়া এখন সাহিত্য-সেবা করিতেছ। ইহাই কি সেই সাহিত্য-সেবার নমুনা? তোমার ও সাহিত্য কয়টা খাজনা-পীড়িত কৃষকের দুঃখমোচন করিবে, কয়জন নিরন্নকে আহার জোগাইবে, কয়জন রোগীর ঔষধ-পথ্যের সংস্থান করিবে, কয়জন অশিক্ষিত ব্যক্তির সুশিক্ষার সহায়ক হইবে, কয়জন দুঃখীকে সুখী করিবে? তুমি বলিতেছ আধিভৌতিক নয়, আধ্যাত্মিক দুঃখ-মোচনই উহার উদ্দেশ্য। তাই যদি হয় বলিতে পার, তোমার এ সাহিত্য দেশের কয়জনের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? ইহা কয়জনের আত্মগোচর হইতে পারে? যে দেশের শতকরা পাঁচজনের শুধু অক্ষর-পরিচয়-মাত্র আছে সে দেশের কয়জন সাহিত্য-রস পান করিতে সক্ষম? যাহারা সক্ষম তাহারাও কি তোমার ও সাহিত্যের ভাষা বোঝে? ও সাহিত্যের ভাব-বিলাসের সহিত কি তাহাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে? দেশ-সেবার অজুহাতে তুমি যাহা করিতেছ তাহা আত্ম-রতি-মাত্র। তুমি এবং তোমার মতো ভাব-বিলাসী কয়েকজন পরস্পর আত্ম-প্রশংসা করিবার অছিলায় মিথ্যা মায়ালোক সৃজন করিয়াছ, তাহার সহিত দেশের জনসাধারণের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহাদের ছোটলোক বল, তাহারা তাড়ির আড্ডায় বসিয়া যাহা করে তোমরাও তোমাদের সাহিত্য-সভায় বসিয়া তদপেক্ষা মহত্তর কিছু কর না। তাহাদেরও উদ্দেশ্য চিত্ত-বিনোদন তোমাদেরও উদ্দেশ্য তাই। চিত্ত-বিনোদন করিতে বসিয়া তাহারাও গালাগালি মারামারি চীৎকার করে, ভিন্ন ভাষায় তোমরাও তাহাই কর। ইহার সহিত দেশের অথবা দশের কোন সম্পর্কই নাই—ইহা নিতান্তই তোমাদের গোষ্ঠিগত ব্যাপার। যাহারা তোমাদের গোষ্ঠির লোক—সাহিত্য-সম্পৃক্ত হওয়াতে তাহারাই বা কি এমন মহত্তর ব্যক্তি হইয়াছে? তাহাদের জীবনের কতটা আধ্যাত্মিক সুখ-সাধন করিয়াছ? কতটা দুঃখমোচন সম্ভব হইয়াছে? তোমাদের দলের সকলেই তো দুঃখী। শুধু তাই নয় সাধারণ সামাজিক মানদণ্ড দিয়া বিচার করিলে অধিকাংশই পাপিষ্ঠ নরাধম। ছবি, প্রফেসার গুপ্ত, লোকনাথ ঘোষাল, নিলয়কুমার, নীরা বসাক, নিপুদা, চণ্ডীচরণ দস্তিদার, হীরালাল মজুমদার, সে নিজে অর্থাৎ সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট যাহারা—তাহারা একজনও কি মনুষ্য-হিসাবে শ্রদ্ধেয়? তবে? সে যে কয়জনকে জীবনে সত্যসত্যই শ্রদ্ধা করিতে পারিয়াছে তাহাদের কাহারও তো সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সহসা তাহার স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত ধরণীধর ভট্টাচার্য্যকে মনে পড়িল। তিনি, মুকুজ্যে মশাই, বেলা মল্লিক, ভন্টুর বৌদি, মৃন্ময়, হাসি, তাহার নিজের বাবা—ইঁহারা কেহই সাহিত্যের স্রষ্টা বা সমজদার হিসাবে উল্লেখযোগ্য নহেন।

বহুদিন পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে চরকা ও খদ্দর প্রচার করিতে করিতে তাহার যেমন মনে হইয়াছিল যে সে ভুল-পথে চলিতেছে —তাহার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়িতে পড়িতে সে যেমন উপলব্ধি করিয়াছিল যে বিজ্ঞানের পথ তাহার পথ নহে— সাহিত্যের পথে চলাই তাহার পক্ষে শ্রেয়, সাহিত্যের পথেই সে দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারিবে—আজও তেমনি আবার অনিবার্য্যভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল—'দেশের দুঃখ ঘুচাইব' ইহাই যদি তাহার জীবনের আদর্শ হয় তাহা হইলে সাহিত্যের পথও ভুল পথ। অন্যান্য নানারূপ বিলাসের মতো ইহাও একরূপ বিলাস।

"আরে—কে শঙ্কর না কি—"

চলন্ত ট্রাম হইতে যে ব্যক্তিটি লাফাইয়া নামিল তাহাকে সে এ সময়ে এখানে মোটেই প্রত্যাশা করে নাই।

উৎপল বম্বে হইতে কবে আসিল!

৩৫

শঙ্করের উচ্ছ্বাসহীন প্রশংসা নিপুকে প্রতারিত করিতে পারে নাই। নিপু বুঝিয়াছিল ওই কয় ছত্র মামুলি সমালোচনার মূল্য কি এবং অর্থ কি। মুখে কিছু বলিতে না পারিলেও সে মনে মনে জ্বলিতেছিল। সে জ্বালা আরও বাড়িয়া গেল যখন দৈনিক কাগজগুলি শঙ্করের গুণগান করিয়া সাড়ম্বরে তাহার অভিভাষণটি বাহির করিল। অভিভাষণে যাহা ছিল তাহা সুরুচিসঙ্গত সাহিত্যিক আলোচনা। শাশ্বত সাহিত্যের লক্ষণগুলির বিচার এবং বাংলা সাহিত্যে তাহাদের প্রকাশ লইয়া আনন্দ অথবা অভাব লইয়া দুঃখ। নিরপেক্ষ যে কোন সাহিত্যিকের নিকট অভিভাষণটি নিঃসন্দেহে উপাদেয়, কিন্তু নিপুর মনে হইল উহা তৃতীয় শ্রেণীর চর্ব্বিতচর্ব্বণ। উহাতে নূতন কথা কি আছে! মানবের ইতিহাসে যে নব-যুগ সূচিত হইতেছে, রুষ দেশের জার-প্রপীড়িত জনসাধারণ সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য বিদ্রোহ করিয়া পুরাতন বিধিবিধান উল্‌টাইয়া দিয়া যে বৈজ্ঞানিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে শঙ্করের অভিভাষণে তাহার কিছুমাত্র আভাস নাই। সুতরাং উহা বাজে। শাশ্বত সাহিত্যের সনাতন বুলি অনেকবার অনেক লোকের নিকট শোনা গিয়াছে, উহা শুনিবার আর প্রবৃত্তি নাই। মানবের অগ্রগতির, মানবের আধুনিকতম প্রতিভার নব জয়যাত্রার বাণী যদি শুনাইতে পার তবেই তাহা শ্রাব্য। রুশদেশের সহিত আমাদের দেশের মিল আছে। রুশদেশ কৃষিপ্রধান, আমাদের দেশও কৃষি-প্রধান। তাহারাও একদিন ঠিক আমাদেরই মতো দুর্দ্দশাপন্ন ছিল। আমাদেরই মতো নিরক্ষর, আমাদেরই মতো রোগে অনাহারে জীর্ণ, ঋণভারে করভারে প্রপীড়িত। আমাদেরই মতো তাহারা ধীরে ধীরে লয় পাইতেছিল, যে সঞ্জীবনী মন্ত্রে তাহারা পুনর্জ্জীবন-লাভ করিয়াছে আমাদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষা-লাভ করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্যে সেই মন্ত্রের ধ্বনি যে কবির বীণায় ঝঙ্কৃত হইবে সেই নব-যুগের কবি।

ঠোঁট বাঁকাইয়া নিপু যাহাদের নিকট বক্তৃতা করিতেছিল তাহারা সকলেই তরুণ বয়স্ক, সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী এবং রুশ-সাহিত্যে কৃতবিদ্য। প্রায় সকলেই বেকার, সকলেই উচ্চাকাঙ্খী, সকলেরই নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা এত অত্যুচ্চ যে সে উচ্চতার নিকট হিমালয়ও হীন হইয়া যায়, সকলেই স্বদেশ-হিতৈষী এবং সকলেরই ধারণা যাহা করিলে স্বদেশের হিত হয় তাহা কেবল তাহাদেরই জানা আছে, অপরের নয়। দেশের নিকট যাহারা স্বদেশ-হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত, স্বদেশের মুক্তির জন্য যাঁহারা জীবন ব্যাপী সাধনা করিয়াছেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—ইহাদের মতে তাঁহারা ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিহীন। নূতন যুগের নূতন প্রেরণার খবর রাখেন না। এরোপ্লেনের যুগে গরুর গাড়ির জয়গান করিয়া বেড়ান। তাঁহারা অধিকাংশই ক্যাপিটালিষ্ট অথবা পেটি বুর্জোয়া। তাঁহারা যাহা করিতেছেন অথবা বলিতেছেন তাহা ক্যাপিটালিজম্‌-গন্ধী, তাহাতে সমগ্র দেশের উপকার হইবে না, তাহা মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, শ্রমিকদের অথবা কৃষকদের নয়।

তাই ইহারা নূতন করিয়া দেশকে গঠন করিতে চায়। সাহিত্য যেহেতু লোকশিক্ষার প্রধান বাহন এবং সংবাদপত্র যেহেতু জনমত গঠন করে সেই হেতু ইহাদের সকলেই প্রায় সাহিত্য অথবা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে ব্যগ্র। ইহাদের নিজেদেরও সাহিত্য-পত্রিকা আছে যদিও তাহার প্রচার খুব কম, কারণ লোকে যে রসের লোভে সাহিত্য-পত্রিকা কেনে ইহাদের পত্রিকা সে রসে বঞ্চিত। ইহাদের পত্রিকা 'থিওরি' প্রচার করে কিন্তু তাহা সাহিত্য হইয়া ওঠে না। নিপুর যুগান্তকারী উপন্যাসটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা নিপুকে নেতৃত্বে বরণ করিয়াছে। যে নিপুকে আত্মীয়-স্বজন কেহই কোনদিন আমোল দেয় নাই, হিরণদা'র 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সম্পর্কে আসিয়াও যে কিছুতেই নিজেকে পাদ-প্রদীপের সম্মুখীন করিতে পারে নাই (কোথাকার অজ্ঞাতকুলশীল শঙ্কর আসিয়া যেখানে আসর জমাইয়া বসিল)—সেই নিপু নিজেকে সহসা একটা দলের শীর্ষভাগে দেখিয়া মনে মনে ভারি একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। কিন্তু ঠোঁট বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া সে এমন একটা ভাবপ্রকাশ করিতেছিল যাহা তাহার প্রকৃত মনোভাবের বিপরীত। ভাবটা এই যে—আঃ, তোমরা আমাকে এ কি বিপদে ফেল্লে! আমি তো এসব চাইনা—আমি চাই নির্জ্জনে অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিয়া মন্ত্রের সাধনা করিতে—আমি সামান্য কেরাণী বটে কিন্তু আমি তপস্বী।

শঙ্কর সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল। একজন বলিল, "লোকনাথবাবুর মতো একটা জ্ঞানী লোক শঙ্করবাবুর পিছনে আছেন বলেই ওঁর সাহিত্য-সমাজে যা কিছু প্রতিপত্তি।" আর একজন বলিল, "কাল কিন্তু লোকনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি দেখলাম শঙ্করের উপর একটু চটেছেন, বেশ একটু অপ্রসন্ন মনে হল—"

"তাই না কি।"

সংবাদটাকে নিপু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

"তাহলে চল না লোকনাথবাবুকে দিয়েই শঙ্করের অভিভাষণের একটা স্কেদিং সমালোচনা লেখানো যাক্। কণ্টকে নৈব কণ্টকম্—"

একজন ভক্ত বলিল—"লোকনাথবাবু কি আপনার মতো লিখতে পারবেন?"

"আমি নিজের নাম দিয়ে ওটা আর লিখতে চাই না।"

সদলবলে সকলে লোকনাথবাবুর বাসায় গিয়া হাজির হইল। লোকনাথবাবু বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। নিপুকে দেখিয়া সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলেন—"শঙ্করবাবুর অভিভাষণটা পড়েছেন? চমৎকার হয়েছে। আমি যাচ্ছি তাকে অভিনন্দন জানাতে—এতটা আমি আশা করিনি—"

নিপুকে হতাশ হইতে হইল। সদলবলে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"যাবেন আপনি?"

"না। আমার অন্য কাজ আছে একটু এখন"

"আমি চললাম তবে"

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। শঙ্করের অভিভাষণ পড়িয়া সাহিত্য-প্রেমিক লোকনাথ ঘোষালের মনের সমস্ত গ্লানি কাটিয়া গিয়াছিল।

নিপু সেই ছোকরাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঁরা সবাই পেটি বুর্জোয়া। আমাদের সঙ্গে ওঁদের সুর মিলতেই পারে না"

ঠিক হইল অভিভাষণের স্কেদিং সমালোচনা নিপুই লিখিবে, কিন্তু বেনামীতে।

স্কেদিং সমালোচনাটা লিখিতে বসিয়া নিপু কিন্তু প্রথমটা একটু বিপদে পড়িল। শঙ্করের অভিভাষণটা পুনরায় আগাগোড়া পড়িয়া তাহার মনে হইল—কিসের বিরুদ্ধে সে সমালোচনা করিবে। শঙ্কর যাহা লিখিয়াছে তাহা এতই যুক্তিযুক্ত, তাহার ভাষা এতই জোরালো এবং ভঙ্গী এমনই চিত্তাকর্ষক যে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে ভদ্র অন্তঃকরণ স্বভাবতই একটু সঙ্কুচিত হয়। হাজার হোক, সে একদিন 'ক্ষত্রিয়'-দলের একজন সমঝদার সভ্য ছিল তো—সাহিত্য-স্রষ্টা না হইলেও অন্তরের অন্তস্তলে সে সুসাহিত্যের রসগ্রাহী, মুখে তাহা স্বীকার করুক আর না করুক।

অনেকক্ষণ সে কলম হাতে করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবন্ধ ত্যাগ করিয়া তাহার চিন্তা অতীতে ফিরিয়া গেল। হিরণদাকে মনে পড়িল। বড়লোকের খাম-খেয়ালী ছেলে হিরণদা, পিতার সঞ্চিত অর্থ-ব্যয় করিয়া নানারূপ খেয়াল চরিতার্থ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা বাহির করিয়াছিল এবং তাহারা (সে নিজেও তাহাদের মধ্যে একজন) ওই উচ্ছৃঙ্খল বড়লোকের ছেলেটার তোষামোদ করিবার জন্য বিদূষক-বেশে তাহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়াছিল। সমঝদার হিসাবে ততটা নয়, যতটা নিজের নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির আশায়। হিরণদা' দিলদরিয়া লোক ছিলেন। কখনও কাহাকেও একটুকরা রুটি ছুঁড়িয়া দিয়া, কখনও কাহারও পিঠ চাপড়াইয়া, এমন কি কখনও কাহারও মদের খরচ জোগাইয়াও তিনি তাহাদের অনেককে মাঝে মাঝে অনুগৃহীত করিতেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুগ্রহ করিয়াছিলেন শঙ্করকে। কারণ, শঙ্করই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পদলেহী ছিল। লেখা ব্যাপারে যতটা না হোক লেহন-ব্যাপারে সে সত্যই একজন বড় আর্টিষ্ট। বেশী কথা না বলিয়াও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খোসামোদ করিতে পারে, তাহার গালাগালির মধ্যেও খোসামোদ প্রচ্ছন্ন থাকে। শাঁসালো ব্যক্তির খোসামোদ করাই তাহার পেশা। ইদানীং শঙ্কর যে সব পুস্তক অথবা প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছিল তাহা নিপুর মনে পড়িতে লাগিল। প্রত্যেকটি সমালোচনায় খোসামোদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, এমন কি যাহাদের পুস্তকের বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছে তাহাদেরও এক অদ্ভুত উপায়ে খোসামোদই করিয়াছে, তাহাদের অন্তরঙ্গ হিতৈষী সাজিয়া কটুভাষণের অন্তরালেই তাহাদের তুষ্টিবিধান করিতে চাহিয়াছে। নিপুর বইটার যে এই ছদ্ম-প্রশংসা করিয়াছে ইহা তাহার ওই হীন মনোবৃত্তিরই পরিচয়। ভালই যদি না লাগিয়াছিল সোজা ভাষায় গালাগালি দিলেই পারিত—তাহাতে বরং ন্যায়-নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত। কিন্তু এ কি!

সহসা নিপুর মনে হইল ইহাই পেটি বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, ইহারা ক্ষমতাবান লোকদের স্তুতি করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে চায়। ইহারা ক্ষমতাবানের খোসামোদ করিয়া অক্ষমের উপর তাহার প্রতিশোধ লয়। খোসামোদ করিতে পারে না বলিয়া নিপুর এই দুর্দ্দশা।

সহসা তাহার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল।

সে লিখিতে সুরু করিল। ক্রমশঃ

রাশিয়ায় খনিজ সম্পদের ক্রমবিকাশ

শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্তরায় এম-এস্‌সি, ডক্‌টর অফ্‌-এঞ্জিনিয়ারিং

(২)

১৯১৮-১৯২৯ সন :—১৯১৭ সনের বিপ্লবের পর শিল্প-বিকাশ একেবারেই ধ্বংসের মুখে চলে যায়—কিন্তু ১৯১৮ সনেই স্রোত বইল উল্‌টোদিকে। নূতন সোভিয়েট্ গবর্ণমেণ্ট শিল্পের উন্নতির জন্য, শিল্পের পুর্নগঠনের জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠ্‌লো। প্রথমেই ভূ-তত্ত্ব-বিভাগ থেকে খনিজ সম্পদের সঠিক্ তথ্য ও বর্ণনা সংগ্রহ করা হল। ভূ-তত্ত্ব-বিভাগের কাজের চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। আট-দশ বৎসরের মধ্যেই তার কাজ-কর্ম্মের অসম্ভব রকম প্রসারণ হ'ল। ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ্ আহরণের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে তাহা সরবরাহের জন্য নূতন নূতন বিভাগ ও কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হ'ল। মাত্র দশ বৎসরে (১৯২৮ সনে) রাশিয়ার ভূ-তত্ত্ব-বিভাগ জগতের দরবারে তার প্রকৃত আসন ঠিক্ কোরে নিল। সোভিয়েট্ গবর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে কর্ম্মীর সংখ্যা ও বার্ষিক ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়িয়ে দিয়েছেন।

বৎসর	কর্ম্মীদল সংখ্যা	বরাদ্দ টাকা	
১৯২৫-২৬	৩০৯	৪৩৮,০০০	পাউণ্ড
১৯২৬-২৭	৩৮৯	৭২০,০০০	,,
১৯২৭-২৮	৬২৮	১,০৫০,০০০	,,
১৯২৮-২৯	৬৭৮	১,৩৫৯,০০০	,,

পুনর্গঠন :—কভালোফ্ তাঁর "পুনর্গঠিত রাশিয়ায় ভূ-তত্ত্ব-কমিটির কার্য্য-কলাপ" নামক প্রবন্ধে লিখেছেন "প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৩২-৩৩ সনের বরাদ্দ ব্যয় ধার্য্য হয় ৫,৯১৮,০০০ পাউণ্ড, আর মোট কর্ম্মীর সংখ্যা ৩,১৬৬। কেবল মাত্র অনুসন্ধানের জন্য ১৯২৮-২৯ সনে ১,৪০০ কর্ম্মচারী ছিল—১৯৩২-৩৩ সনে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬৩০ জন। এই অভূতপূর্ব্ব দ্রুত প্রগতির মূলে ছিল রাশিয়ায় ব্যক্তিগত শিল্প-সম্ভারকে জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরের প্রচেষ্টা। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় সুসংবদ্ধ-ভাবে শিল্পের উন্নতি ও বিকাশ—দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার প্রয়াস—এ সবও ভূ-তত্ত্ব-বিভাগের কার্য্য-পরিধির প্রসারণের অন্যতম মূল কারণ। এই ভাবে দেশের খনিজ সম্পদ ও শিল্পের প্রসারের প্রশ্ন সেদিন খুব বড় হোয়ে দেখা দিল। গবর্ণমেণ্টের খাস-দপ্তরে এসব কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার নেবার দরুণ ইহা স্বাভাবিক যে, গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য তাদের কাজ আদায় করে নেন—খনিজ সম্পদ আবিষ্কার-আহরণ উৎখাতের ব্যাপারে ভূ-তত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তৃত্ব একটা বিশেষ স্থান লাভ করেছে। সুতরাং রাশিয়ার একমাত্র ভূ-তত্ত্ব-বিভাগই দেশের খনিজ শিল্পের একমাত্র উপদেষ্টা হয়ে ওঠে। সমগ্র দেশের খনিজ-সম্পদের

অনুসন্ধানের ভার আজ তাদের উপর বর্তেছে এবং সত্যসত্যই আজ এই ভূ-তত্ত্ব বিভাগ বাস্তব সক্রিয়রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার মুখ্য পুরাতন লক্ষ্য, ম্যাপ-তৈরীর কাজ—আজ অনেকটা গৌণ হয়ে উঠেছে। আগে অনুসন্ধানের কার্য্য ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা ক'রত কিংবা লক্ষ্যহীনভাবে সমাধা হ'ত—এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা দুই উপেক্ষিত ছিল; কিন্তু আজ এই অনুসন্ধানের কার্য্য শুধু ধাতব শিল্পেই সীমাবদ্ধ নহে—সমগ্র দেশের কৃষি-শিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামালের সরবরাহের জন্য ও উহা অতীব প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হইয়াছে। অনুসন্ধানের এই নব-প্রবর্ত্তিত নীতির ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হয়েছে—কেননা অনেক নূতন নূতন খনিজ সম্পদের আকরিক অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূ-তত্ত্ব-বিভাগ নিম্নোক্ত সংগঠনের সাহায্য কার্য্যে রত হন:— (ক) লেলিনগ্রাডে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউট্, (খ) মস্কো, সেভরড্লবাস্ক্, নভোচেরকাসক্, টমস্ক ভ্লাডিভস্টক্, কিয়েভ, আলমা-এটা প্রভৃতি স্থানীয় কেন্দ্র, (গ) শিল্প-সংগঠন। সংগঠনের এই বিরাট পরিকল্পনা সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত করার জন্য স্থানীয় কেন্দ্রসমূহ এক অভিনব ধারায় কাজ সুরু করল। (১) খনিজ-সম্পদের অনুসন্ধানে ১৯২৯-১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর ১৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটারের জরীপকার্য্য ও তদুপরি উরালের ২০০ খানা, ইউক্রেনের ৭০ খানা, মধ্য-রাশিয়ায়, মধ্য-এশিয়ায়, উত্তর-রাশিয়ার, বৈকাল প্রদেশে ও কাজাক্ প্রদেশের আন্তর্জাতিক জিওলজিক্যাল ম্যাপ সঙ্কলন।

(২) খনিজ সম্পদের আহরণ:—ধাতব প্রস্তুত (স্বর্ণ, প্লাটিনাম), কয়লা, তৈল, অধাতব প্রস্তর, জলোৎপাদন, উৎখাতন,—এই গুলোই হ'ল প্রধান প্রতিপাদ্য। খনিজ অনুসন্ধানে এবং প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ে, ইলেকট্রিকেল, ম্যাগনেটোমেটিক্, রেডিও-মেট্রিক্ প্রভৃতি আধুনিকতম প্রণালীসমূহদ্বারা কাজ আরম্ভ হ'ল। প্রতি ৪০০০ বর্গ কিলোমিটারের জন্য কতটী কর্ম্মীদল নিযুক্ত হয়—তাহা নিম্নে পরিদৃশ্য।

কর্ম্মীরদল (সংখ্যা)

	১৯২৮-২৯	১৯৩২-৩৩
তামা, সীসা, দস্তা	৯৩	২০০
লৌহ, মাঙ্গানিজ্	২৯	৭০
স্বর্ণ, প্লাটিনাম্	৭৪	২৬৫
কয়লা	৫৭	৯০
তৈল	৫৪	১০০
অধাতব প্রস্তর	৫২	১৫১
গাঁথনী দ্রব্য (Building material)	৩২	১২৩
জল-সরবরাহ ইত্যাদি	৫৫	২৯৯
	৪৪৬	১২৯৮

(৩) খনিজসম্পদ ও প্রস্রবণের অর্থ-নৈতিক উপায়ের উদ্ভাবন: এই বিভাগটী শুধু যে আয়ের পথই চিন্তা করেন তাহা নহে, খনিজ সম্ভারের উত্তোলন, উৎপাতন বিষয়ে একটা পাকাপাকি হিসাব নিয়াও ব্যস্ত।

(৪) খনিজ-সম্পদ-এর বৈজ্ঞানিক গবেষণা: বহু মূল্যবান তথ্য এ বিভাগে সংগ্রহ করা হয়। রাসায়নিক, পেট্রোলজিক্যাল্ ও পেলিয়োণ্টোলজিক্যাল্ গবেষণাই প্রধান লক্ষ্য—আর উদ্দেশ্য হ'ল প্রত্যেকটী বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ, সর্ব্বসাধারণের জন্য নূতন খনিজ সম্বন্ধে তত্ত্ব-প্রকাশ এবং যাদুঘরের সংগঠন কার্য্যের সহায়তা করা। এইভাবে রাশিয়ান্ ভূতত্ত্ব-বিভাগ একটা বিরাট কর্ম্মভার মাথায় নিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্ল। কিন্তু সময় সময় ভূ-তত্ত্ববিদের অভাব নৈরাশ্যের সৃষ্টি করলেও অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ তত্ত্ব শিক্ষায় সুবন্দোবস্ত করা হ'ল। এই ভূ-তত্ত্ব-বিভাগের সফলতার মূলে রয়েছে রাশিয়ার শিল্পসম্পদের ক্রম-বিকাশের কথা। শুধু academic মূল্যটাই লোকের চোখে পড়েনি, তাই এই বিভাগের খরচের বরাদ্দ অর্থ লোকের নিকট একটু সম্ভ্রমের চোখেই ধরা দিত।

কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউট্:—ভূ-তত্ত্ব-বিভাগের পরিচালনা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের জন্য ১৯৩১ সনের জুন মাসে এর প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিশটী বিভিন্ন বিভাগের সাহায্যে নিম্ন ধারায় এর কার্য্যাবলী আরম্ভ হয়।

(ক) ইয়োরোপ রাশিয়া, ক্রিমিয়া, উরাল্, ককেশাস্, বাস্খিরিয়া, সাইবেরিয়া, কাজাকস্থান, মধ্য-এশিয়া ও ফার-ইষ্ট প্রভৃতি প্রদেশের জরীপ সঙ্কলন (খ) ঐ সমস্ত প্রদেশের পেট্রোলজিক্যাল, পেলিয়োণ্টোলজিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধান (গ) ঐ সব প্রদেশের টিন্, দুর্মূল্য ধাতু, কয়লা, তৈল, অধাতব প্রস্তর ও ধাতব সম্ভারের অবস্থা নির্দ্ধারণ, উত্তোলন, উপায়-উদ্ভাবন ও জলসরবরাহের সমস্যা সমাধান। (ঘ) খনিজ সম্পদের statistics ও ম্যাপ সঙ্কলন। এই প্রতিষ্ঠানটী Heavy Industriesএর পরিচালনাধীনে আছে এবং এর ভূতত্ত্ববিদের সংখ্যা ৫০০। ১৯৩৬ সালে এর খরচের বরাদ্দ ছিল ১২,০০০,০০০ রুবেল (৪৫০,০০০ পাউণ্ড)। এ বরাদ্দের ভেতর খনিজসমূহের উন্নয়নের ব্যয়িত অর্থ ধরা হয় নাই। কারণ এক বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা অবগত হই যে এই প্রতিষ্ঠান খনিসমূহের উন্নয়ন ও অপরাপর কার্য্যে এবং চের্নিচেভ্ (Tchernychev) যাদুঘরের জন্য খরচ করেছে আরো ৩৮,০০০,০০০, পাউণ্ড। উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে দৃষ্ট হয় যে শত শত ভূতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞগণ রাশিয়ায় খনিজ আহরণে রত আছেন। টিরেল সাহেবের মতে ৬০০০ জন, কিন্তু আমার কাছে প্রতীয়মান হ'ল যে ইঞ্জিনিয়ার, ডিলার ইত্যাদি নিয়ে ১২০০ জন। এ বিষয়ে মারকভ্ সাহেবের মতও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য—তাঁর মতে ১৯২৬ সনের ভূতত্ত্ববিদের সংখ্যা ২৬৬ থেকে ১৯৩৬ সনে দাঁড়ায় ২৫৬৩; আর কর্ম্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০০ থেকে ৭৫০০০ এ। সাথে সাথে খরচের পরিমাণও দ্রুতবেগে বেড়ে উঠে। মার্কভ সাহেবের মতে ১৯৩৬ সনে ম্যাপ সঙ্কলনের কার্য্যে ব্যয় হয় এক্শো কোটী রুবেলস্। নিম্নোদ্ধৃত অংশে ম্যাপ্ সঙ্কলনের একটা ধারাবাহিক ক্রমোন্নতির ইতিহাস সুস্পষ্ট হবে।

জানুয়ারী ১৯১৮	জরীপকৃত ভূমি বর্গ কিলোমিটার	ভূমির শতাংশ
মোট স্কেল	২,২০৮,৯০০	১০.৪০
স্কেল—১:২০০,০০০	৫১,৮০০	০.২৫
" ১:১০০,০০০ ও বৃহৎ	৯২,৬০০	০·৪৫
১৯১৮—১৯২৯		
মোট স্কেল	৩,৮২৩,৬৫০	১৮·০০
" ১:২০০,০০০	২৪১,৮০০	১.১০
১:১০০,০০০ ও বৃহৎ	২১৭,৭০০	১.০০
জানুয়ারী ১৯৩৭		
মোট স্কেল	৯,১৭০,২০০	৪৩.২০
" ১:২০০,০০০	১,৮১৬,৮০০	৮,৫১
১:১০০,০০০ ও বৃহৎ	৮৯৭,১০০	৪'২০

উপরোক্ত বিবরণী থেকে ইহাই প্রমাণ হয় যে ১৯১৮ থেকে ১৯৩৭ সনের প্রারম্ভে জরীপকার্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় বিশগুণ; আর ম্যাপ্ সঙ্কলন বৃদ্ধি পেয়েছে দশ থেকে ত্রিশগুণ। যদিও অর্থব্যয় হয়েছে প্রচুর—ম্যাপ সঙ্কলনের গুরুত্বের দিক্ দিয়ে এ ব্যয় নগণ্য; কারণ মন্থরগতিতে পরিচালনার ফলে হয়তো ভূতত্ত্ববিদ-এর সারাজীবনের আকাঙ্ক্ষিত অনেক বিষয়বস্তুই বাস্তবে পরিণত হত না। এ স্থানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটী ঘটনা মনে পড়ে—অধিবেশনের প্রত্যেক প্রতিনিধিকেই নানাবর্ণে রঞ্জিত রাশিয়ার একখানা অতি সুন্দর ম্যাপ উপহার দেওয়া হয়।

যাদুঘর:—এখানকার বৈজ্ঞানিক ইনষ্টিটিউটগুলি ও যাদুঘরসমূহের

মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কের কথা একটু বিশেষ করে বলা আবশ্যক। এসবই বিজ্ঞান পরিষদের (Academy of Sciences) সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। লেনিনগ্রাডে অবস্থিত চের্নিশেভ যাদুঘর কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউট্ এর প্রভূত উপকার সাধন করেছে—প্রথমতঃ এই যাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন ধাতব-সঙ্কলন ভূতত্ত্ববিদের প্রাণে রাশিয়ার খনিজ-সম্পদের একটা অতি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়ে দেয়; দ্বিতীয়তঃ এই যাদুঘর যুবক ভূতত্ত্ববিদকে কোন বিশেষ বিভাগে কর্ম্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে; তৃতীয়তঃ এই যাদুঘর জনসাধারণের প্রাণে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সঙ্কলন কিভাবে দেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রভূত সহায়তা করে—তার একটা প্রকৃত ধারণা জন্মিয়ে তোলে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়ার কথা ইহাতেই নিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক যাদুঘরেরই শিক্ষাপ্রদ দিক্‌টা রাশিয়ার পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে এবং যাতে জনসাধারণ যাদুঘরের সঙ্কলন থেকে কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউট-এর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আগ্রহবান্ হয়—তার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

লেনিনগ্রাডে মাইনিং-ইনষ্টিটিউট-এর যাদুঘরে সঙ্কলিত খনিজ সম্পদের নমুনা সাজানো রয়েছে—পৃথিবীর মধ্যে উহা একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর খনিজ সঙ্কলন বলে গণ্য হতে পারে। এই সঙ্কলন দেখবার জন্য প্রত্যেক প্রতিনিধিকে একটী প্রচারপত্র দেওয়া হয়—এর থেকে আমরা এ সম্বন্ধে প্রভূত তথ্য অবগত হই। রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী কতকগুলি খনিজ আমাদের চোখে পড়ে—তার ভেতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে একপ্রকার অভ্র। পদার্থের আনবিকগঠনের একটী আদর্শ মডেল্ ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওয়াশিংটন্ কৃত মৌলিক পদার্থের শ্রেণী-বিভাগের একটী মডেলও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সমস্ত খনিজ-শিল্পের বিবর্দ্ধনের একটা সন্ধান পাওয়া যায়—এই যাদুঘরে। খনিজ-সম্পদের উত্তোলন, উৎখাতন হ'তে আরম্ভ করে সমস্ত ধাতু নিষ্কাসনের প্রক্রিয়াসমূহ এবং বিভিন্ন বিভাগে এই সব ধাতুর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক প্রণালীর কথা মনে জেগে উঠে।

বিজ্ঞান-পরিষদ (Academy of Sciences) :—মস্কোতে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য আমরা এই বিজ্ঞান-পরিষদের কাছে চিরঋণী। উহা ২৪ নম্বর বলাশি-কালুঝাকিয়ায় অবস্থিত অন্যান্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠান এগুলির সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কিহিবিন্ পর্ব্বতে যে বিরাট এপেটাইট (apatite) খনির প্রতিষ্ঠান্ গড়ে উঠেছে তাহা একমাত্র এদের বৈজ্ঞানিক সাধনা ও সফলতার গুণেই সম্ভবপর হয়েছে। বিজ্ঞান-পরিষদের সাথে কেন্দ্রীয় ইনষ্টিটিউটএর সম্পর্কটী ঠিক সুস্পষ্ট নয়। ফার্সম্যান্ সাহেবের মতে লোমোনোসভ্ ইনষ্টিটিউটের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে রাশিয়ার খনিজসম্পদের অনুসন্ধান—তাদের আনবিক গঠন ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গবেষণাকার্য্য পরিচালন। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠ এবং কস্‌মিক্ প্রদেশস্থ মৌলিকপদার্থগুলির অবস্থান, সংযোগ ও তিরোধান-এর নিয়মপ্রণালীর গবেষণাও আর একটী লক্ষ্য বস্তু। অভিযান প্রেরণ, মূলপ্রবন্ধ প্রকাশ এবং বহুবিধ জনহিতকর শিক্ষাপ্রদ কার্য্যতার নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটী রাশিয়ার খনিজসম্পদের একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হয়।

গবেষণামূলক প্রবন্ধ : যে দেশে গবেষণার শিক্ষাপ্রদ দিক্‌টাই (বিশেষতঃ ভূতত্ত্বের অনুসন্ধান) হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য—যেখানে দেশের শিল্প সম্ভারের উন্নতির জন্যই একমাত্র প্রচেষ্টা চলছে, সেখানে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের বহুল-প্রচার স্বাভাবিক এবং মস্কোই হচ্ছে সকলপ্রকার বৈজ্ঞানিক পত্রিকাসমূহের আসল কেন্দ্র। মস্কো থেকে সমস্ত খনিজ-সম্পদের বিবরণসহ একখানা Encyclopædia (বিশ্ব-কোষ) প্রকাশিত হয়েছে—এছাড়া খনিজ সম্বন্ধীয় আরো নানাবিধ গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে; তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ প্রচারের জন্য নানাবিধ মাসিক, ও পাক্ষিক পত্রিকার প্রচার হয়েছে; তাছাড়া কোন কোন বিশেষ গবেষণা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা সঙ্কলিত মনোগ্রাফও প্রচারিত হয়েছে। পামিরিয়াণ অভিযানের বিচিত্র ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গর্‌মোনোভ্, নেলিভ্‌কিন্, পিড্ ও পয়ারকোভ্-এর সহায়তায়।

কয়লার মাইক্রো গঠন সম্বন্ধে প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক বুরিয়াক্, গ্রাচোভা, ওয়ালটাজ্ প্রভৃতির সাহায্যে একটী অতীব শিক্ষাপ্রদ মনোগ্রাফ্ প্রকাশ করা হয়েছে।

খনিজ সম্ভারের উৎপাদন :—রাশিয়ায় খনিজ-শিল্প কি ভাবে দ্রুত-বেগে উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আজ পৌঁছিয়েছে—তা প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত বিবরণী থেকে।

	১৯১৩	১৯২৪	১৯৩০	১৯৩৬	
এস্‌বেস্‌টোস্ (Asbestos)	২৩,০০০	৭,৯৩২,	৪৬,০০০	১৩০,০০০	টন।
ক্রোম্ (Chrome ore)	২৬,২১৬	৭,২৭৭ ●	৬৬,৭২০	২২০,০০০	"
কয়লা	২৯,০০০,০০০	১৫,৬৫০,০০০	৪৬,৬৫০,০০০	১২২,৭১০,০০০	"
তাম্র	৭২৫,০০০	?	?	৩,১৫০,০০০ ?	"
লৌহ (Pig Iron)	৪,২১৬,৩০০	৬৬১,০০০	৪,৯৬৯,৪৪৩	৯,৬১৫০০০	"
লোহ প্রস্তর (Iron ore)	৯,২২০,০০০	৯৪৮,০০০	১০,২৫০,৩০০	২৭,৯১৮,০০০	"
সীসা	১,৩২১	২০১	১০,৭৪৫	৪৪,৮৫৩	"
মাঙ্গানিজ্ প্রস্তর	১,২৫৫,০০০	৪৯৩,৮৬৩	১,৫৬১০০০	৩,০০২,০০০	"
পেট্রোলিয়াম্	৯,২৩৪,০০০	৫,৯৪২,০০০	১৭,৮০৫,০০০	২০,২০০,০০০	"
পটাস্	——	——	১৯১,০০০	১,৮০০,০০০	"
পিরাইটীজ্	—	২৪,৯৭৮	২৪১,৭০০	৬১৮,০০০	"
লবণ	১,৯৭৮,০০০	১,১৭২,৪৯৩	৩,৩০০,০০০	৪,৩৪৯,৫০০	"
দস্তা	৭,৬১০	৫১৬	৪,৮৯৪	৬৩,৭২০	"

এবং নানাবিধ প্রবন্ধে কয়লা ও তেল ইত্যাদি বিষয়ে নানা আলোচনার ফলে একটা তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে উঠে। এই বিজ্ঞানপরিষদের অধীনে প্রসিদ্ধ লমোনোসভ্ ইনষ্টিটিউট এবং উহা বিভিন্ন খনিজসম্পদের প্রতিষ্ঠান-গুলির সংযোগে গঠিত। সেভ্‌রড্‌লবৃস্ক, কিরেভিস্ক, ইলমেন, খোদজেড্ ও অপরাপর যে সব স্থানে গবেষণা হয়—তাহা এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করে। তাছাড়া আর্কটিক্ প্রদেশ সাইবেরিয়া, মধ্য-এশিয়া ও বৈকাল প্রদেশে নানা অভিযানও প্রেরণ করে।

১৯৩৮ সাল খনিজ সম্পদ আহরণের যে বিরাট পরিকল্পনা হয় তারও একটা হিসাব দেওয়া গেল :—

কয়লা	১৩৯,০০০,০০০	টন্
পিট্	১৫,৫০০,০০০	"
পোট্রোলিয়াম্, গ্যাস্ ইত্যাদি	৩৩,৫০০,০০০	"
কোক্ কয়লা	২২,৪০০,০০০	"
লৌহ-প্রস্তর	৩২,০০০,০০০	"

ম্যাঙ্গানিজ্	৩,২০০,০০০	টন্
লৌহ (Pig Iron)	১৫,৮০০,০০০	"
ইস্পাত	১৫,৬০০,০০০	"
ইস্পাত-প্রস্তুত দ্রব্য	১২,৬০০,০০০	"
ফস্ফেট্	৩৩০,০০০	"
সিমেণ্ট্	৬,৩০০,০০০	"
বিদ্যুৎ-শক্তি	৩৪,০০০,০০০,০০০	Kw.h.

এর থেকে খনিজ উৎপাদনের দ্রুত বর্দ্ধমান দিক্‌টাই চোখে পড়ে। রাশিয়ায় খনিজ-সম্পদের আকরিক অবস্থান :—কংগ্রেস অধিবেশনে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে—তা সবই মস্কো নগরীতে প্রাপ্য। ভল্গা ও কামানদীর উত্তর তীরস্থ প্রান্তর পরিদর্শনে ও লেলিন্‌গ্রাডে বহু যাদুঘর পরিদর্শনেও অনেক তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় যে সব মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়—তার থেকে এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মনোগ্রাফ্ থেকে এ সকল তথ্য সম্যকরূপে সংশোধিত। তাছাড়া, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ট্রেল্লওয়ে ও মার্চিশানের শতবর্ষ পূর্ব্বের গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিচয় থেকে অনেক সহায়তা পেয়েছি। বৈজ্ঞানিক ট্রেল্লওয়ের সময়ে লৌহ প্রস্তুত করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল—কেরিলিয়ার পিটার্স্ কারখানায়, ডন্ নদীর তীরে টোলার কারখানায় এবং ডনেট্জ কয়লার খনির নিকট বাক্‌মুখে লোহার কারখানা ছিল।

তাঁর বিবরণীতে পশ্চিম উরাল প্রদেশের কয়লার উল্লেখও পাওয়া যায়। তাছাড়া সোলিকামস্কের লবণ, বেরেজ-ভস্কের স্বর্ণ, কলিভানের স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং নেরচিন্স্ক প্রদেশের চমৎকার বেরিল, এমিথিষ্ট ও টোপাজ প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরের উল্লেখ আছে। বৈজ্ঞানিক মার্চিসান্ রাশিয়ার শিলা-প্রস্তরের গঠন সম্বন্ধে ব্যস্ত থাক্‌লেও—ডনেট্জ্ প্রদেশের কয়লা ও উরাল প্রদেশের খনিজসম্পদ আহরণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ডনেট্জ্ প্রদেশের কয়লার নানাবিধ রূপান্তর অতি যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি উরালপ্রদেশের সাইবিরিয়াস্থ স্বর্ণ-খনির, পশ্চিম উরাল প্রদেশের তাম্রের অবস্থান ও উরালপ্রদেশের অন্যান্য দুর্লভ ধাতব সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইলামন্ প্রান্তরের জারকন্ (Zircon), এপেটাইট্ (Apatite), বেরিল (Beryl), টোপাজ (Topaz) কৃষ্ণ-অভ্র প্রভৃতি দুর্লভ শিলাপ্রস্তরের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি তাম্রখনির অবস্থান বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ তথ্য আবিষ্কার করেন। মার্চিসানের বিবরণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে ১৮৪৫ সাল বেরেজ-ভোস্কর স্বর্ণখনি থেকে উৎখাত স্বর্ণের বাজার মূল্য ছিল ২,৭৫১,৯৬২ পাউণ্ড। উরালপ্রদেশের স্বর্ণখনির উল্লেখের সাথে সাথে বিসেরেস্ক্ প্রদেশের হীরক-এর আবিষ্কার ও সাইবেরিয়া প্রান্তরে প্লেটিনাম্ ধাতুর অবস্থানের কথাও তাঁর বিবরণীতে আছে। এ সব স্বর্ণ ও প্লেটিনাম্ ধাতুর আকরিক অবস্থান ও তাদের স্তর গঠনের কালের বা বয়সের সীমা-নির্দ্দেশ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মার্চিসানের অমর কীর্ত্তি। রাশিয়ায় খনিজসম্পদের এসব তথ্যাদি সংগ্রহের পর একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে শতবর্ষ আগেও রাশিয়া ভূতত্ত্ব ধাতু-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কোন সভ্যদেশের তুলনায়ই পশ্চাৎপদ ছিল না। ব্যারণ হামবোলড্‌ট্ তখনকার দিনে ২২ হাজার খনি-মজুরদের আদর আতিথেয়তায় কি ভাবে মোহিত হয়েছিলেন তার বিবরণ অতি চমকপ্রদ। মার্চিশানের বিবরণী রাশিয়ার স্বাস্থ্য-কামীর কাম্য খনিজ প্রস্রবণের বিশদ আলোচনায় পূর্ণ।

পেট্রোলিয়াম্ :—অধিবেশনে অধিতব্য প্রবন্ধসমূহের মধ্যে পেট্রোলিয়াম্ সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথম আলোচিত হয়; তারপর আলোচিত হয় কয়লা, লৌহ-প্রস্তর ও অন্যান্য ধাতু-সমূহ। বৈজ্ঞানিক গুবাকিনের মতানুসারে রাশিয়ার নানা প্রদেশে অবস্থিত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ নিম্নলিখিত ধারায় শ্রেণী-বিভাগ করা যায় :—

		পরিমাণ	
১।	আজের্ বৈজান্ প্রদেশ		
	এপ্‌সেরণ খনি	৭৮১,৩০০,০০০	টন্
	কব্রিষ্টানা "	৭৩৭,১০০,০০০	"
	প্রিকোয়ানিস্কি "	৫৭৮,১০০,০০০	"
	অপরাপর খনি	৪৫৫,৮০০,০০০	"
২।	জার্জ্জিয়ান্ প্রদেশ		
	মিরজাহানি	১১৬,২০০,০০০	"
৩।	উত্তর-পূর্ব্ব ককেসাস্ প্রদেশ		
	গ্রজ্নি	১৭৪,৮০০,০০০	"
	দাগেষ্টান	১৪৬,০০০,০০০	"
৪।	কোবান্-আজব-কৃষ্ণসাগর প্রদেশ		
	কোমান্, টামান্, ক্রিমিয়া	১৫৬,৯০০,০০০	"
৫।	এম্বা-প্রদেশ		
	ওরেন্‌বার্গ প্রভৃতি	১,১৯০,৪০০,০০০	"
৬।	পশ্চিম-উরাল, ভল্গা ও কালিমিক্ প্রদেশ		
	বাক্‌খেরিয়ান্	৩৬৫,২০০,০০০	"
	আস্ত্রু বিন্স্ক্	১০২,১০০,০০০	"
	পেরম্ কামা	৩৫৪,০০০,০০০	"
	কুইবিশেপ্	১৮৭,৭০০,০০০	"
	কালিমস্ক্	১৮১,৭০০,০০০	"
৭।	উত্তর প্রদেশ		
	অনুসন্ধানরত খনিসমূহ	২২,১০০,০০০	"
	সাখেলিন্	৩৩৯,৮০০,০০০	"
৮।	মধ্য-এশিয়া	৪২৮,১০০,০০০	"
	মোট	৬,৩৭৬,৩০০,০০০	টন্

বৈজ্ঞানিক গুবাকিনের মতে সারা পৃথিবীর পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ হচ্ছে ৭,৫০০,০০০,০০০ টন্। তার মধ্যে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে রয়েছে ৫,০০০,০০০,০০০ টন্ আর পশ্চিম গোলার্দ্ধে রয়েছে ২,৫০০,০০০,০০০ টন। রাশিয়ায় উপরিলিখিত পরিমাণের উপর নির্ভর করলে পৃথিবীর মোট পরিমাণ পেট্রোলিয়াম্ আরো অনেক বেশী। পেট্রোলিয়াম্ সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ একান্ত যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। খনি থেকে পেট্রোলিয়ামের সবটুকুন্ নিষ্কাশন্ করায় এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়। ৬০০ ডিগ্রি তাপে (সেণ্টিগ্রেড্) উত্তপ্ত বায়ু অতিশয় গুরু চাপে খনির ভেতর প্রবেশ করান হয় এবং পেট্রোলিয়ামের শেষ-কণাটুকুন্ ও গ্যাসের আকারে পরিণত করে সংগ্রহ করা হয়। পেট্রোলিয়াম্-যুক্ত প্রস্তর সমূহ (Shales) Distill করেও তৈল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা লেনিন্‌গ্রাড্ ও অন্য একটী সহরে প্রচলিত আছে।

পারাপার

লতিকা ঘোষ

আশা আজি না পায় ভাষা, শিশু না পায় মায়ের ক্রোড়
জীবন মরণ ছায়ার রাজে, কাটিবে কবে মায়ার ডোর!
সুখ স্বস্তি খোঁজ কোথা হিয়ার শুধু বাজে ব্যথা
হাতড়ে বেড়াও খুঁজে না পাও, দেখছ শুধু আঁধার ঘোর!

জীবন মরণ পারে রাখা—হিরণমাখা আলোর দেশ
সেথায় যেতে হবে ওগো ছেড়ে এ সব ছিন্ন বেশ।
প্রাণের মাঝে নাইক শান্তি ম্লান হয়েছে উজল কান্তি
মায়ের ক্রোড়ে থাক্‌ব তবু, থাকব চেয়ে নির্নিমেষ।

রাজা

শ্রীসুশীল রায়

তারপর পূব দিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। জ্যামিতির সরল-রেখার মত লাল শুরকির রাস্তাটি সটান সিধা পূব দিকে চলিয়া গিয়াছে। নাম অহল্যাবাঈ রোড।

এখানে আসিয়া অবধি আমাদের পায়ের বিরাম নাই। এই ক্ষুদ্র আধা-পল্লীতে আমরা এত শীঘ্রই সবার পরিচিত হইয়া গিয়াছি। রেল লাইনের এক পারে ধূ ধূ মাঠ, শস্য শ্যামল নয়, পাহাড়ী কাঁকরে ভরা; দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ভিড় আর শাল-পিয়ালের বন। অন্য পারে ছোট বাজার, সংক্ষিপ্ত জনতা—আর অহল্যাবাঈ রোড।

আমরা যেন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। রাস্তার দু'পাশে বট পাইকর আর কৃষ্ণচূড়া পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া। দিনের আলো পরিপূর্ণভাবে এখানে প্রবেশ করেনা।

অনেকটা পথ হাঁটিয়া একটু ক্লান্ত হইয়াছি। নীচে অগভীর নদীর চটুল ফাজলামো। পাথরে ধাক্কা খাইয়া খাইয়া জলের স্রোত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহারি কলকল শব্দ। মজবুত পাথরে তৈরী ছোট নদীর উপর প্রকাণ্ড সাঁকো। আমরা বসিয়া পড়িলাম। চারিদিক নির্জন! কদাচিত দু'একজন লোক সাঁকো পার হইয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা তখনো হয় নাই। দূরে আম গাছের উর্দ্ধে ফিকা তৃতীয়ার চাঁদ কাৎ হইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

বাঁশরী কহিল, 'সত্যিই বড় চমৎকার, তাই না?'

ইসারায় কহিলাম, 'চুপ।'

বাঁশরী আমার মুখের দিকে চাহিল, কাছে সরিয়া আসিয়া সভয়ে বলিল, 'কেন?'

বলিলাম, 'ভয় নাই। চুপ ক'রে নদীর শব্দ শোনো।'

'তা-ও ভালো!' বাঁশরী কহিল, 'যে নির্জন—'

ইতিপূর্বেই বাঁশরী বলিয়াছিল এত কাছে এত ভালো জায়গা, আমি ইহার খোঁজ রাখি নাই কেন। অপরাধই বটে। নিজেরও অনুশোচনা হয়। বসিয়া বসিয়া সেই কথাই আবার ভাবিতেছিলাম! আকাশ হইতে ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে, ধীরে ধীরে ফিকা রঙের চাঁদ হলুদ বর্ণ ধারণ করিতেছে, একে একে তারা ফুটিতেছে। মহানগরীর পথের ধারে ধারে এই ভাবে একে একে আলো ফুটিয়া উঠে। তুলনাটি সহজেই মনে পড়ে। সব মিলিয়া মিশিয়া একটি নিশ্চল রোমাঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছে। চারিদিকে নীরবতা ঝমঝম করিয়া বাজিতেছে। বাঁশরী শুধু একবার বলিল, 'ঝিঁঝি।' তারপর চুপ করিয়া হয়ত নদীর চাপা হাসি শুনিতে লাগিল।

হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম, অন্ধকারের মধ্য হইতে ডাকিল, 'বাবু।'

বাঁশরী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বলিলাম, 'কে?'

লোকটি কাছে আসিয়া বলিল, 'আমি বাবু আমি! রাবণ!'

বাঁশরী হয়ত একাগ্র মনে রাম-নাম জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া এই ভাবে বিনা নোটিশে রাবণের আবির্ভাব কেহ প্রত্যাশা করেনা। আমাদের পদতলের শীর্ণা নদীটি গোদাবরীও নহে।

রাবণকে আমি চিনিনা। সে বলিল, 'চিন্‌লেন তো! আমি রাবণ! সব শেষ ক'রে চ'লে এলাম!'

বাঁশরী ভয়ে কাঁপিতেছে। চাপা গলায় বলিল, 'পালাই চলো! ও মাতাল!'

লোকটির কান তো খুব সজাগ, বলিল, 'মাতাল? দু'পাঁটে কে না মাতাল হয়? আরো একটা আছে, রাতে খাবো। কি বলিস্ মিঠু?'

লোকটার বগলে ওটা বুঝি মুরগী দেখা যাইতেছে। গায়ে প্রকাণ্ড একটি খাকির কোট, হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিতেছে। কোটের পকেটে চক্‌চক্ করিতেছে হয়ত রাত্রে খাইবার খাদ্যটি! ডান হাতে—লোকটি টুংটুং করিয়া বাজাইল—একটা খঞ্জনী!

'গান শুনবেন বাবু, গান? আজ বড় গান পেয়েছে বাবু, ভারী খুস্ আছি।'

শুক্‌না চেহারা, চামড়া দিয়া কংকাল ঢাকা, বয়স হইয়াছে অনেক। তৃতীয়ার চাঁদের আলোয় এর বেশি কিছু দেখা গেল না।

বাঁশরী কহিল, 'ভয় করে।'

ইসারায় বলিলাম, 'চুপ।'

বেতালা খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে সে গান জুড়িয়া দিল—

> 'নতুন বৌকে সামলে রাখা দায়
> হাতের থেকে কাঁকন খুলে, মল পরেনা পায়—
> নাকে কেবল নোলক নেড়ে
> প'রে বাংগা পাছ ছা পেড়ে
> এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি ক'রে জল আনিতে যায়···'

লোকটা নাচিতে আরম্ভ করিল। সুর ত' দূরের কথা, জড়িত গলায় কথা ঠিক বাহির হইতেছে না। নাচিতে নাচিতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া অপরূপ ভঙ্গী করিয়া গাহিল:

'(আর) বাঁশবনে এক মিন্‌সে এসে (ছি ছি) মুচ্‌কে হেসে চায়।'

বাঁশরী ভয় ভুলিয়াছে। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল 'এত রঙ্গও জানে!'

সেই পথ দিয়া কে যেন যাইতেছিল। গানে আকৃষ্ট হইয়া সে দাঁড়াইল। বলিল, 'কি রে রাবণ! খুব ফূর্তি আজ—নাৎনীকে পুড়িয়ে এলি?'

সগর্বে রাবণ বলিল, 'হাঁ, এই ত আসছি শ্মশান্ থেকে। হেঁ, একাই পারি। ভারি তো বিশ বরষের ছুঁড়ি। একা ছাড়া দুকলা দিয়ে হবেক কি। সঙ্গে আমার মিঠু ছিলো! ভয় করি কাকে—না রে মিঠু?'

বগলের ভিতর হইতে মিঠু প্রত্যুত্তরে একটু গলা বাড়াইল। লোকটা মুরগীর গালে চড় দিয়া আদর জানাইল।

আমাদের পথিক বন্ধুটি রাবণকে বলিলেন, 'এবার তবে তুই ছুটি নে! আর তোর থাকার দরকার কি রে? এই রাবণ!'

নিশ্চল পাথরের মত রাবণ দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল সে কি যেন ভাবিতেছে।

পথিক বন্ধুটি বলিতে লাগিলেন রাবণের কাহিনী। এখানে রাবণ নাকি এককালে রাজা ছিল, এই সব জায়গাটার মালিক ছিল সে। তার উনিশটা ছেলে, সেই অনুপাতে নাতি নাৎনী। জাতিতে লোকটা মুচি। কিন্তু মুচির কাজ জীবনে বেশি দিন তাকে করিতে হয় নাই। একে একে উনিশটি ছেলে সস্ত্রীক মারা যায়, একে একে নাতি নাৎনীরাও। মাত্র একটি ছিল অবশিষ্ট, সেটিও আজ শেষ করিয়া আসিল। এই নাৎনীটার উপর তার মায়া কতখানি ছিল তা বর্ণনা করা নাকি সম্ভব নয়। দু'টি মাত্র প্রাণী ছিলো যাদের প্রতি রাবণের মমতা অসাধারণ। সেই নাৎনীটা ও এই মুরগীটা। অনেক মুরগী সে জবাই করিয়াছে, মাতাল তো, কিন্তু আজ দু'তিন বছর হইল এই মুরগীটি সে পালন করিতেছে।

রাবণ গাহিয়া উঠিল :

'মুন দেয়না সে ডানলাতে (বাবু) চুণ না পড়ে পানে
যতই ডাক, 'ও নতুন বৌ !' যায় না কারু কানে !
আস্তে আস্তে মুখটি দেখি যেম্‌নি ঘোমটা টেনে
ঝামটা মেরে কয়, 'আমাকে (ও মুখপোড়া)
ভালোবাসিস্ কেনে।'
এমন আহাম্মকের কথার (বলুন বাবু) জবাব দেওয়া যায় ?
নতুন বৌকে সামলে…'

রাবণের কথা ভাবিলাম। রাবণ সত্যই রাজা। দুঃখকে সে কেমন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া হাসি গানে নিজেকে মশগুল্ করিয়া তুলিয়াছে। নিমেষের মধ্যে এই অতি নির্জন পল্লীপ্রান্তের নদীর জলকল্লোল, ঝিঁঝির ঐক্যতান, তৃতীয়ার বক্র চাঁদ, পরিচ্ছন্ন আকাশের অগুন্তি নিশ্চল তারা এবং বৈজ্ঞানিক সরল রেখার মত লাল শুরকির রাস্তা কোথায় মিলাইয়া গেল। সমস্ত জুড়িয়া রাবণ রাজার বিশাল বংশধরেরা অশরীরী দেহ লইয়া প্রেতের মতন আমার চারিদিকে যেন নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। বাঁশরীর একটি হাত মুঠির মধ্যে ধরিয়া আমি রাবণের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আধো অন্ধকারের আবছায়াতে রাবণ ভৌতিক পদার্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

বলিলাম, 'রাবণ, মুরগীটা বেচবে ?'

ধরা গলায় সে কহিল, 'জান্ লিয়ে লিন্ বাবু, মিঠু থাক্।'

থাক্ ! যখন ছাড়িবেই না, তখন থাক্। কিন্তু তাহাকে কিছু দিতে প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল। পথিক বন্ধুটি রাবণের বর্ত্তমান জীবিকার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে তাহাকে কিছু নিঃসঙ্কোচেই দেওয়া যায়। কিন্তু রাজার হাতে ভিক্ষা দিতে হাত সরিতেছিল না।

রাবণকে বলিলাম, 'যদি কাল মালবাবুর বাসায় যাস্, বখশিস্ পাবি। গান শোনাতে হবে। আজ আগাম এই সিকিটা নে।'

হাত পাতিয়া রাবণ তাহা গ্রহণ করিল এবং নেশার ঝোঁকেই হয়ত অনর্থক বারবার প্রতিজ্ঞা করিল-যে সে যাইবেই।

প্রতিজ্ঞা সে রাখে নাই। তার বাবু অর্থাৎ আমার বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু বলিলেন, 'ওই তো ওর দোষ! কথার ঠিক নেই! কক্‌খনো কথা রাখেনা! ওই জন্যেই তো না খেয়ে মরে! আঁধার ঘরের পিদিম সেই নাৎনীটা কদ্দিন এই রেলওয়ে কোয়ার্টারের চারপাশে ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেরিয়েছে। বুড়োটা —তখন মদ খেয়ে টং হ'য়ে কোথায় পড়ে কে জানে!'

বলিলাম, 'আচার্য্য-দেব, তুমি যদি এই রেলের তারবাবু না হ'য়ে রাবণরাজা হ'তে তবে বুঝতে মদ কি ওষুদ।'

জগদীশকে আমরা আচার্যদেব বলিয়াই ডাকি। সে বলিল, 'ছোঃ, মাৎলামি পোষাবেনা, ভাই! লোকটা ছিলো তো ভালোই, কিন্তু এখানকার সেন্টিমেণ্টাল কতকগুলো জীব ওর মাথা খেয়েছে, জুতোয় একটা পেরেক লাগিয়ে নিয়ে দু'আনা পয়সা হাতে গুঁজে দেয়। আমার এই জুতোয় হাফসোল দিয়ে বলে, পয়সা! চারআনা দিলাম, মনই উঠ্‌লোনা ওর! যত সব!'

তারবাবু, মালবাবু, টালিবাবু ইত্যাদি সবাই একমত হইয়া আমাকে কোণঠাসা করিলেন।

আজ মহানগরীতে ফিরিয়া আসিয়াছি। প্রত্যহ সন্ধ্যায় রাস্তার দু'পাশে আলো জ্বলিয়া উঠিতেছে। সরল সুদীর্ঘ কালো কালো পীচের পথে শকটারোহণে যাতায়াত করিতেছি। কত বিভিন্নমুখ, কত সুখ দুঃখের কাহিনী পাশাপাশি রাখিয়া দিন কাটিতেছে। কখনো চাঁদময় কখনো চাঁদহীন আকাশ মাথার উপর চন্দ্রাতপের ন্যায় বিরাজ করে। কিন্তু কখনো দৈবাৎ যদি কোনো সুবৃহৎ গম্বুজের আড়াল হইতে বাঁকা চাঁদের আবির্ভাব দেখি, অমনি এই মহানগরীর অট্টালিকাসমূহ, এই জনকলকোলাহল, অবিরল ব্যস্ত পদপাত কিছুই যেন নিকটে থাকেনা ; এমন কি সেই শীর্ণা নদীটির কলধ্বনি, ঝিঁঝির ঝংকার, সধবার সিঁথির সিঁদুরের মত সেই রাঙা টুকটুকে পথটিও মনে পড়েনা!

মনে পড়ে সেই নতুন বৌ, নাৎনী ও মিঠুর কথা।

খুলে ফেল প্রিয়া তব গুণ্ঠন-ভার

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ

অন্তর তব হ'ল আজি যবে লুণ্ঠিত,
তবুও ব্রীড়ায় কেন তুমি ম্রিয়মাণ ?
মুখখানি তব আছে কেন অবগুণ্ঠিত,
শঙ্কা-ব্যাকুল কেন তবু তব প্রাণ ?
দু'দিনের হাসি, দু'দিনের খেলা শেষে,
তখন কোথায় তুমি বা কোথায় আমি,
অজানা জগতে চির-বিরহের দেশে,
দু'জনের মাঝে মরণ আসিবে নামি।

বিবাহ-বাসর রচিয়া শ্মশান-মাঝে,
কাঁদিছে মহেশ তাহার সতীর লাগি,
কাঁদে সাবিত্রী—সত্যবানের প্রিয়া
তাহার পতির পুনর্জীবন মাগি।
আমাদেরও মাঝে উঠিবে উঠিবে, সখি,
মিলনের পরে বিরহের হাহাকার,
ক্ষণিকের লাগি মোদের মিলন রচা,
খুলে ফেল প্রিয়া তব গুণ্ঠন-ভার।

সিন্‌কোনা ও কুইনাইন *

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

ম্যালেরিয়াপ্লাবিত ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক যত কিছু ঔষধ আছে তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুলভ ও কার্য্যকরী কুইনাইন। কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে সেই কুইনাইনের অভাব উপলব্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। এই বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্য কুইনাইন এবং যাহা হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, সেই সিনকোনার সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ কি, সে বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিতে হয়।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে গড়পড়তা প্রতি বৎসর ২,১০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৩-৩৪ হইতে ১৯৩৭-৩৮ এই পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা কুইনাইন খরচ ছিল প্রতি বৎসর ২,০২,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা ভারতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। প্রতি বৎসর অন্যূন ৬,০০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হইবার মত রোগ এদেশে আছে; কিন্তু এদেশের দরিদ্র অধিবাসীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজন মত ক্রয় করিতে পারে না বলিয়াই প্রকৃত চাহিদার শতকরা ৩৫ ভাগ যোগানেই কাজ চলিয়া যায়। অবশিষ্ট ৬৫ ভাগ লোক যে কুইনাইনের ন্যায় সহজলভ্য ঔষধও না পাইয়া ভাগ্য সম্বল করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, হয় ত বা সে সংবাদ সভ্য সহরবাসীর আদৌ জানা নাই।

ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন সম্বন্ধে বাংলাদেশের অবস্থা কি, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এদেশের মোট জনসংখ্যা ৫,১০,০০,০০০র (১৯৩১ আদমসুমারীর হিসাব গৃহীত হইয়াছে) মধ্যে ৩½ হইতে ৪ কোটী লোক প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এই সংখ্যাটি বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অনুমান। হাসপাতালগুলির বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া যায় :—

বৎসর	ম্যালেরিয়ার জন্য হাসপাতালে চিকিৎসা হইয়াছে	ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু	বাংলাদেশে জনসংখ্যায় হাজার-করা মৃত্যুহার
১৯৩৮	— ৪২,৭৩,৩০৭	৪,১৬,৫২১	৮·৩
১৯৩৯	— ৩৪,৮৪,৭৩৫	৩,৪১,৩২১	৬.৮
১৯৪০	— ৪৪,২৯,৮৩৭	৩,৬৯,৪৪৮	৭·৪

যে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এত অধিক, সেই বাংলাদেশে গড়পড়তা বাৎসরিক কুইনাইন ব্যয় হইয়াছে ৯২,০০০ পাউণ্ড। বিশদভাবে প্রতি বৎসরের হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯এ বাংলাদেশে কুইনাইন ব্যয়ের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ১,৪১,৫০১ পাউণ্ড, পর বৎসর ব্যয়িত হইয়াছে ১,১১,৩৬১ পাউণ্ড। কিন্তু এ বৎসরে (১৯৪১-৪২) পুনরায় কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৯৪,২২৭ পাউণ্ড। অথচ আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ ও প্রতিষেধক। ইটালী, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া, পর্ত্তুগাল, বুল্‌গেরিয়া, কর্সিকা ও আল্‌জিয়ার্সে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ কুইনাইন ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া একেবারে দূরীভূত করা যায়। ইটালীর অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে, সেখানকার গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া বাংলার তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। ভারতবর্ষের ন্যায় সেখানেও রেলপথ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু সেখানকার রাজশক্তি দেশের দুর্দ্দশা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত জল নিষ্কাসন প্রভৃতির দ্বারা নিয়মিতভাবে দেশকে পরিষ্কৃত করিয়া ও অজস্র কুইনাইনের ব্যবস্থা করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই ম্যালেরিয়ার কবল হইতে দেশকে মুক্ত করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে, ইতালীর লোকসংখ্যা ছিল ৩,৪০,০০,০০০ বাৎসরিক ম্যালেরিয়ার সংখ্যা ছিল লোক সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মাত্র এবং উহাতেই সেই বৎসর ৩০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন সেদেশে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে তুলনায় বাংলা দেশে কুইনাইনের ব্যবস্থা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া উপশমের জন্য চিকিৎসা বিভাগের মতে বর্ত্তমানে বাৎসরিক ৩,৫০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন ব্যবহৃত হওয়া উচিত অর্থাৎ বর্ত্তমানে সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ কুইনাইন ব্যবহৃত হয়, তাহার দেড় গুণ।

বাংলা-সরকারের বন, আবগারী ও কুইনাইন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ

ভারতবর্ষে কুইনাইনের এতাদৃশ অভাবের কারণ এই যে, এদেশ কুইনাইনের জন্য বিদেশের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যে দুই লক্ষ দশ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন প্রতি বৎসর ভারতে ব্যবহৃত হয়, উহার মধ্যে কিছু কম ১,৫০,০০০ পাউণ্ড বহির্ভারত হইতে আমদানী হয় এবং মাত্র ৬০।৬৫ হাজার পাউণ্ড ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিক অংশ বহির্ভারত হইতে আমদানী করার ফলে ইহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা ভারতীয়দের নাই। অবশ্য ভারত সরকার কুইনাইনকে সহজলভ্য করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেন এবং আমদানী-করা কুইনাইনের তুলনায় সরকারী কুইনাইন অনেক কম দামেই বিক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এভাবের চেষ্টা কখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারে না। এই সমস্যাটি

* Quinine শব্দের সঠিক উচ্চারণ 'কুঈ্‌নীন,' কিন্তু বহুকাল যাবৎ বাংলাদেশে বাঙালীর মুখে মুখে 'কুইনাইন' হইয়া গিয়াছে। আমরা সেই বাঙ্গালী উচ্চারণই বজায় রাখিলাম।

বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য বাংলা সরকারের সিন্‌কোনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ মহোদয়ের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহার সহায়তা ভিন্ন এই প্রবন্ধের বহু তথ্য সংগ্রহ করা হইত না। এজন্য তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রহিলাম। প্রবন্ধে প্রদত্ত সিন্‌কোনা ও কুইনাইনের ছবিগুলি বাংলা সরকারের সিন্‌কোনা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুত এস্ সি সেন মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত। তাঁহাকেও এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম।

—লেখক

Royal Commission of Agriculture * বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া তাঁহাদের রিপোর্টের ৪১১ অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন, 'Both for prevention and for the treatment of malaria, a much wider distribution of quinine is necessary' এবং আরও বলিয়াছিলেন, 'If India is to embark any large campaign for fighting malaria, we are convinced that it will first be necessary to reduce considerably the price of quinine within India and this can only be effected, if India is self-supporting in its production'।

Royal Commission of Agricultureএর উপদেশ অনুসারে ভারতবর্ষের যে দুইটি প্রদেশ কুইনাইন উৎপাদন করে অর্থাৎ বাংলাদেশ ও মাদ্রাজ, ইহারা উভয়েই উৎসাহিত হইয়াছিল। কমিশনের বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর হইতে, বিশেষতঃ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পরে কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মোটামুটি বলা যায় যে, ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে কম-বেশী ৪০,০০০ পাউণ্ড প্রস্তুত হইয়াছিল, ১৯৩৮-৩৯এ প্রায় ৪৫,০০০ পাউণ্ড, ১৯৩৯-৪০এ কিছু বেশী ৫০,০০০ পাউণ্ড এবং ১৯৪০-৪১ ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪,৬১০ পাউণ্ডে উপনীত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, ১৯৪২-৪৩এ বাংলা দেশ হইতে ৬০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে। মাদ্রাজ অবশ্য এতটা উন্নতি করিতে না পারিলেও, তাহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ পর্য্যন্ত মাদ্রাজের গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বাৎসরিক কমবেশী ২৩,০০০ পাউণ্ড, পরবর্ত্তী তিন বৎসরে উহার পরিমাণ হয় গড়পড়তা বাৎসরিক ২৫,০০০ পাউণ্ড, ১৯৪২-৪৩এ বাৎসরিক ৩০,০০০ পাউণ্ড আশা করা একেবারেই অসঙ্গত হইবে না। বাংলাদেশের সরকারী কুইনাইন বিভাগ নিজেদের সাফল্য সম্বন্ধে এরূপ স্থিরনিশ্চয় আছেন যে, গত বৎসর (১৯৪১) বাংলা সরকার ভারত সরকারকে এই মর্ম্মে এক সংবাদ দেন যে কুইনাইনের কারখানা ও আবাদের প্রসার সাধন করিয়া

নূতন সিনকোনা আবাদের জন্য জঙ্গল কাটিয়া ক্ষেত প্রস্তুত করা হইতেছে—রঙ্গো

আগামী কুড়ি বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে কুইনাইন সম্বন্ধে স্বয়ংপূর্ণ করিতে পারেন, যদি ভারত সরকার কুইনাইনের নিম্নতম মূল্য সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতি দেন। মাদ্রাজ সরকার অবশ্য এতটা বলিতে পারেন নাই; তবে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার যদি নিম্নতম মূল্য স্থির করিয়া বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজার ঠিকমত দিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা কুইনাইনের উৎপাদন সমধিক বর্দ্ধিত করিতে পারেন।

কুইনাইন সম্বন্ধে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সংক্ষেপে আলোচিত হইলেও একথা সত্য যে বর্ত্তমানে ভারতকে অনেকাংশে আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রবন্ধের শেষে ১৯৩৫-৩৬ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ কুইনাইন আমদানী করা হইয়াছে, তাহার বিশদ তালিকা দেওয়া হইবে। ইহা হইতে ও ইহার পরবর্ত্তী বৎসরের Review of Trade of India নামক ভারত সরকারের প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ বাঁধিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের আমদানী করা কুইনাইনের অর্দ্ধেক আসিত জার্ম্মানী হইতে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জার্ম্মানীর এই অংশ ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জাভা ভাগ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড ৮ লক্ষ টাকার ও জাভা ৫ লক্ষ টাকার কুইনাইন রপ্তানী করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৪০-৪১এ তাহাদের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ১৮ লক্ষ টাকায় উপনীত হইয়াছে।

আমদানী রপ্তানীর তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, য়ুরোপের প্রায় সকল সভ্যদেশেই কুইনাইন প্রস্তুত হয়; কিন্তু এই সূত্রে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কুইনাইনের উপাদান সিন্‌কোনা কিন্তু য়ুরোপে বড় একটা হয় না। শিল্পপ্রধান দেশের ব্যবস্থাই এইরূপ। তাহারা অন্যদেশ হইতে কাঁচা মাল আমদানী করিয়া নিজেদের কারখানাগুলি চালাইয়া থাকেন। যে সিন্‌কোনা নামক গাছের ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত হয়, সেই গাছ ইষ্ট ইণ্ডিজ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, নিউজীল্যাণ্ড, কুইন্স্‌ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ এই কয়টি মাত্র দেশে জন্মে। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীতে যে ১৮টি কুইনাইন কারখানা ছিল তন্মধ্যে অধিকসংখ্যক বড় কারখানাই ছিল,সেই দেশে, যেখানে সিন্‌কোনা নাই। ঐ সময় কুইনাইনের ৫টি কারখানা ফ্রান্সে, ৩টি ইংলণ্ডে, ২টি জার্ম্মানীতে, ১টি হল্যাণ্ডে, ৪টি আমেরিকায়, ২টি ভারতবর্ষে ও ১টি জাভায় ছিল। এই সমস্ত কারখানাগুলি জাভা, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ হইতে সিন্‌কোনার শুষ্ক ছাল আমদানী করিত। ঐ সময় সারা পৃথিবীতে ১,৪০,০০,০০০ হইতে ১,৮০,০০,০০০ পাউণ্ড সিন্‌কোনা ছালের চাহিদা ছিল এবং কুইনাইন বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল আমস্টার্ডাম। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীতে সিন্‌কোনার পূর্ণ চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ এখন জাভা হইতে সরবরাহ হয় এবং জাভার 'কিনা বুরো' (Kina Bureau) এখন পৃথিবীর হাটে এই পণ্যটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। জাভায় কতকগুলি ডাচ্ ধনিকের চেষ্টায় সিন্‌কোনা বাগান চলিতেছে; জাভা সরকার সিন্‌কোনা সম্বন্ধে সামান্যমাত্র গবেষণা করিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। ভারতবর্ষে যে ভাবে চা বাগান গড়িয়া উঠিয়াছে,জাভার সিন্‌কোনা বাগানগুলির অবস্থাও সেইরূপ। জাভার 'কিনা বুরো' সিন্‌কোনা বাগানের মালিকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এবং এই বুরো হইতে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে। বলিতে গেলে, কিনা বুরোই পৃথিবীতে সিন্‌কোনার একচেটিয়া ব্যবসা করিতেছে। বর্ত্তমানে জাভা জাপানের হস্তগত হওয়ায় কুইনাইন সম্বন্ধে মিত্রশক্তির শঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক।

সিন্‌কোনা ও কুইনাইনের জন্মকথা

যে সিন্‌কোনা ও কুইনাইনের ব্যবহার আজ সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই সিন্‌কোনা পাশ্চাত্য সভ্য জগতে মাত্র তিনশত বৎসর

* ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল এবং ১৯২৮ জুলাই মাসে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ভারতীয় পল্লীর আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধানকল্পে ইহাই প্রথম কমিশন এবং ইহারা সর্ব্বদিক দিয়া ভারতীয় পল্লীর বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে প্রথম পরিচিত হইয়াছিল এবং কুইনাইন মাত্র একশত বৎসর পূর্ব্বের জিনিষ। সিন্‌কোনা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম অংশে অবস্থিত এণ্ডিজ্ নামক গিরিমালার একটি বৃক্ষ।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কলম্বস তাঁহার তৃতীয়বারের সামুদ্রিক অভিযানে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্বকূলে গমন করিয়াছিলেন এবং এই দিকেই স্পেনের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পরে ১৫১১ খৃঃ Vasco Nunez de Balbao পানামা যোজক পার হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম কূলে আসিয়া উপনীত হন এবং এই দিকটি অধিক সুবিধাজনক বোধে ১৫১৯ খৃঃ অতলান্তিক উপকূলস্থ ড্যারায়ম নামক স্থান হইতে স্পেনীয় উপনিবেশের প্রধান ঘাঁটী প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে অবস্থিত পানামায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই স্থান হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ভাগ ধরিয়া উত্তর ও দক্ষিণের অভিযান চলিতে থাকে এবং ১৫২৭ খৃঃ Francisco Pizarro পেরু আবিষ্কার করেন। পেরুতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বহুদিন ধরিয়া ঘরোয়া ও বৈদেশিক যুদ্ধ চলিবার পর ১৫৬০ খৃঃ শান্তি স্থাপিত হয় এবং ঐ বৎসর হইতে পেরু শাসনের জন্য স্পেন হইতে বড়লাট নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

এই সময় হইতেই উৎসাহী জেসুইট পাদ্রীগণ পেরুতে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য আগমন করেন এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে এই পাদ্রীগণই দেশীয় লোকের নিকট হইতে সিন্‌কোনা গাছের ছাল গুঁড়া করিয়া জ্বরের উপশম করিবার জন্য সেবন করিতে শিক্ষা করেন। কলম্বিয়া, ইকয়েডর, পেরু এবং বলিভিয়ার মধ্য দিয়া যে এণ্ডিজ্ নামক গিরিমালা বিস্তৃত রহিয়াছে, সেই পর্ব্বতের উপর ২,৫০০ হইতে ৯,০০০ ফিট্ উচ্চতায় উত্তর অক্ষাংশ ১০° হইতে দক্ষিণ অক্ষাংশ ১৯° পর্য্যন্ত প্রায় ,,৭০০ মাইল-ব্যাপী পার্ব্বত্য অরণ্য জুড়িয়া সিন্‌কোনা গাছ আপনা হইতেই জন্মিত। পেরু দেশের ভাষায় সিন্‌কোনা গাছের ছালের নাম 'কুইনাকুইনা' (quinaquina), কুইনা অর্থে গাছের ছাল এবং কুইনাকুইনা অর্থে যে-ছালের ভেষজ গুণ আছে।

পেরুতে বড়লাট নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পর সপ্তদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে count of cinchon ঐ দেশে বড়লাটরূপে প্রেরিত হন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে পেরুতে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রী, countess af cinchon জ্বরে আক্রান্ত হন এবং কুইনাকুইনা সেবনে সুস্থ হন। বড়লাট পত্নীকে রোগমুক্ত করিয়া অসভ্য ও বিজিত জাতির কুইনাকুইনা এতদিন পরে প্রতিপত্তি লাভ করে এবং ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে য়ুরোপ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় লাটপত্নী উক্ত কুইনাকুইনা স্বদেশে আনয়ন করেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি য়ুরোপে আসিয়া উপস্থিত হন। ইতিহাসের জ্ঞাতসারে কুইনাকুইনার এই প্রথম য়ুরোপখণ্ডে পদার্পণ।

জেসুইট্ পাদ্রীগণ ইতিপূর্ব্বেই কুইনাকুইনার ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। এখন অর্থাৎ রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিবার পর হইতে জেসুইটগণ উহাকে য়ুরোপে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় য়ুরোপে কুইনাকুইনা Countess' Bark বা Jesuits' Bark নামে পরিচিত হয়। উক্ত ছাল গুঁড়া অবস্থায় স্পেনে বিক্রয় হইত এবং উহা countess powder নামে অভিহিত ছিল।

কিন্তু এতাবৎকাল সিন্‌কোনা গাছ সম্বন্ধে কাহারও সঠিক জ্ঞান ছিল না। ১৭৩৫ খৃঃ হইতে ১৮৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় গবেষকগণ দক্ষিণ আমেরিকায় যে শতাধিক বর্ষব্যাপী তথ্যানুসন্ধান কার্য্য চালাইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা সুইডেন নিবাসী Carolus Linnaues (জন্ম ১৭০৭—মৃত্যু ১৭৭৮) সিন্‌কোনা গাছ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গবেষণা করিয়া Cinchon মহিষীর সম্মানার্থে ইহার নাম দেন "Cinchona"। এই সিন্‌কোনার ছাল গুঁড়া করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুইটি দশক পর্য্যন্ত য়ুরোপে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত, পরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহা হইতে ক্ষারবস্তু নিষ্কাসনের প্রণালী আবিষ্কৃত হয় এবং ঐ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গবেষণা করিয়া তবে সিন্‌কোনা ছাল হইতে নিষ্কাসিত বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষার সম্বন্ধে গবেষকগণ স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিয়াছেন। সিন্‌কোনা ছালের পেরুদেশীয় আদিম নাম কুইনাকুইনা, হইতেই এই ছাল নিষ্কাসিত প্রধানতম ক্ষারের নামকরণ হয় কুইনাইন (Quinine)।

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের দিক দিয়া আলোচনা করিলে বলিতে হয় যে, সিন্‌কোনা গাছ কম করিয়া ত্রিশ চল্লিশ প্রকারের আছে, তন্মধ্যে ঔষধের জন্য তিনটি শ্রেণী সবিশেষ উপযোগী। তাহারা যথাক্রমে :—

(১) সিন্‌কোনা ক্যালিসয়া (Cinchona Calisaya), (২) সিন্‌কোনা অফিসিনালিস্ (Cinchona Officinalis) এবং (৩) সিন্‌কোনা সাকিরুব্রা (Cinchona Succirubra)। সিন্‌কোনা ক্যালিসয়াকে আবার অনেকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তন্মধ্যে লেজারিয়ানা (Cinchona Calisaya, variety Ledgeriana) বিশেষ বিখ্যাত। এই প্রত্যেক শ্রেণীর সিন্‌কোনার আবিষ্কার ও ব্যবহারের প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন :—

ঢালু পাহাড় কাটিয়া সিনকোনার আবাদভূমি প্রস্তুত করা হইতেছে

(১) সিন্‌কোনা ক্যালিসয়া—ইহা হইতে পীত রঙের ছাল হয়। এই গাছের বীজ ওয়েডেল্ (Weddell) সাহেব কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম য়ুরোপে প্রেরিত হয় এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে এই গাছ হইয়াছিল। ফ্রান্স হইতে একটি গাছ পর্ত্তুগীজদের উপহার দেওয়া হয় এবং সেই গাছটিই পরে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের জাভায় আনীত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জাভায় এই শ্রেণীর সিন্‌কোনাই বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই ক্যালিসয়া সিন্‌কোনারই অপর একটি রূপান্তর সিন্‌কোনা লেজারিয়ানা। এই লেজারিয়ানা লেজার সাহেবের দ্বারা আবিষ্কৃত। তিনি অষ্ট্রেলিয়ার তরফ হইতে দক্ষিণ আমেরিকার আলপাকা বা ঐ জাতীয় ভেড়ার অনুসন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। এই তথ্যসন্ধানী ভ্রমণের সময় তিনি শ্রেষ্ঠ সিন্‌কোনার বীজ সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিয়া এই বীজগুলি সংগ্রহ করেন ও য়ুরোপে আনয়ন করিয়া বিক্রয় করেন। য়ুরোপ হইতে ইহার অধিকাংশই জাভায় পাঠানো হয়, সামান্য অংশ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে ও অতি সামান্য অংশ সিকিমরাজ্যে প্রেরিত হয়। জাভায় এই সকল বীজ হইতে প্রায় বিশ হাজার গাছ হইয়াছিল, নীলগিরিতে যত্নের অভাবে একেবারেই হয় নাই এবং সিকিমে অল্প কয়েকটি মাত্র জন্মে। পরে সিকিম হইতে এই লেজারিয়ানা সিন্‌কোনা বাংলাদেশে আনীত হয় এবং বাংলাদেশ হইতে এই গাছ দক্ষিণ ভারতের ওয়াইনাদ নামক স্থানে

প্রেরিত ও রোপিত হয়। বাংলা দেশের মত মাদ্রাজে এই শ্রেণীর সিন্‌কোনা তেমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই ; এই গাছের বিশেষত্ব এই যে, ইহার ছাল হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কুইনাইন পাওয়া যায় তবে গাছগুলি ছোট বলিয়া ইহা হইতে অধিক পরিমাণে ছাল পাওয়া যায় না। জাভায় গবেষণার দ্বারা এই শ্রেণীর সিন্‌কোনার সহিত অন্য জাতীয় সিন্‌কোনার সংযোগ করিয়া এই গাছ হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে ছাল পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এই বিষয়ে তাহারা এমনই উন্নতি করিয়াছে যে, জাভায় একটি সঙ্কর লেজারিয়ানা গাছ হইতে যে পরিমাণ ছাল পাওয়া যায়, দুইটি খাঁটী লেজারিয়ানা হইতেও তাহা পাওয়া যায় না। অথচ ক্ষার বস্তুর দিক দিয়া সঙ্কর গাছের ছাল খাঁটী গাছের তুলনায় মাত্র শতকরা দশভাগ কম। অর্থাৎ যেটুকু মাত্র জমীতে খাঁটী লেজারিয়ানায় ১০০ পাউণ্ড ক্ষার পাওয়া যায় সেইটুকু জমীতেই সঙ্কর লেজারিয়ানার আবাদ করিলে পাওয়া যাইবে ১৮০। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বিশেষ করিয়া এই সঙ্কর লেজারিয়ানা (Hybrid Ledger) অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে।

তুলনামূলকভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, সঙ্কর সিন্‌কোনা বাদ দিয়া যাবতীয় খাঁটী সিন্‌কোনার মধ্যে লেজারিয়ানা আবাদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। বাংলা সরকার ইহা বহু পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সাকিরুব্রার আবাদ বন্ধ করিয়া লেজারিয়ানা আবাদের জন্য এক নির্দ্দেশ জারী করেন। পরে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে Imperial Council of Agricultural Researchএর প্রধান পুরোহিত উইলসন সাহেব স্পষ্টই বলিয়াছেন * যে, লেজারিয়ানাই বাংলাদেশের উপযুক্ত ফসল। বাংলাদেশের আবাদে এই মতই কাজ চলিতেছে। ১৯৩৭-৩৮এর বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে, বাংলাদেশে সিন্‌কোনায় নিয়োজিত মোট ২,৯২০ একার জমীর মধ্যে ২,০৬৩ একারে লেজারিয়ানার আবাদ রহিয়াছে।

(২) সিন্‌কোনা সাকিরুব্রা—ইহা হইতে লাল রঙের ছাল পাওয়া যায়। ইহা দক্ষিণ ভারতের পাহাড়েই বিশেষভাবে জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে টাঙ্গুর পূর্ব্ব দিকস্থ গিরিশ্রেণীতে, মধ্যভারতের সাতপুরা পর্ব্বতমালায় ও সিকিমের বাগানে এই গাছ বহুল সংখ্যায় আবাদ করা হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই গাছ সংখ্যায় প্রায় তিরিশ লক্ষ ছিল, কিন্তু ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহাদের স্থানে লেজারিয়ানা বসানো হইয়াছিল। ইহার কারণ লেজারিয়ানায় অনেক বেশী পরিমাণে কুইনাইন পাওয়া যায় এবং সাকিরুব্রার তুলনায় লেজারিয়ানা লাভজনক। তবে বাংলাদেশে এখনও এই গাছ আছে। ১৯৩৭-৩৮এর হিসাবে বাংলায় সিন্‌কোনা বাগান ১৬৬৩ একার জমী সাকিরুব্রায় নিয়োজিত বলিয়া জানা যায়। সাকিরুব্রার বাগান দূর হইতে বড় সুন্দর দেখায়। এই গাছগুলির উচ্চতা গড়ে ৫০ ফিট্ এবং ইহার পাতাগুলি ঘন ও গাঢ় হরিৎ বর্ণের। নির্জ্জন গিরিশিখরে ধ্যানস্নিগ্ধ সাকিরুব্রার ধ্যানমৌন মূর্ত্তি ইহাকে নগাধিরাজের উপযুক্ত সন্তান বলিয়াই প্রতিপন্ন করে।

কিন্তু খাঁটী সাকিরুব্রার তুলনায় জাভায় সঙ্কর সাকিরুব্রার সাফল্য-দর্শনে বাংলা দেশে লেজারিয়ানা ও সাকিরুব্রার সংযোগে একপ্রকার মিশ্রিত সিনকোনা গাছ করা হইয়াছে। ইহাতে লেজারিয়ানার ক্ষারগুণ ও সাকিরুব্রার আয়তন পাওয়া যায়। ১৯৩৭-৩৮এ ৬৭৩৫ একার জমীতে এই সঙ্কর সিন্‌কোনা গাছের আবাদ করা হইয়াছিল।

(৩) সিন্‌কোনা অফিসিনালিস—ইহা হইতে ফিকা রঙের ছাল হয়। ইকয়েডর এবং পেরু অঞ্চলে এই জাতীয় সিন্‌কোনা আপনা হইতেই জন্মিত। এই গাছ অপেক্ষাকৃত সরু এবং উচ্চতায় প্রায় ২০ ফিট। ইহার বাগান দূর হইতে অন্ধকার ও ভয়াবহ দেখায়। ইহা নীলগিরি ও সিংহলে সহজে জন্মায়, পূর্ব্বে সিকিমে ইহার বাগান ছিল কিন্তু বাংলাদেশে অধিক বারিপাতের জন্য ইহা পুষ্ট হয় না। সেই জন্য এদেশে এই গাছ করা হয় না। বর্ত্তমানে খাঁটী অফিসিনালিস বাংলার আবাদে একটিও নাই তবে লেজারিয়ানা ও সাকিরুব্রার সংযোগে যেমন সঙ্কর শ্রেণী করা হইয়াছে, সেইরূপ লেজারিয়ানা ও অফিসিনালিসের সংযোগেও একটি সঙ্কর গাছ করার চেষ্টা বাংলাদেশে চলিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না। বাংলা দেশের দুইটি প্রধান আবাদস্থল মাংপু ও মুন্‌সংএর মধ্যে মাংপুতে এই সঙ্কর গাছ নাই, মুন্‌সংএ মাত্র ১৯০৭ একার জমীতে এই গাছ করা হইয়াছে (১৯৩৭-৩৮এর বার্ষিক বিবরণী)।

উপরোক্ত কয়টিশ্রেণী ছাড়া অন্য কোনরূপ সিন্‌কোনা বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংএর পাদদেশে দেখা যায় না। তবে পূর্ব্বে এখানে অন্যান্য শ্রেণীর সিন্‌কোনাও ছিল। উদ্ভিদ্‌বৈজ্ঞানিক ও তথ্য সন্ধানী হুকার সাহেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নেপাল-ভূটান অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া চারি প্রকারের সিন্‌কোনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহারা যথাক্রমে Cinchona Excelsa, Cinchona Gratissma, Cinchona Succirubra ও Cinchona Thyrsiflora *।

সিন্‌কোনা হইতে নিষ্কাসিত ক্ষারবস্তু

সিন্‌কোনা হইতে ক্ষারবস্তু নিষ্কাসন করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। বিভিন্ন প্রকার সিন্‌কোনা গাছের ছাল হইতে প্রধানতঃ চারি প্রকারের ক্ষার দানা বাঁধিয়া থাকে। এই ক্ষারগুলিই বর্ত্তমানে ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাহারা যথাক্রমে :—

১। কুইনাইন (Quinine)
২। কুইনিডীন্ (Quinidine)
৩। সিন্‌কোনীন্ (Cinchonine)
৪। সিন্‌কোনীডিন্ (Cinchonidine)

এ ছাড়া দানা বাঁধে না এরূপ একটি ক্ষারও আছে (Amorphons Alkoloid)।

উপরোক্ত সমস্ত ক্ষারগুলিই ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে কুইনাইন বিশেষভাবে উপযোগী বলিয়া ইহাই জনপ্রিয় ও সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছে। উপরন্তু ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। অপর ক্ষারগুলির মধ্যে কোনটি হৃদ্‌রোগের জন্য, কোনটি বা সাধারণ দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে সিন্‌কোনা হইতে ক্ষার নিষ্কাসন প্রণালী প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে ত্রিশবৎসর ধরিয়া নানারূপ গবেষণা করিয়া বিভিন্ন প্রকার কুইনাইন ও ক্ষারদ্রব্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১৮২০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিন্‌কোনা গাছের ছাল গুঁড়া করিয়া ঐ অবস্থাতেই ঔষধরূপে সেবিত হইত, এমন কি ঐরূপ প্রাকৃতিক অবস্থাতেই ইহা ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিস ফার্ম্মাকোপিয়ার (B. P.তে) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কুইনাইন আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে ঔষধের জন্য সিন্‌কোনা চূর্ণ আর বড় ব্যবহৃত হয় না। সিন্‌কোনা-লব্ধ নানাজাতীয় ক্ষারই বিভিন্ন উপায়ে প্রয়োগ করা হয়।

বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া এবং ক্ষেত্রবিশেষে কালাজ্বরেও কুইনাইনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কুইনাইনের চারিটি উপাদান চিকিৎসার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ :—

(১) কুইনাইন সালফেট (Quinine Sulphate)—ইহা ৮০০ ভাগ জলে বা শতকরা ৯০ ভাগ শক্তির ৬৫ ভাগ সুরাসারে দ্রবণীয়। ইহাতে শতকরা ৭২ভাগ ক্ষারবস্তু আছে। সালফেট সহজে দ্রবণীয় নহে

* Report on the Prospects of Cinchona Cultivation in India by A. Wilson (1939)—Imperial Council of Agricultural Research, Miscellaneons Bulletin No. 29.

* J. D Hooker—Flora of British India vol. iii 1882.

বলিয়া ইহা সাধারণতঃ ডাক্তারখানায় দ্রবীভূত করিয়া মিক্‌শ্চাররূপে রোগীকে দেওয়া হয়। ইহা গুঁড়া বা বটীকা আকারে সেবন করিলে ফললাভ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সকল প্রকার কুইনাইনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

(২) কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড (Quinine Hydrochloride)—ইহা ৩৬ ভাগ জলে বা ৯০ ভাগ শক্তির দুইভাগ সুরাসারে দ্রবণীয়। ইহাতে শতকরা ৮১ভাগ ক্ষারবস্তু আছে। সাধারণতঃ ইহার ৩ গ্রেণ, ৪ গ্রেণ ও ৫ গ্রেণ বটীকা শর্করা মণ্ডিত অবস্থায় বাজারে বিক্রীত হয়।

(৩) কুইনাইন বাই-হাইড্রোক্লোরাইড (Quinine Bihydrochloride)—ইহা একভাগেরও কম পরিমাণে জলে দ্রবণীয়। সেইজন্য ইহা বটীকা আকারে সেবন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ করা যায়। সূচী-চিকিৎসার জন্য এই কুইনাইন ব্যবহৃত হয়। বটীকা আকারে ইহা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

(৪) কুইনাইন ট্যানেট (Quinine Tannate)—তিক্ততার জন্য কুইনাইন বিখ্যাত এবং এই জন্যই ইহা শিশুদের পক্ষে সেবন করা বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়ে। কুইনাইন ট্যানেটে এই অসুবিধা নাই, ইহা স্বাদহীন। ইহা দুধ বা চিনির সহিত মিশাইয়া শিশুদের সেবন করানো চলে। ইহার অসুবিধা এই যে ইহাতে ক্ষারবস্তু শতকরা মাত্র ৩৪ ভাগ। সেই জন্য ইহা অধিক পরিমাণে সেবন না করাইলে উপকার পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত চারিপ্রকারের কুইনাইনের মধ্যে বাইহাইড্রোক্লোরাইড সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী এবং সেইজন্যই ইহা সেবনে কুইনাইনের কুফলগুলি (ইংরাজীতে Quinnism অর্থাৎ কান ভোঁ ভোঁ করা ইত্যাদি) সময় সময় রোগীকে ব্যস্ত করে। কুইনাইনের এই সমস্ত কুফলগুলি কমাইবার জন্য ইহা হইতে 'এরিষ্টোচিন', 'প্লাস্‌মোচিন' ইত্যাদি প্রস্তুত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইনের সমকক্ষ আর একটি ঔষধ রঙের উপাদান হইতে প্রস্তুত হইয়া বাজারে চলিতেছে, ইহার নাম 'এটেব্রিন'। কিন্তু কোন ঔষধই কুইনাইনের ন্যায় সুলভ এবং আশু উপকারী নয়। এছাড়া বিভিন্নরূপ জ্বরহারী ভেষজের উল্লেখ উদ্ভিদবিজ্ঞানে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহই সিন্‌কোনার মত কার্য্যকরী নহে, বা কোন গাছ হইতেই কুইনাইনের ন্যায় উপযুক্ত ঔষধ নিষ্কাসন করা যায় বলিয়া আজও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

বটীকা, চূর্ণ এবং তরল এই তিন আকারে কুইনাইন সেবন করা চলে এবং ইহা গলাধঃকরণ করিয়া, মাংসপেশী বা ধমনীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া (By intramuscular injection, by intravenous route), গুহ্যদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া এবং বিশেষ ক্ষেত্রে বস্তিদেশ বিদ্ধ করিয়া (Lumber puncture) রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। সেবনের সুবিধার জন্য কুইনাইন বটীকা আকারেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু চিকিৎসার দিক দিয়া বটীকা তেমন উপযোগী নহে,কারণ ইহা উদরে গিয়া দ্রবীভূত হইয়া রক্তের সহিত মিশিতে অনেক সময় লাগে,অনেক সময় দেহে কোন ক্রিয়া না করিয়াই মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই জন্য সূচী-চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী, কারণ ইহাতে কুইনাইন একেবারেই রক্তের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়। ম্যালেরিয়ার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক Coptain A. Cecil Alport তাঁহার Malaria and its treatment নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'To rely on quinine tablets in the treatment of malaria is to gamble with the health of the patient, if not with his life'। তিনি গুঁড়া ও তরল আকারে কুইনাইন সেবন অপেক্ষাকৃত অধিক কার্য্যকরী বলিয়া মনে করেন। তবে সেবনের সুবিধার জন্য শর্করামণ্ডিত বটীকাই অধিক লোভনীয়। বাংলা দেশের Director of Public Health ডাক্তার Chas A. Bentley
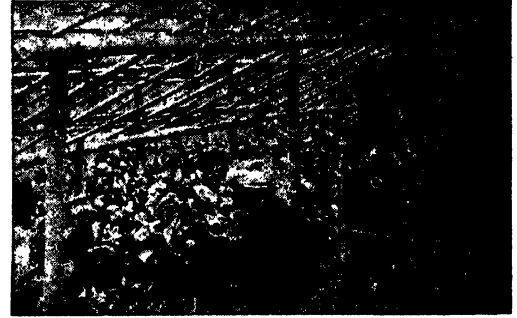
সিন্‌কোনা নার্শারী .

M.B., D.P.H. তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন, 'Sugar-coated tablets are practically essential if quinine is to become popular for use.*

* ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত Quinine Policy নামক পুস্তক-পৃষ্ঠা ১১। বইখানি বিক্রয়ের জন্য প্রকাশিত হয় নাই। for official use ইহা ছাপা হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

প্রার্থনা

শ্রীবীণা দে

ফুলের মতন কর মোর মন,
অমনি কোমল, নিরমল ;
অমনি শান্ত, স্নিগ্ধ অমনি
উজল, পূর্ণ-পরিমল।

অমনি বিচার ছাড়ি একেবারে
বিলাইতে যেন পারি আপনারে,
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে ভরা
ব্যথার-শিশিরে ঝলমল।

ফুলের মতই শোভা সুষমায়
মর্ত্ত্যে স্বর্গ গড়ি'—
কাজ শেষ হ'লে, ফুলেরই মতন
ঝরিয়া যেন গো পড়ি।

স পর্য্যগাৎ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্ ।
অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্ ॥...

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

তোমার হউক জয় !
হে মণীষী, কবি, অব্রণ, অকায়,
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় !
তোমার হউক জয় !

অপাপবিদ্ধ ! অজর, অমর, চির,
তারায় তারায় গগনে গগনে ফির।
নিখিল প্রাণীর প্রাণরসধারা
তোমাতে অভ্যুদয় !
তোমার হউক জয় !

প্রাকৃত সাহিত্যের কয়েকজন নারী কবি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্যের নারী-কবিদের মত প্রাকৃত সাহিত্যের নারী কবিরাও ভাবকুশলা এবং ভাষায় সিদ্ধহস্তা। বাস্তবিক পক্ষে ভাব ও ভাষার দিক থেকে প্রাকৃত সাহিত্যের নারী-কবিদের রচনা বিশিষ্টতর বলে মনে হয়। প্রেম—উভয় সাহিত্যের নারী-কবিদের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু; সংস্কৃত সাহিত্যের নারী-কবিরা মাঝে মাঝে যেমন শ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যান, প্রাকৃত সাহিত্যের নারী-কবিরা তার থেকে প্রায়ই বিরত থাকেন।

এ প্রবন্ধে আমরা কেবল নয়জন প্রাকৃত সাহিত্যের নারী-কবির বিবরণ লিপিবদ্ধ করব। তাঁদের নাম :—১. অবন্তিসুন্দরী ; ২. অনুলক্ষ্মী ; ৩. অসুলদ্ধী ; ৪. মাধবী ; ৫. প্রহতা ; ৬. রেবা ; ৭. রোহা ; ৮. শশিপ্রভা ; এবং ৯ বদ্ধাবহী। এ নয়জনের মধ্যে অবন্তিসুন্দরী ব্যতীত আর সকলের নাম হালের গাথাসপ্তশতীতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতপৈঙ্গলে লক্ষ্মীনাথ ভট্ট বলেছেন—সংস্কৃতে ত্বাদ্যকবির্বাল্মীকিঃ। প্রাকৃতে শালিবাহনঃ। ভাষা-কাব্যে পিঙ্গলঃ। হাল সাতবাহন ও শালিবাহন একই ব্যক্তি। হাল যে খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং অবন্তিসুন্দরী ব্যতীত অন্যান্য সব নারী-কবিরা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে ভারত জননীর অঙ্ক আলোকিত করেছিলেন।

অবন্তিসুন্দরী সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি রাজশেখরের পত্নী। তিনি ছিলেন চৌহান কুলোদ্ভবা, সুতরাং ক্ষত্রিয়া এবং রাজশেখরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ প্রেমমূলক, সন্দেহ নাই। রাজশেখর তাঁর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কর্পূরমঞ্জরী নামক গ্রন্থে রাজশেখর বলছেন যে তিনি উক্ত গ্রন্থ তাঁর পত্নীর অনুরোধ অনুসারে প্রণয়ন করেছিলেন।[১] কাব্য-মীমাংসা নামক গ্রন্থে পতিসাদরে পত্নীর অভিমত তিনবার উদ্ধৃত করেছেন।[২] হেমচন্দ্র তাঁর দেশী-নামমালা গ্রন্থেও অবন্তিসুন্দরীর মতামত উদ্ধৃত করেছেন।[৩] অবন্তীসুন্দরী যে উচ্চদরের কবি ও আলঙ্কারিক ছিলেন, উপরিলিখিত কারণ থেকে তা' বিশেষ করে' প্রতীয়মান হয়।

১। অবন্তিসুন্দরী

দেশীনামমালায় অবন্তিসুন্দরীর তিনটী কবিতা উদ্ধৃত হয়েছে; ১। একটী বিরহিনীর উক্তি বিষয়ক[৪]; ২। একটী বিরহীর উক্তি বিষয়ক[৫] ৩ ও তৃতীয়টী পতির উপহাসমূলক[৬]। প্রথম দুটী কবিতায় বিরহিনী ও বিরহীর চিত্র সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। উভয়ে উভয়ের প্রত্যাশী; অথচ কি যেন দুর্ভেদ্য প্রাচীর উভয়ের মধ্যে বিরাজমান। দুর্জয় অভিমান মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে; এর উন্নত মস্তক অবনত করে কে? তৃতীয় কবিতাটীতে দেখা যায় পতি বলছেন তিনি পত্নীসর্বস্ব, পত্নীই তাঁর ইহকাল, পত্নীই তাঁর পরকাল।

২। অনুলক্ষ্মী

অনুলক্ষ্মীর চারটী কবিতা গাথা-সপ্তশতীতে উদ্ধৃত হ'য়েছে। তিনটী কবিতায়[৭] ক্রমিক বিশ্লেষণে দেখা যায় কি করে নারী ক্রমে ক্রমে অনিচ্ছুক পুরুষকে নিজের বশে আনতে পারে। আর চতুর্থ কবিতাটী[৮] বস্তুবর্ণনমূলক।

৩। অসুলদ্ধী

গাথা সপ্তশতীতে অসুলদ্ধীর দুটী কবিতা উদ্ধৃত হ'য়েছে—১। একটী প্রোষিতভর্তৃকা-বর্ণনমূলক ২। ও অন্যটী দূত্যুক্তি-বিষয়ক। প্রথম কবিতায় বর্ষাগমে কদম্ববিকাশে প্রোষিতভর্তৃকা মৃত্যুসকাশে উপনীতা হচ্ছেন এবং দ্বিতীয়ে তিনি দূতীর দুর্ঘটন ঘটনপটীয়সী বিদ্যায় পারদর্শিতা হেতু নায়িকা ক্রমে ক্রমে হৃত বল ফিরে পাচ্ছেন; কারণ, দূতী প্রিয়ের সঙ্গে তাঁর মিলনের পথ সুগম করে তুলছেন।

৪। মাধবী

মাধবীর একটীমাত্র কবিতা আমাদের জানা আছে—কিন্তু এ একটাই শত কবিতার চেয়েও মূল্যবান্। কারণ, কি ধরণের প্রিয় প্রিয়াদের সত্যি আদরের—তা' এ কবিতাতে বলা আছে। দূতী নায়ককে বলছেন—যে সব স্বামী প্রভুত্ব ভাব গোপন করে, কুপিতা প্রিয়াকে দাসের মত সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করে, তারাই বাস্তবিক মহিলাদের প্রিয় হয়; অন্যেরা সব হতভাগার দলে।[১০] আপাতদৃষ্টিতে কথাটা তো, ঠিক কিন্তু ইহা বাস্তবিক সত্য কি? নাকি—কবিতাটী উপহাসমূলক?

৫। প্রহতা

গাথা-সপ্তশতীতে উদ্ধৃত প্রহতার একটীমাত্র কবিতায়[১১] স্বাধীন-পতিকা নায়িকার চরিত্র সুন্দররূপে বর্ণিত হ'য়েছে। ঈদৃশী নায়িকা স্বামীকে একহাতে প্রহার করে, অন্য হাতে হেসে হেসে স্বামীর কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে। তার ভাবই বেপরোয়া; স্বামীকে দাবিয়ে রাখার গৌরব জগতে বিঘোষিত করাই তার জীবনের যেন সবচেয়ে বড় আনন্দ।

৬। রেবা

রেবার একটী কবিতায় খণ্ডিতা নারী এবং আর একটী কবিতায় কলহান্তরিতা নায়িকার[১৩] মনোভাব অতি মধুরভাবে বিবৃত হ'য়েছে। কোপকষায়িতা নায়িকা তাঁর প্রিয়কে বলছেন—হে লজ্জাহীন! তোমার দোষ বার বার যে ক্ষমা করতে বলছ, কোন্ দোষগুলি আমি ক্ষমা করব; যা আগে করেছিলে, এখন যা করছ বা যা পরে করবে, ঠিক কোন্গুলো? অন্য কবিতায় বর্ণিত কলহান্তরিতা নায়িকার অভিমান বাইরের দিক

১। চাহুআণ কুল-মলি-মালিআ রাঅ সেহর-কইন্দ-গেহিনী।
ভত্তুণো কিইমবন্তিসুন্দরী সা পউঞ্জই উমেঅমিচ্ছই ॥
প্রস্তাবনা, কবিতা১১ ॥

২। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্ট্যাল সিরিজ, পৃঃ ২০, ৪৬ এবং ৫৭।

৩। নীচে দেখুন।

৪। কিং তং পি হ বীমরিঅং, ইত্যাদি। দেশীনামমালা, ১, ১৫৭।

৫। ঋণ-মিত্ত-কলুসিআএ, ইত্যাদি।

৬। উবহসএ এরাণিং, ইত্যাদি।

৭। জং তু, জঅ সঈ ইত্যাদি; ণবি তহ ইত্যাদি, দিট-মূল-বন্ধ ইত্যাদি।

৮। হসিঅং সহত্থতালং, ইত্যাদি।

৯। সহি দুম্মেন্তি কলম্বাইং, ইত্যাদি; ণাহং দূঈণ তুমং, ইত্যাদি।

১০। ণূমেন্তি যে পহুত্তং কুবিঅং দাসা ব্ব জে প্রসাঅঅন্তি, ইত্যাদি।

১১। ১, ৮৬—এক্কং প্রহরুব্বিগ্নং, ইত্যাদি।

১২। গাথা-সপ্তশতী -১, ৯০, কিংদাব কথা, ইত্যাদি। খণ্ডিতা নারীর লক্ষণ—দশরূপকে—জ্ঞাতেঽন্যাসঙ্গ-বিকৃতে খণ্ডিতের্ষ্যা কষায়িতা ॥

১৩। ঐ, ১, ৮৭—অবলম্বিঅ—মাণ-পবম্মুহীএ, ইত্যাদি।

থেকে প্রচণ্ড, অচল, অটল ; কিন্তু তাঁর অন্তর্দেশ করুণরসবিমিশ্রিত। সখী তাঁকে সম্বোধন করে বলছেন—মানিনি! তোমার মানের বালাই নিয়ে যে বড় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এগিয়ে যাচ্ছ ; এদিকে প্রিয়ের পশ্চাদ্ গমনে অধীর তোমার পৃষ্ঠদেশ যে আপনা থেকেই কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌ছে এবং তাতে তোমার সম্মুখস্থিত হৃদয়ের স্বরূপ তো সহজেই ধরা পড়্‌ছে।

৭। রোহা

রোহার দূতী নিতান্তই এ সংসারের লোক ; কথা তার সোজাসুজি। সে কলহান্তরিতা কোনও নায়িকাকে বল্‌ছে[১৪]—যাকে ছাড়া বাঁচা যায় না—অপরাধযুক্ত হ'লেও তাকে অনুনয় করতেই হয় ; আগুন নগর পোড়ায় ঠিকই ; তা' বলে সে কার প্রিয় নয় ?

৮। শশিপ্রভা

কবি শশিপ্রভার নায়িকা সব সময়েই এক পা এগিয়ে আছেন ; দূতীর মুখ থেকে কিছু শোনবার তাঁর অপেক্ষা নাই। বরং বিপরীতভাষিণী দূতীকেই তিনি বল্‌ছেন[১৫]—প্রিয়ের বাঁশীর সুরে আমি নাচি, সে বিষয়ে কি আর করা যায়, বল ? গাছ স্বভাবতই নিস্তব্ধ ; কিন্তু তা' বলে লতা কি আর তাকে জড়ায় না ?

৯। বদ্ধাবহী

বদ্ধাবহীর নায়িকা ভয়েই অস্থির। প্রোষিতভর্তৃকা তিনি—বিরহের চিরশত্রু বর্ষাকাল এলেই যে তাঁকে একেবারে সশরীরে গ্রাস করবে। সখী তাঁকে আশ্বস্ত করছেন—প্রোষিতভর্তৃকে! ঐ যে দূরে কাল কাল পুঞ্জীভূত জিনিষ দেখ্‌ছো, তা' মোটেই নূতন বর্ষাকালীন মেঘ নয় ; ঐগুলি গ্রীষ্মে দাবাগ্নি-দগ্ধ বিন্ধ্যপর্বতের শিখর বিশেষ।[১৬]

প্রাকৃত সাহিত্যের নারী-কবিরা স্বভাবসিদ্ধ সরলতা ও স্নেহে পরিপ্লুত হ'য়ে অভিনব ভঙ্গীতে কবিতায় স্বকীয় ভাব ব্যক্ত করেছেন। প্রেমের গোপন রূপ তাঁদের নিপুণ তুলিতে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে অপূর্বভাবে। নারী কবিদের রচনায় বিভিন্ন নায়িকার মনোগত ভাব বিশ্লেষণ অতি উপাদেয় ও উপভোগ্য।

১৪। গাথা-সপ্তশতী, ২. ৬৩—জেণ বিণা ণ জিবিজ্জই, ইত্যাদি।

১৫। গাথা-সপ্তশতী, ৪, ৪।

১৬। গাথা-সপ্তশতী, ১. ৭০—গিম্হে দবাগ্গি-মসি-মইলিআইং, ইত্যাদি।

'তৃণপত্রে'র কবি—হুইট্‌ম্যান

শ্রীপ্রভাত হালদার

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বের কথা, এমর্শিন যখন সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলেন—ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান একজন অসাধারণ কবি, আর তাঁহার রচিত Leaves of Grass. 'তৃণপত্র' একখানি রত্ন ভাণ্ডার। তখন সাধারণের দৃষ্টি এই জ্ঞানী ও উদার কবির দিকে পড়িল। ইহার আনুমানিক ঘটনা কাল প্রায় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু আজিও সেই তৃণপত্রের কবি আপনার বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে অমর হইয়া আছেন।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নিউ ইয়র্কের লং দ্বীপে ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের জন্ম হয়। তাঁহাদের অবস্থা অতি সাধারণ ছিল। নয়টি ভায়ের মধ্যে হুইট্‌ম্যান ছিলেন দ্বিতীয়। সামান্য চাষ আবাদ ছাড়াও হুইট্‌ম্যানের পিতা ছুতারের কাজ করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এক পক্ষ ছিলেন ইংরাজ এবং অপর পক্ষ ছিলেন ওলন্দাজ। তাঁহারা প্রথমে নাবিক হইয়া এই দেশে পদার্পণ করেন, কিন্তু কিছুদিন এই স্থানে থাকিবার পর চাষ আবাদ করিয়া কায়েমীভাবে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লন।

উত্তরাধিকার সূত্রে হুইট্‌ম্যান পাইয়াছিলেন সমুদ্রের উপর আজন্ম ভালবাসা এবং সবুজ প্রান্তরের উপর আন্তরিক টান। হুইট্‌ম্যান কিন্তু বেশী দিন তাঁহার জন্ম স্থানে থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পরিবারের সকলকেই ব্রুকলীনে চলিয়া যাইতে হয়। ব্রুকলীনে যাইবার পূর্ব্বে তিনি কিছু কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রুকলীনে পৌঁছিয়া তাঁহার লেখাপড়ার ব্যাঘাত ঘটে, কারণ সেই সময়ে তাঁহাকে সাধারণ সংবাদ আদান প্রদানের দূত হিসাবে কাজ করিয়া কিছুদিন উপার্জ্জন করিতে হয়। তাহার কিছুদিন পরে পুনরায় লেখাপড়া শিখিবার কিছু সুবিধা হয় ও এই স্থানে লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাঙ্কনও শিক্ষা করিতে থাকেন। ইহার পর তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিলেন। শিক্ষকতা তাঁহার অধিক দিন ভাল লাগে নাই, সেই কাজ ছাড়িয়া তিনি সংবাদপত্রের অফিসে কাজে ঢুকিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি ব্রুকলীনের বিখ্যাত পত্রিকা ব্রুকলীন ঈগলের সম্পাদক মণ্ডলীর মধ্যেও কিছু দিন অতিবাহিত করেন। এই পত্রিকার কাজ ছাড়িয়া তিনি আরও দক্ষিণাভিমুখী নিউ অর্লেন্সস্ ক্রসেন্ট পত্রিকায় লিখিতে সুরু করেন।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি সকল পত্রিকার কাজ ছাড়িয়া পুনরায় ব্রুকলীনে ফিরিয়া আসেন এবং ব্রুকলীনে ফিরিয়া ঘর বাড়ী কেনা বেচার কাজ করিতে থাকেন, আর মাঝে মাঝে পত্রিকার গল্প উপন্যাস লিখিতে থাকেন। সেই সকল গল্প উপন্যাস তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না তথাপি কেমন মোহের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এগুলি লিখিয়া যাইতেন। এই সকল রচনায় তাঁহার কোনও উচ্চ প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ইহারই অল্প দিন পরে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কবিতার বই 'Leaves of Grass' তৃণপত্র প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বসাধারণে তাঁহার প্রতিভা স্বীকৃত হয়।

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান কোনদিনই স্বদেশের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধকে সমর্থন করিতেন না। কিন্তু ওয়াশিংটনের সামরিক চিকিৎসাকেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কিছুদিন কাজ করেন। এই যুদ্ধের সময়ে তিনি যুদ্ধ সম্পর্কীয় কিছু কিছু কবিতা রচনা করেন। যাহাকে তিনি Dram Traps বা 'দামামার ফাঁদ' বলিতেন। এই কবিতাগুলি Leaves of Grassএর অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে।

যুদ্ধের পর তিনি কিছু দিন গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটি চাকুরী লইয়া ওয়াশিংটনে অবস্থান করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং নিউ জার্সির অন্তর্গত ক্যামডেন নামক স্থানে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৮৯২ খৃষ্টাব্দ) বসবাস করেন।

নিউ জার্সিতে অবস্থান কালে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর Democratic Vesta এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে Specimen Days in America নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান ছিলেন চিরকুমার।

John Burroughs বলেন—ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান জীবনের প্রথম হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত, স্বাধীন, উদারচেতা, অমায়িক, প্রকৃতির লোক ছিলেন।

হুইট্‌ম্যানের মত কোন কবি এ পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আপন মত বজায় রাখিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান যাহা রচনা করিয়াছেন তাহার প্রতি পদই প্রায় আত্ম-বৈপ্লবিক সুরে ভরপুর। স্বাতন্ত্র বজায় রাখিয়া তিনি চিরকালই বলিয়া আসিয়াছেন—"আমি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান—প্রকৃতির মতই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী।"

তাঁহার কাব্যের মধ্যে আমরা পাই—

—"Comredo ! this is no book ;
Who touches this, touches a man."

"বন্ধু ! একি কালির লিখন—শুধুই কালির লেখা ?
স্পর্শে ইহার সত্যিকারের মিলবে লোকের দেখা।"

এই প্রকার কাব্যের মধ্যেই তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

হুইটম্যানের কাব্যের মধ্যে পুরুষত্বের ছাপ প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পুরুষোচিত হুঙ্কার আমরা পাই তাঁহার কাব্যে। তাঁহার সম-সাময়িক একজন তাঁহার চেহারার বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন—

He was quite six feet in height, with a frame of gladiator, a fl wing gray beard mingled with the l airs on his broad, slight beard chest, In his well laundried shirtsleevs, with trousers frequently pushed into his boot-legs, his fine head covered with an immense slouch black or light felt hat, he would walk with a naturally majestic stride, a massive model of ease and independence."

হুইট্‌ম্যান ছিলেন গণতন্ত্রের কবি। তিনি আপনাকে ভালবাসিতেন, কারণ প্রকৃত জীবনের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন আপন আত্মায়। সেইজন্যই তিনি পৌরুষের জয়গান করিতে পারিয়াছেন। ক্ষীণ, দুর্ব্বলকে তিনি কোনদিনই আমল দেন নাই। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল—

"Muscle and pluck for ever,"

তিনি চিরদিন জীবনকে ভালবাসিয়া আসিয়াছেন এবং চিরদিন জীবনকে ভালবাসিতে বলিয়াছেন। সেন্ট ফ্রান্সিসের মত ইনিও বলেন, একমাত্র ভালবাসার দ্বারা এই পৃথিবীকে রক্ষা করা যাইতে পারে। সেই কারণে তিনি গণতন্ত্রের জয়গান করিয়াছেন,—

For you O' Democracy.

Come and I will make the continent indissoluble
I will make the most splendid race the Sun ever shone upon,
I will make divine magnetic lands,
With the love of comrades,
With the life long love of comrades.

হুইট্‌ম্যানের বন্ধুত্ব আদি রসাত্মক। এই বন্ধুত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি তাঁহাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে স্থানে তিনি বলিয়াছেন—

Yet underneath Socrates I dearly see
And underneath Christ the divine I see,
The deer love of man for his comrade,
the attraction of friend to friend.

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের মতবাদ অনুযায়ী দেখা যায়—তিনি সমাজতন্ত্রবাদ অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যবাদকেই বেশী স্বীকার করেন। সমাজতন্ত্রবাদ যে এককালে স্বাতন্ত্র্যবাদে আসিয়া দাঁড়াইবে এমন কথাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন—

"Each man to himself, each woman to herself is the world of past and present and the true word of immortality.

No one can acquire or another—not one
No one can grow for another—not one.

হুইট্‌ম্যানের অন্তরের আনন্দ ও উচ্ছ্বাসকে কোন দিনই অন্তরে আবদ্ধ করিতে পারেন নাই। Children of Adam নামক কবিতাবলীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই হুইট্‌ম্যানের হৃদয়ের স্বাধীন এবং স্বাবলীল আনন্দোচ্ছ্বাস। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার অন্তরে সে সৌন্দর্য্যের ছায়াপাত করিয়াছে তাহাতে কামগন্ধের লেশমাত্র নাই। তাঁহার কামগন্ধহীন ভালবাসা ও সৌন্দর্য্য কাব্যের এক অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি।

এই কামগন্ধহীন সৌন্দর্য্যে তিনি নারীর মধ্যে শাশ্বত যৌবনের দেখা পাইয়াছেন ; তাহা না হইলে কি তিনি বলেন,—

"আমাদের চারিদিকে নারী আছে যত—
তরুণী যুবতী বৃদ্ধা ঘুরিছে সতত ;
কেহ বলে সৌন্দর্য্য আছে যুবতীর ;
বৃদ্ধার সৌন্দর্য্য আছে অচঞ্চল স্থির।"

* * *

ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান অসাধারণ কবি, সে কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কারণ তিনি সাহিত্যের মধ্যে নূতনতম ভাবধারা আনয়ন করিয়াছেন। হুইট্‌ম্যানের কাব্যে প্রকৃতির স্তুতিবাদের বাহ্যাড়ম্বর নাই, আছে সজীবতা—পৌরুষ ও জীবন্ত ভাবের সমাবেশ।

Dr. Watt তাঁহার সমালোচনার এক স্থানে বলিয়াছেন—সকল কাব্যেরই কম বেশী অনুকৃতি রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে বাদ পড়িয়াছেন ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান। কারণ তাঁহার কাব্যে অনুকৃতি অসম্ভব বলিয়া—।

প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের মৃত্যুর পর তিনি যে কবিতা রচনা করেন, তাহা অতি সুন্দর। ভাষা ও ভাবে তাহা হইয়াছে অনবদ্য। সেই কবিতাটির কয়েক লাইন যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল—

—এস মৃত্যু তব স্নিগ্ধপরশ বুলায়ে
অবাধ গভীর রথে ভ্রমিয়া পৃথিবী—এস শান্তিরূপে
দিনে, রাত্রে, সর্ব্বলোকে, প্রতি প্রাণী মাঝে
অদ্য কিম্বা শতাব্দিতে—এস ক্ষীণ দেহে।

পরিবর্ত্তনশীল জগতের মাঝে হুইটম্যানের দৃষ্টি সন্ধান পাইয়াছিল—মানবতার। এই মানবতার সপক্ষে তিনি আবেদন জানান নাই, জানাইয়াছিলেন দাবী। তাই তাঁহার কাব্য জগতে বন্ধুত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

কাল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ছিল এত রূপ কিছু তার নাই আর !
নবযৌবনে কুঁড়ি যে ফুটাল' ফুলে
সেই কাল সম শত্রু নাহিক তার,
হানিল সে জরা ফুলের বৃন্তমূলে।

হে কলাকুশলী তোমার তুলির টানে
রঙে ও রেখায় যে মাধুরী ওঠে ফুটি,
চিরন্তন তা বুঝিতাম যদি প্রাণে
বুদ্‌বুদ সম সম্মোহ যেত টুটি।

জানি নশ্বর তাই এত ভালবাসি,
জানি দুদিনের, অমূল্য হেন তাই,
স্বল্পায়ু ফুল, চলচঞ্চল হাসি,
হারাবার ভয়ে ধরিয়া রাখিতে চাই।

(৪)

একটা রূপকথা বলি।

এক ছিলেন বাদশা। কি তা'র নাম, কোথায় তার রাজধানী সেকথা অনাবশ্যক। বাদশার রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে ছিল একটা পুকুর— সারা বছর তার জল থাকত বরফ হ'য়ে! রাজবাড়ীর কাছেই একটা ছোট পাহাড়ের উপরে ছিল ছোট একটি হ্রদ। এই হ্রদের জল কখনও জমে যেত না। একদিন বাদশার কি খেয়াল হ'ল, বল্লেন, হ্রদের জল এনে দিতে হবে রাজবাড়ীর চৌবাচ্চায়। যেমন কথা, তেমনই কাজ— দলে দলে ইঞ্জিনীয়ার লেগে গেল কাজে। হ্রদ থেকে বড় পাইপ এনে বসানো হ'ল চৌবাচ্চার ভিতরে। আর চৌবাচ্চা উপ্‌চে যে জল পড়ছে, পাইপ দিয়ে তাকে চালান করা হ'ল পুকুরের ভিতর। কিন্তু দুদিন

চিত্র নং ১৭

যেতে না যেতেই হ্রদের জল গেল ফুরিয়ে, আর পুকুরের জল উপচে পড়তে লাগল। ইঞ্জিনীয়ারদের ডাক পড়ল। কিন্তু হ্রদের জল পুকুরে এসে বরফ হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা পাম্প বসিয়েও সুবিধা করতে পারলেন না। জল রয়েছে বরফ হ'য়ে, পাম্পের টানে উঠবে কেমন করে! বাদশা আগুন হ'য়ে উঠলেন, ইঞ্জিনীয়ারদের মাথা কেটে ফেলা হ'ল।

এদিকে বাদশার সভায় ছিল এক ভাঁড়। সে এসে করজোড়ে নিবেদন করল, শাহানশা'র অনুমতি হয় ত আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। হুকুম মিলল। ভাঁড় এসে পুকুরের তলায় গর্ত্ত খুঁড়ে উনুন জ্বালিয়ে দিলে, বরফ গলে জল হতে লাগল—জল আবার বাষ্প হ'য়ে উঠতে লাগল উপরে। একটা খুব মোটা চোঙ্ রাখা হ'ল পুকুরের ঠিক উপরেই। তার গায়ে যে বাষ্প জমতে লাগল, তাকে পাম্প বসিয়ে চালান করা হ'ল হ্রদের ভিতর। আবার বাদশার চৌবাচ্চা উঠল ভরে। বাদশা বল্লেন, জলের জোর আরও বাড়িয়ে দিতে হবে। পাম্পওয়ালাদের পিঠে চাবুক পড়ল, পাম্প চলল আরও ক্ষিপ্রগতিতে। লোকগুলো উঠল হয়রাণ হ'য়ে। বাদশার ফের খেয়াল হ'ল, জলের জোর কমিয়ে দিতে হবে। পাম্প ধীরে ধীরে কাজ করতে লাগল। পাম্পের জোর কখনও বাড়ানো কখনও বা কমানো, সে বড় হাঙ্গামার কাজ! বাদশা ভাঁড়কে ডেকে বললেন, কোন সোজা উপায় বাৎলাও। 'যো হুকুম' বলে ভাঁড় গিয়ে চোঙের মাঝখানে ছোট একটি কল (Stopcock) বসিয়ে দিলে। একটি ছোট ছেলেকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে বল্লে, জলের জোর বাড়াতে বল্লে, কলের মুখ খুলে দেবে, আর কমাতে বল্লে দেবে খানিকটা বন্ধ করে।

গল্প আমাদের এইখানেই শেষ হল। বাদশা খুসী হয়ে ভাঁড়কে কি বকশীষ দিয়েছিলেন, সে কথা আমাদের জানা নেই।

এটা নিছক গল্পই। কিন্তু গল্পের ভাঁড়, ভাঁড় হলেও একটা খুব বড় তথ্যের ইঙ্গিত দিয়েছিল—কি করে একই জলকে বারবার ঘুরতি-পথে (Hydraulic Circuit) চালান করা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা এই রকম একটা তথ্যকেই কাজে লাগিয়ে এমন একটি জিনিষ আবিষ্কার করেছেন, যেটি না হ'লে বর্ত্তমান বেতার জগৎ-ই অচল হ'য়ে পড়ত। এই যন্ত্রটির নাম হ'ল ইলেকট্রন-টিউব (Electron tube), তাপজ-তাড়িত ভাল্‌ভ্ (Thirmionic Valve), অথবা সংক্ষেপে শুধু ভাল্‌ভ্। ভাল্‌ভ্ আবিষ্কারের কাহিনী সুদীর্ঘ এবং কারা এই জিনিষটি আবিষ্কার করেছেন, তাদের নামধাম সন্ধান করার চেয়ে ভাল্‌ভ্ জিনিষটি কি রকম, সেইটিই জানা বেশী প্রয়োজন। তবে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, আমেরিকার এডিসন্ ভাল্‌ভের উদ্ভাবক, বিলাতে ফ্লেমিঙ্ তাকে প্রথম বেতারের কাজে লাগান এবং ডী-ফরেষ্ট তার অন্যান্য অনেক উন্নতি করেছেন।

জল গরম করলে বাষ্প হয়ে উবে যায়, একথা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দেখা গেছে এমন অনেক ধাতু, বা ধাতুমিশ্রিত (oxides, alloys etc) জিনিষ আছে যাদের গরম করলে, তাদের গা থেকে ইলেকট্রনও তেমনি বাষ্পের মতই বেরুতে থাকে। জলের সঙ্গে মিল দেখেই এই ইলেকট্রন-বেরুনোকেও বাষ্প হওয়াই বলা হয় (Electron evaporation)। যত বেশী গরম করা হবে, ইলেকট্রনও বেরুবে তত বেশী। জলের উপরে তেল ঢেলে দিলে, জল যেমন আর সহজে বাষ্প হ'তে পারে না, যে সব জিনিষকে গরম করলে তাদের গা থেকে ইলেকট্রন বেরুতে থাকে, তাদের উপরেও কোনও কোনও জিনিসের প্রলেপ (coating) দিলে ইলেকট্রনেরা আর তেমন সহজে ছুটে বেরুতে পারে না।

ভাল্‌ভ্‌টি দেখতে অনেকটা সাধারণ বিজলী বাতির মতই (Electric glow lamp)—কাচের টিউব। যতটা সম্ভব, জোর পাম্প করে' ভিতর থেকে বাতাস বার করে নেওয়া হয়েছে। আজকাল অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাতাস বার করে নিয়ে, তা'র বদলে অন্য কোন গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

ভাল্‌ভের একদিকে থাকে জ্বালানি-তার, (Filament for electron emission) যাকে গরম করলে ইলেকট্রন বেরুতে থাকে। জ্বালানি তারটিকে গরম করবার সব চেয়ে সোজা উপায় হ'ল, তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করা, ছোট একটি ব্যাটারীর সাহায্যে। যে ইলেকট্রনেরা বেরুল, তাদের টেনে নেবার জন্যও ত কাউকে চাই। তা' না হ'লে ইলেকট্রনেরা টিউবের ভিতর ভিড় করতে থাকবে। শেষে এমন হবে যে, জ্বালানি-তার গরম করলেও আর নতুন ইলেকট্রন বেরুতে পারবে না, বাইরের ইলেকট্রনদের চাপে। তাই ইলেকট্রনদের টানবার জন্য রাখা হয়েছে একখানা ধাতুর প্লেট, যাকে ইংরাজীতে বলে এ্যানোড্, বা শুধু প্লেট। কিন্তু শুধু প্লেট হলেই ত আর ইলেকট্রনেরা তার কাছে যাবেনা! প্লেটের উপর বসানো চাই ইলেকট্রনদের-পাম্প। আমরা আগেই বলেছি, ব্যাটারীই হ'ল ইলেকট্রনদের পাম্প। তাই বড় একটা ব্যাটারীর পজিটিভ্ প্রান্তকে (অর্থাৎ যে মাথায় ধন বিদ্যুতের আড্ডা) জুড়ে দিতে হবে প্লেটের সঙ্গে। তখন ধন বিদ্যুতের আড্ডা হবে প্লেটের উপর এবং তারই টানে ইলেকট্রনেরা ছুটে আসবে প্লেটের গায়ে।

বাদশার পুকুরের গল্পে আমরা দেখেছি, পুকুরের জল বাষ্প হয়ে গেল হ্রদের ভিতর এবং সেই জল সেখান থেকে রাজবাড়ীর চৌবাচ্চা হ'য়ে ফের এসে পড়লো পুকুরের ভিতর—তবে ত জলস্রোত থাকবে অক্ষুণ্ণ এবং জলের ঘুরতি পথ (Hydraulic circuit) হ'বে সম্পূর্ণ! এখানেও যে সব ইলেকট্রন বাষ্প হয়ে গিয়ে পড়ল—প্লেটের উপর, তাদের ত আবার ফিরিয়ে আনতে হবে জ্বালানি তারের ভিতরে—যেখান থেকে তারা বেরিয়েছিল। তাই প্লেটের পাম্প-ব্যাটারীর—নেগেটিভ্ প্রান্তকে জুড়ে দিতে হবে জ্বালানি তারের সঙ্গে। প্লেট যতক্ষণ পজিটিভ্ থাকবে (এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানি তার থেকে যতক্ষণ ইলেকট্রন বেরুতে থাকবে) ততক্ষণই ইলেকট্রন স্রোত বইতে থাকবে। যদি প্লেটের পাম্প-ব্যাটারীর সংযোগ উল্টো করে দেওয়া যায়, তাহলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যাবে বন্ধ হ'য়ে, জ্বালানি তার থেকে ইলেকট্রন বেরুতে থাকলেও। কারণ, এবারে প্লেট হ'ল নিগেটিভ, তাই সে আর ইলেকট্রনদের ত টানবে না বরং ঠেলে দেবে। ফলে ভাল্‌ভের মধ্যে বিদ্যুৎস্রোত যাবে বন্ধ হ'য়ে। এখানে বলা দরকার যে জ্বালানি তারকে গরম করা হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ছোট ব্যাটারী দিয়ে। তাই পাম্প-ব্যাটারী খুলে ফেল্‌লেও জ্বালানি তার তা'র নিজ ব্যাটারীর জন্য গরম হ'তে থাকবেই এবং তাই থেকে ইলেকট্রনও বেরুতে থাকবে।

যে সব ভাল্‌ভের ভিতরে শুধু প্লেট এবং জ্বালানি তারই থাকে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ডায়োড্ (Diode); বৈদ্যুতিক চলতি পথে (Circuit) কৃষ্ট্যাল বসিয়ে যেমন যাতায়াতি প্রবাহকে একমুখী (unidirectional) প্রবাহে পরিণত করা যায়, তেমনই কৃষ্ট্যালের বদলে ডায়োড্ বসিয়েও সেই কাজ করা যেতে পারে।

এ্যানোড পাম্পের ব্যাটারীর জোর বাড়িয়ে আমরা অনেক বেশী ইলেকট্রন টেনে নিতে পারি, তার ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহও যায় বেড়ে। কিন্তু তারও ত একটা সীমা আছে। পাম্পের জোর এমন বাড়ান হ'ল যে যত ইলেকট্রন জ্বালানি তার থেকে বেরুচ্ছে, তারা সবাই গিয়ে হাজির হচ্ছে—প্লেটের উপর। তার পরেও যদি পাম্পের জোর বাড়ান যায়, তাহলে আর কিছু ফল হবে না। ইলেকট্রন প্রবাহ আর বাড়বেনা—যত ইলেকট্রন বেরুচ্ছে তারা সবাই ত ছুটে যাচ্ছে প্লেটের উপর; বাড়তি ইলেকট্রন তো আর নেই! এই রকম অবস্থায় বিদ্যুৎস্রোতকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ স্রোত (saturated current)।

ইলেকট্রন পাম্পের অর্থাৎ এ্যানোড ব্যাটারীর জোর বাড়িয়ে আমরা প্লেটের উপর বেশী ইলেকট্রন টেনে নিতে পারি—সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু আরও একটি সোজা উপায় আছে। প্লেট আর জ্বালানি তারের মাঝখানে একখণ্ড ধাতুনির্ম্মিত জাল (Mesh) বসিয়ে দেওয়া হ'ল। ইলেকট্রন স্রোত নিয়ন্ত্রণ করবার কল হ'ল এইটিই। ইলেকট্রনদের

চিত্র নং ১৮

প্লেটে যেতে হলে আগে এই জাল পার হতে হবে। এই জালটিকে বলা হ'য়ে থাকে গ্রীড্। গ্রীডের উপর ধন বিদ্যুৎ থাকলে সে ইলেকট্রনদের

চিত্র নং ১৯

টান দেয় সজোরে। গ্রীডের ভাগ্যে কিন্তু দু'চারটি ছাড়া বেশী ইলেকট্রন জোটে না। জালের ফাঁক দিয়ে অধিকাংশই চলে যায় প্লেটে, ফলে প্লেটের ইলেকট্রন প্রবাহও যায় বেড়ে। তেমনি আবার গ্রীডের উপর ইলেকট্রন জমা করে রাখলে অর্থাৎ তাকে নেগেটিভ করে দিলে, সে ইলেকট্রনদের ঠেলে দেয় নীচের দিকে, প্লেটের দিকে যেতে দেয় না। প্লেটের টান অবশ্য রয়েছে, কিন্তু গ্রীড পার হতে পারলে তবে ত প্লেটে পৌঁছানর কথা উঠবে। কিছু কিছু খুব তেজীয়ান ইলেকট্রন অবশ্য কোন মতে প্লেট পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে। এই কারণে গ্রীড নেগেটিভ হলে প্লেটের বিদ্যুৎস্রোত যায় কমে। দেখা গেছে গ্রীডকে সামান্য একটু পজিটিভ অথবা নেগেটিভ করে দিলে প্লেটের বিদ্যুৎপ্রবাহ যে পরিমাণ বেড়ে বা কমে যায় তা কিন্তু মোটেই সামান্য নয়। কল টিপে যেমন খুব অল্প আয়াসেই জলের স্রোত বাড়ানো-কমানো চলে, গ্রীড দিয়েও সেই রকম ইলেকট্রন স্রোত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গ্রীডের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এত বেশী বলেই অনেকে তাকে শুধু গ্রীড না বলে পরিচালক গ্রীড (Control Gird) বলে থাকেন। এই ভাল্‌ভের একটা মজা হ'ল এই যে, এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন স্রোত বইতে পারে শুধু একদিকেই—জ্বালানি তার থেকে প্লেটের দিকে। তাই এর নাম ভাল্‌ভ, অথবা 'one way Traffic' এই সাইন বোর্ড লটকান রাস্তা। এখানে বলা দরকার ইলেকট্রনদের গতি প্রচণ্ড। তাই গ্রীডের হুকুম পাবামাত্রই তারা ছুটে যায় প্লেটের উপরে, কিছুমাত্র দেরী করেনা। তাই গ্রীড যত দ্রুতই পজেটিভ্-নেগেটিভ হ'তে থাকুক না কেন, প্লেটের ইলেকট্রন প্রবাহও তত তাড়াতাড়ি বাড়তে-কমতে থাকবে। দেখা গেছে সাধারণত গ্রীডের উপর পজিটিভ এবং নেগেটিভ—কেউই না থাকলেও এ্যানোডের টানে কিছু ইলেকট্রন জ্বালানি তার থেকে প্লেট পর্য্যন্ত ছুটে যাবেই। তাই গ্রীড নিরপেক্ষ (unbiassed) থাকলেও এ্যানোডের ইলেকট্রন স্রোত খানিকটা থেকেই যায়। সেই জন্য এ্যানোড প্রবাহ একেবারে বন্ধ করতে হলে গ্রীডের উপর বেশ কিছু ইলেকট্রন জমা করে রেখে তাকে নিগেটিভ করে দিতে হবে গোড়াতেই।

আজকাল অবশ্য একটা গ্রীডের জায়গায় আরও অনেকগুলি গ্রীড লাগান হচ্ছে। তবে তাদের প্রত্যেকটিরই কোনও না কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে ভাল্‌ভের ভিতর দুটি গ্রীড তাদের বলা হয় টেট্রোড

চিত্র নং ২০

(Tetrode or four electrode valve) ; যাদের ভিতরে রয়েছে তিনটি গ্রীড তাদের বলা হয় পেণ্টোড্ (Pentode or five electrode valve) ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের প্রত্যেক জাতীয় ভালভেরই বিশেষ বিশেষ গুণাগুণ আছে।

প্রথমে আমরা প্রেরক যন্ত্রের (Transmitter) কথাই বলব। আগেই বলা হয়েছে কথা-বা-গান পাঠানোর জন্য চাই ইহাদের অবিরাম একটানা ঢেউ (continuous waves)—এই সব ঢেউ দেখতে সবাই অবিকল এক রকম, একটি থেকে আর একটি চিনে আলাদা করা যায় না। সবগুলি ঢেউই সমান লম্বা, সমান উঁচু। এই ঢেউএর গায়ে কথা-বা-গানের ছাঁপ এঁকে দিতে হবে। অর্থাৎ এই ঢেউগুলির মাথা কেটে ছেঁটে এমন করে দিতে হবে যে মনে হবে যেন কথার ঢেউটাকেই একটা পোষাকের মত ইথার ঢেউএর গায়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে কথা-বা-গানের জন্য সমান মাপের অবিরাম ঢেউএর কি প্রয়োজন। অসমান ইথার ঢেউ হ'লে কি চলত না? একেবারেই যে চলত না, তা অবশ্য বলা যায় না, তবে কথার বিকৃতি ঘট্‌ত সাংঘাতিক। কারণ কথার ঢেউএর পোষাকটিকে ত ইথার তরঙ্গ মালার উপর মানানসই-ভাবে বসা চাই। ইথার তরঙ্গমালার দেহটি নিটোল হলেই ত সুবিধা। কিন্তু প্রত্যেকটি ইথার ঢেউ যদি অসমান হয়, তবে সেই তরঙ্গমালার দেহ হবে টোল খাওয়া। তাই কথার পোষাক তার গায়ে ফিট করবে না। শব্দ পাঠানর জন্য দুটি কাজ করা দরকার—একটি হ'ল ইথারের অবিরাম (বাহক) তরঙ্গ সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়টি তার উপর শব্দের ছাপ এঁকে দেওয়া। আমরা দেখেছি কোন বৈদ্যুতিক চলপথে ইলেকট্রনেরা খুব দ্রুতগতিতে আনাগোনা করতে থাকলে ইথার সমুদ্র আলোড়িত হয়—তাতে ঢেউ ওঠে। কি কায়দায় এবং কত দ্রুত এই ইলেকট্রনদের যাওয়া-আসা চলছে তার উপর নির্ভর করে ইথার ঢেউ-এর চেহারা এবং সেকেণ্ডে কতগুলি ঢেউ সৃষ্টি হ'ল তার সংখ্যা। জলের ঢেউএর জল যেমন একবার উঠ্‌ছে আবার নামছে, তারই সঙ্গে তুলনা করে ইলেকট্রনদের যাওয়া-আসাকেও ইলেকট্রন-স্রোতের উপরে ঢেউ বলা যেতে পারে। বাগানে অনেক সময় ছোট ছোট গাছের সারি বসিয়ে বেড়া দেওয়া হয়। মালী ইচ্ছামত কাঁচি দিয়ে গাছগুলির মাথা কেটে ছেঁটে দেয়। এখানেও কথার ছাপের (অর্থাৎ বাতাসের ঢেউএর) আকারে ইথার ঢেউগুলির মাথা ছেঁটে দেওয়া চাই। সেজন্য ত কাউকে দরকার। আমরা জানি চলপথে ইলেকট্রন স্রোতের ঢেউ (অর্থাৎ ইলেকট্রনদের যাওয়া আসা) থেকেই ত ইথার ঢেউ-এর জন্ম। তাই সোজাসুজি ইথারের বাহক তরঙ্গের উপর কাঁচি না চালিয়ে, চলপথের অতি দ্রুত ইলেকট্রন স্রোতের ঢেউএর মাথায়ই কাঁচি চালাবার কাজটি করবে কে? মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে মাইক্রোফোনের ভিতরকার ইলেকট্রন স্রোতে ঢেউ উঠতে থাকে—এই ঢেউএর চেহারা অবিকল কথার ঢেউএর মতই।
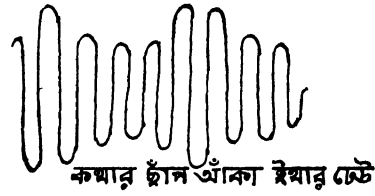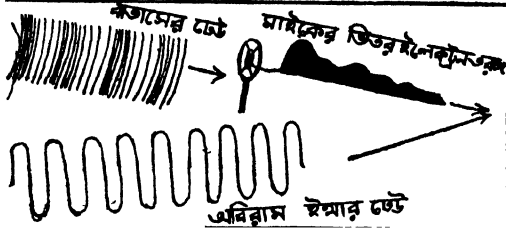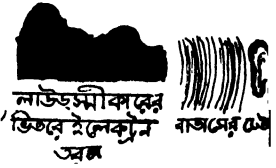
চিত্র নং ২১

মাইক্রোফোনের ইলেকট্রন-ঢেউকেই লাগান হ'ল আমাদের আসল চলপথের অতি দ্রুত ইলেকট্রন ঢেউএর কাট ছাঁটের কাজে। মাইক্রো-ফোনের ঢেউই হ'ল এখানে মালী। কাঁচি চালাবার জন্য তাকে নিয়ে আসতে হবে সেই বৈদ্যুতিক চলপথের ভিতরে—যেখানে অতি দ্রুত ইলেকট্রন ঢেউ চলাচল করছে। এই নিয়ে আসার কাজ সম্পন্ন করা হয় শুধু একটি ট্রান্‌স্‌ফরমার দিয়েই।

এ্যানোড পথে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে তাতে কম্‌তি-বাড়তি হচ্ছে। সেই কমতি-বাড়তিওয়ালা প্রবাহের পথ হল ব্যাটারীর মধ্য দিয়ে। কিন্তু
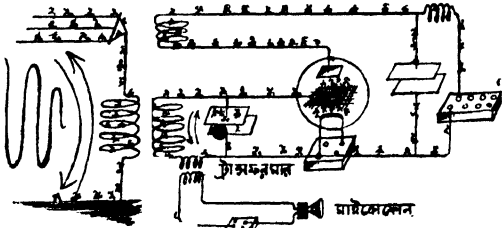
চিত্র নং ২২

ব্যাটারীর ভিতর দিয়ে ঐ রকম প্রবাহ চলাচল করলে ব্যাটারী নষ্ট হয়। তাই সেই প্রবাহের কমতি বাড়তিটুকুই—অর্থাৎ ব্যাটারীর পক্ষে অনিষ্টকর অংশটি পাঠান হয় এই সংরক্ষকের ভিতর দিয়ে—যে কোনও জিনিষকেই একবার দুলিয়ে ছেড়ে দিলে ধীরে ধীরে তার দোলা কমে গিয়ে শেষকালে একেবারে থেমে যায়। দোলার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে তাকে যথাসময়ে একটু একটু করে সাহায্য করতে হবে। প্রেরক যন্ত্র নির্ম্মাণের গোড়াতেই ইলেকট্রনদের চলাচল করবার জন্য একটি চলপথ রচনা করা হ'ল, একটি বিদ্যুৎ সংরক্ষকের দুই প্রান্তের সঙ্গে একটি তার কুণ্ডল জুড়ে দিয়ে। সেই সংরক্ষকের দুই প্রান্তকে আর একদিক দিয়ে জুড়ে দেওয়া হ'ল ভালভের গ্রীড এবং জ্বালানি তারের সাথে।

এ্যানোডকে জুড়ে দেওয়া হ'ল পাম্প ব্যাটারীর সাথে, আর অপর প্রান্ত যোগ করা হ'ল জ্বালানি তারের সাথে। এ্যানোড থেকে পাম্প ব্যাটারী পর্য্যন্ত যে পথ তৈরী করা হ'ল তার মাঝ পথে বসান হ'ল একটু তারকুণ্ডল—তার নাম করা যেতে পারে এ্যানোড কয়েল (Anode coil)। আমরা আগেই বলেছি সংরক্ষকের ধাতুফলক দুটির উপর ঋণ বিদ্যুৎ (ইলেকট্রন) এবং ধন বিদ্যুৎ জড়ো করে রেখে, তারপরে ছেড়ে দিলে, ইলেকট্রনেরা সংযুক্ত তারকুণ্ডলের ভিতর দিয়ে বারংবার অতি দ্রুতগতিতে যাতায়াত করতে থাকবে। তারই ফলে প্রত্যেকটি ফলক যথাক্রমে একবার নেগেটিভ এবং একবার পজিটিভ হতে থাকবে। একটি ফলকের উপর যখন ইলেকট্রন এসে জমা হবে তখন সে হবে নিগেটিভ। আবার পরক্ষণেই ইলেকট্রনেরা যখন পালিয়ে যাবে, তখন সে হবে—পজিটিভ্। কিন্তু এই ইলেকট্রন যাতায়াত বেশীক্ষণ চলতে পারে না—যদি না তাকে কেউ সাহায্য করে। তাই চলপথটিকে জুড়ে দিতে হ'ল ভালভের সঙ্গে এবং ভালভ্‌টিকে বলা হল সাহায্য করবার জন্য। এই সাহায্য আসছে এ্যানোড কয়েলের মারফৎ, কি করে তাই বলছি।

আমাদের সংরক্ষকটির উপরের ফলকটিকে গ্রীডের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ফলকটির ছোঁয়াচ লেগে সাথে সাথে গ্রীডও একবার নেগেটিভ এবং একবার পজিটিভ হতে থাকে। আমরা প্রথমেই ধরে নেব যে তারকুণ্ডল-সংরক্ষক চলপথে ইলেকট্রন চলাচল সুরু হয়েছে। আমাদের কাজ হ'ল এই চলাচলকে স্থায়ী করে রাখা। এখন ইলেকট্রন চলাচল সুরু হবার সাথে সাথেই গ্রাডও কেবলই যথাক্রমে পজিটিভ এবং নেগেটিভ হ'তে লাগল। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, গ্রীড নিগেটিভ হলে (অর্থাৎ গ্রীডের উপর ইলেকট্রনের আধিক্য হ'লে) ভালভের ভিতরে এ্যানোড্‌-যাত্রী ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায়, অর্থাৎ এ্যানোডের ইলেকট্রন প্রবাহ ক্ষীণ হ'য়ে যায়। আবার গ্রীড পজিটিভ হলে তাদের সংখ্যা যায় বেড়ে—এ্যানোড প্রবাহ ফেঁপে ওঠে। তাই গ্রীডের সাথে সংযুক্ত চলপথে ইলেকট্রন চলাচল সুরু হবার সাথে সাথেই এ্যানোডের ইলেকট্রন স্রোতের কম-বেশী হ'তে থাকে। জলের কল.কম-বেশী খুলে যেমন জলের স্রোত কমান বাড়ান যায়, এও অনেকটা সেই রকমই। এই কমতি-বাড়তি-ওয়ালা এ্যানোড প্রবাহের পথ হ'ল এ্যানোড কয়েলের ভিতর দিয়ে।

এ্যানোড্ কয়েলের ভিতর বিদ্যুৎস্রোতের জোর কম বেশী হওয়ার দরুণ চারিদিকের অদৃশ্য চুম্বক ক্ষেত্রেরও কম বেশী হ'তে থাকে। আবার এই চুম্বকক্ষেত্রের কম বেশী হওয়ার জন্য আমাদের আসল গোড়াকার চলপথে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হ'তে থাকে। এই সঞ্চারিত বিদ্যুৎ প্রবাহ তারকুণ্ডল-সংরক্ষক চলপথের আদি প্রবাহকে সাহায্যও করতে পারে। আবার বাধাও দিতে পারে। সাহায্য করবে কি বিরুদ্ধতা করবে, সেটা নির্ভর করে এ্যানোড কয়েলটিকে কেমন করে রাখা হয়েছে তারই উপর। আমরা তাকে এমনভাবে রাখব যাতে সঞ্চারিত ইলেকট্রন স্রোত সহায়তাই করে। গ্রীড-জ্বালানি তার চলপথের ইলেকট্রন স্রোত এই সাহায্য পেয়ে আরও বেড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীডও বেশী পরিমাণে পজেটিভ এবং নিগেটিভ হ'তে থাকবে এবং তারই দরুণ এ্যানোড প্রবাহের কমতি বাড়তির পরিমাণও যাবে ঢের বেড়ে। আবার এ্যানোড কয়েলের ভিতর ইলেকট্রন প্রবাহের বাড়তি কমতির পরিমাণ আগের চাইতে ঢের বেড়ে যাওয়ায়, সে সংচারিত বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে আগের চাইতে অনেক বেশী সাহায্য পাঠাতে পারবে গ্রীড্-জ্বালানি তার চলপথে। এই রকম করে সাহায্যের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যখন গ্রীড-জ্বালানি তার চলপথে ইলেকট্রন চলাচল অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে যতখানি সাহায্য দরকার ঠিক ততখানি সাহায্যই পাওয়া যায়। এই দুয়টী ইলেকট্রন চলাচলের আলোড়নেই ইথার সমুদ্রে অবিরাম তরঙ্গ সৃষ্টি হতে থাকে। ক্রমশঃ

বাঙ্গালার নদী-সমস্যা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এম্-এস্‌সি

সপ্তদশ শতাব্দীতে নদী উপনদীগুলির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে উহারা যখন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল, তখন বাংলার ভূগোল অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। ১৭৬৪-১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে রেণেলের বাংলা দেশের যে মানচিত্র অঙ্কন করিলেন তাহার সহিত সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত ভ্যানদেন ব্রুকের মানচিত্রের খুব অল্পই মিল আছে। ব্রুকের মানচিত্রে সরস্বতী ও ভাগীরথী উভয়েই বিদ্যমান। এই দুইটী নদী উত্তরে সপ্তগ্রাম ও দক্ষিণে কলিকাতার নিকট মিশিয়া এক বিরাট দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছিল; রেণেলের ম্যাপে সে দ্বীপের চিহ্ন মাত্র নাই। সরস্বতী সম্পূর্ণ শুকাইয়া গিয়াছে এবং সরস্বতীর তীরে সপ্তগ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া একদা প্রসিদ্ধ বহু নগর ও বন্দরের নামের উল্লেখ পর্য্যন্ত উক্ত মানচিত্রে নাই। ভাগীরথীও ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে দামোদরের দিক্ পরিবর্ত্তন একান্ত লক্ষণীয়। ব্রুকের ম্যাপে জাহানাবাদের নিকট বিভক্ত হইয়া দামোদরের এক ভাগ উত্তরে আম্বোয়ার নিকট ভাগীরথীতে এবং আর একভাগ দক্ষিণে নারায়ণগড়ের নিকট রূপনারায়ণের পূর্ব্বমুখী স্রোত অবলম্বন করিয়া পুনরায় ভাগীরথীতে গিয়া মিশিয়াছে। মেজর রেণেলের সময় দামোদর দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া সরাসরি বঙ্গোপসাগরে গিয়া মিশে। ইহাতে হুগলী নদীর পতন আরও দ্রুত হইয়াছিল।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের নদীগুলির তুলনায় অনেক জিনিষ পরিষ্কার হইয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে আত্রেয়ী, করোতোয়া, ধলেশ্বরী ও শীতলাখ্যা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে; ধলেশ্বরীর দক্ষিণে গঙ্গার আর একটী ক্ষুদ্র শাখা—কালীগঙ্গা প্রবাহিত; কীর্ত্তিনাশার সর্ব্বনাশা স্রোত পরবর্ত্তীকালে এই পথেই প্রবাহিত হইয়াছিল। উত্তরে তিস্তার আবির্ভাব তখনও হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আত্রেয়ী ও করোতোয়া পতনোন্মুখ এবং তিস্তা আবির্ভূত হইয়া করোতোয়ার পথে দিনাজপুরে আত্রেয়ী এবং আরও দক্ষিণে পদ্মার সহিত মিলিত হয়। ধলেশ্বরী ও শীতলাখ্যার আর সে প্রতাপ নাই; ব্রহ্মপুত্রও ধীরে ধীরে তাহার পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার নদনদীর যে বিরাট পরিবর্ত্তন সুরু হয় তাহার তুলনা মেলে না। তাহার পর হইতেই বাংলা তাহার বর্ত্তমান ভূগোলের ছাঁচ গ্রহণ করে। ইহার প্রধান কারণ ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম শাখার (যমুনার) ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি ও পূর্ব্ব শাখার প্রাধান্যের হ্রাস। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মপুত্র সনাতন কাল হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ভৈরববাজারের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। পশ্চিম দিকে গঙ্গার বদ্বীপে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কতকগুলি কারণে ব্রহ্মপুত্রের সে ইচ্ছা বহুদিন পূর্ণ হইবার সুযোগ পায় নাই। পশ্চিমে ঢাকার উত্তরে প্রায় সত্তর মাইল বিস্তৃত একশত ফুট উচ্চ ভূমিখণ্ড ও মধুপুরের জঙ্গল এবং পূর্ব্বে ত্রিপুরার পর্ব্বতশ্রেণী ব্রহ্মপুত্রকে নড়িবার চড়িবার বিশেষ সুযোগ দেয় নাই। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিস্তার বিরাট বন্যা নামিয়া সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিল। সেই ভয়ানক বন্যার স্বরূপ অবর্ণনীয়। তখন কিছুদিনের জন্য মনে হইয়াছিল বাংলা দেশ বুঝি আবার সমুদ্রে আত্মগোপন করিল।

তিস্তার সাবেক প্রবাহের পথে বন্যার বিরাট জলরাশি নিকাশের সম্ভাবনা ছিল না; কাজে কাজেই তিস্তাকে নূতন পথ করিয়া লইতে হইল। পূর্ব্বদিকে দিক পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে ফুলছড়ি ঘাটের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত না মিলিয়া উপায় রহিল না। যমুনা ফুলিয়া উঠিল। এইরূপে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোত যমুনার কূল ছাপাইয়া গোয়ালন্দের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঢাকার মধ্যদিয়া গঙ্গার মূল প্রবাহ ধলেশ্বরীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু গোয়ালন্দের নিকট গঙ্গা দক্ষিণমুখী যমুনার সহিত মিলিত হইলে ইহার পূর্ব্বপ্রবাহ বিশেষভাবে প্রতিহত হয়। ক্ষীণকায় কালীগঙ্গা পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোত উপসাগরে পৌঁছাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিল বটে —কিন্তু চাঁদরায়, কেদার রায় ও রাজা রাজবল্লভের আমলের সাধের কীর্ত্তিগুলিকে বাঁচাইতে পারিল না। দুই শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু শতাব্দী ধরিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র পৃথক পৃথকভাবে বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িত। তিস্তার বন্যার উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার বদ্বীপে প্রবেশ করিয়া বাংলার ভাগ্যকে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিল। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা লিখিয়াছেন—

"Two hundred years ago, as a glance at Rennell's map of Bengal shows, the three systems of rivers in lower Bengal, viz., the Ganges system, the North Bengal system (Karatoya, Atrai and Tista) and the Brahmaputra system used to flow by separate channels to the sea. Water was distributed equally over the whole country. About two hundred years ago, there ensued a catastrophic change which culminated in about 1837 by the union of two rivers in the heart of the country near Goalundo. This caused a terrible dislocation; central Bengal was deprived of its supply by the rivers and the North Bengal rivers were deflected to the east with the result that it became malarious and the vast amount of water is now discharged to East Bengal which is therefore subject to erosion on an unprecedented scale."

অনুবাদ—"রেণেলের বাংলার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার তিনটী মূল নদীপ্রবাহ, যথা গঙ্গা ও তাহার উপনদী শাখা নদী, উত্তর বঙ্গের নদ-নদী (করোতোয়া, আত্রেয়ী ও তিস্তা) এবং ব্রহ্মপুত্র ও তাহার শাখা প্রশাখা পৃথক পৃথকভাবে সমুদ্রে আসিয়া মিশিত। সমগ্র দেশে সমান জলপ্রবাহের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে যে মারাত্মক পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল ১৮৩৭ সালের অনুরূপ সময়ে বাংলার অন্তস্তলে গোয়ালন্দের নিকট দুইটী নদীর মিলনে তাহার পূর্ণ পরিণতি ঘটে। নদনদীর এই ভয়াবহ রদবদলে মধ্য-বাংলা নদনদী হইতে বঞ্চিত হইল এবং উত্তর বাংলার নদীগুলি পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিল। ইহার ফলে এই সকল স্থানে ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করে এবং অন্যদিকে এই বিরাট জলরাশি পূর্ব্ব বঙ্গের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হওয়ায় —উক্ত অঞ্চলে এখন মৃত্তিকার ক্ষয় অভূতপূর্ব্ব হারে আগাইয়া চলিয়াছে।"

বাংলার নদনদীর ভাঙ্গাগড়ার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই আলোচনায় অনেক নদী উপনদীর কথা বাদ দেওয়া হইয়াছে। তবে বাংলার নদীগুলির ধারা বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। একথা বলা বাহুল্য নদ-নদীর পরিবর্ত্তনের পালা এখনও পূর্ণ বেগে চলিতেছে। উত্তর পশ্চিম ও মধ্যবাংলার বদ্বীপ রচনার কার্য্য মনে হয় সম্পূর্ণ হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গে সে কার্য্য এখনও বাকী। তাই বোধহয় বাংলার প্রধান নদীগুলি আজ পূর্ব্ববঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের ভূমি সংগঠন কর্ত্তব্যপালন করিয়া চলিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ শ্রীহীন জঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিপূর্ণ ছিল। দেখিতে দেখিতে আজ তাহাই বাংলার প্রধান কৃষি ও বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। চাঁদপুর আজ একটী প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। রেণেলের সময়ের বাখরগঞ্জের দক্ষিণে ছোটবড় চরগুলি ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ভোলার সৃষ্টি করিয়াছে। নোয়াখালীর গঠনকার্য্য সবেমাত্র ত আরম্ভ হইয়াছে বলিলেই হয়। তারপর পদ্মাও বৎসরের পর বৎসর ঠিক একইভাবে বহিয়া যাইতেছে না। দক্ষিণে পদ্মা ও মেঘনার মধ্যে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। উত্তরে পদ্মার গতি পরিবর্ত্তনের লক্ষণ কিছু কিছু প্রকাশ পাওয়াতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিরাপত্তা লইয়া ইতিমধ্যেই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। আড়িয়াল খাঁ ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছে। এদিকে কলিকাতার ভবিষ্যতও আশাপ্রদ নহে। হুগলী নদীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে কলিকাতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইবার কারণ আছে। অনেকে অনুমান করেন অদূর ভবিষ্যতে তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রামের ন্যায় কলিকাতার অস্তিত্বও শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকিবে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে বাংলার বর্ত্তমান স্বাস্থ্যহীনতা ও কৃষির দুর্দ্দশার জন্য ইহার নদনদীর স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন দায়ী। এই কথা অনেকাংশে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অদূরদর্শিতা, নিশ্চেষ্টতা, বহু ভুল ভ্রান্তি ও স্বার্থের সংঘাত যে এই দুর্দ্দশার গতিকে দ্রুততর করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রেলওয়ে বাঁধগুলির কথাই ধরা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশে রেলওয়ে লাইনের প্রথম গোড়াপত্তন হইয়াছিল। রেলওয়ে আমাদের দেশে প্রভূত কল্যাণ করিয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার জন্য মূল্যও আমাদের কম দিতে হয় নাই। শত শত মাইলব্যাপী এই লৌহনির্ম্মিত লাইনগুলি নদনদীগুলিকে নাগপাশের মত বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ভাগ্যকেও আষ্টেপিষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে স্বাধীন গতিতে বাধা না পাইলে দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়,. ময়ূরাক্ষী প্রভৃতির পতন বোধহয় এত শীঘ্র হইতে পারিত না। কারণ, বর্দ্ধমান বিভাগের কৃষির দুর্দ্দশা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। মধ্য বাংলার নদনদী পতনের জন্যও রেলওয়ে কোন অংশে কম দায়ী নহে। জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, ইচ্ছামতী, কপোতাক্ষী ও ইহাদের বহু শাখা প্রশাখার দ্রুত পতন প্রায় ঐ সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

অবশ্য এদেশে রেলওয়ে লাইন প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পূর্ব্বে, এমন কি বৃটিশ রাজত্বেরও পূর্ব্বে নদীর তীরে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া বন্যার জল প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঐ বাঁধগুলি সুরক্ষিত রাখিবার বিশেষ কোন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। ফলে অন্যায় হইলেও প্রায়ই ঐ সব বাঁধ কাটিয়া দিয়া বন্যার জল ক্ষেত্রের মধ্যে বহাইয়া দেওয়া হইত। পরবর্ত্তীকালে রেলওয়ে লাইনের নিরাপত্তা অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট কড়া আইন প্রণয়ন করিয়া বাঁধ কাটিয়া বন্যার জল নিকাশ করিবার পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেয় এবং বাঁধগুলি অধিকতর দৃঢ় ও সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ইহাতে নদীতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ প্লাবনের হাত হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু বন্যার পলি জমিতে না আসায় স্থলভাগ উন্নীত হইতে পারিল না। পলিমাটী ক্রমশঃ নদীগর্ভ যতই ভরাট করিয়া তুলিতে লাগিল বন্যা প্রতিরোধ কল্পে বাঁধগুলির উচ্চতাও বৃদ্ধি না করিয়া উপায় রহিল না। এইরূপে বছরের পর বছর ভূমিকে পলিমাটী হইতে উপবাসী রাখিয়া শুধু যে ইহার উৎপাদনী শক্তিই হ্রাস করা হইয়াছে তাহা নহে। স্বাভাবিক উপায়ে ভূমি উন্নীত হইতে না পারায় জল নিকাশ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং মশক গোষ্ঠির বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়া দেশকে সর্ব্বনাশের পথে আগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শতাব্দীর সঞ্চিত পাপের ফল আজ আর ভোগ না করিয়া উপায় নাই। প্রয়োজনীয় হিসাবে যে বাঁধ এককালে রচিত হইয়াছিল আজ তাহাই যত অনর্থের কারণ। আজ আর উহাকে ইচ্ছামত কাটিয়া দেওয়া চলে না। রোষদৃপ্ত বন্যার বিরাট প্রাচীর দেশব্যাপী যে বিরাট প্লাবনের সৃষ্টি করিবে তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে Science & Culture পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধে মিঃ এস্-সি-মজুমদার এই সম্পর্কে লিখিয়াছিলেন—

"Indeed during the last Damodar floods it was observed that, though the embankment was over 20 feet higher than the country level, at some places it was about to be over topped, which could be prevented only by raising the embankment during the progress of the flood. It is needless to say that breaches at such places would have been attended with serious consequences to the country side owing to the terrific velocity which a wall of water 20 feet high ejecting out of the breach would have generated, sweeping away everything that would come in its way—houses, cattle and even human beings." অর্থাৎ—"গত দামোদরের বন্যার সময়েই দেখা গিয়াছে, বাঁধের উচ্চতা চতুস্পার্শ্বস্থ জমি হইতে বিশ ফিটের অধিক হওয়া সত্ত্বেও—কোন কোন যায়গায় বন্যার জল বাঁধকেও ছাপাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। বন্যার বৃদ্ধির সহিত একমাত্র বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়াই ইহা প্রতিরোধ করা সম্ভব। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইরূপ স্থলে বাঁধ কোনওক্রমে ভাঙ্গিয়া গেলে নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলে ইহার ফল কিরূপ সাংঘাতিকভাবে দেখা দিবে। বিশ ফুট উচ্চ জলপ্রাচীরের দুর্ব্বার গতির মুখে গৃহ, গৃহপালিত পশু, এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত যাহা কিছুই পড়িবে ভাসিয়া যাইবে।"

এই সব দেখিয়া শুনিয়াই উইলকক্স সাহেব (Sir William Wilcox) এই বাঁধগুলিকে শয়তানের শৃঙ্খল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, পুরাতন ভুল ভ্রান্তির দীর্ঘ আলোচনায় ফল নাই। পতনোন্মুখ বাংলাদেশের পূর্ব্বতন শ্রীবৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে হইলে কি করা দরকার সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। বর্ত্তমান পরিস্থিতির আশু প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যে একান্ত প্রয়োজন তাহা

বাংলার সেচ বিভাগই সম্প্রতি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা ভয় করিতেছেন, "It may be the case that deterioration has already proceeded so far that it cannot now be checked, that the tract in question (central Bengal) is doomed to revert gradually to swamp and jungle." (Irrigation Dept. Committee, Bengal, 1930)। ইহা বুঝা যাইতেছে যে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার নদনদীর অবস্থা যেরূপ ছিল সেই অবস্থায় উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে বাংলার পূর্ব্বতন স্বাস্থ্য ও শ্রীবৃদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। স্যর উইলিয়াম উইলকক্স সেই কথাই বলিয়াছিলেন। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা কতদুর সম্ভবপর হইবে সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। রাজস্বের যে অংশ সেচকার্য্য ও নদী শাসন ব্যাপারে ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহাতে এইরূপ ব্যাপক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা একরূপ অসম্ভব। এইরূপ সুবিধা ও অসুবিধার দিক আলোচনা করিয়া বাংলায় সেচ বিভাগের ইঞ্জিনীয়র মিঃ এস্-সি-মজুমদার কিছুদিন পূর্ব্বে Science & Cultureএ যে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। এইখানে আমরা তাঁহারই কয়েকটী মতামত সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বাংলার বিভিন্ন বিভাগের সমস্যা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র হওয়ায় কোন একটী সার্ব্বজনীন সমাধান এককালে প্রত্যেকের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। পশ্চিম বাংলা, মধ্য বাংলা, উত্তর বাংলার প্রত্যেকেরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সমস্যা রহিয়াছে। এমন কি পশ্চিম বাংলার মধ্যে আবার পশ্চিম ও পূর্ব্ব অংশের সমস্যা এক নহে। সে যাহাই হউক পশ্চিম বাংলার কথাই প্রথমতঃ ধরা যাক। ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার পাহাড় হইতে উৎসারিত হইয়া দামোদর, অজয়, ময়ুরাক্ষী, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী বর্দ্ধমান বিভাগের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এই বিভাগে বৃষ্টিপাত নিতান্ত মন্দ নহে। তবে মুস্কিল হইতেছে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে সেচের যখন বিশেষ প্রয়োজন তখন এই কার্য্যের জন্য নদীগুলিতে জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়। জুন, জুলাই মাসে বৃষ্টির সময় নদীগুলিতে যে বন্যা নামিয়া আসে তাহা বিশেষ কাজে আসিতে পারে না। বর্দ্ধমান বিভাগে সম্প্রতি খাল কাটিয়া সেচের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। মেদিনীপুরে কাঁসাই নদীর সাহায্যে ৮০,০০০ একর জমি, দামোদরের সাহায্যে বর্দ্ধমানে ১৮০,০০০ একর এবং বীরভূমে বক্রেশ্বরের দ্বারা ১০,০০০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহার অধিক জলসেচের ব্যবস্থা উক্ত নদীর সাহায্যে সম্ভবপর নহে। তবে এই নদীগুলির উৎসমুখে বাঁধ দিয়া বৃষ্টির সময় জল আটক করিবার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহা হইলে, সে ব্যবস্থা হইতে পারে। বীরভুম ও বাঁকুড়া জেলায় এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে জল আটক রাখিবার সুবিধা আছে। প্রসঙ্গত মাদ্রাজের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেইখানেও এইরূপ বাঁধের সাহায্যে ব্যাপক জল সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। মাদ্রাজে জুলাই আগষ্ট মাসের প্রয়োজনীয়তা মিটাইবার জন্য আগের বৎসরের অক্টোবর নভেম্বর মাসে জল ধরিয়া রাখিতে হয়। সময়ের এইরূপ ব্যবধান থাকায় এই সঞ্চিত জলের অনেকাংশ বাষ্পীভবন ও বিশোষণের ফলে বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। বাংলায় এই জাতীয় অসুবিধা ততটা নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে একই পরিমাণ জল মাদ্রাজে যতটুকু জমি জলসেচ করিতে পারে বাংলাদেশে তাহার অন্ততঃ ছয়গুণ অধিক জমিতে জলসেচের সুবিধা করিয়া দিতে পারিবে।

পশ্চিম বাংলার পূর্ব্ব অংশের দুরবস্থার জন্য নদী উপনদীর তীরবর্ত্তী বাঁধগুলিই দায়ী। বৎসরের পর বৎসর বন্যাকে ঠেকাইবার জন্য বাঁধের উচ্চতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়া কিরূপে বিপদ ডাকিয়া আনা হইয়াছে সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা বুঝা যাইতেছে, বাঁধগুলি একেবারে উঠাইয়া দিয়া বন্যার পলিমাটীর সাহায্যে জমির উন্নয়ন কার্য্য প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই সমীচীন হইবে। কিন্তু রেলওয়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকায় ইহা সম্ভবপর নহে। সুতরাং জায়গায় জায়গায় নিরাপদ স্থান বাছিয়া বন্যার জল ক্ষেত্রের মধ্যে বহাইয়া দিয়া আমাদের অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইরূপে পলির সংস্রবে আসিয়া উপবাসী ক্ষেত্র আবার ধীরে ধীরে শস্যশ্যামল হইয়া উঠিতে পারে।

আমরা দেখিয়াছি মধ্য বাংলার পতন পদ্মার আবির্ভাবের পর হইতেই সুরু হইয়াছিল। ভৈরব ও সরস্বতীর পতন এবং ভাগীরথীর প্রাধান্য হ্রাস গঙ্গার পূর্ব্বমুখী প্রবাহের ফল। পরবর্ত্তীকালে জলাঙ্গী ও মাথাভাঙ্গা মধ্য বাংলার দুর্দ্দশা কিয়দংশে দূর করবার চেষ্টা করিলেও অচিরে উহারা নিজেরাই শুকাইয়া যাইতে থাকে। গঙ্গার পূর্ব্বমুখী স্রোত মধ্যবাংলার নদীগুলির পতনের কারণ হইলে পদ্মার প্রবাহ কিয়দংশে প্রতিহত করিয়া দক্ষিণমুখী নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টাতেই মধ্যবাংলার সমস্যার সমাধান হইবে এইরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত। স্যার উইলিয়ম উইলকক্স পদ্মার বাঁধ দিয়া ইহার প্রবাহের কিয়দংশ ভাগীরথী, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতিতে বহাইয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। যুক্তিসঙ্গত হইলেও এই কার্য্যে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তাহা বিচার করিয়া সেচ বিভাগ এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং পদ্মার বাঁধ দিবার পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াই আমাদের সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে আমাদের আর একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বদ্বীপের নদীর প্রবাহের কোন স্থিরতা নাই। এককালে গঙ্গা যেমন তাহার দক্ষিণ-মুখী প্রবাহ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল অদূর ভবিষ্যতে গঙ্গা তাহার সাবেক পথে ফিরিয়া আসিতেও পারে। হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নিকট পদ্মার এইরূপ অস্থিরতার লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য সেই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে কয়েক শতাব্দীও কাটিয়া যাইতে পারে। সে যাহাই হউক বর্ত্তমানে প্রতিকারের একটা ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃত্রিম উপায়ে মধ্যবাংলার নদী সংস্কার প্রয়োজন। পদ্মার জল মাথাভাঙ্গা দিয়া দক্ষিণে বহাইয়া দিবার সহজ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্বে মাথাভাঙ্গার মুখে একটী বিরাট চর পদ্মার জলকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধা দিত। এই চরে এখন ভাঙ্গন ধরিয়াছে এবং চেষ্টা করিলে মাথাভাঙ্গার প্রাধান্য আরও বর্দ্ধিত করা কঠিন নহে। মাথাভাঙ্গার আর একটী সুবিধা এই যে পরে ইহার প্রবাহকে ভৈরব, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, কপোতাক্ষী প্রভৃতিতে বহাইয়া মধ্য বাংলার এই মরা নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা চলিবে। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ইহাদিগের সংস্কার ও নদী খাতের গভীরতা সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন। জলাঙ্গী ও ভাগীরথীর এইরূপ স্বাভাবিক শাখা প্রশাখার বাহুল্য না থাকিলেও প্রয়োজন মত উহাদিগকে কাটিয়া লইতে হইবে। কৃত্রিম উপায়ে নদী ও শাখা নদীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া কিছুদিন ঐ অবস্থায় রাখিতে পারিলে, বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, পরে প্রকৃতি আপনা হইতেই উহাদের ভার গ্রহণ করিতে পারে।

উত্তর বাংলার সমস্যাও অনেকাংশে মধ্য বাংলার মত। ব্রহ্মপুত্রের সহিত তিস্তার মিলনের পর হইতেই উত্তর বাংলার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত করোতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা প্রভৃতির পতন ঘটে। হিমালয়ের তুষার-গলিত জলে পুষ্ট নদীর পলিতে উত্তর বঙ্গের উত্তরাংশ ক্রমশঃ উন্নীত হয়। তারপর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ যমুনা ও পদ্মার পলিতে উন্নীত হওয়ায় এই বিভাগের মধ্যস্থলের অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি আজ 'চলন' বিল অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আপনা হইতে এই জমি উন্নীত না হইলে এই বিরাট বিলের জল নিকাশের সম্ভাবনা নাই। ইহার একমাত্র সমাধান হইতেছে তিস্তাকে বাঁধের সাহায্যে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইতে না দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে দেওয়া। ইহাতে করোতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা

ও ইহাদের বহু উপনদী ও শাখানদীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া উত্তর বঙ্গকে তাহার পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইবে। তারপর দক্ষিণ পশ্চিমে মহানন্দাকে সেচকার্য্যে নিযুক্ত করা চলিতে পারে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে আমাদের সমস্যা সমাধানের ধরণ কিরূপ হইবে। কিন্তু এই সমস্যা উপলব্ধি করা, আর ইহাকে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী করিয়া তোলা এক কথা নহে। বাংলার নদনদীগুলি এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ—তাহাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং এই নদী সংস্কার কার্য্য সমগ্রভাবে আরম্ভ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কোন একটী নদী বিশেষের সংস্কার শেষ করিয়া দেখা যাইবে হয়ত আর একটী নদীর পতন সুরু হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশকেও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তাহারা নদী বিজ্ঞান ল্যাবরেটরী স্থাপন করিয়া এই সমস্যার সুন্দর সমাধান সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এইরূপ ল্যাবরেটারীতে নদী সংক্রান্ত বহু প্রাথমিক পরীক্ষার সাহায্যে নদী সংস্কারের ভবিষ্যত কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। কার্লস্রুহেতে (Karlsruhe) অধ্যাপক রেবকের (Prof. Rehbock) তত্ত্বাবধানে রাইন কমিশন পরিচালিত নদীবিজ্ঞান ল্যাবরেটরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাইন নদী ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহাকে সারা বৎসর নাব্য রাখাই উক্ত কমিশনের উদ্দেশ্য। মাঞ্চেষ্টার, সার্লোটেনবার্গ প্রভৃতি বহু স্থানে এইরূপ নদীবিজ্ঞান ল্যাবরেটরী স্থাপিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে এদেশেও অনুরূপ নদীবিজ্ঞান ল্যাবরেটরী স্থাপনের কথা বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন। ডক্টর এন, কে, বসু (Irrigation Research Institute, Punjab) ইউরোপ ও আমেরিকার বহু নদীবিজ্ঞান ল্যাবরেটরী প্রদর্শন করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তেই পৌছিয়াছেন। এখন গভর্ণমেণ্ট কতদূর কি করিতে পারেন তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মেদিনীপুরে বাতাবর্ত

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গত ২৯শে আশ্বিন ১৬ই অক্‌টোবর শুক্রবার দুর্গা-সপ্তমী। সেদিন মেদিনীপুরে যে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, সে সংবাদ সকলেই অবগত হইয়াছেন। বাঁকুড়ায় বৃহস্পতিবার রাত্রে পূর্ব্বদিক হইতে বাতাস বহিতেছিল। শুক্রবার বেলা ৯টা-১০টার সময় ঝড়ের গতিক দেখিয়া বুঝা গেল দক্ষিণে বাতাবর্ত চলিতেছে। সন্ধ্যাবেলা শুনিলাম এখানকার মেজিষ্ট্রেট সাহেব সকলকে সাবধান হইতে বলিয়াছেন। সে রাত্রে কলিকাতার ট্রেণ আসে নাই, পরেও তিন চারি দিন আসে নাই। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর হইতে লোক আসিতে লাগিল। কি ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া গেল। শুক্রবার রাত্রে কলিকাতা হইতে এখানে লোক আসিবার কথা ছিল। দুই দিন পরে কেহ কেহ বর্দ্ধমান, আসনসোল পথে ঘুরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা শুক্রবার রাত্রি ৯টার সময় হাওড়ায় গাড়ীতে উঠিয়াছিল। বিশ মাইল দূরে উলুবেড়িয়া ষ্টেশনে সারারাত্রি ও পরদিন কাটাইয়া রাত্রে কলিকাতা ফিরিয়াছিল। গাড়ী অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত কাণ্ড হইয়া গেল, কলিকাতার রেডিও-ঘোষক একটি কথাও বলেন নাই, সংবাদ-পত্রে ঝড়ের উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। রেলপথ বন্ধ ছিল। কিন্তু গঙ্গায় ষ্টীমার ছিল। তমলুক ছয় ঘণ্টার পথ। বায়ু-পোত দুই ঘণ্টায় মেদিনীপুরের অবস্থা দেখিয়া আসিতে পারিত।

কেহ ঝড় নিবারণ করিতে পারে না। কিন্তু ঝড়ের সম্ভাবনা দুই একদিন পূর্বে করিতে পারা যায়। এই নিমিত্ত বঙ্গদেশের জন্য কলিকাতার আলিপুরে আবহ-জ্ঞাপক আছেন। আলিপুরে আবহ-নিরূপক যন্ত্র আছে। তদ্দ্বারা কলিকাতার আবহের পরিবর্তন জানিতে পারা যায়। মেদিনীপুরেও আবহ-নিরূপণ থানা আছে। সেখানে নিশ্চয়ই আগন্তুক ঝড়ের পূর্বলক্ষণ দেখা গিয়াছিল। আবহ-বিভাগও একটি কথা বলেন নাই।

শুধু ঝড় হইলে এত প্রাণহানি হইত না। ঘরের খড়ের ও টিনের চাল উড়িয়া যাইত, বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া উপড়াইয়া পড়িত, ক্ষেতের ধান নষ্ট হইত। ঝড়ের সহিত প্রবল বৃষ্টি হইলে কষ্ট বাড়িত, লোকক্ষয়ও কিছু বাড়িত। কিন্তু মেদিনীপুরের বাতাবর্তে সমুদ্র উথলিয়া দক্ষিণ ও পূর্বপার্শ্ব বন্যা-প্লাবিত করিয়াছিল। বিবৃতি পড়িয়া মনে হইয়াছে যে এই অকস্মাৎ জলপ্লাবনই অসংখ্য মনুষ্য ও গবাদি পশুর প্রাণহানির কারণ। জলপ্লাবন গণিতে পারা যায় না। কিন্তু বাতাবর্তের পূর্বলক্ষণ দেখিয়া আশঙ্কা করিতে পারা যায়।

এইরূপে সমুদ্রের উত্থান এইবার প্রথম নহে। ১২৭১ সালে (ইং ১৮৬৪) আশ্বিন মাসের বাতাবর্তে সমুদ্র উথলিয়া গঙ্গাসাগর হইতে পশ্চিমে মেদিনীপুর ও পূর্বে চব্বিশপরগণার বহুস্থান ডুবাইয়া দিয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার নর-নারী প্রাণ হারাইয়াছিল। গোরু-বাছুরের ত কথাই নাই। সমুদ্রের তরঙ্গ নদীতে প্রবেশ করিয়া নদীর জল পেছু দিকে ঠেলিয়া বন্যা উৎপাদন করিয়াছিল। জল-প্লাবনের পরে মহামারি উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাণহানির সংখ্যা ছিল না। তখন সে সব দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা ছিল না। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার স্মরণ করিয়া লোকে ইহাকে ৭১ সালের মন্বন্তর বলিত। ইহার দুই বৎসর পরে উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া জেলায় ভয়ঙ্কর আকাল পড়িয়াছিল। তেমন আকাল আর দেখা যায় নাই। পথে ঘাটে কঙ্কালসার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। উপরি উপরি দুই বৎসর ধান হয় নাই। লোকে সোনা দিয়াও ধান পায় নাই। একাত্তর সালের পর একাশী সালে কার্তিক মাসে মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমান দিয়া এক ভীষণ বাতাবর্ত বহিয়া গিয়াছিল। তাহাতে সমুদ্রতরঙ্গ উত্থিত হইতে শোনা যায় নাই।

বঙ্গের পূর্বদিকেও বাখরগঞ্জ নোয়াখালী বিশেষতঃ দক্ষিণ সাবাজপুর বাতাবর্ত হেতু সমুদ্র-তরঙ্গ দ্বারা প্লাবিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ১২৮৩ সালে কার্তিক মাসে এক পূর্ণিমার পরদিন সমুদ্রতরঙ্গে লক্ষাধিক মনুষ্য নিমগ্ন ও বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহার ৫৪ বৎসর পূর্বে ১২২৯ সালে বাতাবর্ত-জনিত সমুদ্রতরঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছিল। গত বৎসর ১৩৪৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে বাখরগঞ্জ জেলার ভোলা সব্‌ডিভিসন্ সমুদ্র-গ্রাসে পড়িয়াছিল। দশ হাজার লোক প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিল।

পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ ভীষণ ঝড় আশ্বিন কার্তিক মাসে হইয়া থাকে। এই কারণে লোকে বাতাবর্তকে আশ্বিনে ঝড় কিংবা কার্তিকে ঝড় বলিয়া থাকে। বর্ষাকালের পূর্বে ও পরে বাতাসের দিক পরিবর্তিত হয়।

দুই বিপরীতমুখী বাতাসের সংঘর্ষে ঘূর্ণিঝড় উৎপন্ন হয়। তাহাই বাতাবর্ত। (বাত বাতাস, আবর্ত ঘূর্ণি।) গঙ্গাসাগরের দক্ষিণে উৎপন্ন হইলে বায়ুকোণের ভূমির দিকে চলিয়া আসে। তারপর বাঁকিয়া ঈশান দিকে অগ্রসর হয়। বোধহয় সেদিনকার বাতাবর্ত প্রথমে কাঁথির পূর্বদিকে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখান হইতে বাঁকিয়া তমলুক, ঘাটাল, আরামবাগ দিয়া বর্দ্ধমানে শেষ হইয়াছিল। সুন্দরবনের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হইলে সোজা ঈশান কোণে তটে প্রবেশ করিয়া সেই পথেই চলিয়া যায়, বাখরগঞ্জ নোয়াখালীতে উপস্থিত হয়। এই অগ্রগতি ঘণ্টায় দশ বার মাইলের অধিক হয় না। কাঁথি হইতে আরামবাগ বক্রপথে প্রায় একশ'ত মাইল। এই পথ যাইতে দশ বার ঘণ্টা লাগিয়া থাকিবে। মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূলে ঝড় প্রবল হইবার পর দশ বার ঘণ্টা পরে আরামবাগে হইয়াছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশ সমুদ্র-উপকূলে বেলা ২টার সময় সমুদ্রের বন্যা উঠিয়াছিল। সে সময়ে ঝড় প্রবলতম ছিল। আরামবাগে সে দিন রাত্রি ২টা-৩টার সময় ঝড় প্রবল হইয়াছিল। সেখানেও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। একটি অশথ গাছ দাঁড়াইয়া নাই। এমন কি তাল গাছও উপড়াইয়া পড়িয়াছে।

বাতাবর্তের অগ্রগতি ব্যতীত আর এক গতি আছে। সেটাই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিগতি। বাতাবর্তে চারিদিকের বাতাস ভীষণবেগে কেন্দ্রমুখে বহিতে থাকে। সমুদয় পথই এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে চলে। প্রত্যেক স্থানেই প্রথমে ঈশান কোণে আরম্ভ হইয়া পরে উত্তর ও বায়ু কোণ হইতে বহিতে থাকে। পশ্চিম ও দক্ষিণে হইলেই ঝড়ের শেষ বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ববঙ্গের ঘূর্ণিঝড় বাতাবর্তের ছোট ভাই। বিস্তারে ও দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু চণ্ডতায় সমান। গ্রীষ্মকালে ঘটে। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম সময়ে খোলা মাঠে কখন কখন ঘূর্ণিবায়ু উঠে। বালি, মাটি, শুখনা পাতা উপর দিকে টানিয়া লইতে লইতে অগ্রসর হয়। তিনেরই প্রকৃতি এক। কেন্দ্রস্থলে বায়ু উর্দ্ধগতি হয়—যেন উপর হইতে কিছুতে নীচের দ্রব্য টানিয়া লইতে থাকে। নীচে গাছ থাকিলে শিকড় ছিঁড়িয়া গাছ উপরে উঠিবে, ঘরের চাল, নৌকা থাকিলে শূন্যে তুলিয়া লইয়া যাইবে। বিস্তীর্ণ নদীজল পাইলে জলস্তম্ভ হইবে।

১২৭১ সালের ঝড় ও সমুদ্রপ্লাবনের পরে ১২৮১ সালে ঝড় হইয়াছিল। লোকে মনে করিয়াছিল, দশ বৎসর পরে ৯১ সালে আবার ঝড় হইবে। কিন্তু হয় নাই। আবহবিদ্যার উন্নতি হইয়াছে। কবে কোথায় গ্রীষ্মাধিক্য বৃষ্টিবাত্যা হইবে, তাহা দুই একদিন পূর্বে বলিতে পারা যায়। এ সকলের স্থূল কারণ জানা গিয়াছে। কিন্তু আবহ-পর্যায় অদ্যাপি অজ্ঞাত। একই ভূপৃষ্ঠ, জল, স্থল, সাগর পর্বতের একই সন্নিবেশ। একই সূর্য, কিন্তু কেন যে আবহপরিবর্তন সমভাবে না হইয়া হঠাৎ বিষম আকারে হয় সে তত্ত্ব অদ্যাপি অজ্ঞাত। যেমন ঋতুপর্যায় চলিতেছে, তেমন আবহপর্যায়ও আছে। হয়ত অতিশয় দীর্ঘ, সেই কারণে অজ্ঞাত। জ্বলন্ত সূর্যপিণ্ডের চতুর্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল সমভাবে থাকে না। বিশাল সংক্ষোভে ঊর্মি উত্থিত অধোগত হয়। আমরা সৌর কলঙ্করূপে দেখিতে পাই। কলঙ্ক-আবির্ভাবের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। প্রায় ১১ বৎসর অন্তর পরম হ্রাস ও পরম বৃদ্ধি হয়। সূর্যের তেজেই ভূমণ্ডলে বৃষ্টিবাত্যা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এককালে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন, এই সকলের বিষম পরিবর্তন ১১ বৎসর অন্তর ঘটিয়া থাকে। ঘটিবেই, এমন কথা নয়, ঘটিতে পারে। দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষকেরা এক এক চক্র ধরিয়া বলেন—অমুক বৎসরে বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইবে। 'হইবেই হইবে', এ কথা বলিতে পারেন না। বসন্তরোগ প্রাদুর্ভাবের সমুদায় কারণ অজ্ঞাত। আর কারণ অজ্ঞাত হইলে গণনা অনিশ্চিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, মেদিনীপুরের বন্যাপ্লাবনে একাদশ বর্ষচক্র মিলিয়া যাইতেছে। ১২৭১ হইতে ১৩৪৯ সাল ৭৮ বৎসর ৭×১১। ভোলাতে ১২২৯ হইতে ১২৮৩ সাল ৫৪ বৎসর=৫×১১। ১২৮৩ হইতে ১৩৪৮ সাল ৬৫ বৎসর=৬×১১।

এ বৎসর কেবল মেদিনীপুরে নয়। কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম শ্যামদেশেও ভয়ঙ্কর বাতাবর্ত হইয়াছিল। আর গত ২৯শে কার্তিক পুরী ও গঞ্জাম জেলায় বাতাবর্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঝড়েও সমুদ্রতরঙ্গ তটভূমিকে নিমগ্ন করিয়াছিল। পৃথিবীর নানাস্থানে লোমহর্ষণ যুদ্ধ চলিতেছে। অপরিমিত গোলা ছুটিতেছে, বায়ুতে বম্ ফুটিতেছে। একদিন নয় দুইদিন নয়। বায়ুমণ্ডলে এই যে ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ চলিতেছে, ইহার ফলে শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি বাত্যায় প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিবার কথা।

সমুদ্রে ঝড় বহিলে ঝড় ও সমুদ্র মাতামাতি করে। বিশাল তরঙ্গ, কভু তালগাছ প্রমাণ উত্থিত হয়। তটাভিমুখে ঝড় বহিতে থাকিলে সে তরঙ্গ তটে আছাড় খাইয়া পড়ে এবং ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া সর্-সর্ ধাবিত হয়। পশ্চাৎ হইতে আর এক তরঙ্গ প্রথমকে, তার পশ্চাতে আর এক তরঙ্গ দ্বিতীয়কে ঠেলিতে থাকে। এইরূপে উচ্চতটভূমিও প্লাবিত হয়। মেদিনীপুরের সমুদ্র নিকটস্থ দক্ষিণভাগে, যেমন কাঁথিতে বাঁধ ছিল। কিন্তু সে বাঁধ জোয়ারের জল আটকাইতে পারে, সমুদ্র-তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত সহিতে পারে না। মেদিনীপুরের পূর্বভাগ ও চব্বিশপরগণার পশ্চিমভাগ নিম্নভূমি। সমুদ্রতরঙ্গ গঙ্গা-সাগর দিয়া গঙ্গার জল ঠেলিয়া তুলিয়া এই নিম্নভূমি প্লাবিত করিয়াছিল। এইরূপে পূর্বে সাগরদ্বীপ কাকদ্বীপ ডায়মণ্ডহারবার পশ্চিমে সুতাহাটা তমলুক জলপ্লাবিত হইয়াছিল।

কূল হইতে অন্ততঃ পাঁচ মাইল অর্থাৎ প্রায় চারিশত বর্গমাইল দেশ গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে। প্রতি বর্গ মাইলে তিনশত লোকের বাস ধরিলে ১২০,০০০ অর্থাৎ লক্ষাধিক লোকের প্রাণ সংশয় হইয়াছিল, পঞ্চাশ যাট হাজার লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকিবে। উড়িষ্যা যাইবার এক দীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছে। সংবাদ-পত্রে প্রকাশ, এই খালের দক্ষিণ বাঁধে মৃতদেহ দেখা গিয়াছিল। এখানকার ভূমি উর্বরা। কিন্তু জলাদেশে চাপে-চাপ বসতি হয়না। তথাপি প্রতি বর্গমাইলে পাঁচশত লোকের বাস ধরিলে প্রায় দেড়লক্ষ লোকের দুর্দশার সীমা ছিলনা। কেহ কেহ প্রাণ হারাইয়া থাকিবে। রূপনারায়ণের বাম পার্শ্বে তমলুক, দক্ষিণপার্শ্বে হাওড়া জেলার শ্যামসুন্দরপুর বন্যা প্লাবিত হইয়া থাকিবে। এইরূপে দেখা যায় বন্যাক্লিষ্ট লোকের সংখ্যা দুই লক্ষ হইবে। দিবাভাগে বান উঠিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টিবাত্যায় উচ্চভূমির দিকে পলায়ন সহজ হয় নাই। বেলাও বেশী ছিলনা। নিরাপদ আশ্রয়স্থানই বা কোথায় ছিল ?

মেদিনীপুরের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষগুলিকে জীবিত রাখিতে ও প্রতিষ্ঠিত করিতে গবর্ণমেণ্ট ও সহৃদয় ধর্মসেবকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অন্ন নাই, শিশু ও আতুরের দুগ্ধ নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, পানীয় জল পর্যন্ত নাই। তার উপর শীতকাল। দেশে অতিশয় দুঃসময় চলিতেছে। এই বাতাবর্ত-জনিত দুর্গতির প্রতিকার অতিশয় কঠিন হইয়াছে। ধর্মসেবকগণকে দুইভাগ করিলে ভাল হয়। একভাগ বর্তমান দুঃখমোচনে সচেষ্ট থাকিবেন, অপর একভাগ গ্রাম প্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তা করিবেন। তাঁহাদের বিবেচনার নিমিত্ত আমি এখানে কয়েকটি উপায়ের উল্লেখ করিতেছি।

(১) পানীয় জলের কষ্ট ভীষণ কষ্ট। বৃষ্টির জল পাইতে এখনও ছয় মাস সাত মাস। বোধহয় বন্যাপ্লাবিত স্থানের পশ্চিমাংশে কুআর মিঠা জল পাওয়া যাইবে। ভাল ভাল পুকুর হইতে গাছপালা তুলিয়া ভেলায় চড়িয়া চুণ ছড়াইয়া দিলে জলের দোষ কাটিতে পারে। পরীক্ষা কর্তব্য। অন্যত্র জল চুআইয়া লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। জ্বালানি কাঠের অভাব হইবে না। লোকে ভাত রাঁধে, পানীয় জলও করিয়া লইতে পারিবে। হাঁড়ি, বুটি-সরা ও বাঁশের নল যোগে জলের ভাপ্ জমাইয়া লইবার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(২) বন্যাপ্লাবিত স্থানে উপরের মৃত্তিকায়, এক ফুট ও দুই ফুট নীচের মৃত্তিকায় নুনের মাত্রা অবিলম্বে পরিমাণ করা উচিত।

সুন্দরবনে যেখানে যেখানে আবাদ হইতেছে, বিশেষতঃ ভোলা ও নোয়াখালীর মৃত্তিকার নূনের মাত্রা পরিমাণ করিয়া মেদিনীপুরের সহিত তুলনা করিতে হইবে। মেদিনীপুরের নুন এক বর্ষায় ধুইয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

(৩) যে যে ধানের জাত নোনা মাটিতে জন্মে বাড়ে ফলে, যেমন ভোলার কৃষ্ণজীরা ও কলিকাতায় বালাম নামে খ্যাত চাউলের বীজ মেদিনীপুরের নোনা মাটির পক্ষেও উপযুক্ত হইবে। এখন হইতে সে সব ধান সংগ্রহ করা কর্তব্য। এইরূপ নোনা মাটিতে যে যে রবি ফসল হয়, যেমন বিরিকলাই লঙ্কা—সে সকলেরও অল্প অল্প চাষ করিয়া এখনই দেখা কর্তব্য।

(৪) গবাদি পশু একটিও নাই। আবশ্যক হালের গোরু ও দুগ্ধের গাই কোথায় পাওয়া যাইবে? জলা দেশের পক্ষে মহিষই ভাল। বোধ-হয় পূর্বে মহিষ অধিক ছিল। গ্রামের নাম মহিষাদল ও জাতির নাম মাহিষ্য স্মরণ করিলে মহিষের দেশ মনে আসে। গয়া জেলায় মহিষ ও মহিষী পাওয়া যাইবে। ছাগী পুষিলে দুগ্ধের অভাব কতকটা মিটিবে। কিন্তু চাষের নিমিত্ত হালিয়া গোরু কিংবা মহিষ ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইবে। এস্থলে কলের লাঙ্গল ও কলের মই প্রচলন কর্তব্য। বিস্তীর্ণ মাঠ একত্র চাষ করিয়া লোকেরা স্ব স্ব জমির পরিমাণ অনুসারে ফসল ভাগ করিয়া লইবে।

(৫) বস্ত্রের নিমিত্ত চরকার বহুল প্রচলন আবশ্যক। দশ বার খানা গ্রামের মধ্যে এমন সহৃদয় কর্মী পাওয়া যাইবে, যাহারা চরকা ও তুলা দিয়া সুতা লইবে। কাপড় বুনাইয়া কাটনীর বানির পরিবর্তে কাপড় দিবে। অল্পে অল্পে চরকার দামও তুলিয়া লইতে পারা যাইবে। কারণ এখন কলের কাপড় দুর্মূল্য।

(৬) সমুদ্র-উপকূলবাসীরা প্রচুর পরিমাণে নুন করিতে থাকিবে। ইহাতে নুনকরদের যেমন জীবিকা হইবে, দেশে নুনের অভাবও কিছু মিটিবে।

(৭) মেদিনীপুরের ডাঙ্গা জমিতে উত্তম কার্পাস জন্মে। কার্পাস ও মাদুর-কাটির চাষ বাড়াইয়া দিতে হইবে। আগামী বৎসর বহু লোকের কাজ জুটিবে।

(৮) মেদিনীপুরের যে সকল নিম্ন-স্থান প্রায়ই বন্যা-প্লাবিত হয়, সেই সকল স্থানে মাটির ঘর টিকে না। বন্যার জলে কাঁথ গলিয়া পড়ে। লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। পূর্ববঙ্গে চেঁচা বাঁশের ঘর প্রসিদ্ধ। যেখানে বন্যার আশঙ্কা থাকে, সেখানে মাটির ঘর পরিত্যজ্য। নোনা মাটিতে উই থাকে না। চেঁচা বাঁশ পোতার নীচে হইতে উঠিবে। (শুনিয়াছি মেদিনীপুরের কোন কোন নোনা স্থানে উইএর উপদ্রব আছে। কিন্তু মাটি বাস্তবিক নোনা মনে হয় না। নিম্ন নোনা ভূমিতে উই থাকিতে পারে না।) বাঁশের খুঁটীর ঘর হনুমানের উপদ্রব সহিতে পারিবে কিনা সেটাই বিবেচ্য। হনুমান ধরিয়া দ্বীপান্তরিত না করিলে, কেবল মেদিনীপুর নয়, হুগলী বর্দ্ধমান বাঁকুড়া জেলায় স্বস্তি থাকিবে না। ঝড়ে ও বন্যায় কিছু নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পালের তুলনায় কিছুই নয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অবধান কর্তব্য।

(৯) মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে বহু চক্র-বন্ধ আছে। ভূমি-পৃষ্ঠ নদীনালায় বিভক্ত হইয়া খণ্ড খণ্ড দ্বীপ হইয়াছে। বন্যা হইতে রক্ষা নিমিত্ত দ্বীপের বেষ্টন করিয়া বাঁধ আছে। এক একটি দ্বীপ এক একটি গড়খাই। পাশে পাশে গড়, নদীনালা পরিখা। গড়ে নদীজল প্রবেশ করিতে পারে না। গড়ের ভিতরের বৃষ্টি জল কষ্টে বহির্গত হয়। কারণ বর্ষাকালে পরিখা জলপূর্ণ থাকে, কপাট বন্ধ রাখিতে হয়। পূর্বাংশের গড় মেলিয়ার খনি। সম্প্রতি সে কথা থাক। সে সকল গড়ে নোনা জল প্রবেশ করিয়াছে। সে জল এখন গড়ের ভিতর শুখাইয়াছে। মাটির উপরে নুনও জমিয়াছে। এই নুন ধুইয়া যাইতে কত বৎসর লাগিবে? গড়ের উত্তরে ও দক্ষিণে বাঁধ না কাটিলে নদীজল প্রবেশ ও নির্গম করিতে না দিলে নুন শীঘ্র দূরীভূত হইবে না। ইহাতে দেশের মঙ্গল হইবে। গিরিদুর্গ নয়, সিমেন্ট কন্‌ক্রিটের নয়, বালি মাটির নোনা মাটির বাঁধ ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। আর, পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে আর্তনাদ উঠিবে। এ দৃশ্য আর দেখিতে পারা যায় না।

(১০) বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে গ্রাম প্রতিষ্ঠার সময় ভাবিতে হইবে এইরূপ সমুদ্র তরঙ্গ আবার আসিবে। রক্ষার উপায় না করিলে আবার হাহাকার উঠিবে। মাটির বাঁধের সাধ্য নাই রক্ষা করে। বালি-আড়ী ও বাঁধ কাঁথি রক্ষা করিতে পারে নাই। তমলুকের বাঁধ রূপনারায়ণের বাঁধ বন্যা রোধ করিতে পারে নাই। তমলুক নগর হইতে মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা পর্যন্ত সমুদ্রের জোয়ার সীমার পরে প্রথমে বেত, পরে বেউড় বাঁশ, মুলী বাঁশ ও অন্যান্য বাঁশ পরে নারিকেল, শেষে পুন্না গাছের বন করিলে সমুদ্র তরঙ্গ প্রতিহত হইবে, আর দেশের অগণ্য লোকের জীবিকার উপায় হইবে। কাজ সামান্য নয়। প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইবে, প্রচুর আয়ও হইবে। যেখানে যেখানে চক্রবন্ধ কাটিয়া জল প্রবেশ ও জল নির্গমের পথ করিতে হইবে, সেখানে সেখানেও বেত ও বাঁশ বন করিলে জলের তোড় মৃদু হইবে। প্রবেশ পথে মোটা বালির বাঁধ হইতে থাকিবে এবং চক্রের ভিতরের পলি ভিতরেই থাকিবে।

কৌতুকের পরিণতি

শ্রীমিহিরকুমার বসুমল্লিক বি-এ

দরখাস্ত করার জন্যে পোষ্টেজ্ খরচার ধাক্কা যখন একটা সম্মানজনক আকার লাভ করেছে তখন হোলো এর ইতি অর্থাৎ চাকরী মিললো। যদিও একটা কিন্তু রয়ে গেলো—মানে অস্থায়ী। তবুও মন্দের ভালো সরকারী চাকরী! সময়টা তখন জানুয়ারী মাসের শেষ, জাপানী বোমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে লক্ষ্মণসেনের দেশবাসীরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে এই সময়। আমি পালাইনি সুতরাং আমাকে ছেড়ে যাও যেতে পারেননি—আর পুরোনো চাকরটা ছিল বলেই তখনকার ধোপাচাকরবামুনবর্জ্জিত কোলকাতায় থাকা সম্ভবও হয়েছিল। এই সময়ে বাঙ্গালীজাতির জীবনে অভূতপূর্ব্ব পরি-স্থিতির মধ্যে আমি পেলাম চাকরী।

জয়েন করার পর কয়েকদিনের মধ্যেই সহকর্ম্মীদের সঙ্গে পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতাও হোল যথেষ্ট, কারণ অনেকেই আমার সমবয়সী দু'একজন বাদে। আমার অনভিজ্ঞতাকে তাদের স্বল্প অভিজ্ঞতা দিয়ে আড়াল করে তারা সাহায্য করতে লাগলেন। কাজেই অন্তরঙ্গতা হোল ভালভাবেই।

দিন পনেরো পরের কথা। প্রণবের বিয়ে। প্রণব আমার আবাল্য বন্ধু ও সহপাঠী। ছেলেবেলার বন্ধু বলে তার বিয়েতে আমার ওপর যথেষ্ট কাজের বোঝা চাপলো। বিয়ের আগের দিন অফিসে গেছি—এক গোছা শুভবিবাহের রঙ্গীন লিপি নিয়ে। উদ্দেশ্য অফিসের বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা। কিন্তু রঙ্গের গন্ধ পেয়ে তারাই আমাকে আক্রমণ করলে রীতিমত। কোন সুযোগ না দিয়ে অভিযোগ করলে "বিমল! এই তোমার বন্ধুর বিয়ে ঠিক

করে তবে আমাদের খবর দিচ্ছ! কেন আগে বললে কি ক্ষতিটা হোত! আমরা তোমার স্বপ্নাবেশের একটু স্বাদ উপভোগ করতুম, তা বুঝি তোমার অসহ্য মনে হোল! আমি তাদের শান্ত করে বললাম, 'দেখ, যা ভাবছ তা নয়। এ আমার বিয়ে নয়—বন্ধুর। তোমাদের আহ্বান করছি—"

বাধা পড়লো। "কিহে কার আবার যুদ্ধের বাজারে বিয়ে দিচ্ছ।"

কৌতুকভরা স্বরে প্রশ্ন করতে করতে ঢুকলেন রসময়বাবু—আমাদের বড়বাবু। কিন্তু বড়বাবুত্ব তিনি একটুও জাহির করেননা। এই সদালাপী রহস্যপ্রিয় প্রৌঢ়ই এক রকম তার রসভরা কথাগুলি দিয়ে আমাদের কলমপেশার কাজের মধ্যেও একটুখানি বৈচিত্র্য বজায় রেখেছেন। আমি নমস্কার করে তাঁকে একটা নিমন্ত্রণ লিপি দিলাম। বললাম—"যাবেন ত!" রসময়বাবু বিব্রতের মত মুখভার করে বললেন, "মুস্কিল করলে হে! ডিস্‌পেপটীক্ আমি গেলেও খেতে পারবোনা—আর খেতে যখন পারবোনা তখন যাবোনা—সুতরাং বিমল হতাশ হয়োনা, তোমার বিয়েতে কিন্তু যাবো এবং খাবো, কেমন!" মুচকি হেসেই কথাটা শেষ করলেন। সবাই হেসে উঠলাম। আমার কিন্তু একটু রসিকতা করবার ইচ্ছা হোল। বোলে ফেল্লাম, "দেখুন আপনার সে গুড়ে বালি। ওই উদ্বাহবন্ধন বা উদ্বন্ধনের ব্যাপারটা চুকিয়েছি কিছুদিন আগেই।" "তাই নাকি হে! বড় Diplomatic চাল দিয়েছ ত, কিন্তু তার খাওয়া ছাড়বোনা" বলে রসময়বাবু নিজের কামরায় গেলেন। রসময়বাবু গেলেন কিন্তু বন্ধুরা—সুনীল, সুহাস, সুজিৎ, মনীশ, শিশির খাপ্পা হয়ে এগিয়ে এলো। "এতবড় ষ্টুপিড্ তুই, আমাদের কাছে সবকথা লুকিয়েছিস্ অথচ চোরের মত আমাদের ঘরের খবর ত বেশ নিয়েছিস্। ক্ষমার অযোগ্য তুই, কিন্তু ক্ষমা কোরব এক সর্ত্তে—তোর সেই চুরি করে বিয়ে করা বৌ দেখাবি, আর আমাদের পেটপূজা করাবি।"

বিপদ দেখ্‌নতো! বিয়ে আমার সত্যি হয়নি। রসময়বাবুকে কি বলতে কি বলে বসেছি। বৌ কোথায় পাই এখন! কিন্তু ঘাড়ে তখন আমার কৌতুকের ভূত চেপেছে—উপায় মিল্‌লো বল্‌লুম, "ভাই Evacuation এর হিড়িকে বৌ বেনারসে চলে গেছে তার বাপমার সঙ্গে।" স্রেফ জবাব, তবু কিছুদিন থামাতে পারলুম—তারপরতো অস্থায়ী চাকরী—তারাই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায় থাকি! কিন্তু পাঁচটা মাথায় বুদ্ধি খেলে, "ফটোত দেখাবি?" একটু বিপদ কিন্তু এটাও উদ্ধার হয়ে গেলাম। ফটোগ্রাফার বন্ধু সমীরের কথা মনে পড়লো আর উত্তর দিয়ে দিলাম, "হ্যাঁ তা দেখাতে পারি বৈকি! এই বিয়েটার পর দেখাব কেমন?"

ইত্যবসরে সমীরকে সব বললাম। সমীর খুব উৎসাহ দেখিয়ে তার ষ্টুডিওতে তোলা ফটোগুলো হাতড়াতে লাগলো। অধ্যাবসায়ের ফলও ফললো। যে ফটোটা বেরুল সেটা কুমারী সুজাতা মিত্রের, নামটা সমীরই বললে। সঙ্গে সঙ্গে কল্পিত বৌয়ের নামটা ঠিক করে ফেল্লাম—সুজাতাই থাক—হাঁ বেশ নাম, সমীরেরও সমর্থন পেলাম। আর্টিষ্ট সমীর বল্লে আমার আর সুজাতার ফটো এক সঙ্গে প্রিণ্ট করিয়ে দেবে। approve করে ফেল্লাম তার Plan। কিন্তু নৈতিক দিকটা একটুও ভাবলাম না। কৌতুকটাই বড় হয়ে জল্ জল্ করতে লাগলো চোখের সামনে।

অফিস গেলাম যুগলমূর্ত্তির ফটো সমেত। সবাই দেখলো কিন্তু আমার একবার যেন মনে হোলো সুহাসের মুখটা কালো হয়ে গেলো ছবিটা দেখে, কেন জানিনা! অফিসের কাজ সেরে বাড়ী যাবার মুখে সুহাস ফটোটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলে, বললে—"দে বাড়ীতে দেখাব।" তেমনি গম্ভীর মুখ, কিন্তু কোন সম্ভাবনার কথা মনে হোল না আমার।

পরদিন সকাল। উপরের একটা ঘরে সবেমাত্র চা পান সেরে খবরের কাগজখানার ওপর চোখ বুলোচ্ছিলাম—হঠাৎ মনে হোলো যেন একটা গাড়ী দাঁড়ালো—উঠে দেখি হ্যাঁ আমারই বাড়ীর দরজায়। নেমে এলাম—বৈঠকখানায় দাঁড়াতেই দেখলাম এক কমনীয় কান্তি সুন্দরী তন্বী। কিন্তু হঠাৎ মনে হোলো তাইতো! এ যে সেই ফটোর মেয়ে সুজাতা! একি স্বপ্ন দেখছি! মাথার মধ্যে শুভাশুভ সব রকম পরিণতির কথা এসে ভিড় করলো। কিন্তু স্বল্পক্ষণের এই আবেশ ভেঙ্গে গেলো রূঢ় আঘাতে তরুণীর ক্ষুব্ধ প্রশ্নে—"আপনিই বোধহয় বিমল বোস?" নির্ব্বাক আমি অতি কষ্টে বল্লাম "হ্যাঁ।" তারপর তার প্রসারিত হাতের মধ্যে সমীরের তোলা ফটো দেখতে পেলাম, আর জিজ্ঞাসিত হলাম রুষ্টস্বরে, "এর মানে কি?" বলতে গেলাম কিছু, কিন্তু আরম্ভ হোল ভর্ৎসনার 'মেসিনগান ফায়ার" একটা ভদ্রমেয়ের সম্মান নিয়ে ছেলেখেলা করতে আপনার নীতিতে একটুও বাধলো না। আপনি না শিক্ষিত! এই আপনার শিক্ষা, আর এরই গর্ব্ব করে বেড়ান।" এমনই চোখাচোখা বাক্যবাণ আমাকে বিদ্ধ করে চললো। তরুণী একটু ক্লান্ত হয়ে থামলো। তার ক্রুদ্ধ দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। অবসর পেয়ে আমি একটু আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গেলাম, "দেখুন, উদ্দেশ্যটা আমার—" কিন্তু বাকীটা মুখের মধ্যেই থেকে গেল। দীপ্তভঙ্গিতে তরুণী বল্লেন, "আপনার কি বলবার থাকতে পারে? উদ্দেশ্য আপনার কেউ দেখতে পাবেনা কিন্তু একটা মেয়ের মর্য্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন—Scoundrel!" বিস্মিত হয়ে দেখি দীপ্ত ভঙ্গিমা কোমল হয়ে গেছে—আর চোখের কোলে মুক্তাবিন্দুর মত জল টলটল করছে। সে মুক্তাবিন্দু অদৃশ্য হবার আগেই তরুণী গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল। আমি তখন পাথরের মত নিশ্চল!

সে ভাব কাটলো মার করস্পর্শে। বুঝলাম মা তরুণীর সব কথাই শুনেছেন, জানতে চাইলেন ব্যাপার কি? আমার অবিমৃষ্যকারিতার কথা মাকে জানাবার ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু ভাবলাম আমার ওপর যদি কোন সন্দেহ থাকে তা দূর করবার জন্য সব কথা তাঁর জানা দরকার! সব বোললাম। মা বললেন, "মেয়েটা তাহ'লে সুহাসেরই কেউ হয়।"

আমি মার কথার উত্তর দিলুম না। মা আবার বললেন—"এর একটা মধুর প্রতিশোধ নোব।" প্রতিশোধ আর কি! প্রজাপতির কারবার। বাসরের চটুল আবহাওয়ার মধ্যে অবসর একটু করে নিলুম—পার্শ্বোপবিষ্টাকে শুধালুম—"কি মিসেস স্কাউণ্ড্রেল্!" উত্তর এলো চোখের মারফৎ। ব্রীড়াকুণ্ঠিত পরিতৃপ্ত দৃষ্টি আমার মুখের উপর চকিতে নিবিষ্ট হয়ে নিম্নমুখী হোলো।

সমীরের ফটো আজ মূর্ত্ত।
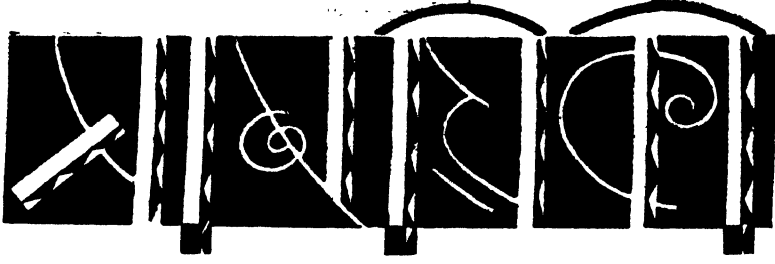
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

বহু বাধা বিপত্তি কাটাইয়া ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিংশ অধিবেশন সম্প্রতি কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে এই অধিবেশন ১৯৪৩ সনের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে লক্ষ্ণৌ সহরে হইবার কথা ছিল। ঠিক ছিল, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ই এই কংগ্রেস আহ্বান করিয়া উহার পরিচালনার দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করিবেন। কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অধিবেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার অক্ষমতা দুঃখের সহিত জানাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়াছিল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য অধিবেশন স্থগিত রাখিবার পরামর্শই প্রদান করেন। কিন্তু সে পরামর্শ গৃহীত হইলে অধিবেশন আদৌ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেসের বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখার কার্য্য তালিকা ও আয়োজন ইতিপূর্ব্বেই একরূপ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণে বিশেষতঃ গত উনত্রিশ বৎসর যাবৎ সযত্নে প্রতিপালিত ভারতের এই একটীমাত্র আন্তঃপ্রাদেশিক বিজ্ঞানানুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তাগণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের আরও কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ একটী বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার গুরুভার কোন প্রতিষ্ঠানই গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। সুখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শেষ মুহূর্ত্তে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় সাদরে আহ্বান করিয়া ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবারকার অধিবেশনে পৌরহিত্য করিতে পারেন নাই। নূতন সভাপতির অনুপস্থিতিতে পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতিরই পৌরহিত্য করিবার নিয়ম। তদনুসারে সরকারের অন্যতম খনিজতত্ত্ববিদ্ মিঃ ডি-এন্-ওয়াদিয়া, এম্-এ, বি-এস্-সি, এফ, আর, জি, এস্; এফ, জি, এস; এফ, আর, এ, এস্, বি; সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত উনত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই আসন বিশিষ্ট ভারতীয় ও বিদেশী বৈজ্ঞানিক এবং কর্ম্মবীরগণ অলঙ্কৃত করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্মান সাধারণতঃ বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের ভাগ্যে ঘটিলেও কয়েকবার বিজ্ঞান জগতের বাহিরের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মবীরগণের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে। সেইদিক দিয়া এ বৎসর পণ্ডিত নেহেরুর নির্ব্বাচনে একটু বিশেষত্ব ছিল। অবশ্য বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখার সভাপতিগণ চিরকালই বিশেষ বিশেষ শাখার বিশেষজ্ঞদিগের মধ্য হইতেই হইয়াছেন, এখন এবারেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনিবার্য্য অনুপস্থিতি গোড়া হইতেই এবারকার অনুষ্ঠানকে কিয়ৎপরিমাণে ম্লান ও ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। রাজনীতি ও বিজ্ঞানের নিবিড় সম্বন্ধ মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বহু তর্কবিতর্কের অবসান ঘটাইয়া বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্ব্বাচনে এবারে যে অভিনবত্বটুকু সুপরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিতে পারিল না দেখিয়া অনেকেরই ক্ষোভ থাকিয়া গেল। বহু পূর্ব্বেই পণ্ডিত নেহেরু রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহিত বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ যোগ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন এবং বহু অভিভাষণে ও লেখায় এইরূপ বিশ্বাসের সুস্পষ্ট পরিচয়ও দিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে তিনি যে বাণী প্রেরণ করেন তাঁহার অনুপস্থিতিতে আজ উহার কয়েকটী লাইন বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে—

"ভারতীয় রাজনীতির শকটে ক্রীতদাসের ন্যায় বিতাড়িত হইবার ফলে অন্যদিকে মন দিবার মত অবসর আমার অল্পই ছিল সত্য, কিন্তু তথাপি বিজ্ঞানের কেন্দ্র কেম্ব্রিজের লেবরেটরীতে ছাত্রাবস্থায় কাটানো দিনগুলির মাঝে আমার চিন্তা প্রায়ই ফিরিয়া গিয়াছে। * * * পরবর্ত্তী জীবনে আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই বিজ্ঞানের নিকটেই আসিতে হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম, বিজ্ঞান একটা মনোরম পরিবর্ত্তনের উপায় মাত্র নহে। ইহা মানুষের জীবনের কাঠামোর সহিত ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে; ইহাকে বাদ দিলে আধুনিক মতের বিশেষত্বই বিলুপ্ত হইবে। রাজনীতি অর্থ-নীতির সহিত আমার হাত মিলাইয়া দিয়াছে এবং সেই অর্থ-নীতিই আবার আমাকে বিজ্ঞানের নিকট টানিয়া আনিয়া বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে জীবনকে ও আমাদের বহুবিধ সমস্যাকে দেখিতে শিখাইয়াছে। একমাত্র বিজ্ঞানই আমাদের বুভুক্ষা ও দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অশিক্ষা, কুসংস্কার ও অন্ধ নিয়মনিষ্ঠা সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। ইহার কল্যাণে এই বিপুল সম্পদ বৃথা নষ্ট হইয়া যাইত না এবং সমৃদ্ধ দেশে বাস করিয়াও একটী জাতির ভাগ্যে অনশনের অভিশাপ লাগিতে পারিত না।"

খেলনা ও কাগজের প্রদর্শনী—

১৫ই ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে খেলনা ও হাতে-তৈয়ারী কাগজের প্রদর্শনী হইয়াছিল। পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ শিল্প ছাড়াও যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখার প্রয়োজন আছে, একথা আজ মানুষ ভুলিতে চলিয়াছে। এই সময়ে ঠিক্ এই শ্রেণীর দুইটি অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প-বস্তুর প্রতি মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়িয়াছে, ইহা তাঁহাদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। খেলনা ছোট ছেলেমেয়েদের জিনিষ। কিন্তু ইহার মূল্য বিচার করিতে গেলে ইহার সমকক্ষ অন্য বস্তু মেলা ভার। সমাজের কৃষ্টি, চিন্তা, কল্পনার প্রতীক সেই সমাজে প্রচলিত খেলনা। কোন সমাজে যে যে স্মরণীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বা যে যে দেব-দেবী বা অন্যবিধ প্রতীক পূজিত হন, খেলনার মধ্যে সেই সেই প্রতিমূর্ত্তি স্থান পায়। প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের নিদর্শনও খেলনার মধ্যেই পাওয়া যায়। জাতির বর্ত্তমান ভাবধারাও খেলনার মধ্যে প্রকাশ পায়। সেইজন্য এদেশীয় খেলনার মধ্যে মোটর-

গাড়ী, এরোপ্লেন, কামান-বন্দুক প্রভৃতির সমাবেশ দেখা যায়। এরূপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের ফলে এদেশে খেলনা নির্ম্মাণের শিল্প-পদ্ধতির অচিরে উন্নতি সাধিত হইবে। প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের মার্কেটিং ও প্রচার বিভাগের সংগৃহীত দেশীয় শিল্পগুলি দেখিবার জিনিষ। এভারেষ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী "চেষ্টার কম্পাউণ্ড" নামক একপ্রকার নবাবিষ্কৃত রাসায়নিক মিশ্রণ হইতে যে খেলনা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল।

আজিকার দিনে হাতে তৈয়ারী কাগজের মূল্য সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। একদিন এদেশে হাতে তৈয়ারী কাগজই সকলে ব্যবহার করিত। কিন্তু বিদেশী কাগজের কল্যাণে আজ এই শিল্পটি উপেক্ষিত। সখের ব্যবহার, কোষ্ঠি লেখা, ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা প্রভৃতি কয়েকটি কাজের জন্য ইহার সামান্য একটু চাহিদা না থাকিলে হয়ত আজ এদেশ হইতে এই শিল্পটি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। বঙ্গীয় শিল্প-বিভাগের চেষ্টার ফলে বিভিন্ন কাঁচা মাল হইতে হাতে তৈয়ারী কাগজ কতদূর উন্নতশ্রেণীর হইতে পারে, তাহার বিভিন্ন নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে দেখান হয়। এখন যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে প্রতি গ্রামে হাতে কাগজ তৈয়ারীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত। ইহাতে একটী নষ্ট শিল্পেরও পুনরুদ্ধার ঘটিবে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

গত ২৫শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে দেশের সকলকে শিল্প প্রতিষ্ঠায় অবহিত হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ যুগে শুধু কৃষিকার্য্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন শিল্পের কারখানা গঠন করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে যাহারা ব্যবসা করে বা কারখানা চালায়, তাঁহাদের সামাজিক সম্মান কম বলিয়া সভাপতি দুঃখ প্রকাশ করেন। যাহাতে ব্যবসায়ীরা ও শিল্পীরা সামাজিক জীবনে উপযুক্ত সম্মান লাভ করে, সে জন্যও প্রত্যেক বাঙ্গালীকে তিনি যত্নবান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় বাঙ্গালীদের মধ্য হইতে বেকার সমস্যা দূর করিবার জন্য যে উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহা সম্মিলনে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন পরীক্ষা ব্যবস্থা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা সম্প্রতি আই-এ, আই-এস্‌-সি, বি-এ, বি-এস সি ও বি-কম পরীক্ষার্থীদের জন্য এক নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় অপর সকল বিষয়ে শতকরা ৪০ নম্বর পাইয়া মাত্র একটি বিষয়ে ফেল করে, তাহা হইলে তাহাকে শুধু ঐ বিষয়ে পুনরায় পরীক্ষা করা হইবে এবং সে বিষয়ে পাশ করিলে তাহাকে পরীক্ষায় পাশ বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। অন্যান্য স্থানে এইরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও কলিকাতায় এতদিন এ ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই নূতন ব্যবস্থার ফলে একদল ছাত্র যে উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলন—

গত ১৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা হ্যারিসন রোডস্থ পূরবী সিনেমা হলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন হইয়াছিল এবং তাহাতে সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৺ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হইয়াছে। মহিষাদলের কুমার দেবীপ্রসাদ গর্গ সকলকে অভ্যর্থনা করেন এবং বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এদেশে 'ভারতীয় সঙ্গীত একাডেমী' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং গভর্ণমেণ্টকে একাডেমী প্রতিষ্ঠায় অবহিত হইতে অনুরোধ জানান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দেশের ধনীদিগকে সঙ্গীতালোচনায় উৎসাহ দিতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

পূর্ণিমা সম্মিলনে দ্বিজেন্দ্র স্মৃতি—

সম্প্রতি বালীগঞ্জ হিন্দুস্থান পার্কে রায় বাহাদুর শ্রীযুত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয়ের গৃহে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মিলনের এক সভায় দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ডক্টর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় কয়েকটি দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাগ, শ্রীযুত সুব্রত রায় চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায় পূর্ণিমা সম্মিলন পুনরায় চলিতেছে দেখিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলন—

গত বড়দিনের ছুটীতে ইন্দোরে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মিলনের অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় শ্রীযুত মুকুন্দরাম রাও জয়াকর যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে স্কুলে শিক্ষকতা ও কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ের সমস্যাগুলি এখনও তাঁহার মনে আছে এবং সে সকল সমস্যার সমাধান আজও হয় নাই। প্রথম সমস্যা—ধর্ম্ম শিক্ষা লইয়া। সে সময়ে গীতার শিক্ষা রাজদ্রোহজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন পর্য্যন্ত ভারতের কোথাও ধর্ম্ম-শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয় সমস্যা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল কলেজ পরিচালনার স্বাধীনতা লইয়া। সে সমস্যা এখনও প্রবল আছে—এখনও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলকলেজসমূহকে গভর্ণমেণ্টের সকল নির্দ্দেশ মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে হয়। শ্রীযুত জয়াকরের মত লোক যদি এখন এই সকল সমস্যার সমাধানে ব্রতী হন, আমাদের বিশ্বাস, তাহা হইলে সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান হওয়া সম্ভব হইতে পারে।

শ্রমিক পরিচালিত পৌরসভা—

সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুর জেলার গারিইয়াসিন সহরের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ১২জন শ্রমিক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর মোট সভ্য সংখ্যা ১৬জন। অপর ৪জন সভ্য উচ্চশ্রেণী সম্ভূত। সে কারণ উক্ত ৪জন সভ্য মিউনিসিপ্যাল সভায় যোগদান করিতেছেন না। ১২জন শ্রমিক সভ্যের মধ্যে ৬জন হিন্দু ও ৬ জন মুসলমান। ইঁহারা সকলেই একমত হইয়া সমস্ত কাজ করিতেছেন। এই শ্রমিক সভ্যদের পোষাক পরিচ্ছদও একই রকমের। একজন কোচ-ম্যান এই মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন একজন মুদির দোকানের ভৃত্য। অন্যান্য দশজন সভ্যের মধ্যে কর্ম্মকার,গরুর গাড়ীর চালক, ফেরিওয়ালা, আইসক্রীম ভেণ্ডার, হোটেলের ভৃত্য এবং টোঙ্গা-চালকও আছেন। পৌরসভার এইসব শ্রমিক প্রতিনিধিদের মাসিক আয় ৩০।৪০ টাকার অধিক কাহারও নহে। গত আগষ্ট মাসে ইঁহারা মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার সহিত যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। রাস্তায় আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তাঁহারা নিজেরাই উহা পরিষ্কার করিয়া থাকেন। সামান্য কর বৃদ্ধি করিয়া সম্প্রতি ইঁহারা সহরের জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর বেতনভুক কর্ম্মচারিগণকে অত্যন্ত সতর্কভাবে ইঁহাদের সহিত কার্য্য করিতে হইতেছে। এই শ্রমিক কমিশনারগণ মিউনিসি-প্যালিটীর কাজে আদৌ বিলম্ব পছন্দ করেন না। সভার আলোচ্য বিষয় অতি অল্পসময়ের মধ্যেই আলোচিত ও গৃহীত হয়। সভায় কোনরূপ বাকবিতণ্ডা বা মতানৈক্য দেখা যায় না। সম্প্রতি উক্ত প্রদেশের স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী গারিইয়াসিন সহর পরিদর্শন করিতে দিয়া চেয়ার-ম্যানকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলে প্রত্যুত্তরে চেয়ারম্যান বলেন—"আমি যতক্ষণ মিউনিসিপ্যালিটীর অফিসের মধ্যে থাকি ততক্ষণ আমি চেয়ারম্যান, বাহিরে আসিলে জুতা বুরুশ করিতে দিলে আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।" সিন্ধুর এ হাওয়া অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটীকে সংক্রামিত করিলে কি হয় বলা যায় না।

শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু—

গত ১৪ই ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের অধিবাসী-বৃন্দ শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুকে তাঁহার ৬০তম জন্ম বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে এক সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আচার্য্য ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পৌরহিত্য করেন। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ বলেন—মাতা যেমন সফলগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া বরবেশী পুত্রের জয়যাত্রা দর্শন করেন, আমারও তদ্রূপ হইয়াছে। গুরুদেব ও আমার নিজের তরফ হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, শ্রীমান্ নন্দলাল দীর্ঘজীবী হইয়া কলাভবনের ছাত্রদের কঠোর ও মধুর পরিণতির পথে চালিত করুন। গুরুর এই আশীর্ব্বাদ শিষ্যের শিরে বর্ষিত হউক, আমরাও এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষা—

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। এদেশে এখনও এই বৃত্তি শিক্ষাপ্রদানের কোথাও কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কলিকাতায় এ বিষয়ে একবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। মহীশূরের আদর্শে যদি কলিকাতায় আবার এই চেষ্টা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে বহু শিক্ষার্থী উপকৃত হইতে পারে।

ভারতীয় লস্কর ভবন—

বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় জাহাজের কাজের জন্য ভারতীয় লস্কর সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হইয়াছে। সেজন্য বৃটীশ সরকার ভারত-সচিব মারফত ৩ লক্ষ টাকা দান করিয়া কলিকাতায় ভারতীয় লস্করদিগের বাসের জন্য একটি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। তাহার ফলে ভারতীয় লস্করগণের কলিকাতায় থাকার সুবিধা হইবে। বলা বাহুল্য, সমগ্র পৃথিবীর লস্কর সংখ্যা হিসাবে ভারতীয় লস্করের সংখ্যাই অধিক।

বিহার ও বাঙ্গালা—

গত ২৭শে নভেম্বর বিহার গভর্ণমেণ্ট এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া বিহার হইতে প্রদেশের বাহিরে ঘৃত রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন ও প্রতি মণ ঘৃতের মূল্য ৬০ টাকা স্থির করিয়া দেন। তাহার পর বিহার হইতে ডাইল রপ্তানীও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা হইতে বিহারের বহু স্থানে চাউল প্রেরিত হইয়া থাকে—যদি বাঙ্গালা সরকার অবিলম্বে সেই চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন, তবেই পরে বিহারের ঘৃত বা ডাউল বাঙ্গালায় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা দেশ যদি বিহারের কয়লা লইতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে বিহারের কয়লাও পড়িয়া থাকিবে। এ অবস্থায় উভয় প্রদেশের মধ্যে মিলন স্থাপন করিয়া পরস্পর জিনিষপত্র আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকাই ভাল। আশাকরি, উভয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সত্বর এ বিষয়ে একটা রফা হইবে।

বীরেন্দ্রবিনোদ রায়—

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক বীরেন্দ্রবিনোদ রায় গত ১১ই ডিসেম্বর মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি ষ্টেট্‌সম্যানের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরাজিতে এম-এ পাশ করিয়া তিনি স্কটীশ চর্চ্চ কলেজের অধ্যাপক হন। পরে তিনি বহুদিন 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রবন্ধ লেখেন ও গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র যখন ১৯৩০ সালে লণ্ডন যান, তখন বীরেন্দ্রবাবু তাঁহার সেক্রেটারী হইয়া গিয়াছিলেন। পরে তিনি ষ্টেট্‌সম্যানে যোগদান করিয়া বহুদিন তথায় কাজ করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমাজ সেবা' শিক্ষা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সমাজ সেবা' শিক্ষাদানের নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সম্প্রতি ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় সে বিভাগের উদ্বোধন করিয়াছেন। কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে লইয়া সেজন্য পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং

দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল বোর্ডের সম্পাদক হইয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই নূতন বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থার ফলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

প্রশ্ন—

খাদ্যদ্রব্যের অভাব দেখিয়া লোকের মনে সাধারণত নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে ইহার উত্তর পাওয়া গেলে দেশবাসী আশ্বস্ত হইতে পারে। প্রশ্ন এইরূপ (১) বাঙ্গালা হইতে গত এক বৎসরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে কত চাউল রপ্তানী করা হইয়াছে (২) যুদ্ধের জন্য ভারতে যে সকল স্থল সৈন্য, নৌ-সেনা, বিমান সেনা প্রভৃতি আছে, তাহাদের জন্য কত চাউল, গম প্রভৃতি সরবরাহ করা হইয়াছে (৩) এ পর্য্যন্ত সিংহলে কত চাউল প্রেরণ করা হইয়াছে ও (৪) যুদ্ধ ও অন্যান্য প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্ট কত খাদ্য দ্রব্য মজুত করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

সার ফজলুর রহমন ১৯৪৩ সালের জন্য কলিকাতার নূতন সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন।

নূতন এ-আর-পি কণ্ট্রোলার—

সিভিলিয়ান মিঃ এস-কে-দে কলিকাতার এ-আর-পি বা বিমান আক্রমণে সতর্কতা ব্যবস্থার ডেপুটী কণ্ট্রোলার ছিলেন; কণ্ট্রোলার অনুপস্থিত থাকায় তিনি কণ্ট্রোলারের কাজ পাইয়াছেন। মিঃ দে কৃতী ব্যক্তি, তাঁহার পরিচালনায় এ-আর-পি বিভাগের উন্নতি হইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন।

কলিকাতার দূরত্ব—

গত নভেম্বর মাসে কলিকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্র কলিকাতায় বোমা পড়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন প্রকাশিত হয়, যদি ইংরাজ ব্রহ্মদেশে যাইয়া বোমা ফেলিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য জাপানীরাও কলিকাতায় আসিয়া বোমা ফেলিবে। কারণ কলিকাতা ব্রহ্মের অতি নিকটে। ইহা আকিয়াব হইতে ৩৪০ মাইল, মাগো হইতে ৪৬০ মাইল, পোকুকু হইতে ৪৪০ মাইল, মিকটিলা হইতে ৪৯০ মাইল ও মান্দালয় হইতে ৪৯০ মাইল। কালেয়াতে জাপানীদের যে চিন্দুইন কেন্দ্র আছে, সেখান হইতে কলিকাতা মাত্র ৩৭৫ মাইল।

চাউলের অভাবের কারণ—

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সিংহলকে যে চাউল পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সিংহলে চাউল পাঠাইতে হইবে। সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের এক পত্রে প্রকাশ—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি পশ্চিম ভারতের কোচিন রাজ্যেও অবিলম্বে কয়েক হাজার টন চাউল প্রেরণ করিবেন। বাঙ্গালার লোক চাউলের অভাবে যে সময়ে অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাইতেছে, সে সময়ে গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থাকে কতটা সঙ্গত বলা যায় জানি না।

দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতের দাবী—

সম্প্রতি কলিকাতায় ডাক্তার পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে নিখিল বঙ্গ চিকিৎসক সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে দেশের লোকের পক্ষে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। যাহাতে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ঔষধাদি ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত করা হয়, সেজন্য সম্মিলন গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য বিদেশীয় ঔষধাদির আমদানী বন্ধ হওয়ায় যে অবস্থা হইয়াছে, তাহার জন্য সকলেই অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। এ অবস্থায় চিকিৎসকগণ যদি স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হইবার চেষ্টায় অবহিত হন, তাহা হইলে তাঁহারা এবং দেশের লোক—সকলেই উপকৃত হইবেন।

কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়—

কলিকাতাবাসীরা যাহাতে খাদ্যদ্রব্য (চাল, ডাল, তৈল, লবণ প্রভৃতি) ক্রয়ে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ না করে, সেজন্য সরকার সহরের ২১টি বাজারে ঐ সকল জিনিষ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হন নাই, তাঁহাদের খাদ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা যে সফল হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

কাগজ সম্বন্ধে ইস্তাহার—

গত ৭ই ডিসেম্বর নয়া দিল্লী হইতে খবর প্রচারিত হইয়াছে যে ভারত গভর্ণমেণ্ট সাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাগজের পরিমাণ বাড়াইবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। সংবাদ ভাল—কিন্তু কবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে?

মেদিনীপুরে সাহায্য দান—

মেদিনীপুরে ঝড়ে বিধ্বস্ত লোকদিগকে কি ভাবে সাহায্য দান করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হয়, ১৭ই অক্টোবর হইতে কাঁথি ও তমলুকে সরকারী কর্ম্মচারীরা সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করে এবং সৈন্যগণ পর্য্যন্ত দুস্থ লোকদিগকে খাদ্য দান করিয়াছিল। কিন্তু এই সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পরই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল ও গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক এক বিবরণ প্রকাশ দ্বারা সরকারী ইস্তাহারের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন—সরকারের বিবরণে যে সকল অভিযোগের উল্লেখ আছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। সরকারী বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল মেদিনীপুরবাসী নেতা আজ কারারুদ্ধ, তাঁহারা বাহিরে থাকিলে সাহায্য দানের ভার তাঁহারাই লইতেন এবং সে কার্য্য সুসম্পাদিত হইত। বিবরটি বিশেষ প্রয়োজনীয়, কাজেই এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের তদন্ত ব্যবস্থা করা উচিত।

গভর্ণমেণ্ট ও খাদ্য সমস্যা—

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, ভারতীয় উদারনৈতিক দলের সভাপতি সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতার নিন্দা করিয়াছেন। চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ৪ গুণ বর্দ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ ছাড়া অন্য কোন প্রতীকার ব্যবস্থা করেন নাই। লোকের খাদ্যাভাবে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। অথচ গভর্ণমেণ্টের বড় বড় কর্ম্মচারীরা কেহই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। ইহা বাস্তবিকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয়। বাঙ্গালার যে সকল মন্ত্রী জনপ্রিয় বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে দেখিলেও লোক আশ্বস্ত হইত।

মেদিনীপুর সমস্যার প্রতীকার—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে সম্প্রতি শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মেজর পি-বর্দ্ধন, শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরী কাঁথি ও তমলুক মহকুমার দুরবস্থা দর্শন করিয়া আসিয়া এক বিবরণ দাখিল করিয়াছেন। সেই বিবরণ আলোচনার পর মহাসভার কার্য্যকরী কমিটীতে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভেদ দূর করিবার জন্য এখনই সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া উচিত। গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্পর্কে কি করিবেন তাহা অজ্ঞাত। তবে যদি প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা হইত, তাহা হইলে যে দুঃস্থগণের সাহায্যের অনেক ভাল ব্যবস্থা হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাসভার অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটিতে বলা হইয়াছে—বর্ত্তমানে কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় আড়াই টাকা মণ দরে প্রচুর লবণ পাওয়া যায়; যদি ঐ লবণ মেদিনীপুরের বাহিরে রপ্তানীর ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে লবণ প্রস্তুত দ্বারা বহু লোক জীবিকার্জ্জন করিতে পারে। ব্যবস্থাটি কার্য্যে পরিণত হইলে উহার ফলে শুধু যে মেদিনীপুরবাসীরা উপকৃত হইবে তাহা নহে, কলিকাতার লোককেও আর বিদেশী লবণ ১০৲ টাকা মণ দরে কিনিতে হইবে না।

হিন্দু মহাসভার সভাপতি—

সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সভাপতির পদে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গালার হিন্দু আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। কাজেই এই নির্ব্বাচনের ফলে বাঙ্গালার হিন্দুদের স্বার্থ অধিকতর রক্ষিত হইবে।

সাংবাদিকের বৃত্তি সমস্যা—

গত ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা ৬১ বৌবাজার ষ্ট্রীটে প্রবর্ত্তক ফার্নিসার্স ক্লাবে ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির বার্ষিক প্রীতি সম্মিলনে সাংবাদিকদিগের বৃত্তি সমস্যার কথা আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বহু খ্যাতনামা সাংবাদিক সভায় যোগদান ও আলোচনা করিয়াছিলেন। এদেশে সাংবাদিকদিগের অবস্থা যাহাতে উন্নততর হয়, সে বিষয়ে সমিতিকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে বলা হইয়াছে।

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস—

ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস কলিকাতাস্থ ন্যাশানাল মেডিকেল ইনিষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল। গত ১৮ই ডিসেম্বর তাঁহার বয়স ৮৫ বৎসর আরম্ভ হওয়ায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সভায় বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্ম্মশক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া সকলকে বিস্মিত হইতে হয়। সকলেই ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়াছিলেন।

কাগজ সমস্যা—

ভারত গভর্ণমেণ্ট সামরিক প্রয়োজনে ভারতীয় মিলসমূহে উৎপন্ন কাগজের অধিকাংশ গ্রহণ করার ফলে বাজারে কাগজ যেমন অগ্নিমূল্য হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই সাময়িক পত্র, পুস্তক প্রভৃতি প্রকাশের জন্য উপযুক্ত কাগজ পাওয়া যাইতেছে না। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতা চীনাবাজারে প্রসিদ্ধ কাগজব্যবসায়ী ভোলানাথ দত্ত এণ্ড সন্স লিমিটেডের অফিসে এক সম্মিলন হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সার হরিশঙ্কর পাল, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম প্রভৃতি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যাহাতে নিজেদের জন্য কম পরিমাণ কাগজ গ্রহণ করেন, সে জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার জন্য সভায় একটি কমিটীও গঠিত হইয়াছে।

মৃণাল জয়ন্তী—

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের ৮২তম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ১৬ই নভেম্বর সিঁথি-বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় অভিনন্দনের উত্তরে বলেন—"মাতৃজ্ঞানে পত্রিকার পূজা করিয়াছি, মাতৃপূজায় অধিকারীর বিচার নাই, পত্রিকা সেবায় আমাদের সমঅধিকার।" প্রবীণ সংবাদপত্রসেবীর নিষ্ঠা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিয়া আমরাও তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

সার মহম্মদ ইয়াকুব—

বিশিষ্ট মুসলিম রাজনীতিবিদ্ সার মহম্মদ ইয়াকুব গত ২৩শে নভেম্বর হায়দ্রাবাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য এবং নিজাম সরকারের রিফর্ম্মস্ এড্‌ভাইসর ছিলেন। সার মহম্মদ ইয়াকুব কিছুদিন বড়লাটের শাসন পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন বিশিষ্ট

মুসলিম নেতার তিরোভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে জেনারেল হার্টজগ—

দক্ষিণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। জেনারেল হার্টজগ দীর্ঘ ১৬ বৎসরেরও অধিককাল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৯ সালে বৃটীশ জার্ম্মাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে জেনারেল হার্টজগ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য পার্লামেণ্টে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ কারণ স্মাটসের সহিত রাজনীতিক্ষেত্রে বহুদিন তাঁহার সহিত মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদের তিরোভাব ঘটিল।

ব্যক্তিগত আয়—

যাহাদের আয় যত বেশী, তাহারা যে কেবল নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশী ব্যয় করিয়া জীবন উপভোগ করিতে পারে তাহা নয়, দুর্দ্দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। এই এক কারণে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষ অতি মাত্রায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত। বিদেশী অর্থনীতিকদের মতে আমেরিকার অধিবাসীর জনপ্রতি বার্ষিক আয় ১,০৪৯ টাকা, ইংলণ্ডের ৫৩১ এবং ভারতবাসীর ৬০৲। সার বিশ্বেশ্বরায়া প্রভৃতি মণীষীদের মতে এই আয় আরও কম। যাহাদের বার্ষিক আয় ষাট টাকা মাত্র তাহারা প্রতি বর্ষের ৩৬৫ দিন কায়ক্লেশে জীবনযাপন করে, এই দুর্দ্দিনে ধনী আমেরিকাইংলণ্ডবাসীর মত সঞ্চিত অর্থ হইতে যে ১৫৲ টাকা দরের চাউল খাইয়া বাঁচিবে, তাহার উপায় নাই। অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বস্তুরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের মধ্যে না পড়িয়াও আমাদের যুদ্ধের স্বাদ মিলিতেছে। যাঁহারা যুদ্ধায়োজনে প্রতিদিন ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা প্রজার দুঃসময়ে দিনে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে যে সকলদিক রক্ষা পায়।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ—

বর্ত্তমান বৎসরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের চাষ হওয়ায় পাটের দাম খুবই কমিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে চাষীদের দুর্দ্দশার শেষ নাই। এই সম্পর্কে 'আর্থিক জগৎ' পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। লেখা হইয়াছে—"বাঙ্গালা সরকার যদি অচিরে ঘোষণা করেন যে তাঁহারা ১৯৪৩ সালে ১৯৪২ সালের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী জমীতে (১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ) পাট চাষ হইতে দিবেন না, তাহা হইলে দেশে পাটের মূল্য অচিরেই কিছু বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া এই ঘোষণা যথারীতি কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে আগামী বারে পাটের জমী নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে ধানের জমি ও স্বভাবতই কিছু বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দেশে চাউলের যোগান বাড়িয়া উহার মূল্যও অবশ্যই কতকটা নামিয়া আসিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা সরকার সেরূপ কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে এখনও কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। এদিকে, শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের মুখপত্র 'ক্যাপিটেল' রব তুলিয়াছেন, আগামী ১৯৪৩ সালে দেশে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না।" ক্যাপিটেলের এই প্রচারের মর্ম্ম বুঝা খুবই সহজ অর্থাৎ পাটচাষীদের যাহাই হউক না কেন, কলওয়ালাদের সস্তায় পাট মিলিলেই হইল।

সংবাদপ্রকাশের বিধি নিষেধ ঃ—

ভারতরক্ষা বিধানবলে বাংলা সরকার সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন, নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে সরকারী ভাবে ঘোষিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ সংবাদ অথবা কোনরূপ উল্লেখ সংবাদপত্র সমূহ প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

(১) রাস্তা অথবা রেলওয়ে সংক্রান্ত ক্ষতিকর কোন সংবাদ—

(২) রেলওয়ে, সামরিক অথবা বেসামরিক বিমান ঘাঁটি, বৈদ্যুতিক সরবরাহ কেন্দ্র, তৈল অথবা জল সরবরাহের ব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি ধ্বংসসাধন সম্পর্কিত বা ধ্বংসসাধন প্রচেষ্টা সম্পর্কিত কোন সংবাদ—

(৩) সামরিক উদ্দেশে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত কারখানায় ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত সংবাদ।

চীনাবাদামের চাষ—

১৯৪১-৪২ সালে ভারতে যে পরিমাণ জমীতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছিল ১৯৪২-৪৩ সালে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমীতে উহার চাষ হইয়াছে, ইহা দেশের পক্ষে অবশ্যই মঙ্গলের বিষয়। চীনাবাদাম পুষ্টিকর ও সুখাদ্য—বাঙ্গালা দেশে কি তাহার চাষে উৎসাহ প্রদানের কখনও কেহ চেষ্টা করেন নাই।

ভারতীয় সৈন্য গ্রহণ—

প্রকাশিত হইয়াছে যে ১৯৩৮ সালে যেখানে মাত্র ১ লক্ষ ৭৭ জন ভারতীয় এ দেশের সৈন্যদলে কাজ করিত, তাহার স্থলে এখন ১৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবিভাগে কাজ করিতেছে। বর্ত্তমানে প্রতি মাসে প্রায় ৭০ হাজার করিয়া ভারতবাসী সৈন্যদলে যোগদান করিতেছে এবং সাড়ে ৩ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ভারতের বাহিরে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এইটুকুই শুধু বুঝা যায় যে ভারতীয়গণ অসামরিক নহে।

পাকিস্থানের বিরোধিতা—

"এক কথা, হাজার মিথ্যা হইলেও, বারে বারে চীৎকার করিয়া বলিলে সত্যের আকার হয়ত এক সময় ধারণ করিতে পারে" হিতোপদেশের এই একটী গল্পের সারাংশ 'কায়েদে আজাম' ধরিয়া বসিয়া আছেন। হয়ত এতদিনে তাঁহার স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিত, কিন্তু ইংরেজের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি তাঁহার গলার স্বর উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে উঠাইতেছেন। পার্লামেণ্টে সেদিন এক বক্তৃতায় বলা হইয়াছিল যে পার্শী প্রভৃতি ক্ষুদ্র বা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত এবং ভারতের বিভিন্ন অংশে তাহারা স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে চায়। ইহার উত্তরে পার্শী ও শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। এ্যাংলো-

ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তাহাদের নেতা মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনী মারফত জানাইয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাদের মাতৃভূমি, সুতরাং কোনও ক্রমে তাহারা ভারতকে খণ্ড খণ্ড হইতে দিতে পারেন না। সার মির্জ্জা ইসমাইল এই পাকিস্থান পরিকল্পনাকে ত্যাগ করিয়া ভারতের ঐক্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। সকল দিক বিবেচনা করিলে জিন্না্‌হ্‌-আমেরী দলের প্রকৃত জবাব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ সকল ধর্ম্মের কাহিনী কেহ শুনিবে কি?

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সম্বর্দ্ধিত—

কানপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলার অর্থসচিবের পদে ইস্তফা দেওয়ায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দিল্লীর প্রতিনিধি রায় বাহাতুর হরিশচন্দ্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলেন—হিন্দুগণের বিশেষ করিয়া বাংলার হিন্দু অধিবাসীগণের সেবায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের অবদান সর্ব্বজনবিদিত। ডাঃ খাপার্দে রায় বাহাদুরের প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলেন—ডাঃ মুখার্জ্জি মন্ত্রী-পদে ইস্তফা দিয়া হিন্দু মহাসভার আদর্শ ও নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

পরলোকে সার হেণ্ডারসন—

গত ৩০শে ডিসেম্বর লণ্ডনে সার নেভিল হেণ্ডারসন মারা গিয়াছেন। সার হেণ্ডারসন বার্লিনে ব্রিটীশ রাজদূত ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধেতিহাসে সার হেণ্ডারসন স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু কিরূপে জার্ম্মাণীর সহিত আপোষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে তাহা তিনি তাঁহার "ফেলিওর অফ্‌ এ মিশন" নামক পুস্তকে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিটলারের নিকট বৃটেনের পক্ষ হইতে তিনিই চরমপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন বৃটীশ কূটনীতিজ্ঞের তিরোভাব ঘটিল।

নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার নূতন যে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহাতে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কার্য্যকরী-সভাপতি, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অন্যতম সহ সভাপতি, শ্রীযুত আশুতোষ লাহিড়ীকে অন্যতর সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রীযুত মনীন্দ্রনাথ মিত্রকে কমিটীর অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। গত বৎসরের সাধারণ সম্পাদক রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ পদত্যাগ করিয়াছেন। কয়জন বাঙ্গালীর এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরববোধ করিবেন। ইঁহারা সকলেই বাঙ্গালার হিন্দু-সংগঠন কার্য্যে আত্মনিবেদিতপ্রাণ। পরবর্ত্তী অধিবেশন পাঞ্জাব অমৃতসরে হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

মহিলা মিলন সমিতি—

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতাবাসী মহিলারাও বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি ১৯৪৩ সালের জন্য একটি মিলন সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী সমিতির সভানেত্রী, ঢাকার নবাব-বেগম সাধারণ সম্পাদিকা, শ্রীমতী সরোজিনী বিশ্বাস সংগঠন সম্পাদিকা এবং মিসেস্‌ সাকিনা বেগম, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী ও মিসেস্‌ হুমায়ুন কবীর যুগ্ম সম্পাদিকা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। তাঁহারা মহিলাগণের মধ্যে মিলন আন্দোলন চালাইলে মিলন-চেষ্টা সহজেই ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয়।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য—

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ৮২ বৎসর বয়স আরম্ভ হওয়ায় কানপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি স্বয়ং তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছেন। হিন্দু সংগঠন আন্দোলনের প্রথম প্রবর্ত্তক হিসাবে পণ্ডিত মালব্যকে ভারতবাসী হিন্দু মাত্রই শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। হিন্দুর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তিনি জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা যে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিয়াছেন, আজ দেশবাসী সকলেরই তাহার পুষ্টিসাধনে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমরা এই শুভদিনে পণ্ডিতজীর সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন কামনা করি।

পাঞ্জাবের নূতন মন্ত্রিসভা—

সার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সমাধান হইয়াছে। মেজর মালিক খিজির হায়াৎ খাঁর নেতৃত্বে পাঞ্জাবে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। পুরাতন মন্ত্রীগণের মধ্যে সকলেই এই মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অপর একজন নূতন মন্ত্রীও নিযুক্ত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভা এইরূপে গঠিত হইয়াছে :—মেজর মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ (প্রধান মন্ত্রী), সার ছোটুরাম (রাজস্ব ও সেচ বিভাগ), সার মনোহরলাল (অর্থ এবং শিল্প বিভাগ), মিঞা আবহুল হাই (শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ) এবং সর্দ্দার বলদেব সিং (উন্নয়ন বিভাগ)।

ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের অবসান—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গড়গণ তাহাদের ভাতাবৃদ্ধির দাবী জানাইয়া ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ তখন তাহাদের ভাতাবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন এরূপ আশ্বাস দেওয়ায় তাহারা সে সময়ে কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচনা না করায় সম্প্রতি পুনরায় তাহারা ধর্ম্মঘট করে। কলিকাতার ন্যায় বিশাল নগরীর আবর্জ্জনা পরিস্কার এক বা ততোধিক দিন না হইলে সহরের যে অবস্থা হয় তাহা বর্ণনাতীত। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার অধিবাসীগণ একাধিকবার ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের ফলে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ধর্ম্মঘটে নাগরিকগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে নানা কারণে সহরবাসীগণ যে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাহাতে ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট অধিক দিন স্থায়ী হইলে জনসাধারণের দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। ধর্ম্মঘট অধিক দিন স্থায়ী হইতে না দিয়া সরকার ধাঙ্গড়দের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন।

খাদ্য মূল্য সমস্যা—

কলিকাতায় বোমা পড়ার পর সহরবাসীদিগের খাদ্যদ্রব্য ও তাহার মূল্য সমস্যা আরও ভীষণভাবে দেখা দিয়াছে। সহরের বাজারে বাহির হইতে মাছ ও তরকারী কম পরিমাণে আমদানী হওয়ায় মাছ ও তরকারী দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। চাউলের মূল্য ১৮৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকায় নামিলেও চাউল দুষ্প্রাপ্য। সরিষার তেল বাজারের শতকরা ৮০টি দোকানে মোটেই পাওয়া যায় না। ক্রমে দুগ্ধ সমস্যাও উপস্থিত—কারণ বোমার ভয়ে গোয়ালারা তাহাদের গরু-মহিষ লইয়া পলায়ন করিতেছে এবং মফঃস্বলের লোকও দুধ লইয়া ভোরে কলিকাতায় আসিতে সাহস করে না। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের যেরূপ তৎপর হইয়া জনরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, তাহাও হয় নাই। যানবাহনের অভাবে সহরের পথে যাতায়াতের কষ্ট বাড়িয়াছে। দরিদ্রের সমস্যা বহু এবং চিরস্থায়ী, কাজেই এ সকল ভোগ করা ছাড়া লোকের উপায়ান্তর নাই।

সুতী কাপড়ের শীতবস্ত্র—

সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক একটি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন—তাঁহার নবাবিষ্কৃত পন্থায় সাধারণ সুতীর কাপড় পশমের ন্যায় গরম করা সম্ভব হইয়াছে। দুই রকম গাছের বীজ ভিজাইয়া উহাতে সুতী কাপড় ডুবাইয়া লইলেই উহা পশমের ন্যায় গরম ও টেকসই হয়। এই গাছ দুইটিও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এই নূতন ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে বাঙ্গালার দরিদ্র জনগণের একটা প্রকৃত অভাব দূর হইতে পারিবে।

কলিকাতায় বোমা—

গত ২০, ২১, ২২, ২৪ ও ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা ও তাহার সহরতলীর স্থানে স্থানে জাপানী বিমান হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সুখের বিষয় বোমাগুলি প্রায়ই জনবিরল স্থানে পড়ায় লোকের ক্ষতি অতি অল্পই হইয়াছে এবং জীবন হানির সংখ্যাও খুব কম। তাহার ফলে আর কিছু না হউক, একদল ভীত লোক সহর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যাঁহারা গত বৎসর এই সময়ে রেঙ্গুনে বোমাবর্ষণের পরই ভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গত বৎসর যে আর্থিক ও অন্যবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া এবার আর পলায়ন করিতে সাহস করেন নাই। প্রথম ২।৫ দিন কলিকাতা সহরের সকল কাজকর্ম্মেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ক্রমে তাহা কমিয়া যাইতেছে এবং সহরের কাজকর্ম্ম আবার সাধারণ-ভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে। এ অবস্থায় সহরবাসীর বর্ত্তমান সাহসিকতার সত্যই প্রশংসা করিতে হয়। বোমা পড়িলে তাহার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নানারূপ ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর থাকিলে সহরে বোমা পড়িলেও যে অধিক লোক তদ্দারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, একথা এখন নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। মানুষও ধৈর্য্য এবং সাহসের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইলে, বিপদ তাহাকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়—

দেড় বৎসর পূর্ব্ব হইতে গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড অর্থাৎ সুলভ কাপড় প্রস্তুতের ব্যবস্থার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট বোম্বায়ের কাপড়ের কলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ গজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় তৈয়ার করিবার আদেশ দিয়াছেন। সাধারণ কাপড়ের দরের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ কম দরে ঐ সুলভ কাপড় বিক্রয় করা হইবে। বাঙ্গালা দেশেও সর্ব্বপ্রথম কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল্‌স্ লিমিটেড সাড়ে তিন টাকা জোড়া দরে ৯ গজ ৪৪ ইঞ্চি ধুতি এবং ৪ টাকা জোড়া দরে ১০ গজ ৪৪ ইঞ্চি শাড়ী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ব্যবস্থা প্রশংসনীয়। বাঙ্গালার অন্যান্য বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলগুলিতে এই ব্যবস্থা অনুকৃত হইলে দেশের দরিদ্র অধিবাসীরা উপকৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

নূতন কোম্পানী ও গভর্ণমেণ্ট—

ইউনাইটেড্ কিংডম কমার্সিয়াল কর্পোরেশন নামক একটি নূতন বিদেশী কোম্পানী ভারত হইতে নানাপ্রকার জিনিষ কিনিয়া বিদেশে চালান দিতেছে এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ নূতন কোম্পানীকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করিতেছেন—ফলে অন্য ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা অধিক লাভবান হইতেছে। বিষয়টি ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়কে জানান হইয়াছে এবং তিনি ইহার প্রতীকারের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাও জানাইয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কেন এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া এই বিষয়ে অপরাধীর শাসনের ব্যবস্থা করা উচিত নহে কি?

বাণিজ্য সচিবের নিকট দরবার—

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় গত কয়দিন কলিকাতায় থাকায় সকল সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ নিজ অভাব অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন। গত ৩রা জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স-গৃহে তিনি খাদ্য সরবরাহ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু আসল সমস্যা যেরূপ সেইরূপই থাকিয়া গিয়াছে। পরদিন সোমবার বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ, চিনির কলের মালিকগণ ও চা ব্যবসায়ীগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চাও সহরে ক্রমে দুর্লভ হইতেছে এবং চিনি সরবরাহেরও এখন পর্য্যন্ত কোন সুব্যবস্থা দেখা যায় নাই। এ অবস্থায় চা খাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করা ছাড়া লোকের গত্যন্তর নাই। বাণিজ্যসচিব যদি বাঙ্গালীর বর্ত্তমান খাদ্যসমস্যার স্বল্পমাত্র সমাধানেরও ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশবাসী তাঁহার কার্য্যকালের কথা ভবিষ্যতে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে চাঞ্চল্য—

গত ২রা জানুয়ারী শনিবার সকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ ভবনে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিংশ বার্ষিক সম্মিলন আরম্ভ হইলে তথায় এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। একদল যুবক কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর একখানি ছবি লইয়া সভায় উপস্থিত হয় এবং তাহা সভাপতি ডাক্তার ওয়াডিয়ার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর স্থাপিত করিয়া তাহা পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে। তাহারা পণ্ডিত জহরলালের অভিভাষণ যাহাতে কংগ্রেসে পঠিত হয় সেজন্য দাবী করে এবং ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার এস-কে-মিত্র ও ডাক্তার মেঘনাদ সাহা উক্ত অভিভাষণ পাওয়া যায় নাই বলা সত্বেও তাহারা গণ্ডগোল করে। পরে তাহারা পণ্ডিতজীর ছবিখানি লইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলে যথারীতি কংগ্রেসের কার্য্য চলিয়াছিল। পণ্ডিতজীকে অভিভাষণ প্রেরণে বাধা দেওয়ার জন্য কংগ্রেসে সরকারের কার্য্যের নিন্দা করিয়া পরে এক প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলালের মত মণীষীর অভাব বিজ্ঞান কংগ্রেসেও বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছে।

পরীক্ষার্থীদিগকে সুযোগ দান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন গত ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ছাত্রগণ সহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের মধ্যে যাহারা এবার আই-এ, আই-এস্-সি, বি-এ, বি-এস্-সি বা বি-কম্ পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদের আর টেষ্ট পরীক্ষা দিতে হইবে না। তাহা ছাড়া এবার আই-এ ও আই-এস্-সি পরীক্ষার কোন বিষয়েই প্র্যাকৃটিকাল পরীক্ষা হইবে না বা প্র্যাকৃটিকাল পরীক্ষার জন্য কোন ফি কাহাকেও দিতে হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থায় ছাত্রগণ অবশ্যই উপকৃত হইবেন।

সহরে খাদ্যসরবরাহ—

বোমা পড়ার ফলে কলিকাতা সহরের বহু ভৃত্য, পাচক প্রভৃতি পলায়ন করায় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত কলিকাতা রিলিফ কমিটী সহরে সাধারণের জন্য কতকগুলি খাদ্যাগার খোলার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আপাততঃ সহরে ১২টি ঐরূপ খাদ্যাগার খোলা হইবে। প্রত্যেকটিতে সকাল সাড়ে ৭টা হইতে সাড়ে ৯টা পর্য্যন্ত ও বিকাল সাড়ে ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ভাত ডাল প্রভৃতি ৪ আনা মূল্যে খাওয়ান হইবে। দ্বিপ্রহরে ১২টা হইতে সাড়ে ৪টা পর্য্যন্ত চা ও জলখাবার সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিবে এবং স্বেচ্ছাসেবিকাগণ দ্বিপ্রহরে খাদ্যাদি পরিবেশন করিবেন। বর্ত্তমানে হোটেল, রেঁস্তোরা, বোর্ডিং প্রভৃতি বন্ধ হওয়ার ফলে যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, এই ব্যবস্থায় তাঁহারা উপকৃত হইলেই ভাল।

মহিলা আন্দোলনের বিবরণ—

বাঙ্গালা দেশে গত কয় বৎসর ধরিয়া মহিলাদের জীবনে নানাপ্রকার উন্নতি সাধনের যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ একত্র করিয়া প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। সেজন্য সকল নারী-প্রতিষ্ঠান ও নারীমঙ্গল সমিতিকে তাঁহাদের ইতিহাস ও বিবরণ কলিকাতা ১২নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে স্যুট নং ৬-এ'তে সম্পাদকের নিকট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। সকল প্রতিষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া গেলে বাঙ্গালার মহিলা আন্দোলনের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে। এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই সাহায্য করা উচিত।

ছাত্রের কৃতিত্ব—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র শ্রীমান সুব্রত রায়-চৌধুরী বর্ত্তমান বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় অর্থনীতি শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন। তিনি আই-এ পরীক্ষাতেও গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয়

শ্রীমান সুব্রত রায়চৌধুরী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণিমা সম্মিলনের বর্ত্তমান পরিচালকগণের তিনি অন্যতম এবং তাঁহার চেষ্টায় পূর্ণিমা সম্মিলনের গত কয়েকটি অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রীতি দিন দিন বর্দ্ধিত হউক এবং তিনি জীবনে সাফল্য লাভ করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

বয়স্কদের শিক্ষাদান সমস্যা—

এবার ইন্দোরে ভারতীয় বয়স্ক শিক্ষা সম্মিলন হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পণ্ডিত অমরনাথ ঝা সভাপতিত্ব করিয়াছেন। তিনি বলেন—পুরাতন প্রথায় শিক্ষাদান বন্ধ হইয়া তাহার স্থানে যে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে চরিত্র গঠন বা ধর্ম্মনীতি শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নাই। ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান গলদ। বয়স্কদের শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে উৎসাহ দানের জন্য তিনি ভারত

গভর্ণমেণ্টকে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। শুধু লেখা ও পড়া শিক্ষা দিলেই হইবে না—বিভিন্ন বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানের কথা সহজ ও সরল ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকায় প্রকাশ করা উচিত।

কয়লা সরবরাহ সম্বন্ধে প্রস্তাব—

কলিকাতার কয়লা সমস্যা সম্পর্কে মাড়োয়ারী বণিক সমিতি কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন। অন্যান্য জিনিষের মত সহরের বিভিন্ন বাজারে যাহাতে সস্তাদরে কয়লা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়, কর্পোরেশন হইতে তাহার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। যদি কর্পোরেশন তাহা করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের নিজেরই উহা করা উচিত। আমরা জানি, কয়লার মূল্য বৃদ্ধির ফলে বহু দরিদ্র পরিবারের লোক দিনে একবার রান্না করিয়া তাহা দুই বেলায় খাইয়া থাকে। তাহাদের দুরবস্থা দূরীকরণে যদি কেহ অগ্রসর না হয়, তাহা প্রকৃতই পরিতাপের বিষয়। কলিকাতা হইতে মাত্র একশত মাইলের মধ্যে প্রচুর কয়লা জমা থাকা সত্ত্বেও সহরের লোককে তিন টাকা মণ দরে কয়লা কিনিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হইতে পারে?

নববর্ষের উপাধি তালিকা—

গত ১লা জানুয়ারী নববর্ষ উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট যে উপাধি বিতরণ করিয়াছেন, তাহার তালিকা সরকারী ব্যবহারের প্রতিবাদে কোন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয় নাই। যে সকল ভাগ্যবান এবার উপাধি লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের জানিবার উপায় রহিল না—কাজেই তাঁহাদের পক্ষে উপাধি পাওয়া না পাওয়া সমানই হইল। সাংবাদিক সমিতির এই উপাধি-তালিকা না প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত দেশবাসী সকলেই তারিফ করিয়াছেন। কিন্তু মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাঁহাদের উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ বিতরণ করিতেছেন।

হাওড়া মিউনিসিপালিটির ভাতাদান—

হাওড়া মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের এই দুর্দ্দিনে উপযুক্ত যুদ্ধ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই যে সকল শ্রমিক ২০ টাকা বা তাহার কম বেতন পাইত তাহাদের জন্য মাসিক তিন টাকা যুদ্ধ ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে। সম্প্রতি ২১ হইতে ১৫০ টাকা মাসিক বেতনের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে মাসিক ৬ টাকা, ১৫১ হইতে ২০০ টাকা বেতনের লোকদিগকে মাসিক ১০ টাকা ও দুই শতের অধিক বেতনের সকলকে মাসিক ২০ টাকা যুদ্ধ ভাতা দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান দুরবস্থার তুলনায় ইহা অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলেও হাওড়া মিউনিসিপালিটীর এই ব্যবস্থা প্রশংসনীয় ও অন্য সকল মিউনিসিপালিটীতে ইহা অনুকৃত হওয়ার যোগ্য।

ভারতে লবণ শিল্প—

ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশ করিয়াছেন যে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মাটী হইতে প্রচুর সোডা, সোডিয়াম সালফেট পাওয়া যাইতে পারে এবং রাজপুতানার লবণ হ্রদগুলিও সোডিয়াম সালফেটে পূর্ণ। ঐ সকল অঞ্চল হইতে সালফার ও সালফিউরিক এসিডও প্রচুর পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। খবরটা ভাল বটে, কিন্তু যে দেশকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিবার লবণের জন্য এখনও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, সে দেশে কি ঐ সকল রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হইবে?

ভারতীয়ের সম্মান—

সার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। সম্প্রতি লণ্ডনের রাসায়নিক শিল্প সমিতি তাঁহাকে অনারারী সদস্য করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। উক্ত সমিতি ইতিপূর্ব্বে মাত্র দুই জন বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রজাকে ঐ সম্মান দান করিয়াছেন—তন্মধ্যে একজন ইংরাজ ও অপর একজন কানাডা দেশীয়। আমরা সার শান্তিস্বরূপের এই সম্মান লাভে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

পণ্ডিত মদনমোহনের ভবিষ্যদ্বাণী—

নিখিল ভারত গোরক্ষা প্রচার মণ্ডলের পক্ষ হইতে কাশীতে গত ৪ঠা জানুয়ারী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীকে তাঁহার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে মালব্যজী বলিয়াছেন, "আর দেড় বৎসর পরে বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের অবসান হইবে এবং গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূহের জয় হইবে।" পণ্ডিত মালব্যের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইলে তৎপূর্ব্বে যে পৃথিবীর প্রচুর ধন ও লোকক্ষয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ১৯৪৩ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কারারুদ্ধ হওয়ায় কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারেন নাই। ১৯৪৪ সালের জন্যও তাঁহাকে সভাপতি করা হইয়াছে। তবে আগামী ১লা জুলাই পর্য্যন্ত যদি তিনি মুক্তি লাভ না করেন, তাহা হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কংগ্রেসের একত্রিংশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে হইবে। ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে ত্রিবান্দ্রামে আগামী বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

শোচনীয় ঘটনা—

গত ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-ভাঙ্গা হলে ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য যখন ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন, তখন একদল লোক সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ ও প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ডাক্তার রায়ের জামা ছিঁড়িয়া যায় ও চাদরখানি অপহৃত হয় এবং নলিনীবাবু গাড়ী ঘুরাইয়া পরে অন্য পথে সম্মেলনে প্রবেশ করেন। কে বা কাহারা এবং কেন এই কাজ করিয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। তবে এই ঘটনা যে বিশেষ শোচনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ঘটনার জন্য সম্মেলনের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পরে আরম্ভ করিতে হইয়াছিল।

আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার

গত ৩০শে ডিসেম্বর বুধবার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও কবি আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম ; ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৪ সালে তিনি সহসা দৃষ্টিশক্তিহীন হন ; কিন্তু অন্ধ হইয়াও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা বা কর্ম্মশক্তি কিছুই কমে নাই। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল এবং অন্ধ হইবার পর তাঁহার নিকট যাহা পাঠ করা হইত, তিনি সমস্তই মনে রাখিতে পারিতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ১২ বৎসর কাল এমন যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার ছাত্রগণ কখনই তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি ও অধ্যাপনা-কৌশলের কথা বিস্মৃত হইবে না। তিনি নৃতত্ত্ব, ভাষা বিজ্ঞান, বঙ্গসাহিত্য এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস—এই ৪টি বিষয়েই ছাত্রগণকে শিক্ষা দান করিতেন ; অতি কঠিন বিষয়ও অতি সহজ ও সরল করিয়া তিনি বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি অন্য কর্ম্মক্ষেত্রে কোনরূপ দান না করিলেও শিক্ষাব্রতী হিসাবে চিরদিন অমর হইয়া থাকিতেন।

তাঁহার বঙ্গসাহিত্য প্রীতিও কম ছিল না। কৃষ্ণনগরে স্কুলে পড়িবার সময় তিনি কবিবর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহপাঠী ছিলেন। তাহার পর হুগলী কলেজ ও জেনারেল এসেম্বলী ইনিষ্টিটিউসনে শিক্ষালাভের পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া কর্ম্মজীবনে দ্বিজেন্দ্রলালের মতই বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর হইতে তিনি নব্য-ভারত, প্রবাসী, ভারতী, প্রদীপ, সাহিত্য ও ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক ছিলেন। আমরা সেদিনও ভারতবর্ষে তাঁহার রচনা প্রকাশ করিয়াছি। ভারতবর্ষ প্রকাশের সময় তিনি উহার প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য যে প্রবন্ধ দেন, সে প্রবন্ধগুলিকে ভারতবর্ষে যথেষ্ট সম্মানের সহিত প্রকাশ করা হইয়াছিল। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে যখন বঙ্গবাণী মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, তখন আচার্য্য বিজয়চন্দ্র ও আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন তাহার যুগ্ম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং যে ৬ বৎসর কাল ঐ পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, বিজয়চন্দ্র ততদিনই যোগ্যতার সহিত উহার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিজয়চন্দ্র ফরিদপুর জেলার খালকুলার জমীদার হরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ঝিনাইদহে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং বি-এ পাশ করিয়া তিনি প্রথমে বামড়া ষ্টেটে ও পরে শোনপুর রাজ্যে চাকরী করেন। পুরী স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি কটকে একটি প্রাইভেট কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরেই তাঁহাকে সম্বলপুরের গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ প্রদান করা হয়। ঐ সময়ে ১৮৯৫ সালে তিনি বি-এল্ পাশ করিয়া সম্বলপুরেই ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে প্রভূত অর্থোর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে অন্ধ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ওকালতী ছাড়িয়া দিতে হয় ও তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। অন্ধ অবস্থাতেও তিনি উড়িষ্যার কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের আইন-সম্পর্কিত পরামর্শদাতার কাজ করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি লণ্ডনে ধর্ম্মকংগ্রেসে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'জীবন বাণী' পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। বিদ্রূপ বিকল্প, ফুলশর, কথা ও বীথি, যজ্ঞভস্ম, উদানম্, হেয়ালী, হেরীগাথা, তপস্যার ফল, গীতগোবিন্দ, পঙ্কমালা, কথা নিবন্ধ, কালিদাস, প্রাচীন সভ্যতা, ছিটে ফোঁটা, রুচিরা, খেলাধুলা প্রভৃতি বহু পুস্তক তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরাজিতেও তাঁহার বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে এম-এ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই—সেগুলি পুনপ্রকাশিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হইবে। তাঁহার রস রচনাও এক সময়ে পাঠকগণকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে।

তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবী বর্ত্তমান। তাঁহার জামাতা ডাক্তার বি-বি-সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক।

ক্ষুধা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মিত্র এম্-এ

জীবনের মৌন ম্লান শূন্য দিনগুলি
ভীড় করে আসে আজ শ্রাবণের সাঁঝে—
নীরবে নোয়াই মাথা দীনতার লাজে
তবু শত প্রশ্ন আসে মিনতিরে দলি।
যৌবনের গোধূলি লগনে মনে পড়ে আজি
আমারি অঙ্গনতলে কত কুঁড়ি গিয়াছে ঝরিয়া
অনাঘ্রাত অনাহুত আঁধারের অজানা প্রান্তরে
লাগেনি পূজায় কারো, ভরে নাই নৈবেদ্যের সাজি।

জীর্ণ মোর তৃষাদগ্ধ সায়াহ্নের তীরে
জীবন দেবতা মোর ! এ কি প্রশ্ন আজ তারা করে-
তৃপ্তিহীন শান্তিহারা সংযমের ঘেরি চারিপাশ
উপেক্ষিত লাঞ্ছিতের একি ক্রূর দুরন্ত উল্লাস।
ক্ষমা করো ওগো দেব—
বক্ষভরে নৃত্য করে রক্তলুব্ধ শত তীব্র ক্ষুধা—
তোমার করুণা তারা পাবে নাকি কভু
তোমার হৃদয় হতে এতটুকু সুধা।

চল্‌তি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আফ্রিকার রণাঙ্গন

'ভারতবর্ষ'-এর গত পৌষ সংখ্যায় আমরা যখন আফ্রিকার যুদ্ধ প্রসঙ্গে সমালোচনা করি সেই সময় যুদ্ধ চলিতেছিল লিবিয়ার অভ্যন্তরে এল্ আঘেলিয়ার ৩০ মাইল পূর্বে। তাহার পর এক মাসের মধ্যে জেনারেল রোমেলের বাহিনী যথেষ্ট পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। আঘেলিয়া পরিত্যাগের পর অক্ষশক্তিবাহিনী নোফিলিয়ায় সরিয়া যায়। কিন্তু মিত্রশক্তির চাপে নোফিলিয়া পরিত্যাগ করিয়া তীর পথে জার্মান বাহিনী সার্টে সরিয়া আসে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবনে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে জার্মান বাহিনী মৃত সৈন্যদের দেহের নিম্নে মাইন স্থাপন করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। জেনারেল রোমেলের পশ্চাদরক্ষী সৈন্যদল অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ায় রোমেলের অভিসন্ধি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু অনুমান করা যায় নাই। মিত্রশক্তিকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে কোন সুবিধাজনক অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্য থাকিলে পশ্চাদরক্ষী সৈন্যদল কর্তৃক অধিকতর তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী বাধাপ্রদানই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কিন্তু জার্মান বাহিনীর বাধা প্রদানের মধ্যে তাহার কোন পরিচয় না থাকায় অনুমান করা হয় যে, ত্রিপলীর পূর্বে মিত্রবাহিনীকে বাধা প্রদানের কোন উদ্দেশ্য জার্মান বাহিনীর নাই। জেনারেল রোমেলের বাহিনী টিউনিসিয়ায় জার্মান বাহিনীর সহিত সম্মিলিত হইতেই সচেষ্ট। এদিকে মিত্রশক্তি টিউনিস্-এর দ্বাদশ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সক্সাক্স্-এ বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। শত্রু বিমান হানা দিয়াছে কাসাবলাঙ্কায়। পঁ-দ্যু-ফতে অক্ষশক্তির চাপে মিত্রবাহিনীকে সামান্য পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছে। অ্যাড্‌মিরাল্ দারলঁ নিহত হওয়ায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জেনারেল গিরাউড্ আফ্রিকার যুদ্ধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলেন যে, আফ্রিকার যুদ্ধ মিত্রশক্তির অনুকূলে শেষ হইবে নিঃসন্দেহ, তবে তাহার জন্য মিত্রশক্তিকে যথেষ্ট তৎপর থাকিতে হইবে। আফ্রিকায় ৫০,০০০ ফরাসী সৈন্য সংগ্রামে লিপ্ত, কিন্তু তাহাদের প্রয়োজন মত আধুনিক সমর সম্ভার তাহাদের নিকট নাই। অপর পক্ষে শত্রু বাহিনী যথেষ্ট আধুনিক ও উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তবে বৃটেন ও আমেরিকা হইতে ফরাসী বাহিনী যথেষ্ট অস্ত্রাদি লাভ করিয়াছে।

লণ্ডনে ছুটীতে আমেরিকান নৌ কর্ম্মচারী ও ভারতীয় সৈন্যগণের বিশ্রাম

জেনারেল গিরাউড্ শুধু শত্রুপক্ষের অস্ত্রাধিক্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় আফ্রিকার যুদ্ধ সম্বন্ধে আরও চিন্তার বিষয় আছে। টিউনিস ও বিজার্টায় জার্মান বাহিনী যথেষ্ট সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানি করিয়াছে, মার্কিন বাহিনীর সহিত তাহারা সংগ্রামে লিপ্ত। এদিকে জেনারেল রোমেল ক্রমেই পশ্চাদপসরণ করিতেছেন, টিউনিসিয়ায় জার্মান বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। মিশর ও সাইরেনাইকা শত্রুমুক্ত, ট্রিপলিটানিয়ার পূর্বাংশ হইতেও রোমেলবাহিনী অপসৃত। এদিকে ককেশাস অঞ্চলেও রুশ সৈন্য আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করিয়া চলিয়াছে। উভয় রণক্ষেত্রের এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও হিটলার নীরব। নূতন কোন পরিকল্পনার আভাস এখনও পাওয়া যায় নাই, অথচ আফ্রিকার রণাঙ্গন সম্বন্ধে হিটলারের স্বাভাবিক উদ্যম আজও দেখা যাইতেছে না। কিন্তু যুদ্ধের গতির এতাদৃশ অবস্থা সত্ত্বেও হিটলারের পক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া নিরুদ্বেগে কালক্ষেপ সম্ভব জার্মান বাহিনীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। ফলে দীর্ঘ ঈপ্সিত বাকু তৈল অঞ্চল জার্মানীর হাতে আসিতে পারে এবং এই আক্রমণের প্রভাব উত্তর ককেশাস ও দক্ষিণ রুশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের উপর যথেষ্ট প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু ইহাতে প্রথম বাধা তুরস্ক স্বয়ং। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই তুরস্ক নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে সঃ সারাজগ্লু পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে, তুরস্কের নিরপেক্ষতা সক্রিয় এবং যদি তুরস্কের স্বাধীনতা বা সাম্রাজ্য আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তুরস্কের শেষ অধিবাসী পর্যন্ত তাহা রক্ষার জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করিবে। বর্তমান যুদ্ধের সূচনা হইতেই তুরস্ক যুযুধান রাষ্ট্রগুলির কার্যাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। ইরাকে যখন জার্মানীর প্ররোচনায় বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে তখন তুরস্ক এই বিদ্রোহকে সুনজরে দেখিতে পারে নাই। কারণ বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের যে পরিকল্পনা জার্মানীর আছে, ইরাকের এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়া তুরস্ক জার্মানীর সেই

পারসিয়ান গালফ্ এবং ইরানিয়ান্ রেল দিয়া রাশিয়ার যুদ্ধোপকরণ প্রেরণ

নয়। তাহা হইলে হিটলার কোন্ কূটনৈতিক চালের অপেক্ষায় আছেন? ভারতবর্ষ-এর গত পৌষ সংখ্যায় আমরা স্পেনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এবং ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ অঞ্চলের সংগ্রামে স্পেনের গুরুত্ব যে কতখানি সে বিষয়েও আমরা উক্ত সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি হিটলারের হেড কোয়ার্টাস-এ অক্ষশক্তির অধিনায়কদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। রিবেনট্রপ, গোয়েরিং, কাইটেল, সিয়ানো, ক্যাভালেরো প্রভৃতি এই সভায় আলোচনায় নিরত ছিলেন। একমাত্র মুসোলিনি ব্যতীত অক্ষশক্তির সকল প্রধান নায়কগণই উপস্থিত ছিলেন। এই সভার আলোচনা যে শুধু আত্মরক্ষামূলক নয়, আক্রমণাত্মক অভিযান সম্বন্ধেও আলোচনা চলিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু আফ্রিকা ও রুশ-জার্মান যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় হিটলারের পক্ষে দুইটি গ্রহণযোগ্য পন্থা আছে। প্রথম তুরস্কের মধ্য দিয়া পূর্বাভিমুখে অভিযান। ইহাতে একদিক যেমন মিশরের বিপদ বর্দ্ধিত হইবে, তেমনই দক্ষিণ ককেশাসে উপনীত হওয়াও অভিসন্ধিরই আভাস পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের ১৮ই জুন তুরস্কের সহিত জার্মানীর সন্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৃটেন ও রুশিয়ার নিকট তুরস্ক তাহা গোপন করিতে প্রয়াস পায় নাই। ১৯৪১ সালে বৃটেন হইতে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী তুরস্কে রপ্তানি হইয়াছে, আবার ঐ বৎসরেই তুরস্ক স্বীয় কাঁচা মালের বিনিময়ে জার্মানী হইতে সমর-সম্ভার গ্রহণের সর্তে জার্মানীর সহিত বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। আর রুশিয়ার সহিত তুরস্কের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। ইটালী কর্তৃক লিবিয়া ও ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রহণের কথা তুরস্ক ইতিমধ্যে বিস্মৃত হয় নাই। তুরস্কের সাধারণতন্ত্রের শৈশবে যখন ইয়োরোপের রুগ্ন ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব-লাভের প্রচেষ্টাকে অন্যান্য রাষ্ট্র আদৌ সুনজরে দেখে নাই, একমাত্র রুশিয়াই তখন পরোক্ষেও তুরস্কের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। বর্তমানে ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর ফলে তুরস্কের সহিত রুশিয়ার বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। কাজেই ভয় অথবা লোভ দেখাইয়া তুরস্ককে স্বপক্ষে আনিবার

আশা হিটলারের নির্মূল হইয়াছে বলা চলে। একমাত্র উপায় আক্রমণ। কিন্তু জার্মানীর বর্তমান অবস্থায় তুরস্ককে আক্রমণ করিয়া এক নূতন শত্রু ও নূতন রণাঙ্গন সৃষ্টি জার্মানীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা কার্যারম্ভের পূর্বে হিটলারকে একাধিকবার চিন্তা করিতে হইবে।

হিটলারের দ্বিতীয় পন্থা—স্পেনের সাহায্য গ্রহণ। স্পেনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পৌষ মাসের 'ভারতবর্ষ-এ' আমরা আলোচনা করিয়াছি। জেনারেল ফ্রাঙ্কো যে স্পেন আক্রমণকারীর শত্রুপক্ষে যোগদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন তাহাও আমরা জানাইয়াছি। কিন্তু জেনারেল ফ্রাঙ্কোর এই ঘোষণা সম্বন্ধে চিন্তার কারণ আছে। ফ্রাঙ্কোর বর্তমান অবস্থা লাভের মূলে যে অক্ষশক্তির সাহায্য বর্তমান ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য স্পেন হইতে জার্মানীতে সৈন্যও প্রেরিত হইয়াছে। আঙ্কারা হইতে প্রাপ্ত রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরস্থ বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের অনুমতি প্রদানের জন্য জার্মানী হইতে স্পেনের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে। এমন কি অ্যালজিরিয়াতে মার্কিন বাহিনীর অবতরণের পর হইতে জার্মানী কর্তৃক সমগ্র স্পেন অধিকারের পরিকল্পনাও করা হইতেছে। ফ্যাসিস্ত শক্তির সাহায্যে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত ফ্যাসীমনোভাবাপন্ন ফ্র্যাঙ্কো নিরপেক্ষতার বুলি আওড়াইলেও এবং যে শক্তি স্পেন আক্রমণ করিবে তাহার বিপক্ষদলে যোগদানের ভয় দেখাইলেও সত্যই স্পেনে নাৎসী আক্রমণ ঘটিলে স্পেনের বাধাপ্রদান শেষ পযন্ত প্রহসনে পরিণত হইবে কি না তাহা চিন্তার বিষয়।

রুশ জার্মান সংগ্রাম

গত এক মাসে রুশ রণাঙ্গনে জার্মান প্রতিরোধ অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। স্ট্যালিন্‌গ্রাডের উত্তর-পশ্চিম, দাক্ষণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য ডনে জার্মান সৈন্যের উপর লাল ফৌজের আক্রমণ চলিয়াছে প্রচণ্ডভাবে। মধ্য ডনে লাল ফৌজ কর্তৃক আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার সময় হইতে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০,০০০ জার্মান সৈন্য বন্দী হইয়াছে, লালফৌজের অগ্রগতির দূরত্ব ৯০হইতে ১২৫ মাইল। মিলেরোভোর ৩০ মাইল উত্তরেভরোনেশ-রষ্টোভ রেলপথের উপর অবস্থিত চার্টকোভো রুশ সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। 'প্রাভদা' প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, জার্মান বাহিনী উক্ত অঞ্চল হইতে পলায়নের সময় পশ্চাদরক্ষার জন্য রুমানিয়ান 'আত্মোৎসর্গী সৈন্যদল'কে রাখিয়া গিয়াছে। স্ট্যালিন্‌গ্রাড-নভোরসিস্ক রেলপথের উপর অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সহর কোটেলনিকোভো রুশ বাহিনীর অধিকারে আসিয়াছে। স্ট্যালিন্‌গ্রাড অঞ্চলের মধ্য রণাঙ্গনে জেনারেল জুকোভ বহু সৈন্য বন্দী ও অপরিমিত সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ-এর গত সংখ্যাতেই আমরা জানাইয়াছিলাম প্রায় ৪০০,০০০ জার্মান সৈন্যের ককেশাশ অঞ্চলে বন্দী হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত সৈন্যদল এখনও রুশ বূহ্য ভেদ করিতে পারে নাই। রুশ বাহিনীর এই বেষ্টনী সফল হইলে জার্মানীর উপর যে প্রচণ্ড আঘাত পড়িবে তাহা নিঃসন্দেহ; তবে ইহাতে এখন হইতে যথেষ্ট উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই। গত বৎসর শীতকালে স্টারায়া রুশিয়াতেও জার্মাণ ১৬শ বাহিনী অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা সেই অবরোধ ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসিতে সক্ষম হয়। বর্তমানে ডন এলাকায় অবরুদ্ধ সৈন্যদল পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, এ দিকে রুশবাহিনী কর্তৃক একটির পর একটি সহর অধিকৃত হওয়ায় বেষ্টনী ক্রমশঃই ছোট হইয়া আসিতেছে। লালফৌজ যদি রষ্টোভ এবং আজভ সাগরের তীর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা হইলে স্ট্যালিনগ্রাড ও ককেশাশের মধ্যস্থ জার্মান বাহিনী পশ্চাদ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ হইয়া পড়িবে। নাৎসী বাহিনী কোটেলনিকোভো পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সফল হয় নাই। বর্তমানে লাল ফৌজ রষ্টোভ এবং সল্‌স্ক-এর দিকে জার্মানবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

মহিলাদিগকে ফায়ার ফাইটাররূপে শিক্ষিত করিয়া তোলার দৃশ্য

পশ্চিম রুশিয়াতেও সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি চলিয়াছে অব্যাহতভাবে। লালফৌজ কর্তৃক ল্যাটভিয়া সীমান্ত হইতে ৯৫ মাইল দূরবর্তী সহর ভেলিকিলুকি পুনরধিকৃত হইয়াছে।

নববর্ষে হিটলার তাঁহার সৈন্যদলে যে বাণী দিয়াছেন তাহাতে জানাইয়াছেন—"পূর্ব বৎসরের ন্যায় বর্তমান বর্ষও জার্মানীর নিকট দুর্বৎসর। বর্তমান শীতেও জার্মান বাহিনীকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, তবে গত বৎসরের তুলনায় সে কষ্ট অল্প হইবে। শীতের পরই আবার শুরু হইবে জার্মানীর অভিযান। সেই অভিযানে এক বিশিষ্ট শক্তির ধ্বংস হইবে এবং সে শক্তি জার্মানী নয়। নরওয়ে হইতে স্পেনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে নাৎসী সৈন্য সমাবিষ্ট, যে কোন শত্রু আক্রমণকে তাহারা পরাভূত করিবে। শত্রুর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।" হিটলারের বক্তৃতাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁহার ভাবাবেগের বক্তৃতাসমুদ্রে বাস্তবের চড়া পড়িতে

শুরু করিয়াছে। তাই বর্তমান দুর্দিন তাঁহার নজরে পড়িয়াছে। অতীত দিনের ন্যায় বিজয়মাল্য প্রদানের জন্য ঈশ্বরকে স্মরণ করার কথাও তিনি সৈন্যদের শুনাইয়াছেন। জয়ের কথা তাঁহাকে বলিতেই হইবে, তাই জার্মানীর ভবিষ্যৎ বিজয়ের কথা জার্মান বাহিনীকে শুনাইয়াছেন; কিন্তু কি উপায়ে সেই বিজয় কোন্ পথ ধরিয়া আসিবে তাহার কোন উল্লেখ নাই! রুশিয়া এবং আফ্রিকা উভয় রণক্ষেত্রেই জার্মান বাহিনী প্রধানতঃ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে, ককেশাশে অসংখ্য সৈন্য নিহত ও বন্দী হইয়াছে, অপরিমিত সমরোপকরণ বিনষ্ট হইয়াছে, তবুও হিটলারের মুখে জয়ের কথা! জার্মান বাহিনীকে নৈতিক শক্তির অবনতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্য কোন নূতন কূটনীতিক অথবা সামরিক চাল হিটলারের পক্ষে বর্তমানে আশু প্রয়োজন। কিন্তু সেই চাল কোন্ দিকে কোন্ রাষ্ট্রকে ঘিরিয়া ঘটা সম্ভব সে সম্বন্ধে আমরা 'আফ্রিকার সংগ্রাম' প্রসঙ্গে উপরে আলোচনা করিয়াছি; বর্তমানে তাহা প্রাসঙ্গিক হইলেও পুনরুক্তি বাহুল্য বোধে সে আলোচনা করিলাম না।

সুদূর প্রাচী

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সংগ্রামে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই। বুনা অঞ্চলে যে জাপ বাহিনী প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য সমাবিষ্ট হইয়াছিল মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে তাহারা সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। যথেষ্ট সৈন্যক্ষয় ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া জাপ বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইতেছে। জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের সৈন্যদল কর্তৃক বুনা অধিকৃত হইয়াছে। ছয়বার জাপবাহিনী বুনা অঞ্চলে নূতন সৈন্য অবতরণের চেষ্টা করিয়া মার্কিন সৈন্যের প্রবল আক্রমণে ফিরিতে বাধ্য হয়। বুনা এলাকায় সানানান্দা এবং বুনা মিশন অঞ্চলে শুধু কিছু জাপ সৈন্য এখনও আত্মরক্ষার্থ সংগ্রামে লিপ্ত আছে। গোনার উত্তরে পাপুয়ার তীরে জাপসৈন্য অবতরণ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত তাহা জানা যায় নাই। নিউগিনিতে মাসাধিক কাল পূর্বেই জাপান যথেষ্ট 'বিঘাত বাহিনী' (Shook troops) সমাবেশ করিয়াছে। এই বাহিনীর পরিচয় আমরা ভারতবর্ষ-এর পৌষ সংখ্যাতেই প্রদান করিয়াছি। গুয়াদালকানারে বিমান হইতে জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। এ অঞ্চলে বিমান দ্বারা সৈন্য নামাইবার প্রচেষ্টা জাপানের পক্ষে এই প্রথম। অদূর ভবিষ্যতে জাপান যে নিউগিনিতে এক প্রবল সংঘর্ষ বাধাইতে ইচ্ছুক, তাহার সৈন্য সমাবেশের মধ্যেই সে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

উভয় পক্ষে বিমান আক্রমণও চলিয়াছে বেশ তীব্রভাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ২১ খানি জাপ বিমান এক দিনে বিনষ্ট হইয়াছে। নিউগিনিতে জাপ বিমান ঘাঁটিতে ৫০০০ পাউণ্ড ওজনের বোমা বর্ষিত হইয়াছে। গ্যাসমাটায় মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনী ১০০০ পাউণ্ডের বোমা বর্ষণ করিয়াছে। রাবাউলে তিনখানি জাপ জাহাজ বোমা বর্ষণে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিস্কাতেও বিমান আক্রমণ পরিচালনা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশেও মিত্রশক্তির তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাপান যে ব্রহ্মদেশে যথেষ্ট সৈন্য আমদানী করিয়াছে এবং নূতন বিমান ঘাঁটি নির্মাণ করিতেছে সে সংবাদ আমরা 'ভারতবর্ষ-এর পৌষ সংখ্যাতেই দিয়াছি। কোন্ স্থানে কিরূপ শক্তির সমাবেশ হইতেছে সে কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ফলে মিত্রশক্তির তৎপরতাও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। মাউঙ্গডাউ পাপিয়াডাউং অঞ্চলে বোমা বর্ষণ ও মেসিনগানের গুলি চালান হইয়াছে। জাপ বিমানও চট্টগ্রাম, ফেনী ও কলিকাতা অঞ্চলে একাধিকবার বিমান আক্রমণ করিয়াছে। আরাকান সীমান্ত হইতে স্থলবাহিনী আকিয়াবের ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমস্থ বুথিয়াডাউং অঞ্চল অধিকার করিয়াছে। অবশ্য এখনও ইহা সংঘর্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে, প্রচণ্ড যুদ্ধের আকার এখনও ধারণ করে নাই। জেনারেল ওয়াভেলও কয়েক দিন পূর্বে জানাইয়াছেন যে, অচিরে সমগ্র ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের জন্য এই আক্রমণ পরিচালনা করা হয় নাই। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মিত্রশক্তি দখল করিতে ইচ্ছুক এবং প্রথমে সেই উদ্দেশ্যেই অভিযান পরিচালনা করা হইবে। ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধার করিতে হইলে বাঙ্গালা ও আসামের সামরিক গুরুত্ব কতখানি তাহা আমরা একাধিকবার 'ভারতবর্ষ'-এর অন্যান্য সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু জাপানের কলিকাতা আক্রমণের উদ্দেশ্য কি নিয়ে 'কলিকাতায় বিমান হানা' শীর্ষক প্রবন্ধাংশে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

কলিকাতায় বিমান হানা

বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর এবং পূর্ব ভারত তথা বৃটিশ সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলস্থ সুদৃঢ় ঘাঁটি কলিকাতায় গত ২০এ ডিসেম্বর জাপ বোমারু বিমান হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে কোকনদ এবং
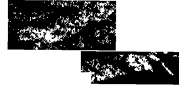
শত্রু বোমার আঘাতে একটী বাজারের অবস্থা ফটো—তারক দাস

ভিজাগাপাটমে এবং উত্তর-পূর্বভারতে চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলে বোমা বর্ষিত হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতায় বিমান আক্রমণ সম্বন্ধে অনেকের যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে।

একটী গোশালায় বোমা পড়িয়া সম্মুখস্থ বহির্বাটীর কতকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত ফটো—তারক দাস

এই আক্রমণ অপ্রত্যাশিত নয়। ১৯৪১ সালের ২৩-এ ডিসেম্বর রেঙ্গুনে বোমা বর্ষণের পরই অনেকে অবিলম্বে কলিকাতায় আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বিমান হানা যে তখনই আসন্ন হইয়া ওঠে নাই, তথ্যাদির আলোচনা দ্বারা আমরা

তখনই তাহা জানাইয়াছিলাম—পাঠকগণের বোধ হয় তাহা স্মরণ আছে। 'ভারতবর্ষ'-এর গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় জাপানের ভারত আক্রমণের সম্ভাব্যতা লইয়া আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা স্পষ্টই বলিয়াছিলাম—ভারতবর্ষের গুরুত্ব কতখানি তাহা জাপান জানে,

কলিকাতার শত্রু বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত একটী বাসগৃহ ফটো—তারক দাস

ভারতবর্ষ লাভে তাহার সামরিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সুবিধা কি তাহাও জাপানের অজ্ঞাত নয়, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক অবস্থা জাপানের কতখানি অনুকূল অথবা প্রতিকূলে যাইবে সে হিসাবও জাপান

কলিকাতা অঞ্চলের ভারতীয় বাসিন্দাগণের পল্লীতে বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত একটী গৃহ ফটো—তারক দাস

নিশ্চয় আজও বাকি রাখে নাই, তাহার সামরিক শক্তির বিচ্ছিন্ন অবস্থান সম্বন্ধেও সে সজাগ, ভারতের বর্তমান বর্দ্ধিত প্রতিরোধ শক্তির সংবাদও নিশ্চয় তাহার নিকট অসংগৃহীত নাই, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অনুপেক্ষণীয় গুরুত্ব সম্বন্ধেও সে নিশ্চয় উদাসীন নয়, ভারতবর্ষে অভিযান পরিচালনা করিতে হইলে বর্ষারম্ভের পূর্বেই যে তাহা শেষ করা প্রয়োজন এবং যুক্তিযুক্ত, ইহাও জাপান বোঝে—কিন্তু তবুও প্রয়োজন কখন সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে পারে না; জাপানও ভবিষ্যতে
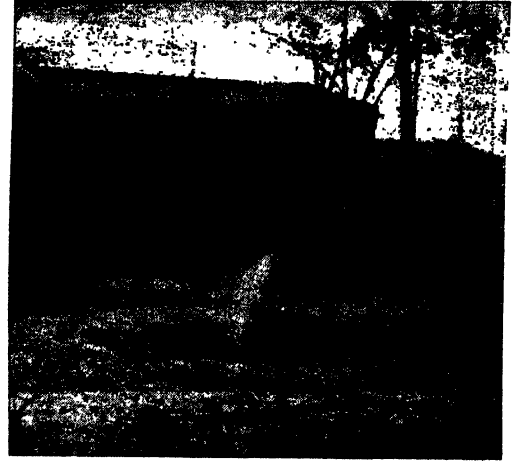
বোমার আঘাতে সহরতলী অঞ্চলের একটী বহির্বাটীর সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বোমার আঘাতে গর্ত্ত ফটো—তারক দাস

অধিকতর সুযোগ লাভের অনিশ্চিত আশায় বর্তমানে আপন প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই।
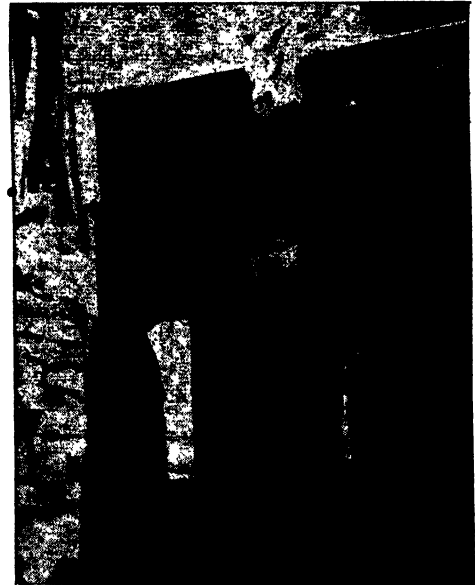
বোমার আঘাতে ভাঙ্গা একটী বাসগৃহের দৃশ্য ফটো—তারক দাস

রেঙ্গুন, মান্দালয় প্রভৃতি বিভিন্ন সহরে জাপ বিমান হইতে যেমন নির্বিচারে বোমা বর্ষিত হইয়াছে, কলিকাতার বোমা বর্ষণের মধ্যেও তাহার সেই

স্বভাবই প্রকাশ। একাধিক দিনে কলিকাতাঅঞ্চলে যেভাবে বোমা বর্ষিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণ নাগরিক জীবনে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা যে জাপানের উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

শত্রু-বোমার আঘাত-প্রাপ্ত একটী বাসগৃহ ফটো—তারক দাস

কলিকাতায় আক্রমণের আশঙ্কা সম্বন্ধে একটা সাধারণ কারণ প্রদর্শিত হয় যে, পূর্ব ভারতের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে কলিকাতার গুরুত্ব যথেষ্ট। সামরিক গুরুত্ব উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে বর্তমানে সামরিক ও বেসামরিক ভাবে পৃথক নির্দিষ্ট বস্তুর গুরুত্ব প্রদান বিশেষ সহজ নহে। সে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যুগ আর নাই—বর্তমানে যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীতেও যুদ্ধ ছিল দুই যুযুধান রাষ্ট্রের সৈন্যদলের মধ্যে। উন্মুক্ত প্রান্তরে বা নদীতীরে দুই বেতন-ভুক সৈন্যদলের মধ্যে অস্ত্রের আদান প্রদানেই সে যুদ্ধ নিবদ্ধ থাকিত; সাধারণ নরনারীর নাগরিক জীবনে তাহার প্রভাব আসিয়া পড়িত না। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় হইতেই যুদ্ধের রূপ যথেষ্ট পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু তখনও এই যুদ্ধ ছিল স্থানিক। দুর্গের অভ্যন্তরে বা পরিখার অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ চলিত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কিন্তু গত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় হইতে যেমন বহুবিধ নূতন সমর সম্ভার আবিষ্কৃত হইয়াছে, রণপদ্ধতির মধ্যেও তেমনই আসিয়াছে পরিবর্তন। বর্তমানের যুদ্ধ গতির যুদ্ধ, কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে দুই বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই তাহা আজ আর নিবদ্ধ নয়। বর্তমানে যুযুধান রাষ্ট্রের সমগ্র ভূখণ্ডই যুদ্ধক্ষেত্র, রাষ্ট্রের প্রতিটি নরনারী আজ সৈনিক। উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়া আজিকার দিনে যুদ্ধজয়ের কথা কোন রাষ্ট্রই ভাবিতে পারে না, আর সেই জন্যই যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যেই নাগরিক জীবনের স্বাভাবিকতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন অত্যাবশ্যক, প্রয়োজন যোদ্ধার নৈতিক শক্তির মূলে আঘাত হানা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জার্মানী ইংলণ্ডে নির্বিচারে বার বার বোমা বর্ষণ করিয়াছে, এই একই উদ্দেশ্যে অক্ষশক্তির অন্যতম সহযোগী জাপান চীন ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন সহরে 'বেসামরিক' নরনারীর উপর অগ্নিগোলা বর্ষণ করিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে ইতস্ততঃ বোমা নিক্ষেপের মধ্যেও জাপানের ঐ একই উদ্দেশ্য নিহিত। কিন্তু বোমা পড়ার পরও কলিকাতা সহরে পূর্বের মতই কাজ চলিতেছে, কাজেই জাপানের সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। ৩.১.৪৩

কলিকাতা অঞ্চলের কোনস্থানে শত্রু বোমার আঘাতে একটী বাড়ীর পাঁচিল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, কর্মিগণ তৎপরতার সহিত তাহা অপসারণ করিতেছে ফটো—তারক দাস

আমার এ গান তাদের জন্যে নয়

ভাস্কর দেব

আমার এ'গান তাদের জন্যে নয়:
বিলাস ব্যসনে শুধু দিন গ'ণে যারা—
আপনার মাঝে আপনি আত্মহারা,
জীবন-নদীতে যা'দের জোয়ার বয়।

আমার এ'গান তাদের জন্যে নয়;
মেঘ সম যা'রা ঢালিয়া করুণা ধারা—
তবু উল্লাসে হয়েছে পাগল পারা,
অন্তরে যা'রা সদাই তৃপ্তিময়।

আমার এ'গান তাদের কণ্ঠে সাজে
দুঃখে দৈন্যে কভু নহে যা'রা নত;
শত পরাজয়ে পথেতে যাহারা রত
যা'দের কণ্ঠে করুণ পূরবী বাজে;

এ' গীতিকা-মালা তাদেরই জন্যে গাঁথা
জীবন-যুদ্ধে যাহাদের নীচু মাথা।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

রণজি ক্রিকেট ঃ

বিহার ঃ ২৭১ ও ১৭৬ (৯ উইকেট ডিক্লেয়ার)
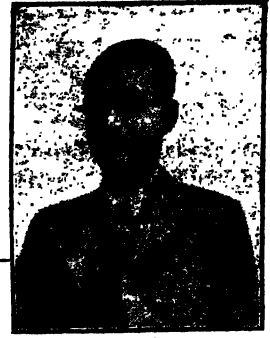
বাঙলা ঃ ৩১২ ও ১২০ (৩ উইকেট)

প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী থাকার ফলে বাঙলা জয়ী হ'য়েছে।

বিহার টসে জিতে প্রথমে ব্যাট ক'রে দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২৪৭ রান তোলে। প্রথম উইকেট অবশ্য কম রানেই পড়ে গিছলো কিন্তু পরবর্ত্তী খেলোয়াড়রা খুব ধীরভাবে খেলে রান তুলতে লাগলেন। শান্তি বাগচী ৭৫ রান ক'রে আউট হন। দলের সর্ব্বোচ্চ রান ক'রলেও তাঁর খেলার ষ্টাইল খুব উপভোগ্য নয়। দ্বিতীয় দিনে বিহার ২৭১ রানেই সব উইকেট হারালে। ছোট এস ব্যানার্জ্জি এবং বিজয় সেনের ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য। বাঙলার বোলিং মহারাজা ছাড়া কারো উল্লেখযোগ্য হয়নি। পি ডি দত্ত মন্দ নয়। এস দত্তর বোলিং নিম্নশ্রেণীর, কমল হতাশ ক'রেছেন। বাঙলার সূচনা মোটেই আশাপ্রদ হয়নি। কোন রান হবার আগেই প্রথম উইকেট, চার রানে দ্বিতীয় আর আঠার রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট হারিয়েছে। পরাজয় সুনিশ্চিত ব'লেই মনে হ'চ্ছিল কিন্তু বিহার খেলোয়াড় বাঙলার জনষ্টন চ্যাটার্জ্জি জুটি ভাজবার সুযোগ একাধিকবার পেয়েও সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। নির্ম্মল বহুবার অল্পের জন্য বেঁচেছেন। জনষ্টন খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ১২৫ মিনিট খেলে ৮৮ রান ক'রে আউট হন। নির্ম্মল ১০৪ রান করে আউট হ'ন। এই রানই উভয় দলের দুই ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ রান ছিল। দিনের শেষে বাঙলার ৭ উইকেটে ২৮০ রান হয় মহারাজা ৪৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

ইউনিভারসিটি ইন্‌ঃ জিমনাসিয়ামের বাৎসরিক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে যোগদানকারী খেলোয়াড়গণ ও সভাপতি—ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় দিনে ৩১২ রানে বাঙলার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। মহারাজা শেষ পর্য্যন্ত নট আউট থাকেন। তিনি নিজস্ব ৭১ রান খুব তাড়া তাড়ি তুলেছেন। উপযুক্ত সহযোগিতা পেলে তিনি অতি সহজেই শতাধিক রান তুলতে পারতেন। বিহারের তরুণ বোলার এন চৌধুরীর খেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১০০ রানে ৭টি উইকেট পেয়েছেন এবং এস ব্যানার্জ্জি ৯২ রানে ৩টি। বিহারের গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং চমৎকার কিন্তু অজস্র ব্যাট তাঁরা নষ্ট ক'রে বোলারদের হতাশ করেছেন। কতকগুলি ক্যাচ অত্যন্ত সহজ ছিলো। বিহার দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে ১৭৬ রান তুলে বাঙলাকে ব্যাট ক'রতে দেয়। মহারাজা এবারও ভাল খেলেছেন, ৫২ রানে ৪ উইকেট। ১৩৫ রানে পিছিয়ে থেকে বাঙলা দ্বিতীয় ইনিংস সুরু করে। সময় আছে মাত্র ৯০ মিনিট। খুব দ্রুত রান উঠতে থাকে। নির্ম্মল উইকেটের চারিদিকে খুব

পিটিয়ে খেলেছেন। দিনের শেষে বাঙ্গলার রান উঠলো ৩ উইকেটে ১২০। নির্ম্মল শেষ পর্য্যন্ত ৬৪ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

বিহারে যেমন ক্রিকেটে ক্রমোন্নতি হচ্ছে বাঙ্গলাতে আবার তেমনি ক্রমোবনতির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। পূর্ব্বে বিহারকে বাঙ্গলা যেমন অতি সহজেই পরাজিত ক'রেছে গত বছর ও এবার সে ভাবে পরাজিত ক'রতে পারে নি। বিহার পরাজিত হ'লেও বহু বিষয়ে তারা বাঙ্গলার চেয়েও ভাল খেলা দেখিয়েছে। তাদের ব্যাটিং মন্দ নয়। বোলিং বাঙ্গলার চেয়ে শক্তিশালী; গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং উন্নততর। বিহার অনেক ক্যাচ ফসকেছে এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট উন্নতি ক'রতে হবে। বিহারে উদীয়মান বোলার চৌধুরী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এস ব্যানার্জ্জি (বড়) ও (ছোট) এবং বি সেনের খেলাও উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলার খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কুচবিহারের মহারাজা। উভয় ইনিংসেই ব্যাটিং ও বোলিংয়ে তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য বাঙ্গলাকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা ক'রেছে। বাঙ্গলার জয়লাভে হার্ভে জনষ্টন ও নির্ম্মলের কৃতিত্বও তাঁর চেয়ে কম নয়। উভয়ের ব্যাটিং সাফল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলা যদি খেলার যথেষ্ট উন্নতি করতে না পারে তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে বিহারের কাছে তার পরাজয়ে আশ্চর্য্যের কিছু থাকবে না। এস ব্যানার্জ্জির সংবাদপত্রে বিবৃতি দেওয়ার পর সাময়িক উত্তেজনা বসে তাঁর টুপি ফেলার কথা উল্লেখকরার ইচ্ছা ছিল না। ব্যারাকিংও তাঁকে যথেষ্ট সহ্য ক'রতে হ'য়েছে। কিন্তু বিখ্যাত ক্রিকেট ক্যাপ্টেন উডফুলের ক্রিকেট সম্বন্ধে পুস্তকে লিপিবদ্ধ প্রায় অনুরূপ একটি ঘটনার কথা মনে পড়ায় এ ঘটনাটিও উল্লেখ ক'রতে হ'চ্ছে।

'Incidentally, why do we have appeals in cricket at all? Such appeals are not found necessary in any other sporting activity, and I should like to see a trial given to the game without appeal of any sort. A few years back, George Duckworth, the Lancashire 'keeper, in his unbounded enthusiasm, lifted up his voice rather more loudly and more frequently than an Australian crowd thought necessary. The result was that George had to face a spirited onslaught from a portion of the crowd. Had there been no appeals, this unpleasantness would not have come to the front, and anything which helps to create harmony between players and partisan spectators must be worth some consideration. One must admit that some of the excitement of the game would be lacking but it would do away with any intimidation of an umpire not possessing a strong personality'.

গ্যারিসন থিয়েটারে অনুষ্ঠিত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী মুষ্টিযোদ্ধাগণ ও পরিচালকমণ্ডলী।
অনুষ্ঠানে গোরাদল ১১-১০ পয়েন্টে বাঙ্গালীদলকে পরাজিত করে

সিন্ধু: ১১৮ ও ১০৬

পশ্চিম ভারত রাজ্য: ২০০ ও ২৭ (১ উইকেট)

পশ্চিমাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে পশ্চিমভারত রাজ্য সিন্ধু-সিন্ধুপ্রদেশকে পরাজিত করেছে। পশ্চিমভারত রাজ্যের প্রথম ইনিংসে কিষেণ চাঁদের নট আউট ৫৭ রান উভয় দলের দুই ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ রান ছিল।

আমেরিকান টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকা:

যোগ্যতা অনুসারে আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের মধ্যেও খেলাধূলাকে ওদেশের কর্তৃপক্ষ ত্যাগ করেন নি দেখে আমরা খুশী হয়েছি। বর্ত্তমান অবস্থার অজুহাতে ভারতের টেনিস ক্রমপর্য্যায় তালিকা এবছর প্রকাশিত হয়নি। আমরা আশা করি আমেরিকার টেনিস মহলের উদ্যম দেখে আমাদের দেশের টেনিস খেলার কর্তৃপক্ষগণ অনুপ্রাণিত হবেন।

পুরুষদের নামের তালিকা:

(১) ফ্রেড শ্রোডার (২) ফ্রাঙ্ক পার্কার (৩) ফ্রাসিস্কো সেগার অফ ইকুয়েডার (৪) গার্ডার মুলয় (৫) উইলিয়াম ট্যালবার্ট (৬) সিডনী উড

মহিলাদের নামের তালিকা:

(১) মিস পলিসবেজ (২) মিস লুই ব্রাউ (৩) মিস্ মার্গারেট ওসবর্ণ (৪) মিস হেলেন বের্ণহার্ড।

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা:

নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলাদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেছিলেন কিন্তু কোন বিভাগের ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা তাঁরা অর্জ্জন করতে পারেননি। খেলার প্রথম দিকেই বাঙ্গলাদলের খেলোয়াড়রা বিদায় নেন। বাঙ্গলার প্রতিনিধি হিসাবে একমাত্র ম্যাডগাওকার পুরুষদের সিঙ্গলস কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

ফাইনাল খেলার ফলাফল:

পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রকাশনাথ (পাঞ্জাব) ১৫-৯, ১৫-৩, পয়েণ্টে বোম্বাইয়ের কে রঙ্গনেকারকে পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে পুনার মিস তারা দেওধর ১০-১২, ১২-১০৩ ১১-৯ পয়েণ্টে পুনার মিস সুন্দর দেওধরকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে প্রকাশনাথ ও অশোকনাথ ১১-১৫, ১৫-১০, ১৮-১৩ পয়েণ্টে পট্টবর্দ্ধনও মাগাউইকে পরাজিত করেন। মহিলাদের ডাবলসে মিস সুন্দর দেওধর ও মিস তারা দেওধর ১৫-৮, ১৫-৪ পয়েণ্টে মিস তলায়ার খান ও মিস দাদীবুর্জ্জরকে হারিয়ে দেন।

বোম্বাইতে প্রদর্শনী ব্যাডমিণ্টন খেলা:

রেড ক্রশ সোসাইটির তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য বোম্বাইতে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ব্যাডমিণ্টন খেলার অনুষ্ঠান হয়। এই খেলাতে খ্যাতনামা এমেচার এবং পেশাদার ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ যোগদান ক'রেছিলেন। এইরূপ প্রতিযোগিতা ভারতে ইতিপূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ টেনিস এবং ব্যাডমিণ্টন খেলার আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে পেশাদার খেলোয়াড় সখের (এমেচার) খেলোয়াড়দের সঙ্গে কোন প্রতিযোগিতায় অথবা প্রদর্শনী খেলায় একত্র যোগদান করতে পারেননা। এই আইনের পরিবর্ত্তনের জন্য বহু চেষ্টা হয়েছিল। মাত্র গত বৎসর ইউরোপের কোন টেনিস মহল রেডক্রশ সোসাইটির অর্থ সংগ্রহের জন্য পেশাদার এবং সখের টেনিস খেলোয়াড়দের এক প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে এবং ঘোষণা করে একমাত্র রেডক্রস সোসাইটির তহবিলের সাহায্য কল্লেই এইরূপ খেলার ব্যবস্থা করা যাবে। ঐ উদ্দেশ্যে গত বছর আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে পেশাদার এবং সখের টেনিস খেলোয়াড়দের অনেকগুলি বিশেষ প্রদর্শনী খেলার অনুষ্ঠান হয়েছিল।

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী ব্যাডমিণ্টন খেলায় সখের খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন বিভাগে সাফল্যলাভ করেন।

ফলাফল:

সিঙ্গলসে জি লুইস (এমেচার) ১৫-৩, ১৫-৩ পয়েণ্টে সরযূ প্রসাদকে (পেশাদার) হারিয়ে দেন।

দেবীন্দর (এমেচার) ১৮-১৫, ১৫-৫ পয়েণ্টে গণপৎ রাজীকে (পেশাদার) হারিয়েছেন।

প্রকাশনাথ (এমেচার) ১৫-৬, ১৫-১১ পয়েণ্টে পপৎলালকে (পেশাদার হারিয়ে দেন।

ডবলসে দেবীন্দর ও অশোকনাথ (এমেচার) ১৫-১২ পয়েণ্টে সরযূপ্রসাদ ও গণপৎ রামজীকে (পেশাদার) পরাজিত করেন।

জি লুইস ও প্রকাশনাথ (এমেচার) ১৫-৯ পয়েণ্টে পপৎলাল সালুকে (পেশাদার) পরাজিত করেন।

ভি এন আয়ার ও কে লোতয়াল (এমেচার) ১৫-৭ পয়েণ্টে কস্ সমদিন ও রামচন্দ্রকে (পেশাদার) পরাজিত করেন।

পূর্ব্বভারত টেনিস প্রতিযোগিতা:

ক্যালকাটা সাউথ ক্লাব পরিচালিত পূর্ব্বভারত টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। কলকাতার বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করেন নি। বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে ক্লাবের পরিচালকগণ প্রতিযোগিতা বন্ধ রেখে দুর্ব্বলতার পরিচয় দেন নি। এ বিষয়ে তাঁদের নির্ভিকতা এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনার ব্যবস্থা প্রশংসনীয়।

সিঙ্গলসের ফাইনালে বাঙ্গলার দিলীপ বসু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার খ্যাতনামা খেলোয়াড় হল সারফেসের কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে সিন্ধু টেনিস প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে হল সারফেস দিলীপ বসুর কাছে পরাজিত হওয়ায় সকলেই ভেবেছিলেন এবারও তিনি পরাজিত হবেন। কিন্তু দিলীপ বসু জয়লাভ করা ত দূরের কথা সারফেসের কাছে দাঁড়াতে পারেননি। খেলায় বিচার ভুল তাঁর একাধিকবার হয়েছিল। তাঁর খেলায় একমাত্র উল্লেখযোগ্য ছিল

নেটের খেলাগুলি। খেলাতে তিনি যে ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন তা স্পষ্ট দেখা দিয়েছিল। হল সারফেস বিজয়ীর মতই খেলেছিলেন।

ফলাফল ঃ

সিঙ্গলসের ফাইনালে হল সারফেস ৬-৩, ৬-০, ৬-৩ গেমে দিলীপ বসুকে পরাজিত করেন।

প্রবীনদের ফাইনালে এল ব্রুক এডওয়ার্ডস ও কৃষ্ণপ্রসাদ ৬-৪, ৬-৩ গেমে জি দে ও এস গিয়ার্সকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে দিলীপ বসু ও জি মেটা ৬-৪, ৬-৮, ৬-৩, ৬-৩ গেমে সি এল মেটা ও সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক টেনিস ঃ

পঞ্চম বার্ষিক আন্তঃপ্রাদেশিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে।

ফলাফল :

বাঙ্গলা ৫-২ গেমে হায়দরাবাদকে হারিয়েছে। বাঙ্গালা ৫-৪ গেমে মহীশূরকে হারিয়েছে। বোম্বাই ৫-০ গেমে পাঞ্জাবকে পরাজিত করে। বোম্বাই ৫-০ গেমে দিল্লীকে পরাজিত করে। মাদ্রাজ ৫-২ গেমে মহীশূরকে পরাজিত করে।

মহারাষ্ট্র : ২৬২ ও ২২৪

বরোদা : ৩০৮ ও ১৮৬ (২ উইকেট)

রঞ্জি ক্রিকেট খেলায় বরোদা মহারাষ্ট্রকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে। বরোদা দল পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে পশ্চিম ভারত রাজ্যদলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

মহারাষ্ট্র দলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান—এস সোহানীর ৮২, ডি বি দেওধরের ৪৯ রান। ভি হাজারীর ৫৭ রানে ৪ উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে সোহনীর ৬০ রান এবং দেওধরের ৬৪ রানই উল্লেখযোগ্য। সি এস নাইডু ৭৫ রানে ৪টা উইকেট পান।

বরোদা দলের প্রথম ইনিংসে সর্দ্দার ঘোরপদের ৬৬, হাজারীর ৪৪ এবং এইচ অধিকারীর নট্ আউট ৪৪ রান উল্লেখযোগ্য।

বরোদার দ্বিতীয় ইনিংসের ২ উইকেটে ১৮৬ রান উঠে। আর নিম্বলকার ১০০ রান ক'রে নট্ আউট থাকেন।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমরা তখন বি-এ পড়ি। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের দুইটী সাহিত্যিক দল ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের দলে ছিলেন সুরেশ সমাজপতি, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এবং অপর পক্ষে ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ।

তাঁদের এই বিরুদ্ধভাবের কারণ আমি সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু বিবাদের অনেক পরেও আমি চারুবাবুকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে দেখেছি। একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি চারুবাবুকে তাঁর মতামতের জন্য আহ্বান করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—আমি দ্বিজেন্দ্রলালের বই পড়িনি—আমি ও বই পড়ব না। এমনতর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তখনকার প্রবীণ লোকেরাই হয়ত ভাল বলতে পারেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কিন্তু সে যুগে অনেকেরই মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর নাটক, তাঁর হাসির গান, তাঁর জাতীয় সঙ্গীত সে যুগে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

আমরা তখন হিন্দু হোষ্টেলে থাকি। সেবার হিন্দু হোষ্টেলে "মেবার পতন" অভিনয় হবে বলে মহলা চলছে। শোনা গেল, যে দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতায় এসেছেন। একথা শুনে আমরা একদিন সকালে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এলাম। গানের সুরগুলি দেওয়ার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল। তিনি সস্নেহে গানের সুরগুলি দিয়ে দিলেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র উভয়েই গান গেয়ে সুরগুলি রপ্ত করিয়ে দিয়েছিলেন। অভিনয়ের দিন তিনি নিজে অভিনয় আসরে উপস্থিত হলেন এবং এমন অমায়িকভাবে সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলেন যে সহজেই সকলে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমাজ এবং দেশের প্রতি যে গভীর অনুরাগ, তা সমস্ত নিন্দা সুখ্যাতির বাইরে। তাঁর মত অমন অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি করতে আর কেউ পারেন নি।

আমাদের দেশে ডিগ্রীধারী অনেক আছেন। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্য-রস পরিবেশন করার শক্তি অনেকেরই নেই। সেদিকে যদি আমাদের আগ্রহ বাড়ে ত দেশের অনেক মঙ্গল হবে।

(বালীগঞ্জে রায় বাহাদুর শ্রীযুত অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয়ের গৃহে পূর্ণিমা সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ)

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅরস্কান্ত বক্সী প্রণীত নাটক "ভোলা মাষ্টার"—১॥০
শ্রীবিমলদত্ত প্রণীত শিশু-উপন্যাস "নিঝুম রাতের কান্না"—৷৷০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহনের তূর্যনাদ"—২৲
শ্রীসন্তোষকুমার দে প্রণীত জীবনী গ্রন্থ "আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র"—৷০
বঙ্গীয়গ্রন্থাগারপরিষদপ্রকাশিত বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী—৩৲
আবুল হাসানাৎ প্রণীত "সচিত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ—মত ও পথ"—১॥০
গল্প-গ্রন্থ "কবির প্রেম ও অন্যান্য গল্প"—১৸০
এস, ওয়াজেদ আলি প্রণীত নাটক "সুলতান সালাদীন"—২৲
শ্রীপ্রভাতসমী রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "অনুবাদিকা"—১৲
শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী সম্পাদিত "মেঘনাদবধ কাব্য"—১॥০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাগচি　　সুলতানা রিজিয়া　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

—১৩৪৯

দ্বিতীয় খণ্ড ত্রিংশ তৃতীয় সংখ্যা

অহং রাষ্ট্রী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

চণ্ডিকা বলিলেন—আমি রাষ্ট্রী (I am the Super-State)···শাসনদণ্ড আমার হস্তে···আমিই দেশমাতৃকা।

তিনি আরও বলিলেন—সংগমনী বসুনাং···অর্থ বিভব আমার ভাণ্ডারে···সকলের সব বিত্তের অধিশ্বরী আমি।

> অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং
> চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম।
> তাং মা দেবা ব্যাদধুঃ পুরুত্রা
> ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম ॥৩ —দেবীসূক্তম্।

দেশ, অর্থ, শ্রেষ্ঠ দেবতা, আত্মজ্ঞানদায়িনী ও পূজার পাত্রী—আমি, আমিই জগৎস্বরূপা। (সূক্তদর্শনকারিণী বাগনাম্নী ঋষি দেবীভূতা হইয়া এরূপ বলিয়াছেন)।

চণ্ডীর দেহ কি রূপক—অতি প্রাকৃতিক ?

অঙ্গসকল দেহ নয়, তাহাদের প্রয়োজন হয় দেহ যন্ত্র গঠন করিতে—তাহারা একজন কেহ দেহের চরম পরিণতি নয়, তাহারা দেহের অংশ মাত্র এবং পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু চণ্ডীর দেহে তাহা যেন বিপরীত। দেবগণ চণ্ডীর দেহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা চণ্ডীর দেহের পৃথক পৃথক অঙ্গ হইয়াও প্রত্যেকেই পূর্ণাঙ্গ থাকিলেন। দেবতারা চণ্ডীকে নিজেদের অনুরূপ অস্ত্রসকলও দিলেন—আসল অস্ত্র দিলেন না।

সুতরাং দেবতারা চণ্ডীর একনায়কত্ব (dictatorship) মানিয়া লইলেও নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিলেন। ইহাকে যুদ্ধকালে এক নায়কের অধীনে রাষ্ট্রসমন্বয় (confideracy of states in war time) বলা যাইতে পারে।

মহিষাসুর দেবগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া যখন [illegible] তখন দেবতাগণের সম্মিলিত শক্তিতে চণ্ডীর উদ্ভব হয়। [illegible] হইয়া বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শঙ্করের যে ক্রোধ হইল তাহা (সেই তেজ) এক [illegible]তী নারী মূর্ত্তি গ্রহণ করিল। শঙ্করের তেজ দ্বারা দেবীর মুখ, [illegible] তেজে কেশ, বিষ্ণুতেজে বাহুদ্বয়, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রতেজে কটি, বরুণ [illegible] জঙ্ঘা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পাদদ্বয়, সূর্য্যতেজে পাদাঙ্গুলি, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবের তেজে নাসা, প্রজাপতিগণের তেজে দন্ত, অগ্নির তেজে তিনচক্ষু, উভয় সন্ধ্যার তেজে দুই ভ্রূ, বায়ুর তেজে দুই কর্ণ, বাকী সব সূক্ষ্ম অবয়ব অন্যান্য দেবতার তেজে গঠিত হইল। এই দেবীকে দেবতারা তাঁহাদের অস্ত্রের অনুরূপ এক একটি অস্ত্র দিলেন। শঙ্কর দিলেন দ্বিতীয় ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন দ্বিতীয় চক্র, বরুণ [illegible] দ্বিতীয় শঙ্খ, ঐরূপ অগ্নির শক্তি, পবনের ধনুক ও বাণপূর্ণ তূণীরদ্বয়, ইন্দ্রের বজ্র ও ঘণ্টা, যমের দণ্ড, জলাধিপের পাশ, দক্ষের অক্ষমালা, ব্রহ্মার কমণ্ডলু এবং সূর্য্যদ্বারা তাঁহার কিরণ সদৃশ কিরণ [illegible] হইল। তাহার পর যম খড়্গ, চর্ম্মফলক, নির্ম্মল হার, উত্তরীয় বস্ত্র, দিব্যশিরোরত্ন, কুণ্ডলদ্বয়, ললাটভূষণ ও দশ অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা নিজ কুঠারের

অনুরূপ কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্র দিলেন। জলধি তাঁহার মাথার ও বুকের পদ্মমালা ও হাতের পদ্ম দিলেন। হিমালয় দিলেন সিংহবাহন ও রত্নরত্ন। ধনাধিপ দিলেন নিজের সুরাপাত্রের অনুরূপ সুরাপাত্র * * *। দেবতারা এই দেবীর জয় ঘোষণা করিলেন, মুনিগণ স্তব করিলেন।

(চণ্ডী ৭-৩৫ শ্লোক)

সুতরাং মহিষাসুর বধ জন্য কি বিরাট শক্তি সজ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

তৎপরে দেবী মহিষাসুরকে বধ করিলেন (৪২)।

মহামানবগণ এইরূপে তাঁহাদের যুদ্ধের দেবতাকে নির্ম্মাণ করিলেন। সে মূর্ত্তিতে যেন প্রকৃতির তমঃক্ষোভ উগ্রভাবে সুপ্রকট। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের সাম্য অবস্থার নাম প্রকৃতি (গীতা ১৪।৫)। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের প্রাক্কালে এই সাম্য অবস্থা থাকে। সৃষ্টির উন্মুখ অবস্থায় একটি গুণের ক্ষোভ হয়। সত্ত্বগুণের ক্ষোভে শান্ত-ধার্ম্মিক লোকের ও শান্ত প্রকৃতির উদ্ভব হয়। রজোগুণ ক্ষোভে অসুর প্রকৃতির লোক, কর্ম্মকাণ্ড ও ব্যবসাদির প্রসার হয়। আর তমোগুণ ক্ষোভে রাক্ষস প্রকৃতির লোক, কলহ, যুদ্ধ ও পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য্য হয়। ইহার সহিত আবার কাল শক্তির সংযোগ হয়। প্রকৃতির সেই শান্ত সৌম্য রূপটিই বাঙ্গালীর দুর্গা মূর্ত্তিতে ফুটিয়া ওঠে। তাহা যেন জ্ঞান বীর্য্য ঐশ্বর্য্যময়ী একটি অপরূপ ধ্যান বিগ্রহ !

এই দুর্গাপূজায় বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সমাধি ও সুরথ—দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পূজা করেন। বাঙ্গালী রঘুনন্দন দেবীমূর্ত্তির বিসর্জ্জন (শারদার্চ্চা তত্ত্বে) পরিপাটীভাবে উল্লেখ করেন। বেণীনাথ দুর্গাপূজার উৎকৃষ্ট একখানি পদ্ধতি রচনা করেন। রামায়ণে বাল্মিকী রামচন্দ্র দ্বারা শারদীয়া পূজার উল্লেখ করেন নাই। বরং সূর্য্যপূজার উল্লেখ আছে। তবে পুরাণকার ব্যাস বলিয়াছেন, রাবণ বধের জন্য রামচন্দ্র দেবী দুর্গার অকাল বোধন করেন।

দুর্গাকে নারায়ণের ছায়া বা অংশ বলা হইয়াছে (ব্র: সং)। আবার এই নারায়ণই সূর্য্যের মধ্যস্থ হিরণ্ময় বপু। কাজেই এই নারায়ণের ছায়া সূর্য্যেরই ছায়া। বেদোক্তমতে আমাদের দুর্গা দেবী রূপক ও কাল্পনিক। দেবীর বাহন সিংহকে সূর্য্যের স্বরূপ বলা হইয়াছে (শঃ ব্রাঃ ১৪।৪।৩৭)। মহিষ ও অসুর সূর্য্যেরই নামভেদ (যজু ১২।১০৫)। সর্প হইল মেঘ বা বিদ্যুৎ (কৌ: ১৬১৭)। লক্ষ্মী বেদোক্ত সন্ধ্যা, সরস্বতী বেদের ঊষা। তাঁহারা দুই প্রান্তে আছেন···মধ্যে মহাকাল (দিনমান) মার্ত্তণ্ড (পটে আঁকা শিব)। তাঁহার পুরোভাগে প্রকাশমানা দুর্গাদেবী। সন্ধ্যায় দেখা দেয় ভূত বা জীবগণ। অথবা লক্ষ্মীর কাছে জীবগণ ভীড় করে। তাই সেখানে গণপতি গণেশ রহিয়াছেন। সন্ধ্যায় ইন্দুর ও পেচক বাহির হয়। তাহারাই গণেশ ও লক্ষ্মীর বাহন। ঊষার (সরস্বতীর, জ্ঞানের) প্রকাশে বাধা দেয় যে অন্ধকার (অসুর) তাহাকে বিনাশ করিতে সশস্ত্র কার্ত্তিকেয় সরস্বতীর পাশে বিরাজমান। প্রভাতকালের আনন্দে ময়ূর ও রাজহংস বাহির হয়। তাহাদের কার্ত্তিক ও সরস্বতীর বাহনস্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। সূর্য্যপূজা বৈদিক আচার। অগ্নি পরিবার বা শিব পরিবার একটা কল্পনা মাত্র। সেদিন আমাদের একটি সন্ন্যাসী বন্ধু চমৎকারভাবে এই কাল্পনিক চিত্রটির রহস্যোদ্ঘাটন করিয়াছেন।১

শক্তি পূজার বিবরণ সূত্রাকারে বেদের মধ্যে থাকিলেও পুরাণে তাহা বিশদভাবে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ পুরাণের ১ম ব্রহ্মপুরাণে পূর্ব্বভাগে পার্ব্বতীর জন্ম, বিবাহ ও দক্ষের উপাখ্যান। ২য়, পদ্ম পুরাণে সৃষ্টি (প্রথম) খণ্ডে পার্ব্বতীর বিবাহ। ৫ম, ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে দক্ষযজ্ঞ। ৭ম মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গাকথা। ১০ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ১ম খণ্ডে শিব সকাশে জ্ঞানলাভ ও ৩য় খণ্ডে কার্ত্তিক গণেশের জন্ম বৃত্তান্ত। ১১শ, লিঙ্গ পুরাণে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, মদন ভস্ম ও পার্ব্বতীর সহিত শিবের বিবাহ পূর্ব্বখণ্ডে আছে। ১২শ, বরাহ পুরাণে পূর্ব্বভাগে গৌরীর উৎপত্তি, মহিষাসুর বধার্থে 'ত্রিশক্তি' হইতে দেবীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য। ১৩শ স্কন্দ পুরাণে প্রথম (মহেশ্বর) খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতীর বিবাহ, কার্ত্তিকের জন্ম, মহাবিদ্যাসাধন, মহিষাসুর বধ ; তৃতীয় (ব্রহ্ম) খণ্ডে শিব মাহাত্ম্য, শবরোপাখ্যান, রুদ্রাধ্যায় ; ষষ্ঠ (নাগর) খণ্ডে লিঙ্গোৎপত্তি ও সপ্তম (প্রভাস) খণ্ডে লিঙ্গ বিবরণ। ১৪শ, বামন পুরাণে পূর্ব্বভাগে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, মদন দহন, দুর্গা চরিত, পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ ; উত্তর ভাগে মাহেশ্বরী, ভগবতী, গৌরী এবং গণেশ্বরী সংহিতা। ১৫শ, কূর্ম্ম পুরাণে পূর্ব্বভাগে দক্ষযজ্ঞ। ১৬শ মৎস্য পুরাণে পার্ব্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ এবং কার্ত্তিকের জন্ম। এবং ১৮শ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শিবপুরী বর্ণন প্রসঙ্গ আছে। ৩য় বিষ্ণু, ৪র্থ বায়ু, ৬ষ্ঠ নারদীয় এবং ১৭ম গরুড় পুরাণে শিব পার্ব্বতীর উপাখ্যান নাই বলিলেই চলে। ৮ম অগ্নি পুরাণে লিঙ্গ স্তোত্র এবং ৯ম ভবিষ্য পুরাণে শৈব সৌর প্রভৃতি উপাসক ভেদে তিথি নিয়মগুলির বর্ণনা আছে মাত্র।

কালিদাসের কুমারসম্ভব (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) এই ধারা বহন করিয়া আনে। লোকসাহিত্যে চণ্ডী কাব্যের ধারা শূন্য পুরাণের মত ও পথের অনুবর্ত্তী। তাহা বৌদ্ধপ্রভাবসম্পন্ন। ডঃ দীনেশচন্দ্রের মতে দ্বিজ জনার্দ্দন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম লেখক। কবিকঙ্কণের মতে মাণিক দত্ত ইহার "পথ পরিচয়" করাইয়াছেন। দীনেশচন্দ্র আরও বলেন যে বলরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু। তৎপরে মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য (১৫৭৯ খৃঃ) তৎপরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য (খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে)। তাহার পর রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল (খৃঃ ১৭১২-৬০)। জয়নারায়ণ সেন (লালা) ও চট্টগ্রামের মুক্তরাম সেন প্রভৃতি এই ধারাই পরিপুষ্ট করেন। কবিরঞ্জন সাধক রামপ্রসাদ সেন (খৃঃ ১৭২৩-৭৫) তাঁহার সাধন সংগীতের ভিতর দিয়া এই শাক্তধারাকে অপূর্ব্বত্ব ও মহত্ব প্রদান করেন। নবদ্বীপের পটপূর্ণিমা উৎসব সেই ধারাকেই প্রবহমান রাখিয়াছে। রাসের সময় দেবীর শত শত বিভিন্ন প্রকারের বিগ্রহ পূজা কোনো বেদ পুরাণে নাই। চৈতন্য মহাপ্রভুর (১৪৮৫-১৫৩৩) উদ্ভব ক্ষেত্র নবদ্বীপে বৈষ্ণবের প্রধান উৎসব রাসযাত্রাকে খর্ব্ব করিবার জন্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-৮৩) কর্ত্তৃক ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ উভয়েই কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। রাসের সময় নবদ্বীপের পাড়ায় পাড়ায় ঘটে-পটে দেবীর নানারূপের পূজা হইত। এখন অতিকায় দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহ সেইভাবেই ঐ সময় তথায় বিভিন্ন দেবীবিগ্রহের পূজা হয়। কিন্তু সকল পূজারই সঙ্কল্প হয় কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধরের নামে। অথচ পল্লীস্থ সকলে পূজার ব্যয় বহন করে। নবদ্বীপে শাক্ত সম্প্রদায়ের বসন্তোৎসব এই ধারারই একটি প্রবাহ। আনন্দময়ী বাসন্তী প্রকৃতি শিবের সহিত মিলিত হইয়া নব সৃষ্টির সহায়তা করিলেন—ইহাই এই উৎসবের দ্বারা সূচিত হয়। সারা বর্ষের 'গাজন' তাণ্ডবের পর উন্মত্ত পুরুষ (শিব) নবীনা প্রকৃতির (বাসন্তীর) সঙ্গে মিলিত হইয়া শান্ত হইলেন। যেন বর্ষশেষে আনন্দ ও সুখপ্রদ নববর্ষের আবাহন করা হইল। নবদ্বীপে এইরূপ বাসন্তী দশমী রাত্রে নিরঞ্জনের পূর্ব্বে শিবের সহিত বাসন্তী প্রতিমার বিবাহ হয়। পুরাণের শিবের বিবাহ এইভাবে সেখানে রূপায়িত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন—বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায়ে (among the Brahmins and their followers) প্রথমে তন্ত্রের প্রচার ছিল না (উড়িষ্যাদেশের বর্ত্তমান বৌদ্ধ সমাজ ও ধর্ম্ম গ্রন্থের ভূমিকায়)। কিন্তু আমরা দেখিতেছি নদীয়ার সমাজপতি বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হইতে এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজে তন্ত্র এবং শক্তি-পূজায় বিশেষ আধিপত্য রহিয়াছে।

১। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, দুর্গাপূজার রূপ ও ঐতিহ্য—প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯।

রামপ্রসাদের 'মা' সাংখ্যের প্রকৃতি। বঙ্কিম দেশকেই দুর্গা বলিলেন। বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২) বলিলেন—দেশ ছাড়া আর সব (দেবদেবী) ঘুমাইয়া আছে। অরবিন্দ বলিয়াছেন—দেশই শক্তি।

দেবীপুরাণ ও কালিকা পুরাণে দুর্গাপূজার বিবরণ আছে। বল্লাল সেন কিন্তু দেবীপুরাণকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়াছিলেন। দক্ষিণদেশে দেবীপুরাণ প্রচলিত ছিল না। দক্ষিণদেশ হইতে সেন রাজাগণ আসেন। তাই তাঁহারা এই গৌড়ীয় গ্রন্থকে আমল দিতে চান নাই। পুরাণগুলির পদ্ধতি এক নয়। আদি, মধ্য ও শেষে দুর্গা পূজার অনেক অঙ্গেই বেদমন্ত্র আছে। কিন্তু ঘট-স্থাপনে তিনবেদীর বিভিন্ন মন্ত্র আছে। পত্রিকা পূজায় রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান দেওয়া হয়।

নবপত্রিকাকে শাস্ত্রকার কুলবৃক্ষ বলিয়াছেন। অশোক, বকুল, বেল, আম, রুদ্রাক্ষ, পিয়াল প্রভৃতি কুলবৃক্ষ। যোগিনীরা এই সব গাছে থাকেন। ষষ্ঠীর দিন বেলগাছ তলায় দেবীর আবাহন হয়। অধিবাসের সময়ও বলা হয় বেলগাছের শাখায় দেবী তুমি অবস্থান কর এবং আরও বলা হয় দেবী তুমি নবপত্রিকা হও। নবপত্রিকা নিয়া পূজার স্থানে প্রবেশ করিবার সময় বলা হয়—বিল্বশাখাকে আশ্রয় করিয়া দেবী তুমি গণসহ এখানে অবস্থান কর। এইভাবে গাছপূজাই শেষে যূপ ও স্তূপ পূজায় দাঁড়ায়। যূপ ও স্তূপকে সূর্য্যের প্রতীক বলা হইয়াছে (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩।৫।৩৪ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২১।৫।২) এজন্য দুর্গাপূজা সূর্য্যপূজা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। পশুবলি না হইলে দুর্গাপূজা সিদ্ধ হয় না। নবমীপূজায় বলিদান কর্ত্তব্য। তবে সাত্ত্বিকী পূজার বলি নাই ইহাও বলা হয়। শরৎকালে দেবীর এই মহাপূজা হইবে। পূজায় মস্তদান ও নিজের রক্ত দিবার ব্যবস্থাও আছে। বাঙ্গালা, মিথিলা ও কামরূপে দুর্গাপূজা করিবার যোগ্যস্থান ইহাও জানা যায়। বাসন্তীপূজা শারদীয়া পূজার বিকৃতি—অতিদেশ, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সুরথ তিন বৎসর পূজা করেন। সুতরাং শরৎ, বসন্ত উভয় ঋতুতেই পূজা হইয়াছিল। বাসন্তীপূজা কিন্তু বেশী কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না।

বহু মানবের জীবন এবং সভ্যতা যখন বিপন্ন হয়, প্রাদেশিকতা, আচার ও নিষ্ঠাকে বজায় রাখিয়াও সকলে নিজের শক্তিকে একত্র করিতে পারে। সেই শক্তির পরিচালনাধীনতা (dictatorship) মহামানবগণও স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনিই তো দেশমাতা। ধনাধিষ্ঠাত্রী তিনি হইবেনই হইবেন। কারণ কেন্দ্রীভূত ধনের কর্ত্তৃত্বভার (state control of capital) না পাইলে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনে সক্ষম হইতে পারেন না। এই রাষ্ট্র নায়িকার বুদ্ধি ও জ্ঞানের নিকট মাথা নত করিতে হইবে। তিনি হইবেন সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী। সুতরাং তিনি ছাড়া আর কে জগৎস্বরূপা হইতে পারেন। সাংখ্যতত্ত্বের সহিত এই ভাব-ধারার সম্যক যোগ আছে।

এইরূপে সর্ব্বলোক যাঁহার নিকট শ্রদ্ধানত হয় তিনিই রাষ্ট্রী।

শক্তি তো প্রত্যেক জীবের মধ্যেই আছেন। মন হইতে কর্ম্মেতে শক্তির প্রকাশ হয়। মনের মধ্যেও অসুর রহিয়াছে—অহং। সেখানেও দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। এই দ্বন্দ্ব হইতে রক্ষা পাইবার দুইটি উপায় আছে। জৈন-বৌদ্ধ-শাঙ্কর মতে কর্ম্ম-সন্ন্যাস নিয়া…দ্বন্দ্ব এড়াইয়া থাকা। উপনিষৎ-গীতা-ব্রহ্মসূত্রমতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে অহংকে পরাস্ত করিয়া…অহংকে ভগবানে লীন করিয়া—আত্মসমর্পণে। মহামানবগণ অহং বধের জন্য নয়—অসুর বধের জন্য চণ্ডীর আশ্রয় নিয়াছিলেন। গীতা ও চণ্ডীতে এক-নায়কের অধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। উভয় স্থানেই পরাজয় ভীতি বর্ত্তমান…চিত্ত অসুস্থ। স্বাধীন চিন্তা তখন আসিতে পারে না।

গীতাতত্ত্বে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ বাহিরের জিনিষ। নিয়মিত রাজ্য শাসনের সঙ্গে ইহা (রাষ্ট্র) রাজাদিগের সম্পূর্ণ ভোগের বস্তু।

চণ্ডীতত্ত্বে রাজ্য প্রয়োজনীয় বস্তু—বাহিরের জিনিষ নয়। চণ্ডীর দেহ রাষ্ট্রের দেহ। চণ্ডীর প্রাণ ও মন রাষ্ট্রের প্রাণ ও মন। দেহ-প্রাণে-মনে চণ্ডী ও রাষ্ট্র এক। রাষ্ট্রের দেহে আঘাত করিলে চণ্ডীর দেহে আঘাত করা হইবে। চণ্ডীই রাষ্ট্র—রাষ্ট্রই চণ্ডী। এই চণ্ডীই বলিতে পারেন—অহং রাষ্ট্রী।

সেদিন কোনো সম্মেলনে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বন্ধু এইভাবে বলিলেন—এই যে আমরা কয়েকজন বসিয়া আছি এইখানেই চণ্ডী আবির্ভূতা হইতে পারেন, আমরা যদি এক প্রাণে একযোগে তাঁহাকে ডাকি…যদি আমরা দৃঢ়পণ করি আমাদের উদ্ধারের জন্য, তবে মহাশক্তির আবির্ভাব হইবেই হইবে।২

ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী দশভুজার মূর্ত্তিতে দেশমাতা বঙ্কিমচন্দ্রের মানসচক্ষে যখন প্রকাশিত হন তিনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। আমরা শুনিতে পাই তাহা শারদীয়া পূজার আবাহন রাত্রি। কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুসহ ডেপুটী বঙ্কিম ধনীর গৃহে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কুলপ্রথা মতো দেবী প্রতিমার সম্মুখে চণ্ডীপাঠ হইল। আহারাদির পর রাত্রে সবন্ধু বঙ্কিম নিদ্রার আশ্রয় নিয়াছেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রাত্রে তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন—একটা বাতি, একটা আলো। আলো আসিল। প্রতিমার দুইপাশে সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার একটি বাতি আনিয়া দেওয়া হইল। আর কোনো আলো হাতের কাছে ছিল না। সেই আলোতে বসিয়া বঙ্কিম ভারতের অমর জাতীয়-সঙ্গীত রচনা করিলেন।৩ অনুমান হয় ইহা ১৮৮০ খৃঃ ঘটনা। ১৮৮২ খৃঃ এই গান আনন্দমঠে সংযুক্ত হয়। ইতিমধ্যে বঙ্কিম ইহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখাইয়া-ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তখন এই বাংলা-সংস্কৃত মেশানো ভাষায় লেখা গানটির মূল্য তুচ্ছ করেন। পৃথিবীর অনেক জাতীয়-সঙ্গীতই রচনাকালে উপযুক্ত মর্য্যাদা পায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে বাঙ্গালা মায়ের রূপই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার আগে এভাবে—'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' বলিয়া দেশমাতাকে কেহ ডাকে নাই। তাই ইহা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হইল। চণ্ডীর সংরাষ্ট্রী রূপটি এই গানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

• বাঙ্গালার দ্বারপ্রান্তে আজ ঐ অসুরের হুঙ্কার। সমস্ত ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া সেই মহাশক্তিকে স্বরূপে অবতীর্ণ হইবার জন্য আমরা আবাহন করিয়াছি কি? দেবীর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে সেই মহামানবগণ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—আমাদের বিপদে শত্রু বিনাশ করিতে আবার তুমি অবতীর্ণ হইও। দেবীও যে আশ্বাস দিয়াছিলেন—তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে (চণ্ডী, ৩৯)।

২। নবদ্বীপ সাধারণ লাইব্রেরীতে 'বিজয়া-সম্মেলনে' ২০।১০।৪২ তারিখে শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতির ভাষণ।

৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি মজিলপুর (২৪ পরগণা) দত্ত বাড়িতে এই ঘটনা হইয়াছিল।

দুই পক্ষ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের কোনও একটি বড় রেলওয়ে জংশনে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুম। ঘরটি টেবিল চেয়ার গদি আঁটা চওড়া বেঞ্চি প্রভৃতি যথোচিত আসবাবে সজ্জিত। মেঝে পরিষ্কার মোজেইক করা। ঘরের প্রবেশ দ্বারে সতরঞ্চির মত পর্দা ঝুলিতেছে, পাশে আর একটি দরজার মাথার উপর লেখা—ল্যাভেটারি। রাত্রি কাল; মাথার উপর তীব্রশক্তির দুটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলিতেছে।

প্রবেশ দ্বারের দিকে পিছন করিয়া ঘরের এক পাশে একটি স্ত্রীলোক মেঝের সতরঞ্চির উপর বসিয়া পান সাজিতেছে ও মৃদু-গুঞ্জনে হিন্দী ঠুংরী ভাঁজিতেছে। সাজপোষাক ধনী শ্রেণীর বাঙ্গালী কুল কন্যার মত। সম্মুখে রূপার পানের বাটা। পিছনে কিছু দূরে কয়েকটা সুটকেস হোল্ডল বেতের ঝাঁপি প্রভৃতি ও একটা রূপার গড়গড়া রহিয়াছে; এগুলি এই স্ত্রীলোকেরই লটবহর, কারণ ঘরে অন্য কোনও যাত্রী নাই।

স্ত্রীলোকের বয়স অনুমান আটাশ বৎসর—তবু রূপের বুঝি অবধি নাই। যৌবন অপরাহ্নের দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সহসা তাহা ধরা যায় না। কী মুখের পরিণত সৌকুমার্য্যে, কী শরীরের নিটোল বাঁধুনিতে, যৌবন যেন এত রূপ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই গর্ব্বিত ও প্রভুত্ব-জ্ঞাপক; লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধা গায়িকা কেশর বাঈ যে মুগ্ধা-নায়িকা নয়, বরং অত্যন্ত সচেতনভাবে স্বাধীনভর্তৃকা তাহা তাহার রাণীর মত চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর সন্দেহ থাকে না।

পান সাজা প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় দরজার সতরঞ্চি রঙের পর্দা সরাইয়া ওয়েটিং রুমের দাসী প্রবেশ করিল। রোগা ঘাঘ্‌রা-পরা স্ত্রীলোক; হাড় বাহির করা গালের ভিতর হইতে পান দোক্তার ডেলা ঠেলিয়া আছে। বাইজীকে সে প্রথম দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল। সে অতি নিম্ন শ্রেণীর ও নিম্ন চরিত্রের স্ত্রীলোক; ওয়েটিং রুমের দাসীত্ব করাই তাহার একমাত্র উপজীবিকা নয়। তাই সমধর্ম্মী আর এক নারীর গৌরব গরিমায় সে নিজেও যেন একটা মর্য্যাদা অনুভব করিতেছিল।

বিগলিত মুখের ভাব লইয়া সে কেশর বাঈয়ের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাসী : বাঈ সাহেবা, আপনি নিজে পান সাজছেন! দিন, আমি সেজে দিই।

বাইজী তাচ্ছিল্যভরে একবার চোখ তুলিল।

কেশর : দরকার নেই। পরের হাতের সাজা পান আমি মুখে দিতে পারিনা।

দাসী মুখ কাঁচুমাচু করিল।

দাসী : তাহলে—তামাক সেজে আনি?

পানেরখিলি মুখের কাছে ধরিয়া কেশর ক্ষণেক ইতস্তত করিল।

কেশর : না থাক।

পান মুখে দিয়া কেশর বাকি পানগুলি ডিবায় ভরিতে ভরিতে একটা কোনও জিনিষ এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল। ওদিকে দাসী যাইতে চায়না, বাইজীর জন্য একটা কিছু করিতে পারিলে সে কৃতার্থ হয়।

দাসী : বাঈ সাহেবার রাত্রের খানা-পিনাও তো এখনও হয়নি। গাড়ী আসবে সেই পৌনে দশটায়—এখনও অনেক দেরী। যদি হুকুম হয় তো কেল্‌নারে ফরমাস দিয়ে আসি—

কেশর : খাবার পাট আমি চুকিয়ে নিয়েছি। ম্যানেজার সাহেব বাইরে আছেন? তুই একবার তাঁকে ডেকে দে।

দাসী : এই যে বিবি সাহেবা, এক্ষুণি দিচ্ছি। তিনি প্লাট-ফরমে পায়চারি করছেন।

দাসী ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া গেল। কেশর দুটি পান হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। পানের সহিত যে বিশেষ মশ্‌লাটিতে সে অভ্যস্ত, ঠিক মৌতাতের সময় তাহা হাতের কাছে না পাইয়া বাইজী একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

পর্দা ঠেলিয়া যে লোকটি ঘরে প্রবেশ করিল তাহার নাম বিজয়। সে যে এককালে বিত্তবান ও ভদ্রশ্রেণীর লোক ছিল তাহার চেহারা দেখিয়া এখনও অনুমান করা যায়; ধানের শীষ্‌ পাটে আছ্‌ড়াইলে শস্য ঝরিয়া গিয়া কেবল খড়ের গোছাটা যেমন দেখিতে হয়, অনেকটা সেইরূপ। শীর্ণ লম্বা লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি; মাথার সম্মুখস্থ টাকের নগ্নতা ঢাকা দিবার জন্য পাশের লম্বা চুল টানিয়া আনিয়া টাকের লজ্জা নিবারণ করা হইয়াছে। এই লোকটির চেহারা হাসি কথাবার্ত্তা সব কিছুর মধ্যেই একটু শুষ্কতা আছে। গত দশ বৎসরে নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু ও পূর্ব্বপুরুষ সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিঃশেষে কেশর বাইজীর পায়ে ঢালিয়া দিয়া এখন নিজেকেও সে বাইজীর পদমূলে নিক্ষেপ করিয়াছে। নামে সে বাইজীর বিজনেস্‌ ম্যানেজার; আসলে গলগ্রহ। বাইজীর মনে বোধহয় দয়া-মায়া আছে, তাই সে বিজয়কে তাড়াইয়া না দিয়া অন্নদাস করিয়া রাখিয়াছে। বিজয় সে কথা বোঝে; তাই তাহার নিরুদ্ধ অভিমান নিজের চারিপাশে শুষ্কতা ও নীরস ব্যঙ্গ বিদ্রূপের একটা আবরণ ফেলিয়া রাখিয়াছে।

কেশরের দিকে আসিতে আসিতে বিজয়ের অধরের একপ্রান্ত গোপন ব্যঙ্গভরে নত হইয়া পড়িল।

বিজয় : কি বাইজী, খুঁজি খুঁজি নারি? অমূল্য নিধি খুঁজে পাচ্ছ না?

কেশর ঈষৎ বিরক্তি ভরে চোখ তুলিল।

কেশর : তুমিই পানের বাটা থেকে কখন সরিয়েছ। দাও কৌটো।

বিজয় কাত করা একটা সুটকেসের প্রান্তে বসিল।

বিজয় : নেশা নেশা নেশা। দুনিয়ায় এমন লোক দেখলুম না যার একটা নেশা নেই; সবাই নেশার ঝোঁকে চলেছে। মৌতাতের সময় নেশার জিনিষটি না পেলে বড় কষ্ট হয়, না কেশর বাঈ?

কেশর : হয়। এখন কৌটো দাও।

বিজয় ধীরে-সুস্থে পকেট হইতে একটি মোনাবাই বাক্সের

আকৃতির রূপার কৌটা বাহির করিল ; সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—

বিজয় : নেশা ভাল—তাতে মৌজ আছে। কিন্তু নেশা যখন ভূতের মতন ঘাড়ে চেপে বসে তখনই বিপদ। দেখো বাইজী, নেশার পাল্লায় প'ড়ে যেন আমার মতন সর্ব্বস্বান্ত হয়ো না। আমার দৃষ্টান্ত দেখে সামলে যাও।

কেশর ভ্রূ তুলিয়া চাহিল।

কেশর : তুমি কি নেশার পাল্লায় প'ড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছ ?

বিজয় : তা ছাড়া আর কি ! ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নেশা রয়ে গেছে, কিন্তু মৌতাত আর পাওয়া যাচ্ছে না।

কেশর : তোমার মৌতাত তো মদ।

বিজয় : মদ ? উহুঁ। মদ খাই বটে—না খেলে চলেও না—কিন্তু ওটা আমার আসল নেশা নয়। আমার আসল নেশা—

বিজয় অর্থপূর্ণভাবে কেশরের মুখের পানে চাহিয়া হাসিল ; তারপর, যেন কথা পাল্টাইয়া বলিল—

বিজয় : মদের পয়সা না থাকলে মানুষ যেমন তাড়ি খায়, আমার মদ খাওয়া তেমনি—

ইঙ্গিতটা বুঝিতে কেশরের বাকি রহিল না কিন্তু সে অবহেলা-ভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—

কেশর : আবোল-তাবোল বোকো না ; কেল্‌নারে ঢুকেছিলে বুঝি ?

বিজয় : (হাসিয়া) আরে, সেখানে ঢোকবার কি জো আছে—ট্যাঁক্ যে একেবারে ফাঁক ! তাই ভাবছিলুম তুমি যদি —আজ শীতটাও পড়েছে চেপে—

কেশর : (দৃঢ় স্বরে) না। এখনও ট্রেণে অনেকখানি যেতে হবে। ঘরে মদ খেয়ে যা কর তা কর, বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ে থাক, আমি কিছু বলিনে। কিন্তু রাস্তায় ওসব চলবে না। যাও এখন, এটা মেয়েদের ওয়েটিং রুম, এখানে বেশীক্ষণ থাকলে হয় তো ষ্টেশন-মাষ্টার হাঙ্গাম করবে। বাইরে গিয়ে বসো গে—

বিজয় : (উঠিয়া) তথাস্তু। আজ নিরামিষই চলুক তাহলে। কিন্তু শাদা চোখে এই ষ্টেশনে একলা বসে ধর্ণা দেওয়া—বড়ই একঘেয়ে ঠেকবে বাইজী—

বিজয় বাহিরে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

কেশর : কৌটোটা দিয়ে যাও।

বিজয় হাসিয়া ফিরিয়া চাহিল।

বিজয় : সেটা কি ভাল দেখাবে বাইজী ! ব্রত-উপবাস যদি করতেই হয় তবে দু'জনে মিলেই করা যাক। তুমি কালিয়া পোলাও খাবে আর আমি দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকব, সেটা কি উচিত ? তুমিই ভেবে ছাখো।

কেশর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর নিঃশব্দে একটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

বিজয় : ধন্যবাদ। বড় দয়ার শরীর তোমার বাইজী। এই নাও কৌটো।

দ্রুত হস্তে কৌটা লইয়া কেশর প্রথমে দুটা পান মুখে পুরিল, তারপর কৌটা হইতে এক চিমটে মশ্‌লা লইয়া গালে ফেলিল। বিজয় দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—

বিজয় : কেশর বাঈ, তুমি লক্ষ্ণৌয়ের নামজাদা বাইজী, রূপে-গুণে টাকায়-বুদ্ধিতে, ঠাটে-ঠমকে তোমার জোড়া নেই—তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তবু বলছি, ও জিনিষটা একটু সাবধানে খেও। বিশ্রী জিনিষ। একবার একটু মাত্রা বেশী হয়ে গেলে—এমন যে ভুবনমোহিনী তুমি, তোমাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

প্রথম চিমটি মুখে দিবার সঙ্গে সঙ্গে কেশরের ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখে মুখে একটা উত্তেজনা-দীপ্ত প্রফুল্লতা দেখা দিয়াছিল ; সে আর এক টিপ্ মশ্‌লা মুখে দিতে দিতে প্রসন্ন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—

কেশর : আমার মাত্রা বেশী হবে না। তুমি এখন এস গিয়ে।

বিজয়ের মুখে কিন্তু চকিত উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছিল, সে এক-পা কাছে আসিয়া বলিয়া উঠিল—

বিজয় : মণি ! আর খেও না ! সত্যি বলছি, ওটা বড় সাংঘাতিক জিনিষ ! মণি—!

নিজের পুরাতন নামে সহসা আহূত হইয়া কেশরের নেশা-জনিত প্রসন্নতা মুখ হইতে মুছিয়া গেল ; চমকিয়া সে বিজয়ের পানে বিস্ফারিত চক্ষু ফিরাইল।

কেশর : চুপ ! ও নাম আবার কেন ?

কেশর কট্ করিয়া মশ্‌লার কৌটা বন্ধ করিল। বিজয় হাসিল ; তাহার কণ্ঠের স্বাভাবিক ব্যঙ্গ-ধ্বনি আবার ফিরিয়া আসিল।

বিজয় : মাফ্ কর বাইজী, বে-টক্করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। দশ বছরের অভ্যেস, যাবে কোথায় ? প্রথম যখন ঘর ছেড়ে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিলে, তখন 'মণি'ই ছিলে, আরও ক'বছর—যদ্দিন আমার টাকা ছিল—ঐ নামই জারি রইল। তারপর হঠাৎ একদিন তুমি মনমোহিনী কেশর বাঈ হয়ে উঠ্‌লে। ছিলাম তোমার মালিক, হয়ে পড়লাম—ম্যানেজার। কিন্তু মনের মধ্যে সেই পুরোনো নামটি গাঁথা রয়ে গেছে। মণি মণি মণি ! কি মিষ্টি কথাটি বল দেখি ? সহজে কি ভোলা যায় ?

শুনিতে শুনিতে কেশরের মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল, সে রুক্ষ স্বরে বলিল—

কেশর : আমার ভাল লাগে না। যা চুকে-বুকে গেছে তার জন্যে আমার মায়াও নেই, দরদও নেই। ওসব আগের জন্মের কথা। আমি কেশর বাঈ—এ ছাড়া আমার অন্য পরিচয় নেই। আর কখনও ও-নামে আমাকে ডেকোনা।

বিজয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল ; তারপর অলস পদে দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল—

বিজয় : এখনও তোমার ঘা শুকোয়নি বাইজী।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। কেশর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল ; তারপর কতক নিজমনেই বলিল—

কেশর : ঘা শুকোয় নি ! না, মিছে কথা। আমার কোনও আপ্‌শোষ নেই। কিন্তু—কিন্তু—যখনই ঐ নামটা শুনি—মনে হয় কে যেন পিছন থেকে ডাক্‌ছে। পিছু ডাক !

কেশর মাথা নাড়িয়া চিন্তাটাকে যেন দূরে সরাইয়া দিল, তারপর অন্যমনস্কভাবে কৌটা খুলিয়া এক টিপ্ মশলা মুখে দিবার উপক্রম করিল।

মুখে দিতে গিয়া তাহার চমক ভাঙিল। সে মশলার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া আবার উহা কৌটায় রাখিয়া দিল। তারপর

কৌটাটা পানের বাটার মধ্যে রাখিয়া দৃঢ়ভাবে কৌটা বন্ধ করিল।

কেশর: উহুঁ, আর না। বেশী হয়ে যাবে।

ওয়েটিং রুমের বাহিরে প্ল্যাটফর্মে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, পরক্ষণেই একটা ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। ইঞ্জিনের চোঁ চোঁ হড়্ হড়্ শব্দ, যাত্রীদের ওঠা নামার হুড়াহুড়ি, 'কুলী—কুলী'—'চা' 'হিন্দু পানি—' 'কাবাব রোটি—' ইত্যাদি।

গোটা দুই কুলী কয়েকটা লটবহর লইয়া ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করিল এবং মোটগুলি ঘরের অন্য পাশে রাখিয়া নিক্রান্ত হইল। ইত্যবসরে নবাগত মেল ট্রেণটিও বংশী ধ্বনি করিয়া হুস্ হুস্ শব্দে বাহির হইয়া পড়িল।

এই সময় একটি পুরুষ গলা বাড়াইয়া ওয়েটিং রুমে উঁকি মারিলেন। গায়ে ওভারকোট, মাথা ও মুখ বেড়িয়া পাঁশুটে রঙের একটি কম্ফর্টর—সম্ভবত সর্দ্দি হইয়াছে? তিনি ঘরের ভিতরটা এক-নজর দেখিয়া লইয়া, বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া সর্দ্দি চাপা গলায় ডাকিলেন—

পুরুষ: ওগো—' এই যে—এদিকে—

বাইশ-তেইশ বছরের একটি সুশ্রী যুবতী বছর দেড়েকের ছেলে কোলে লইয়া প্রবেশ করিলেন; দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিতেই সে হাঁটিয়া ভিতরের দিকে চলিল? কেশর দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল; দ্বারের নিকট পুরুষের গলার আওয়াজ পাইয়া সে কেবল মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিল।

পুরুষ: তুমি তাহলে খোকাকে নিয়ে এখানেই থাক, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেণ এসে পড়বে। কাগজ-টাগজ কিছু কিনে এনে দেব? এখনও ষ্টল খোলা আছে।

যুবতী: দরকার নেই। তোমার ছেলে সামলাতেই আমার আধ ঘণ্টা কেটে যাবে। এত রাত্তির হল, এখনও ওর চক্ষে ঘুম নেই।

পুরুষ: তাহলে না হয় ওকে আমিই নিয়ে যাই—আমার কাছে খেলা করবে।

যুবতী: না না, আমার কাছে থাক। খায়ও নি এখনও। তুমি যাও, আর ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকোনা—

পুরুষ: আমি ভাবছিলুম এইখানেই দোরের বাইরে চেয়ার নিয়ে বসে থাকি। যদি তোমার কিছু দরকার টরকার হয়—

যুবতী: কিছু দরকার হবে না আমার। সর্দ্দিতে মুখ তম্‌তম্ করছে, বাইরে ঠাণ্ডায় বসে থাকবে! যাও, ওয়েটিং রুমে দোর বন্ধ করে বোসো গে। (পুরুষ যাইবার উপক্রম করিলেন) আর শোনো—! আমি বলি কি, কেল্‌নার থেকে একটু ব্রাণ্ডি আর কুইনিনের দুটো গুলি আনিয়ে নিয়ে খেও; এই সর্দ্দির ওপর ট্রেণের ঠাণ্ডা—কি জানি বাপু আমার ভয় করছে—যদি আবার জ্বর-টর—

পুরুষ একটু ঠাট্টা করিলেন।

পুরুষ: ডাক্তারের বোন কিনা, একটু ছুতো পেলেই ডাক্তারি করা চাই। আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে। কুইনিন গেলা শক্ত হবে না—বাঙালীর ছেলে, অভ্যেস আছে—কিন্তু রমা, অন্য জিনিষটা যে গলা দিয়ে নামে না।

রমা: নামবে। লক্ষীটি খেও; ওষুধ বৈত নয়, চক্ করে গিলে ফেলবে। যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকেনা—

পুরুষ: বেশ। এর পরে কিন্তু মাতাল বলতে পাবেনা, তা বলে দিলুম।

রমা: হয়েছে, আর রসিকতা করতে হবেনা। যত বুড়ো হচ্চেন—(কপট ভ্রূকুটি করিল)

পুরুষ: ঘৃতভাণ্ড!—আচ্ছা—ট্রেণের সিগনাল দিলেই আমি আসব।

পুরুষ হাসি এবং কাশি একসঙ্গে চাপিতে চাপিতে প্রস্থান করিলেন। রমা ঘরের দিকে ফিরিয়া এক পা আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। খোকা ইতিমধ্যে ঘরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া হঠাৎ কেশরের পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই ক্ষুদ্র হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খল্‌খল্ হাস্য করিতেছে।

রমা: ওমা! ওরে ও দস্যি!

রমা তাড়াতাড়ি ছেলেকে কেশরের পৃষ্ঠ হইতে মুক্ত করিয়া লইল।

রমা: কিছু মনে করবেন না, ভারী দুরন্ত ছেলে—

কেশর সহাস্যে মাথার কাপড় সরাইয়া রমার পানে চাহিল। তাহার রূপ দেখিয়া রমার চোখ যেন ঝলসিয়া গেল; সে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল।

কেশর: তাতে কী হয়েছে! এস খোকাবাবু আমার কোলে এস।

খোকা তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া বুট-সুদ্ধ কেশরের কোলে উঠিয়া বসিল। রমা বিপন্ন হইয়া পড়িল।

রমা: ঐ দেখুন! আপনার কাপড় নষ্ট করে দেবে!

কেশর: না না, কিছু করবে না। ভারী সপ্রতিভ ছেলে তো! আর, মুখখানি কি সুন্দর, যেন গোলাপ ফুল ফুটে আছে। তোমার নাম কি খোকাবাবু?

খোকা মাতার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিল।

খোকা: মা বলে—দচ্চি।

কেশর হাসিয়া উঠিল।

কেশর: ওমা—দস্যি বলে! ভারি দুষ্টু তো তোমার মা! আচ্ছা, এবার সত্যিকার ভাল নাম কি তোমার বল তো বাবা?

খোকা একটি তর্জ্জনী তুলিয়া সমুচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল—খোকা: পিটিং কুঃ!

কেশর স্মিত সপ্রশ্ন নেত্রে রমার পানে চাহিল; রমা হাসিল।

রমা: ওর নাম প্রীতিকুমার—প্রীতিকুমার গুহ। ভাল করে' বলতে পারে না—ঐ কথা বলে।

ক্ষণেকের জন্য কেশর একটু বিমনা হইল।

কেশর: প্রীতিকুমার—গুহ! (সামলাইয়া লইয়া) বাঃ, খাসা নাম—যেমন মিষ্টি খোকা, তেমনি মিষ্টি নাম।—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না। এই সতরঞ্চিতেই বসুন। আসুন—

কেশর সতরঞ্চির উপর নড়িয়া বসিল। রমা একবার একটু ইতস্ততঃ করিল।

রমা: এই যে বসি। খোকা এখনও খাইনি, ওর খাবার নিয়ে বসি।

একটা বেতের বাক্স হইতে দুধের বোতল ও কয়েকটা বিস্কুট লইয়া রমা কেশরের কাছে আসিয়া বসিল।

রমা: আয় খোকা, দুধ খাবি—

খোকা দ্বিধা ভয়ে মাথা নাড়িল।

খোকা : দুদু খাব না—বিস্কু খাব।

রমা : আগে দুধ খাবি, তবে বিস্কুট দেব। আয়।

খোকাকে নিজের কোলে শোয়াইয়া বোতলের স্তনবৃন্ত তাহার মুখে দিতেই খোকা আর আপত্তি না করিয়া দুধ খাইতে লাগিল।

এই দুধ খাওয়ানোর ব্যাপার দেখিতে দেখিতে কেশরের মুখখানা যেন কেমন একরকম হইয়া গেল; প্রবল আকাঙ্খার সহিত ঈর্ষার মত একটা জ্বালা মিশিয়া তাহার বুকের ভিতরটা আনচান করিতে লাগিল। খোকা পরম আরামে দুধ টানিতেছে; রমা স্মিতমুখ তুলিয়া কেশরের পানে চাহিল। কেশর চকিতে মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া সহৃদয়তার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল।

কেশর : আপনারা কোন দিকে যাচ্ছেন?

রমা : আমরা দেবীপুরে যাচ্ছি। ব্রাঞ্চ লাইনে যেতে হয়, রাত্রি একটার সময় পৌঁছুব।—আর আপনি?

কেশর একটু থতমত হইয়া গেল।

কেশর : আমি—আমিও দেবীপুর যাচ্ছি।

রমা : (সাগ্রহে) দেবীপুরে! কাদের বাড়ী যাচ্ছেন?—আপনি কি ওখানেই থাকেন?

কেশরের মুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল।

কেশর : না, আমি—একটা কাজে যাচ্ছি।

রমা : ও—তাই। দেবীপুরে আপনার মত এত সুন্দর কেউ থাকলে আমি জানতে পারতুম। আমি দেবীপুরেরই মেয়ে। অবশ্য সকলকে চিনিনা, সহর তো ছোট নয়; কিন্তু—(হাসিয়া) আপনি থাকলে নিশ্চয় চিনতুম।

রূপের প্রশংসায় কেশরের কোনও দিন অরুচি হয় নাই কিন্তু আজ সে তাড়াতাড়ি কথা পাল্টাইয়া ফেলিল।

কেশর : আপনি বাপের বাড়ী যাচ্ছেন?

রমা : হ্যাঁ। সেও কাজে পড়েই যাওয়া। দাদার প্রথম কাজ—মেয়ের বিয়ে। খুব ঘটা করেই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন; খবর পেয়েছি লক্ষ্ণৌ থেকে বাইউলি আসবে। আমার দাদা দেবীপুরের খুব বড় ডাক্তার।

হঠাৎ কেশর পানের বাটার উপর ঝুঁকিয়া পান বাহির করিতে লাগিল। এই মেয়েটি যে-বাড়ীতে যাইতেছে ভ্রাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে, সেই বাড়ীতেই কেশর যাইতেছে নাচ গানের যোগান দিতে। এতক্ষণ সে রমার সহিত কথা কহিতেছিল সমকক্ষের মত, এমন কি মনের মধ্যে একটু সদয় মুরুব্বিয়ানার ভাবও ছিল; কিন্তু এখন তাহার মনে হইল সে এই মেয়েটার কাছে একেবারে ছোট হইয়া গেছে। কেশর জোর করিয়া মুখ তুলিল, জোর করিয়াই নিজের সহজ গর্ব্বকে উত্তিক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কয়েকটা পান হাতে লইয়া সে অনুগ্রহের কণ্ঠে বলিল—

কেশর : পান খাবেন?—এই নিন্।

যে অনুগ্রহ পাইয়া রাজা-রাজড়া, নবাব-তালুকদার কৃতার্থ হইয়া যায় রমা তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

রমা : আমি পান খাই না—মানত আছে।

ইতিমধ্যে খোকা দুগ্ধপান শেষ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল; তাহার হাতে বিস্কুট দিতেই সে দু'হাতে দুটি বিস্কুট লইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেশর রমাকে আর দ্বিতীয় বার পান খাইবার অনুরোধ করিল না, ভ্রূ তুলিয়া মুখের একটু বিকৃত ভঙ্গী করিয়া নিজে পান মুখে দিল। তাহার মন যে ভিতরে ভিতরে রমার প্রতি অকারণেই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলেও সে তাহা দমন করিবার চেষ্টা করিল না।

কেশর : যিনি দোর গোড়ায় তোমার সঙ্গে কথা কইছিলেন উনি বুঝি তোমার কর্ত্তা?

রমা হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

কেশর : ঠিক আন্দাজ করেছি তাহলে। কথা শুনেই বোঝা যায়—কী দরদ, কী আর্ত্তি—! কতদিন বিয়ে হয়েছে ভাই?

রমা : এই—পাঁচ বছর।

কেশর : পাঁচ বছর! বল কি? এখনও এত! পুরুষের আদর তো অ্যাদ্দিন থাকে না—তবে বুঝি তুমি দ্বিতীয় পক্ষ ভাই? শুনেছি দ্বিতীয় পক্ষের আদর ট্যাঁক্-সই হয়। কেমন, ধরেছি কিনা?

রমার মুখ একটু গম্ভীর হইল; সে খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—

রমা : হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন।

কেশর : তা—দুঃখু কি ভাই। করকরে নতুন টাকা কি সবাই পায়? হাজার হাত ঘুরে এলেও টাকার দাম ষোল আনা।—সতীন কাঁটা আছে নাকি?

রমা : না।

কেশর : ভাল ভাল। কাঁটা নেই, কেবলই ফুল—এমন দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে সুখ আছে। যাই বল।

কেশরের কথার মধ্যে যে ইচ্ছাকৃত খোঁচা আছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও রমা মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিল; কিন্তু সে হাসিমুখেই বলিল—

রমা : আমার সব খবরই তো নিলেন; আমি কিন্তু আপনার কোনও পরিচয়ই পেলুম না—

কেশর : আমার পরিচয়—?

কেশরের চোখের দৃষ্টি কড়া হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য মিথ্যা পরিচয় দিবার কথাও তাহার মনে আসিল কিন্তু সে সগর্ব্বে তাহা মন হইতে সরাইয়া দিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিয়া উঠিল।

কেশর : আমার পরিচয় শুনবে? দেখো ভাই, শিউরে উঠ্‌বে না তো? তুমি আবার কুলের কুলবধূ—

রমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কেশর আর একটা পান মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে সম্মুখে উর্দ্ধদিকে তাকাইল; তারপর যেন তাচ্ছিল্যভরেই বলিল—

কেশর : কেশর বাঈয়ের নাম শুনেছ? লক্ষ্ণৌয়ের কেশর বাঈ?

রমা ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

রমা : (ক্ষীণ কণ্ঠে) কেশর বাইজী! আপনিই—!

কেশর : আমিই। বিশ্বাস হচ্ছে না?

রমা একবার বিহ্বল-নেত্রে চারিদিকে তাকাইল; রূপার গড়গড়াটা চোখে পড়িল। তারপর সে অনুভব করিল, সে বাইজীর সহিত একাসনে বসিয়া আছে; তাহার সমস্ত শরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে হঠাৎ উঠিয়া যাইতেও পারিল না; তাহার বসার ভঙ্গীটা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল মাত্র।

রমা : তাহলে আপনি—দাদার বাড়ীতে—

কেশর রমার ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, তীক্ষ্ণ হাসিয়া বলিল—

কেশর : হ্যাঁ। গান গাইতে যাচ্চি। ভারী লজ্জার কথা—না?

রমা : না না, তা বলিনি—

রমা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, খোকা বিস্কুট খাইতে খাইতে বিস্কুটের অধিকাংশই দুই গালে মাখিয়া ফেলিয়াছিল, এই ছুতা পাইয়া রমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

রমা : ওরে দস্যি ছেলে, ও কি করেছিস—মুখময় বিস্কুট মেখে বসে আছিস্। পারিনে আমি। চল্, গোসলখানায় মুখ ধুইয়ে দিইগে—

সে খোকার নড়া ধরিয়া গোসলখানার দিকে লইয়া চলিল। কিন্তু তাহার এই চাতুরী কেশরের কাছে গোপন রহিল না; কেশর বিদ্রূপভরা স্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

কেশর : বলেছিলুম, শিউরে উঠ্‌বে। ঘরের বৌ—সতী-লক্ষ্মী—শিউরে ওঠাই তো চাই, নইলে লোকে বলবে কি! আর, একজন বাইজীর সঙ্গে এক সতরঞ্চিতে বসা—সে যে মহাপাতক। কি দুঃখু যে কাছেই গঙ্গা নেই, নইলে স্নান করে শুদ্ধ হতে পারতে!

রমা : আমি—সেজন্যে নয়, খোকাকে—

কেশর : (কঠিন স্বরে) বলতে হবেনা আমি বুঝতে পেরেছি, শাগ দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়! কিন্তু তুমি মনে কোরো না যে তোমার মর্য্যাদা আমার চেয়ে একচুল বেশী—বরং ঢের কম। কে তোমাকে চেনে? তোমার মত বৌ বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আছে—কিন্তু খুঁজে বার কর দেখি আর একটা কেশর বাঈ! তুমি যাও বড়মানুষ ভায়ের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে, আর তোমার ভাই একদিনের জন্যে এক হাজার টাকা দিয়ে খোসামোদ করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। কার মর্য্যাদা বেশী?

এই গায়ে-পড়া বচসায় রমা ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া কেশরকে লক্ষ্য করিতেছিল, শান্ত স্বরে বলিল—

রমা : আপনার মর্য্যাদা যদি বেশীই হয়—তা বেশ তো। মান-মর্য্যাদার কথা তো আমি তুলিনি।

কেশর : মুখে তোলো নি কিন্তু ঠারে ঠোরে তাই তো বলছ! কিসের এত দেমাক তোমাদের? ঘরের কোণে স্বামীর লাথি-ঝাঁটা খেয়ে তো জীবন কাটাও। তোমাদের আবার মান-মর্য্যাদা! হ্যাঁ সেকথা আমি বলতে পারি, মান-মর্য্যাদা খাতির সম্মান নিজের জোরে আদায় করেছি। কারুর দাসীবৃত্তি করে না—পুরুষ আমাকে মাথায় করে রেখেছে? এত খাতির এত সম্ভ্রম কখনও চোখে দেখেছ তোমরা?

কথা কহিলেই হয় তো ঝগড়ায় দাঁড়াইবে, তাই রমা আর কথা না বলিয়া ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

উত্তেজনায় কেশর ফুলিতেছিল, রমা চলিয়া যাইবার পর সে ক্রমশ একটু শান্ত হইল, তারপর কৌটা হইতে খানিকটা মশলা লইয়া মুখে দিল।

এই সময় একটি মাতাল দরজার পর্দার ভিতর মুণ্ড প্রবেশ করাইয়া কেশরকে দেখিয়া মহা আহ্লাদে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। লোকটির বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; গৌরবর্ণ দোহারা, মুখে একজোড়া পুরুষ্ট গোঁফ ও মাথায় চুনট্-করা শাল টুপী। বড় বড় চক্ষু দুটি অরুণাভ।

মাতাল : বন্দেগি বিবি সাহেবা। এক হাজার কুর্ণিশ! (নত হইয়া কুর্ণিশ করিল ও সেই সঙ্গে কেশরের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল) নাঃ—যা রটে তা বটে! রূপ তো নয়, যেন গন্‌গনে আগুন। অ্যাদ্দিন কানে শুনেই মজেছিলুম, এখন চোখে দেখে বুক ঠাণ্ডা হল।

কেশর : (রুক্ষ স্বরে) কে আপনি?

মাতাল : আমি—, কুলুজি গাইতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে বিবিজান, তার দরকার নেই। তবে কেও-কেটা মনে কোরো না। এখানকারই একজন জমিদার। অবস্থা আগের মত আর নেইবটে, কিন্তু—শরীফ্ আদ্‌মি। রাম তেলক সিংকে এদিকের জজ্-ম্যাজিষ্টর সবাই চেনে? একটু গান বাজনা আমোদ-আহ্লাদের সখ আছে; কতবার ভেবেছি তোমাকে আনিয়ে দু রাত্তির মুজ্‌রো শুনি? কিন্তু যা তোমার খাঁই, পেরে উঠিনি গুলবদন। আজ কেল্‌নারে দু' পেগ্ টান্‌তে এসেছিলুম, শুনলুম এই আস্তাকুড়ে তোমার পায়ের ধুলো পড়েছে। ব্যস্, চলে এলুম; আর কিছু না হোক, দেবী দর্শনটা তো হয়ে যাক।

কেশর : আপনি এখন যান; এটা মেয়েদের ওয়েটিং রুম।

মাতাল : এমনি করেই কি বুকে ছুরি মারতে হয় বাইজী! এই এলুম, এই চলে যাব? (মেঝেয় উপবেশন করিল) বিশ্বাস হচ্চে না যে আমি ভদ্রলোক? ভাবছ, ফোতো কাপ্তেন—দু'দণ্ড এয়ার্কি মেরেই কেটে পড়ব! (পকেট হইতে কয়েকটা নোট বাহির করিল) এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ। এই ভাখো এখনও পঞ্চাশ টাকা পকেটে আছে? একটি ছোট্ট গজল শুনিয়ে দাও, বুলবুল বাঈ, পঞ্চাশটি টাকা পেন্নামি দিয়ে তর্ হয়ে বাড়ী চলে যাই।

কেশর : আপনি যদি এই দণ্ডে বেরিয়ে না যান, আমি ষ্টেশন মাষ্টারকে ডেকে পাঠাব।

মাতালের মুখের গদ্গদ ভাব মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল, সে কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

মাতাল : ষ্টেশন মাষ্টারের বাবার ক্ষমতা নেই আমার মুখের ওপর কথা বলে, জুতিয়ে খাল্ খিঁচে নেব। রাম-তেলক সিংকে এদিকের সবাই চেনে; যতক্ষণ ভদ্দর লোক আছি ততক্ষণ ভদ্দর লোক, কিন্তু বাগড়া পেলে বাপের কুপুত্তুর। (রক্তনেত্রে চাহিয়া) নাও, আর দেরী কোরো না, ঝাঁ করে একটা গেয়ে ফ্যালো—

কেশর : আমি গাইব না। আপনি যান।

মাতাল : (নিজের উরুতে চাপড় মারিয়া) গাইবে না কি আলবৎ গাইবে! পয়সা দিচ্ছি—গাইবে না। ব্যবসাদার মেয়েমানুষ তুমি, যখন হুকুম করেছি, গাইতে হবে।

অসহায় ক্রোধে ও আশঙ্কায় কেশরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। এই সময় গোসলখানার দরজা খুলিয়া খোকা কোলে রমা বাহির হইয়া আসিল।

একজন পুরুষকে ঘরের মধ্যে কেশরের অতি নিকটে বসিয়া

থাকিতে দেখিয়া রমা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ; আঁচলটা মাথার উপর টানিয়া দিয়া তীক্ষ্ণ অমুচ্চ কণ্ঠে বলিল—

রমা : এ কি ! এ ঘরে পুরুষমানুষ কেন ?

মাতাল রমাকে দেখিয়া ক্ষণকাল বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল, তারপর ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মাতাল : অ্যাঁ ! এ যে—এ যে—! (হাতজোড় করিয়া) মাফ্ করবেন মা লক্ষ্মী—আমি জানতুম না—ভেবেছিলুম কেবল বাইজীই ঘরে আছে। মাফ করবেন, আমি যাচ্ছি। (যাইতে যাইতে ঘুরিয়া) আমি ভদ্দর লোকের ছেলে, ঘরে ভদ্রমহিলা আছেন জানলে এ বেয়াদবি আমার দ্বারা হত না। আমি যাচ্ছি।

লজ্জিত মাতাল চলিয়া গেল। রমা খোকাকে ছাড়িয়া দিয়া একটা চেয়ারে বসিল। মর্য্যাদায় কে বড়, একটা মাতাল এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছে ; কেশর আর মুখ তুলিয়া রমার পানে চাহিতে পারিল না। রমার মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বোঝা গেল না কিন্তু কেশরের অহঙ্কার যে ধিক্কার ও অপমানে মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না।

ইহাদের মধ্যে আবার আলাপ আরম্ভ হইবার আর কোনও সূত্রই ছিল না। দুইজন বিভিন্ন জগতের অধিবাসীর মধ্যে ক্ষণিকের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে ; রমা গায়ে পড়িয়া এই পতিতার সহিত আবার আলাপ আরম্ভ করিবে তাহার এমন প্রবৃত্তি নাই। কেশরের বলিবার কিছু নাই। সুতরাং বাকি সময়টা হয় তো ইহাদের নীরবেই কাটিয়া যাইত ; কিন্তু যিনি লজ্জা ধিক্কার শুচিতা অশুচিতার অতীত, সেই শিশু ভোলানাথ গোল বাধাইলেন। খোকা স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠ, নির্ব্বিকার চিত্তে কেশরের কোলে গিয়া বসিল।

খোকার এই অর্ব্বাচীনতায় রমা সচকিতে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। কেশরের বুকের মধ্যে রোদনের মত একটা বাষ্পোচ্ছ্বাস গুমরিয়া উঠিল ; তাহার ইচ্ছা হইল, পরম নিষ্পাপ, নবনীতের মত কোমল এই শিশুটিকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরে। কিন্তু সে খোকাকে দুই হাতে কোল হইতে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া ভারী গলায় বলিল—

কেশর : না বাবা, তুমি আমার কোলে এসো না ; তোমার মা হয় তো এখনি তোমায় নাইয়ে দেবেন—

ইহা তেজের কথা নয়, অভিমানের কথা। মুহূর্ত্তে রমার মন গলিয়া গেল।

রমা : না না, থাক না আপনার কাছে—কী হয়েছে ? আমার ওসব—কুসংস্কার নেই।

কেশর তিক্ত হাসিল কিন্তু খোকাকে আবার কোলে বসাইল।

কেশর : ওটা কথার কথা। কিন্তু সে থাক, তোমার ভাল-মন্দ তোমার কাছে, আমার ভাল-মন্দ আমার কাছে—কেউ তো কারুর ভাগ নিতে পারবে না। তবে—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, দুনিয়াও ঢের বেশী দেখেছি। মানুষ যা বলে তা সব সময় সত্যি নয়, মানুষ যাকে যে চোখে ছাখে তাও সব সময় সত্যি ছাখা নয়।—

রমা : কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কেশর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিল, খোকার মাথায় একবার হাত বুলাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

কেশর : তোমার জীবন আমার অজানা নয়। আমিও একদিন তোমার মত ঘরের বৌ ছিলুম—স্বামীর ঘর করেছি। কিন্তু ভগবান ঘরের বৌ ক'রে আমাকে সৃষ্টি করেন নি। ভগবান আমাকে অসামান্য রূপ অসামান্য গুণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন, নিজের মুখে বললেও একথা সত্যি। যৌবনের আরম্ভে যখন নিজের কথা নিজে ভাবতে শিখলুম, তখন দেখলুম —এ আমি কোথায় কোন্ অন্ধকার কূয়োর মধ্যে পড়ে আছি ! এর চেয়ে ঢের বড় যায়গা, খোলা যায়গা আমায় ডাকছে। এখানে আমার স্থান নয়, আমার স্থান অন্য আসরে।—লোকে আমাকে কুলটা বলতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে, কিন্তু কী আসে যায় ? কাঁটা তো সর্ব্বত্রই আছে ; তোমার পথেও কাঁটা আছে, আমার পথেও কাঁটা আছে। আমার সান্ত্বনা এই যে, নিজের স্থান আমি বেছে নিয়েছি, নিজের আসন আমি অধিকার করেছি।

রমা গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল ; তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খোকা ইত্যবসরে কেশরের কোলে শুইয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। তারপর রমা হঠাৎ হাত হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল—

রমা : আপনি সুখী হয়েছেন ?

কেশর : সুখী ? হয়েছি বৈকি। অন্তত ঘরের কুলবধূ হয়ে থাকলে এরচেয়ে বেশী সুখী হতাম না একথা জোর করে বলতে পারি।

রমা : আমি বিশ্বাস করিনা ; আপনি সুখী হন নি।—আপনি যার লোভে এ পথে পা দিয়েছিলেন তা পান নি, আপনার জাতও গেছে পেটও ভরেনি।

কেশর ক্ষণেক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল ; এতটা স্পষ্ট-বাদিতা সে নরম-স্বভাব রমার কাছে প্রত্যাশা করে নাই। তাহার মন আবার যুদ্ধোন্মুখ হইয়া উঠিল।

কেশর : ওটা তোমার কুসংস্কার, বুদ্ধি-বিবেচনার কথা নয়।

রমা : (দৃঢ়স্বরে) না, বুদ্ধি-বিবেচনারই কথা। সংসার করতে হ'লে শুধু কুসংস্কারের ওপর ভর দিয়ে বসে থাকলে চলেনা, একটু-আধটু ভাবতেও হয়। আমি আপনার চেয়ে বয়সে অভিজ্ঞতায় ছোট হতে পারি, কিন্তু আমাকেও অনেক কথা ভাবতে হয়েছে। আপনি স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, মান যশ মর্য্যাদা চেয়েছিলেন, মেনে নিলুম। স্বাধীনতা খুব বড় জিনিষ, মান-মর্য্যাদাও তুচ্ছ নয় ; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, মানুষের স্নেহ ভালবাসা শ্রদ্ধা মমতা—এ সবের চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। এ সব তো উপলক্ষ। আপনার রূপ-যৌবন আছে জানি ; গুণও নিশ্চয় আছে—শুনেছি আপনি খুব ভাল নাচতে গাইতে পারেন—কিন্তু এ-সব তো চিরদিনের নয় ; আজ আছে কাল শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু জীবন সেই সঙ্গে শেষ হবে না। তখন ? (একটু চুপ করিয়া) দেখুন, কেবল যৌবনের কথা ভেবে সারা জীবনের ব্যবস্থা করা তো বুদ্ধিবিবেচনার কাজ নয়। এর পর শুধু শুকনো স্বাধীনতায় আপনার মন ভরবে কি ? ভরবে না। কারণ আপনিও চান মানুষের স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা-মমতা। আর তা পাননি বলেই আপনার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

কেশর : কে বলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। মিথ্যে কথা। আমি মানিনা।

রমা : (শান্তস্বরে) না মানুন। কিন্তু আপনি মনে জানেন, যা পেয়েছেন তা তুচ্ছ ; আর যা হারিয়েছেন তার জন্যে আপনার বুকে অসীম বেদনা লুকিয়ে আছে—আমি দেখতে পাচ্ছি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) খোকা কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

কেশর কোলে খোকার পানে চাহিল ; সহসা তাহার দেহ-মন যেন কোন্ দুরন্ত নিপীড়নে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সে বাষ্পবিকৃতকণ্ঠে বলিল—

কেশর : হ্যাঁ। তুমি নেবে ?

রমা : না, থাক আপনারই কোলে। এখন তুল্‌তে গেলে হয় তো জেগে উঠ্‌বে।

কেশর একদৃষ্টে খোকার ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; সে যখন চোখ তুলিল তখন তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কেশর : (রুদ্ধস্বরে) আর কিছু না, যদি এম্‌নি একটি খোকাকে পৃথিবীতে আন্‌বার অধিকার আমার থাকত—!

রমা তাহার পাশে নতজানু হইয়া বসিল, আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—

রমা : আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বড় অভিমানী, লজ্জার মধ্যে অপমানের মধ্যে আপনি একটি নিষ্পাপ শিশুকে টেনে আনতে পারবেন না। (উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস ফেলিয়া) বড় নিষ্ঠুর সংসার। কত লোক কত ভুল করে, সব শুধ্‌রে যায় ; কিন্তু মেয়েমানুষের এ ভুলের যে ক্ষমা নেই দিদি।

কেশর : (চোখ মুছিতে মুছিতে) বোলো না—দিদি বলে ডেকো না—ও নামে আমার অধিকার নেই। আমি কেশর বাইজী—

বাহিরে ট্রেণ আসিবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে রমার স্বামী হন্তদন্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। গলায় গলাবন্ধ নাই, এবার তাঁহার মুখাবয়ব ভাল করিয়া দেখা গেল। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সের একটি অতি সাধারণ মানুষ।

রমার স্বামী : ট্রেণ এসে পড়েছে, রমা, ট্রেণ এসে পড়েছে। খোকা কৈ ?

বলিতে বলিতে তিনি রমা ও কেশরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষণকাল কেশর ও রমার স্বামী পরস্পরের পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন ; তারপর রমার স্বামী একপা পিছাইয়া আসিলেন—

রমার স্বামী : মণি—!

বিদ্যুতাহতের মত কেশর দু'হাতে মুখ ঢাকিল। রমা চমকিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

রমা : কি ! কে ইনি ? তুমি এঁকে চেনো ? কে ইনি ?

ক্ষণিকের মূঢ়তা ভাঙিয়া রমার স্বামী ক্ষিপ্রহস্তে ঘুমন্ত ছেলেকে কেশরের কোল হইতে ছিনাইয়া লইলেন ; তারপর রমার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—

রমার স্বামী : চলে এস রমা—

রমা : (ব্যাকুলস্বরে) কিন্তু—কে ইনি ?

রমার স্বামী : কেউ না—কেউ না—তুমি চলে এস।

রমাকে একরকম টানিতে টানিতেই তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছিল। দুইটা কুলী দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া রমাদের বাক্স-বিছানা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কেশর এতক্ষণ মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল, এখন মুখ খুলিয়া হঠাৎ হাসিতে আরম্ভ করিল। হিষ্টিরিয়ার হাসি, কিছুতেই থামিতে চায় না। অবশেষে হঠাৎ হাসি থামাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল ; চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, মুখে একটা ব্যঙ্গ-বিকৃত ভঙ্গী। কেশর মশ্‌লার কৌটা উজাড় করিয়া হাতের উপর ঢালিল।

এই অবসরে বিজয় চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, কেশর সমস্ত মশ্‌লা মুখে দিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে ছুটিয়া আসিয়া কেশরের হাতে চাপড় মারিয়া মশ্‌লা ফেলিয়া দিল।

বিজয় : এ কি ! পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

কেশর : পাগল ! না পাগল হইনি। ওরা চলে গেছে ?

বিজয় : ওরা ! কারা ?

কেশর : না না, কেউ নয়। ওরা তো এই গাড়ীতেই যাবে।

বিজয় : আমরাও তো এই গাড়ীতেই যাব। দেরী কিসের ? এখনি গাড়ী ছেড়ে যাবে—

কেশর : যাক ছেড়ে ! বিজয়, আমি দেবীপুরে যাবনা।

বিজয় : দেবীপুরে যাবেনা !

কেশর : না—ফিরে যাব।

বাহিরে হুইস্‌ল্ দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কেশর উৎকর্ণ হইয়া গাড়ীর আওয়াজ শুনিতে লাগিল। বিজয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ীর আওয়াজ দূরে মিলাইয়া গেলে বিজয় সুটকেসের কোণের উপর বসিল।

বিজয় : কেলনারে একলা বসে বসে একটু চোখ লেগে গিয়েছিল। এখন ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি বাইজী।

কেশর : (সম্মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া) ব্যাপার ! কিছু না। কয়েকজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হল।

বিজয় : চেনা লোক ?

কেশর : হ্যাঁ—চেনা লোক—

কেশর একটু একটু হাসিতে আরম্ভ করিল ; ক্রমে তাহার হাসি বাড়িতে লাগিল—উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে।

হিষ্টিরিয়ার হাসি।

অনুরোধ

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী বি-এ

বহুমূল্য আবরণে, বুঝাঁতে অবুঝ জনে,
সাজায়ো না কবর আমার ;
তৃণগুচ্ছ আচ্ছাদন, সে যে মোর অমূল্যধন,
দীন আত্মা জহান্-আরার ।*

* (পুরাতন দিল্লীতে জহান্-আরার সমাধি-গাত্রে খোদিত তাহার স্বরচিত পারশী কবিতা হইতে অনূদিত।)

বারাণসীর বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

সমগ্র জগতের সুপ্রাচীন নগর ও নগরীর মধ্যে বারাণসী যে অন্যতম বা প্রাচীনতম, এ কথা সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বৈদিক সাহিত্যে, পুরাণ-সাহিত্যে, প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে কাশী ও বারাণসীর কথার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্র

ধর্ম্মচক্র-মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি

শক্তিতে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, ধর্ম্ম চর্চ্চায়, শিল্পে বাণিজ্যে কাশী রাজ্য একদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বারাণসীর গৌরবের উত্থান-পতনের স্বল্পায়তন ইতিহাস ও সেই সঙ্গেই বর্ত্তমান বারাণসী নগরীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বর্ণনা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"বারাণসী" এই নামের উৎপত্তি সকলেই অবগত আছেন। 'বরণা' ও 'অসি' এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই নগরীর নাম "বারাণসী"। (১) পূর্ব্বে কিন্তু কাশী রাজ্যের রাজধানী গঙ্গা ও গোমতী নদীর মোহানার উপর স্থাপিত ছিল। (২) কাশীরাজ্যের রাজধানীরূপেই বারাণসী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। (৩) বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে আয়ু বংশীয় সুহোত্র পুত্র কাশ প্রথম রাজা। তৎপুত্র কাশিরাজ বা কাশ্য। সম্ভবতঃ এই কাশিরাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য 'কাশি' বা 'কাশী' নামে বিখ্যাত হয়। (৪) বারাণসীর আরও কয়েকটী নাম পাওয়া যায়, যথা—সুরন্ধন, সুদর্শন, ব্রহ্মবর্দ্ধন, পুষ্পবতী, রম্য।

নৃপতি কাশের বংশধরের নাম ছিল ধন্বন্তরী। সেই ধন্বন্তরী—যিনি চিকিৎসা জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন, যিনি হিন্দু আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কর্ত্তা। ধন্বন্তরীর ঔরসে কেতুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। মহাভারতে ধন্বন্তরীর পৌত্র বা প্রপৌত্র ছিলেন রাজা দিবোদাস। ইঁহার সময়েই কাশীরাজ্যের সহিত ত্রিপুরীর হৈহয় রাজ্যের একটী দীর্ঘকাল-ব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে হৈহয়গণ কাশী সেনানীর নিকট বিশেষরূপে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া নিজের জাতি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই সব ঘটনা ঘটে ভারত যুদ্ধের অনধিক পূর্ব্বে। সুতরাং ঠিক ঐতিহাসিক যুগের প্রমাণ বলে এইগুলিকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে ভরসা হয় না।

ভারত যুদ্ধের এক শতাব্দী পূর্ব্বে মগধের পরাক্রান্ত নরপতি জরাসন্ধ বারাণসীকে নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। তবে বারাণসী বেশীদিন তাঁহার অধীনে থাকে না। জরাসন্ধের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই কাশীরাজ্য মস্তক উত্তোলন করে। ভারত যুদ্ধে 'বীর্য্যবান্ কাশীরাজ' ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করেন ও সেই মহাহবে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

প্রাগ্বৌদ্ধ যুগে ব্রহ্মদত্ত রাজবংশ কাশীতে রাজত্ব করিতেছিল। বহু বৌদ্ধ জাতকে কাশীর নৃপতি ব্রহ্মদত্তের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কাশী রাজ্য এই সময়ে পূর্ব্বে পঞ্চাশ ক্রোশ, পশ্চিমে ৭৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জাতক হইতে আরও জানা যায় যে, কাশীর সেনানীগণ তক্ষশিলা পর্য্যন্ত গমন করেন, মিথিলার অপরান্ত বিদেহ

বিশ্বনাথ মন্দির

রাজ্যও কাশীর অধীনস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু কাশীর এই সাম্রাজ্য গৌরব বেশীদিন অটুট থাকিল না। কোশল রাজ্যের সহিত সাময়িক কলহে

(১) বামন পুরাণ, ৩য় অধ্যায়।
(২) মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়।
(৩) রামায়ণ, উত্তরা কাণ্ড, ৪৮ অধ্যায়।
(৪) জাতক, চতুর্থ খণ্ড, ৭৫।

কাশীর স্বাধীনতা পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ হইল। অচিরে বারাণসী প্রবলতর কোশল-নরপালের করতলগত হইয়া পড়িল। কাশীর এই পরাজয় ঘটে খৃঃ পূর্ব্ব ৬৫০ সালে।

কাশীরাজ্য কোশলরাজের অধিকারে আসিবার পরেই কোশল রাজকন্যা মগধাধিপতি বিম্বিসারের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং

মণিকর্ণিকা ঘাট

বারাণসীর রাজকর ঐ রাজদুহিতার পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ধার্য্য করা হয়। এই সময় হইতে বারাণসী মগধরাজ্যভুক্ত হইল। মহারাজ অজাতশত্রুর সহিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে যদিও অল্পদিনের জন্য বারাণসী কোশলরাজের অধীনে আসে কিন্তু অবশেষে বারাণসী বহুশতাব্দীর জন্য মগধরাজ্যেরই অধীনে চলিয়া গিয়াছিল। নন্দ, মৌর্য্য এবং শুঙ্গ ইত্যাদি সকলেই মগধের রাজবংশ ছিল এবং এই সকল রাজবংশ বারাণসীর উপর রাজত্ব করিতেন। কুশান রাজত্বের সময় কণিষ্ক প্রভৃতি নৃপতিগণ বারাণসীর উপর তাঁহাদের আধিপত্যের ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। সারনাথে প্রাপ্ত কণিষ্কের একখানি প্রস্তরলিপিতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ক্ষত্রপ, বনস্পর বারাণসীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং খরপল্লান এই প্রদেশের কণিষ্কের প্রতিনিধি ছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বারাণসী গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সারনাথে গুপ্তদিগের বহু শিল্প কীর্ত্তি তাঁহাদের রাজত্বের গৌরব বহন করিতেছে। এই সময়েই বারাণসী শিল্পের একটী কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সারনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শন—ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি গুপ্তশিল্পের অতুল কীর্ত্তি।

গুপ্তরাজগণের পরে মৌখরী বংশের রাজন্যবর্গ কান্যকুব্জ হইতে বারাণসী শাসন করিতেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বারাণসী মহারাজা হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মুখ্যভাবে হর্ষের সময়কার বিশেষ কোন শিল্পকীর্ত্তি বারাণসীতে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে সারনাথের ধামেক-স্তূপ এই সময়েই সংস্কারপ্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে কান্যকুব্জের নরপতি যশোবর্ম্মা বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই পাল নরপালগণ বঙ্গদেশে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহীপাল এবং ধর্ম্মপাল কাশীতে যে রাজত্ব করেন তাহার বহুবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে পাল-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট-দ্বন্দ্বে বারাণসী এক একবার এক একজনের হস্তে হস্তান্তরিত হইতেছিল। উত্তরকালে প্রতিহারগণই বারাণসীর অধিকার বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার উপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রতিহার শক্তি যখন অধঃপতিত হইল, তখন ত্রিপুরীর চেদীরাজগণ বারাণসী অধিকার করিলেন।

চেদিরাজ গাঙ্গেয়দেবের রাজত্বকালেই (১০১৫—১০৪১) বারাণসী সর্ব্বপ্রথম মুসলমান আক্রমণে কলুষিত হয়। মামুদ গজনীর পুত্র মাসুদের প্রধান সেনাপতি নিয়ালত্গিন ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে অপ্রত্যাশিতভাবে বারাণসী নগরীর উপর আক্রমণ করেন এবং নগরীর বহু দোকান পসার, বাজার প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। চেদীরাজ্যের তিরোধানের পর গাহড়বাল্ বংশীয় রাজা চন্দ্রদেব বারাণসীতেই তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করেন। পরবর্ত্তীকালে তিনি কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া সেইখানেই তাঁহার রাজধানী অপসারিত করেন। কিন্তু তথাপি বারাণসী বহুদিন ধরিয়া গহড়বালগণের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এইরূপ নানা কারণে দ্বাদশ শতাব্দীতে বারাণসীর সমধিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান কালের কাশী ষ্টেশনের উত্তরস্থ কেল্লার সমস্ত ভূভাগ গাড়োয়াল রাষ্ট্র-চক্রের কেন্দ্রস্থল ছিল। গত বৎসরের খননে এই সময়কার বহু প্রাচীন দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গাড়োয়াল রাজত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীরও গৌরব অস্তাচলে গেল। এই বংশের শেষ নৃপতি জয়চন্দ্র মহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও পরাজিত হন। ঘোরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবেক ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসী আক্রমণ করিয়া প্রায় সহস্রাধিক মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করেন এবং তৎস্থলে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। প্রায় ১৪০০শত উটের পিঠে বোঝাই হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সহর হইতে চলিয়া যায়। অতঃপর তুর্ক রাজত্বের সময়ে জৌনপুর ও গাজীপুরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বারাণসীর পূর্ব্ব-গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়ে বারাণসী বহুবার লুণ্ঠিত হইয়াছিল, মন্দির দেবালয় ভূমিসাৎ হইয়াছিল। আলাউদ্দিন খিলিজী ও ইব্রাহিম লোদীও বারাণসী লুণ্ঠন করেন। সম্ভবতঃ শার্কি রাজত্বের সময় বারাণসীর মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারই ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দিয়া জৌনপুরে প্রধান প্রধান মসজীদ নির্ম্মাণ করা হয়।

মুঘল রাজত্বে বারাণসীর ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হইল। বাদশাহ আকবর হিন্দুদিগের উপর বিরূপ ছিলেন না। সেই কারণে কাশীর হিন্দুগণ বড় বড় মন্দির ও শিলাময় ঘাট প্রকাশ্যভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা টোডরমল বিশ্বনাথের নব মন্দির রচনা করেন। শাজাহান হিন্দুদিগের মন্দির-নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন এবং ৭৬টি অর্দ্ধনির্ম্মিত মন্দির বারাণসীতে ভাঙ্গিয়া দেন। ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মনীতি আরও পাশবিক ছিল। তিনি আদেশ দিলেন যে হিন্দুদিগের পবিত্রতম দেবালয় বিশ্বনাথের মন্দির অবিলম্বে ধ্বংস করা হউক এবং তৎস্থলে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করা হউক। এই আদেশ ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইল। বর্ত্তমান জ্ঞানবাপী মসজিদ ঔরঙ্গজেবের নির্ম্মম হিন্দু-বিদ্বেষের সাক্ষ্যদান করিতেছে। বিশ্বনাথের মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীর বহু মন্দিরই বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বারাণসীর কোনও মন্দিরই প্রাচীনতার দাবী রাখে না।

ঔরঙ্গজেব বারাণসীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার মুহম্মদাবাদ নাম রাখেন, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান গ্রন্থে ও অযোধ্যার নবাবদিগের সনদে

বারাণসী মুহম্মদাবাদ নামেই চলিয়া আসিয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী অযোধ্যার সুবেদারের অধীন হইলেও একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া অভিহিত ছিল।

দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহ বাদশাহ হইবার পর হিন্দুর পবিত্র স্থান বারাণসী হিন্দুরাজের অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসীর ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নামক গ্রামের জমিদার মনসারামকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার পুত্র রাজা বলবন্ত সিংহ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিয়া বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুহম্মদ শার মৃত্যুর পর বারাণসী সম্পূর্ণরূপে অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত হয়। তথাকার মুসলমান সুবেদারগণ এমন কি সুজাউদ্দৌলা পর্য্যন্ত বলবন্ত সিংহকে নানাভাবে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বলবন্ত রামনগরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। এদিকে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তখনকার নবাব মীরজাফর বৃটীশ সৈন্য সাহায্যে পাটনায় উপস্থিত হন। পরবৎসরে সুজাউদ্দৌলা বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করেন। এই সময়ে মীরজাফর বলবন্তের সাহায্য প্রার্থনা করায় রাজা বলবন্ত সৈন্যদ্বারা বঙ্গেশ্বরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্ আলম্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে বলবন্ত সিংহ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার এক ক্ষত্রিয় রমণীর গর্ভজাত চেৎসিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসী বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অধীন হইল, পরবৎসর চেৎসিংহ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এক সনন্দ পাইল। অতঃপর ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ইয়োরোপের যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ বার্ষিক কর ব্যতীত আরও পাঁচ লক্ষ টাকা চেৎসিংহের নিকট চাহিয়া পাঠাইলেন। দ্বিতীয় বর্ষে এই দাবীর টাকা দিতে বিলম্ব হওয়ায় হেষ্টিংস্ ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে কাশী আক্রমণ করিলেন। চেৎসিংহ নিরুপায় হইয়া রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যার অনুরোধে, হেষ্টিংস্ চেৎসিংহের দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। সেই মহীপনারায়ণের বংশধরই বর্ত্তমান কাশীর মহারাজা। মহারাজা আদিত্যনারায়ণের মৃত্যুর পর বর্ত্তমানে কাশীরাজ্য গভর্ণমেণ্টের অধীনে আছে এবং নাবালক মহারাজা অন্যত্র অধ্যয়নাদি করিতেছেন।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে বারাণসী বৈদিক যুগেও বর্ত্তমান ছিল। কালের খাতায় যুগের পর যুগ চলিয়া গেলেও তাহাদের চিহ্ন সকল অক্ষরে অক্ষরে অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইতিহাস বারাণসীরও মণীষীগণের ভাবধারা ও শিল্পীগণের শিল্পধারা সযত্নে তাহার পত্রে পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

দশাশ্বমেধ ঘাট

মানবেতিহাসের ঊষাকালে—বৈদিক যুগে কোন কোন ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এই বারাণসীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বারাণসীর একজন নৃপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৃৎসমদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনে হয় ২৭০০ খৃঃ পূর্ব্বে বৈদিক ধর্ম্ম কাশীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে সর্ব্বপ্রথম কাশী শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (১) সেই অতি প্রাচীন সময়ে কাশী একটি বিস্তৃত জনপদ এবং পবিত্র যজ্ঞভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে প্রতর্দ্দন একজন পরম যাজ্ঞিক রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক। (২) উপনিষদিক যুগে

দুর্গাবাড়ীর মন্দির ও কুণ্ড

বেদান্তচর্চ্চার জন্য বারাণসী অসীম খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। কাশীর নৃপতি অজাতশত্রু তাঁহার রাজধানীতে দার্শনিক বিচারের একটি কেন্দ্রস্থল

(১) "যজ্ঞং কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব", —শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩—৫৪২১

(২) রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ৪।১৫-১৭

করিয়াছিলেন। সে সময়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের ভূমিরূপে বারাণসী রাজা জনকের মিথিলার সহিত প্রতিযোগিতা করিত। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান ছিল—একটি বারাণসীতে, অপরটী তক্ষশিলায়।

বলা বাহুল্য বারাণসী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের ভারতের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র স্থান বলিয়াই বুদ্ধদেব এই স্থানেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের স্থান স্থির করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্ম উপদেষ্টাই জানিতেন যে বারাণসী যদি তাঁহাদের উপদেশ না গ্রহণ করে, তাহা হইলে সমগ্র দেশ তাহা গ্রহণ করিবে না। এই কারণেই শঙ্করাচার্য্য বহুদূর মালবার হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার নূতন দর্শন বারাণসী দ্বারা সমর্থিত করেন।

চৈনিক পর্য্যটক হুয়েন্‌সাং বারাণসীর হিন্দুগণের গভীর বিদ্যাবত্তা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে যেরূপ নবদ্বীপ সংস্কৃত বিদ্যার রাজধানী, সেইরূপ বা ততোধিক বারাণসী ভারতের সংস্কৃত শিক্ষার রাজধানী। কত সংস্কৃত গ্রন্থ যে বারাণসীতে রচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। মুসলমান রাজত্বেও সংস্কৃত বিদ্যা বারাণসী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বহু দক্ষিণী পণ্ডিত কাশীতে আসিয়া বসবাস করেন। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র এবং বেদান্তশাস্ত্রের উপর বহু সংস্কৃত গ্রন্থ বারাণসীতেই রচিত হয়। ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারাশিকো দেড়শত বারাণসীর পণ্ডিতকে বেতন দিয়া সমগ্র উপনিষদের ফার্সী ভাষায় ভাষান্তর করাইয়াছিলেন।

ভক্তি দর্শনেও বারাণসীর দান সামান্য নহে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভক্ত সাধু রামানন্দ বারাণসী ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি পঞ্চগঙ্গা ঘাটের নিকটেই বাস করিতেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে তাঁহার দুই বিখ্যাত শিষ্য কবীর এবং রুইদাস এই নগরেই জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ভক্তকবি তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিতমানস' রচনা করিয়া সমগ্র দেশকে রামভক্তিতে আপ্লুত করেন। গুরু নানক এবং শ্রীচৈতন্যও বারাণসীতে পদার্পণ করিয়া এই নগরীতেই তাঁহাদের ধর্ম্ম ও জ্ঞানের উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিয়া যান।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রাচীনকাল হইতেই বারাণসীর সাড়ী ও রেশমী কাপড় সমস্ত ভারতে বিখ্যাত ছিল। রং এবং বয়নশিল্পে এই সকল সাড়ী এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে একদিন সিন্ধুদেশ, বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও মাদ্রাজের মহিলাগণ ইহা পরিধান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন। গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈল বারাণসীর আর একটী প্রাচীন শিল্প। এগুলিও অতি প্রাচীনকালে বারাণসী হইতে দেশদেশান্তরে প্রেরিত হইত। এই সময়ে বারাণসীতে হস্তিদন্তের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও শিল্পরূপে আদৃত হইত। গুপ্তযুগে ভাস্কর্য্য শিল্পের একটী কেন্দ্র এই বারাণসী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখক 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চিনি ও সোরার ব্যবসা চলিতেছে। কাশীর শাল, নানাপ্রকার জরির কাপড় এবং কাঠের খেলনা প্রসিদ্ধ। পিত্তল ও তাম্রের নানাবিধ বাসনপত্র এবং কারুকার্য্যখচিত ঘর সাজাইবার জিনিষপত্র এখান হইতে অনেকেই দেশদেশান্তরে লইয়া যান। ক্রমশঃ

কুনুর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি চলে যাবো হে বন্ধু মোর
দীর্ঘ তোমার স্থিতি,
বরষ বরষ আনিবে বন্যা
উদ্দাম কলগীতি।
এমনি করিয়া ডুবে যাবে কাশবন,
ঘাট মাঠ বাট দীন গৃহ-অঙ্গন
খর উচ্ছল ঘন রাঙা জল
জাগাবে দারুণ ভীতি।

২

তোমার দুকূল হইবে শ্যামল
পুনঃ হেমন্ত শীতে
সজ্জিত হবে বেগুনী হরিৎ
লাল নীল শ্বেত পীতে।
স্বচ্ছ সলিল দ্রব হীরকের ধার,
হয়ত দেখিতে পাবনাকো আমি আর,
পারের ঘাটেতে যাত্রীর ভিড়
যেন উৎসব তিথি।

৩

যুগ যুগ পরে কোনো সুলগনে
হয়ত হইবে দেখা।
পথিকের বেশে পরিচিত তটে
আসিয়া দাঁড়াবো একা।
জন্মান্তর সৌহার্দ্দ্যের বাণী,
হয় ত হইবে সমীরণে কানাকানি,
শুধু চেনা চেনা লাগিবে তোমায়
আধ ভোলা সুখ স্মৃতি।

৪

দিনে শতবার এই যে মিলন
এই নেত্রোৎসব,
তোমার জলকে প্রেমাশ্রুর কি
দেবেনাকো গৌরব?
নাগেশ্বরের পরাগের ঝাক সম,
ভরা এ বুকের ঝরা অনুরাগ মম,
তোমার জলে কি রেখে যাবে না কো
কিছু ক্ষীণ পরিচিতি?

৫

রহিল তোমার বুকে ভালবাসা
কূলে কূলে উল্লাস।
আমার আদর রাখিবে ধরিয়া
তব বনফুল বাস।
হেরিবে তোমার পাণ্ডু ও সৈকতে
তব খেয়াঘাটে, নির্জ্জন বনপথে,
মোর কবিতার অটুট পাণ্ডুলিপি
পর্য্যুৎসুক হৃদি'।

উপহার

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

ক্যাসবাক্সর খোপে, আলমারীর আনাচে কানাচে বিছানার তলায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে জ্যোৎস্না খুঁজতে লাগল। সময়ে অসময়ে এই স্থানগুলো বড় উপকারে আসে। সেবার স্বামীর অসুখের সময় সে এমনি করে চারদিন সংসার চালিয়েছিল। কিন্তু আজ ঝেড়েমুছে যা বেরুল তাতে তার মুখ শুকিয়ে গেল—দু'বার তিনবার ক'রে গুণেও চোদ্দ আনা তিন পয়সার বেশী কিছুতেই হলো না। কাল ইলেকট্রিকের বিল দেবার শেষ তারিখ, অথচ মাসকাবারের তখনো তিনদিন বাকী তাকে সংসার চালাতে হবে। অবশ্য তার কাছে মাসকাবারি খরচের যা অবশিষ্ট ছিল তার সঙ্গে এই ক'আনা যোগ করলে হয়ত আলোর বিল শোধ হয়েও কোন রকমে এমাসটা কেটে যায়। কিন্তু জ্যোৎস্নার ভাবনার আসল কারণ তা নয়—তার চেয়েও বুঝি বড়, সেই কথাই এখন বলবো।

আজ তাদের বিবাহের তারিখ। প্রতি বছর এই দিনে তারা কিছু উৎসবের আয়োজন করে। ফুল দিয়ে ঘর সাজায়, বন্ধুবান্ধব দু'চারজনকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ায়। তারপর সবশেষে অশোক জ্যোৎস্নাকে একটা কিছু উপহার দেয়, আর জ্যোৎস্না অশোককে কিছু দেয়। এমনি করে বিবাহের দিনটার স্মৃতি তারা প্রতি বছর একবার ক'রে উজ্জ্বল করে নেয়, নব নব উপহারের ভিতর দিয়ে। খরচ যা লাগে তা অশোকই দেয়, তবে আয়োজনটা সব করতে হয় জ্যোৎস্নাকে। তাই আজ যখন অশোক খেয়ে দেয়ে অফিসে বেরিয়ে গেল এবং আজকের এই বিশেষ দিনটার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করলে না তখন জ্যোৎস্না রীতিমত বিপদে পড়লো। সে একবার ভেবেছিল মুখ ফুটে স্বামীকে সে-কথা জিগ্যেস করবে কিন্তু লজ্জায় পারেনি। স্বামীর বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কথা সে ভালো করেই জানতো তাই বোধহয় বলতে গিয়েও মুখে আটকে গিয়েছিল।

দুপুরবেলা একা ঘরে শুয়ে শুয়ে জ্যোৎস্না ভাবতে লাগল, কি করবে। এই দিনটার আনন্দ কি তবে আজ থেকে শেষ হয়ে গেল! উপায় কি, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কত লোকের কত বাসনাই ত এমনি করে অপূর্ণ থেকে যায়। সে মনকে এইভাবে বোঝাতে লাগল। স্বামীর জন্যে জ্যোৎস্নার দুঃখ হয়। বাস্তবিক তার কি দোষ! কোন রকম উপায় থাকলে সে কি চুপ করে থাকতো আজ? এই গেল বছরেও সে তার আংটীটা বিক্রী করে উৎসবের আয়োজন করেছিল। জ্যোৎস্না বরং তাকে নিষেধ করেছিল কিন্তু অশোক শোনেনি, বলেছিল পয়সাটা হাতের ময়লা, আজ আছে কাল নেই—কিন্তু এই দিনটা গেলে জীবনে আর কখনো ফিরে আসবে না।

প্রথম বছরের কথা জ্যোৎস্নার মনে পড়লো, একটা হীরের 'নেকলেস্' অশোক তাকে 'প্রেজেণ্ট' করেছিল। তার পরের বছর একজোড়া হীরের দুল—আর সে মনে করতে পারলে না, মাথার মধ্যে কেমন করতে লাগল। সে-সব গেছে, এখন আর কিছুই নেই! এমন কি গেল বছরের আগের বছর এই দিনে যে টেবিল হারমোনিয়ামটা অশোক তাকে দিয়েছিল সেটাও বিক্রী করতে হয়েছে টাকার অভাবে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জ্যোৎস্না একবার ঘরের চারিদিকে চাইলে। বিক্রী করবার মত আজ আর কোন জিনিষ তাদের অবশিষ্ট নেই। ঘরের টেবিল চেয়ার থেকে খাট আলমারী ইলেকট্রিক পাখাটা পর্য্যন্ত ভাড়া-করা। সাহেব পাড়ার 'ফ্ল্যাটের' এই নিয়ম। তাদের এই সুসজ্জিত ঘরের জন্যে মাসে মাসে ভাড়া দিতে হয় বাড়ীওয়ালাকে। এর জন্যেও জ্যোৎস্না অশোককে বলেছিল, কি দরকার এত বাড়ী ভাড়া গুণে, তার চেয়ে চলো ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গালী পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করিগে। কিন্তু অশোক রাজী হয়নি। সে বলেছিল 'ভেক না হলে ভিখ্ মেলে না'। যুদ্ধটা যে কদিন থাকবে একটু কষ্ট করতে হবে আমাদের—তারপর যুদ্ধ থেমে গেলে আবার সুদিন ফিরে আসবে। কথাটা যুক্তি দিয়ে সে জ্যোৎস্নাকে বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

অশোক মোটরের দালালী করে যা রোজগার করতো তাতে তাদের স্বামীস্ত্রীর সাহেবী পাড়ায় বাস করে বেশ 'ষ্টাইলের' সঙ্গে চলে যেতো। কিন্তু যুদ্ধটা বাঁধতেই হলো বিপদ। মোটর গাড়ীর দাম যত বাড়তে লাগল তার আয়ও তত কমতে লাগল। কে কিনবে এত টাকা খরচ করে গাড়ী? সকলেরই পয়সার টানাটানি। অগত্যা অশোক দামী স্যুট ছেড়ে, চাঁদনীমার্কা ধরলে এবং চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাট ছেড়ে ইলিয়ট রোডের দিকে বাসা বাঁধলে। তাও একরকম চলছিল কিন্তু সরকার যেদিন থেকে পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ করলে সেইদিন থেকে অশোক মাথায় হাত দিয়ে পড়লো। মোটরগাড়ী বিক্রী একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তখন স্ত্রীর গয়না ও সৌখীন জিনিষপত্তর যা ছিল ঘরে, একে একে বিক্রী করে দিনাতিপাত করতে লাগল। এসব কথাই জ্যোৎস্না জানতো। অশোক কোন কথাই তাকে গোপন করে না।

তবুও সে চিন্তা করতে লাগল, আজকের দিনটার স্মৃতি কোন রকমে রক্ষা করা যায় কিনা। কত রকমের কত কথা তার মাথায় ভীড় করে আসে কিন্তু মানসম্ভ্রম বজায় থাকে অথচ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় এমন কিছুই সে ভেবে পায় না। এরই মধ্যে হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় গত বৎসরের কথা। এইদিনে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে টেবিলে বসে খেতে খেতে একজন অশোককে আবেগভরা কণ্ঠে বলে [illegible]ছিল, বেশ আনন্দে আছিস কিন্তু তোরা দুজনে।

অশোক তার [illegible]ছিল, ইচ্ছে করলে তুই এর চেয়েও বেশী আনন্দে [illegible]সিস্! লোকটা ছিল কৃপণ প্রকৃতির জন্য বিখ্যাত। [illegible]স করলে, কি করে?

অশোক [illegible]কে যদি সর্ব্বদা একটা 'সেভিংস্ ব্যাঙ্ক' বলে [illegible] এ শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিল। আর [illegible] সবচেয়ে বেশী হেসেছিল জ্যোৎস্না নিজে।

এখন ঘুরে ফিরে কেবলি জ্যোৎস্নার সেই কথাটা মনে পড়তে লাগল। যদি কিছু তারা সঞ্চয় করে রাখতো তাহ'লে হয়ত আজ ঠিক এইখানে এই অবস্থায় এসে পৌঁছুতে হোতো না। এই সব ভাবতে ভাবতে আবার জ্যোৎস্নার মনে পড়ে অশোকের সেই কথাটা—পয়সা ত হাতের ময়লা, আজ আছে কাল নেই, কিন্তু এদিন একবার গেলে আর ফিরে আসবে না।

বাস্তবিক অশোকের কথাই খাঁটা। জ্যোৎস্না ভাবলে, না—যেমন করে হোক আজকের দিনের মর্য্যাদা সে রাখবেই! সে ঠিক করলে যা পয়সা তার কাছে আছে তাই দিয়েই সে আজকের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে। কালকের কথা কাল ভাববে—আর সংসার চলবে কি করে সেকথাও পরে ভাববে। আজকের দিন সে কিছুতেই বৃথা যেতে দেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে ও উত্তেজনায় জ্যোৎস্না একেবারে সোজা হয়ে উঠল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে চারটে বেজে গেছে। আর সময় নেই, বাজারে যেতে হবে; সে তখুনি ছুটলো বাথরুমে।

কিন্তু গা ধুয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়েই সে চমকে উঠলো। রেশমের মত দীর্ঘ ও কুঞ্চিত কেশরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে তার কপালে, ঘাড়ে, বুকে, পিঠে কোমরে একেবারে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন ঘন, তেমনি কালো, আর তেমনি অজস্র। সে যেন অমাবস্যার জমাট অন্ধকার, বর্ষার সুনিবিড় মেঘপুঞ্জ! তার ওপর জ্যোৎস্নার বয়স এই পূর্ণ চব্বিশ। যদিচ যৌবনের ধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া—এখানে কিন্তু তার ব্যতিক্রম ঘটেছে যেন। তাকে দেখলে মনে হয়, সে তার রূপ যত দান করেছে তার চেয়ে বেশী সঞ্চয় করে রেখেছে—দেহের রেখায় রেখায় শরীরের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে। ছিপছিপে একহারা চেহারা। রঙ ফর্সা নয় তবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুখের মধ্যে আগে নজরে পড়ে চোখ দু'টী, যেমন উজ্জ্বল তেমনি গভীর ও ভাবময়। তাতে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ নেই আছে প্রদীপের স্নিগ্ধতা। চেহারার সঙ্গে এই চুল-গুলোকে এমন সুন্দর দেখায় যে বিয়ের প্রথম বছরেই তার চুল নিয়ে অশোক এগোরাটা কবিতা লিখেছিল। এখন কবিতা লেখে না বটে, তবে হাঁ করে মধ্যে মধ্যে সে চেয়ে থাকে তার চুলের দিকে।

সেই সঙ্গে আর একজনের কথা মনে পড়তে জ্যোৎস্নার চোখ মুখ নিমেষে যেন জ্বলে উঠলো। তাদের ফ্ল্যাটে একজন মোটা ফিরিঙ্গি মহিলা থাকে; সে একদিন তাকে চুল শুকাতে দেখে বলেছিল, এত বড় চুলের বোঝা না বয়ে যদি সে 'বব্' করে ফেলে তাহলে খুব সুন্দর দেখাবে; উপরন্তু এই চুলগুলো বিক্রী করলে সে কিছু টাকাও পেতে পারে।

জ্যোৎস্না সেদিন হেসে তাকে উত্তর দিয়েছিল, কি করবো বলো আমার স্বামী যে বড় চুল খুব পছন্দ করে, তা নাহ'লে তোমাদের মত 'বব্' করে ফেলতুম।

আজ কিন্তু আয়নার মধ্যে দিয়ে যতবার সে নিজের এই সুন্দর চুলগুলির দিকে তাকালে ততবার মনে পড়তে লাগল সেই ফিরিঙ্গী মহিলাটার কথা। জ্যোৎস্না আর স্থির থাকতে পারলে না। অন্য সব চিন্তা তখন তার মাথা থেকে যেন কোথায় পালালো। সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে ছুটলো ওপরের ফ্ল্যাটে।

দরজার পাশে 'কলিং বেলটা' টিপতেই সেই স্থুলা মহিলাটা বেরিয়ে এলো। তারপর তাকে দেখে সাগ্রহে বলে উঠলো, হ্যালো মাই ডিয়ার গার্ল, বলো আমি তোমার কি করতে পারি?

জ্যোৎস্না বললে, আমার চুলটা 'বব্' করে দিতে পারবে ত? তোমার সেদিনের কথা আমি আজও ভুলিনি।

মেমসাহেবের একটা দোকান ছিল। সে মেয়েদের মাথার চুল বিক্রী করতো। এই কথা শুনে তাই সে সাগ্রহে বলে উঠলো, নিশ্চয়—নিশ্চয়—এখুনি পারি। চলো আমার সঙ্গে দোকানে; এই ত গলির মোড়ে দোকান।

একটু ইতস্ততঃ করে জ্যোৎস্না বললে, কিন্তু এর জন্যে যে দাম দেবে বলেছিলে একদিন—তা কত দেবে?

মেমসাহেব তার চুলগুলো হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে বললে, দশ টাকা।

জ্যোৎস্না মুহূর্ত্ত কয়েক চুপ করে কি ভাবলে। তারপর বললে, আচ্ছা চলো।

মেমসাহেব তখুনি তাকে নিয়ে চলে গেল।

টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না একেবারে একটা ঘড়ির দোকানে গিয়ে উঠলো। অশোকের একটা হাতঘড়ি ছিল। সোনার ছোট্ট ঘড়ি। ভারী সুন্দর দেখতে কিন্তু তার 'ব্যাণ্ড'টা জ্যোৎস্নার একেবারে পছন্দ হতো না। সেই ঘড়ির সঙ্গে চামড়ার 'ব্যাণ্ড' যেন মোটেই মানাতো না। তাই দোকান থেকে বেছে বেছে একটা অতি সুন্দর হাল ফ্যাসানের 'ক্রোমিয়ামের' ব্যাণ্ড সে কিনলো। দোকানদারকে জ্যোৎস্না জিগ্যেস করলে, এর চেয়ে ভালো কিছু আছে?

—না 'ক্রোমিয়ামের'এর চেয়ে সুন্দর কিছু হয় না—সোনার পেতে পারেন।

—থাক্ সোনার চাই না। বলে জ্যোৎস্না দোকান থেকে বেরিয়ে এলো।

এই ঘড়িটা অশোকের পৈতৃক সম্পত্তি। অশোক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে তার বাবার কাছ থেকে উপহার পায়। ঘড়িটী অশোকের ছিল ভারী প্রিয়। শত অভাব অনটনের মধ্যে পড়লেও এটাকে হাতছাড়া করবার চিন্তা করতে পর্য্যন্ত সে ব্যথা পেতো। পিতৃস্নেহের এই শেষ চিহ্নটুকুর জন্যে তার মনের কোণে কোথায় যেন একটা গভীর শ্রদ্ধা লুকানো ছিল। জ্যোৎস্না একথা জানতো। তাই এই ব্যাণ্ডটা পেয়ে অশোক কি রকম খুসী হয়ে উঠবে, সে কথা চিন্তা করতে করতে সে যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন ছটা বেজে গেছে। বাজার থেকে আসবার পথে জ্যোৎস্না কিছু ফুল ও খাবার কিনে আনতে ভোলেনি।

ঘরদোর সাজিয়ে গুছিয়ে সে রান্নাঘরে গেল। তারপর অশোক যা খেতে ভালবাসে এমন কতকগুলো বাছা বাছা রান্নার কথা সে চিন্তা করতে লাগল।

অশোককে সে আজ তাক লাগিয়ে দেবে। আর এই অপ্রত্যাশিত আনন্দে তার চোখ মুখ কি রকম উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে—তার ছবি কল্পনা করতে করতে জ্যোৎস্না রাঁধতে লাগল। আনন্দ সে আজ চেপে রাখতে পারছিল না। একবার তার মনে হলো, হয়ত অশোকের মনেই নেই আজকের তারিখটার কথা। বেশ হয় তাহলে। স্বামীর ওপর ভালবাসার এই গৌরবটুকু নেবে

সে একা। সে যে অশোককে তার চেয়েও বেশী ভালোবাসে সেই কথাটা মুখে না বলে আজ কাজে দেখিয়ে দেবে। কতক্ষণে আটটা বাজবে অশোক বাড়ীতে ফিরবে—সেই আশায় সে সিঁড়িতে কান পেতে রইল। স্বামীর পায়ের শব্দ সে দূর থেকেও বুঝতে পারে।

বেচারী অশোক! যতই তার অভাব থাক এই দিনটার স্মৃতি কখনো কি সে ভুলতে পারে? এই দিনটাতে সে পেয়েছিল জ্যোৎস্নাকে। তার বিশ্বাস এ রকম স্ত্রী পাওয়া বহু সৌভাগ্যের কথা! রূপে গুণে, সেবায় যত্নে, হাস্যে লাস্যে—এ রকমটী আর হয় না। অশোকের মনে পড়ে স্ত্রীকে দেখে বাসর ঘরে সে এই গানটী গেয়েছিল—'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো'। আর ফুলশয্যার রাত্রে তাই নিয়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীতে কত উচ্ছ্বাস, কত ভাবপ্রবণতা! জ্যোৎস্না সলজ্জকণ্ঠে তাকে জিগ্যেস করেছিল, তুমি ও গান গাইলে কেন?

অশোক বলেছিল, ওই একমাত্র গান আমি তোমাকে শোনাবো বলে শিখেছিলুম।

ভাবজড়িত কণ্ঠে জ্যোৎস্না বলেছিল, যাঃ মিছে কথা—

—তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি—এর চেয়ে সত্য কথা আমি আর কোনদিন বলিনি।

—তুমি কি করে জানলে 'তোমার পরাণ যাহা চায় আমি তাই আমি তাই গো'। স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকোতে লুকোতে জ্যোৎস্না জিগ্যেস করেছিল।

—শুধু তোমাকে চোখে দেখে—

—চোখ দিয়ে যাকে দেখেছো, মন দিয়ে যদি তাকে না পাও তাহলে কি গান গাইবে বলো না গো?

এই কথা শুনে সেদিন দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠেছিল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সে গান এখনো পর্য্যন্ত গাইতে হয় নি। বরং শত অভাবের মধ্যেও তার মুখ দিয়ে সেই গানটীই বারবার বেরিয়েছে—'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।'

আজ তাই সেইসব কথা স্মরণ করে অশোক সমস্ত দিন ভেবেছে কি করবে? আজকের দিনটার মর্য্যাদা কেমন ক'রে রাখবে? টাকা ধার পাবার আর কোন স্থান নেই তার। যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের কাছে সুযোগ নিতে সে ছাড়েনি। তাই জ্যোৎস্নার মত অশোকও ভাবছিল যদি জ্যোৎস্না আজকের কথাটা ভুলে গিয়ে থাকে ত ভালই হয়। দারিদ্র্যের কাছে জগতের আরো কত লোক এমনি করে প্রত্যহ বলিদান দিচ্ছে তাদের কত কল্পনা, কত আনন্দ বিলাস! এমনি নানা চিন্তা করতে করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। অশোক ভাবতে লাগল এখুনি বাড়ী যাবে, না দেরী করবে। তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত আজকের দিনের ব্যর্থতা আরো বেশী করে মনকে পীড়া দেবে! তাই সে 'ইডেন গার্ডেনের' একটা বেঞ্চিতে গিয়ে চুপ করে বসে পড়লো। অনেকক্ষণ সে বসে রইল—কি যে ভাবতে লাগল তা সেই জানে!

তারপর হঠাৎ একবার সময় দেখবার জন্যে হাতের ঘড়ির দিকে চেয়েই অশোক চমকে উঠলো! এই ত তার ঘড়ি রয়েছে; তবে আজকের দিন—তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন বৃথা যাবে কেন?

সে তখুনি ছুটলো একটা ঘড়ির দোকানে। সেখানে সে ঘড়িটা বিক্রী করে ফেললে। কিন্তু এইবার অশোক আর এক সমস্যায় পড়লো। কি কিনবে এই সামান্য টাকায়? সিকি দামে ঘড়িটা বেচতে হয়েছে। ভাবতে ভাবতে সহসা অশোকের চোখের সামনে ভেসে উঠলো জ্যোৎস্নার মাথার সেই নিবিড় চুল—কালো অন্ধকারের মত চুল!

সে তখন 'নিউমার্কেটে' গিয়ে একটা গয়নার দোকানে ঢুকলো এবং অনেক বেছে একটা মাথার চিরুণী কিনলে। অশোক কল্পনায় দেখলে জ্যোৎস্নার চুলের মধ্যে সেটী ভারী সুন্দর মানিয়েছে। তার মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য মুক্তো ও চুনিপান্নার কাজ করা ছিল। হাতে করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে বারবার দেখতে লাগল। তারপর একটা সুন্দর ভেলভেটের বাক্সে সেটাকে পুরে নিয়ে অশোক বাড়ী চললো। আজ জ্যোৎস্নাকে গিয়ে সে চমক লাগিয়ে দেবে। আর যদি আজকের তারিখের কথা সে ভুলে গিয়ে থাকে, তাহ'লে অশোক যে তাকে কত বেশী ভালবাসে সে কথাটা কি ভাষায় বলবে তাই ভাবতে ভাবতে সে বাড়ীর দরজায় এসে পৌঁছুল। পা টিপে টিপে অশোক সিঁড়িতে উঠতে লাগল।

জ্যোৎস্না তখন ফুল দিয়ে তাদের বিবাহের ফটোটা সাজাচ্ছিল। দরজার দিকে পিছন ফিরে ছিল বলে সে বুঝতেই পারেনি কখন অশোক ঘরে ঢুকেছে চুপিচুপি। বলা বাহুল্য সাজানো ঘর দেখেই অশোক বুঝতে পারলে ব্যাপারটা। তাই অন্ততঃ তার দাবীটা আগে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সে নিঃশব্দে জ্যোৎস্নার মাথায় সেই চিরুণীটা পরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু যেমন সে পিছন দিক থেকে তার মাথার কাপড়টা টানলে অমনি 'বব্' করা চুল বেরিয়ে পড়লো। অশোকের মুখ নিমেষে ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। সে শুধু অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, এ কি!

জ্যোৎস্না জানতো অশোক তার মাথার চুল কত ভালবাসে। তাই আড়চোখে একবার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে সে খিল্ খিল্ করে ছেলেমানুষের মত হেসে উঠে বললে, দেখ কেমন 'বব্' করেছি, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে না?

জ্যোৎস্না ভেবেছিল হয়ত তার হাসি দেখে অশোকের মুখেও হাসি ফুটে উঠবে; কিন্তু তাকে আরো গম্ভীর হয়ে যেতে দেখে সে তখন অশোকের বাঁ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সেই 'ষ্ট্রাপটা' বেঁধে দিতে গেল। কিন্তু ঘড়িটা না দেখতে পেয়ে সেও চমকে উঠে বললে—এ কি! ঘড়ি কৈ?

অশোক এতক্ষণ মৌন ছিল এইবার ঘাড় হেঁট করে বললে, ঘড়িটা পুরণো হয়ে গিয়েছিল বলে বেচে ফেললুম।

একথা শুনে জ্যোৎস্নাও চুপ করে গেল। এইভাবে আরো কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব হয়ে থাকবার পর জ্যোৎস্না আবার বললে, সত্যি করে বলো তুমি ঘড়ি বেচলে কেন? এই বলে সে স্বামীর মুখের ওপর দুটী বড় বড় চোখ তুলে ধরলে।

অশোকও জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তুমিও বলো চুল কাটলে কেন?

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে জ্যোৎস্না বললে, আমি মাথার চুল বিক্রী করে তোমার জন্যে এই ব্যাণ্ডটা কিনেছি।

অশোকও ধীরে ধীরে বললে, আমি ঘড়িটা বিক্রী করে তোমার জন্যে এই চিরুণীটা কিনে এনেছি।

আবার চুপচাপ। শুধু নিঃশব্দে দুজনে দুজনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।*

* বিদেশী গল্পের কঙ্কাল অবলম্বনে।

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ্-ডি

১১৪০—১১৫৫ পদে ঝুলন, পিচকারী সাহায্যে পরস্পরের অঙ্গে সুগন্ধি প্রক্ষেপ ও যুগলরূপ বর্ণনা। এগুলিকেও রাসের অঙ্গীভূত ধরা যায়। ঝুলন-মণ্ডপের বিচিত্র ও রত্নখচিত সৌন্দর্য্য—বর্ণনা রাসমঞ্চের বর্ণনা-প্রণালীর অনুরূপ। পূর্ণিমা নিশীথে কৌমুদী-প্লাবিত বনভূমির শোভা দেখিয়া গোপরমণীগণের কৃষ্ণ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় কৃষ্ণের সঙ্কেত-মুরলী-ধ্বনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছে। তাহারা বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া ঘরের বাহির হইয়াছে।

যেমত চঞ্চল বনের হরিণী
তেমত বাউল প্রায়।
পথে যেতে পদ আন ঠাঁই পড়ে
তটস্থ হইয়া যায়॥ (১১৪১)

কুঞ্জগৃহে রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটিয়াছে। তাঁহারা উভয়েই আনন্দ-বিভোর। চারিদিকে সখিরা ব্যজন, চন্দনলেপন প্রভৃতি সেবায় নিযুক্তা। ঝুলনলীলা আরম্ভ হইয়াছে, শত শত পিচকারী নায়ক-নায়িকার অঙ্গে সুগন্ধি বর্ষণ করিতেছে। তারপর সখিরা যুগলরূপ দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই অনুপম যুগ্ম সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদনে প্রয়াসী হইয়াছে।

চণ্ডিদাস কহে নিশিদিশি দেখি
এ দুই নয়ন কোণে।
তথাপি চকোর নয়ন-চাতকী
সদা নিতে চাহে পানে॥ (১১৪৮)

১১৪৯ পদে দেহ-সৌন্দর্য্য ও ১১৫১ পদেই সখিদের চিত্তে এই সৌন্দর্য্যের প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। উভয় পদই কবিত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণ উদ্ধারের যোগ্য।

মরম সজনি সই।
কি আর বলিব দোঁহ রূপ খানি
সদাই নয়নে রই॥
আধ তনু দেখ কালিয়া-বরণ
আধ তনু দেখ গোরা।
যেমত জলদে বিজুরি বেড়ল
দেখিয়ে তেমতি ধারা॥
আধ সে ললাটে চন্দন (সিন্দুর?) শোভিছে
আধ সে কপালে ইন্দু।
এক শির পর ময়ূর সুন্দর
আর শিরে ফণি নিন্দু॥
এক খঞ্জু নিয়া পাখি সে নাচিয়া
ফিরিছে মনের সরে।
আর অদভুত দেখিল বেকত
ও মৃগ বুলিয়ে ফিরে॥
এক ফল দেখ দাড়িম্ব বীজের
আকৃতি সমান হয়।
কুন্দের কুসুম কলিকা সুষম
এক স্থানে দেখ রয়।
এক ফল নীল রঙ্গিণী—(?) সমান
আর ফল রাতা সম।
বড় অদভুত কখন না দেখি
দেখিয়া লাগিল ভ্রম॥
এক কীর পাখী খগ তার কাছে
সুধা বরিষয়ে কেনে।
বুঝি সে বাউলি চান্দের মধুতে
তেঞি বরিখত ঘনে॥
চঞ্চল (?) চাঁদের ঘটাও শোভিত
করে বৃন্দাবন ভূমি।
চণ্ডিদাস ভণে দোঁহার রূপেতে
আনন্দে ভাসিল জানি॥ (১১৪৯)

*   *   *

নিরখিতে রূপ আঁখি পিছলয়ে
অঙ্গেতে নাহিক রয়।
সদাই দেখিএ রূপের রাশিটী
মোর মনে হেন হয়॥

*   *   *

কোন সখি বলে অপরূপ খানি
আঁচলে বাঁধিয়া থোব।
কোন সখি বলে দোঁহ রূপ খানি
নয়নে ভরিয়া নিব॥
কোন সখি বলে হিয়ার কাঁচুলি
করিতে হএন মন।
কোন সখি বলে বান্ধি কুতুহলে
নোটনের নটকন।
কোন সখি বলে হিয়ার পদক
করিয়া রাখিএ সারা।
আপন ইচ্ছাএ সদাই দেখিএ
এমত বাসিএ ধারা॥
চণ্ডিদাস কয় হেন মনে লয়
বাহির করিতে ভয়।
ব্রজের অনেক ডাকা চুরি আছে
জানিবা মাড়িয়া লয়॥ (১১৫১)

হেন মনে লয় শুন গো সখি।
নয়ান গোচরে সদাই রাখি॥
দোঁহ রূপখানি করিয়া ফুল।
পরিএ যতনে শ্রবণ মূল॥
চাহি ঘনে ঘনে যখন সাধ।
নিকরুণ ধাতা কর্য়াছে বাদ।
কুলের কামিনী কুলের ঝি।
বিহি নিকরুণ করিব কি॥
দারুণ গৃহেতে বঞ্চয়ে যেই।
কাল সাপ মাঝে বসতি সেই॥ (১১৫২)

সমস্ত প্রকৃতি এই রাসলীলার আনন্দের অংশভাক হইয়াছে। পশু-পক্ষী জগতে অনুরূপ আনন্দের প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে প্রভাত হওয়াতে গোপীগণ বিদায় মাগিয়াছে ও মঞ্জরীগণ ছাড়া সকলেই গৃহে ফিরিয়াছে।

(৭)

১১৫৬—১১৬৫ পদে নায়কের অচৈতন্য অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। গোপীগণের বিদায়ের পর বিরহব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। মঞ্জরীগণ ললিতাকে সংবাদ দিলে ললিতা আবার কুঞ্জে ফিরিয়া বিরহ-তাপ-প্রশমনের সাধারণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছে। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় পূর্ব্বরাগ-উদ্দীপক পঞ্চগুণোপেত গন্ধরাজ ফুল শ্রীকৃষ্ণের নাসারন্ধ্রে ধরিয়াছে। ফুলের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে নায়কের চেতনা-সঞ্চার হইয়াছে এবং ললিতা ও কৃষ্ণ উভয়েই গৃহে ফিরিয়াছেন। এই সমস্ত রসলীলা যশোদার অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

নায়কের পর এইবার নায়িকার অচৈতন্যের পালা। ১১৬৬-১১৭৩ পদে এই পালার বিবৃতি। শিখিনৃত্য ও তাহার বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়া গৃহে সন্ত-প্রত্যাগতা রাধার চৈতন্য লোপ হইয়াছে। কুটিলা মন্ত্রজ্ঞা কোন 'চেতনী'কে আনিবার আদেশ দিয়াছে। ললিতা বড়াই-এর নাম উল্লেখ করায় প্রিয়ম্বদা তাহাকে আনিয়াছে। বড়াই ভিতরের রহস্য সবই জানে; সে কাণে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নাম উচ্চারণ করিতেই রাধিকার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে। রাধা আবার সখীগণ সঙ্গে যমুনা-স্নানে গিয়াছেন। ১১৭২ পদে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় বড়াই-এর মধ্যবর্ত্তিতার উল্লেখ ও তাহার সহিত পূর্ণমাসীর অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই পদে রসপুষ্টির জন্য মিলন-সংঘটনকারিণী ও উপদেষ্ট্রীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তব্য খুব কৌতূহলোদ্দীপক।

দান ছলে বড়াই হইতে আনাগোণা।
কানাঞি মিলায় আনি যত ব্রজাঙ্গনা॥
বড়াই রসের তরু দোঁহে বসাইয়া।
দান-কেলি-কুমুদিনী (?) কহিয়াছি ইহা॥
রসে রস পর্য্যায় (?) হয় রসপোষ্টা লাগি।
লবণ বিহীনে জিহ্বা কান্দে তার লাগি॥
রস বিনে রসিক নহিলে কিছু নয়।
তেমত পরোক্ষ-রস জানিহ নিশ্চয়॥
রসের সায়র হয় শ্রীরাধিকা প্রেয়সী।
তাহাতে লবণ হয় এই পূর্ণমাসী॥
দোঁহার মিলন-কর্ত্তা দুহুঁরসে ভোক্তা।
দোঁহার মাধুরী-গুণ জানেন সর্ব্বথা॥
অষ্ট-রস বর্ণনা আছে রসের পর্য্যা(য়ে)তে।
রসে রসে পদাবলী লিখিয়ে সাক্ষাতে॥
অন্ত-উপদেশ রস চৌষট্টি হইতে বাড়া॥
উপদেশ না হইলে কহে পংক্তি-ছাড়া॥
মুখ্য চৌওট্টি হয়ে উপদেশ বহু।
অতএব রসপোষ্টা অন্তরস কহু॥
কহিবেন ভকতগণ এখানে বড়াই।
ইহার অনেক গুণ চণ্ডিদাস গাই॥ (১১৭২)

বড়াই-এর সহিত লবণের তুলনা, মধুররসপ্রধান প্রেম-বর্ণনায় স্বাদবৈচিত্র্যের জন্য মিলনকারিণীর প্রবর্ত্তন ও মুখ্য চৌষট্টিরসকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আনুষঙ্গিক উপদেশ প্রভৃতি পরোক্ষ-রসের প্রয়োজনীয়তা—আলঙ্কারিক আলোচনা হিসাবে বিশেষ উপভোগ্য।

১১৭৪-১১৮০ পদে শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়া সুবলের নিকট নিজ মর্ম্ম-বেদনা প্রকাশ করিতেছেন। সুবল সান্ত্বনা-প্রসঙ্গে স্বপ্নদর্শনের যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে মনোবিজ্ঞান-সম্মত। ১১৭৪ ও ১১৭৬ পদে চণ্ডীদাসের পূর্ব্ব পদের সঙ্গে ভাবা, ভাব ও উপমামূলক এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, যাহাতে আখ্যায়িকা-রচয়িতার ঐক্য সম্বন্ধে নিঃসংশয়িত প্রমাণ মিলে।

"স্বপন আপন না হয় কখন
সকল মিছাই বাসি। (১১৭৫)

স্বপ্নের অবাস্তবতা প্রমাণের জন্য এইরূপ মন্তব্য পুনঃ পুনঃ দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ভাবিতে সঘনে দেখিয়ে নয়নে
শুনহ উত্তর বাণী।
ভৃঙ্গ পোক সম কহি তরতম
শুন সখা গুণমণি॥
ভৃঙ্গরাজ যেন ধরে কীট আন
বিষ্মরে আপন মনে।
বিন্ধিতে সে কীট হঞা যায় লট
চাহিতে তাহার পানে॥
দেখি সেই ভৃঙ্গ সেই কীট মরে
রাখয়ে আপন স্থানে।
যদবধি নহে তার সেই দেহ
তদবধি সেই ধ্যানে॥ (১১৭৬)

ঠিক এই উপমাটিই গ্রন্থের প্রারম্ভের দিকে ৬৪ সংখ্যক পদে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আখ্যায়িকার প্রথম ও শেষের দিকের রচনা যে একই ব্যক্তির তাহা সন্দেহাতীত।

সুবলের পরামর্শ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটের দিকে ধেনুপাল লইয়া গিয়াছেন ও সেখানে স্নান-রতা রাধার সহিত দেখা হওয়াতে তাঁহার স্বপ্ন-দর্শনজনিত মানসিক উৎকণ্ঠা দূর হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা আবার মুগ্ধ-বিবশা হইয়াছেন ও বংশীবাদকের পরিচয়-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। এই পরিচয়-জিজ্ঞাসা আখ্যায়িকার দিক হইতে সম্পূর্ণ নিরর্থক; কেননা ইহার পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার মধ্যে অন্ততঃ শতবার মিলন সংঘটিত হইয়াছে। ইহাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হয় যে কবি আখ্যায়িকার বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করিয়া এখন কেবল ধারাবাহিকতা-বিহীন বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালার মধ্য দিয়া রসঘন মুহূর্ত্তের আস্বাদনে ব্রতী হইয়াছেন। আখ্যায়িকার মানদণ্ডে আর কবির বিচার চলিবে না। তীরের বন্ধনরজ্জু কাটাইয়া কবি এখন ভাবসমুদ্রে পাড়ি দিতে চলিয়াছেন।

হেদে গো সজনি শুন মোর বাণী
তোমারে সুধাই ইহা।
কি নাম ইহারি কহ না উত্তর
শুনি জুড়াউক হিয়া॥
কিবা সে মুরতি বরণ সুছান্দ
নবীন মেঘের প্রায়।
তাথে বনমালা কিবা করে আলা
শিখিপুচ্ছ উড়ে বায়॥
মোহন মুরলী কি জানি বাজয়ে
হেন মনে লয় বাণী।
বিনি মূলে পায়ে বিকাইয়ে তায়
ও পদে হইয়া দাসী॥
কিবা সে কটাক্ষ চাহনি দেখিতে
হেন মোর মন হয়।
হিয়ার মাঝারে সদা ভরি রাখি
দীন চণ্ডিদাস কয়॥ (১১৭৮)

শ্রীকৃষ্ণের পর রাধার স্বপ্নদর্শন (১১৮১-১১৮৯)। রাধা সখিকে নায়কের সহিত স্বপ্নে মিলনের ও তাহার অতুলনীয় আদর-সোহাগের কথা জানাইতেছেন। আশ্লেষ-সুখের মধ্যে কোকিলের ডাকে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তুলনীয়)। "দারুণ কোকিলী" বাক্যাংশটী বড়ু

চণ্ডীদাসের প্রতিধ্বনি। নায়িকা কয়েকটী পদে কোকিলের প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। সখী রাধাকে আশ্বাস দিয়া আবার তাঁহাকে যমুনা-স্নানে লইয়া গিয়াছেন। এই পরিচ্ছেদের মধ্যে কয়েকটী পদ প্রকৃত-পক্ষে রসোদ্গার-পর্য্যায়ভুক্ত।

এমন পিরিতি সুখের আরতি
না দেখি কোনহ ঠান।
শুন গো সজনি পরম বেদনি
ইহাতে নাহিক আন॥
আমার পায়ের বঙ্করাজখানি
সিজেতে পড়িয়াছিল।
নেতের আঁচলে মুছিয়া নাগর
আমার চরণে দিল॥
আপন গলার হার মনোহর
আমার গলায় দিয়া।
হরষিত হয়্যা বাঁশি করে লয়্যা
তুরিতে চলল পিয়া॥
হেনক সময় দারুণ কোকিলী
সুস্বর মধুর গানে।
তা শুনি আমার নিন্দ দূরে গেল
উঠিয়া বৈঠনু মেনে॥
কেহ কতি নাঞি না দেখি সে ঠাঞি
পাইলুঁ বড়ই মোহে।
সেই হত্যে মোর সুখ নাহি গায়
আনচান করে দেহে॥

* * *

নবঘনশ্যাম রূপ নিরখিতে
যে মোর করিল বাধা।
আক্কটি হইয়া বধিএ সেজনে
মনে অনুমানি সদা॥ (১১৮৪)

১১৯০—১২০২ পদে দুস্তা (?) ও বিকলারূপ আলোচিত হইয়াছে। ১১৯০—১১৯৭ পদে রাধা নিজগৃহে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন ও প্রভাতে নায়ক-সমীপে দূতী প্রেরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণের সেই মামুলি কৈফিয়ৎ—চোরা গাইএর বন্ধন ছিঁড়িয়া পলায়নের জন্য তিনি নায়িকার সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। এই পদগুলি দুস্তা (?) রসের উদাহরণ। ১১৯৮—১২০২ পদে শ্রীমতী কৃষ্ণের জন্য কুঞ্জ-প্রয়াণ করিয়াছেন—এমন সময় রতনমঞ্জরী সংবাদ দিল যে কৃতাভিসার নায়ককে পথিমধ্যে অন্য কোন রমণী দূতীর হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর ইঙ্গিতে রাধার অভিমান প্রবলতর হইয়াছে। ইহাকে বিকলা-রস সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে এই পদগুলি বিপ্রলম্ভ ও উৎকণ্ঠিত রসের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য বোধ হয় যে কবি দ্বারা উল্লিখিত দুস্তা (!) ও বিকলা রস এই দুই প্রধান ও সুপরিচিত রসের প্রকারভেদ মাত্র। সে যাহাই হউক পদগুলিতে কবিত্বশক্তির অপ্রাচুর্য্য নাই।

নিম্নলিখিত পদাংশগুলিতে নায়কের সহিত মিলনের অভাবে রাধার চিত্তবিকার বর্ণিত হইয়াছে।

খেনে উঠ খেনে বৈঠহ ঠায়। মলিন হইল গউর গায়॥
ক্ষেণেক নাসার নিঃশ্বাস পড়ে। নাসার বেসর খসিয়া পড়ে॥
এক দিঁঠি পানে চাহিয়া রও। খেনেক খেনেক অবশ হও॥
অঙ্গের ভূষণ দূরেতে ডার। যেমত বাতাসে খসিয়া পড়।
কি হেতু ইহার বলনা দেখি। কহ কহ শুনি কমল মুখি॥
ভিজল বসন নয়ন জলে। সিন্দুর মুছিলে আপন ভালে (১১৯২)

নিশি আধ গেল জাগিয়া পোহাল
না আসে পরাণ-নাথ।
অধিক বিরহে বিকল পরাণ
বুকে দিয়া দুটি হাত॥
চরণের সাথে বেড়ে ফণিরাজে
নূপুর করিয়া মানি।
কুলিশ পড়ল কত শত তাহা
কিছুই নাহিক জানি॥
গুরুর বচন গৌরব গভীর
ঠেলিলু চরণ দিয়া।
বহু সাধে হেদে কুঞ্জেতে আয়ল
না মিলে রসিক পিয়া॥
যাহারে ভজন তারে না পায়ল
বিফলে গোঙানু নিশি।
কোন কলাবতি সুঘড় যুবতী
বঞ্চল হেনক বাসি॥
মনোরথ কাম সেহ ভেল বাম
বিকল হইলা ধনি।
চণ্ডিদাস কয় হেন মনে লয়
আমি সে সকল জানি॥ (১১৯৮)

কাহার কারণে বেণীর বন্ধানে
করিল বেশের ঘটা।
বিঘটিত ভেল॰ তাহার মিলন
সে পথে পড়ল কাঁটা॥
সাজল কাজল সে ভেল বিফল
সে যেন গরল হেন।
মলয় চন্দন পবন-পরশে
গরাসে হুতাশ যেন॥
গলে গজমতি হার মনোহর
সে ভেল ভুজঙ্গ যৈছে।
করের কঙ্কণ— গরাসল রাহু
আমারে লাগল তৈছে॥
সিঁথার সিন্দুর সে রবি কিরণ
অধিক উত্তাপ হয়।
নীলের বসন আন্ধার যেমন
দেখিয়া লাগায়ে ভয়॥
কিঙ্কিণী-কলনা বড়ই বেদনা
মদন তাহাতে মাতি।
চরণে নূপুর॰ বাজিত মধুর
সে ভার হইল অতি॥
সিজ যেন লাগে কণ্টক-সমান
শুইলে ছেদয়ে গায়।
বিকল পরাণ নাহি শুনে আন
দীন চণ্ডিদাস গায়॥ (১১৯৯)

এই পদ ও অন্যান্য উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে কি চণ্ডীদাসের সরল, মর্ম্মস্পর্শী সুর-ঝঙ্কার শোনা যায় না! ১২০২ পদে বনপাশ পুঁথি পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এখন এই আবিষ্কারের ফলে মণীন্দ্রবাবুর পদ-বিন্যাস-রীতির কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়া বিধেয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

ক্রমশঃ

অঙ্গনা

(গীতি ও নৃত্যনাট্য)

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

বৌদ্ধযুগ

তক্ষশিলার বনবীথি—লতামণ্ডপ

পশ্চাতে নানাপুষ্পশোভিত তরুরাজি, পুরোভাগে একটা অশোক বৃক্ষ। অশোকের পাদদেশে বেদী। বসন্ত উৎসবে অশোকের দোহদ (সাধ) অনুষ্ঠান উপলক্ষে তক্ষশিলার রাজা অমিতকীর্ত্তি, পুরোহিত, সভাকবি কাহ্নুপাদ, সেনাপতি অম্বপালি ও বয়স্য মিত্রানন্দ এবং অন্যান্য অনুচরবর্গ ও চারণগণ সমবেত হইয়াছেন। সকলের পরিধানেই পূজারী বেশ।

পুরোহিত। (অশোকের পাদমূলে অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া, শঙ্খধ্বনি করিলেন) মহারাজ! বনে বনে বিকশিত নানা পুষ্প; তক্ষশিলার পৌরগেহে সুরু হ'য়েছে বসন্তোৎসব। শুধু অশোকের শাখায় আজো বিকশিত হয় নি কুসুমগুচ্ছ। তাই আজ আয়োজন হ'য়েছে এই দোহদ উৎসবের। পুরাঙ্গনারা অশোককে দেবেন 'সাধ'।

মিত্রানন্দ। সাধ, মহারাজ! যেমন ক'রে বধূকে দেন তাঁর আত্মীয়স্বজন। নানা ভোজ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার—

অমিতকীর্ত্তি। জানি, মিত্র। আমরা আজ তক্ষশিলার গণসাধারণের পক্ষ থেকে উপস্থিত হ'য়েছি এই পরম প্রীতি-আস্পদ অশোককে দোহদ দিতে।

মিত্র। মহারাজ শুধু জেনেই নিশ্চিন্ত হ'য়েছেন। কিন্তু—

অম্বপালি। হঠাৎ আপনার আবার 'কিন্তু' কিসে এলো, রাজবয়স্য?

মিত্র। মিত্রানন্দ শুধু জেনেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না, সেনাপতিবর। মনে মনে কেমন একটা লোভও মোচড় দিয়ে ওঠে।

অমিত। যথা?

মিত্র। যথা—মহারাজ! এই সব নানা ভোজ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি দেখে আমারও ইচ্ছে করে, অমনি আসন্ন-পুষ্পা অশোক কিংবা কোন ধনীর বধূ হ'তে। বেশ একটা 'সাধ' পাওয়া যায়।

অমিত। বল কি মিত্রানন্দ! (সকলে হাসিয়া উঠিল।)

কবি। সখা মিত্রানন্দ দেখ্‌ছি এই প্রকট বৌদ্ধ যুগেও আবার ফিরিয়ে আন্‌তে চান মান্ধাতার আমল।

মিত্র। ঠিক ধ'রেছেন কবি কাহ্নুপাদ! মান্ধাতা হ'তে পারলে, সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় রকম সিংহাসন লাভেরও কিঞ্চিৎ আশা ছিল। অর্থাৎ, যাকে বলে সোনায় সোহাগা!

কবি। বুঝেছি, এ সবই রূপান্তর বন্ধু, চিত্ত বিকারের রূপান্তর।

অমিত। কবির দৃষ্টি সূক্ষ্ম; তাই অন্তরের গোপন রহস্য অনায়াসেই ভেদ ক'রতে পারেন। কিন্তু বন্ধুবর মিত্রানন্দের কোন্ গোপন রহস্যে ইঙ্গিত করা হ'ল, সেটা তো ঠিক বুঝে উঠতে পারলেম না, কবিবর!

কবি। মহারাজ, বনে বনে এসেছে বসন্ত। যৌবন মদিরায় পৃথিবী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। শাখায়, পাতায়, ফুলে ফলে লেগেছে সেই যৌবনের উল্লাস। মানুষের মন কি তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে?

পুরোহিত। মুকুলিত হ'য়ে ওঠাই স্বাভাবিক কবিবর!

কবি। শুধু তাই নয়, আচার্য্যদেব! সখা মিত্রানন্দের মনেও লেগেছে তারই দোলা। উপায় খুঁজে না পেয়ে সখা উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েছেন। চিত্তে বিকার দেখা দিয়েছে। কামিনী লাভের বিফল প্রয়াস রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে কাঞ্চন লাভের আকাঙ্খায়। ওটা ওঁর কামনারই রূপান্তর মহারাজ;—রূপান্তর!

অম্বপালি। সাধু, সাধু, রাজকবি! হা-হা-হা!

অমিত। সাধু, সাধু!

কবি। মহারাজের জয় হোক্।

পুরোহিত। আর সেই সঙ্গে রাণী উৎপলা পুত্রবতী হোন্।

চারণগণ। জয়তু অমিত-কীর্ত্তি তক্ষশিলা পালক!
জনগণ অধিনায়ক।—জয়তু—।
বীরভদ্র শাক্য সেন—
ভিক্ষুশরণ গমিত যেন,
মহাবাহু দিব্যজীবন—দীনশরণ পাবক।
জয়তু—।

পুরোহিত। মহারাজ, প্রথম প্রহর অতীত প্রায়। আর বিলম্ব কেন?

অমিত। বিলম্বের প্রয়োজন নাই আচার্য্য! উৎসবের কাজ আরম্ভ হোক। আজ বাসন্তী পূর্ণিমা! এমনি এক পবিত্র দিনে ভগবান বুদ্ধ অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন ভারতের পুণ্যতীর্থে। মানুষ পেল মুক্তির মন্ত্র। পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর ভয়।

পুরোহিত। তেন পুণ্যেন লোকোঽস্তু জ্ঞানভূমিঃ স্বয়ম্ভুবঃ।

অম্বপালি। কবিবর! উৎসবের উদ্বোধন করুন।

অমিত। আচার্য্য, অশোক-অর্চনা সমাপন করুন।

পুরোহিত। (অশোক তরুমূলে অর্ঘ্য দিয়া)
ইদং অর্ঘ্যং পুষ্পসন্তবিতায়ৈ অশোকশোকরহিতায়ৈ নমঃ।

মিত্রানন্দ। মহারাজ! কবি ব'লছেন···বসন্ত এসেছে। আপনারা আয়োজন ক'রছেন উৎসবের! কিন্তু আমার যেন সবই কেমন নিরামিষ নিরামিষ মনে হ'চ্ছে।

পুরোহিত। (আপনমনে) সোপকরণং দোহদং অশোকায়ৈ নমঃ।

অম্বপালি। নিরামিষ?

মিত্রানন্দ। আজ্ঞে হাঁ, সেনাপতি! বড্ড নিরামিষ।

পুরোহিত। কিন্তু সখা, এই বনভূমিতে আমিষ লাভের আশা যে দুরাশা।

মিত্রানন্দ। রাজ-অনুগ্রহ থাক্‌লে দুরাশা মোটেই নয়, আচার্য্যদেব। অন্ততঃ কিঞ্চিৎ শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীমদনানন্দ পেলেও—

উৎসবটা কতক পরিমাণে সতেজ হ'য়ে উঠ্ত। শ্রীপ্রাণকে আমোদিত ক'রতে শ্রীমদনানন্দই অতুলনীয়, আচার্য্যদেব। মোদতে যৎ তৎ মোদকং।

কবি। দেখুন, মহারাজ! মিত্রের মনে আবার সেই একই বিকার দেখা দিয়েছে। রতি বিলাসের সুবিধা নাই দেখে, মনটা পাশ কাটিয়ে মদন-মদন ক'রে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। রস-পিপাসা—

অমিতকীর্ত্তি। সে কি কথা, কবিবর? উৎসবের দিন দেবতারাও অমন রসের সন্ধান ক'রে থাকেন। তাঁরা পান করেন সোমরস।

মিত্র। বলুন তো, বলুন তো—মহারাজ! দেবতারা যদি উৎসবে সোমরস উপভোগ করেন, তা হ'লে আমরা মানুষ হ'য়ে অন্ততঃ একবাটি তালরসও কি পেতে পারি না?

অম্বপালি। তালরস! তাড়ি?

মিত্র। আজ্ঞে, অবিকল। মধু অভাবে গুড়ং।

কবি। আর ছন্দ মিলিয়ে ব'ল্তে গেলে, ব'ল্তে হয়—

প্রিয়া যদি নাহি মিলে, নাহি রহে ভাতি।
শিথান ধরিয়া বুকে গোঁয়াইব রাতি॥

ভেবে দেখ্তে গেলে, এও সেই এক পর্য্যায়েই পড়ে মহারাজ! রূপান্তর। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার চেষ্টা।

অমিত। কিন্তু উপায়ান্তরও ত দেখ্ছি না, কবিবর। আজ যে সারা বিশ্বের আকাশে বাতাসে ওই একই সুর! মহাকবি ব'লেছেন—

"দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং
স্ত্রিয়ঃ সকামাঃ পবনঃ সুগন্ধিঃ।
সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ,
সর্ব্বং প্রিয়ং চারুতরং বসন্তে॥"

মিত্র। মহারাজের জয় হোক্।

কবি। অবশ্য।

দিকে দিকে ফুটিছে পলাশ,
কুরুবক কিংশুক মন্দার।
আম্র মুকুলের গন্ধে ধরণীর যৌবনমদিরা
উথলিছে বনে বনে।
অশোকের ওষ্ঠপুটে ক্ষীণ রক্তরাগ!
একি তার অভিমান?
অথবা নবীন কোন দয়িতের লাগি,
ফুটিয়াছে স্বপ্নময় পূর্ব্বরাগ রেখা!
হ'য়েছে সবুজ পত্রে
অভিসার লিপিখানি লেখা।

[নেপথ্যে অঙ্গনাদের কলরব]

অমিত। ওই যে, অঙ্গনাদের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। তাঁরা বোধহয় এই দিকেই আস্ছেন। হ'য়েছে সবুজ পত্রে অভিসার লিপিখানি লেখা।

চারণগণ। গান

অশোকের সবুজ শাখায় দোলে স্বপন,
এলো বসন্ত বনে বনে।
ফুটিছে পলাশ-শাখে অলক্তিমা—
মাধবীর হ'লো দেখা তারি সনে।
এলো বসন্ত বনে বনে।

[অর্ঘ্যপাত্র হাতে দুই দিক হইতে দুইজন অঙ্গনার নৃত্যগতিতে প্রবেশ]

অশোকের সবুজ শাখে দোলে স্বপন,
এলো বসন্ত বনে বনে।
ফুটিছে পলাশ শাখে অলক্তিমা—
মাধবীর হ'লো দেখা তারি সনে॥

অঙ্গনাদ্বয়।— মধুপ ব্যাকুল আজি,
করে তাই কানাকানি;
গোপন মিলন-কথা—
হ'লো কি জানাজানি।

[দুই পাশ হইতে দুইজন অঙ্গনার কুম্ভ কক্ষে নৃত্য সহকারে প্রবেশ]

৩য় ও ৪র্থ অঙ্গনা। আজি এই উষার আলো
জ্বালে যে জীবন শিখা—
ক্ষণে ক্ষণে॥

অঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে করিতে অশোক মূলে অর্ঘ্যপাত্র ও কুম্ভ রাখিল

চারণ ও অঙ্গনাগণ। অশোকের সবুজ শাখে দোলে স্বপন—

নেপগণ। এলো বসন্ত বনে বনে।

মঞ্চস্থ অঙ্গনাগণ অভিনন্দন-জ্ঞাপক নৃত্যকৌশলে অগ্রসর হইয়া আসিল। উভয় পার্শ্বপথে দুই জন করিয়া চারিজন অঙ্গনার প্রবেশ। তাহাদের হাতে ধূপ ও মাল্য

অঙ্গনাগণ। ফুটিছে পলাশ শাখে অলক্তিমা—
মাধবীর হ'লো দেখা তারি সনে।
এলো বসন্ত বনে-বনে॥

অঙ্গনাগণ সমবেত নৃত্যে অশোককে অঞ্জলি নিবেদন করিয়া অশোক-কাণ্ডে চরণাঘাত করিল। তারপর বেদীমূলে নতি-নৃত্যে প্রণাম করিল

কবি। অঙ্গনার অঙ্গে অঙ্গে বিকশিত মাধবী-বিলাস,
তনুলতা লীলায়িত আসঙ্গ উল্লাসে।
ফেনিল যৌবনসুরা অধর সীমায়
উপচিয়া ওঠে পলে পলে;
লুব্ধ চিত্ত মত্ত ভৃঙ্গসম
মূরছিয়া পড়ে হৃদিতলে।

মিত্রানন্দ। মহারাজ! আজ যেন আমারও কেমন কবিতা কবিতা ঢেকুর উঠতে চায়। এই সব লাবণ্যময়ী ফুলবালাদের লীলালাস্যে বনতল উতল হ'য়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে বিহঙ্গ কণ্ঠের সঙ্গীত আর ত্রিভঙ্গ-অঙ্গভঙ্গী যেন জঙ্গলের কুরঙ্গদের অবস্থাও সঙ্গীন ক'রে তুলেছে। অঙ্গ ভঙ্গী বিহঙ্গ কুরঙ্গ মাতঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ জঙ্গল আর সুড়ঙ্গ একসঙ্গে মিশে স্থাবর জঙ্গম উলঙ্গ হ'য়ে আজ গঙ্গাযাত্রা না করে!

অমিত। বন্ধুবর যে দেখ্ছি ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার সবই সমানভাবে আয়ত্ত ক'রেছেন!

মিত্র। মার্জ্জনা ক'রবেন, মহারাজ! অধম ছন্দ ব'ল্তে বোঝে, ভোজনান্তে একটা মোটা রকম 'ছাঁদা'। আর ব্যাকরণ চেয়ে অধীন ব্যয়করণেই অধিক পটু; যদি অর্থটা পরের হয়।

অমিত। উত্তম; উত্তম। (হাস্য)

অঙ্গনাগণ প্রণতি শেষ করিয়া আবার চঞ্চল নৃত্যে গাহিয়া উঠিল—

অঙ্গনাগণ। আজি এই উষার আলো—
জ্বালে যে জীবন-শিখা—
ক্ষণে ক্ষণে।

নেপথ্যে শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি

গান

আজি আরতির দীপখানি জ্বালো—
ভুবন ভরিয়া তার আলো—
প্রাণের জোয়ার যেন আনে,
ছন্দে বরণে গানে গানে—;
তারি মৃদু হিল্লোলে কুসুম সুবাস যেন
ছড়ায় আজিকে মনে মনে।
—বসন্ত এলো বনে বনে॥

পঞ্চপ্রদীপ হাতে আরতি নৃত্যের সহিত
পৌরনর্ত্তকী বিপাশার প্রবেশ

অঙ্গনা পরিবেষ্টিতা বিপাশার আরতি নৃত্য।—নৃত্যের অপূর্ব্ব রূপভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া রাজা, সেনাপতি, কবি, পুরোহিত ও বয়স্য প্রভৃতি উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

অমিতকীর্ত্তি। স্বাগতা, সুস্বাগতা! পৌরনর্ত্তকী বিপাশার শুভাগমনে এ উৎসব সার্থক হোক্।

বিপাশার নৃত্য। নৃত্য শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সহসা
অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, মুহূর্ত্তে নৃত্যগীত স্তব্ধ হইল।

অমিত। সর্ব্বনাশ?

প্রতিহারী। হাঁ, মহারাজ! রাণী উৎপললেখা অর্ঘ্যপাত্র নিয়ে মন্দির পথে চ'লেছিলেন। প্রাসাদের তোরণ দ্বারে কোন দস্যু তাঁর হাত থেকে কঙ্কন অপহরণ ক'রেছে। দেবী সেই পাপ স্পর্শ সহ্য ক'রতে না পেরে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়েছেন। তাঁকে অন্তঃপুরে স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে।

সংবাদ শ্রবণে সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

অমিত। (চিন্তিতভাবে) উৎসব বন্ধ কর। তক্ষশিলায় একি অভাবনীয় অরাজক! সেনাপতি, এই মুহূর্ত্তে নগররক্ষককে আমার আদেশ জানিয়ে দিন: আগামী কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চোরকে যদি রাজসভায় উপস্থিত ক'রতে না পারে, তাহ'লে হবে তারই প্রাণদণ্ড। আর যদি পারে, উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করবে। সে চোর যেই হোক, এমন কি রাজবংশধর হ'লেও আমি তার বিধান ক'রলেম 'মৃত্যু'।

অশ্বপালি। মৃত্যু? মহারাজ!

অমিত। আমি কোন কথা শুনতে চাইনে, সেনাপতি। এই অনাচারের প্রতিবিধান না হওয়া পর্য্যন্ত তক্ষশিলার সীমানায় আর কোন উৎসব হবে না।

সকলে অবনত মস্তকে রাজার আদেশ মানিয়া লইলেন।

দীর্ঘ বিরাম

দ্বিতীয় দৃশ্য

তক্ষশিলার রাজপথ। মধ্যরাত্রি। পথিপার্শ্বস্থ একটী নির্জন মন্দির প্রান্তে জনৈক বিদেশী যুবক নিদ্রামগ্ন। জনবিরল পথে আপন মনে বিলোল নৃত্যভঙ্গীতে বিপাশা অভিসারে চলিয়াছে। সঙ্গে তার সহচরী বিনতা। আগে আগে প্রদীপ ধরিয়া বিনতা গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। গানের শব্দ খুব লঘু।

বিনতা। আজি মোর অভিসার রাত্রি!
দূর বিমানে হাসে ফাল্গুন চন্দ্রিমা,
মন্দ মলয় জাগে গন্ধে:
কুঞ্জ-বিতানে সখি চলো সংগোপনে—
চঞ্চল চল-গতি ছন্দে।
—মোরা আঁধারের যাত্রী।

বিপাশা। বিনতা! কে ওই তরুণ আশ্রয় নিয়েছে পথের পাশে?

বিনতা। (প্রদীপটি তুলিয়া ধরিল) হয় তো কোন বিদেশী ভিক্ষুক।

বিপাশা। ভিক্ষুক! সখীর কাজল কি ঘন হ'য়ে দৃষ্টি অবরোধ ক'রেছে? ভাল ক'রে আর একবার দেখ তো চেয়ে। মুখে অনিন্দ্য কান্তি; সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের দীপ্তি!

বিনতা। তবে, কোন ধনীর দুলাল: অভিমানে এসেছে ঘর ছেড়ে।

বিপাশা। না। (অতি সন্তর্পণে নিদ্রিতের অঙ্গ স্পর্শ করিল।)

সুবর্ণ। (সহসা চমকিয়া উঠিল) কে তুমি দেবী? (উঠিয়া বসিল)

বিপাশা। দেবী নয়, মানবী। হয় তো আরও নীচে।—কিন্তু তুমি কে?

সুবর্ণ। আমি বিদেশী বণিক। সুদূর কেরল থেকে এসেছিলেম রাজধানীতে ভাগ্যের সন্ধানে।

বিপাশা। তারপর? ভাগ্য বুঝি দিল না ধরা!

সুবর্ণ। না। যা কিছু মূলধন, সব গেছে।

বিনতা। বিদেশী বণিক; পড়েছিল বুঝি কোন নায়িকার মোহে।

সুবর্ণ। আমায় অকারণ লাঞ্ছিত ক'রবেন না। প'ড়ে আছি পথের একটী পাশে, তাও কি সইবে না আমার ভাগ্যে?

বিপাশা। ছিঃ বিনতা! সম্ভ্রম রেখে কথা ব'লো।

সুবর্ণ। অপরাধ ওঁর নয় দেবী! সবই আমার ভাগ্য।

বিপাশা। ভাগ্য?

সুবর্ণ। তা' ছাড়া আর কি ব'লতে পারি, বলুন? অশ্বব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে যৌথ কারবার ক'রবো ব'লে বিশ্বাস ক'রে সর্ব্বস্ব তুলে দিয়েছিলাম তাঁর হাতে। বন্ধু আমার লাভ ও মূলধন সবই নিয়ে স'রে প'ড়েছেন। এমন কি পাথেয়টুকু [illegible] নেই আজ।

বিপাশা। বিশ্বাস ক'রলে মানুষ পারে এমনভাবে বঞ্চিত ক'রতে!

বিনতা। ব'লবো একটা কথা?

সুবর্ণ। বলুন।

বিনতা। ইনি বিপাশা! তক্ষশিলার অধিরাজ থেকে পথবাসী পর্য্যন্ত জানেন ওঁর পরিচয়। যদি আপত্তি না থাকে, কাল সকালে সাক্ষাৎ ক'রবেন ওঁর বাড়ীতে।

বিপাশা। বিনতা! (রুষ্ট দৃষ্টিতে বিনতার দিকে চাহিয়া রহিল।)

বিনতা। কেন! অন্যায় ক'রেছি? উনি অসহায়; বিদেশে এসে বিপদে প'ড়েছেন। নিলেনই বা তোমার একটু সাহায্য!

সুবর্ণ। হয় তো প্রয়োজন হবে না। তবু এ করুণার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বিপাশা। থাক্ সে কথা। পরিচয় জিজ্ঞেস ক'রতে পারি কি?

সুবর্ণ। জানাবার মত কোন পরিচয়ই নেই আমার। নাম—সুবর্ণ গুপ্ত; কেরলের অধিবাসী।

বিপাশা। সুবর্ণ গুপ্ত!

সুবর্ণ। হাঁ, আজ নিঃস্ব; কিন্তু একদিন শ্রেষ্ঠী ছিলেম।

বিপাশা। ও!—আমায় ক্ষমা ক'রবেন। নিদ্রাভঙ্গ ক'রে হয় তো অনেক কষ্ট দিলেম।

সুবর্ণ। কষ্ট দেবেন কেন! নিঃসহায় বান্ধবহীন অবস্থায় আপনাদের সৌজন্যে যে আজ কতখানি আনন্দ পেলেম, তা ব'লবার নয়।

বিপাশা। একটী অনুরোধ জানাবো; রাখ্‌বেন কি?—না থাক্। (বিনতার প্রতি) বিনতা, চলো বাড়ী ফিরে যাই। আজ আর মন চাইছে না এগিয়ে যেতে।

বিনতা। কেন! মনে কি আগুন ধ'র্‌লো?

বিপাশা। থামো। অধঃপাতে যেতে তোমার আর বাকী নেই, বিনতা।

বিনতা। অন্ধের আবার অন্ধকার! (সুর করিয়া)—"মোরা আঁধারের যাত্রী।"

বিপাশা। বিনতা! (নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিল।)

সুবর্ণ! এই জনবিরল পথে—

বিনতা। আমরা অভ্যস্ত।

বিপাশা। (সুবর্ণের প্রতি) আসি তবে! বিদেশে যদি কোনদিন কোন প্রয়োজন হয়, দয়া ক'রে পদধূলি দেবেন বিপাশার গৃহে। বিপাশা ধন্য হবে।

সুবর্ণ স্বপ্নাবিষ্টের মত চাহিয়া রহিল। বিপাশা ও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে বিনতা চলিয়া গেল। বিনতা আবার উচ্ছল চপল গতিতে গুন্ গুন্ সুরে গান ধরিল—

বিনতা। দূর বিমানে হাসে ফাল্গুন চন্দ্রিমা,
মন্দ মলয় জাগে গন্ধে;
কুঞ্জবিতানে সখি, চলো সংগোপনে—
চঞ্চল চল-গতি ছন্দে।
—মোরা আঁধারের যাত্রী।
আজি মোর—আজি মোর অভিসার রাত্রি॥

প্রস্থান

সুবর্ণ। (চোখ মুছিয়া) একি স্বপ্ন! অনাহারে অনিদ্রায় মাথাটা কেমন ঘোলা হ'য়ে আসে। আজ আর জীবনে অতীত নেই, বর্ত্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। আছে শুধু ক্ষীণস্মৃতি আর অলীক কল্পনা।—স্মৃতিটুকু মুছে ফেলতে কোন কষ্টই হবে না। কিন্তু এই স্বপ্ন আর অলীক কল্পনা যেন মাঝে মাঝে মনটাকে মাতাল ক'রে দেয়।—(কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) বিনতা! বিপাশা! কে, এরা? যেন কোন্ প্রাচীন হিন্দুযুগের দেবী-মূর্ত্তি! আজ অস্তিত্ব চাপা প'ড়েছে বৌদ্ধ অনুশাসনে। তবুও বেশ লাগে। বেশ নাম ওই 'বিপাশা'! তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের পিপাসা মিটাতেই যেন মরুপথে ধীরে ধীরে ব'য়ে চলেছে—চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা!

নেপথ্যে প্রহরীদের কণ্ঠস্বর

নেপথ্যে। চোর চোর!

সুবর্ণ। কে ওরা? (দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।)

দুইজন প্রহরী ও নগররক্ষীর প্রবেশ

১ম প্রহরী। কে তুমি? (মুখের কাছে ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল।)

সুবর্ণ। আমি?

নগররক্ষী। হাঁ, আপনি।

সুবর্ণ। আমি সুবর্ণ গুপ্ত।

২য় প্রহরী। সুবর্ণ গুপ্ত! কোন সুবর্ণ গুপ্ত?

নগর রক্ষী। ওঃ। উনি যেন স্বনামধন্য ভিক্ষু! মহাস্থবির, কিংবা তক্ষশিলার অধিরাজ! (বিদ্রূপের স্বরে) মহাশয়ের অন্য পরিচয় কি শুনি?

সুবর্ণ। আমি বিদেশী বণিক।

নগররক্ষী। বণিক? (হাস্য সহকারে) বণিক যদি, তা হ'লে এই নিশুতি রাতে রাজপথে কেন আড়ি পেতে মাণিক?

সুবর্ণ। থাক্‌বার মত কোন আশ্রয় নেই, তাই।

নগররক্ষী। চলো, দিচ্ছি গে রাজার আশ্রয়। আমি নগরপাল উদ্ধরণ! আমার চোখে ধূলো দেওয়া অত সোজা নয়। প্রহরী! (প্রহরীগণকে ইঙ্গিত করিল।)

প্রহরীদ্বয় সুবর্ণের দুই হাত ধরিয়া অঙ্গরাখা খুঁজিতে লাগিল

১ম প্রহরী। কঙ্কনটি কোথায় লুকিয়েছ বাবা?

সুবর্ণ। কঙ্কন?

২য় প্রহরী। হাঁ, কঙ্কন। বেটা যেন সাধু! কিছু জানে না।

সুবর্ণ। সত্যি জানি না কিছু। আমি বুঝ্‌তে পারছিনা আপনাদের কথা।

নগররক্ষী। বুঝ্‌বার দরকার নেই। সেখানে গেলেই সব দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

সুবর্ণ। আপনারা হয় তো ভুল করেছেন।

নগররক্ষী। ভুল করেছি আমি! স্পর্দ্ধা তো কম নয়। প্রহরী!

প্রহরীদ্বয় সুবর্ণের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল

প্রহরীদ্বয়। বেটা বনবিড়াল! দেবীর কঙ্কন চুরি ক'রে পালিয়ে বাঁচ্‌বি!

সুবর্ণ। কার কঙ্কন, কিসের কঙ্কন, আমি কিছুই জানিনা।

নগররক্ষী। বাঃ, এ-সবও বেশ মুখস্থ আছে দেখ্‌ছি।

পাকা চোর কিনা! সাধু সাজবার আটঘাট কিছু অজানা নাই। ওঠ, ওঠ শিগ্‌গির।

সুবর্ণ। অদৃষ্টের একি নিষ্ঠুর পরিহাস! (উঠিয়া দাঁড়াইল) এক চোখে সুখ স্বপ্নের মত এসে দেখা দেয় মমতাময়ী নারী; অন্য চোখে ঘনিয়ে আসে মৃত্যু।

নগররক্ষী। হাঁ, মৃত্যু। জেনে-শুনে এ কাজ কেন ক'রতে গেলে চাঁদ? এখন আর কাঁদলে রক্ষা নাই। রাজার আদেশ, দেবীর অঙ্গ থেকে যে কঙ্কন অপহরণ ক'রেছে, তার শাস্তি হবে—প্রাণদণ্ড। সে রাজবংশধর হ'লেও নিষ্কৃতি নাই।

সুবর্ণ। যে নিরপরাধ, তারও হবে প্রাণদণ্ড?

নগররক্ষী। হবে। এখন ইষ্টদেবকে স্মরণ ক'রে ভালোয় ভালোয় এগিয়ে এসো। দিনে ডাকাতি!

সুবর্ণ। চলুন। প্রাণদণ্ডকে সুবর্ণগুপ্ত ভয় করেনা। কিন্তু অকারণ অপমান ক'রবেন না।

নগররক্ষী। ওঃ! রাজাধিরাজ দেবচক্রবর্ত্তীর আবার সম্মানের দিকেও দৃষ্টিটুকু ঠিক আছে!—চলো, চলো শিগ্‌গির।

বন্দীকে লইয়া প্রহরীদ্বয় ও নগররক্ষী অগ্রসর হইল

১ম প্রহরী। এখানে আপনজন কেউ আছে?

সুবর্ণ। না। থাকলেই বা কি হ'তো? মুক্তি পেতাম তোমাদের হাত থেকে?

২য় প্রহরী। আমাদের হাত থেকে নয়, যমের হাত থেকে।

সুবর্ণ। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) হয় তো আছে। না, না, থাক্; তার চেয়ে মরণই ভালো।

প্রহরী সঙ্কেতে কি বলিবার চেষ্টা করিল

নগররক্ষী। (রুক্ষস্বরে) প্রহরী!

প্রহরীদ্বয় সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সুবর্ণগুপ্ত মস্তক অবনত করিল

যবনিকা বিরাম

ক্রমশঃ

মানসীর ব্যথা

কুমারী সলিলা মুখোপাধ্যায়

আমায় নিয়ে তার ভয়ের সীমা ছিলনা। আমায় সে যখন একদিন সোনালী জরি-মোড়া উষায় স্নিগ্ধ আলোয় বরণ করে এনেছিল তখন সে ছাড়া আর কেহ আমায় প্রীতির চক্ষে দেখেনি। একমাত্র সে ছাড়া সে বাড়ীর অন্যান্য সকলে আমায় অনাদর করত। সকলের মনে এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে আমি এ বাড়ীতে এসেই তাকে একেবারে নিজের করে নিয়েছি। সে সর্ব্বদা আমার সঙ্গ কামনা করত। বাড়ীর অন্য সকলের ভয়ে আমি অনেক সময় তার ব্যাকুল আহ্বান প্রত্যাখান করতাম কিন্তু তাতে কোন ফল হোতনা, তার কাছে হার আমায় স্বীকার করতেই হোত। এইসবের জন্য অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাকে নীরবে সহ্য করতে হোত। সে আমাকে বুকে জড়িয়ে বলত যে আমার জন্য সে সব সহ্য করতে পারে। একমাত্র আমি যদি তার সঙ্গে থাকি তাহলে সে হাসিমুখে সব দুঃখ বিপদ মাথা পেতে নিতে রাজী আছে। সে যখন কাজে বার হবার জন্য তৈয়ারী হোত, তখন সে আমার মুখের পানে এমন করুণভাবে তাকাত যে দেখে মনে হোত, সে যেন বলতে চায়, "আজ অনেকক্ষণ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে"—তখন তার এই দুঃখ দেখে আমার বুকটা দুলে উঠত। বাড়ী ফিরেই আগে আমায় আদর করে তারপর সমস্ত কাজ আরম্ভ করত। দিনের অবসানে সকল কাজের পর আমায় নিয়ে সে ছাদে উঠত। জ্যোৎস্না রাত, সারি সারি ফুল গাছের টব, নানারকম সুবাসিত ফুলের গন্ধের মাঝে বসে সে আমার সঙ্গে আলাপ করত। আমিও তার ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সুখী করতে চেষ্টা করতাম। এই আলাপ যে কতরাত্রি পর্য্যন্ত চলত তার কোন ঠিক থাকত না। এই সময় সে সকল দুঃখ ভয় ভুলে যেত।

ভগবান সুখ বেশীদিন রাখেন না। সুখ প্রভাতের শিশিরের মত ক্ষণস্থায়ী। হায়! আমার ভাগ্যেও এ সুখ বেশীদিন রইলনা। হঠাৎ একদিন তাকে কতকগুলি লোক ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে এল। সকলের কথাবার্ত্তাতে জানতে পারলাম যে তার জ্বর এবং বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। তার এই অবস্থা দেখে সকাতরে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম যাতে সে শীঘ্রই সেরে ওঠে। আমার এই কাতর প্রার্থনা বোধহয় ঈশ্বরের কানে পৌঁছায়নি। তার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। প্রতিদিন ডাক্তারবাবুকে পরীক্ষার পর জিজ্ঞাসা করতেন "দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি দিনে একবারও কি 'মানসী'র সাথে আলাপ করতে পারিনা।" আমায় আদর করে নাম দিয়েছিল 'মানসী'। ডাক্তারবাবু একটু হেসে বলতেন, "এত ব্যস্ত কেন, শীঘ্র শীঘ্র সেরে উঠুন, তারপরে যত পারেন মানসীর সঙ্গে আলাপ করবেন।" সে একটু ম্লান হেসে বলত "আর সেদিন আসবে না।" সত্যিই সেদিন আর এলনা। মাসখানেক এই রকম রোগভোগ করার পর একদিন সকলের কান্নার শব্দে বুঝতে পারলাম যে আমার সঙ্গে আলাপ করবার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে সে চিরদিনের মত চলে গেল। আমার বুকটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেঙ্গে যেতে লাগল। আমি কাতরকণ্ঠে সকলকে বলতে লাগলাম, "ওগো আমায় তার সঙ্গে যেতে দাও। একদিন যার সঙ্গে এই বাড়ীতে প্রথম পদার্পণ করেছিলাম পুনরায় তারই সঙ্গে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে দাও। আমি সকলের অনাদরে এ বাড়ীতে থাকতে পারব না"—কিন্তু হায়! আমার ভাষা যে কেউ বুঝতে পারেনা। আমি কাহাকেও কিছু বলতে পারিনা। আমি যে একটা বাঁশের বাঁশী।

সিনকোনা ও কুইনাইন

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(২)

জীবদেহে কুইনাইনের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কুইনাইনের তিক্ততাই প্রধানতঃ তাহাকে ম্যালেরিয়ার বীজাণু (parasites) নষ্ট করিবার ক্ষমতা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার বীজাণু ম্যালেরিয়া রোগীর দেহ হইতে বীজাণুবাহী মশকের (Anopheles) হুল ও লালার সহিত মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া মানুষের রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া মানুষের রক্তেই বংশ বৃদ্ধি করে। কুইনাইন সেবন করিলে ঐ কুইনাইন পাকস্থলী হইতে যকৃতের মধ্য দিয়া রক্তে সঞ্চারিত হয় এবং সমস্ত রক্তকে এরূপ তিক্ত করিয়া দেয় যে, ম্যালেরিয়া বীজাণু ঐ রক্তে আর টিঁকিতে পারে না। কুইনাইন রক্তে প্রবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বীজাণু প্রাণভয়ে দেহের সর্ব্ব অংশ হইতে পলায়ন করিয়া মস্তিষ্কের পিছন দিকে—যেখানে কোন ঔষধের প্রভাবই সত্বর উপনীত হইতে পারে না—সেইখানে গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু অন্যান্য রোগবীজাণুর ন্যায় ম্যালেরিয়ার বীজাণু অধিক দিন এই স্থানে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না; রক্ত হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পুনরায় দেহের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। সেই জন্যই কুইনাইন সেবনের নিয়ম হইতেছে কিছুকাল ধরিয়া প্রত্যহ অল্প অল্প কুইনাইন সেবন করা; কারণ এইরূপ না করিলে প্রথম কুইনাইন সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই বীজাণু পলায়ন করিলে

সিন্‌কোনা নার্শারীতে একবছর বয়স্ক সিন্‌কোনা চারা

জ্বর ছাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু দেহের প্রবহমান রক্ত অল্পকাল মধ্যেই যখন কুইনাইনকে বর্জ্জন করিয়া নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে, তখনই মস্তিষ্কের পিছন-দিক হইতে ঐ সমস্ত লুক্কায়িত বীজাণু পুনরায় বহির্গত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে ও রোগী পুনরায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। কিছুকাল ধরিয়া উপর্য্যুপরি কুইনাইন সেবন করিলে ঐ সমস্ত বীজাণু মস্তিষ্কের পিছন দিকে অধিক দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে বাহিরে আসে এবং কুইনাইনের প্রভাবে মারা পড়ে, ফলে রোগীর দেহ সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়া বীজাণুবর্জ্জিত হয়।

বীজাণুই যে ম্যালেরিয়ার কারণ এই তথ্যটি আবিষ্কৃত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে Laveran সাহেবের দ্বারা এবং ইহার দশ বৎসর পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে Golgi ম্যালেরিয়া বীজাণুর ক্রিয়াটিকে অপরের প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন। কিন্তু বীজাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই সিন্‌কোনার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও এই জাতীয় জ্বরের জন্ত চিরতা, গুলঞ্চ, নাটা ইত্যাদি অতিশয় তিক্ত ভৈষজ্য দেওয়া হইত। ইহাদের দ্বারাও ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হয় অর্থাৎ তিক্ত ঔষধ সেবনের ফলে দেহের রক্ত তিক্ত হইয়া দেহমধ্যস্থ বীজাণু ধ্বংস করে। তবে কুইনাইনের সহিত এই সমস্ত দেশী ঔষধের পার্থক্য এই যে, তিক্ততায় কুইনাইনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া ইহা অধিক কার্য্যকরী, উপরন্তু কুইনাইনের জীবাণুনাশী ক্ষমতাও আছে। অপর দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, কুইনাইন দেহের পক্ষে সামান্য ক্ষতিকারকও বটে, কিন্তু চিরতাপ্রমুখ ঔষধগুলি কোন দিক দিয়াই অনিষ্টকর নহে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যালেরিয়া, ইহার কারণ এবং কুইনাইন সেবন সম্বন্ধে জ্ঞান যখন কম ছিল এবং যখন সস্তা দামের অপরিশুদ্ধ কুইনাইন সাল্‌ফেট্ বাজারে বিক্রীত হইত, সেই সময় কুইনাইনের কুফল ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ পাইত। ইহাতেই জনসাধারণের মনে কুইনাইনের উপর কেমন একটা ভীতি আসে। উপরন্তু রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে কুইনাইনের সুফল ফলিতে পারে না, সেজন্যও কুইনাইনের উপর অনেকে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। এ ছাড়া গ্রামস্থ হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ ও অন্যান্য চিকিৎসকেরা নিজেদের ব্যবসার প্রতিদ্বন্দী বলিয়া কুইনাইনের উপর সর্ব্বদাই খড়্গহস্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের নিন্দাবাদও কুইনাইনকে জনপ্রিয় হইতে বাধা দেয়। একদল ব্যবসায়ী আছেন, তাঁহারা কুইনাইনের নিন্দা করেন কিন্তু কুইনাইনের সাহায্যে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীদের তাহাই সেবন করিতে দেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে এরূপ অনেকগুলি ঔষধ 'কুইনাইন-আট্‌কানো জ্বর' সারাইবার জন্য বিজ্ঞাপিত হইত, যদিও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহারা সমস্তই কুইনাইন দিয়া প্রস্তুত। কুইনাইন সেবনের বিধি না জানিয়া, নিতান্ত কম মাত্রায় সেবন করিয়া ও স্বার্থান্বেষী লোকের মুখে কুইনাইনের নিন্দা শুনিয়া বাংলাদেশে সাধারণ লোকের মনে কুইনাইনের উপর কেমন একটা অবজ্ঞা আসিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত মফঃস্বলে অল্প বিস্তর কুইনাইন-ভীতি আছে। সেখানে কুইনাইনের পরিবর্ত্তে কুইনাইন-প্রধান বহু পেটেন্ট ঔষধের উপর অচলা বিশ্বাস দেখা যায়। ঔষধ হিসাবে এগুলি অবশ্যই কার্য্যকরী, কিন্তু সাধারণ ম্যালেরিয়ায় কুইনাইনের ন্যায় এরূপ সুলভ বন্ধু আর নাই।

সিন্‌কোনার প্রচার

আমেরিকা হইতে কাউন্টেস্ অফ্ সিন্‌কনের সাহায্যে সিন্‌কোনা ছাল য়ুরোপে আনীত হওয়ার পর অতি দ্রুতগতিতে উহা লোক সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে Badius, ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে Roland Sturm, ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে Morton, ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে Pomet প্রভৃতি চিকিৎসাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সিন্‌কোনা সম্বন্ধে নানা গবেষণা করেন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে ঔষধের দোকানে সিন্‌কোনা বিক্রীত হইতে আরম্ভ হয় এবং পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ব্রিটিস ভৈষজ্য শাস্ত্রে (B. P.তে) ঔষধরূপে গৃহীত হয়। প্রায় এই সময়েই ইহা ভারতবর্ষে ঔষধরূপে পরিচিত হইয়াছিল, কারণ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে Fryer সাহেব ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার দেখিয়াছিলেন। ইহার এক

শত বৎসর পরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মীর মহম্মদ হুসেন কর্ত্তৃক লিখিত 'মখ্‌জান-এল্‌-অদ্বীয়' নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে সিন্‌কোনার ঔষধরূপে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে জেসুইট্‌ পাদ্রীদের সিন্‌কোনার আবিষ্কর্ত্তা বলা হইয়াছে। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট চতুর্দ্দশ লুই

নার্শারী হইতে সিন্‌কোনার চারা লইয়া আবাদে বসানো হইতেছে

Talbor নামক এক ইংরাজের নিকট হইতে সিন্‌কোনাচূর্ণ ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী উদ্ভিদ-বিশেষজ্ঞ La Condamine এবং Jussieu দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সিন্‌কোনা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রাথমিক তথ্য আবিষ্কার করেন। ইতিপূর্ব্বে যে Linnaeus সাহেবের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি La Condamineএর নিকট হইতেই প্রথম সিন্‌কোনার নমুনা পাইয়াছিলেন এবং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সিন্‌কোনা অফিসিনালিস সম্বন্ধে আত্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। Condamine সাহেবের নিকট তিনি ইহা প্রথম পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন 'Condaminea', কিন্তু এই নাম স্থায়ী হইতে পারে নাই ; প্রথম আবিষ্কর্ত্রী সিন্‌কন মহিষীর নামানুসারে ইহার সিন্‌কোনা নামই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। য়ুরোপে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে সিন্‌কোনার ত্বকচূর্ণ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইলেও প্রথম জীবিত সিন্‌কোনা গাছ ইহার দুই শত বৎসর পরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। বলিভিয়া হইতে ওয়েডেল (Weddell) সাহেবের প্রেরিত বীজ প্যারিসের Jardin des Plamtesএ প্রথম জন্মিয়াছিল।

ভারতবর্ষে সিন্‌কোনা

প্রাচীন ভারতে ম্যালেরিয়া ও সিন্‌কোনার সঠিক উল্লেখ নাই, তবে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সিন্‌কোনা যে অজ্ঞাত ছিল, তাহাও বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের সামান্য উল্লেখ অপরিহার্য্য।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ ও আয়ুর্ব্বেদের নিদান তুলনা করিলে ম্যালেরিয়াকে 'বাতজ্বর' বা 'বাতপিত্তজ্বর' বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদের মতে 'মহাদেব রাজা দক্ষের অপমানে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই নিঃশ্বাস হইতে প্রথম জ্বরের সৃষ্টি হয়।' আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঋষিরা বায়ু, পিত্ত ও কফ (বা শ্লেষ্মা) শরীরের এই তিনটি মূল উপকরণের যে-কোন একটি, দুইটি বা তিনটিরই বৈষম্য দেহের যাবতীয় পীড়ার কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। এই হিসাবে জ্বর আট প্রকারের বলা হইয়াছে। তাহারা যথাক্রমে :—

বায়ুর দোষে 'বাতজ', পিত্তের দোষ 'পিত্তজ' এবং কফের দোষে 'কফজ'—এই তিন প্রকার।'

যে কোন দুইটি একত্রে কুপিত হইলে 'বাত-পিত্তজ', 'বাত-শ্লেষ্মজ', এবং 'পিত্ত-শ্লেষ্মজ' এই তিনপ্রকারের হইতে পারে।

বায়ু, পিত্ত এবং কফ তিনটি একত্রে কুপিত হইলে তাহা 'সন্নিপাতজ'। এ ছাড়া অন্য কোন বাহিরের কারণে, যথা আঘাত, ভয়, মনোকষ্ট ইত্যাদি হইতেও জ্বর হইতে পারে। ইহাকে আয়ুর্ব্বেদে 'আগন্তুক' জ্বর বলা হয়।

এই আটপ্রকারের মধ্যে বাতজ্বরের লক্ষণ ম্যালেরিয়ার সহিত মিলিয়া যায়। চরক সংহিতার নিদান অংশে বাতজ্বরের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—'শুষ্ক বমন, শুষ্ক তালু, অরুচি, শরীরের বিনাম অর্থাৎ ঘাড় মুইয়া পড়া, কম্প, ভ্রম, প্রলাপ, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ ইত্যাদি। চরক আরও বলিয়াছেন যে, 'বর্ষাকালে ভূ-বাষ্পাদি দ্বারা এবং কালের স্বভাববশতঃ জল এবং ঔষধিসমূহ অম্লবিপাক' হওয়ায় আশু জ্বর উৎপাদন করে। মাধবনিদানও বাতজ্বরকে বর্ষা ঋতুর জ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এই জ্বরের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, বর্ষাকালে বায়ু কুপিত হইয়া বাতজ্বর উৎপাদন করে। (ম্যালেরিয়া জ্বর যে দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, এই বিশ্বাস পাশ্চাত্য জগতেও বহুদিন পর্য্যন্ত বদ্ধমূল ছিল ; এমন কি ম্যালেরিয়া শব্দটিই এই বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত। ল্যাটিন Malus অর্থে দূষিত এবং aer অর্থে বায়ু। ইংরাজী শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'দূষিত বায়ু'। (Castillani ও Chalmers প্রণীত Mannual of Tropical Medicine নামক গ্রন্থে গ্রন্থকারদ্বয় লিখিতেছেন It is suggested that the references in the Charaka Samhita to fevers spread by mosquitoes refer to malaria'.

আয়ুর্ব্বেদে বাতজ্বরের চিকিৎসা উপলক্ষে সিন্‌কোনা গাছের প্রত্যক্ষ কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু যতগুলি গাছগাছড়ার উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই অতি তিক্ত। সুশ্রুত সংহিতায় বাতজ্বরের চিকিৎসিতাধ্যায়ে চিরতা, গুলঞ্চ, পিঁপুল, কণ্টকারী ইত্যাদির বিধান দেওয়া হইয়াছে! এই সঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, শুশ্রুত সংহিতার দ্রব্য সংহরণীয় নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে ভৈষজ্যের যে ৩৭ প্রকার গণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেই সকল গণের সমস্ত প্রকার গাছ আজিও সম্পূর্ণরূপে নির্ণীত হয় নাই। সুশ্রুত নিজে এই সকল গাছ চিনাইবার ভার দিয়াছেন আরণ্য-ব্যক্তি

পরিণত সিন্‌কোনা বৃক্ষে ফুল ধরিয়াছে

অর্থাৎ কাঠুরিয়া, শিকারী ও বনবাসীদের উপর। কাজেই গাছ চিনাইবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা না থাকায় প্রাচীন ভারতে সিন্‌কোনার অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোন বিষয়েই জোর করিয়া কিছু বলা যায় না।

পুরাকালের অনুমানমূলক অধ্যায় ছাড়িয়া দিয়া ঐতিহাসিকভাবে সিন্‌কোনার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যেমন পেরুপ্রদেশের

লাটপত্নী সিন্‌কোনাকে প্রথম পরীক্ষা করিয়া সভ্য সমাজে প্রথম আনয়ন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ বড়লাটপত্নী লেডি ক্যানিং (Lady Canning) ভারতে সিন্‌কোনাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে সিন্‌কোনা হইতে কুইনাইন নিষ্কাসন প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পরে য়ুরোপে অনেকগুলি কুইনাইন কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের জন্য সমস্ত সিন্‌কোনাই দক্ষিণ আমেরিকা হইতে আনিতে হইত, অথচ সেখানে সিন্‌কোনা আবাদের কোন বন্দোবস্তই ছিল না। ইহা হইতেই য়ুরোপের দূরদর্শী পণ্ডিতগণ আশঙ্কা করিতেছিলেন যে, যেভাবে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সিন্‌কোনা গাছ কাটা আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে কিছুদিনের মধ্যেই সিন্‌কোনা ছাল দুষ্প্রাপ্য হইবে। সেইজন্য ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এবং ডাচ্‌গণ ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজে এই গাছ হয় কি না সে বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। ডাঃ আন্সলি (Dr Ainslie) ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে সিন্‌কোনা স্থাপন করা আদৌ সম্ভব কি না সে বিষয়ে আলোচনা করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ রয়েল (Dr, Forbes Royle) আসামে খাসিয়া পর্ব্বত ও মাদ্রাজের নীলগিরিতে ইহার আবাদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়েই Fritze Miquel প্রমুখ কয়েকজন উদ্ভিদবিদ্ পণ্ডিত জাভায় সিন্‌কোনা আবাদ আরম্ভ করিয়া দেন। ভারতে ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দেখা যায় যে, বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট বড়লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, ভারতে সিন্‌কোনা চাষ আরম্ভ করা উচিত। ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ম্যালেরিয়ায় ভারতে ব্যাপক মড়ক হওয়ার পর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে Sir Clements R. Markhamএর চেষ্টায় ইংলণ্ডের অন্তঃপাতি কিউ নামক স্থানে অবস্থিত Royal Gardensএর পরিচালকের সহযোগিতায় ভারতে সিন্‌কোনার গাছ ও বীজ আনীত হয় এবং দক্ষিণভারতে উটাকামণ্ডের নিকট ডোডাবেট্টা ও নীলগিরির নিকট নাডুবাতামে সিন্‌কোনা আবাদের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই, অযত্নে এই গাছ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অথচ এই সময়ের মধ্যেই জাভায় সিন্‌কোনা আবাদ বিশেষ উন্নতিলাভ করে। ভারতবর্ষে সিন্‌কোনার জন্য চেষ্টা করায় সঙ্কল্প করিয়া বড়লাটপত্নী লেডি ক্যানিং প্রায় এই সময়েই কলিকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের এণ্ডারসন (Dr. Thomas Anderson) সাহেবকে সিন্‌কোনা গাছ ও বীজ আনিবার জন্য জাভায় প্রেরণ করেন। তিনি জাভা হইতে গাছ ও বীজ সংগ্রহ করিয়া কতক সিংহলে, কতক নীলগিরি পর্ব্বতে এবং অবশিষ্ট দার্জ্জিলিং ও সিকিমে আনয়ন করেন। ইহাও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ব্যাপার। ইহা হইতেই Bengal Cinchona Departmentএর সূত্রপাত হয়। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে সিন্‌কোনার আবাদ দেখিবার পূর্ব্বেই ইহার পৃষ্ঠপোষিকা লেডী ক্যানিং ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন এবং এণ্ডারসন সাহেবও সিন্‌কোনার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা শেষ করিবার পূর্ব্বেই বরং ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহার পর Sir George King সিন্‌কোনা বাগানের ভার গ্রহণ করেন।

এই সময়ের পর হইতে বাংলা দেশের সিন্‌কোনা বিভাগ শিবপুর বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরিচালনাধীনে ছিল। ইনি শিবপুর বাগানের কাজ করিয়া অবসর সময়ে সিন্‌কোনার তত্ত্বাবধান করিতেন; অতএব সিন্‌কোনার প্রধান কার্য্যস্থল ছিল কলিকাতার। গার্ডেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তে সিন্‌কোনার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কার্য্য সরকারী বনবিভাগের সহিত সিন্‌কোনার চুক্তি। ৩০শে অক্টোবর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন কনসারভেটর অফ ফরেষ্ট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন উভয়ে একটি memoর দ্বারা এইরূপ ব্যবস্থা করেন যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে কোন সময়ে দার্জ্জিলিং অরণ্য বিভাগের অধীনস্থ যে কোন স্থান সিন্‌কোনার জন্য নির্ণয় করিলে কনসারভেটর সেই স্থানটি সঙ্গে সঙ্গেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অর্পণ করিবেন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিন্‌কোনা বাগানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্বালানী কাঠ বা অন্যান্য কাঠ সরকারী জঙ্গল হইতে বিনামাশুলে গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে যদি
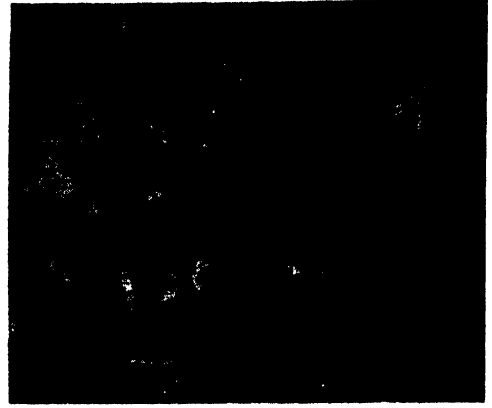
একটি পুরাতন সিন্‌কোনা আবাদ

এইরূপে সংগৃহীত কাষ্ঠাদি অপর কাহাকেও বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে বনবিভাগ সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ অংশই গ্রহণ করিবে।

বাঙ্গালাদেশে সিন্‌কোনা পরিচালনার পরবর্ত্তী ইতিহাস ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে। এই সময় হইতে সিন্‌কোনা বিভাগে নূতন ব্যবস্থা করার কথা চলিতেছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত নূতন বন্দোবস্ত না হয়, ততদিনের জন্য এই বিভাগ পরিচালনার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও কুইনাইন বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কুইনোলজিষ্টকে কারখানা বিভাগের ভার প্রদান করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি সমস্ত বিভাগের কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারের একজন মন্ত্রী ইহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ১৯৩৭এ স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে এই বিভাগ মাননীয় শ্রীপ্রসন্ন দেব রায়কতের অধীন ছিল; ১৯৪১ ডিসেম্বর হইতে ইহা মাননীয় শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মনের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। এ ছাড়া সিন্‌কোনার বাগানগুলি পরিচালন করিবার জন্য ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার ও ওভারশিয়ার আছেন। এই সমস্ত পদগুলি বি সি এস, বি ই এস, ইত্যাদি প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের সমকক্ষ করিয়া ইহাদিগকে B. Cin. S. বা Bengal Cinchona Service নাম দিবার জন্য জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন B. A (Cantab) B. Sc. (Cal) A. M I Chem. E বাংলা সরকারের সিন্‌কোনা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন D. Sc. (Cal) কুইনাইন কারখানার অধ্যক্ষরূপে, P. V. Osborne মাংপুতে সিন্‌কোনা আবাদের ম্যানেজাররূপে, H. Thomas মুন্‌সং আবাদের ম্যানেজাররূপে ও G. H. Fothergill সাহেব রংগো আবাদের ম্যানেজার রূপে কর্ম্ম করিতেছেন। বাগানের ম্যানেজারগণ সকলেই ইংলণ্ডের কিউ উদ্যান হইতে উদ্ভিদ্ বিষয়ে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন।

১৯৩৭এর পর হইতে সিন্‌কোনা বিভাগের হেড্ অফিস বোটানিক্যাল গার্ডেন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দার্জ্জিলিং জেলার মাংপুতে লওয়া হইয়াছে। এই মাংপু ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্রামের স্থান। শিলিগুড়ী হইতে কালিম্পং যাইবার পথে রবীন্দ্রনাথ মাংপুতে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের মাংপুতে অবস্থিতি সম্বন্ধে কুইনোলজিষ্ট শ্রীমনোমোহন সেনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত মাংপুতে রবীন্দ্রনাথ নামক পুস্তক হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ক্রমশঃ

জঙ্গম

বনফুল

৩৬

উৎপল ও সুরমার সহিত অনেকদিন পরে দেখা হইয়া শঙ্কর যেন তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বাদ খানিকটা ফিরিয়া পাইল—যেপূর্ব্বজীবনে সুরমার সান্নিধ্যে তাহার মনে প্রথম রং ধরিয়াছিল, রিণিকে ঘিরিয়া প্রথম প্রণয়ের উদ্বোধন হইয়াছিল, মিষ্টিদিদির মাদকতায় প্রথম পদস্খলন ঘটিয়াছিল, কলিকাতা শহরের প্রথম স্পর্শে যে জীবন মাধুর্য্য-আবিলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল সেই পূর্ব্বজীবনের অনুভূতি তাহার মনে আজ আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল স্মিতমুখী সুরমাকে দেখিয়া। আজ যেন শঙ্কর নূতন করিয়া আবার উপলব্ধি করিল বিংশ শতাব্দীর যে প্রকাশ আমরা নারী-প্রগতিতে কামনা করি, যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখিয়া আমরা আমাদের মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠাই তাহা যেন শোভনভাবে সার্থক হইয়াছে সুরমা-চরিত্রে। সুরমা সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, ধনীর কন্যা, ধনীর বধূ। কিন্তু তাহার ব্যবহারে কোনরূপ উগ্রতা নাই, তাহা অতিশয় বিনম্র ও সুমধুর। কথায় বার্ত্তায় আকারে ইঙ্গিতে সে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হয়না যে অধুনা-প্রকাশিত বিদেশী পুস্তক সে সর্ব্বদাই পড়িয়া থাকে অথবা তাহাদের চারখানা মোটরকার আছে। অথচ অতি-বিনয়ের অভিনয়ও তাহার নাই। তাহার এই সহজ সপ্রতিভ সুমার্জ্জিত রূপ শঙ্করকে বিস্মিত করিয়াছে—তাহাতে কোনরূপ আড়ষ্টতাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, সংযম আছে। সে পর-পুরুষের সঙ্গে মেশে, আলাপ করে, হাসি-ঠাট্টাতেও যোগ দেয় কিন্তু তাহার চরিত্রে কোথায় কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা কিছুতেই শোভনতার সীমা-রেখা অতিক্রম করে না। শঙ্করের কবিতা উপন্যাস গল্প লইয়া সে অনেক আলোচনা করিল। নীরা বসাকের মতো সোচ্ছ্বাসে নয়, নিপুদার মতো অবজ্ঞাভরেও নয়, যাহা বলিল সবিনয় শ্রদ্ধা সহকারেই বলিল। তাহাতে বাচালতা নাই, নিজের বিদ্যা জাহির করিবার চেষ্টা নাই, কিন্তু আন্তরিকতা আছে। সব লেখার প্রশংসা করিল না, কিন্তু যেগুলির অপ্রশংসা করিল তাহা অন্তরকে ব্যথিত করে না; কারণ তাহা ঠিক নিন্দা নয়, তাহা যেন 'আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই', অথবা 'আমার রুচি একটু আলাদা রকমের' জাতীয় মন্তব্য।

উৎপলের বয়স কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু মন বদলায় নাই। সে এখনও ঠিক তেমনি দুষ্ট-বুদ্ধি, তেমনি খামখেয়ালী আছে। আগের মতোই এখনও সে নূতন-কিছু করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ। দুই বৎসর কাগজ চালাইয়া শঙ্করের মতো সে-ও নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে যে সাহিত্য-ব্যবসা ভদ্রলোকের কর্ম্ম নহে। এদেশে ভদ্রভাবে সাহিত্য-ব্যবসা করিতে গেলে দেশটাকেই সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করিতে হইবে। জমি প্রস্তুত না করিয়া বীজবপন করা মূর্খতারই নামান্তর।

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "কি করে' জমি প্রস্তুত করবে তুমি?"

"শিক্ষা দিয়ে"

"কোথায় কাকে শিক্ষা দেবে—"

"ও তুই বুঝি শুনিস নি, আমি আমাদের গ্রামের জমিদারিটা কিনে ফেলেছি। সেইখানেই ভাবচি—"

"কিনে ফেলেচিস? রাজবল্লভবাবুরা কোথা গেলেন?"

"কোলকাতা চলে এসেছেন বোধহয়। আজকাল অধিকাংশ জমিদারই তো কোলকাতায় চলে আসছেন। পাড়া গাঁ আর ভাল লাগছে না তাঁদের"

"কি করে কিনলি তুই?"

"কেনারামবাবুর মারফত"

শঙ্কর এবং উৎপল এক গ্রামেরই ছেলে। উৎপল গ্রামের জমিদার হইয়াছে! সংবাদটা শুনিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

উৎপল সোৎসাহে বলিতে লাগিল—"রাজবল্লভবাবুর জমিদারি শুধু আমাদের গ্রামখানি নিয়েই নয়—পাশাপাশি দশখানা গ্রাম আছে। আমি ভাবছি—সমস্তটা নিয়ে একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করব। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি সবরকমের যাতে উন্নতি হয় তার চেষ্টা করার ইচ্ছে আছে—"

"অনেক টাকার দরকার তাতে"

"অনেক টাকা আমার আছে। শ্বশুর মশাই যে টাকা আমায় দিয়েছিলেন তার খানিকটা অবশ্য আমি জার্ণালিজ্‌ম্ করতে গিয়ে নষ্ট করেছি—খুব বেশী অবশ্য নয়, হাজার দশেক—কিন্তু বাকিটা শ্বশুর ম'শায়ের পরামর্শ মতো ব্যবসাতে খাটিয়ে অনেক লাভ হয়েছে। টাকার জন্যে আটকাবে না, তাছাড়া আমি হয় তো প্রথমে একখানা গ্রাম নিয়ে আরম্ভ করব, কেনারামবাবুকে আমার প্ল্যান লিখেও পাঠিয়েছি—"

"তিনি—"

শঙ্কর একটু হাসিল।

"তিনি ছাড়া গ্রামে আর তো কোন বুদ্ধিমান লোকই দেখতে পাই না। তাঁকে দিয়ে যে চলবে না তা বুঝতে পারছি, ভাল লোকের চেষ্টাতেও আছি; দেখি যদি—"

সহসা উৎপল থামিয়া গেল। খানিকক্ষণ শঙ্করের মুখের দিকে সোৎসুকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"তুই যাবি? তোকে বলতে ভয় করে। তোর আত্মসম্মান যে রকম প্রখর, হয় তো হঠাৎ চটে উঠবি। চল না দুজনে মিলে নিজেদের গ্রামটার উন্নতি করা যাক। তোর কথার সুরে মনে হচ্ছে আমার মতন তোরও ভুল ভেঙেছে। সাহিত্য টাহিত্য করে' কিছু হবে না এখন এদেশের। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই"

"তুই কি তোর অধীনে চাকরি নিয়ে যেতে বলছিস আমাকে"

"তা ঠিক বলছিনা, আমি তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি ইচ্ছে করলে স্বাধীনভাবেও থাকতে পার। জ্যাঠামশাই বা রেখে গেছেন তাতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া উচিত"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। বাবার উইলের কথা সে উৎপলকে বলিতে পারিল না। তাহার মনে পড়িল করালিচরণকে। করালিচরণের আগমন ও নির্গমন বার্ত্তা সে জানিত না। ভণ্টুর সহিত

তাহার দেখাই হয় নাই। এই সূত্রে তাহার মনে পড়িল ভণ্টুর বৌদিদি কাল আপিসে পণ্টুকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি একবার তাহার সাক্ষাৎ চান। কাল নানা গোলমালে যাওয়া হয় নাই। সময় করিয়া একবার যাইতেই হইবে। শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল।

"উঠচিস ? আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখিস একটু—"

"আচ্ছা"

৩৭

উপন্যাসে যাহা লিখিলে সমালোচকরা নাসা কুঞ্চিত করিয়া মনে করেন যে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইল, লেখক যেন নিজের সুবিধার জন্য জোর করিয়া ঘটনাটা এই স্থানে ঘটাইয়া দিলেন; জীবনে কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক সময় সত্যসত্যই তাহা ঘটে। শঙ্করের জীবনে ইতিপূর্ব্বে এরকম একাধিকবার ঘটিয়াছে, আবার ঘটিল।

শঙ্কর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার বাবার উইলের কথাই ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। হঠাৎ নজরে পড়িল ফুটপাথের একধারে মোস্তাক বসিয়া আছে। তাহার বগলে একগাদা কাগজ, এক কানে জবাফুল, অন্য কানে বিড়ি, নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া শাঁক-আলু ভক্ষণ করিতেছে। মোস্তাককে দেখিয়া শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল—হয়তো করালিচরণের খবর এ বলিতে পারে—অন্তত জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে ক্ষতি নাই।

"মোস্তাক, কি হচ্ছে এখানে—"

মোস্তাক শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মিলিটারি কায়দায় স্যালিউট করিল। বগল হইতে কাগজের গাদা ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেল।

"আহা তোমার সব পড়ে গেল যে, দাঁড়াও তুলে দিচ্ছি"

তুলিয়া দিতে গিয়া কিন্তু যাহা তাহার হাতে পড়িল তাহা যে এখানে এভাবে পাওয়া যাইতে পারে ইহা তাহার কল্পনাতীত ছিল। তাহার বাবার উইল এবং করালিচরণকে লেখা তাঁহার সেই চিঠিখানা!

"এ তুমি কোথা থেকে পেলে—"

মোস্তাক তাহার কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া পুনরায় শাঁক-আলুতে মন দিয়াছিল। কোন জবাব দিল না।

"বকশি মশাই কি ফিরেছেন?"

এই কথায় মোস্তাক হঠাৎ ফিক করিয়া হাসিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাড়িয়া দিল।

"আমি এই কাগজ দু'খানা নিয়ে যাই, কেমন"

মোস্তাক আপত্তি করিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। শঙ্কর ভন্টুর বাড়ি যাইতেছিল হঠাৎ মোড় ঘুরিয়া সে ঝামাপুকুরের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মনে হইল করালিচরণের খোঁজটা লইয়া যাওয়াই ভাল।

গলিটা ধোঁয়ায় ধূলায় আচ্ছন্ন। পানের দোকানের সামনে একজন কাবুলীওলা একজন পাওনাদারকে লাঞ্ছিত করিতেছে, কয়েকজন লোক একটু দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ঋণগ্রস্ত লোকটার দুর্দ্দশা দেখিতেছে। কাবুলীওলার টকটকে লাল মখমলের জরিবসানো ওয়েষ্টকোটটা স্বল্পালোকেই চকমক করিতেছে। তাহার অন্তরের লোলুপতা. নিষ্ঠুরতা যেন উহাতেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে শঙ্কর দেখিতে পাইল করালিচরণের বাসার সম্মুখে আলো জলিতেছে, কে যেন দাঁড়াইয়াও আছে। কাছে গিয়া দেখিল করালিচরণ নয়—একটি বারবনিতা—সাজসজ্জা করিয়া খরিদ্দারের প্রতীক্ষা করিতেছে। শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—মুখটা যেন চেনা-চেনা বলিয়া মনে হইতেছে। হ্যাঁ চেনাই তো—এ যে উষা—মুক্তোর প্রতিবেশিনী উষা। কেরাণীবাগান হইতে উঠিয়া আসিয়া এইখানে ঘর-ভাড়া করিয়াছে না কি। করালিচরণ কোথায় গেল।

"আসুন বাবু, অনেক দিন পরে যে, পথ ভুলে না কি—"

উষাও শঙ্করকে চিনিতে পারিয়াছিল, একমুখ হাসিয়া সম্বর্দ্ধনা করিল। শঙ্কর কিন্তু আর দাঁড়াইল না, দাঁড়াইতে পারিল না। সেই উষার হাসি আজ এত বীভৎস!

শঙ্কর প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গলি হইতে বাহির হইয়া গেল।

৩৮

বৌদিদি ঘরে খিল দিয়া স্বামীকে পত্র লিখিতেছিলেন। অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছিলেন—"তুমি আর দেরি কোরো না, তাড়াতাড়ি চলে এসে কাজে জয়েন কর। সংসারের খরচ দিন দিন বাড়ছে, ঠাকুরপো এত খরচ একা আর চালাতে পারছে না। কাল তার শ্বশুর এসেছিলেন, তিনি ঠাকুরপোকে না কি বলেছেন যে তিনি না হয় মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করবেন, যতদিন না তুমি চেঞ্জ থেকে ফিরে এস। ঠাকুরপো একটু দোনো-মোনো করছিল আমি কিন্তু তাতে মত দিলাম না। কুটুমের কাছ থেকে এভাবে টাকা নেওয়াটা কি ভাল দেখায়। কিন্তু এটাও ঠিক যে ঠাকুরপো বেচারা একা আর পেরে উঠছে না। তুমি আর ওখানে থেকো না, চলে' এস। এখানেই নিয়ম করে' থাকলে শরীর সেরে যাবে। নন্টুরও কদিন থেকে রোজ জ্বর আসছে সন্ধে বেলা, কুইনিন খেয়ে গেল না, ডাক্তারবাবু বলছেন ওরও না কি বুকের দোষ জন্মাচ্ছে। ভগবান কপালে কি যে লিখেছেন জানিনা—"

"বৌদি—"

বৌদিদি তাড়াতাড়ি কলম নামাইয়া খাতার তলায় চিঠিটা চাপা দিলেন, গায়ের কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লইলেন, তাহার পর খিল খুলিয়া বাহিরে আসিলেন।

"শঙ্কর ঠাকুরপো না কি। এসো, এত রাত্রে যে—"

"নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেল। ভন্টু ঘুমিয়েছে-না কি"

"সে শ্বশুর বাড়ি গেছে ইন্দুকে নিয়ে, জামাই ষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে"

"ও। আমাকে ডেকেছিলেন কেন বলুন তো—"

"বস বলছি, দালানেই এস—"

বাকুর ঘরের বন্ধ-দ্বারের দিকে তাকাইয়া শঙ্কর বলিল "বাকুও আজ বড্ড শিগগির শুয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে—"

"ওঁর শরীরটা খুব খারাপ। শোথটা কিছুতেই কমছে না" অন্য সময় হইলে হয়তো শঙ্কর বাকুর অসুখের বিষয়ে দুই চারিটা প্রশ্ন করিত। এখন কিন্তু তাহার মনের অবস্থা এরূপ যে এ সম্বন্ধে সে কিছুই বলিল না। মোস্তাকের নিকট হইতে বাবার

উইলের যে নকলটা সে পাইয়াছিল তাহা সে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে। বাবার আসল উইলটা দেশে দেরাজের মধ্যে আছে। উইলের কোন সাক্ষী নাই, উইল রেজেষ্টারি করা নাই। সেটাকেও অবলুপ্ত করিয়া দিলে উইলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতেই পারিবে না। কিন্তু শঙ্করের মনে হইতেছিল কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিলেই কি উইল ছিঁড়িয়া ফেলা যায়? আইনত যাহাই হউক, ধর্মত বাবার বিষয় সে কি লইতে পারে? বাবা তো তাহাকে কিছুই দিয়া যান নাই। সে যদি কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তাহা হইলে অমিয়াই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইবে, সে নয়—ইহাই তাহার বাবার অন্তিম ইচ্ছা।

"বস—দাঁড়িয়ে রইলে কেন—"

শঙ্করকে একটি মোড়া আগাইয়া দিয়া বৌদিদি নিজে একখানি আসন টানিয়া বসিলেন। শঙ্কর হঠাৎ যেন বৌদিদি ও পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হইল। মোড়াতে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল—"বাবাজি কোথায়"

"তিনি আজ চলে গেছেন"

"চলে গেছেন? কোথা গেলেন"

"তা জানি না। ঠাকুরপোর সঙ্গে আজ সকালে বাইরের ঘরে বসে অনেকক্ষণ কি যে কথা হল তাও জানি না। ঠাকুরপো আপিস চলে যাবার পর উনিও নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরের ঘরের টেবিলে একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন দেখলাম"

"কি লেখা আছে তাতে?"

মুচকি হাসিয়া বৌদিদি বলিলেন—"মাত্র একটি লাইন—আমার আর ভাল লাগছে না, চললাম"

বৌদিদি চুপ করিয়া গেলেন। একটা বিষাদের ম্লান ছায়ায় তাঁহার হাসি যেন বিবর্ণ হইয়া গেল।

"আমাকে ডেকেছিলেন কেন"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বৌদিদি বলিলেন, "ঠাকুরপোকে একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারবে তুমি? তুমিই যদি পার, আমি তো বলে' বলে' হার মেনেছি"

"কি কথা"

"ইন্দুকে নিয়ে ও আলাদা বাড়ি ভাড়া করে' থাকুক। এমন করে' আমাদের সব্বাইকে নিয়ে ও আর পেরে উঠছে না। ওর মুখের পানে চাইলে কষ্ট হয় আমার। আজকাল জলখাবার খাওয়া পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের সব্বাইকে জড়িয়ে কষ্ট পাবার কি দরকার ওর। উনি এসে কাজে জয়েন করুন, তাহলেই আমাদের একরকম করে' চলে যাবে। কিন্তু আমার কথায় ও মোটে কান দেয় না—"

শঙ্কর ইহাও প্রত্যাশা করে নাই। ভন্টুকে ও বৌদিদিকে পৃথক পৃথক কল্পনা করিতে সে অভ্যস্ত নহে। বৌদিদি একি বলিতেছেন!

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"কেন, কি হল কি"

বৌদিদি সবিস্তারে সব বলিতে লাগিলেন। ইন্দু অথবা ভন্টু কাহারও দোষ দিলেন না, কিন্তু অবস্থা যাহা সত্যই দাঁড়াইয়াছে তাহাই বলিতে লাগিলেন। শঙ্কর চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

৩৯

শঙ্কর যখন বাড়ি ফিরিল তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঢুকিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, লেটার বক্সের ভিতর একখানা মাসিক পত্রিকা রহিয়াছে। বাহির করিয়া দেখিল 'মজদুর দর্পণ'। উল্টাইতেই চোখে পড়িল তাহার সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কে কি লিখিল! নিরতিশয় ক্লান্তি সত্ত্বেও সে নীচের ঘরে বসিয়া সাগ্রহে প্রবন্ধটি পড়িতে শুরু করিয়া দিল—নিজের সম্বন্ধে এত বড় দীর্ঘ প্রবন্ধে কে কি লিখিয়াছে তাহা অবিলম্বে জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। পড়িতে পড়িতে কিন্তু তাহার সমস্ত মন ক্ষোভে গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। অন্য নাম দেওয়া থাকিলেও নিপুদা'র লেখা চিনিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। এই ঈর্ষ্যা-তিক্ত যুক্তি, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ছলে সকলকে হীন করিয়া দিবার এই প্রয়াস, সহজভাবকে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিবার এই বক্র-ভঙ্গী—নিপুদা ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না। সে যেন মানসপটে নিপুদা'র মুখখানা দেখিতে পাইল। গালের হাড় উঁচু, চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা, গালে কপালে মেচেতার দাগ, ঠোঁট বাঁকাইয়া কথা বলিবার ভঙ্গী। গ্রন্থকীট লোকটা জীবনে কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অবশেষে 'মজদুর'দের উদ্ধার করিবার ছুতায় যেখানে সেখানে নিজেকে জাহির করিয়া বেড়াইতেছে।

সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া শঙ্কর ঘাড় ফিরাইল। অমিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"তুমি এত রাত করে' ফিরলে"

"কেন কি হয়েছে"

"নিতাই ঠাকুরপো—"

অমিয়া আর বলিতে পারিল না, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট শঙ্করের কোলে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"কি করেছে নিতাই—"

অনেক জেরার পর শঙ্কর জানিতে পারিল—চাকরটা সন্ধ্যার সময় ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অমিয়া বাড়িতে একা ছিল। নিতাই কোথা হইতে মদ খাইয়া আসিয়া হঠাৎ তাহাকে পিছন দিক হইতে জাপটাইয়া ধরে। অনেক ধস্তাধস্তির পর নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে পাশের ঘরে খিল দিয়া বসিয়াছিল। নিতাই টেবিলের ড্রয়ার হইতে চাবির রিং লইয়া আলমারি খুলিয়া তাহার গহনার বাক্সটা লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

শঙ্কর হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল।

সহসা সে ঠিক করিয়া ফেলিল গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। সাহিত্যের স্বপ্ন তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে, কলিকাতায় আর সে থাকিতে পারিবে না।

৪০

পরদিন সকালে উঠিয়াই সে উৎপলের সহিত দেখা করিল। বলিল যে সে তাহার সহিত গ্রামেই ফিরিয়া যাইবে ঠিক

করিয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টাতে সে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু একটি সর্তে।

'সর্তটা কি'

'আমি তোমার অধীনে চাকরি করব'

'বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই তাতে। একজন ভাল লোক তো আমি খুঁজছিই—"

"কিন্তু আসল সর্তটা হচ্ছে কথাটা গোপন রাখতে হবে। তুমি এবং আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি একথা জানবে না—"

"তাহলেই তো মুস্কিলে ফেললে দেখছি। তৃতীয় একটি ব্যক্তির নিকট আমি ইতিপূর্ব্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তার কাছে কোন কিছুই গোপন রাখব না"

"ব্যক্তিটি কে"

উৎপল মুচকি হাসিল।

"সুরমা। ওর কাছে আমি সব বলি, এমন কি নিজের দুষ্কৃতি পর্য্যন্ত। তবে ও একটি লোহার সিন্দুক বিশেষ, একবার যা প্রবেশ করবে তা' আর সহজে বেরুবে না। যদি ইচ্ছে কর ওকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার।"

শঙ্কর ক্ষণকাল ভাবিল। তাহার পর বলিল—"বেশ। এইবার আমি উঠি তাহলে—ওই ঠিক রইল—"

"মাইনে কত নেবে তা বললে না"

"সে তুমি ঠিক কর। যা দেবে তাতেই আমি রাজি। তবে আর একটা কথা আছে, সেটাও বলে রাখা ভাল। মাইনে আমি কম নিতেও রাজি আছি, কিন্তু আমার কাজে তুমি যখন-তখন বাধা দিতে পারবে না। তাহলে কিন্তু বনবে না ভাই—"

উৎপল হাসিয়া বলিল—"বাধা দিতে হলে যে উত্তম প্রয়োজন তা' যদি আমার থাকত তাহলে আমি অন্যলোক খুঁজতাম না, নিজেই সব করতাম। সুতরাং সে বিষয়েও তুমি নির্ভয় থাকতে পার—"

৪১

হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণ ছাড়িতেছিল।

জিনিসপত্রসহ অমিয়াকে একটা গাড়িতে চড়াইয়া দিয়া শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ছিল। গতকল্য উৎপল সপরিবারে চলিয়া গিয়াছে, আজ সে যাইতেছে। সকলের সঙ্গেই তাহার প্রায় দেখা হইয়াছে—কেবল ভন্টুর সঙ্গে হয় নাই। বৌদিদি ভন্টুকে যাহা বলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহা এখনও পর্য্যন্ত অনুক্ত রহিয়াছে। কাল ভন্টুকে তাহার আপিসে ফোন করিয়া জানাইয়াছে যে সে বোধ হয় চিরদিনের মতো কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে; বাড়িতে গিয়া তাহার সহিত দেখা হয় নাই, বৌদিদিকেও সে বলিয়া আসে নাই যে হঠাৎ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া সে গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে, কেমন যেন চক্ষুলজ্জা হইল বলিতে পারিল না। অথচ ইহাই বলিতে সে গিয়াছিল। ভন্টু যদি ষ্টেশনে আসিয়া তাহার সহিত দেখা না করে তাহা হইলে হয় তো আর দেখাই হইবে না। আরও একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে তাহার সঙ্গে। শঙ্কর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ভন্টুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।...সিগারেট পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল, কিন্তু ভন্টু আসিল না। সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে চুনচুন আসিয়া হাজির হইল। চুনচুনের সহিতও সে দেখা করিয়া আসে নাই। শঙ্কর প্রত্যাশা করিতে লাগিল যে চুনচুনই আসিয়া প্রথমে কথা কহিবে, কিন্তু চুনচুন সে সব কিছুই করিল না। অন্যদিকে চাহিতে চাহিতে যেন সে শঙ্করকে দেখিতেই পায় নাই, এমনি ভাবে প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গেল। শঙ্কর খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর ডাকিল। মনে হইল চুনচুন যেন ডাকটাও শুনিতে পাইল না। সামনের প্ল্যাটফর্মে আর একটা প্রায়-খালি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দাঁড়াইয়াছিল—বোধ হয় কোন লোকাল ট্রেণ—তাহারই একটা কামরায় গিয়া চুনচুন উঠিয়া পড়িল। শঙ্করের মনে হইল হয় তো কোথাও যাইবে—আমাকে দেখিতে পাইল না। আগাইয়া গিয়া আলাপ করিবে কি না ভাবিতেছে এমন সময় ভন্টুর ভাইপো শন্টু আসিয়া উপস্থিত হইল।

"ভন্টু কোথায়—"

"কাকা এখানে আসবেন বলেই বেরিয়েছিলেন বাইক করে'। রাস্তায় হঠাৎ একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি পড়ে' গেছেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে খবরটা দিতে"

"খুব বেশী লেগেছে না কি"

"পায়ের হাড় ভেঙে গেছে"

"ও"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"যাবার সময় তার সঙ্গে আর দেখাটা হল না দেখছি। আচ্ছা তুমি যাও। আমি গিয়েই চিঠি লিখব—কেমন থাকে খবরটা দিও আমাকে—"

"আচ্ছা"

প্রণাম করিয়া শন্টু চলিয়া গেল। শঙ্কর হাতঘড়িটা একবার দেখিল, ট্রেণ ছাড়িতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। অমিয়াকে বলিল—তুমি বস আমি আসছি। শঙ্কর দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ষ্টেশনে সকলের ব্যবহারের জন্য যে ফোন আছে তাহারই সহায়তায় মেডিকেল কলেজ ইমারজেন্সি রুমের একটি ডাক্তারের সহিত সে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

"ভন্টু নামে আমার একজন বন্ধু এখুনি বাইক থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে আপনাদের ওখানে গেছে। তাঁকে যদি দয়া করে' একটু বলে' দেন যে শঙ্করবাবু ফোন করেছিলেন। নিতান্ত দরকারে আমাকে আজ চলে যেতে হচ্ছে, জিনিসপত্র সব ট্রেণে তুলে দিয়েছি, তা না হলে আমি এখনি তাকে দেখতে যেতাম। বলে দিন যে আমি হাওড়া ষ্টেশন থেকে ফোন করছি। আজ্ঞে হ্যাঁ এখুনি যদি বলে' দেন বড় ভাল হয়। মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে? ও আচ্ছা, উঠলে বলবেন। আচ্ছা—থ্যাংকস্"

ফোনটা করিয়া শঙ্কর যেন খানিকটা তৃপ্তি লাভ করিল। কিছু করিতে না পারিয়া সে যেন অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল। ট্রেণ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিতেই শঙ্কর একরূপ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে চুনচুন দাঁড়াইয়া আছে। শঙ্কর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে হেঁট হইয়া শঙ্করকে প্রণাম করিল। ট্রেণ চলিতে সুরু করিয়াছে—আর দাঁড়াইয়া থাকা চলে না, শঙ্কর উঠিয়া পড়িল। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি খবর তোমার? ভাল আছ তো—"

চুনচুন স্মিতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না, ট্রেণ চলিয়া গেল।

৪২

গ্রামে যখন শঙ্কর পৌঁছিল তখন প্রভাত হইতেছে। সে পূর্ব্বে কোন খবর দেয় নাই। সব জিনিসপত্র লইয়া এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল কেন তাহা শঙ্করের মা বুঝিতে পারিলেন না; সবিস্ময়ে শুষ্কমুখে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

"তুই হঠাৎ এসে পড়লি যে—"

"শহর আর ভাল লাগছে না, তোমার কাছেই থাকব এবার ঠিক করেছি—"

"আমার কাছে থাকবি?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা তিনি আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"আমি রাক্ষসী, তোর ভাইকে খেয়েছি—বাপকে খেয়েছি, তোকেও খেয়ে ফেলব—পালা, পালা, পালা আমার কাছ থেকে।" সেইদিন রাত্রেই তিনি সম্পূর্ণরূপে আবার পাগল হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন—এখানে ঠিক সুচিকিৎসা হওয়া সম্ভব নয়, রাঁচি পাঠানো উচিত। ক্রমশঃ

সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল

শ্রীসুহৃৎকুমার রায়

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় গত চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে "সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল" নামক প্রবন্ধে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক দিবস হইতে গুপ্তাব্দের আরম্ভ এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। যিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন, তিনি কখনই অল্প বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন নাই। ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে সমুদ্রগুপ্ত ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে কত বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজসিংহাসন লাভ করেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অতি অল্প বয়সে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তথাপিও সমুদ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকাল তদীয় (সমুদ্রগুপ্তের) ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ধরিলে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৫৬ বৎসর বয়সে রাজসিংহাসন লাভ করেন এবং মৃত্যুকালে ইহার বয়স ৯৪ বৎসর হয়, কারণ তিনি ৩৭৬-৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মগধ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কুমারগুপ্তের রাজ্যকাল ৪১ বৎসর। পিতা পুত্রের মধ্যে ২৫ বৎসরের ব্যবধান ধরিলে কুমারগুপ্ত পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন ৬৯ বৎসর বয়সে এবং ১১০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, যাহা হওয়া সম্ভব নহে। ঐতিহাসিকগণের অভিমত ৩২০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত (১ম) মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সমুদ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩৪০ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তদনুযায়ী সমুদ্রগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্ত অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন নাই এবং কুমারগুপ্তও শত বৎসরের অধিক কাল মানবজীবন ভোগ করেন নাই। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের অনুমান সত্য হইতে পারে যদি গুপ্তবংশের সম্রাটগণের কেহ পোষ্য পুত্র হইয়া থাকেন। অন্যথা গুপ্তাব্দের প্রথম বর্ষ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের বৎসর নহে, ইহা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের বৎসর।

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকারের উত্তর

শ্রীযুক্ত সুহৃৎকুমার রায়ের 'প্রতিবাদ' পাঠ করিলাম। আশাকরি তিনি বয়সে প্রবীণ নহেন, সুতরাং পাকা চুলকেই প্রবলতম যুক্তি বলিয়া দাবী করিবেন না। কিন্তু 'প্রতিবাদে' আমি এমন কিছুই পাইলাম না, যাহাতে আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধের কোন অংশের প্রত্যাহার বা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ঘটাইতে পারে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন প্রাপ্তি হইতে গুপ্তাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণের এই সিদ্ধান্ত আনুমানিক। ইহার পক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নাই। আমি এই সিদ্ধান্তটির পার্শ্বে অপর একটা অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছি এবং সমুদ্রগুপ্তের নালন্দা এবং গয়া লিপির তারিখের সহিত উহার যে সম্পর্ক আছে, তৎপ্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে ঐতিহাসিকগণের পূর্ব্বোল্লিখিত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কাহারও কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ আমার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন, যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতামহ মহারাজ শ্রীগুপ্তের রাজ্যারম্ভের সহিত গুপ্তাব্দের সম্পর্ক আছে কিনা, সে সম্ভাবনাও একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যাহা হউক, নিম্নে আমি রায় মহাশয়ের যুক্তিগুলির সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি।

(১) রায় মহাশয়ের মতে সমুদ্রগুপ্ত কখনই অল্প বয়সে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের কম বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন নাই; কারণ তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধ, রায়মহাশয় যেন একখানি স্কুলপাঠ্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" খুলিয়া আকবরের রাজত্ব সম্পর্কিত বিবরণ পাঠ করেন। আকবর চৌদ্দ বৎসর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন এবং তেষট্টি বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু তাঁহার সাম্রাজ্য যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক অধিক বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরকারের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" (পঞ্চম সংস্করণ), ৫৬ ও ২২৩ পৃষ্ঠার মানচিত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য।

(২) রায়মহাশয় স্থির করিয়াছেন, যে দ্বিতীয় পুত্রের অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জন্মকালে পিতা সমুদ্রগুপ্তের বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল। এই উক্তিও মূল্যহীন। কারণ, প্রথমতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে সমুদ্রগুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র, ইহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই; দ্বিতীয়তঃ বাল্য-বিবাহের দেশে ২০।২২ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। সমুদ্রগুপ্তের যুগে বোধহয় জন্মনিরোধের ব্যবস্থা ছিল না।

(৩) কুমারগুপ্তের জন্মসময়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বয়স ২৫ বৎসর ছিল; কুমারগুপ্ত ৬৯ বর্ষ বয়সে সিংহাসন লাভ করেন এবং তিনি ১১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, এ সমস্তই কাল্পনিক উক্তি। ইহার স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রায় মহাশয় কুমারগুপ্তের পক্ষে শতাধিক বৎসর বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব মনে করিয়াছেন। অসম্ভবটা কিসে? ভারতের ইতিহাসে শতাধিক বর্ষ আয়ু দুষ্প্রাপ্য নহে; এমন কি কুমারগুপ্তের ভগ্নী প্রভাবতী গুপ্তার বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল, তাম্রলিপিতে ইহার প্রমাণ আছে।

বিচিত্র-বেতার

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আমরা গোড়াতে ধরে নিয়েছিলাম গ্রীড্-জ্বালানি তার চলপথে ইলেকট্রন-চলাচল সুরু হয়েছে। এই প্রাথমিক ইলেকট্রন স্রোতকেই সাহায্য দিয়ে অবিরাম যাতায়াতি প্রবাহে পরিণত করা হ'য়েছিল। কিন্তু এই প্রাথমিক চলাচল এলো কোথা থেকে? প্রথমে এ্যানোডের পাম্পব্যাটারী খোলা (off) থাকে। জ্বালানি তার কিন্তু তার নিজের ব্যাটারীর জোরে গরম হ'তে লাগল। ইলেকট্রনেরাও বেরুতে লাগল হুহু করে, কিন্তু তাদের টেনে নেবার কেউ নেই। সঙ্গে পাম্প ব্যাটারী না থাকলে, শুধু এ্যানোড্ প্লেটের কিছুমাত্র মূল্য নেই। গ্রীড্ও চুপ করে আড়ি করে বসে আছে। তখন জুড়ে দেওয়া হ'ল পাম্পব্যাটারীকে এ্যানোডের সাথে। সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনদের উপর টান পড়ল। তারা ছুটতে লাগল এ্যানোডের দিকে। এ্যানোডের পথে ইলেকট্রন স্রোত হঠাৎ কেঁপে উঠল। এ্যানোড্ কয়েলের ভিতর দিয়ে এই হঠাৎ-স্রোত বইতে সুরু করার জন্য চারিদিকে সহসা চুম্বকক্ষেত্র প্রকাশ পেল। তারই ফলে মুহূর্ত্তের জন্য গ্রীড্-জ্বালানি-তার চলপথের তারকুণ্ডলে সঞ্চারিত বিদ্যুৎস্রোত দেখা দিল। এই আলোড়িত ইলেকট্রনই প্রাথমিক ইলেকট্রন চলাচল। এই অঙ্কুরিত চলাচলকেই সাহায্য করে অবিরাম যাতায়াতি প্রবাহে পরিণত করা হয়, যার আলোড়নে ইথার তরঙ্গের জন্ম।

যে পথে ইলেকট্রনেরা চলাচল করছে সেই পথ যত বেশী প্রশস্ত হবে, তাদের আঘাতে তত বেশী পরিমাণ ইথার আলোড়িত হবে। আর তত বেশী দূরে যেতে পারবে এই ইথার ঢেউএরা। সেই জন্য চলপথের সংরক্ষকের ফলক দুটিকে অনেকটা পৃথক্ ক'রে দেওয়া যেতে পারে। তবে এর চাইতেও একটি ভালো উপায় আছে। সে কৌশলটি হ'ল একটি তার কুণ্ডল এবং একটি সংরক্ষক দিয়ে নতুন আর একটি চলপথ তৈরী করে, তাকে আগের চলপথের পাশে বসিয়ে দিতে হবে। এই নতুন চলপথের সংরক্ষকটি কিন্তু মোটেই সাধারণ সংরক্ষক নয়—তার একটি ফলক হ'ল আকাশতার এবং অপর ফলকটি হ'ল মাটি স্বয়ং। এই চলপথের নাম আকাশতার চলপথ বলা যেতে পারে।
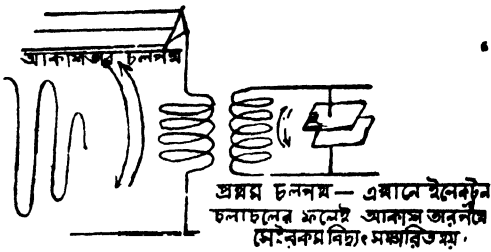
চিত্র নং ২৩

এখন পর্য্যন্ত আমরা কিন্তু কথার ছাপ সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে তার ভিতরকার ইলেকট্রন স্রোতের কমতি-বাড়তি হ'তে থাকে। মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎপ্রবাহে ঢেউ উঠতে থাকে, যে ঢেউএর চেহারা অবিকল কথার ঢেউএরই মত। এই মাইকের ইলেকট্রন তরঙ্গকে চালান করা হয় আমাদের প্রথম চলপথে, যেখানে ইলেকট্রনেরা অতি দ্রুত আনাগোনা করছে। চালান করার কাজটি অবশ্য করা হয় একটি ট্রান্‌স্‌ফরমার দিয়ে। মাইক্রোফোন থেকে আগন্তুক এই প্রবাহই এসে আমাদের অবিরাম ইলেকট্রন তরঙ্গকে (চলাচল) এমন করে কাট ছাট করে দেয়, যেন তার গায়ে কথার ঢেউ-এর ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে। একেই বলে স্বরায়ন। এই স্বরায়িত ইলেকট্রন তরঙ্গকে (বা চলাচলকে) ট্রান্‌স্‌ফরমার দিয়ে চালান করা হ'ল নতুন আকাশতার
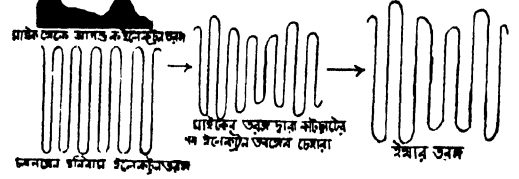
চিত্র নং ২৪

চলপথে। সেই পথের ইলেকট্রন চলাচলের অভিঘাতে ইথার সমুদ্র আলোড়িত হ'য়ে উঠল—চারিদিকে কথার ছাপমারা ইথারতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, আলাদা আকাশতার চলপথ ব্যবহার করবার কী প্রয়োজন ছিল? আকাশতার যখন একটি বড় রকমের সংরক্ষক ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আর একটা নতুন চলপথ তৈরী না করে গ্রীড্ জ্বালানিতার চলপথের সংরক্ষকের বদলেইত আকাশতার বসিয়ে দেওয়া যেত! তবে এত হাঙ্গামায় কাজ কি?

আমরা জানি গ্রীড্ চলপথে যে দোলায় ইলেকট্রনেরা দুলছে, যাচ্ছে, আসছে, সে দোলা হ'ল স্বাভাবিক দোলা (Natural Oscillation) এবং তাই এই দোলার দ্রুততা (frequency) নির্ভর করছে শুধু তারকুণ্ডল এবং সংরক্ষকের আয়তনের উপর। আমাদের কিন্তু বিদ্যুৎ চলাচলের দ্রুততা ঠিক রাখতে হবে, বাড়ালে কমালে চলবে না। তাই দেখতে হবে যেন তারকুণ্ডল এবং সংরক্ষকের আয়তন না বদলায়। বেশী ইথার আলোড়িত করতে হ'লে বড় আকাশতার দরকার এবং আকাশতার বড় হলে তাকে আর ঘরের ভিতরে রাখা যাবে না। ঘরের ভিতরে রাখবার অবশ্য আরও অসুবিধা আছে। কারণ তখন ঘরের দেওয়ালরাই অনেকটা ইথার ঢেউ শুষে নেবে। তার জোর যাবে কমে। সে যাই হোক, আকাশতারকে ত বাইরে রাখা হ'ল। কিন্তু বাইরে থাকলে হাওয়ার জোরে আকাশতার দুলতে থাকে, মাটি থেকে তার উচ্চতা কম বেশী হ'তে থাকে। অর্থাৎ আকাশতাররূপী সংরক্ষকের আয়তন বদলায়। গ্রীড্ চলপথেই যদি আকাশতার থাকত তবে এই আয়তন পরিবর্ত্তনের জন্য ইলেকট্রন চলাচলের দ্রুততারও কমবেশী হ'ত। কিন্তু দুটি আলাদা আলাদা চলপথ থাকার দরুণ তা' হবার সম্ভাবনা নেই। আকাশতার পথে যে ইলেকট্রনেরা যাতায়াত করছে—তাদের চলাচলের দ্রুততা নির্ভর করছে গ্রীড্‌চলপথের ইলেকট্রন-চলাচলের দ্রুততার উপর। গ্রীড্‌চল-পথের ইলেকট্রনেরা যেমন চলবে—আকাশতার পথের ইলেকট্রনদের ঠিক তেমনভাবেই দুলতে হবে। কিন্তু গ্রীড্ চলপথ রয়েছে ঘরের ভিতর—তার সংরক্ষক বা তার-কুণ্ডল, কারুরই আয়তনের পরিবর্ত্তন হবে না। তাই আকাশতারের আয়তন বদলালেও সেখানকার ইলেকট্রন চলাচলের দ্রুততার কিছুমাত্র কমবেশী হবে না।

(৫)

কথার ছাপ গায়ে এঁকে ইথার ঢেউ তো বেরিয়ে পড়ল চারিদিকে, এবার তাদের ধরবার পালা। কিন্তু ধরি বল্লেই ধরা অত সহজ নয়। অনেক দূরপথ চলে তারা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, তাদের তেজ যায় কমে।

প্রথমে তাদের তেজীয়ান করে নিতে হবে, তবে ত তাদের কাছ থেকে কথা আদায় করা যাবে। ইথার ঢেউকে ধরবার জন্ত একটি বৈদ্যুতিক চলপথ তৈরী করতে হবে—একটি সংরক্ষক এবং তারকুণ্ডল দিয়ে। সাধারণত আকাশতার দিয়েই সংরক্ষকের কাজ চালান হয়। আকাশতার এবং তার সাথের তারকুণ্ডলের আয়তন কমিয়ে বাড়িয়ে এমন করতে হবে যাতে ঐ পথে ইলেকট্রনদের স্বাভাবিক দোলনের দ্রুততা আগন্তুক ইথার ঢেউএর দ্রুততার সমান হয়। এই হ'ল গ্রাহক যন্ত্রের সুর-বাঁধা। সুর-বাঁধা থাকলেই ইথার ঢেউএর আঘাতে ঐ চলপথে যে ইলেকট্রন-স্রোত চলাচল করতে সুরু করে তার তেজ হয় খুব বেশী। প্রেরকযন্ত্র যদি থাকে খুব দূরে এবং গ্রাহকযন্ত্রের যদি সুরবাঁধা না থাকে, তা' হলে ইথার ঢেউএর আঘাতে যে ইলেকট্রন স্রোত চলাচল করতে থাকে, তার পরিমাণ হবে এত ক্ষীণ যে তা' দিয়ে কাজ চালানোই শক্ত হ'য়ে পড়বে।

সুর বেঁধে নিয়ে ইলেকট্রন চলাচলের জোর খানিকটা বাড়ানো গেল, কিন্তু তাতেও যখন কাজ চলেনা, তখন চাই অন্ত ব্যবস্থা—কোন কৃত্রিম কৌশল। একে বলা হয় সম্প্রসারণ। **Amplification or magnification of Signals**। সম্প্রসারণ মানেই হ'ল আয়তনে বাড়িয়ে দেওয়া। তার চেহারার আগে যা বৈশিষ্ট্য ছিল এখনও তাই থাকবে, আকারেই শুধু বেড়ে যাবে সম্প্রসারিত হ'লে। আমাদের ঢেউএর বেলাতেও তার মূল আকৃতি বা দ্রুততা সম্প্রসারিত হলেও ঠিক আগের মতই থাকবে। শুধু রবারের বেলুন যেমন ফুঁ দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ঢেউগুলিকেও তেমনি বড়ো করে দেওয়া হবে। আগে যে কটি ইলেকট্রন চলাচল করছিল এখন সম্প্রসারিত হ'লে তার কয়েকগুণ বেশী ইলেকট্রন চলাচল করবে। কিন্তু তাদের যাতায়াতের ভঙ্গী (Mode of oscillation) অথবা দ্রুততা (frequency) থাকবে ঠিক আগের মতই।

এখানে স্রোত এবং ঢেউ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। কোথাও যদি একটানা একমুখী কোন স্রোত বইতে থাকে এবং তার পর যদি সেই স্রোতের বাড়্‌তি-কমতি হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে আগের একমুখী স্রোতের উপর একটি যাতায়াতি প্রবাহ এসে পড়েছে। দু'টি প্রবাহ যখন একদিকে বয় তখনকার স্রোত আগের একমুখী প্রবাহের চাইতে বেড়ে যায়। আবার যখন তারা বিপরীত দিকে বয় (কারণ একটি স্রোত ত বারবার দিক পাল্টাচ্ছে) তখনকার স্রোত একমুখী স্রোতের চাইতে কমে যায়। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, সেই একমুখী স্রোতই বাড়তে-কমতে থাকে।

আবার কখনও এমনও দেখা যায়, একমুখী স্রোত গোড়াতে যা ছিল তার চাইতে মাঝে মাঝে শুধু বেড়েই যাচ্ছে, অথবা শুধু কমেই যাচ্ছে। শুধু বাড়্‌তি হচ্ছে, অথবা শুধু কমতিই হচ্ছে। সে ক্ষেত্রেও কিন্তু দুটি স্রোতই রয়েছে, কিন্তু দু'টিই একমুখী প্রবাহ—একটি অবিরাম স্রোত; অপরটি বইছে থেকে থেকে (Discontinuous unidirectional flow) এই দুটি একমুখী প্রবাহ যদি একই দিকে বয়, তবে থেকে থেকে শুধু বাড়তিই দেখা দেবে, আর যদি তারা বিপরীত দিকে বয় তবে থেকে থেকে শুধু কমতিই দেখা যাবে।

চিত্র নং ২৫

ইথার ঢেউএর আঘাতে আকাশতার চলপথে যে ইলেকট্রন চলাচল আরম্ভ হ'ল তাদের প্রথমে ম্যাগ্নিফাই করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে কথার পোষাক খুলে নিতে হবে। সম্প্রসারণ করা যেতে পারে ট্রায়োড ভাল্‌ভ্ দিয়ে। ঢেউকে যত বেশী শক্তিশালী করতে হবে তত বেশী ভাল্‌ভ্ ব্যবহার করা দরকার। একটার পর একটা সিঁড়ি গেঁথে মানুষ যেমন উপরে উঠতে পারে, আগত ঢেউও একটার পর একটা এ্যাম্প্‌লিফাইং ভাল্‌ভের ভিতর দিয়ে গিয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হ'তে থাকে। আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা শুধু একটি ভালভের কথাই আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে বাদশার পুকুরের পাম্পের কথা আর একবার মনে করা যাক্। সেখানে আমরা দেখেছি, কল ঘুরিয়ে জলের জোর কমবেশী করা যায় অতি সহজে। সম্প্রসারণের জন্ত কলটিকে খুলে রাখতে হবে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। খানিকটা খুলে দিলে জলের স্রোত যে পরিমাণে বেড়ে যাবে ঠিক সেই পরিমাণ বন্ধ করে দিলেও যেন তত পরিমাণের জলের স্রোত কমে যায়। আরও একটি জিনিষ দেখা দরকার। কলটি যতটুকু খোলা যাবে জলের স্রোতও ঠিক তত পরিমাণে বাড়া চাই। এক পাক ঘোরালে জলের প্রবাহে যে পরিবর্ত্তন হবে দু'পাক ঘোরালে ঠিক তার ডবল হওয়া চাই। কলটিকে যেমন মাঝামাঝি খুলে রাখতে হয়, ভালভের বেলাতেও গ্রীডটি সেই রকম একটা বিশেষ অবস্থায় গোড়াতেই এনে নিতে হবে। আমরা জানি গ্রীডের উপর ইলেকট্রন এনে তাকে নেগেটিভ করে দিলে তার বিকর্ষণে এ্যানোড যাত্রী ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে যায়—এ্যানোড প্রবাহও ক্ষীণ হয়। আবার গ্রীড্ থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে পজিটিভ করে দিলে তার আকর্ষণে এ্যানোড্ স্রোত বেড়ে যায়। এখন গ্রীডের সেই বিশেষ অবস্থার কথা বলা যাক। সেই অবস্থাটি হবে এমন যাতে গ্রীড থেকে কতগুলি ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে গেলে এ্যানোড্ প্রবাহ যে পরিমাণ বাড়বে, ততগুলি ইলেকট্রন গ্রীডের উপর নিয়ে এলে এ্যানোড প্রবাহ ঠিক সেই পরিমাণ কমে যাবে। আবার তার ডবল পরিমাণ ইলেকট্রন নিয়ে এলে এ্যানেড স্রোত আগের বারে যতটা কমেছিল, এবারে তার ঠিক ডবল পরিমাণে কমে যাওয়া চাই। সাধারণত যে রকম ভালভ্ আমরা ব্যবহার করি তাতে এই অবস্থায় আনতে হলে গ্রীডের উপর গোড়াতেই কিছু পরিমাণ ইলেকট্রন এনে জমা করে রেখে দিতে হয়—জলের কলটিকে যেমন গোড়াতেই মাঝামাঝি খুলে রাখতে হয়। গোড়াতেই গ্রীডকে (বা জলের কলকে) যে অবস্থায় এনে নিতে হয় তাকে বলা যেতে পারে কার্য্যকরী অবস্থা (working point); তবে সবরকম কাজের জন্ত একই অবস্থা কখনই কার্য্যকরী হ'তে পারেনা সে কথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রসারণের জন্ত গ্রীডের যে অবস্থাকে কার্য্যকরী অবস্থা বলব, অন্ত কাজের জন্ত সে অবস্থা কার্য্যকরী নাও হ'তে পারে। গোড়াতে কিছু ইলেকট্রন দিয়ে গ্রীডকে ত কার্য্যকরী অবস্থায় নিয়ে আসা হ'ল। গ্রীড্ সামান্ত ঋণাত্মক হ'লেও খানিকটা এ্যানোড্ প্রবাহ বর্ত্তমান থাকে। এই ঋণাত্মক গ্রীডের উপর যথাক্রমে পজিটিভ এবং নেগেটিভ এনে ফেললে এ্যানোড্ প্রবাহও বেড়ে এবং কমে যাবে যথা নিয়মে। কিন্তু এ্যানোড্ প্রবাহে বারবার বাড়্‌তি এবং কমতি হওয়ার মানেই হ'ল, এ্যানোডের আসল স্রোতের উপর একটি যাতায়াতি প্রবাহও এসে জুটেছে। তাহলে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে সম্প্রসারণের জন্ত গ্রীডকে প্রথমেই একটি বিশেষ অবস্থায় এনে নিতে হবে, তারপর তার উপরে চাপাতে হবে পজিটিভ-নেগেটিভের বোঝা। সাধারণতঃ গ্রীডের উপর গোড়াতেই কিছু ইলেকট্রন জড়ো করে রাখলে তবে গ্রীড এই প্রাথমিক বিশেষ অবস্থায় আসে। অবশ্য ভাল্‌ভ্ বিশেষে এবং দরকার অনুসারে অনেক সময় ঋণ-বিদ্যুৎ বা ধনবিদ্যুৎ কিছু না হলেও চলে, আবার কখনও বা ধনবিদ্যুতের প্রয়োজন হয়, ইলেকট্রনের বদলে। যদি সেই বিশেষ অবস্থায় গ্রীডকে নিয়ে আসতে ঋণ বা ধন বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় তাহলে তখন সেই কার্য্যকরী অবস্থায় নিয়ে আসাকে আর একটি বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়—সেই নামটি হ'ল **Biasing**, যার বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া শক্ত।

ইথার ঢেউএর সংঘাতে আকাশতারে যে ইলেকট্রন চলাচল সুরু হ'ল

তাদের চালান করা হ'ল ট্রান্স্‌ফরমারের সাহায্যে পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি বৈদ্যুতিক চলপথে। এই চলপথটি তৈরী করা হয়েছে অন্য সবারই মত
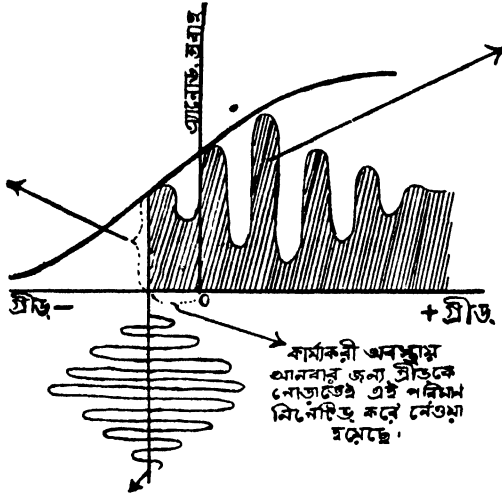
চিত্র নং ২৬

তারকুণ্ডল এবং সংরক্ষক দিয়ে। সংরক্ষকের ফলকদু'টিকে আবার জুড়ে দেওয়া হ'ল গ্রীড এবং জ্বালানি তারের সাথে। গ্রীডকে

পথে এই আগন্তুক যাতায়াতি প্রবাহই হ'ল গ্রীডের উপর ইথারের ঢেউ থেকে পাওয়া যাতায়াতি প্রবাহের বড়ো বা সম্প্রসারিত সংস্করণ (Amplified form of incoming signals). এই হ'ল সম্প্রসারণের মূল কথা। বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যাবে, গ্রীডের ঢেউটাই কিন্তু সম্প্রসারিত হল না। কিন্তু ক্ষীণ গ্রীডের ঢেউএর "বদলে" আমরা এ্যানোডের যাতায়াতি প্রবাহকেই সম্প্রসারিত সংস্করণ বলে ধরে নিলাম।

একথা মনে রাখতে হবে যে সম্প্রসারিত যাতায়াতি প্রবাহ স্বরান্বিত, তা থেকে কথার পোষাকটি খুলে নিতে হবে আর একটি ভাল্‌ভের সাহায্যে। অবশ্য কৃষ্ট্যাল দিয়েও এই কাজ চলতে পারে এবং আগে চলতও তাই। আজকাল কিন্তু ভাল্‌ভই ব্যবহার করা হয়। ভালভের একটা বড়ো গুণ হল এই যে, সে শুধু কথাই আদায় করে নেয় না তার জোরও খানিকটা বাড়িয়ে দেয়। তা না হলে কাজের সুচারুতার দিক থেকে দেখতে গেলে কৃষ্ট্যালই ভালো।

এ্যাম্পলিফাইং ভালভের এ্যানোড্ পথে সম্প্রসারিত (এবং স্বরান্বিত) যাতায়াতি প্রবাহ বইছে। তার কাছ থেকে কথার পোষাকটি খুলে আনবার জন্য একটি ট্রান্সফরমার দিয়ে আর একটি ভালভের গ্রীড্-জ্বালানিতার-চলপথে তাকে চালান করে আনা হয়। কথার পোষাক খুলে নিতে হলে এই কথার-ছাপ মারা যাতায়াতি প্রবাহের যাওয়া বা আসা, একটা অংশ বাতিল করে দিতে হবে অর্থাৎ তাকে পরিণত করতে হবে একমুখী স্রোতে। এই স্রোত তখন একমুখী হবে বটে কিন্তু একটানা অবিরাম স্রোত হবে না, থেকে থেকে বইবে। ইলেকট্রনেরা ঝাঁক বেঁধে

চিত্র নং ২৭

কার্য্যকরী করে নেবার জন্য প্রাথমিক যেটুকু ঋণাত্মক বা ধনাত্মক করা দরকার (সাধারণ ক্ষেত্রে নেগেটিভ্) তা করা হল একটা ব্যাটারীর সাহায্যে। ইথার ঢেউ এসে পড়লেই আকাশতারে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীড্ জ্বালানিতার চলপথে ইলেকট্রনেরা যাওয়া-আসা করতে থাকে। সেই জন্য গ্রীডের উপরেও ইলেকট্রনেরা ছুটাছুটি করতে থাকে—কখনও এসে জমা হয় আবার কখনও বা সরে যায়। এই ইলেকট্রন আসা-যাওয়ার ফলেই গ্রীড্ যথাক্রমে নেগেটিভ এবং পজিটিভ হ'তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এ্যানোড্ প্রবাহেরও কমতি বাড়তি হ'তে থাকে অর্থাৎ গোড়াকার একটানা একমুখী এ্যানোড স্রোতের উপর একটা যাতায়াতি প্রবাহ এসে পড়ে। গ্রীডের উপর ইলেকট্রনদের যে ধরণে এবং যে দ্রুততার সঙ্গে যাওয়া-আসা চলছে—এ্যানোড প্রবাহের ভিতর আগন্তুক যাতায়াতি প্রবাহের ধরণ এবং দ্রুততাও অবিকল তাই। তবে গ্রীডের উপর সামান্য কটি ইলেকট্রনদের যাতায়াত চলছে, আর এ্যানোডের পথে চলছে তার চাইতে বহুগুণ বেশী ইলেকট্রনের যাতায়াত। এই যা পার্থক্য। এ্যানোডের

বেঁধে একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে মুখ করে ছুটবে। এই সবিরাম একমুখী স্রোতকে পাঠাতে হবে টেলিফোন বা লাউড্‌স্পীকারের ভিতর দিয়ে। ইলেকট্রনদের এই দলগুলিকে দূর থেকে সম্মিলিতভাবে দেখলে মনে হবে একটি ঢেউ বয়ে চলেছে। কিন্তু এ ঢেউ সাধারণ ঢেউএর মত নয়। জলের কথাই ধরা যাক। সাধারণ ঢেউএর বেলা শান্ত অবস্থা থেকে জল একবার ঠেলে উপরে উঠছে, আবার নীচে নেবে যাচ্ছে। কিন্তু এই ঢেউএর বেলা ইলেকট্রন স্রোতের শান্ত অবস্থা থেকে ঢেউ শুধু উপরেই উঠছে থেকে থেকে (অথবা শুধু নীচেই নামছে)।

এখানে বলা দরকার লাউড-স্পীকারের বা টেলিফোনের পর্দ্দা ইলেকট্রনদের মত মোটেই সূক্ষ্ম দেহধারী নয়। আবার স্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহের অর্দ্ধেক কাটা পড়বার পর একমুখী যে ইলেকট্রনদলগুলি থাকে তারা একটার পিছনে আর একটা এত দ্রুত টেলিফোন বা লাউড-স্পীকারের তারের ভিতর দিয়ে ছুটে যায় যে পর্দ্দাটির পক্ষে দলগুলিকে আলাদা আলাদা করে ঠাহর করে দেখাই সম্ভব নয়। তার কাছে মনে হবে,

সব দলগুলিই গায়ে গায়ে মিশে একটি একটানা দল হ'য়ে পথ চলছে। দুটো দলের মাঝখানে যে খানিকটা সময় ফাঁক পড়ল সেটা সে না বুঝলেও ইলেকট্রন প্রশেশনের ভিতরে ইলেট্রনের সংখ্যা কেবলই কম বেশী হচ্ছে তা সে বুঝতে পারে। সে মনে করে ইলেকট্রন প্রবাহের উপর ঢেউ উঠছে।

চিত্র নং ২৮

এই ঢেউএর চেহারা কিন্তু কথার ছাপের মত অর্থাৎ বাতাসের ঢেউএর মতই। এই কথার ঢেউএর মত চেহারাওয়ালা ঢেউই সাড়া তোলে লাউডস্পীকারে এবং তার পর্দার আঘাতে বাতাসে ঢেউ উঠতে থাকে—শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

তাই আমাদের কাজ হ'ল শুধু ত্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহের অর্দ্ধেকটা কেটে দিয়ে তাকে সবিরাম একমুখী স্রোতে পরিণত করা। ত্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহের পথে কৃষ্ট্যাল দরজা বসিয়েও যে এই কাজ করা যেতে পারে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ভাল্ভ্ লাগিয়ে এই কাজ করবার দু'টি পদ্ধতি আছে। প্রণালী দু'টির ইংরাজী নাম হ'ল Anode Bend Rectification এবং Grid Leak Rectification.

ক্রমশঃ

যদুপুরে প্রাপ্ত একটি শৈবমূর্ত্তি

শ্রীগুরুদাস সরকার

যে মূর্ত্তিটির আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল তাহা মুর্শিদাবাদ জেলার যদুপুর নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছিল। যদুপুর রাঙ্গামাটীর সন্নিকটস্থ গ্রাম প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের অন্তর্গত। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় ৬॥• ইঞ্চি বেদিকার প্রস্থ ৩॥ ইঞ্চি। দুইটী পার্শ্ব-দেবতা ব্যতীত বেদীর বাম ভাগে একজন উপাসিকা নতজানু হইয়া উপবিষ্টা। বেদীর মধ্যভাগে উপবিষ্ট বৃষভ দেবতার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি দ্বিহস্ত, ব্রোঞ্জধাতু বিনির্ম্মিত। এই ধাতুকেই বোধহয় পঞ্চ লৌহ বলা হইত। মূর্ত্তির এক হস্তে ত্রিশূল, অপরটি মনে হয় যেন বরদমুদ্রায় সন্নিবিষ্ট। বামদিকে স্কন্ধের উপর একটি বিততফণা সর্প। এ শ্রেণীর একটি রুদ্র-শিব মূর্ত্তি, কান্দীর অনতিদূরে একটি গ্রামের পর্ণশালা মধ্যে দেখিয়াছিলাম। উহা কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত। মূর্ত্তিটি কত প্রাচীন—অভিজ্ঞগণ উহার নির্ম্মাণভঙ্গী দেখিয়া নির্ণয় করিতে পারিবেন। আলোকচিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে মূর্ত্তিটি একটি ফ্রেমের মধ্যস্থলে পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান। মস্তক আলঙ্কারিক প্রভামণ্ডলে বেষ্টিত। শিরোদেশের জটামুকুট কতকটা মুকুটাকারেই পরিকল্পিত। মূর্ত্তিটির জানুদেশের ঠিক উপরিভাগে মাল্যাকৃতি দুইটি প্রসাধক অলঙ্কার ভুগ্নভাবে সন্নিবদ্ধ। মূর্ত্তিটি উপবীত ধারণ করিয়া আছেন, বুঝিবা সর্পোপবীতই হইবে। গলদেশে মাল্য ও হস্তে কেয়ূর বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। মূর্ত্তিটির বর্ত্তমান মালিক বহরমপুর গোরাবাজারের প্রবীণ চিকিৎসক ডাঃ শশীভূষণ দত্ত। বিশেষজ্ঞগণ মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করেন ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। মনে হয় এ অঞ্চলে শিবোপাসনা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগে শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত কর্ণ সুবর্ণের নরপতি ছিলেন। তিনি যে শৈব ছিলেন তাহা তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায়।

শৈবমূর্ত্তি

মনের গোপন কোণে

মোহাম্মদ আবদুল হক

তর্ক করা আফজালের একটা স্বভাব। তাই জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয় যখন তার স্কুল-পরিদর্শন শেষ করিলেন, তখন সেক্রেটারী এবং অন্যান্য শিক্ষকবর্গকে ডিঙাইয়া সে তাঁহার সহিত বাধাইয়া তুলিল একটা তর্ক। এইরূপে—

বলিল—আমাদের স্কুলে ত্রিশটাকা সাহায্য দিতে হবে।

চেয়ারম্যান বলিলেন—এম-ই স্কুলের সাহায্য নতুন অবস্থায় প্রায় কুড়িই হয়। তারপর উন্নতি দেখালে বাড়ানো চলে।

আফজাল বলিল—না স্যর। প্রথম অবস্থাতেই কমপক্ষে ত্রিশ কিম্বা চল্লিশ টাকা সাহায্য দেওয়া দরকার, তারপর না-হয় কমানো যেতে পারে।

—তার মানে?

—মানে—শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখনই তার সাহায্যের বেশী দরকার। সাবালক হ'লে কম সাহায্য পেলেও তার চলে।

চেয়ারম্যান হাসিয়া বলিলেন—শিশুর সংগে স্কুলের তুলনা!—

আফজাল বলিল—তাই স্যর। যা স্বাভাবিক তা-ই আমি ব'লেছি। এই স্বাভাবিক পন্থার অনুসরণ আপনারা করেন না তাই তো অকালে শত শত স্কুল গোয়াল ঘরে পরিণত হয়। শিশু যখন থাকে সূতিকাগৃহে, তখন মাত্র দু'এক ডোজ অষুধ না দিয়ে যদি তার সুপুষ্টির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে বোধহয় অত অপমৃত্যু ঘটে না।

চেয়ারম্যান আফজালের তরুণ বয়সের পানে চাহিয়া বলিলেন—সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে আপনি ঢুকেছেন শিক্ষাবিভাগে, তাই এর নীতি এখনো বোঝেন নি। ভাল ক'রে কাজ করলে মজুরী পাওয়া যাবে, সাহায্য পাওয়া যাবে—এই সর্ত থাকে বলেই শিক্ষকেরা আর ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা ভাল ক'রে কাজ করবার প্রয়াস পান।

আফজাল বলিল—কিন্তু এই নীতি যে চূড়ান্ত রকমের ভুল আমি সেই কথাই বলতে চাই। গভর্ণমেণ্ট চায় যে, ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের ভার নিক জনসাধারণ, গভর্ণমেণ্ট তাতে দেবে কিছু সাহায্য কিছু সহযোগিতা কিছু উৎসাহ—যদি সে সব পাবার উপযুক্ত কাজ তারা করে তুলতে পারে। কিন্তু আমি বলি, গভর্ণমেণ্টেরই উচিৎ ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের ভার নেওয়া, আর জনসাধারণের উচিৎ তাতে সাহায্য করা, সহযোগিতা করা, উৎসাহ দেওয়া।

চেয়ারম্যান বলিলেন—আপনি জানেন না অনেক-কিছুই। ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট করেছেন, করছেন। আপনি নিয়মিতভাবে খবরের কাগজ পড়েন তো?

আফজাল বলিল—আজ্ঞে না। কারণ, এখানে নিয়মিত খবরের কাগজ পাওয়া যায় না। যাঁরা নিয়মিত পান তাঁরা হয়ত অনেক কিছুই বেশী জানেন আমার চেয়ে, কিন্তু এছাড়া তাঁদের থেকে আমার পার্থক্য বেশী নেই। 'চেষ্টা'র কথা খবরের কাগজে জেনে কী হবে, যদি জনসাধারণের জীবনে বাস্তব কাজের রূপে তাকে না দেখতে পাই? গবেষণা করা রিপোর্ট তৈয়ার করা আর পরিষদ-ঘরে বক্তৃতা দেওয়ায় কিছুই লাভ নেই। আমরা জানতে চাইনে, দেখতে চাই।

চেয়ারম্যান বলিলেন—এরকম সস্তা বুলি আমরা অনেক শুনেছি, খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু শিক্ষাকর দিতে বলা হয় যখন, তখন শিক্ষাপ্রার্থী ওই জনসাধারণই চীৎকার ক'রে আকাশ ফাটিয়ে তোলে। গভর্ণমেণ্টের ব্যয় যে তার আয় থেকে, আর সে-আয় যে জনসাধারণের থেকে, তা ওরা বোঝে না। গভর্ণমেণ্টকে ব্যয় করতে বলে ওরা, কিন্তু তার আয়ের কথাটা তারা ভুলে যায়।

আফজাল বলিল—গভর্ণমেণ্টের আয় জনসাধারণের থেকে তা মানি, কিন্তু জনসাধারণের আয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে অনেক-কিছুই করতে পারেন এ-ও তো সত্যি। কিন্তু অর্থনীতির এই প্রশ্নের আলোচনা আমি করতে চাইনে; আমি বলতে চাই যে, যেখানে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য দেয় কিম্বা সর্বদিক দিয়ে পরিচালনা করে, সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে financed হ'বার নিয়ম ক'রে দিয়ে গভর্ণমেণ্টের উচিৎ, এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সবরকমের ভার হাতে নেওয়া।

চেয়ারম্যান বলিলেন—বড়ো শিক্ষায়তনগুলোকে আপনি নিজেদের চেষ্টায় financed হতে বলেন?

আফজাল বলিল—খুব সাধারণ হেতুর জন্য তেলা মাথায় তেল না দিয়ে, যাদের চুল বিনা তেলে রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে তাদের মাথায় তেল দেওয়াই সবচেয়ে স্বাভাবিক ব'লে আমার মনে হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ের পথ অনেক সহজ। ওখানে যারা ছেলেদের পাঠায় তাদের প্রায়ই বেতন দেবার সামর্থ্যের অভাব নেই; কিন্তু এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাদের ছেলে পড়ে তাদের বেশীর ভাগেরই আর্থিক অবস্থা যে কেমন সে বিষয়ে আপনাদের ধারণা একেবারেই আবছা। তাই আপনাদের কর্মপন্থার পদে পদে ত্রুটী। প্রোফেসরেরা চাল বজায় রাখবার জন্যে টাকা খরচ করেন, আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত-মাষ্টারেরা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ছাত্রদের অভিভাবকদের বাড়ীতে বাড়ীতে, তারপর যা পায় তা দিয়ে তাদের খাওয়াও চলে না, পরাও চলে না, পরিজনদের যথারীতি ভরণপোষণ করাও চলে না।

চেয়ারম্যান ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আপনার একথায় জবাব অনেক কিছুই দেওয়া যায় মাষ্টার সাহেব, তবে আমার সময় খুব কম।

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেক্রেটারী এতক্ষণ চুপ করিয়া তর্ক শুনিতেছিলেন, এবার বলিলেন—আমাদের স্কুলের সাহায্য কিন্তু কিছু বেশী দিতেই হবে।

চেয়ারম্যান বলিলেন—দেখি, যদি পারা যায়—

তিনি বিদায় লইলেন। সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন—বেশ তর্ক করলেন কিন্তু।

আফজাল বলিল—কয়া নেহাতই দরকার, মাষ্টার সাহেব। আমরা চুপ ক'রে থাকি বলেই কিছু পাই না। আমাদের এখন সতেজ কণ্ঠে জানাতে হবে আমাদের অভাবের কথা।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন—নিশ্চয়ই। কথায় বলে—কাঁদলে ছেলে দুধ পায়, না কাঁদলে পায় না।

আফজাল বলিল—কাঁদলে? কান্না নয় মাষ্টার সাহেব, দাবী। জাতিকে জ্ঞানের প্রথম আলোক দান করে যারা, তাদের তুচ্ছ মনে ক'রে উপেক্ষা করা যে পাপ একথা আমাদের সতেজ কণ্ঠে জানাতে হবে।

সেকেণ্ড মাষ্টার বলিলেন—তা তো ঠিকই।

এর পর আরো কিছুক্ষণ এ লইয়া আলাপ-আলোচনা চলিল, কিন্তু থাক্ সে সব।

ছুটীর পর বাড়ী ফিরিবার পথে তৃতীয় পণ্ডিত হাশেম আলি বলিলেন—স্কুলের সাহায্য যদি বাড়ে তবে আমাদের বেতনও তো বাড়বে, মাষ্টার সাহেব?

আফজাল বলিল—কিছু কিছু বাড়বে বৈকি। কিন্তু কেবল বোর্ডের সাহায্য বাড়লেই যথেষ্ট হবে না। আমাদের স্কুলের আয় আরো অনেক উপায়ে বাড়াতে হবে। তা না হ'লে আপনার মাত্র পাঁচ টাকায় কী ক'রে চলে? এই স্কুলে পণ্ডিতী করা ছাড়াও আপনাকে আবার একটা নৈশ মক্তব কেন করতে হয়? কয়েকটা টাকার জন্ত অত দূরের একটা জুম্মা মসজিদে কেন আপনাকে এমামতি করতে যেতে হয়?

সত্যি। হাশেম আলি চুপ করিয়া রহিলেন। সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিবার জন্ত অতগুলো তাঁহাকে করিতে হয়। আট দশটা পরিজন তাঁহার, তারপর কতকালের ঋণ—

বাড়ীর কাছে আসিয়া হাশেম আলি বলিলেন—দাওত নেন মাষ্টার সাহেব।

আফজাল বলিল—ইন্‌শা আল্লাহ্ আরেক দিন।

সে নিজের পথে চলিয়া গেল।

২

নিজের চারটা ছোটোবড়ো ছেলে-মেয়ে, বিধবা বোন হামিদাবানু, বুড়ো মা, এক আত্মীয়া আর তার এক ছেলে, এই লইয়া হাশেম আলির সংসার। স্ত্রী মারা গিয়াছে বছর তিন আগে, কিন্তু আর তিনি বিবাহ করেন নাই। করিতে পারেন নাই বলিলেই ঠিক হয়। তিনি গরীব, তার ওপর তাঁর চার ছেলে বর্তমান; এইজন্ত তাঁহাকে মেয়ে দিতে অনেকেই নারাজ। রাজী যদি কেহ হয় তবে তারা মেয়ের জন্ত এমন অনেক কিছুই চাহে বা লিখিয়া দেয়, যা দিবার মত সামর্থ্য তাঁর নাই। তার ওপর একটা গুরু দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে। বিধবা বোনের নিকা দিতে হইবে। তাতে খরচ আছে। নিজে বিবাহ না করিলেও চলিবে, কিন্তু বালবিধবা যুবতী ভগ্নীর নিকা না দিলে অনেকে অনেক কথাই বলিবে।

সেদিন রাত্রে মক্তব হইতে ফিরিয়া আসিয়া আহারে বসিয়া তিনি বলিলেন—আমাদের নতুন মাষ্টার সাহেব ভারী তেজিয়ান লোক।

হামিদা চুপ করিয়া রহিল। সে জানে এর পর একটা কাহিনী আরম্ভ হইবেই। হাশেম আলির স্বভাব, দিনে যা ঘটে রাত্রে তা বোনের কাছে বিবৃত করা। না করিলে তাঁর পেটটা যেন ফুলিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাঁর এই স্বভাবের জন্ত হামিদা অনেক কিছুই জানিতে পারে। স্কুলের প্রায় প্রত্যেকটী ছেলের নাম সে জানে; পড়াশুনায় কে কেমন, কোন্ শিক্ষক কত বেতন পান এবং কার স্বভাব কেমন তা-ও সে জানে। এই একঘেয়ে কাহিনীগুলি শুনিতে যে তাহারে খুব ভাল লাগে তা নয়, কিন্তু না শুনিলেও নয়। কেননা ভাই না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার যে কোনো কথা ধৈর্যের সহিত শোনা তার একরকমের সহানুভূতি। দরিদ্র বড়-ভাইকে এই সহানুভূতিটুকু দিতে সে কোনোদিন কার্পণ্য করে নাই।

হাশেম আলি বলিলেন—আমাদের স্কুলে তাঁর আগে আরো তো হেডমাষ্টার ছিলেন, কিন্তু এতখানি বুকের পাটা কারুর দেখিনি। আজ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন তর্ক। উঃ, সে কি ভয়ানক তর্ক! শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান আমাদের মাষ্টার সাহেবের কাছে হেরে গেলেন।

চেয়ারম্যান মাষ্টার সাহেবের নিকট হারিয়া গেলেন! কেমন করিয়া, জানিবার জন্ত হামিদার মনে কৌতূহল জাগিল। অন্যান্ত পরিদর্শনের সময় শিক্ষকেরা কেমন ভয়ে শুকাইয়া চামসী হইয়া থাকেন তা তো তার শোনা আছে। কিন্তু এ আবার কেমন মাষ্টার—?

ব্যাপারটা কী সে জানিতে চাহিল। হাশেম আলিও সব কথাই খুলিয়া বলিলেন। উপসংহারে বলিলেন—এখন বুঝে দেখ, এমনি ক'রে অবিচারের প্রতিবাদ না করলে কি প্রতীকার হয়? এবার বেশ উপযুক্ত একটা মাষ্টার পাওয়া গেছে। তিনি বলেছেন—যেমন ক'রে পারা যায় সকলের বেতন বাড়াতেই হবে। না বাড়ালে শিক্ষকদের চলবে কেন?

হামিদা প্রশ্ন করিল—তাঁর বাড়ী কোথায়?

হাশেম আলি বলিলেন—পাবনা জেলায়। ভদ্রলোকের বয়স কিন্তু খুবই কম। মাত্র এবছর আই-এ পাশ ক'রেছেন; এখানে আসবার আগে অন্ত ইস্কুলে কাজ করতেন। কিন্তু সেখানে সেক্রেটারীর সঙ্গে মতের মিল হয়নি বলে চ'লে এসেছেন।

শুধু সেই রাত্রি নয়। অতঃপর প্রত্যেক রাত্রেই হাশেম আলি তাঁহার ভক্তিভাজন বয়োকনিষ্ঠ মাষ্টার সাহেবের বিবিধ কর্মতৎপরতার সংবাদ হামিদাবানুর নিকট পেশ করিতে লাগিলেন। আফজালের শিক্ষাদানপ্রণালী এবং শিক্ষার মধ্য দিয়া জাতি গড়িয়া তুলিবার আদর্শ-সম্বন্ধে শীঘ্রই হামিদাবানু ওয়াকে-ফহাল হইয়া উঠিল। সভা ডাকিয়া শিক্ষার দিকে জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্ত তাহার বিপুল উদ্যমের প্রশংসাও সে শুনিল।

একদিন হামিদা বলিল—তোমাদের মাষ্টার সাহেবকে তো কৈ একদিনও জিয়াফত দিলেনা।

হাশেম আলি বলিলেন—মাঝে মাঝে দেই, কিন্তু তিনি আসেন না।

হামিদা বলিল—আমরা গরীব মনে করেই হয়ত আসেন না; কিন্তু তিনি বিদেশী মানুষ, পরের বাড়ীতে কেমন খেতে পান-না-পান তার তো ঠিক নেই, তাই তোমার উচিৎ তাঁকে মাঝে-মাঝে ডেকে খাওয়ানো।

হাশিম আলি ভাবিয়া দেখিলেন—তাই তো। তবে নিজেরা

গরীব বলিয়াই তিনি কোনোদিন জোর করিয়া বলেন নাই। বলিলেন—আচ্ছা, কাল তাহ'লে তাঁকে ধ'রে নিয়ে আসব। সকালে আনি, কী বল?

একটু ভাবিয়া হামিদা বলিল—না। কাল রাতের দাওত দিয়ো।

পরদিন সন্ধ্যার পরে। হাশেম আলি তাঁহার ক্ষুদ্র বৈঠকে আফজালের সহিত গল্প করিতেছেন। তাঁহার পুত্র করিম, আবেদ, এবং মেয়ে নঈমাও সেখানে আছে। হেডমাষ্টার সাহেব আজ তাহাদের অতিথি, তাঁহার এতখানি সান্নিধ্যের এই সুযোগ তাহারা ছাড়িবে কেন? একমাত্র সঈদাকে হামিদা ধরিয়া রাখিয়াছে। সে সর্বজ্যেষ্ঠা, অতএব বাহিরের সহিত অন্দরের সংযোগকর্ত্রীরূপে সে-ই মনোনীত হইয়াছে।

খাবার দেওয়া হইল। হামিদা নিঃশব্দে গিয়া দাঁড়াইল বৈঠকের পেছনদিকে। টাটির এক জায়গায় একটু ফাঁক দিয়া সে দেখিবার চেষ্টা করিল সেই মানুষটাকে, যার সম্বন্ধে অসংখ্য বিচিত্র সংবাদ সে শুনিয়াছে।

দেখিল—সবার ডাইনে করিম, তারপর মাষ্টার সাহেব, তারপর আবেদ, তারপর বড় ভাই, তারপর নঈমা। সঈদা তাহাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে কোনো কিছুর দরকার হইলে আনিয়া দিবার জন্য।

মাষ্টার সাহেব সত্যই অল্পবয়স্ক। হামিদার চেয়ে বয়সে বোধ হয় দু'তিন বছর বড় অর্থাৎ বয়স গোটা উনিশ-কুড়ি। রাত্রি বলিয়া ভাল দেখা যায় না। তবে মনে হয় দাড়ি কামানো মাথার চুল খুব বড় নয়, সিঁথি কাটিবার মত নয়। চুলগুলি সামান্য একটু ডানদিকে ঘুরিয়া আছে মাত্র। মাঝে মাঝে তিনি তাঁহার দুই পাশের আহাররত ক্ষুদে ছাত্রদের থালার পানে চাহিতেছেন, তাহাদের কোনো কিছুর প্রয়োজন কিনা দেখিবার জন্য। তাঁহার চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে।

হামিদা শুনিল আফজাল বলিতেছে; আপনার বাড়ীর রান্না ভারী সুন্দর।

হাশেম বলিলেন—আমার মা ভাল রান্না জানতেন কিনা, তাঁর কাছেই আমার বোনের শিক্ষা।

—আপনার বোন এখানেই থাকেন বুঝি?

—জী। বছর চারেক আগে ওর স্বামী মারা যায়, কিন্তু খরচের টানাটানিতে, তারপর ভাল সম্বন্ধ না আসায়, ওর নিকা দিতে পারিনি। আমার বোনটা খুব লেখাপড়া জানে আর সুন্দর কিনা, ওর নিকাতো আর যেখানে-সেখানে দিতে পারিনা।

—জী, তা তো ঠিক।

হামিদা তার বড়-ভাইয়ের সরলবুদ্ধিকে মনে মনে অভিসম্পাৎ দিতেছিল, এমন সময় শুনিল, কে যেন ডাকিতেছে—ফুফু!

হামিদা চমকিয়া ছিদ্র হইতে মুখ টানিয়া লইল। এ সঈদার কণ্ঠস্বর। সে তাহাকে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইল কী করিয়া? সঈদা আরেকটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—ফুফু! এ ডাক তো বৈঠকখানার ভিতর হইতে নয়! হামিদা আবার ছিদ্রে মুখ রাখিল। ভিতরে সঈদা নাই। সে যে কখন্ সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেছে হামিদা খেয়ালই করে নাই। সে ত্রস্তপদে হেঁসেলে গিয়া দেখিল, একটা বাটী হাতে সঈদা দাঁড়াইয়া আছে। সঘন নিঃশ্বাস চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী রে!

—ডা'ল লাগবে।

হামিদা তাড়াতাড়ি ডাল ঢালিয়া দিল।

৩

এর পরেও হামিদার তাগিদে এবং হাশেম আলির নিমন্ত্রণে বা পরোক্ষভাবে হামিদার নিমন্ত্রণে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তাহাদের কুটীরে আফজালের আতিথ্য ঘটিতে লাগিল। প্রতিবারেই আহারের সময় হামিদা লঘুপদে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত সেইখানে, যেখানে থাকিয়া বেড়ার একটুখানি ছিদ্র দিয়া দেখা যায় ভোজনরতদের। কোরান-হাদিসের অনুশাসনে অপরিচিত অনাত্মীয়ের সম্মুখে যাওয়া নিষিদ্ধ, অতএব ঐভাবে দেখিয়াই হামিদা তাহার দেখিবার-কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু ব্যাপারটা হইল এই যে, যেহেতু একটুখানি ছিদ্র-দিয়া দেখা আর সাম্‌নাসাম্‌নি দেখার মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি, সেহেতু তাহার শুধু-দেখিবার কৌতূহল ভাল করিয়া দেখিবার কৌতূহলে পরিণত হইল, কিন্তু তৃপ্তির পথ অবরুদ্ধই রহিয়া গেল। ছিদ্রটুকু বড়ো করিবার কোনোই উপায় নাই, সমাজ বড়ো করিতে দিবেনা। সাপ্তাহিক নিমন্ত্রণের দিনটা ছিল নির্দিষ্ট এবং সেদিন ছাড়া আর কোনোদিন যে আফজাল তাহাদের বাড়ী আসিত না তা নয়; সে আসিলে,তাহাকে সকলের অগোচরে ক্ষণিকের জন্য একটুখানি দেখা ছাড়া হামিদার আর কিছুই করিবার থাকিতনা।—রান্নার প্রশংসা মেয়েদের পক্ষে গৌরবের আর আনন্দের বিষয়। এই প্রশংসার লোভ হামিদাকে যে কোন্‌দিকে পরিচালিত করিল তাহা কেহই, এমন কি সে নিজেও জানিতে পারিলনা।

একদিন হাশেম আলি বলিলেন—আজ হঠাৎ মাষ্টার সাহেব মালদহ গেছেন। কেন, ব'লে যাননি। আসবেন তিনদিন পরে।

ভগ্নীকে এ সংবাদ দিবার একটা কারণ ছিল। এ বাড়ীতে আফজালের আতিথ্যগ্রহণের নির্দিষ্ট দিন এইটা।

হামিদা কিছু বলিল না। তাহার মনে হইল, কে যেন তাহার সাপ্তাহিক পাওনাটা কাড়িয়া লইল।

সেদিন স্কুল যাইবার সময় হাসেম আলিকে হামিদা বলিল—আজ বুঝি মাষ্টার সাহেব ফিরবেন?

—বোধ হয়।

একটু সংকোচের সাথেই হামিদা বলিল—তবে তাঁকে আজ রাত্রের দাওত দিয়ো।

—আচ্ছা। সরলবুদ্ধি হাশেম আলি চলিয়া গেলেন।

দুপুরে কোনো কাজ না থাকায় হামিদা শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, আজ কী কী রান্না করা যায়।

* * * *

রান্নার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া অন্ধকার হইবার একটু আগে হামিদা গেল বৈঠকখানা পরিষ্কার করিয়া দিতে। এত অপরিষ্কার হইয়া আছে! মাষ্টার সাহেব দেখিয়া ভাবিবেন, এ বাড়ীর মেয়েরা কোনো কাজের নয়।

পরিষ্কার করা সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, এমন সময় সঈদার

উদ্দেশে একটা ডাক দিয়া আফজাল বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। হামিদাকে সেখানে দেখিয়া সংকোচে একবার সে বোধহয় বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু গেলনা। জিজ্ঞাসা করিল—আপনিই সঙ্গীদার ফুফু বুঝি ?

হামিদা মৃদুস্বরে বলিল—জী।

—আজ আপনাকে দেখলাম। আপনার রান্নাটা ভারি ভাল কিনা, ভাবি—যার রান্না এত ভাল, সেই মানুষটাই বা দেখতে কেমন।

কথাটা এড়াইবার জন্ম হামিদা বলিল—মালদা কেন গিয়েছিলেন ?

—একটু বেড়াতে। গিয়ে কী ক'রেছি শুনবেন ? জানলাম, স্কুল থেকে খানিক দূরের কিছু জমি নিলামে উঠেছে। আমি নিজের নামে ডেকে নিলাম।

হামিদা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—নিজের নামে ! কেন ? জমি আপনি কী করবেন ?

—ভাবছি এখানে বাড়ী বাঁধবো।

—তাহলে তো বেশ হয়। একটু থামিয়া হামিদা বলিল—পরিবার নিয়ে আসবেন বুঝি ?

আফজাল হাসিয়া বলিল—পরিবার ? দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। তাইতো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভাবছি, আর ঘুরবোনা। এখানেই বিয়ে ক'রে স্থায়ী হব।

—পাত্রী দেখেছেন কোথাও ?

—দেখেছি বই কি !

হামিদা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে কে ?

আফজাল একটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বলছিনে।

হামিদা চলিয়া আসিল। ইস্, কার এত দরাজ নসীব—

* * * *

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে মা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাছে বসাইয়া পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন—হামিদা, মাষ্টার সাহেব তোকে নিকা করতে চান। তোর মত জানবার জন্ম হাসেম আমাকে বলেছে।

হামিদা যে কী জবাব দিবে ভাবিয়া পাইলনা। মাষ্টার সাহেব নিকা করিতে চাহিয়াছেন তাহাকে ! এত ভাগ্য তাহার ! এজন্ম আবার তাহার মতের দরকার ! অল্পবয়সে যখন তাহার একবার বিবাহ হইয়াছিল তখন তো তার মতামতের দরকার হয়নি, এখন দরকার কেন ? মাষ্টার সাহেবের কথায় সোজাসুজি রাজী হইয়া গেলেই তো হয়। হামিদার দেহ নত হইয়া মায়ের কোলের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

আফজালের গৃহনির্ম্মাণ শেষ হইলে তাহার সহিত হামিদার নিকা হইয়া গেল।

হামিদা স্বামীগৃহে—স্বামীর কক্ষে—স্বামীর পার্শ্বে। আফজল ঘোমটা সরাইয়া—হামিদার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—এই মুখটা একদিন মাত্র দেখেছি। সেদিন থেকে ভেবেছি—বলিয়া হামিদাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন—

* * * *

এমন সময় 'হামিদা, হামিদা !'—বলিয়া কোথা হইতে হাসেম আলি আসিয়া একেবারে দুয়ারে দাঁড়াইলেন—

স্বামীর বাহুদু'টী ঝাড়িয়া ফেলিয়া হামিদা ধড়মড় করিয়া একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং দাঁড়াইয়াই বুঝিল, এতক্ষণ সে শুধু স্বপ্নই দেখিতেছিল। সহসা ঘুম হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া তাহার মাথাটা একটু ঘুরিয়া উঠিল, তাই সে পুনরায় বিছানায় বসিয়া পড়িল।

হাশেম আলি উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন—এমন অবেলায় ঘুমুচ্ছিস্ বহিন্ ? শরীর খারাপ করেছে নাকি ?

হামিদা বলিল—না।

হাশেম আলি বলিলেন—যা হয় একটু তাড়াতাড়ি খেতে দে-তো বহিন্। মাষ্টার সাহেবের সংগে ষ্টেশন যেতে হবে। ফিরব তো সেই কোন্ রাত্রে।

হামিদা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বড়-ভাইকে খাওয়াইতে বসিয়া সে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—মাষ্টার সাহেব ফিরে এসেছেন নাকি ?

হাশেম আলি বলিলেন—হ্যাঁ। কিন্তু আবার আজই চিরদিনের জন্ম বিদায় নিচ্ছেন।

হামিদা ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের পানে চাহিল।

হাশেম আলি বলিলেন—কিছুদিন আগে একটা দারোগার কাজের জন্ম মাষ্টার সাহেব দরখাস্ত ক'রেছিলেন। হঠাৎ এস্-পির চিঠি পেয়ে সেদিন গেলেন মালদহ। কাজটা তিনি পেয়েছেন।

হামিদা চুপ করিয়া রহিল। হাশেম আলি বলিয়া চলিলেন—একজনকে তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন। তাঁকে এই স্কুলের কাজে বহাল করা হবে কাল থেকে। মাষ্টার সাহেব আজই নিচ্ছেন বিদায়। ষ্টেশন পর্যন্ত আমরা যাব।

একটু থামিয়া বলিলেন—মাষ্টার সাহেব কিন্তু সত্যি যোগ্য লোক ছিলেন। স্কুলের অবস্থা অনেক ভাল হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যে। বোর্ডের বাজেটে তিনি পঁচিশটাকা মঞ্জুর করিয়েছেন। তিনি একটা ভাল কাজ পেয়েছেন ব'লে আমরা খুশী হ'য়েছি, কিন্তু তাঁকে হারাতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিতও কম নই। যোগ্য লোক কি চিরদিন মাষ্টারী করে ?

সত্যি। হামিদা কোনো কথাই বলিল না। স্কুলের সংগে সংশ্লিষ্ট যারা তারা এইজন্ম দুঃখিত যে, একজন যোগ্য মাষ্টার চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু একমাত্র তাহারাই কি ওই বিদেশীকে হারাইতে বসিয়াছে ?

গান

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ

গানখানিরে শেষ করে দি আগে
সুর যে তাহার তোমার প্রাণে লাগে
ওগো প্রিয় হৃদয় যারে চায়
(তুমি দিও) হৃদয় তারে দিও

গান যদি হায় কাঁটার মত কভু
হৃদয়মাঝে দেয় গো সাড়া, তবু
(তুমি) সে সুরখানি হৃদয় মাঝে
নিও অনুরাগে !

এমন দিনে কাকে লেখা যায়—?

শ্রীনারায়ণ রায় এম্‌-এ, বি-এল্‌

প্রীতিভাজনেষু—

দিনটা বড় বেখাপ্পা লাগছে। মনে হ'চ্ছে কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়েছে আর সে ফাঁক পূরণ করায় আমি যেন নিতান্ত অক্ষম। ভাবলুম কাকেও একটা লম্বা ধরণের চিঠি লিখলে বেশ হয়—কিন্তু মুস্কিল বাধল—লিখি কাকে? এক এক ক'রে মনে ক'রতে চেষ্টা ক'রলুম। প্রথমেই মনে প'ড়ল কাকে ব'লতে পারেন? না না সত্যি বলছি আপনাকে নয়। মনে পড়ল আমার এক পরিচিতের কন্যা নীনাকে। না, কন্যা শব্দ ব্যবহার না করাই ভাল, কেন না সংস্কৃত ব্যাকরণবেত্তাগণ কন্যা শব্দের অর্থ ক'রেছেন 'কুমারী'—আমার প্রতিবেশী পুত্রীটি কুমারী নন্—কিন্তু সত্যি কথা ব'লতে কি, কন্যা ব'ল্লেও দোষ হয় না—কেন জানেন? তবে বলি শুনুন—ঐ মেয়েটীকে মনে পড়ে তার কুমারীবেলার কার্য্য-কলাপের জন্যেই বেশী ক'রে—হ্যাঁ, বিয়ের পরও সে কিন্তু দুর্ব্বলতা দেখিয়ে ফেলেছিল—সাধারণের মাপকাঠিতে এটা ঘোরতর অন্যায়! কিন্তু আমি কি করি বলুন তো? দেখুন না তার কথাটাই কেন হঠাৎ আজ মনে প'ড়ে গেল? কার কথা বলছি বুঝতে পেরেছেন ত? সেই যার কথা সীতেশ আপনার কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল—কিন্তু দোহাই আপনার আমাকে হতাশপ্রেমিক মনে ক'রে যেন করুণা ক'রতে চেষ্টা করবেন না—কিম্বা উপদেশ দিয়ে ব'লে বসবেন না যেন—এইবার একটী বিয়ে করুন। কেন জানেন? এ উপদেশ আপনার বিফল হবে। তা ব'লে ভাববেন না যেন—যে আমি এখুনই বলব—"বাবাঃ বিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না।" ব্যাপারটা কি জানেন? বিয়ে হয় ত' শীগ্‌গীরই ক'রতে হবে—মানে পারিপার্শ্বিকের চাপে—আন্তরিক ইচ্ছা না থাকলেও। উপদেশটা যদি দিয়ে ফেলেন তা হ'লে আর ঠাট্টা ক'রে ব'লতে পারবেন না—"কেমন বিয়ে ক'রতে হ'ল ত?" কেন না সে ক্ষেত্রে কৈফিয়ৎ দিয়ে ব'লব—আপনিই ত' বিয়ে ক'রতে বলেছিলেন, কিম্বা আপনার কথাতেই বিয়ে ক'রেছি।

আচ্ছা ওসব কথা যাক। ঐ যে করুণার কথা ব'লেছিলুম? সত্যিই ওটাকে আমি দু চোক্ষে দেখতে পারি না—দুর্ঘটনার পরে অনেকেই গদগদভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসতেন—সত্যিই বলছি অতি অসহ্য বোধ হ'ত। এই অতি-দরদী সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সমষ্টিকে এড়াবার জন্যে বাইরে যাওয়া বন্ধ ক'রতে হ'ল—কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত! দরদী গোষ্ঠী ভাবলেন আমার বুকে বড় বেজেছে (কনসার্ট নয়—দুঃখ বা ব্যথা) তাই নাকি আমি এত মুষড়ে প'ড়েছি ও নির্জ্জনতা খুঁজছি। আরে মোলো যা—কি বিপদ বলুন ত? অবশ্য আপনার কাছে সত্যি কথা বলতে আমার একটুও বাধে না—একটুও ব্যথা পাই নি বা একটুও মুষড়ে পড়িনি এ কথাটা বললে মিথ্যে বলা হবে, কিন্তু তাই ব'লে......... থাকগে............।

আপনাকে আর সীতেশকে এত ভাল লাগে কেন জানেন? এরা আমার সেই পরম ব্যথার দিনে আর যাই করুন গায়ে পড়া করুণা দেখাতে আসেন নি। আমার একটা বন্ধু—আমার প্রতিবেশী ও ছেলেবেলার বন্ধু—নাম তার সু—সেও ওরকম কিছু করেনি।

আবার বিপদের ওপর বিপদ দেখুন না! ওই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় মনটা সাধারণতঃ একটু খারাপ ত' হবেই—কপাল দোষে সেটুকু ধরা প'ড়ল—একটি মেয়েকে একটি চিঠি লিখেছিলুম; ঠিক সেই চিঠিতেই ঐ বুদ্ধিমতী মেয়ে ধরে নিলেন যে তার জন্যেই আমার মন খারাপ—কি বিড়ম্বনা! তার উত্তর পেয়ে বুঝতে পারলুম না—আমার কি করা উচিৎ—হাসা না কাঁদা। আজ এদের সকলের কথাই মনে প'ড়ছে কিন্তু চিঠি লিখি কাকে? সকলের কথাই ভাবছি। হ্যাঁ সীতেশের কথাই ধরুন না কেন? বিয়ে ক'রে যেন কেমন হয়ে গিয়েছে; দেখাবার চেষ্টা করছে যে সে আর ছেলেমানুষদের (?) দলে নেই; পাক্কা কাজের লোক হ'য়ে উঠেছে—বাজে কাজে সময় দেওয়ার মত সময়ের প্রাচুর্য্যের তার একান্তই অভাব। আমার কিন্তু ওকে দেখলেই মনে হয় ও সোনালী স্বপন দেখতেই ব্যস্ত।

থাক্‌গে ও সব; সীতেশকে চিঠি দিয়ে লাভ নেই—উত্তর দিলেও তাতে হয়ত' থাকবে দর্শন শাস্ত্রের কথা।

হ্যাঁ ভাল কথা, ভূপতিকে মনে আছে আপনার? ভূপতির কথাই বলি—ওর খবর জানতে ইচ্ছা করে কিন্তু বেঁচে আছে কিনা তাই জানি না—বহুকাল আগে ওর শেষ চিঠি পেয়েছিলুম ইরাক থেকে—আর কোন চিঠি দেয়নি—দোষটা আমাদেরও আছে—আমাদেরই দেওয়া উচিৎ ছিল।

ভূপতির কথা ভাবলেও মনটা ব্যথায় ভ'রে যায়—জীবনে মানুষ সুখেরই সন্ধান করে; কিন্তু সুখের সন্ধান পেয়েও যে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না তার ভাগ্য সত্যিই খারাপ! ভূপতির কথা মনে হ'লে মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসে—ব্যাচারা! ও চেয়েছিল মনের মত সাথী—সাথীর সন্ধানও পেয়েছিল; কিন্তু সাথীকে পেল না—তাই ও দেশ ছেড়ে চলে গেল—আশ্চর্য্য! ওর মনের এই দিকটির খবর আমরা কেউই বড় একটা জানতুম না। সাথীহারা হ'য়ে ও মনমরা হ'ল, কিন্তু তাই ব'লে অলসতাকেও পছন্দ ক'রত না তাই বোধ হয় ভূপতি অতি দুঃখে ইরাকেই নিজের স্থান করে নিলে। মনটায় এক এক সময় বড় কষ্ট হয় যখন ভাবি যুদ্ধকে ভালবেসে ভূপতি যুদ্ধ করতে যায়নি—গিয়েছে কাকে যেন ভুলতে। আমি Practical খুব বেশী না হ'লেও খানিকটা বটে, তাই খুব দুঃখ হয় তখনই—যখন ভাবি আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে ভূপতিকে সামান্য হাবিলদার হ'য়ে যেতে হ'ত না, অতি সহজেই 'কিংস্ কমিসন্' পেতে পারত।

কিংস্ কমিশনের কথায় মনে প'ড়ল সঙ্ঘের আর দুজনকে—বেণু মজুমদার আর কানু অর্থাৎ পার্ক সার্কাসের শচীন দত্তকে। বেণু বোধ হয় এতদিন appointed হ'য়ে গিয়েছে—কানুও বোধ হয় হব হব ক'রছে—তবে শুনছি নাকি কোন জুটমিলে আবার ও চেষ্টা করছে।

যুদ্ধের ব্যাপারে আর একজনের কথা আজ মনে হ'চ্ছে—একসঙ্গে ফুটবল খেলেছি—সিটি কলেজে বি-এ পড়েছি—নাম করলে আপনি চিনবেন না—গলাটি ছিল ভারী মিষ্টি; আচ্ছা সে কেন যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে যোগ দিলে বলুন ত? জীবনে কোনদিন সে পাংচুয়ালিটির ধার ধারেনি। আমরা তাকে ঠাট্টা ক'রে বলতুম—ওহে তুমি বিয়ের সময় duplicate ঠিক করে রেখো—কেন না ঠিক সময়ে ত' ভাই তুমি যেতে পারবে না; কেন মিছামিছি মেয়েটার লগ্নভ্রষ্ট করাবে—এমনই অদ্ভুত সে, যে বি-এ পরীক্ষা দিতে দিতে সেনেট হলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। গার্ড এসে তুলে দিতে তবে আবার লিখতে আরম্ভ করে—এই সব শুনে আপনার কি মনে হয় বলুন—যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে যাবার তার কি প্রয়োজন? তাকে একখানা চিঠি দিলে মন্দ হয় না—কিন্তু রাগ করে দিইনি—বাইরে চ'লে গেল কিন্তু একটিবারও আমাকে জানালো না—আমি কি তাকে বারণ ক'রতুম?

কাকেই বা লিখি খুঁজেই পাচ্ছি না, হ্যাঁ হঠাৎ আর একজনের কথা মনে পড়ল—মেয়েটা আমাকে মামা বলে ডাকত', আর আমি তাকে আদর করে বলতুম মা লক্ষ্মী—আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিল। কি ভালোই মা

খাসত আমাকে। তাদের বাড়ী থেকে শুধু মুখে ফেরার উপার ছিল না। তার হাতের চা একটু না খেলে মেয়ের অভিমানের শেষ ছিল না—ঠিক যেন ছোট্ট মেয়েটী—হ্যাঁ তার কথাও মনে পড়ছে—কী সুন্দর দেখতে ছিল সে—একটু সাজ-পোষাকের ভক্ত ছিল—সত্যি সে যখন মারা গেল—এই বছর দুইও হয়নি বোধহয় এখনও, তাকে আমরা নিয়ে গেলুম তার সুন্দরতম বেনারসী শাড়ীটি পরিয়ে আর সর্বাঙ্গে ফুলের গয়না পরিয়ে—ফুলের মুকুটে তাকে দেখাচ্ছিলো রাজেন্দ্রাণীর মতই—কী অদ্ভুত মেয়ে ছিল জানেন? মরার আগে তার আব্দার হ'য়েছিল আমার কাঁধে চড়ে শ্মশানে যাবে—গেলোও তাই। তার কত আশা আকাঙ্ক্ষাই না ছিল!

কবিতা অর্থাৎ এই মেয়েটা ছিল বড় ছেলেমানুষ, হঠাৎ একদিন বায়না ধরল যে সে তার মামীমার কাছে যাবে—কী করি বলুন তো? মামীমা তার কে জানেন? আমার সেই পরিচিতের কন্যা নীনা। কিন্তু নিয়ে যাই কি ক'রে? তাদের বাড়ীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ তখন সাপে আর নেউলে। তার বাপ দাদার ধারণা—তাদের মেয়ে খারাপ হয়ে গিয়েছে—আচ্ছা কি নীচু মন বলুন ত? কেউ কাকেও ভালবাসলেই বুঝি খারাপ হয়ে যায়? আমাদের সমাজের পিতামাতা তথা অভিভাবক শ্রেণীর মন থেকে এ ধারণা কবে যে যাবে তার ঠিকঠিকানা নেই। মেয়েটার ওপর নির্য্যাতন তাঁরা চালাচ্ছিলেন যা-তা অকথ্য। তবু মেয়েটীর এক কথা—সে নাকি আমাকে ছাড়া অপর কাকেও বিয়ে করতে অক্ষম। মারের চোটে তার বহুদিনই রক্তপাত হয়েছে ও ডাক্তার ডাকতে হয়েছে—ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার জন্যে। মেয়ের একগুঁয়েমিই তারা দেখলে। নিজেদের একগুঁয়েমিটা কিন্তু তাদের চোখে পড়েনি। বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল এই যে, এই বিয়েটা হবে দেশাচারের বিরুদ্ধে—যদিও এ বিয়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আইনবিরুদ্ধ নয়—মানে আমরা একই caste হলেও একই sub-caste-এর নই—এই মাত্র অপরাধ। যাই হোক পরে শুনলুম—তা সে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, একই পাড়ায় না হ'লে নাকি মেয়েটীর বাবার তত আপত্তি ছিল না—এটাত' আরও সাংঘাতিক কথা—তাই নয় কি? মেয়েটীর মা কিন্তু মনে হয় আমার স্বপক্ষেই ছিলেন—মা বুঝেছিলেন মেয়ের মনের কথা।

কবিতা যখন একান্তই বায়না ধরল—সে যাবেই, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে নিয়েই গেলুম। দুজনে কি ভাব—পরে শুনলুম নীনা নাকি কবিতার মামীমা সম্বোধনে বিগলিত-চিত্ত হ'য়ে বড় আনন্দ প্রকাশ করেছিল—যাক্‌গে ওসব কথা, ভেবে আর কি-ই বা হবে? কিন্তু তবু ভাবনা যায় কই? কেন আজও মনে হয়—যদি সে কাছে থাকত?

আচ্ছা মনে কৌতুহল হয় কি—কেমন করে আমাদের আলাপ হয়েছিল জানতে? রোমাঞ্চকর আরম্ভের আশা ক'রে থাকলে কিন্তু হতাশ হ'তে হবে। আমাদের আলাপের মধ্যে রোমাঞ্চের বাষ্পও ছিল না, রবীন্দ্রনাথের গোরার মত পাগলা ঘোড়ার লাগাম ধ'রে বা শেষের কবিতার মিতা ও বন্যার মত দার্জ্জিলিং-এর বুকে মোটর থেকে আলাপ হয়নি বা প্রথম আলাপের সময় তাকে আর যাই বলা চলুক তাকে লক্ষ্য করে—"আমার প্রিয়ার তনু অষ্টাদশ বসন্তের মালা" একথাও বলা চলত না নিশ্চয়ই। প্রথম আলাপটা যে ঠিক কোনদিন ও কোনক্ষণে হ'য়েছিল তা আজ মনে পড়ে না, মনে পড়ার কথাও নয়—আমি তখন হাফ প্যাণ্ট পরতুম কিনা তাও মনে নাই; তবে সে যে ফ্রক প'রে দুরন্ত-পনায় পাড়া উত্যক্ত ক'রত তা বেশ মনে আছে। কবি আমি নই, তবুও যেন মনে হয় একদিন তার দুরন্তপনা লক্ষ্য করেই কবিতা লিখে ফেলেছিলুম।

শুধু কবিতা কেন অনেক কিছুরই অনুপ্রেরণা ও দিয়েছে—ক্রমে সে যখন চোখের সামনে একটু একটু ক'রে বড় হতে লাগল—কি যেন তখন বুঝতে পারিনি কেন ওকে বড় বেশী ভাল লাগতে লাগল—পরে অবশ্য একদিন কি জানি কবে সেই ভাললাগা ভালবাসায় পরিণত হ'ল।

থাক্‌গে ওসব না ভাবাই ভাল—অন্য কথাই হোক্ কি বলেন? আচ্ছা সন্তের মিনু রায়কে মনে আছে আপনার? আমার কিন্তু তাকে বেশ ভালই লাগত—অনেক দিন খবর পাইনি, পরে শুনলুম এক অধ্যাপকের পত্নী হ'য়েছেন—ভালই ত? কি বলেন?

সন্তের কথায় মনে হ'চ্ছে বরেনকে—আমাদের বরেন বসু। সে এখন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট—দিব্যি মানায় ছোকরাকে বিজাতীয় পোষাকে—ড্রেস্-কলার পরলে সত্যিই ওকে খুব সুন্দর দেখায়। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে কিন্তু মনে অহঙ্কার নেই—অথচ সন্তে একদিন ওকে উপলক্ষ করেই আমার মনে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল; তাইত আর ব্যয় বিভাগের সম্পাদকত্বে ইস্তফা দিলুম—আর হীরু এল সেই জায়গায়।

হীরুর উপাধির নেশা দেখা দিয়েছে; এম্-এ পাশ করে বি-টি হল। বাংলাতেও দুটো উপাধি পেয়েছে—ওর আরও চাই—আবার স্পোকেন ইংলিস-এ ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেবে—বেশ আছে ছোকরা। ওকেও একটা চিঠি দিলে মন্দ হয় না—কিন্তু একটা গোল বেধেছে এই যে চিঠিতে কাজের কথা না থাকলে ও চ'টে যাবে, অথচ কাজের কথা লিখতে আমার একটুও ইচ্ছে ক'রছে না।

কলকাতা থেকে কত দূরে র'য়েছি—লাইনের কি গণ্ডগোল বেধেছে—ট্রেণ আসছে না—সঙ্গী সাথীও নেই—কি যে করি ভাবতেই পারছি না। এই সময়ে একটা সঙ্গী পেলে বড় আনন্দ হ'ত—অনাবশ্যক কাজে সময় কাটাতে বড় ভাল লাগে। আবশ্যকীয়ের পিছনে ছুটতে হ'লেই আমার ক্লান্তি দেখা দেয়—এটা আমার মজ্জাগত স্বভাব। আপনিই বলুন কুঁড়েমির মত আনন্দ দুনিয়ায় আর আছে কি? মতে মিলল না বুঝি? তা হোক—মতের মিল নাই বা হ'ল—আপনি আছেন অনেক দূরে, এইটুকুই আমার পরম লাভ। কেন জানেন? তবে বলি শুনুন; আপনার বিরক্তি ত' আর আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না—বড্ড বিরক্ত হন ত' না হয় আর পড়বেন না এটা, এইত? তা সে আপনার খুসী। কোনদিন এটা আপনার হাতে না গেলেও আমি দুঃখিত হব না—কেননা আমি লেখার আনন্দে লিখছি। কলমের সদ্ব্যবহার হয় লেখায়, আর লেখার সদ্ব্যবহার হয় আনন্দে—সে আনন্দ আমি পাচ্ছি এইটাই আমি পর্য্যাপ্ত ব'লে মনে করি। এই দেখুন না অনেক লেখক আছে তাদের লেখা কেউ কোন কালে প'ড়বে না—তবুও তারা লেখে। ভাল কথা রমণী মোহনের লেখা পড়েছেন? আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না ওই ভদ্রলোকের লেখা। যে সমাজের কথা তিনি বলেন, সাধারণতঃ তাদের অস্তিত্ব কি সত্যিই আছে? ভদ্রলোক একটা কথা বার বার ব্যবহার করেন—সেটা হ'চ্ছে, বাল্য প্রণয়ে অভিসম্পাত আছে—

কথাটা ধার করা হ'তে পারে কিন্তু মিথ্যে যে নয় তার প্রমাণ আমিই। নীনাকে আমি সত্যিই ভালবেসেছিলুম। একলা ব'সে আজ তার কাজের, ব্যবহারের খুঁটি-নাটি মনে পড়ছে—ওকে কেন্দ্র ক'রে আমিও যে সব কীর্ত্তি ক'রেছি সেগুলো মনে হ'লে আজ আমিও আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই! রাত্রির অন্ধকারে গোপনে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা ব'লতে বুক কাঁপতো; কিন্তু তার মধ্যে যে এত আনন্দ ছিল তা এর আগে বুঝতে পারিনি—কী অসীম সাহস ছিল আমার! রাত্রে গোপন জায়গা থেকে সঙ্কেত পেয়ে চুপি চুপি গিয়ে তার সঙ্গে মিলতুম; তারপর চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কত অর্থহীন ও অর্থভরা কথা। কী যে ব'লতুম আর কী-ই যে শুনতুম আজ তার সব মনে পড়ে না; তবে মনে খুবই পড়ে যে—"দুটী বক্ষ দুরু দুরু।" ওর একটি আশা কিন্তু আমি পুরণ করতে পারিনি—ওর ইচ্ছা ছিল আমি মস্ত বড় পণ্ডিত হই—তাই ত' এম্-এ পাশ ক'রে আবার এম্-এ পড়তে আরম্ভ করেছিলুম। এম্-এতে ফার্ষ্ট হব এই ছিল ওর আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু তা হ'তে পারিনি বলে ও মনে বড় আঘাত পেয়েছিল।

ভাল কথা, কৃপারামের কথা মনে আছে? ওই ত আমাদের সময়

কার্ট হ'য়েছিল—এই কদিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হ'ল। চাকরী ছেড়ে দিয়েছে ব'লে। ও হ'য়েছিল সাব-ইনস্‌পেক্টর অব স্কুল—বর্দ্ধমান জেলার কোথায় যেন ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম চাকরী ছাড়লি কেন? উত্তরে বল্লে প্রেমে প'ড়ে গিয়েছিলুম—আমার কিন্তু বিশ্বাস হ'ল না। যেখানেই পড়িস্ তা সে প্রেমেই হোক, আর জলেই হোক—চাকরী ছাড়বি কেন রে বাপু? প্রেম কি তোকে খাওয়াবে? অবশ্য গৌর মুখুজ্যের কথা আলাদা, সে এমন জায়গায় বিয়ে করেছে যে ভবিষ্যতের ভাবনার দায় থেকে নিশ্চিন্ত—ও কি বলে জানেন? বলে আমি লটারীর টিকিট কিনেছি—মানে শ্বশুর যদি ইচ্ছা ক'রে অপরকে দিয়ে না দেয় ত' সব বিষয় সম্পত্তিই ওর—কিন্তু সে ত' বিয়ে—সেত' আর প্রেম নয়! অবশ্য বিয়ের পরে প্রেম হ'য়েছে। গৌর মুখুজ্যের কথায় একটা মজার ব্যাপার মনে প'ড়ে গেল—ওর বউ বাংলা ছাড়া কিছু জানত না, আর ও বাঙ্গালী হ'য়েও বাংলা জানত না—বলুন ত' ও কি ক'রে বিদেশ থেকে চিঠি লিখত বৌকে? ভাবছেন নিশ্চয়ই যে আমরা লিখে দিতুম—তা যা ইচ্ছা ভাবুন আমি নিজে কিছু বলব না; জানতে পারলে মুখুজ্যে রাগ করবে।

আচ্ছা সত্যি বলুন না অপরে লিখে দিলে সে চিঠি পাওয়ায় কি আনন্দ আছে? আমার পরিচিতের কন্যাটী আপনাদের মত কলেজে পড়া মেয়ে ছিলনা—কিন্তু চিঠি লিখতে সে বেশ পারতো—বানানের গণ্ডগোল বা ব্যাকরণের অশুদ্ধি হয়ত' থাকতো, কিন্তু তাহলেও তার চিঠি পেতে বেশ লাগতো।

আচ্ছা আমাদের চিঠির কথাই বলি। আমরা কিন্তু প্রিয়তম, হৃদয়েশ্বরী এসব সম্বোধন কোনদিনই করি নি। কেমন যেন গ্রাম্য বলে মনে হ'ত, সেই সঙ্গে রুচিতেও বাধত—আমাকে সে ভালবাসতও যত, শ্রদ্ধাও ক'রত তত—তাই সে আমাকে লিখত "পরম পূজনীয়" আর আমিও তাকে কল্যাণীয়া ছাড়া আর কিছু লিখেছি বলে মনে হয় না—চিঠির শেষে সে প্রণাম লিখতো। ব'লত তুমি যে আমার দেবতা।

আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়েরা হয়ত দেবতা বলার কথা শুনে ঘৃণা করবে—তাদের মতে হয়ত বন্ধু, সাথী বা কমরেডই ভালো—এ কোনটার একটাও যদিও নাই হয় তবুও দেবতা অন্তত নয়; কিন্তু সত্যিই বলছি তার এই একান্ত শ্রদ্ধায় আমি বড় আনন্দই পেতুম। সে ব'লত আমিই তার সবচেয়ে বড় বন্ধু—সে বন্ধুর মাঝে দেবতাকে দর্শন করেছিল। আবার এও দেখেছি যে সে তার এই রক্তমাংসের গড়া দেবতার মঙ্গলের জন্যেই পাথরের দেবতার পাথরের দেউলে ধর্ণা দিয়ে প'ড়ে থাকতেও দ্বিধা ক'রত না—কিছু বল্লে ক্ষমার হাসি হেসে বলত—সব কিছুকেই বিদ্রূপ করতে নেই। আজ তার সেই কল্যাণীমূর্ত্তি মনে পড়ে। গরদের লালপাড় সাড়ীটি পরে ঠাকুরঘর থেকে এলোচুলে যখন সে বেরুত—কী সুন্দর লাগত, মনে হত ওকেই পুজো করি। ঝগড়াটে মেয়ের সে কি সুন্দর শান্ত মূর্ত্তি।

মনে ক'রছেন বুঝি কোন প্রৌঢ়ার কথা বলছি? না তা নয়—আপনি ত' জানেন আমার পরিচিতের কন্যা বয়েসে আপনার চেয়েও অনেক ছোট—যাক্‌গে এসব আলোচনায় মনের কষ্ট বাড়ে বই কমে না—একুশ বছর পূর্ণ হ'লে ত' সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সিভিল ম্যারেজই হ'য়ে যেত—কিন্তু তা আর হ'ল কই?

আজ মনে পড়েছে ইলা ও মনুর কথা—ওরা দুজনেও আমাকে আন্তরিকভাবেই চেয়েছিল—কিন্তু আমি তা জানতুমও না—আমার কি দোষ বলুন? লোকে যদি নিজেকে প্রকাশ না ক'রে ব'সে থাকে ত' আমি কী করে জানব তাদের মনের কথা! যাক তাদের কথা নাই বা তুলুম। তাদের মনোগত ইচ্ছা যখন আমার গোচরে এসেছে তখন তারা নাগালের বাইরে।

কিন্তু এদের জন্যে সত্যিই ব'লছি আমার তত দুঃখু হয়না—কেননা ওদের বেলায় চাওয়াটা শুধু ওদের পক্ষ থেকেই হ'য়েছিল। আমার পরিচিতের কন্যা নীনার বেলায় যে তা হয়নি! আমরা চেয়েছিলুম পরস্পরকে একান্তভাবে।

সেই রাত্রের কথাটাই বলি—রাত তখন প্রায় ১২টা—নিত্যকার মত সেদিনও সে এল—জানাল শুতে যাচ্ছে—হাসিমুখে উপদেশ দিলুম ভাল ক'রে ঘুমিয়ো। মনটা সেদিন আনন্দে ভরা ছিল—কত কি কল্পনায় আরও কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে প'ড়লুম। পরের দিন সকালে কি হ'ল জানেন? সে একটা পরমাশ্চর্য্য! আচ্ছা সেটা একটু পরে বল্‌ছি।

শেষের দিকটায় ওর চিন্তাধারার যেন পরিবর্ত্তন ঘটতে লাগল—হঠাৎ একদিন একটা কথা ও ব'লে বসল—"আমাকে বিয়ে করলে তোমার বড় কষ্ট হবে—তা সে না হয় হ'ল, তুমি তা সহ্য করবে—কিন্তু তোমার মা বাবা বড় কষ্ট পাবেন—তাঁদের একটিমাত্র ছেলে—কী ব'লে আমি তাঁদের কাছ থেকে তোমাকে টেনে নিই, না না—তাঁদের অভিশাপ নিয়ে জীবনে সুখী হ'তে পারব না। কথাটা একদিনই মাত্র বলেছিল বোধহয়।

হ্যাঁ যে ঘটনাটার কথা বলছিলুম সেইটাই বলি—দুপুর রাতে ত' শুতে গেল—সাতঘণ্টা পরে সকালে—কথা কওয়ার চেষ্টা ক'রতে গিয়ে বিফলমনোরথ হলুম—তা কথা না হয় নাই বল্ল—কিন্তু ও বিয়ে করল কেন? বছর ছয়েক অশেষ নির্য্যাতনই বা সহ্য করল কেন? আমার কাছে হ'য়ে রইল এটা একটা সমস্যা—ওকি আর সইতে পারল না? উঁহু তাত' নয়—আমাকে সে স্বচ্ছন্দে জানাতে পারত সেকথা! তবে কি লোভে প'ড়ে বিয়ে করল? তবে কি আমাকে সে মুক্তি দিলো? বাপমায়ের একটীমাত্র ছেলেকে তার বাপমায়ের হাতে ফিরিয়ে দিলো? কি জানি!

না' আর না! মনটা বড্ড ভারী হ'য়ে যাচ্ছে—এই সময় একটী সঙ্গী থাকতো—মনের কথা খুলে বলে মনটা একটু হাল্কা করে নিতুম—কিন্তু কোথায়ই বা কে? একটা লম্বা ধরণের চিঠি লিখলেও মন্দ হ'তনা কিন্তু লিখি কাকে?

অসীম ও সীমা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সীমা—সীমা—সারা বিশ্ব কাঁদিল কাতরে,
কোটি কোটি পণ্ডিতের ভাষা নিরুত্তর;
ক্ষুদ্রপ্রাণ দিশাহীন না পায় সন্ধান,
সীমা খুঁজিবারে গিয়া ব্যাকুল কাতর?
অনন্ত জীবনপথে চাহিনু বিস্ময়ে,
হেরিনু তাহারে দূর—সুদূরের পানে;

অন্ত কোথা?—বিস্ময়েতে হেরিলাম তবু—
অসীমের রস-যাত্রা তারি মাঝখানে!
দর্শন কাঁদিয়া মরে সীমার লাগিয়া
বিজ্ঞান—সে—সীমা লাগি' ফিরে নিশিদিন,
অরূপ বাঁধিতে চাহে রূপ দিয়া সীমা
সীমারে ঘিরিয়া বাজে অসীমের বীণ।

নীল ঘিরে ঘিরে নাচে অনন্ত নীলিমা,
অসীম সে বিশ্ব ঘিরে' রচিয়াছে সীমা?

সূর্যোদয়ের আগে

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত এম-এ

দমকা হাওয়া এসে ওপাশের জানালাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল। জানালার উপরে ফটোখানা কাঁপতে লাগল। 'মহাকাল'-এর সম্পাদকীয় বিভাগের জনৈক কর্মীর বিদায় গ্রহণ উপলক্ষে গৃহীত ফটো। মোমবাতির কম্পিত শিখায় অনেকগুলি অস্পষ্ট মুখে আলোছায়ার প্রেত-লীলা। একপাশে প্রভাতের ছোট মুখখানিও রয়েছে। কচি কচি ছোট মুখখানি। ছবিতে আরো কচি হয়ে ধরা পড়েছে।

কিন্তু ও মুখ প্রভাতকে মানায় না। প্রভাতের মুখে দেখেছি রুক্ষ কাঠিন্য। ব্যাকব্রাসকরা চুলগুলি এলোমেলো, তৈলহীন। গায়ে লম্বা ঝুলের সার্ট, পায় স্যাণ্ডেল। বগলে একগাদা বই।

হন হন করে প্রভাত চলেছে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট দিয়ে। ডাকলাম প্রভাত—ও প্রভাত—

রাস্তার মাঝখানেই প্রভাত চেঁচিয়ে উঠল—আরে নারাণদা যে।

প্রভাত ফুটপাথে উঠে এল। শুধালাম: কোথায় চলেছ এই রোদে?

মেসের দিকে। তুমি কোথায়?

যাব একটু কলেজ স্ট্রীটে। কয়েকখানা কাপড় কিনতে হবে?

প্রভাত উৎসাহিত হয়ে উঠল: কি কাপড়? সাড়ি? তা বেশ তো, চলো আমিও যাচ্ছি।

হেসে বললাম: সাড়িও অবশ্য কিনব। তবে তুমি কেন আবার যাবে এই রোদ্দুরে?

বাঃ, এই দুপুর রোদ্দুরে হাঁটতেই তো আরাম। মাথার উপরে সূর্যে আগুণ ধরেছে। শরীরের রক্ত জল হয়ে জামা কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে। রাস্তা প্রায় জনশূন্য। দুপুরে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে আমার এত ভাল লাগে।

বললাম: কম্যুনিষ্ট মানুষ, এত কবিত্ব তোমার মুখে শোভা পায় না, চুপ করো।

বলো কি নারাণদা, যে বিপ্লবী সেই তো কবি। গোর্কির একটা লাইন মনে পড়ে: For me a revolutionary is a poet—a Promethes unbound. এত-বড় সত্যি কথা একমাত্র রাশিয়ার কবিই লিখতে পারে। কারণ সেদেশে কবি মাত্রই বিপ্লবী, বিপ্লব সেখানকার ভাব-জীবন।

থাক। এখন যাবে তো চলো।

চলতে চলতে প্রভাত অনর্গল কথা বলতে লাগল: দেখছ নারাণদা, রাস্তার পীচ কেমন গলে গেছে। আমার কি মনে হয় জানো, আমার পায়ের ভার পৃথিবী সইতে পারছে না। পৃথিবী জয়ের নেশা লাগে আমার মনে। আদিম মানুষের মত সদ্য জেগে ওঠা ধরিত্রীর নরম বালু-বেলায় পায়ের চিহ্ন আঁকতে ইচ্ছা করে। সাধ হয় রুশ-অভিযাত্রীদের মত উত্তর মেরুর বরফ-বুকে চালাই অভিযান। নতুন নতুন দেশ, নব নব প্রকৃতি-সম্পদ জোগাড় করে নিয়ে আমি ভাবী কালের মানুষের জন্য। এই যাঃ—

প্রভাতের স্যাণ্ডেলের স্ট্রাপ হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। হেসে বললাম: এই তো মেরু-অভিযান সুরু হল।

প্রভাত ছেঁড়া স্যাণ্ডেলপাটির দিকে একবার তাকাল। একবার তাকাল সামনে ও পিছনে। কোথাও একটা মুচির চিহ্নও নাই। তারপর স্যাণ্ডেল জোড়া ডান হাতে করে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ডাষ্টবিনটা লক্ষ্য করে। বলল: চলো নারাণদা, সত্যি এইবার অভিযান সুরু।

আমার মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর পদচিহ্নহীন পথে বেপরোয়া অভিযাত্রী। পীচ-গলা পথে নগ্নপদ প্রভাত। বগলে বই। তৈলহীন উস্কোখুস্কো চুল। প্রভাতের এ চেহারা রাতের অন্ধকার আলো করে চোখের সামনে জলছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তীব্র দীপ্ত চোখ। দেহে সংগ্রামের রুক্ষতা। ঠোঁটে খড়্গ-ঝলসানো হাসি। ধীরে ধীরে সে মূর্তি আমার পাশে এল। বলল: কি ভাবছ নারাণদা? জানতে চাও আমার কথা? আমি আজ কোথায়? কোন্ পথে চলেছে আমার অভিযান? তবে শোন। ভলগা নদীর জল জমে বরফ হয়ে গেছে। আকাশ-ভুবন আচ্ছন্ন করে বরফ পড়ছে অবিরাম। তারি মাঝে ছুটে চলেছে ট্যাংক, আর্মার্ড-কার। দেখতে দেখতে প্রতিপক্ষের সংগে বাধল সংঘর্ষ। নাৎসী বাহিনীর সংগে লাল ফৌজের দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ। কামান-গোলার শব্দে আকাশ প্রকম্পিত। আমার হাতে গর্জাচ্ছে মেসিন-গান। মানুষের মুক্তি কামনায় প্রাণ চঞ্চল। শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তধারা। নাৎসী বাহিনীকে লক্ষ্য করে চালাচ্ছি মেসিন-গান: কট্—কট—কট্—

দমকা হাওয়ায় ফটোখানা দেওয়ালের সংগে মাথা ঠুকছে: খট্—খট্—খট্। স্বপ্ন ভেঙে গেল। কোথায় মেসিন-গান? কোথায় রুশ রণাংগন? কোথায় সৈনিক প্রভাত?

ফিরে এলাম আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের পীচ-গলা পথে। পাশাপাশি চলেছি আমি ও প্রভাত।

প্রভাত বলল: সাড়ী যখন কিনতে চলেছ, পকেট নিশ্চয় ভারী আছে। বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে। এসো চা খেয়ে নি।

একটা বাজে। এখন ক্ষিধে? বিস্মিত হলাম। বললাম: চলো। কিন্তু তুমি এখনো ভাত খাও নি নাকি?

হেসে প্রভাত বলল: কখন আর খেলাম। আপীস থেকে বেরিয়ে ভোরে গেলাম আউটরাম ঘাটে।

কেন?

গংগার জলে লাল সূর্যের ঝিলমিলি আমার বড় ভাল লাগে। দিনের ঘোলাটে গংগা বড় বেশী পবিত্র। ভস্মমাখা মহেশ্বর যেন। আমার পছন্দ হয় ঊষার আরক্ত গংগা। রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। ঘুমন্ত মহানগরীর রক্তবাহী ধমনী। এই

তো পরাধীন দেশেও প্রাণ-গংগার রূপ। বৈরাগ্যে ধূসর নয়, সংগ্রামশীলতায় রক্তবর্ণ।

ব্রাউন টোষ্ট ও চায়ের অর্ডার দিয়ে বললাম: নাঃ, তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়। কথায় কথায় কাব্য, লাইনে লাইনে রক্ত, বিপ্লব আর শ্রেণীসংগ্রাম। কাঁহাতক আর পারা যায় বলতো বাপু?

প্রভাত একটু ক্ষুণ্ণ হল, বলল: আচ্ছা চুপ করলাম।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুধালাম: এখন কি আউটরাম ঘাট থেকেই ফিরছ নাকি?

না। সেখান থেকে গিয়েছিলাম ভবানীপুর। একটা পার্টি-মিটিং ছিল।

হেসে উঠলাম: কি? কাষ্ঠ কারিগর সমিতির মিটিং নাকি?

প্রায়ই প্রভাত একটা না একটা শ্রমিক সভার রিপোর্ট নিয়ে আসে কাগজে ছাপতে। তাই ওকে আমরা কাষ্ঠ কারিগর সমিতি বলে ঠাট্টা করি।

আমার প্রশ্নটা হেসে পাশ কাটিয়ে প্রভাত বলল: মিটিং সেরে এই তো আসছি হাঁটতে হাঁটতে।

এই রোদ্দুরে ভবানীপুর থেকে হেঁটে হেঁটে এলে?

কি আর করি। মাসের আজ ২৬ তারিখ। পকেট যে এদিকে গড়ের মাঠ।

চায়ের পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম; সারা রাত নাইট ডিউটি করে সারাদিন এমন হৈ-হৈ করে বেড়াতে কষ্ট হয় না তোমার প্রভাত?

কষ্ট যে একটু হয় না তা বলতে পারি না। তবে ভালও লাগে। কোন কাজ নাই। কেউ জোর করে ঠেলেও পাঠাচ্ছে না। তবু হাঁটছি। বেশ লাগে। তাছাড়া মেসে ফিরেই বা কি করব? হৈ-চৈ গণ্ডগোল। তার চেয়ে এখন ফিরে যাব। মেস যেন তপোবন। ঠাকুর বারান্দায় ভাত ঢাকা দিয়ে চলে গেছে। উড়ে চাকরটা সিঁড়ির উপর পড়ে নাক ডাকাচ্ছে। বেশ আরাম করে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকব কিছুক্ষণ চুপ করে। তারপর ভাত খাব। ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত। খেয়েছ কোনদিন?

বললাম: না। দেখ প্রভাত, এরকম করলে তো শরীর টিঁকবে না। একে night duty, তার উপর খাওয়া নাই, নাওয়া নাই।

কেন? স্নান তো আমি রোজ করি।

কখন করো? এই তো তোমার বেলা তিনটে পর্যন্ত কাজের ফিরিস্তি দিলে।

বারে, আমি তো স্নান করি বিকেলে কলে জল এলে। কলতলা তখন গড়ের মাঠ। ভীড় নাই, কাড়াকাড়ি নাই। নবাব সিরাজদৌল্লার মত কল খুলে দিয়ে তার নীচে বসে যাই। স্নান আবার করিনা, পাকা একঘণ্টা ধরে করি।

নিজের আনন্দেই প্রভাত হো-হো করে হেসে উঠল। আমার কেমন ভাল লাগল না। প্রভাতের চোখের নীচে কি কালী পড়েছে?

বললাম: শরীরটাকে অযথা কষ্ট দিয়ে কি যে বাহাদুরী পাও তা তোমরাই জানো।

গম্ভীর গলায় প্রভাত জবাব দিল: শরীরের কষ্টটাই তোমাদের চোখে পড়ে নারাণদা, কিন্তু আমাদের মন যে কুঁকড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে দিনের পরদিন, তা কি তোমরা একটুও দেখতে পাও?

অদ্ভুত অশরীরী স্বর। যেন জনহীন প্রান্তরে অনেক দূর হতে ভেসে-আসা বাণী। প্রভাতের চোখে স্বপ্নাবেশ। সারা মুখের ইস্পাৎ-কাঠিন্যে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা। সূর্য্যসাধক প্রভাত।

মেঘান্ধকার আকাশ হতে সূর্য নির্বাসিত। বাইরে তাকালাম। শুধু আঁধার। নিকষকালো আঁধার। শুধু আঁধার আর আমি ছাড়া এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আর কিছু আছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। কোথায় সূর্য? কোথায় নতুন দিন? কিসের প্রত্যাশায় দুঃখের তিমির রাত্রির ভিতর দিয়ে চলেছে অসংখ্য মানবযাত্রী? তড়িৎদার স্বপ্ন। প্রভাতের আদর্শ সাধনা। সব কি মিথ্যা? সকল পথই কি একদিন ব্যর্থতার সীমাহীন অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন? আজকের এই প্রতারিত রাত্রের মুখোমুখি বসে আশংকা হচ্ছে সবি মিথ্যা। বৃথা স্বপ্নের আনন্দলোক রচনা। বৃথা নতুন সূর্যের তপস্যা। সর্বম্ দুঃখম্।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে এল। টিনের চালে রাত্রির সংগীত হল সুরু। বৃষ্টির বড় বড় ফোটাগুলি অন্ধকারেও দেখা যায়। রাত্রির রঙ দেখতে দেখতে ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে। অশ্রুসজল নৈশ প্রকৃতি। শশীবাবুর চোখ দুটি মনে পড়ে। কাঁদনভরা দুটি চোখ।

কলেজ ষ্ট্রীট। শশীবাবু চলেছেন। হলদে চোখ দু'টি আরো বিবর্ণ। চোখের নীচে মাংসটা আরো ফুলে উঠেছে। বলিরেখায় সমগ্র মুখ ঝুলে পড়েছে। গায়ে তালি-দেওয়া টুইলের সার্ট। পায়ে ক্যানভাসের ছেঁড়া জুতো। জীর্ণ ছাতাটায় ভর দিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে চলেছেন।

ডাকলাম: নমস্কার শশীবাবু।

আচমকা থেমে গেলেন। একটু চেয়ে থেকে বললেন: হ্যাঁ-হ্যাঁ, নমস্কার। কেমন আছেন আজকাল? কোথায় আছেন?

বললাম: মহাকালেই কাজ করছি। আপনার খবর কি?

হতাশায় ভেঙে পড়লেন শশীবাবু! কোন খবরই নেই। ভাস্কর তো মশাই উঠে গেল। সংগে সংগে আমাদেরো মেরে গেল। সেই থেকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে মরছি।

সংবাদপত্র বড় সংকীর্ণ কর্মক্ষেত্র। জীবন-নদীতে বড় ছোট একখানি নৌকা। যারা চড়ে বসেছে, একেবারে তাদেরি মাপমত তৈরী যেন। একবার স্থানচ্যুত হলে আবার স্থানসংকুলান করা দুর্ঘট ব্যাপার।

তবু বললাম: 'স্বাধীনতা'-র আপীসে একবার খোঁজ নিননা। ওরা শুনেছিলাম লোক নিচ্ছে।

খোঁজ নিতে কি আর বাকী রেখেছি নারাণবাবু। কিন্তু সব ব্যাটারই এক কথা: আপনি একজন পাকা লোক এ লাইনে। আপনাকে নিতে পারলে তো সুবিধাই হতো। কিন্তু কি করি

শশীবাবু, যা দিনকাল পড়েছে। এমনি অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, বুড়ো ঘোড়াকে কেউ আর দানা খাওয়াতে রাজী নয়।

শশীবাবুর চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বললাম: আপনি বরং অন্য কোন লাইনে একটু চেষ্টা করে দেখুন না, তাতে হয়তো সুবিধা হতে পারে।

এই বুড়ো বয়সে আর কোন্ গোয়ালের সন্ধানে বেরুব বলুন। রয়টার-এসোসিয়েটেড প্রেস ছাড়া আর কিছু যে এখন চোখেই দেখি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শশীবাবুর বুকের ভিতর থেকে। তার তপ্ত হাওয়া লাগল আমার কপালে। আজীবন সাধনার ব্যর্থ পরিণামের অভিশাপ বুঝি। হাত দিয়ে কপালটা মুছে ফেললাম। সাংবাদিক জীবনের শেষ বয়সের কথা ভেবে শিউরে উঠলাম।

শশীবাবু বললেন: তাই ভাবি নারাণবাবু, সারাজীবনটা ভুলের ফসল কেটেই মরলাম। এ লাইনে না ঢুকে প্রথমেই যদি কোন মার্চেন্ট আপীসে ঢুকতাম, নিদেন পক্ষে পোষ্ট আপীসেও যদি একটা চাকরী নিতাম, তাহলে কি আর শেষ বয়সে এমন হা অন্ন, হা অন্ন করে মরতে হয়। কি দুর্বুদ্ধিই যে তখন ঢুকলো মাথায়। কত আশা, কত স্বপ্ন। আর নিজেকেই বা শুধু দোষ দিয়ে লাভ কি। সবাই তখন তুলে দিল আকাশে। কর্তৃপক্ষ বললেন: পরাধীন দেশে সংবাদপত্রসেবা দেশসেবার রূপান্তর। আপনাদের মত যুবকেরই তো এ কাজ। বন্ধুরা বলল: দুদিন পরে দেশ স্বাধীন হবে। তখন তো তোরাই দেশের হর্তাকর্তা। লাটসাহেবের বাড়ীতে খানা খাবি। রাজামহারাজার সাথে দহরম মহরম করে বেড়াবি। দেখিস্ তখন যেন আমাদের ভুলে যাস্‌নি।

চোখে তখন যৌবনের নেশা। ভাবতাম হবেও বা। তবু ভয়ে ভয়ে এক এক সময় বলতাম: কিন্তু এই অল্প মাইনেতে এই হাড়ভাঙা খাটুনি—

সকলে হৈ-হৈ করে উঠত: আরে এ্যাসা দিন নেহি রহেগা। দেশ স্বাধীন হলে আপনাদের হাতেই তো গভর্ণমেণ্ট। আর আপনার যা পার্টস রয়েছে। দুদিনেই এডিটার হয়ে যাবেন। বাড়ী হবে। গাড়ী হবে। আপনার তে-তলা বাড়ীর সামনে তখন মোটর গিস্‌গিস্ করবে।

হঠাৎ শশীবাবু আমার ডানহাতখানা ধরে ফেললেন। উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন: রাত জেগে cable read করতে করতে এমন অনেক স্বপ্ন আমি দেখেছি। দোহাই আপনার, পারেন তো এখনো সরে পড়ুন।

জলভরা চোখে করুণ মিনতি। বললাম: দেখি। কোথাও যদি সুবিধে করতে পারি।

হ্যাঁ—হ্যাঁ, এখনো আপনার বয়স আছে। পেটে বিদ্যা আছে। শরীরে শক্তি আছে। এইবেলা সরে পড়ুন। এ বড় সর্বনেশে লাইন। একবার শিকড় গাড়লে আর নড়তে পারবেন না। আমাকেই দেখুন না। শেষের দিকে কতবার ভেবেছি, দেব এই সাব-এডিটারী ছেড়ে। কিন্তু কই, পারলাম না তো। কিসের যেন টান। নাড়ীতে নাড়ীতে কিসের যেন আকর্ষণ। একবার ধরা পড়লে এর হাতে নিস্তার নেই। এ ম'শায় ময়াল সাপের ঠাকুর্দা। চোখে টানে, নিঃশ্বাসে টানে।

বলতে বলতে শশীবাবুর কেমন যেন ভাবান্তর দেখা দিল। চোখের দৃষ্টি অর্থহীন। মাথাটা অনবরত নড়ছে। হাত-পা ছুঁড়ছেন অপ্রকৃতিস্থের মত। তার ভাবভংগী দেখে দু' একজন লোকও দাঁড়িয়ে গেল পথের পাশে।

তাদের দিকে ভেংচী কেটে শশীবাবু বললেন: কি চাই এখানে? চাকরী? সে হবে না মশায়। সে গুড়ে বালি।

একটা অদ্ভুত ভংগীতে বৃদ্ধাংগুষ্ঠদুটি তুলে ধরলেন। সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

শশীবাবু আরো ক্ষেপে বক্তৃতার সুরে বলতে সুরু করলেন: হাসো। হেসে নাও দুদিন বইতো নয়! কিন্তু সব মশায়েরি কাঁদতে হবে। কলম চালাতে চালাতে আঙুল টনটন করবে। কপালের শিরা দপ্‌দপ্ করে লাফাবে। চোখে আগুন ধরে উঠবে। না, না, সে বড় কষ্ট। এ চাকরী তোমরা কোরো না। যাও, যাও এখান থেকে। পালাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। শশীবাবু উন্মাদ হয়ে গেছেন। বেদনার্ত স্মৃতির কশাঘাতে জর্জরিত বুদ্ধি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

একটা রিক্সা ডেকে শশীবাবুকে তুলে নিলাম। খানিক চুপ করে চলতে চলতেই সহজ বুদ্ধি ফিরে এল। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে উঠল। কোটরগত দুটি জলভরা গোলচোখ। হলদে, বিবর্ণ। ঈষৎ লাল ছিটে। জীবনের কীর্তিনাশা। আশা-আকাংখা, স্বপ্ন-সাধ সব চূর্ণ করেও অতৃপ্ত তার ক্ষুধা। এবারে সে চায় বুদ্ধির শেষ আশ্রয়-স্থল। অসহায় শশীবাবু। উপর্যুপরি ভাঙনের মুখে বড় অসহায়।

স্মৃতির পাতা হতে মুছে গেল শশীবাবুর ছবি। আর কখনো তাঁর দেখা পাই নি। তড়িৎদার ছবিও একদিন মুছে গেল। রাণুদাই সংবাদ দিল, হাসপাতালেই তড়িৎদা শেষ নিশ্বাস ফেলেছে। মরবার সময় ট্রেণের একটা হুইস্‌ল তার চোখে মানস সরোবর রচনা করেছিল কিনা কে জানে!

বসে বসে অতীতের জাবর কাটছি। স্মৃতির চাকা ঘুরে চলেছে নিরংকুশ গতিতে। জীবনের কত গলিতে, কত আঙিনায় পদক্ষেপ করলাম। কত মানুষের সংগে পরিচয় ঘটল— কত প্রাণের সাথে হল রাখীবন্ধন। আজ তারা কোথায়? কি করছে? আমিই বা কোথায়? নিজের কথা মনে পড়ে। 'মহাকাল' ছেড়ে দিয়েছি। মফস্বলের একটি স্কুলে মাষ্টারী নিয়েছি। চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এগিয়ে চলেছে জীবনের পথ। এ পথেও সুখ আছে, দুঃখও আছে। সাংবাদিক জীবনেরও সুখ ছিল, দুঃখও ছিল। তবে সাংবাদিকতা ছেড়ে এলাম কেন? শশীবাবুর উন্মত্ত সতর্ক-বাণী? তড়িৎদার মৃত্যু? শশীবাবু-তড়িৎদা তো সাংবাদিক জীবনের accidentও হতে পারে। বাঙলার সব সাংবাদিকই আর পাগল হয় না, হাসপাতালে শেষ নিশ্বাসও ফেলে না। তারাও হাসে, খেলে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার করে। তাদেরও অনেকে বাড়ী করে। মোটারে হাওয়া খায়। তবে? কিছুই বুঝি না। যুক্তি দিয়ে বোঝাতেও পারি না। আমার শুধু মনে

হয়, এখানে শশীবাবু-তড়িৎদারই মেজরিটি ; যারা বাড়ী করে, গাড়ী চড়ে, তারাই accident ; glorious accident হলেও।

অবশ্য আমি 'মহাকাল' ছেড়ে স্কুল-মাষ্টার হয়েছি, এর মূলে এত কিছু সুখদুঃখের বিচার-বিবেচনা ছিল না। এটা নেহাতই আমার ব্যক্তিগত কথা। হয়তো আমারি দুর্ভাগ্য, দীর্ঘ ছয়টি বছর টেলিপ্রিণ্টারের আর্তনাদের সংগে মানুষের আর্তনাদই শুনে এলাম। আশেপাশে যাদের দেখলাম, যাদের সাথে মনের মিল হল, যাদের আত্মীয় বলে গ্রহণ করলাম, তারা শশীবাবু-তড়িৎদারই সমগোত্রীয়। চরম গন্তব্যে না পৌঁছুলেও একই পথের পথিক। অভুক্ত দেহ। অনিদ্র চোখ। অপূর্ণ আশা। আহত স্বপ্ন। জীবনের গাছে স্বপ্নের ফুল কি কখনো সত্যি ফোটে ?

তবু বলব অদ্ভুত টেলিপ্রিণ্টার। অদ্ভুত ইউ. পি, এ. পি, রয়টার। অদ্ভুত সংবাদপত্রের দৈনন্দিন কায। বিরাট বৈচিত্র্য। গতিবেগে চঞ্চল। অদম্য আকর্ষণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। দিনের পর দিন কাটে। বিশ্রাম নাই। অবকাশ নাই। শরীর অবসন্ন হয় অবিরাম পরিশ্রমে। মন তবু থাকে জেগে। তীব্র আকর্ষণে উন্মুখ।

এই আকর্ষণ টেনেছিল শশীবাবুকে। এরি সাইরেন বাজে রাণুদার বুকে। রাণুদা বলে ভাল : আরে বাবা, খবরের কাগজে চাকরী যেন হিন্দুমতে বিয়ে। একবার গাঁটছড়া বেঁধেছ কি সারাজীবন বোঝা বইতেই হবে। তার যদি night-duty হয়, তবে তো একেবারে তৃতীয়পক্ষের ব্যাপার অর্থাৎ যাকে বলে henpecked.

আমারো নাড়ীতে অনুভব করেছি এর টান। তবু একদিন এ-পথ ছেড়ে দিলাম। শেষ ধাক্কাটা বুঝি প্রভাতই দিয়ে গেল।

নৈশ-সম্পাদক অনুপস্থিত। আমিই সেদিন রাত্রের চার্জে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরী করে প্রভাত আপীসে এল। বলল : কাজটাজ কেমন বাকী আছে নারাণদা ? বড়ো মাথা ধরেছে আজ।

চোখ না তুলেই বললাম : মাথার আর অপরাধ কি। ওটা তো আর ষ্টীলের তৈরী নয়। কোথায় ছিলে সারা দুপুর ? গড়ের মাঠে, না আউটরাম ঘাটে ?

আজ সারাদিন মেসেই ছিলাম। এই উঠে এলাম। শরীরটা যেন কেমন লাগছে।

খবরের কাগজে কাজ করলে সব সময়েই 'কেমন' লাগে। কেমন লাগা গ্রাহ্য করলে night duty অচল। হেসে বললাম : আরে বলো কি প্রভাত ? দুপুরের সূর্যটা আজ তাহলে মাঠেই মারা গেল ?

সকালে-দুপুরে-সন্ধ্যায় সুযোগ হলেই সূর্যের গতি নিরীক্ষণ করা প্রভাতের একটা বাতিক। এ নিয়ে আমরা যত বাক্য-বাণ ছুঁড়ি, ও ততই হয়ে ওঠে বেপরোয়া। অন্য দিন হলে সূর্যের প্রাণবত্তা নিয়ে এখনি প্রভাত লম্বা লেকচার দিয়ে বসত। আজ কিন্তু একটি কথাও বলল না। ডাক-এডিশনের কাগজ, তারো আর রয়টার-স্লিপগুলো নিয়ে নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। চেয়ে দেখলাম ভাল করে। চেহারাটা সত্যি অসুস্থ।

খানিক পরেই কিন্তু প্রভাতের চেহারা বদলে গেল। মস্তিষ্কে সুরু হয়েছে সংবাদের চুম্বক-শক্তির ক্রিয়া। কোথায় অসুখ ? কিসের মাথাধরা ? চোখে আগুন ধরেছে সৃষ্টির আবেশে। হাতের কলমে লেগেছে বিদ্যুৎ-গতি। প্রভাত অবিশ্রাম লিখে চলেছে।

কাজ শেষ করে প্রভাত আজ কোন কথাই বলল না। হাত দিয়ে কপাল চেপে ধরে বিছানার উপুড় হয়ে পড়ল।

বিস্মিত হলাম। কপালে হাত দিলাম। জ্বরে কপাল পুড়ে যাচ্ছে। কে বলবে, পাঁচ মিনিট আগেও এই মানুষ একাদিক্রমে চার ঘণ্টা কলম চালিয়েছে তীব্রবেগে।

সংবাদপাগল রয়টার-এডিটার প্রভাত, শশীবাবুর ময়াল সাপ তোমায় টানছে। তুমি মরেছ।

টেবিলের মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। আত্মনাশের নেশায় সলতেটা যেন উজ্জ্বলতর। এমনি আত্মদাহী দীপ্তি দেখেছি প্রভাতের চোখে। চোখের নীচে কালি পড়েছে। চোখ ঢুকেছে গর্তে। তবু অনন্ত তার দীপ্তি। ভিতরের অগ্নি-শিখায় প্রতিবিম্বিত।

কয়েকদিন পরে। প্রভাত আবার নিয়মিত আপীস করছে। শরীরটা আরো শুকিয়েছে। মুখ আরো রুক্ষ। মাঝে মাঝে খুক্ খুক্ করে কাশে।

পাশের চেয়ার হতে উঠে এল নগেশ। চুপি চুপি নৈশ-সম্পাদক ধরিত্রীবাবুকে কি যেন বলল। ধরিত্রীবাবু চমকে উঠলেন : এ্যাঁ, বলেন কি ?

নগেশ জবাব দিল : কয়দিন যাবতই সন্দেহ হচ্ছিল। আজ আমি নিজ চোখে দেখেছি।

বিহ্বলকণ্ঠে ধরিত্রীবাবু বললেন : কি ?

প্রভাতের কাশির সংগে রক্ত ওঠে। ওর পকেটে তুলো রয়েছে। কাশি এলেই সেটা মুখে দেয়।

প্রভাতকে ডেকে নিয়ে ধরিত্রীবাবু ছাদে গেলেন। পাশে বসেছিলাম। পাছে পাছে আমিও গেলাম।

প্রভাত বলছে : কি যে বলেন ধরিত্রীবাবু ! রোগ হল আমার, আর মাথাব্যথা হল আপনাদের।

কিন্তু নগেশ যে বলল তোমার কাশির সংগে রক্ত উঠছে। সে নিজ চোখে দেখেছে।

প্রভাত হেসে বলল : আমিই কি অস্বীকার করছি।

তবে ?

ও কিছু না। অনেকদিন থেকেই আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। কি একটা শিরা নাকি ছিঁড়ে গেছে। তাই মাঝে মাঝে গলা দিয়েও রক্তটা ooze করে।

একটু ভেবে ধরিত্রীবাবু বললেন : দেখ প্রভাত, আর যাই হোক, তোমার শরীরটাও তো দুর্বল। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলে। তোমার আর রাতে কাজ করে দরকার নাই। কিছুদিন বরং day shiftএ যাও।

প্রভাত ঘাড় নাড়ল : ওইটি পারব না ধরিত্রীবাবু।

আমি বললাম : না পারবার এতে কি আছে ?

শক্ত গলায় প্রভাত জবাব দিল : আছে নারাণদা, অনেক কিছু আছে। সারা বিকেলটা আপীসে আটকা থাকতে আমি পারব না।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও একি অশোভন জিদ্! রাগ হল। বললাম: কেন পারবে না শুনি? গংগার ধারে বসে সূর্যাস্ত দেখতে পারবে না, এইজন্তে তো?

প্রভাত বললে: তোমরা ঠাট্টা করতে পারো। কিন্তু আমার জীবন আমারি। সূর্যাস্ত না দেখে জীবনে বেঁচে থাকার কোন মানে নেই আমার কাছে।

তবু বললাম: অন্তত কিছুদিনের জন্তেও কি দিনে কাজ করতে তুমি পার না?

না।

একটু থেমে প্রভাত আবার বলল: শোন তাহলে। এক তো দিনের বেলাটা আপীসের অন্ধকার ঘরে আটক থাকবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। তার চেয়ে চাকরী ছেড়ে দেওয়া ভাল। তাছাড়া দিনের বেলায় আমার অনেক কাজ।

ঝাঁঝালো গলায় বললাম: কি কাজ তোমার? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান তো?

তোমাদের কাছে তাই বটে, আমার কাছে নয়। সারাদিন আমাকে পার্টির কাজ করতে হয়। কি সে কাজ তা তোমাকে বলতে পারব না। তবে এইটুকু জেনে রাখো নারাণদা, তোমাদের স্নেহ-সহানুভূতির চেয়েও আমার কাছে সে কাজের মূল্য বেশী। আমার জীবনের চেয়ে তো বটেই।

ধরিত্রীবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, প্রভাত হাত জোড় করে বাধা দিল: আমাকে মাপ করবেন ধরিত্রীবাবু! দিনে আমি কাজ করতে পারব না। বরং দরকার হলে বলে দেবেন, আমি resignation দেব।

উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রভাত নীচে চলে গেল। একটা নক্ষত্রপতনে চমকে দুজনেই সেদিকে চোখ ফিরালাম।

আবার প্রভাতকে মনে পড়ছে। কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছি না আজ রাতে। স্মৃতির পাতা উজ্জ্বল করে বারবার সে দেখা দিচ্ছে! তীব্র দীপ্ত চোখ। দেহে সংগ্রামের রুক্ষতা। ঠোঁটে আত্ম-প্রত্যয়ের দৃঢ়তা। সৈনিক প্রভাত। নতুন সূর্যের তপস্তায় নিবেদিতপ্রাণ।

ক'দিন ধরেই আপীসে একটা চাপা আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। আজ তা সশব্দে ফেটে পড়ল।

প্রথম কথাটা তুলল নগেশ: এভাবে তো আমরা কাজ করতে পারি না ধরিত্রীবাবু। আর কিছু তো নয়, একেবারে টি-বি।

প্রায় সকলেই তার সংগে সুর মিলালো।

প্রভাত মাথা নীচু করে লিখছিল। ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: বার বার বলছি, টি-বি আমার হয় নি। তবু আপনারা এ নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়াই করছেন। কিন্তু এও আপনারা জানবেন যে, টি-বি যদি হয়ও তবু আমি এখানে কাজ করব যতদিন পারব।

সীতেশবাবু বললেন: আপনি বলছেন কি?

ঠিকই বলছি। টি-বি যদি আমার হয়েই থাকে তার জন্তে এই আপীসই দায়ী। সুতরাং আপীসকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

ধরিত্রীবাবু সহানুভূতিভরা গলায় বললেন: ভগবান না করুন, যদি তেমন কোন মারাত্মক ব্যাধি তোমার হয়েই থাকে, তাহলে সবশুদ্ধ জড়িয়ে তোমার লাভ কি প্রভাত?

মৃদু হেসে প্রভাত জবাব দিল: এত সহজেই রোগ জড়ালে পৃথিবীতে ডাক্তার-কবিরাজ বেঁচে থাকত না ধরিত্রীবাবু। আর লাভ? লাভ আমার নয়, আপনাদের।

নগেশ প্রশ্ন করল: মানে?

মানে জীবন দিয়েও আমি একটা প্রতিবাদ জানাতে পারব।

কিসের প্রতিবাদ?

অন্যায়ের। দিনের পর দিন অসহায় সাংবাদিকেরা যে অন্যায় সহ্য করে চলেছে, তারই প্রতিবাদ। রক্ত জল করে আমরা খেটে মরি, অথচ আমাদের উপযুক্ত খাবারের সংস্থান নাই, প্রয়োজনীয় বিশ্রামের ব্যবস্থা নাই।

ধরিত্রীবাবু বললেন: সে প্রতিবাদ তো আমরা এমনি জানাতে পারি।

প্রভাত আবেগে ফেটে পড়ল: না, পারি না। প্রতিবাদ জানালেই আমাদের চাকরী যায়। সারা দুনিয়ার কোথায় কতটুকু অন্যায় হল, রাতের পর রাত জেগে আমরা তার চুলচেরা হিসাব প্রকাশ করি, শ্রমিক-মালিক বিরোধের উপর দু'কলম লম্বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাপি; অথচ আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কেউ হিসাব রাখে না। আমাদের মাইনের কোন গ্রেড নাই, যা খুসী দিলেই হল। আমাদের ছুটির কোন ঠিকানা নাই, কর্তৃপক্ষের সেখানে মর্জি। আমাদের চাকরীর কোন security নাই, গাছ থেকে টুপ করে পড়লেই হল। অথচ এ নিয়ে কোন কথা বলা চলবে না। বললেই আপীস থেকে বেরুবার দরজা সেই মুহূর্তে খুলে যাবে, রাত দুপুরেই হোক্ আর দিন দুপুরেই হোক্।......

জীবন দিয়েই প্রভাত একদিন এ অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু সে সংবাদ সে নিজ হাতে এডিট্ করতে পারল না।

সংবাদ পাঠালেন 'মহাকাল'-এর জনৈক মফস্বল সংবাদদাতা। লিখলেন:

> গত ১৮ই মার্চ তারিখে বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'মহাকাল'-এর ভূতপূর্ব সহকারী সম্পাদক তরুণ সাম্যবাদী কর্মী শ্রীমান্ প্রভাতরঞ্জন সেন কাল যক্ষ্মারোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের—

দপ্ করে জ্বলে উঠে নিঃশেষিত মোমবাতিটা কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল। চারদিক হতে নেমে এল অন্ধকার। ঘর ভরে গেল। কালো মিশ্‌মিশে অন্ধকার। জমাট। নিরন্ধ্র।

একা বসে আছি। শরীর অসার। মাথাটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। চিন্তা করবার শক্তিও নাই। স্মৃতির চাকা ঘুরছে ঘূর্ণির মত। সমগ্র অতীত গেছে তাল পাকিয়ে। নেমে এসেছে বর্তমানে। চারদিকে ভীড় করেছে চেনা-অচেনা কত মুখ। আঁধার ঘরে কত অশরীরী আত্মার শব্দহীন পদক্ষেপ। তড়িৎদার কালি-পড়া চোখ। ভাস্করের শশীবাবু, কীর্তিনাশা চোখের উপর জ্র উদ্ধত ভাঙন। বর্মা চুরুটমুখে রাণুদা। 'মহাকাল'-আপীসের ছাদে প্রভাতের সূর্য-তপস্যা। হেড-কম্পোজিটার বুড়ো নগেন দত্ত। ছোকরা প্রেসম্যান নরহরি, ফর্মা পড়ে যার পা ছেঁচে গিয়েছিল। এমনি কত মুখ। বিচিত্র। অসংখ্য। অন্ধকারে স্মৃতির প্রেতদল।

মাথাটা টন্‌-টন্ করছে। বড় যন্ত্রণা। মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে স্মৃতির বৃশ্চিকদংশন। স্মরণের পট দাউ দাউ করে জলে উঠেছে। আগুন। মাথায়, বুকে, শিরায় শিরায় অগ্নি-প্রবাহ। উঃ।

আর্তনাদ করে জানালা খুলে দিলাম। এক ঝলক আলো এসে পড়ল ঘরে। ভোর হয়েছে। চোখের পলকে ঘরভরা আঁধার ছুটল বাইরে। জানালার পথে শেষহীন প্রেত-শোভাযাত্রা। ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা? কোথায়?

বাইরে তাকালাম। মেঘধোয়া প্রশান্ত উষা। পাখীর গানে নতুন দিনের বন্দনা। পূর্বদিগন্তে আলোর সমারোহ। নীল আকাশে জবাকুসুমের আলপনা। দেবদারু গাছটায় নতুন-ওঠা সবুজ পাতাগুলি খুসীতে ঝলমল্। সূর্য্য উঠছে। নতুন সূর্য।

জানালার দিকে মাথা রাখলাম। প্রণাম।

শেষ

নানা সাহেবের পরিণাম

শ্রীক্ষিতিনাথ সুর

ম্যাট্রিকুলেশন ইতিহাসগুলিতে শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পোষ্যপুত্র ধুন্দুপন্থ ওরফে নানাসাহেবের পরিণাম সম্বন্ধে কোন সঠিক উল্লেখ নাই। বিভিন্ন ইতিহাসগুলির বিবরণে কোন সামঞ্জস্যও নাই। ইহা দুঃখের কথা, কারণ একই মানের (ষ্টাণ্ডার্ড) ছাত্রদিগকে একই বিষয়ে বিভিন্ন কথা বলা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—নানাসাহেব কানপুর হইতে পলাইয়া গেলেন এবং তাঁহার কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না।—ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৩৪৬।

ডাঃ কালিদাস নাগ লিখিয়াছেন—'নানাসাহেব পরাজয়ের পর কোথায় যে পলায়ন করিলেন কেহই জানিতে পারিল না।'—স্বদেশ ও সভ্যতা, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৪২৯।

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী লিখিয়াছেন—'নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন।'—ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃঃ ৩৭৭।

ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শ্রীযুত অনিলচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন—'নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন'।—আমরা ভারতবাসী, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৩১৭।

আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক। নানাসাহেবের পরিণাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মত বিরোধ আছে, ইহা সত্য। সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণীও ইংরাজ লেখকদের লেখায় নানাসাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু মারাঠী কাগজ-পত্রে তাঁহার মৃত্যুর সঠিক সংবাদ আছে। এই সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মারাঠী ঐতিহাসিক শ্রীযুত জি. এস. সরদেশাই, কিছুদিন আগে মডার্ণ রিভিয়ুতে, **The last days of Nana Saheb of Bithur** নামে একটী প্রবন্ধ লেখেন। তাহা হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে নানাসাহেবের মৃত্যুর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কাণপুর হইতে পলায়ন ও তাঁহার মৃত্যু—ইহার মধ্যে চৌদ্দমাস অতিবাহিত হইয়া যায়। এই সময়ের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

—'Two days after the massacre of Cawnpur had taken place, on the night of July 15, 1857, General Havelock entered the town with a relieving force. As soon as Nana Saheb heard that Havelock was rapidly approaching Cawnpur, he fled away from Bithur with his followers and relations and as much valuable property as he could collect and carry in a short time and traversing the territory of Oudh and encountering severe hardship on the way, he entered Nepal, when he could breath a momentary relief from his pursuers... Knowing that Jung Bahadur the de facto ruler of Nepal, was a friend of the British, Nana Saheb did not disclose his identity for a long time. In fact, the party did not live in one lot or in one place. They wandered from place to place, mostly resorting to hills and jungles, concealing their movements and whereabouts. Various reports about their peregrinations reached both the Nepalese and British officials. When they were discovered under the Nepalese jurisdiction, they ran to the British territory and vice versa. This game of hide and seek, altogether lasted for some fourteen months, July 1857 to September 1858 and subjected them to untold miseries and hardships. Nana Saheb was utterly work out and while living near a village named Devkhari, about 15 miles from Thada, in Nepal, he was attacked from a kind of malignant fever, to which he succumbed on Wednesday 6th. October, 1858, at the age of 34.'

Modern Review, November, 1936, p. 509.

নানাসাহেবের মৃত্যুর পরে, তাঁহার বিধবা পত্নী কৃষ্ণাবাঈ পেশোয়া পরিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে কাটমণ্ডু যান এবং সেখানে জমি কিনিয়া নিজেরা গৃহনির্ম্মাণ করতঃ দীর্ঘদিন বাস করেন। তাঁতিয়া তোপীর ৪টী পৌত্র এই সঙ্গে ছিল এবং তাহার মধ্যে বলবন্ত রাও এই পরিবারের বিশ্বস্ত সেবক ছিল।

শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের কন্যা কুসুমবাঈও এইদলে ছিলেন। সকল হাঙ্গামা মিটিয়া গেলে, তিনি গোয়ালিয়রে তাঁহার স্বামীগৃহে যান এবং ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে বাস করেন। পরে তিনি কাশীতে আসেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুন সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সম্পর্কে শ্রীযুত সরদেশাই লিখিতেছেন—'It is from her (i, e. Kusum Bai) that authentic information was obtained by the historian Rajawade, about the sad end of Nana Saheb and published by him, in 1918, in one of the volumes of the Bharat Itihas Mandal of Poona.—Ibid. p. 508.

এই ব্যাপারে আর অধিক লেখা অনাবশ্যক। কিন্তু একটা কথা—ম্যাট্রিকুলেশন ইতিহাসগুলির লেখক প্রায় সকলেই খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এবং অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক; তবে কেন, তাঁহাদের রচনায় এই অসামঞ্জস্য থাকিতেছে? বিশেষ করিয়া, এই প্রবন্ধের প্রথমে যে চারিখানি পুস্তক হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই অসামঞ্জস্য পরিস্ফুট হইবে। এই দিকে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া একটা সামঞ্জস্য বিধান হওয়া উচিত।

কলিকাতার চিঠি

(১৯৪৩)

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রিয়বরেষু—

পঙ্ক-নদের মঞ্চ আড়ালে রয়েছ' ক্ষুব্ন-চিতে,
'দেউলে' দাদার বিজয়ার চিঠি গেল যেথা দেওয়ালীতে।
লা-হো-র এখন আনন্দে ভোর, এখানে 'লা-মিজারেল্'—
শুরু হয়ে গেছে শহরে ভাইরে ভানুমতী বাজী খেল্!
জবাব তোমার এসেছিল বটে বড়দিন ঘেঁষে হাতে
আমরা তখন বোমার হিড়িকে জেগে থাকি রোজ রাতে।
হয়ত' বসেছি সবে খেতে রাতে, বেজেছে মাত্র ন'টা—
হঠাৎ ডুকরে ওঠে 'সাইরেণ্' পাড়ার যেখানে য'টা!
বন্ধ করিয়া আহার-পর্ব উঠে পড়ি এঁটো হাতে,
পত্নী বলেন—"ওকি! বোসো বোসো, সবই যে রইল পাতে।
মুখের গ্রাস কি ফেলে ওঠে কেউ? মাথা খাও, খেয়ে নাও
বাজুক্ গে বাঁশী। ফাঁসি দেবে নাকি? মিছে কেন ভয় পাও?
খাঁদা বেটাদের মুখ্যে আগুন, অসময়ে উড়ে আসে
খেতেও দেবে না পোড়ার মুখোরা! থাকবো কি উপবাসে?"
আমি বলি—"ছাখো, আর না এখানে; রেখে আসি চলো দেশে,
গতিক ভাল না, কি জানি কি হয়—" পত্নী বলেন হেসে—
"যেতে পারি যদি তুমি যাও তবে, নচেৎ নড়ছি না কো।
দেশে গিয়ে আমি মরব কি ভেবে তুমি যদি হেথা থাকো?
গিয়ে গেল-বারে ম্যা-ভোগা ভুগেছি, ভুলে গেছ বুঝি? ওমা!
মরি বাঁচি আমি নড়ছিনি আর হাজার পড়ুক বোমা।
রেডিয়োতে যেই শোনাবে খবর 'শত্রু বিমান এসে
ফেলে গেছে কিছু সামান্য বোমা শহরের কোণ ঘেঁসে।'
কিংবা সকালে কাগজ খুলেই পড়িব চখের জলে
'বিমান আক্রমণের বার্তা কলিকাতা অঞ্চলে'
কোথা? কোনখানে? জানাবেনা কিছু, সেন্শারে সেটা মানা;
তোমাকে তখনি টেলিগ্রাম ছাড়া কুশল যাবে না জানা।
হয়ত বা কেউ দেশে ফিরে গিয়ে গুজব রটাবে হেঁকে—
'গুঁড়ো হয়ে গেছে হাওড়ার পুল এসেছে সে চোখে দেখে!
গঙ্গার জলে মড়া ভেসে চলে সংখ্যা হয় না তার—'
এসব শুনে কি স্থির হয়ে থাকা সম্ভব সেথা আর?
দুর্ভাবনায় দুরন্ত চাপে অস্থির হবে মন,
তার চেয়ে আমি ঢের ভাল আছি সঙ্গে যতক্ষণ।"

[illegible] কঁকিয়ে কাঁদে থেকে থেকে বিপদ-জ্ঞাপক বেণু
গৃহিণীকে [illegible] ছুটে চলি যেন ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ ধেনু!
ছেলে মেয়েগুলো পড়েছে ঘুমিয়ে, তুলে নিয়ে কোলে কাঁখে
নেমে আসি তাই 'শেল্টারে' সব সিঁড়ির নীচের ফাঁকে।
কারণ, শুনেছি বাড়ী যায় ভেঙে, সিঁড়ি ঠিক থাকে খাড়া,
এমন সময় এ-আর-পি দেয় আলো নেভাবার তাড়া।

বদ্ধ ঘরের অন্ধকারের করাল কবলে ঢুকে
মধুসূদনের নাম জপি দাদা ভয় কম্পিত বুকে।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাবার, কেটে যায় বুঝি নিশি—
মেয়ে জেগে বলে 'জল খাব বাবা', ছেলে উঠে বলে 'হি-শি'
গৃহিণীরে বলি—"চা' পেলে একটু মন্দ হ'ত না, ওগো!
বিনা সিগারেটে ফুলে ওঠে পেট, একটু কষ্ট ভোগো—
চট্ করে গিয়ে প্যাকেটটা আনো জামার পকেট থেকে,
'টর্চ' নিয়ে যাও, হোঁচট খেয়োনা, উঠো নেমো সিঁড়ি দেখে-
গিন্নী যেমন যাবেন অমনি 'দ্দুম্' আওয়াজ দূরে
"ওরে বাবা গেছি!" বলে 'টর্চ' ফেলে পত্নী আসেন ঘুরে।
'এ-আর-পি'দের উপদেশ দাদা গ্রাহ্য করি নি, তাই
শেল্টারে সব যোগাড় না-রেখে কেবলি কষ্ট পাই।
এই ভাবে দিন যেতেছিল বলে হয়নি পত্র লেখা
কৃষ্ণ পক্ষে পেয়েছি রক্ষে, নিশীথে ডাকেনি 'কেকা'!
ছ'টা না বাজতে বন্ধ শহরে গাড়ী ঘোড়া বাস ট্রাম
সন্ধ্যার পর মনে হয় ভাই 'কোলকাতা' যেন গ্রাম!
'পেট্রল' হয়ে 'রেশান'গ্রস্ত মোটরে করেছে হিট্,
গোদের উপরে বিষফোড়া যেন দেখা দেছে 'পারমিট্'।
'বিফল প্রাচীর' ঘেরা চারিধার, ট্রেঞ্চ্ খোঁড়া আশে-পাশে,
নগর যেন বা কবর ভূমি এ! দেখে শুনে মরি ত্রাসে।
নিষ্প্রদীপের শাসন বেড়েছে, ঠুলি ঢাকা যত আলো,
এখন বুঝেচি অমাবস্যার রাত কী নিবিড় কালো।
'সার্শি', 'আরশি' 'বুক কেস্' ভায়া যেখানে যা ছিল কাঁচ,
চট, কানি, কাঠে ঢেকে দিছি সব, বাঁচাতে বোমার আঁচ!
কেউ বলে—'যেই সাইরেণ হবে জানলা দরজা যত
খুলে রেখ' সব—নইলে 'ব্লাষ্টে' হতে হবে বিব্রত;'
কেউ বলে—'না না, এঁটে রেখ' সব, হয় হোক্ চৌচির,
নইলে যে হবে খাণ্ডব-দাহ 'ইন্সেন্ডিয়ারির!'
'ভাইব্রেশানের' বিভীষিকা আনে ভূমিকম্পের নাড়া—'
এ সব শুনে কি বুড়ো মানুষের ঠিক থাকে শিরদাঁড়া?

সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফিরে আসি, খেয়ে নিই আটটায়,
কি জানি কখন আসে বাবাজীরা বে-রসিক ঠাট্টায়!
চাঁদের আলোয় করে আনা-গোনা চাঁদেরা পুষ্প রথে,
খসে খসে পড়ে উল্কা-পিণ্ড হাটে মাঠে ঘাটে পথে।
ফুকারিয়া ওঠে '[illegible]-শিঙা' তীব্র আর্ত্ত স্বরে
করে বিঘোষিত শত্রু আগত জ্যোৎস্না প্লাবিত পুরে।
ছুটে যায় ঘুম, শয্যা ছাড়িয়া সবাই নীচের নামি,
পৌষ-প্রখর শীতের রাত্রে 'শেল্টারে' ঢুকে ঘামি।
দুই কাণ থাকে খাড়া হ'য়ে যেন রজক-বস্ত্র-বাহী,
শব্দ শুনিলে 'মধি' নারায়ণে, প্রাণ করে ত্রাহি ত্রাহি।

আকাশ বাতাস মন্দ্রিয়া ওঠে বজ্র নিনাদে যেন,
পড়িছে হয়ত খুব কাছাকাছি মনে হয় ঠিক হেন।
সকালে উঠেই পড়ে খোঁজা খুঁজি—সবারই শোনার তাড়া—
কাল রজনীতে চূর্ণ হয়েছে কোনদিকে কোন পাড়া ?
সবার মুখেই শুনি এক কথা, জটলা পাকায় যারা,
"আমাদেরই ছাদ প্রায় ছুঁয়ে নাকি উড়ে গেছে কাল তারা !"

আবার এসেছে শুক্ল-পক্ষ আবার উঠেছে চাঁদ,
সেই মায়াবিনী জ্যোৎস্না আবার পেতেছে বোমার ফাঁদ।
মাথার উপরে ঘোরে ঘর্ঘর কিবা দিন কিবা রাত
হরেক রকম জঙ্গী বিমান :—নগরে 'বেলুন-ছাত'।
সারা ত্থুনিয়ার বিদেশী সেনানী শহর ফেলেছে ছেয়ে,
সওদা করিয়া ফেরে পথে পথে শিস্ দিয়ে গান গেয়ে !
সকালে বিকেলে বেরুলেই দেখি সাদা কালো মেটে গোরা,
'চৌরঙ্গী'র নাম এতদিনে সফল করেছে ওরা।
নিউজিল্যাণ্ডে কারো দেশ ভাই, কারুবা অষ্ট্রেলিয়া,
কেউ ক্যানাডার তরুণ সেনানী ঘুরিছে অস্ত্র নিয়া।
সঙ্গে তরুণী ফিরিঙ্গী বালা মোটরে কীটনে ঘোরে,
কারুবা জুটেছে 'রিক্সা' মাত্র, কেউ হাঁটে হাত ধরে।
ঘোরে মার্কিন ঈগলমার্কা, ব্রিটিশ জঙ্গী 'টমি'
শিখ, রাজপুত, পাঠান, গুর্খা, 'চীনেম্যান' যেন 'মমী' !
নিউমার্কেটে যেতে ফুটপাথে কাঁধে কাঁধ যায় ঠেকে,
নির্ভাবনার নবীন মূর্তি অবাক্ হই যে দেখে !
এইত' প্রথম উঠেছে তপন জীবনে ও যৌবনে,
চলেছে হেলায় প্রাণ দিতে তবু কী নিঃশঙ্ক মনে !
গীতার বচন ঝাড়েনাকো এরা, কিন্তু, কাজের বেলা
মৃত্যুরে নিয়ে জীর্ণ বাসের মতই করিছে খেলা !
জননী জন্মভূমিরে এরাই শিখিয়াছে পূজিবারে,
যার মান লাগি প্রাণ দিতে এল সপ্তসিন্ধু পারে।
যেন বা 'টুরিষ্ট' বেড়াতে এসেছে—লেগে আছে মুখে হাসি,
সিনেমার হলে ভীড় ক'রে আসে, ট্রামে বসে পাশাপাশি।

লিখেছ লাহোরে জিনিসপত্র কেনো তুমি চড়া দরে,
জানোনা ত দাদা এখানে উঠেছে হাহাকার ঘরে ঘরে !
চাল ডাল ত্থু'ইই সতেরো আঠারো, মণ দরে মন দমে,
আটা ময়দাত' ছোঁবার জো নেই তিরিশ টাকার কমে ;
দশ আনায় কিনি গম-ভাঙা ভেবে জোয়ার ভুট্টা রোতো,
'বাটা'র দোকানগুলো যদি হায় আটার দোকান হ'তো !
কয়লার মণ সাড়ে চার টাকা, গয়লা আসেনা আর,
ধোপা নাপিতেরা অদৃশ্য প্রায়, কেরাসিন মেলা ভার,
সর্ষের তেল কিনতে গিয়েতো' দেখছি সর্ষে ফুল !
নারিকেল তেল চড়েছে যা তাতে গিন্নী ছাঁটুন চুল।
পান সুপারির পাঠ তুলে দিয়ে হরিতকী খাই ভাই
সিগারেট আর একটিন কিনে খাবার উপায় নাই।

হুইস্কী ব্র্যাণ্ডি অভাবে এখন 'ধেনো'ই হয়েছে সার,
'বর্মাচুরুট' 'হাভানা' 'ম্যানিলা' মেলেনা কোথাও আর।
ত্থু' টাকায় কিনে চায়ের পাউণ্ড ভাবি বসে নিশি দিবা—
মধুর অভাবে গুড় চলে জানি, চিনির অভাবে কিবা ?
রাত না পোয়াতে সার বেঁধে পথে 'কণ্ট্রোলে' কিছু কেনা—
দেখে যাও যদি বুঝবে কেন যে বাড়ছে মুদীর দেনা !
চিন্তামণিও চিনি নাহি পান যোগাতে যে খায় চিনি,
একটা তুচ্ছ তামার পয়সা ত্থুর্লভ যেন 'গিনী' !
'আনি' 'ত্থু' আনিরা' উধাও আজিকে ফাঁকি দিয়ে ট্যাকশালে,
সেই পুরাতন 'বিনিময়-প্রথা' হয়ত চলিবে কালে।
কিছু কেনা বেচা কঠিন এখন দোকানে বাজারে হাটে,
ট্রাম-কোম্পানী 'ক্যুপন' না দিলে ব্যবসা উঠিত লাটে !
কমে গেছে গাড়ী লাইনে লাইনে, বেড়েছে লোকের ভীড়
সন্ধ্যে সকালে গাড়ীতে যেন হে বাত্থুড়ে বাঁধিছে নীড় !
ট্রেণের টাইমও বেঠিক এখন, ঘড়ির ধারেনা ধার,
বাড়ী-ফেরা নিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছে ডেলির প্যাসেঞ্জার।
বেলা তিনটেয় থিয়েটার বসে, ত্থু'টোয় সিনেমা শুরু—
ইস্কুলে প্রায় শূন্য বেঞ্চি, চিন্তিত যত গুরু।
শশ্মানে এখন চুলি জ্বালা শুনি নিষেধ হয়েছে রাতে,
'বাসিমড়া' হয়ে পড়ে থাকা ভায়া, সয় কি হিঁত্থুর ধাতে ?
বেলা চারটেয় মরি যদি তবে ভোর চারটের আগে
কেউ মুখে হায় দেবেনা আগুন—এ এক ভাবনা জাগে !
ঘাটের খরচও কর্পোরেশন বাড়িয়েছে সম্প্রতি
দেড়া মাশুলের কমে নাকি আর হবেনা মরণে গতি।
ঠাকুর চাকর পলাতক ভায়া, ঠিকে ঝী ভরসা দিনে,
সোনা যদি হয় সস্তা কখনো দেব তাকে 'তাগা' কিনে।
দেড় টাকা সের মাছের বাজার, পাঁচসিকে হাঁকে খাসি,
নিরামিষ আজও জুটছে, হয়ত পরে রবো উপবাসী।
ন' টাকার কমে শাড়ী নেই আর, ধুতি চায় সাড়ে সাত,
গামছা নিয়েছে বারো আনা তাও মোটে সাড়ে তিন হাত !
দিগম্বরের দেরী নেই আর, আবার আদম-ঈভ্—
মায়েরা হবেন শ্যামা বিবসনা মেলিয়া শুষ্ক জিভ্ !
বিংশ-শতকী সভ্যতা আজ খসে পড়ে ধাপে ধাপে,
ইঁত্থুর বিড়াল খেতে হবে শেষে চীনাদের অভিশাপে।
কোথায় লড়াই—কে করে যুদ্ধ—কারা বাঁচে কারা মরে ?
উলু খাগড়ার প্রাণ যায় দাদা অন্ন বস্ত্র তরে !
ত্থুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যে ধেয়ে আসে ধীরে ধীরে,
যুদ্ধ-বিজয়ে শান্তি আবার দেখিব কি মোরা ফিরে ?
আশা করি আছ কুশলে সকলে, ওখানে ত' খুব শীত ;
এখানেও বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে কাঁপায় দেহের ভিৎ।
শীত বস্ত্রের অভাবে এবং পীতবর্ণেরও ভয়ে
কর্তা গিন্নী মিলে আছি যেন 'ক'-য়ে 'মূর্দ্ধণ্য-ষ'য়ে !
ব্রহ্ম-আসাম—বাংলার-সীমা নহেত হে বেশী দূর,
আজ তবে আসি—প্রীতি নাও এই বোমা-ভীত বন্ধুর।

ভারতে রেলবিস্তারের মূলনীতি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ইংরেজের সহিত ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইলে তাহার গুণ কীর্ত্তন করিতে লোকের অভাব হয় নাই। বিদেশী চাকচিক্য বহুদিন এই জাতীয় লোকদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং বিদেশীর প্রচার কার্য্যের ফলে এখনও এই দল একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নাই। যতদিন স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাত থাকিবে, ততদিন কোনও না কোনও দল এই রাজনৈতিক সম্পর্ক অটুট রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টিত থাকিবে।

কিন্তু অর্থনৈতিক দিকটা বিচার করিতে গেলে মোটামুটি ইংরেজ সম্বন্ধে গুণকীর্ত্তন করা খুব সহজ নহে। এই দিকটা ভারতের পক্ষে কোনও প্রকারেই কল্যাণকর হয় নাই; উপরন্তু মহা ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

ভারতের রেল বিস্তার ইহার একটী জাজ্বল্য প্রমাণ। একটু স্থির-ভাবে বিচার করিলে ইংরেজ রাজনীতির কূটতথ্যগুলি রেলবিস্তারের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠে। যখন ভারতে "শান্তি" স্থাপিত হইল, তখন হইতেই দেশের মধ্যে অভাবের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতে থাকে এবং বারে বারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া মহামারী ঘটায়। সে সময় দেশের মধ্যে জলপথে যাতায়াত সহজ এবং সস্তা ছিল। তাহা ছাড়া সেচ-কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য নূতন পয়ঃপ্রণালী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

দেশের মধ্যে সেচের উপযোগী নদীনালা বর্ত্তমান থাকায়, অথবা সার উইলিয়ম উইলকক্স প্রভৃতি মনীষীর মতে, মানুষ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়ায় দেশের মধ্যে শস্যের তথা খাদ্যের অভাব ছিল না। তৎকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একবাক্যে সকলেই দেশের মধ্যে সেচের উপযোগী পয়ঃপ্রণালীর প্রসার কার্য্যে উৎসাহ দিতে থাকেন, কিন্তু ইংরেজ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

দেশে যাহাতে "শান্তি" বিরাজ করিতে পারে, ভারতের সীমান্ত যাহাতে উপদ্রুত না হয় এবং হইলে তথায় দ্রুত সৈন্য চলাচল করিতে পারে, তাহার জন্যই রেল বিস্তারের প্রথম পরিকল্পনা ইংরেজ রাজনীতিক-গণের মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠে। যাত্রীর যাতায়াতের সুবিধা অথবা দেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক শিল্প বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, তখনকার মতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এই স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, রেল বিস্তার ক্ষেত্রে পুরাতন পয়ঃপ্রণালী বা কোনও স্থানের স্বাভাবিক জল নিকাশের পথগুলির প্রতি কোনও মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; ইচ্ছামত এবং কাজের সুবিধামত রেলপথ চলিয়া গিয়াছে; নদীর জলের স্বচ্ছন্দ গতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, পুল তৈয়ারী হইয়াছে। ফলে নদী মজিয়াছে, ভাল করিয়া জল নিকাশ না হওয়ায় বহু দেশের, বিশেষতঃ ভারতের নিম্নভূমি, সমতল ক্ষেত্রে এবং নদীবহুল বাঙ্গালার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরেজে না বলিলে ইংরেজ ভাল বুঝিতে পারে না। যাঁহারা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এরূপ বহু ইংরেজ পণ্ডিত রাজসরকারের এই অপরিণামদর্শিতার নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। ফল যাহাদের ভোগ করিবার কথা, তাহারা ফলভোগ করিবে, যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা মুদ্রা পাইয়াছেন, অন্য বিষয়ে "মা ফলেষু কদাচন।"

রেল কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার ইতিহাস রাজপুরুষদিগের কূটনীতিক চিন্তাধারার অন্য পরিচয় দেয়। ভারতে রেল বিস্তারকল্পে ইংরেজ বণিককে উৎসাহ দেওয়া হইল। গরজ বুঝিয়া তাহারা কারবার সুরু করিবার কল্পনা হইতেই মুনাফার দাবী করিয়া বসিল। কল্পতরু ভারত সরকার শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দিবার অঙ্গীকার করিলেন; দেশের মধ্যে বিদেশী টাকা আসিয়া পড়িতে লাগিল। সুদের বাঁধা হার জানা থাকিলে অর্থ ব্যয় করিবার সময় হিসাব থাকে না। উপরন্তু ব্যয় যত বৃদ্ধি করা যায়, লাভের পরিমাণ সেই অনুপাতে তত বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাপারে যে দারুণ আর্থিক ক্ষতি ভারতের তহবিল হইতে হইয়াছে, তাহার তুলনা পৃথিবীতে দুর্লভ। এই সকল কোম্পানী কেবল যে সুদ লইয়া ক্ষান্ত থাকিলেন, তাহা নহে; লাভ হইলে সুদের টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহার অর্দ্ধেক তাঁহারা পাইবেন, এই ব্যবস্থাও তখন স্বীকার করিয়া লইতে হইল।

সর্ব্বতোভাবে বিদেশী এই কোম্পানীগুলি ভারতের অর্থে পুষ্ট, ভারতের ক্ষেত্রে স্থাপিত হইলেও ভারতবাসীর প্রতি ইহাদের আচরণ অতিশয় অসম্মানকর ছিল। তদানীন্তন ভারতের বড়লাট সার জন লরেন্স (Sir John Lawrence) পর্য্যন্ত এই অবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং পার্লামেণ্টারী কমিটীর নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে এইদিকে বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। সাদা কালার বিভেদ সেদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় রেলে অক্ষুণ্ণ ছিল। যাক্, ইহা ভিন্ন কথা।

রেল কোম্পানীগুলি ইংলণ্ডে স্থাপিত হওয়ায় কেবল যে সমস্ত সুদ এবং সমস্ত লাভ ভারত হইতে উঠিয়া ইংলণ্ডে গেল তাহাই নহে, এই কোম্পানী-গুলি আত্মপ্রসার করিতে এবং রেল সংক্রান্ত মাল পত্র, কলকব্জা আনিতে সমস্ত মুদ্রা ইংলণ্ডে গিয়াছে। সমস্ত গ্যারাণ্টিড্ (guaranteed) কোম্পানী-গুলি কত কোটী টাকা সুদ হিসাবে এ পর্য্যন্ত পাইয়াছেন, তাহার হিসাব উদ্ধার করা কঠিন ব্যাপার, তবে অসম্ভব নহে। একটী সামান্য উদাহরণ দিলে কতকটা ব্যাপার পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল ভারত সরকারের নিজস্ব সম্পত্তি হইল, তখন এক চোটে বিদেশী কোম্পানী ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড দাবী করিল। ১৮৭৮-৭৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই টাকার উপর শত-করা পাঁচ টাকা সুদ চলিত, তখন হইতে তাহা শতকরা চার টাকা হয়, অর্থাৎ কর্ম্মচারীদের বেতন প্রভৃতি বাদ দিলেও কেবল বাৎসরিক সুদের পরিমাণ ৩৮ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া লভ্যাংশের এক পঞ্চমাংশ তাহারা পাইতে থাকে। ঐ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রয় করিয়া লইলেও ভারত সরকার রেল পরিচালনার সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ঐ কোম্পানীর হাতেই রাখিয়া দেন।

এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সুদের হার তিন বৎসরে এক কোটী টাকার অধিক। ইহারা ১৮৪৫ সালে গঠিত হইলেও ১৮৫৪ সালে রেলপথের কাজ আরম্ভ করে। অবশ্য প্রথম বৎসর হইতেই মূলধনের পরিমাণ ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড ছিল না, কিন্তু কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে তাহারা বহু টাকা আনিয়া ঢালিয়া দিল; লাভ লোকসানের কথা নাই, সুদ সুনিশ্চিৎ!

১৮৪৫ সালে গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেল কোম্পানীও গঠিত হয় এবং ই. আই. রেলের সহিত প্রায় একই সময়ে কার্য্য আরম্ভ করে। পরে অন্যান্য কোম্পানীও অল্পকালের মধ্যেই আবির্ভূত হয়।

রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী মাল অজস্র আসিতে থাকে। ১৮৫৩ সালে রেলপথ পাতা হইবে এই আশায় ১৮৫২ সাল হইতেই এতৎ-সংক্রান্ত মাল (Railway Materials and Stores) আমদানী আরম্ভ হয়। তখন উহা (১৮৫২-৫৩) মাত্র ২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ছিল। ১৮৫৮-৫৯ সালে তাহা ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা হয়। দশ বৎসরের মধ্যে ২ কোটী ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছে। রেল প্রসারের সঙ্গে আমদানীর অঙ্ক ধাপে ধাপে

গিয়াছে এবং ১৯২০-২১ সালে ১৪ কোটী ১৩ লক্ষ এবং পর বৎসর ১৯ কোটী টাকা হয়। যদি সব কয়েক বৎসরের আমদানী এক সঙ্গে যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

উপরে যে অঙ্ক দেওয়া গেল, তাহাই কিন্তু একমাত্র আমদানী নয়। ১৮৭২-৭৩ সাল হইতে সরকারী হিসাবে আমদানী হইতে থাকে। ১৮৭৯-৮০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রয় করিয়া লইলে ১৮৮১-৮২ সালে আমদানী হঠাৎ ১ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। পরে কিছু কিছু রেলপথ সরকারের হাতে আসিয়াছে বা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রেল পাতা হইয়াছে। সম্মিলিত ফলে ১৯০৫-০৬ সালে আমদানী ৫ কোটী ১২ লক্ষ টাকা হয়।

প্রথম হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বে-সরকারী কোম্পানীগুলি বাঁধা সুদের স্বাদ পাইয়া অর্থের দারুণ অপব্যয় করিয়াছে। ভারতের তদানীন্তন অর্থসচিব (খাঁটী বিলাতী) দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রতি মাইল রেলপথ পাতিতে (জমি প্রভৃতির দাম দিতে হয় নাই) আন্দাজ ৩০,০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। তখন জিনিষপত্রের দাম এবং মজুরির হার যেরূপ সস্তা ছিল তাহা স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে এইরূপ অপব্যয় জগতে দুর্লভ।

১৯২৭-২৮ সালে রেলের নামে জিনিষপত্র আমদানী রহিত হইলেও মালগাড়ী (wagons) ও যাত্রীবাহী গাড়ী (carriages) বলিয়া মাল আসিতে থাকে। প্রত্যেক হিসাবে কোনও কোনও বৎসর এক কোটীর টাকার উপর আমদানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া রেল ইঞ্জিন প্রায় প্রতি বৎসর এক কোটী টাকার আসিয়াছে। লাইনের সরঞ্জাম প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য আসিয়াছে ; ইহার স্বতন্ত্র হিসাব পাওয়া কঠিন।

এই আমদানী নীতি যখন স্থিতি লাভ করিল তখনও রেলের পরিচালন, আয়ব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে সরকারের প্রখর দৃষ্টি থাকিত। ১৯২৪-২৫ সালে রেলের আয় ভারতীয় রাজস্ব হইতে পৃথক করিয়া রাখা সুরু হইল। বৎসরে যে লাভ হইত তাহার কতকাংশ সরকারী তহবিলে জমা পড়িবার ব্যবস্থা হয়।

রেল যাহাতে দেশীয় লোক দ্বারা পরিচালিত আইন সভা বা পরিষদ (Legislative Council or Assembly) কর্তৃক প্রভাবান্বিত হইতে না পারে, তাহার জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত সংস্কার আইনে ইহাকে একেবারে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া হয়। ইহা প্রকারান্তরে একটা সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্ত্বা লাভ করে। ইহা যে বোর্ড (Board) দ্বারা পরিচালিত হইবে তাহার সভাপতি নির্ব্বাচনের ভার খোদ বড়লাট বাহাদুরের হাতে। লাট বাহাদুরের পরিষদের যিনি যানবাহন পথঘাটের মন্ত্রী (Communications Minister) হইবেন, তিনি বোধ হয় রেলগাড়ী চড়িবার সময় সাদা গাড়ী (Saloon) পাইবার অধিকারী মাত্র। ইহা হইতে ইংরেজের মতিগতির আর একদিক স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য আরও অনেক কথা আসিয়া পড়ে। যতদিন সম্ভব হইয়াছে, ভারতে রেল চালাইবার জন্য বিদেশী কয়লা আমদানী করা হইয়াছে এবং এক সনে তাহা পাঁচ কোটী টাকা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। দেশীয় কয়লা যে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযোগী তাহা ক্রমে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় রেলের মাশুলের মারপ্যাঁচ (rates policy) খুব তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা না করিলে হেঁয়ালী বলিয়া মনে হইবে। ইহাতে সমুদ্র উপকূলের বন্দর হইতে দেশের মধ্যে এবং তথা হইতে বন্দরের দিকে মাল চলাচলের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাঁধা হইয়াছে। যতদিন ভারতবাসীর কথার বা দাবীর কোনও মূল্য ছিল না, ততদিন ইহা পূর্ণোদ্যমে কাজ করিয়াছে। ফলে দেশের মধ্যে বিদেশী মাল সস্তায় ও সহজে আসিয়াছে এবং দেশীয় কাঁচা মাল বাহিরে যাইবার সুযোগ হইয়াছে। ভারতের Industrial Commission চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন যে বন্দর পর্য্যন্ত যে কয় শত মাইল কাঁচা মাল যাইতে যত মাশুল পড়ে, তদপেক্ষা বহু নিকটে অবস্থিত কোনও শিল্পকেন্দ্রে সেই মাল যাইতে অনেক সময় তদপেক্ষা বেশী পড়িয়া যায়। দেশের মধ্যে শিল্পের উন্নতির জন্য রেলের যে সহায়তা করা প্রয়োজন, তাহার কিছুই হয় নাই। (সম্প্রতি এই নীতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে)। আন্তঃপ্রাদেশিক মাল চলাচলের জন্য যে সকল দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে।

ভারতের রেলের উৎপত্তি ও প্রসার এবং ইহা পরিচালনের গূঢ়তত্ত্ব একেবারে "অমৃত-সমান"। সকল স্বাধীন দেশে যে রেল অপরিমিত কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তাহাই এদেশের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎ নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখক যখন ইহার বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিবে, তখনই ইহা রাজপুরুষদের মনের আলেখ্য বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে।

বসন্তে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

হিসেবি বধির লাভ ও ক্ষতির
খতিয়ান আজ যাও ভুলে।
ভাঁড়ার দুয়ারে তালা চাবি দাও
হৃদয় দুয়ার দাও খুলে।
দখিন পবন জানালার চোকে
চশমা ছাড়িয়া হের খালি চোখে,
কি ধনের বাণী করে কানাকানি
গোলাপে এবং বুলবুলে।
স্বর্ণ শুধুই খনিতে জুটেনা
হের গাছে গাছে রয় ফুটে।
ঐ দেখ দেখ উড়ন্ত চোর
কুসুমের ধন :লয় লুটে।

সকাল হইতে ডাকিতেছে পাখী,
কি বলিছে তারা শুনিয়াছ তাকি ?
সোনা ফেলে তুমি শূন্য আঁচলে
গেরো দিলে কোন্ ধন খুলে ?
ফুলের গন্ধ কতবার তোমা'
ঠারে ঠোরে ঐ যায় ক'য়ে,
ভিতরে তুচ্ছে করিছ হিসাব
বাহিরে যে বহু যায় ব'য়ে।
কচি কিশলয় মাথা নেড়ে কয়
কি কথা, শুনেছ তাকি মহাশয় ?
মাথা ভরা যার রাশি রাশি চুল
খোঁপা বাঁধে সে কি পরচুলে ?

চল্‌তি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

আফ্রিকার রণাঙ্গন

আফ্রিকার যুদ্ধের স্রোত আজও পুরাতন খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্ব-সংগ্রামের মধ্যে পরিবর্তন আনিবার মত কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা এখনও সেখানে ঘটে নাই। বৃটিশ বাহিনী গত মাসেও পূর্বের স্থায় রোমেলের বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। 'ভারতবর্ষ'এর গত মাঘ সংখ্যাতেই আমরা বলিয়াছিলাম যে, টিউনিসিয়ায় জার্মান বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়াই জেনারেল রোমেলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, আফ্রিকার রয়টারের বিশেষ সংবাদাতা কর্তৃক রোমেল বাহিনীর টিউনিসিয়ায় প্রবেশের সংবাদ আমাদিগকে পরিবেশন করা হইয়াছে। এই পশ্চাদ্ধাবনে বৃটিশ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য বিজয় ত্রিপলী অধিকার। হোমস্ ও তারহুনা মিত্রবাহিনী কর্তৃক পূর্বেই অধিকৃত হয়। হোমস্ হইতে সমুদ্রোপকূল দিয়া একটি পথ গিয়াছে ত্রিপলী অভিমুখে। হোম্‌স্-এর ৫০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে তারহুনা। তারহুনা হইয়া অপর একটি পথ আফ্রিকার অভ্যন্তর দিয়া ত্রিপলীতে মিলিয়াছে। হোমস্ ও তারহুনা অধিকারান্তে বৃটিশ বাহিনী এই দুই পথে ত্রিপলী অভিমুখে অভিযান করে। বৃটিশ বাহিনীর হোমস্ অধিকারের সময়েই ত্রিপলী হইতে জার্মান বাহিনীর জাহাজ যোগে অপসৃত হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। জেনারেল রোমেল অগ্রগামী বৃটিশ বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত না হইয়া ত্রিপলী পরিত্যাগ করিয়া টিউনিসিয়ায় প্রবেশ করিয়াছেন। জেনারেল রোমেলের এই পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকায় ইটালীর শেষ উপনিবেশটুকুও হস্তচ্যুত হইল।

জেনারেল রোমেলের এই পশ্চাদপসরণ বৃটিশ বাহিনীর বিজয় ঘোষণা করিলেও কোন্ মূল্যে এই বিজয় লাভ হইয়াছে তাহা ভাবিবার কথা। প্রধান লক্ষ্যের বিষয় জেনারেল রোমেল বৃটিশ বাহিনীকে কোন প্রতিরোধ-মূলক বাধা কোথাও প্রদান করেন নাই। জেনারেল রোমেলের সমর-সম্ভার মিত্রশক্তির বাহিনীর রণোপকরণের তুলনায় যথেষ্ট কম ছিল। নূতন সৈন্স ও সমরোপকরণ তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছে নাই। জেনারেল রোমেল পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী। বৃটিশবাহিনীর তাড়ায় রোমেল বাহিনী বিশৃঙ্খলভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইতস্তত: পলায়ন করিয়াছে এমন কোন সংবাদ আমরা পাই নাই। পশ্চাদপসরণের জন্ম যেটুকু বাধা প্রদান আবশ্যক রোমেল বাহিনীর পশ্চাদরক্ষী সৈন্সদল কর্তৃক ততটুকু প্রতিরোধ প্রদত্ত হইয়াছে। এল্ আলামিন্-এর রণক্ষেত্রে জেনারেল রোমেলের প্রচুর সমর-সম্ভার নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পর হইতে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক কোন রণাঙ্গনেই রোমেলের প্রভূত সমরোপকরণ হস্তগত করার সংবাদও আমরা পাই নাই। পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চাদপসরণে জেনারেল রোমেল যে সামরিক দিক হইতে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ।

ইহার পরে টিউনিস ও বিজার্টার প্রশ্ন। জেনারেল রোমেল টিউ-নিসিয়ার ৬০ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রকাশ টিউনিসিয়ায় ৭০,০০০ জার্মান বাহিনী জেনারেল আরনিম্‌এর অধীনে আছে। রোমেলের বাহিনী টিউনিসিয়ায় প্রবেশ করায় যে এই সৈন্স সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল ইহা সুপ্রকাশ। মার্কিন বাহিনী টিউনিসিয়ায় এ পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য সংগ্রামে লিপ্ত হয় নাই। সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকার আবহাওয়া বিশেষ অনুকূল নহে, বর্ষা নামিয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত এই বর্ষা থাকে। কিন্তু তাহার পর জমি শুকাইলে কোন্ পক্ষ কি ভাবে প্রথম আক্রমণ সুরু করিবে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। টিউনিসিয়ায় জার্মান সৈন্স ও সমর সম্ভার যথেষ্ট আনীত হইয়াছে। ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষীয় নৌশক্তি যতই তৎপর হউক, প্রধান ভূখণ্ডের সহিত অক্ষশক্তির সরবরাহসূত্র যে যথেষ্ট স্বল্পদূরে ইহা অনস্বীকার্য। সিসিলি প্যাণ্টালেরিয়া প্রভৃতি দ্বীপে জার্মানীর যথেষ্ট বিমান এবং বিমান ঘাঁটি আছে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তিকে অধিকৃত অঞ্চলে নব-নির্মিত বিমান অবতরণ ক্ষেত্রের উপর সমধিক নির্ভর করিতে হইবে। তদুপরি মিত্রপক্ষের দীর্ঘ সরবরাহ সূত্র রক্ষার প্রশ্নও আছে। জেনারেল রোমেল টিউনিসিয়ায় মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীকে বিচ্ছিন্নভাবে বাধাপ্রদানের সঙ্কল্প করিয়া থাকিতে পারেন। ম্যাজিনো লাইনের অনুকরণে যে ম্যারেথ লাইন ১৯৪০ সালে টিউনিসিয়ার নির্মিত হইয়াছে তাহার পূর্বাংশে জেনারেল মণ্টগোমারীর সৈন্সদিগকে বাধা প্রদান জেনারেল রোমেলের পরিকল্পনার বিষয় হইতে পারে। ফন্ আরনিম প্রতিরোধ প্রদান করিবেন মার্কিন বাহিনীকে। ইহার সহিত বিমানের প্রশ্নও আছে। একদিকে যেমন মিত্রশক্তির বাহিনীর উপর বিমান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব, অপর দিকে তেমনই উত্তর আফ্রিকার বিস্তীর্ণ উপকূলে বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাতে গ্রীস্. ক্রীট প্রভৃতি স্থান হইতে জাহাজযোগে এবং সিসিলি, প্যাণ্টালেরিয়া প্রভৃতির বিমান ঘাঁটি হইতে বিমান সাহায্যে সৈন্স অবতরণ বিপজ্জনক হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। অবশ্য জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সমন্বয় অতি সহজ নহে। জার্মানী কত বিমান, সৈন্স ও রণোপকরণ আফ্রিকার রণক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে পারিবে সে প্রশ্ন আছে। ম্যারেথ লাইনও যে অভেদ্য তাহা নহে। বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাতে যদি উপকূলে অক্ষশক্তির সৈন্স অবতরণ করে, তাহা হইলে তাহাদের সরবরাহ ও সংযোগ রক্ষাও বিশেষ সহজ হইবে না। কাজেই জেনারেল রোমেল যদি এই ধরণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা প্রয়োগ করা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে কিনা সে বিষয়ে তাঁহাকে একাধিকবার চিন্তা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, টিউনিসিয়া রক্ষায় অক্ষশক্তি কতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রকৃত সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহা সঠিক জানা সম্ভব নয়। উভয়পক্ষে সংঘর্ষ আরম্ভের পর তাহা পরিস্ফুট হইবে।

চার্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকার

জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের সাক্ষাৎকার। এবারের সাক্ষাৎ অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষে জাহাজের উপর নহে, খাস ওয়াসিংটনেও নহে, সাক্ষাৎ হইয়াছে একেবারে পূর্ব গোলার্দ্ধে, কাসাবলাঙ্কায়। প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধান মন্ত্রী দুজনেই মধ্যপথে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। মঃ স্ট্যালিনকেও আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কিন্তু লেনিনগ্রাড্ হইতে স্ট্যালিনগ্রাড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে নাৎসী উচ্ছেদে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকায় স্ট্যালিনের পক্ষে আসা সম্ভব হয় নাই। মার্শাল চিয়াংকাইশেকও সামরিক কার্যে ব্যস্ত। তবে আলাপ আলোচনার ও সিদ্ধান্তের সকল সংবাদই স্ট্যালিনের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

দীর্ঘ ১০ দিন ধরিয়া এই আলোচনা চলিয়াছে, কিন্তু আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সংবাদ বিশেষভাবে গোপন রাখা হইয়াছিল। আলোচনার সময় জেনারেল দ্য-গল এবং জেনারেল জিরো উপস্থিত ছিলেন।

মিত্রপক্ষের আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা সম্বন্ধে এই আলোচনা চলে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যথেষ্ট আলোচনা চলিয়াছে। মিত্রশক্তির সমর্থনকারী ও সহযোগী বহু রাষ্ট্রের জনগণ অবিলম্বে মিত্রশক্তি কর্তৃক দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি দেখিতে বহুবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

সেদিনও স্ট্যালিনগ্রাডে নাৎসী সৈন্যের অবরোধকারী সোভিয়েট বাহিনীর জেনারেল ম্যালিনভ্‌ ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। জেনারেল স্পষ্টই জানাইয়াছেন—পশ্চিম ইয়োরোপে মিত্রশক্তির সংগ্রামারম্ভের জন্য আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছি। পশ্চিম ইয়োরোপে জার্মান বাহিনীর একাংশের যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া আমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলিয়াছিলেন—আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করা আবশ্যক। বৃটেনের সমর পরিচালকমণ্ডলী দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের প্রশ্নকে বার বার যেভাবে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন তাহাতে অনেকে মনে করিতেছেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে রুশিয়া বর্তমানে অত্যন্ত অ-গ্রহান্বিত হওয়ায় প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রীর এই সাক্ষাৎকার এবং অবিলম্বে কিছু করা হইবে এই ভাব দেখাইয়া আরও কিছুদিন কাল হরণের চেষ্টা। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির ব্যবস্থা সময়সাপেক্ষ নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাহার জন্য এই সাক্ষাৎকে গুরুত্বহীন করিবার কোন কারণ নাই। পাঠকগণের বোধহয় স্মরণ আছে, গত ১৯২১ সালের শেষভাগে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশাল নৌবহর নির্মাণের ব্যবস্থাকে যখন পূর্ণোদ্যমে পরিচালনার বন্দোবস্ত করেন সেই সময়ে রুজভেল্ট জানাইয়াছিলেন যে, ১৯৪৫ সালের পূর্বে এই পরিকল্পনা বাস্তবক্ষেত্রে সুসম্পন্ন না হইলেও ১৯৪৩ সালের প্রারম্ভেই মিত্রশক্তি যথেষ্ট যুদ্ধ জাহাজ লাভ করিবে এবং ১৯৪৩ সালেই মিত্রশক্তির সংগ্রাম আক্রমণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করিবে। কয়েকদিন পূর্বেও মিঃ কার্টিন দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ জাহাজের সমাবেশ ও তৎপরতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মিত্রশক্তি বহুবার অক্ষশক্তিকে উপযুক্ত সময়ে আঘাতের সুযোগ হারাইয়াছে। যতদিন যাইতে থাকিবে জাপান আপনাকে ততই সুসমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করিবে। বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই কথা। আফ্রিকা এবং রুশিয়া উভয় রণাঙ্গনেই জার্মানী বর্তমানে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, জাপানও আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া চলিয়াছে। অক্ষশক্তিকে হানিবার ইহাই উৎকৃষ্ট অবসর।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ১৯৪৩ সালেই আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার কথা বলিয়াছেন। ফ্রান্স, ইটালী, বলকান দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম ইয়োরোপ অথবা নরওয়ে কোথায় যে এই দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সৃষ্টি করা হইবে তাহা হয়তো এখনও স্থির হয় নাই, অথবা হইলেও সামরিক কারণে এখন সেই স্থানের নাম অজ্ঞাত থাকিবে; তবে ১৯৪৩ সালেই মিত্রশক্তির দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করার কথা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানাইয়াছেন। জার্মান বাহিনীর 'বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ' দাবী করা হইয়াছে। জার্মানীর জনসাধারণের সহিত বিবাদ নয়, বিবাদ নাৎসীবাদের সঙ্গে। হিটলারবাদকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। দ্য-গল ও জিরোর মতৈক্যের কথাও জানান হইয়াছে। কিন্তু নাৎসীবাদের ধ্বংস আলোচনাতেই পরিসমাপ্ত করিলে চলিবে না। যে 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটেজি' পরিকল্পিত হইয়াছে, কবে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মিত্রশক্তি কর্তৃক কার্যারম্ভ হইবে, নাৎসীবাদের উচ্ছেদকামী জনসাধারণ সাগ্রহে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

রুশ রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর উপর লাল ফৌজের আক্রমণের স্রোত সমানভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। সমগ্র রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী ২০০ হইতে ২৫০ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তর ককেশাসে মজদক নলচিক্‌ এবং প্রখ্‌লাদনায়া রুশ বাহিনী পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সামরিক দিক হইতে মজদক্‌-এর গুরুত্ব যথেষ্ট। মজদক অধিকারের অর্থ নাৎসীবাহিনী কর্তৃক গ্রজনী অধিকার করিয়া বাকুর তৈলখনির দিকে অভিযান পরিচালনার উদ্যমের মূলে কুঠার হানা। এই রুশ বাহিনী মিনারলেনিভোদি অধিকার করিয়া কালমুক অঞ্চলে এলিস্তাভিমুখে অগ্রসরমান সোভিয়েট সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহাদের লক্ষ্য রষ্টোভ। লাল-ফৌজের অপর একটি কলম জিমোভনিকি দখল করিয়া রষ্টোভ হইতে ৮০ মাইল দূরে মানিচ্‌ নদীর তীরে উপনীত হইয়াছে।

স্ট্যালিনগ্রাড অঞ্চলে লাল-ফৌজের অগ্রগতি চালিয়াছে অব্যাহত ভাবে। দুই লক্ষ জার্মান বাহিনী এই অঞ্চলে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। গত ৯ই জানুয়ারী সোভিয়েটের পক্ষ হইতে এই বিশাল ২২ ডিভিসন সৈন্যকে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণের জন্য চরমপত্র প্রদান করা হয়। আত্মসমর্পণ করার পর তাহাদের নিরাপত্তার ও অবিলম্বে খাদ্য এবং ঔষধাদি প্রদানের ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু জার্মান সৈন্য আত্মসমর্পণে রাজী হয় নাই। উক্ত অঞ্চলের সৈন্যাধ্যক্ষদের বিমান সাহায্যে অন্য স্থানে আনয়ন করা হয়। আত্মরক্ষার জন্য সৈন্য পরিচালনার ভার প্রদান করা হয় ক্যাপ্টেন এবং লেফ্‌টনাণ্টদের উপর। অবিলম্বে তাহাদের জন্য নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ আনীত হইবে বলিয়া হিটলার পরিবেষ্টিত সৈন্যদিগকে যুদ্ধ চালাইতে উৎসাহিত করেন। বলা বাহুল্য সে সাহায্য আজও আসে নাই। লাল-ফৌজ কর্তৃক প্রতিদিন বহু সৈন্য নিহত ও বন্দী হইতেছে। ১০ই জানুয়ারী হইতে ১৬ই জানুয়ারী পর্যন্ত এক সপ্তাহে ২৫,০০০ সৈন্য নিহত ও প্রায় ৭ হাজার বন্দী হইয়াছে। বর্তমানে এই দুই লাল সৈন্যের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ৭০,০০০-এ!

মধ্য ডনে লাল-ফৌজ কর্তৃক মিলেরোভো অধিকৃত হইয়াছে। গত ২৫-এ জানুয়ারী ভরোনেশ সম্পূর্ণ দখল করা হইয়াছে। রুশ বাহিনী বর্তমানে কুরস্ক অভিমুখে অগ্রসর।

ভেলিকিলুকি পুনরধিকারের জন্য জার্মান বাহিনী যে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রভূত ক্ষতি স্বীকারান্তে নাৎসী বাহিনী পশ্চাদবর্তী ঘাঁটিতে ফিরিয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্য ল্যাটভিয়ার সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট। যদি রুশ বাহিনী সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইলে উক্ত অঞ্চলে যুদ্ধরত ৰান্‌ কেচ্‌লারের সৈন্যদের পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। একদিকে অগ্রসরমান লেনিনগ্রাড রক্ষী সৈন্যদল, অপরদিকে ভেলিকিলুকি হইতে ল্যাটভিয়া সীমান্ত ঘুরিয়া আগত লাল-ফৌজ উভয় দিক হইতে এই শাঁড়াশীর চাপে বান্‌ কেচলারের সৈন্যদল স্ট্যালিনগ্রাডে অবরুদ্ধ নাৎসী বাহিনীর ভাগ্যের অংশই গ্রহণ করিবে।

সোভিয়েট সৈন্যের অপর উল্লেখযোগ্য সাফল্য লেনিনগ্রাড-এর অবরোধ মুক্তি। বাহির ও অভ্যন্তরের চাপে সুসেলবুর্গ অধিকৃত হয়। রুশ বাহিনীর এই সাফল্যে অবরোধে নিযুক্ত নাৎসী সৈন্যের উপর প্রবল চাপ পড়ে, জার্মান অবরোধ-বেষ্টনী শিথিল হয় এবং অবরোধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। দীর্ঘ ১৬ মাস পরে মস্কো-লেনিনগ্রাড রেলপথে খাদ্য পূর্ণ মালগাড়ী আবার লেনিনগ্রাড-এ যাতায়াত আরম্ভ করে।

রুশিয়ার প্রত্যেক রণাঙ্গনেই রুশ সৈন্য যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছে। জার্মান বাহিনীর আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অনেকের মতে, অক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করে ঋতু ভেদে। গত বসন্তে ও গ্রীষ্মে জার্মানী যে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল শীতাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিবর্তিত হয় আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে। শীতাবসানে গ্রীষ্ম ও বসন্তে জার্মানী আবার প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। বর্তমানে শীত আসায় তাহারা পুনরায় আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালাইয়া বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং বসন্তান্তে পুনরায় সুরু হইবে জার্মানীর দুর্দ্ধর্ষ অভিযান। কিন্তু এই ধরণের অভিমত প্রকাশের পূর্বে যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। জার্মান কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া লাল-ফৌজ পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর সেই পশ্চাদপসরণের সঙ্গে

নাৎসী বাহিনীর পশ্চাদপসরণের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। রুশিয়ার সামরিক কৌশল অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায়, বিশেষ রণনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লাল-ফৌজ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। সমগ্র অধিকৃত-ইয়োরোপের শক্তি লইয়া জার্মানী যখন ১৯৪১ সালে রুশিয়াকে আক্রমণ করে তখন অবিলম্বে আক্রমণে প্রস্তুত সৈন্য সংখ্যা ও সমরোপকরণে রুশিয়া জার্মানী

বিমান দুর্গের দরজায় বোমা বোঝাই করা

অপেক্ষা সংখ্যাল্প ছিল। ফলে শত্রুকে সরবরাহ কেন্দ্র হইতে বহু দূরে আপন দেশের অভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে তাহার সৈন্য ও সংগ্রাম পরিচালনার শক্তি ক্ষয় করাই ছিল রুশিয়ার উদ্দেশ্য। তাই মস্কো লেনিনগ্রাড প্রভৃতি রুশিয়ার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের নিকট পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করিয়া লালফৌজ নাৎসী বাহিনীকে প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণে হঠাইয়া দিয়াছে। নাৎসী অগ্রগামী সেনাদল ও ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সোভিয়েট সৈন্য কি ভাবে ঘিরিয়া উৎসাহিত করিত তাহা ভারতবর্ষ-এ অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। গত শীতের সময় রুশিয়ার শক্তি আরও বর্দ্ধিত এবং সংহত হয়। হিটলার তাহা উপলব্ধি করিয়াই বসন্তাগমে আর ১৫০০ মাইল রণাঙ্গনে পুনরাক্রমণের মূর্খতা প্রকাশ করেন নাই। আপনার সকল শক্তি সংহত করিয়া ককেশাস অঞ্চলে আঘাত হানেন। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনী তাহাদের প্রারম্ভেই প্রতিরোধ করিবার পন্থা গ্রহণ না করিয়া নাৎসী বাহিনীর উৎসাদনের পরিকল্পনাই তাহারা অবলম্বন করে। যুদ্ধের বর্তমান অবস্থাতেই ইহা প্রকাশ। ভরোনেশ, স্ট্যালিনগ্রাড, নভোরস্কি এবং প্রথলাকদানায়া—এই চারিটি সহরকে সরল রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিলে যে ক্ষেত্র সৃষ্ট হয় ইহারই অভ্যন্তরে ককেশাশের তৈলখনির লোভে অভিযান করিয়া হিটলার বাহিনীকে উৎসাদনের পরিকল্পনা জেনারেল জুকোভ কর্তৃক গৃহীত হয়। ডন-ভলগা এলাকায় ২২ ডিভিসন সৈন্য, সংখ্যায় নূন্যাধিক ২ লক্ষ, রষ্টোভ এবং নভোরসিস্ক-এর মধ্যে আড়াই লক্ষের উপর এবং ডনেজ-ডন এলাকায় আরও দেড় লক্ষ এই ফাঁদের মধ্যে পড়িয়াছে। এই বিশাল বাহিনীর একাংশ এই ঐতিহাসিক বেষ্টনী ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে সমর্থ হইবে সত্য, কিন্তু যে অসংখ্য সৈন্য নিহত ও বন্দী হইবে, সংখ্যায় তাহারা নগণ্য তো নয়ই, বর্তমান যান্ত্রিক যুদ্ধের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব। প্রায় ছয় মাস যাবৎ মার্শাল টিমোশেঙ্কো স্ট্যালিনগ্রাড রণাঙ্গনে নাই, এই বিশাল আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা, সৈন্যদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান এবং উন্নত ধরণের সমরসম্ভার নির্মাণের নির্দেশাদি ব্যাপারে তিনি মঃ স্ট্যালিনের সহিত পরিকল্পনাদিতে ব্যস্ত আছেন এবং স্ট্যালিনগ্রাড রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী লইয়া রুশিয়ার এই নূতন সমরনীতিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে নিযুক্ত আছেন জেনারেল জুকোভ। মিত্রশক্তির নিকট হইতে রুশিয়া সমরসম্ভার লাভ করিয়াছে, এই বিশাল বাহিনীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে অবিলম্বে যুদ্ধে যোগদানের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। উন্নত ধরণের ও সংখ্যাধিক সমরোপকরণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাহিনী এবং যান্ত্রিক যুদ্ধের উপযোগী রণনীতি অবলম্বন করার ফলেই রুশ বাহিনীর এই আক্রমণাত্মক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, দুর্দ্ধর্ষ নাৎসী বাহিনী তাই পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সেনাপতি শীত, অথবা রুশ সৈন্যের রণাঙ্গন সম্বন্ধে উন্নততর ভৌগলিক জ্ঞানই যে রুশিয়ার এই বিজয়ের মূল—আজ আর তাই ইহা যথেষ্ট কৈফিয়ৎ নহে। বর্তমান সমষ্টি-যুদ্ধের প্রতিরোধ করিতে হইলে সর্বস্ব নিয়োগ করা প্রয়োজন, রুশিয়া সে বিষয়ে কার্পণ্য করে নাই। যান্ত্রিক যুদ্ধের প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণকে বাধা প্রদান করিয়া তাহাকে একবার নির্বেগ করিতে পারিলে গতির যুদ্ধ (Dynamic war) যে স্থিতি যুদ্ধে (Static war) রূপান্তরিত হয়, যান্ত্রিক যুদ্ধের এই দুর্বলতাও রুশ সমরনায়কগণের নিকট আত্মগোপন করিতে পারে নাই। তাই দেখি দীর্ঘ ১৬ মাস অবরোধের পরেও লেনিনগ্রাড অবরোধ ভাঙিতে সক্ষম হয়। উন্নত সমরসম্ভার ও রণকৌশল অদমনীয় নৈতিক শক্তি, সৈন্য বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আদর্শ রক্ষার দৃঢ়পণ—ইহারই জন্য রুশিয়ার অভিযান আজ সাফল্যের পথে। রুশিয়ার শীত অথবা নাৎসী বাহিনীর রণক্ষেত্র সম্বন্ধে ভৌগলিকজ্ঞানের অভাবই যে তাহার জয়ের পক্ষে অন্তরায় এ যুক্তি আজ তাই অচল।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ

পূর্ব ভারতের সুদৃঢ় ঘাঁটি কলিকাতায় গত ডিসেম্বর মাসে যে বোমা বর্ষিত হইয়াছে, সংবাদপত্রের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

জাপান কর্তৃক বাংলায় বিমান হানার প্রয়োজন ঘটিল কেন এবং সেই আক্রমণের স্বভাব কি, সেই বিষয়ে 'ভারতবর্ষ'-এর গত মাঘ সংখ্যাতেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতার সামরিক গুরুত্ব কতখানি সে আলোচনাও উক্ত সংখ্যায় করা হইয়াছে। 'ভারতবর্ষ'-এর একাধিক সংখ্যায় আমরা বলিয়াছি যে, স্থিতিশীল যুদ্ধের যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান যান্ত্রিক মহাযুদ্ধ গতির যুদ্ধ। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে দুই যুযুধান রাষ্ট্রের বেতনভুক সৈন্যদলের মধ্যেই আর তাহা নিবদ্ধ নয়। বর্তমানে যুযুধান রাষ্ট্রের সমগ্র ভূখণ্ডই যুদ্ধক্ষেত্র, তথাকার প্রতিটি নরনারী আজ সৈনিক। প্রকৃত রণক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক চালাইয়া বা বিমান বিধ্বংসী কামান হইতে গোলা বর্ষণ করিয়া যে সৈনিক যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে সেও যেমন যোদ্ধা, রণক্ষেত্র হইতে পাঁচশত মাইল দূরে যে শ্রমিক কারখানায় সমরসম্ভার উৎপাদনে নিযুক্ত, বিরাট বাহিনীর খাদ্য উৎপাদনার্থ যে কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণে রত, যে বৈজ্ঞানিক আপন বীক্ষণাগারে সাধনায় সমাহিত, এবং যে নাগরিক নগর হইতে প্রকৃত রণক্ষেত্রে সমরোপকরণ ও রসদ প্রেরণে ব্যাপৃত, তাহারাও প্রত্যেকে আজ ঠিক তেমনই যোদ্ধা। উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়া আজিকার দিনে যান্ত্রিক যুদ্ধজয়ের কথা কোন রাষ্ট্রই ভাবিতে পারে না ; আর সেই জন্যই যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে আক্রান্ত দেশের নাগরিক জীবনের স্বাভাবিকতার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন আক্রমণকারীর নিকট অত্যাবশ্যক, প্রয়োজন রণক্ষেত্রের সৈনিক এবং নগরের যোদ্ধা, উভয়ের নৈতিক শক্তির মূলে আঘাত হানা। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই চীন ও ব্রহ্মদেশের একাধিক নগরে জাপান বৃদ্ধ, শিশু, নরনারী নির্বিশেষে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে ইতস্ততঃ বোমা বর্ষণের মধ্যেও জাপানের সেই পৈশাচিক মনোভাব ক্রিয়া করিয়াছে।

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ যে অপ্রত্যাশিত ছিল না ইহা স্পষ্ট ; সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে। আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু অনেকের মনে এমন ধারণাও ছিল যে, জাপান অচিরে ভারতে বোমাবর্ষণ করিবে না। এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রদত্ত যুক্তি এই যে, বর্তমানে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক অবস্থা জাপ আক্রমণের প্রতিকূলে। এই অভিমতের মধ্যে যুক্তি ও সত্য কতখানি তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক।

তাহার পর জানুয়ারী মাসেও কলিকাতা অঞ্চলে বিমান আক্রমণ প্রচেষ্টা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারই জাপ বোমারু বিমান মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনীর তাড়া খাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হইয়াছে। কয়েকখানি জাপ বিমানের নিশ্চিত ধ্বংসের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। বাঙলার উপর প্রথম জাপ বোমারু ধ্বংসের গৌরবলাভ করিয়াছেন উইং কমাণ্ডার ও ফ্লাইং সার্জেণ্ট মিঃ প্রিং ; চার মিনিটে তিনখানি বিমান ভূপাতিত করাও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। বিমান বাহিনীর ফ্লাইং অফিসার মিঃ চার্লস্ ক্রোম্বি তিনখানি জাপ বোমারুকে ধ্বংস করিয়াছেন। মিত্রপক্ষ কর্তৃক পূর্ব-ভারতে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে যথেষ্ট সুদৃঢ় করা হইয়াছে মিত্রপক্ষের উপরোক্ত সাফল্যই তাহার পরিচায়ক।

বাঙলার উপর জাপ বিমান কর্তৃক নৈশ আক্রমণের প্রকৃতি কি? যে কয়েকবার কলিকাতা অঞ্চলে বিমান হানা হইয়াছে, প্রতিবারই তাহা ঘটিয়াছে রাত্রে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ—জাপ বোমারু বিমান প্রতিবারই আসিয়াছে ক্ষুদ্র দলে, সাধারণতঃ তিনটি অথবা চারটি বিমানের এক একটি ঝাঁক বাঁধিয়া। বহু উচ্চে বিমান বিধ্বংসী কামানের সীমানার বাহির দিয়া তাহারা লক্ষ্য বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়াছে। আর একটি লক্ষ্যের বিষয়—জাপ বিমান সাধারণতঃ আসিয়াছে জঙ্গী বিমানের সাহায্য না লইয়াই!

জাপ বিমান আক্রমণের উপরোক্ত প্রকৃতি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মিত্রপক্ষ পূর্ব ভারতে যে যথেষ্ট সমরায়োজন করিয়াছেন জাপানের নিকট তাহা অপরিজ্ঞাত নয় এবং পূর্বভারতের প্রধানতম ঘাঁটি কলিকাতা অঞ্চলে বিমান আক্রমণকালে সেইজন্যই জাপান গুরু দায়িত্ব বহন ও ক্ষতি স্বীকারে নারাজ। জাপান বোঝে, কলিকাতা অঞ্চলে সাফল্যজনক বিমান হানার উদ্দেশ্যে যদি তাহাকে বোমারু বিমানের সঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ জঙ্গী বিমানের একটি বড় দল লইয়া দিবাভাগে হানা দিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। মিত্রপক্ষের সমরায়োজনে বাধা প্রদান করিতে হইলে ব্যাপক আক্রমণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু জাপান বর্তমানে বিমান ও বিমান চালকের ক্ষতি স্বীকার করিয়া সেই আক্রমণ পরিচালনায় প্রস্তুত নয়। কলিকাতা মান্দালয় নয়, তাই

চার ইঞ্জিনযুক্ত অতিকায় ব্রিটীশ যুদ্ধ বিমান হালিফ্যাক্স মেঘের মধ্য দিয়া আকাশযুদ্ধে জার্মানীর বিপক্ষে অভিযান করিয়াছে। জার্মানীর বহু শিল্প-ঘাঁটিতে এই হালিফ্যাক্স ৩,০০০ মাইল দূরত্বের সাড়েপাঁচ টন বোমা নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছে

জাপান প্রথমেই ব্যাপক আক্রমণে সাহসী না হইয়া পর্যবেক্ষণ কার্যের মধ্যেই আপন বিমান আক্রমণকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিবার প্রাক্‌কালে শেষোক্ত রাষ্ট্রের সরকারকে লইয়াই আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সকল]

কূটনীতিক হিসাব সীমাবদ্ধ থাকে না। আক্রমণের লক্ষীভূত দেশের জনসাধারণের প্রশ্নও আক্রমণকারী রাষ্ট্রকে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হয়। সামরিক দিক হইতে বিচার করিলে স্থিতিশীল যুদ্ধে রণক্ষেত্রের কোন বিশেষ সুবিধাজনক অঞ্চল পূর্বাহ্নে দখল করিতে পারিলে যেমন যুদ্ধের অর্দ্ধেক জয়লাভ আগেই ঘটিয়া যায়, তেমনই যান্ত্রিক যুদ্ধে আক্রমণের লক্ষীভূত রাষ্ট্রের জনসাধারণের সমর্থন পূর্ব হইতে লাভ করিতে পারিলে যুদ্ধের অর্দ্ধজয় সেইখানেই হইয়া যায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই চায় আক্রমণের লক্ষীভূত রাষ্ট্রের সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ ও আক্রমণের সময় গণশক্তির সক্রিয় সহযোগিতা। জার্মানীকে আমরা একাধিকবার এই নীতি অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। সেই জন্যই যখন রুশিয়া, বৃটেন, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ বৃটেনকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দাবী জানাইয়াছিল, তখন তাহার উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে একথাও জানান হইয়াছিল যে, মিত্রশক্তিবাহিনী কর্ত্তৃক ফ্রান্সের উপকূলে জার্মানীকে আক্রমণ করিবার প্রাক্‌কালে ফ্রান্সের জনসাধারণের প্রদত্ত সহযোগিতার প্রশ্নও সেখানে বিবেচ্য। ভারতের জাতীয় সরকারের দাবী পুরণ না হওয়ায় ভারতের জনসাধারণ যে ক্ষুণ্ণ এবং মর্মাহত হইয়াছে সে কথা সত্য এবং সেই আত্মঘাতী বিক্ষোভ অনেক স্থলে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার ফলাফল সম্বন্ধেও আমরা 'ভারতবর্ষ'-এ গত সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। বিক্ষোভকারিগণের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী আন্তরিক হইলেও যে পন্থা তাহারা নিজেদের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থায় একদিকে যেমন দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, অপরপক্ষে তাহা আক্রমণেচ্ছুক বৈদেশিক সরকারকে যে আক্রমণে উৎসাহিত করে তাহা নিঃসন্দেহ। যে সকল ব্যক্তি জাপানের আসন্ন আক্রমণের অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ভারতের রাজনীতিক পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধাবস্থার সহিত তাহার সম্পর্ক হিসাব করিয়াই ঐ ধরণের অভিমত তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত উপরোক্ত যুক্তি হইতে আপাতঃদৃষ্টিতে উহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আরও একটু অভিনিবেশ সহকারে তাঁহাদের মতামতকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, যে ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আপন অভিমতের প্রসাদ তাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, গলদ আছে একেবারে তাহার মূলে। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সাধারণতঃ কোন রাষ্ট্র দুইটি কারণে অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়—প্রথম কূটনীতিক এবং দ্বিতীয় সামরিক।

বিমান আক্রমণ আদৌ প্রয়োজন কি না এবং আক্রমণ কালে বোমা বর্ষণ সামরিক লক্ষ্য বস্তুতেই নিবদ্ধ থাকিবে কি না তাহা প্রথমতঃ নির্ভর করে কূটনীতির উপর। মিত্রশক্তির বিমান অক্ষশক্তির বহু সহরে একাধিকবার বোমা বর্ষণ করিয়াছে, জার্মানীর একাধিক সহরে হাজার বিমানের অভিযানও প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু রোম নগরীতে কোন দিন নির্বিচারে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের সংবাদ এখনও আমরা পাই নাই। রোম নগরী সুরক্ষিত বলিয়া, অথবা মিত্রশক্তির নিকটতম ঘাঁটি হইতে তাহার দূরত্ব যথেষ্ট অধিক থাকাতে আক্রমণ অসম্ভব বলিয়াই যে মিত্রশক্তি সেখানে বোমা বর্ষণ করেন নাই, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে। কূটনীতিক কারণেই রোমের উপর নির্বিচারে যথেচ্ছ বোমা বর্ষণ করা হয় নাই। ইটালীর বর্তমান শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিক অবস্থায় ইটালীর জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ ইটালীর বর্তমান শাসক শ্রেণীর উপর অসন্তুষ্ট, আর সেই অসন্তোষকে স্বপক্ষে ভবিষ্যতে কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে মিত্রশক্তির পক্ষে সেখানে জনসাধারণের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা চলে না। অপর পক্ষে, জার্মানী রুশিয়ার বহু স্থানে 'বেসামরিক' নরনারীর উপরও বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে। কারণ জার্মানী জানে—রুশিয়ার প্রত্যেকটি নরনারী তাহার শত্রু, রুশিয়ার সামরিক শক্তিকে তাহারা সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেছে, রুশিয়ার তুষারকণিকা পর্যন্ত তাহার জয়লাভের পক্ষে অন্তরায়। সেই জন্যই রুশ নাগরিকগণের উপরও জার্মানীর নৃশংস বোমাবর্ষণ!

আক্রমণের অপর কারণ হইতেছে—সামরিক। শত্রুর সমর সম্ভার বিনষ্ট করিবার জন্য, উৎপাদন শক্তিকে ধ্বংস ও সরবরাহ সূত্রকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বিমান আক্রমণ প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ আক্রমণ ব্যতীত কখনও জয়লাভ হয় না। কবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক অবস্থার বীজ তাহার অনুকূলে ফল প্রসব করিবে সেই আশায় কোন রাষ্ট্র অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সামরিক কার্যকলাপ যখন প্রয়োজনের পর্যায়ে আসে তখন আক্রমণ হয় অবশ্যম্ভাবী। মিত্রশক্তির ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে সন্ত্রস্ত জাপান যদি অবিলম্বে সামরিক প্রয়োজনে আক্রমণ ব্যতীত গত্যন্তর না দেখে, তাহা হইলে ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থার মুখের দিকে তাকাইয়া সে একদিন গুনিবে এ আশা বাতুলতা।

জাপ বিমান হানার বর্তমান অবস্থায় প্রশ্ন ওঠে, জাপান কর্তৃক ভারত আক্রমণ আসন্ন কি না। প্রশ্নটি সহজ এবং প্রয়োজনীয় হইলেও উত্তরটি যথেষ্ট জটিল, ফলে কূটনীতিকরাও দ্বিমত। ভারতের প্রধান সেনাপতির কথায় বুঝা যায় যে, জাপান ভারত আক্রমণে সাহসী হইবে না। আবার Royal Institute of International Affairsএর পক্ষ হইতে লর্ড হেইলী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। জাপান যখন উপলব্ধি করিবে যে, অষ্ট্রেলিয়ার দিকে তাহার আক্রমণ-বেগ প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, তখন সে স্বেচ্ছায় ভারতে পদার্পণের চেষ্টা করিতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে রণক্ষেত্র প্রসারিত হইবার আশঙ্কা আরও অনেকে করিতেছেন। আমাদের মনে হয়, জাপানের এই আক্রমণ প্রতিরোধ মূলক। জেনারেল ওয়াভেল স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, ব্রহ্মদেশকে অদূর ভবিষ্যতে পুনরুদ্ধার করা হইবে। রাজকীয় বিমান বাহিনী ব্রহ্মদেশের একাধিক স্থানে জাপ বিমান ও সামরিক ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে, মিত্রশক্তিবাহিনী জাপসৈন্যকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়া আকিয়াবের নিকটে উপস্থিত

ব্রিটেনের বালক সৈন্যকর্তৃক পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের গোলা নিক্ষেপ

হইয়াছে। ইহার প্রতিরোধের জন্ম জাপানের সতর্কতা অবলম্বন স্বাভাবিক। কিন্তু মিত্রশক্তি আকিয়াব হইয়া ব্রহ্মের পশ্চিম উপকূল যদি অধিকারে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জাপ-নৌশক্তির আশঙ্কা সমধিক বৃদ্ধি পাইবে, সিঙ্গাপুরের বিপদও সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইবে। তৃতীয়তঃ, উত্তর-পূর্ব-দিক হইতে ভারতকে রক্ষার ন্যায় ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধারের জন্ম প্রতি আক্রমণ চালাইবার পক্ষে কলিকাতার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। কাজেই জাপানের পক্ষে কলিকাতায় বিমান আক্রমণ পরিচালনা করিয়া মিত্র-

ব্রিটেনের অতিকায় জঙ্গীবিমান আভ্রো ল্যাঙ্কেষ্টার। এই অতিকায় বিমানপোতের পাখা ১০২ ফিট, ৭০ ফিট লম্বা এবং ২০ ফিট উচ্চ

শক্তির সমর প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার উত্তম স্বাভাবিক। সেই কারণেই জাপান আজ আত্মরক্ষামূলক আক্রমণে প্রবৃত্ত।

অবশ্য আরও একটি প্রশ্ন এখানে ওঠে—বিমান আক্রমণ যদি জাপানের পক্ষে প্রয়োজনীয় তাহা হইলে জাপান সেই আক্রমণে এত বিলম্ব করিল কেন? কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আক্রমণ চলে সামরিক এবং কূটনীতিক কারণে। মিত্রশক্তিবাহিনী ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সামরিক কারণ আসন্ন হইয়া ওঠে নাই; আর কূটনীতির দিক দিয়া বিচার করিলে জাপান আক্রমণ সুরু করিয়াছে ঠিক চরম মুহূর্তে। ভারত সরকার বিক্ষোভ দমন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহাতে ভারতের জনসাধারণের মন হইতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা মুছিয়া গিয়া তাহাদের চিত্ত যে আত্মস্থ হইয়াছে ইহা প্রমাণিত হয় না। পথভ্রষ্ট বিক্ষোভকারিগণ যখন আপন মনে গুমরিয়া মরিতেছে, জাপান আপনাকে সেই মানসিক সঙ্কট মুহূর্তে "পরিত্রাতা" হিসাবে উপস্থিত করিতে চাহিয়াছে। ইহাই আক্রমণের কূটনীতির দিক। কিন্তু এই-খানেই জাপানের হিসাবে ভুল হইয়াছে। ভারতবাসী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা দেখিতে ইচ্ছুক সত্য, কিন্তু সে জাতীয় সরকার জাপানের নির্দেশ-ক্রমে গঠিত হইবে না। প্রতিটি ভারতবাসী জাপ আক্রমণে সাধ্যমত বাধা প্রদানে বদ্ধপরিকর। আমরা একাধিকবার একথা 'ভারতবর্ষ'-এ বলিয়াছি এবং কিভাবে জাপানকে 'বেসামরিক' নরনারী বাধা প্রদান করিতে পারে সে বিষয়েও কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। ভারতবাসী জানে জাপানের মিত্রতার ছদ্মবেশের অন্তরালে কোন্ মূর্তি আত্মগোপন করিয়া আছে। ভারতের বিরোধ বৃটেনের সঙ্গে নহে। বিরোধ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। আটশত বৎসরের ব্যবধানে ভারতবাসী যথেষ্ট রাজনীতিক চেতনালাভ করিয়াছে; একটি মাত্র ভারতবাসীকেও আজ জয়চন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে দেখিবার আশা করিয়া থাকিলে জাপানকে প্রারম্ভেই নিরাশ হইতে হইবে।

২৪।১।৪৩

নব ফাল্গুন এল

শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী

লীলা বিতানের দোলের দোলায়
নব ফাল্গুন এল,
প্রিয়া বিরহের বিক্ষোভ ভরা
নিমিলিত আঁখি মেল।
নব মল্লিকা খুলিয়াছে দল,
ফুল উৎসবে হাসে বনতল।
মনোরমা প্রিয়া রঙীণ মায়ায়
রচিল ইন্দ্রধনু;
আমার প্রাণের ফাগের পরাগে
ভরে গেছে তার তনু।

কুঙ্কুম ভাঙা রক্ত অধরে,
লুব্ধ মধুপ রভসে বিহরে';
উদাসীন মন বন্দী আজিকে
আঁখি পল্লব হার।
মিলন দিনের গন্ধে অধীর
লঘু দক্ষিণা বায়।
দোলের দোলায় এল যে গো আজ
প্রীতির আমন্ত্রণ;
মধু মাধবের রতির বিলাসে
এই নব গীতায়ন।

নৌকাযোগে নবদ্বীপ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্‌

পূজার ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়া চাকুরীজীবী বাঙ্গালীর পক্ষে একটা লোভনীয় আকর্ষণ। বর্ষাগগনে শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে মনোভাবের পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণের দিক্‌বিজয় যাত্রার সঙ্গে আধুনিক মসীজীবী বাঙ্গালীর দেশভ্রমণেচ্ছার কি সাদৃশ্য থাকিতে পারে তা বলিতে পারি না। নদীপথে অনেক দ্রষ্টব্যস্থান আছে, কিন্তু সময় সংক্ষেপবশতঃ নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল।

বিজয়ার পরদিন ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রে যাত্রা করার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু, সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া, নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলে দেখা গেল যে, পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মাঝি কোন এক অজ্ঞাত কারণে অদৃশ্য হইয়াছে। সেই হরিষে বিষাদ অবস্থায় অপর এক মাঝিকে অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরি দিতে স্বীকৃত হইয়া বহু সাধ্য সাধনার পর রাজী করান গেল। পাঁচজন মাঝী দৈনিক ৫৲ টাকা মজুরীতে, আমাদের লইয়া যাইতে রাজী হইল। আমরা ছয়জন যাত্রী—ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইনসিওরেন্স জগতে সুপরিচিত শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বেরিলী প্রবাসী শ্রীহরিপদ মিত্র, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীশঙ্করলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখক।

রাত্রি ১২টার সময় কামারহাটী গঙ্গার ঘাট হইতে নৌকা ছাড়িয়া সমস্ত রাত্রি নৌকা চালাইয়া প্রাতঃকালে কোন্নগরে পৌঁছিলাম। তখন শেষ পর্য্যন্ত নবদ্বীপে পৌঁছাইবার আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তবে, যে হেতু ইহা তীর্থ যাত্রা বা কোন অবশ্য কর্ত্তব্য কাজের জন্য যাত্রা নহে,কাজেই আমাদের আমোদ তাহাতে বিশেষ বাধা পায় নাই। কোন্নগরে আসিয়া গঙ্গায় ইলিশ্‌ মাছ কিনিয়া তাহা কাটিয়া কুটিয়া রন্ধনের উপযোগী করা যখন ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িল, তখন কোন্নগরের এক ভদ্রলোক অযাচিতভাবে আমাদের সেটুকু উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; উপরন্তু আমাদের চায়ের জন্য নিজের বাড়ি হইতে গরুর দুধ ও কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইরূপ অযাচিত ও অহেতুক পরোপকার প্রবৃত্তি এই যাত্রাপথে আরও কয়েকবার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। আর প্রত্যেকবারেই মনে পড়িয়াছে যে সঞ্জীববাবু সত্যই বলিয়াছেন যে "বঙ্গবাসী মাত্রই সজ্জন"। চা ও জলযোগান্তে কোন্নগর হইতে নৌকা ছাড়িতে বেলা ৮॥০ বাজিয়া গেল। গঙ্গার দুই ধারে কলের চিম্‌নি ও ছোট-বড় নানা রকমের বাড়ি আমাদের বিশেষ আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হইল না। বেলা ১২টার সময় যখন বারাকপুরের নিকটস্থ মণিরামপুরের একঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সকলে স্নানাদি সমাপন করিয়া আহারাদির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, তখন এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত হইল। মালবাহী যে সকল ষ্টীমার নৈহাটী বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি স্থানের জুটমিল পর্য্যন্ত যাওয়া আসা করে সেইরূপ একটি ষ্টীমারের সঙ্গে আমাদের নৌকাটিকে বাঁধিয়া দেওয়া গেল। ইহার জন্য অবশ্য সেই ষ্টীমারের সারেঙ্‌কে কিঞ্চিদধিক দুই টাকা "দস্তুরী" দিতে হইলেও আমরা নবদ্বীপ পৌঁছান সম্বন্ধে আশান্বিত হইতে পারিলাম। কারণ, কেবলমাত্র দাঁড়ের সাহায্যে নৌকা চালাইয়া নবদ্বীপ যাওয়া অসম্ভব না হইলেও যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। ১২টা হইতে বেলা প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত আমরা এই ষ্টীমারের সাহায্যে অগ্রসর হইলাম। ইঁট, কাঠ ও লোহার ঘর বাড়িকে আশ্রয় করিয়া যে যন্ত্রযুগের সভ্যতা গঙ্গার উভয়-তীরে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, ও প্রতিনিয়ত গঙ্গাতীরের শ্যামল সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া আপন কায়া স্ফীত করিয়া চলিয়াছে, সেই সভ্যতার সংস্পর্শশূন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য-বহুল নদীতীর হুগলীর দক্ষিণ দিকে পাওয়া যায় না। তাই যখন শরতের অপরাহ্নে হুগলীর পুল পার হইয়া কিছুদূর যাওয়ার পর ষ্টীমার আমাদের নৌকাকে ছাড়িয়া দিল তখন গঙ্গার উভয় তীরের দৃশ্য দেখিয়া মনের মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। সেখানকার আকাশ কলের চিম্‌নির ধোঁয়ায় কলুষিত নয়, সেখানকার গঙ্গার তীর সান বাঁধান পোস্তা অথবা কলের মাল তুলিবার জেটীবহুল হইয়া আমাদের দৃষ্টিকে প্রতিহত করে না। শান্তিপুরের গঙ্গার যে শোভা বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাওয়া যায়, তাহা হুগলী পুলের উত্তর দিক হইতেই যেন আরম্ভ হইয়াছে। ঘন গুল্ম সমাচ্ছন্ন বড় বড় অশথ পাকুড়ের শাখার ফাঁক দিয়া যে সকল পাকা-বাড়ী চোখে পড়ে সেগুলিও প্রাচীনত্বের আবরণে আপনার কৃত্রিমতা বিসর্জ্জন দিয়াছে। প্রকৃতির লীলা নিকেতনের মধ্যে মানুষের হাতে গড়া এই সকল ঘর বাড়ী যেন কেমন সুন্দরভাবে মিলিয়া গিয়াছে। মনে হয় যে ঐ সকল ঘর বাড়ী ঐ পরিবেষ্টনীর মধ্যে যেন যথাস্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। দুই তীরে শ্যামল বনরেখা, ঊর্দ্ধে শরতের স্বচ্ছ আকাশে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া—আর নদীমধ্যে বিস্তৃত চরের উপর ঘন কাশবনের শ্বেত পুষ্প সম্ভার—হেমন্তের দিনান্ত বেলার অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান রশ্মিতে যেন এক নূতন স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করিল! কলিকাতার কর্ম্মমুখর কোলাহলময় লৌহদংষ্ট্রা সভ্যতার কৃত্রিম নাগরিক জীবনের এত কাছে প্রকৃতির এই শান্ত মধুর অধিষ্ঠান চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের নৌকা গঙ্গার পশ্চিম তীর ঘেঁসিয়া চলিল। গঙ্গার পাড় স্থানে স্থানে এমন উঁচু ও খাড়াই যে দেখিলে ভয়; মনে হয় যে এখনি বুঝি তীরের উপরস্থ গাছপালা ও ঘর বাড়িসমেত সমস্তই নদীগর্ভে পড়িয়া যাইবে। কোন কোন জায়গায় বটগাছের অবলম্বনহীন শিকড়ে নৌকা বাঁধিয়া ছেলেরা মাছ ধরিতেছে; কোথাও বা ২০-২৫ ফুট উচ্চ পাড় ভূমি হইতে সোপানবিহীন ঘাটের ঢালু জমি বাহিয়া স্ত্রীলোকেরা জল লইতে নামিতেছে; কোথাও বা ভাঙা ঘাটের সোপানে বসিয়া কয়েকজন গ্রামবাসী আমাদের নৌকার দিকে চাহিয়া আছে। নদী এখানে যেন সকলের আপনার জন। দেখিলে মনে হয় অনেক গৃহস্থের খিড়কীর ঘাটই—গঙ্গার ঘাট। শান্ত, নিস্তরঙ্গ গঙ্গা ঘন ছায়াবহুল বৃক্ষের তলদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আপন বিরাটত্ব ও রুদ্রভাব বর্জ্জন করিয়া এমন শান্তভাব ধারণ করিয়াছে যে তাহাকে সমব্যথিনী বলিয়া মনে করিতে বা তাহার কাছে সুখ দুঃখের ঘরোয়া কথা বলিয়া শান্তি পাইতে একটুও দ্বিধা জাগে না।

এইভাবে মানুষে ও প্রকৃতিতে মিলিয়া মিশিয়া ঘরকন্না করার বিচিত্র ছবি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। সন্ধ্যা ৬৷০ টার সময় বাঁশবেড়িয়ার ঘাটে আসিয়া আমাদের নৌকা ভিড়িল। মাঝিরা তাহাদের প্রয়োজন মত বাজার হাট করিতে গেল। আমরাও তীরে উঠিয়া এইস্থানের প্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী দেবীর মন্দির দেখিতে গেলাম। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিল। নিস্তব্ধ গ্রাম্যপথ ধরিয়া আমরা হংসেশ্বরী মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। স্থানটা যেমন নির্জ্জন, তেমনই প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। দেউড়ী তোরণের খানিকটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে ও অপর এক অংশে এক অশ্বথ গাছ জন্মিয়াছে। মানুষ নিজের হাতে গড়া জিনিষকে যখন পরিত্যাগ করে, প্রকৃতি তাহাকে আশ্রয় দেয়। মন্দিরে সংলগ্ন চাতালের উপর চারিপার্শ্বের ঘন গাছপালার বাধা অতিক্রম করিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। ১৩টী চূড়া সমন্বিত সুউচ্চ মন্দিরের বিরাট আয়তন সেই আধ-আলো আধ-ছায়াতে এমন মায়া রচনা করিল যাহাতে মন্দিরে প্রতিমার স্বরূপ প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। মন্দিরের মধ্যে সহস্রদল পদ্মের উপর শায়িত শিবমূর্ত্তির বক্ষোপরি নীল

বরণা দেবীপ্রতিমা সমাসীন। দেবীর প্রতিমা নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত এবং লোল জিহ্বা প্রসারিতা নৃমুণ্ড মালিনী মূর্ত্তি নহে—বসনপরিহিতা বরাভয়-করা। মাত্র দুইটি তৈল প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহারই ক্ষীণ আলোকে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় তাহাতে মন্দিরের গাত্রের কারুকার্য্য দেখিলাম। পূজারী ব্রাহ্মণ একটি প্রদীপ হাতে লইয়া আমাদিগকে পথ দেখাইয়া মন্দিরের অপর অংশস্থিত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি ও রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহ দেখাইলেন। হংসেশ্বরী মন্দিরের চত্বরসংলগ্ন বাসুদেবের মন্দির দেখিলাম। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। মন্দিরটী স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ। বিরাট মন্দিরটির মধ্যে কোথাও একটু আলো জ্বলে না। পূর্ব্বোল্লিখিত শিবলিঙ্গমূর্ত্তি ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সম্মুখেও সামান্য একটু তৈল প্রদীপও জ্বলে না, অথচ শুনা গেল এই মন্দির নির্ম্মাণে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। পূজারী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল তৈলের মূল্যবৃদ্ধিহেতু মন্দিরে প্রদীপ জ্বালা সম্ভব হয় না। যে মন্দির নির্ম্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয় সেখানে বিগ্রহের সম্মুখে তৈলপ্রদীপ জ্বালাও কালক্রমে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কালের কি বিচিত্রগতি! দেবীমূর্ত্তি ও মন্দিরাদির কারুকার্য্যবিষয় আলোচনা করিতে করিতে নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম।

নৌকার ঘরের মধ্যে সকলের শয়নোপযোগী স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় নৌকার ঘরের সম্মুখস্থ পাটাতনের উপর চটের সাহায্যে তাঁবুর মত ঘর করিবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ফিরিবার পূর্ব্বে মাঝিরা ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। আহারাদি সারিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নদীপথে ভ্রমণে অনেকসময় জোয়ার ভাঁটার হিসাব রাখিতে হয়। কলিকাতা হইতে জোয়ার উত্তরদিকে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যায় বটে কিন্তু হুগলী পুলের উত্তর হইতে সে জোয়ারের বিশেষ জোর থাকে না। কেবলমাত্র ভাঁটার টান একটু মন্দা পড়ে এবং নদীর জল সামান্যই বাড়ে। এই জোয়ারও ঐ সব স্থানে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। রাত্রি ১২॥০টার সময় জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা খুলিয়া দিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

রজনী প্রভাতে দেখিলাম নৌকা এক চড়ায় বাঁধা রহিয়াছে; এই চড়াটি আকারে খুব বড়। কেবলমাত্র কলিকাতার কাছাকাছি গঙ্গার সহিত যাঁহাদের পরিচয়, তাঁহাদের পক্ষে ধারণা করা সহজসাধ্য নয় যে এই গঙ্গা নদীতেই এত বড় বড় চড়া বা চর আছে। এই সকল চড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাশ ও বাবলার বন। আবার অনেক চড়ায় ঘর বাড়ী তৈয়ার করিয়া চাষীরা বাস করে, সুবিধামত কৃষি কার্য্যও করে। কোন কোন চড়ার খানিকটা অংশ হয়ত সারা বৎসর জাগিয়া থাকে এবং সেই চড়ার অধিবাসীরা তাহাদের বাসস্থানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে খুব বিশেষ সন্দিগ্ধ নয়। এই সকল চড়াতে আমকাঁঠাল গাছও দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা এই চড়া হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। নদীটি এখানে খুবই সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হইল এবং এক পাশে যেমন সুবিস্তীর্ণ চরভূমি জাগিয়া উঠিয়াছে, অপর পার্শ্বে তেমনি সুউচ্চ পাড় ধ্বসিয়া খাড়াই দেয়ালের মত দাঁড়াইয়া আছে। নৌকা চলিতে লাগিল, নদীর এই ভাঙাগড়া ও চড়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তার সহিত মনুষ্য জীবনের ও পৃথিবীর ইতিহাসের ভাঙা গড়ার সহিত সাদৃশ্যমূলক অনেক কথাই মনে জাগিতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া চড়া শেষ হইলে দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে নদীটি এখানে যথেষ্ট বিস্তৃত—কেবল মাত্র মাঝে মাঝে এরূপ চর জাগিয়া ওঠায় দুই পাশের জলরেখা সঙ্কীর্ণ বলিয়া মনে হয়। নৌকায় চলিতে চলিতে ষ্টোভে প্রাতঃকালীন চা ও জলযোগ প্রস্তুত হইয়াছিল। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অপর এক উনানে রান্না চলিতে লাগিল।

বেলা ১২টার সময় আমরা যে স্থানে নৌকা বাঁধিলাম সে স্থানটির নাম ভাণ্ডেলের চর। এই চরটি নদীর মধ্যস্থ নয়। তীরের সংলগ্ন হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের অধিবাসীরা এই চরভূমি পার হইয়া নদীতে স্নান করিতে আসে। শুনিলাম এই চরে স্থানীয় চাষীরা যে সকল চাষ আবাদ করিয়াছিল, গত বর্ষায় তাহা সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। মিত্র মহাশয় ও ফণিবাবু চায়ের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহের জন্য গ্রামের মধ্যে গেলেন এবং আমরা কয়েকজন এইখানে স্নানাদি সমাপন করিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন গ্রামবাসী কতকগুলি কাঁচা পেঁপে আমাদিগকে আনিয়া দিল এবং এগুলি তাহার নিজের চাষের বলিয়া কোন মূল্য লইল না। তাহার বিনয় সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইলাম। ফণিবাবু ও মিত্র মহাশয় দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিলে নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া অগ্রসর হওয়া যে কি ভীষণ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার তাহা যাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই তাঁহারা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। সমস্ত নৌকাটির ভার স্রোতের বিরুদ্ধে টানিয়া আগাইয়া লইয়া যাওয়া দুইটি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। গুণ টানিবার সময় সমস্ত শরীরের ভার দিয়া গুণ টানিতে হয়, এইজন্য সোজাভাবে দাঁড়াইয়া গুণ টানিলে নৌকা মোটেই অগ্রসর হয় না। গুণ টানা সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতালাভের জন্য আমাদের নবীন সহযাত্রীরা মধ্যে মধ্যে মাঝিদের সহকারী হিসাবে গুণ টানিতে লাগিয়া গেলেন। চড়ার বালির উপর দিয়া গুণ টানিবার আরও অসুবিধা, কারণ সামান্য রৌদ্রে চড়ার হাল্কা বালি উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং দ্বিতীয়তঃ সম্মুখ ভাগের সমস্ত শরীর ঝুঁকাইয়া দিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠির উপর জোর দিয়া চলিতে গেলে প্রতি পদক্ষেপে পায়ের তলা হইতে বালুকারাশি সরিয়া যাইতে থাকে। যদিও হুগলীর ধার হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের অধিকাংশই গুণ টানিয়া অতিক্রম করিতে হয়, গুণ টানিবার কোন সুবিধামত রাস্তা কিন্তু এই অঞ্চলে নাই। কখনও খুব উচ্চ খাড়াই পাড়ের উপর দিয়া, কখনও বা কাশ ও ঘন গুল্ম সমাচ্ছন্ন বনের পাশ দিয়া, কখনও বা হাঁটু পর্য্যন্ত জলের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইয়া চলিতে হয়। স্রোতের উজানে কখনও লগী মারিয়া কখনও গুণ টানিয়া কখনও বা দাঁড় টানিয়া মাঝিরা নৌকা আগাইয়া লইয়া চলিল। এইভাবে গুণ টানিয়া অপরাহ্ন প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময় বলাগড় নামক স্থানে নৌকা তীরে ভিড়ান হইল। আমরা ও মাঝিরা প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য বলাগড়ের বাজারে যাইলাম। বাজারটি অল্প পরিসর হইলেও সব কিছুই পাওয়া যায়। দোকানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। বলাগড় ত্যাগ করিয়া আরও কিছু-দূর অগ্রসর হইয়া আমরা এক চরের শেষ প্রান্তে সেই রাত্রির মত নৌকা বাঁধিলাম। সেদিন শুক্লা চতুর্দ্দশী, বৃক্ষলতাবিরল চরের সুবিস্তীর্ণ সমতল বালু ভূমির উপর জোৎস্না প্রতিফলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। পরপারে ঘনান্ধকার বনরেখা—একটুও প্রদীপালোক দেখা যায় না। এই স্থানের নির্জ্জনতা এত গম্ভীর যে এখানে এ অবস্থায় না আসিলে বিশ্বাস হয় না। প্রকৃতির এই অন্তপুরে এই সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে আমাদের নৌকাখানি যেন কখন কোন অবসরে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। সেইদিন সকালে নৌকায় বসিয়া রন্ধন কার্য্যের অবকাশে আমরা যে রবীন্দ্র কাব্যের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহারই একটি পংক্তি এই চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত নিস্তব্ধ রাত্রে মনে পড়িতে লাগিল—"চাঁদের পেয়ালার উপচিয়ে পড়ে স্বর্গীয় মদের ফেনা।" রাত্রে আহারাদির পর আমরা চরের উপর বেড়াইতে গেলাম। সেই নিস্তব্ধ রাত্রে লতাগুল্ম বিরল সেই চরের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চড়ায় উপর যে ছোট ছোট বাবলা গাছ জন্মিয়াছে তাহারই শাখায় বাসা বাঁধিয়া গাঙ্‌শালিকেরা বাস করে, আমাদের পদধ্বনিতে তাহারা সচকিতে জাগিয়া উঠিয়া অস্ফুট কলধ্বনিতে আমাদের অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ করিতে লাগিল। নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের মধ্যে

অতি উৎসাহী এক তরুণ যাত্রী একজন মাঝিকে সঙ্গী করিয়া একখানি গামছার সাহায্যে মাছ ধরিবার জন্য নদীর জলে নামিয়াছে।

পরদিন (শুক্রবার) সকাল হইতেই আমাদের মধ্যে নবদ্বীপে পৌঁছাইবার জন্য একটা ব্যাকুলতা দেখা গেল। মাঝিরাও আমাদের এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যেন আপনা হইতেই অধিকতর পরিশ্রম স্বীকার করিতে লাগিল। নিথর নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ নদীজলে দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছবির মত দুই পাশের চরভূমি ও গাছপালা দেখিতে দেখিতে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ সকল স্থানে অধিকাংশ সময়ে গুণ টানিয়া নৌকা বাহিতে হয়। প্রায় সমস্ত সময়টা গুণটানিয়া আমরা বেলা ১১॥০টার সময় কালনার ঘাটে পৌঁছাইলাম। এখানে একটি অস্থায়ী ভাসমান পুল তৈয়ার হইতেছে সেজন্য লোকজনের ভিড় একটু বেশী। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা—কাজেই ঘাটে স্নানার্থিনী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক বলিয়া মনে হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই যে স্থানীয় অধিবাসী নহে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। নদী তীরেই ইহাদের রন্ধনাদির ব্যবস্থা দেখিলাম। ঘাট হইতে দেখা যায় অনেক বড় বড় পাকা বাড়ী সহরের ন্যায় ঘন সন্নিবেশিত; ঘাটে মালবাহী নৌকার সংখ্যাও সর্বাধিক। পূজার সময়ের ঝড়ে কত নৌকা ডুবিয়াছে ও কত মানুষ নদীবক্ষে প্রাণ হারাইয়াছে তাহার কিছু কিছু প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে পথেই পাইয়াছিলাম। কিন্তু কালনার ঘাট ছাড়িয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই ঝড়ের দরুণ এ স্থানের যে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে তাহার দৃশ্য চোখে পড়িতে লাগিল। নদীর তীরের উপর যে সকল পাকা বাড়ি ছিল, তাহাদের অধিকাংশই ভিত্তিসমেত নদীগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতল বা ত্রিতল ইমারতগুলির হয়ত বা একদিকের দেয়ালমাত্র দাঁড়াইয়া আছে, বাকী অংশ মাটীসমেত ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। প্রায় সমস্তদিন গুণ টানিয়া সন্ধ্যার সময় মাঝিরা আগেকার দিনের মত গ্রামসংলগ্ন এক চড়ায় নৌকা বাঁধিল। আমরা সারাদিন অগ্রসর হইবার পরেও নবদ্বীপে পৌঁছাইবার সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইবার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। যতগুলি মাছ ধরিবার নৌকা চোখে পড়িতে লাগিল তাহাদের সকলকেই নবদ্বীপের দূরত্ব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম এবং বিভিন্ন মাঝির নিকট হইতে বিভিন্ন প্রকারের উক্তি আমাদের মনের ব্যাকুলতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিল। একবার একজন মাঝিকে নবদ্বীপ কতদূর জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "আজ্ঞে, এ কথার জবাব কতবার দেব? একবার ত বলে গেছি।" ভাবিয়া দেখিলাম সত্যিই তাই। এইভাবে আমাদের যখন ভ্রম সংশোধন হইল তখন একখানি নৌকা আসিতে দেখিয়া মিত্রমহাশয় সেই নৌকার মাঝিকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ কর্ত্তা! তুমি তখন এখান থেকে নবদ্বীপ কতদূর বলিয়া গেলে?" কিন্তু দেখা গেল যে এবারেও ভ্রম হইয়াছে। কারণ, সে জবাব দিল "আজ্ঞে, আমি ত এ বিষয় কিছু বলিনি।" অগত্যা স্থির করা গেল আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে না। পরদিন (শনিবার) প্রাতে নৌকা ছাড়িয়া বেলা প্রায় ১১॥০টার সময় নবদ্বীপে পৌঁছাইলাম। নবদ্বীপে পৌঁছাইতে আমাদের এত বিলম্ব হইবার কারণ, কেবল যে উজান স্রোতে আসা তাহা নয়, নদী এমন সর্পিল গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া অসংখ্য চরের সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে যে পথের দূরত্ব বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

নৌকা হইতে তীরে নামিয়া স্নানাদি সারিয়া আমরা মহাপ্রভুর মন্দির দেখিতে গেলাম। মন্দিরের মধ্যে মহাপ্রভুর নিম্বকাষ্ঠ খোদিত মূর্ত্তি বিরাজমান। আমরা নবদ্বীপের বিশিষ্ট অধিবাসী শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায় মহাশয়ের নিকট হইতে মন্দিরের ইতিহাস, বিগ্রহ নির্ম্মাণের কাহিনী, শচীমাতার ব্যাকুলতা, বিষ্ণুপ্রিয়ার অপূর্ব্ব নিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিলাম। ভক্তির যে ভাগীরথী ধারা এককালে শান্তিপুর নবদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গ, আসাম, উড়িষ্যা প্লাবিত করিয়াছিল আজ কালক্রমে বৈষয়িক বুদ্ধির চোরাবালীর চরভূমিতে তাহা ক্রমশঃ ক্ষীণস্রোতা হইয়া মরিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মণিপুর রাজার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গদেবের স্বর্ণচূড় মন্দির দেখিতে গেলাম। এখানে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে অনেক মণিপুরবাসী বসবাস করিতেছেন। ইহাদের বেশভূষা, ভাষা ও মুখের গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। নবদ্বীপে এইবৈদেশিক উপনিবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। মন্দিরের সম্মুখের নাটমন্দিরে অনেক মণিপুরবাসী স্ত্রীপুরুষ একত্রে উপবেশন করিয়া সম্পূর্ণ বাঙালী রীতিতে বেশভূষা করিয়া খোল করতাল সহযোগে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় রচিত কীর্ত্তনের পদ গাহিতেছে যখন দেখিতে পাইলাম তখন মনে হইল যে আজ হইতে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সম্প্রদায়গত, সমাজগত ও আচারগত বিভেদ দূর করিবার জন্য এই বাংলা দেশের মধ্যে কি একটা প্রবল প্রচেষ্টাই না হইয়াছিল—যাহার ফলে বাংলার এক ছেলে শুধু পূর্ব্ব ভারত কেন সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মুখে এক ধর্ম্ম এক সমাজ ও এক মহাজাতির অপূর্ব্ব আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

"এক ধর্ম্ম-রাজ্য-পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।"

এ-কথা শিবাজী পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন বাহুবলে। চৈতন্যদেব চাহিয়াছিলেন প্রেম, কল্যাণ ও করুণার সাহায্যে। চৈতন্যদেবের লীলাভূমি নবদ্বীপের একাংশে অবস্থিত এই বৈদেশিক উপনিবেশ আজিও তাঁহার এই ধর্ম্ম অভিযানের সাফল্য প্রমাণ করিতেছে।

মণিপুরের মন্দির দেখা হইলে, আমরা সমাজ বাড়িতে আসিয়া বিগ্রহাদি দেখিলাম। এখানে ললিতা সখী নামধারী এক ভক্তের সাক্ষাৎ পাইলাম। এখানে মন্দিরের মধ্যে সখীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা মূর্ত্তি বিদ্যমান। নাটমন্দিরের একাংশে কয়েকজন বৃদ্ধবৈষ্ণব বহুভক্ত সমক্ষে শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনা করিতেছিলেন। সেখান হইতে আমরা শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। এখানে মন্দিরের মালিকগণ আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া জলযোগে আপ্যায়িত করিলেন। শুনিলাম, এখানে একটি টোল আছে এবং সেখানে বহু ছাত্র শিক্ষালাভ করে। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিলাম। মন্দিরের মালিক গোঁসাইগণ তাঁহাদের পালিত কুকুরগুলিকে আতপ তণ্ডুলের হবিষ্যান্ন ও ঠাকুরের পঞ্চভোগের ফলমূলাদি খাওয়াইয়া থাকেন। এইপ্রকার সাত্ত্বিক নিরামিষ আহারে কুকুর জাতির যে কি পরিমাণ ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি-সাধিত হইতে পারে তাহার প্রমাণস্বরূপ সেই ভক্ত গোঁসাইগণ তাঁহাদের কুকুরগুলিকে আনিয়া সগর্ব্বে আমাদিগকে দেখাইলেন। মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথের সেই লেখা—

"বাঘের বাচ্ছারে বাঘ না করিনু যদি, কি শিখানু তারে।"

যাহা হউক, আমরা সোনার গৌরাঙ্গ মন্দির দেখিতে গেলাম। এখানে মন্দিরের ঐশ্বর্য্য দেখিবার বিষয়। শুনিলাম, অব্রাহ্মণ যাত্রীগণের নিকট হইতে দর্শনী লওয়ার বন্দোবস্ত আছে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দর্শনী চাওয়া হয় নাই বটে; চাহিলেও যে তাঁহারা দর্শনী দিতে সম্মত ছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যিনি আচণ্ডাল সকলকেই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সুধামাখা হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার সোনার অঙ্গ বহুজন পদলাঞ্ছিত পথের ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল, আজ তাঁহার সুবর্ণে গঠিত মূর্ত্তি দর্শনে অব্রাহ্মণের অনধিকার—ধর্ম্মের নামে ইহা অপেক্ষা অনাচার ও উৎপীড়ন আর কি হইতে পারে!

রাত্রি প্রায় ১১টার সময় আমরা নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যে পথ অতিক্রম করিতে ৩। দিন লাগিয়াছিল, সেইপথে ফিরিয়া আসিতে যে মাত্র ২৪ ঘণ্টা সময় লাগিবে, ইহা পূর্ব্বে ধারণা করিতেই পারি নাই। এই পথ ভ্রমণে মাঝিদের যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল; তবে প্রথম দুই তিন দিন তাহারা এমন অনিচ্ছার সহিত যাইতেছিল যে তাহাদিগকে কার্য্যে উৎসাহিত করিবার সময় আমাদিগকে প্রায় কলম্বাসের মতই ধৈর্য্যশীল হইতে হইয়াছিল।
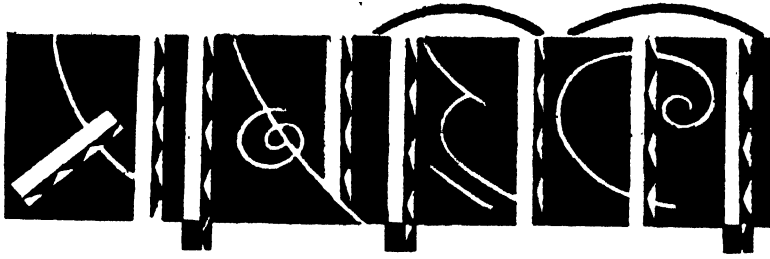
খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা—

প্রকাশ, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত কারখানাবহুল স্থানগুলিতে নিয়মিতভাবে ও নিয়মিত মূল্যে খাদ্যসরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙ্গালার খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার একখানি পত্রে এই কথা কলিকাতা কর্পোরেশনকেও জানাইয়া দিয়াছেন। লোক এই সংবাদে আশ্বস্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ তারিখ হইতে ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে।

খুচরার অভাব—

বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র বহু দিন হইতে তামার পয়সার অভাব অনুভূত হইয়াছিল—কাজেই গত কয়েক মাস যাবৎ পয়সার আমরা জানি না—তবে গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, একদল লোক খুচরা জমাইতেছে বলিয়া বাজারে খুচরার এত অভাব দেখা দিয়াছে। সত্য সত্যই পুলিস বহু স্থানে খানাতল্লাস করিয়া প্রভূত পরিমাণ খুচরা বাহির করিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনারও ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেহ খুচরা জমাইলে তাহাকে দণ্ডিত করা হইবে এবং কেহ তাহার খবর দিলে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে আমরা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছি, কাজেই এই খুচরার অভাব যে কবে দূর হইবে, তাহা বলা কঠিন। ব্যবসায়ীগণ যদি তাঁহাদের কারবারের পরিমাণ অনুযায়ী খুচরা সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাহার জন্য যাহাতে তাঁহাদের বিপন্ন হইতে না হয়, সে বিষয়েও কর্ত্তৃপক্ষের অবহিত থাকা উচিত।

আগ্রা দুর্গের দেওয়ান-ই-আমের বাহিরে তুরস্কের সাংবাদিক দল

ব্যবহার প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন হইতে ডবল পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি, আধুলিও বাজারে আর পাওয়া যাইতেছে না। সে জন্য সকল শ্রেণীর জনসাধারণের কিরূপ অসুবিধা ও কষ্ট হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কি কারণে এই অভাব উপস্থিত হইয়াছে তাহা

সর্ব্বত্র লুট তরাজ—

প্রত্যহ সংবাদ পত্রে নানাস্থানে লুঠ তরাজের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। টাকার জন্য এখন আর লোক চুরি ডাকাতি করিতেছে না—খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির দোকান লুঠ তরাজ হইতেছে। বোম্বাই

প্রদেশের নাসিকে একই দিনে ২০ খানি দোকানে লুঠ করা হইয়াছে। ভারতের গ্রামে গ্রামে এই ভাবে লুঠের কারণ সহজেই বুঝা যায়। লোক বাজারে যাইয়া পয়সা দিয়াও মাল পায় না। ভারতের সর্ব্বত্র চাল, ডাল, আটা, ময়দা, তেল, ঘি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষসমূহের অভাব। লোক বাজারে যাইয়া অর্থ দিয়াও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য পায় না। যাহাদের অর্থ জোটে না, তাহারা লুঠ তরাজ করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু এই অরাজকতা বন্ধ করিবার জন্ত শাসকগণও কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না। ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া সকলেই শঙ্কিত হইতেছেন।

যক্ষ্মা নিবারণের জন্ম বিরাট দান—

গোরক্ষপুরের প্রসিদ্ধ উকীল চারুচন্দ্র দাস মহাশয় গত ১২ই জানুয়ারী ৬৭ বৎসর বয়সে তথায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি সামান্ত অবস্থা হইতে নিজ অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে দীর্ঘকাল তাঁহাকে যক্ষ্মারোগে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। তিনি অপুত্রক ছিলেন ও মৃত্যুকালে ৪ লক্ষ টাকা একটি যক্ষ্মানিবাস প্রতিষ্ঠার জন্ত দান করিয়া গিয়াছেন। জীবিতকালেও তাঁহার গৃহের দ্বার সকলের জন্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত ও যে কোন বিদেশী গোরক্ষপুরে যাইলে তাঁহার গৃহে আদৃত হইতেন। তাঁহার এই বিরাট দান তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

গুরুদাস শতবার্ষিক—

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে স্বর্গত সুধী সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আগামী বৎসর ঐ দিনে তাঁহার জন্মের শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদন করিবার জন্ত গত ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভায় সার গুরুদাসের জীবন-কথা আলোচিত হইয়াছে। সার গুরুদাসের আদর্শ দেশের লোকের সম্মুখে যাহাতে উপস্থিত করা যায়, সে জন্ত আগামী এক বৎসর কাল ধরিয়া সকলের সর্ব্বত্র চেষ্টা করা উচিত। এই এক বৎসর কাল যেন দেশবাসী সকলে, বিশেষ করিয়া স্কুল কলেজগুলিতে, তাঁহার কথা আলোচনা করেন।

কানপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে মঞ্চের উপর নেতৃবৃন্দ

জনসঙ্ঘের শিক্ষা প্রচার—

গত ১৭ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে দক্ষিণেশ্বরে (২৪ পরগণা) স্থানীয় জনসঙ্ঘ পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক

আচার্য্য বিজয়চন্দ্র মজুমদার (গত মাসে আমরা ইঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিয়াছি)

বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক উৎসব ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া জনশিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিবৃত করিয়া কি ভাবে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে, তাহা সকলকে জানাইয়া দেন ও জন সঙ্ঘের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

হাইকমিশনার ও মেদিনীপুর—

মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য প্রদানের জন্ত লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার স্যার মহম্মদ আজিজুল হক সাহেব এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহা বাঙ্গালার গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। স্যার আজিজুল বিলাতে থাকিয়াও যে দুঃস্থ দেশবাসীর কথা ভুলেন নাই, সে জন্ত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিবেন।

নূতন ডেপুটী মেয়র—

কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র মিঃ আদম ওসমান পরলোকগমন করায় গত ৬ই মাঘ বুধবার কর্পোরেশনের সভায় মিঃ হামিদুর রহমন ডেপুটী মেয়র পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি তরুণ বয়স্ক ও কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। তিনি গত সাধারণ নির্ব্বাচনে কর্পোরেশনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে তাঁহার এই সম্মানলাভে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ—

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হওয়ায় পাটের দাম খুব কমিয়া যায় ও তাহার ফলে কৃষকদের দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যে পরিমাণ জমীতে পাটের চাষ হইয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ জমীতে মাত্র পাট চাষ করিতে নির্দ্দেশ দেন। কাজেই সে বৎসর পাটের দর কমে নাই ও ফলে চাষীদের কম কষ্ট হইয়াছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কিন্তু পাটকলওয়ালাদের চাপে গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববৎসরের মত নির্দ্দেশ না দেওয়ায় বাঙ্গালা দেশে অধিক জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে—ফলে আবার চাষীদের কষ্ট বাড়িয়াছে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ হইতে ব্রহ্মদেশও শত্রু-কবলিত হওয়ায় ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল আমদানী হয় নাই—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে পাটের চাষ বৃদ্ধির ফলে বাঙ্গালা দেশে কম জমীতে ধানের চাষ হইয়াছে—কাজেই এখন দেশে চাউল শুধু দুর্ম্মূল্য নহে, দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যাহাতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের মত কম জমীতে পাটের চাষ হয়, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এত সত্বর যে গভর্ণমেণ্টের এইরূপ সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, ইহা অবশ্যই দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। পাটের চাষ কমাইয়া দিয়া কৃষকেরা সেই জমীতে ধানের চাষ করিলে যে অধিকতর লাভবান হইবেন, এ সময়ে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

১৫ই জানুয়ারী শত্রুর বিমান হানায় ক্ষতিগ্রস্ত চালাঘর ফটো : তারক দাস

বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি—

গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা প্রাসাদে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির এক সভায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে সভাপতি পদ শূন্য হইয়াছিল। উক্ত সমিতি নানাভাবে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে এ বিষয়ে সকলের সাহায্য করা উচিত। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই।

জয়পুর রাজ্যে অনশন—

জয়পুর গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া সেখানে পণ্ডিত রামচন্দ্র বীর নামক একজন হিন্দু সনাতনী অনশনব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। জয়পুর রাজ্যে উর্দ্দু ভাষা রাজভাষা করা হইতেছে, গোচর জমীর উপর রাজস্ব বসান হইতেছে, মন্দির ও রাজপথ বন্ধ করা হইতেছে—এই সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজারাও পূর্ব্বে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। পণ্ডিত রামচন্দ্র প্রতিবাদ স্বরূপ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণ বিয়োগও ঘটিতে পারে। কাজেই সকলে আশা করেন, জয়পুর গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করিয়া সমস্যার সমাধান করিবেন।

সভাপতি নির্ব্বাচন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের (নিম্নতর পরিষদ) সভাপতি সার মহম্মদ আজিজুল হক ভারতের হাই কমিশনার হইয়া বিলাতে আছেন।

১৫ই জানুয়ারী শত্রুর বিমান হানায় শস্যক্ষেত্রে গর্ত্ত ফটো : তারক দাস

কাজেই উক্ত সভারই এখন কোন পতি নাই। আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদের এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্ব্বাচন হইবে।

শ্রীযুক্ত মুকুল গুপ্ত—

শ্রীযুক্ত মুকুল গুপ্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিল্প (বাণিজ্য) বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত

পুস্তক বাজেয়াপ্ত—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী থাকার সময় বড়লাটকে ও গভর্ণরকে যে কয়খানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি একত্র করিয়া 'এ ফেজ অব্ দি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ঐ পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করিয়া উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

১৯শে জানুয়ারী শত্রুর বিমান হানায় ক্ষতিগ্রস্ত চালাঘর ফটো: তারক দাস

এবং খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী। দেশের ছোট ছোট কুটীর শিল্পগুলিও যাহাতে যুদ্ধের উপকরণ উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে, মুকুলবাবুকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহার দ্বারা দেশের লোক অবশ্যই উপকৃত হইবে।

মুক্তি ও গ্রেপ্তার—

কলিকাতার খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গুপ্তকে একবার ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিয়া পরে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হুগলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বঙ্গীয়

১৯শে জানুয়ারী বিমান হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসগৃহ ফটো: তারক দাস

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কেও একবার মুক্তি দান করার পর পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নূতন সদস্য—

ডাক্তার অনিলকুমার চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার বিনয়ভূষণ সিংহ ও ডাক্তার তারকনাথ ঘোষ সম্প্রতি নির্ব্বাচনে সাফল্যলাভ করিয়া 'বেঙ্গল কাউন্সিল অব্ মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশনের' সদস্য হইয়াছেন। তাঁহাদের দ্বারা দেশের চিকিৎসক সমাজের অসুবিধা দূর হইলেই তাঁহাদের এই নির্ব্বাচন-সাফল্য সার্থক হইবে।

নূতন অলডারম্যান—

কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্যতম অলডারম্যান মিঃ আদম ওস্মান পরলোকগমন করায় গত ২২শে জানুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় প্রসিদ্ধ দন্ত চিকিৎসক ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাক্তার আর আমেদ অলডারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার এই নির্ব্বাচনে জাতীয়তাবাদী মাত্রই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

গম সমস্যা—

ভারতে প্রচুর গম উৎপন্ন হইত না বলিয়া এতদিন অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানীর ব্যবস্থা ছিল। এ বৎসর জাহাজ না পাওয়ায় অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানী করা সম্ভব হয় নাই। সে জন্য ভারতের সর্ব্বত্র আটার দাম ৪গুণ ৬গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন, তাঁহারা ভারতের জন্য প্রচুর গম দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টকে তাহা লইয়া যাইবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুনা যাইতেছে, গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই ভারতের জন্য অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর গম আমদানী করিবেন। এখন লোককে সেই আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে। ভারতের যে সকল প্রদেশে গম উৎপন্ন

হয়, সেই সকল প্রদেশে উৎপাদনের পরিমাণ যাহাতে বাড়িয়া যায়, গভর্ণমেণ্টকে সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। বাঙ্গালা দেশেও কয়েকটি জেলার মাটী গম চাষের উপযোগী। ধান

১৯শে জানুয়ারী বিমান হানায় ক্ষতিগ্রস্ত খড়ের গাদা ফটো: তারক দাস

চাষের সঙ্গে সেই সকল স্থানেও যাহাতে গম চাষ হয়, আমাদের নিজেদের সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। 'অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের' প্রচার কার্য্যের ফলে বাঙ্গালায় অধিক খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু যদি আগামী বর্ষে সে ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে আমাদের খাদ্যাভাব আরও বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে।

স্কুল খোলার সমস্যা—

কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলির উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়-সমূহের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় সে সকল স্কুলের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে। এ অবস্থায় উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষককে বেতন প্রদান অধিকাংশ স্কুলেই সম্ভব হইতেছে না। সে জন্য গত ২৩শে জানুয়ারী কলিকাতায় হাই স্কুলের শিক্ষক-

১৯শে জানুয়ারী বিমান হানায় ক্ষতিগ্রস্ত টিনের ঘর ফটো: তারক দাস

সঙ্ঘের এক সভায় বলা হইয়াছে, এ অবস্থায় স্কুলগুলিকে গভর্ণমেণ্ট অর্থ দান না করিলে স্কুলগুলি আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যাইবে। বিশ্ববিদ্যালয়কেও এ বিষয়ে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলা হইয়াছে। এ দেশের শিক্ষকগণ এমনই চিরদিন দরিদ্র—বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের দারিদ্র্য যে বহুগুণ বাড়িয়াছে, তাহা আর বলার প্রয়োজন নাই।

কর্পোরেশন ও গভর্ণমেণ্ট—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শ্রমিক কমিশনারের নির্দ্দেশ মত কলিকাতা কর্পোরেশন তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে যে যুদ্ধকালীন ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনকে প্রথম দফায় ৪ লক্ষ টাকা ও দ্বিতীয় দফায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া ঐ টাকা কি ভাবে শোধ হইবে, সে বিষয়ে পরে নির্দ্দেশ দিবেন। সে যাহাই হউক, কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরা যে এই দুঃসময়ে ঐ অতিরিক্ত ভাতা পাইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে সুবিধার কথা।

শোক সংবাদ—

গত ২৬শে পৌষ সোমবার প্রাতে ৬৬ বৎসর বয়সে রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার ট্রেজারী অফিসারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সনের বর্দ্ধমানের প্রচণ্ড বন্যার সময় তিনি জনসাধারণের যে কল্যাণ সাধন করেন তাহা সকল রাজকর্ম্মচারীর আদর্শের বস্তু হইতে পারে। বর্দ্ধমান ও ২৪ পরগণার স্বায়ত্তশাসনের মূলে ছিলেন তিনি। বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ইতিহাসে জি, এস, হার্ট আই-সি-এস্-এর পরই তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পরদুঃখকাতরতা, সৌজন্য ও ভদ্রব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন।

রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আটক বন্দী ও ভাতা সমস্যা—

ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে যে সকল লোককে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন বন্দীকে বা তাঁহাদের পরিবারবর্গকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশেও বহু রাজনীতিক কর্ম্মীকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে; তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের পরিবারবর্গকে ভাতা দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বহু দুস্থ পরিবারের দুরবস্থা দূর হইবে।

জনরক্ষায় ছাত্র সম্প্রদায়—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা ইউনির্ভাসিটি ইনিষ্টিটিউটের উদ্যোগে একদল ছাত্রকে জনরক্ষা বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে কোন কাজ হয় নাই বা চেষ্টা করিয়াও কেহ কেহ নানা কারণে সফলকাম হইতে পারেন নাই। অথচ আজিকার এই দুর্দ্দিনে প্রত্যেকের দেশরক্ষার জন্ম প্রস্তুত হওয়া ও সে বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। ইনিষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া দেশের উপকারই করিয়াছেন।

কয়লা সমস্যা—

কলিকাতায় কয়লার দর হঠাৎ সাড়ে তিন টাকা, চার টাকা মণ হওয়ায় লোকের দুঃখ দুর্দ্দশার শেষ নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন কয়লা সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়া জানাইয়াছিলেন যাহাতে কলিকাতায় প্রতি মণ কয়লা পাইকারী ১৷৹ ও খুচরা ১৷৵ দরে বিক্রয় হয় সে জন্ম তাঁহারা ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তাহার পরও পক্ষকাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার লোককে তিন টাকা মণ দরেই কয়লা ক্রয় করিতে হইতেছে। কলিকাতা হইতে খনিঅঞ্চলগুলি একশত মাইলের মধ্যে; তথাপি আমাদের এই দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হইতে পারে? গভর্ণমেণ্ট বোধহয় এই সকল বিষয়ে শুধু নিরপেক্ষ নহেন, নিশ্চেষ্ট। কাজেই দুঃখীর দুঃখ আর কে বুঝিবে?

কলিকাতার উপর আকাশে যে ৬ খানি জাপানী বিমান নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদের ভগ্ন ও অর্দ্ধদগ্ধ অংশ (৩ খানি চিত্রে)

জাতীয় রক্ষা সমস্যা—

গত ২০শে জানুয়ারী ভারতীয় বণিক সমিতি-সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত গগাবিহারীলাল মেটা কলিকাতা বিরলা পার্কে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বলিয়াছেন—বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের সাধারণ অধিবাসীদিগের উপর দেশ-রক্ষার ভার কতকটা অর্পণ করা বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের উপর দায়িত্ব ও শক্তি প্রদত্ত হইলে তবেই তাহারা মন দিয়া কার্য্য করিবে। গভর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে দেশের সমূহ বিপদ হওয়া স্বাভাবিক। আমরাও এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মেটার সহিত একমত এবং আশাকরি, গভর্ণমেণ্ট এ সময়ে বিষয়টি সুবিবেচনা করিবেন।

তুরস্কের সাংবাদিকগণের অভিমত—

তুরস্ক হইতে আগত কয়েকজন সাংবাদিক বর্ত্তমানে ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। লাহোরে পাঞ্জাবের মুসলমান সাংবাদিকগণ প্রদত্ত এক সম্বর্দ্ধনা সভায় ঐ সাংবাদিক দলের নেতা মঁসিয়ে আতে জানাইয়াছেন—"আমরা প্রথমে তুরস্কবাসী, তাহার পর মুসলমান; কোনরূপ ইসলাম সঙ্ঘ গঠনের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই।" রাওলপিণ্ডিতে অপর এক সভায় তাঁহারা জানাইয়াছেন—"তুরস্কে ধর্ম্ম সাধনা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; তাহার সহিত দেশশাসন বা রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই।" অন্যত্র তাঁহারা বলিয়াছেন—"ভারতের হিন্দু মুসলমান বিরোধ সম্পর্কে তুরস্ক কিছুই করিবে না। কারণ, তুরস্কে এইরূপ কোন ঘরোয়া ব্যাপারে বাহিরের লোক হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহারা তাহা পছন্দ করিতেন না।" কয়েকটি কথা হইতেই তুরস্কের জনগণের মনোভাব স্পষ্ট বুঝা যায়। জাতীয়তাবাদের দ্বারাই যে জাতি বড় হইতে পারে, তাহা নবীন তুরস্কের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। যে সকল সাম্প্রদায়িকতাবাদী এ বিষয়ে এখনও ভুল ধারণা মনে পোষণ করিয়া থাকেন তুরস্কের সাংবাদিকগণের অভিমত তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিবে।

ভাগলপুর কলেজের বাংলা সাহিত্য সঙ্ঘ—

গত ১০ই জানুয়ারী ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের বাঙালী ছাত্রবৃন্দ তাহাদের বাংলা সাহিত্যসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মুঙ্গের কলেজের অধ্যক্ষ খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), গোপালচন্দ্র হালদার, অমূল্যকৃষ্ণ রায়, প্রেমসুন্দর বসু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীগণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অথবা বক্তৃতা দিয়া উক্ত অধিবেশনের গৌরব বৃদ্ধি করেন। ছাত্রগণ কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ এবং ক্ষুদ্র একটি অভিনয় করিয়া অধিবেশনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় এই সঙ্ঘের সঙ্ঘপতি। তাঁহারই উৎসাহে ও উপদেশে সঙ্ঘটি সাত বৎসর সুশৃঙ্খলার সহিত সাহিত্য সেবা করিতেছে। অধ্যাপক মহাশয় এইবার অবসর গ্রহণ করিলেন। আশা করা যায় আর একজন যোগ্য অধ্যাপক এইবার এই ছাত্র সমিতিটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া ইহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের বাংলা সাহিত্য সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে সমবেত সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ
মধ্যে উপবিষ্ট—(বামদিক হইতে) অধ্যক্ষ শ্রীহরলাল দাশগুপ্ত, শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়, ডক্টর কমলকৃষ্ণ বসু, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়,
সভাপতি শ্রীকালীপদ মিত্র, সঙ্ঘপতি শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, শ্রীগোপালচন্দ্র হালদার, অধ্যাপক
শ্রীব্রজবিহারী গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীগিরিধর চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক শ্রীঅমলকুমার সেন ফটো—এন্‌, এন্‌, সিন্‌হা

ঢাকায় আবার দাঙ্গা—

গত ৩১শে জানুয়ারী ঢাকা সহরে কার্জ্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সমিতির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এক সভায় পুনরায় ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামারূপ যে শোচনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার জাতীয়তাবাদী মাত্রই দুঃখিত হইবেন। সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাক্তার এম-হাসান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও একদল মুসলমান ছাত্র বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে আপত্তি করিয়া দাঙ্গা বাধাইয়াছিল ও পরদিন তাহা জঘন্য আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সেদিনও ঢাকার মুসলমান ছাত্রগণ যেভাবে ভাইস্ চ্যান্সেলারের সম্মুখে সম্মানিত অতিথি সার মির্জা ইস্মাইলকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে বিবেচক লোক মাত্রই ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে একত্র বাস করিতে হইবে; কাজেই শুধু শুধু বিবাদ করিলে শুধু একপক্ষ নহে, উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। একদল কুচক্রী লোক সর্ব্বদা বিবাদ বাধাইবার জন্য সচেষ্ট; উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা মিলিত হইয়া কি তাহাদের কার্য্যে বাধাদান করিতে পারেন না?

বৃটীশ শ্রমিক দল ও ভারত—

বৃটীশ শ্রমিক দলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্প্রতি বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টারে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হইয়াছে। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য এখনই বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট যাহাতে ভারতকে স্বাধীনতা দান করিয়া ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন, সে জন্য সকলকে চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে। বিলাতের একদল লোক চিরদিনই ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কেহ সে কথায় কর্ণপাত করেন না।

তুরস্কের সাংবাদিক দল—সঙ্গে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার, শ্রীযুত তুষারকান্তি ঘোষ প্রভৃতি

তুরস্কের সাংবাদিকদলের অভ্যর্থনা—

গত ১৯শে মাঘ প্রাতে তুরস্কের সাংবাদিক দল কলিকাতা ভ্রমণে আসেন। ঐদিন বেলা ৪ ঘটিকায় আশুতোষ কলেজ হলে "ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের" উদ্যোগে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের পক্ষে সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় তুরস্কের সাংবাদিকগণকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তুর্কী সাংবাদিক দলের পক্ষে মঃ বেলজি বলেন—"তুরস্ক হইতে এই বাণী লইয়াই আপনাদের দেশে আসিয়াছি যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কামালবাদকেই তুরস্ক সত্য এবং বড় বলিয়া জানে। বাস্তব এবং বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাকে রূপ দেওয়াই তুরস্কের সাধনা, আর কামালবাদের মূল ইহাই। এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়াই আমরা সাংবাদিকের কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই।"

সভায় কলিকাতার প্রায় সমস্ত সাংবাদিকই উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যায় বঙ্গীয় সংবাদপত্রগুলির পক্ষ হইতে সাউথ ক্লাবে তাঁহাদিগকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তুর্কী সাংবাদিকদলকে অভিনন্দিত করিয়া বলেন—'ভারতের সংবাদপত্রসমূহ কণ্টকাকীর্ণ পথে চালিত হয়। একদিকে যেমন নানাবিধ সরকারী বিধিনিষেধ, আদেশজারী এবং অর্ডিন্যান্স রহিয়াছে, অপর দিকে তেমনি রহিয়াছে—অশিক্ষিত বিপুল জনসঙ্ঘ। তথাপি, সংবাদপত্রসমূহ যে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে—ইহাই আশার কথা।" তুর্কী সাংবাদিক দলের একমাত্র ইংরাজীনবীশ প্রতিনিধি মঃ বেলজী ইংরাজীতে সম্বর্দ্ধনার উত্তর প্রদান করেন এবং বাংলার সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান।

মেদিনীপুরে সাহায্য দান—

মেদিনীপুর জেলার বাত্যাবিধ্বস্ত স্থানগুলিতে সাহায্য দানের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ টাকায় পথ সংস্কার ও নির্ম্মাণ, কৃষির জন্য বাঁধ প্রস্তুত, পুকুর খাল প্রভৃতি খনন ও সংস্কার, জলপথ সংস্কার প্রভৃতি কার্য্য করান হইবে। শ্রমিকদিগকে এমন পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে, যাহাতে তাহারা প্রত্যহ দেড় সের চাউল ক্রয় করিতে পারিবে। মধ্যবিত্ত বেকার লোকদিগকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে, লোক উপকৃত হইলেই ভাল।

লণ্ডনে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস—

গত ২৬শে জানুয়ারী লণ্ডনে স্বরাজ্য-হাউসে এক জনসভায় ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছে। ডাক্তার এস-বি-ওয়ার্ডেন সভাপতিত্ব করেন এবং ডাক্তার শশধর সিংহ সঙ্গীত ও স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাণী পাঠ করেন। কেম্ব্রিজ মজলিসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত শঙ্করপ্রসাদ মিত্র ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থা বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় ভারতীয় ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের মধ্যেও প্রবাসী ভারতীয়গণ ঐ দিনের কথা স্মরণ করিয়া ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার উগ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন।

চীনে ভারতীয় চিকিৎসকের মৃত্যু—

১৯৩৮ সালে কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের সদস্যরূপে যে ৫ জন ভারতীয় চীনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাক্তার ডি-এস-

কোটনীস ও ডাঃ বি-কে-বসু উত্তর সানসীতে অষ্টম রুট আর্ম্মীর সহিত বাস করিতেছিলেন। ডাঃ কাটনীস সম্প্রতি, তথায় মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন; তিনি চীন দেশেই বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক শিশুপুত্র বর্ত্তমান। ডাক্তার কোটনীস বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুরের অধিবাসী ছিলেন।

বিহারে প্রবাসীদের সুবিধা লাভ—

বিহার প্রদেশে বহু প্রবাসী বাঙ্গালীর বাস। ঐ সকল বাঙ্গালীদিগকে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বহু অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত 'ডোমিসাইল সমস্তা'র উদ্ভব হইয়াছিল। যাহাতে বিহার প্রদেশে অধিকার লইয়া বিহারীদের সহিত বাঙ্গালীদের বিরোধ না হয়, সে জন্ত পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও বিহার বাঙ্গালী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ ১৯৩৮ সাল হইতেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন; তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, ডোমিসাইল নিয়মাবলী ভারত শাসন আইনের বিরোধী এবং তাহার ফলে ভারতের জাতীয়তাবোধের অনিষ্ট সাধিত হইবে। ঐ সকল বিবেচনা করিয়া সম্প্রতি বিহার সরকার এক সার্কুলার প্রচার করিয়া ডোমিসাইল সমস্তার বিবেচনা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে এখন বিহারে বিহারী ও বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়কে কার্য্যতঃ এক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলে এখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইবে। আমরা বিহার সরকারের এই ব্যবস্থার সাধুবাদ করি।

বিপিনবিহারী দাস—

সৌখীন নাট্য সমাজের অতি পরিচিতি, ক্লাইভ ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বাগবাজারনিবাসী বিপিনবিহারী দাস মহাশয় গত ১৮ই মাঘ অপরাহ্ণে পরিণত বয়সে পরলোকগমন

৺বিপিনবিহারী দাস

করিয়াছেন। অতি সামান্ত অবস্থা হইতে অসামান্ত প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তির প্রভাবে ইনি সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় ও বহু ধনসম্পত্তির অধিকারী হন। বৃহত্তর বঙ্গের ছোট বড় বিভিন্ন নাট্য-সংস্থা এবং কলিকাতার নাট্যশালাসমূহে ইঁহার বিস্তৃত পোষাক-ব্যবসায় পরিচিতি লাভ করে। অভিনয় শিক্ষক ও স্বভাব অভিনেতারূপে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতিও ছিল। ইনি একাধিক হার্ডোয়ার ব্যবসায় এবং সহর ও সহরতলীর বহুসংখ্যক পুষ্করিণীতে মৎস্ত-চাষের বিরাট ব্যাপার সুশৃঙ্খলে পরিচালনা করিতেন। বর্দ্ধমান অঞ্চলের বিখ্যাত 'রাজবাঁধ' জলাশয়ে দক্ষতার সহিত মাছের চাষ করিয়া তিনি অনেকেরই চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যে চালানী মাছের ব্যাপার কলিকাতার বাজারকে সরগরম করিয়া রাখিয়াছে, প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তরুণ যৌবনে বিপিনবাবুই সর্ব্বপ্রথম হাতে-কলমে এই ব্যবসায়ে ব্রতী হন। বহু সদনুষ্ঠানেও ইনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং অন্তিমকালে যে সব নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে বাগবাজার গঙ্গাতীরে বাঁধাঘাট নির্ম্মাণ, কার্ম্মাইকেল মেডিকেল কলেজে 'বেডে'র ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নূতন সরবরাহ কণ্ট্রোলার—

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্ততম বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গ সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে সিভিলিয়ান মিঃ পিনেল ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি কলিকাতা ও সহরতলীর কারখানা অঞ্চলগুলিতে খাদ্য পরিবেশনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিঃ ডি-এল-মজুমদার, মিঃ বি-কে-আচার্য্য প্রভৃতি আরও কয়েকজন সিভিলিয়ানও ঐ বিভাগে কাজ করিতেছেন। কিন্তু আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই আছি। আটা, চিনি, কেরোসিন তৈল, চাল প্রভৃতি পাইবার জন্ত আমাদিগকে যথা-পূর্ব্ব ছুটাছুটি করিতে হইতেছে।

বৈমানিক প্রীং সম্মানিত—

গত ১৫ই জানুয়ারী রাত্রিতে সুপ্রসিদ্ধ বৃটীশ বৈমানিক ফ্লাইট-সার্জ্জেণ্ট প্রীং ৪ মিনিটের মধ্যে কলিকাতার নিকটে ৩ খানি শত্রু বিমান ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। তজ্জন্ত ভারতীয় বিমান বিভাগের প্রধান সেনাপতির নির্দ্দেশ মত সম্রাট প্রীংকে ডি-এফ-এম মেডেল দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। প্রীং-এর এই সম্মান-লাভে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

মন্ত্রীদের নূতন কার্য্যব্যবস্থা—

বাঙ্গালার গভর্ণর বাঙ্গালার দুইজন মন্ত্রীকে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন। (১) মাননীয় ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর—বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগ (২) মাননীয় খান বাহাদুর মৌলবী হাসেম আলি খান—কৃষি, সমবায় ঋণ ও গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থা।

চীনদেশে দুর্ভিক্ষ—

১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে চুংকিং হইতে চীনের বিকট দুর্ভিক্ষের কাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষুধার তাড়নায় এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কোন গাছে পাতা নাই, এমন কি গাছের ছাল ও শিকড় পর্য্যন্ত লোক খাইয়া ফেলিতেছে। অখাদ্য খাইয়া লোক পথেই মারা যাইতেছে। ছয়

মাসেরও অধিক কাল হোনান প্রদেশে এইরূপ অবস্থা চলিয়াছে। পথে তাহারা শিশুদিগকে, বিশেষ করিয়া কন্যাদিগকে বিক্রয় করিতেছে। এ বর্ণনা পাঠ করিতেও কষ্ট হয়। ওদিকে ফিলাডেলফিয়া হইতে বৃটেনের চীন-দূতের পত্নী মাডাম ওয়েলিংটন কু জানাইয়াছেন—চীনের অর্থনীতিক পতনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। জাতি এখন যুদ্ধ রত—তাহার এ দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর কই ? চীনের এই দুরাবস্থা দেখিয়া, আমরা ভারতবাসীরাও শঙ্কায় কম্পমান হইতেছি।

উন্নতিশীল ঔষধ প্রতিষ্ঠান—

বর্ত্তমানে যে কয়টি বিশিষ্ট ঔষধ-প্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি ও ব্যবসায়-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকে "বেঙ্গল ড্রাগ এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ লিমিটেড" তাহাদের অন্যতম। ১৯৩২ অব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৯৩৯ পর্য্যন্ত গতানুগতিকভাবেই চলিতেছিল। কিন্তু ১৯৪০ অব্দে শিক্ষিত তরুণ কর্ম্মী শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমার মিত্র বি-কম্ ডাইরেক্টররূপে প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া যে-ভাবে ইহাকে সর্ব্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠাপন্ন ও উন্নতিশীল করিয়া তুলিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। ইঁহার তত্ত্বাবধানে বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ঔষধগুলি সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি এবং ইহার উন্নতি কামনা করিতেছি।

শরৎচন্দ্র স্মৃতি সভা—

গত ১৬ই জানুয়ারী শনিবার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পঞ্চম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে তাঁহার পিতৃভূমি হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার স্মৃতি তর্পণ করা হইয়াছে। স্থানীয় শরৎচন্দ্র স্মৃতি সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে আয়োজন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের দান বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যে যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রতি দেশবাসীকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

গত ২৭শে জানুয়ারী কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্য সমিতি বাণীতীর্থের উদ্যোগে কলেজ হলেও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং ছাত্রগণ শরৎচন্দ্রের বিভিন্নমুখী প্রতিভার কথা আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী ও সুকবি শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

হিন্দুর স্বার্থরক্ষা—

কলিকাতায় যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে হিন্দু সৎকার সমিতি ও হিন্দু তীর্থযাত্রী রক্ষা সমিতি অন্যতম। গত ৩১শে জানুয়ারী কলিকাতা শম্ভু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে উভয় সমিতির বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু সৎকার সমিতি দুই হাজার টাকা ব্যয়ে নিমতলা ঘাটে সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন স্থির করিয়াছেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ বিদ যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তীর্থযাত্রী রক্ষা সমিতির সভায় সার হরিশঙ্কর পাল সভাপতি ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয় সমিতির কার্য্য দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে জানিয়া হিন্দু-মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী—

গত ১লা ফেব্রুয়ারী সোমবার কলিকাতা ১নং পার্ক ষ্ট্রীটে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক সভায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সোসাইটীর সভাপতি এবং অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডক্টর সি-এস-ফক্স, সার জন লর্ট উইলিয়ম্স, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা ও ডাক্তার সত্যচরণ লাহা সোসাইটীর সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটী এক সময়ে বাঙ্গালা দেশের সকল প্রকার গবেষণার প্রধান কেন্দ্র ছিল। নূতন পরিচালক-গণের উৎসাহে পুনরায় উহা সর্ব্বসাধারণের উপকারে লাগিবে বলিয়া আমরা আশাকরি।

ব্যায়ামবীর অমূল্য চক্রবর্ত্তী—

ফরিদপুর জেলার গয়ঘর গ্রামনিবাসী ব্যায়ামবীর অমূল্য চক্রবর্ত্তীর বর্ত্তমান বয়স ২২ বৎসর। ইনি নানারকম শারীরিক কৌশল প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইনি চলমান
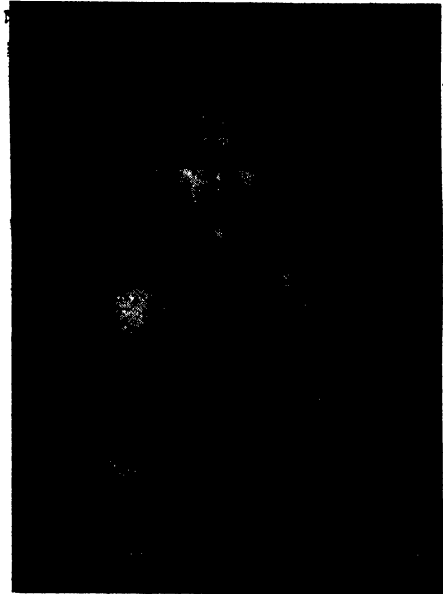
শ্রীঅমূল্য চক্রবর্ত্তী

মোটরের গতিরোধ ও দুই টন রোলার বক্ষে ধারণ করিতে পারেন। বর্ত্তমানে ইনি স্বগ্রামের হেমচন্দ্র ব্যায়ামাগারের অধ্যক্ষ।

পরলোকে শেঠ বংশীধর জালান—

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ বংশীধর জালান সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিকানীরের
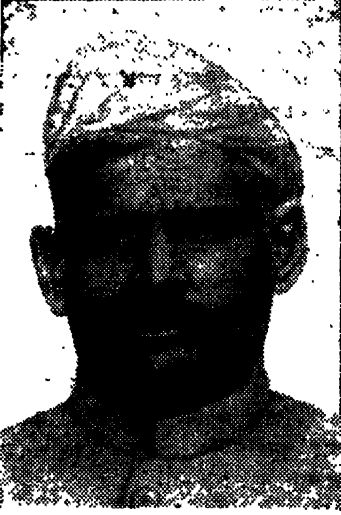
বংশীধর জালান

রতনগড় গ্রামে সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সে বিকানীর হইতে কলিকাতায় আসেন এবং তাঁহার এক আত্মীয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু এ চাকুরী তাঁহার ভাল না লাগায় তিনি ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। সামান্য পুঁজি লইয়া, অসামান্য অধ্যবসায় ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই ভারত ও ভারতের বাহিরে একজন কৃতী ব্যবসায়ীরূপে পরিগণিত হন। মেসার্স সুরজমল নাগরমল নামক বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাঁহারই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় প্রদীপ্ত। বাংলাদেশে চিনি শিল্পের উন্নতিকল্পে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চিনির কল স্থাপনা করেন। তিনি জুট মিল, জুট প্রেস, চিনির কল প্রভৃতি নানারূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গিয়াছেন। স্বর্গত শেঠ বংশীধর জালান ব্যবসায়ীগণের আদর্শস্থল। দীন দরিদ্রের প্রতি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। দেশের শিল্পোন্নতি, শিক্ষা, জনসাধারণের চিকিৎসা, দেবসেবা, ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত ছিলেন। মৃত্যুকালেও তিনি ৬ লক্ষ টাকা সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরের অধিবাসী হইলেও শেঠ বংশীধর জালান বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর অতি আপনার জন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রকৃত দানবীর ও আদর্শ ব্যবসায়ীর তিরোভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

গত ৩১শে জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্নে পানিহাটী (২৪পরগণা) গ্রামে ঐ গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-সভা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভাপতির অভিভাষণে হেমেন্দ্রবাবু বলেন—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতির নামের সহিত পূর্ণচন্দ্রের নামও ভারতের পুরাতত্ত্ব বিভাগের ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। পূর্ণচন্দ্রের চেষ্টায় বহু বৌদ্ধ ও জৈন তীর্থের উদ্ধার হইয়াছিল। তাঁহার গ্রামবাসীরা তাঁহার স্মৃতি রক্ষায় সচেষ্ট হইয়া প্রকৃত গুণীরই আদর করিতেছেন। কলিকাতার মত সহরেও পূর্ণচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সভায় অন্যান্য বহু বক্তাও বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

আশীর্বাদ

শ্রীমমতা ঘোষ

এই ধরণীর সাথে তোমার
এক বছরের জানাশোনা'
মাসের পরে মাস জুড়ে আজ
শেষ হয়েছে মাসটি গোণা।

একটি বছর পূর্ণ হ'ল
আজ ভাদরের সপ্তদশে,
জন্মদিনে বাছা তোমায়
কী দেব তাই ভাব্‌ছি ব'সে।

কী দেব তোর দুখান্ হাতে
ভেবে ভেবে ঠিক না পাই
সবার চেয়ে সেরা আশীষ
তোমারে আজ কয়্‌তে চাই।

সুপ্তি মাঝে সুষুপ্তিতে
স্বপ্নে আমার জাগরণে
দিনে রাতে একই কথা
তোমার তরে জাগছে মনে।

এই কথাটি জাগছে সদা—
মা বোল ব'লে আমায় ডাকো,
বেঁচে থাকো দুঃখে সুখে
বাছা আমার বেঁচে থাকো।

কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেস

গত জানুয়ারী মাসের ২রা, ৩রা ও ৪ঠা এই তিন দিন ভারতের বিজ্ঞান-সমাজের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৮ সালের পর কলিকাতায় এই প্রথম অধিবেশন; ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন এই বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় এই বৎসরের ত্রিংশ অধিবেশনকে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় গোলযোগ হেতু ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতে না পারায় মাত্র একমাসের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের আন্তরিক চেষ্টায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ২রা জানুয়ারী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান কলেজ ও পার্শ্ববর্ত্তী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে সম্মেলনের বিভিন্ন সভার আয়োজন হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসর সপ্তাহ-কালব্যাপী অধিবেশন হইয়া থাকে, এইবার মাত্র তিনদিনে সময় সংক্ষেপ করিয়া কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কার্য্য শেষ করা হইয়াছে। জাতির জীবনে যতই দুর্দ্দিন আসুক না কেন, সভ্যতা ও শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠানকে পঙ্গু করিয়া রাখিলে উন্নতির অন্তরায়ই হইবে। যেমন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা প্রয়োজন, সেইরূপ জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনাকেও পরিপুষ্ট করা প্রয়োজন। রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি গড়িয়া তুলিতে পারা যায় শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সত্বর গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয় না। এই বৎসরের অধিবেশনে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের চিন্তাধারা দেশের উন্নতির জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। গত বৎসরের সভাপতি শ্রীযুত ডি, এন, ওয়াদিয়া (বর্ত্তমানে সিংহল গভর্ণমেণ্টের ধাতু বিশেষজ্ঞ) নির্ব্বাচিত সভাপতির অনুপস্থিতে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। অতি ক্ষুদ্র অভিভাষণে তিনি ধাতুর বহুল ব্যবহার ও সব দেশের খনিজ পদার্থের একটি সমষ্টিগত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার কথা বলেন। খনিজ পদার্থের পরিমাণ নির্দ্ধারিত এবং তাহা সকলে বুঝিয়া খরচ না করিলে সভ্য জগতের সমূহ ক্ষতি হইবে। এ সমস্যার সমাধান কেবল আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের এপারে ওপারে হইবে না—সমগ্র বিশ্বে সমস্যাকে বিস্তৃত করিয়া বিচার করিতে হইবে।

সম্মেলন বারোটি শাখায় বিভক্ত করা হয়। অঙ্ক বিজ্ঞান শাখায় নাগপুর সায়েন্স কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ধর গত ত্রিশ বৎসরে যে গবেষণা হইয়াছে তাহার বিবরণ দেন। ক্রমশঃই অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌রা নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়া পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন; যে সব ব্যাপারে পরীক্ষামূলক গবেষণা অসম্ভব সেই সব ক্ষেত্রে অঙ্কের সাহায্যে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায় বাঙ্গালোরের নবীন যশস্বী অধ্যাপক ডাঃ ভাবা পরমাণু-গঠন-তত্ত্বের গবেষণার ধারা বিবৃত করিয়াছেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার এককালে পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। পরে পরীক্ষা যন্ত্র মার্জ্জিত হইবার ফলে পুরাতন কার্য্যকারণ তত্ত্বে অনেক ভুল বাহির হইতে আরম্ভ করিল। তাহার ফলে আইনষ্টাইন দ্রব্যের গুণাগুণের মানদণ্ডে সময়কেও এক মাপের মাত্রায় দাঁড় করাইলেন। ইহার ফলে দ্রব্যের গঠন-ব্যবস্থার সন্ধানে নানা প্রকারে নূতন নূতন অবস্থার সন্ধান পাওয়া গেল। সন্ধানের বর্ত্তমান কোঠায় পরমাণুর গঠনে বিদ্যুতের (electricity) কণার নানাবিধ বিকার দেখা যায়। পজিটিভ্ চার্জ্জ সমেত কণাও তাহার উল্টা নেগেটিভ্ চার্জ্জযুক্ত কণা ব্যতিরেকে বিদ্যুৎহীন কণাও লঘু-গুরু ভেদে ভিন্ন স্তরের তিন প্রকারের বৈদ্যুতিক কণার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। সবগুলিকেই সহজে চাক্ষুষ করা বর্ত্তমানে সম্ভব নয় কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানাদিক হইতে প্রমাণ আছে। রসায়ন-শাখার অভিভাষণ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ যোশী পাঠাইতে পারেন নাই। ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখায় সরকারী ভূতত্ত্ব-বিভাগের এবং বর্ত্তমানে অভ্র উৎপাদনের জন্য নিযুক্ত প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ডাঃ ভান ভারতের খনিজ পদার্থের সমাবেশ ও তাহার উৎপাদন সম্বন্ধে এক তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। আমাদের দেশের খনিজ পদার্থের সম্ভার বেশ ব্যাপক এবং এখনও অনেক খনিজ শিল্পের কাজ বাকী পড়িয়া আছে যাহাতে দেশের ধনী লোকের উৎসাহ প্রয়োজন। দেশের শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে স্বকীয়ভাবে মাল-মশলার জোগাড়ের উপর। উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান শাখায় শিবপুর বোটা-নিকাল গার্ডেনের প্রধান কর্ত্তা ডাঃ বিশ্বাস আমাদের এই বিস্তীর্ণ দেশের বিভিন্ন গাছ-পালার জীবন কথা সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন। কৃষির উন্নতি, জমির উন্নতি, বনের উন্নতি, বনজ বৃক্ষ হইতে শিল্পের জোগানদারী, প্রয়োজনীয় গাছের চাষ বাড়ান প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন। প্রাণীবিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব শাখায় সরকারী প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের (Zoological survey] ডাঃ চোপ্‌রা চিংড়ি মাছের জীবন-কথা ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এই মাছের ব্যবসা সংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার অভিভাষণে আলোচনা করেন। আমাদের দেশে মাছের প্রয়োজনীয়তা যে কত তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এযাবৎ বৈজ্ঞানিকের সাহচর্য্যে দরিদ্র মৎস্য ব্যবসায়ীদের জীবিকাকে সুদৃঢ় করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। ডাঃ চোপরার অভিভাষণে আমরা এই সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি কি ভাবে করিতে পারি তাহার ইঙ্গিত আছে। সপ্তম শাখায় নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখায় সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের (Achaeological survey) ডেপুটি ডিরেক্টার ডাঃ চক্রবর্ত্তী নূতন খনন-কার্য্যের ফলে ভারতের বিলুপ্ত ইতিহাসের যে সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা বিবৃত করেন এবং পরিশেষে তাম্রলিপি-শিলালিপি কিরূপে মানুষের পুরানো জীবনের তথ্য খচিত করিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের রীতিনীতির গবেষণায় সাহায্য করিতেছে তাহা বর্ণনা করেন। সরকারী জীব-স্বাস্থ্য গবেষণাগারের (Imperial Veterenary Research Institute) প্রধান কর্ত্তা ডাঃ মাইনেট চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখায় তাহার অভিভাষণে রোগ বিস্তারে ঋতু-ভেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন। উপরন্তু মানুষ ও জন্তুর মধ্যে অনেক রোগের বিনিময় এবং সদৃশ রোগ যে

অনেক বর্ত্তমান সেইজন্ত মানব-স্বাস্থ্য এবং জীবস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় গবেষণা পাশাপাশি আদান প্রদানের ভিতর দিয়া করিবার জন্ত নির্দ্দেশ দেন। শারীর বিজ্ঞান শাখায় পাটনা মেডিকেল কলেজের উক্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ নারায়ণ শারীর বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি বিষয়ে অভিভাষণে উল্লেখ করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে এই বিষয়ে গবেষণার জন্ত উন্নত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কৃষি-বিজ্ঞান শাখার ভূতপূর্ব্ব সরকারী কীটতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ রায় বাহাদুর রামচন্দ্র রাও বিশেষ করিয়া পঙ্গপালের ধ্বংসকারী আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের আশু প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। পঙ্গপালের শ্রেণীভাগ আছে এবং ইহারা নানা আচারী। অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের আগমন আগে জানা যাইতে পারে এবং তখন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্ভব। পঙ্গপাল সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ বিশেষ করিয়া আমাদের দেশের জন্ত এখনও অনেক দরকার এবং কেবলমাত্র এই বিষয়েই বৎসরের পর বৎসর কাজ করিবার লোক প্রয়োজন। মনঃ সমীক্ষণ ও শিক্ষা বিজ্ঞান শাখায় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আত্রেয় আমাদের কার্য্যকলাপে আত্মা ও অন্ত অদৃশ্য প্রেরণা সম্বন্ধে গবেষণার বিশদ বিবরণ দিয়া ভারতীয় ক্ষেত্রে অনুরূপ গবেষণার পরিপোষণ করিতে বলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে পূর্ত্তবিজ্ঞান ও ধাতুবিদ্যা এই সম্মেলনের কার্য্যে সংযুক্ত হইয়াছে। বোম্বাই মিউনিসিপালিটির ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মোদক তাঁহার মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় দাদর অঞ্চলে পরিশোধিত জল নিষ্কাসন ব্যবস্থার বহু তথ্যপূর্ণ এক বিবরণ দেন। এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে বিদেশী ব্যবস্থার অনেক বিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে এবং সেই সব তথ্য অন্যত্র কাজে লাগিবে সন্দেহ নাই। এই সকল অভিভাষণ ব্যতীত গবেষণামূলক প্রবন্ধও সম্মেলনে পাঠ করা হয়। শাখা অন্তর্গত কোন বিশেষ বিষয়ে গবেষণা ব্যতীত, বিভিন্ন শাখা এক হইয়াও অনেক আলোচনা হয়। এই বৎসর 'কয়লার সুব্যবহার', 'খাদ্য উৎপাদন সমস্যা', 'জমির সেচ ও জলের ব্যবস্থা' প্রভৃতি সময়োপযোগী বিষয়েও আলোচনা হইয়াছিল।

বাপিতটে

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম্-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল

কাজল দীঘির সজল সোপানে
নয়ন-ভুলানো বেশে,
'গাহন করিয়া সিক্ত-বসনা
দাঁড়ালে সমুখে এসে।
চূর্ণ-চিকুরে ঝরিছে শীকর,
পড়িয়াছে তাহে সূর্য্যের কর—
রঙিন্ তুলিকা বুলায়ে বুলায়ে আঁকিছে মুগ্ধ ছবি ;
'রক্ত-কমলে বিহরে ভ্রমর' আঁকে কি অস্ত রবি ?

লীলাভরে যবে ক্ষীণ বাহু হ'তে
ওগো পীন পয়োধরা,
খসিয়া পড়িল শিথিলাঞ্চল
নিখিল পড়িল ধরা।
লজ্জায় মুখ ঢাকিল সন্ধ্যা,
আঁধারে মলিন রজনীগন্ধা
ধরা পড়ে গেছি ভাবিয়া তপন
লুকাল আননখানি,
শিহরে ধরণী যবে দিলে অগ্নি
বক্ষের বাস টানি।

ওগো মায়াবিনী একি রহস্য
তোমার অক্ষিপুটে,
রূপলালসায় ভক্ত ভৃঙ্গ
চরণ-পদ্মে লুটে !
বক্ষে সুধার কুম্ভ তব্বি,
অধরে হাস্য নয়নে বহ্নি,
সিক্ত-বসনা, কি মোহিনী বেশে দাঁড়ায়েছ বাপিতটে,
ঢাকো অঞ্চলে চঞ্চলা তনু, কি জানি বিপদ ঘটে।

পারের যাত্রী

কবিকঙ্কণ শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

ধরার পথিক ! ডাক্‌ছে তোমায় তীর্থ-দেউলগুলি,
দূরের আকাশ নাম্‌ছে নয়ন পানে।
অসীমকালের বাজ্‌ছে যে-সুর তাহার মীড়ের টানে
—ধূসর বেলায় মৌন প্রাণের উঠ্‌ছে কুসুম দুলি' ;

বেড়ায় বাতাস, স্বর্গ-দূতীর পাখার আওয়াজ তা'তে
আপন কুলায় বস্‌ছে পারের পাখী,
স্বপ্ন তোমার ঘুমের মায়ায় মেঘের ছায়ায় থাকি'
কালের খেলায় অশ্রুহাসির মাল্য মনের গাঁথে।

আসছে এখন পারের ভেলায় পাল তুলে কোন্ মাঝি !
আনন্দগান বাজছে নদীর 'পরে ;
দিন যে ফুরায় আঁধার ঘনায় প্রাণ যে কেমন করে,
তীরের তরুর পায়ের তলায় পড়ছে জোয়ার নাচি'।
দূর-দেউলের স্বর্ণচূড়ায় জ্বলছে আলোক নব,
থাকুক্ তোমার দুঃখ সুখের ঝোলা,
প্রাণের মানুষ পালিয়েছে আজ, ঘরের দুয়ার খোলা,
সাঁঝের প্রদীপ জ্বালার সময় ভাঙলো প্রদীপ তব।

রইলো ধুলায় শেষ কড়িটা বইতে স্মৃতির ভার,
হাস্‌তে গিয়েই ফেলছ চোখের জল !
নিয়ত-চাকায় পিষ্ট জীবন-ভাগ্য কুসুমদল ?
দুর্য্যোগে যার যাত্রা প্রথম, দুঃখ কিসের তার !

আঘাত এবং অত্যাচারেই রইলে মনস্তাপে,
দ্বন্দ্ব দ্বিধায় সইলে বিপুল ব্যথা ;
চল্‌লে ধরার রাজপথে সব ছড়িয়ে আপন কথা,
ভ্রান্তি তোমার চুকিয়ে এবার শান্তি পরশ পাবে।

দুইটী মূর্ত্তির পরিচয়

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে কত মূর্ত্তি জনসাধারণের অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছে কে তাহার বিবরণ সংগ্রহ করে? গ্রামবাসীদের নিকট প্রতি গ্রামের বিবরণ ভিক্ষা করিয়াও কোনই সাড়া পাই নাই। বাঁকুড়া ও বিক্রমপুরে যে কয়েকটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, সেই মূর্ত্তিগুলি বাংলার বিভিন্ন মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সুপ্রাচীন রাঢ় হইতে অতি অল্প মূর্ত্তিই মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে একটী অনাদৃত সূর্য্য মূর্ত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

একটী মূর্ত্তি নিমাই তীর্থের ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে এবং জনৈকা নারী ইহার পূজা করে, যদিও এ পূজা তাঁহার পয়সা রোজগারের উপায় মাত্র। মূর্ত্তিটীর অবস্থান লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে এ মূর্ত্তিটী অন্য কোথাও হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় অতি প্রাচীন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আশানুরূপ উত্তর পাই নাই। তাঁহারা বলেন, শৈশব হইতে এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত হরিহর শেঠ মহাশয়ও তাঁহার রচিত "পুরাতনী"তে এই শিলা প্রতিমাটীর কথা কিছু বলেন নাই।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অতি প্রাচীন বৈদ্যবাটী গ্রাম অবস্থিত। বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার এলাকাভুক্ত মিউনিসিপ্যালিটী সহর বৈদ্যবাটী। কলিকাতা হইতে মাত্র ১৪ মাইল দূর। এই মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে ই, আই, আর্‌এর সেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটী—দুইটী ষ্টেসন অবস্থিত। নিমাই তীর্থের ঘাট হইতে তারকেশ্বর যাইবার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

মূর্ত্তি পরিচয়—এই প্রতিমাটী কৃষ্ণ প্রস্তরে খোদিত। মূর্ত্তিটী উচ্চতায় ২½ ফুট। পাদদেশে স্পষ্টভাবে সারথীসহ সপ্তাশ্ব খোদিত আছে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী নারী মূর্ত্তি (সম্ভবত) বিভিন্ন ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান এবং সূর্য্য মূর্ত্তির শীর্ষের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট কতকগুলি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। এই সূর্য্য মূর্ত্তি কতদিনের পুরাতন তাহা সঠিক বলা সম্ভব নয়। আনুমানিক চারিশত কি পাঁচশত বৎসরের পুরাতন।

*

সিঙ্গুর হইতে দুই মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে "পলতা গোড়" নামে একটী গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামের একটী প্রস্তর মূর্ত্তির সংবাদ বোড়াই গ্রাম নিবাসী শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় আমাকে দিয়াছিলেন।

এই মূর্ত্তিটী কাল পাথর হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট সপ্তসর্পফণা তলে ঋজু বাটে দাঁড়াইয়া আছে যে, সে কে—শেষ নাগ?—বাসুকী?—বিষ্ণু? পায়ের চিহ্ন কিছুই নাই। চারি হস্তের মধ্যে দুই হাতে সাপ ধরিয়াছে। অবশিষ্ট দুই হাতের মধ্যে এক হাত বক্ষে স্থাপন করিয়াছে এবং অপর হাতে একটী মানব শিশু। মূর্ত্তিটীর মুখের গঠন দর্শনীয়।

সিঙ্গুর শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। যে রাস্তা সিঙ্গুর, অপূর্ব্বপুর, বিরাম নগরের ভিতর দিয়া রামনগর, বোড়াই প্রভৃতি গ্রামের দিকে আসিয়াছে সে রাস্তার ধারে পুষ্করিণীর পার্শ্বে অশথ বেল ও মনসার গাছের তলায় এই প্রস্তর প্রতিমাটী স্থাপিত। একজন ভৈরবী প্রত্যহ পূজা করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটী জনৈক

বৈদ্যবাটীর সূর্য্য-মূর্ত্তি

শ্মশানচারী সন্ন্যাসী সিঙ্গুর শ্মশান হইতে কুড়াইয়া আনিয়া পলতাগোড় গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ব[illegible]গ প্রবাদ আছে। সিঙ্গুর অতি পুরাতন স্থান। সিংহপুর রাজ্যের রাজধানী সিংহপুর—আধুনিক সিঙ্গুর। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। মূর্ত্তি দুইটীর প্রতি বাংলার মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বৈদ্যবাটী মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ বিভাগের কর্ম্মীরা উক্ত দুইটী প্রস্তর মূর্ত্তির আলোক চিত্র লইয়া আসিয়াছে। মূর্ত্তি দুইটী যাহাতে মহামায়া সাহিত্য মন্দিরের সংগ্রহশালায় (Museum) স্থান পায় তাহার ব্যবস্থা হইতেছে।

ফাল্গুনী

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

সমুদ্রমন্থন স্বপ্নে শেষরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল',
জন্মাতুর আকাশেতে ফুটিল নূতন নীহারিকা,

সোনার চাঁদের চোখে দেখিলাম যে কলঙ্কলিখা,
—ভাবিতে অবাক মানি কে আমায় এ কথা শিখালো,
ক্ষীণ আবেষ্টনী মাঝে দেবতার চরণ প্রসাদ
আজন্মসঞ্চিত মোর ঘুচাবে সহস্র অবসাদ।

বন্ধু তুমি কাছে নাই, লিপিকায় পাঠাইনু কথা,
সার্থক জীবন স্রোত মৃত্যুস্রোতে এক হ'ল আজ,
পথে, মাঠে, সিনেমায় বিরাজিত প্রাকৃত সমাজ,
ফাগুন এসেছে তবু আসে নাই নূতন বারতা।

জানি তুমি আছ মোর, হে আমার একমাত্র আলো,
আঁধারে দেখিয়াছিনু শুধু তব তনুর ভঙিমা,
এবার বিদ্যুত-শিখা চোখে মোর প্রদীপ জ্বালালো,
তাই বুঝি রজনীর ক্লান্ত মুখে জাগে অরুণিমা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রণজি ক্রিকেট ঃ
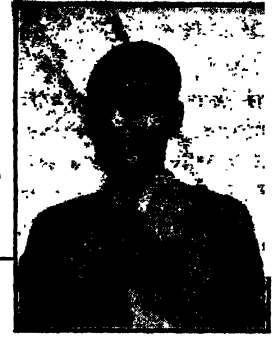
হায়দরাবাদ ঃ ২৬০ ও ১৫৩

মহীশূর ঃ ১৮৩ ও ৬৮

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনালে হায়দরাবাদ দল ১৬২ রানে মহীশূরদলকে পরাজিত করেছে।

হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংসে ভরতচাঁদের ৭৪ এবং মেটার ৪৮ রান উল্লেখযোগ্য ; বোলিংয়ে গুরুদাচারের ৬৯ রানে ৬টি উইকেট লাভ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রান এম হোসেন ২৩ ; বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন দারাশা ৪৪ রানে ৫টি, রমা রাও ২২ রানে ৩টি, গুরুদাচার ৫৩ রানে ২টি উইকেট নিয়ে।

মহীশূরের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান গুরুদাচারের ৫৬। গোলাম আমেদ ৪৪ রানে ৫টি উইকেট নিয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখান।

হোলকার ঃ ১০৯ ও ২৮২ (৩ উইকেট)

যুক্তপ্রদেশ ঃ ২১২ ও ১৭৮

পূর্ব্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে হোলকারদল ৭ উইকেটে যুক্তপ্রদেশদলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় হোলকার দলের যোগদান এ বৎসরই সর্ব্ব প্রথম। পূর্ব্বে এর নাম শুনা না গেলেও এই দলের অনেক খেলোয়াড়কে মধ্য ভারতদলের পক্ষে খেলতে দেখা গেছে। যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংসের ২১২ রানের বিরুদ্ধে হোলকার দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ১০৯ রানে। এর পর যুক্তপ্রদেশদল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৮ রান তুলে ২৮১ রানে অগ্রগামী থাকে। কিন্তু অগ্রগামী থেকেও শেষপর্য্যন্ত তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়। দর্শকেরা ভাবতে পারেনি যে, হোলকার দল খেলায় জয়লাভ করবে। হোলকার দলের খেলোয়াড়রা দৃঢ়তার সঙ্গে

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের বাৎসরিক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত সুখেন পাল কাঁধের উপর লোহার জয়েন্ট বাঁকাচ্ছেন। ইনি ১৯৪০ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে 'ব্লু' লাভ করেন, ইনি একজন ভাল হকি খেলোয়াড় এবং মুষ্টিযোদ্ধা।

মহীশূরের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৬৮ রানে শেষ হয়। মেটার ১৮ রানে ৬টি এবং ভূপৎ ১৮ রানে ৪টি উইকেট লাভ করেন।

খেলেছেন, দলের অধিনায়কের দৃঢ়তার কথাই সব থেকে উল্লেখযোগ্য।

হোলকার দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হয় নি। মাত্র ১ রানে প্রথম উইকেট খোওয়া যায়। কিন্তু হতাশ না হয়ে মুস্তাক আলী এবং ইয়াড়ে একসঙ্গে জুটী হ'য়ে খেলে যেতে লাগলেন। ৪৫ মিনিটের সময় মুস্তাক আলীর ৫০ রান পূর্ণ হ'ল। দলের ৭৫ রানের মাথায় ইয়াড়ে আউট হয়ে গেলে জাগদেল খেলায় যোগ দিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় হোলকার দলের রান উঠল ১৩১। মুস্তাক আলী নিজস্ব ১১৩ রান করে যখন আউট হ'লেন তখন দলের রান সংখ্যা উঠেছে ৩ উইকেটে ১৬৪। মুস্তাকের মত একজন শক্তিশালী ব্যাটসম্যান বিদায় হওয়ায় দর্শকেরা হোলকার দলের পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'লেন। কিন্তু জাগদেলের সঙ্গে সি কে নাইডু জুটী হ'য়ে দ্রুত রান তুলে যেতে লাগলেন, এতটুকু তাঁদের বিচলিত হ'তে দেখা গেল না। ৩ উইকেটে ২৮২ রান উঠলে হোলকার দল ৭ উইকেটে বিজয়ীর সম্মান লাভ করলে। দলের এই বিজয়লাভের জন্য তিনজনের ব্যক্তিগত দান উল্লেখযোগ্য, তাঁরা যথাক্রমে—মুস্তাক আলী, সি কে নাইডু এবং জাগদেল। এই তিনজন ক্রিকেট

বোলিং গ্রিপ—'অফ্ ব্রেক'

খেলোয়াড়ের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা দর্শক এবং খেলোয়াড়দের মুগ্ধ করেছিল। খেলার শেষপর্য্যন্ত জাগদেল ৭০ এবং সি কে নাইডু ৮১ রানে নট আউট থেকে যান।

ফলাফল :

যুক্তপ্রদেশের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান—কিয়ামৎ হোসেন ৬৭, খাজা ৪১; বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন সি কে নাইডু ৬৮ রানে ৪টি এবং জাগদেল ৪৭ রানে ৩টি উইকেট নিয়ে।

দ্বিতীয় ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান—ফানসালকার ৫০, হামিদ ৩৬; বোলিংয়ে উল্লেখযোগ্য—৬৫ রানে জাগদেলের ৭টি উইকেট পাওয়া।

হোলকারদলের প্রথম ইনিংসে উল্লেখযোগ্য রান ছিল—মুস্তাক আলীর নট্ আউট ৬৬ রান। আলেকজাণ্ডার ৫৫ রানে ৬টি এবং ১৫ রানে রামচন্দ্র ২টি উইকেট পান।

হোলকারদলের দ্বিতীয় ইনিংসে মুস্তাক আলীর ১১৩, জাগদেলের নট্ আউট ৭০ এবং সি কে নাইডুর নট্ আউট ৮১ রান উল্লেখযোগ্য।

বোলিং গ্রিপ—'গুগলি'

হোলকার দল পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে বাঙ্গলা দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। খেলাটি হচ্ছে ইন্দোরে।

বরোদা : ২৪৫ ও ১৩৫

পশ্চিম ভারত : ১৬৮ ও ২০৮

রণজি ট্রফির পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে বরোদা দল জয়ী হ রানে পশ্চিম ভারতরাজ্য ক্রিকেট এসোসিয়েশনদলকে পরাজিত করেছে। খেলাটিতে জয়লাভের জন্য উভয় দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল।

বরোদা দলের প্রথম ইনিংসে উল্লেখযোগ্য রান ছিল ভি এস হাজারীর ৭৩ এবং নিম্বলকারের ৭১ রান। বোলিংয়ে অদ্ভুত

বোলিং গ্রিপ—'আউট সুইঙ্গার'
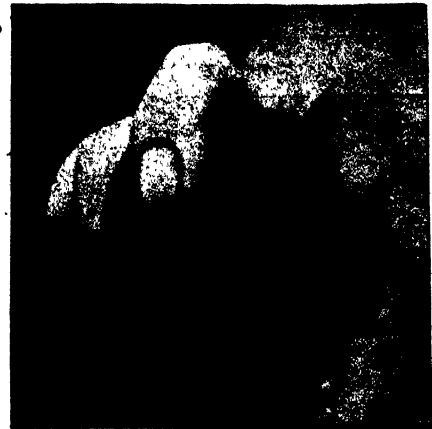
কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন নয়ালচাঁদ। তিনি ৩৫ ওভার বল দিয়ে ৬৩ রানে ১৩টা মেডেন এবং ৬টা উইকেট পান।

পশ্চিম ভারত রাজ্যের প্রথম ইনিংসে শান্তিলাল গান্ধির ৫২ রান উল্লেখ করা যায়। সি এস নাইডু ৩০ ওভার বল ক'রে ৮৫ রান দিয়ে ৬ মেডেন এবং ৫টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসেও হাজারীর ৪৩ রান দলের সর্ব্বোচ্চ ছিল। এবারও নয়ালচাঁদ মারাত্মক বল দিয়ে ৫৩ রানে ৫টা উইকেট পেলেন। চিপ্পা নিয়েছেন ৩টে উইকেটে ৫২ রানে।

পশ্চিম ভারতরাজ্যের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি। মাত্র ১৯ রানে ৪টা উইকেট পড়ে যায়।

টেনিস ঃ

ইন্দোরে অল ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতা যশোবন্ত ক্লাব টেনিস টুর্ণামেণ্টের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের ফাইনাল খেলা শেষ হয়েছে। ফলাফল নিম্নে দেওয়া হ'ল।

ইফতিকার আমেদ

পুরুষদের সিঙ্গলসে ঘস্ মহম্মদ ৬-২, ৭-৫, ৪-৬, ৬-৩ গেমে ইফতিকার আমেদকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস লীলা রাও ৬-০, ৬-১ গেমে মিস ডুবাসকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে জে কে কাপুর ও ক্যাপটেন ইন্দুলকার ২-৬, ৬-৪, ৬-১, ৪-৬, ৬-৪ গেমে ঘস্ মহম্মদ ও বরোদার মহারাজাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে মিস উডব্রীজ ও ইফতিকার ৭-৫, ৭-৫ গেমে ঘস্ মহম্মদ ও মিস ডুবাসকে পরাজিত করেন।
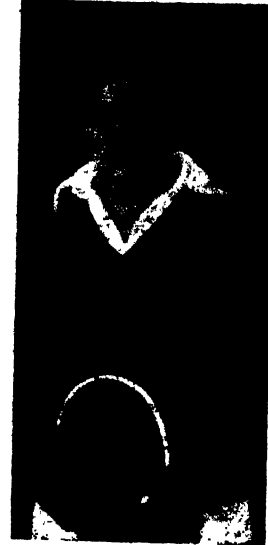
প্রবীণদের ডাবলস ফাইনালে রাও ও দাস ৭-৫, ৬-৩ গেমে সি কে নাইডু ও দেশাইকে পরাজিত করেন।

প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় যোগদান করেন। বাঙ্গলার দিলীপ বসু প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ইফতিকার আমেদের কাছে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হ'ন। সিঙ্গলস ফাইনালে ঘস্ নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ইফতিকার পরাজিত হ'লেও ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন; ফলে ৪টি গেমে খেলাটির মীমাংসা হয়। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালের ফলাফল কিন্তু দর্শকদের বিস্মিত করেছিল। ঘস্ তাঁর সহযোগী মহারাজার কাছ থেকে উপযুক্ত সহযোগিতা লাভ করতে না পারায় শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হ'ন।

টেবিল টেনিস ঃ

নিখিল ভারত টেবিল টেনিস এবং পঞ্চম বার্ষিক আন্তঃ-প্রাদেশিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খেলোয়াড়রা যোগদান করেন। বোম্বাই প্রদেশের খেলোয়াড়রা দু'টি প্রতিযোগিতাতেই বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। নিখিল ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের কে এইচ কাপাদিয়া পুরুষদের সিঙ্গলসে, ডাবলসে এবং মিক্সড ডাবলসে সাফল্যের পরিচয় দেন। আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা প্রদেশ মাত্র এক পয়েণ্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় বোম্বাই ৬, বাঙ্গলা ৫, পাঞ্জাব ৩, মাদ্রাজ ৩, মহীশূর ২, হায়দরাবাদ ১ ও দিল্লী ০ পয়েণ্ট লাভ করেছে।

নিখিল ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে কে এইচ, কাপাদিয়া (বোম্বাই) ২১-১৩, ২১-১৪, ২১-১৪ পয়েণ্টে ডি এইচ কাপাদিয়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডাবলসে কে এইচ কাপাদিয়া ও চন্দ্রানা (বোম্বাই) ২১-১৩, ১৪-২১, ২১-১১, ২১ ১৯ পয়েণ্টে শিবরাম ও নাইডুকে (মাদ্রাজ) পরাজিত করেছেন।

মিক্সড ডাবলসে কে এইচ কাপাদিয়া ও মিস্ এক ম্যাডান (বোম্বাই) ১৭-২১, ২১-১৮, ২১-১৩, ২১-১৯ পয়েণ্টে চন্দ্রানা ও মিস্ কুদেবকে হারিয়ে দেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিস্ কুদেব (বোম্বাই) ২১-১৯, ২১-১৮, ২১-২৩, ২৪-২৬, ২১-১১ পয়েণ্টে মিস্ ব্রোডিকে (বোম্বাই) পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের ডাবলসে মিস্ ব্রোডি ও মিস্ ম্যাডন (বোম্বাই) ২১-১৩, ২১-১৩, ২১-১৭ পয়েণ্টে মিসেস প্রতাপ সিং ও মিসেস্ ইন্দ্রওয়াদকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "জীবনের মূল্য"—১৸০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "মোহন ও জল্লাদ"—২৲
শ্রীশক্তিচৈতন্য ব্রহ্মচারী অনূদিত "শ্রীশ্রীগুরুগীতা"—।০
শ্রীঅজয়েন্দুনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "মেঘ ও জ্যোৎস্না"—১৷৷০
শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে প্রণীত "যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনতৃপ্তি"—২৷৷০
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "এপার ও ওপার"—৷৷০
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর প্রণীত যুদ্ধ-উপন্যাস "বোমা ও ব্যারিকেড"—১।০
শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিনয় সরকারের বৈঠকে"—৩৲
শ্রীশীতলবর্দ্ধন প্রণীত কবিতা পুস্তক "ওমর খাইয়ামের মজলিস"—১৲
শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত স্বরলিপি গ্রন্থ "রাগ সঙ্গীত"—১৷৷০
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা প্রণীত কবিতা পুস্তক "সাগরিকা"—২৲
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মাইতি প্রণীত ছোটদের নাটিকা "ভারতবীর"—।৵০
শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত "সংঘজীবন"—১।০
শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত উপন্যাস "চলার পথে"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি মিত্র মায়াপুরী ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
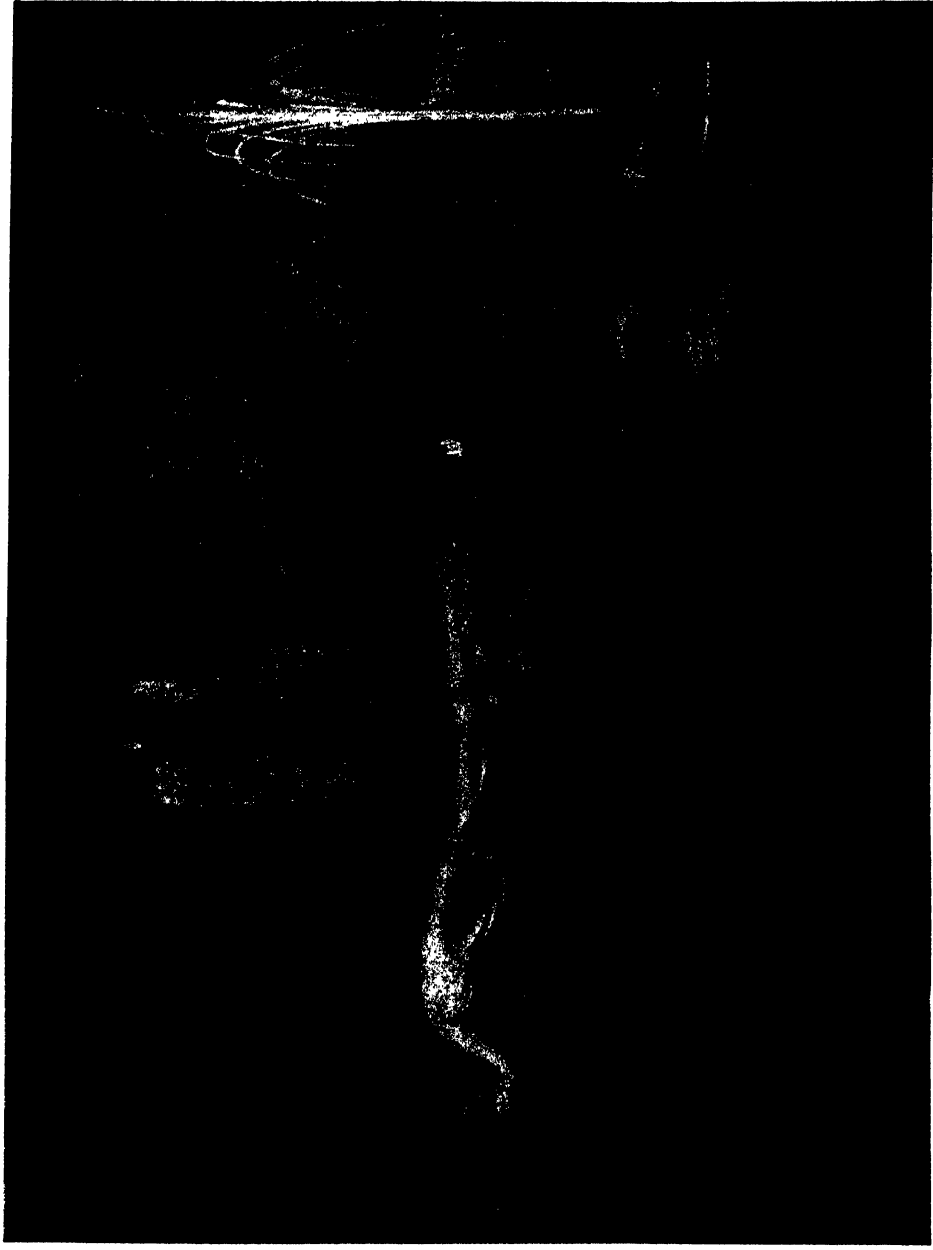
চৈত্র—১৩৪৯

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

লৌহ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

ভারতের আকরিক প্রস্তর

আজ যাহা সভ্যজগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে, যাহা কোনও না কোনও প্রকারে ব্যবহার না করিলে আজ জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে অচল, তাহা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ফেলিলে নিতান্ত পুরাতন জিনিষ বলিয়া মনে হইবে না। লৌহ ব্যবহারের সুসংবদ্ধ কাল নির্দ্দেশ করিতে গেলে ছয় হাজার বৎসরের পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিতে হয়। সুতরাং আকরিক প্রস্তর হইতে লৌহ উদ্ধারের জ্ঞান মানবজাতি তাহার কিছু পূর্ব্বে আয়ত্ত করিয়া থাকিবে। মোট সাত বা আট হাজার বৎসরের অধিক নয়; কিন্তু আমাদের পৃথিবীর জন্মের ইতিহাসের তুলনায় ইহা মাত্র কয়েকটা বৎসর।

ব্যবহার হিসাবে লৌহ তাম্রের অনুজ। কত (শত) বৎসর তাম্র ব্যবহার হইবার পরে লৌহ মানবজাতির কাজে আসিয়াছে তাহা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের জ্ঞানরাজ্যের সীমার বাহিরে। পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র বা তৈজসাদি মৃত্তিকার নানাস্তরে অবস্থান হইতে এই সকল কাল নির্ণীত হইয়াছে; আর সেই তথ্যানুসন্ধানের ফলস্বরূপ তাম্র, এমন কি ব্রঞ্জ যুগের পরে লৌহযুগ স্থাপিত হইয়াছে। বয়সের স্বল্পতাহেতু লৌহ তাম্র অপেক্ষা শক্তিমান্ এবং তাহারই ফলে ন্যায্য অধিকার হইতে জ্যেষ্ঠকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বঞ্চিত করিলেও তাহাকে একেবারে বিতাড়িত করিতে যে পারে নাই, বরং ক্রমে বজ্র বা বৈদ্যুতিক শক্তির সহিত মিতালী করিয়া নূতন ক্ষেত্রে বয়োবৃদ্ধ তাম্র স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে উঠিয়া গিয়া লৌহ নিষ্কাসন প্রভৃতি কার্য্যে বিদ্যুতের সাহায্য নিয়া অনুজের প্রতি পুরাতন অনুরক্তি প্রকট করিতেছে।

অনেক পণ্ডিত আবার ভিন্নমত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকিলে ব্রঞ্জের ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিত না। ব্রঞ্জ মিশ্রিত ধাতু, কিন্তু মাক্ষিকে যথোপযুক্ত তাপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই লৌহ উদ্ধার করা সম্ভব।(১) সুতরাং দুই বা ততোধিক ধাতুর উদ্ধার ও মিশ্রণের জ্ঞান অপেক্ষা একটা ধাতু উদ্ধারের জ্ঞানলাভ করা যে সহজ তাহা অনুমান করা কষ্টকর নহে।

ভারতবর্ষে লৌহের ব্যবহার তাম্রের বহু পূর্ব্ব হইতে যে প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত বিশেষ জোর করিয়া

(1) "Metallurgy of Iron and Steel" by Dr. John Percy and "The Pre-historic Use of Iron and Steel" by Mr. St. John V. Day.

বলিয়া থাকেন।(২) আর্য্য অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই লৌহের ব্যবহার ভারতে প্রবেশ লাভ করে। তাঁহারা যে লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ লৌহ

আমরা সাধারণতঃ যে আকারে লৌহ দেখিতে পাই, প্রকৃতির রাজ্যে সেরূপ কোথাও পাওয়া যায় না; প্রস্তর হইতে লৌহ উদ্ধার করিতে হয়।

মাত্র উল্কাপিণ্ডে বিশুদ্ধ লৌহ দেখা গিয়াছে, অবশ্য তাহার সহিত অন্যান্য ধাতুরও সংমিশ্রণ থাকে। (৩) ব্রেজিল, গ্রীণ-ল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের পিণ্ড দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে গ্রীণল্যাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানাভাবে নানা স্থানে লৌহ আত্মগোপন করিয়া আছে। পৃথিবীর প্রত্যেক উনিশ ভাগ মাটীতে এক ভাগ লৌহ মিশ্রিত রহিয়াছে। প্রস্রবণ ও গভীর নলকূপের জলে, বৃক্ষ লতাদিতে এবং নরশোণিতে সামান্য পরিমাণে লৌহ বর্ত্তমান।

মৃত্তিকার উনিশ ভাগের এক ভাগ লৌহ বলিয়া সকল স্থানের মৃত্তিকা ঘাঁটিয়া এই অনুপাতে লৌহ উদ্ধার করা যায় না। পৃথিবীর স্থানে স্থানে এমন প্রস্তরাদি পাওয়া যায়, যাহার মধ্য হইতে লৌহ উদ্ধার করা সম্ভব। পৃথিবীর যে যে অংশে এই প্রকার "প্রস্তর" পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে উহা গলাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লৌহ-প্রস্তর

লৌহমিশ্রিত সকল প্রকার "প্রস্তর" হইতে বৈজ্ঞানিকগণ লৌহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে না। ভূতত্ত্ববিদের মতে যাহাতে লৌহের ভাগ অধিক, তাহাই ব্যবহারযোগ্য। বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় ইহারা অক্সাইড (oxide) এবং কার্ব্বনেট (carbonate) বলিয়া পরিচিত।(৪)

অক্সাইড প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত :—(১) ম্যাগনেটাইট বা magnetic iron ore (চুম্বক প্রস্তর); (২) হেমাটাইট red or yellow ochre (রক্ত বা হরিদ্রাবর্ণ প্রস্তর) ও (৩) লাইমোনাইট বা brown hæmatite.

সিডারাইট

কার্ব্বনেটের মধ্যে সিডারাইট (siderite) প্রধান। লৌহ নিষ্কাসনের ব্যাপারে সিডারাইটের স্থান খুই নিম্নে; শতকরা ৪৮ ভাগ লৌহ থাকিলে ভাল সিডারাইট বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সাধারণতঃ কয়লা স্তরের সহিত সিডারাইট পাওয়া যায় বলিয়া ইহার প্রধান সুবিধা।

ম্যাগনেটাইট

ম্যাগনেটাইট (magnetite) প্রস্তরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থাৎ শতকরা ৭২ বা ততোধিক ভাগ লৌহ থাকে। চুম্বক গুণবিশিষ্ট বলিয়া ইহা এককালে নাবিকদিগের সমুদ্রযাত্রায় দিগ্‌-নির্ণয়ের সহায়তা করিত। সেই কারণে ইহা "leading stone" আখ্যালাভ করিয়া উত্তরকালে "lodestone" নামে পরিচিতি বা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটী স্থানে ম্যাগনেটাইটের অবস্থান জানিতে পারা গিয়াছে। তন্মধ্যে সুইডেনের ড্যানেমোরা (Dannemora) খনি বিখ্যাত। গত পাঁচ শত বৎসর এই খনি হইতে ম্যাগনেটাইট উৎখাত হইতেছে। রুশের উরল (Urals) পর্ব্বত, আমেরিকার ভার্জ্জিনিয়া, পেনসিলভ্যানিয়া ও নিউ জার্সি প্রদেশ, কানাডা ও জাপানের স্থানে স্থানে ম্যাগনেটাইট পাওয়া যায়। রুশের কোলা উপদ্বীপ ও উক্রেন অঞ্চলের মাক্ষিক বিশেষ প্রসিদ্ধ।

লৌহপ্রাপ্তি ব্যাপারে হেমাটাইট (haematite) প্রধান। ইহাতে বেশী পক্ষে শতকরা ৭০ ভাগ লৌহ থাকে। বৃক্কের

হেমাটাইট

আকারে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে বৃক্ক (Kidney ore) মাক্ষিকও বলা হয়। ইস্পাত প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে হেমাটাইট সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ম্যাগনেটাইট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং পৃথিবীর নানাস্থানে পাওয়া যায় বলিয়া হেমাটাইটের ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত।

ভারতে লৌহ-প্রস্তরের অবস্থান

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই লৌহ প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। (৫) কিন্তু সকল স্থানের 'প্রস্তর' আধুনিক লৌহ কারখানার

---

(2) "Such a division (into stone, bronze and iron ages) might be tenable in the case of European countries but hardly applicable in the case of India which was colonised by the Aryans possessing a very high order of civilization at a very early age."—Roscoe & Schorlemmer in 'Treatise of Chemistry.'

(3) "Such iron as may be said to occur in a nearly pure or native state is found in meteorites or meteoric stones but always allied with varying percentages of nickel, with traces of cobalt, manganese, tin, copper, chromium etc."—H. J. Skelton.

"Isollated masses of iron have been found in Brazil, Greenland, Australia and other localities, some of them being of meteoric origin others derived probably from basalts. At Disco Island, West Greenland, the blocks weight upwards of 20 tons, while a mass from Cape York, North Greenland, was estimated to weigh about 100 tons".—J. Henry Vanstone, 'The Raw Materials of Commerce', Vol II. p. 700

(4) "Iron ores properly so called always contain the metal in an axidised state, whereas ironstones are carbonates or protoxide of iron."—H. J. Skelton.

(5) "They (iron deposits) are to be found in every part of the country, from the northern mountains of Assam and Kumaun to the extreme south of Madras. Whenever there are hills, iron is found and worked to a greater or

ব্যবহারের উপযোগী নহে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে বহু স্থানের 'প্রস্তর' আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রাপ্ত 'প্রস্তর' অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ; এখন পর্য্যন্ত যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমেরিকার মোট আনুমানিক প্রস্তরের পরিমাণ অপেক্ষা ইহা কিছু কম হইতে পারে মাত্র।

ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে লৌহ-প্রস্তর দেখা গিয়াছে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। আজ যে স্থানের প্রস্তরের পরিমাণ জানা নাই, হয়ত কোনও দিন কোনও ভূতত্ত্ব-দর্শীর জ্ঞানের প্রভাবে সেই স্থানে নূতন সন্ধান মিলিতে পারে। লৌহ ও অন্যান্য ধাতু সম্বন্ধে ভারতবাসীর অতীত কৃতিত্ব সাধারণের মনে ভারতে প্রচুর ধাতু-প্রস্তরের অবস্থান সম্বন্ধে যে ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া ভারতের ভূতত্ত্ব বিভাগ মনে করিতেন। তাঁহাদের মতে যখনই ভারতে নূতন লৌহ খনি আবিষ্কারের কথা উঠে তখনই একবার তাহা সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত। (৬) কিন্তু তাহাদের এই মতামত ক্রমে ভুল বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই লৌহ-প্রস্তরের ক্ষুদ্র বৃহৎ ভাণ্ডার রহিয়াছে। পরিমাণ ও গুণ হিসাবে সকল স্থানের মাক্ষিক হইতে লৌহ নিষ্কাসন লাভজনক নয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিহার, উড়িষ্যা ও মহীশূর বর্ত্তমানে ভারতের সমস্ত কারখানার মাক্ষিক সরবরাহ করিতেছে। প্রদেশ হিসাবে স্বতন্ত্র ভাবে পরিচয় দিলে পাঠকের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া বাঙ্গলা বর্ণানুক্রমিক ধারায় আলোচনা করা হইল।

আসাম

আসামে এক কালে লৌহ শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাদ বা ময়লা (slag) স্তূপ দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে যে আসামে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিত। (৭)

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কুমাওন১, কালাডুঙ্গি২, ডেচাউরি৩, পেশোয়ারের বাজাওর, বান্নু জেলা৫, রামগড়৫ প্রভৃতি স্থান ভূতত্ত্ববিদগণের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। বান্নু জেলার প্রাচুর্য্য এবং পেশোয়ারের৬ প্রস্তরের বিশেষত্ব সম্বন্ধে সকলেই একমত। (৮)

উড়িষ্যা

ভারত সরকারের ইষ্টর্ণ ষ্টেট্‌স্ এজেন্সীর অন্তর্গত কতকগুলি স্থানে প্রচুর মাক্ষিকের অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। চব্বিশ-পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা গ্রামের প্রথিতযশাঃ ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু (৯) মহাশয় ১৮৮৭ সালে মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ (রায়পুর) অঞ্চল ও ১৯০৪ সালে ময়ূরভঞ্জের কয়েকটী স্থানে প্রচুর মাক্ষিকের কথা ভূতত্ত্বানুসন্ধান বিভাগের পত্রিকাতে (Records of the

---

less extent. The indigenous methods of smelting the ore, handed down unchanged through countless generations, yield a metal of the finest quality in a form well suited to native wants." W. W. Hunter, C.S.I., C.I.E., L.L.D Imperial Gazetteer of India (1886) Vol VI, p. 618.

(6) "In ancient times the people of India seem to have acquired a fame for metallurgical skill and the reputation of the famous woot steel which was certainly made in India long before the Christian era, has probably contributed to the general impression that the country is rich in iron-ore of a high class type......It is true that throughout the peninsula which is so largely occupied by ancient crystalline rocks, quartz hæmatite and quartz magnetite schists are very common in the Dharwarian system, the system of rocks that lithologically as well as in stratigraphical relationship, corresponds approximately to the lower Huronian of America. But most of these occurences consist of quartz and iron-ore so intimately blended that only a high siliceous ore of a low grade can be obtained without artificial concentration. These occurences of quartz-iron ore schist are so common in India that newly recorded instances are generally passed over as matters of little immediate economic interest."—Rec. Geo. Sur. India. Vol XXXIX (1904-8) p. 99.

(7) The hills of Assam abound in mineral resources, including coal, iron and limestone." (p 347) and ' Iron occurs along the whole line of the hill tracts." (p. 348) —Imperial Gazetteer of India (1886)—W. W Hunter.

(8) 1 "Existence of valuable iron ores in Kumaon was first brought to notice by Col. Drummond in the year 1850."—Ball—Econ Geo. of India Pt. III p. 406

2 "As to its (ores) abundance there can be no doubt, but the quality is variable"—Ibid p. 409.

3 "The ore in the neighbourhood is of better quality but not so extensive as that at Kala Dhungi ; still there is an abundant supply."—Ibid p. 409

4 "Ores are said to be found in abundance in the hills South East of Bannu"—Ibid p. 404.

5 "The ore is micaceous hæmatite which occurs in beds in association with schists. It is rich and abundant and might easily be worked."—Ibid p. 409.

6 "The iron ore of Bajaur has long been famous" —Ibid p. 404.

(9) In the story of the industrial development of India, Mr. (P. N.) Bose is assured of permanent mention. His enquiries were prelude to the discoveries of Mr. Weld (Tatas Geologist) in the Drug area, and he now pointed the way to still more promising results. His work is one more refutation of the current criticism of Bengalis on the supposed ground that they are not practical men."—Mr. Lovat Fraser in 'Iron and Steel in India p 42.

Records of the Geo. Sur. of India vol XX (1887) p. 167

Do. Vol XXXI p. 168

Geological Survey of India) লিখিয়াছিলেন। তাহা তখনকার বিদেশী ভূতত্ত্ববিদগণের মতের বিরুদ্ধেই বলা হইয়াছে। কালক্রমে বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিদের কথাই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া ভারতের সর্ব্বপ্রধান লৌহশিল্পের কারখানা স্থাপন সম্ভব করিয়াছে। তাঁহার মতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের—

(১) বামনঘাটি মহকুমায়

(ক) গরুমইশানী পর্ব্বত,(১০) আট বর্গমাইলের অধিক স্থানে

(খ) সারন্দাপীরে বন্দগাঁর নিকট

(গ) কোন্দাদেরা হইতে জয়ধনপোষী দ্বাদশ মাইলব্যাপী সুলাইপেত-বাদামপাহাড় পর্ব্বতমালা

(২) পাঁচপীর মহকুমায়

কামদাবেদী ও কান্তিকূয়া হইতে ঠাকুরমুণ্ডা পর্য্যন্ত পঁচিশ মাইল স্থানে

(৩) ময়ূরভঞ্জ (খাস)-এ

সিমলি পাহাড় শ্রেণী ও পূর্ব্বসানুদেশে (গুড়গুড়িয়া, কেণ্ডুয়া ও বালদিয়ায়)

বহু প্রস্তর আছে। বলা বাহুল্য জামসেদজী টাটা এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার নূতন কারখানা অন্য কোনও স্থানে স্থাপিত না করিয়া ইহারই সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ নির্ব্বাচিত করেন।

গরু-মইশানী, সুলাইপেত (ওকামপদ) ও বাদাম পাহাড় জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পরে কেঁওঝর (১১) ও বোনাই আসিয়া উদয় হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত কয় স্থানের যশ হরণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ Eastern States Agencyর বাঙ্গালা শাখা (Bengal States Agency)র অন্তর্গত এবং ইহার রেসিডেণ্টের অফিস কলিকাতায় অবস্থিত।

উড়িষ্যা শাখার (Orissa States Agency) কতকগুলি স্থানে প্রচুর মাক্ষিক পাওয়া যাইতেছে; তন্মধ্যে বামড়া, ঢেনকানল, ময়ুরাখোল ও তালচের বা তালচির প্রধান। ভূতত্ত্ববিদগণের বিশদ অনুসন্ধানের ফলে অপরাপর রাজ্য (States) গুলিতে ক্রমেই মাক্ষিকের পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। অঙ্গুল ও বালেশ্বরে বিশেষ গুণ সম্পন্ন প্রস্তর আছে বলিয়া জানা আছে এবং ঐ সকল স্থানের পুরাতন লৌহশিল্পের চিহ্নগুলি এই ধারণা দৃঢ় করিতে সহায়তা করে। (১২)

বাঙ্গলা

বাঙ্গলার মধ্যে বীরভূম এক হিসাবে প্রধান; কারণ এখানে যে কেবল পুরাতন "লোহার" বা লৌহ নিষ্কাসকদিগের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে, ভারতবর্ষের মধ্যে বীরভূমে আধুনিক প্রথায় কারখানা স্থাপনের প্রথম চেষ্টা হয়; লৌহ শিল্প অধ্যায়ে এ বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া আছে।

বীরভূম ছাড়া রাণীগঞ্জ ও বরাকরে মাক্ষিক আছে। বীরভূমে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে বরাকরে বাঙ্গলার প্রথম কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল।

বিহার

ধাতুপ্রস্তর সমৃদ্ধিতে বর্ত্তমানে বিহার ভারতবর্ষে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সিংহভূমকে "Ontario of India বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হয়ত খনিজবৈচিত্র্যে সিংহভূম কানাডার অণ্টারিও অপেক্ষা সমৃদ্ধ। সিংহভূমের মধ্যে কহ্লান সরকারী জমিদারী বা সম্পত্তি (Kalhan Government Estate) মাক্ষিক সমৃদ্ধিতে সর্ব্বপ্রধান।(১৩) তাহা ছাড়া পালামৌ(১৪) এবং মানভূম ও হাজারিবাগে মাক্ষিকের (১৫) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং পালামৌ অঞ্চল মাক্ষিক উৎখাতনের কাজ চলিতেছে। ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের ভীমবন্দ স্থানেও যথেষ্ট মাক্ষিক রহিয়াছে। ক্রমশঃ

---

(10) "In the lofty Gurumaishini Hill, which rises to a height of 3,000 ft. they (Tatas' geologists Messrs. Perin & Weld) found enormous deposits of iron ore nearly as extensive as those at Dhalli and Rajhara (Lohara ?) in (in C.P.) not so compact and not so rich but more favourably situated. They further found hundreds of acres of rich "ore float"—ore lying loose on the surface, which required no mining and simply had to be picked up by unskilled labour. The explorers were in the presence of a treasure-house far more potentially valuable than most gold mines. The merest superficial examination indicated that the supply of ore was very extensive. Mr. William Selkirk, mining Engineeer of London, reported at a later date that when fifteen million tons of ore had been won the property would still be far from exhausted. For many years the "Float" ore alone would be sufficient to supply the furnaces.—L. Fraser, 'Iron & Steel in India' pp. 44-5.

(১১) কেঁওঝরের বাগিস্ বুরুখনি প্রধান।

(12) "Good iron ore is reported to occur also in the Feudatory State of Pal Lohara and in the Zamindari of Sukinda."—Rec. Geo. Sur. Ind. Vol. LVII (1919-23) 1925, p. 150.

পাল লোহারা Eastern States Agencyর Orissa States Agencyর অন্তর্গত একটী করদ রাজ্য।

Eastern States Agencyর অপর একটী শাখার নাম Chattisgarh States Agency.

(13) Rec. Geo.-Sur. Ind. Vol. LVII (1919-23) 1925 p. 150

কহ্লানের মধ্যে গুয়া (Gua), নোয়ামুদি (Noamud), পানসিরা বুরু (Pansira Buru) ও বুদা বুরু (Buda Buru) ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাক্ষিক সরবরাহ করিয়া থাকে।

(14) "Remarkable abundance of ores"—Economic Geology of India, Part III p. 367.—V. Ball.

(১৫) বিশ্ববিদ্যালয় পরিভাষা সমিতি 'pyrites' অর্থে 'মাক্ষিক' ব্যবহার করিয়াছেন। আমি স্থানে স্থানে 'ore' অর্থে 'মাক্ষিক' ব্যবহার করিয়াছি। সম্ভবতঃ ইহা ঠিক নহে। উপযুক্ত কথা না পাওয়ায় এরূপ করিয়াছি। যদি কেহ পরিভাষা দিয়া সাহায্য করেন বিশেষ বাধিত হইব।

অঙ্গনা

গীতি ও নৃত্যনাট

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় দৃশ্য

বিপাশার কক্ষ। বিপাশার প্রণয়প্রার্থী তরুণ সোমনাথ উপবিষ্ট; তাহার পার্শ্বে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বন্ধু দেবদত্ত। বিপাশা নৃত্য-গীতে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাইতেছে। সুসজ্জিত কক্ষের একপার্শ্বে পালঙ্ক, অপরাংশে বিশ্রামপীঠ। দীপদান ও অগুরুস্থাপক ইত্যাদি গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অতিথিদ্বয় বিশ্রামপীঠে বসিয়া আছেন। বিনতা পালঙ্কে বসিয়া বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছে। নৃত্যপরা বিপাশা গৃহতলে চঞ্চল গতিতে নাচিয়া ফিরিতেছে।

গান

আজি মঞ্জীর মন্দিরা বাজে।
এলে অতিথি কুঞ্জদ্বারে
একি নব অভিনব সাজে!
যাও ফিরে যাও ওগো পিয়াসী—
দূরের পথে:
আরতি শিখায় মরণ নামে
সোনার রথে।
ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—
আজি এ সাঁঝে।

নৃত্য শেষে সোমনাথ রত্নহার লইয়া বিপাশার সম্মুখে উপস্থিত হইল

সোমনাথ। বিপাশা! তক্ষশিলার উর্ব্বশী তুমি, তোমার উপযুক্ত অলঙ্কার হয়তো রাজার ভাণ্ডারেও নেই।

(রত্নহার বিপাশার হাতে দিল)

দেবদত্ত। হয় তো, কেন বন্ধু! নিশ্চয়ই নেই।

বিপাশা। (চিন্তিতভাবে) না। থাক্‌লেও বিপাশার প্রয়োজনে লাগ্‌ত না।

দেবদত্ত। লাগ্‌ত না, কিছুতেই লাগ্‌ত না আপনার প্রয়োজনে। অলঙ্কার লজ্জা পেত।

বিনতা। বাঃ! বন্ধুটি যে দেখ্‌ছি চারণ কবি। কিন্তু এখানে চারণ কবির চেয়ে বৈতালিকই মানাত ভালো।

সোমনাথ। বৈতালিক? (হাসিয়া উঠিল)

বিনতা। হাঁ; বৈতালিক। যাদের তালের দিকে খেয়াল আছে, তারা পারে না আমাদের মুখে হাসি ফোটাতে। (এখানে শুধু কেনা-বেচার কারবার) ও সব স্তবস্তুতি দেবতাদেরই ভাল লাগে। আমাদের নয়।

বিপাশা। বিনতা! তোর বাচালতা যেন দিন দিন বেড়েই চ'লেছে।

বিনতা। ওরা যে নতুন যাত্রী। সাবধানে জাল না টান্‌লে, পাশ কাটিয়ে পালাবে।

বিপাশা। তা পালাক্। তোর জালে দেবো আমি আগুন ধরিয়ে।

দেবদত্ত। সোমনাথ, সব যে কেমন বেসুরো ঠেক্‌ছে।

বিপাশা। হাঁ। আগাগোড়াই ঠেক্‌বে অম্‌নি বেসুরো। এখনো সময় আছে; বন্ধুটিকে নিয়ে সসম্মানে ফিরে যাও। এই নাও তোমাদের উপহার। (রত্নহার সোমনাথের হাতে ফিরাইয়া দিল।)

সোমনাথ। (গ্রহণ না করিয়া) বিপাশা!

বিপাশা। না। কি দেখ্‌ছো, অমন ক'রে মুখপানে চেয়ে?

সোমনাথ। দেখ্‌ছি তোমার ওই স্থলপদ্মের মত দুটি চোখ, আর ভাবছি—না, থাক। বিপাশা, আমি—আমি তো কোন অসম্মান করি নি তোমার।

বিপাশা। ক'রলেই ভাল ছিল। যাও, ফিরে যাও;—এখনো সময় আছে।

বিনতা। ঘাড়ে কি অপদেবতা চেপেছে বিপাশা?

বিপাশা। হাঁ। (সোমনাথের হাতে রত্নমালা গুঁজিয়া দিল) যাও, ফিরে যাও। নিজের ইচ্ছায় পাতালের সিঁড়ি ব'য়ে অন্ধকার পথে পা বাড়িও না। যাও—

সোমনাথ। তোমার কথা আমি এক বর্ণও বুঝ্‌তে পারছিনা, বিপাশা।

বিপাশা। বুঝ্‌বার দরকার হবে না। যেদিন বুঝ্‌বে, সেদিন শিয়রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে মরণ।

সোমনাথ। মরণ! মর্‌তে আমি ভয় পাইনা বিপাশা। আমি তোমায় ভালবাসি। আমার যা কিছু, সব তুলে দিতে পারি তোমার হাতে। আমায় ফিরিয়ো না।

বিপাশা। বলো কি, সোমনাথ! এত ভালবাসো তুমি? (বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল) কিন্তু, আমি তো তোমায় ভালবাসি না। (সহসা নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া) ভুল, ভুল ক'রেছ, সোমনাথ। আমি নটী! নটীকে কেউ ভালবাসে কোনদিন? আমাদের মনের বালাই নেই। যাও, ফিরে যাও তুমি। (অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোমনাথ একটু পশ্চাদপসরণ করিল।)

দেবদত্ত। সোমনাথ!

সোমনাথ। এঁ্যা। (অন্যমনস্কভাবে চাহিল।)

দেবদত্ত। চলো। আজ আর বিপাশার গৃহে হবে না স্থান। কি ভাব্‌ছো অমন ক'রে?

সোমনাথ। (বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বিপাশার মুখপানে চাহিয়া) কিছু না। (আবার একটু অগ্রসর হইয়া) বিপাশা!

বিপাশা। না। আজ আর কিছুই ভাল লাগে না আমার। তোমরা ফিরে যাও। যদি বিপাশা বেঁচে থাকে, আবার এসো।

সোমনাথ। (অপ্রত্যাশিত উল্লাসে) আস্‌বো?

বিপাশা। হাঁ। (ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল।)

দেবদত্ত। সোমনাথ! আর দাঁড়িয়ে কেন? চলো—

সোমনাথ। যাবো। ভুল ক'রেছি দেবদত্ত; মরীচিকার পিছনে ছুটে—

বিনতা। কোন লাভ নেই, কেমন? হতাশ হ'য়ো না, বন্ধু। মরীচিকার পিছনেই তো থাকে পান্থপাদপ। কালবোশেখীর ঝড় দেখে ভয় পেলে কি চাতকের তেষ্টা মেটে কোনদিন! সব ভ্রমরকেই সইতে হয় বাতাসের ঝাপ্টা। তাই ব'লে কি ফুলের মায়া ত্যাগ ক'রতে পারে তা'রা?

দেবদত্ত। শুনলে সোমনাথ?

সোমনাথ। শুনেছি।

দেবদত্ত। তবে চলো। আশা ব্যর্থ হবে না। আবার এসো ফুলের দুয়ারে প্রাণের অঞ্জলি নিয়ে।

বিনতা। আর, তুমি?

দেবদত্ত। আমি?

বিনতা। হাঁ গো, হাঁ। তুমি হবে বিনতার দোসর। এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভালো? বিপাশা আর সোমনাথ; তুমি আর আমি।

দেবদত্ত। সত্যি?

বিনতা। নয়তো কি মিথ্যে! এই যে আমাদের কারবার। তবে কি জানো? আমরা মেয়েমানুষ কিনা, তাই গাঁটছড়া বাঁধ্বার আগে, তোমাদের ভাল ক'রে যাচাই ক'রে নিই।

সোমনাথ। (সহসা বিনতার নিকটবর্ত্তী হইয়া) বিনতা! রাখ্বে একটা অনুরোধ?

বিনতা। কেন রাখ্বো না! ওই তো ব'ল্লেম—

সোমনাথ। (বিনতার হাতে রত্নমালা ফিরাইয়া দিল) এই নাও। আমি পারবো না, পারবো না এ মালা ফিরিয়ে নিতে। এখন যাই—

ক্ষিপ্রপদে প্রস্থানোদ্যত

বিনতা। ও কথা ব'ল্তে নেই। আবার এসো। পোড়ারমুখী কাল রাতে দেখেছে মন্দ স্বপন। তাই মনটা ওর ডুক্‌রে ম'রছে।

সোমনাথ ও দেবদত্তের প্রস্থান

বিনতা আপন মনে গান গাহিয়া ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। রত্নমালা হাতে লইয়া যেন সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে

কীর্ত্তন

পথে যেতে হেরিনু যে তারে।
টুটিল সরম বাধা আধো আঁধিয়ারে।
থির বিজুরি হাসে
কান্ত সে বয়ানে,
চকিত ঝলক লাগে
নয়ানে নয়ানে।
হিয়ার পুতলি তাই
কাঁপে বারে বারে॥

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। বিনতা! কৌতুক নয়। আমি পারছি না, পারছি না আর সইতে এই জীবন।

বিনতা। একে দেখ্ছি, পলকে প্রলয় হ'লো তোমার মৈত্রী বনে। নটীর আবার প্রণয় কি? শেষে কারবার খুইয়ে পথে দাঁড়াবে?

বিপাশা। পথই আমি খুঁজ্ছি, বিনতা। এতকাল ঘরের কারবারে যা ক'রেছি লাভ, এবার পথের কারবারে ক'রবো তার ক্ষয়। দেহ দিয়ে মনকে আর পারছিনা ভুলিয়ে রাখ্তে। পথ আমায় সত্যি টেনেছে বিনতা।

বিনতা। ও সব বড় বড় কথা কি ব'ল্ছো? মাথাটা কি গোলমাল হ'য়ে গেল! না রাতের অভিসারে লেগেছে ডাকিনীর দৃষ্টি?

বিপাশা। আজ আর তাতেও দুঃখ নেই বিনতা। আমি চাই মুক্তি। এ জীবন আর সইতে পারি না। এতকাল শুধু দিনের পর দিন মানুষকে এনেছি পথ ভুলিয়ে; সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে পথে বসিয়েছি। তাই আজ পথে ব'স্বার নেশা আমার পাগল ক'রেছে।

বিনতা। তাই বুঝি নির্ম্মমভাবে ফিরিয়ে দিলে সোমনাথকে?

বিপাশা। ফিরিয়ে যে দিতে পেরেছি, তাই ভেবেও নিজেকে ধন্য মনে ক'রছি। সারা জীবনই তো ক'রেছি অভিনয়। মানুষকে কখনো ভালোবাসিনি। যারা ভালবেসেছে, তাদের সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছি দস্যুর মত। সোমনাথ ভালবাসে। ওই সুকুমার কিশোরের ভালবাসা নিয়ে আমি আর ক'রতে পারবো না দোকানদারি। শুধু আঘাত কেন, ওকে যদি মরণের মুখে ঠেলে দিতে হয়, তা-ও ভালো। তবুও আমি কলুষিত হ'তে দেবো না ওর জীবন।

বিনতা। ভালো। সোমনাথের ভাগ্য বল্তে হবে!

বিপাশা। ভাগ্য সোমনাথের, না বিপাশার, তা জানিনা। জান্বার দরকারও নেই আজ।

বিনতা। দরকার যদি কিছুতেই নেই, তা হ'লে সংসার ছেড়ে দীক্ষা নিলেই হয়।

বিপাশা। দীক্ষা!

বিনতা। হাঁ। দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুণী সেজে মহাস্থবিরের শরণাপন্ন হও। পাপ যাবে সব ধুয়ে মুছে।

বিপাশা। পাগ্‌লামি করিস্‌নে বিনতা। সেও তো বঞ্চনা। যে বঞ্চনার বাকল প'রে কাটিয়েছি সারা জীবন—, সেই বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আবার ক'রবো নিজের সঙ্গে বঞ্চনা!

বিনতা। নাঃ। তুমি দেখ্ছি শেষ পর্য্যন্ত ডাকার্ণব না শুনিয়ে ছাড়বে না। নাগার্জ্জুনের ভূত বোধহয় পিছু নিয়েছে। মন খুলে সোজা কথায় বল তো শুনি, কি উদ্দেশ্য তোমার?

বিপাশা। উদ্দেশ্য! নারী হয়েও পৃথিবীতে পাই নি নারীর মর্য্যাদা। অঙ্গনা হ'য়েও হ'য়েছি পৌর বিলাসিনী নটী। বিনতা! আমি চাই নারীর সম্মান।

বিনতা। বুঝেছি। মাথায় বজ্রকীট ঢুকেছে। কাল রাতের সেই অভিসারই হ'লো কাল। এবার বুঝেছি ভাগ্যটা কার। যে বিপাশার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে রাজার দুলাল হ'য়েছে দেউলিয়া, সেই বিপাশাই আজ দেউলিয়া হ'তে চায় নিঃস্ব পথিকের প্রেমে! সুবর্ণ গুপ্ত—অজ্ঞাতকুলশীল পথিক!

সসম্ভ্রমে ভৃত্য শরণের প্রবেশ

শরণ। দুয়ারে মাতাজী কৃপালী। প্রস্থান

বিপাশা। কৃপালী! ভিক্ষুণী! (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিল।) একি সৌভাগ্য আমার! বিনতা, ভিক্ষুণী কৃপালীর পদধূলি

প'ড়েছে আমার গৃহে। আমি নটী। আমার ঘর আজ পবিত্র হ'য়েছে দেবীর পদধূলি পেয়ে। এসো—এসো বিনতা। (ছুটিয়া দ্বার প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইল।)

বৌদ্ধভিক্ষুণী কৃপালীর প্রবেশ

কৃপালী। বিপাশা!

বিপাশা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে পশ্চাদপসরণ করিয়া কৃপালীকে অভ্যর্থনা করিল। অপলক মুগ্ধ নেত্রে সে শুধু কৃপালীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। কোন কথা বলিল না

—অমন মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে কি দেখ্ছো?

বিপাশা। একি স্বপ্ন!

কৃপালী। না। আমি কৃপালী। শৈশবে ছিলেম তোমার খেলার সাথী।—রত্নাবলী।

বিপাশা। (মন্ত্রমুগ্ধের স্থায়) রত্নাবলী! সেই আমলকী ছায়ার পাশাপাশি দু'খানি খেলা ঘর! বেণীতে পিয়ালের কচি শাখা,কানে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, দুটি হাতে অঞ্জলি ভরা বৈঁচি আর বনফুল। (সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া) রত্নাবলী—আমি—আমি—নটী—

কৃপালী। (সাদরে কণ্ঠে বাহু বেষ্টন করিয়া) তাতে কি হ'লো? অমন সঙ্কুচিত হ'চ্ছ কেন, বিপাশা?

বিপাশা। হবো না? হবো না সঙ্কুচিত? আমার দেহ অপবিত্র; আমার মন—আমার জীবন—আমার সর্ব্বস্ব। একই উদ্যানে পাশাপাশি ফুটেছিল দুটি ফুল! একটাতে হ'লো দেবতার নির্ম্মাল্য, আর—একটা ঝ'রে পড়লো নরকের পথে।

কাঁদিতে কাঁদিতে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল

কৃপালী। ছিঃ, বিপাশা! ওসব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল। (বিনতার দিকে চাহিয়া) ইনি বুঝি তোমার সহচরী?

বিনতা অগ্রসর হইয়া কৃপালীকে অভিবাদন করিল

চলো, ওই বিশ্রামপীঠে বসি গিয়ে। আজ শৈশবের কত মধুর স্মৃতিই না মনে জেগে ওঠে! সেই স্মৃতির আনন্দ উপভোগ ক'রবো ব'লেই তো এসেছি তোমার ঘরে।

বিনতা। এ আমাদের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য দেবী!

কৃপালী। সৌভাগ্য শুধু তোমাদের হবে কেন বোন! সে তো আমারও।

তিনজনে পাশাপাশি বিশ্রামপীঠে বসিল

বিপাশা। রত্নাবলী, তোমাদের মাঝখানে ফিরে যাবার আর কোন পথই বুঝি নেই আমার?

কৃপালী। কেন থাকবে না, বিপাশা। পথ কি কখনো রুদ্ধ হয়? যিনি হাত ধ'রে টেনে এনেছেন এই পথে, সময় হ'লে তিনিই আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন অন্য পথে।

বিপাশা। কিন্তু, যা একবার অপবিত্র হ'য়েছে, তাকে কি আর নতুন ক'রে গ'ড়ে তোলা যায়? ছিলেম নারী, হ'য়েছি নগরের নটী।

কৃপালী। গণদেবতার পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দিয়েছিলে ব'লে হ'য়েছ নটী; আবার দেবতার পায়ে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে হবে দেবদাসী। দেহ অপবিত্র হ'লেও, মানুষ তো অপবিত্র হয় না বিপাশা।

বিপাশা। তা হ'লে পারবো আবার ফিরে যেতে?

কৃপালী। হাঁ, পারবে। অমন উতলা হ'য়ো না। মন যখন চেয়েছে ফিরে যেতে, তখন পথও আপনি আস্‌বে তোমার সাম্‌নে।

বিপাশা। আমি তোমাদের মত দেবী হ'তে চাই নে

কৃপালী। ওই পবিত্র নাম তাতে কলঙ্কিত হবে। আমি হ'বো নারী; আবার হাত পেতে চাইব অঙ্গনার মর্য্যাদা। (পায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া) আমায় একটু পায়ের ধূলো দেবে?

কৃপালী। ওকি! (হাত চাপিয়া ধরিলেন) আজ তোমার মন বড় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। আর একদিন আস্‌বো। যে বিপ্লব জীবনে দেখা দিয়েছে, তার ভিতর দিয়েই আস্‌বে তোমার মুক্তি।

উঠিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন

আর সেই মুক্তিই তো সত্যিকারের মুক্তি। প্রবল বন্যার মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে নতুন জীবনের পথে।

বিপাশা ও বিনতা উঠিয়া দাঁড়াইল

বিনতা। হাঁ, মুক্তি ওর আসবেই। অন্ততঃ কাল রাত্রে পেয়েছি তার প্রথম নমুনা! যাক্, আর একটু ব'সবেন না?

কৃপালী। না, আজ নয়। আর একদিন আস্‌বো।

বিনতা। আশা করি বঞ্চিত হবো না সে সৌভাগ্য থেকে!

বিপাশা। যা ভাল লাগে, তাই ক'রো। পায়ের ধূলো দিয়েছ, সেই বড় কথা। তার বেশী চাইবো না কোনদিন।

কৃপালী চলিয়া গেলেন। বিপাশা ও বিনতা তাঁহার অনুগমন করিয়া দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল

বিপাশা। বিনতা! বিনতা! (অস্বাভাবিক প্রসন্নতার সঙ্গে) এতক্ষণে মনটা আমার হাল্‌কা হ'য়ে এলো। মনে কি হ'চ্ছে জানিস্? মনে হ'চ্ছে—সারা আকাশে একটা ঝড় বইয়ে দিই। সেই ঝড়ে উড়ে যাক্ এই মহানগরী, প্রাসাদ—তক্ষশিলার বন-উপবন সব।

বিনতার গলা জড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিল

বিনতা। লক্ষণ তো ভাল নয়!

বিপাশা। তার মানে?

বিনতা। মানে, মুক্তির না হোক বন্ধনের পূর্ব্বলক্ষণ। তক্ষশিলার ঘরবাড়ী না উড়লেও, তোমার সব কিছু হয় তো উড়বে অমনি কোন ঝড়ে। আচ্ছা বিপাশা, সত্যি ব'ল্‌বে?

বিপাশা। কি?

বিনতা। কাল রাতে, সেই বিদেশী বণিককে তোমার সত্যি খুব ভাল লেগেছে?

বিপাশা। (অন্যমনস্ক হইয়া গেল) ভাল? কি জানি! ভাল হয়তো লাগ্‌তো না বিনতা। কিন্তু তাকে দেখে আমার কি মনে হ'য়েছিল জানিস?

বিনতা। কতকটা জানি বৈকি। তবুও তোর মুখ থেকেই শুনি। অন্ততঃ ভাবটা কতখানি গভীর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তার একটা আন্দাজ পাবো।

বিপাশা। মনে হ'লো—যেন ওই মূর্ত্তিই ছিল আমার কল্পনায়, আমার ছেলেবেলার পুতুল খেলায়। একটা সত্যিকারের

পুরুষ মূর্ত্তি, যার হাতে আমার দেহমন চেয়েছিল আত্মসমর্পণ ক'রতে। দু'জনে মিলে বাঁধ্‌তেম ছোট্ট একখানি লতাপাতার ঘর।—অঙ্গনে উঠ্‌তো শিশুর কলকোলাহল। দূর বনে বাজ্‌তো রাখাল-ছেলের বাঁশী।

বিনতা। তাই বলো!

বিপাশা। গোপন তো করিনি। তবে, যা অসম্ভব তা-ই নিয়ে কি মানুষ খোল-করতাল বাজাতে পারে?—তা ছাড়া, আমি নটী। আমার সে স্বপ্নও যে শোভা পায় না, বিনতা।

বিনতা। তাই তো সব দিক্ ভেবেচিন্তে বুড়ো শিব হ'য়ে ব'সে আছি। শ্রদ্ধার দান যে যা দিয়ে যায়, তাতেই সন্তুষ্ট। এক মুঠো আতপ চাল, আর দুটো শুক্‌নো বেলপাতা।

নিতান্ত আড়ষ্টভাবে ভৃত্য শরণ আসিয়া দ্বারপথে দাঁড়াইল

শরণ। রাজার আদেশ!

বিপাশা চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিল

বিপাশা। কি শরণ?

শরণ অগ্রসর হইয়া একখানি তাম্রলিপি দিল

শরণ। রাজার আদেশ; মহাপাল সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছেন।

বিপাশা। রাজার আদেশে মহাপাল এসেছেন আমার গৃহে?

বিনতা। (সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল) এ আবার কি নতুন উৎপাত এসে জুট্‌লো। শেষে কি কপালে রাজদণ্ডও ঘট্‌বে নাকি?

বিপাশা। চুপ কর, বিনতা। (ভৃত্যের প্রতি) শরণ, মহাপালকে আমার অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এসো।

তাম্রলিপি ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিল

শরণ। এখানেই নিয়ে আস্‌বো?

বিপাশা। হাঁ।

ভৃত্য নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল

বিনতা। সাধে কি বলি—কপাল মন্দ হ'লে দৈব পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়। 'বাঘের ভয়ে উঠি গাছে, ভালুক বলে পেলেম কাছে।' ভিক্ষুণীর যাতায়াত সুরু হ'লো দেখে, মনে মনে ধর্ম্মপালের ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে উঠেছিলেম; পাশ ফিরতেই দেখি—এদিকে স্বয়ং মহাপাল এসে উপস্থিত রাজার আদেশ নিয়ে।

বিপাশা। আঃ। তোর কি ছেলেমানুষি কোনদিন ঘুচ্‌বে না?

বিনতা। বিপদ-আপদের ভাব্‌নাও যদি ছেলেমানুষি হয়, তা হ'লে—

মহাপালের প্রবেশ। বিপাশা ও বিনতা সসম্ভ্রমে উঠিয়া অভিবাদন করিল ও বিশ্রামপীঠে আসন গ্রহণ করিবার জন্য নীরব অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। মহাপাল আসন গ্রহণ করিলেন

মহাপাল। অসময়ে দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে হয়তো আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালেম।

বিপাশা। সে কি! রাজপুরুষের দর্শনলাভ আমার পক্ষে পুণ্যের কথা। আদেশ করুন।

মহাপাল। আদেশ নয়। রাজ অনুজ্ঞায় আমি এসেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে। উৎসব মণ্ডপে রাজা যে আদেশ দিয়েছিলেন, সে আদেশের কথা আপনার বোধহয় স্মরণ আছে।

বিপাশা। হাঁ। দেবী উৎপলার কঙ্কন অপহৃত হ'য়েছে; তাই রাজা আদেশ দিয়েছেন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের। কিন্তু, আমার এখানে কেন?

মহাপাল। আপনার এখানে? (দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া) প্রহরী!

বিপাশা। কঙ্কন-চুরির অপরাধে—

সহসা কেমন সশঙ্কিত হইয়া উঠিল

মহাপাল। আপনি সুবর্ণ গুপ্তকে চেনেন?

বিপাশা। (চমকিয়া উঠিল) সুবর্ণ গুপ্ত!

বিনতা। বিদেশী বণিক?

মহাপাল। হাঁ।

দুইজন প্রহরী হস্তবদ্ধ সুবর্ণ গুপ্তকে লইয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল

—ইনিই সেই মহাপুরুষ! দেবীর কঙ্কন চুরির অপরাধে ধৃত। আপনি কি সাক্ষ্য দিতে পারেন, উনি নিরপরাধ কিনা?

বিপাশা। মহাপাল! (কাকুতি জানাইয়া) উনি নিরপরাধ। বিদেশী বণিক; ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত—নিঃস্ব।

বিনতাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল—বিনতা চলিয়া গেল
সুবর্ণ অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল

মহাপাল। আপনার সঙ্গে কত দিনের পরিচয়?

বিপাশা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) পরিচয় দীর্ঘকালের না'হ'লেও আমি জানি।

মহাপাল। তবু কতদিনের পরিচয়, জিজ্ঞেস্ ক'রতে পারি কি?

বিপাশা। (ইতস্তত করিয়া) কাল রাত্রের।

মহাপাল। ওঃ! (হাসিয়া উঠিলেন।) মাত্র একদিনের পরিচয়ে সাধুতার সাক্ষ্য!

সুবর্ণ। মহাপাল, আমায় নিয়ে চলুন। আমি যে-কোন শাস্তি নিতে প্রস্তুত।

বিপাশা। আমি জানি, আমি জানি মহাপাল! উনি নিরপরাধ। কঙ্কনের বিনিময়ে আমার সব সম্পদ, আমার সব রত্ন-অলঙ্কার আপনার হাতে সমর্পণ ক'রছি; ওঁকে মুক্তি দিন। আমার অনুরোধ—ভিক্ষা।

মহাপাল। তা হয় না, সুন্দরী। আপনার অনুরোধ রক্ষা ক'রবার সুযোগ পেলে তক্ষশিলার যে কোন অধিবাসী নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে ক'রতো; আমিও কৃতার্থ হ'তেম। কিন্তু নিরুপায়! রাজার আদেশ অন্যথায়, অধীনেরই হবে প্রাণদণ্ড।

সুবর্ণ। আমায় মার্জ্জনা করুন। জলে ডুব্‌বার আগে, মানুষ যেমন হাতের কাছে যা পায় তাই আঁকড়ে ধরে, তেমনি আমিও অজ্ঞাতসারে হাত বাড়িয়ে ছিলেম। আমায় ব্যঙ্গ ক'রবেন না।

বিপাশা। শ্রেষ্ঠী, কেমন ক'রে বুঝাবো—পরিহাস কিনা! নটী হ'লেও আমি নারী। ভগবান জানেন আমার অন্তরের আকৃতি। সর্ব্বস্ব দিয়েও যদি আজ এতটুকু উপকার ক'রতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে ক'রবো—মহাপাল, আপনার পায়ে ধরি, আমায় ব'লে দিন—কি উপায়ে শ্রেষ্ঠীর জীবন রক্ষা হয়! এ ঋণ জীবনে কোনদিন ভুল্‌বো না।

মহাপাল। কোন উপায় নেই, লোকমিত্রা! রাজার কঠোর আদেশ আপনি অবগত আছেন।

বিপাশা। জানি; সব জানি, মহাপাল। কিন্তু সে আদেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কি কোন উপায়ই নেই?

মহাপাল। একমাত্র উপায়, যদি প্রমাণ হয় যে—শ্রেষ্ঠী নিরপরাধ।

বিপাশা। সে প্রমাণ সংগ্রহ করা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়, অধিনায়ক। মাত্র একটী রাত্রের পরিচয়ে না হয় আমি ওঁর সাধুতার প্রমাণ দিতে অক্ষম। কিন্তু মহারাজ কি বুঝবেন না ওই বিদেশী বণিকের মুখ দেখে? ওই চোখ! ওই নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধ দৃষ্টি! রাজশক্তি কি শুধু শাস্তিই দেবে! বিচার ক'রবে না?

মহাপাল। বিধান তো কারো মুখাপেক্ষী নয়, সুনেত্রা!

সুবর্ণ। আপনি নিরস্ত হোন্, দেবী। আমি মুক্তি চাই না। অদৃষ্ট ক'রেছে পরিহাস; বন্ধু ক'রেছে প্রতারণা! নিঃস্ব বিদেশী বণিকের মৃত্যুই আজ চরম পুরস্কার।

বিপাশা। বলুন, বলুন মহাপাল! কেমন ক'রে এই সত্যের প্রমাণ হবে?

মহাপাল। যদি প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ে; কিংবা রাজা প্রত্যাহার করেন তাঁর আদেশ। প্রয়োজন হ'লে, আপনি নিজেই নিতে পারেন সে ভার।

বিপাশা। তাই ক'রবো, তাই ক'রবো মহাপাল। আপনি শুধু অভয় দিন, যেমন ক'রে হোক্ অন্ততঃ দুটি দিন বাঁচিয়ে রাখবেন এই শ্রেষ্ঠীকে।

মহাপাল। তাই হবে। আমি কথা দিলেম, দুদিনের আগে হবে না ওঁর প্রাণদণ্ড।

বিপাশা। মহাপাল! শুধু সেইটুকু অনুগ্রহই ক'রবেন! যেমন ক'রে পারি ক'রবোই সে অসাধ্যসাধন। ওঁকে নিয়ে যান্ আমার চোখের সম্মুখ থেকে। বিপাশা আজ সত্যি করবে অসাধ্য সাধন। তার জন্যে যদি মহাপাপ ক'রতে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত হবে না। বাঁচাবে, বাঁচাবে সে ওই বণিককে।

মহাপাল। আসি তবে?

মহাপাল প্রস্থানোদ্যত হইলেন

বিপাশা। আসুন।

নমস্কার জানাইল। মহাপাল, প্রহরীদ্বয় ও সুবর্ণগুপ্তের প্রস্থান

বিপাশা। বিনতা! বিনতা!

বিনতা প্রবেশ করিল

বিনতা। কি?

বিপাশা বিনতাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন রোদনের ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছিল

বিপাশা। একি হ'লো বিনতা?

বিনতা। অমন ক'রছিস্ কেন, বিপাশা!

বিপাশা। একবার—একবার পারিস্ সোমনাথকে ফিরিয়ে আনতে?

কাঁপিতে লাগিল

বিনতা। সোমনাথ কি করবে?—

বিপাশা। যা—যা বিনতা, প্রতিবাদ করিস্নে।

শয্যায় লুটাইয়া পড়িল

[দীর্ঘ বিরাম] ক্রমশঃ

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

২

আবার ইহার সঙ্গে আর একটী ছোট কথাও আছে। হিউ-য়েন-চুয়াঙ শশাঙ্কের রাজ্য মধ্যেই অনেকগুলি জৈন ও বৌদ্ধ মঠ নিজ চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। হিউয়েন চুয়াঙ লিখিয়াছেন "কর্ণসুবর্ণে দশটি সঙ্ঘারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের দ্বিসহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। কর্ণসুবর্ণ নগরে ৫০টি দেবমন্দির ছিল এবং এই স্থানে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিত। ইহার নিকট রক্তমৃত্তিক সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল। ও নগর মধ্যে অশোক নির্ম্মিত কয়েকটি স্তুপ বা চৈত্য ছিল"। কর্ণসুবর্ণ অশোকের সময়েও নগর ছিল। শশাঙ্ক অশোকের অসম্মান করেন নাই। অশোকের স্তুপ তিনি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা হিউয়েন চুয়াঙের সাক্ষ্য। শশাঙ্কের যদি এতই বৌদ্ধ বিদ্বেষ তবে সেগুলি ত তার আগে ধ্বংস করা উচিত ছিল। তাহা তিনি করেন নাই কেন? ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, অপর দেশ জয় করিতে গিয়া যেরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের প্রয়োজন হইয়াছিল, নিজের অধীন রাজ্যে সেরূপ প্রয়োজন হয় নাই। বাধ্য প্রজাকে অযথা উত্ত্যক্ত করিয়া ক্ষিপ্ত ও বিদ্রোহী করিতে তিনি চাহেন নাই। যিনি ভারতবর্ষে একটী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার দূরদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞান তদুপযোগী ছিল বলিয়াই বিনয়ের সহিত আমাদের স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

৫ম প্রশ্ন—বোধিদ্রুম উৎপাটনের ৫ বৎসর পর ৬০৫ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিবার জন্য মালদহ হইতে কনৌজে ছুটিয়া গেলেন কেন? এই কথার উত্তর দিতে হইলে ঘটনাটি সংক্ষেপে একটু বলিয়া নিলে বুঝিতে সহজ হইবে।

মধ্য এশিয়াতে হুন বলিয়া একটী জাতি ছিল। তাহারা হিংস্রও ছিল, বর্ব্বরও ছিল। তাহাদের মধ্যে একদল ইউরোপের দিকে চলিয়া গেল এবং রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করিল। আর একদল—ইহাদের নাম ছিল শ্বেত হুন—ভারতবর্ষের দিকে আসিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য বিনা বাধায় গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় নাই। কিন্তু হুন আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য আর দাঁড়াইতে পারিল না। টুক্রা টুক্রা হইয়া ভাজিয়া গেল। ইতিহাসবিশ্রুত কত সাম্রাজ্যই না এইরূপে ভাঙিয়া গিয়াছে। ওদিকে

ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। তাই কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম
কাঁপিত যাহার তেজে মর্ সিন্ধু ব্যোম"।

—রোমের কথা থাক।

হুন আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে ভারতবর্ষে অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য দেখা দিল। এই খণ্ডরাজ্যগুলিও সমগ্র ষষ্ঠ শতাব্দী ধরিয়া হুনদের আক্রমণ বাধা দিয়াছে। দেড় শতাব্দী ধরিয়া ক্রমাগত এক অতি দুর্দ্ধার হিংস্র জাতি যদি দেশকে ক্রমাগত আক্রমণ করিতে থাকে তবে সেই দেশের কি অবস্থা হয় তাহা আপনারা অস্তকার এই আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমাকে কষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

যে সমস্ত খণ্ড রাজ্য এই সময় দেখা দিল তার মধ্যে থানেশ্বর রাজ্যই প্রধান। প্রভাকরবর্দ্ধন এই রাজ্যের রাজা। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন, কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন ও এক কন্যা—তাহার নাম রাজ্যশ্রী। কনৌজের মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্ম্মা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। কনৌজ ও থানেশ্বরে এই বিবাহের দরুণ যে মিলন হইল—হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে তিনি নিজের এবং বিধবা ভগিনী রাজ্যশ্রীর এই দুই রাজ্যের রাজা হইয়া এ মিলনকে সার্থক করেন। ইহা ছাড়া মালব দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম দেবগুপ্ত। আর আমাদের এদিকে পশ্চিম বঙ্গে রাঢ়ে ছিলেন গৌড়াধিপ শশাঙ্ক। এই সকল রাজারা প্রত্যেকেই ছিলেন স্বাধীন এবং প্রত্যেকেই ছিলেন প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। পূর্ব্ববঙ্গে তখন কে রাজা ছিলেন জানা যায়না। যিনিই থাকুন তিনিও স্বাধীন ছিলেন, কারু অধীন ছিলেন না।

হুনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা শেষ হয় নাই—এমন সময় বৃদ্ধ রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু হইল। কবি বাণভট্ট হর্ষচরিতে প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন থানেশ্বর রাজের প্রাসাদ কিরূপ ঐশ্বর্য্য, শিল্পকলা ও বিলাসিতার সম্ভারে পূর্ণ ছিল। যেকালে প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যু হয় সেকালে রাজ্যবর্দ্ধন হুনদের সহিত যুদ্ধ করিতে চলিয়া গিয়াছেন।

প্রভাকর বর্দ্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মালবের দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করিয়া গ্রহবর্ম্মাকে বধ করিলেন। শুধু তাহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। রাজ্যশ্রীকে হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। হয়ত ইহার প্রয়োজন ছিল। কেননা রাজ্যশ্রী সামান্যা নারী ছিলেন না। তাঁহাকে বন্দী না করিলে হয়ত তিনি সৈন্যদের উত্তেজিত করিয়া যুদ্ধ করাইতেন। ইত্যবসরে রাজ্যবর্দ্ধন সসৈন্যে তাড়াতাড়ি আসিয়া মালবরাজ দেবগুপ্তকে বধ করিলেন। বধ করিয়া তাহার ধনরত্ন সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া নিজ সেনাপতি ভণ্ডীর সহিত থানেশ্বর প্রেরণ করিলেন। সুতরাং রাজ্যবর্দ্ধনের সঙ্গে দেহরক্ষী ব্যতীত আর কোন সৈন্যই রহিল না। কেননা রাজ্যবর্দ্ধন অপর কোন শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করেন নাই।

কিন্তু সহসা রাজ্যবর্দ্ধনের চমক ভাঙ্গিল। তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলেন গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণ হইতে এক প্রচণ্ড সৈন্যবাহিনী সঙ্গে লইয়া বৃষভধ্বজ দণ্ড হস্তে যুদ্ধমান অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কের এতাদৃশ আগমন প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি সৈন্যসামন্ত থানেশ্বরে সেনাপতি ভণ্ডীর সহিত প্রেরণ করিয়া দিয়াছেন। লুণ্ঠিত ধনরত্নও প্রেরিত হইয়াছে। অথচ গৌড়দেশ হইতে কনৌজে আসিয়া রিক্তহস্তে শশাঙ্ক ফিরিয়া যাইবে না, ইহাও নিশ্চিত। সুতরাং হয় রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছিলেন অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিম্বা অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শশাঙ্কের সুসজ্জিত বিপুল বাহিনীর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই তিনের যে কোন একটা ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। যদি হুন বিজয়ী রাজ্যবর্দ্ধন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া শশাঙ্কের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন তথাপি শশাঙ্ক তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। এবং এইরূপ অবস্থায় বধ করার জন্য কবি বাণভট্ট শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম' এবং 'দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গ' বলিয়া অজস্র নিন্দা করিয়াছেন।(১) (১৬৫৯ খৃঃ) সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিবাজী আফজলখাঁকে যেভাবে হত্যা করিয়াছেন, হর্ষচরিত রচয়িতার মতে শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে সেইরূপ অবস্থায় হত্যা করিয়াছেন। সুতরাং শশাঙ্ক ধর্ম্মবিদ্বেষের জন্য যেমন ঔরংজেবের সহিত তুলনীয়, তেমনি রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা ব্যাপারে শিবাজীর সহিত তুলনীয়। সুতরাং শশাঙ্ক একাধারে ঔরংজেব ও শিবাজী দুই অংশই ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছেন।

এই ত প্রাচীন ঐতিহাসিকদের অভিমত। শশাঙ্ক চরিত্র অতি জটিল সন্দেহ নাই। মোটামুটি এই ত ঘটনা। এখন দুইটি কথার উত্তর অতি সহজেই দেওয়া যায়। ১ম, শশাঙ্ক বাংলা দেশ হইতে কনৌজে গিয়াছিলেন থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্য জয় করিবার জন্য। যেমন ইতিপূর্ব্বে তিনি বোধগয়া ও পাটলিপুত্র জয় করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে এই সকল রাজ্য তিনি বিনা বিধায় অতিক্রম করিতে পারিতেন না এবং এত দ্রুত কনৌজে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিতেন না। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর সুযোগ লইয়া যাহারা ভারতবর্ষে তৎকালে একটী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা পোষণ করিয়াছিলেন গৌড়াধিপ শশাঙ্ক তাহাদের মধ্যে একজন। রাজার পক্ষে ইহা নিন্দার কিছুই নহে। ২য়, কবি বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের আশ্রিত সভাকবি। রাজভোগে পুষ্ট দেহ ও মনে তিনি অত্যন্ত খোসমেজাজে হর্ষ সম্বন্ধে চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের প্রশংসা

(১) কবি বাণভট্ট হর্ষচরিত ৬ষ্ঠ উচ্ছ্বাসে লিখিয়াছেন—"গৌড়াধিপেনমিথ্যোপচারোপচিত বিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রং একাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবনে এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতং অশ্রৌষীৎ॥" রমাপ্রসাদ চন্দ ইহার বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন—"গৌড়াধিপ (শশাঙ্ক) তাঁহাকে (রাজ্যবর্দ্ধনকে) মিথ্যা লোভ দেখাইয়া, বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া স্বভবনে (লইয়া গিয়া) অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া, গোপনে নিহত করিয়াছেন।" "ব্যাপাদিতং" পদ দ্বারা ঠিক বুঝা যায় না যে শশাঙ্ক নিজে রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন, কি অন্যের দ্বারা হত্যা করাইয়াছিলেন। কিন্তু কথা একই দাঁড়ায়।

হিয়ানচুয়াং লিখিয়াছেন—"তাঁহারা (শশাঙ্ক এবং তাঁহার মন্ত্রীরা) রাজ্যবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন।" হত্যা করিবার জন্য নিশ্চয় আহ্বান করা হয় নাই।

মিথ্যা প্রলোভন দ্বারা বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যার কথা বাণভট্ট এবং হিয়ানচুয়াং দুইজনেই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুইজনে একমত নহেন।

কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে আছে যে "রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে অরাতি ভবনে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।" ইহা বাণভট্টের বিরোধী কথা। "প্রাণানুজ্ঝিত বানরাতি ভবনে সত্যানুরোধেন যঃ॥" বাণভট্টের "মিথ্যা প্রলোভন"—আর হর্ষবর্দ্ধনের "সত্যানুরোধ···এক কথা নয়। তফাৎ অনেক। রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন—"বাণভট্ট প্রদত্ত রাজ্যবর্দ্ধন নিধনের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"রাজ্যবর্দ্ধন যে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু-ভবনে গমন করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য উক্তি নহে। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া রাজ্যবর্দ্ধন অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন।"

বাণভট্টের "মিথ্যা উপচার" কথাটা আরো স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। এই অস্পষ্টতা অতি মাত্রায় সন্দেহজনক। আর ইহা স্পষ্টতর হইবার কোন উপায় দেখি না।

ভিক্ষা করিয়া এই ব্রাহ্মণ শশাঙ্কের অযথা নিন্দা করিয়া তাঁর ইতিহাসকে বিকৃত ও চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন—শশাঙ্ক যে রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন, এত বড় শিভাল্‌রি যাহা এযুগেও দুষ্প্রাপ্য এবং প্রশংসনীয় সে কথা সম্পর্কে নানা রকমের ঘোর প্যাঁচ দিয়া শশাঙ্কের নামটী পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন না। হর্ষচরিত রচয়িতার লেখনী যে কতদূর পক্ষপাত দোষে দুষ্ট ইহা তাহার একটী জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।(২)

শশাঙ্কের প্রতি রাজ্যশ্রীর কি মনের ভাব এবং রাজ্যশ্রীর প্রতি বা শশাঙ্কের কি মনের ভাব,তাহা লইয়া উপন্যাস রচনা চলিতে পারে, ইতিহাস লেখা যায় না। ভ্রাতাকে হত্যার জন্য ঘৃণা ও ক্রোধ এবং কারামুক্ত করিয়া দিবার জন্য কৃতজ্ঞতা। শশাঙ্কের প্রতি এই দুই বিপরীত ভাবের সমাবেশ রাজ্যশ্রীর মনে ছিল। তিনি বিধবা ছিলেন বটে, কিন্তু রাজকন্যা ও কনোজ রাণী অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া তিনি রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। মন্ত্রণা দিতেন। হিউ-য়েন-চুয়াঙের সম্মুখে বসিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেন। সুদূর চীনে পর্য্যন্ত পরিব্রাজকেরা তাঁহার সুখ্যাতি প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু শশাঙ্কের সহিত তাঁহার প্রকাশ্যে বা গোপনে দেখা হওয়ার কথা ইতিহাস বলে না।

আর একটী ঘটনাও লক্ষ্য করিবার বিষয়; শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য মধ্যে ছাড়িয়া দেন নাই। যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতিজ্ঞান তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। শশাঙ্ক রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করিয়া একেবারে বিন্ধ্যাচলে প্রেরণ করিলেন। কেননা শশাঙ্ক জানিতেন যে, রাজ্যবর্দ্ধনকে বধ করাতেই শত্রু নিঃশেষ হইল না—হর্ষবর্দ্ধন জীবিত আছে। সে ইহার প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধনকে সোজা পথে প্রতিশোধ লইবার সুযোগ দিলেন না। হর্ষবর্দ্ধন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দুইটী সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। ১ম, ভগিনী রাজ্যশ্রীর উদ্ধার। ২য়, শশাঙ্ককে নিধন। ইহার কোনটি তিনি আগে করিবেন? ভগিনীর উদ্ধারে বিলম্ব করিলে হয়ত আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষেও গৌড়াধিপ শশাঙ্ককে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। অতএব শশাঙ্কের বধের জন্য তিনি দারুণ প্রতিজ্ঞা করিলেন। যতদিন না তিনি শশাঙ্ককে বধ করিতে পারিবেন, ততদিন দক্ষিণ হস্তে অন্ন গ্রহণ করিবেন না।(৩) বীরোচিত প্রতিজ্ঞা সন্দেহ নাই। কিন্তু গৌড়াধিপের বিরুদ্ধে এই প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি দ্রুত ভগিনীর উদ্ধারের জন্য বিন্ধ্যাচল অভিমুখে গমন করিলেন এবং সেই গভীর অরণ্যে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের সম্মুখে আত্মাহুতি দিবার প্রাক্কালে ক্ষিপ্রহস্তে ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া রাজ্যশ্রীর উদ্ধার এবং প্রাণরক্ষা দুইই করিলেন। শশাঙ্ক অতি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। যেকালে হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য বিন্ধ্যাচলে গমন করিলেন, সেই সুযোগে শশাঙ্ক কনৌজ হইতে নিজ রাজধানী কর্ণসুবর্ণে নিরাপদে ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় ইহারই নাম কৃতকার্য্যতার সহিত পশ্চাদপসরণ (Successful retreat)।

৭ম প্রশ্ন—৬০৫ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার পরে অন্ততঃ চৌদ্দ বৎসর অর্থাৎ ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়াধিপ শশাঙ্ক কবি বাণভট্টের লেখনীতে গৌড়াধম ও দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও গৌড়রাজ্যে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। হর্ষবর্দ্ধন এই চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত কুত্রাপি যুদ্ধ করেন নাই। করিলে হর্ষের পক্ষ হইতে ফলাও করিয়া লিখিবার জন্য বাণভট্ট ও হিউ-য়েন-চুয়াঙ শ্রেণীর লোকের অভাব হইত না। কেননা হিউ-য়েন-চুয়াঙ হর্ষ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের যে পঞ্চরাষ্ট্র বিজয়ের কথা উল্লাসভরে লিখিয়াছেন, তাঁর মধ্যে গৌড়রাজ্য অধিকার ও শশাঙ্ককে পরাজয়ের কথা নাই। অথচ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর, পূর্ব্বে নহে, হর্ষবর্দ্ধন ভারতবর্ষের অনেকটা জয় করিয়া একটী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। শশাঙ্ককে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া হর্ষবর্দ্ধন কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্ম্মার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিমূলে শশাঙ্ককে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কি হর্ষবর্দ্ধন, কি ভাস্কর বর্ম্মা—কেহই শশাঙ্কের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারে নাই।

৮ম প্রশ্ন—তবে কি ভাবে শশাঙ্কের মৃত্যু হইল এবং কখন তাহার মৃত্যু হইল? এখানেও ইতিহাস নীরব। হর্ষের চাটুকারগণ নিস্তব্ধ। কেননা শশাঙ্কের স্বাভাবিক মৃত্যু হর্ষের দারুণ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিল। বরং দেখা যায় হর্ষবর্দ্ধনেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই। তাঁহার একজন অমাত্য অর্জ্জুনাশ্ব তাঁহাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল (৬৪৭ খৃঃ)। ইহা হর্ষের পক্ষে নিদারুণ লজ্জার কথা। যাহা হর্ষের পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের কথা সেদিনকার ইতিহাস তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই। সমসাময়িক ঐতিহাসিকের নিকট গৌড়াধিপ ন্যায়বিচার পান নাই। আধুনিকেরা গত ৩০ বৎসর যাবৎ যে কিছু চেষ্টা করিতেছেন তাহাও বিশেষ কিছু নয়।

হিউ-য়েন-চুয়াঙ বলেন,শশাঙ্কের গায়ের মাংস খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হিউ-য়েন-চুয়াঙ ইহা চক্ষে দেখেন নাই, কানে শুনিয়াছেন মাত্র। কেননা হিউ-য়েন-চুয়াঙ শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। হর্ষের চাটুকারেরা সরলমতি এই চীনা ভদ্রলোককে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যে সকল মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া বলিয়াছেন, সুবোধ বালকের মত চৈনিক পরিব্রাজক সরল বিশ্বাসে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বাংলার ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই শ্রেণীর মিথ্যা উপকরণ লইয়াই বাংলার

---

(২) হর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাসে আছে—"দেব,…দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনে—গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে দেবী রাজ্যশ্রী পরিভ্রষ্ট বন্ধনাৎ বিন্ধ্যাটবীং সপরিবারা প্রবিষ্টা।" অর্থ এই "রাজ্যবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করিলে—এবং গুপ্ত নামক ব্যক্তি কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকৃত হইলে রাজ্ঞী রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া (সানুচরী) বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

জীবানন্দ বিদ্যাসাগর "গুপ্তনাম্না" কথাটার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"গুপ্তনাম্না = ছদ্মসংজ্ঞয়া,—নামান্তরং গৃহীত্বেত্যর্থঃ।" অতি মারাত্মক ভুল!' এই ভুলের অর্থ দাঁড়ায় রাজ্যশ্রী ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া নিজেই পালাইয়া গিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও এই ভুলে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। পরিতাপের বিষয়।

কিন্তু ৭ম উচ্ছ্বাসে কথাটা পরিষ্কার হইয়াছে। যথা—"গৌড় সম্ভ্রমং গুপ্তিতো গুপ্তনাম্না কুলপুত্রেন নিষ্কাশনং নির্গতায়াশ্চ রাজ্যবর্দ্ধন মরণ শ্রবণং শ্রুত্বাচ আহার নিরাকরণং অনাহার পরাহতায়শ্চ বিন্ধ্যাটব্বী পর্য্যটন খেদংজাত নির্বেদায়া—পাবকপ্রবেশোপক্রমণং যাবৎ সর্ব্বমশ্বনোৎ ব্যতিকরং পরিজনতঃ।" "গুপ্তনামক কুলপুত্র (ছদ্ম সংজ্ঞায়!) কর্ত্তৃক কান্যকুব্জের কারাগার হইতে তাঁহার (রাজ্যশ্রীর) নিষ্কাশন। এই গুপ্ত নামক কুলপুত্র কে? হয় শশাঙ্ক নিজে, কেননা তাঁহার এক নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। অথবা শশাঙ্কের সেনাপতি যিনি কান্যকুব্জের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—তিনিই রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের আদেশ বিনা ইহা হয় নাই। হওয়া সম্ভব নয়।

(৩) হিয়ানচুয়াং লিখিয়াছেন—"হর্ষ রাজপদে বৃত হইয়া, মন্ত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন…যতদিন আমার ভ্রাতার শত্রুগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে না পারিব—* * ততদিন এই দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আহার্য্য সামগ্রী তুলিয়া মুখে দিব না।"

ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান একটা দিগ্বিজয়ী রাজার অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ কার্য্যকলাপ অতিশয় বিকৃত করিয়া ছোট করিয়া হীন করিয়া ভাবিতে হয়। বাংলার সাহিত্যামোদীগণ, ক্ষণকালের জন্যও সাহিত্যের আসরে আমোদ প্রমোদ ছাড়িয়া বাংলার এই রাজাকে স্বদেশী এবং বিদেশী আক্রমণের মিথ্যা আবর্জ্জনার স্তূপ হইতে উদ্ধার করুন। গৌড়াধিপ কি ইহা আমাদের নিকট প্রত্যাশা করিতে পারেন না ?

মাংস খসিয়া খসিয়া শশাঙ্কের মৃত্যু হউক, ইহাতে শশাঙ্কের কলঙ্ক নহে। ইহাতেও গৌড়বাসীর অগৌরব নাই। কিন্তু ইহা—যে হর্ষবর্দ্ধন হূনগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্য্যন্ত জয়গৌরবে সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন, যিনি সমগ্র উত্তরাপথের রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন—সেই থানেশ্বর ও কনৌজের ভ্রাতা ও ভগিনীর সম্মিলিত রাজশক্তির পক্ষে নিদারুণ পরাজয়। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াও গৌড়াধিপকে বধ করিতে পারেন নাই। যতই অন্ধকার হউক ইহাই শশাঙ্কের ইতিহাস। শশাঙ্কের স্বাভাবিক মৃত্যুই তাঁহার অপরাজেয় বীরত্বের পরিচয়। সুতরাং ৭ম শতাব্দীর ১ম ও ২য় দশকে বাংলাদেশে রাজা ছিল। সেই রাজার রাজধানী ছিল, সৈন্য ছিল, দুর্গ ছিল, নিশান ছিল, ডঙ্কা ছিল, হুঙ্কার ছিল। যাহা হর্ষবর্দ্ধনের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত শক্তিকে তুচ্ছ করিবার স্পর্দ্ধা রাখিত। হায় কর্ণসুবর্ণ, আজ তোমার দগ্ধ মৃত্তিকায় এক ফোঁটা অশ্রু ফেলিবার মত জলও বাঙ্গালীর চক্ষে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৯ম প্রশ্ন—যদি ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক সগৌরবে রাজত্ব করিয়া থাকেন এবং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে হিউ-য়েন-চুয়াঙ ভারতবর্ষে আসিয়া থাকেন তবে, ৭ম শতাব্দীর ৩য় দশকে যে কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয় এবং সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণের প্রাসাদেই তাঁর মৃত্যু হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হিউ-য়েন-চুয়াঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সুতরাং ৬১৯ খৃঃ পর এবং ৬৩০ খৃঃ পূর্ব্বে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা ঠিক তারিখ এতাবৎ আবিষ্কার হয় নাই।

শশাঙ্কের বাণভট্ট ছিল না। মহারুদ্রের উপাসক এই পরম শৈব—গুপ্তযুগে মহাকবি কালিদাসের পর "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ" বলিতে বলিতে যখন শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তখন কি তাঁহার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে কেহই উপস্থিত ছিল না? কনৌজে ব্রাহ্মণ ছিল জানি, কিন্তু বাংলায় কি সেদিন ব্রাহ্মণ ছিল না? শশাঙ্কের বিজয়কাহিনী—মৃত্যুকাহিনী লিখিবার মত লোক কি অকৃতজ্ঞ গৌড়বাসীর মধ্যে সেদিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই? কর্ণসুবর্ণে প্রাসাদ, দুর্গ, তোরণ, নগর, বিপণি, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা—এ সকল ছিল না বলিবার মত আহাম্মক নিশ্চয়ই কেহ নাই। কিন্তু কতবড় দুঃখের বিষয় যে ইহা লিপিবদ্ধ করিবার মত লোক তখনও এবং এখনও বাংলা দেশে নাই। শশাঙ্কের প্রতি অকৃতজ্ঞতার কলঙ্ক দূর করিবার মত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভোগী অধ্যাপকদের মধ্যে কেহ নাই! ইহা উপজীবিকা নয়, ব্যবসা নয়—ইহা সাধনা, ইহা তপস্যা। বাংলাদেশে সাধনার পীঠস্থান। কর্ণসুবর্ণের মহাশ্মশানে শশাঙ্কের অতীত গৌরবের শব লইয়া সাধন করিবার মত কেহই কি আজ নাই ?

দীপিচর্ম্ম-পরিধানা-শুষ্কমাংসাতি-ভৈরবা—বাঙ্গালীর এই ধ্যান কি মিথ্যা! বঙ্কিমের 'দেখ মা যাহা হইয়াছেন' ইহা কি মিথ্যা? ইহা মিথ্যা নয়। বাঙ্গালীর শশাঙ্ক সত্য। এই সত্যকে দর্শন করিবার মত দৃষ্টি আমাদের লাভ করিতে হইবে। আমরা বিভীষিকা দেখিতেছি—সত্যকে দেখিতেছি না।

১০ম প্রশ্ন—শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। ৭ম শতাব্দীর সত্তর বৎসর সম্মুখে বিস্তৃত। হর্ষবর্দ্ধনের প্ররোচনায় সম্ভবতঃ কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ৪র্থ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর রাজা, বাঙ্গালী সৈন্য দিল্লী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল লুণ্ঠন করিয়াছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর 'তেহি দিবসাগতাঃ'—সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নেই। শশাঙ্কের পর হইতেই বাংলাদেশে বিদেশী রাজার আক্রমণের সূত্রপাত হইল। ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রাজা একের পর এক বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। কে কখন আক্রমণ করিল ইতিহাস খুঁজিলে তাহাদের নাম পাওয়া যায়। যথা—১। অজ্ঞাতনামা "পৌণ্ড্র বিজেতা ২। কনৌজ-রাজ যশোবর্ম্মা ৩। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য ৪। কামরূপরাজ হর্ষদেব ৫। জয়ন্ত—কাশ্মীররাজ জয়ন্তের শ্বশুর ৬। গুর্জ্জররাজ—গৌড় ও বঙ্গের দুই রাজাকেই জয় করিয়া দুই শ্বেতছত্র কাড়িয়া নিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর রাজাদের মাথার উপর শ্বেতবর্ণের ছাতা থাকিত। ভিন্নদেশী রাজাদের এই উপর্য্যুপরি আক্রমণে পশ্চিমবঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পূর্ব্ব-বঙ্গের অবস্থা কিছু জানা যায় না। অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

'৮ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পরিব্যাপ্ত বহিঃশত্রুর এই পুনঃ পুনঃ আক্রমণ বাংলাদেশে অরাজকতা আনিয়া উপস্থিত করিল। অরাজকতা অর্থ দেশে রাজা নাই লুঠতরাজ, দস্যুভীতি। পুরাদমে চলিতে লাগিল। অরণ্যে হিংস্র পশুরা যেরূপ আচরণ করে সুসভ্য বাঙ্গালীজাতির মধ্যেও সেইরূপ অবস্থা দেখা দিল। প্রাচীন রাজনীতিবিশারদগণ এই অরাজক অবস্থার নাম 'মাৎস্য ন্যায়' দিয়াছেন। মাৎস্য ন্যায় বলিতে তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, জলে যেমন বড় মৎস্য ছোট মৎস্যকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে, দেশের মধ্যেও সেইরূপ প্রবল দুর্ব্বলকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল। চাণক্য অর্থশাস্ত্রে মাৎস্য ন্যায় সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"অপ্রণীতো হি মাৎস্য ন্যায় সমুদ্ভাবয়তি বলীয়ান বলং হি গ্রসতে দণ্ডধরা ভাবে"—যখন দণ্ড (রাজশক্তি) অপ্রণীত থাকে, তখন মাৎস্য ন্যায়ের প্রভাব হয়। উপযুক্ত দণ্ডধরের অভাবে প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া থাকে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অন্য রাজ্যভুক্ত হইবার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য অথবা মৎস্যের ন্যায় অপর মৎস্যের উদরগ্রস্ত হইবার ভয় দূর করিবার জন্য—" ইত্যাদি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দেড়শত বৎসর এইরূপ মাৎস্য ন্যায় বা অরাজকতা চলিল। শশাঙ্ক বাঁচিয়া থাকিলে এইরূপ হইতে পারিত না। শশাঙ্ক বিদেশী রাজার আক্রমণ বাধা দিতেন। দেশে অরাজকতা দমন করিতেন। একের অভাবে একটা সভ্য জাতির এই শোচনীয় পরিণাম আসিয়া দেখা দিল। এইখানেই ইতিহাস পথে শশাঙ্কের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বাঙ্গালী প্রজা অনুভব করিল। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রজাশক্তি একত্রে সম্মিলিত হইল, এবং প্রজা-শক্তির এই সঙ্ঘবদ্ধ সম্মিলিত শক্তি-কেন্দ্র হইতে বাংলার চণ্ডী আবির্ভূতা হইলেন। তিনি অসুর বধ করিয়া সেই সম্মিলিত শক্তির কেন্দ্র হইতে একটা নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিদেশী আক্রমণের ফলে ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় সাম্রাজ্য স্থাপন হয় নাই। কোন বিদেশী বাংলা আক্রমণ করিতে আসিয়া বাংলায় পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। সেদিনকার বাঙ্গালী জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির ইহাই সর্ব্বোত্তম পরিচয়। বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জ একত্রে মিলিয়া বপ্যটনামক রণকুশল এক ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে সম্রাট পদে বরণ করিলেন। ইতিহাসবিশ্রুত বাঙ্গালীর পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এইরূপে হইল। ভারতের সমগ্র উত্তরাপথে বাঙ্গালীর এই পাল সাম্রাজ্য পরে বহু শতাব্দী ধরিয়া সগৌরবে রাজত্ব করিল।

একা

শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ দে

চারিদিকে নিবিড় নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আসন্ন পূর্ণিমার শুভ্র আলোকে আজ রাত্রি কানায় কানায় ভরে উঠেছে। আমার সঙ্গে দু'দিন আগে যাঁরা ঝাড়গ্রামে এসেছিলেন আজ তাঁরা কল্‌কাতায় রওনা হয়েছেন। রাত্রি তখন এগারটা কি বারটা হবে। আহার শেষ করে জানালার ধারে বসে আছি। সামনে টেব্‌লের উপর খানকয়েক বই। একখানা বই নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে রেখে দিলাম। আজ পড়্‌তে ভাল লাগল না। টেব্‌ল-ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিয়ে সামনের আর একটা চেয়ারের উপর পা তুলে জানালার বাইরে চেয়ে রইলাম। টাইম-পীসটা টিক্‌টিক্ করছিল, উঠে ঘরের অপর পার্শ্বে আলমারীর উপর রেখে এলাম।......দিগন্ত-বিস্তৃত জ্যোৎস্নাসিক্ত মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে বেশ একটা গভীর তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলাম। তবুও একটা অজানা বিরহ থেকে থেকে মনকে কাঁদিয়ে তুল্‌ছিল। জীবনের কত কথাই আজ মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ব্যর্থতায় ভরা এই জীবন। শুক্‌নো ফুলের মত গাছের ডালে ঝুলে থাকার সার্থকতা কি! মানুষ জন্মায় কেন? আমিই বা কেন এই পৃথিবীতে জন্মেছিলাম? আমি আজ মরে গেলে জগতের কতটুকু ক্ষতি হবে? এমনি কত কথাই বসে বসে ভাবছি।

হঠাৎ মনে হল কে যেন বাইরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। এত রাত্রে এই নির্জ্জন গ্রামে কে আসতে পারে। আবার শব্দ হল। কেমন যেন ভয় করতে লাগল; হাত পা অবশ হয়ে গেল। অনেক চেষ্টায় চীৎকার করে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কে? কে ডাকছ?" কোন সাড়া নেই। বাড়ীতে বা আশপাশে আর কেউ নেই যে ডাকি। ভীষণ গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। চুপ করে বসে রইলাম। একটু পরেই আবার শব্দ! নাঃ, আর বসে থাকা চলে না। সাহস করে উঠে দাঁড়ালাম। দরজার পিছন থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে?" খুব ক্ষীণস্বরে উত্তর পেলাম, "আমি, বন্ধু, দরজা খোল, আমি।" পরিচিতস্বর অথচ দরজা খুলতে সাহস হচ্ছে না। আবার ডাক এলো, "ভয় কি? দরজা খোল, আর দাঁড়াতে পারি না।" যন্ত্র-চালিতের মত দরজা খুলে দিলাম। খুলে যা' দেখলাম তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছয় বৎসর পূর্ব্বে মৃত আমার নিকটতম বন্ধু, মীরা। "মীরা!" বলে ডাকতেই আমার কণ্ঠরোধ হল। পাষাণের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

মীরা হেসে বল্লে, "আমায় ভিতরে ডাকলে না? আমি ফিরে যাই?"

আমি তবুও কিছু বলতে পার্‌লাম না। মীরা বল্লে, "ভয় পেয়েছ, না? আমাকে ভয় কি? চল ভিতরে যাই। এইভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? আর সত্যই যদি ভয় পেয়ে থাক, আমি না হয় চলে যাচ্ছি।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, "না, না, তুমি যেও না। আমি ভয় পাইনি, কেবল আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি এ কি ভাবে সম্ভব! এ কি স্বপ্ন না সত্য! যেন সবটাই ভৌতিক ব্যাপার।"

"তুমি ভূত বিশ্বাস কর?"

"চল আগে ভিতরে, সেকথা পরে হবে।" এই বলে আমি ভিতরে চল্লাম। মীরা পিছনে পিছনে আমার ঘরে উপস্থিত হল।

মীরা একবার ঘরের চারিদিক দেখে নিলে। আমি বলবার আগেই জানালার ধারে সে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়্‌ল। পরে আমাকে বল্লে, "দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোসো।" আমি অপর চেয়ারে বস্‌লাম। * * * * * * কিছুক্ষণ চুপচাপ কাট্‌ল।

মীরা বল্লে, "তোমার শরীর কি হয়েছে! এতরাত্রে বসে বসে কি ভাবছিলে?"

"আমি যে জেগেছিলাম, তুমি জানলে কেমন করে?"

"আমি সব জানি; আচ্ছা সত্যি কথা বলতো, তুমি আমার দেখে ভয় পেয়েছ কি না?

"যদি 'না' বলি, মিথ্যা বলা হবে। আচ্ছা, তুমিই বল, হঠাৎ মরা মানুষ যদি বেঁচে উঠে—"

"অর্থাৎ ভূত দেখলে কে না ভয় পায়? হাঁ, তোমাকে যে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তুমি ভূত বিশ্বাস কর কিনা, তুমি ত কিছু বল্লে না।"

"ভূত চোখে কখনও দেখি নি। তোমাকে ছ' বছর পরে আজ প্রথম দেখলাম। কিন্তু তোমাকে ভূত ছাড়া কি বলব, তাও ভেবে পাই না।"

মীরা "হুঁ" বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লে।

"তুমি মনে কষ্ট পেলে?"

"না, কিছু না। মানুষ মরলে সে হয় ভূত, তোমাদের জীবন্ত জগতের সঙ্গে তার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে যায়। আচ্ছা, বলতে পার, তুমি যেমনটী আমায় ভালবাসতে আজ তেমনি ভাল-বাস্‌তে পার কিনা? এখন যদি বলি, 'আমার জন্য প্রাণ দাও,' দিতে পারবে?"

"তোমার নাম করে যদি প্রাণ দিতে হয় তা' পারি। আর আমার জীবনের কি আকর্ষণ, কতটুকুই বা মূল্য? এতক্ষণ ত বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলাম। তুমি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছ আমিও সেই মুহূর্ত্তে মরেছি। এ কথাটা এখন এত স্পষ্ট হলেও—আবিষ্কার করতে অনেকদিন লেগেছে। তুমি যতদিন বেঁচেছিলে তোমার ভালবাসার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত অনুভব করিনি। এ জীবন-নায়ের মাঝি ছিলে তুমি; তুমিই সব টাল সাম্‌লেছ। তুমি মরে যাবার পর থেকে কঠিন পৃথিবীতে পা ফেলে চল্‌তে আরম্ভ করলাম। যত পায়ে বেজেছে, তোমার জন্য তত অশ্রুবিসর্জ্জন করেছি। একে একে কত স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। এখন জীবন অন্ধকার! হা-হুতাশে ভরে উঠেছে! এখন আমি বেঁচে আছি, কি মরে গেছি ঠিক

বলতে পারি না। তুমি মরে গিয়ে ভূত হয়েছ, আর আমি ভূত হয়ে বেঁচে আছি।"

"তুমি আমায় কত ভালবাসতে জানি। আমিও কি তোমায় ছেড়ে···না, অসম্ভব, অশরীরী জীব রক্ত মাংসের লোককে ভালবাসতে পারে না। পার? তুমি এখনও আমায় ভালবাসতে পার?"

"সম্প্রতি তোমায় একরকম ভুলেই ছিলাম। না, ঠিক ভোলা বলা চলে না। তোমার অভাব সহ্য করায় অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তবে তোমাকে ভুলতে পারি না, অশরীরী তোমাকেও ভালবাসি। আমি ভালবেসেছিলাম তোমাকে, তোমার বাহিরের কাঠামোটা নয়। শুনেছি তোমরা লোকের মনের কথা জানতে পার। তাই যদি হয়, তুমি বোধহয় বুঝতে পারছ আমার মনের প্রকৃত অবস্থাটা কি।"

"ভালবাসার অভাব তোমাকে পীড়ন করছে? তুমি যে বললে, এখনও তুমি আমাকে ভালবাস?"

"ঠিক বলেছ, তোমার ভালবাসাই ছিল আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তুমি যেদিন থেকে নেই, সেদিন থেকে আমার এত একা একা মনে হয় যে, আশ্চর্য্য হয়ে যাই এত ভীড়ের মধ্যে থেকেও একাকী মনে হয় কেন? সংসারের পথে চল্‌তে গেলে সঙ্গীর দরকার হয়; একা চলা ভারী শক্ত, বিশেষতঃ আমার মত লোকের পক্ষে। অথচ সময় সময় লোকালয়, লোকের ভীড় আমার একেবারে অসহ্য মনে হয়। নিরালায় বসে তোমার স্মৃতিকে স্মরণ করি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, স্মৃতি কথা কয়না, আমার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। আজকের মত তোমার দেখা ত ছ' বছরের মধ্যে একদিনও পাইনি।"

"না, না, না, কি করছ? আমায় ছোঁবার চেষ্টা কোরো না।"

"তবে তোমার শরীরটা মিথ্যা? আমি পরীক্ষা করছিলাম সত্যই তুমি রক্তমাংসের শরীর ধারণ করেছ কি না।"

"মিথ্যা নয়, শরীরটা না থাকলে তুমি আমায় চিন্‌তে পারতে না।"

"তোমার সম্বন্ধে আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয় তুমি আমায় ভুলে গেছ। তোমাকে আমার যতই প্রয়োজন থাকুক, তুমি এ সংসারের সমস্ত প্রয়োজন অপ্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে গেছ। তোমার ছবির দিকে চেয়ে মনে হয়,

"এক সাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।"

কখনও আবার ভাবি,

কবির অন্তরে তুমি কবি
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।"

মীরা বল্লে, "আজকাল কাব্যচর্চ্চা খুব বেড়েছে দেখছি। কিন্তু বাস্তব জগৎটা কাব্য নয়।"

"কাব্য নিয়ে পেট ভরে না জানি। কিন্তু কাব্যের মধ্যে যে 'সত্যম শিবম্ সুন্দরম্'-এর সন্ধান পেয়েছি সেটাও ত অস্বীকার করা চলে না। বাস্তব জগতের সত্যের কাছে সেটাও কম সত্য নয়। বাস্তব জগৎ সত্য, কিন্তু বড় বেসুরো। বাস্তব জগৎ নিয়েই ত প্রকৃত কাব্য। "ছন্দে উঠে রবি শশী, ছন্দে উঠে তারা"—সে ত এই বাস্তব জগতেরই কথা। তুমি কি বলতে চাও এই কাব্যের সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ নেই? বাস্তব জগৎ যা' নিয়ে কোলাহলের সৃষ্টি করে, কাব্য তাই নিয়েই সঙ্গীতের রূপ দেয়। * * * পশ্চিমের কাছে শেখা Realism জিনিষটা অনেক সময় প্রকৃত সত্যের কাছ দিয়েও ঘেঁসে না। পশ্চিমের চিন্তাশীল ব্যাক্তিরাও আজকাল ধীরে ধীরে সেটা বুঝতে পারছেন। বাস্তবতার নামে যেটাকে আমরা idealistic philosophical বলে উপহাস করি, সত্যের পরিবর্ত্তে যা' আমাদের মন ধোঁয়াটে করে, সত্যের সন্ধান অনেক সময় তারই মধ্যে পাওয়া যায়। মাটীর উপরে গাছের যে ফলফুল পাতা শোভা পায় তাকেই পরম ও সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেওয়া ভুল। কারণ মাটীর নীচের শিকড় যে জীবন রস জোগায়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।"

"থামলে কেন? তোমার বক্তৃতা ভালই লাগছিল।"

"ঠাট্টা করছ? বেশ, মুখে চাবি দিলাম।"

"না না না, হাঁফিয়ে উঠবে।···রাগ করলে?"

"বল্লাম যে মুখে চাবি দিয়েছি।"

"আচ্ছা কানে ত তুলো দাওনি। চুপ করে না হয় এবার আমারই দু'চারটে কথা শোন। তোমাদের জীবন্ত মানুষের জীবন বড় জটিল। সভ্যতার বিকাশে জটিলতা বেড়েছে; কিন্তু মানুষ অগ্রসর না হয়ে যেন পিছিয়ে পড়্‌ছে অথবা যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে। রঙচঙে বেশভূষা করলেই ত আর সত্যকার সৌন্দর্য্য বাড়ে না। এরোপ্লেন ও মোটরে চাপলেই মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। যাঁরা আবার জটিলতা বাদ দিয়ে জীবনটাকে খুব বেশী সরল করে ফেলবার চেষ্টা করেন, তাঁরাও জীবনের সম্পূর্ণতা হারিয়ে ফেলেন। তোমার উপমা নিয়েই বলি, জীবন-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাকে কেউ জীবন বলে ভুল করেন, কেউ বা ফুল বা ফলটাকেই জীবন মনে করেন। এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি সমস্ত জীবন-বৃক্ষটী একসঙ্গে দেখতে পান। সত্যই যে মানুষের মত বাঁচতে চায়, তাকে হতে হবে সম্পূর্ণ মানুষ।"

"এত তুমি আমার কথাই বল্লে, তোমার মতের তফাৎ কোথায়?"

"বাঃ এক-কে এক না বলে দুই বলব কেমন করে? আমার এ কথা বলবার উদ্দেশ্য, তুমি কাব্য থেকেই হোক, দর্শন থেকেই হোক—আর বিজ্ঞান থেকেই হোক, সত্য উপলব্ধি কর, তাতে দোষ নেই। কিন্তু ডানা মেলে Shellyর মত আকাশে উড়ো না। তাতে আরাম থাকতে পারে, সৌন্দর্য্য থাকতে পারে; কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দেওয়া হয়।"

"Shelly হতে পারলে সত্যকে ফাঁকি দিয়েও সুখী হতে পারতাম।"

"তুমি সুখকে সত্যের চেয়ে বড় মনে কর, তা' আমি ভাবিনি।"

"ঠিক তা নয়, সত্য নিয়ে থাকতে গেলে অজ্ঞ লোকে এত ভুল বুঝে যে সময় সময় মনে হয় এখান থেকে পালিয়ে বনে জঙ্গলে বাস করিগে। বাস্তবিক আমার কাজে, আমার কথায় লোকে আমায় এত ভুল বোঝে কেন তা বল্‌তে পারি না। অথচ তারা ভাবে আমার মন তাদের নখদর্পণে। আমার মন যদি কখনও

কারও নখদর্পণে থেকে থাকে ত সে তোমার। আমার চেয়েও আমাকে ভাল বুঝতে তুমি।"

"প্রশংসার জন্ত ধন্তবাদ।"

"মীরা, তোমার সঙ্গে কি মন খুলে কথা কইতে পাব না? তুমি যেন আজ আমায় ব্যথা দেবার জন্তই এসেছ।"

"যদি তাই মনে হয়, তবে তাই। ব্যথা ত দেবই। হায়, বাছা অমিয় আমার! বসে বসে স্বপ্ন দেখছ—তুমি আমার কত ভালবাস! আমার জন্ত মনে মনে কতবার প্রাণ বিসর্জ্জন দিচ্ছ। এ তোমার অহঙ্কার, অহঙ্কার। নিজেকে ভাবছ মস্ত বড় স্বার্থহীন মহাপুরুষ। আহা, বাছা আমার! কত আশাই করেছিলাম!"

"তুমিই বল আমি কি করতে পারি! আমার কতটুকু শক্তি? তুমি কি বলতে চাও আমি অমিয়কে ভালবাসি না? তোমাকেও ভুলে গেছি?"

"যদি সত্যই ভালবাস, সেই মত কাজ কর। প্রকৃত ভালবাসার জন্ত অনেক সইতে হয়। আঘাতের ভয়ে, বেদনার ভয়ে লুকিয়ে পড়্‌লে চলবে না।"

"মীরা, তুমি যত পার আঘাত কর, আজ আমি কোন প্রতিবাদ করব না। তাই আমার প্রাপ্য। আমি ভাবি এক, হয় আর এক। আমি কী করব! * * * আমি তোমারই হাতে গড়া, মীরা। কেন তুমি আমায় তখন এমন করে গড়েছিলে? তুমি যদি মাঝ-গঙ্গায় গিয়ে জলে ঝাঁপ দেবে, তবে আমায় দাঁড় বাইতে শেখাও নি কেন। * * * না, দোষ আমারই। আবার কে কড়া নাড়ে?"

"তুমি বোসো, আমি দেখছি।"

"না না, তুমি দাঁড়াও * * * মীরা, মীরা—কোথায় গেলে মীরা—"

* * * *

"এ কে? তুমি! তুমি ফিরে এলে?"

"কি করি? ষ্টেশন থেকে কানু ধরে নিয়ে গেল, তার মেয়ের কলেরা, আমি না গেলে বাঁচে না। তাই ওদের চলে যেতে বল্লাম, আমি সকালের ট্রেনে যাব। তা' তুই ছুটছিলি কোথায়? কাকে ডাকছিলি?"

"সে কথা পরে বলছি। তুমি কড়া নাড়্‌লে দরজা খুলে দিলে কে?"

"কেন? দরজা ত খোলাই ছিল, কড়া নাড়্‌তে যাব কেন?"

"তা' হলে……সবই ভুল!!!"

বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথের স্থান

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস এম্‌-এ

উজ্জ্বল আলোকময় প্রকোষ্ঠে আসীন হইয়া গৃহের সুন্দর সজ্জা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিতেছিলাম। যে উজ্জ্বল আলোকবর্ত্তিকার প্রভাবে গৃহমধ্যস্থিত মনোমুগ্ধকর বস্তুসকল নয়ন সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল তাহার দিকে দৃষ্টি পতিত হয় নাই বা তাহার উজ্জ্বলতা পরিমাপের অবসর হয় নাই। কিছুকাল পরে গৃহস্বামী আসিয়া আলোক বর্ত্তিকা লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; অবস্থা বিপর্য্যয়ে কিয়ৎকাল তমসাচ্ছন্ন হইয়া মোহাবিষ্টের ন্যায় রহিলাম—কি হইল কিছু যেন বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ দেখিলাম দিগন্তব্যাপী আঁধার প্রান্তর মধ্য দিয়া ঐ আলোক দূর হইতে সুদূরে নীত হইতেছে এবং লক্ষ্য করিলাম দীপ-শিখা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতেছে—উহার নয়নলোভন স্নিগ্ধতা ও ঔজ্জ্বল্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ দীপ আমাদেরই মধ্যে বিরাজ করিতেছিল, তখন তো তাহাকে এরূপ দেখি নাই।

রবীন্দ্র-প্রতিভালোক সহসা অন্তর্হিত হইয়াছে এবং আমরা এখনও ঐ গৃহবাসীদিগের ন্যায় মোহাবিষ্টই রহিয়াছি। কিন্তু দূরে ঐ আলোকের প্রকৃতরূপ দেখিবার সময় আসিয়াছে ও আসিবে; যতই দিন যাইবে ততই দেখিতে পাইব—যাহা পূর্ব্বে দেখি নাই। সভ্যতার প্রথম হইতেই জগতে মহাপুরুষদিগের সম্পর্কে ইহাই ঘটিয়া আসিতেছে; জীবিতকালে তাঁহারা কেহই জগদ্বাসীর নিকট সম্যক পরিচিত হন নাই।

আজ বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয়ের সময় আসিয়াছে; ভবিষ্যতে আরও ভালভাবে তাহা নির্ণীত হইবে। এই কার্য্য অল্প কথায় সুষ্ঠু ও সম্যক সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়; তথাপি আজ ইহাই ভাল করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন, এজন্ত অল্প কথায়ই বক্তব্য যথাসাধ্য বিবৃত করা যাইতেছে।

এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন কবির প্রতি সমগ্রভাবে আলোকসম্পাত করা; তাঁহাকে আজ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে তাঁহার স্থান কোথায় তাহা দেখিতে পাইব না—এ সম্পর্কে কবি নিজেই আমাদিগকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার শেষ জীবনের একটী প্রবন্ধে[১] "আজ আশী বছরের আয়ু ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচ্ছিন্ন ক'রে যেতে ইচ্ছা করেছি।" তাঁহারই কথামত তাঁহার 'জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে' দেখিতে পারিলেই আমরা তাঁহার স্থান জগতে মহাপুরুষদিগের মধ্যে কোথায় বুঝিতে পারিব। কবি শুধু আমাদের এই পথ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—নিজেই আমাদের জন্ত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন ঐ একই প্রবন্ধে। তাঁহার কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার সম্পর্কে আমাদের ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা তিনি রাখেন নাই। তাঁহার কাব্যপাঠে উহার মর্ম্মকথা বলিয়া যাহা আমরা বুঝি এবং উক্ত প্রবন্ধে যাহা তিনি তাঁহার "জীবনের চরম-তাৎপর্য্য" বলিয়া বুঝাইয়াছেন—এই উভয় হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে—রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ (unique); তিনি কেবলমাত্র মহাকবি নহেন—তিনি মহাকবি ও দ্রষ্টা (seer) একাধারে দুইই; তিনি দ্রষ্টা কেননা তিনি পরমার্থতত্ত্বে দৃষ্টিসম্পন্ন—এই অর্থে ঋষি। ইহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এতদনুসারে রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণীত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত দ্রষ্টা ছিলেন কিনা তাহার প্রমাণ কেবল সূত্রবিহীন ভাবে (without context) তাঁহার কবিতা হইতে পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া না দেখাইয়া, মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে ১লা বৈশাখ, ১৩৪৭

১। প্রবাসী—১লা বৈশাখ, ১৩৪৭—"জন্মদিনে"।

সালে লিখিত "জন্মদিনে" নামক পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে তাঁহার "জীবনের চরম তাৎপর্য্য" বুঝাইতে গিয়া নিজে যাহা বলিয়াছেন তাহাই এই প্রবন্ধের পক্ষে অপরিহার্য্য সাক্ষ্য বিবেচনায় যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষার সাহায্যে বিবৃত করা হইতেছে। তাঁহার ভিতরকার যে নিগূঢ় "প্রবর্ত্তনা" তাঁহার সত্তাকে বিশিষ্ট রূপ দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন, "জীবনের যেটা চরম তাৎপর্য্য, যা তার নিহিতার্থ, বাইরে যা ক্রমাগত পরিণামের দিকে রূপ নিচ্ছে, তাকে বুঝতে পারছি সে প্রাণস্য প্রাণং, সে প্রাণের অন্তরতর প্রাণ।...আমার মধ্যে সেই রকম সৃষ্টি-সাধনকারী একাগ্র লক্ষ্য নির্দ্দেশ করে চলেছেন একটী গূঢ় চৈতন্য।" এই গূঢ় চৈতন্যের প্রবর্ত্তনায় তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যে ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে বাল্যেই তাহার প্রথম নিদর্শনের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—"আমার মনের সঙ্গে অবিমিশ্র যোগ হ'তে পেরেছে এই জগতের। বাল্যকাল থেকে অতি নিবিড়ভাবে আনন্দ পেয়েছি বিশ্বদৃশ্যে। সেই আনন্দবোধের চেয়ে সহজ পূজা আর কিছু হ'তে পারে না"; আবার তার সেই আনন্দবোধ আনন্দদানের বস্তু অপেক্ষা তুলনায় অনেক বেশী; তাই বলিতেছেন "বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশী।" তাহার কারণ এই আনন্দধারার উৎস ছিল তাঁহার ভিতরে এবং বাল্যেই তাহা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল; তিনি বলিতেছেন—"বাল্য বয়সের শীতের ভোরবেলায় বাড়ীর ভিতরের প্রাচীর ঘেরা বাগানের পূর্ব-প্রান্তে একসার নারকেল পাতার ঝালর তখন তরুণ আভায় শিশিরে ঝলমল করে উঠেছে। একদিনও পাছে এই শোভার পরিবেশন থেকে বঞ্চিত হই সেই আশঙ্কায় পাতলা জামা গায়ে শীতকে উপেক্ষা করে ছুটে যেতুম...এইখানে যেন ভাঙা কানাওয়ালা পাত্র থেকে আমি পেতুম পিপাসার জল। সে জল লুকিয়ে ঢেলে দিত আমার ভিতরকার এক দরদী।" এই "পিপাসার জলের" উৎস বা রসসম্ভোগের প্রাণ ছিল—সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টি কর্ত্তার প্রকাশ দর্শন। তাই তিনি বলিতেছেন "দেবতার কাব্যে নিয়মজালের ভিতর থেকেই নিয়মের অতীত যিনি তিনি আবির্ভূত; সেই কাব্যে কেবলমাত্র আছে তাঁর বিশুদ্ধ প্রকাশ।" এই প্রকাশ প্রথম হইতেই তিনি দেখিয়াছিলেন; ইহা দেখিবার জন্য তাঁহার যোগ্যতা কী ছিল? বলিতেছেন "ঋগ্বেদে একটা আশ্চর্য্য বচন আছে—'হে ইন্দ্র তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই তবু প্রকাশ হবার কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর'—সত্যভাবে প্রকাশ পেতে হ'লে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই...সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই...ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ।"[১] "বন্ধুত্বের যোগ," "ভাল লাগার" যোগ, এই ছিল তাঁর "সৃষ্টি সাধনকারী" কাব্য-প্রতিভার একাগ্র লক্ষ্য; তাই বার বার তিনি তাঁহার কবিতার নানা ভাষায় ঐ একটী ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন; "গীতাঞ্জলি"তে তাহার ভাষা হইয়াছে—

> বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহর
> সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
>
> ৭ই আষাঢ় ১৩১৭
>
> সীমার মাঝে, অসীম তুমি বাজাও আপন সুর
> আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর
>
> ২৭শে আষাঢ় ১৩১৭

ইহার দুই বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত (১৩১৯) "জীবনস্মৃতি"তে লিখিয়াছেন "আমার তো মনে হয় আমার কাব্য রচনার এই একমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনের পালা।" এই সহজ বন্ধুত্বের যোগের জন্য কঠোর-তপস্যার বা বিবিধ দর্শন শাস্ত্র জ্ঞানের প্রয়োজনের কথা বলেন নাই; শুধু বলিয়াছেন—"আমি সাধু নই সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃতস্বাদের আমি যাচনদার, বার বার বলতে এসেছি ভালো লাগ্‌লো আমার।"[২] একথা সত্য যে সাধারণ অর্থে তিনি সাধক ছিলেন না; কারণ আমাদের দেশে 'সাধক' বলিলেই বুঝি পরমার্থ লাভের জন্য একাগ্রভাবে ধ্যানের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সোপান বা বিশেষ পন্থানুসরণকারী ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই অর্থে সাধনা করেন নাই। কিন্তু তিনি যে বস্তুর "যাচনদার" উহাই তাঁহার সাধনীয় এবং কবি বলিতেছেন তিনি "বিশ্ব-রচনার অমৃত-স্বাদের যাচনদার"—ইহা তো প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বা philosophyর "যাচনদার" হওয়া; "Philosophy is the account which the human mind gives to itself of the constitution of the world. (Emerson); ইহা সেই রসাস্বাদন—

> "যে রস পাইলে স্বাদ না থাকে অপর সাধ"

আর সে স্বাদ-লাভ যে তাঁহার হইয়াছিল তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ কবিতাগুলি—যাহার প্রভাব দেশে কালে আবদ্ধ নয়। তাঁহার ভালো লাগার" কারণ ছিল "চেয়ে দেখা"; তিনি বলিতেছেন, "জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে...এই দেখা এবং দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি।" তিনি কী দেখিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন, "সংসারের নিয়মকে—মূঢ়ের মতো তাকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় বিকৃত করে দেখি নি, কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহারের মাঝখান দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার মন যুক্ত হ'য়ে চলে গেছে সেইখানে যেখানে সৃষ্টি গেছে সৃষ্টির অতীতে। এই যোগে সার্থক হয়েছে আমার জীবন।"...সৃষ্টির সহিত "বন্ধুত্বের যোগে" এই "চেয়ে দেখা" বা সত্যদৃষ্টি লাভ সম্পর্কে কবি Wordsworth ঠিক একই ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

> "While with an eye made quiet *by the power*
> *Of harmony*, and the deep power of joy,
> *We see into the life of things.* (*Tintern Abbey*)

সেই দৃষ্টি—"The vision and the faculty divine"—রবীন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছিলেন, এজন্যই তিনি দ্রষ্টা বা ঋষি; এবং যেহেতু তাঁহার কথানুসারে "এই দেখা এবং দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি"—তিনি দেখিয়া দেখাইয়াছেন, এজন্য তিনি স্রষ্টা, তিনি প্রকৃত কবি—এইখানেই তাঁহার 'সৃষ্টি সাধনকারী একাগ্র লক্ষ্যের" পরিণতি।—ইহাই ছিল এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

এইখানে প্রাসঙ্গিকভাবে আর দুই একটী কথা বলা হইতেছে। "চেয়ে দেখার জন্য যে আলোকের প্রয়োজন তাহা তিনি পাইয়াছিলেন কোথায় তাহার সন্ধানও তিনি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—"আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" এই অন্তর্দৃষ্টির আলোকই ছিল তাঁহার "সহজ পূজার" নৈবেদ্য, আর সেই পূজার বোধন হইয়াছিল বাল্যকালেই "উপনিষদ আবৃত্তি"তে। "বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে" দেখা ও "মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখা"—এই দুইটী তাঁহার কাব্যের প্রধান কথা। "আর প্রথম আমি (কড়ি ও কোমলে) সেই কথা বলেছি যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তর অন্তরে বার বার প্রবাহিত হয়েছে:—

> মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
> মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,—"

"কবির মন্তব্য", "কড়ি ও কোমল" রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড। অতি সহজ কথায় ব্যক্ত এই ভাবের দৃষ্টান্ত—

> প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
> চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা

২। "জন্মদিনে"—প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭

নিশীথ আকাশ মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটী গ্রহ-তারা ;
সুগভীর তামসীর ছিদ্রপথে যেন
জ্যোতির্ম্ময় তোমার আভাস
ওহে মহা অন্ধকার, ওহে মহাজ্যোতি,
অপ্রকাশ, চির স্বপ্রকাশ !
—মানসী, "জীবন-মধ্যাহ্ন" (১৩ই বৈশাখ ১৮৮৮)

এই চরম তাৎপর্য্যকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্যকে দেখিলে দূর হইতে তাজমহলের শিল্পচাতুর্য্যই দেখা হইবে, কিন্তু—

"সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে"

তাহার মর্ম্মকথা যে

"প্রেমের করুণ কোমলতা কুটিলতা"

দেখা হইবে না।

আরও একটী দিকে রবীন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিয়াছিলেন—সর্ব্বোপরি যাহার জন্য তিনি দ্রষ্টা এবং এদিকেও কবি নিজেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন—"কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটী প্রবল প্রবর্ত্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটী বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ।" একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে এখানেও আমরা দেখি সেই "আবাল্য উপনিষদ আবৃত্তির" প্রভাব। উপনিষদের পরলোক-তত্ত্ব তিনি গভীরভাবে উপলব্ধিপূর্ব্বক স্বীয় প্রতিভা-বলে নূতন আলোকে মণ্ডিত করিয়া নূতন ভাষায় জগতকে দিয়া গিয়াছেন। উপনিষদের ঋষি বলিয়াছিলেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা-বিদ্যতেঽয়নায়" (তাহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন ; অমৃতত্ব-প্রাপ্তির অন্যপথ নাই)। রবীন্দ্রনাথও বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। উপনিষদের যে বাণী তাঁহার অন্তরকে স্পন্দিত করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ভানু-সিংহের পদাবলীতে উচ্চারিত হইয়াছিল—

মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান।

উহাই পরবর্ত্তী জীবনে কবির অন্তরে যে গভীর অনুভূতিলব্ধ উজ্জ্বল সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল এবিষয়ে তাঁহার পরলোক বিষয়ক সঙ্গীত ও কবিতা পাঠে আর সন্দেহ থাকে না।—

(১) অন্ন লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায় ; (২) "তোমার অসীমে প্রাণ মন ল'য়ে যতদূরে আমি ধাই"; (৩) "কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয় ? জয় অজানার জয় !" (৪) "সম্মুখে শান্তির পারাবার"—প্রভৃতি সঙ্গীতের তুলনা নাই। মৃত্যুর দ্বার অতিক্রম করিয়া যে অজানা অনন্ত জীবন প্রসারিত তাহাকে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ইহজীবনের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিয়া তাহার জয়গান এইভাবে কোন দেশের কোন কবি করিয়াছেন? এখানে দেখি দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সেই জীবন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টি—"the faith that looks through death" (Wordsworth)। ভবিষ্যতে এই সকল সঙ্গীতের বিস্তৃত প্রচারের ফলে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে শোকবিদ্ধ সকল নরনারী যে পরম সান্ত্বনা ও শান্তিলাভ করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শত শত বর্ষপরে কবির অন্য সকল কবিতা মানবসমাজের স্মৃতিপট হইতে যদি মুছিয়া যায় তথাপি এই supreme universal interestএর সঙ্গীতগুলি দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অমর হইয়া থাকিবেন। ইদানীং অনেক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে কবির শেষ বয়সে লিখিত কবিতাগুলিতে তাঁহার কাব্যশক্তির অভাবের চিহ্ন দেখা যায় ; কিন্তু ইহজীবনের সীমানায় দাঁড়াইয়া প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুসংবাদে যে কবিতাটী লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে যে কেবল দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পরলোক সম্পর্কে দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠার পরিচয় পাই তাহা নয়, উহাতে প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকারী কাব্যপ্রতিভার বক্তব্যবিষয়ের উপর সেই প্রকার আলোকসম্পাতকার্য্যের, যাহার সম্বন্ধে Wordsworth বলিয়াছেন—

"...to add the gleam
The light that never was on sea or land."—
সায়াহ্ন বেলার ভালে অস্তসূর্য্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত-শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিম সীমায়।
আলোক তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।

এক্ষণে প্রবন্ধের সিদ্ধান্তের বিষয়—রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইবে কাহাদের মধ্যে। পাশ্চাত্য মনীষী Emerson জগতের মহাপুরুষদিগের সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যের মধ্যে একস্থানে বলিয়াছেন,' The human mind stands ever in perplexity, demanding intellect, demanding sanctity, impatient equally of each without the other"— (অর্থাৎ, মানবের মন নিয়তই দ্বিধাবিভক্ত, কখনও চায় মানসিক প্রতিভা, কখনও চায় আধ্যাত্মিকতা—দুইএর জন্যই ব্যাকুল, কিন্তু দুইটাকেই পরস্পর বিযুক্তভাবে চায়) ; "If we tire of the saints, Shakespeare is our city of refuge" (সাধকদিগের কথা শুনিতে গিয়া যখন বিগতস্পৃহ হই তখন আমরা কবি Shakespeareএর শরণাপন্ন হই)... "The reconciler has not yet appeared" (এই উভয় সমস্যার সামঞ্জস্যকারী আজিও আসেন নাই) ; "The world still wants its poet priest, a reconciler...who shall see, speak and act, with equal inspiration।" রবীন্দ্রনাথের জন্মের প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে Emerson এই কথা লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের মর্ম্মকথা যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন এই—Emerson কথিত "poet, priest, a reconciler"—একাধারে মহাকবি ও দ্রষ্টা আসিয়াছেন কি ?

এক্স্প্লয়্‌ট্‌

কুমারী রাণী মিত্র

গত সন্ধ্যায় এই কুলী-বস্তিতে এক বাবু আসিয়া কি সব বলিয়া গিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া ইহাদের সকলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরের ভিতরে যেন একটা উত্তেজনার স্রোত বহাইয়া দিয়াছিল। আর এই স্রোতটা বনোয়ারীর ভিতরেই যেন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই আজ সেই বাবুটির নির্দ্দেশে তাহারা হাজিরাবাবুর ফেল্‌ফেলায়মান দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া সুবিদিতধ্বনি সহকারে পথে বাহির হইয়া আসিল। মেশিন্‌গুলি অচল হইয়া গেল। যথারীতি মালিক ও পুলিশ আসিল। বাবুটি পুলিশ-কবলিত হইলেন। পুলিশের মর্জ্জিতে অথবা মালিকের ইঙ্গিতে বনোয়ারীকে বাবুটীর সহগামী হইতে হইল না। সে তাহার দলবল লইয়া সহরের প্রশস্ত পথগুলি ঘুরিয়া আস্তানায় ফিরিয়া গেল।

মিল বন্ধ হইল। মালিক নূতন মজুর আনিয়া তাহাকে সচল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সফল হন নাই। কাজেই কল বিকল হইয়া রহিল। বনোয়ারী প্রমুখ কুলীরাও ক্রমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। পুঁজির ব্যাপারে চিরকালই ইহারা উদাসীন এবং অক্ষম। সুতরাং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহাদের অবস্থা চরমে উঠিল।

সেদিনের সেই বাবুটীর মত বনোয়ারীদের বস্তীতে আর একবাবু আচম্বিতে উপস্থিত হইলেন। ইনি আবার আর এক রকম কথা বলেন: মালিকের সঙ্গে চুক্তি—মাগ্‌গীভাতা—ব্যাক্‌ল-ওয়াল—স্লীট্‌ষ্ট্রেক্‌—আত্মরক্ষা—দেশরক্ষা—ইত্যাদি—ইত্যাদি। সব কথা শুনিবার আর দরকার হয়না। হাঁড়ীর কথা চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা রাজী হইয়া যায়।

কাজেই পরদিন সকালে আবার ইহাদের হাজিরাবাবুর সম্মুখ দিয়া দল বাঁধিয়া কাজে যাইতে দেখা যায়। হাজিরাবাবুর দৃষ্টি এই-বার আর ফেলফেলায়মান নয়। রীতিমত পরিহাস সূচক। সামনেই মালিক দাঁড়াইয়া। পায়ের জুতা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত তাঁহার মালিকানা ঘোষণা করিতেছে। বনোয়ারী সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় একবার চাহিয়া দেখিল। মালিকও বনোয়ারীর দিকে তাকাইলেন। আসলে তাঁহার দৃষ্টি বনোয়ারীকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। সামনে পাইয়া সক্রোধে কহিলেন—"ফের্ যদি তোমায় দেখি ও-সব আরম্ভ করেছ, তোমায় আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব। হারামজাদা কোথাকার! সকলের···" বলিতে বলিতেই থামিয়া গেলেন। বনোয়ারী কিছু না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। সকলেই কাজে যোগ দিয়াছে। যন্ত্রদানব তাহার সুপরিচিত নির্ঘোষে তাহা জানাইয়া দিতেছে।

ছুটীর পর ঘরে ফিরিয়া বনোয়ারী মালতীকে ঘরের ভিতর মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকিতে দেখিয়া ভীষণ চটিয়া গেল। মালতী মিলের মালিক নয় কিম্বা হাজিরাবাবুও নয় যে, নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া সে চলিয়া যাইবে—তাহার লাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব এইখানে সঞ্জীবিত হইয়া ওঠিল। এক লাথিতে মালতীকে সরাইয়া দিয়া সগর্জ্জনে ঘরে ঢুকিয়া গেল। একজনের রক্ত জল করা রোজগারে নিত্য ভাগ বসাইয়া আয়েসে নিদ্রা যাওয়াটা যে অন্যায় মালতীকে লাথি মারিয়া তাহাই জানাইয়া দিল। আকস্মিক আঘাতে মালতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু বনোয়ারীর কথাগুলি শুনিয়া সে লাথির চেয়ে অধিক আঘাত পাইল। কিন্তু এই সকল কথাতো সে কোনদিনই অস্বীকার করে নাই। বস্তুতঃ, শরীরের রক্ত জল করিয়া যে রোজগার করিয়া আনে তাহার জন্য সে অন্যান্য অসংখ্য স্ত্রীর মতই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বতোভাবে তাহার সেবা ও পরিচর্য্যা করিবার চেষ্টা করে। এই যে তিনদিন বনোয়ারী বসিয়াছিল সেই তিনদিন সে দুইবেলা পরিপূর্ণভাবে না হইলেও একেবারে অনাহারে ছিল কি? সে আহার কোথা হইতে আসিয়াছিল? মালতীই প্রতিবেশীদের নিকট হইতে ধার করিয়া, থালাঘটি বাঁধা রাখিয়া চাউল জোগাড় করিয়া আনিয়া-ছিল। বনোয়ারীকে রাঁধিয়া দিয়াছিল। বনোয়ারী খাইয়া ভাত বাঁচিলে তবেই তাহার ভাগ্যে জুটিত! আজ যে মালতী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা পরিপূর্ণ আহারের পর সুখ নিদ্রা নহে। উপবাসী দেহ বহনে অক্ষম হইয়াই সে আজ মাটিতে এলাইয়া পড়িয়াছিল। মালতী আজ সকালে তাহাদের প্রতিবেশী ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে পিতলের একটা হাঁড়ী বাঁধা রাখিয়া চাউল চাহিতে গিয়াছিল। এই গৃহে ইহারা প্রায়ই ঔষধ এবং মাঝে মাঝে পথ্য সাহায্যও পাইয়া থাকে। আজ ছোটলোকের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ডাক্তার গৃহিণী ভীষণ চটিয়া গিয়া মালতীকে হাঁকাইয়া দিয়া-ছিলেন। তাই বনোয়ারীকে আজ না খাইয়া কাজে যাইতে হইয়াছিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়েক মুষ্টি চাউল যখন মালতী জোগাড় করিয়াছিল তখন বনোয়ারী চলিয়া গিয়াছে। বেগুন সহযোগে তাহাই সিদ্ধ করিয়া রাখিয়া মালতী শুইয়া পড়িয়াছিল। তারপর এই কাণ্ড! মালতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ভাতগুলি থালায় বাড়িয়া আনিয়া বনোয়ারীর সম্মুখে ধরিয়া দিল। একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও মালতীর আর শুইবার সাহস হইল না—বসিয়া রহিল। থালার দিকে চাহিয়া বনোয়ারী আগুন হইয়া উঠিল—"এই কটা ভাত কেনেরে? আমি কি রুগী নাকি, যে বেশী খেতে লার্‌বো?"

হাসিবার চেষ্টা করিয়া মালতী বলিল—"রুগী হবি, কেনেরে? সব ভাত দিয়েছি তোকে, আর নেই।"

"দেখি হাঁড়ী," বনোয়ারী সবেগে উঠিয়া রন্ধনশালায় গিয়া উপস্থিত হইল। একটা বাটীতে ফেন ছিল। বনোয়ারী তাহার ভিতরেও হাত ঢুকাইয়া খুঁজিয়া দেখিল, মালতী নিজের জন্য ভাত লুকাইয়া রাখিয়াছে কিনা। সন্দেহ ঘোচে কিন্তু রাগ যায় না। বাহিরে আসিয়া সরোষে মালতীর উদ্দেশে বলে—"সব খেয়েরে আমার লেগে পেসাদ রেখেছেন!" কিন্তু কিছুক্ষণের ভিতরেই বনোয়ারী গোগ্রাসে পেসাদের থালা শূন্য করিয়া ফেলে। আর মালতী বসিয়া থাকে শূন্য দৃষ্টিতে—ততোধিক শূন্য উদরে!

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি

(৮)

কিন্তু তৎপূর্ব্বে মণীন্দ্রবাবুর সঙ্কলিত পদাবলীর শেষের কয়টী পদ হইতে (১৮৬১-৬৫, ১৯০৩-১৯০৭ ও ১৯৯৯-২০০২) আখ্যায়িকার গতি সম্বন্ধে কিরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। ১৮৬১-১৮৬৫ পদে নায়কের সহিত নায়িকার মিলনের জন্য সুবলের নূতন কৌশল অবলম্বনের কথা আছে। এই কৌশল নীলরতনবাবু সম্পাদিত চণ্ডীদাসে বর্ণিত কৌশলের প্রকারভেদ মাত্র। প্রথমবার সুবল দশ অবতারের চিত্রাভিনয় করিয়াছে; এবার সেই গুলিকেই পটে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছে। ১৮৬৪-১৮৬৫ পদে বর্ণনা-প্রণালীর সাদৃশ্য ও মূল পরিকল্পনার ঐক্য রচয়িতার অভিন্নত্বের সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য অনুকরণের সম্ভাবনা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ১৯০৩-১৯০৫ পদে সুবলের কৃষ্ণকে বনদেবতারূপে প্রচার ও তাহার কৌশলে বন-ভূমিতে নায়ক-নায়িকার নির্জ্জন মিলন বর্ণিত হইয়াছে। এই বনদেবতারূপে কৃষ্ণের পরিচয়দানের কথা বনপাশ পুঁথিতে ৮৯৩-৯৩২ পদে উল্লিখিত দেখা যায়। সুতরাং এখানেও পরিকল্পনার ঐক্য। পূর্ব্বরাগ, নবোঢ়া-মিলন প্রভৃতি পূর্ব্বোদ্ধৃত আলঙ্কারিক পরিভাষার পুনরুল্লেখও ঐ একই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। তবে এই পদগুলি খণ্ডিত ও নীরস-বিবৃতি-প্রধান বলিয়া ইহাদের মধ্যে কবিত্বের অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। একই বিষয়ের পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তিও কাব্যোৎকর্ষ-হীনতার কারণ হইতে পারে। ১৯০৬ পদে রাজা পরীক্ষিত, ব্যাসদেব, শুক, পিক প্রভৃতি অনেক নূতন বক্তা ও শ্রোতার প্রবর্ত্তন ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, গরুড় পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের উল্লেখ গ্রন্থারম্ভের কল্পনা-শক্তিবর্জ্জিত, শুষ্ক পৌরাণিক আখ্যানের অনুসরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ও আখ্যায়িকা চক্রের এক নূতন আবর্ত্তনের সম্ভাবনা সূচিত করে। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর ইঞ্জিনের মধ্য হইতে যেমন একপ্রকার কর্কশ যান্ত্রিক শব্দ নির্গত হয়, দীর্ঘভ্রমণ-শ্রান্ত কবির কাব্যরথচক্র হইতেও সেইরূপ অমসৃণ, ছন্দোসুষমাহীন, তথ্যকঙ্কর-পেষণের ঘর্ঘর-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য মণীন্দ্রবাবু অনুমান করেন যে ১৯০৭ পদ হইতে প্রেমবৈচিত্ত্য-পর্য্যায়ভুক্ত আক্ষেপানুরাগের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে ও ১৯৯৯-২০০২ সংখ্যক শেষের চারিটী পদ তাঁহার এই অনুমানের সমর্থন করে। আক্ষেপানুরাগ বিষয়ে কবিত্বশক্তির যথেষ্ট অবসর আছে ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ এই সম্বন্ধে রচিত। সুতরাং হয়ত এই বিষয়ে কবির গীতি-প্রতিভার আবার নূতন স্ফুরণ হওয়া অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু গ্রন্থ-সমাপ্তি-সূচক শেষ চারিটী পদকে উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। ২০০২ পদে ব্যাধ-বাণ-বিদ্ধ হরিণীর উপমা দীন চণ্ডীদাসের পুঁথিতে বারংবার লক্ষিত হয়। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত পুঁথিটী যে একই হাতের রচনা তাহার প্রমাণ সন্দেহাতীত। ১২০৩ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত এই যে ৬৫৮ পদের বিরাট ছেদ তাহা কবি কিরূপে পূরণ করিয়া-ছিলেন তাহা অনুমানেরও কোন উপায় নাই—চক্রাবর্ত্তনরীতিতে একই বিন্দু পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আসিতে পারে। আক্ষেপানুরাগের অনেক পদও এই ফাঁকে অনায়াসে বসান যায়। যাহা হউক আজ পর্য্যন্ত যে উপকরণ হস্তগত হইয়াছে তাহাতে চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি যে অব্যাহতভাবে ক্রমোন্নতিশীল তাহা বলা যায় না—কবিত্ব-গ্রামের আরোহণ-অবরোহণ-প্রবণতা তাঁহার কবিত্বশক্তির চূড়ান্তবিচারকে দুরূহ ও সংশয়-জড়িত করিয়াছে।

এই পুঁথির আলোচনায় ভণিতা বিষয়ে আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি নাই। কেননা যেখানে রচয়িতার ঐক্য সম্বন্ধে প্রমাণ যথেষ্ট, সেখানে ভণিতার বিভিন্নতার কোন মূল্য নাই। তথাপি পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কোন ভণিতা কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার একটী বিবরণ দিতেছি। ৩১০-১২০২ পদের মধ্যে 'দীন' ৮৮ বার, 'দ্বিজ' ৭ বার ও 'দীনক্ষীণ' ১৩ বার প্রযুক্ত হইয়াছে—বাকী পদে বিশেষণহীন কেবল 'চণ্ডীদাস'। 'বড়ু' বা 'বাসলীর' উল্লেখ পুঁথিমধ্যে একবারও পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয় যে 'দীন', 'দ্বিজ' 'দীনক্ষীণ' প্রভৃতি অভিধান নামের অংশ নয়, লেখকের জাতি ও বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের দ্যোতক মাত্র। যখন অধিকাংশ পদে কবি নিজেকে কেবল 'চণ্ডীদাস' নামেই পরিচিত করিয়াছেন, তখন ভণিতা-বৈচিত্র্যের অজুহাতে বিভিন্ন কবির পরিকল্পনা নিছক কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষতঃ ভণিতা-সংযোজনায় বৈশিষ্ট্য কতটা কবির নিজের অভিপ্রেত, কতটা বা লিপিকারের প্রমাদ বা স্বেচ্ছাচার তাহা যখন অভ্রান্তভাবে নিরূপণের কোন উপায় নাই, তখন একই কবির নাম-সংযুক্ত বিভিন্ন ভণিতার প্রতি অত্যধিক জোর দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না।

(৯)

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের সহিত বনপাশ পুঁথির সম্পর্ক নিম্নলিখিত তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হইবে।

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ প্রথম খণ্ড পদসংখ্যা	বিষয়	আকর	বনপাশ পুঁথি
১-৬৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা	সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, ১৯৪৯ নং ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক ১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত।	•

৬৩-১০২	„ বাল্যলীলা	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭৫৯ নং পুঁথি—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।		
....	রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনও পূর্ব্বরাগ বাদ গিয়াছে।			
১০৩-১৯২	„ গোষ্ঠলীলা	নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাস পদাবলী হইতে সংগৃহীত।	মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের =	বনপাশ পুঁথিতে
১৯৩-২২২	অক্রূরাগমন	„	২০৯-২১৭	৩১০-৩১৮
২২৩-২৪২	যশোদা বিলাপ ও		২১৮-২৩৩	বনপাশ পুঁথিতে নাই
	গোপ বিলাপ	„	২৩৪-২৪২	„ ৩৩৪-৩৪২
			২৪৩এর প্রারম্ভ-২৫৮ শেষ,	বনপাশ পুঁথিতে নাই
			২৫৯-২৭৬	„ ৩৫৯৩৭৬
২৪৩-২৭৬	ছত্রিশ অক্ষরের করুণা	„	২৭৭-২৯০	„ ৩৭৭-৩৯০
২৭৭-২৯০	রাখাল বিলাপ	„	২৯১-৩১৩	„ ৩৯১-৪১৩
			৩১৪-৩৩৮	„ ৪১৪-৪৩৮
২৯১-৩১৩	গোপী বিলাপ	„	৩৩৯-৩৬০	„ ৪৩৯-৪৫৪
৩১৪-৩৪০	কৃষ্ণ বলরামের মথুরাগমন কংসবধ ও নন্দবিদায়	„	৩৬১-৩৮৬	„ ৪৫৫-৪৭৪
			৩৮৭-৪২১এর পরিবর্ত্তে	৪৭৫-৪৭৯ সংখ্যক নূতন পদ
৩৪১-৩৪৯	যশোদার শোক	„		
৩৫০-৪২১	রাধিকার শোক. কৃষ্ণের নিকট সখী প্রেরণ, শ্রীকৃষ্ণ ও সখীর উত্তর-প্রত্যুত্তর মিলন, আত্ম-নিবেদন প্রভৃতি	„ ও চণ্ডীদাসের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের বিন্যাস।		

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ দ্বিতীয় খণ্ড পদসংখ্যা	আকর	বিষয়	বঃ পুঁথি	বিষয়
৪৮০-৫০২	২৩৮৯ ও ২৯৪ পুঁথি	পিরীতির উৎপত্তি ও প্রীতিরস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত	৪৮০—৪৯৯ পদের পঞ্চম পংক্তি	ঐ
			[৪৯৯—৫১৭ পদের প্রথমার্দ্ধ পুঁথিতে নাই]	
৫০৩-৫৪৬	২৯৪ পুঁথি	মাথুর বিরহ ও উদ্ধব সন্দেশ	৫১৭-৫৪৬	ঐ
			৫৪৭-৫৫১	অতিরিক্ত পদ
৬২৭-৬৫৪	২৩৮৯ পুঁথি	রাধা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের নিকট হংস দূত প্রেরণ	নাই	
৬৬২-৬৭২	„	রাধা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের নিকট কোকিল দূত প্রেরণ	নাই	
৭২২-৭২৬	„	মথুরায় কৃষ্ণের সহিত সুবলের মিলন	৭৩২	সুবলের ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন
			৭৩৩-৭৪৪	রাধা বিরহ
			৭৪৫-৭৯০	রাধা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের নিকট পবনদূত প্রেরণ ও পবনের প্রত্যাবর্ত্তন।
			৭৯১-৮০০	রাধা বিরহ।
			৮০১-৮০৫	ললিতার মথুরা-গমন ও কৃষ্ণের বংশী-ধ্বনিতে মথুরা-নাগরীদের ভাব-বিপর্য্যয়।
			৮০৬-৮৯২	ভ্রমর-দৌত্য ও পরকীয়া তত্ত্ব প্রতিপাদন
			৮৯৩-৯৩২	পূর্ব্বরাগ
			৯৩৩-৯৬২	নবোঢ়া, বাসক-সজ্জিতা ও উৎ-কণ্ঠিতা নায়িকার বর্ণনা
			৯৬৩-৯৮০	পদ নাই।

মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ পদ সংখ্যা	আকর	বিষয়	বনপাশ পুঁথি	বিষয়
	নাই		৯৮১-৯৮৫	মনঃশিক্ষা, রাধা-কৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ঐক্য প্রতিপাদন
			৯৮৬-১০০০	রসোদ্গার
			১০০১-১০১৬	বিপ্রলম্ভরস
১০৪৫-১০৫১	২৩৮৯ নং পুঁথি	গৌণরাস	১০১৭-১০৮৫	নাই
			১০৮৬-১০৯১	গৌণরাস-অন্তর্গত বর্ষাভিসার শেষ ; জ্যোৎস্নাভিসার আরম্ভ।
১০৭৭-১০৭৯	"	গৌণরাসে রাধা কৃষ্ণের মিলন	১০৯২-১০৯৪	* মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণের ১০৭৭-১০৭৯এর সহিত অভিন্ন
১০৮০-১০৮৪	ও নীলরতনবাবুর পদাবলী সংগ্রহ	মহারাস	১০৯৫-১১০০	
			১১০০-১১০৩	মহারাস শেষ
			১১০৪-১১১৯	স্বয়ং দৌত্য ; রাধার মান ও সখিবেশে কৃষ্ণকর্তৃক মানভঞ্জন ; নর্ত্তক-রাস।
			১১২০-১১৩২	হাস্যরস—বংশীহরণলীলা
			১১৩৩-১১৩৯	জল কেলি
	নাই		১১৪০-১১৫৫	ঝুলনরাস
			১১৫৬-১১৬৫	শ্রীকৃষ্ণের অচৈতন্য
			১১৭৪-১১৮০	শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন
			১১৮১-১১৮৯	শ্রীরাধিকার স্বপ্নদর্শন
			১১৯০-১২০২	তৃষ্যতা ও বিকলারস ? (বিপ্রলম্ভ ও উৎকণ্ঠিত রসের প্রকার প্রকার ভেদ বলিয়া মনে হয়)
১৮৬১-১৮৬৫	২৩৮৯ নং পুঁথি	পূর্ব্বরাগ		এইখানে বনপাস পুঁথির পরিসমাপ্তি
১৯০৩-১৯০৫	"	সুবলের কৌশলে নায়ক নায়িকার প্রথম মিলন		

	আকর	বিষয়
১৯০৬	২৩৮৯ নং পুঁথি	পূর্ব্বরাগ, নবোঢ়া ও সুবল-মিলন শেষ ও যুগল মধুর রস আরম্ভ
১৯০৭		রাধা-কৃষ্ণের চাঁপাবনে মিলন—তাহা হইতে বিপ্রলম্ভরসোৎপত্তি
১৯৯৯-২০০২	"	আক্ষেপানুরাগ

চণ্ডীদাস ৪১, ৪৩, ৪৪ ৪৫

এই আলোচনা হইতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পরিস্ফুট হইতেছে :—

প্রথম খণ্ড

(১) মণীন্দ্রবাবুর অনুমিত প্রথম খণ্ডের ৪৭৯ পদ বনপাশ পুঁথির দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

(২) মণীন্দ্রবাবুর ৩৮৭-৪২১ অর্থাৎ ৩৫টী পদের পরিবর্ত্তে বনপাশ পুঁথিতে মাত্র ৪৭৫-৪৭৯ অর্থাৎ ৫টী পদ মিলিতেছে। সুতরাং মণীন্দ্রবাবুর অধিকাংশ অনুমান-বিন্যস্ত পদ আখ্যায়িকার ক্রম-বহির্ভূত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। মিলন, আত্মনিবেদন প্রভৃতি বিষয়ক পদগুলি আখ্যায়িকার বর্ত্তমান স্তরে অপ্রযোজ্য দাঁড়াইতেছে।

(৩) মণীন্দ্রবাবুর সংস্করণ ও বনপাশ পুঁথির পদগুলির ক্রমিক সংখ্যা তুলনায় বোঝা যাইতেছে যে শেষোক্ত পুঁথিতে চণ্ডীদাসের পরিকল্পনার যে আভাস মিলে তাহাতে প্রায় ১০০ পদ বেশী আছে। এই সিদ্ধান্ত আখ্যায়িকার যথাযথ বিন্যাস ও পরিণতির দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে। পূর্ব্বরাগ, প্রথম মিলন ও রাসলীলা সংক্রান্ত পদগুলি মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই এবং এই পদগুলির সংখ্যা ১০০ অনুমিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৭১-৭১৩ ও ৫৪৪-৬৭৫ পদের প্রয়োজনীয় অংশ এই ছেদ পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

দ্বিতীয় খণ্ড

(১) মণীন্দ্র বসুর সংস্করণ ও বনপাশ পুঁথি উভয়ত্র নিঃসন্দেহে একই উপাখ্যান অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থে ৭২২-৭২৬ পদে

কৃষ্ণের সহিত সুবলের মিলন ও দ্বিতীয়ে ৭৩২ পদে সুবলের ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন বিবৃত হইয়াছে। এই দুই ঘটনা একই উপাখ্যানের অঙ্গ। আবার প্রথম গ্রন্থে ১০৪৫-১০৫১ পদে দিবাভিসার ও স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে কৃষ্ণের রাধার সহিত মিলন-সঙ্কেত বর্ণিত হইয়াছে। এগুলি গৌণরাসের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ঠিক পরে পুঁথিতে—১০৮৬-১০৯৪ পদে সেই গৌণরাগের অন্তর্গত আরও কয়েকটী লীলা—যথা বর্ষাভিসার জ্যোৎস্নাভিসার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ও ১০৯৫ (সংস্করণের ১০৮০) পদে গৌণরাসের পরিসমাপ্তি ও মহারাসের আরম্ভ উল্লিখিত হইয়াছে। কাজেই মধ্যবর্ত্তী অপ্রাপ্ত পদগুলিতেও যে একই বিষয়ের আলোচনা আছে তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

(২) পুঁথিতে ৮৯২ পদ পর্য্যন্ত মাথুর বিরহ ও নানাবিধ দৌত্য প্রেরণ আখ্যাত হইয়াছে। ৮৯৩ পদ হইতে আখ্যায়িকার অগ্রগতি বন্ধ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি—পর্য্যালোচনার পালা আরম্ভ হইয়াছে। আবার পূর্ব্বরাগ, প্রথম-মিলন, বাসক-সজ্জিতা ও নায়িকার বর্ণনা, বিপ্রলম্ভরস, রসোদ্গার, গৌণ ও মহারাস ইত্যাদি পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাইতেছে। ১৮৬১ পদ হইতে তৃতীয়বার পূর্ব্বরাগ, সুবলের সাহায্যে নায়ক-নায়িকার মিলন, নবোঢ়ারস ইত্যাদির আলোচনা চলিয়াছে। কাজেই অগ্রগতির পরিবর্ত্তে চক্রাবর্ত্তন, আখ্যায়িকার পরিবর্ত্তে রসের ও ভাবের বিচ্ছিন্ন আলোচনা—ইহাই পুঁথির শেষ দিকের বিশেষত্ব দাঁড়াইতেছে। সুতরাং মণীন্দ্রবাবুর একটী প্রধান সিদ্ধান্ত—আখ্যায়িকার মানদণ্ডে পদাবলীর অকৃত্রিমতার বিচার—ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন যে কোনও বিচ্ছিন্ন, ভাব-প্রধান পদ উপাখ্যান-সূত্র-গ্রথিত না হইলেও চণ্ডীদাসের বলিয়া দাবী করা চলিবে। আখ্যায়িকার রজ্জু গলায় বাঁধিয়া তাঁহার গীতি কবিতার শ্বাসরোধের চেষ্টা অসমর্থনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। পূর্ব্বরাগের আখ্যান-অংশ প্রত্যেকবার পুনরাবৃত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—তিনবার আমরা তিন বিভিন্ন প্রকারের তথ্যগত বিবরণ পাই। কাজেই আখ্যায়িকার প্রতি আনুগত্য চণ্ডীদাস-কাব্যের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ-নীতি নহে ইহা পুঁথির প্রমাণ বলে জোর করিয়া বলা যায়। ক্রমশঃ

১৩৪৯ সাল

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

বছর পরে, বছর আসে,
দিনের পরে দিন গুণে;
পুরাতনের উল্‌টে পাতা
নতুন আশার জাল বুনে।

অর্দ্ধশত বর্ষ আগে
হে সন-! ঊনপঞ্চাশী;
ধাক্কা খেয়ে তোমার কৃপায়
প্রাপ্তি বুঝি হয় কাশী!

ইংরাজীতে কয়ুটিনাইন
গালাগালির সামিল যে,
তোমার দোরে মুড়িয়ে মাথা,
বুঝেছি তা কেমন হে!

ইতিহাসের পাতায় যদি,
সত্যি কথা হয় লেখা,
বর্ষে তোমার বিমর্দ্দের-ই
উঠ্‌বে ফুটে সব রেখা!

তোমার কাছে অনেক পেলাম,
পেটের দায়ে গঞ্জনা—
প্রপঞ্চময় এই জগতে
আর কত সয় বঞ্চনা!

মুদির দোরে সায় দিয়েছি
ছেলেমেয়ের হাত ধরে,—
কয়লাভাবে ভাতের হাঁড়ী
শিকেয় ঝোলে সব ঘরে!

তোমার কৃপায় খুচরা যত
কোথায় হ'ল নিরুদ্দেশ—
এমন বছর আসেনি আর
দৌলতে যার অসীম ক্লেশ।

সইল মানুষ নানান রূপে
প্রাণের দায়ে, মানের দায়;
লিখ্‌তে গেলে সে সব কথা
বাধার বাধায় পড়বে হায়!

নিত্য নতুন চিন্তা জোগান
চিন্তামণি মগজে—
চিনি-টী হায় নাইক কেবল
যায় না পাওয়া সহজে।

অন্নাভাবে শুষ্ক মলিন
বস্ত্রাভাবে জীর্ণবাস।
তৈলাভাবে মেটেনি তাই,
তৈলদানের যতেক আশ।

কৃপায় তোমার দেখা গেল
আগুন, প্লাবন, মহামারী!
সভয় চিত্তে করব স্মরণ
কীর্ত্তিনাশা মূর্ত্তি তা'রি।

নয়কো 'ঊন' তুমিই খুনো
পাঁচের বাকী নেইক আর—
বোমার ভয়ে চক্ষু মুদে
দেখ্‌ছি কেবল অন্ধকার!

গুপ্তসম্রাট্‌গণের আদিবাস

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ্‌-ডি,

গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "গুপ্তবংশের আদিনিবাস যে বরেন্দ্রী ছিল তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে" (পৃষ্ঠা ৫৯৭)। আমার কয়েকজন বন্ধু ডক্টর গাঙ্গুলীর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন, যে সত্যই এবার গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণ বাঙালী বলিয়া প্রমাণিত হইলেন কিনা। বন্ধুগণকে এই প্রশ্ন সম্পর্কে যে উত্তর দিয়াছি, তাহাই এস্থলে প্রকাশ করিলাম। আমার বিবেচনায় এই গুরুতর সিদ্ধান্তটীর সপক্ষে ডক্টর গাঙ্গুলী উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই ; অধিকন্তু ইহার বিরুদ্ধে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল যুক্তি তিনি সেটাকে এড়াইয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে গুপ্তবংশীয় রাজগণের আদিবাস মগধে ছিল কিনা, সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বেও গুপ্তদিগের রাজধানী পাটলীপুত্রে ছিল কিনা, ইত্যাদি বহু সমস্যার আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত বিচার করিবার পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক নহে। এস্থলে আমি কেবল ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে সিদ্ধান্তটীর সপক্ষে ডক্টর গাঙ্গুলীর ক্ষীণযুক্তির তুলনায় ইহার বিরুদ্ধ-যুক্তি অত্যন্ত প্রবল।

ডক্টর গাঙ্গুলীর মূল যুক্তিটী এই। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিঙ্‌ ভারতপরিভ্রমণকালে (৬৭২-৬৯৩ খৃষ্টাব্দে) জনশ্রুতিমূলে অবগত হন যে ঐ সময়ের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শ্রীগুপ্ত নামক জনৈক নরপতি মৃগস্থাপনে একটী বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইৎসিঙের বিবরণ হইতে জানা যায় যে মৃগস্থাপন নালন্দার মন্দির হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়া চল্লিশ যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত। ডক্টর গাঙ্গুলীর হিসাবে চল্লিশ যোজন প্রায় দুইশত আশী মাইলের সমান (এস্থলে ডক্টর গাঙ্গুলীর হিসাবে কিছু ভুল আছে) ; সুতরাং দুইশত আশী মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত মৃগস্থাপন অবশ্যই বর্ত্তমান মালদহ কিংবা মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল। তাঁহার মতে ইৎসিঙের শ্রীগুপ্ত এবং গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতামহ মহারাজ গুপ্ত অভিন্ন। সুতরাং গুপ্তবংশের আদিপুরুষ বাঙালী ছিলেন।

এই যুক্তি সম্পর্কে কয়েকটী কথা বলা যায়। প্রথমতঃ, ইৎসিঙের প্রাপ্ত কিংবদন্তী অনুসারে মৃগস্থাপনে বিহারনির্ম্মাণকারী রাজার নাম শ্রীগুপ্ত ; কিন্তু গুপ্তবংশের আদিরাজের নাম গুপ্ত, শ্রীগুপ্ত নহে। দ্বিতীয়তঃ ইৎসিঙের শ্রীগুপ্ত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন ; কিন্তু গুপ্তবংশের আদিরাজ উহার একশত বৎসর পরে রাজত্ব করেন। তৃতীয়তঃ একজন বিদেশীয় পরিব্রাজক পাঁচশত বৎসরের পূর্ব্বেকার জনৈক অখ্যাত নরপতি সম্পর্কে কিংবদন্তী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাকে খাঁটি ইতিহাস হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। চতুর্থতঃ, ইৎসিঙের বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও সমস্যার সমাধান হয় না ; কারণ উহাতে শুধু এইমাত্র প্রমাণ হয় যে মালদহ কিংবা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত মৃগস্থাপন শ্রীগুপ্ত নামক নরপতির রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল। (১) শ্রীগুপ্তের রাজধানী বা বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা ইৎসিঙের বিবরণ হইতে জানা যায় না। ডক্টর গাঙ্গুলী যেমন অনুমান করিতেছেন যে শ্রীগুপ্তের রাজধানী এবং আদিবাসস্থান মৃগস্থাপনের নিকটে অবস্থিত ছিল, তেমনই অপর কেহ কল্পনা করিতে পারে যে মৃগস্থাপন শ্রীগুপ্তের রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে বিহারের অধিবাসী ছিলেন। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় এইরূপ ক্ষীণ যুক্তির বলে নিশ্চয়ই জোর করিয়া বলা যায় না যে গুপ্তসম্রাট্‌গণ অবশ্য বাঙালী ছিলেন। বিশেষতঃ, যখন দেখা যায় যে আদিম গুপ্ত সম্রাট্‌গণের সমসাময়িক একজন লেখক তাঁহাদের সাম্রাজ্যের উল্লেখ করিতে গিয়া বাংলা দেশের কোন অঞ্চলই উহার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, তখন ডক্টর গাঙ্গুলীর সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়।

আজকাল সকলেই অবগত আছেন যে প্রাচীন পুরাণসমূহ গুপ্ত যুগের প্রথম ভাগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ এই যে এইগুলিতে ঐতিহাসিক রাজবংশসমূহের বর্ণনা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে আনিয়াই শেষ করা হইয়াছে। বায়ু, ভাগবত, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণগুলিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মর্ম্মের একটী বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

> অনুগঙ্গং প্রয়াগং চ সাকেত-মগধাংস্তথা ।
> এতান্‌ জনপদান্‌ সর্ব্বান্‌ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ ॥

অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় নরপালগণ গঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রয়াগ (এলাহাবাদ), সাকেত (অযোধ্যা) এবং মগধ (দক্ষিণ বিহার) শাসন করিবেন। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে এই বর্ণনায় সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বকালীন গুপ্তসাম্রাজ্যের অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের (২) উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই বর্ণনা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অর্থাৎ আদি গুপ্তসম্রাট্‌গণের সমকালবর্ত্তী কোন কবির রচনা, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। এই সমসাময়িক লেখকের বর্ণনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইৎসিঙের জনশ্রুতিমূলক কাহিনী হইতে বহুগুণে অধিক, তাহা বলা বাহুল্য। বর্ণনাটী সুস্পষ্ট এবং আদিম গুপ্তসাম্রাজ্যের আয়তনই ইহার লক্ষ্য ; পক্ষান্তরে অনেকখানি কষ্ট কল্পনা এবং অনুমানের সাহায্য ব্যতীত ইৎসিঙ্‌ হইতে কিছুই বোঝা সম্ভব নহে। এই সমসাময়িক বর্ণনায় আদিম গুপ্তরাজগণের রাজ্য মধ্যে কেবল দক্ষিণ বিহার, এলাহাবাদ অঞ্চল এবং অযোধ্যা অঞ্চলকে গণনা করা হইয়াছে ; বাংলা দেশের কোন অঞ্চলেরই উল্লেখ করা হয় নাই। আমার বিবেচনায় আদিম গুপ্তসাম্রাজ্য যে বাংলা দেশে বিস্তৃত ছিল না, ইহা তাহার প্রবল প্রমাণ। অপর কোন প্রবলতর প্রমাণের উপাদান আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রমাণ অকাট্য।

ডক্টর গাঙ্গুলী মনে করেন যে উল্লিখিত বিবরণটী কেবল বিষ্ণুপুরাণে আছে ; এই ধারণা ভ্রমাত্মক। তিনি লিখিয়াছেন, "পুরাণোক্ত বিবরণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় যে

---

(১) মালদহ বলাই ভাল। কারণ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মৃগস্থাপন বরেন্দ্রীর অন্তর্গত ছিল।

(২) অনেকে মনে করেন, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজত্ব করেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, ৩২০ খৃষ্টাব্দ সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণের বৎসর হইতে পারে। এ সম্পর্কে গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষে ১৯৩ পৃষ্ঠায় আমার যে রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, উহার ৩০শ পঙ্‌ক্তির পরে নিম্নোদ্ধৃত অংশ যোগ করিয়া পড়িতে হইবে।

"কিন্তু আবার বাল্যবিবাহ হইলেও দীর্ঘকাল দম্পতির কোন সন্তান না জন্মিতে পারে এবং সন্তান হইলেও পুত্রসন্তান না হইতে পারে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত যে পিতার প্রথম বয়সের সন্তান ছিলেন, তাহা অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই।"

যথেষ্ট ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন।" একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু পুরাণগুলির সর্ব্বাংশের ঐতিহাসিক মূল্য একরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আইন-ই-আকবরীতে বাংলার পাল এবং সেনবংশীয় রাজগণের সম্পর্কে অনেক আজগুবী কাহিনী স্থান পাইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া উহাতে আকবরের রাজত্ব সম্বন্ধে যে সমসাময়িক বিবরণ আছে, তাহার ঐতিহাসিকতা উড়াইয়া দেওয়া হাস্যকর হইবে। আমার বিবেচনায় পুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণকে সমসাময়িক দলিলের মূল্য দেওয়া যাইতে পারে। উহার কাছে ইৎসিঙের উদ্ধৃত জনশ্রুতির উপর নির্ভরশীল সিদ্ধান্ত নিতান্তই মূল্যহীন।

এই সম্পর্কে ডক্টর গাঙ্গুলীর একটা প্রাসঙ্গিক যুক্তির সমালোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তৎকর্ত্তৃক বাংলা দেশ জয়ের উল্লেখ নাই; অথচ সমতট, ডবাক এবং কামরূপের প্রত্যন্ত নরপালগণ কর্ত্তৃক তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে তিনি স্থির করিয়াছেন যে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণের পূর্ব্বেই বাংলা দেশ গুপ্তরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই যুক্তিটিও অত্যন্ত অসার। কারণ, এলাহাবাদ প্রশস্তিতে রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দী (অথবা, অচ্যুত ও নন্দী), বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তরাজগণকে উৎসাদন করিবার কথা আছে। ডক্টর গাঙ্গুলী অবশ্যই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে এই তালিকাতে বাংলা দেশের কোন সমসাময়িক নরপতির উল্লেখ নাই। আজকাল অনেকেই তালিকায় উল্লিখিত চন্দ্রবর্ম্মার সহিত শুশুনিয়া (বাঁকুড়া জেলা) লিপির পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার অভিন্নত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। ঐ তালিকায় আরও বাঙালী রাজার নাম থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব।

আমার মতে ডক্টর গাঙ্গুলী তাঁহার সিদ্ধান্তটী প্রমাণ করিতে পারেন নাই; আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভবও নয়। পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়সমূহ ব্যতীত তাঁহার প্রবন্ধে অ্যালান সাহেবের মতের দোহাই, বরেন্দ্রীর পশ্চিমাংশে খড়্গরাজগণের অধিকার, ইত্যাদি অপর যাহা আছে, তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম।

গান

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

(কীর্ত্তন)

ওগো! গুরুজন কাছে থাকি যবে কাজে
ডরি পাছে বাঁশী বাজে।
সহসা অমনি বংশীর ধ্বনি ওঠে নিধুবন মাঝে॥
(ভয়ে মরি)
(গঞ্জনার ভয়ে মরি)
(গুরু গঞ্জনা শত লাঞ্ছনা করি কল্পনা ভয়ে মরি)
তা'রা বচনের বাণে বিঁধি মম প্রাণে
শাসন করিতে যায়।
বদনের পানে কুপিত নয়ানে ঘন ঘন ফিরে চায়॥
(কেমন সে বাজায়)
(ওগো, কেন সে বা যায়)
(নাম ধ'রে বাজাতে কেন সে বা যায়)
(সখি, সেই নিধুবনে যখন তখন কেন সে বা যায়)
ওগো! বাঁশুরিয়া পানে যেন মোরে টানে
সেই সুর সুধামাখা।
বুকের ভিতরে প্রাণ কি যে করে
যায় না ধরিয়া রাখা॥
(বিপদ বাধায়)
(পদে পদে বিপদ বাধায়)
(গুরুজন বাধায় বিপদ বাধায়)
(মোর অসহায় চিত্ত যে ধায়, গুরুজন বাধায় বিপদ বাধায়)
সখি! রাধিকার মন রাধিকারমণ
বিনা কিছু নাহি চায়।
নয়নের বারি নিবারিতে নারি, কেঁদে কেঁদে মরি, হায়!
(নয়ন বারি বারিতে নারি)
(আমি নারী বারিতে নারি)
আমি যে নারী, নয়ন বারি বারিতে নারি, হায়॥

বিবর্ত্তন

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, পি-আর-এস্

১

তুমি চিরদিন কেমনে জানিলে
মোর জীবনের গতি
লবে তোমাতেই পরিণতি।

মিথ্যার মোহ, কামনার ধূলি, বিবেকের আর্ত্তনা,
তার গায়ে তুমি ছোঁয়ালে কখন্ প্রভাতের প্রার্থনা—
জীবনের পুরমার্গের খুঁজি গলি,
দূর প্রান্তরে, ঘন কান্তারে চলি—

তুমি সব পথ রোদনে রাঙিলে,
কর্ম্মপ্রখর জীবনে আনিলে
স্বপনের তালবতি,
বিস্ময়-সঙ্গতি।

২

সেদিন প্রাণের সদীতে মোর
আকাশ দেয়নি ধরা,
হাসেনি বসুন্ধরা।

সন্ধ্যার মায়া—স্মৃতিরে জড়ায়ে নেমে এল গৌরবে,
হাজার ছায়ার ইঙ্গিত কাঁপে জীবনের সৌরভে—
—কোথাকার কোন্ উত্তুরে হাওয়া জেগে
মনের পুরাণো ঝাউ গাছগুলি জেগে

কেঁদে কেঁদে দেয় অন্তরে দোল,
দূর পশ্চাতে চাহনি বিভোল
ক্লান্ত-উদাস-করা—
ছায়ার মুক্তি ভরা॥

সিন্‌কোনা ও কুইনাইন

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

(৩)

ভারতে সিন্‌কোনা ক্ষেত্র

সিন্‌কোনা পাহাড়ীয়া গাছ, ইহার চাষের জন্য উর্ব্বর অথচ কঙ্করময় ঢালু জমী চাই। সমুদ্রবক্ষ হইতে সিন্‌কোনা বাগানের উচ্চতা দুইহাজার ফিটের অধিক হইলেই ভাল হয়। মাঝামাঝি পরিমাণের বারিপাত সারা বৎসর ধরিয়াই প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি প্রাকৃতিক আবহাওয়া নাতি-শীত নাতি-উষ্ণ হইতে হইবে। সেই জন্য সিন্‌কোনার আবাদ যেখানে সেখানে হইতে পারে না। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে উত্তর-বাংলার দার্জ্জিলিং জেলায় ও মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চলেই সিন্‌কোনার আবাদ রহিয়াছে।

উত্তর ভারতে উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক J. D. Hooker তাঁহার Flora of British India (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ) নামক গ্রন্থে নেপাল হইতে ভুটান পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য অংশেই সিন্‌কোনা গাছ দেখিয়াছিলেন এবং এই সমস্ত অংশটিকেই সিন্‌কোনার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আমলে এই সমস্ত অঞ্চলে বহু বে-সরকারী বাগান থাকিলেও বর্ত্তমানে উত্তর ভারতে মাত্র দার্জ্জিলিং জেলাতেই সিন্‌কোনার তিন চারি খানি সরকারী বাগান দেখা যায়, তন্মধ্যে দুইখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ ও আবাদ নামের উপযুক্ত। এই দুইটী যথাক্রমে মাংপু ও মান্‌সং। মাংপুতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সিন্‌কোনা গাছ বসান হয় এবং মান্‌সংএ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। শিলিগুড়ি হইতে গিয়েলখোলা রেলপথের রিয়াং ষ্টেশন হইতে ৩৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রিয়াং নদীর উত্তরে অবস্থিত মাংপু গ্রাম। দার্জ্জিলিং লাইনের সোনাদা ষ্টেশন হইতেও মোটর যোগে যাওয়া যায়। স্থানটি শিলিগুড়ি কালিম্পং রোডের উপরে অবস্থিত।

মাংপু ও মান্‌সংএর সিন্‌কোনা আবাদের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দার্জ্জিলিং জেলার সিঞ্চলে ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে সিন্‌কোনা চাষ প্রথম আরম্ভ হয়। কিন্তু সিঞ্চল অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বলিয়া আবাদটিকে সেখান হইতে লেবংএ লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখান হইতে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিংএর দক্ষিণ পশ্চিমে ১২ মাইল দূরে রংগো উপত্যকায় আবাদটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। মাংপু আবাদের ইহাই সূচনা বলা যাইতে পারে। ইহার পরে বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সিটং নামক স্থানেও সিন্‌কোনা আবাদ আরম্ভ করা হইয়াছিল। এইরূপে প্রয়োজনমত প্রাকৃতিক অরণ্য কাটিয়া আবাদ ভূমিকে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত করা হয় এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রিয়াং উপত্যকার দুইধার দিয়া মাংপু পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। মাংপুতে গ্রাম ও হাট আছে এবং এখানকার মধ্যে মাংপুই প্রসিদ্ধ, সেইজন্য মাংপুর নামেই আবাদটির নামকরণ হইয়াছে। এই অঞ্চলের আবাদ হইতে প্রথম সিন্‌কোনা ছাল পাওয়া গিয়াছে ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে এবং তদবধি এই আবাদটি বিশেষ লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। এখানে বর্ত্তমানে ১২,০০০ একর জমী সিন্‌কোনার জন্য নিয়োজিত রহিয়াছে। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বোচ্চ ৬,০০০ ফিট ও সর্ব্বনিম্ন ১,০০০ ফিট।

মাংপু আবাদের নিকট বিস্তৃতির উপযুক্ত স্থান আর না থাকায় মাংপু হইতে ৩৫ মাইল দূরে তিস্তা নদীর পূর্ব্বদিকে বাংলা সরকারের Damsong Reserve Forestএর মান্‌সং নামক স্থানে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আর একটি নূতন আবাদ আরম্ভ করা হয়। এখানে চতুর্দ্দিকেই গভীর জঙ্গল। এখানকার উচ্চতা সমুদ্রবক্ষ হইতে সর্ব্বোচ্চ ৬,০০০ ফিট ও সর্ব্বনিম্ন ২০০০ ফিট। এখানে ৯,০০০ একর জমী লইয়া আবাদটি স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম দশ বৎসরেই মান্‌সং আবাদ আশানুরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ১,৭৫,০০০ পাউণ্ড শুষ্কত্বক্ পাওয়া গিয়াছিল। ঐ বৎসর মাংপু হইতে সংগৃহীত শুষ্ক সিন্‌কোনা ত্বকের পরিমাণ ছিল ৩,০০,০০০ পাউণ্ড। ইহা হইতেই আবাদটির সাফল্য সম্বন্ধে অনুধাবন করা যায়।

মাংপু ও মান্‌সং ছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে আরও কতকগুলি স্থানে সিন্‌কোনার আবাদ ছিল, কিন্তু নানাকারণে উক্ত স্থান সকল বর্জ্জিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ রংজং, নিম্বং ও রাংবী আবাদের উল্লেখ করা যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রংজং আবাদটি সিন্‌কোনা বিভাগের চেষ্টায় করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই উহা পরিত্যক্ত হয়। নিম্বং আবাদটি Bhutan Tea and Cinchona Associationএর চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহা গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিয়াছেন এবং উক্ত স্থানে আর আবাদ করা হয় নাই। সিকিমের রাংবী উপত্যকাতেও সিন্‌কোনার আবাদ ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক আবহাওয়া ততটা অনুকূল বলিয়া মনে না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ উহা পরিত্যাগ করেন এখানকার উচ্চতা ছিল ৩,৩০০ ফিট্ ; সর্ব্বোচ্চ তাপ ৮৮° ও সর্ব্বনিম্ন ৪০°, বাৎসরিক বারিপাত গড়ে ১৬৬″ ইঞ্চি।

সিন্‌কোনা ছাল শুকাইবার চালা

বর্ত্তমানে উত্তর ভারতে সিন্‌কোনার আবাদ বলিতে বাংলাদেশের দার্জ্জিলিং জেলা ভিন্ন অন্যত্র আর কোথাও নাই। এখানকার মাংপু ও মান্‌সং নামক প্রধান দুইটি আবাদকে সিন্‌কোনা বিভাগ পরিচালনের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটিকে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। মাংপুতে (১) রংবী (২) মাংপু (৩) লাব্‌দা ও (৪) সিটং এবং মুন্‌সংএ (১) কম্মেম (২) মান্‌সং (৩) বুড়্‌মিয়াক্ ও (৪) সংশীর এই চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এ ছাড়া আবাদী ভূমি বৃদ্ধি করিবার জন্য 'জলঢাকা' নামক আরণ্য অঞ্চলে, 'রংগো'তে এবং 'লাটপঞ্চোরে' পরীক্ষামূলক আবাদ (experimental plantation) চলিতেছে। রংগোতে প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ১২৪ একর ভূমি লইয়া পরীক্ষামূলকভাবে সিন্‌কোনার আবাদ আরম্ভ হইয়াছিল এবং লাটপঞ্চোরেও অনুরূপ আয়োজন সুরু হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার পরীক্ষাকার্য্যে আট বৎসর সময় লাগে, তবে বিশেষজ্ঞগণ ইহার কম সময়েও ক্ষেত্রের গুণাগুণ নির্ণয় করিতে পারেন। লাটপঞ্চোর এলাকায় প্রতি

বৎসর ৫০ একর জমীতে আবাদ করিয়া চারি বৎসরে ২০০ একর আবাদ করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। অনুমান করা গিয়াছে যে, লাটপঞ্চোরে সিন্‌কোনা আবাদের উপযুক্ত দুই হাজার একর জমী পাওয়া যাইতে পারে। মোটামুটি বলিতে গেলে বাংলাদেশে সিন্‌কোনা বিভাগের অধীনে খাস জমী আছে ২৬,০০০ একর, কিন্তু এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে সিন্‌কোনার নিট্ আবাদ আছে মাত্র ৪,০০০ একরে, কারণ সিন্‌কোনার আবাদে বাঁশঝাড়, কুলী লাইন, পাহাড়ীয়া খাত, রাস্তা ইত্যাদির জন্য অনেক জমী বাদ যায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে বাংলাদেশে নিট্ ২,৮০০ একর জমীতে সিন্‌কোনা গাছ ছিল, গত পাঁচ বৎসরে ১,২০০ একর নিট্ বাগান বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবৎসর হইতে বাংলাদেশে মোটের উপর সাত হাজার একর জমিতে সিন্‌কোনার নিট্ আবাদ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাংলার তুলনায় মাদ্রাজের সিন্‌কোনা আবাদ সমবয়স্ক হইলেও সেখানে বাগানের পরিসর বর্ত্তমানে অনেক কম। মাদ্রাজের উটকামণ্ডের নিকট ডাডাবেট্টা এবং নীলগিরির নিকটে নাদুবাতামে ১৮৬০—৬২ খৃষ্টাব্দে Clements B. Markham সাহেব সিন্‌কোনা আবাদের সূত্রপাত করেন। পরে মাদ্রাজের অন্যান্য জেলাতেও সিন্‌কোনা প্রসার লাভ করিয়াছে। সেখানে ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ১,৭৫৭ একর জমীতে সিন্‌কোনার গাছ ছিল এবং এইগুলি তিনটি জেলায় ছড়ানো ছিল। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম আবাদ ছিল নীলগিরিতে (১,৫৮৮ একর), দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল কইম্বাটোর (১৬৮ একর) এবং পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম আবাদ ছিল মালাবারে (মাত্র ১ একর)। ইহার পর পাঁচ বৎসরে মাদ্রাজের সিন্‌কোনা আবাদ সামান্যমাত্রই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মাদ্রাজের আবাদ সম্বন্ধে বাংলার সহিত এইটুকু পার্থক্য দেখা যায় যে, সেখানে সরকারী এবং বেসরকারী দুই রকমের বাগানই আছে। সেখানকার বাগানগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

১। গভর্ণমেন্ট সিন্‌কোনা প্ল্যানটেশন, অন্নমলৈ, পোঃ অঃ বাল্পরৈ, জেলা কইম্বাটোর। নিকটস্থ রেল ষ্টেশন পোল্লাচী (S. I) আবাদের নীট্ পরিমাণ ৯৩৯ একর। ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,৫০০ হইতে ৪,৮০০ ফিট।

২। আরুমঙ্গল সিন্‌কোনা এষ্টেট, পোঃ অঃ কিলাকুণ্ডু, নীলগিরি। নিকটস্থ রেল ষ্টেশন কাটেরী রোড্। ভূমির উচ্চতা ৭,০০০ ফিট।

৩। কেয়ার্ণ হিল্ এণ্ড সিন্‌কোনা এষ্টেট্, পোঃ অঃ উটকামণ্ড্, নীলগিরি। বাগানের মোট আয়তন ৮৫ একর। ইহাতে চা, সিন্‌কোনা ও ব্লুগাম্ নামক একজাতীয় ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ হইয়া থাকে। ভূমির উচ্চতা ৭,২০০ ফিট। ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার A. E. Ricktor.

৪। মারলিয়াম্মন্দ্ এষ্টেট, পোঃ অঃ উটকামণ্ড্, নীলগিরি। রেল ষ্টেশন, উটকামণ্ড। ক্ষেত্রের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭,৫০০ ফিট। এখানে ৭০ একর জমীতে সিন্‌কোনার গাছ আছে।

৫। রাজমহল ব্লুগাম এণ্ড সিন্‌কোনা প্ল্যানটেশন পোঃ অঃ উটকামণ্ড, কালীকাট্, নীলগিরি। বাগানের মালিক মহম্মদ হাসিম সৈয়দ। বাগানের পরিমাণ ৭০০ একর। ক্ষেত্রের উচ্চতা ৭,০০০ ফিট্। এখানে ব্লুগাম জাতীয় ইউক্যালিপ্‌টাস্ ও সিন্‌কোনার গাছ আছে।

৬। কোরঙ্গমুদি এষ্টেট্ কোম্পানী লিমিটেড, পোঃ অঃ বাল্পরৈ জেলা অন্নমলৈ। জমীর মোট পরিমাণ ১,০১২ একর। এই বাগানে মাত্র ১৬৭ একর ভূমির উপর সিন্‌কোনা ও কফি গাছ পর্য্যায়ক্রমে লাগানো আছে।

মাদ্রাজের উটকামণ্ড অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ তাপ ৬৯° এবং সর্ব্বনিম্ন ৪২°, বাৎসরিক বারিপাত গড়পড়তা ৪৪″; নেদিওয়াত্তুম অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ তাপ ৬৬°, সর্ব্বনিম্ন ৫৪°, বাৎসরিক বারিপাত গড়পড়তা ১০৫″।

বাংলা ও মাদ্রাজ ছাড়া বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আর কোথাও সিন্‌কোনার বাগান নাই। তবে Agricultural Statistics of India হইতে দেখা যায় যে ১৯৩৩-৩৪ পর্য্যন্ত বোম্বাই ওয়ে একর মাত্র জমীতে সিন্‌কোনা গাছ ছিল। ১৯৩৪-৩৫ হইতে তাহাও শেষ হইয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজে সরকারী সিন্‌কোনা বিভাগের অধীনে সরকারী কুইনাইন কারখানাও (Government Quinine Factory P.O. Naduvattam, Nilgiris. Madras) রহিয়াছে। কারখানাটি আকারে ও উৎপাদন ক্ষমতায় মাংপু কারখানার অর্দ্ধেক বলিলেও চলে।

প্রবন্ধের প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে কুইনাইন বিষয়ে ভারতবর্ষ স্বয়ংপূর্ণ নহে। এই বিষয়ে ভারতকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়াই সারা ভারতে সিন্‌কোনা চাষের উপযুক্ত ক্ষেত্র অন্বেষণ করিবার জন্য অল্পবিস্তর চেষ্টা করা চলিতেছে। সিন্‌কোনা ক্ষেত্র প্রসারণ চেষ্টার মূলে আছে কতকগুলি সরকারী ও বেসরকারী উপদেশ। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে A. T. Gageএর বিবরণ, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে Royal Commission of Agricultureএর নির্দ্দেশ এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে Imperial Council of Agricultural Researchএর অভিমত সবগুলিই এই বিষয়ে একমত যে, যদি ভারতবর্ষকে উন্নত করিতে হয়, তাহা হইলে ভারতীয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে এবং ভারতকে ম্যালেরিয়ামুক্ত করিবার জন্য কুইনাইন বিষয়ে ভারতবর্ষকে স্বয়ংপূর্ণ হইতে হইবে। ইম্পিরিয়েল কাউন্সেল অফ্ এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চের অধিনায়ক উইলসন্ সাহেবের মতে ৬,০০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন যাহাতে ভারতে প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক একর জমীর আবাদ হইতে গড়ে বাৎসরিক ১৫ পাউণ্ড কুইনাইন হইয়া থাকে। অতএব ৬,০০,০০০ পাউণ্ডের জন্য ৪০,০০০ একর আবাদী জমী চাই অথচ সিন্‌কোনা আবাদের উপযুক্ত এই বিরাট্ জমী বর্ত্তমানে বিশেষজ্ঞগণের সন্ধানে নাই, অতএব ইহার সন্ধান করিতে হইবে। এদিকে আবার বাংলা ও মাদ্রাজের সিন্‌কোনা বাগান হইতে দেখা যায় যে, গড়ে প্রতি একর জমীতে আবাদ করিবার জন্য অন্ততঃ দুই বা আড়াই একর জমী অন্য কাজে লাগে, যথা বাঁশঝাড়, কুলীলাইন, রাস্তা, নদীর খাত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ মাংপু আবাদের হিসাব দেখা যাইতে পারে। মাংপুতে সিন্‌কোনা বিভাগের হাতে ১৯,০৯৪ একর জমী আছে; তন্মধ্যে ৭,২১৩ একর জমীতে প্রজা বসান আছে, বিভাগের হাতে খাস জমী আছে ১১,৮৮১ একর। ইহার মধ্যে ২,৪৬৩ একরে সিন্‌কোনা গাছ এবং অবশিষ্ট জমী আবাদের অন্যান্য আনুসঙ্গিক প্রয়োজনে নিয়োজিত আছে। এখানে অবশ্য প্রতি একর আবাদের জন্য সাড়ে চার বা পৌনে পাঁচ একর জমী আনুসঙ্গিক অন্য কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহা হউক, এই হিসাবের অর্দ্ধেক ধরিলেও প্রতি বৎসর চল্লিশ হাজার একর জমী হইতে ফসল লইতে হইলে অন্ততঃ ১,২০,০০০ একর হইতে ১,৫০,০০০ একর জমী সিন্‌কোনা বাগানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই এবং প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে ৩,৩৩৩ একর জমীতে সিন্‌কোনা গাছ বপন করিতে হইবে।

তুলনামূলকভাবে দেখিবার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে সিন্‌কোনায় কতটা জমী নিয়োজিত ছিল, তাহা দেখা যাইতে পারে। Agricultural statistics of Indiaর মতে ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে মোট ৪,৩৪৬ একর জমীতে সিন্‌কোনা বাগান ছিল, ১৮৯৮-৯৯এ উহা সহসা বৃদ্ধি পাইয়া ৬,১৯২ একর হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় ১৯০০-০১ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া ৪,৯০৩ একরে দাঁড়ায়। ইহার কারণ ঐ সময়ে বেসরকারী বাগানগুলির অধিকাংশই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মাদ্রাজে সরকারীর তুলনায় বেসরকারী বাগান ছিল অনেক বেশী। ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ১,৩৯৪ একর সিন্‌কোনা বাগানের মধ্যে ১০ একর মাত্র বেসরকারী সম্পত্তি ছিল, কিন্তু ঐ বৎসর মাদ্রাজে ২,৯৫২ একার বাগানের মধ্যে সরকারী সম্পত্তি ছিল মাত্র ৮০০ একর, বাকী সমস্তই ছিল বেসরকারী। ইহার পর হইতে সিন্‌কোনা বাগানের পরিমাণ

পুনরায় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ চার বৎসর পরে ১৯০৪-০৫ সালের হিসাবে দেখা যায় সারা ভারতে সিনকোনার নিযুক্ত মোট ভূমির পরিমাণ ৫,২৬৯ একর, তন্মধ্যে বাংলাদেশে ১,৮০০ একর, মাদ্রাজে ৩,২৯৩ একর ও কুর্গে ১৭৬ একর।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে সিনকোনা বাগানের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য অনেকেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সিনকোনা বাগান করিবার জন্য সরকারকে সাহায্য করিতে উপদেশ দিতেছেন। জাভার সমস্ত বাগানই বেসরকারী এবং ইহাদের উন্নতি দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতেও এইরূপ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান উন্নতি করিতে পারিবে। বিশেষতঃ, চা বাগানগুলিতে উৎপাদনের 'কোটা' নিরূপিত হওয়ার পর হইতে যে সমস্ত চা বাগান আংশিকভাবে বেকার হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারা সিনকোনার আবাদ গ্রহণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু শোনা যাইতেছে, তবে এখনও বাংলাদেশে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সিনকোনা বাগান আরম্ভ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া শোনা যায় নাই।

সিনকোনা চাষ

সিনকোনা বীজ নিতান্ত ক্ষুদ্র। ৭০,০০০ বীজের ওজন এক আউন্স মাত্র। ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে এই বীজ পাকিয়া থাকে। বীজ হইতে গাছ করিয়া আবাদে বসাইবার জন্য ইহাকে তিনবার করিয়া রোয়া transplantation করিতে হয়। এই সময় ইহার বিশেষ যত্ন রাখিতে হয়। প্রথম বারে সিনকোনা চারাকে চালা ঘরে বসাইয়া আধ ইঞ্চি আন্দাজ গাছ বড় হইলে তাহাকে অন্য মাটীতে তুলিয়া বসাইতে হয়। পরে গাছগুলি চারি ইঞ্চি লম্বা হইলে উহাদের পুনরায় তুলিয়া উর্ব্বরা ভূমিতে বসাইতে হয়। পরে উহা একফুট উঁচু হইলে শেষবারের মত তুলিয়া আবাদে বসাইতে হয়। আবাদে সাধারণতঃ এক একর জমীতে প্রায় দুই হাজার গাছ বসান হইয়া থাকে। দার্জ্জিলিং জেলার হিসাবে চার ফিট অন্তর অন্তর বসাইয়া এক একর জমীতে ২,৭২২টি গাছ বসান হইয়া থাকে। তিন বৎসর পরে এইরূপ আবাদ হইতে অর্দ্ধেক গাছ কাটিয়া বাগানকে পাৎলা করিয়া দিলে যে গাছগুলি থাকে, সেগুলি সতেজে বাড়িয়া উঠে।

আবাদকে পাৎলা করিবার জন্য যে গাছগুলি কাটা হয়, সেগুলির ছাল হইতে সিনকোনা পাওয়া যায়। যে গাছগুলি আবাদে থাকে সেগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আট বৎসর পরে কাটিয়া ফেলিয়া তাহা হইতে ছাল সংগ্রহ করা হয়। সিনকোনা গাছ কাটিবার পরে কাটা গাছের গোড়া হইতে পুনরায় গাছ জন্মে এবং পুনরায় আট বৎসর পরে সেই গাছগুলি গোড়া হইতে উপ্‌ড়াইয়া লওয়া হয়। প্রথমবারে গাছের গুঁড়ি ও ডাল হইতে ছাল পাওয়া যায়, দ্বিতীয়বারে গুঁড়ি, ডাল ও শিকড় হইতে ছাল সংগ্রহ করা হয়। শিকড় হইতে যে ছাল পাওয়া যায়, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক কুইনাইন পাওয়া যায়।

বাংলাদেশে সিনকোনা ত্বক্ সংগ্রহ করিবার এই ব্যবস্থা এখানকার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মাদ্রাজে কিন্তু এই রীতি নাই। সেখানে সিনকোনা গাছকে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অবাধে বাড়িতে দেওয়া হয় এবং ইহার পর একেবারে উপড়াইয়া লওয়া হয়। মাদ্রাজের পক্ষে ইহাই নাকি লাভজনক ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে দ্বিতীয়বারে অর্থাৎ ষোল বৎসর পরে সিনকোনা গাছ গোড়া হইতে উপড়াইয়া লইয়া সিনকোনার ঐ আবাদী ভূমিকে অরণ্যে পরিণত করার বিধান আছে *। ইহার পর এই জমীর উপর দশবৎসর যাবৎ অরণ্য রাখা প্রয়োজন। পরে ঐ জঙ্গল কাটিয়া উহার মাটী হইতে জঙ্গলের শিকড় ইত্যাদি পরিষ্কৃত করিয়া ও আগাছাগুলি অগ্নিদগ্ধ করিয়া উহাতে পুনরায় সিনকোনা আবাদ করিতে হয়। এইরূপ না করিলে সিনকোনা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া যায় এবং এইরূপে জমী রক্ষা করিলে একই ক্ষেত্রে অনন্তকাল ধরিয়া সিনকোনা আবাদ চলিতে পারে। অতএব দেখা যায় যে, একটি ভূমি একবার সিনকোনা আবাদের পর পুনরায় আবাদ করিতে ২৬ বৎসর সময় কাটিয়া যায়। পরিমাণের দিক দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে, গড়পড়তা মাংপুতে একর প্রতি বৎসরে ৩৫০ পাউণ্ড ও মুনসংএ একর প্রতি বৎসরে ৪০০ পাউণ্ড শুষ্ক ত্বক্ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে এই প্রণালীতে বৃক্ষ ত্বক সংগৃহীত হইলেও জাভায় ছয় বা আট বৎসর পরে গাছ কাটার রীতি নাই। তাহারা বাগানের জীবিত বৃক্ষ হইতে কাটারীর ন্যায় গড়নের একপ্রকার ভোঁতা যন্ত্রের সাহায্যে গাছ হইতে এমনভাবে ছাল ছাড়াইয়া লয় যাহাতে গাছের পরবর্ত্তী স্তরে † কোনরূপ আঘাত না লাগে। ইহাকে shaving system বলা হয়। অনেক সময় এইভাবে ছাল ছাড়াইয়া লইয়া কাটা স্থানে শেওলা জড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাকে Mossing system বলে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের তেজ যাহাতে কমিয়া না যায়, সেজন্য সমগ্র ছাল না ছাড়াইয়া দেড় ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া ফিতার মত করিয়া ছাল ছাড়াইয়া উহাতে শেওলা জড়াইয়া দেওয়া হয় এবং ঐখানে ছাল জন্মাইলে যে অংশ পূর্ব্বে ছাড়ানো হয় নাই তাহাই ছাড়াইয়া লওয়া হয়। ইহাকে stripping and mossing process বলে। যে কোনো রূপেই ছাড়ানো হউক না কেন, একবার ছাড়ানোর পরে সেই স্থানের ত্বক পূর্ব্বের ন্যায় পুরু হয় না, কিন্তু পুরু না হইলেও কাটা অংশের উপরের নবজাত ত্বকে ক্ষারদ্রব্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।
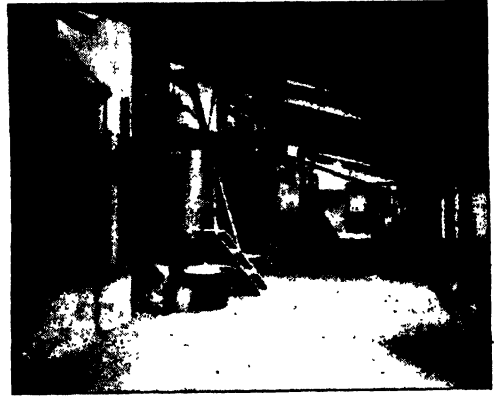
সিনকোনা হইতে কুইনাইন নিষ্কাষণের কারখানা

সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহারা ১৮ মাস বা দেড় বৎসর বয়স্ক সিনকোনা গাছ হইতে ছাল সংগ্রহ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বুঝা যায় যে, এইরূপে ত্বক সংগ্রহ করিলে তাড়াতাড়ি কুইনাইন পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পড়তা পোষায় না, লোকসান স্বীকার করিতে হয়। একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, গাছের পরিণতির জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সময় লাগে, উহার আগে বা পরে গ্রহণ করিলে পরিমাণের অনুপাত নিঃসন্দেহে কম হইয়া থাকে।

---

* এই অংশটি ঔপপত্তিকভাবে (theoretical) আলোচিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাই করা উচিত ; যদিও বাস্তবভাবে দেখিলে বলিতে হইবে নানা কারণে বাংলার বাগানে এইভাবে কাজ এখনও হয় নাই, তবে এইরূপ হইবার ব্যবস্থা আছে।

† যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'Cambium Layer' এর বাংলা পরিভাষা করিয়াছেন পরবর্ত্তী স্তর। ছাল ছাড়াইবার সময় এই স্তর আহত হইলে পুনরায় ছাল জন্মায় না।

সোভিয়েট নীতিতে সিন্‌কোনা সংগ্রহ শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসায়িক হিসাবে লাভজনক না হইলেও মোটের উপর তাড়াতাড়ি কুইনাইন পাওয়া যায় বলিয়া ভারত সরকার এই প্রণালী অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশে ব্যবস্থাও সুরু হইয়া গিয়াছে। ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে এই প্রণালীতে সিন্‌কোনার আবাদ করিয়া যাহাতে আড়াই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে কুইনাইন পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন এবং এই প্রচেষ্টার সমস্ত ব্যয় ভারতসরকারই বহন করিতেছেন। ভারত সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে বাংলাদেশে সাতশত একর জমীতে মিশ্র সোভিয়েট ও ভারতীয় প্রণালীতে সিন্‌কোনা আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। এই আবাদে দুই ফিট অন্তর অন্তর চারা বসাইয়া আড়াই বৎসর পরে একটি অন্তর একটি গাছ তুলিয়া ফেলা হইবে। ইহাতে বাংলাদেশের প্রণালীর তুলনায় একটি ক্ষেত্রে চতুর্গুণ অধিক গাছ বসানো হইবে এবং আড়াই বৎসর পরে ক্ষেত্রের তিন ভাগ গাছ কাটিয়া ফেলিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা বাংলাদেশের প্রণালী মতই চলিতে থাকিবে। রংগোতে এই আবাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সাতশত একর আবাদের জন্য উপযুক্ত নার্শারীর প্রয়োজন এবং হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৬´+৫´ আয়তনের ৫৫,০০০ নার্শারী বেড্‌ প্রয়োজন। এই বেড্‌গুলির জন্য মিট ৩০·৫৮ একর জমী চাই, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মোটামুটি ১২০ একর জমী নার্শারী বাবদ নিযুক্ত করিতে হইবে। মাংপু, মান্‌সং, লাটপঞ্চের এবং রংগো এই কয়স্থান মিলাইয়া এই নার্শারী বেড্‌গুলি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাংলার অরণ্য বিভাগ এবং অন্যত্র হইতে শত শত টন উপকরণ লইয়া চার হাজার শ্রমিকের দ্বারা এই কার্য্য পুরা উদ্যমে চলিতেছে। বর্ত্তমানের যুদ্ধ ও তজ্জনিত কুইনাইনের অভাবই এই বিষয়ের সমস্ত অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছে।

উপরে উল্লিখিত এতগুলি বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে যেরূপেই ছাল সংগৃহীত হউক না কেন, ঐগুলিকে ভালোভাবে শুকাইয়া লইতে হয়। সিন্‌কোনার বিশুষ্ক ছাল বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে, কিন্তু কাঁচা রাখিলে নষ্ট হইয়া যায়। চায়ের পাতা শুকাইবার জন্য যেরূপ withering racksএর প্রচলন আছে, সিন্‌কোনার ছালও সেইরূপে শুকান হইয়া থাকে। বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ছালগুলি ফেলিয়া হাওয়া লাগাইয়া শুকান যাইতে পারে বা বাষ্পীয় উত্তাপেও ইহার জলীয় অংশ বিদূরিত করা হয়। সিন্‌কোনার ছাল উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে উহা গুদামে সঞ্চিত হয় এবং প্রয়োজনমত কারখানায় পাঠানো হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

হারাধনের মায়া

শ্রীজনরঞ্জন রায়

রাত্রি প্রায় একটা। আকাশে পাতলা পাতলা মেঘ···কোথায় তাহারা ছুটিয়াছে?···দক্ষিণ হইতে উত্তরে চলিয়াছে··কে আছে উত্তরে? সব হাল্কা মনে ছুটিয়াছে অলকা পুরীর দিকে··· তাহাদের দেশের দিকে।···আনন্দে এ উহার ঘাড়ে পড়িতেছে জ্যোৎস্নার আলোকে। অলকা কি স্বপ্ন রাজ্য···?

জোরে একটা হাওয়া আসিল···যেন সেপাই তাড়া দিল— এমন করিয়া গা ভাসাইয়া গেলে চলিবে না। সব ঠাসাঠাসি হইয়া গিয়াছে ঐ উত্তরের আকাশে···ভয়ে রং হইয়া গেল কালো!

মাথার উপর ঐ নীল চাঁদোয়া···তাহার রূপালী চুম্‌কিগুলির কি নরম আলো!

ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। এই কি ডাকিবার সময়? উহার মনে রং ধরিয়াছে তাই ডাকিতেছে···নিজের সুরে ও গান ধরিয়াছে।

শব্দ আসিল—'না গো···না গো···না গো!···কোল থেকে নিও না···। আমার কুঁড়ে থেকে কাতর শব্দ আসিল। উঁনি স্বপ্ন দেখিতেছেন···হারাধনকে কোলে নিয়াও স্বপ্ন দেখিতেছেন! আমি চাতাল হইতে উঠিয়া গিয়া ওঁর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। বলিলাম—'ছিঃ-ছিঃ···তোমার কোলে রয়েছে যে হারাধন···তোমার অরুণ···তোমার হারাধন'!

প্রথম সন্তান অরুণোদয় মারা গিয়াছে আড়াই বৎসর আগে। তাহার পর যে কোলে আসিয়াছে তাহার নাম হারাধন। অরুণকে যখন গুরুদেব তাঁহার কাছে ডাকিয়া নিলেন···নীল হইয়া গিয়াছে তাহার দেহ···সেই দেহ নিয়া উঁনি কাঁদিতেছেন!··· আমি ওঁর কোল থেকে তাহাকে বুকে তুলিয়া নিলাম—চোখ বুজিয়া গেল—তাকাইতে পারিলাম না তাহার দিকে।···শ্মশান-যাত্রীদের হাতে উঠাইয়া দিলাম। সেই স্মৃতি আজও ওঁর মাথায় রহিয়াছে···। চোখ ভিজিয়া গেল···।

চাতালে দুই একটা মশা উৎপাত করিতেছে···মশারীটা খাটাইয়া নিলাম।

জ্যোৎস্নার নেশা···হাওয়ার নেশা···প্রিয় সন্তানের স্মৃতির নেশা···ঘুমাইয়া পড়িলাম—কি যেন সুখের আমেজ নিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছি জানি না···কিন্তু স্বপ্ন দেখিতেছি। দেখিতেছি আমি মেঘের উপর চড়িয়া চলিতেছি···দূরে···কত দূরে। কোন দেশে আসিলাম! একটা স্নিগ্ধ বেগুনে আলো··· সেই আলোতে দেখিতে পাইলাম গুরুদেবকে। নিমীলিত নেত্রে তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন। আমি প্রণাম করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। গুরুদেব এবং আমি ছাড়া আর কেহ সেখানে নাই। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। আলোটা যেন হইল নীল···তাহার পর সবুজ। যেন গুরুদেবের ওষ্ঠ নড়িতেছে···চারি দিকে যেন প্রাণের স্পন্দন হইতেছে। অশরীরীগণ তাঁহাকে চামরব্যজন করিতেছে···কতলোক পূজার উপকরণ নিয়া আসিতেছে। শিশুদের বন্দনা গানের শব্দ কানে আসিল। গুরুদেব চোখ মেলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। বলিলেন—এসেছো···ঐ দেখ তোমার অরুণ আসছে! হলদে রঙের আলো ফুটিল···তাহার পর কমলা···সব মিশিয়া গেল অরুণ রঙের আলোর সঙ্গে। শিশুগণের আগে ঐ অরুণ···আমার অরুণোদয়! এই অরুণোদয় সময়ে সে যে আমাদের কাছে আসিয়াছিল—তাই নাম রাখিয়াছিলাম অরুণোদয়।

ডাকিলাম—অরুণ···অরুণ!

জাগিয়া উঠিলাম স্ত্রীর স্পর্শে। তিনি আমার বুকে হাত বুলাইতেছেন আর বলিতেছেন—'ছিঃ-ছিঃ···তোমার কোলে রয়েছে যে হারাধন···তোমার 'অরুণ!' সত্যই কোলের কাছে হারাধন। তখন অরুণোদয় হইতেছে।

শিল্পী পশুপতি

শ্রীসুবোধকুমার রায়

শিল্পজগতে বাংলার মৃৎশিল্পের একটা বিশেষ স্থান আছে। মৃৎশিল্পে বাংলার গড়নভঙ্গী সম্পূর্ণ নিজস্ব। খেলনা, বাসন থেকে আরম্ভ করে' দেবদেবীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত সব কিছুতেই বাংলার শিল্পীগণ আপন প্রদেশের নিজস্বতাকে বজায় রেখে এই শিল্পটাকে দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। পালরাজাদিগের রাজত্বের সময় এক উন্নত ধরণের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভঙ্গি ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বাংলার এই শিল্পটা যে গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা আজও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। স্বতন্ত্র ধরণের গড়নভঙ্গী ও সুনিপুণ সৃষ্টির কৌশলে ঐ সময়ের শিল্পীগণ সম্পূর্ণ স্মরণীয় হয়ে আছেন।

বর্ত্তমানে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর কৃতী ছাত্রগণের চেষ্টায় ভারতীয় চারু শিল্পে নবযুগ আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মৃৎশিল্পেও এক নবযুগের সৃষ্টি হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীগণের প্রভাব

পার্ব্বত-পরমেশ্বর

বিষ-পান•

শিল্পী ও তাঁহার নির্ম্মিত কয়েকটি মূর্ত্তি

বাংলার মৃৎশিল্পেও যথেষ্ট পড়েছে। ভারতীয় ভাবধারা ও ভঙ্গী বজায় রেখে কয়েকজন শিল্পী মৃৎশিল্পকে এক নব পর্য্যায়ে উপনীত করবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের শিল্পনৈপুণ্য ও নির্ম্মাণচাতুর্য্যে বাংলার মৃৎশিল্প বর্ত্তমানে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করেছে।

শিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্য্যও ভারতীয় ভাবধারা ও ভঙ্গী বজায় রেখে মৃৎশিল্প সাধনায় ব্রতী হয়েছেন; কিশোর বয়স থেকে পশুপতির ঝোঁক ছিল চারুশিল্পে, কারও কাছে শিক্ষা গ্রহণ না করে তিনি ছবিও এঁকেছেন অনেক, কিন্তু সেগুলিকে সার্থক সৃষ্টি বলা চলে না। বর্ত্তমানে তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, এখন তিনি মন দিয়েছেন মৃৎশিল্পে। ছবি আর আঁকেন না, বর্ত্তমানে সবটুকু সময়ই কোন না কোন মাটির
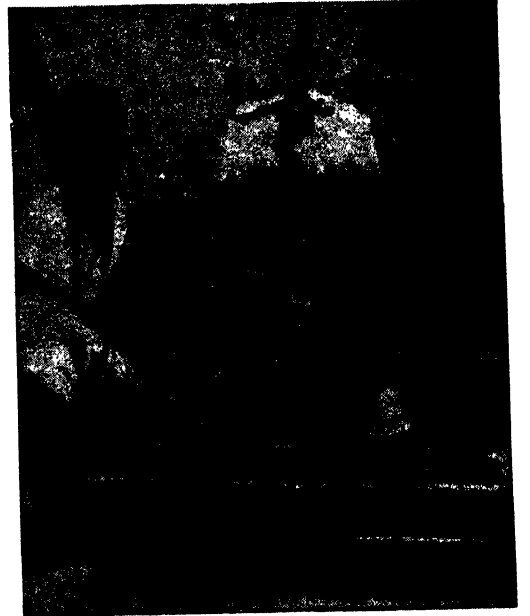
পুতুলে রূপ দিতে ব্যস্ত। শ্রীধর, পার্ব্বতী পরমেশ্বর, বিষপান, দেবদাসী, কবি রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি প্রভৃতি তিনি গড়ে তুলেছেন অতি নিপুণতার সঙ্গে। এ শিল্পসাধনায় তিনি সাফল্যলাভ করেছেন নিজের অধ্যবসায়ের দ্বারা, কারুর কাছেই কোনদিন এবিষয়ে শিক্ষালাভ করেননি।

শিল্পী পশুপতি কি ভাবে প্রথম মৃৎশিল্পে অনুপ্রাণিত হ'লেন তা শিল্পীর কাছে যা শুনেছি সেই গল্পটা বলা আশাকরি এখানে অবান্তর হবে না।—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিল্পী একদিন মুলাজোড় কালীবাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে মন্দির সোপানের পাশে একটা মঞ্চে শ্রীধরের একটা মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। বাসনা হয় ঐ ধরণের মূর্ত্তি নিজ হাতে সৃষ্টি করতে। বাড়ীতে ফিরে এসে কি ভাবে ঐ দেবতার রূপ দেবেন সেই চিন্তাতেই তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে। যে বিষয়ে কোন শিক্ষা নেই, কোন জ্ঞান নেই—যিনি ইতিপূর্ব্বে কোনদিনও একটা মাটির পুতুলও গড়েননি তাঁর এই অসাধ্য সাধনার সঙ্কল্পে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যত্ন ও সাধনায় কিছুদিনের মধ্যে সত্যাই শ্রীধর মূর্ত্তি রূপায়িত হয়ে উঠল। আর এ সৃষ্টি যে সার্থক হয়েছে—সেই আনন্দে তিনি পুতুলের পর পুতুল গড়তে লাগলেন। আবাল্য শিল্পী মন তাঁর সৃষ্টি-সাফল্যে মুক্তি পেয়ে নূতন উৎস মুখের সন্ধান পেয়েছে। আপন সৃষ্টিনৈপুণ্যকে পূর্ণাঙ্গ করবার জন্যে নিত্যই নূতন নূতন পরখ করে চলেছেন; সৃষ্টির বাসনায় শিল্পী দিন দিন এগিয়ে চলেছেন সাফল্যের দিকে।*

শ্রীধর

দেবদাসী

* যে পুতুলের ছবিগুলি প্রকাশিত হইল ইহা ছাড়া শিল্পীর তৈয়ারী আরও অনেকগুলি পুতুল আরিয়াদহ শিল্প প্রদর্শনীতে (২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪২ সালে) প্রদর্শিত হইয়াছিল।

প্রেম ও পক্ষ

শ্রীপরেশ ধর এম্-এ

প্রত্যহ রাত্রিশেষে পূর্বাকাশ রক্তিম হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় ঝুলান পিঞ্জরাবদ্ধ টিয়াপাখী দুইটির হৃদয় চঞ্চল হইয়া ওঠে। বড় টিয়াপাখীটি পুরুষ, ছোটটি স্ত্রী। ভোরবেলা অন্যসব পাখীরা যখন আকাশের বাধাহীন নীলিমায় পক্ষ বিস্তার করিয়া গান গাহিতে গাহিতে উড়িয়া বেড়ায়, লৌহপিঞ্জরাভ্যন্তরে এই টিয়াপাখী দুইটির মনে তখন পুলকের রোমাঞ্চ জাগে—তাহারা দুইজনে একসঙ্গে গান গাহিয়া ওঠে—সে গানে একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার আভাস পাওয়া যায়।

বড় টিয়াপাখীটি বলে, আমাদের জীবন বৃথা হ'য়ে গেল! ঈশ্বরের আশীর্বাদে যদিও তোমার আমার পরিচয় এই খাঁচার মধ্যে, তবু আমাদের দুঃখ এই যে হৃদয়ে এত আনন্দ নিয়ে আমরা মুক্ত পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারলুম না। প্রথমে আমাকেই ওরা একলা এই খাঁচায় কিনে এনে রেখেছিল। তারপর একদিন দেখলুম তোমায় কিনে এনেছে। সেই প্রথম তোমায় যেদিন দেখি,সেদিন আমার সমস্ত ওলটপালট হ'য়ে গেল; আমার নবজন্ম হ'লো। আমি পলকহীন চোখে তোমার দিকে তাকিয়েছিলুম! দেখলুম, তুমিও ঠিক তেমনি ভাবে আমার দিকে চেয়ে র'য়েছো! মনে হলো, পৃথিবীতে কি যেন ঘটে যাচ্ছে! আমার শিরার রক্ত উত্তেজনায় যা কাঁপ্‌ছিল!

কথা শুনিয়া ছোট পাখীটির চোখ দুইটি উচ্ছ্বাসে ঝলসিয়া ওঠে। প্রথমে সে কোন কথা বলিতে পারে না, শুধু বড় পাখীটির গা ঘেঁসিয়া বসে। তারপর আনন্দে ডানা ঝাড়িয়া বলে, সেদিন আমারও ঠিক ঐ রকম হ'য়েছিল। তোমায় না পেলে আমার জীবন বিফল হ'য়ে যেত। এই পরাধীনতার মধ্যে তুমিই আমার আনন্দ।

বড় পাখীটি বলে, আমরা যদি মুক্তি পেতুম তাহলে আরো কত আনন্দ হতো। ও পাড়ায় যে ভাঙা মঠ আছে তারই একটি পরিস্কার কোটরে আমরা দুজনে নীড় বাঁধ্‌তুম। ভোর বেলা দুজনে একসঙ্গে এক সুরে গান গাইতে গাইতে বনের ওপর দিয়ে নদীর ওপর দিয়ে বাতাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতুম; তারপর যখন দুপুর হ'তো তখন ধান ক্ষেতে নেমে ঝকঝকে পাকা সোনালী ধান পেট ভরে খেতুম। বিকেল বেলা নিম গাছ থেকে নিম ফল খেতুম, বকুল গাছ থেকে বকুল ফল—আরো কত কি! সে কি সুখের জীবন!

—সত্যি, অমন জীবন যদি আমরা পেতুম!

—এখানে আমাদের রোজ দুধের সর দেয়, কত ভালো ভালো খাবার খেতে দেয়; কিন্তু জানো, এসব খাবার আমার বিষের মত মনে হয়।

—আমারও তাই। আমরা কি জীবনেও এই খাঁচার ভেতর থেকে ছাড়া পাব না?

—একদিন না একদিন নিশ্চয় পাবো। আমার মনে হয় ভগবান একদিন আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন।

—তাহলে কি মজাই না হবে! সেদিন শুধু তুমি আর আমি অসীম শূন্য দিয়ে উড়ে যাবো—আমাদের সবুজ পালকে লাল সূর্য্যের আভা ঝরবে সোনার গুঁড়োর মত। শুধু তুমি আর আমি—

—আমাদের কারো মুখে কথা নেই—উড়ে চলেছি ত চলেছি—কোথায় জানি না। একদিন খাঁচার দরজাটা খোলা পেলে হয়।

গভীর ভাবাবেগে পাখী দুইটি আর কথা কহিতে পারিল না। তাহারা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাড়ীতে তখন সকলেই জাগিয়াছে। ছোট ছেলেমেয়েদের কোলাহল ক্রমশঃই প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে। বড় পাখীটি বিরক্ত হইয়া অতিশয় কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার সুরু করিয়া দিল—ট্যাঁ—ট্যাঁ—ট্যাঁ।

বাড়ীর গিন্নী তাঁহার দশ বৎসর বয়স্কা নাত্‌নীকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে বিলু, তাকের ওপরকার বাটি থেকে পাখী দুটোকে দুটি ছোলা দেত রে—

একটি টুলের উপর দাঁড়াইয়া বিলু বারাণ্ডার শিকে ঝুলান খাঁচাটিকে মাটিতে নামাইল। তারপর অতি সন্তর্পণে সে খাঁচার দরজাটি খুলিল। দরজা খুলিয়াই তাহার মনে হইল যে ছোলার বাটি হইতে ছোলা আনা হয় নাই। তাড়াতাড়ি সে ছোলা আনিতে গেল, কিন্তু যাইবার সময় খাঁচার দরজা বন্ধ করিয়া যাইবার কথা মনে হইল না। অভাবনীয় সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া টিয়া পাখী দুইটির চোখে মুখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের দীপ্তি খেলিয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের চোখে চোখে কি এক নির্বাক্ ইসারা হইল, তারপর উন্মুক্ত দরজা দিয়া পাখী দুইটি নিমেষের মধ্যে বাহির হইয়া গেল। ইতিমধ্যে নিজের ভুলের কথা স্মরণ হইতেই ব্যস্ততাসহকারে বিলু খাঁচার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং উপর দিকে চাহিয়া চকিতের জন্য উড্ডীয়মান টিয়াপাখী দুইটিকে একবার মাত্র দেখিতে পাইল। শূন্য হইতে সে শুধু দুইটি ডাক শুনিতে পাইল, টি—টি—।

সুবিস্তীর্ণ অনন্ত নীল আকাশের মধ্য দিয়া পাখী দুইটি উদ্দেশ্যহীনভাবে ক্রমাগত উড়িয়া চলিতে লাগিল। সদ্য মুক্তির আনন্দে তাহাদের অন্তর তখন অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উল্লাসের আতিশয্যে তাহারা কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না। অননুভূত নূতন এক উদ্দীপনায় তাহারা শুধু উচ্চকণ্ঠে গান গাহিতে লাগিল—সে গানের সুর বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে কাঁপিয়া কাঁপিয়া সমস্ত আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল। অন্যান্য আরো অনেক পাখী আকাশে উড়িতেছিল। কিন্তু টিয়াপাখী দুইটি কাহারও দিকে তাকাইয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। অতি দ্রুত পক্ষ সঞ্চালিত করিয়া তাহারা মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। বায়ু-প্রবাহে তাহাদের দেহের পালকগুলি আলোড়িত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ উড়িবার পর অবশেষে শ্রান্ত হইয়া তাহারা একটি বটগাছের ডালে গিয়া বসিল। উভয়েই তখন মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করিতেছে।

বড় পাখীটি বলিল, কি করে যে আমি আমার আনন্দ প্রকাশ করবো ভেবে পাচ্ছিনে। ঈশ্বর আমাদের কথা নিজের কানে শুনেছেন। কি আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি আমাদের সুযোগ ঘটিয়ে দিলেন দেখ্‌লে! এবার আমরা কি করবো বলত?

ছোটপাখীটির চোখে কি এক রমণীয় মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছিল। উদ্বেল কণ্ঠে সে কহিল, এবার আমরা সেই ভাঙা মঠে ফিরে যাবো। সেখানে একটি পরিচ্ছন্ন কোটরে আমাদের বাসা বাঁধতে হবে।

—আমাদের জীবনের অন্ধকার আজ দূর হ'য়ে গেল।

—এখন সামনে শুধু মধুর ভবিষ্যৎ—

—আর, শুধু তুমি আর আমি—মুক্ত, স্বাধীন জীবন—

—হ্যাঁ, শুধু তুমি আর আমি—পৃথিবীতে আর কেউ নেই—

তারপর বড় পাখীটি পরম আদরে ছোট পাখীটির মাথার ও দেহের পালকের মধ্যে ঠোঁট চালাইতে সুরু করিয়া দিল—আর ছোট পাখীটি অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিবিড় আরামে চুপ করিয়া বসিয়া সেই চঞ্চুস্পর্শের মাদকতা সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল।

এমন সময় আকাশে মেঘ জমিয়া হঠাৎ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল ও এলোমেলো বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। এখনি বোধহয় বৃষ্টি নামিবে। আসন্ন দুর্য্যোগের আভাসে টিয়া পাখী দুইটি শঙ্কিত হইয়া উঠিল ও মঠে ফিরিয়া যাইবার জন্য শূন্যে ডানা মেলিয়া দিল।

ভাঙা মঠের নিভৃত কোটরে সে দিন সমস্ত রাত্রি পাখী দুইটি ঘুমাইল না। জাগিয়া জাগিয়া তাহারা কত কথাই না কহিল। তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাহারা আলোচনা করিল। এখন হইতে তাহাদের জীবন সুখে ও তৃপ্তিতে কত না মধুর হইয়া উঠিবে! কল্পনার রঙে রঙে তাহারা ভবিষ্যতের সেই মাধুর্য্য মণ্ডিত দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রকার সুখোপকরণ ও বিলাসের মধ্যেও এই পাখী দুইটির হৃদয়ে যে বেদনা প্রতিনিয়ত গুমরিয়া উঠিত সেই বেদনা ও গ্লানি হইতে আজ তাহারা সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পাইল। আজ হইতে তাহারা এই সুবিশাল ও বিচিত্রজগতের প্রাণস্পন্দনের সহিত নিজেদের জীবন মিলাইয়া দিতে পারিবে; পরস্পরের প্রতি তাহাদের হৃদয়াবেগ স্বাধীনতার মধ্য দিয়া প্রখরতর ও মধুরতর হইয়া উঠিবে; সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিটি মূহুর্ত তাহারা নবজীবনের অভূতপূর্ব্ব প্রেরণায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। শেষ রাত্রে তাহাদের চোখে তন্দ্রা আসিল।

পরদিন প্রত্যুষে পাখী দুইটি যখন জাগিয়া উঠিলতখন তাহারা বেশ ক্ষুধা অনুভব করিতেছে। গতকল্য কিছুই খাওয়া হয় নাই। পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া অবধি সমস্ত দিন ও রাত্রি তাহারা অনির্ব্বচনীয় এক মোহের ভিতর দিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তাহাদের মনেও হয় নাই। কিন্তু বিগতদিনের সেই মোহ এখন অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। এইবার তাহাদের প্রাত্যহিক বাস্তবজীবনের সমস্তপ্রকার ছোটখাটো কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হইতে হইবে।

বড় পাখীটি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার খুব খিদে পেয়েছে ত?

ছোট পাখীটি বলিল, তোমার?

—হ্যাঁ, আমারও পেয়েছে—

—আমারও।

—বিলু না ফিলু কি সেই মেয়েটা—সে আমাদের আর ছোলা দিতে আসবে না। আমার এমন রাগ হতো! কি করবো—খিদের জ্বালায় আমরা সেই ছোলা খেয়েছি।

—ওরা আমাদের কত রকম খাবার খাওয়াত, ভাবত আমরা বুঝি সুখে আছি। ওদের যে আমরা ঘৃণা করতুম তা তো ওরা জানত না—ওদের দেওয়া খাবার যে আমরা খিদের জ্বালায় খেতুম, তৃপ্তিতে খেতুম না তা ওরা বুঝতো না।

—এখন আমরা নিজেরাই আমাদের খাবার সংগ্রহ ক'রবো।

—পৃথিবীতে খাবারের ভাবনা! বনে বনে গাছে গাছে কত ফল, কত কীট পতঙ্গ, কত কি! দুধের সরের চেয়ে আমাদের সে খাবার শতগুণে ভাল।

—তোমার মত পৃথিবীতে আর কেউ নেই! এত চমৎকার কথা বল তুমি, এত সুন্দর তোমায় দেখতে—এত মধুর তোমার মন!—

—তোমার কথা ভাবলে আমারও ঠিক এম্‌নি মনে হয়! তুমি আমায় কত ভালবাস, তুমি আমার সব!—

কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা কহিল না। নিস্তব্ধ থাকিয়া বোধ হয় মনে মনে উভয়ে উভয়ের কথাগুলির স্বাদ উপভোগ করিতে লাগিল। তারপর বড় পাখীটি পুনরায় কহিল, চল, এবার আমরা আকাশে উড়ি। সব ধান ক্ষেতের ধান এখনো পাকে নি; কোন পাকা ধানের ক্ষেত দেখতে পেলেই সেখানে আমরা নেমে পড়বো।

ইহার পর পাখী দুইটি আকাশে পক্ষ বিস্তার করিল।

সোজা পশ্চিম দিগন্তের পানে উড়িয়া চলিতে চলিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা একটি সুপক্ক ধানের ক্ষেত দেখিতে পাইল। যারপর নাই আনন্দের সহিত তখন তাহারা সেই ক্ষেত্রে নামিয়া আসিল। সমস্ত ক্ষেত্রটি ভরিয়া সোণার বর্ণ পাকা ধান থরে থরে ফলিয়াছে। গাছগুলি সেই ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই স্নিগ্ধ হরিদ্রাবর্ণ সুষমা, পাখী দুইটির প্রাণে কি যে হিল্লোল জাগাইয়া দিয়া গেল!

অবশেষে তাহারা ঠোঁট দিয়া ধান ছিঁড়িতে সুরু করিয়া দিল। ধানের খোসা ছাড়াইয়া সবে মাত্র দুই একটি শাঁস মুখে পুরিয়াছে, এমন সময় তাহারা দেখিতে পাইল ক্ষেতের অদূরে একদল রাখাল বালক লাঠি হাতে করিয়া এই দিকেই আসিতেছে। চলিতে চলিতে বালকেরা সহসা থামিয়া গেল ও মাঠ হইতে মাটির ঢিল কুড়াইয়া সকলে মিলিয়া টিয়াপাখী দুইটিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। একজন তাহাদের মধ্যে বলিয়া উঠিল, ধান খেতে এসেছো—এই যে ভাল করে খাওয়াচ্ছি!

ব্যাপারটি এতই আকস্মিক যে টিয়া পাখী দুইটি প্রথমটায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহারা কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। একটা ঢিল ছোট পাখীটির ঠিক পায়ের নিকট আসিয়া পড়িল। একটুর জন্য যদিও তাহার গায়ে লাগিল না, তথাপি তাহার ভাঙা টুকরাগুলি ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পাখীটির পেটে মাথায় সামান্য আঘাত করিল।

বড় পাখীটি বলিল, শীগ্‌গির উড়ে পালাই চল।

আর মুহূর্ত সময় নষ্ট না করিয়া তাহারা উড়িতে আরম্ভ করিল।

উড়িতে উড়িতে ছোট পাখীটি বলিল, ওরা কি পাজী দেখলে। দুটো ধান খেলে বাপু তোদের কি ক্ষতিটা হতো!

বড় পাখীটি উত্তর দিল, ওরা ঐ রকমই। পরের ভাল দেখতে পারে না।

ক্ষুধায় তাহারা দুইজনেই তখন ক্লান্তি বোধ করিতেছিল।

পশ্চিমদিকে না গিয়া এবার তাহারা উত্তরমুখী হইল। গতকল্য হইতে পেটে কিছু পড়ে নাই—পৃথিবীটা অন্ততঃ সাময়িকভাবেও তাহাদের নিকট নিষ্ঠুর মনে হইতে লাগিল। তথাপি মুখে তাহারা কেহ কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। কারণ, যে সুগভীর প্রীতি-বন্ধনে আজ তাহারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে তাহাতে বাস্তব জীবনের তুচ্ছ কয়েকটা দুঃখ কষ্ট তাহাদের মনে কি অশান্তি আনিতে পারে?

উড়িতে উড়িতে তাহারা একস্থানে ছোট একটি জামরুল গাছ দেখিতে পাইল। দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র অজস্র জামরুলগুচ্ছে গাছটি প্রায় আচ্ছাদিত। ফলগুলি দেখিয়া তাহারা দুইজনেই প্রলুব্ধ না হইয়া পারিল না। আনন্দে পাখী দুইটির চোখ বড় বড় হইয়া উঠিল। ছোট পাখীটি বলিল, কি চমৎকার ফল দেখেছো?

বড় পাখীটি বলিল, হ্যাঁ।

—এইখানেই নামা যাক্, কি বল?

—নিশ্চয়ই—

কিয়ৎ পরিমাণে পক্ষ সঙ্কুচিত করিয়া তাহারা বাতাসে গা ভাসাইয়া দিল এবং অতিশয় তীব্রবেগে নীচে নামিয়া আসিয়া জামরুল গাছের একটি ডালের উপর বসিল। গাছটিতে বিশেষ পাতা নাই। বৃহদাকার রসপুষ্ট ফলগুলি স্তবকে স্তবকে ঝুলিতে-ছিল। অনাহারী লোভীর মত তাহারা ফলের গায়ে চঞ্চু বসাইয়া দিল। উভয়েই দুই-একটি করিয়া ফল খাইয়াছে এমন সময় গাছের নীচে একটি লোককে অতিশয় দীর্ঘ একটি লাঠি হাতে করিয়া গাছটির দিকে সন্তর্পণে আগাইয়া আসিতে দেখা গেল। লোকটির উপর বড় পাখীটির নজর পড়িল। ভীত কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, সর্বনাশ!

ছোট পাখীটি শঙ্কান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হল?

—ঐ যে একটা লোক লাঠি হাতে করে গাছের দিকে আসছে, ওকে দেখেছো?

—হ্যাঁ।

—শীগ্‌গির উড়ে পালাই চল, তা না হলে আমাদের বিপদ হবে।

—কেন?

—আগে উড়ে পালাই এসো, তারপর বলবো।

শীর্ণপাখা আন্দোলিত করিয়া দ্রুত পক্ষ সঞ্চালনে শূন্যে উড়িয়া গেল।

ছোট পাখীটি জিজ্ঞাসা করিল, ও কে?

বড় পাখীটি বলিল, ওর হাতে যে মস্ত লাঠিটা দেখ্‌ছিলে, ওটার মাথায় আঠা লাগান আছে। ঐ লাঠির ডগাটা আমাদের ডানায় একবার লাগাতে পারলেই হলো, ব্যস্। আমরা আর উড়ে পালাতে পারবো না। এমনি করে ঐ লোকগুলো আমাদের ধরে ধরে বেড়ায়। জামরুল গাছে আমরা এতক্ষণ ফল খাচ্ছিলুম দেখে চুপি চুপি লোকটা আমাদের ধরতে এসেছিল। ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম!

—এত কাণ্ড! কি সর্বনাশ! আমি ত এর কিছুই জানতুম্ না।

—আমাদের ধরে ধরে খাঁচায় পুরে রাখতে ওদের যে কি আনন্দ হয়, বুঝি না।

—ওদের যদি এমনি করে কেউ খাঁচায় পুরে রাখ্‌তো, তবে বুঝ্‌তেন মজাখানা।

—সবাই আমাদের ধরতে চায়। কোন বাড়ীর ছাদের রেলিং-এর ওপর একবার গিয়ে বোসো, দেখ্‌বে বাড়ীর যত মেয়ে-পুরুষ তোমায় ধরবার জন্যে খাঁচা হাতে করে চুপি চুপি ছাদে উঠে আস্‌ছে।

—সত্যি?

এইরূপে বহুক্ষণ তাহারা উড়িয়া উড়িয়া নানাদিকে খাদ্যের অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল। বহু বাধা বিপত্তি, বহু হতাশার পর নানা স্থানের নানা প্রকার খাদ্যে কোন প্রকারে উদর পূর্তি করিয়া অবশেষে যখন তাহারা বাসায় ফিরিল তখন সূর্য পশ্চিম গগনে অস্তোন্মুখ। মনে হইল, বিগত দিনের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা আজ তাহাদের নিভিয়া গিয়াছে।

এই প্রকারে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল।

পিঞ্জরের ভিতরে ছোট পাখীটি কল্পনায় ভবিষ্যতের স্বাধীন জীবনের যে মনোহর স্বপ্ন রচনা করিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা বাস্তব জীবনযাত্রার নানাপ্রকার নির্মম সমস্যার আঘাতে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। খাঁচার ভিতরের সুনিবিড় শান্তির কথা কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল। ভাবনা নাই, চিন্তা নাই—যথা সময়ে প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ সম্মুখে আসিয়া যাইতেছে সেখানে কত আদর, কত যত্ন, কত রকমারী ফলমূল ও সুস্বাদু খাদ্যসামগ্রী। শীতকালের বড় বড় কমলালেবুর সুমিষ্ট রসের স্বাদ এখনও তাহার জিহ্বায় লাগিয়া রহিয়াছে। কে বলে দুঃখে সব তাহার বিষের মত মনে হইত! বড় পাখীটির মন রাখিবার জন্য সে শুধু তাহার কথায় সায় দিয়া গিয়াছে মাত্র কিন্তু বড় পাখীটিকে যে তাই বলিয়া সে ভালবাসিত না তাহা নহে। তাহাকে সে যথেষ্টই ভালবাসিত। যেদিন তাহারা মুক্তি পাইল সেদিন ছোট পাখীটির তো সত্যই আনন্দ হইয়াছিল। বড় পাখীটি তাহার মনে কি মোহ-মদির প্রভাবই না বিস্তার করিয়াছিল! কিন্তু শুধু হৃদয়োচ্ছ্বাসে কি পেট ভরে? জীবনে আরাম প্রয়োজন। স্বাধীন জীবনে যদি স্বাচ্ছন্দ্য না থাকে তবে সেরূপ স্বাধীন জীবনের কোন অর্থ-ই হয় না। ভাল করিয়া মনের মত সামগ্রী খাইতে পাইব না, আরাম করিয়া নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারিব না—তবে আর স্বাধীন হইয়া লাভ কি? পরাধীনতার মধ্যেও যদি সমস্ত বিলাসোপকরণ লাভ করিয়া জীবনকে প্রকৃত উপভোগ করা যায় তবে সেরূপ পরাধীনতাই কাম্য। ইচ্ছানুযায়ী নাই বা উড়িতে পাইলাম। মনে মনে বুঝিয়া আমার লাভটা কি? হইলই বা খাঁচাটি ছোট। ভাঙা মঠের অপরিচ্ছন্ন কোটর অপেক্ষা অনেক ভাল। খাঁচাটির তলা

কেমন পরিপাটি করিয়া কাগজ বিছাইয়া দেয়। যাহাতে গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিতে না পারে সেইজন্ত, রাত্রে খাঁচাটির চতুর্দিকে কেমন সুন্দর করিয়া পুরু কাপড় দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। বাস্তবিক এমন সুখের জীবন আর হয় না। আর এখানে ভোর হইতে না হইতেই খাবার খুঁজিতে বাহির হইতে হয়। ভাল জিনিষ কে খাইতে দিবে? যত বাজে জিনিষে বাধ্য হইয়া পেট ভরাইতে হয়। আর এরই জন্ত আবার সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানাদিকে উড়িয়া উড়িয়া মর। তাহা না হইলে উপবাসী থাকিতে হইবে। ছোট পাখীর মনে এই প্রকার অসন্তোষের জন্ত বড় পাখী ও ছোট পাখীটির মধ্যে একদিন সামান্ত কথা কাটাকাটি হইয়া গেল। কোথায় যেন সমস্ত গোলমাল হইয়া যাইতেছিল।

মাসখানেক পরে একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া বড় পাখীটি ছোট পাখীটিকে বলিল, চল, এবার খাবার খুঁজতে যাওয়া যাক্।

ছোট পাখীটি বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, আমি যাব না?

—সে কি? তুমি যাবে না?

—কি মণিমাণিক্য খাওয়াবে যে যাব? ও সব ছাইপাঁশ আমি রোজ রোজ খেতে পারবো না।

কথাগুলি বলিয়া ছোট পাখীটি গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। বড় পাখীটি যেন আকাশ হইতে পড়িল। তাহাদের জীবনে এ কি দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল! ছোট পাখীটি কি সব কথা ভুলিয়া গেল? উভয়ের সুগভীর মর্মপ্রেরণায় একদিন যে স্বর্গ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার স্থায়িত্ব কি শুধু তুচ্ছ একটা জাগতিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে? একথা সে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই। এ কি হইল ছোট পাখীটির! তবে কি সব মিথ্যা? ছোট পাখীটির পূর্ব্বেকার সমস্ত ব্যাকুলতা তবে কি ছলনা মাত্র? তাহা ত মনে হয় না। বড় পাখীটি মনে মনে বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

তথাপি বড় পাখীটি নম্রস্বরে ছোট পাখীটিকে বলিল, তুমি রাগ করেছ? কোন কারণে তোমার বোধ হয় আজ মনটা ভাল নেই। তা তুমি খাবার খুঁজতে আজ নাই বা গেলে। আমি তোমার জন্তে ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে আস্‌বো। তোমার কথায় আমি একটুও রাগ করিনি, জানলে?

ছোট পাখীটি কোন কথা কহিল না। অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই বড় পাখীটি কোটরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু দেখিল কোটর শূন্ত, ছোট পাখীটি সেখানে নাই। কোথায় গেল সে এমন সময়! বড় পাখীটি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ছোট পাখীটিকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত সে কোটর হইতে বাহির হইয়া গেল। চতুর্দিকে উড়িয়া উড়িয়া কোথাও সে তাহার দেখা পাইল না। এমন অসময়ে ছোট পাখীটি যে কোথাও যাইতে পারে তাহাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে, যে বাড়ীতে তাহারা বন্দী হইয়াছিল সেই বাড়ীর ছাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময় বারাণ্ডায় ঝুলান খাঁচাটির দিকে বড় পাখীটির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। খাঁচার ভিতর ছোট পাখীটিই ত রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এতদিন ত খাঁচাটি শূন্ত ছিল। বড় পাখীটি নিজের উড়ন্ত গতি রোধ করিল। ছাদের রেলিং-এর উপর বসিয়া খাঁচাটির দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহার সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। খাঁচার ভিতর সত্যই ছোট পাখীটি। সে এখনও বড় পাখীটিকে লক্ষ্য করে নাই। বারাণ্ডায় তখন কোন লোকজন ছিল না। বড় পাখীটি উড়িয়া গিয়া খাঁচার উপর বসিল। তাহাকে দেখিয়াই ছোট পাখীটি কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জন্ত। তারপর সে উদাসীন হইয়া রহিল।

বড় পাখীটি জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় ওরা ধরলে কি করে?

ছোট পাখীটি মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, আমি ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছি। এইরূপ অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া বড় পাখীটির অন্তর ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে শতধা হইয়া গেল। সে কোনরূপ ভুল শুনিতেছে না ত? অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ও অসহনীয় এক অনুভূতির আলোড়নে বড় পাখীটি কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্ত হতবাক্ ও বিহ্বল হইয়া রহিল। কিন্তু সে উত্তেজিত হইল না, নিজেকে সংযত করিয়া ধীরকণ্ঠে ছোট পাখীটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তাহলে স্বাধীনতা চাও না?

—স্বাধীনতা মানে ত শুধু আকাশে উড়ে বেড়ানো? অমন্ স্বাধীনতা আমি চাই নে—

—তুমি কি তাহলে এতদিন আমার সঙ্গে ভান করেছো?

—আমি ভেবেছিলুম বুঝি বাইরে গেলে সুখী হবো। কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলুম।

—তোমার যা ভেবেছিলুম, তুমি তাহলে তা নও।

এই কথা বলিয়াই ক্রোধান্বিত বড় পাখীটি খাঁচার উপর হইতে উড়িয়া পলাইল।

সেদিন ক্ষুব্ধ মনে নিরালা কোটরে বড় পাখীটি বিনিদ্র রজনী যাপন করিল। মনে পড়িল, অতীতের আর একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন রাত্রি সে বিনিদ্র কাটাইয়াছিল। সেদিন ছোট পাখীটি ছিল, কিন্তু আজ সে একা। বিগতদিনের সেই রাত্রির সহিত অদ্যকার রাত্রির কত পার্থক্য! সহসা তাহার জীবন একেবারে অর্থহীন বলিয়া মনে হইল।

যে জীবন কামনা করিয়া তাহারা এতদিন লালায়িত হইয়াছিল, পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় যে মুক্ত স্বাধীন জীবনের কল্পনায় তাহাদের দিনগুলি আশার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, আজ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সেই আকাঙ্খিত জীবন লাভ করিবার পর ছোট পাখীটি অতিশয় সঙ্কীর্ণচেতার মত জঘন্ত বিশ্বাসঘাতকতায় ও অবহেলায় তাহা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল! এতবড় একটি দুর্ঘটনার জন্ত বড় পাখীটি প্রস্তুত ছিল না। ছোট পাখীটির নয়নে যে স্বর্গীয় প্রভা সে দেখিয়াছিল তাহা কি তবে মিথ্যা? এমন কোমলাভ কান্তিময় রূপের অন্তরালে যে এমন কুৎসিৎ হৃদয় থাকিতে পারে তাহা বড় পাখীটির কোন দিনই মনে হয় নাই। নিজেকে প্রবোধ দিবার জন্ত অবশেষে সে মনে মনে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার প্রতি যে এইরূপ শঠতা করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না তাহার জন্ত কেন সে মিথ্যা ভাবিয়া মরিতেছে? বড় পাখীটিও তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, ছোট পাখীটির সমস্ত স্মৃতি সে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিবে, জীবনে আর কোনদিন তাহার মুখদর্শন করিবে না। ছোট পাখীটির অভাবে তাহার মনে অশান্তির কি কারণ থাকিতে

পারে? সে একা একা থাকিবে, যেখানে খুশী উড়িয়া বেড়াইবে, যখন খুসী খাবার খুঁজিতে যাইবে, কাহারও জন্ত আর তাহাকে ভাবিতে হইবে না। তাহার জীবনের স্বাধীনতার পরিধি বরং বৃহত্তর হইয়া গেল। ছোট পাখীটির জন্ত তাহার মনস্তাপের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

প্রায় সাত আট দিন অতীত হইবার পর রৌদ্রতপ্ত, অলস ও প্রশান্ত এক দ্বিপ্রহরে বড় পাখীটির হৃদয় কি এক বেদনায় উদাস হইয়া গেল। যুক্তি মীমাংসায় সে নিজেকে যাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করুক না কেন, তাহার অন্তরলোক হইতে ছোট পাখীটির স্মৃতিটি সে শত চেষ্টাতেও মুছিয়া ফেলিতে পারিল না। বিরহ দহনে প্রতিটি মুহূর্ত তাহার নিকট দুর্বিসহ হইয়া উঠিল। এই এক সপ্তাহ যাবৎ নিঃসঙ্গ বাস করিয়া ছোট পাখীটির জন্ত তাহার ব্যাকুলতা আরো বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একটা কাকের ডাক শুনা যায়। কোটরাভ্যন্তরে বড় পাখীটির বিচ্ছেদ-বিধুর প্রাণ কিসের আকাঙ্খায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল!

কোটর হইতে সে বাহির হইয়া পড়িল। অন্তমনস্কের মত উড়িতে উড়িতে সে দেখিতে পাইল যে ছোট পাখীটি যে বাড়ীতে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আছে সে কেমন করিয়া যেন সেই বাড়ীটিরই নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। একি কম্পন সুরু হইল তাহার বুকের ভিতর! না—না—না—না—না—কিছুতেই বড় পাখীটি তাহার চিত্তের এই প্রবল বাসনা দমন করিতে পারিবে না। ছোট পাখীটিকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিবে না। অপূর্ব এক শিহরণের মধ্য দিয়া বড় পাখীটি খাঁচার অদূরে বারাণ্ডার রেলিং-এর উপর উড়িয়া গিয়া বসিল। তারপর খাঁচাটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই বড় পাখীটি যাহা দেখিল তাহাতে সে একেবারে পাংশু হইয়া গেল! পৃথিবীর সমস্ত আলো হঠাৎ অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল নাকি? তাহার শিরায় শোণিতপ্রবাহ বোধহয় এখনি তুষারে পরিণত হইবে! দেখিল, খাঁচার ভিতর অন্ত আর একটি চমৎকার পুরুষ টিয়াপাখী তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কি রূপ পাখীটির! তাহার দেহ হইতে মনোমুগ্ধকর উজ্জ্বল সবুজবর্ণ যেন উপ্‌ছাইয়া পড়িতেছে। পুচ্ছটিও কি দীর্ঘ! খাঁচার ভিতর স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে উহা শেষের দিকে খানিকটা বাঁকিয়া রহিয়াছে। লাল টক্‌টকে ঠোঁট, গলায় রামধনু রঙের কাঠি, বেশ মোটা সোটা গড়ন। ঠোঁট দিয়া সে পরিপূর্ণ যত্নে ছোটপাখীটির মস্তক ও পৃষ্ঠদেশের পালকগুলি আঁচড়াইয়া দিতেছে। ছোটপাখীটি একখণ্ড আপেলের টুক্‌রা ভক্ষণ করিতে করিতে অপরিসীম পরিতৃপ্তি সহকারে তাহার আদর উপভোগ করিতেছে। বারাণ্ডার রেলিং হইতে বড় পাখীটি একদৃষ্টে খাঁচাটির দিকে চাহিয়া রহিল। ছোট পাখীটিও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল—কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিল না। বিচিত্ররূপিণী এক ছলনাময়ীর মত শুধু মুহুর্মুহু হাস্ত করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে খাঁচার ভিতরের পুরুষ পাখীটি রেলিংএর বড় পাখীটিকে দেখাইয়া ছোট পাখীটিকে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা আমাদের দিকে অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখ্‌ছে বল ত?

পরম ঔদাসীন্ত সহকারে ছোটপাখীটি জবাব দিল, কে জানে?

—ও তোমার চেনা না কি?

—পাগল হ'য়েছ তুমি? আমার চেনা হ'তে যাবে কেন?

ইচ্ছা করিয়াই ছোটপাখীটি কথাগুলি বেশ জোরে জোরে কহিল। ক্রোধে, দুঃখে, অপমানে, হিংসায় ও ঘৃণায় অদূরে উপবিষ্ট বড়পাখীটির অন্তর যেন অসহ্য এক আগুনের উত্তাপে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, লোহার খাঁচাটিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙিয়া ঐ দীর্ঘ পুচ্ছ টিয়াপাখীটিকে টানিয়া বাহির করিয়া সুতীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এখনি উহার হৃদ্‌পিণ্ডটা বাহির করিয়া আনে।

উত্তেজনায় অস্থির হইয়া বড়পাখীটি আর বসিতে পারিল না, অতিশয় তীব্রবেগে আকাশ পথে উড়িতে সুরু করিয়া দিল। অবিশ্রান্ত ভাবে উড়িতে উড়িতে তাহার মানসিক উত্তাপ অনেকটা কমিয়া আসিল, কিন্তু তথাপি সে তাহার গতিবেগ কমাইল না; বরং আরও বেগে, আরও দ্রুত পক্ষ সঞ্চালন করিয়া সে মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, নদীর পর নদী পার হইয়া যাইতে লাগিল। দুঃখে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল। এই নির্মম, কঠোর পৃথিবীতে—এই নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে সে আর কিছুতেই থাকিবে না—কিছুতেই না। দূর চক্রবালে ঐ যে একখণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে—ওখানে স্বপ্নের দেশ আছে। কতক্ষণ লাগিবে আর ওখানে পৌঁছিতে? ডানা অবশ হইয়া আসিল—আর কতদূর! আর কতদূর!

দুর্ব্বাদল

শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার

কুশ কহে ডাকি' গর্ব্বিতভাবে,
শ্যামল দুর্ব্বাদলে,—
"তৃণ হয়ে দোঁহে লভেছি জনম
এ মহা অবনী তলে।
তোমার এ শির সদাভূমে নত
চরণের তলে ঠাঁই,
তোমার আমার কত যে প্রভেদ
তুলনা তাহার নাই!"

দূর্ব্বা কহিল, লাজে সঙ্কোচে,
—"ক্ষমা করো দীন জ্ঞানে
তব অঙ্কুরে যে ব্যথা বিরাজে
ভুক্তভোগী সে জানে।
চরণে দলিত করেছে যে মোরে
কত না যতন ক'রে
মাথা নত করি প্রণাম জানায়ে
লয়েছে মাথার 'পরে।"

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

একসপ্ততিতম বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে অনেকস্থানে আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে; তাঁহার শিষ্য ও অনুরক্তগণ শিল্পাচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। অবনীন্দ্রজয়ন্তি আরো পূর্ব্বেই অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি ভারতবর্ষে যে কি জিনিষ দান করিয়াছেন, তার মূল্য এখনো হয়ত সম্যক স্থির হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের আগে ও পরে শিল্পের ধারা অনুশীলন করিলে তাঁর দানের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কর্দ্দম হইতে তুলিয়া তিনি ভারতীয় শিল্পকে সংহত শিলার উপর স্থাপন করিয়াছেন। আজ ভারতীয় শিল্প ফলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। যদিও প্রথম চিত্রকলার ভিতরেই এই নব্য আন্দোলনের উন্মেষ হইয়াছিল, এখন নানা শিল্পে কারুকর্ম্মে ইহার প্রভাব অনুভূত হয়। শুধু কর্ম্মে নয়, আমাদের চিন্তায় ও সৌন্দর্য্যে নূতনরূপ লাভ করিয়াছে।

আমরা নূতন করিয়া রূপশিল্পসম্বন্ধে সজাগ হইয়াছি। আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে, ঘরবাড়ী সাজসজ্জা প্রভৃতির সঙ্গেও যে সৌন্দর্য্য-স্পৃহার স্থান থাকিতে পারে, পূর্ব্বে আমরা তেমন করিয়া ভাবি নাই। বাজার চলতি জিনিষই ছিল একমাত্র গ্রহণীয়। অবনীন্দ্রনাথের নব্য চিত্রকলার আন্দোলন আমাদের রুচিকে পরিমার্জ্জিত করিয়াছে, নূতন পথে সৃষ্টিকে চালিত করিয়াছে। যে আন্দোলন বাংলাদেশে সুরু হইয়াছিল, তাহা সারা ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যেমন আলোকের বার্ত্তা প্রবহমান থাকে তেমনি শিষ্যপরম্পরা গুরুর বাণী প্রচলিত হয়। বিরুদ্ধ ভাবের ভিতর দিয়া অবনীন্দ্রনাথকে পথ করিয়া লইতে হইয়াছিল। যাহারা নূতন সৃষ্টি করে, প্রচলিত বাঁধা পথ ছাড়িয়া নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়, তাহাদের ভিতর একটা বিদ্রোহের ভাব আছে। সকল স্রষ্টাই বিদ্রোহী।

অবনীন্দ্রনাথের নব্য চিত্রকলা উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে একদল চিত্র-সমালোচক গড়িয়া উঠিয়াছে। নব্য চিত্রকলা উদ্ভবের পূর্ব্বে চিত্রসমালোচনা বলিয়া কিছু ছিল না। কাজেই বলা চলে, এই নব্য আন্দোলন চিত্র এবং বাংলা সাহিত্য, দুই জিনিষকেই পুষ্ট করিয়াছে।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে, বিশেষ করিয়া বিংশ শতকের প্রথমে, ইউরোপে একটি শিল্প সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরোপের নব্যচিত্র-কলা—ইম্প্রেসনিষ্ট, পোষ্ট ইম্প্রেসনিষ্ট প্রমুখদের কার্য্যরীতি অবলম্বন করিয়া এই সমালোচনা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইহার ইংরাজী নাম æsthetics : বাংলায় ইহাকে বলা যায়, সৌন্দর্য্য তত্ত্ব—ইহা একটি নূতন বিজ্ঞান।

ইম্প্রেসনিষ্টদের উদ্ভবের পূর্ব্বে চিত্র সমালোচনা, বিশেষ শ্রেণী-সাহিত্য হিসাবে গণ্য ছিল না; কারণ ইম্প্রেসনিষ্টদের পূর্ব্বে ছবি ছিল শুদ্ধ কৌলিক (অ্যাকাডেমিক)—ভাল আর মন্দ। তার কোনো জাতি বিচার ছিল না, তার ভিতর কোনো নূতন তত্ত্ব ছিল না। চিত্রের যত নূতন তত্ত্ব নূতন শৈলী আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সে সকল তত্ত্ব সাধারণের কাছে প্রচারের জন্য নূতন সমালোচনা সাহিত্যও গড়িয়া উঠিল। ক্লাইভ বেল, রোজার ফ্রাই, এ লিকর, ফ্রাঙ্ক রাটার প্রভৃতি সমালোচকদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে এমনি সমালোচনা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের কর্ম্ম ও চিন্তাধারা লইয়া ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য গড়িয়াছে, আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাহা নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে। হ্যাভেল সাহেব, সিষ্টার নিবেদিতা, ডাক্তার কুমারস্বামী, শ্রীঅরবিন্দ, ডাক্তার কাজিন্স, অর্দ্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি লেখকদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অবনীন্দ্রনাথ সব্যসাচী। তিনি যেমন চিত্রের নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি সমালোচনা দ্বারা তাহার প্রচার করিয়াছেন এবং আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। প্রারম্ভে বাংলার সাময়িক সাহিত্যে যেভাবে এই নব্য পন্থীদের উপর আক্রমণ চলিয়াছিল, হতোদ্যম হইয়া পড়িলে ইহার প্রসারলাভ হইত না। অবনীন্দ্রনাথের লেখনী শিল্পীদের আশার সঞ্চার করিয়াছে। তাঁর শিল্প সমালোচনা নব্যপন্থীদের উৎসাহ দিয়াছে।

কোনো শিল্পাচার্য্যের বয়াসন রাজা দিতে পারেন না; শিল্প সমালোচক তাহাকে তক্তে বসাইতে পারে না। তাঁর কর্ম্মই তাঁকে উচ্চাসন দেয়। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী তাঁর চিন্তাকে, তাঁর কর্ম্মধারাকে প্রবহমান রাখে এবং তাঁর সৃষ্টিকে দেদীপ্যমান্ করিয়া তোলে। শিল্পগুরু যে শিষ্যদের হাতে ধরিয়া ড্রয়িং-মাষ্টার ইস্কুল-মাষ্টারের মত শিক্ষা দেন তাহা নহে। তিনি প্রেরণা জোগান, শিষ্যদের সঙ্গে গুরুর চাক্ষুস পরিচয় লাভ থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁর চিত্ররাজি তরুণ প্রাণে সৃষ্টির বীজ রোপণ করে, তরুণ শিল্পীদের সৃষ্টির পথে চালিত করে। গুটিকতক শিষ্য লইয়া অবনীন্দ্রনাথ কলিকাতায় নব্যচিত্রকলার গোড়াপত্তন করেন, কিন্তু আজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে তাঁর প্রভাব অনুভব করা যাইবে। বহু চিত্রকরই তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হিসাবে স্বপরিচয় দিবে।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর চারিদিকে একটি মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, শিল্পরস-পিপাসুগণ তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছেন। বৎসর দুই পূর্ব্বে একজন আমেরিকান চিত্রকর কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। আমেরিকান শিল্পীকে আমি বলিয়াছিলাম, অবনীন্দ্রনাথ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন, "No, No, his mind is still active, there is an aroma round him." "না না, তাঁর মন এখনো কর্ম্মিষ্ঠ, চারদিকে তাঁর একটি সৌগন্ধ লাগিয়া আছে। অবনীন্দ্রনাথের কথাবার্ত্তা আমেরিকান শিল্পীকে খুব impressed করিয়াছিল।

শিল্পাচার্য্যগণ হইতে নূতন স্কুল বা শিল্পীদের গোষ্টির সৃষ্টি হয়। বিশেষ অঙ্কনরীতি বা শৈলী বা নূতন চিন্তাধারা হইতে নূতন গোষ্টির পত্তন হইয়া থাকে। শিল্পাচার্য্যগণ মাষ্টারি না করিলেও Master গুরু সাজিয়া বসিয়া না থাকিলেও অনুসরণকারী চেলার দল জুটিয়া থাকে।

ইংরাজীতে স্কুল বলিতে যাহা বুঝায়, ভারতবর্ষে মোগলযুগে চিত্রের "কলম" বলিতে তাহাই বুঝাইত। কলম অর্থে লেখনী ও তুলি দুইই বোঝায়—ইহা হইতে দাঁড়াইয়াছে চিত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন দিল্লী কলম, জয়পুর কলম, পাটনা কলম ইত্যাদি। ভৌগলিক নামানুসারে শ্রেণীবিভাগ। এখানে পার্থক্য ইউরোপের বিভিন্ন স্কুলের ন্যায় তেমন প্রকট নহে। আমাদের দেশে স্কুলের স্বাতন্ত্র্য ইউরোপের ন্যায় খুব প্রবল হইয়া ওঠে নাই। তার কারণ, আমাদের দেশে, শিল্পী রাজদরবারে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করিয়াছে, তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য কখনো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াইয়া যায় নাই। প্রাচীনকালে, বৌদ্ধ ও হিন্দুযুগে শিল্পীরা কাজ করিয়াছে শাস্ত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে। যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, শিল্পের উদ্দেশ্য ছিল সেই ধর্ম্মকে প্রকটিত করা। কাজেই অধুনা বিভিন্ন স্কুলে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের জন্য যে বিরুদ্ধ মতবাদের সৃষ্টি হয়, তখন তাহা হওয়ার সুযোগ ছিল না। বৌদ্ধ বা হিন্দুযুগে, বুদ্ধ বা শিবকে অবলম্বন করিয়া স্থাপত্য ভাস্কর্য্য চিত্র সৃষ্ট

হইয়াছে, শিল্পী সেখানে নিজে পুরোভাগে না থাকিয়া বুদ্ধ বা শিবকেই পুরোভাগে রাখিয়াছে। অজন্তার চিত্রে কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই। তাহাতে রহিয়াছে একটা যুগের ছাপ, সে সময়ে বা কাছাকাছি অন্যত্র যে সকল ভিত্তি-চিত্র (ফ্রেস্কো পেন্টিং) দেখা যায়, তাহা অজন্তা চিত্রেরই সদৃশ। ইহার সঙ্গে ইউরোপের প্রাচীন খৃষ্টীয় যুগের তুলনা চলে, সেখানে শিল্পীর কীর্ত্তি ঘোষিত না হইয়া খৃষ্টের মহিমাই ঘোষিত হইয়াছে।

ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাতেই প্রথম আসিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা বর্ত্তমান সত্ত্বেও ইহার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতবর্ষে উদ্ভব হয় নাই। ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ হয় ত চিত্রকলার পরাকাষ্ঠা স্বতন্ত্র-রূপে দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহার ভিতর কোনো সংহত গঠনশীল প্রচেষ্টা নাই. সেজন্য খণ্ডাকারে এ সকল শিল্প-সৃষ্টি দানা বাঁধিতে পারে নাই। দানা বাঁধিবার অন্তর্নিহিত শক্তির অভাবে এবং চিন্তা ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যের অভাবে এই দলের একটা শিল্পী-গোষ্ঠি গড়িয়া ওঠে নাই।

অবনীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও কর্ম্মে তাঁহাকে শুধু প্রধান চিত্রকর হিসাবে পরিচয় দিলে চলিবে না, তাঁহার কাজের ভিতরে আছে একটা গঠনশীলতা, একটি সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য—যাহা অবলম্বন করিয়া নব্য শিল্পী-গোষ্ঠি গড়িয়া উঠিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে বাংলার সাময়িকপত্রে পক্ষে বিপক্ষে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে; কিন্তু তার সম্যক বিশ্লেষণ হয়ত এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলার অভ্যুদয়কে কোন কোঠায় ফেলা যায়? ইহা কি ভারতীয় শিল্প ধারার নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গ? না, নূতন কিছু বাহির হইতে আনিয়া ভারতীয় অঙ্গে বসাইয়া দেওয়া? ইহা কি রেনেসাঁ, পুনরভ্যুদয়? ইহা ভারতীয় শিল্পে নূতন কিছু দান করিল কি? না, বহুপূর্ব্বে বিলুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পুনরাবৃত্তি মাত্র? ভারতীয় শিল্পকে প্রগতির পথে আগাইয়া দিতেছে কি? না, স্বাদেশিকতার আবরণে সকল প্রকার উন্নতি হইতে এবং পৃথিবীর প্রগতি-শীল শিল্প হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বকীয় কোঠরে আশ্রয় লইয়াছে? যেখানে বাতায়ন বন্ধ, সেখানে বাহিরের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না।

অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম পরিচয় পাইলেন মোগলচিত্রে, অজন্তার চিত্র তখনো তাঁহার কাছে অজ্ঞাত ছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে মোগলচিত্র উঠিয়াছিল সর্ব্বোচ্চ সোপানে। জাহাঙ্গীরের দরবারের শিল্পীরা ইউরোপীয় ওস্তাদদের চিত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিল। বাদশার নির্দ্দেশক্রমে তাহারা ইউরোপীয় চিত্রের নকল করিয়াছিল। ইউরোপীয় চিত্রের নকল করিলেও, তাহারা স্বকীয়ত্ব হারাইয়া ফেলে নাই। জাহাঙ্গীরের পরবর্ত্তী যুগে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এই ইউরোপীয় চিত্র অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ প্রকট হইতে থাকে। ইউরোপীয় রিয়ালিজম—সাদৃশ্যবাদ এবং Chiaroscuro বা আলোছায়ার খেলা, শেডলাইট্ ক্রমশঃ মোগলচিত্রে প্রাধান্য লাভ করে। মোগলশিল্পীরা নিশ্চয়ই ওলন্দাজ ওস্তাদদের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আমি একখানা কাঠের পাটায় তেলরংয়ে আঁকা মূল ওলন্দাজ মিনিয়েচার দেখিয়াছিলাম, এ চিত্র দেখামাত্রই আমার মোগল চিত্রের কথা মনে পড়িল। এক সময় নিশ্চয়ই এ ধরণের ওলন্দাজ চিত্র মোগল চিত্রকরগণ অনুশীলন করিয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এ সকল চিত্র ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে। অবনীন্দ্রনাথ এই অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগলচিত্র হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথম এই ধারাতে মৌলিক সৃষ্টি ফলাইলেন। দুই শত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে, অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভাশালী শিল্পী জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রথা তাঁর শৈলীতে সমন্বয় লাভ করিয়াছে।

আমাদের দেশে এক সময় একটা রেওয়াজ ছিল, যখন মনীষীদের সাহিত্যিকদের শিল্পীদের বিদেশীয় নামে ভূষিত করিয়া তাহাদের গৌরব বর্দ্ধন করা হইত। এই রীতিতে বঙ্কিমচন্দ্র হইয়াছিলেন ওয়ালটার স্কট, রবীন্দ্রনাথ বাংলার শেলী, অবনীন্দ্রনাথ বাংলার রসেটি—এই রীতির আমি অনুমোদন করি না। যদিই বা বিদে-শীয় নামে ভূষিত করা হয়, অবনীন্দ্রনাথকে বলিব, বাংলার নহে ভারতের জ্যাত্তো।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে, পূতচরিত্র সেণ্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসির নাম। ইনিই প্রথম মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে আলোকবর্ত্তিকা জ্বালাইয়াছিলেন।

সেণ্ট ফ্রান্সিস অফ আসিসিরএর জীবনী জ্যাত্তোকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। রেনেসাঁর যুগ ইউরোপের সৃজনী প্রতিভার যুগ। চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, নাটক, ধর্ম্ম, সব বিষয়ে রেনেসাঁ তার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। জ্যাত্তো এই যুগে মস্ত ব্যক্তি—রাজনীতিক, কবি, দার্শনিক, শিক্ষক সব আসিয়া ভিড় করিত তাঁহার কাছে। কবি দান্তেকে কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া অনেক দিন পলায়ন করিয়া কাটাইতে হইয়াছে। জ্যাত্তো তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। জ্যাত্তো ও দান্তে দুই বন্ধু। ইউরোপের রেনেসাঁর নানা বিভাগের আন্দোলনের মধ্যে চিত্রই প্রধান স্থান পাইবে এবং অনেক স্থলে, চিত্রকরেরা দেশের প্রধান ব্যক্তির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছে। হল্যাণ্ডে রেমব্রাণ্ট হইল প্রধান। পূর্ব্বে কেহ ছিল না, সমসাময়িক কালেও কেহ ছিল না; পরবর্ত্তী কালেও রেমব্রাণ্টের ন্যায় হল্যাণ্ডে কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই।

ইটালীতে ও হল্যাণ্ডে চিত্রের শ্রেষ্ঠযুগে চিত্রকর ও চিত্রের যে স্থান হইয়াছে, আমাদের দেশে অবশ্য সে স্থান হয় নাই। যদিও মোগল যুগে দেখি চিত্রকরেরা দরবার হইতে বড় খেলায়েৎ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমগ্র দেশে তারা সে স্থান পায় নাই। ফ্লোরেন্সে জ্যাত্তোর গুরু সিমাব্যুর আঁকা মেডোনার চিত্র রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া লওয়া হইয়াছিল; সেদিন না জানি কী উৎসব পড়িয়াছিল নগরে। সকল নরনারী চিত্র দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। চীনের প্রধান চিত্রকরেরা রাজ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়াছে। ভারতের ইতি-হাসে একমাত্র অবনীন্দ্রনাথকেই দেখি যিনি দুই দিক হইতেই সম্মান পাইয়াছেন।

বাংলার নবজীবন ধারার সঙ্গে ইউরোপের রেনেসাঁর একটা তুলনা হইতে পারে। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি জীবনের স্পন্দন প্রথম অনুভব করিলেও বিংশ শতাব্দী হইতেই ইহার প্রকাশ সকল দিক হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর এই নব জীবনের প্রকাশ—শিক্ষা-ধর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতি সকল বিষয়েই লক্ষিত হইয়াছে। এই চেতনা স্বদেশী আন্দোলন বলিয়া পরিচিত। এই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উন-বিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমের সাহিত্য বাংলাকে দিয়াছিল প্রাণ, তেমনি বিংশ শতাব্দীতে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়ের চিত্র বাংলায় দিয়াছে প্রাণ।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি; তিনি সব্যসাচী চিত্রকর ও চিত্রসমালোচক। চিত্র সমালোচনা ছাড়া, শিশু সাহিত্যে তিনি অদ্বিতীয়। রাজকাহিনীতে শব্দ দ্বারা আঁকিয়াছেন তিনি ছবি। বুড়ো আংলাতে মানসবিহঙ্গ কল্পনার পাখায় ভর করিয়া শূন্যে উড়িয়া চলে। এই পুস্তক শিশুদের ন্যায় বৃদ্ধদেরও চিত্তবিনোদন করিবে। আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তি, আশ্চর্য্য কারুকর্ম্ম। কোনারকের ভ্রমণ

কাহিনীতে মন কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। বাংলা ভাষায় এর আর দ্বিতীয় নাই। আমি একমাত্র সাদৃশ্য আনিতে পারি ফরাসী লেখক পিয়েলোটির ভারত সম্পর্কীয় ভ্রমণ কাহিনীতে। অবনীন্দ্রনাথের কোনারকের বর্ণনা পিয়েলোটির এলোরা গুহার বর্ণনার মত মনোহর। দুজনেই কল্পনার মায়াজাল রচনা করিয়াছেন। দুজনেই দেখিয়াছেন কতকটা চোখ বুজিয়া—এই বর্ণনার বস্তু যেন আরো সত্য হইয়া প্রকটিত হইয়াছে। দুই লেখকের গদ্য যেন, গদ্যে কবিতা লেখা। গদ্য হইতেই যেন কবিতার চাহিদা মেটে।

শুধু চিত্র ও সাহিত্যসৃষ্টি হইতেই তিনি আমাদের দেশে স্মরণীয় থাকিবেন না, তিনি যে শিল্প সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন তার জন্যও তিনি স্মরণীয়। তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় যে কোনো দেশের গৌরবের বিষয় হইতে পারেন। যেমন গুরু, তেমনি হইয়াছেন তাঁর শিষ্য।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ডাঃ এ্যানি বেশান্তের একটা লেখা পড়িয়াছিলাম—ভারতীয় সংস্কৃতির দুই স্তম্ভ স্বরূপ—সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, আর আর্টে অবনীন্দ্রনাথ।

চার্ব্বাক

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

পরমেশ আমাদের মজলিশে সহসা উপস্থিত হইয়া সকলকে অবাক করিয়া দিল। অবাক হইবার বিশেষ কিছু ছিল না, তবুও সমবেত সকলেই অবাক হইয়া গেল। পরমেশের সম্বন্ধে কল্পনা করিবামাত্র লোকেদের মনে উদয় হইত একটি রোগা ব্যক্তি—যাহার মাথার চুল উস্কোখুস্কো, পরিধানে অতি ময়লা ধুতি, গায়ে ছিন্ন জামা। আজ কিন্তু সেই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার উল্টাইয়া গেল। আজ পরমেশ বেশভূষার পারিপাট্যে উপস্থিত হইয়া সকলকেই বিস্মিত করিয়া দিল।

পরমেশ বসিল। বসিয়াই বিস্ময়ের মাত্রা আরো খানিক বাড়াইয়া নতুন জামার পকেট হইতে এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়া বিতরণে মনোযোগ দিল। এই ব্যক্তিকে ইতিপূর্ব্বে কোনোদিন সিগারেট খাইতে দেখা যায় নাই। তাহার অভ্যাস ছিল বিড়ি খাওয়া, যদিও কাহাকেও বিড়ি খাওয়াইত না। সকলের মুখগুলি পূর্ব্বেই 'হাঁ' হইয়া ছিল, এখন আরো প্রশস্তভাবে 'হাঁ' হইল।

"খা না রে—খা"—অবনীর সিগারেট ধরাইয়া দিতে দিতে পরমেশ বলিল, "আজ আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কি করব—ছোট ছেলেটা কমলালেবুর জন্যে বায়না ধরেছিল, তাই কিনে এনে তার কান্না থামিয়ে তবে আসছি।"

অবনী বলিল, "বেশ ত তাতে আর ক্ষতি কি হয়েছে? জামা দেখছি নতুন তৈরী করালে। আমরা ভেবেছিলাম মরবার আগে আর নতুন জামা তোমার অঙ্গে দেখে চোখ সার্থক করতে পারব না।"

"কেন পারবে না? হেঃ! নতুন জামার কতই বা দাম! দেড় টাকা হলেই জামা কেনা যায়? খাও দাও, ফূর্ত্তি কর—জীবনের উদ্দেশ্যই তো এই"—পরমেশ প্রাণপণশক্তিতে সিগারেটে একটা টান দিল।

সমর বলিল, "সে তো আমরা মানি দেখতেই পাচ্ছ—নইলে এই মজলিশে কেন হাজির হব? যাক, তুমি বোধহয় নতুন কাজটাজ পেয়েছ, নয়?"

"না হে না, নতুন কাজ কি পথে প'ড়ে রয়েছে? আমি আমার জীবনের গতিপথ বদ্‌লেছি। অর্থ শুধু খরচ করবার জন্যে—যত শীগ্‌গির খরচ করা যায়, ততই মঙ্গল। জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করে যেতে দাও।"

পরমেশই আজিকার মজলিশটা জমাইয়া তুলিল।

পরদিন অন্যমনস্কভাবে ট্রামে আরোহণ করিয়াছি। আমার ব্যবসায়ের তদ্বির করিবার জন্য একটু শ্যামবাজারে যাইতে হইবে। বেঞ্চিতে বসিয়া পাশ ফিরিতেই পরমেশকে দেখিলাম।

অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিহে পরমেশ! আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি যে। তুমি আবার ফার্ষ্ট ক্লাশে ট্র্যাভেল করা সুরু করলে কবে থেকে?"

"বলেছি তো জীবনের গতিপথ বদলে ফেলেছি। এখন থেকে ফার্ষ্ট ক্লাসেই যাতায়াত করব।"

মনে মনেই ভাবিলাম যে এত পয়সা আসিতেছে কোথা হইতে!

কলেজ ষ্ট্রীটে সে নামিয়া গেল। দুইখানি ইংরেজী গল্পের বই কিনিবে। বই দুইটির দামও অল্প নয়।

দিন যাইতে লাগিল। লোক পরম্পরায় শুনিলাম, পরমেশ এই কয়দিনে অনেক দেনা করিয়া ফেলিয়াছে। অল্প আয় লইয়া এত বেশী অপব্যয় করিবার দুর্ব্বুদ্ধি কে তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিল? এ দেনা শোধ করিবার কোনো উপায়ই তো তাহার নাই।

মজলিশে বসিয়া আছি। দূরে পরমেশের গলা শোনা গেল। পরমেশ মজলিশে প্রবেশ করিল। এবার প্রবলবেগে সকলের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। পরমেশের বেশভূষায় সংসারের প্রতি অনাসক্তি তীব্রভাবে ঘোষণা করিতেছে। পরমেশ আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল যে, সে লটারীর টিকিট কিনিয়াছিল।

কথা—শ্রীমতী সুজাতা ঘটক বি-এ, বি-টি

সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

বনে বনে লাগিল দোলা।
সুন্দর অতিথি আজি
এলে পথ ভোলা ॥

ফাল্গুন বাতাসে
ফুল সুরভি ভাসে
বিরহ-বিধুরা ধরা
হ'ল আনন্দ উতলা ॥

একি অপরূপ সাজে
আসিলে প্রিয় তুমি,
ফুল-অঞ্চল-ঢাকা—
বন পথখানি চুমি'—
তোমারি অনুরাগী
আছে মধুনিশি জাগি,
তব আবাহন লাগি'—
সকল দুয়ার খোলা ॥

II গা মমা রা | সা -ন্‌া সা I মমা সা রা | পা পা পা I হ্মপা - ধা - নধা | -পহ্মা -পা -া I

ব ০ ০ নে ব ০ নে লা ০ ০ গি ০ ল দো লা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মমা -সা রা | রপা -া পা I হ্মপা -ধা পা | -া পা পা I হ্মা -পা ধনা | -র্সর্া র্সনা ধা I

সু০ ন্ দ র ০ অ তি০ ০ থি ০ আ জি এ ০ লে ০ ০ ০ প ০ থ

I পা -া -পা | রগা -মা -পা II

ভো ০ ০ লা ০ ০

II পা - হ্মা পা | পর্সা -া র্সা I নর্সা - র্রা র্সা | -া -া -া I নর্সা ধা না | নর্সা -া র্রা I

ফা ল্ গু ন ০ বা তা০ ০ সে ০ ০ ০ ফু ল সু র ০ ভি

I র্সা - র্সা ধা | পা -া -া I হ্মা পা ধা | গা মা পা I রা -া সা | -া ন্‌া সা I

ভা ০ ০ সে ০ ০ বি র হ বি ধু রা ধ ০ রা ০ হ ল

I মমা সা রা | পা পা হ্মা I পধা -নর্সা -র্র্রা | র্সনা -ধপা -হ্মপা II
আ • ন ন্ দ উ ত্‌ • • • • • লা • • • • •

II ন্া সা ধ্া | প্া সা ন্া I রা -া সা | -া -া -া I গা -া গা | গা মা পা I
এ কি অ প রূ প সা • জে • • • আ • সি সে প্রি য়

I গা -মা -পা | মা - মগা -া I গা গপাপ া | -া ধা না I ধা র্সা -ননা | ধা -পা -া I
তু • • মি • • ফু ল অ ন্ চ ল ঢা • • • কা • •

I পা ধা পাম | মাগ গার রাস I সরা -গমা -পমা | গরা -া -া I
ব ন প থ খা নি চু • • • • • মি • •

I গ পা হ্মপা | র্সা র্সা র্সা I নর্সা- র্রা র্সা | -া -া -া I র্সর্সা ধা না | র্সা র্গা র্রা I
তো মা রি • অ নু রা • • গী • • • আ • ছে ম ধু নি শি

I র্সা -ননা -ধা | পা -া -া I হ্মা পা ধা | গা মা পা I রা -া -গরা | সা -া -া I
জা • • • গি • • ত ব আ বা হ ন লা • • গি • •

I নসা রমা সা | রা হ্মা -পা I হ্মপা -ধনা -র্সর্রা | র্সনা -ধপা -হ্মপা II II
স কং ল দু য়া র খো • • • • • লা • • • •

নানা সাহেবের পরিণাম

ডক্‌টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-এইচ্‌-ডি, বি-লিট্‌

ফাল্গুনের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ সুর মহাশয় অনুযোগ করিয়াছেন যে ম্যাট্রিকুলেশনের ইতিহাসগুলিতে নানা সাহেবের পরিণাম সম্বন্ধে কোন সঠিক উল্লেখ নাই। বিভিন্ন ইতিহাসগুলির বিবরণে কোন সামঞ্জস্য নাই। ইহার একটা কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক-লেখকদিগকে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হয়। তাঁহারা পুস্তকের আয়তন অযথা বৃদ্ধি করিতে পারেন না এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে যাহা অবান্তর অথবা যাহা বাদবিতণ্ডার বিষয় স্কুল পাঠ্য ইতিহাসে তাহার আলোচনা করিতে পারেন না। ইতিহাসের দৃষ্টিতে নানা সাহেবের পরাজয়ই প্রধান কথা, তাহার মৃত্যুর তারিখ অবান্তর, কারণ তাহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা কোথাও ক্ষুণ্ণ বা ব্যাহত হয় নাই। তাহার পিতা বাজীরাও সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। দ্বিতীয় বাজীরাও রাজ্যচ্যুতির পরে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন কিন্তু স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে তাহার নির্বাসিত জীবনের কথা কিছুই জানা যায় না, কারণ সাধারণ দৃষ্টিতে তাহা নিতান্তই অবান্তর। তিনি যদি বিঠুরে পৌঁছিবার দুই বৎসর পরে পরলোকগমন করিতেন তাহা হইলে যাহা হইত বহুকাল বাঁচিয়া থাকিলেও ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাহাই হইয়াছে। অথচ সরকারী দপ্তরখানায় বাজীরাও-এর শেষ জীবন সম্বন্ধে বহু উপাদান আছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিমের পরাজয়ই প্রধান কথা, লুৎফউন্নিসা বা মীরকাশিমের শেষ জীবন সম্বন্ধে আমাদের যতই কৌতুহল থাকুক না কেন স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে তাহার সঠিক বা অঠিক কোন উল্লেখই পাওয়া যাইবে না। সুতরাং নানা সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে যদি ম্যাট্রিকুলেশনের ইতিহাস লেখকেরা কোন গবেষণা না করিয়া থাকেন তাহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সুর মহাশয় অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ চারিখানি পুস্তক হইতে এক

একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত শেষ দুইখানি পুস্তকের মধ্যে (সুরেন্দ্রনাথ সেন ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর "ভারতবর্ষের ইতিহাস" এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও অনিলচন্দ্র ঘোষ কৃত "আমরা ভারতবাসী") সিদ্ধান্তগত বা ভাষাগত কোন অনৈক্যই নাই। উভয় পুস্তকেই আছে—'নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন।' ইহার সহিত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের উক্তিরও মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। তিনি লিখিয়াছেন—নানা সাহেব কানপুর হইতে পলাইয়া গেলেন এবং তাঁহার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। ইংরাজ সরকার যে শেষ অবধি নানা সাহেবের কোন খোঁজই পান নাই তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুর মহাশয় রাও বাহাদুর সখারাম গোবিন্দ সরদেশাই মহাশয়ের যে প্রবন্ধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতেও আছে যে নানা সাহেব কানপুর হইতে পলায়নের পর নেপালের জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুতরাং এ পর্য্যন্ত অসামঞ্জস্যের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। ডাক্তার কালিদাস নাগের সহিত অন্যান্য লেখকগণের অনৈক্য আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না।

সুর মহাশয় বলিয়াছেন যে মারাঠী কাগজপত্রে তাঁহার (নানা সাহেবের) মৃত্যুর সঠিক সংবাদ আছে। স্বয়ং সরদেশাইও বলিয়াছেন যে I wish to supplement gistine evidence by presenting in an English garb what the Marathi papers have proved. যদি নানা সাহেবের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কোন সমসাময়িক মারাঠী চিঠিপত্রে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইত তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সরদেশাই তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধে কোন কাগজপত্রেরই উল্লেখ করেন নাই। কেবল রাজওয়ারে দ্বিতীয় বাজীরাওর কন্যা বয়া বাঈএর মুখে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহার পুনরুক্তি করিয়াছিলেন। সুতরাং মনে করা অনুচিত হইবে না যে সরদেশাই কথিত Marathi papers রাজওয়ারের প্রবন্ধ ব্যতীত কিছুই নহে। তখনকার দিনে নানা সাহেবের সঙ্গিগণ মহারাষ্ট্রে কাহারও সহিত পত্রালাপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

নানা সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে মারাঠী কাগজপত্র (যদি কিছু থাকে) অপেক্ষা নেপালের সরকারী কাগজপত্রের মূল্য বেশী এবং কোন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের উক্তিই বিনা প্রমাণে গৃহীত হইতে পারে না। সরদেশাইর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে দুইটি গুরুতর ভুল আছে যাহা ইংরাজী কাগজপত্রের সাহায্যে অনায়াসে সংশোধিত হইতে পারিত। তিনি বলিয়াছেন যে বিঠুরে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বাজীরাওর ৩৩ বৎসর ব্যাপী নির্ব্বাসিত জীবনকালে মাত্র চারিজন কর্ম্মচারী রেসিডেণ্টের কাজ করিয়াছেন। প্রথমত এই কর্ম্মচারীদিগের উপাধি ছিল বিঠুরের কমিশনার, রেসিডেণ্ট নহে, দ্বিতীয়তঃ লো, বেকন, জনসন ও মোরল্যাণ্ড ব্যতীত আরও কয়েকজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিঠুরে কমিশনারের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই সুর মহাশয় অনুমান করিতে পারিবেন যে কেন সরদেশাইর প্রবন্ধ বাহির হইবার পরও পাঠ্যপুস্তক-লেখকেরা নানা সাহেবের শেষ জীবন বা মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

সরদেশাইএর প্রবন্ধ পড়িলে মনে হয় যে বয়া বাঈর পূর্ব্বে নানা সাহেবের আর কোন নিকট আত্মীয় তাহার মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। সরদেশাইএর ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার আট বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৮ সালে পার্সিভাল ল্যাণ্ডেল কৃত নেপাল নামক পুস্তক বাহির হয়। এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নবম অধ্যায়ে ল্যাণ্ডেল সাহেব নানা-সাহেব সম্বন্ধীয় নেপালের সরকারী চিঠিপত্র এবং ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের কাগজ আলোচনা করিয়াছেন। নেপালী কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে ১৮৫৯ সালে নানা সাহেবের মাতা কর্ণেল সিদিমান সিংহকে পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানান এবং কর্ণেল এই সংবাদ জঙ্গ বাহাদুরের গোচর করেন। কিন্তু নানা কারণে ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এই সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। যাহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য চাহেন তাহারা ল্যাণ্ডেলের গ্রন্থ পাঠ করিবেন। এখানে কেবল দুইটি কথা বলিব—১৮৬৬ সালে কৃষ্ণাবাঈর পিতা নেপালে গিয়া কন্যার সহিত সাক্ষাত করেন। এই সময় পর্য্যন্ত কৃষ্ণাবাঈ সধবার চিহ্ন পরিত্যাগ করেন নাই, অথচ নানা সাহেবের ভ্রাতা বালা রাওর বিধবা পত্নী কখনও সধবার বেশ ধারণ করেন নাই। মাতার কথা অনুসারে ১৮৫৯ সালে ২৪শে সেপ্টেম্বর দেবঘরীতে নানা সাহেবের মৃত্যু হয়। যদি এই সময় হইতে নানার পত্নী বিধবার বেশ ধারণ করিতেন তাহা হইলেও সন্দেহ থাকিতে পারিত যে স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্যই তিনি জানিয়া শুনিয়া বিধবার ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সধবা-বেশের অন্য কোন সঙ্গত কারণ বাহির করা কঠিন। ইহার পরও নেপালের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে বরাবরই একটা জনরব প্রচলিত ছিল যে নানা সাহেব জীবিত আছেন। ১৮৭০ সালে বতুওয়ালের (এই অঞ্চলেই নানার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া রটনা হয়) শাসনকর্ত্তার একজন নিকটআত্মীয় বলেন যে তিনি নিজে জানেন যে নানা জীবিত আছেন। কর্ণেল সিদিমান সিংহ বালারাওকে মৃত্যুশয্যায় দেখিয়াছিলেন কিন্তু নানাকে অসুস্থ অবস্থায় দেখেন নাই। এই সকল কারণেই মাতার উক্তি সত্ত্বেও ইংরাজ সরকার নানার মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই; পাঠ্যপুস্তক লেখকেরাও নিঃসন্দেহে নানার মৃত্যু তারিখের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। হত্যাপরাধে লুক্কায়িত ব্যক্তির পিতামাতা হত্যাকারীর মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়াছেন এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

বয়াবাঈর সাক্ষ্য তাহার মাতার সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। মৃত্যুকালে তিনি ভ্রাতার নিকটে ছিলেন কিনা সন্দেহ। মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন সরল বিশ্বাসে বৃদ্ধ বয়সে রাজওয়ারের নিকট তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকিবেন।

১৮৬৪ সালে নানা সাহেবের মৃত্যু সংবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ইংরাজ সরকার লাল সিংহ ও রাম সিংহ নামক দুইজন চর নেপালে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের দুই জনেরই ধারণা হইয়াছিল যে নানা সত্য সত্যই জীবিত নাই। কিন্তু যে কারণে তাহাদের এই ধারণা হইয়াছিল তাহার পুনরালোচনা এই দীর্ঘকাল পরেও প্রীতিকর হইবে না।

নানার মৃত্যু, সে যখনই ঘটিয়া থাকুক না কেন ঐতিহাসিকের নিকট খুব বড় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইংরাজ সরকারও শেষে তাহাকে তুচ্ছই করিয়াছেন নতুবা নেপালে আরও অধিক তদন্ত হইত। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী কিশোরেরা এই ঘটনার তারিখ না জানিলেও তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। অনুসন্ধিৎসা তৃপ্তির জন্য শিক্ষককে অনেক অবান্তর বিষয়েরও খবর রাখিতে হয়, কিন্তু কোন যোগ্য শিক্ষকই কেবল মাত্র পাঠ্য পুস্তক সম্বল করিয়া শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ করেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিষ্ফল প্রচেষ্টার অভাব নাই; যে হতভাগ্যেরা সেই প্রচেষ্টার ফলে নানাবিধ দুর্গতি ভোগ করিয়াছেন তাহাদিগের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ করা একখানি পুস্তকে অথবা এক জীবনে সম্ভব নহে।

বনফুল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

চার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

প্রভাত হইতেছে, বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে। শঙ্করের ঘুম এখনও ভাঙে নাই, কিন্তু দুই বৎসরের শিশু কন্যাটির ঘুম ভাঙিয়াছে এবং সে বুকের উপর চড়িয়া চোখের ভিতর ছোট ছোট আঙুল ঢুকাইয়া ডাকিতেছে—"বাবা ওত, ও বাবা ওত—"

শঙ্কর হাসিয়া চোখ খুলিল। অমিয়া আগেই উঠিয়া রান্নাঘরে আঁচ দিতে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিল। মেয়ের কাণ্ড দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—'মেয়ের বেলায় হাসা হচ্ছে, আর আমি ওঠাতে গেলে ধমক খেয়ে মরি'

শঙ্কর আর একটু হাসিয়া চোখ বুজিয়া আবার পাশ ফিরিল।

"পাশ ফিরে শুচ্ছ যে, তোমার আজ ছবিগঞ্জে যাবার কথা নয়?"

"মনে আছে"

কন্যা ডাকিল—"বাবা ওত"

শঙ্কর উঠিয়া বসিল। সত্যই তাহার অনেক কাজ, শুইয়া থাকিলে চলিবে না। ছবি-গঞ্জে আজ একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা। তাছাড়া আরও অনেক কাজ আছে। বাহিরের ঘরে হয় তো ইতিমধ্যেই জনসমাগম হইয়াছে। কন্যা গলা জড়াইয়া গালে গাল রাখিয়া শুইল। অমিয়া চা করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

"ছাড়, এবার আমাকে উঠতে হবে"

"না"

"ভারী আদুরে দুষ্টু হয়েছ তুমি"

"তুমি দুত্তু"

আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্করের মনে হইল এমনভাবে তাহাকে আর কেহ বোধহয় কখনও বাঁধে নাই। জীবনে অনেকের বাহুপাশে সে বাঁধা পড়িয়াছে কিন্তু এ নিগড়ের নিকট সে সব অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহারই নিজের অন্তরের নিগূঢ় কামনা যাহা বারম্বার বহু নরনারীকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল কিন্তু পারে নাই, তাহাই যেন তাহার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

ভৃত্য আসিয়া প্রবেশ করিল এবং বলিল বাহিরের ঘরে কেনারামবাবু কয়েকজন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। "চল যাচ্ছি, একে নাও"

"না দাব না"

"যাও, লক্ষ্মী তো"

"না—না—না"

জোর করিয়া চাকরের কোলে তাহাকে দিয়া শঙ্কর উঠিয়া পড়িল।

বাহিরের ঘরে কেনারাম চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আসিয়াছিল কবির এবং কারু। উভয়েরই উদ্দেশ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ করা। কেনারাম চক্রবর্ত্তী ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি সুপারিশ করিতে আসিয়াছেন। উৎপলের এবং কয়েকজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার টাকায় গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টও কিছু টাকা তাহাতে দিয়াছেন—ঋণ-স্বরূপই দিয়াছেন। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য মহাজনদের হাত হইতে গরীব প্রজাদের রক্ষা করা। গরীব প্রজারা মহাজনদের নিকট হইতে অতিশয় চড়া সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। এই ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দেয় এবং ফসল উঠিলে কিস্তিতে কিস্তিতে তাহা শোধ করিয়া লয়। কেনারাম চক্রবর্ত্তীর কর্ত্তব্য অনুসন্ধান করিয়া দেখা—যাহাতে ব্যাঙ্কের টাকা মারা না পড়ে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন ঋণ-প্রার্থীর বিষয়সম্পত্তি এমন আছে কি না যাহা হইতে টাকা উদ্ধার হইতে পারে এবং লোকটা বিশ্বাসযোগ্য কি না, টাকা লইয়া সরিয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না। কেনারামবাবু ভূতপূর্ব্ব জমিদার রাজবল্লভের নায়েব, এ অঞ্চলের সমস্ত প্রজার প্রকৃত অবস্থা তাঁহার জানিবার কথা, সুতরাং তাঁহাকেই সেক্রেটারি করা হইয়াছে। শঙ্কর অবশ্য সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাহার অনুমতি ছাড়া কিছুই হইবে না, ইহা কেনারামবাবুর সম্মতি ক্রমেই উৎপল নির্দ্ধারিত করিয়াছে।

কেনারাম চক্রবর্ত্তী যদিও সারাজীবন নায়েবি করিয়া কাটাইয়াছেন কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে নায়েব বলিয়া মনে হয় না, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া মনে হয়। হাব-ভাবে পোষাক-পরিচ্ছদে কথায় বার্ত্তায় তাঁহার যে মার্জ্জিত রূপটি বিচ্ছুরিত হয় তাহা সম্ভ্রম-উদ্রেক-কারী। তাঁহার ঢিলা-হাতা এণ্ডির পাঞ্জাবী, ধবধবে শাদা বাঁধানো দাঁত, ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে বুদ্ধিদীপ্ত গাম্ভীর্য্য, অতি-আধুনিক বুকনি-সমন্বিত আলাপ—সমস্ত মিলিয়া এমন একটা সুষ্ঠু প্রকাশ যে ভিতরের আসল মানুষটিকে চিনিতে দেরি লাগে, অনেক সময় চেনাই যায় না। কেনারামবাবু শঙ্করের পিতৃবন্ধু সুতরাং শঙ্কর তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলে। উৎপলও দূর হইতে তাহাকে যতটা তুচ্ছ করিয়াছিল নিকটে আসিয়া দেখিল তিনি ততটা উপেক্ষণীয় নহেন, এমন কি এ বিশ্বাসও তাহার হইল যে তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার এই পল্লী-উন্নয়ন চেষ্টা হয় তো ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং একটা বড় বিভাগের শীর্ষদেশে তাঁহাকে স্থাপন করিতে সে ইতস্তত করিল না। কেনারামবাবু এ ব্যাপারে প্রথমে কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম লইতে স্বীকৃতই হন নাই। তাঁহার ভাবটা ছিল—তোমরা ছেলে ছোকরার দল—দেশের কাজ করিতে চাহিতেছ এ তো বেশ ভাল কথা, তোমরা নিজেদের নিয়মে নিজেদের বুদ্ধি অনুসারেই চল না—আমাদের মতো বুড়াকে আবার ও সবের মধ্যে টানিতে চাও কেন। উৎপলের অনুরোধেই তিনি যেন

অবশেষে খানিকটা অনিচ্ছাসহকারে এবং খানিকটা আবদারের খাতিরে শঙ্করের অধীনে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি হইতে রাজি হইয়াছেন।

শঙ্কর বাহিরে আসিতেই কেনারামবাবু বলিলেন—"দুটো গরীব প্রজাকে টাকা ধার দিতে হবে—তারা এসেছে—তোমার যা জিগ্যেস করবার করতে পার"

"আমি আর কি জিগ্যেস করব। আপনি যখন এনেছেন—"

কেনারাম স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"তোমার এটা কর্ত্তব্য বলেই বলছি—"

"আমি কি আর আপনার চেয়ে ভাল বুঝি ? কত টাকা চায়?"

"প্রত্যেকেই চায় হাজার খানেক করে'। দেবে কিনা ভেবে দেখ। ফরিদের দশ বিঘে জমি আছে, কারুর আছে আট বিঘে। এ ছাড়া বাস্তু ভিটেও আছে অবশ্য দুজনের—"

"বেশ তো, আপনি যদি ভাল বোঝেন"

"ভালমন্দ বোঝবার ভার তোমার—তুমিই ফাইনাল অথারিটি—"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। কেনারামবাবুও চুপ করিয়া রহিলেন, কেবল তাঁহার চক্ষু দুইটি হইতে কৌতুকপূর্ণ একটা নীরব হাস্য যেন উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। চতুর দাবা-খেলোয়াড় চাল আগাইয়া দিয়া যেমনভাবে বিপক্ষের মুখের দিকে চায় অনেকটা তেমনিভাবে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

শঙ্কর বলিল, "বেশ তো, দেওয়া যাক। গরীব প্রজাদের উপকারের জন্যই তো ব্যাঙ্ক"

কথাটা লুফিয়া লইয়া কেনারাম বলিলেন—"উপকার' কথাটাই যদি ব্যবহার করছ তাহলে বেশী কড়াক্কড়ি করাটা অনুচিত। করলে তোমাদের সঙ্গে নেকিরামের অথবা রাজীববাবুর কোন তফাত থাকে না"

"তাতো বটেই। প্রজাদের উপকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে টাকাটা যাতে মারা না যায় সেটা যথা-সম্ভব দেখতে হবে—"

"সে তো একশ'বার। তবে 'যথা-সম্ভব' কথাটা মনে রেখ। নেকিরাম রাজীববাবুর টাকাও মারা যায়, এমন কি কাবুলি-ওলারাও সব সময়ে টাকা আদায় করতে পারে না—তাই ওদের সুদ অত চড়া—"

"আপনি যদি ভাল মনে করেন ওদের টাকা দিন না, আমার আপত্তি নেই"

"বেশ"

পকেট হইতে কেনারামবাবু একটি ছাপান অনুমতি-পত্র বাহির করিলেন।

"সই করে' দাও তাহলে"

শঙ্কর সহি করিয়া দিল। কেনারামবাবু উঠিয়া পড়িলেন, শঙ্করও উঠিয়া তাঁহার সহিত বারান্দা পর্য্যন্ত আসিল। বারান্দায় ফরিদ ও কারু জোড়হস্তে বসিয়াছিল। একজন হিন্দু এবং একজন মুসলমান। উভয়ের মধ্যে কিন্তু কোন তফাত নাই। উভয়েরই অনাহার-ক্লিষ্ট মূর্ত্তি, পরিধানে শতছিন্ন মলিন বসন, উভয়েরই দৃষ্টি ম্লান ভীত-চকিত, উভয়েই ঋণে জর্জ্জরিত, রোগে জীর্ণ, নানা অভাবে নিষ্পিষ্ট দরিদ্র চাষী।

২

আহারাদির পর শঙ্কর ছবি-গঞ্জের দিকে গরুর গাড়ি চাপিয়া রওনা হইল। সেখানে মুকুন্দরাম পোদ্দারের বৈঠকখানায় নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। মুকুন্দরাম একজন ধনী মহাজন, ছবি-গঞ্জের মাতব্বর ব্যক্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় নূতন জমিদার উৎপলের এই সকল জনহিতকর কার্য্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন, শঙ্করের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল। ছবি-গঞ্জে কিছুদিন পূর্ব্বে যে নূতন পাঠশালাটি স্থাপিত হইয়াছে তাহার ঘরটিও তিনি দিয়াছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে একটি বালিকা বিদ্যালয় করিবার সহায়তাও তিনিই করিবেন।

কলিকাতা পরিত্যাগের পর দেখিতে দেখিতে চার বৎসর কাটিয়া গেল। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া সে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিল তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে বই কি। দশটি পাঠশালা, একটি বালিকা বিদ্যালয়, গোটা দুই দাতব্য চিকিৎসালয়, দুইটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দরিদ্র চাষীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে নূতন ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছে, পুরাতন কূপগুলির সংস্কার সাধন করা হইতেছে। ইহা ছাড়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সহজ প্রতিষেধ্য সংক্রামক ব্যাধি নিবারণ প্রভৃতির জন্যও চেষ্টার ক্রটি নাই।

এই শেষোক্ত কার্য্য দুইটির ভার সে নিপুদা'কে দিয়াছে। মাস ছয়েক পূর্ব্বে নিপুদা নিজের নিতান্ত দুরবস্থার সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়া শঙ্করকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল যে আত্মীয় স্বজন কাহারও সহিত তাহার বনিতেছে না। কাকা-কাকীর অনুগ্রহপ্রদত্ত অন্ন এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত উপদেশ আর সে হজম করিতে পারিতেছে না। যে কেরাণীগিরি সে কিছুকাল পূর্ব্বে জোগাড় করিয়াছিল তাহাতে সে টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। টিকিয়া থাকিতে পারিলে হয়তো জীবনের শেষে মাসিক পঁচাত্তর টাকার গ্রেডে উন্নীত হইতে পারিত কিন্তু তাহার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ হীনতা স্বীকার করিতে হইত তাহা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সে চাকুরি গিয়াছে। প্রাইভেট ট্যুশনি করিয়া কিছুদিন চলিয়াছিল, একটি ভাল ছাত্রও জুটিয়াছিল। ছাত্রের অভিভাবকেরাও ভদ্রলোক ছিলেন অর্থাৎ সামান্য কারণে প্রাইভেট টিউটারকে কড়া কথা শুনাইয়া কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। বেতনও ভাল দিতেন। কিন্তু সে চাকরি বেশীদিন রহিল না, কারণ ছাত্রটি একবারেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়া ফেলিল। আরও দুই এক স্থানে টিউশনি জুটিয়াছিল, কিন্তু অভিভাবকদের অভদ্রতা অথবা অতিশয় কম বেতন অথবা ছাত্রের ধৈর্য্যচ্যুতিকর নির্ব্বুদ্ধিতা—একটা না একটা কারণের জন্য তাহাকে সে সব ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শুধু বখরাদার হইয়া—অর্থাৎ নিজের পরিশ্রম এবং বুদ্ধি ক্যাপিটাল স্বরূপ দান করিয়া সে একজন বন্ধুর সহিত ব্যবসায়ে যুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে ব্যবসায়টি ফেল করিয়াছে। এই সব বর্ণনা করিয়া অবশেষে সে লিখিয়াছিল যে দুর্ভাগ্যক্রমে এমন দেশে এমন সময়ে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে কিছুতেই ভদ্রভাবে এক মুঠা অন্ন জুটিতেছে না, অথচ সে কাজ করিতে প্রস্তুত, তাহার বুদ্ধির অভাব নাই, বিদ্যাও যৎকিঞ্চিৎ আছে। সোভিয়েট

রাশিয়াতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার এমন দুর্দ্দশা নিশ্চয়ই হইত না। সাহিত্য পথেও সে চেষ্টা কম করে নাই। ইংরেজি বাংলা কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিয়া সে নামজাদা সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে। কিন্তু কোথাও সেগুলি ছাপা হয় নাই। সর্ব্বত্রই একটা না একটা দল নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্ত কোমর বাঁধিয়া বসিয়া আছে, কিছুতেই বাহিরের লোককে সেখানে ঢুকিতে দিবে না। যদিই বা অতি কষ্টে কোথাও প্রবেশাধিকার মেলে, প্রবন্ধের ন্তায্য পারিশ্রমিক মিলিবে না। "মজদুর দর্পণ" কাগজের এমন আয় নাই যে বেশী মূল্য দিয়া তাহার প্রবন্ধ কিনিতে পারে। কাকা-কাকীর সংশ্রব সে ত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং এখন হয় অনাহারে না হয় আত্মহত্যা করিয়া তাহাকে মরিতে হইবে। শঙ্কর না কি তাহার এক উদার বন্ধুর অর্থে পল্লী-উন্নয়ন করিতেছে সে যদি তাহাকে কোন একটা—ইত্যাদি।

শঙ্করের সহিত নিপুদা যদিও ভাল ব্যবহার করে নাই তবু শঙ্কর তাহাকে আহ্বান করিয়া অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও স্যানিটেশনের কাজে লাগাইয়া দিয়াছে। নিজেও সে একদিন অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিল, এ অবস্থার দুঃখটা যে কত গভীর ও শোচনীয় তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। যে হিরণদার অনুগ্রহে সে উদ্ধারলাভ করিয়াছিল সেই হিরণদারই বন্ধু নিপুদা। চক্ষু-লজ্জাবশতই শঙ্কর প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই। উৎপলও আপত্তি করে নাই। কোন বিষয়েই সে আপত্তি করে না। সে টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত, শঙ্করকেই সে সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ মালিক করিয়া দিয়াছে। পাঁচ বৎসর পরে সে কেবল হিসাবনিকাশ লইবে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল। ইতিমধ্যে শঙ্কর যা ভাল বোঝে করুক—সে কোন কথা বলিবে না।

বালিকা বিদ্যালয়টির জন্ত শঙ্কর কলিকাতা হইতে হাসিকে আনাইয়াছে। সাধারণত সেই সব শিক্ষিতা মহিলারা বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী-পদে বাহাল হন—যাঁহারা কুরূপের জন্ত অথবা অর্থাভাবে সমাজে স্বামী সংগ্রহ করিতে পারেন না। হতাশ প্রণয়িনীও মাঝে মাঝে আসিয়া জোটেন। শঙ্করের ধারণা শিক্ষয়িত্রী হিসাবে ইঁহারা অযোগ্য। শিক্ষয়িত্রী হইতে হইলে মনের যে সমতা ও প্রসন্নতা থাকা উচিত তাহা ইহাদের না থাকিবারই কথা। ইঁহারা বঞ্চিত, ক্ষুধিত—ইহাদের সমস্ত মন-প্রাণ পড়িয়া থাকে সেই সব ভোগৈশ্বর্য্যের দিকে—যাহা তাঁহারা পান নাই অথচ যাহাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের বৈরাগ্যও জন্মে নাই। মাতৃত্বই নারীত্বের পূর্ণ পরিণতি। তাহা লাভ না করিলে চিত্তের স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। তাই হাসিকে সে আনিয়াছে। হাসির শুধু যে বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা আছে তাহাই নয়, স্বামী-চরিত্রের বৃহৎ আদর্শের সংস্পর্শে আসাতে সে অভিজ্ঞতা মহত্বপূর্ণ। তাহার নারীমনের অবলম্বনস্বরূপ একটি পুত্রও আছে। হাসি প্রথমে আসিতে চায় নাই। অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে সে আনিয়াছে এবং বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

গরুর গাড়ি চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে চাষের জমি। দূরে দূরে চাষারা টোকা মাথায় দিয়া লাঙল চষিতেছে। কত দরিদ্র অথচ কত মহৎ উহারা। উহাদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া শঙ্কর মনে-প্রাণে ইহাই বুঝিয়াছে যে মানব-চরিত্রে যে সব গুণগুলিকে আমরা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি তাহা উহাদের চরিত্রেই প্রচুর পরিমাণে আছে। তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের 'চরিত্র' বলিয়া এমন কোন কিছু নাই যাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়—যাহা আছে তাহা স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল একটা হীনধরণের চতুরতা মাত্র। এই শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সত্যই বড় দুর্দ্দশাপন্ন। ইহারা ভাল করিয়া ভোগও করিতে পারে না ত্যাগও করিতে পারে না। ইহারা আর পাঁচজনকে দেখাইয়া ভোগের একটা অভিনয় করে মাত্র এবং সেই লেফাপা বজায় রাখিবার জন্ত আজীবন প্রাণপণ করে। সত্যকার ত্যাগের নাম শুনিলে ইহারা ভয় পায়; তবে ত্যাগের অভিনয় করিয়াও অনেক সময় লেফাপা বজায় রাখিতে হয়, সে রকম ত্যাগ ইহারা করে মাঝে মাঝে। কিন্তু মুখোস কিছুদিন পরেই খসিয়া যায় এবং তখন ইহাদের কদর্য্যস্বরূপ দেখিয়া সকলে আতঙ্কিত হইয়া ওঠে।

সহসা তাহার মনে হইল—এই সব লইয়া একটা উপন্যাস লিখিলে কেমন হয়? ম্যাক্সিম গোর্কির মাদারের মত উপন্যাস সে কি লিখিতে পারে না? না, সময় নাই—তাহার অনেক কাজ। অনেক কাজসত্ত্বেও কিন্তু তাহার মন সাহিত্য-বিমুখ হয় নাই। সাহিত্যকে সে ত্যাগ করিতে পারে নাই। যাহা তাহার অন্তরের বস্তু তাহাকে ত্যাগ করিবে কি করিয়া। সময় পাইলেই, এমন কি সময় নষ্ট করিয়া এখনও সে সাহিত্য-চর্চ্চা করে। ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এখনও সে মাঝে মাঝে লেখে বই কি, সাময়িক পত্রিকাদিতে সে সব প্রকাশিতও হয়। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকার সঙ্গে অবশ্য এখন তাহার পূর্ব্বের সে সম্বন্ধ নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকা সে লোকনাথবাবুকে দান করিয়া দিয়াছে—লোকনাথ স্বেচ্ছায় যাচিয়া স্বয়ং সে ভার লইয়াছেন। সে পত্রিকার এখন কাজ লোকনাথবাবুর সাহিত্যিক মতামতই লিপিবদ্ধ করা। বাহিরের কোন লেখকের নিকট তিনি লেখা ভিক্ষা করেন না, বিজ্ঞাপনদাতাগণের মুখ চাহিয়া আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করেন না. কোন বড়লোকের খাতিরে নিজের সাহিত্য-বুদ্ধিকে এক চুলও বিচলিত করেন না। তাঁহার সারস্বত-সাধনার ত্রিসীমানায় তিনি লক্ষ্মী অথবা লক্ষ্মীর বাহনদের সামান্ত ছায়াপাতও সহ্য করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং 'ক্ষত্রিয়' কাগজের 'চাহিদা' নাই। বিক্রয়ের জন্ত সজ্জিত হইয়া ষ্টলে ষ্টলে তাহা খরিদ্দারের আশায় মাসে মাসে পথ চাহিয়া থাকে না। তাহা মাঝে মাঝে বাহির হয়—ঠিক মাসে মাসে নয় এবং সাহিত্য-রসিকদের নিকট বিনামূল্যে বিতরিত হয়। লোকনাথ ঘোষালের অর্থ-সামর্থ্য কতটা তাহা শঙ্কর ঠিক জানে না, শুধু জানে যে তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকরা সাধারণতঃ দরিদ্র, লোকনাথবাবু কি করিয়া যে নিজ ব্যয়ে ক্ষত্রিয় ছাপাইয়া বিতরণ করেন তাহা ভাবিয়া শঙ্কর বিস্মিত হয়। তাঁহাকে চিঠিতে এ সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই। 'ক্ষত্রিয়' পত্রিকায় শঙ্কর এখনও মাঝে মাঝে লেখে কিন্তু সে লেখা লোকনাথ ঘোষালের অনুমোদন লাভ করিলে তবে প্রকাশিত হয়। বাজে লেখা লোকনাথ ঘোষাল ছাপেন না, শঙ্করের অনেক লেখা তিনি ফেরত দিয়াছেন। লোকনাথ ঘোষালকে শঙ্কর একটি বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তাহার পল্লী-উন্নয়ন-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্তও আমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি নিজের

যে মাইনর স্কুলে এতদিন কাটাইয়াছেন—প্রথম যৌবনে চেষ্টা-চরিত্র করিয়া যাহা তিনি নিজেই একদিন স্থাপন করিয়াছিলেন—সে স্কুল ছাড়িয়া কোথাও তিনি যাইবেন না।

'সংস্কারক' পত্রিকাতেও শঙ্কর মাঝে মাঝে লেখে। এ পত্রিকাটিও হস্তান্তরিত এবং রূপান্তরিত হইয়াছে। সেখানে আজকাল হীরালাল মজুমদার অথবা নিলয়কুমার নাই। কুমার পলাশকান্তিই বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী। অর্থাৎ অনিল এবং নীরাই বর্ত্তমান 'সংস্কারক' পত্রিকার কর্ণধার। কুমার পলাশ-কান্তির উপন্যাস, অনিল সান্ন্যালের বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক প্রবন্ধ এবং নীরার গল্প কবিতাই এখন সংস্কারকের অধিকাংশ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতেছে। নিলয়কুমারের কবি-পত্নী রেণুকাদেবীও সংস্কারক পত্রিকায় নিয়মিত লিখিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই প্রেমের কবিতা লেখেন এবং তাহা সংস্কারকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়। নীরার অনুরোধে শঙ্করও মাঝে মাঝে লেখে।

হীরালাল মজুমদারের 'সংস্কারক' কি করিয়া কুমার পলাশ-কান্তির হইয়া গেল সে ইতিহাস বড় করুণ। একদা ন্যায়-পরায়ণতা ও সত্যভাষণের জন্য, নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য, সততা ও সাহিত্যিক নিষ্ঠার জন্য 'সংস্কারক' পত্রিকার যে সুনাম ছিল সেই সুনামের সুবিধা লইয়া ভাগিনেয় নিলয়কুমার বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করিতে করিতে পত্রিকাখানিকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তাহার গৌরবময় অগ্র-গতি আর সম্ভব ছিল না। ভাল পত্রিকায় ভাল লেখকমাত্রেই লিখিতে চায়। আরও প্রলোভন ছিল সংস্কারকের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকিত—ভাল লেখা সমুচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করা হয় এবং রচনা-নির্ব্বাচনে সাহিত্যিক মানদণ্ড ছাড়া অন্য কোন প্রকার মানদণ্ড ব্যবহৃত হয় না। এই উচ্চাদর্শে উৎসাহিত হইয়া অনেক ভাল লেখক তাঁহাদের রচনা 'সংস্কারক' পত্রিকায় প্রেরণ করিতেন। ক্রমশঃ কিন্তু এই কথাটাই সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে বিজ্ঞাপনে যাহাই লেখা থাক, লেখার মূল্য সহজে কেহ পাইবেন না এবং লেখার মূল্য লইয়া বেশী কড়াকড়ি করিলে সে লেখা ছাপা হইবে না। ইহাও বুঝিতে কষ্ট হইল না যে 'সাহিত্যিক মানদণ্ড'ও বিজ্ঞাপনের বুলি-মাত্র, চালিয়াত নিলয়কুমারের স্বকীয় মানদণ্ডই আসল মাপকাঠি এবং সে মাপকাঠির স্থূল-কথা অর্থ—মানে, সেই অর্থ যাহা দিয়া মোটর কেনা যায় অথবা ঋণ-শোধ হয়। পত্রিকার কর্ম্মচারিগণও সময়ে বেতন পাইতেন না। শুধু লেখক এবং কর্ম্মচারিগণই নয় একটা পত্রিকার সহিত অবিচ্ছেদ্য-ভাবে অন্যান্য যে সব ব্যক্তি জড়িত থাকেন তাঁহারাও সংস্কারকের সুনামে আস্থা স্থাপন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। কাগজ-ওলা, টাইপ-সরবরাহকারী, কালীর দোকানদার, ব্লক-প্রস্তুত-কারক কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে 'সংস্কারক' পত্রিকার টাকা আদায় করিবার জন্য তাঁহাদের আদালত পর্য্যন্ত ছুটিতে হইবে। হীরালাল মজুমদার সত্যই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার নিকটে গেলে তিনি সত্য কথাই বলেন—"আমি বৃদ্ধ হয়েছি, কিছুই দেখতে শুনতে পারি না, আপনারা নিলয়ের কাছে যান, সেই সব ব্যবস্থা করবে।" নিলয়ের কাছে যাইতে তাঁহাদের আপত্তি নাই, গিয়াছিলেনও। কিন্তু সাহেবি-প্রকৃতির নিলয়কুমারের দেখা পাওয়াই শক্ত—তিনি প্রায় সর্ব্বদাই 'নট্ অ্যাট্ হোম'। অনেক হাঁটাহাঁটির পর দৈবাৎ তাঁহার দর্শন মিলিলে টাকার পরিবর্ত্তে তিনি তারিখ দিতেন এবং প্রায়ই সে তারিখের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন না। সুতরাং বাধ্য হইয়া সকলে আদালতের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কুমার পলাশকান্তি উদ্ধার না করিলে হয়তো 'সংস্কারক' পত্রিকা অবলুপ্ত হইয়া যাইত। কুমার পলাশকান্তির এবম্বিধ হিতৈষণা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় যদিও দুষ্টলোকে রটাইয়াছে যে সাহিত্য-প্রীতিবশতঃ ততটা নহে যতটা নিলয়কুমারের পত্নী রেণুকার জন্যই তিনি নাকি এই জনহিতকর কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। রেণুকার ন্যায় ভনৈকা বিদুষী কবি অর্থাভাবে কষ্ট পাইবেন তাহা পলাশকান্তির ন্যায় মহাপ্রাণ না কি সহ্য করিতে অক্ষম। পাওনাদারদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া 'সংস্কারক' পত্রিকার সমস্ত স্বত্ব কিনিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই হীরালাল মজুমদার এবং নিলয়কুমারকে মাসে মাসে মাসোহারাও দিয়া থাকেন। রেণুকা দেবীর মধ্যে তিনি নাকি অসাধারণ কবি-প্রতিভা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহাকে নাকি 'পুশ' করিতেছেন।

"দেখিয়ে হুজুর"

গাড়োয়ান মুশাই হঠাৎ কথা কহিয়া উঠিল। গাড়ীটাও হঠাৎ একটু একপেশে হইয়া পড়িল।

"কি—"

"বয়েল কো বদমাসি"

শঙ্কর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। বাঁ-ধারের কালো গরুটা জোয়াল খুলিয়া ফেলিয়া রাস্তার পাশ হইতে দুর্ব্বা ছিঁড়িয়া খাইতে সুরু করিয়াছে। ডান-ধারের সাদা গরুটা বোকার মতো দাঁড়াইয়া আছে।

"কহা থা না?"

"তাই তো"

গরু জোড়া সম্প্রতি কেনা হইয়াছে। মুশাই গাড়োয়ান কয়েক দিন হইতে শঙ্করকে বলিতেছে যে ইহাদের জোড় ঠিক মেলে নাই। কালো গরুটা বেশী চালাক এবং বেশী পেটুক—সাদাটা কিঞ্চিৎ নির্ব্বোধ এবং স্বল্পাহারী। মুশাইয়ের অভিপ্রায় এবং উপদেশ কালো গরুটাকে বিক্রয় করিয়া তাহার স্থানে মুশায়েরই বাদামী রঙের গরুটাকে নিযুক্ত করা। কারণ মুশাইয়ের মতে তাহার এই বাদামী গরুটির স্বভাবও উক্ত সাদা গরুটিরই অনুরূপ—বেশী চালাকি নাই এবং খুব কম খায়। বাবু যদি অনুমতি করেন, মুশাই বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। উহার জোড়াটা মরিয়া গিয়াছে, একটা গরু লইয়া সে আর কি করিবে, তাহা ছাড়া তাহার ক্ষেত এখন চষিবেই বা কে, ছেলেটা তো কলে চাকরি লইয়া চলিয়া গেল—গরুটা বেচিয়াই ফেলিতে হইবে। হাটে লইয়া গেলে ভাল দামেই সে বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু বাবু যদি কেনেন তাহা হইলে সে—ইত্যাদি।

"বেচ দিজিয়ে শালে কো—"

কালো গরুটাকে জোয়ালে বাঁধিতে বাঁধিতে মুশাই পুনরায় স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিল।

"এখন তাড়াতাড়ি নে, ছবি-গঞ্জে পৌঁছুতে অনেক দেরী হয়ে যাবে দেখছি। অনেক কাজ সেখানে আমার—"

"হো গিয়া"

গরুটাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া মুশাই তড়াক করিয়া স্বস্থানে বসিল এবং দ্রুত-বেগে গাড়ি হাঁকাইতে লাগিল। শঙ্কর মুশাইয়ের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা দিয়া তাহার সমস্ত ঋণ-শোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, ফ্যাক্টারিতে তাহার পুত্র বিষুণের চাকরি করিয়া দিয়াছে—তবু তাহার অভাব মেটে না। তাহার এই গো-চরিত্র-বিশ্লেষণের মূলে যে অর্থাভাব তাহা শঙ্করের বুঝিতে কষ্ট হয় নাই। তাহার বারবার মনে হইতে লাগিল—কেন, এত অভাব কেন ইহাদের? আর কি করিলে ইহাদের দুঃখ দূর হয়।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাহারা হীরাপুর গ্রামে ঢুকিল।

হীরাপুরে নিমাই ঘটক থাকে। হীরাপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলের হেড পণ্ডিত সে। গ্রামেরই ছেলে, আই. এ. ফেল করিয়া বসিয়াছিল, শঙ্কর তাহাকে স্কুলের হেড পণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। হেড পণ্ডিতি করিবার যোগ্যতা ছেলেটির নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ঠিক ওই জন্যই যে শঙ্কর তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে তাহা নয়, আসল কারণ শঙ্কর তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আকর্ষণের প্রধান কারণ রূপ। রূপ জিনিসটার এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে স্ত্রী-পুরুষ ফল-পুষ্প জন্তু-জানোয়ার আকাশ-সমুদ্র যেখানেই তাহার আবির্ভাব ঘটুক না তাহা মানুষকে মুগ্ধ করে। রূপ দেখিয়াই শঙ্কর প্রথমে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার পর আরও মুগ্ধ হইয়াছে তাহার সাহিত্য-প্রীতি এবং সাহিত্য-বিষয়ে চিন্তার অভিনবত্ব দেখিয়া। শঙ্কর আজকাল যাহা-কিছু লেখে তাহা সর্ব্বাগ্রে নিমাই ঘটকের নিকট পাঠাইয়া দেয় এবং তাহার অভিমত গ্রাহ্য করে। নিমাই ঘটক সাহিত্য-স্রষ্টা নয় বটে, কিন্তু উঁচুদরের রসিক সমজদার—অন্তত শঙ্করের তাহাই বিশ্বাস।

হীরাপুর গ্রামে ঢুকিয়াই শঙ্করের মনে পড়িল তাহার "জাতীয় সাহিত্য" নামক প্রবন্ধটা ঘটকের কাছে অনেকদিন পড়িয়া আছে। প্রবন্ধটি লিখিবার অব্যবহিত পরেই ঘটকের সহিত দেখা হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি পড়িবে বলিয়া লইয়া গিয়াছিল, এখনও ফেরত দেয় নাই। যদিও ছবি-গঞ্জে তাড়াতাড়ি যাওয়া প্রয়োজন, তবু সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল। প্রবন্ধটি নিমাই ঘটকের কেমন লাগিয়াছে তাহা জানিবার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে সাহিত্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু সাহিত্য তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। মনের প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে যে ভাবনা তাহার অন্তরতম সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে তাহা সাহিত্য-ভাবনা। ওই ভাবনাই সে সর্ব্বদা করিতেছে, উহা ছাড়া অন্য কোন ভাবনায় তাহার সুখ নাই। ইহার জন্য তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি ঘটিতেছে ইহা সে বোঝে—সেবার যে কাঁটাপোখর গ্রামের স্কুলটা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল না তাহার কারণ সে সময়মতো স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে তোয়াজ করিতে পারে নাই। দেখা না করিতে পারার কারণ সে তখন প্রকাণ্ড একটা কবিতা লইয়া এমন তন্ময় হইয়াছিল যে ইন্‌স্পেক্টারের কথা তাহার মনেই ছিল না। অনুরূপ ঘটনা আরও কতবার ঘটিয়াছে। আজও ছবিগঞ্জে যাইবার পথে সে হীরাপুরে নামিয়া পড়িল। ক্রমশঃ

ফাগুয়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নব ফাল্গুন এল এ খবর পাইনি এতক্ষণ
তাইত সহসা চঞ্চল হ'ল শ্যাওলা-পড়া এ মন।
ফাগুনে অনেক ফাগ খেলিয়াছি, ছুড়ি নাই পিচ্‌কারী,
জলো রঙে মন ভেজে না বলেই সহিয়াছি টিট্‌কারি।
দোলের দোলায় প্রাণ দুলিয়াছে, দোল্‌না খেয়েছি মনে
তারি আপশোষে একান্তে ডাকি কহেছি বন্ধু-জনে।
প্রিয়ার বিরহ সহি অহরহ, দেখিলাম আঁখি মেলি'
ব্ল্যাক্-আউট্ বলে যে যার মতন চলে গেছে বেলাবেলি।
নব-মল্লিকা নাই এ বাগানে, ডালিয়া একটি দু'টি
বিলম্ব বলে লজ্জায় রাঙা মাঝে মাঝে ওঠে ফুটি'।
আমার ফুলের স্বল্প জীবনে অল্প কথার ফাঁকে
বুঝিয়া নিয়েছি ফাগুন এল যে কোন্ সে প্রিয়ার ডাকে।
সে প্রিয়ার মায়া রঙীণইত বটে, ইন্দ্রধনু ত ছার
বৃন্দাবনের অচেনা পথের বান্ধবী ফাগুয়ার।
অনুরাগে রাঙা অধরে লাগেনা কুঙ্কুম-ভাঙা রঙ
রভস-মিলনে বঁধু বাঁধিবার এ যে যাদুকরী ঢঙ।

মধুমাধবীর ফুল-উৎসবে, প্রীতির আমন্ত্রণ
যদি এসে থাকে তাহারে জানাও সাদর-সম্ভাষণ,
দক্ষিণা বায় যদি আসে যায় ফিরায়ে দিওনা তারে
চেনা-পথ দিয়ে সেই নিয়ে যাবে প্রিয়ার কুঞ্জদ্বারে,
রভস-বিহার করি পরিহার শুধায়ো একটি কথা
জীবন ভরিয়া বঞ্চনা করি' কখনো পেয়েছে ব্যথা?
লুব্ধ মধুপ অনেক দেখেছি মধুহীন ফুলদলে
পরাগে তাদের অনুরাগ বেশী, বাসিমালা পরে গলে,
ঝরা ফুলে করে বাসর-শয্যা, নিরুদ্ধ বাতায়ন,
যাহা চায় তাহা পায়না ব'লেই রচে নব গীতায়ন।
তোমার প্রাণের ফাগে ফাগে যার আগুন লেগেছে মনে,
ভাল করে দেখো, নব মল্লিকা ফুটিয়াছে সেই বনে
পথ চেয়ে থাকা দিবস রাত্রি উতলা দখিণা বায়
একখানি মুখ আলো করে আছে মিলন-পূর্ণিমায়।
সে মুখের পানে চাহিনি কখনো, জানিনা কেমন তর
শুধু জানি তার হৃদয়-যমুনা তরঙ্গে থর থর
শত জীবনের হারাণ তোমায় বিধি মিলালেন ঘরে
বরণ-মালিকা কণ্ঠে তোমার দিল সে আদর করে'
প্রিয় বলে নয়, প্রিয়তম বলে দিল সে আলিঙ্গন
তারি প্রেমে ফুল আলো করে' আছে শ্রীবাসের অঙ্গন;
শ্রীধামের ধুলা অঙ্গে তাহার, শ্রীমতীর প্রেম বুকে,
ব্রজমাধুরীর নির্ম্মল জ্যোতি দেখনিকি তার মুখে?

বিচিত্র বেতার

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

আমাদের পুকুরের চোঙের কথাই ফের ধরা যাক। এখানে মনে রাখা দরকার যে স্রোতে বাড়তি এবং কমতি দুই আছে, সেখানে দুটি স্রোত—একটি একমুখী অবিরাম, অপরটি যাতায়াতি—বর্ত্তমান। কিন্তু যে প্রবাহ থেকে শুধু বাড়তি অথবা শুধু কমতিই হচ্ছে সেখানেও দুটি স্রোতই রয়েছে, তবে এখানে দ্বিতীয় স্রোতটি সবিরাম একমুখী প্রবাহ।

আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল জলের স্রোতে যাতে থেকে থেকে শুধু বাড়তিই হয়। সেজন্য গোড়াতেই কলটিকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। এখন তাকে শুধু একদিকেই ঘোরান যাবে। খুলে দিলে জলস্রোত বাড়বে কিন্তু উল্টোদিকে ঘোরালে কিছুমাত্র ফল হবে না। আমাদের ভালভের বেলায়ও তাই। এখানে গ্রীডের উপর ঋণবিদ্যুৎ কিছু না থাকলেও কতগুলি ইলেক্‌ট্রন ফিলানি তার থেকে এ্যানোডে চলে যাবে তার আকর্ষণে। তাই গ্রীড্ উদাসীন থাকলেও কিছুটা এ্যানোড স্রোত পাওয়াই যায়। কিন্তু প্রথমেই গ্রীডকে আমাদের কার্য্যকরী অবস্থায় এনে নিতে হবে। এমন করে রাখতে হবে যাতে এ্যানোড প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে যায়। (সাধারণতঃ কার্য্যকরী অবস্থায় গ্রীড্‌কে নিয়ে এলেও খানিকটা এ্যানোড্ স্রোত থেকে যায়। কিন্তু বুঝবার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নেব যে এ্যানোড প্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়)। এই ঋণাত্মক গ্রীডের উপরে আরও ইলেকট্রন চাপালে কিছুই ফল হবে না। কিন্তু যদি এই ঋণাত্মক গ্রীডের উপরে পজিটিভ্ আমদানী করা যায় তাহ'লে তার গোড়াকার নিগেটিভত্ব কমে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এ্যানোড্ স্রোতও বেড়ে যাবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে কোন জিনিষকে পজিটিভ করে দেওয়া মানেই হ'ল তার উপর থেকে কিছু ইলেকট্রন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। স্বাভাবিক অবস্থায় যা দরকার তার চাইতে কম ইলেকট্রন থাকলেই পজিটিভত্ব প্রকাশ পাবে। তাহ'লে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে কার্য্যকরী অবস্থায় গ্রীডের উপর ইলেকট্রন আনলে (অর্থাৎ তাকে আরও নিগেটিভ্ করে দিলে) এ্যানোড্ স্রোতের কোনও পরিবর্ত্তন হবে না কিন্তু গ্রীড থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নিলে (অর্থাৎ গোড়াকার কার্য্যকরী নিগেটিভের তুলনায় তাকে পজিটিভ করে দিলে) এ্যানোড স্রোত বেড়ে যাবে।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে সম্প্রসারক ভালভের কার্য্যকরী অবস্থা এবং এই ভালভের (কথার পোষাক খুলবার ভালভ) কার্য্যকরী অবস্থা মোটেই এক নয়। আগের ক্ষেত্রে কার্য্যকরী গ্রীডকে আরো নিগেটিভ করলে এ্যানোড স্রোত চলে যেত, কিন্তু এখানে কার্য্যকরী অবস্থা থেকে আরও নিগেটিভ করে দিলে কিছু ফল হবে না।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মনে করা যেতে পারে যে ভাল্‌ভটিকে যেন একদিকে খুলে রাখা হয়েছে। আমরা দেখেছি কোনও যাতায়াতি প্রবাহ ইলেকট্রনের কেবল এদিক-ওদিক যাওয়া আসা করছে। তাই আমাদের এই গ্রীডকে (ঋণাত্মক) যদি কোন যাতায়াতি প্রবাহের পথের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহ'লে একবার তার উপর ইলেকট্রন এসে জমা হবে আবার পরমুহূর্ত্তে সেখান থেকে ইলেকট্রনেরা পালিয়ে যাবে অন্যদিকে। যখন ইলেকট্রন এসে জমা হবে তখন গ্রীড হবে আরও বেশী নিগেটিভ্ এবং যখন ইলেকট্রন সরে যাবে তখন তার নিগেটিভত্ব কমে যাবে অর্থাৎ আগের তুলনায় সে হবে পজিটিভ। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে আমাদের ঋণাত্মক গ্রীডকে আরো নিগেটিভ করলে কিছুই ফল হবে না। সুতরাং গ্রাডের উপর যাতায়াতি প্রবাহ এসে পড়লে তার নিগেটিভ্ অংশটা বাতিল হয়ে যাবে, গ্রীডকে গোড়াতেই যথেষ্ট পরিমাণ ঋণাত্মক করে রাখার দরুণ। ফলে এ্যানোড প্রবাহে শুধু থেকে থেকে বাড়তিই দেখা দেবে। আমরা আগেই বলেছি স্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহ থেকে কথার পোষাক খুলে নিতে হ'লে তার একটা অংশ বাতিল করে দিতে হবে। অতএব আমাদের কাজ হ'ল সম্প্রসারিত স্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহকে কথার-পোষাক-খুলে নেওয়ার ভালভের গ্রীডের উপর এনে ফেলা। তাহ'লে এই ভাল্‌ভের এ্যানোড স্রোতে শুধু থেকে থেকে বাড়তিই দেখা দেবে। কিন্তু যে স্রোত থেকে থেকে বাড়ছে তার মধ্যে আসল অবিরাম স্রোতের সঙ্গে রয়েছে এমন একটি স্রোত—যেটি মোটেই যাতায়াতি প্রবাহ নয়, যেটি হ'ল একমুখী এবং সবিরাম। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে গ্রীডে যাতায়াতি প্রবাহ লাগিয়ে এ্যানোডের পথে আমরা একমুখী স্রোত পেতে পারি। এ্যানোড পথের এই থেকে থেকে একমুখী স্রোতটিকে পাঠাতে হবে টেলিফোন বা লাউড্‌ স্পীকারের ভিতর দিয়ে।

আগেই বলা হয়েছে সম্প্রসারক ভালভের এ্যানোড পথে অতি

এ্যানোড পথে এই থেকে থেকে বাড়তি স্রোতগুলিকে সম্মিলিতভাবে দেখলে কথার ঢেউএর চেহারার মতই দেখাবে এবং সেই ঢেউ ইলেকট্রন স্রোত লাউড স্পীকারে ভিতর দিয়ে গেলে কথার পুনরাবৃত্তি ঘটবে

চিত্র নং ২৯
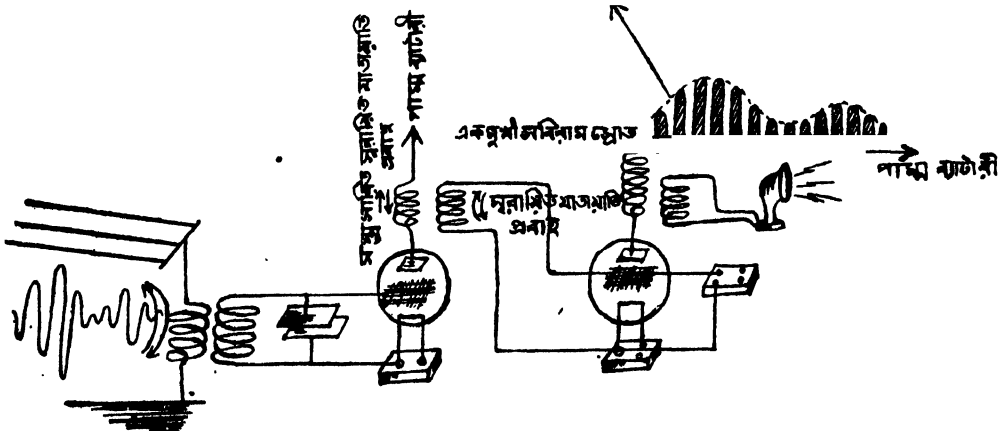
শক্তিশালী স্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহ বইতে লাগল। তার কাছে থেকে কথার পোষাকটি খুলে নিতে হবে। প্রথমে সেই যাতায়াতি প্রবাহের অর্দ্ধেকটা কেটে দিয়ে, তারপর সেই বাকী অর্দ্ধেক লাউড স্পীকারের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে। সেই এ্যানোড পথের স্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহকে একটা ট্রান্‌স্‌ফরমার দিয়ে কথার পোষাক খুলে নেওয়া ভাল্‌ভের গ্রীডের উপর এনে ফেলা হ'ল। এই ট্রান্‌স্‌ফরমারের সেকেণ্ডারী তারকুণ্ডলের মধ্যে (যার সাথে দ্বিতীয় ভালভের গ্রীড এবং জ্বালানি তার জুড়ে দেওয়া হয়েছে) স্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহ চলতে লাগল এবং তার সাথে গ্রীডের যোগ থাকায় গ্রাড (যাকে গোড়াতেই ঋণাত্মক করে নেওয়া হয়েছে) একবার আরও নিগেটিভ্‌ এবং একবার আগের তুলনায় পজিটিভ্‌ হতে লাগল। নিগেটিভ অংশ গেল বাতিল হয়ে, পজিটিভ অংশগুলিই কার্য্যকরী হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে এ্যানোড প্রবাহে শুধু থেকে থেকে বাড়তিই দেখা দিতে লাগল। এই বাড়তি অংশগুলিকে একত্র করে দেখলে একটা ঢেউ-এর মতই দেখাবে, সে ঢেউ-এর চেহারা হ'ল কথার ঢেউ-এরই মত। এই এ্যানোডের পথেই টেলিফোন বসানো চলে।

এইটিই হ'ল প্রথম প্রণালী। এখানে গ্রীডকে গোড়াতেই ঋণাত্মক ক'রে নেবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে সে যেন ঢেউ থেকে-আসা যাতায়াতি প্রবাহের পজিটিভ অংশের কথাই শোনে। পজিটিভ এবং নিগেটিভ দুজনের কথাই সমানভাবে শুনলে যাতায়াতি প্রবাহের অর্দ্ধেক ত কাটা পড়বে না। কিন্তু পজিটিভ অথবা নিগেটিভ, তাদের একজনের কথাই যাতে গ্রীড শোনে সেজন্য আর একটি উপায় করা যেতে পারে। সম্প্রসারণের মত এখানেও গ্রীডের কল ঠিক মাঝামাঝি খুলে রাখা হ'ল, যাতে পজিটিভ এবং নিগেটিভ দুজনেই এসে তার উপর সমান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু গ্রীডের উপর একজন প্রহরী বসান হ'ল যে দরকার মত শুধু পজিটিভ অথবা শুধু নিগেটিভ অংশকে বাতিল করে দিয়ে গ্রীডকে অন্যটির কথা শুনতে বাধ্য করবে। কিন্তু কে এই প্রহরীর কাজ করবে? শেষকালে এমন একজন প্রহরী পাওয়া গেল সে গ্রীডের উপর আগত পজিটিভ অংশকে বাতিল করে দেবে এবং নিগেটিভ অংশকে আরও নিগেটিভ হ'তে সাহায্য করবে। এই প্রহরী থাকার দরুণ গ্রীডের উপর যাতায়াতি প্রবাহ এলেও তার পজিটিভ অংশগুলি প্রহরীর আঘাতে বাতিল হয়ে যাবে। ফলে শুধু নিগেটিভ অংশগুলিই কার্য্যকরী হবে। তাই যে যে সময়টিতে পজিটিভ আসার কথা গ্রীডের উপর, সেই সেই সময়ে এ্যানোড স্রোত একেবারে অপরিবর্ত্তিত থাকবে। কিন্তু যে যে সময়ে নিগেটিভ অংশগুলি আসবে গ্রীডের উপর তখন এ্যানোড স্রোতের কমতি হ'তে থাকবে।

এই প্রহরীটি আর কেউ নয়—ইলেকট্রন। গ্রীডের উপর যাতায়াতি প্রবাহ এসে পড়লে সে ক্ষণে ক্ষণে পজিটিভ এবং নিগেটিভ হ'তে থাকে। পজিটিভের সঙ্গে। যে তাদের নিয়ে এলো তাকেই নির্ম্মূল করতে চায়! প্রথমবারেই কিন্তু সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারে না কিন্তু পজিটিভকে অনেকটা কাবু করে দেয়। এই প্রহরী ইলেকট্রনেরা পাহারা দেবার জন্য যাতে গ্রীডের উপরেই থেকে যায়, যাতে গ্রীড-জ্বালানি-তারজোড়া তার-কুণ্ডল বেয়ে জ্বালানি তারে ফিরে যেতে না পারে সেই জন্য গ্রীড থেকে জ্বালানিতার পর্য্যন্ত পথের মধ্যে একটি সংরক্ষক বসান হয়। আগেই বলা হয়েছে সংরক্ষকের ভিতর দিয়ে যাতায়াতি প্রবাহ বইতে পারে কিন্তু একমুখী স্রোত বইতে পারে না। কিন্তু এই প্রহরী ইলেকট্রনদের একমাত্র গন্তব্যস্থল হ'ল জ্বালানি তার। তাই এদের গতি হবে একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে—এরা একমুখী এবং সংরক্ষক পার হ'য়ে যেতে পারে না। কিন্তু ঢেউ থেকে পাওয়া যাতায়াতি প্রবাহ সম্বন্ধে এই সংরক্ষক পার হয়ে গ্রীডের উপর আসতে পারে।

এর পরে গ্রীডের উপর এলো নিগেটিভ্‌ অর্থাৎ কিছু ইলেকট্রন। কিন্তু সেখানে প্রহরী ইলেকট্রনেরাও ত রয়েছে, তাই গ্রীড্‌ হয়ে গেল আরও বেশী ঋণাত্মক। ফলে এ্যানোড্‌ প্রবাহ বেশ কিছু কমে যায়। দ্বিতীয়বার গ্রীড্‌ যখন পজিটিভ্‌ হ'ল তখন আবার সে ভালভ্‌ থেকে একদল ইলেকট্রন কুড়িয়ে নিলো। আর আগের প্রহরীরা ত রয়েছেই। এরা দু'দলে মিলে পজিটিভকে ঘায়েল করে দেয়। আবার গ্রীড যখন নিগেটিভ হবে তখন এই প্রহরীরাই সাহায্য করবে তাকে আরও বেশী নিগেটিভ্‌ হ'তে। এই রকম দু'একবার যেতে না যেতেই এত বেশী প্রহরী ইলেকট্রন জমা হ'য়ে যায় যে যাতায়াতি প্রবাহ থেকে পজিটিভ্‌ আসতে না আসতেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায় এবং শুধু নিগেটিভ্‌ অংশগুলি কার্য্যকরী হয়—তারা এ্যানোড্‌ স্রোতকে কমিয়ে দেয়। কিন্তু এই প্রহরী ইলেকট্রনদের নিয়ে একটা বিপদও আছে। যখন অনেক ইলেকট্রন জমে যায় গ্রীডের উপর, তখন তারা জ্বালানি তার থেকে যে সব এ্যানোড্‌ যাত্রী ইলেকট্রন বেরুচ্ছে তাদের সবাইকে নীচের দিকে ঠেলে দেয়, একটিকেও এ্যানোডে যেতে দেয় না। এ্যানোড প্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়! আমরা চাই একটানা এ্যানোড্‌ স্রোত যে যে সময়ে গ্রীড্‌ নিগেটিভ্‌ হবে সেই সেই সময়ে শুধু কমে যাবে। একেবারে বন্ধ হ'য়ে যাবে তাত আর আমরা চাই না। তাই প্রহরী ইলেকট্রনেরা যখন সংখ্যায় খুব বেশী হ'য়ে যায় তখন তাদের ফের জ্বালানি তারের ভিতরে তাড়িয়ে দিতে হবে। সেই জন্য গ্রীড্‌ থেকে জ্বালানি তার পর্য্যন্ত এমন একটি পথ তৈরী করে রাখতে হবে যে পথ দিয়ে ইলেকট্রনেরা যেতে পারবে শুধু তখনই যখন প্রহরী ইলেকট্রনদের সংখ্যা হ'য়ে যাবে প্রয়োজনের চাইতেও ঢের বেশী। গ্রীড্‌ এবং জ্বালানি তারকে সোজা-সুজি জুড়ে দেওয়া হ'ল এই রকম একটি বাধাপ্রাপ্ত পথ (Resistance) দিয়ে। এই পথের বাধা এত বেশী যে অল্প সল্প ইলেকট্রন ভয়েই এপথে

—ইথার ঢেউ আসার পূর্ব্বে এ্যানোড্‌ স্রোত

—ইথার ঢেউ আসার ফলে থেকে-থেকে কমে যাওয়া এ্যানোড্‌ স্রোত

—টেলিফোনের কাছে মনে হবে এ্যানোড স্রোতের কমতি অংশগুলি গায়ে গায়ে মিশে গিয়ে এক হয়ে' গেছে
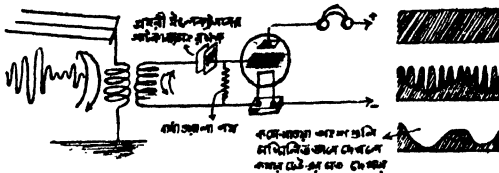
চিত্র নং ৩০

আমাদের প্রহরীর কাজ হ'ল পজিটিভ্‌ এলেই তাকে ঘায়েল করা। স্বরান্বিত যাতায়াতি প্রবাহ এসে পড়ল—গ্রীডের উপর। গ্রীড যখন প্রথম পজিটিভ হ'ল তখন সে জ্বালানি তার থেকে যে সব ইলেকট্রন বেরুচ্ছে তাদের সজোরে টান দেয়। তারা অনেকেই ছুটে যায় এ্যানোডে, কিন্তু কেউ কেউ আটকা পড়ে গ্রাডের জালে। এই আটকে-যাওয়া ইলেকট্রনেরাই আমাদের প্রহরী। তারা এসেই কাটাকাটি সুরু করল গ্রীডের উপরকার

যেতে চাইবে না—কিন্তু যখন তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায় তখনই শুধু তারা পথের বাধার প্রতি দৃক্‌পাত না করে কোনমতে ছুটে পালিয়ে যায় জ্বালানি তারে।

এই রকমে যাতায়াতি প্রবাহের পজিটিভ্‌ অংশগুলি বাতিল হ'য়ে যায় এবং নিগেটিভ্‌ অংশগুলির প্রভাবে এ্যানোড্‌ স্রোতে মাঝে মাঝে কমতি হতে থাকে। এ্যানোড প্রবাহের কমে-যাওয়া অংশগুলিকে সম্মিলিতভাবে দেখলে কথার ঢেউ-এর মতই মনে হবে। এই কথার ঢেউ-

এর মত ঢেউ-তোলা এ্যানোড্ স্রোত যখন টেলিফোন বা লাউড্ স্পীকারের ভিতর দিয়ে যাবে তখন শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

ইথার ঢেউ থেকে পাওয়া যাতায়াতি প্রবাহ যখন গ্রীড্-ফিলামেন্ট তার চলপথে যাওয়া-আসা করতে থাকে তখন তার জোর খানিকটা কমেই যায়। কারণ যে কোনও তারেরই বিদ্যুৎপ্রবাহকে বাধা দেবার খানিকটা ক্ষমতা আছেই। এই ইলেকট্রণ আনাগোনার ফলেই গ্রীড্ কেবল পজিটিভ্ ও নিগেটিভ্ এবং গ্রীড থেকে ইলেকট্রন সরে গেলে হয় পজিটিভ্। কিন্তু প্রবাহের জোরই যদি কমে যায়, তাহ'লে গ্রীডের নিগেটিভ্ ও পজিটিভ্ হওয়ার পরিমাণও কমে যাবে। তারই ফলে এ্যানোড্ প্রবাহের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে। চলপথে যে ক্ষয় হচ্ছে তা যদি না হ'ত, অথবা সেই ক্ষয় যদি পূরণ করা যেত তাহ'লে গ্রীড্ আরো বেশী নিগেটিভ্ ও পজিটিভ্ হতে পারে। কারণ তখন যাতায়াতির জন্য অনেক বেশীসংখ্যক ইলেকট্রণ যোগ দেবে। সেই সঙ্গে এ্যানোড্ প্রবাহের কমতি বাড়তিও অনেকখানি বেড়ে যাবে। ক্ষতিপূরণ করাও একরকম সম্প্রসারণ বই কি।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল কী করে এই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া যায়? প্রেরক যন্ত্রের বেলায় আমরা বলেছি গ্রীড্ পজিটিভ্, নিগেটিভ্ হ'তে থাকলেই এ্যানোড্ প্রবাহের বেশী-কম হ'তে থাকে। এই হ্রাসবৃদ্ধিওয়ালা এ্যানোড্ প্রবাহ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, ক্ষতিপূরণের জন্য। অনেক রকম ভাবেই এই সাহায্য গ্রীড্-ফিলামেন্টের চলপথে আমদানী করা যেতে পারে। একটি প্রণালীর কথা আমরা প্রেরক যন্ত্র প্রসঙ্গেই বলেছি। এ্যানোড্ স্রোতের পথে একটি তার-কুণ্ডল বসাতে হবে। এ্যানোডের পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ তার ভিতর দিয়ে ব'য়ে যায়। এ্যানোড্-কয়েলের ভিতর বিদ্যুৎ স্রোতের কমবেশী হওয়ার দরুণ কাছাকাছি গ্রীড্-ফিলামেন্টের চলপথে বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। এ্যানোডের তার-কুণ্ডলটিকে এমনভাবে রাখতে হবে (orientation in the correct sense) যাতে এই সঞ্চারিত বিদ্যুৎ প্রবাহ গ্রীডের আসল যাতায়াতি প্রবাহকে সাহায্য করে···অর্থাৎ সর্ব্বদা দুটিতেই যেন একদিকেই বয়। কিন্তু এ্যানোড-পথে তারকুণ্ডল না বসিয়ে আরও একরকম উপায়ে এ্যানোড-পথ থেকে গ্রীড ফিলামেন্টের-চলপথের সাহায্য আনা যেতে পারে। আমরা জানি যে পরিবর্ত্তনশীল বিদ্যুৎপ্রবাহ সংরক্ষকের ভিতর দিয়ে যেতে পারে। কাজেই হ্রাসবৃদ্ধিওয়ালা এ্যানোড স্রোত থেকে গ্রীডে দরকার মত সাহায্য আনা চলতে পারে শুধু একটি সংরক্ষক দিয়ে। সেজন্য এ্যানোড প্রবাহের পথ থেকে গ্রীড ফিলামেন্টের চলপথ পর্য্যন্ত একটি পথ তৈরী করে দিতে হবে—এই রাস্তাটি হবে শুধু একটি সংরক্ষক দিয়ে প্রস্তুত। এখানে একটি কথা বলা দরকার। প্রথম প্রণালীতে

চিত্র নং ৩১

সাহায্যের পরিমাণ কমানো-বাড়ানো যায় এ্যানোড কয়েল এবং গ্রীড্ ফিলামেন্টের চলপথের ভিতরকার দূরত্ব কম-বেশী করে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রণালীতে সংরক্ষকের আয়তন বাড়িয়ে কমিয়েই এই কাজ করা যেতে পারে। সংরক্ষকের বড়ছোটর উপর নির্ভর করবে সেই রাস্তা দিয়ে কী পরিমাণ শক্তি চালান করা যায়। সংরক্ষকটি ঠিক দরজার মত কাজ করে। দরজা বড় করে দাও, বেশী সাহায্য পাবে—দরজা ছোট করে দাও, সাহায্যের পরিমাণও কমে যাবে। তাই, যার আয়তন কম বেশী করা যায় এমন একটি সংরক্ষকই (variable condenser) ব্যবহার করতে হবে। তখন ছোট একটি ডালা ঘুরিয়েই (Dial of the condense) কাজ চালান সহজ হবে। ইংরাজীতে এই জাতীয় সাহায্যের নাম হ'ল Reaction অথবা Retroaction.

একটা কথা কিন্তু বিশেষ করে মনে করে রাখতে হবে। সাহায্যের পরিমাণ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে কিন্তু প্রেরক যন্ত্রের মত গ্রীড-ফিলামেন্টের চলপথে অবিরাম যাতায়াতি প্রবাহ সৃষ্টি হতে থাকবে। আর তারই আলোড়নে ইথার ঢেউ সৃষ্টি হবে এবং তারা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তখন আমাদের গ্রাহক যন্ত্রই প্রেরক যন্ত্রের মত কাজ করতে থাকবে। তবে এইসব ইথার ঢেউএর গায়ে কথা-বা-গানের পোষাক পরান থাকবে না—শুধু অবিরাম একটানা ঢেউ (continuous waves) সৃষ্টি হতে থাকবে। অবশ্য একটা ভরসার কথা আছে—এই ঢেউ খুব বেশী দূর যেতে পারে না। গ্রাহক যন্ত্রের শক্তি আর কতটুকু! তাই সে যে ঢেউ সৃষ্টি করে তার জোরও খুব বেশী নয়। কিন্তু কাছাকাছি কোন বাড়ীর গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে এরা বাধা ঘটাতে পারে সহজেই। তাতে গান-শোনা যে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই Reaction Receiver ব্যবহার করবার সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সাহায্যের মাত্রা যেন না ছাড়ায়।

গ্রাহক যন্ত্র সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা আমরা বলব। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইথারতরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। যে কেন্দ্রের গান আমরা শুনতে চাই সেখানকার বেতার ঢেউএর সঙ্গে আমাদের আকাশ তারের সুর বেঁধে দিতে হবে। শুধু আকাশ তার কেন, গ্রীড-ফিলামেন্ট তার চলপথটিরও সুর মিলিয়ে দিতে হবে। সুরবাঁধা না থাকলে ভালো কাজ পাওয়া যাবে না। আরও একটা কথা সুর মেলান থাকলে অন্যান্য কেন্দ্রের ইথার ঢেউগুলি এসে খুব সামান্য মাত্রই সাড়া তুলতে পারে আকাশ তারে। তাই সুর বেঁধে অবাঞ্ছিত ঢেউকে বাতিল করা যায়। তবে অসুবিধা হয় কাছাকাছি কোন বেতার প্রতিষ্ঠানের ঢেউকে নিয়ে। মনে করা যাক্ আমরা আমাদের গ্রাহক যন্ত্রটি নিয়ে কলকাতাকে বাদ দিয়ে দূরের অন্য কোন ষ্টেশনকে (যেমন দিল্লী প্রভৃতি) শুনতে চাই তাহ'লেই অসুবিধে ঘটবে। আমরা ত দিল্লীর বেতার ঢেউএর সাথে সুর বেঁধে নিলাম, কিন্তু কলকাতা কেন্দ্র থেকে যে সব ঢেউ বেরুচ্ছে তারা গ্রাহক যন্ত্রের অতি নিকটে বলেই তাদের তেজ থাকে সাংঘাতিক। তাই সেই ঢেউএর সঙ্গে সুরবাঁধা না থাকলেও কিছু না কিছু সাড়া সে তুলবেই আমাদের গ্রাহক যন্ত্রের ভিতরে—যদি দিল্লী এবং কলিকাতার ঢেউএর মাঝে খুব বড়ো রকম পার্থক্য থাকে। অথচ দূরের ষ্টেশনের সঙ্গে সুর মেলান থাকায় সেখানকার কথাও আমরা শুনতে পাব। ফলে দুজনে মিলে গোলমাল সৃষ্টি করবে, কাউকেই তার

করে শোনা যাবে না। তাই এমন উপায় বাতলাতে হবে যাতে করে নিকটের অথচ অবাঞ্ছিত ষ্টেশনের ঢেউ নিশ্চিতরূপে বাতিল হয়ে যায়। এইজন্ত একরকম ফাঁদ তৈরী হয়েছে (wavetrap)—তাদের বসিয়ে দেওয়া হয় আকাশতারের চলপথের মাঝখানে। প্রথমে যে ষ্টেশন আমরা শুনতে চাইনা সেই ঢেউকে প্রলুব্ধ করে ধরতে পারে, আমাদের ফাঁদটিকে এমন করে নিতে হবে। তার পরে সেই ঢেউ যখন এসে পড়ল আকাশ তারের উপরে তখন সে আটকা পড়ে যায় ঐ ফাঁদের ভিতর। ওরই ভিতর ঘুরে মরে, গ্রাহকযন্ত্রের গ্রীড পর্য্যন্ত আর পৌঁছতে পারেনা। এই ফাঁদটি কিন্তু একটি অতি সাধারণ বৈদ্যুতিক চলপথ—একে তৈরী করা হয়েছে একটি সংরক্ষকের সাথে তারকুণ্ডল জুড়ে। এর তারকুণ্ডল এবং সংরক্ষকের আয়তন অদল বদল করে এর সুর মিলিয়ে দিতে হবে সেই ঢেউএর সাথে, যাকে আমরা চাইনা। তাই অবাঞ্ছিত ঢেউ আকাশতারে এসে প্রথমে নির্ভয়ে চলতে সুরু করে এবং পথের মধ্যে নিজের সঙ্গে সুর মেলান আর একটি চলপথ (ফাঁদ) দেখে তার ভিতরে ঢুকে পড়ে। আর বেরুতে পারেনা। কেবল ওটুকুর মধ্যেই ঘোরাফিরা করতে থাকে। আর যে ঢেউকে আমরা চাই তার সংঘাতে যে যাতায়াতি ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে তারা
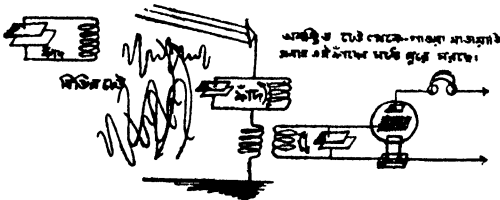
চিত্র নং ৩২

চলাচল করছে সমস্ত আকাশতারের পথ বেয়ে। তাদেরই প্রভাবে গ্রীড্ প্রভাবিত হচ্ছে এবং লাউড্‌স্পীকার সাড়া দিচ্ছে।

(৬)

প্রেরকযন্ত্রের মত গ্রাহকযন্ত্রেও আকাশতার জিনিষটি খুবই দরকারী। আকাশতার অবশ্য বাড়ীর ভিতরেও টাঙান যায়, তবে বাইরের তারই ভালো কাজ দেয়। সাধারণত তার খাটান হয় বাড়ীর ছাদে, দুটি মাস্তুলের সাহায্যে। এই তারের এক মাথা থেকে তার এনে জুড়ে দিতে হবে আকাশতার-চলপথের তার কুণ্ডলের একমাথার সঙ্গে, যার অপর প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হবে মাটিতে। এখানে মনে রাখতে হবে, মাটি কিন্তু বিরাট আকাশতার-রূপী সংরক্ষকেরই একটি ফলক। তাই এই মাটি-ফলক এমন হওয়া চাই যার উপরে ইলেকট্রনেরা সহজেই চলাফেরা করতে পারে। সচরাচর জলের পাইপ বিস্তৃত মাটির ভিতরে বসান থাকে। তাই সুবিধার জন্ত আমরা তারকুণ্ডলের অপরপ্রান্ত জলের পাইপের সঙ্গেই জুড়ে দিতে পারি।

শক্তিশালী গ্রাহকযন্ত্রের জন্ত আর একরকম ছোট আকাশতার ব্যবহার করা চলে যা সহজেই ঘরের ভিতরে রাখা যায়। এদের বলা হয় ফ্রেম-আকাশতার (Frame Aerial)। একটা চারকোণা ফ্রেমের উপর কয়েক পাক তার জড়িয়েই এই আকাশতার তৈরী করা হয়।

এই জাতীয় আকাশতারের একটা মজার গুণ আছে। তারা দিক্ নির্ণয় করতে পারে। যে দিক থেকে ঢেউ আসছে ফ্রেমটিকে যদি তার সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে (perpendicular to the direction of wave) বসানো যায়, তাহলে সেই ঢেউএর আঘাতে ফ্রেমের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হবেনা একটুও এবং তারই জন্ত গ্রাহকযন্ত্রের কিছু শোনা যাবে না। কিন্তু ফ্রেমটিকে যদি যে দিক থেকে ঢেউ আসছে তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে (parallel to the direction of wave) বসান হয় তাহ'লে কিন্তু সব চাইতে শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হবে এবং গ্রাহকযন্ত্রেও খুব জোর আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাবে। বিষয়টি জটিল হলেও মোটামুটিভাবে এর কারণ বলা যেতে পারে।
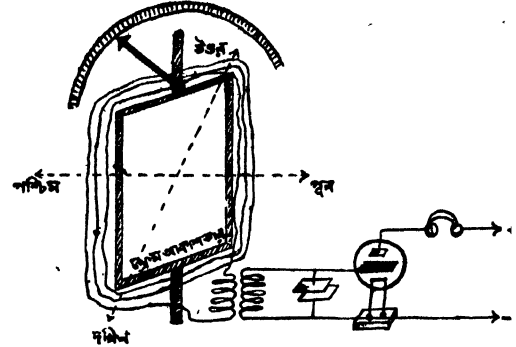
চিত্র নং ৩৩

ফ্রেমটি যখন ঢেউএর দিকে মুখ করে থাকে (perpendi ular to the direction of propagation), তখন ঢেউএর একই জায়গা ফ্রেমের ডানদিকের এবং বাঁদিকের, দুদিকের বাহুতেই লাগছে। যেমন দক্ষিণ বাহুতে যখন ঢেউএর চূড়া (crest) এসে লাগছে, বাঁদিকের বাহুতেও তখন সেই চূড়াই লাগছে। আবার ঢেউএর নীচু জায়গাটা যখন আসছে তখন দুদিকের বাহুতেই ঠিক একই সময়ে এসে লাগছে। তাই এই ঢেউ লেগে বাহু দুটিতে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে তার পরিমাণে যেমন সব সময়েই হবে সমান, তেমনি কোন দর্শকের চোখে তাদের চলবার দিক হবে বিপরীত। ডানদিকের বাহুতে যখন ইলেক্‌ট্রনেরা উপর বেয়ে উঠছে, বাঁদিকের বাহুতেও ইলেক্‌ট্রনেরা উপরেই উঠবে। তার ফল কিন্তু হবে মারাত্মক। প্রবাহ দু'টি দু'বাহু থেকে এসে ঠোকাঠুকি লাগবে এবং দুজনেই সমান শক্তিশালী হবার দরুণ, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে—কেউই থাকবেনা। গ্রাহকযন্ত্রেও কিছু শোনা যাবে না।

আবার যদি ফ্রেমটিকে ঢেউএর দিকে লম্বালম্বি (parallel) করে রাখা যায়, তাহ'লে ব্যাপার দাঁড়াবে অন্ত রকম। বাঁদিকের বাহুতে ঢেউ আগে এসে লাগবে। ডান দিকের বাহুতে যখন ঢেউএর চূড়া এসে লাগল বাঁদিকের বাহুতে তখন ঢেউএর অন্ত কোন জায়গা এসে লাগছে। তার ফলে দুই বাহুতে সৃষ্ট বিদ্যুতের পরিমাণ এবং দিক সমান হবে না। দুবাহুর প্রবাহ এসে কাটাকাটি করেও কিছু থেকে-যাবে। আর এই উদ্বৃত্ত প্রবাহের জোরেই গ্রাহকযন্ত্রে শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। ফ্রেমটিকে ঘোরাতে আরম্ভ করলে শব্দও কমতে সুরু করবে। শেষকালে ফ্রেমটিকে যখন ঢেউএর সাথে আড়াআড়ি করে রাখা হবে তখন শব্দ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।
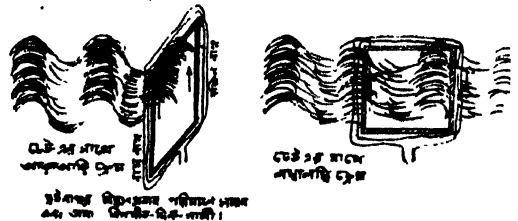
চিত্র নং ৩৪

এই তথ্যটি কাজে লাগিয়েই আজকাল যে কোন প্রেরক যন্ত্রের দিক্ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। যে বেতার কেন্দ্রের দিক্‌নির্ণয় করা প্রয়োজন

সে বেতার তরঙ্গ পাঠাতে থাকে। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার। এখন পর্য্যন্ত বড় বড় ঢেউ পাঠানর শক্তিসম্পন্ন প্রেরক যন্ত্রেরই দিক্‌নির্ণয় করবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। যে সব কেন্দ্র থেকে অতি ছোট ঢেউ (shortwave) পাঠান হয় তাদের দিক বার করা এই পদ্ধতিতে অসম্ভব। সে যাই হোক্, বেতার ঢেউ ত এলো। এখন ফ্রেমটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন অবস্থায় আমাদের নিয়ে আসতে হবে যাতে গ্রাহকযন্ত্রে আর কোন শব্দই শোনা না যায়। ফ্রেমের সেই অবস্থান দেখে সহজেই বলে দেওয়া যায় কোন দিক থেকে ঢেউ আসছে অর্থাৎ যে বেতার কেন্দ্রের দিক আমরা নির্ণয় করতে চাই সেটি কোন দিকে। কিন্তু আরও একটি বিষয় বিবেচনা করবার আছে। আমরা বলেছি ফ্রেমটি ঢেউএর সঙ্গে আড়াআড়ি হ'লেই শব্দ শোনা যাবে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। মনে করে নিই, আমাদের নির্ণেয় প্রেরক যন্ত্র রয়েছে কলকাতার ঠিক পশ্চিমে তখন আমাদের ফ্রেমটিকে ঘুরিয়ে ঠিক উত্তর-দক্ষিণ করে রাখতে হবে, যাতে সে ঢেউএর সাথে আড়াআড়ি ভাবে থাকতে পারে। কিন্তু ফ্রেমটিকে ঠিক ঐ অবস্থায় রেখেও, প্রেরকযন্ত্রকে যদি পশ্চিম দিকে না রেখে ঠিক পূর্ব্ব দিকে রাখা হত তাহ'লেও তার ঢেউ ফ্রেমের উপর আড়াআড়িভাবে এসে লাগত এবং কোন শব্দও শোনা যেত না। এখন প্রশ্ন হল পূর্ব্ব না পশ্চিম, কোন দিকে নির্ণেয় প্রেরকযন্ত্রটি রয়েছে? ফ্রেমের যে কোন অবস্থানের জন্যই ঠিক ১৮০ ডিগ্রি ব্যবধানে, দুটি স্থান নির্দ্দেশ করা যেতে পারে, তার যে কোন একটি স্থানেই প্রেরক যন্ত্র থাকলে কোন শব্দ শোনা যাবে না আমাদের দিক্‌নির্ণয়কারী গ্রাহকযন্ত্রে। এর প্রতিকার অবশ্য করা হয়েছে। কিন্তু সে এক জটিলতর অধ্যায়।

এই দিক্‌নির্ণয় প্রণালী বিমান চালনায় আজকাল খুব ব্যবহৃত হচ্ছে। ঝড় বৃষ্টি, কুয়াসা প্রভৃতিতে যখন দৃক্‌ভ্রম হয় তখন বেতারের দিক্‌নির্ণয় পদ্ধতি কাজে লাগে।

সূর্য্যের তেজে বাতাসের অণু-পরমাণুদের মধ্যে বড় গোলযোগ ঘটে। কেউ বা ইলেক্‌ট্রন হারিয়ে পজিটিভ কণিকায় পরিণত হয়, আবার কেউ বা ইলেকট্রন কুড়িয়ে নিগেটিভ হয়ে যায়। আবার কখনও শুধু ইলেক্‌ট্রনেরাই শূন্যে ঘুরে বেড়াতে থাকে। রাতের বেলা, সূর্য্য যখন থাকে না, তখন তারা যে যার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। এই ইলেকট্রন হারা এবং ইলেকট্রন পাওয়া পরমাণু স্তরের (Ionised layer) ভিতর দিয়ে যখন বেতার ঢেউ চলে যায়, তখন তারা ঢেউ থেকে খানিকটা শক্তি শুষে নেয়। তারই ফলে ঢেউএর জোর যায় কমে। কিন্তু রাতের বেলাতে এই অসুবিধা থাকে না। এই কারণেই দিনের চাইতে রাতে এবং গ্রীষ্মকালের চাইতে শীতকালে গ্রাহকযন্ত্রে ভালো আওয়াজ পাওয়া যায়। শীতকালে সূর্য্য গ্রীষ্মকালের চাইতে ঢের কম সময় আকাশে থাকে।

আমরা জানি প্রেরক যন্ত্র থেকে ইথার ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একদল যায় মাটির উপর দিয়ে। তাদের বলা যেতে পারে পায়ে-চলা (Ground waves) ঢেউ। আর একদল যায় শূন্যে, তাদের নামকরণ করা যেতে পারে উড়ে-যাওয়া-ঢেউ (sky-waves)। সাধারণভাবে বলা চলে, ইথারের ঢেউ লম্বায় যত বড় হবে, শব্দগ্রহণ হবে তত ভালো। ঢেউএর পায়ে চলা অংশ যাচ্ছে মাটির উপর দিয়ে। মাটি যদি তার চলার পথে কেবলই বাধা দিতে থাকে (offers Resistance) তাহ'লে তার জোর কমে যাবেই। দেখা গেছে শুকনো মাটিতে ঢেউএর চলতে খুব কষ্ট হয়। মাটি ভিজে হ'লে ভালো হয়। সমুদ্রের উপর দিয়ে চলতে তার খুব সুবিধা। তাই মাটির চাইতে সমুদ্রের উপর দিয়ে বেতার ঢেউ অনেক বেশীদূর অবধি শোনা যায়। অনেক সময়ে মেঘলা দিনের শেষে বেতার-যন্ত্রে খুব ভাল শব্দ পাওয়া যায়। তার একটি কারণ, মেঘে ঢাকা থাকায় সূর্য্য বাতাসের অণুমহলে তেমন কিছু বিপর্য্যয় ঘটাতে পারে না। আর একটি কারণ হ'ল, মাটি অপেক্ষাকৃত ভিজে থাকে।

বড় বড় ইথার ঢেউএ (Long and medium waves) পায়ে-চলা অংশই হ'ল প্রধান। কিন্তু ঢেউ লম্বায় যত ছোট হ'তে থাকে তার উড়ে যাওয়া অংশের পরিমাণও তত বাড়াতে থাকে। গোড়ায় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল, এই উড়ে যাওয়া অংশ পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েই উড়ে যায়। তাদের দিয়ে কোন কাজই হয়না তাই কর্ত্তৃপক্ষ সখের বেতার বিজ্ঞানীদের (Radio Amateurs) ছোট ছোট ঢেউ পাঠাতে সক্ষমকারী প্রেরকযন্ত্র নিয়ে (short wave Transmitters) কাজ করতে, পরীক্ষা করতে অনুমতি দিলেন। বড় ঢেউএ হাত দেওয়া তাদের নিষেধ। কিন্তু অবাক করল এই সখের বেতারবিজ্ঞানীরাই। তারাই দেখিয়ে দিল—ছোট ছোট ইথার ঢেউ দিয়ে কি করে অনেকদূরে, এমন কি এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে সঙ্কেত পাঠান যায়। আজকাল এর কারণ জানা গেছে। মাটি থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল উপরে ইলেক্‌ট্রন পাওয়া পরমাণুদের (Ionised layer) এক স্তর আছে। তাকে বলা হয় 'হেভি সাইড স্তর।' আয়নায় যেমন আলোক প্রতিফলিত হয়, বেতার ঢেউও তেমনি এই স্তরে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এই স্তর সমস্ত পৃথিবীকে একটা চাঁদোয়ার মত ঘিরে রেখেছে। ছোট ছোট ঢেউএরা যে পথে চলে, তার অনেকটাই পড়ে এই স্তরের মধ্য দিয়ে। আর এ স্তর বেয়ে যখন চলে তখন তাদের খুব কম শক্তি ক্ষয় হয়। তাই যে সব প্রেরক যন্ত্র থেকে ছোট ছোট ঢেউ পাঠান হয় তারা খুব অল্প শক্তি খরচ করেই অনেক দূরে ঢেউ পাঠাতে পারে। কিন্তু বড়-ঢেউ-পাঠান-যন্ত্রের শক্তি-ব্যয় ঢের বেশী হয়। সেখানে পায়ে চলা ঢেউই প্রধান—মাটির উপর দিয়ে চলতে তাদের শক্তি নষ্ট হয় অনেক।

চিত্র নং ৩৫
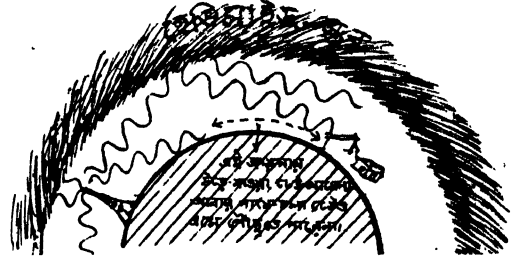
অনেক সময়ে কিন্তু এই হেভিসাইড স্তর ভালো কাজ দিতে পারে না। কখনও বাঁকা-চোরা হয়ে যায়। প্রতিফলন ঠিকমত হয় না। শব্দের জোরও কমে যায়। কখনও কখনও গ্রাহকযন্ত্রে শব্দ মিইয়ে (fadding) যায়। তার কারণ হ'ল হেভিসাইড স্তরের খামখেয়ালী। অনেক সময়ে পায়ে চলা ঢেউ এবং উড়ে-আসা ঢেউ—দু'ই এসে পড়ল গ্রাহক যন্ত্রের উপরে, কিন্তু বেতালে। তার জন্য শব্দের বিকৃতি ঘটে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে প্রেরক যন্ত্রের কাছাকাছি জায়গায় পায়ে চলা ঢেউই প্রধান। একটু দূরে অবশ্য দুজনেই থাকে। আবার এমন দূরত্ব আছে যেখানে পায়ে-চলা ঢেউ ক্ষ'য়ে যাওয়ার দরুণ এসে পৌঁছতে পারল না আবার প্রতিফলিত ঢেউও সেখানে আসে না। সে রকম স্থলে কোন শব্দই শোনা যাবে না। অবশ্য খুব দূরে আবার শুধু প্রতিফলিত ঢেউই কার্য্যকরী হয়, পায়ে-চলা ঢেউ সে পর্য্যন্ত যেতেই পারে না।

বৈদ্যুতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা হ'লে বাতাসে সাংঘাতিক বিপর্য্যয় ঘটে। নানা আকারের ইথার ঢেউ উৎপন্ন হ'তে থাকে। এই বিপর্য্যয়ের ফলে গ্রাহক-যন্ত্রে অনেক সময়ে বিশ্রী শব্দ হ'তে থাকে (Atmospheric) এবং এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া খুবই শক্ত।

বেতার বিচিত্র। এখানে তার মূলসূত্রগুলিই অতি সাধারণভাবে মাত্র আলোচনা করা হয়েছে। বেতারের কল্যাণে আজকাল শুধু কথা কেন, ছবি পর্য্যন্ত (Television) এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠান সম্ভব হয়েছে। ইউরোপীয় দেশের তুলনায় ভারতে এখনও বেতার বিজ্ঞানের তেমন প্রসার হয়নি। শিক্ষায়, আমোদে, প্রমোদে কত দিকে আজ বেতারের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। বেতার মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নিকটতম করে দিয়েছে। শেষ।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ

(প্রতিবাদ)

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘের (১৩৪৯) ভারতবর্ষে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ" শীর্ষক যে সভাপতির ভাষণ প্রকাশিত হয়েছে তাতে তিনি আমার স্বর্গগত পিতা ঔপন্যাসিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে এমন এক মন্তব্য করেছেন যার প্রতিবাদ করা আমি প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেছেন—

"সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের দুইটি সাহিত্যিক দল ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের দলে ছিলেন সুরেশ সমাজপতি, প্রিয়নাথ সেন প্রমুখ সাহিত্যিকগণ এবং অপরপক্ষে ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। তাঁদের এই বিরুদ্ধভাবের কারণ আমি সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু বিবাদের অনেক পরেও আমি চারুবাবুকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে দেখেছি। একবার ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা ৺দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটক অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলে চারুবাবুকে তাঁর মতামতের জন্যে আহ্বান করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন—"আমি দ্বিজেন্দ্রলালের বই পড়িনি—আমি ও বই পড়ব না।"

অধ্যাপক মজুমদার মহাশয়ের এই উক্তি পড়লেই মনে হয় যে আমার পিতা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। আর দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা তিনি পাঠ করতেও প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। পিতা অবশ্য রবীন্দ্রভক্ত-গোষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তিনি যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা, নাটক বা হাসির গানের সমাদর কিছু কম করতেন এমন মোটেই নয়। এর অনেক প্রমাণ আছে—যে কটি আমি লক্ষ্য করেছি বা পিতার কাছে শুনেছি তার কতকগুলি উল্লেখ করছি। সেই কটি প্রমাণ থেকেই বোঝা যাবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বা অন্যান্য রচনা তিনি পড়েনই নি বা পড়্‌বেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এই উক্তি ঠিক নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ অনার্স অথবা এম্-এ-তে কিছুকাল ধরে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগ্রন্থ "মন্দ্র" পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল ; আর তাও পিতা ঢাকা যাবার অব্যবহিত পরেই। অধ্যাপকদের যে সভায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয় সেই সভায় পিতা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁকে যখন অধ্যাপনার জন্য বই বেছে নিতে বলা হয় তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা', দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' প্রভৃতি কয়েকখানি বই অধ্যাপনার জন্য বেছে নেন। তারপর বিশেষ পরিশ্রম করে তিনি মন্দ্রের কবিতাবলীর টীকাটিপ্পনী তৈরী করেন। কবিতাগুলির মার্জিনে মার্জিনে বহু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ লিখেছিলেন তিনি। সেই টীকাটিপ্পনী সম্বলিত 'মন্দ্র' কাব্য-গ্রন্থখানি আমার কাছেই আছে। কবির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব থাক্‌লে তিনি নিশ্চয়ই ঐরকম পরিশ্রম করে 'মন্দ্র' বইখানি অধ্যাপনা করবার জন্যে তৈরী হতেন না, বা অধ্যাপনার জন্যে ঐ বই বেছেও নিতেন না।

মন্দ্রের তিনটি কবিতা পিতার বিশেষ প্রিয় ছিল। ১। সমুদ্রের প্রতি ২। তাজমহল ৩। সুখমৃত্যু। রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতা অধ্যাপনা করবার সময়ে তিনি জায়গায় জায়গায় উভয় কবির ভাব সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেছিলেন যে, "রবীন্দ্রনাথের বহু পূর্ব্বেকার রচনা হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের 'তাজমহল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মতন কল্পনাভঙ্গী দেখা যায়, ইত্যাদি। পিতার রবিরশ্মি নামক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিশ্লেষণগ্রন্থেও তিনি লিখেছেন—"তাজমহলের প্রথম প্রশস্তি রচনা করেন স্বয়ং শাজাহান।......

তাহার পরে কত কত লেখক তাজমহলের প্রশস্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইঁহাদের মধ্যে সার এডুইন আরনোল্ড, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম করা যাইতে পারে।

> সম্রাটের অনিমেষ ভালবাসা সম্রাজ্ঞীর প্রতি।
>
> —দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মন্দ্র।

স্মৃতি মন্দিরেই যে স্মৃতি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে না, সে কথা দ্বিজেন্দ্রলালও বলিয়াছেন।—

> কিন্তু যবে ধূলিলীন হইবে তুমিও
> কে রাখিবে তব স্মৃতি ? হে সমাধি ! চিরস্মরণীয় !"
>
> —রবিরশ্মি ২য় ভাগ পৃঃ ১৪০।

তিনি যখন 'মন্দ্র' অধ্যাপনা করছিলেন তখন যে সব ছাত্রেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তাঁদের কাছে তিনি অনেক সময়ে 'মন্দ্র' সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে যে-সব কথা বলতেন তার মর্ম এই—একবার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি কবিকে বলেন—আপনার নাটকের চেয়ে কবিতাই আমার বেশি ভাল লাগে। উত্তরে কবি বলেছিলেন—আপনার মত আরও দু-চারজন আমায় একথা বলেছেন। কিন্তু কবিতা লিখে আমি ত হাততালি পাই নে, হাততালি পাই নাটক লিখে। আসল কথা কি জানেন—আমাদের এদেশে ভাল কবিতা বোঝবার শক্তি আছে কজনের ? কিন্তু নাটক সবাই বুঝছে। তাই আমি একটার পরে একটা নাটক লিখে যাচ্ছি। আপনাদের মত কবিতার সমঝদার পেলে আমি কবিতা রচনাই ক'রতাম।

এ কথা থেকে বোঝা যাবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা তাঁকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে পিতা তাঁর সম্পাদিত "বঙ্গবীণা" নামক কবিতাসঙ্কলন গ্রন্থে (পুস্তকখানির ভূমিকা কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিত) লিখে গেছেন—দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের কবিতা ও হাসির গান, বহু নাটক বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কবিতায় বিস্ময়কর মিল করিবার ও বলিষ্ঠ ছন্দ রচনায় ইঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল।......

বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধীয় রচনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর "ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস" শীর্ষক বইয়ে বলেছেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁহার রঙ্গরচনার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার "ত্র্যহস্পর্শ" "আষাঢ়ে" বা গুটিকতক রহস্য গল্প, "প্রায়শ্চিত্ত" বা "বহুৎ আচ্ছা", "কল্কি-অবতার", "একঘরে", "বিরহ", "হাসির গান" প্রভৃতি পুস্তক সর্বজন-পরিচিত ও সর্বজন-সমাদৃত।......তাঁহার "মন্দ্র" নামক কবিতা পুস্তকের মধ্যেও কোনো কোনো কবিতার ঢং ও ভাষা রঙ্গপূর্ণ ও হাস্যজনক। —পৃঃ ১৩০

এ সব থেকেও বোঝা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক উৎসবে পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের আষাঢ়ে থেকে "হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা" আবৃত্তি করেছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলে একাধিকবার "বিরহ" নাটক অভিনীত হয়েছিল। অভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন পিতা স্বয়ং এবং আমাদেরই বাড়িতে অভিনয়ের রিহার্সাল হতো। অভিনয়ের রিহার্সাল হতে হতে দেখা গেল যে গোবিন্দর ভূমিকায় অভিনয় করবার মতো কোনো ভাল অভিনেতা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন স্থির হয় যে গোবিন্দর

ভূমিকা বর্জন করে—নাটকের যে যে অংশে গোলাপীর আবির্ভাব আছে সেই সেই অংশ বর্জন করে নাটকখানি অভিনয় হবে। তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন—"তোমরা নাটকের সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করবে দেখছি।" দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সাহিত্য-গৌরব নষ্ট হয় তা তিনি চাইতেন না—তাই এই উক্তি তিনি করেন।

পিতার বাংলা লাইব্রেরীতে "পাষাণী" "কল্কি অবতার" প্রভৃতি নাটক ছিল, এখনও আছে। "পাষাণী" নাটক—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জীয়াট, বলাগড় ১৩১৩—এই লেখা আছে।

নাটকের কথা নিয়েই অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার প্রতি পিতার শ্রদ্ধার অভাব ছিল। তিনি বলেছেন যে, ঢাকা যাবার পরও পিতার দ্বিজেন্দ্র-বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু তা যে নয় সে কথা উল্লিখিত প্রমাণগুলি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে আশা করি। ১৩১৩ সালেই তিনি পাষাণী নাটকখানি কেনেন এবং সেটা ঢাকা যাবার বহুপূর্বে। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা তার ভাল লেগেছিল—সেও ঢাকা যাবার অনেক আগে (প্রমাণ কবির সঙ্গে পিতার কথোপকথন)। আর ঢাকায় গিয়েও তিনি বিরহ নাটকের অভিনয়ে উৎসাহ দেন এবং ঐ নাটকের অভিনয়-শিক্ষকরূপে ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে বহু সন্ধ্যা অতিবাহিত করেন।

উত্তর

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি

ভারতবর্ষের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক শ্রীমান্ কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদটি আমার নিকট পাঠাইয়া জানিতে চাহিয়াছেন যে ইহার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে কিনা। ৺চারুবাবু আমার বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু ছিলেন—তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ কনক আমার স্নেহভাজন। এ ক্ষেত্রে ৺চারুবাবু সম্বন্ধে শ্রীমান্ কনকের সহিত বাদপ্রতিবাদ আমি বিশেষ অশোভন মনে করি।

৺চারুবাবুর যে উক্তিটি আমি উদ্ধৃত করেছিলাম সেটা শ্রীমান্ কনক সত্য বলে বিশ্বাস করেন না—স্পষ্ট না বললেও তাঁর লেখা থেকে সেই ধারণাই হয়। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে ৺চারুবাবু নিজে আমাকে এ কথা বলেছিলেন এবং তাঁর মত একনিষ্ঠ বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক ও সাধকের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের লোকপ্রসিদ্ধ নাটকগুলির সহিত ইচ্ছাকৃত পরিচয়ের অভাব আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল বলেই কথাটা আমার মনে আছে। অবশ্য এ বিষয়ে কোন দলিলপত্র নাই। আমার স্মৃতিশক্তি ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি যাঁরা সন্দেহ করবেন, তাঁদের কাছে লিখিত বা আর কোন প্রমাণ দিতে আমি অক্ষম। তবে সেই সময়ে এই কথাটা নিয়ে ঢাকার কোন কোন অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। তাঁদের এ বিষয়ে স্মরণ থাকলে তাঁরা হয়ত আমার কথার সমর্থন করবেন। তবে সেটাও মৌখিক প্রমাণ মাত্র।

অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি যে ৺চারুবাবুর বিদ্বেষ বা শ্রদ্ধার অভাব ছিল সেটা তাঁর ঐ উক্তি এবং কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য আলোচনা থেকে আমার অনুমান মাত্র। কারণ ও ছাড়া আমি অন্য কোন সঙ্গত যুক্তি দ্বারা ৺চারুবাবুর দ্বিজেন্দ্র নাটক সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করার অনিচ্ছার ব্যাখ্যা করতে পারি নাই। তবে শ্রীমান কনক যা লিখেছেন তাতে যদি কেউ মনে করেন আমার অনুমান ভুল তাতে আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের দুই ভক্ত দলের মধ্যে বিবাদের কথা যা আমি উল্লেখ করেছিলাম—সেটা যে আমার দূর অতীতের ছাত্র জীবনের ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র এবং সে সম্বন্ধে যে আমার বিশেষ কিছু জানা নাই সে কথা আমি সভাস্থলেই বলেছিলাম। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন সম্বন্ধে আমার ধারণা যে ভুল—সে কথা সভাস্থলেই একজন বলেছিলেন এবং সেটা যে সম্ভব তা আমি তখনই স্বীকার করি। কিন্তু ৺চারুবাবুর ৺দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে যে উক্তি সেটা খুব বেশীদিনের কথা নহে—এবং সে সম্বন্ধে আমার নিজের কোন সন্দেহ নাই।

জ্ঞানালোকে

অধ্যাপক শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এম্-এ

অন্তদৃষ্টি গেছে খুলি, হেরিলাম দৃশ্য অপরূপ—
যুগে-যুগে, কোটীরূপে জন্ম-মৃত্যুর নানা রঙ্গে,
এক আমি বহু হ'য়ে পৃথি'পরে ক'রেছি বিরাজ,
পিতা, পুত্র, পৌত্র সব এক হ'য়ে আছে মোর অঙ্গে।

লীলাময় বিধাতার অংশভূত "তুমি" হ'য়ে "আমি"
ভুলে যাই বারবার মহান্ সে সৃষ্টির রহস্য,
ভুলে যাই মানবতা, ডুবে যাই আমিত্ব সাগরে,
কর্ম্মফল স্রোতে ভেসে ভুলে যাই জীবন-উদ্দেশ্য।

ক্ষুদ্র-আত্ম-বুদ্ধি-বশে গ'ড়ে তুলি বিরাট প্রাচীর,
প্রতিষ্ঠার কামনায় তা'রি মাঝে জ্বলি অহর্নিশ ;
অতৃপ্তি ইন্ধনে পুড়ে পরাশান্তি হয় ভস্মীভূত,
দিকে দিকে উঠে শুধু পূতিগন্ধ স্বার্থ-বাষ্প বিষ।

অনাচার, মিথ্যাচার, পাণ্ডিত্যের বৃথা অহঙ্কার,
দর্প, দম্ভ, অভিমান, ঐশ্বর্য্যের পঙ্গু আস্ফালন
অন্তরের ধর্ম্মবুদ্ধি লুপ্ত করে অতলেরই তলে,
চিনেও চিনিতে নারে নরপশু অরূপ রতন।

কাণ্ডারী-বিহীন তরী লক্ষ্যভ্রষ্ট করে টলমল,
দিক্-ভ্রষ্টে এ অকূল সিন্ধুপারে কে করিবে পার—
ভীত-চিত্ত একদিন সেই প্রশ্নে উঠিল শিহরি,
ব্যাকুলিত হোল মন, আত্মা, প্রাণ সন্ধানে তাঁহার।

নব-জন্ম হোল তার গুরুপদে কৃপাকণা লভি,
সহসা শুনিল যাত্রী করুণাময়ের মাভৈঃ বাণী,
সুনির্ম্মল আনন্দ-লহরী মাঝে ডুবিল হৃদয়
ঘুচে গেল অন্ধকার, মুছে গেল সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(মৃত্তিকা)

পৃথিবী বাড়িতেছে।

দিনের পর দিন নদীব মোহনা-মুখে পলিমাটির স্তর পড়িতেছে আর ক্রমে ক্রমে সেই স্তরের উপর দিয়া সুন্দরবন প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই শেষ নয়। প্রয়োজনের ধারালো কুঠার দিয়া লোভী মানুষ বনভূমিকে করিতেছে সমভূমি—অরণ্যকে করিতেছে উপনিবেশ।

আবার ওদিকে যখন মেঘনার কালো জলে কল্ কল্ করিয়া ঘূর্ণী ঘুরিতে থাকে, আকাশে একপ্রান্তে এতটুকু একটু বৈকালী মেঘ দেখিয়াই বৈশাখী নদী ইলসা উদ্দাম হইয়া উঠে, তেঁতুলিয়ার মুখ দিয়া যখন পাহাড়ের মতো খাড়া হইয়া দুর্জয় বেগে 'শরের' জল ছুটিয়া আসে, তখনো সেই মৃত্যু-তরঙ্গের নিভৃত তলাটিতে বসিয়া জীবন-কীট অন্ধ প্রেরণায় রচনা করিয়া চলে। দেখিতে দেখিতে অতলস্পর্শ নদী গর্ভে ষ্টিমার কোম্পানীর লোক আসিয়া বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতিয়া যায়, রাত্রে সেই বাঁশের মাথায় লাল আলো মিট্ মিট্ করে, জানাইয়া দেয় এখানে বাঁও মিলিবে। আরো কিছুদিন পরে ভাঁটার সময় সেখানে মহাজনী নৌকার হাল আট্‌কাইয়া যায়, ইলিশ মাছের ডিঙ্গিগুলি লগি পুঁতিয়া অবসর সময়ে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লয়। তার পর আস্তে আস্তে সেই অথই জল ঠেলিয়া অতিকায় তিমির মতো একটা প্রকাণ্ড চড়া জাগিয়া ওঠে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে চড়ার নোনা ক্ষয় হইতে থাকে, আগাছা জন্মায়, তার পরে আসে মানুষ। অমনি সোনার কাঠির ছোঁয়াচ লাগিয়া যায় যেন। পৃথিবী বিস্তৃত হয়—নতুন মাটিতে নতুন নতুন ফল ও শস্য জন্মিয়া প্রয়োজনের ভাণ্ডারটিকে পূর্ণতার দিকে লইয়া চলে।

ইহাই উপনিবেশ। জাতি ভেদে নয়, দেশ ভেদেও নয়। সমগ্র পৃথিবী, সমস্ত সৌর-জগৎ, মহাকাশ ও মহাকাল ব্যাপিয়া এই উপনিবেশ রচনা হইয়া চলিয়াছে।

* * * *

অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা মনে পড়িতেছে।

নবাব আলীবর্দী তখন বাংলার সিংহাসনে। মাকড়সার জালের মতো ধীরে ধীরে ইংরেজের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি বাংলাময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর পলাশীর প্রান্তরে যে ঝড় একদিন করাল মূর্তি নিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, দিকে দিকে তাহারি নিঃশব্দ আয়োজন সুরু হইয়া গিয়াছে।

সেই সময় এবং তার বহু আগে হইতেই নিম্ন বাংলায় পর্তুগীজ জলদস্যুরা অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিল। এই 'আর্‌মাডা' বা হার্মাদদের ভয়ে তখন সমুদ্রের মুখে নদী-নালাগুলি এতটুকুও নিরাপদ ছিল না। এই পর্তুগীজের দল কেবল যে বড় বড় জাহাজ লইয়া সমুদ্রে বা নদীতে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত তাহাই নয়, সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর চরে তাহারা সুরক্ষিত অনেকগুলি কেল্লা তৈয়ার করিয়াছিল। বড় বড় তোপ পাতিয়া এই সব কেল্লাতে তাহারা শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিত, বোম্বেটে জাহাজে পাল তুলিয়া তাহারা গ্রামের উপর জমিদার বাড়ির উপর হানা দিত। তাহাদের সেই সমস্ত অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী ইতিহাসের বিবর্ণ পৃষ্ঠায় আর ক্ষীয়মান জনস্মৃতির উপরে আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে। এই পর্তুগীজদেরই স্মরণ-চিহ্নে চিহ্নাঙ্কিত তেঁতুলিয়ার মোহানায় চর ইস্‌মাইল!

অতীতকে ভুলিয়া যাওয়ার অশ্রান্ত সাধনার মধ্য দিয়াও চর ইস্‌মাইল সেদিনের কথা অনেকখানি মনে রাখিয়াছে। নোনা জল আর নোনা মাটির দেশ—ইটের দেওয়াল দু দিনেই জীর্ণ হইয়া আসে, তবুও পর্তুগীজদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজ অবধিও আত্মরক্ষা করিয়া আছে। চরের দক্ষিণ দিকের যে অংশটা নদীতে ভাঙিয়া নিয়াছে, মাত্র দশ বছর আগে আসিলেও ওখানে তাহাদের প্রকাণ্ড গীর্জার খানিকটা অবশেষ অন্তত দেখিতে পাওয়া যাইত। বালির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া একটা লোহার কামান দেখিয়া তাহাদের বল-বিক্রম আজিকার দিনেও খানিকটা অনুমান করিয়া লওয়া চলে।

চর ইস্‌মাইল।

আজ কিন্তু সেখানে মস্ত বাজার বসিয়া গিয়াছে। সরকারী ডাক্তারখানা, ডাকঘর—কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ছোটখাট একটি কাছারী। বাসিন্দা যাহারা, তাহাদের অধিকাংশই চট্টগ্রাম আর নোয়াখালি হইতে আসা একদল দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান, কিছু পরিমাণে মগ আর একদল জেলে।

কম করিয়াও এখন প্রায় দেড়হাজার মানুষের বসতি। সপ্তাহে একদিন খুব বড় করিয়া হাট বসে, আশে পাশের চরে বালাম ধান আর মহিষের বাথান লইয়াই যাহারা দিন গুজরাণ করে, এই একটি দিনে এখানে আসিয়া তাহারা প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অনেক কিছু কেনা-কাটা করিবার সুযোগ পায়। ধানের সময় এখানে আসে বড় বড় মহাজনী নৌকা—আশা করা যায় ব্যবসা বাণিজ্যের কিছু কিছু প্রসার ঘটিলে হয়তো বা আর-এস্-এন্ কোম্পানী এই পর্যন্ত একটা ষ্টিমারের লাইন খুলিলেও খুলিতে পারে।

কিন্তু এত করিয়াও চর ইস্‌মাইল সভ্য জগতের খুব কাছে আগাইয়া আসিতে পারে নাই। নদীর নিবিড় ও গভীর স্নেহ ইহাকে চারিদিক হইতে জড়াইয়া আছে। সে স্নেহের কঠিন বাহুপাশ হইতে ছিনাইয়া নিয়া সম্পূর্ণভাবে ইহাকে আত্মসাৎ করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

নদী—অশান্ত এবং চঞ্চল। জলের আস্বাদ যেমন আঁশ্‌টে, তেমনিই নোনা। ভাঁটার সময় আবার সে জলের রঙ নীলাভ

হইয়া আসিতে চায়। আর বিচিত্র বর্ণ-গন্ধ সমন্বিত সেই জল অন্তহীন বিস্তারে চর ইস্‌মাইলকে সমস্ত জগৎ হইতে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে বলিলেই চলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইহার সহিত বৎসরে মাত্র ছয় মাস পৃথিবীর সত্যিকারের যোগ-সূত্রটা বজায় থাকে। আশ্বিনের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ—সময় বলিতে ইহাই। যেই নদীর বুকের উপর হইতে কুয়াশার পর্দাটা একটু একটু করিয়া সরিয়া যায় আর চরের গায়ে এখানে ওখানে দু' চারটি করিয়া বুনো ফুল ফুটিতে সুরু করে, অমনি পাটির মতো শান্ত নদীটির চেহারা যায় বদ্‌লাইয়া। হয়তো চৈত্রের এক বিকালে আকাশের ঈশান কোণে কে একবিন্দু কালি ছিটাইয়া দেয়—আর তারপরেই গোঁ গোঁ করিয়া চাপা একটা কান্নার মতো শব্দ নদীর তলা হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসে। ক্রমে সেই শব্দটা বাড়িতে থাকে, বাড়িতেই থাকে—সঙ্গে সঙ্গে বাতাসেরও আগল খুলিয়া যায়। সেই তাণ্ডবে একবার পড়িলে এক গাছের শাল্‌তি নৌকাও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারেনা। আর ঝড় না উঠিলেই বা কী আসে যায়। তেঁতুলিয়া, মেঘনা, ইলসা কিংবা কালাবদরের মুখে যখন তখন যে এক একটা দমকা উঠিয়া আসিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে।

অতএব বৎসরে ছয় মাস চর ইস্‌মাইল নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া নদীর নিভৃত বুকের মধ্যে দিন কাটাইয়া চলে। কেবল ডাকের নৌকাই যা একটু যাতায়াত করে, কিন্তু তেমন তেমন প্রকৃতি-বিপর্যয় ঘটিলে তাও বন্ধ হইয়া যায়। সে সময়ে চর ইস্‌মাইল একটা অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো তার সভ্য এবং অর্ধ-সভ্য একদল মানুষ লইয়া নিজস্ব মহিমায় বিরাজ করিতে থাকে।

এমন একটি সময়ে সেই সব সভ্য ও অর্ধ-সভ্য মানুষদের লইয়াই এই কাহিনী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পর্তুগীজেরা আজ আর নাই।

তেঁতুলিয়ার জলে বোম্বেটে জাহাজগুলির ভাঙা দাঁড় আর হালের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কঙ্কালগুলিও লোপ পাইয়াছে। চরের দক্ষিণ দিকে বিলুপ্ত গীর্জাটার সঙ্গেই ছিল তাহাদের গোরস্থান। আজ সেখানে নোনা জলে তির তির করিয়া ছোট ছোট ঘূর্ণী ঘোরে।

তাহারা নাই কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের স্মৃতি যে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে সে কথাও বলা চলে না। এই চর ইস্‌মাইলে এখনো আট দশ ঘর পর্তুগীজ বাস করে। বাহির হইতে চট্ করিয়া দেখিলে তাহাদের চেনা কঠিন। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের মুসলমানদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক ঘটিয়া একটা বিচিত্র সঙ্কর জাতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহারা। পরে লুঙ্গি, কাণে গুঁজিয়া রাখে গোলাপী বিড়ি, পিতৃপুরুষের ভাষার শেষ অক্ষরটি পর্যন্ত চাটিয়া খাইয়াছে বলা চলে। কথায় কথায় কেবল মেরীর নামে শপথ করে এবং বিবর্ণ একটা ঘর্মসিক্ত কালো কারের সহিত গলায় ঝুলাইয়া রাখা একটা নিকেলের ক্রস্ তাহাদের ক্যাথলিক ধর্ম বিশ্বাসের পরিচয় দেয়।

আর বাড়তির মধ্যে যা আছে তাহা হইতেছে তাহাদের নাম। ইহাদেরই একজন ডি-সুজা সকাল বেলাতেই অত্যন্ত চীৎকার করিতেছিল। বোঝা যাইতেছিল লোকটা চটিয়াছে। বয়সের প্রভাবে সামনের তিনটা দাঁত ঝরিয়া পড়িয়াছে, কথার মধ্যে আসিয়াছে অনেকটা জড়তা। তাই কী সে বলিতেছিল সেটা ঠিক স্পষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু যে রকম অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করিতেছিল, তাহা হইতে ইহা বুঝিয়া লওয়া চলে যে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির প্রতি আপ্রাণ-চেষ্টায় গালিবর্ষণ চলিতেছে।

গালির চোটে অস্থির হইয়া পাশের বাড়ি হইতে জোহান বাহির হইয়া আসিল।

জোহানের বয়স অল্প। চেহারা দেখিয়া বোঝা যায় লোকটি সৌখীন। চুলটা কাঁধের উপর দিয়া বেশ করিয়া বাবরী করা, পরণে একটি ফর্সা পায়জামা। এই সাত সকালেই সে একমুখ পান লইয়া চিবাইতেছিল।

জোহান বলিল, কী হয়েছে ঠাকুর্দা, এই সকাল বেলাতে অমন ভাবে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

এমন মোলায়েম সম্বোধনেও কিন্তু ঠাকুর্দা খুসি হইল না, বরং আরো ক্ষেপিয়া উঠিল:

—চ্যাঁচাচ্ছি মানে? তুমি যেন এর কিছুই জানো না। ন্যাকা আর কি!

জোহান বিস্মিত হইল না, রাগও করিল না। সুস্মিত মুখে বলিল, আবার আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? কী হয়েছে ব্যাপারটা তাই খুলে বলো না?

—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। তুমি যে একেবারে গাছ থেকে পড়ছ, বলি আমার বড় রাওয়া মোরগটা গেল কোথায়?

—তোমার বড় মোরগটা? কেন, সেটার আবার কী হয়েছে?

—কী হয়েছে? দন্তহীন মুখটাকে ডি-সুজা বিকট রকমে ভ্যাংচাইল: সেটা তোমার পেটে গেছে কিনা সেই খবরটাই তোমার কাছে জানতে চাই।

জোহান বলিল, আমার? আমার পেটে গেছে একথা তোমায় কে বললে?

ডি-সুজা সরোষে কহিল, তবে কার পেটে গেল শুনি? মুরগী তো আর নিজে নিজে খোঁয়াড়ের দরজা খুলে বেরিয়ে আসিতে পারেনা।

এইবারে জোহানের চটিবার পালা।

—তাই বলে আমিই চুরি করতে গেলাম! চোরের অভাব আছে দেশে? ত্মাখো ঠাকুর্দা, তুমি বুড়ো মানুষ ব'লে কিছু বলছিনা, নইলে—

ডি সুজা ইহাতে ভয় তো পাইলই না, বরং আরো তিন পা আগাইয়া আসিল। বলিল, নইলে কী করতে, করতে কী, সেটা শুনি? তুমি তো পারো কেবল—একটা নিতান্ত অশ্লীল মুখখিস্তি করিয়া সে তাহার বক্তব্যটা শেষ করিল।

গেঞ্জির আস্তিন নাই, তবু অভ্যাস-বশে দুই হাতে খানিকটা কাল্পনিক আস্তিন গুটাইয়া জোহান সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল। বলিল, মুখ সামলে কথা কোয়ো ঠাকুর্দা। ভালো হবেনা বলছি।

ডি-সুজা আগুন হইয়া উঠিল। দুঃসাহসী পিতৃ-পুরুষদের রক্ত তাহার শিরা-উপশিরায় ফেনাইয়া উঠিয়াছে। অথবা জোহানের অপেক্ষা বয়সে খানিকটা বড় বলিয়াই হয়তো পূর্বগামীদিগের

সহিত রক্ত সম্পর্কটা তাহার নিকটতর। সেই মুহূর্তে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, রফা করা অপেক্ষা মারামারিটা বেশ করিয়া বাধাইয়া তোলার ইচ্ছাটাই তাহার অধিকতর প্রবল।

ডি-সুজা শাসাইয়া কহিল, তুইও মুখ সামলে কথা বলবি ছোঁড়া। নইলে—

কুরুক্ষেত্র-জাতীয় কিছু একটা হয়তো বা বাধিয়াই বসিত, কিন্তু বাধিলনা। পরিপাটি হইয়া আসা আয়োজনটির মধ্যে চট্ করিয়া একটা ছন্দপতন ঘটিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই ডি-সুজার সামনে কোথা হইতে একটি তরুণী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। সস্নেহে আল্‌গা একটি ধমক দিয়া বলিল, কেন পাগ্‌লামি করছ ঠাকুর্দা, তোমার চা হয়েছে, এসো।

ডি-সুজার গলার স্বর চড়া-পর্দা হইতে সেইমুহূর্তেই একেবারে অতি কোমল নিখাদে নামিয়া গেল। বলিল, কিন্তু আমার বড় মোরগটা—

মেয়েটি বলিল, আবার!

ডি-সুজা করুণ স্বরে বলিল, তুই কিছু বুঝিসনে লিসি—

লিসি বলিল, সব বুঝি। তোমার বড় মোরগটা শেয়ালে খেয়েছে, এসো তুমি।

মাথাটি নত করিয়া ডি-সুজা আস্তে আস্তে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল।

জোহান তখনও তেমনি করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া লিসি শাসনের স্বরে বলিল, ঠাকুর্দা না হয় বুড়ো মানুষ, কিন্তু তোমারও তো একটু মাথা ঠিক রেখে চলা উচিত ছিল।

অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে কী একটা তো তো করিয়া উত্তর দিবার আগেই লিসি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং খটাং করিয়া জোহানের নাকের সামনেই দরজাটা দিল বন্ধ করিয়া।

জোহান দাঁড়াইয়া রহিল তো দাঁড়াইয়া রহিলই।

খাসমহল কাছারীর নূতন তহশীলদার মণিমোহন পোষ্টাপিসে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখের ভঙ্গিতে অত্যন্ত প্রকট একটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছিল।

কাল রাত্রিতে টানা বৃষ্টি হইয়াছে এক পশলা। সেই বৃষ্টিতে সামনে খানিকটা গর্তের মতো জায়গায় এক হাঁটু জল এবং কাদা জমিয়াছে। মণিমোহন রবারের জুতা জোড়া খুলিয়া হাতে লইল, তারপর কোঁচার কাপড় হাঁটু অবধি তুলিয়া ছপছপ করিয়া সেই জল-কাদাটা ডিঙাইয়া সোজা পোষ্টাপিসে আসিয়া উঠিল।

পোষ্ট মাষ্টার হরিপদ সাহা তখন একহাতে হুঁকা লইয়া উবু হইয়া বসিয়া চিঠি সর্ট করিতেছিলেন। সকালের ডাক আসিয়াছে। মেজের উপর একরাশ চিঠিপত্র চারিদিকে ছড়ানো—পিয়ন কেরামদ্দি সেগুলি বাছিতেছিল আর পোষ্ট মাষ্টার একটু দূরে বসিয়া রেজিষ্ট্রি, বেয়ারিং ও মণি-অর্ডারগুলি আলাদা করিয়া লইতেছিলেন।

মণিমোহন জানালা দিয়া উদগ্রীব ও উদ্বিগ্ন চোখে চিঠি বাছাই দেখিতে লাগিল। ঐ যে একরাশ লম্বা লম্বা সরকারী খাম একপাশে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—ওগুলি নিশ্চয়ই খাসমহল আফিসের চিঠি। মণিমোহন ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নামে কোনো পার্সনাল চিঠি এসেছে মাষ্টার মশাই?

চোখ তুলিয়া চাহিয়া পোষ্টমাষ্টার বলিলেন পার্সনাল চিঠি? আপনার নামে? কই চোখে তো পড়লনা। একবার ভালো ক'রে দেখে দাও দিকি কেরামদ্দি।

দুহাতে চিঠির স্তূপগুলি ছড়াইয়া দিয়া কেরামদ্দি বলিল, না বাবু, নেই। যোগেশবাবুর নামে পোষ্টকার্ড এসেছে খালি একখানা।

—নেই? মণিমোহন মুহূর্তে বিষন্ন ও অন্যমনস্ক হইয়া গেল। আজ প্রায় সাতদিন ধরিয়া তাহার চিঠি আসিতেছে না। মাঝে একবার সে আদারে বাহির হইয়াছিল তিন চার দিনের মতো, ভাবিয়াছিল আসিয়া অন্তত চিঠিখানা সে পাইবেই। কিন্তু আজও চিঠি আসিলনা।

পশ্চিম বঙ্গের ছেলে, ওপারে বর্ধমান আর এপারে রাণাঘাট—ইহার বাহিরে আর কোনোদিন পা বাড়ায় নাই। চলিতে চলিতে দেখিয়াছে রেল লাইনের দু'পাশে মাঠ—ঘন সবুজ শস্যের ঐশ্বর্যে দিকে দিগন্তে রঙের সমুদ্রের মতো দুলিয়া উঠিতেছে। উঁচু বাঁধের পাশে পাশে কল্‌মি শাকে ঢাকা টুকরা টুকরা চিক্‌চিকে জল—দু দিকের প্রসারিত উদার সমতলের বুকে বিস্ময়ের মতো নিঃসঙ্গ বা শ্রেণীবদ্ধ তালের গাছ; আমের বাগানে ঘেরা বাঁশবনের ছায়ায় চাষাদের গ্রাম—পাকুড় প্যাসেঞ্জার, গয়া ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার বা নর্থ বিহার এক্সপ্রেসে বসিয়া যেগুলিকে নিতান্তই কাব্যময় ও স্বপ্নময় বলিয়া মনে হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে আরো অনেকের সঙ্গে এক ঝাঁকে বিএস্‌-সি পাশ করিয়া মণিমোহন আদাজুন খাইয়া জীবন সংগ্রামে ভিড়িয়া গেল। অবশ্য বাঙালীর জীবন সংগ্রাম বলিতে যা বুঝায় ঠিক তাই। সংগ্রামটা যে কাহার সঙ্গে করিতে হইবে আজ পর্যন্ত সেটা নিশ্চিত করিয়া বলা চলেনা। এ সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই—সফলতার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই—বাঁচিয়া থাকার একান্ত শক্তিহীন প্রয়াস: নো ভ্যাকান্সি, অবিশ্রান্তভাবে জুতার তলা ক্ষয় করিয়া চলা, স্তূপাকার দরখাস্ত, ফুটপাথের পাশে খড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকা জ্যোতিষীদের দিয়া হাত দেখানো, নবগ্রহ-কবচ এবং কখনো কখনো এক একটা টাকা খরচ করিয়া এক একখানা রেস্কোর্সের টিকেট্।

কিন্তু আর কিছু না থাক, অন্তত একটা ব্যবসা এখন পর্যন্ত খোলা আছেই। ব্যবসা না বলিয়া বরং লটারী বলিলে অর্থটা পরিষ্কার। ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী নয় বটে, কিন্তু লোভ, লাভ এবং লভ্ এইখানেই যা হোক খানিকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া যায়।

অতএব চাকুরী জুটিবার আগেই মণিমোহন বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু শাস্ত্রে আছে, "স্ত্রী ভাগ্যে ধন"—এবং এই সার্থক উক্তিটি প্রমাণ করিবার জন্যই শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের এই সুদূরতম প্রান্তে মণিমোহনের চাকুরী লাভ ঘটিল।

এখানে আসিয়া মণিমোহন এই সত্যটা সকলের আগে অনুভব করিল যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের প্রশস্ত ধানক্ষেতের বাহিরে পৃথিবীর আর একটি রূপ আছে। সে রূপ মানুষকে নিতান্ত মুগ্ধ করেনা—দিকে দিকে রাক্ষসীর মতো করালজিহ্বা বিস্তৃত করিয়া সে ফুঁসিয়া ওঠে—গর্জন করিয়া ওঠে। সে মূর্তির দিকে তাকাইলেও বুকের ভিতরটা আতংকে থর থর করিয়া দুলিতে থাকে।

কিন্তু এই রাক্ষস-মূর্তির যে ভয়ঙ্কর ক্ষুধার্ত সৌন্দর্য, তাহাকে উপভোগ বা অনুভব করিবার মত দৃষ্টি বা অনুভূতি আজও এই মণিমোহনদের আসে নাই। যেদিন আসিবে, সেদিন হয়তো জীবন-সংগ্রাম কথাটার সমস্ত অর্থটাই যাইবে বদলাইয়া। আগুন-মুখার যোলো মাইল পাড়ির মুখে আকাশ ঘিরিয়া কালো মৃত্যুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা হয়তো সত্যকারের জীবন সংগ্রামের ইঙ্গিতটাকে খুঁজিয়া পাইবে। হয়তো দেখা যাইবে বৈশাখী বিপ্লবের সর্বনাশী মুখোসটাকে খুলিয়া ফেলিল; তাহার পশ্চাতে এক নবীন রূপ আসিয়া উঁকি মারিয়াছে—বজ্রের প্রখর আলোকে তাহার মাথার রক্ত-মুকুট জ্বলিতেছে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া।...

পোষ্টমাষ্টার হরিদাস সাহা আতিথেয়তায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন যে! আসুন না ভেতরে, একটান তামাক খেয়ে যাবেন।

মণিমোহন আমন্ত্রণটা উপেক্ষা করিল না। ভিতরে ঢুকিয়া সে কাঠের একখানা টুল টানিয়া লইয়া বসিল; তারপর পোষ্টমাষ্টারের হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া কহিল, চিঠি কেন এলনা বলুন দেখি?

পোষ্টমাষ্টার রসিকতার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, গিন্নীর চিঠি বুঝি? তা ভয় নেই ম'শায়, আমরা লুকিয়ে রাখিনি। বয়েস গেছে, বুঝলেন না?

মণিমোহন হাসিল, কারণ না হাসাটা এ ক্ষেত্রে অশোভন। তবুও হাসিটা তাহার তেমন দানা বাঁধিল না।

পোষ্টমাষ্টার মণিমোহনের মুখভাবটা লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর ও গভীর হইয়া উঠিলেন। লোকটি হাঁপানির রোগী। বুকের হাড়গুলি কালো চামড়ার তলায় জিল্ জিল্ করে—সেই কারণে চামড়াটাকে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল দেখায়। গলায় কালো সুতার সঙ্গে শাদা একটা কড়ি বাঁধা, ডান হাতে রূপার তারের মধ্যে নানা আকারের একরাশ তামার কবচ।

যতক্ষণ তিনি হাসেন, কালো মুখটা তবু একরকম দেখায়। কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মানুষের ভয় করে। মনে হয়, বহু দিনের কাল-সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়া বর্তমানের ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইয়াছে লোকটা। এই সাগরের উপর দিয়া যে সব ঝড় বহিয়া গেছে—তাহাদের ঝাপটা তাহাকে একেবারেই এড়াইয়া যায় নাই। কপালের কুঞ্চিত রেখা-সমষ্টিতে, বুকের জিরজিরে হাড়গুলিতে আর কাঁধের উপরকার প্রকাণ্ড একটা ক্ষতচিহ্নে অনেক ইতিহাস অব্যক্ত হইয়া আছে।

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, এখন তো তবু দু' তিন অন্তর চিঠি পত্তর আসে, আর একটা মাস গেলে হয়তো দশ-বারো দিন, চাই কি পুরো এক মাসই ডাক বন্ধ থাকবে।

মণিমোহন ভীত হইয়া কহিল, কেন?

—ডাক আসবে কী ক'রে, বলুন? নদীর অবস্থা তো দেখেছেন। একবার ক্ষেপে উঠলে কারও সাহস আছে না সাধ্য আছে এর ভেতর নৌকো ভাসায়? এক পারে কিছু কিছু মগেরা, কিন্তু ও ব্যাটাদের বিশ্বাস কী বলুন? গলা কেটে মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিলে তো মা বলতেও নেই, বাপ বলতেও নেই।

মণিমোহন হুঁকাটা নামাইয়া বলিল, কিন্তু আমি তো ভাবছিলুম চৈত্র মাসে একবার কিছুদিনের ছুটি নিয়ে—

—দেশে যাবেন, এই তো? কিন্তু সেগুড়ে বালি মশাই, সেগুড়ে বালি। এতো আর আপনাদের দেশ নয় যে মর্জিমাফিক এক সময় রেলগাড়িতে চেপে বসলেই গড়গড়িয়ে নিয়ে দেশে পৌঁছে দেবে। এ বড় কঠিন ঠাঁই, এখানে ভগবানের মর্জির ওপরেই নির্ভর ক'রে থাকতে হয়। তার ওপর মাঝিই পাবেন না বোধ হয়। বেশ কিছু টাকা কবুলিয়ে যদি বা একখানা নৌকো জোটাতে পারেন, কিন্তু তাতে চড়ে পাড়ি জমানো আপনাদের মত মানুষের কাজ নয়।

মণিমোহন আরো বিবর্ণ হইয়া কহিল, কেন নৌকো ডুববে নাকি?

—তা কি আর সব সময়ে ডোবে? এ দেশের মাঝিরা অমন কাঁচা নয়। নৌকো ডুববার আশঙ্কা দেখলে তারা পাড়িই ধরবে না।

—তা হলে আর ভয়টা কিসের?

—সেইতো বলছিলুম। জাহাজে চেপে সমুদ্দুরে পাড়ি দিয়েছেন কখনো?

—না তো।

—ব্যাপারটা বুঝবেন না তবে। সমুদ্রের রোলিং জানেন তো? বেশি দূর যেতে হবে না, বরিশাল থেকে চাটগাঁর ষ্টিমারে একটিবার ঘুরে এলেই টের পাবেন। এ হচ্ছে সেই জিনিস—যার অনিবার্য ফল হচ্ছে সী-সিক্‌নেস্ এবং একমাত্র ওষুধ হচ্ছে লেবুর আরক। কিন্তু নোয়াখালির মাঝিদের নৌকোয় তো আর চামড়ার কৌচ কিংবা লেবুর আরক পাবেন না।

মণিমোহন বিস্ফারিত চোখে বলিল, নদীতেও কি সে-রকম রোলিং হয় নাকি?

—হয় না? আর নদীই বা আপনি কোথায় দেখছেন মশাই? নদী আর সমুদ্দুরে কি এখানে কি কোন তফাৎ আছে? জল একবার মুখে দিয়ে দেখবেন, মেসিনের সাহায্যে চেষ্টা করলে এ দিয়ে লবণ তৈরি করা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ আর চর ইস্‌মাইল, আসলে এরা পুরাপুরি এক জাতের—বুঝেছেন? শ্রাবণ-ভাদ্দরের আগে এ রোলিং আর থামবে না।

—আপনি এই রোলিঙের ভেতর পাড়ি দিয়েছেন কোনবার?

পোষ্টমাষ্টার নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিলেন। তাঁহার মুখের উপর দিয়া মেঘের মতো কালো একটা ছায়া যেন বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার কোটরে-বসা চোখ দুইটা যেন অনেকদিনের ঘুমন্ত স্বপ্নাচ্ছন্নতা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। এই মুহূর্তে মনে হয়, বহুদিনের মহাকাল-সমুদ্র পার হইয়া স্তূপাকার অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি যেন মণিমোহনের সামনে অপরিচিতের মত আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—দিইনি আবার? বছর পোনেরো আগে সে অভিজ্ঞতা একবার আমার হয়েছিল। তারপর থেকেই এই সব সীজ্‌নে নদী পাড়ি দেবার দুঃসাহস আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমিও ঢাকা জেলার ছেলে মশাই, পদ্মা নদীর সঙ্গে সঙ্গে মিলে মিশে বেড়ে উঠেছি, জলের ভয়টাকে তেমন বিশেষ মনেও করিনা। কিন্তু সেবারের সে ব্যাপারে আমারও বুকটা দশ হাত দমে গেছে।

তা হ'লে ঘটনাটা বলি শুনুন। আমি তখন মনপুরায় ছিলুম।

সে জায়গাটাও ঠিক এই রকম—একেবারে নির্বান্ধব পাণ্ডববর্জিত দেশ যাকে বলে। বাড়তির মধ্যে সেখানে একরকম কুকুর পাওয়া যায়—সমস্ত বাংলা দেশে সে কুকুরের জোড়া নেই। নেকড়ে আর বন-কুত্তোর ব্রিডিং, বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর, গ্রে হাউণ্ডের চাইতেও বিশ্বাসী। এরই এক জোড়া কুকুর আমি সেবারে কিনেছিলুম।

চৈত্রের শেষ—বুঝতেই তো পারেন, সময়টা কেমন। অর্থাৎ কথায় কথায় যখন কাল-বোশেখী ঘনিয়ে আসে, ঠিক সেই সব দিন। বহুকষ্টে একখানা নৌকো জোগাড় ক'রে দুর্গা ব'লে এক সকালে ভেসে পড়লুম। সঙ্গে সেই কুকুর জোড়া।

পান্‌সী চলতে লাগল। নদীতে অল্প অল্প বাতাস—প্রথমটা তো ভালই লাগছিল, ভাবলুম, এমনিই চলবে, "মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।"

কিন্তু মশাই, কলির সন্ধ্যে তখনো আসেনি। এল যখন, নৌকো ডাঙা ছাড়িয়ে তখন প্রায় মাইল চারেক এসে পড়েছে। নৌকো ঘন ঘন দুলতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল, গা বমি বমি করতে লাগল, তারপর চোখ বুজে নৌকোর খোলের ভেতর সোজা হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়লুম।

না, ঝড় আসেনি। আকাশের কোন প্রান্তেও দেখা দেয়নি একটুকরো কাল কিংবা সোনামুখী মেঘ। কিন্তু অর্থই অন্তহীন নদীর বুক থেকে হু হু ক'রে বাতাস উঠে এল—একটু মলয়-পবন বলা যেতে পারে। সে বাতাসের তালে ফুলে উঠল অসংখ্য ঢেউ—আর নৌকোটা একবার শাঁ ক'রে ঠেলে আকাশে, আর একবার সোজা পাতালে নেমে যেতে লাগল।

দুদিনের পাড়ি। কিন্তু পুরো দেড়দিন আমার একরকম জ্ঞান ছিলনা বললেই চলে। নৌকো ডুববে কি ডুববেনা সে ভাবনা ভাববার সময় ছিল না, কেবল থেকে থেকে অস্পষ্টভাবে এই চেতনাটাই মাথার ভেতর ঘা মারছিল যে এই দুলুনির চোটেই আমার সোজা স্বর্গলাভ ঘটবে। বড় বড় জাহাজের ওপর চেপেও মানুষ যার ধাক্কায় হিমসিম খেয়ে যায় মশাই, এতটুকু একখানা পান্‌সীর ভেতর তার অবস্থাটা কী রকম দাঁড়ায় না বললেও সেটা টের পাচ্ছেন আশা করি।

সেই বাঘা-কুকুরদের একটাকে তো নদীর মধ্যেই ফেলে দিতে হয়েছিল, আর একটাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ডাঙ্গায় এসে যখন পৌঁছুলুম, তখন তারও জীবনী-শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোনোমতে সেটাকে বাড়িতে নিয়ে গেলুম, কিন্তু বাঁচলনা, দু' তিন দিন পরেই মরে গেল। আর আমি! সে-ধকল সামলাতে পুরো দশটি দিন বিছানাসই হয়ে থাকতে হয়েছিল, বুঝেছেন!

পোষ্টমাষ্টার কাহিনীটি শেষ করিলেন।

মণিমোহন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া অবস্থাটা কল্পনা করিতে লাগিল। বলিবার ক্ষমতা আছে পোষ্টমাষ্টারের। চোখ মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলোড়ন পর্য্যন্ত তাঁহার বর্ণনাটাকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। যে কোন ঘটনাকেই বিশ্বাস করাইয়া দেওয়ার একটা অদ্ভুত প্রতিভা তাঁহার আছে—তাই বহুক্ষণ ধরিয়া মণিমোহনের মনের সাম্‌নে দিগন্তব্যাপী বিরাট নদীর রোলিঙের দৃশ্যটা যেন ছবির মত ভাসিতে লাগিল।

খানিক পরে বড় করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল সে। বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিটা মেলিয়া দিয়া বলিল, কাল সকালেই চলে' যাচ্ছি আদায় করতে। ফিরতে বেশ কিছুদিন দেরী হবে। এর ভেতর পিয়ন পাঠিয়ে খবর নেব—চিঠি এলে তার হাতে দিয়ে দেবেন।

পোষ্ট মাষ্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা। কিন্তু এবার কোন্ দিকে বেরোবেন?

—ভাবছি, কালুপাড়ার দিকে নামব। অনেক টাকা বকেয়া পড়ে' রয়েছে—তা ছাড়া—টি-এ বিলটাও বেশ—বুঝলেন না?

পোষ্টমাষ্টার মৃদু হাসিলেন। তা আর বুঝিনে মশাই। ওই করেই তো ইংরেজ রাজত্ব চলছে।

আজ্ঞে হাঁ—মণিমোহন হাসিয়া বিদায় লইল। ক্রমশঃ

অপূর্ণ

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

জীবনের পথ মিশেছে সুদূর পারে,
সীমার মাঝেতে অসীমের রূপ পেলা;
সে পথে চলিতে কত বাধা বারে বারে,
তার পর দেখি ফুরায়ে এসেছে বেলা।

এসেছে কতই নব আশা, ভালবাসা,
জীবনের মাঝে কত কি যে অনুরাগে;
বৈশাখী ঝড়ে ভেঙেছে পাখীর বাসা,
সেই স্মৃতি আজো মাঝে মাঝে মনে জাগে।

সীমা রেখা দেখি মাঝ পথে প'ড়ে যায়,
সহসা যে নেভে জীবনের দীপ-শিখা;
পূর্ণতা—সে ত কভু না মিলিবে হায়,
ভাবী যাহা সে ত মায়া আর মরীচিকা।

অপরাজিতা

শ্রীকৃষ্ণপ্রভা ভাদুড়ী

প্রভাত বেলায় উঠিস্ ফুটে
কোমল লতার বক্ষপুটে
কাহার তরে থাকিস্ চেয়ে নির্নিমেষে দিক্ ভুলে
নীলনয়না সরমে তোর, মরম উঠে উচ্ছ্বলি।

গোলাপ যূথী চাঁপা বেলা
চায়না তোরে করে হেলা,
ভোম্‌রা বধূ চায়না ফিরে পরাগ মধু যায় ঝরে।
কার ধেয়ানে উন্মনা তুই রূপসী তুই কার তরে।

তোর পরাণের গোপন কথায়
অভিমানের শতেক ব্যথায়
তরুণ উষার অরুণ-রাঙ্গা বক্ষে উঠিস্ গুঞ্জরী
ওরে আমার অনাদৃতা অপরাজিতা সুন্দরী।

চল্‌তি ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশ-জার্মান সংগ্রাম

বিগত একমাসের রুশ-জার্মান সংগ্রাম একাধিক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। লাল ফৌজের সৃষ্টির পঞ্চবিংশতম বার্ষিকীর প্রাক্‌কালে যে বিরাট বিজয়ের মধ্য দিয়া লাল ফৌজ গৌরবজনক সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহা শুধু অতীত নাৎসী অভিযানের গৌরবকে ম্লান করিয়া

ব্রিটীশ জঙ্গী বিমান কর্তৃক কলিকাতা অঞ্চলে বিধ্বস্ত প্রথম জাপানী বোমারু

দেয় নাই, সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ১৯৪১ সালে নাৎসীবাহিনী কর্তৃক রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় তাহাদের রণকৌশল ও দ্রুত অগ্রগতি সারা পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ১৯৪২-৪৩ সালে রুশ আক্রমণাত্মক অভিযান সেই নাৎসী রেকর্ডকেও বহু পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। একদিকে লাল ফৌজ যেমন একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সহিত দখল করিয়া চলিতেছে, অপরদিকে তেমনই নাৎসী-রণপদ্ধতি তথা এক উন্নত ধরণের যান্ত্রিক যুদ্ধকে বেদনাকর ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিয়া দিয়াছে। যে সংখ্যাগুরু সৈন্য ও সমরোপকরণের সমাবেশে, পদাতিক ও যান্ত্রিক বাহিনীর বিশেষ সন্নিবেশে, বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায়, নাৎসী বাহিনী প্রায় সমগ্র ইয়োরোপ উল্লেখযোগ্য তৎপরতার সহিত অধিকার করিয়াছে, তাহার সেই সকল কৌশল ও নৈপুণ্য প্রথম ও চরমভাবে ব্যর্থ হইল রুশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে। সংগ্রামের প্রারম্ভে সংখ্যালঘু রুশসৈন্য নাৎসী সমরসম্ভার অপেক্ষা সংখ্যাল্প রণসম্ভারের সাহায্যে কোন্ রণপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া হিটলারের রুশ বিজয়ের স্বপ্নকে রূঢ় আঘাতে ভাঙিয়া দিয়াছে সে আলোচনা আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর একাধিক সংখ্যায় করিয়াছি। রুশিয়ার নৈসর্গিক বাধাই যে নাৎসী অভিযানের বিফলতার জন্য দায়ী এই অভিমতের মধ্যেও যে কতখানি অসারতা আছে 'ভারতবর্ষ'-এর গত ফাল্গুন সংখ্যায় আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

বিগত চারি সপ্তাহে লাল ফৌজ সমগ্র রণাঙ্গনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়াছে। রষ্টোভ, ভরোশিলভগ্রাদ, কুর্স্ক এবং খারকভ রুশবাহিনী কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে। এই প্রতিটি অঞ্চল অধিকারের মধ্যে রুশিয়ার সৈন্য পরিচালন পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু স্থান দখল করা নহে, নাৎসী বাহিনীকে বেষ্টন করিয়া তাহার উৎসাহদানই যে প্রধান লক্ষ্য, জেনারেল জুকভের অভিযান পরিচালনা প্রসঙ্গে 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যায় তাহা আলোচিত হইয়াছে। রুশিয়ার এই অভিনব পরিকল্পনায় দক্ষিণ রণক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত হইয়াছে। আর্মাভির এবং টিখোরেটস্ক হইয়া মজদক হইতে রষ্টোভের দূরত্ব ৩২০ মাইলের অধিক। মজদক হইতে অগ্রসরমান রুশবাহিনী যখন আজভ সাগর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে তখন সেই বাহিনীর একাংশ পরিচালিত হইয়াছে রষ্টোভ অভিমুখে। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য—দক্ষিণ দিক হইতে রষ্টোভকে বিচ্ছিন্ন করা। অপরদিকে স্ট্যালিনগ্রাড হইতে দুইটি বাহু রষ্টোভকে পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া অধিকার করিয়াছে। এদিকে নভোরসিস্ক অভিমুখেও রুশ বাহিনী অগ্রসর। নাৎসী বাহিনীর কার্চ প্রণালী পার হইয়া পলায়ন বন্ধ করিবার জন্য রুশ-বাহিনী তামানে অবতরণ করিয়াছে। এই অঞ্চলে আড়াই লক্ষের উপর সৈন্য রুশ বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়াছে। লাল ফৌজের অপর একটি বাহু স্ট্যালিনো হইয়া ট্যাগানরগ অভিমুখে অগ্রসর। কিন্তু রষ্টোভের পতনের পূর্বে রুশ সৈন্যের এই বাহু ট্যাগানরগে পৌঁছিতে না পারায় জার্মান বাহিনীর কতকাংশ এই পথে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইউক্রেনের রাজধানী খারকভও রুশবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। খারকভের আক্রমণ জার্মান বাহিনীর নিকট অপ্রত্যাশিত অঞ্চল হইতে আসিয়াছে বলা যায়। রুশ বাহিনী কর্তৃক খারকভ পূর্বদিক হইতে আক্রান্ত হইবে এই অনুমানই স্বাভাবিক, কিন্তু ভরোনেশ হইতে

লাল ফৌজের একটি বাহু বিয়েলগরোজ হইয়া উত্তর দিক হইতে খারকভ আক্রমণ করে। সেই সঙ্গে স্ট্যালিনো অভিমুখে অগ্রসরমান রুশ সৈন্যের একাংশ ঘুরিয়া আসিয়া ইউক্রেনের রাজধানীকে আক্রমণ করে দক্ষিণ দিক হইতে। উভয়দিক হইতে এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে খারকভের দ্রুত পতন হয়। এই একই সমর কৌশলে লাল ফৌজ কুর্স্ক অধিকার করিয়াছে।

রষ্টোভ ও খারকভ অধিকারের গুরুত্ব যথেষ্ট। ডন নদীর মোহানায় অবস্থিত রষ্টোভ বন্দর রাজপথ ও রেলপথের এক বিরাট সংযোগস্থল। দ্বিতীয়ত সিঙ্গাপুর যেমন ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে দ্বারস্বরূপ, রষ্টোভ তেমনই ককেশাশে প্রবেশের সিংহদ্বার। রষ্টোভ রুশ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ফলে হিটলারকে ককেশাশের তৈলখনি-লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এতদ্ব্যতীত, রষ্টোভ অধিকৃত হওয়ায় ট্যাগানরগ অভিমুখে অগ্রসরমান লাল ফৌজ পূর্বদিক হইতে জার্মান আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল। রষ্টোভস্থ লাল ফৌজ বর্তমানে নিপ্রোপেট্রোভস্ক এবং ট্যাগানরগ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ফলে জার্মান বাহিনীর শীতকালীন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হারাইবার আশঙ্কা আসন্ন। এতদ্ব্যতীত যে জার্মান বাহিনী ক্রমান্বয়ে একের পর এক দেশ অথবা অঞ্চল অধিকার করিয়া বিজয়লাভেই অভ্যস্ত হইয়াছিল, এই শোচনীয় ক্রম পরাজয় তাহাদের নৈতিক শক্তির মূলে আঘাত হানিবে কিনা তাহাও বিবেচ্য।

মধ্য এবং উত্তর রণাঙ্গনেও রুশ বাহিনী বিশেষ তৎপর। রুশ বাহিনী দক্ষিণ দিক হইতে ওরেল অভিমুখে অগ্রসর। ভেলিকিলুকি যে রুশ বাহিনী কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে সে সংবাদ 'ভারতবর্ষ'-এর গত সংখ্যাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, মোঝাইস্ক-এর পশ্চিমে রুশ বাহিনী অতর্কিত অভিযান পরিচালনা করিয়াছে। আমাদের মনে হয় লাল ফৌজের লক্ষ্য স্মোলেন্স্ক। স্মোলেন্স্ক-এর মামুলি
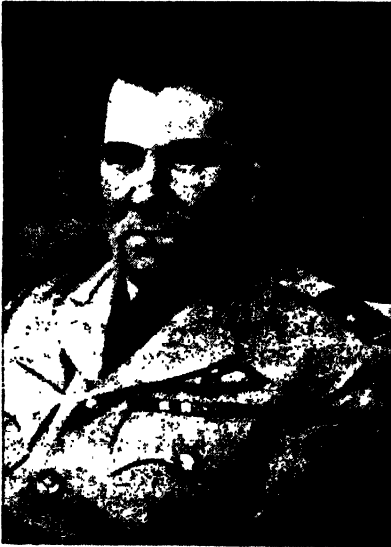
বঙ্গদেশের নবনিযুক্ত এয়ার অফিসার কমাণ্ডিং
মিঃ টি, এম্, উইলিয়মস্

গুরুত্ব যথেষ্ট। ভেলিকিলুকি হইতে যদি রুশ সৈন্যের একটি বাহু রজেভ্‌কে পূর্বে রাখিয়া দক্ষিণে ভিয়াজমা হইয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলে খারকভের ন্যায় স্মোলেন্স্কও যে অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হইয়া রুশ অধিকারে আসিবে শুধু তাহাই নয়, উক্ত অঞ্চলস্থ জার্মান বাহিনীরও অবরুদ্ধ হইবার গুরুতর আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। ব্রিয়ানস্ক হইয়া লাল ফৌজের অপর একটি বাহুর ওরেলকে উত্তর-পশ্চিম হইতে আক্রমণ করার সম্ভাবনা বর্তমান। সুদূর উত্তরে লেনিনগ্রাদ হইতে ভেলিকিলুকি, স্মোলেন্স্ক, ব্রিয়ানস্ক, কুর্স্ক এবং খারকভ হইয়া ট্যাগানরগ পর্যন্ত যদি রুশ পুনরধিকারের সীমানা বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জার্মান বাহিনীর পক্ষে নূতন করিয়া নীপার নদীর তীরে আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ রচনা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ব্রিয়ানস্ক, কুর্স্ক এবং খারকভ হইতে লাল-ফৌজের তিনটি বাহুর কিয়েভ অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু এই অভিযানের বিলম্ব আছে। বর্তমানে রুশিয়ার বরফ গলিতে শুরু করিয়াছে এবং এই কর্দমাক্ত জমি যতদিন না শুষ্ক হইবে ততদিন গুরুভার সমরোপকরণ পরিচালনা দ্বারা যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। শীঘ্রই আমরা রুশ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির মধ্যে শৈথিল্যের সংবাদ পাইব, কিন্তু তাহা জার্মানীর প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য নহে, অথবা রুশ যোদ্ধ্‌গণের অক্ষমতাও ইহার জন্য দায়ী নহে—রুশিয়ার গলিত তুষারই ইহার জন্য দায়ী। রুশিয়ায় বসন্তের আবির্ভাবের এখনও বিলম্ব আছে। বসন্ত সমাগমে রুশ যুদ্ধের গতি কোন্ খাতে প্রবাহিত হইবে ভবিষ্যতে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

টিউনিসিয়ার সংগ্রাম

উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংবাদ সৈন্যাধ্যক্ষের পরিবর্তন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করেন যে, জেনারেল আইসেনহাওয়ার উত্তর আফ্রিকার রণক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আফ্রিকাস্থ অষ্টম বাহিনী থাকিবে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের আজ্ঞাধীন। আইসেনহাওয়ারের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে জেনারেল আলেকজাণ্ডারকে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের বিমান বাহিনীর অধিনায়কেরও পরিবর্তন করা হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলের বিমান সেনাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছেন—ভাইস্ মার্শাল টেড্‌ডার।

রণক্ষেত্রে সৈন্যাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তন যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহা 'ভারতবর্ষ'-এর পাঠকগণের নিকট অবিদিত নাই। রণনীতির মধ্যে কোন গুরুতর পরিবর্তন করিতে হইলে, অথবা পূর্ব নিযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষদের যোদ্ধ্‌ পরিচালনার মধ্যে কোন মারাত্মক ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে অথবা অনুরূপ কোন গুরুত্বপুণ কারণে সৈন্যাধ্যক্ষদের পরিবর্ত্তন করা হয়। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে যে একাধিকবার সেনানায়কগণ অপসৃত হইয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জেনারেল রোমেলের পশ্চাদপসরণ প্রসঙ্গে কোন্ মূল্যে মিত্রশক্তির বিজয়লাভ হইয়াছে এবং জেনারেল রোমেলের পশ্চাদপসরণের মধ্যে কতখানি সামরিক নৈপুণ্য বর্ত্তমান 'ভারতবর্ষ'-এর গত ফাল্গুন সংখ্যায় আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। কোন্ কারণে উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে সৈন্যাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে সামরিক কারণে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তবে উন্নততর রণপদ্ধতির প্রয়োজন ও রণনীতির পরিবর্তনের উদ্দেশ্য যে ইহার মধ্যে নিহিত আছে তাহা স্পষ্ট। এই পরিবর্তন সাধনের পর সংগ্রামের মধ্যেও যে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে ইহাতেই সৈন্যাধ্যক্ষ অদলবদলের প্রয়োজন প্রমাণিত হইয়াছে।

'ভারতবর্ষ'-এর গত ফাল্গুন সংখ্যায় জেনারেল রোমেলের সম্ভাব্য প্রতিরোধ সম্বন্ধে আমরা যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অক্ষশক্তির সৈন্য সমাবেশ ও রণকৌশল সম্বন্ধে আমরা যে উপায় অবলম্বন রোমেল কর্ত্তৃক সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, জেনারেল রোমেল কর্ত্তৃক সেই পন্থাই গৃহীত হইয়াছে। সুদীর্ঘ পুনরুল্লেখের

বাহুল্য বর্জন করিয়া আমরা সংক্ষেপে বলিতে পারি যে, ম্যারেথ লাইনের পূর্বাংশে অষ্টমবাহিনীকে বাধা প্রদান জেনারেল রোমেলের উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব এবং মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীকে বিচ্ছিন্নভাবে বাধা প্রদানের সঙ্কল্পই রোমেলের পক্ষে অনুকূল এবং স্বাভাবিক। কোন্ উপায়ে ইহা সম্ভব এবং উভয় যুযুধান রাষ্ট্রের ইহাতে সুবিধা এবং অসুবিধা কি, বর্তমান সংখ্যায় তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য। মিত্রপক্ষ হইতে অবশ্য জানান হইয়াছে যে, জেনারেল রোমেল কর্তৃক মার্কিন ও অষ্টম বাহিনী বিচ্ছিন্ন রাখিবার প্রয়াসকে ব্যর্থ করা হইবে।

জেনারেল আইসেনহাওয়ার কর্তৃক অষ্টম বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবার পরও প্রথম কয়েক দিন যুদ্ধ বিশেষভাবে অক্ষশক্তির অনুকূলে গিয়াছে। চক্রশক্তি কর্তৃক ফেরিয়ানা, স্বিত্‌লা এবং কাসেরিন অধিকৃত হয়। গাসফা অধিকৃত হয় ইহারও পূর্বে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের সমর সচিব মিঃ স্টিম্‌সন্ প্রদত্ত বক্তৃতায় জানা যায় যে, টিউনিসিয়ায় মার্কিন বাহিনীর গুরুতর বিপর্যয় হইয়াছে। সংখ্যাগুরু অক্ষশক্তির ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণের ফলেই এই বিপর্যয়। সম্প্রতি প্রকাশ, প্রথমে এই ক্ষতি যত অধিক বলিয়া মনে করা হইয়াছিল বর্তমানে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট কম বলিয়া বোধ হইতেছে।

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যভাগ হইতে যুদ্ধ মিত্রশক্তির অনুকূলে আসিয়াছে। অষ্টম বাহিনীর অগ্রবর্তী সৈন্যদল মেদেনিনএ উপস্থিত হইয়াছে। ম্যারেথ লাইনের পুরোভাগ হইতে মেদেনিন্‌এর দূরত্ব কিঞ্চিদধিক ২৫ মাইল। কাসেরিন গিরিপথ মিত্রবাহিনী কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে। শেষ সংবাদে প্রকাশ, মিত্র সৈন্য কাসেরিন সহর অধিকার করিয়াছে। পশ্চাদপসরণকারী অক্ষবাহিনী ফেরিয়ানা ও গাসফা অভিমুখে সরিয়া যাইতেছে। পূর্বদিকে অবশ্য অপর একটি পথ আছে। পথটি গিয়াছে ফৈদ পর্যন্ত। তবে সম্ভবতঃ স্বিবা হইতে পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদল এই পথ অবলম্বন করিয়া ফৈদ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

কিন্তু যুদ্ধের এতাদৃশ অবস্থা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে টিউনিসিয়ার যুদ্ধ এখনও প্রবলভাবে আরম্ভ হয় নাই। বিগত আট সপ্তাহের অধিক কাল এই যুদ্ধ ধীর গতিতে অত্যন্ত একঘেয়ে ভাবে চলিতেছিল। রণক্ষেত্রের প্রাকৃতিক আবহাওয়া অবশ্য ইহার জন্য খানিকটা দায়ী। বৃটিশ সমর-সচিব কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রবল বৃষ্টি এবং প্রতিকূল আবহাওয়াই সমস্ত পণ্ড করিয়া দিয়াছে। অন্নের জন্য মিত্রবাহিনী এখনও টিউনিসিয়া দখল করিতে পারিল না। কিন্তু সমর সচিবের উক্তির মধ্যে কিছু লবণ সংযোগ করা প্রয়োজন। নৈসর্গিক অবস্থা যে শুধু মিত্রবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নয়, অক্ষবাহিনীও এই প্রতিকূল আবহ হইতে রেহাই পায় নাই। রুশিয়ার শীত যেমন রুশ ও জার্মান উভয় পক্ষীয় সৈন্যের উপরই আপন শৈত্য বর্ষণে কার্পণ্য করে নাই উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে বৃষ্টিপাতও তেমনই শুধু মিত্রবাহিনীর বাধা সৃষ্টির জন্য বর্ষিত হয় নাই। বর্ষা কাটিলে এবং জমি কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে যে যুদ্ধের বেগ বর্দ্ধিত হইবে ইহা আশা করিতে পারা যায়। অক্ষ শক্তির সৈন্য পরিচালনা ও সমাবেশ হইতে অনুমিত হয় যে, আসন্ন প্রবল সংঘর্ষের প্রধান অংশ ঘটিবে উপকূল ভাগে। টিউনিসিয়ার প্রধান সংগ্রামে ভূমধ্যসাগরের নৌশক্তিকেও যে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে ইহা সুনিশ্চিত। এই যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য অন্যান্য রণাঙ্গনের ন্যায় জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সমন্বয় প্রয়োজন; অক্ষশক্তি এই ত্রিসমন্বয়

ব্রিটিশ এয়ার-ক্রাফ্‌ট্ কেরিয়ার "ইলাসট্রিয়াস্" সুসংস্কৃত হইয়া পুনরাক্রমণে উদ্যত হইয়াছে

ঘটাইবার জন্য কোন্ পন্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং তাহাতে মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তির সুবিধা ও অসুবিধা কি—সে সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই 'ভারতবর্ষ'-এর ফাল্গুন সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

সুদূর প্রাচী ও ভারতবর্ষ

বেশ দীর্ঘকাল যাবৎ প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ-যোগ্য সংঘর্ষ ঘটে নাই। কিন্তু সেই কারণে জাপান নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া আছে মনে করিলে ভুল হইবে। মিত্রশক্তির চাপে ও মার্কিন নৌবাহিনীর সহায়তায় গুয়াদালকানার হইতে জাপবাহিনী অপসৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে তাহার মুষ্টি শিথিল হইয়াছে মনে করা সঙ্গত হইবে না। অষ্ট্রেলিয়ার বিপদও পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পায় নাই। মিঃ কার্টিন যে একাধিকবার অষ্ট্রেলিয়ার আক্রমণাশঙ্কা সম্বন্ধে ও মিত্রশক্তি কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে অবহিত হইবার জন্য মিত্রশক্তির নিকট আবেদন জানাইয়াছেন তাহা অযৌক্তিক নহে। টিমর, লে, রাবাউল প্রভৃতি ঘাঁটিগুলিতে জাপান আপনাকে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিউগিনির উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব উপকূল এবং নিউ বৃটেনের দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া জাপানীরা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন সন্নিবিষ্ট অঞ্চল দখল করিয়াছে। টিমর হইতে সলোমন্‌স্ পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল দীর্ঘ সমুদ্রাঞ্চলে জাপান যে সূত্রগ্রথিত পুষ্পহারের ন্যায় অসংখ্য ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এই অসংখ্য ঘাঁটি অষ্ট্রেলিয়াকে উত্তর-পশ্চিম হইতে উত্তর হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব পর্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়াছে বলা চলে। স্বভাবতই অষ্ট্রেলিয়ার বিপদাশঙ্কা ইহাতে যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে।

চীন দেশেও জাপ অভিযান পুনরায় শুরু হইয়াছে; এই অভিযানকে ব্যাপকভাবে পরিচালনা করাই জাপানের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। একই সময়ে একাধিক প্রদেশে জাপ অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। হুপে, কিয়াংসি, কিয়াংসু ও কোয়ানটাং প্রদেশে জাপ অভিযান শুরু হইয়াছে বেশ প্রবলভাবে। মধ্যচীনের উত্তরাঞ্চলে ও দক্ষিণ চীনে যুদ্ধ গুরুতর অবস্থা পরিগ্রহ করিয়াছে। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে হাইনান দ্বীপের

উত্তরে ফরাসী উপনিবেশ কোয়াং চোআন্-এ জাপসৈন্য অবতরণ করিয়াছে। মধ্য হুপে প্রদেশে যুদ্ধ চলিয়াছে পোশি-হাওয়ান-এর নিকট। এই অঞ্চলে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনাকালে বহু জাপসৈন্য হতাহত হইয়াছে। কিয়াংসি প্রদেশে আক্রমণকারী জাপসৈন্যদল চীনাবাহিনীর প্রবল চাপের মুখে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্তে মাংপান এবং তামানলাং-এর নিকট প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে।

চীনের প্রতি জাপানের এই হঠাৎ অতি-মনোযোগ প্রথমে অতর্কিত বোধ হইলেও আদৌ অস্বাভাবিক নয়। চীনে ব্যাপক অভিযান পরিচালনার জন্য জাপানের পক্ষে ইহাই উৎকৃষ্ট সময়। খাদ্যাভাবে চীনের বহু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, আধুনিক সমরোপকরণের একান্ত অভাব। মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক একাধিকবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সমরোপকরণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। মার্শাল জানাইয়াছেন —শতকরা দশভাগ রণসম্ভার পাইলে শতকরা একশত ভাগ রণসম্ভারের উপযোগীভাবে তাহাকে ব্যবহার করা হইবে। কিন্তু মার্শালের প্রার্থিত সমরসম্ভার আজও চীনে আসিয়া পৌঁছে নাই। জাপান জানে, আমেরিকা হইতে চীনে সমরোপকরণ প্রেরণ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। খাদ্যের অভাব, সমর সম্ভারের অপ্রাচুর্য, একাধিক রণাঙ্গনে সংখ্যাগুরু জাপসৈন্যের যুগপথ আক্রমন চীনাবাহিনীর নৈতিক শক্তির মূলে যদি আঘাত হানিতে পারে জাপান এই আশা পোষণ করে। এই একই উদ্দেশ্যে নানকিং সরকারের সহিত সে আলোচনা চালাইয়াছে। তাঁবেদার সরকারকে কিছু সুবিধা প্রদান করিয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত চীনা বাহিনীর মানসিক শক্তিকে হীনবল করাই তাহার লক্ষ্য। চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে জাপানের পক্ষে চীনে ব্যাপক অভিযান পরিচালনার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়। অবশ্য জাপানের উদ্দেশ্য সফল হওয়া আদৌ সহজ নয়। মার্শাল চিয়াং-এর অধীনে দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল ধরিয়া যে স্বাধীনতাকামী সৈন্য এবং গরিলাবাহিনী জাপানের প্রচণ্ড অভিযান ও নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঘাত হানিয়া চলিয়াছে তাহাদের নৈতিক শক্তি অত ভঙ্গুর নয়, অর্থ বিনিময়ে তাহা ক্রয় করাও অসম্ভব। দারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অখণ্ড মহাচীন তাই আজও জাপ আক্রমণকে শুধু প্রতিহত করিয়াই নিরস্ত হয় নাই, আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করিয়া আধুনিক সামরিক জগতের প্রথম শ্রেণীর শক্তি জাপানকে বহু স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাহাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে। কিন্তু চীনের এই অতি প্রয়োজনীয় ও সঙ্কটজনক মুহূর্তে মিত্রশক্তির সত্বর কার্যকরী সাহায্য প্রদান একান্ত আবশ্যক। ইয়োরোপের রণাঙ্গনে অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি যেমন অত্যন্ত প্রয়োজন, সুদূর প্রাচীতে মার্শাল চিয়াংকে সামরিক সাহায্য প্রদানও তেমনই ক্রমশঃ অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছে।

আরাকান অভিযানকারী মিত্রবাহিনীর সংবাদও বহুদিন আমাদিগকে পরিবেশন করা হয় নাই। বুথিয়াডং এবং রথেডং-এ মিত্রশক্তির যে আক্রমণ চলিয়াছিল প্রায় দুইমাস পূর্বে আমরা সেই সংবাদ-লাভ করিয়াছিলাম। বুথিয়াডং বর্তমানে মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পর দীর্ঘকাল যাবৎ এই রণাঙ্গনের কোন সংবাদই আমরা পাই নাই। কোন অপ্রত্যাশিত কারণে যে এই অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত হইয়াছে তাহাও নহে, কারণ তাহা হইলে সে 'সংবাদ সামরিক সংবাদ পরিবেশন বিভাগ' হইতে আমাদিগকে জানান হইত। কোন প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্যও এই অভিযান সম্প্রতি বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। এই অভিযান সম্পর্কে কোন সংবাদ অপ্রকাশিত রাখিবার মত সামরিক কারণ উপস্থিত হইয়াছে কিনা আমরা জানিনা, তবে মধ্যে-মধ্যে উক্ত রণাঙ্গন সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা লাভ করি তাহা শুধু সংক্ষিপ্ত নয়, একেবারেই সামান্য। নূতন কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য অভিযান পরিচালনার সংবাদও আমরা লাভ করি নাই। ব্রহ্মের একাধিক জাপ ঘাঁটিতে মিত্রপক্ষের বিমান হইতে বহুবার বোমা বর্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থল বাহিনীর অগ্রগতি ঠিক উহার সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয়। অবস্থা দৃষ্টে জাপানের আত্মরক্ষামূলক ঘাঁটিগুলি যে যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে ইহাই ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সালুইন নদীর তীরে এবং ব্রহ্মের একাধিক স্থানে জাপ বাহিনী নূতন সৈন্য ও বিমান সহযোগে আপন আত্মরক্ষার শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াছে। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার মত সামরিক শক্তি এখনও লাভ করিতে না পারিলেও সুদৃঢ় আত্মরক্ষা যে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার পূর্ব স্তর, ইহা অনস্বীকার্য।

বর্তমান সপ্তাহের প্রথমে আসাম অঞ্চলে দুইবার জাপ বিমান হানা দিয়াছে। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৫-এ ফেব্রুয়ারীর আক্রমণে জাপবিমান অধিক শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। সংবাদে প্রকাশ উক্ত দিবসে বোমারু, জঙ্গী ও আলোকচিত্র গ্রহণ করা বিমানের মোট সংখ্যা ছিল ৪৬। কিন্তু মার্কিন জঙ্গী বিমান বহরের তৎপরতায় শত্রু বিশেষভাবে পরাজিত হইয়াছে। ৬টি বোমারু ও ৩টি জাপ জঙ্গী বিমান নিশ্চিত ধ্বংস হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ আরও ২০টি জাপ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। পর্যবেক্ষকগণ প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ যে, আক্রমণের শেষে মাত্র ৯টি জাপ বিমানকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখা গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, একটিও

জার্মানীর বিপক্ষে অভিযান চালাইবার জন্য ব্রিটিশের হাজার বোমা সংরক্ষিত রহিয়াছে

মার্কিন বিমান বিনষ্ট হয় নাই। সামরিক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, ক্ষতির পরিমাণও সামান্য।

আসাম ও ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে মিত্রশক্তির ঘাটি যে কতখানি

আমেরিকান "মস্তাং" নামক সুবৃহৎ এই বিমান ব্রিটীশের সহিত সহযোগিতা করিতেছে

শক্তিশালী জাপানের এই বিমান আক্রমণই তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা এখনও জাপানের নাই ; জাপ বিমান আক্রমণের মধ্যেও সেই উদ্দেশ্য নিহিত নাই। ভারতে মিত্রশক্তির সামরিক বিশেষ বিমান বাহিনীর শক্তি কতখানি—তাহার পরিচয় জাপান কলিকাতা অঞ্চলে বিমান হানার সময় উপলব্ধি করিয়াছে। মার্কিন বিমানবাহিনী প্রায় প্রতিদিন ব্রহ্মের বিভিন্ন জাপ ঘাটিতে যে বিমান আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে তাহারই পাণ্টা জবাব ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যেই এই আক্রমণ। একদিকে মিত্রশক্তির সামরিক লক্ষ্য বস্তুর ক্ষতি সাধন যেমন ইহার লক্ষ্য, মিত্রশক্তির বিমান আক্রমণে বাধা প্রদানও তেমনই এই আক্রমণের উদ্দেশ্য। তবে কলিকাতা আক্রমণ কালে যে দায়িত্ব বহন ও ক্ষতি স্বীকারে জাপান নারাজ ছিল, আসাম অঞ্চলে সাম্প্রতিক আক্রমণে জাপান সেই দায়িত্ব ও ক্ষতির আশঙ্কা পূর্ব হইতেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। জাপানের এই পরিবর্তিত মনোভাব তাহার শক্তির ক্রম বৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়াই বোধহয় এবং সেই কারণে ইহা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। সম্প্রতি লণ্ডনে আগত চীনা সামরিক প্রতিনিধির নেতা জেনারেল সুইং শিন্ হই এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, জাপান প্রতিদিন তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। নিষ্ক্রিয় থাকিয়া জাপান পরাজয় স্বীকার করিবে না। জাপানকে পরাজিত করিবার জন্য সত্বর তাহার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন। আমরা একাধিকবার বলিয়াছি যে, যতই দিন যাইতে থাকিবে, জাপান অধিকৃত অঞ্চলে আপনাকে ততই দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ লাভ করিবে। তাহার উপর জাপানের এক বিষয়ে বিশেষ সুবিধা আছে। আজ যদি জার্মানীর পক্ষে পরাজয় অনিবার্য হইয়া ওঠে, তাহা হইলে অধিকৃত ইয়োরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু জাপান অধিকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলিতে সেরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ দ্বীপগুলি প্রধানতঃ বৃটিশ, মার্কিন ও ওলন্দাজ সরকারের অধীন এবং তাহারা পূর্ব হইতেই জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত। একমাত্র অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীর সাহায্যলাভ সম্ভবপর। কাজেই জার্মানীর সম্ভাব্য বিপদাশঙ্কার ন্যায় ভীতি হইতে জাপান নিশ্চিন্ত। জাপানের আত্মরক্ষামূলক শক্তি বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করিতে হইলে একদিকে যেমন চীনকে অবিলম্বে সামরিক সাহায্য প্রদান প্রয়োজন, তেমনই জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অতি সত্বর আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনাও একান্ত আবশ্যক।

২৮।২।৪৩

নব্য বৃন্দাবন

শ্রীনীলরতন দাশ বি-এ

হৃদয়-যমুনা উজান বহেনা মধুর মুরলীস্বনে ;
জীবন-কুঞ্জ হয় না মুখর ভ্রমর-গুঞ্জরণে।
তোমার চরণে বাজে যে নূপুর
পরাণে ত প্রভু তোলে নাক' সুর,—
অন্তর-রাধা ত্যজি' লাজভয় তব পদে নাহি লুটে ;
অভিসারে মন হয় না পাগল, বন্ধন নাহি টুটে !

রক্তের রঙে হোলি-খেলা চলে বিশ্ব-বৃন্দাবনে—
'বোমার' আঘাতে রাসের মঞ্চ ভাঙ্গিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।
যমুনা-পুলিনে 'সাইরেন্' বাজে,
বাঁশরীর রব ডুবে তা'র মাঝে ;
মরণের খেলা লাঞ্ছিত করে জীবনের লীলা যত ;—
ওগো লীলাময় ! এস এ সময়, গোপ-গোপী কাঁদে কত !

মহাবাণী ও মহাত্মাজী—
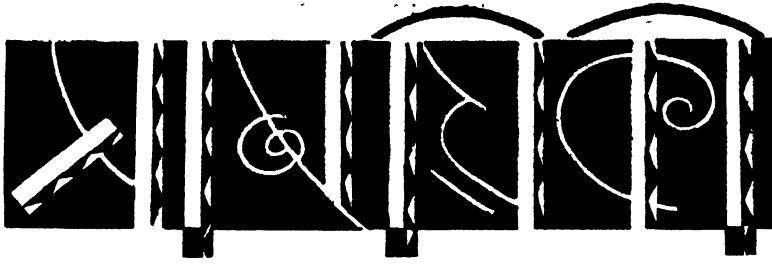
গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজী এই অনশনব্রত তিন সপ্তাহকালব্যাপী পালন করেন। তিনি এই অনশন চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত করিয়াছিলেন।

বার্দ্ধক্যের প্রান্ত-সীমায় আসিয়া দেহের শিথিল শক্তি লইয়া যিনি উপবাসব্রত গ্রহণে পশ্চাদপদ হন না তিনি আত্মশক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ, বৈচিত্র্যময় বিজ্ঞান-যুগের যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া এই বাণীই প্রচার করিলেন—

জরামরণমোক্ষায় মমাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥

জরামরণ নিবারণের জন্য যাঁরা ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হন, তাঁরাই আর্ত্তভক্ত।—এই আর্ত্তভক্ত যোগী পুরুষের সিদ্ধিলাভের পথে যে অনন্ত অন্তরায় আছে তা কেবলমাত্র অন্তরীণের গণ্ডীতেই আবদ্ধ নয়—সমগ্র ভারতের শত সহস্র অভাব ও অভিযোগের মধ্যে অন্তর্নিহিত।

এই অনশন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মহাত্মাজী ও বড়লাট বাহাদুরের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল—তাহা সংবাদপত্রে

মহাত্মা গান্ধী
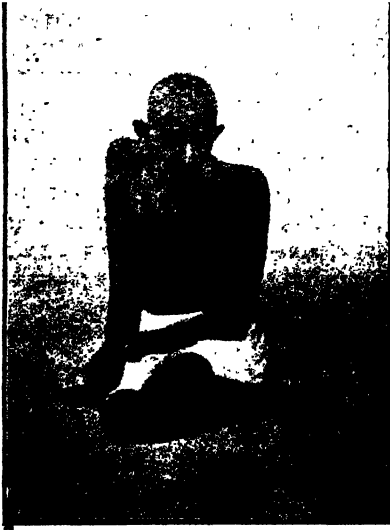
প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মাজীর পত্রের একস্থানে প্রকাশ,—'অনশনে প্রাণত্যাগ করার ইচ্ছা আমার নয়। আমার ইচ্ছা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।' যে অটুট স্বাস্থ্য ও অপরিণত বয়সে একথা ঘোষণা করা সম্ভব, বয়সের সে বেড়া মহাত্মাজী বহুকাল অতিক্রম করিয়াছেন। বার্দ্ধক্যের দ্বারে বসিয়া যিনি জীবনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি ধ্যান-সমাহিত যোগী। তিনি সেই মানুষ, যিনি—"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে"। সুতরাং তিনি সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে নহেন। তিনি—মহামানব।

কিন্তু এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়াছিলেন—ঈশ্বরের উপর। তিনি বলিলেন—'ইচ্ছা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, অবশ্য যদি ভগবানের সেইরূপ ইচ্ছা হয়।'

মহাত্মাজীর এইরূপ জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে মূলতঃ যে কারণ রহিয়াছে—তাহা শত সহস্র আর্ত্তজনগণের মুক্তির জন্যই।

বড়লাট বাহাদুর কংগ্রেসের কার্য্যের জন্য মহাত্মাজীর নিকট অনুযোগ করিয়াছেন। মহাত্মাজী তদুত্তরে বড়লাট বাহাদুরকে জানাইয়াছেন—"আমি দেখিতেছি যে, এই সম্পর্কে সরকারী মহল হইতে আমার সম্বন্ধে যে সব উক্তি করা হইয়াছে তাহাতে অনেক স্থানে সত্যের অপলাপ আছে। আমি যেন এতই পতিত হইয়াছি যে, আমি আমার মুমূর্ষু বন্ধু অধ্যাপক ভনশালীর (চিমুরের ঘটনা সম্পর্কে ইনি উপবাস করিয়াছিলেন) সঙ্গে পর্য্যন্ত যোগাযোগ করিতে পারি না। এরূপ আশা করা হইয়াছে যে, কংগ্রেস সেবক বলিয়া কথিত কতিপয় লোকের তথাকথিত হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের নিন্দাবাদ আমাকে করিতে হইবে, যদিও এই নিন্দাবাদ করিতে হইলে যে সমস্ত তথ্যের (কঠোর নিয়ন্ত্রণের পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ব্যতীত) প্রয়োজন তাহা আমার নাই। আমি বলিতে চাই যে, এ সমস্ত সংবাদ আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমি আরও অনেক কথাই লিখিতে পারি কিন্তু আমার বেদনার কাহিনী আমি দীর্ঘ করিতে চাই না। * * * সত্যাগ্রহে পরাভবের স্থান নাই। সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচারের বিভিন্ন পথের মধ্যে কারাগার একটী পথ, কিন্তু এ পথেরও সীমা আছে। আপনি আমাকে প্রাসাদোপম ভবনে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। এই স্থানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে। এমন দিন আসিবে, যখন ক্ষমতাধিকারীরা বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা নিরীহ ও নির্দ্দোষীদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন—এই আশাতেই আমি অংশতঃ কর্ত্তব্য বোধে—আনন্দের জন্য নহে, এই অবস্থা বরণ করিয়া লইয়াছি। * * * আমার সত্যাগ্রহে এইরূপ দ্বন্দ্বের সময়েও একটা মুক্তিপথের সন্ধান আছে, এক কথায় এই পথ হইতেছে

—অনশনে আত্মশুদ্ধি। আমার সত্যাগ্রহেই বলে যে, একেবারে নিরুপায় না হইলে এই পন্থা অবলম্বন করিবে না। পরিহার করিতে পারিলে আমি এই পথ অবলম্বন করিতে চাহি না। ইহা পরিহারের একটীমাত্র পথ আছে, সেটী হইতেছে আমাকে আমার ভুল বুঝাইয়া দেওয়া। আপনি যদি ইহা করিতে পারেন, তবে আমিও আমার করণীয় করিব।"—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মাজীর এই প্রশ্নের উত্তর মেলে নাই। সুতরাং মহাত্মাজীকে অনশনেই আত্মশুদ্ধি করিতেহইয়াছে।

যোগী যোগসাধনায় সমাহিত হইলেন। কিন্তু শত সহস্র ভারতবাসীর আর উদ্বেগের সীমা রহিল না। বড়লাট বাহাদুর মহাত্মাজীকে লিখিত তাঁহার পত্রে অনশনকে সহজ উপায়ে মুক্তিলাভের চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিন্তু প্রকৃত অনশন-ব্রতগ্রহণকে বড়লাট বাহাদুর রাজনৈতিক ভয় প্রদর্শনের একটি অস্ত্রস্বরূপ বলিয়া ইঙ্গিত করায় মহাত্মাজী তদুত্তরে বলিয়াছেন—'ইহা সর্ব্বোচ্চ বিচারকের নিকট আবেদন মাত্র। যদি এই পরীক্ষায় আমি প্রাণত্যাগ করি, তবে নিজের নির্দোষিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী মন লইয়া আমি ধর্ম্মরাজ সভায় উপস্থিত হইব। আপনি একটি সর্ব্বশক্তিমান্ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, আর আমি দেশসেবার মধ্য দিয়া মানবতার একজন সামান্য সেবক মাত্র। ভাবীকাল আপনার ও আমার বিচার করিবে।' যিনি দূরদর্শী কেবলমাত্র তাঁহারই পক্ষে একথা বলা সম্ভব। কেননা তিনি—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মানি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবলোকন না করিলে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ
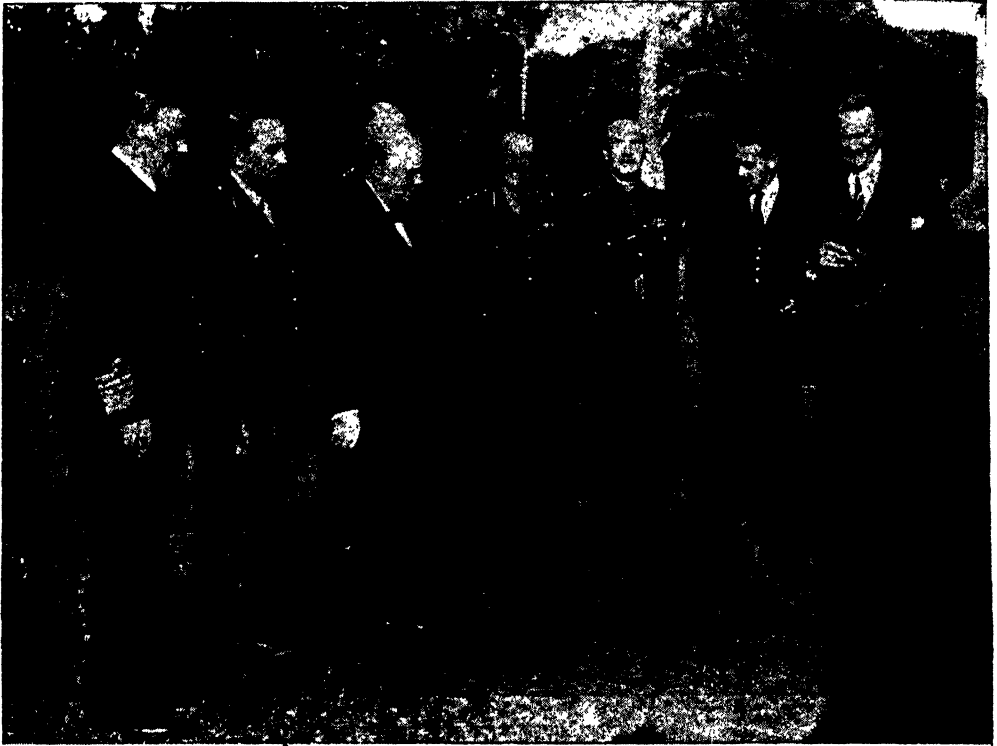
বামদিক হইতে—সার হেনরী হারউড্, জেনারেল সার এলেন ব্রুক, প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন্ চার্চ্চিল, জেনারেল মেটল্যান উইলসন্ (মিঃ চার্চ্চিলের পশ্চাতে জেনারেল সার হ্যারল্ড্ আলেকজাণ্ডার।) ফিল্ড মার্শাল সার জন ডিল্, মাননীয় আর, জি, কাসে, সার মাইলস্ ল্যাম্পসন (কাইরোতে গৃহীত আলোকচিত্র)

হইতে পারেন না। মহাত্মাজী আত্মপ্রতিষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষ। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হওয়া তাঁহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে।

মহাত্মাজী ও বড়লাট বাহাদুরের মধ্যে যে সকল পত্র বিনিময় হইয়াছে তাহা গভীরভাবে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে সরকার হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করিবার যে যুক্তি পক্ষে এ আত্মাহুতির মধ্যে মুক্তিলাভের বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। আত্মার যেখানে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছে সেখানে দৈহিক মুক্তিলাভ নগণ্য। মহাত্মাজী সেই পর্য্যায়ের মানুষ যিনি—

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।"

তিনি যোগযুক্ত মহাপুরুষ, তিনি বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ।

দেখাইয়াছেন মহাত্মাজী তাহা সরাসরি খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মহাত্মাজী বড়লাট বাহাদুরকে লিখিত পত্রে এমন কথাও বলিয়াছেন—"যে কার্য্যের ফলে ব্রিটিশ জাতির ক্ষতি হইতেছে, সেই কাজ যদি আপনাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি, তাহা হইলে তাহাতে আপনার রাজানুগত্যে ব্যাঘাত জন্মায় কি প্রকারে? প্রধান প্রধান কংগ্রেসকর্মীদের অসাক্ষাতে এই সব বিভ্রান্তিকর "প্যারাগ্রাফ" প্রকাশ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে মুহূর্ত্তে এই সব উদ্যোগ আয়োজনের কথা জানিতে পারিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই যাঁহারা ইহার জন্য দায়ী, তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের দণ্ডিত করা উচিত ছিল।"—মহাত্মাজী অকুণ্ঠিতচিত্তে হিংসামূলক কার্য্যের জন্য দণ্ডনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বলিয়াছেন।

জনগণের কল্যাণ কামনায় জীবনকে বিপন্ন করিয়া মহাত্মাজী আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ-সাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

৭৩ বৎসর বয়সে তিন সপ্তাহকালব্যাপী উপবাস দেশবাসীর পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। উপবাসকালের মধ্যে মহাত্মাজীর এমন সঙ্কটজনক অবস্থা হইয়াছিল যে চিকিৎসকগণও তাঁহার জীবন সংশয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যানুসরণকারী সাধক, চিকিৎসা বিজ্ঞানকেও পরাজিত করিয়া প্রাচীন ভারতের ঐশী শক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত মহাত্মাজী ১৭ বার উপবাস করিলেন।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ সমস্যা—

বর্ত্তমানে খাদ্য দ্রব্য, কয়লা, কেরসিন তৈল এবং বস্ত্রের বণ্টন ব্যবস্থা লইয়া বাংলাদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের অন্যতম কংগ্রেসী-সদস্য ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এতদ্‌-সম্পর্কে এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে অভিযোগ করিয়া বলেন যে কলিকাতা সহর ও সহরতলীর জনগণ, কি সারা বাংলার জনসাধারণ, কাহারও জন্যই খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে কোন ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ডাঃ বি, এন্, দে'র পুনর্নিয়োগ—

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় ডাঃ বি, এন্, দে'কে আগামী ১৫ই অক্টোবরের পর হইতে আরও ৫ বৎসরের জন্য চীফ্ ইঞ্জিনিয়র, স্পেশাল অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাড্‌ভাইসররূপে পুনর্নিয়োগ করা হইয়াছে। ডাঃ দে'র কার্য্যের ফলেই কলিকাতাবাসীগণের পক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের খরচ হ্রাস পাইয়াছে। ডাঃ দে বর্ত্তমানে কুলটীর জল নিষ্কাষণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ব্যস্ত আছেন।

দিল্লীতে উচ্চপদস্থ এ্যাংলো-আমেরিকান সামরিক অফিসারবৃন্দ

মিঃ জিন্না ও মিঃ হকের পত্রালাপ—

মুস্‌লিম লীগের কায়েদে-আজাম মিঃ জিন্না সম্প্রতি তাঁহার নিকট বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক সাহেব লিখিত কয়েকটি পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল পত্রে মিঃ হক লীগের সহিত বিবাদ করায় দুঃখপ্রকাশ, লীগে যোগদানেচ্ছু এবং বাংলায় কোয়ালিশান মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া লীগ নির্দ্দেশানুসারে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনেও আগ্রহশীল বলিয়া প্রকাশ।

উক্ত পত্রগুলি জিন্না সাহেব সংবাদপত্রে প্রকাশ করায় হকসাহেব এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বিস্ময়প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—'পত্রে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার এতকথা বলিবার আছে যে, মিঃ জিন্না এইখানেই পত্রালাপ শেষ করিয়াছেন বলিয়া আমি দুঃখিত।" বাস্তবিকই দুঃখিত হইবার কথা। ব্যক্তিগত পত্রগুলি কায়েদে আজাম প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবনায় ঢোল বাজাইয়া পালা শেষ করিয়া দিলেন, ইহা কি উচিত হইল? ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হক সাহেবের লিখিত পত্রে জানা যায়, হক সাহেব জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনে আগ্রহান্বিত ছিলেন। হক সাহেবের এ শুভেচ্ছার জন্য আমরা সাধুবাদ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের উত্তর বঙ্গ ইলেকৃট্রিকাল সাবডিভিসানের সহকারী এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি লণ্ডনস্থ ইলেকৃট্রিকাল এঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউটের এসোসিয়েট

রাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মেম্বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। রাধাগোবিন্দবাবু লণ্ডনের সিটি এণ্ড গিল্ডস্ এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভের পর এখানে আসিয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চাকরী লাভ করেন এবং পরেও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে রাজসাহীতে আছেন।

সুশীলা ভট্টাচার্য্য—

আসানসোল বার্ণপুরের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পত্নী সুশীলা ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি দেরাদুনের সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙ্গালী বাগচী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর তিনি যেখানেই বাস করিয়াছেন, সেখানেই স্থানীয় মহিলাগণের মধ্যে জাগরণের আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছেন। গৃহস্থ ঘরের বধূর পক্ষে এরূপ উৎসাহী মহিলাকর্ম্মী সাধারণতঃ অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তি তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয়

সুশীলা ভট্টাচার্য্য

করিয়াছিল। স্বামীর সাহিত্য-সাধনায় তিনি নিয়মিত উৎসাহ ও সাহায্যদান করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহার দান—

সন্তোষের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী তাঁহার শিল্প নৈপুণ্যের জন্য সর্ব্বজনপরিচিত। তিনি সম্প্রতি তাঁহার রচিত গালা দ্বারা নির্ম্মিত একখানি মূল্যবান ছবি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের

সন্তোষের মহারাজকুমার শিল্পী রবীন রায় তাঁহার গালা-নির্ম্মিত চিত্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঝাকে উপহার দিতেছেন

ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুত অমরনাথ ঝা কর্তৃক চিত্রখানি গ্রহণের ফটো আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি—

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব ও মহিলা শিল্প প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জে-এন মিত্র সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী শ্রীযুক্তা অমিয়া মিত্র প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং জেলা-জজ শ্রীযুক্ত শৈবালকুমার গুপ্তের পত্নী শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণ করেন। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের মহিলা প্রতিনিধিরা প্রদর্শনীতে শিল্প দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন এবং প্রদর্শনীটি সকলকে দেখাইবার জন্য ৫দিন খোলা রাখা হইয়াছিল। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার নারীগণের মধ্যে শিক্ষা ও শিল্পসংস্কৃতি প্রচারের যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা সকলেরই প্রশংসার বিষয়।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন

অতিরিক্ত কর ধার্য্যের প্রস্তাব—

বাংলার অর্থ-সচিব বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট উত্থাপনের পর ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ফাইন্যান্স বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে (১) সিনেমা গৃহসমূহে প্রবেশ মূল্যের উপর (২ ও ৩) ঘোড় দৌড় ও জুয়া খেলার উপর এবং (৪) বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সিনেমা গৃহে প্রবেশ মূল্যের উপর যে কর ধার্য্য আছে তাহার প্রায় দ্বিগুণ—জুয়া খেলা ও ঘোড় দৌড়ের উপর শতকরা ৪৲ টাকা হিসাবে যে কর বর্ত্তমানে ধার্য্য আছে তাহা বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ৮৲ টাকা এবং বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা ব্যবহারের জন্য যে হারে বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক কর ধার্য্য আছে তাহাও বর্দ্ধিত করার প্রস্তাব উক্ত বিলে করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর প্রসঙ্গ—

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতী নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া মেদিনীপুরের অবস্থা সম্পর্কে এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতী গত ডিসেম্বর মাসের শেষে তাঁহার চারজন ছাত্র সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর গমন করেন। তাঁহার দীর্ঘ পত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা-স্তূপ জমা হইয়া আছে, দুর্ঘটনার পর পায়খানাগুলি পরিষ্কার করা হয় নাই। এই আবর্জ্জনা-স্তূপ পরিষ্কার অথবা ভগ্ন গৃহগুলির সংস্কার কার্য্য তাঁহার চোখে পড়ে নাই। পত্রলেখক নিজ অভিজ্ঞতায় বলিয়াছেন "শোচনীয় অভাবের তাড়নায় বিধ্বস্ত অঞ্চলে চুরি ডাকাতি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের সততা ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছি। রাত্রে পকেটে চারশত টাকা লইয়া পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; অনেকে জানিত আমার পকেটে টাকা আছে, তার উপর আমি ইংরাজ এবং সরকার পক্ষের লোক তথাপি তাহারা কোন অভদ্রোচিত ব্যবহার করে নাই।" যে অপরাধে আজ বিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা অপরাধী শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতীর এই অযাচিত সার্টিফিকেট তাহাদের কাজে লাগিবে কি? এই শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতী মহাশয়ের পত্রে অন্যত্র প্রকাশ—বহু গ্রামে পানীয় জলের সরবরাহ এখনো কঠিন সমস্যা হইয়া আছে। পানীয় জলের অভাবে মড়ক দেখা দিতে পারে। তমলুকের ন্যায় কাঁথির কোন কোন স্থানে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারে। ঔষধ মেলে না। এই সকল স্থানে যে সব চিকিৎসক পাঠান হইয়াছিল তাঁহারা সেবা কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ইহার প্রতীকারকল্পে যথারীতি ব্যবস্থা না করিলে মড়ক ভীষণরূপে দেখা দিতে পারে। প্লাবিত অঞ্চলসমূহে ধান হয় নাই। ঝড়ের ফলেও বহু স্থানে ধান কম হইয়াছে।

যে সকল অভিযোগের কথা শ্বেতাঙ্গ শিক্ষাব্রতী মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমরা মাত্র তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহার পত্রে আগাগোড়া অভাব অভিযোগের কথাই লিখিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে যাঁহারা মেদিনীপুরে সাহায্যের প্রয়োজন নাই বলিয়া চিৎকার করিতে সুরু করিয়াছেন আমরা কেবলমাত্র এই পত্রের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী শেঠ—

কলিকাতার ৬নং ওয়ার্ডের নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবিউনালে এসেসর নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী শেঠ উপ-নির্ব্বাচনে বিনা বাধায় কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গোষ্ঠবাবু সর্ব্বজনপরিচিত দেশকর্ম্মী—তাঁহার নির্ব্বাচন সাফল্যে সকলেই আনন্দিত।

কুমারী নীলিমারাণী দত্ত—

টাটানগরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কুমারী নীলিমারাণী ৯ বৎসর বয়স হইতে বিভিন্ন স্থানের নানা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া নিজ অসাধারণ সঙ্গীত কৌশল প্রদর্শনের দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং বহু প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা, হাওড়া, কটক, মজঃফরপুর, প্রয়াগ, চাইবাসা প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি যোগদান করিয়াছিলেন এবং চাইবাসার ডেপুটী কমি-

নীলিমারাণী দত্ত

শনার তাঁহাকে 'নাইটিংগেল অফ্ হিন্দুস্থান' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায়—

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায় "হিষ্ট্রী অফ্ আর্ট" এবং "মিউজিয়ম ট্রেনিং" লইবার জন্য লণ্ডনে

শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায়

গমন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ্" এবং পরে বাঙ্গালা সরকার হইতে দুইটি বৃত্তি পান। কৃতিত্বের সহিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ ডিগ্রি ও মিউজিয়ম সম্বন্ধীয় বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "ফোক্ আর্ট অব্ বেঙ্গল" এবং অন্যান্য গবেষণার জন্য লণ্ডনের "রয়েল এ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউট্" ১৯৪১ সনে তাঁহাকে ফেলো নির্ব্বাচিত করেন। তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত প্রগতিশীল মাসিক পত্রিকা "হরাইজনের" ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সিমলা-শৈলে বাঙ্গালীর উৎসব—

গত ২৬শে মাঘ সিমলা-শৈলে প্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নাভা এষ্টেটে শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে "বাণী-অর্চ্চনা" হইয়াছে। সিমলার ইতিহাসে প্রতিমাসহ সার্ব্বজনীন বাগ্‌দেবীর আরাধনা এই প্রথম। উৎসব উপলক্ষে ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্ক' বালক-বালিকাদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং বিচিত্র প্রমোদ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উৎসবে স্থানীয় সমস্ত বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন ছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকায় ঈষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের

বাঙ্গালী সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে সিমলা কালীবাড়ীর প্রতিমা মিত্র হলে বিচিত্র আমোদ অনুষ্ঠান এবং তরুণ সাহিত্যিক শ্রীকমল মৈত্রের "অভিশপ্ত পৃথিবী" নামক নাটিকা অভিনীত হয়। সুদূর প্রবাসে অবস্থান করিয়াও বাঙ্গালী তাহার সংস্কৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইতে যে বিরত হয় নাই ইহা সত্যই প্রশংসার্হ।

শান্তিপুরে সাহিত্য সভা—

গত ডিসেম্বর মাসে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে শান্তিপুরে পরিষদ ভবনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য সঙ্গীতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। সুকবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী 'সাহিত্যের আর্ট' বিষয়ে প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন সিংহ কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ অভিভাষণ প্রদান করেন। সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল, ভূনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক প্রমুখ বহু স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির সভ্যবৃন্দ

বাংলার বাজেট ও ঘাটতি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ-সচিব মিঃ এ, কে, ফজলুক হক কর্তৃক ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের যে বাজেট উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ১ কোটী ৫২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ঘাট্‌তি দেখা গিয়াছে। বাজেটে রাজস্বের মোট আনুমানিক আয় ১৬ কোটী ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ১৭ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলার বাজেটে ঘাট্‌তি ইহা নূতন নহে। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে ইহার মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে মাত্র। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলা দেশকে বর্ত্তমান বর্ষে নানারূপ বিপদ ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে এই ঘাট্‌তির জন্য পুনরায় নতুন করিয়া যে অবশ্যম্ভাবী করবাধ্য করা হইবে তাহাও দেশবাসীকে বহন করিতে হইবে। বোঝার উপর শাকের আঁটী বহন করিয়া যাহারা কাঁধের চামড়া পুরু করিয়া ফেলিয়াছে তাহারা এ ভারও বহন করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিবর্ষেই ঘাট্‌তির এই পুনরাবৃত্তি না ঘটিলেই দেশবাসী কৃতার্থ হয়।

অর্থ-সচিব বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—যুদ্ধের জন্য এই প্রদেশের রাজস্বের উপর যে বিবিধ এবং অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়াছে তাহার ফলে রাজস্ব অপেক্ষা আমাদিগের ব্যয় ১৫০ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। এ, আর, পি বাবদ ১ কোটি ১০ লক্ষ ছাড়াও যদি প্রতীকারের উপায় স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকার আড়াই কোটি টাকা আগাম না দিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান বৎসরে রাজস্বের বাহিরেও বহু টাকা ঘাট্‌তি পড়িত। দেশবাসী কেন্দ্রীয় সরকারের এ অনুগ্রহ সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিবে; কেননা আলোচ্য বর্ষের ঘাট্‌তি পূরণের জন্যই নিষ্প্রভ বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে প্রমোদাগার হইতে ঘোড়া দৌড়ের মাঠ পর্য্যন্ত ছুটাছুটী করিতে হইতেছে—নহিলে হয়ত অন্যত্রও অনুসন্ধানী দৃষ্টি লইয়া ঘুরিতে হইত।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—

ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতে এক অখণ্ড আত্মরক্ষণক্ষম হিন্দু জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই সঙ্ঘের মিলন-মন্দির ও রক্ষিদল আন্দোলন। বঙ্গদেশের ন্যায় বহির্বঙ্গেও এই আন্দোলনের প্রচার প্রসারের জন্য সঙ্ঘ বিশেষ উদ্যোগী। সঙ্ঘ-সন্ন্যাসিগণ এক একজন সুযোগ্য পরিচালকের অধীনে কয়েকটী দলে বিভক্ত হইয়া ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এমন কি অধুনা-জাপানীকবলিত ব্রহ্ম, মালয় ও শ্যামের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী সহর এবং প্রধান প্রধান পল্লীসমূহে বৎসরের পর বৎসর পরিভ্রমণপূর্ব্বক সঙ্ঘের ভাব, আদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতি প্রচার

করিয়া কার্য্যোপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন। ফলে বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশে এবং সম্প্রতি গুজরাটে সঙ্ঘের গঠনমূলক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্ঘের গয়া, কাশী, পুরী ও স্থাপন এবং অনার্য্য ভিলদিগের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করা সম্বন্ধে সঙ্ঘ-প্রচারকগণ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

রক্ষিদলভুক্ত যুবকবৃন্দ (গুজরাট মিলন-মন্দির)

প্রয়াগ সেবাশ্রমের খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। গত ২ বৎসর পূর্ব্বে সঙ্ঘের অন্যতম প্রচারক স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর চেষ্টায় সুরাট সহরে "গুজরাট মিলন-মন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গুজরাটবাসী জনসাধারণ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও তরুণ-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে একটি বৃহৎ দ্বিতল ভাড়াটিয়া বাড়ী ও তৎসংলগ্ন এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে উহার কার্য্য প্রধানতঃ পাঁচটী ধারায় পরিচালিত হইতেছে :—(১) মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়া স্থানীয় বিচ্ছিন্ন হিন্দু জনসাধারণকে নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধ ধার্ম্মিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সাহায্যে হিন্দু আদর্শের প্রেরণায় সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলা হইতেছে। (২) রক্ষিদল আন্দোলনের দ্বারা স্থানীয় যুবকগণের মধ্যে শক্তিচর্চ্চার আগ্রহ ও চেষ্টা এবং স্বধর্ম্ম ও স্বীয় সমাজ রক্ষার দায়িত্ববোধ জাগ্রত করিয়া দেওয়া হইতেছে। (৩) সঙ্ঘের কলিকাতা, রাজসাহী, পাবনা, খুলনা, বাজিতপুর, আশাশুনী প্রভৃতি কেন্দ্রের ন্যায় গুজরাট কেন্দ্রেও সম্প্রতি একটী ছাত্রাবাস খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ১৪টী ছাত্র স্কুল ও কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গুরুগৃহের ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্যমূলক আদর্শ ও তদনুকূল নিয়মকানুনের মধ্যে থাকিয়া জীবন গঠন করিতেছে। (৪) লাইব্রেরীতে ধর্ম্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক ইংরাজী ও গুজরাটী ভাষায় লিখিত প্রায় পাঁচ শতাধিক পুস্তক সংগৃহীত বা ক্রীত হইয়াছে। (৫) দাতব্য চিকিৎসালয়ে সহরের বিভিন্ন পল্লী, বিশেষ করিয়া বস্তি অঞ্চল হইতে বহু দরিদ্র পরিবার প্রতিদিন বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া থাকে। গুজরাটের পল্লী অঞ্চলে এই আন্দোলনের শাখা

আরিয়াদহে শিল্প প্রদর্শনী—

২৪ পরগণার অন্তর্গত আরিয়াদহ গ্রামে 'হেঁয়ালী' হাতে-লেখা পত্রিকার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি একটী শিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটী জনসভা হয়। এবারের প্রদর্শনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় শিল্পীদের বহু চিত্র, সূচীশিল্প, মৃৎশিল্প, ও নানারূপ কুটীর শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় যে চিত্রগুলি স্থান পাইয়াছিল তন্মধ্যে শ্রীমতী দুর্গারাণী দেবী-অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, ষ্ট্যালিন, সন্ধ্যা-প্রদীপ, শ্রীযুক্ত তৃপ্তাংশু পালিতের দুইখানি ল্যাণ্ডস্কেপ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ ঘোষের প্যাগোডা, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত একখানি ক্ষুদ্র ছবি বহু ছবির মধ্যেও দর্শকদের বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে,ছবিখানির নাম 'বীরভদ্র'; একটী হনুমানকে যেভাবে রূপ দিয়াছেন তাহাতে শিল্পীকে অভিনন্দিত না করিয়া উপায় নাই। মৃৎশিল্পে শিল্পী পশুপতি ভট্টাচার্য্যের নাম সর্ব্বাগ্রেই উল্লেখযোগ্য এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। কুটীর শিল্পের মধ্যে আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার শিল্প বিভাগের তৈয়ারি কাপড়-চোপড় ও এইচ, পি, দাস এণ্ড কোম্পানীর নিব্—উন্নত কুটীর শিল্পের নিদর্শন হিসাবে প্রদর্শনীটির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল।

নানাস্থানে হাট লুট—

খুলনা, রাজসাহী প্রভৃতি কয়েকটি জেলার বহু গ্রামের বহু হাট লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। হাটগুলি সাধারণতঃ খোলা জায়গায় হইয়া থাকে ও যে সময়ে

তথায় ভীড় খুব বেশী হয়, সে সময়ে ৫০ জন লোক সংবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে অনায়াসেই হাট লুঠ করিতে পারে। সকল হাটে উপযুক্ত সংখ্যক পুলিস রাখাও সম্ভবপর নহে। লোক খাইতে না পাইয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি জেলায় গ্রামে গ্রামে লোক যাহাতে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য দ্রব্য পায়, গভর্ণমেণ্টের সে ব্যবস্থা করা উচিত। এখনও পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এক সপ্তাহে চাউলের দর হঠাৎ বৃদ্ধি পাইয়া মোটা চাউলের মণ ১৮ টাকা হইল—ইহা যে সরকারী কর্ম্মচারীদের জ্ঞাতসারে হয় নাই, এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু সে ব্যবস্থা দমনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। পৃথিবীর অন্য সকল সভ্য দেশে এরূপ অসাধারণ অবস্থায় খাদ্য বিতরণের যে ব্যবস্থা করা হয় আমাদের দেশে তাহা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন উৎসাহ দেখা যায় না। অথচ লোক খাইতে না পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কি করিবে, তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ভবিষ্যতে আমাদের আরও কত অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহা ভাবিয়া এখন হইতেই আমরা শঙ্কিত হইয়াছি।

কিরণশশী সেবায়তন—

উত্তর কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার নামক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সর্ব্বজনবিদিত। ঐ ভাণ্ডারের কর্ম্মীদের উদ্যোগে এবং মেসার্স বি-সি নান এণ্ড ব্রাদার্সের শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র নানের দানে যক্ষ্মা চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে ভাণ্ডারে কিরণশশী সেবায়তন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে—তথায় যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করা হয়, রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং সেবায়তনস্থিত লেবরেটারীতে রোগীদের কফ, রক্ত, মূত্রাদি পরীক্ষা করা হয়। ঐ
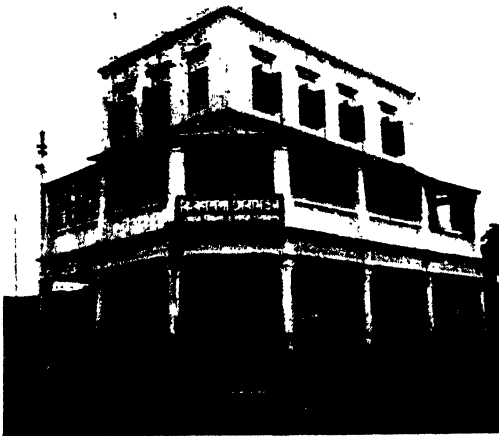
কিরণশশী সেবায়তন, হালসীবাগান

সঙ্গে একটি ছোট হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে ও সেজন্য প্রয়োজনীয় জমী সংগ্রহ করা হইয়াছে—এবিষয়ে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিশেষ উদ্যোগী হইয়া সাহায্য করিয়াছেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও এ জন্য গত বৎসর (১৯৪১-৪২) ৬ হাজার টাকা এককালীন দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মারোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে—কাজেই তাহার চিকিৎসার জন্য যত অধিক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা যায়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক। সাধারণতঃ দরিদ্রদিগের মধ্যেই এই রোগ বেশী দেখা যায়—সে জন্য সর্ব্বত্র সুলভ চিকিৎসার ব্যবস্থাই অধিক প্রয়োজন। ভাণ্ডারের কর্ম্মীরা সে জন্য এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হইয়া কার্য্য করিতেছেন—আমাদের বিশ্বাস, এই মঙ্গলজনক কার্য্যে তাঁহাদের অর্থের অভাব হইবে না—কারণ আমাদের দেশে এখনও সদুদ্দেশ্যে দান করিবার লোকের অভাব নাই।

নূতন পয়সা—

গত জানুয়ারী মাসে সরকারী ইস্তাহারে জানা গিয়াছিল যে ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বাজারে প্রচুর নূতন পয়সা পাওয়া যাইবে, ভারতের ট্যাঁকশাল সমূহে প্রচুর পয়সা তৈয়ারী হইতেছে—কাজেই আমাদের খুচরার অভাব দূর হইবে। কিন্তু সারা ফেব্রুয়ারী মাস কাটিয়া গেল, আমরা কিন্তু একটির বেশী নূতন পয়সা দেখিলাম না—তাহাও বাজারে দেখা যায় নাই, একজন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি প্রচুর নূতন পয়সা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে সেগুলি গেল কোথায়? গভর্ণমেণ্ট কি এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহার ফল প্রকাশ করিবেন। ছিদ্রযুক্ত পয়সা লোকে কি তবে অন্য প্রকারে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছে?

ম্যালেরিয়া নিবারণে সরকারী ব্যবস্থা—

বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কিছু অর্থব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। যে সকল স্থানে মশার প্রকোপ খুব বেশী, সে সকল স্থানে মশা মারিবার যন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এবার ১৫ হাজার টাকা দান করিবেন। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের জন্য গ্রামোন্নতির কার্য্য ব্যপদেশে ১৬৮০ টাকা ব্যয় করা হইবে। কয়েকটি জেলার গ্রাম্য ও থানা দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির জন্য টাকা দেওয়া হইবে; প্রত্যেক গ্রাম্য চিকিৎসালয় ২৫০ টাকা ও প্রত্যেক থানা চিকিৎসালয় ৫০০ টাকা দান পাইবে। বর্দ্ধমান জেলা—৩টি থানা ও ২২টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৭ হাজার টাকা; বীরভূম জেলা—৪টি থানা ও ২০টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৭ হাজার টাকা; বাঁকুড়া জেলা—২টি থানা ও ৪টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্য ২ হাজার টাকা; মেদিনীপুর জেলা—১টি থানা ও ১৪টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৪ হাজার টাকা; হাওড়া জেলা—৪টি থানা ও ১৬টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৬ হাজার টাকা এবং হুগলী জেলা—৮টি থানা ও ৪৭টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের জন্য—১৭২৫০ টাকা দেওয়া হইবে। টাকা যত কমই হউক না, যদি টাকাগুলির সদ্ব্যয় হয়, তাহাতে বহু লোক উপকৃত হইতে পারিবে।

উচ্চতর পরিষদে নির্ব্বাচন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) কয়েকটি সদস্যের পদ খালি হইয়াছিল। কলিকাতা সহরতলী (হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলার মিউনিসিপ্যাল এলাকা) কেন্দ্র হইতে সাউথ সুবার্ব্বান (বেহালা) মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন রায় বিনা বাধায় উচ্চতর পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঢাকা বিভাগ দক্ষিণ গ্রাম্য সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায় মহাশয়ও বিনা বাধায় উচ্চতর পরিষদের

সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেও ঐ কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন। উভয়েই দেশসেবাক্ষেত্রে সুপরিচিত—তাঁহাদের দ্বারা দেশের লোক উপকৃত হইবে।

কাগজ-সমস্যা—

ভারতীয় মিল সমূহে যে কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহার মাত্র শতকরা ১০ ভাগ সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইবে ও বাকী ৯০ ভাগ সরকারের নানা কাজে ব্যবহৃত হইবে—এইরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণার ফলে দেশের সর্ব্বত্র প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা গিয়াছিল। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট শতকরা ১০ ভাগের স্থলে শতকরা ৩০ ভাগ কাগজ সাধারণকে ব্যবহার করিতে দিবেন। প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য নহে। জ্ঞান ও বিদ্যা প্রচারের দ্বারা দেশ সমৃদ্ধ হয়—কাগজ সেই প্রচারের প্রধান সহায়ক। কাজেই কোন গভর্ণমেণ্ট যদি সেই প্রচার কার্য্যের পথ বন্ধ করেন, তবে তাহাতে সাধারণের বলিবার কি আছে? আমাদের বিশ্বাস, এখনও কর্ত্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির উদয় হইবে।

বোম্বায়ে সারস্বত উৎসব—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাই হর্ণবি রোডস্থ বেঙ্গল লজের অধিবাসীদের চেষ্টায় বার্ষিক সারস্বত উৎসব আড়ম্বরের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে ঐ স্থানে সেদিন সন্ধ্যায় বোম্বাই প্রবাসী বাঙ্গালীরা সকলে একত্র হইয়া আমোদ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমরা ঐ উপলক্ষে গৃহীত চিত্রখানি এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

বোম্বাইএ প্রবাসী বাঙ্গালীদের সরস্বতীপূজা

খুচরার অভাব—

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বাজোরিয়া খুচরার অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে—কলিকাতা ও বোম্বায়ে দুইটি ট্যাঁকশালে ২৪ ঘণ্টা কাজ করিয়া মাসে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ খুচরা মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে। লাহোরে আর একটি টাঁকশাল নির্ম্মিত হইতেছে, আগামী দুই মাসে তাহা নির্ম্মিত হইলে মাসে আরও ৩ কোটি মুদ্রা খুচরা প্রস্তুত হইবে। সরকার প্রচুর ধাতু সংগ্রহ করিয়াছেন এবং যতদিন প্রয়োজন হইবে ততদিন এইভাবে খুচরা মুদ্রা প্রস্তুত করিবেন। লোক যাহাতে খুচরা জমাইয়া না রাখে, সেজন্যও গভর্ণমেণ্টের চেষ্টার অন্ত নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমাদের অভাব পূর্ব্ববৎ থাকিয়া গিয়াছে। বাজারে যাইয়া আমাদের কষ্টের সীমা থাকে না। বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরা দরিদ্রদের সেই অসুবিধা অনুভব করিতেও বোধহয় পারেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি ১৯৪৩-৪৪ সালের যে বাজেট পেশ করা হয় তাহাতে দেখা যায় চলতি বৎসরে ৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ এবং আগামী বৎসরে ৬০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ঘাটতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে আয় হইয়াছিল ১৩৪ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা, আর ব্যয় হইয়াছিল ১৪৭ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। ঐ বৎসরে ঘাটতি হইয়াছিল ১২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বর্ষে ঘাটতির পরিমাণ যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে গত বৎসরের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত

হওয়া নিরর্থক হইবে। সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতুই ঘাট্‌তির পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং কোন্ সুদূরে ইহা সমতাপ্রাপ্ত হইবে তাহা বলা সুকঠিন।

পদত্যাগ—

সম্প্রতি মিঃ এম্, এস্, এনী, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও স্যার এইচ, পি, মোদী বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যপদ

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

ত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগকারী সদস্যত্রয়ের এক যৌথ বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে, মহাত্মাজীর অনশন সম্পর্কে বড়লাটের সহিত মতভেদ হওয়ায় ঐপদে অধিষ্ঠিত থাকা তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। শাসন পরিষদের সদস্যত্রয়ের পদত্যাগের কারণ হইতে অবিচলিত সরকারী মনোভাব সুপরিস্ফুট হইয়াছে।

কয়লা সরবরাহ—

বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রথম হইতেই রেলের মালগাড়ীর অভাবে কলিকাতায় কয়লার অভাব বাড়িয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে কয়লার দাম বাড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহা চরমে উঠিয়া ৫ আনা মণের কয়লার দাম ৫ টাকা মণ হইয়াছিল। খনিতে কয়লার অভাব হয় নাই, কলিকাতা হইতে কয়লার খনিসমূহও এক শত মাইলের মধ্যে; তথাপি কেন এইরূপ হইল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। যাহা হউক, কয়লা যখন কলিকাতায় দুর্লভ হইয়াছিল, তখন চারিদিক হইতে চেষ্টা করিয়া কলিকাতায় কিছু কয়লা আনা হইয়াছে এবং তাহা অধিকাংশ স্থলেই ১৷৴০ মণ দরে বিক্রীত হইতেছে। কিন্তু সহরতলীগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—অধিকাংশ স্থলেই টাকা দিয়াও কয়লা পাওয়া যায় না—যাহা পাওয়া যায় তাহা তিন টাকা বা সাড়ে তিন টাকার কম মণ দর নহে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কি ইহা লজ্জার বিষয় নহে? এই ভাবে পক্ষাধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সহরতলীগুলিতে কয়লা পৌঁছে নাই। কাঠও ক্রমে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হওয়ায় লোক কাঠের উপর নির্ভর করিতে পারিতেছে না। ২০ টাকা মণ দরের চাল ৪ টাকা মণ দরের কয়লায় সিদ্ধ করিয়া সাধারণ মানুষ আর কত দিন জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাও বিবেচনার বিষয় হইয়াছে।

রেলবাবদে গভর্ণমেণ্টের লাভ—

১৫ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারত গভর্ণমেণ্টের যানবাহন বিভাগের সদস্য স্যার এডোয়ার্ড বেন্থল জানাইয়াছেন—১৯৪২-৪৩ সালে সরকারের রেল বিভাগে ব্যয় অপেক্ষা আয় ৩৬ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। পর বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালেও ৩৬ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্যার এডোয়ার্ড জানাইয়াছেন—এ বৎসর মানুষের ভাড়া বা মালের মাশুলের হার পরিবর্ত্তন করা হইবে না। ৩৬ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হওয়া ছাড়াও রেলের মূলধনের ঘাট্‌তি হিসাবে ৮৪ কোটি টাকা ও রিজার্ভ বাবদে সাড়ে ৯ কোটি টাকা জমা রাখা হইবে। এই হিসাব দেখিয়া আমাদের কিন্তু উল্লসিত হইবার কারণ নাই। আমাদের যাতায়াতের যে কষ্ট পূর্ব্বে ছিল, এখনও তাহাই আছে। দরিদ্র কর্ম্মচারীরাও রেলে কাজ করিয়া অপ্রাচুর্য্যের মধ্যেই থাকিয়া যাইবে। তাহাদের জন্য হয় ত ছিটেফোঁটার ব্যবস্থা হইবে কিন্তু যাত্রীদের দুঃখ, কষ্ট, অসুবিধা প্রভৃতি দূর করার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে রেলযাত্রীদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়, এদেশে সে অনুপাতে কিছুই করা সম্ভব হয় না। ষ্টেশনে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিলেও কেহ এক গ্লাস জল পায় না। আমাদের এ দুর্গতি কি চিরদিনই চলিবে?

মেদিনীপুর সম্বন্ধে তদন্ত—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যালের প্রস্তাবে মেদিনীপুরে অনাচারের কথা আলোচিত হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্বমন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেদিনীপুরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্যার নাজিমুদ্দীন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের অনাচার বর্ণনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সকলেই মেদিনীপুরের ঘটনা সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিয়াছেন, যাহা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরে ঝড় হইয়াছিল; কিন্তু মন্ত্রীরা ঐ অঞ্চল দেখিয়া আসার পর ৪ঠা নভেম্বর ঐ ঝড়ের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ৯ই আগষ্টের পর কংগ্রেস আন্দোলন আরম্ভ হইলে মেদিনীপুরে সরকারী কর্ম্মচারীরা যে অনাচার চালাইয়াছিল, তাহা এবং ঝড়ের পরবর্ত্তী কালে সাহায্য দানের সময়ে সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক তাহাতে বাধাপ্রদানের কথা বক্তৃতায় প্রকাশিত হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মৌলবী এ-কে ফজলুল হক আশ্বাস দিয়াছেন যে, মেদিনীপুরের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন এবং সেই তদন্তের ফল সাধারণে প্রকাশ করা হইবে। দুইঘণ্টা কাল পরিষদে এ বিষয়ে আলোচনা চলিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই নিরপেক্ষ তদন্তের ফল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিবে।

প্রধান-মন্ত্রীর উক্তি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী খোলাখুলিভাবে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন—"আমাকে অনেক বাধ্যবাধকতার মধ্যে কাজ করিতে হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা যে আমার নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার ক্ষমতা বুঝায় না, একথা সকলেরই উপলব্ধি করা উচিত। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিলে যাহা করিতাম ঠিক তাহার বিপরীত কাজই বহুক্ষেত্রে আমাকে করিতে হয়। এই সব ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয়, যখন আমি প্রকৃতই উপলব্ধি করি যে, মন্ত্রিত্বের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইবে। আর সেইরূপ শুভ মুহূর্ত্ত যদি দেখা দেয়, তবে আমি ঐ পথ অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদও হইব না।"

সংবাদপত্রের নবনিয়ন্ত্রিত মূল্য—

ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রের যে মূল্য নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল তাহা পুনর্বিবেচিত হইয়া আগামী ১লা এপ্রিল হইতে পৃষ্ঠা হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধির এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে—সপ্তাহে ১৪ পৃষ্ঠা (দৈনিক ২ পৃষ্ঠা) অন্যূন চার পয়সা, কিন্তু ছয় পয়সার কম; সপ্তাহে ২০ পৃষ্ঠা—অন্যূন ৬ পয়সা, কিন্তু দুই আনার কম; সপ্তাহে ২৮ পৃষ্ঠা অন্যূন দুই আনা কিন্তু তিন আনার কম; সপ্তাহে ৪২ পৃষ্ঠা অন্যূন তিন আনা। বিজ্ঞাপনের হার দেড় গুণ বৃদ্ধি হইল এবং অবিক্রিত শতকরা ৫ ভাগ সংবাদপত্র ফেরত লওয়ার ব্যবস্থা নূতন ব্যবস্থায় বাতিল করা হইয়াছে।

মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কারণ বর্ণনা—

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভূতপূর্ব্ব অর্থ-সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে তাঁহার পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করেন। উক্ত বিবৃতিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ যে সকল কারণে পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে মেদিনীপুরের ঘটনা, জাতীয় সেনা দল গঠনে বিরুদ্ধ সরকারী মনোভাব, হোমগার্ড গঠনের সংশোধিত পরিকল্পনা বাতিল, পাইকারী জরিমানা এবং মন্ত্রীগণের পরামর্শ উপেক্ষা করা প্রভৃতি কারণগুলি অন্যতম।

১৯৪২ সালের দমননীতির ইতিকথা—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সর্দ্দার সন্ত সিং-এর এক প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মিবৃন্দ গ্রেপ্তার হইবার পর ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত ৫৩৮বার গুলি চালান হইয়াছে। পুলিশ এবং সৈন্যদিগের গুলি-চালনার ফলে ৯৪০জন লোক নিহত, ১,৬৩০ জন লোক আহত এবং ৬০,২২৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালের প্রায় শেষাশেষি আনুমানিক ২৬ হাজার লোক দণ্ডিত হইয়াছে। ১৯৪২ সালে ১৮ হাজার লোককে ভারতরক্ষা বিধানের ২৬ এবং ২৯ ধারায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র সচিবের উপরোক্ত সরকারী বিবৃতি হইতে দণ্ডনীতির যে তালিকা পাওয়া গেল, তাহা ৩৩ কোটী ভারতবাসীর সংখ্যানুপাতে কিছুই নহে। কিন্তু দেশের অন্যান্য অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সরকারী আইন ও নীতি এইভাবে অনুসৃত হইলে দেশবাসী চরম দণ্ড সহ্য করিবার সামর্থ্য লাভ করিত।

কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব—

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের জন্মভিটায় শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে মহাসমারোহে আদিকবি কৃত্তিবাসের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। "যুগান্তর" সম্পাদক খ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন এবং নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় মিঃ জে, এন্, মিত্র বাহাদুর রামায়ণ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। নদীয়ার বহু খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আদিকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সভাপতি সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনের পর সভাপতির পদটি শূন্য ছিল। গত ২রা মার্চ্চ স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় অধিক ভোট পাইয়া ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্যার বিজয়প্রসাদ বহু বৎসর যাবৎ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী ছিলেন। সার বিজয়প্রসাদ নিখিল ভারত উদার নৈতিক দলের সভাপতি এবং তিনি যৌবনকাল হইতেই দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনীতিক মত যাহাই কেন হউক না, তাঁহার এই নির্ব্বাচন সাফল্যে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়

কলিকাতায় দুগ্ধ সমস্যা—

কলিকাতায় দুগ্ধ সমস্যা ক্রমে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও মানুষ ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছে। ক্রমে টাকায় দুই সের দুধ হইয়াছে। তাহাও সব সময় পাওয়া যায় না। বোমার ভয়ে এক দল হিন্দুস্থানী গোয়ালা তাহাদের গরুবাছুর সঙ্গে লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সহরতলী হইতে যে সকল গোয়ালা দুধ লইয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিতে আসিত, তাহাদের সংখ্যাও ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। ট্রেণ চলাচলের অব্যবস্থার ফলে বহু গোয়ালা নিয়মিত সময়ে সহরে আসিয়া

পৌঁছিতে পারে না। সর্ব্বত্র মানুষের খাদ্যের যেমন অভাব, পশুর খাদ্যেরও তেমনই অভাব। দুধ মানুষের অত্যাবশ্যক পানীয়, তাহার অভাবে শিশুদিগকে পালন করা যায় না। দুধের এইরূপ অভাব বেশী দিন থাকিলে শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাওয়াও স্বাভাবিক। এবিষয়ে সকল দিক দিয়া আন্দোলন করিয়া সহরে দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সকলের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। সমবায় প্রথায় বা লিমিটেড্ কোম্পানী করিয়া দুধের ব্যবসা না করিলে বা এই ব্যবসায়ে বাঙ্গালী যুবকগণ যোগদান না করিলে ক্রমে সহরে দুধ অপ্রাপ্য হইবে। তাহার ফল যে কিরূপ অনিষ্টকর হইবে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

অল্পবয়স্কদের মুক্তি দান—

প্রকাশ, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক যে সকল যুবককে কংগ্রেস আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে মুক্তি দান করা হইবে। আমরা জানি, স্কুলের ছাত্রদের নিকট কংগ্রেস প্রচারিত পুস্তিকা পাইয়া পুলিশ সেই সকল ছাত্রকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিয়াছেন। অনেক সময় আদালতের বিচারেও তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ডাদেশের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে এতদিনে যে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই সুখের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, অপরাধ নির্ব্বিশেষে সকল অপ্রাপ্ত-বয়স্ককেই এই আদেশের ফলে মুক্তি দেওয়া হইবে।

ভারতের জনসংখ্যা—

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিলাতের পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ভারত সচিব জানাইয়াছেন—ভারতের জনসংখ্যা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৩৮ কোটী ৯০ লক্ষ হইয়াছে। তাহা পূর্ব্বে ১৯১১ সালে ৩০ কোটি ২৯ লক্ষ, ১৯২১ সালে ৩০ কোটি ৫৬ লক্ষ এবং ১৯৩১ সালে ৩৮ কোটি ৮১ লক্ষ ছিল। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অঙ্ক দেখাইয়া কি ভারতের ক্রমোন্নতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে?

সরবরাহ ব্যবস্থা—

ন্যায়সঙ্গত মূল্যে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সমভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য বাঙ্গালা সরকার নির্ব্বাচিত আমদানীকারক ও বিক্রেতাদের লইয়া একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি ট্রেড ট্রাইবিউনালও গঠিত হইয়াছে—কলিকাতার সেরিফ স্যার ফজলর রহমন তাহার সভাপতি, মিঃ ডি-আর-স্কট সেক্রেটারী ও ডক্টর সত্যচরণ লাহা সদস্য হইয়াছেন। এই তিনজন কর্ম্মী কলিকাতায় কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যফলে দেশের লোক সর্ব্বত্র খাদ্য-দ্রব্য পাইলেই তাঁহাদের পক্ষে সুখের কথা।

কমন্স সভায় দণ্ডনীতির হিসাব পেশ—

কমন্স সভায় ভারত সচিব মিঃ আমেরি ভারতীয় গোলযোগ সম্পর্কিত দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা পেশ করিয়া বলেন, ৬০২২৯ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩৯৪৯৮জনকে আটক রাখা হইয়াছে। মিঃ সোরেনসেনের একটী প্রশ্নের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত হিসাব দাখিল করিয়া ভারত সচিব বলেন, গোলযোগের সময় পুলিশ ৪৭০বার এবং মিলিটারী ৬৮ বার গুলিবর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কমন্স সভায় ভারতের দণ্ডিত ব্যক্তিদের উপরোক্ত হিসাব দাখিল করিয়া ভারত সচিব যোগ্যতার অথবা অযোগ্যতার নিদর্শন দেখাইলেন তাহাই ভাবিবার বিষয়।

দায়িত্ব কাহার?—

মহাত্মা গান্ধী অনশন ব্রত অবলম্বন করায় দেশব্যাপী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দেওয়ায় দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহাত্মাজীকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য উক্ত সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ মানবের জীবন বিপন্ন হওয়ায় দেশবাসী যেরূপ আতঙ্কিত অবস্থায় সরকারের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইয়া দ্বারস্থ হইয়াছিলেন সরকার সে অনুরোধ সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া জানাইয়াছিলেন—"সমগ্র দায়িত্ব গান্ধীর"। যেহেতু মহাত্মাজী স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া উপবাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন সেহেতু সে দায়িত্ব যে গান্ধীজীর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রজাপুঞ্জের অনুরোধ রক্ষা করা অথবা না করার দায়িত্ব কাহাদের? দায়িত্বের বোঝা এমন করিয়া সরকার যদি হাল্কা করিয়া দেন তাহা হইলে জনসাধারণ তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবে কোথা হইতে? কিন্তু সরকার দায়িত্বের বোঝা যাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়াছিলেন, সুখের বিষয় তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ এবং রক্ষণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

দায়িত্ব ও দৃষ্টান্ত—

মহাত্মাজীকে অবিলম্বে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিবার জন্য নয়া-দিল্লীতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল উক্ত সম্মেলনের সভাপতি স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলেন—"মহাত্মা গান্ধীকে একজন বিদ্রোহী বলা হইয়া থাকে। কিন্তু স্মাটস নামে একজন বিদ্রোহী আছেন, যিনি সাম্রাজ্যের হিতার্থে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতেছেন। ডি, ভ্যালেরা নামে আরও একজন বিদ্রোহী আছেন, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে রাখাই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। বৃটীশের ইতিহাসে এই দৃষ্টান্তই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুগত ব্যক্তিদিগের পরিবর্ত্তে বিদ্রোহী-দিগের সঙ্গেই তাঁহারা সকল সময়ে মীমাংসা করিয়াছেন।" ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এ নজীর ভারতবর্ষের অনুকূলে কার্য্যকরী হইলে দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে না চাপাইয়া দায়-ভার গ্রহণ করা হইত বোধহয়।

লণ্ডনে কবি-স্মৃতির আয়োজন—

সম্প্রতি লণ্ডনে ঠাকুর সোসাইটীর এক কার্য্যকরী সভার অধিবেশনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার কথা আলোচনা হয়। বানার্ড শ ন্যাশনাল গেলারীতে কবির প্রতিকৃতি রাখিবার প্রস্তাব করেন। অপরাপর প্রস্তাবে বলা হয়, ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের পোয়েট্স্ কর্ণারে কবির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে 'ঠাকুর বক্তৃতা' নামে শিক্ষামূলক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হউক।

মুক্তির প্রস্তাবে বাংলা সরকার—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অবিলম্বে মহাত্মার বিনা-সর্ত্ত মুক্তির দাবী করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব ভারত সরকারকে জানাইবার জন্য বাংলা সরকারকে অনুরোধ করা হয়। বাংলা সরকার এ অনুরোধ রক্ষা করিয়া ভারত সরকারের নিকট কি জবাব পাইয়াছেন সে কথা অবশ্য জানা যায় নাই।

জনগণের খাদ্যসরবরাহ—

১লা মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ-কে ফজলুল হক জানাইয়াছেন—গভর্ণমেণ্ট আপাততঃ একজন বেসামরিক দ্রব্য সরবরাহ বিভাগীয় মন্ত্রী নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; এই মন্ত্রী কেবল বেসামরিক দ্রব্যাদি সরবরাহ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন; তাঁহাকে অন্য কোন বিভাগের ভার বহন করিতে হইবে না। তাঁহার এই কার্য্যে একটি প্রতিনিধিমূলক ক্ষুদ্র কমিটী তাঁহাকে সাহায্য করিবে।—নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া জনগণের খাদ্য-সরবরাহের কি সুব্যবস্থা করেন, তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া রহিল। কারণ দেশে বর্ত্তমানে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সকলেই শঙ্কিত হইয়া আছে। বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসে খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা না হইলে এপ্রিল মাস হইতে দেশ যে চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

যাদুকর পি-সি-সরকার—

রাজপুতানার যোধপুর রাজ-দরবার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যাদুকর শ্রীযুক্ত পি-সি সরকার গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাজসভায় তাঁহার যাদুবিদ্যা দেখাইয়াছেন। যোধপুরের মহারাজা ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের দেশীয় রাজন্য তথায় উপস্থিত ছিলেন ও সকলেই তাঁহার খেলা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বেও যাদুকর সরকার মহীশূর, জয়পুর, সিরমুর প্রভৃতি বহু রাজ্যের রাজামহারাজাদের সম্মুখে তাঁহার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সৈয়দ নৌশের আলি—

গত ১লা মার্চ্চ সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে সৈয়দ নৌশের আলি পরিষদের স্পীকার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ১১৮ ভোট পাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র ৯৫ ভোট পাইয়াছেন। পরিষদের স্পীকার স্যার আজিজুল হক হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়া বিলাতে গমন করায় এই পদ শূন্য হইয়াছিল। সৈয়দ নৌসের আলি জনগণের সুপরিচিত। বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পরই তিনি বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে পদে নিযুক্ত থাকিয়া কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় অল্পকাল পরেই তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় দলে যোগদান করিয়া তদবধি দেশের সেবা করিতেছেন। আমরা তাঁহার নির্ব্বাচন সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ—

গত ১৬ই ফাল্গুন রবিবার বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিক মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ১০৪ তম জন্মদিবস উপলক্ষে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে ২৫ নং বাগবাজার ষ্ট্রীটে এক সভায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। রসিকমোহন এই বয়সেও যেরূপ কার্য্যক্ষম আছেন তাহা দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। তিনি আজীবন সাহিত্যসেবা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। বহু পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমরাও এই উপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি এবং তাঁহার দীর্ঘজীবনের জন্য শ্রীভগবৎ সমীপে প্রার্থনা জানাই।

বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েসন—

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে বঙ্গীয় সংস্কৃত এসোসিয়েশনের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত এসোসিয়েশন বর্ত্তমানে যেভাবে পরিচালিত হয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহারও পরিবর্ত্তনের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার করা যে প্রয়োজন সে বিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু কি ভাবে তাহা করা যায়, তাহা লইয়াই যত মতভেদ। আমাদের বিশ্বাস, বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হইলে সত্বরই ইহার একটা সুব্যবস্থা হইবে ও তদ্বারা দেশের পুরাতন সংস্কৃতি রক্ষিত হইবে।

বহরমপুরে পূর্ণিমা সম্মিলন—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের খাগড়ায় বাগচী বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পূর্ণিমা সম্মিলনের একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, রাজা শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায়, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, জেলাম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা জজ প্রভৃতি স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুব্রত রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সারথী শেঠ ও গায়ক শ্রীযুক্ত সুনীল রায় সম্মিলনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ডক্টর শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর শ্রীযুত কালিদাস নাগ সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সহিত প্রাচীন সাহিত্যিকগণের পরিচয় বর্ণনা করিয়া লিখিত একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ সভাস্থলে পাঠ করিয়াছিলেন। বহরমপুরে যাহাতে পূর্ণিমা সম্মিলনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, সভায় তাহারও চেষ্টা করা হইয়াছে। সরস্বতী পূজা দিবসে অনুষ্ঠিত এই উৎসব বহরমপুরবাসী সকলকেই আনন্দ-দান করিয়াছে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বরোদা ঃ ৫৪৩

রাজপুতানা ঃ ৫৪ ও ১৩৩

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে বরোদা দল এক ইনিংস ও ৩৫৬ রানে রাজপুতানা দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে।

রাজপুতানা প্রথমে ব্যাটিং পেয়েও কিছু সুবিধা করতে পারেনি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বেই মাত্র ৫৪ রানে রাজপুতানা দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ভি হাজারী এবং সি এস নাইডুর বোলিং মারাত্মক হয়েছিল। হাজারী ১৭ রানে ৪টি এবং নাইডু ২১ রানে ৫টি উইকেট পেয়ে রাজপুতানা দলের এই শোচনীয় অবস্থা করে। দিনের শেষে বরোদা দলের ৪ উইকেটে ১৮৮ রান ওঠে। এম এম নাইডু এবং সি এস নাইডু যথাক্রমে ৯১ ও ৪৭ রান করে নট্ আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় এম এম নাইডু এবং সি এস নাইডুর খেলাই উল্লেখযোগ্য ছিল। এম নাইডু ১৯৯ রান করেন; মাত্র এক রানের জন্তে ডবল সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। সি এস নাইডু পিটিয়ে খেলে ১২৬ রান তুলেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে বরোদা দলের ৮ উইকেটে ৫২২ রান উঠে। হাতে এখনও ২টা উইকেট।

তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভের ২০ মিনিট পর বরোদা দলের সব উইকেট পড়ে গিয়ে রান দাঁড়াল ৫৪৩। ঘোরপদে ৯৭ রান করে রান আউট হয়ে যান। মাসুম আলী ৪টি উইকেট পান ১৪৩ রান দিয়ে। আমেদ আলী ২৯ রানে ২টি উইকেট পেয়েছিলেন।

রাজপুতানা দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলো আর মধ্যাহ্ন ভোজের সময় এক উইকেটে রান উঠলো ৫৮। চায়ের ৪০ মিনিট পূর্ব্বে সব উইকেট খুইয়ে রান হ'ল ১৩৩। রঘুবীর দলের সর্ব্বোচ্চ ২৮ রান করেন।

ভারতের এক নম্বর গুগ্‌লী বোলার সি এস নাইডু এবারও বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করলেন। ৩৬ রানে তিনি ৭টা উইকেট পেলেন। ভি হাজারী পেলেন ৩১ রানে ২টি উইকেট।

হায়দরাবাদ ঃ ৩৫৫ ও ২৭৭

হোলকার ঃ ২৬৮ ও ১৭৭

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অপর দিকের ফাইনালে হায়দরাবাদ দল ১৮৭ রানে হোলকার দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠেছে।

হায়দরাবাদ দল প্রথমে ব্যাটিং নিয়ে দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৩০০ রান তুলে। আসাতুল্লা ১২৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় হায়দরাবাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় ৩৫৫ রানে লাঞ্চের ৪৫ মিনিট পূর্ব্বে। আসাতুল্লার ১৪৮ রান দলের সর্ব্বোচ্চ ছিল। ৩৮০ মিনিট কাল উইকেটের সামনে থেকে তিনি ২১টী 'চার'-এর বাড়ি মেরেছিলেন। উইকেটের চারি পাশে বিভিন্ন রকমের মার, তাঁর নির্ভুল ব্যাটিং দলকে বিজয় লাভে যেমন সাহায্য করে তেমনি দর্শকদের মুগ্ধ করে। এর পর উল্লেখযোগ্য রান ভরতচাঁদের ৫৭, আইবারার ৪৮ এবং ইব্রাহিমের ২৭ রান। জগদ্দল ৫৯ রানে এবং নিম্বলকার ৭০ রানে ৩টি ক'রে উইকেট পান।

হোলকার প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে এবং ২ উইকেটে রান উঠে ৬০। মুস্তাক আলী এবং জগদ্দলের তৃতীয় উইকেটের জুটীতে ৬৭ রান উঠলে দলের মোট রান হয় ১২৭। দিনের শেষে হোলকার দলের ৫ উইকেটে ১৮২ রান উঠে।

তৃতীয় দিনের লাঞ্চের পূর্ব্বে হোলকার দলের ইনিংস শেষ হয় ২৬৮ রানে।

মুস্তাক আলীর খেলাই বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ৭২ রান উঠতে সময় নেয় ১৬৫ মিনিট, কিন্তু রানে মাত্র ৩টে 'চার' ছিল। নিম্বলকার এবং ভায়া যথাক্রমে ৬১ এবং ৩৫ রান করে। গোলাম মহম্মদের বোলিং সব থেকে মারাত্মক হয়েছিল। ৫৮ রানে তিনি ৬টা উইকেট পান।

হায়দরাবাদ ৮৭ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে। লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না হারিয়ে ১৭ রান উঠে। দিনের শেষে হায়দরাবাদ্ ৫ উইকেটে ২১৫ রান করে।

চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে হায়দরাবাদের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৭ রানে শেষ হয়ে গেল। আসাতুল্লা ৭৮ রান করলেন। তাঁর রান এবারও দলের সর্ব্বোচ্চ হ'ল। আলি আব্বাসের ৬৩ রানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্বলকার ১৯ ওভার বল দিয়ে ৫৬ রানে ৪টা উইকেট পেলেন। সি কে নাইডু পেলেন ৩টে উইকেট ৩৯ রানে।

হোলকার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে। হাতে ২৪৮ মিনিট সময়, ৩৬৫ রান তুলতে পারলেই খেলায় বিজয়ী হবে। কিন্তু ১৭৭ রানে তাদের ইনিংস শেষ হয়ে গেল।

রিলিফ ফণ্ড ক্রিকেট ঃ

বাঙলা গভর্ণরের দল ঃ ২৮১ ও ২৪৬ (৪ উঃ ডিক্লঃ)
কুচবিহার মহারাজার দল ঃ ২৩১ ও ১৪৭

ইডেন উদ্যানে সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ড-এর সাহায্যার্থে একটি বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়। এই খেলায় বাঙ্গলার গভর্ণর দল ১৪৯ রানে কুচবিহার মহারাজার দলকে পরাজিত করে।

বাঙ্গলার গভর্ণর দলের প্রথম ইনিংসের উল্লেখযোগ্য রান কে বসু ৭২, এস গাঙ্গুলী ৬২, এন চ্যাটার্জ্জী ৩৮। মুস্তাক আলী ৭৭ রানে ৪টে উইকেট পান।

কুচবিহার মহারাজার দল প্রথম ইনিংসে ২৩১ রান করে। উল্লেখযোগ্য রান হয়েছিল একমাত্র আর গ্রিনের ৪১ এবং ধ্রুবদাসের ৩৬। মুস্তাক আলি, নিম্বলকার এবং ফানসেলকার কেউ নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। বাঙ্গলা গভর্ণর একাদশ ৫০ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে এবং দিনের শেষে ৩ উইকেটে দলের ১০৩ রান উঠলো। সি কে নাইডু এবং এস গাঙ্গুলী যথাক্রমে ২১ ও ৫২ রান করে নট আউট থাকেন। পরবর্ত্তী দিনে ৪ উইকেটে ২৪৬ রান উঠলে নাইডু ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে গভর্ণর একাদশ দলের উল্লেখযোগ্য রান ছিল সি কে নাইডুর ১১২ এবং এস গাঙ্গুলীর ৯৮ রান। বহুদিন পরে ভাগ্যলক্ষ্মী নাইডুর প্রতি সুপ্রসন্ন হলেন। ইডেন উদ্যানে এই শত রান নাইডুর প্রথম। ইতিপূর্ব্বে তিনি এই সম্মানলাভে সমর্থ হতে পারেন নি। এস গাঙ্গুলী দুর্ভাগ্যের জন্য মাত্র ২ রানের অভাবে শত রান পূর্ণ করতে পারলেন না।

কুচবিহার মহারাজার দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৭ রান করলে বাঙ্গলা গভর্ণর একাদশ ১৪৯ রানে বিজয়ী হ'ল। নাইডু মারাত্মক বোলিং করেন। মাত্র ৭ ওভার বল দিয়ে ৩৬ রানে তিনি ৩টী উইকেট পান।

ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিদ্ধান্ত ঃ

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে আম্পায়ার ভাবে পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিপক্ষে যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রতিবাদ স্বরূপ পশ্চিম ভারত দলের পরিচালকগণ ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কাছে এক আবেদন করেছিল। কিন্তু কণ্ট্রোল বোর্ড এই আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে ভাবের সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে নিয়েছে। ঘটনায় প্রকাশ, বরোদা দলের সঙ্গে খেলায় পশ্চিম ভারত রাজ্যদলের দ্বিতীয় ইনিংসে যখন শান্তিলাল গান্ধী ব্যাট করছিলেন সেই সময়, আম্পায়ার ভাবে ওভারের মধ্যে 'সময় হয়েছে' এরূপ নির্দ্দেশ দেন। ফলে শান্তিলাল বিচলিত হয়ে পিটিয়ে বল মারতে গিয়ে আউট হন। ওভারের চারটি বল তখনও বাকী এক্ষেত্রে আম্পায়ারের 'সময় হয়েছে' এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া যে বে-আইনী ক্রিকেট খেলার এই আইনের উপর ভিত্তি করেই প্রতিবাদ জানান হয়। ক্রিকেট খেলায় 'ওভার' শেষ না হলে 'সময় হয়েছে' এরূপ নির্দ্দেশ আম্পায়ার দিবে না এইরূপ উক্তি এম সি সির ক্রিকেট আইনে লিখিত আছে। আমরাও জানতাম দু একটী বল দেবার পর যদি নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় তাহলে বাকি বলগুলি না দেওয়া পর্য্যন্ত আম্পায়ারদের অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে সে ধারণা ত্যাগ করতে হ'ল। ক্রিকেট সম্পূর্ণ বিদেশী খেলা এবং বিদেশী আইন অবলম্বন করেই এ দেশে এতদিন ক্রিকেট খেলা চলে আসছে। আজ হঠাৎ সেই আইন লঙ্ঘন করার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে সে কথা স্পষ্ট করে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রকাশ না করায় তাদের এই বিচারের উপর নিরপেক্ষ মাত্রেই ক্ষুণ্ণ হবে। খেলায় পশ্চিম ভারত রাজ্য মাত্র চার রানে পরাজিত হয়েছে। খেলার সেই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় আম্পায়ার ভাবের এইরূপ আচরণ যদি প্রকাশ না পেত তাহলেও যে পশ্চিম ভারত রাজ্য পরাজিত হ'ত এ কথা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারে না; বরং খেলার সেই অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় পশ্চিম ভারত রাজ্যের জয় লাভের সম্ভাবনা বেশী ছিল। বরোদা দলের জয়লাভ অপেক্ষা পশ্চিম ভারত রাজ্যদলের গৌরবজনক পরাজয়, আম্পায়ার ভাবের আচরণ এবং সর্ব্বোপরি ক্রিকেট কণ্টোল বোর্ডের সিদ্ধান্তই আমাদের বেশী ক'রে মনে থাকবে।

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস ঃ

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের ২০তম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালী এ্যাথলেটরা নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করতে পারেন নি। খেলাধূলায় আমাদের দেশের যুবকরা যে কি পরিমাণ অকৃতকার্য্য হচ্ছেন তার পরিচয় বর্ত্তমান বছরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল থেকেই পাওয়া যাবে। যুবকদের মধ্যে খেলাধূলার স্পৃহা যেমন কমেছে তেমনি খেলায় তাঁদের ষ্ট্যাণ্ডার্ডের অবনতি দেখা দিয়েছে। বেঙ্গল অলিম্পিক প্রতিযোগিতার অধিকাংশ অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হয়েছেন বৈদেশিক সৈনিক কিম্বা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এ্যাথলেট। বাঙ্গালী এ্যাথলেটের যোগদানের সংখ্যাও খুব কম।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন আর আর সি (এ এফ-এর) ম্যানলি। তিনি মোট ৩৬ পয়েণ্ট পেয়েছেন।

৯৬ পয়েণ্ট পেয়ে ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব টিম চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

শ্রীমতী ই জনসন এবং কুমারী ফেরন উভয়ে ২৪ পেয়েণ্টে মেয়েদের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন।

ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব ৬০ পয়েণ্ট নিয়ে মহিলাদের টীম চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

এ বছর হপ ষ্টেপ জাম্প, ১০০০ মিটার দৌড় এবং বর্শা-নিক্ষেপে নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

ফলাফল :

১০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম—ডি ফেরণ (মেসারার্স), ২য়—এম এইচ খাঁ (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—সেক ওয়াজেদ (আই এ ক্যাম্প)। সময়—১১ ২/৫ সেকেণ্ড।

১০০ মিটার দৌড় (মহিলাদের) :—১ম—মিস আর ফেরণ (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—মিস ডলি সেন (আই এ ক্যাম্প), ৩য়—মিস পদ্ম দত্ত (শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান)—সময়—১৩ ৩/৫ সেঃ।

২০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম—সেখ ওয়াজেদ

(আই এ ক্যাম্প), ২য়—এম এস আরফিন (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—রোনাল্ড পেরিরা (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব) সময়—২৪ ১/৫ সে: ।

গোলা ছোড়া (সাধারণ) :—১ম—এস কে মিত্র (বাটা সু কোম্পানী), ২য়—কেদারনাথ (আই এ ক্যাম্প) ৩য়—পুবিলাল (আই এ ক্যাম্প) দূরত্ব—৩২ ফি: ৭।৹ ইঞ্চি ।

৫০ মিটার দৌড় (মহিলাদের) :—১ম—মিস আর ফেরণ (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—মিস ডলি সেন (·আই এ ক্যাম্প); ৩য়—মিস পদ্ম দত্ত (শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান) সময়—১২/৫ সে: ।

১০০ মিটার দৌড় (জেলা) :—১ম—আব্দুল হামিদ (২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসো:), ২য়—শিবদাস বাউল (হাওড়া স্পোর্টস এসো:), ৩য়—আশুতোষ দত্ত (২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসো:) সময়—১২ সে: ।

১১০ মিটার হার্ডল (সাধারণ) :—১ম—ডি ই ফেরণ (মেসারার্স), ২য়—জি হাউইট (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—বি ভট্টাচার্য্য (আই এ ক্যাম্প) সময়—১৬২/৫ সেকেণ্ড ।

৪০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম সার্জ্জেণ্ট ফিনলে (সৈন্য দল), ২য়—এস সি মুখার্জ্জি (আই এ ক্যাম্প), ৩য়—এন দাস (আই এ ক্যাম্প) ;. সময়—৫২২/৫ সে: ।

পোল ভল্ট (সাধারণ) :—১ম—এ মুখার্জ্জি (এ আর পি), ২য়—এস চক্রবর্ত্তী (আই এ ক্যাম্প), ৩য়—রুস্তম আলী (এ আর পি), উচ্চতা—১০ ফি: ১০।০ ই: ।

৮০ মিটার হার্ডল (মহিলাদের) :—১ম—মিসেস ই জনসন (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব) ; সময়—১৭ সেকেণ্ড ।

৫০০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) :—১ম—আর সি ম্যানলে (আর এ এফ), ২য়—কর্পোরাল জে কে ব্যাঙ্ক (আর এ এফ), ৩য়—এল এ সি ই জোন্স (আর এ এফ) ; সময়—১৭ মি: ৪৩/৫ সে: ।

১১০ মিটার হার্ডল (জেলা) :—১ম—জহর চ্যাটার্জ্জি (২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসো:), ২য়—আব্দুল কাদের (মুর্শিদাবাদ জেলা স্পোর্টস এসো:), ৩য়—নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, (২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসো:) ; সময়—১৯ সে: ।

৪ × ৩০০ মিটার রীলে, (সাধারণ) :—১ম—সৈন্য দল ; ২য়—আই এ ক্যাম্প ; সময়—২ মি: ৩৯ সে: ।

৪ × ১৫০ মিটার রীলে, (মহিলাদের) :—১ম—ক্যালকাটা ওয়েষ্ট ক্লাব ; ২য়—শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ; সময়—১ মি: ৩৬ ১/৫ সে: ।

হপ ষ্টেপ ও জাম্প (সাধারণ) :—১ম—পি গডফ্রে (ক্যাল ওয়েষ্ট ক্লাব) ; ২য়—জি হাউইট (ক্যাল: ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—এস ভড় (এ আর পি) ; দূরত্ব—৪৩ ফি: ৯ ই: (বেঙ্গল রেকর্ড) ।

১৫০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) : ১ম—আর সি মউসি (আর এ এফ), ২য়—টি আর ষ্টারলিং (ক্যাল ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—জেমস রীড (আর্মি) সময়—৪ মি: ২৪ সে:

বর্শা নিক্ষেপ : ১ম—এইচ হোসেন (ক্যাল ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—এস সোকিয়াম (ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—এস সিংহ (বি এন আর), দূরত্ব—১৫৯ ফি: ৪ই:

হাইজাম্প : ১ম—রুস্তম আলি (আর এ এফ), ২য়—বি বসু (আই এ ক্যাম্প), ৩য়—এস আর মিডদয়া (২৪ পরগণা) উচ্চতা—৫ ফিট ৯৫-৪ই ।

লং জাম্প (জেলা) : ১ম—এ হামিদ (২৪ পরগণা), ২য়—এস ঘোষ (ঐ), ৩য়—এস মিডদয়া (ঐ) দূরত্ব—২০ ফি: ৪ ই:

লং জাম্প (সাধারণ) : ১ম—জি হাউইট (ওয়েষ্ট ক্লাব), ২য়—পি গডফ্রে (ঐ), ৩য়—ব্রাডরিক (আর্মি) দূরত্ব—২১ ফি: ৬।০ ই:

৮০০ মিটার দৌড় (সাধারণ) : ১ম—জে রীড (আর্মি), ২য়—টি ষ্টার্লিং (ওয়েষ্ট ক্লাব), ৩য়—জে ব্যাঙ্ক (আর এ এফ) সময়—২ মি: ৮ সে:

ডিসকাস থ্রো (সাধারণ) : ১ম—লি (আর্মি), ২য়—অসিত দাস (ইণ্ডি: এ্যাথ, ক্লাব), ৩য়—ব্যাসফোর্ড (আর্মি), দূরত্ব—১১ ফি: ৮ই:

বেঙ্গল ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ বার্ষিক বেঙ্গল ভলিবল চ্যাম্পিয়ানসীপ টুর্ণামেণ্ট শেষ হয়েছে । প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিজয়ী সংজ্ঞ ১৫-৯, ১১-১৫ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে বৈষ্ণবাটীর ইউনিয়ন স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করেছে ।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "মাটির মায়া"—১।৹
শ্রীবাণীকুমার প্রণীত উপন্যাস "অভিচার !"—১॥৹
শ্রীসরলা বসু রায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মরণোৎসব"—১৲
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত প্রবন্ধ পুস্তক "সাহিত্যের স্বরূপ"—১।৹
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র-সম্পাদিত "আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প"—১৲
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "পথের ডাক"—১।৹
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "শেষ প্রশ্নের পরে"—২॥৹
শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "নব মেঘদূত"—১॥৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
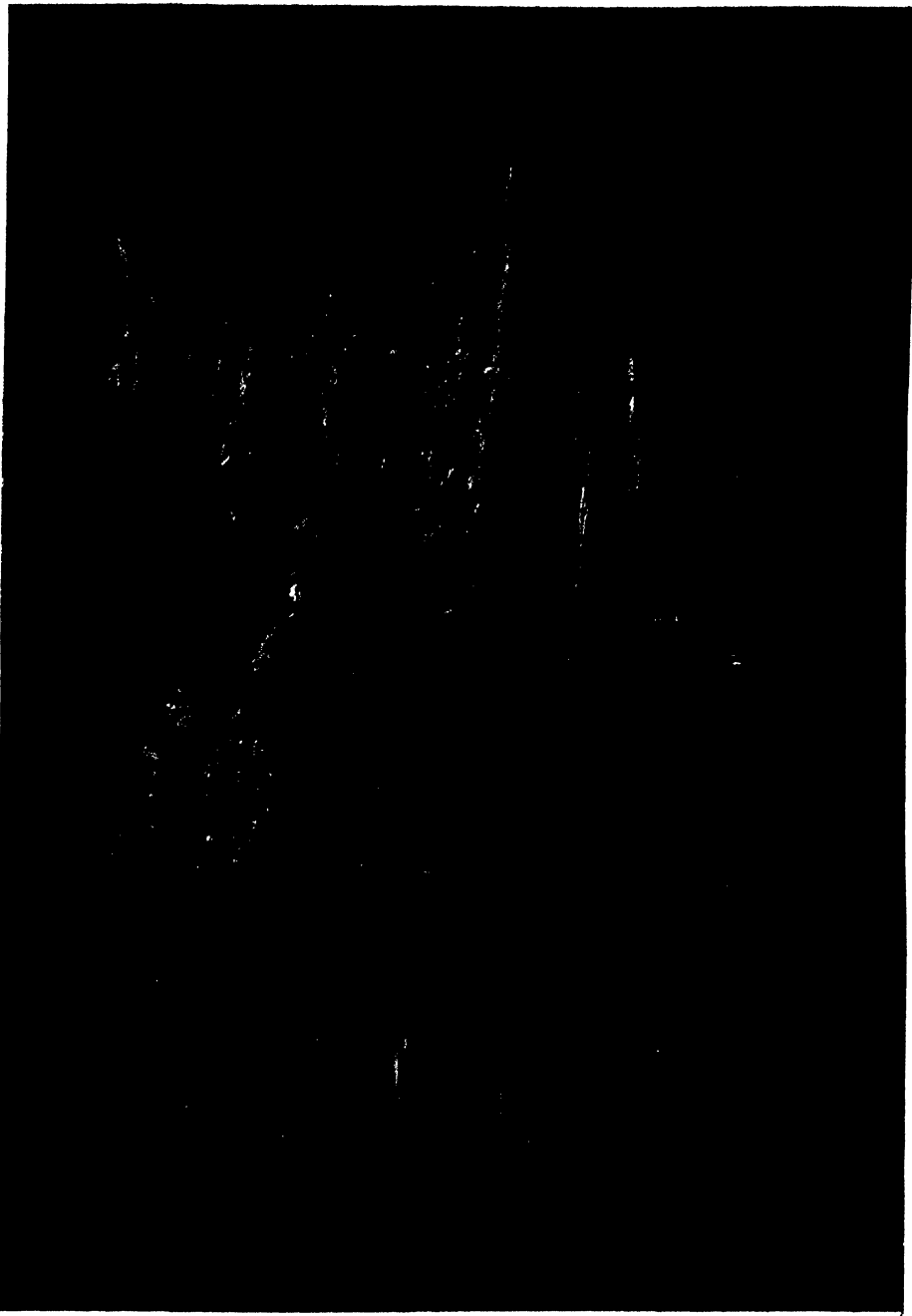
শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

বৈশাখ—১৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সংসারধর্ম্ম ও গীতা

শ্রীঅনিলবরণ রায়

গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করা, সেই জন্য গীতা কোথাও কর্ম্মের উপর আবার কোথাও জ্ঞানের উপরেই জোর দিয়াছে, আবার কর্ম্মের কথা বলিতে বলিতে জ্ঞানের কথা আনিয়াছে, জ্ঞানের কথা বলিতে বলিতে কর্ম্মেরও ইঙ্গিত দিয়াছে। প্রথম প্রথম অর্জ্জুনের পক্ষে এই সমন্বয়-তত্ত্ব বুঝা কঠিন হইয়াছিল। গীতার গুরু শেষ পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের সংশয় সম্পূর্ণভাবে দূর করিয়াছিলেন—কিন্তু গীতার ব্যাখ্যাকারিগণের মধ্যে এই সংশয় আজিও দূর হয় নাই। তাই দেখিতে পাই কেহ গীতার শিক্ষাকে জ্ঞান যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আবার কেহ ইহাকে কর্ম্মযোগ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। বর্ত্তমানে মানুষ স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেছে, গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছে—এইটিই গীতার শিক্ষা, গীতার আদর্শ বলিয়া আজকাল অনেকেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্ত্রীপুত্র পালন কর, দেশের ও সমাজের হিতসাধন কর, মানব জাতির সেবা কর—ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ, গীতার আদর্শ। ইহা যে আধুনিক আদর্শ, যুগধর্ম্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু এই আদর্শের সমর্থন খুঁজিবার উদ্দেশ্য লইয়া যদি আমরা গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে গীতার নানা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার ন্যায়—গীতাকে উপলক্ষ করিয়া আমরা আমাদের নিজেদের মতটিই প্রচার করিব—গীতার প্রকৃত শিক্ষা কি, মূল শিক্ষা কি তাহা ধরিতে পারিব না। আধুনিক আদর্শটি হইতেছে মূলতঃ পাশ্চাত্য আদর্শ, মানবধর্ম্মের আদর্শ—কিন্তু ইহার মধ্যে সত্য কতটুকু আছে, ইহার ত্রুটি কোথায় তাহা যদি আমরা বুঝিতে চাই এবং সেজন্য গীতার মহতী শিক্ষা হইতে সাহায্য ও আলোক লাভ করিতে চাই তাহা হইলে আমাদিগকে সকল মানসিক আদর্শ বা মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ খোলা মন লইয়া গীতার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গীতা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলে নাই, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করা, সর্ব্বকর্ম্মাণি, গীতার আদর্শ—কিন্তু বর্ত্তমানে মানুষ যে-ভাবে কর্ম্ম করে তাহার মূলে রহিয়াছে রাজসিক বাসনা ও অহংভাব, ইহাই সংসারের সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব অশান্তির মূল। এই বাসনা ও অহং ভাব নির্ম্মূল করাই গীতার শিক্ষা। এইখানে গীতার সহিত বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের শিক্ষার বেশই মিল রহিয়াছে এবং সেই জন্যই গীতা এখানে পুনঃ পুনঃ "নির্ব্বাণ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার

সম্পত্তি—এইরূপ বোধ যতদিন আমাদের মনে রহিয়াছে ততদিন আমরা গীতার আদর্শ হইতে বহু দূরে। লোকে বলে সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতেছি—ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ, ইহাই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম সাধনা। কিন্তু ইহা হইতেছে আত্ম-প্রতারণা। মানুষ স্ত্রীপুত্রের প্রতি মমতা ও আসক্তির বশে তাহাদের জন্য কর্ম্ম করে, কেবল মুখে বলে যে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিতেছি। যখন কোন কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয় তখনই এই ভিতরের গলদটি বাহির হইয়া পড়ে—কুরুক্ষেত্রে আসিয়া অর্জ্জুনের প্রথমে তাহাই হইয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য পালনের জন্যই তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন—কিন্তু বস্তুতঃ তিনি নিজের ও ভ্রাতাদের জন্য রাজ্য কামনায়, যশ, মান, প্রতিষ্ঠা কামনায়, নিজেদের ভোগ সুখ কামনায় যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন—তাই যখন তিনি দেখিলেন যে, শাস্ত্রানুযায়ী কর্ত্তব্য করিতে হইলে তাঁহাকে নিজ হস্তে তাঁহার সকল স্নেহের বন্ধন, মমতার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, আপনার জন সকলকে নিজ হস্তে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতে হইবে তখন তিনি শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সকল দুঃখের মূল এই অহং ভাবকে দূর করিতেই হইবে—নির্ম্মম নিরহঙ্কার হইতে হইবে—আমরা যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবন যাপন করিতেছি, কর্ম্ম করিতেছি—এইটিকে ভাঙ্গিয়া, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, আভ্যন্তরীণ সত্তায় ব্রহ্মের সহিত এক হইতে হইবে। সংসারে সকল বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া এইরূপ ব্রহ্ম ভাব লাভ করা সহজ নহে—নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিয়া এইরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়; এর জন্য বর্ত্তমানে মানুষ যে-ভাবে সাংসারিক জীবন যাপন করিতেছে, ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া অপরিহার্য্য—এখানে গীতার শিক্ষার সহিত সন্ন্যাসীদের শিক্ষার বেশ মিল রহিয়াছে—

> বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
> শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
> বিবিক্তসেবি-লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
> ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
>
> ১৮।৫১,৫২

তবে গীতা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের যে অর্থ দিয়াছে তাহাতেই হইয়াছে গীতার সহিত সন্ন্যাসীদের প্রভেদ। গীতা বাহ্য বিষয় ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগ প্রশংসা করে নাই—ভিতরে বাসনা ত্যাগ, আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছে এবং সর্ব্বদা নিষ্কামভাবে ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম্ম করিতে বলিয়াছে। তবে এই সাধনার জন্য সাধারণ সাংসারিক জীবন হইতে সরিয়া যাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। যখন সিদ্ধিলাভ হইয়াছে—সাধক অহংভাবের নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—তখন তিনি সংসারের সকল কর্ম্মই করিতে পারেন। তখন তিনি নির্জ্জনে ধ্যানে মগ্ন হইয়া বসিয়া না থাকিয়া অতন্দ্রিতভাবে সর্ব্বভূতের হিতের জন্য কর্ম্ম করিবেন—ইহাই গীতার শিক্ষা।

তবে এই সাধনার জন্য সাংসারিক জীবন ছাড়িয়া যাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, সকলেই ইহার যোগ্য নহে—এইরূপ অনধিকারী ব্যক্তিকে সংসার ত্যাগের কর্ম্মত্যাগের শিক্ষা দিলে তাহাদের বুদ্ধিভেদ হইতে পারে—তাহারা উর্দ্ধের চৈতন্যে অর্দ্ধ উঠিয়া তামসিকতার মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইল—সেইজন্যই গীতা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে কর্ম্মত্যাগ, সংসার ত্যাগের আদর্শ ধরিতে নিষেধ করিয়াছে। যে যে অবস্থায় আছে—সেই অবস্থানুযায়ী কর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিতভাবে করিয়া যেন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—এই উপদেশই দিয়াছে এবং সেই জন্য প্রাচীন বর্ণধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিকে আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম যজ্ঞভাবে করিতে বলিয়াছে। কিন্তু এইটি হইতেছে গীতার কর্ম্মযোগের প্রাথমিক অবস্থা—অথবা কর্ম্মযোগের জন্য মন, প্রাণ, হৃদয়কে তৈয়ারী করিবার সাধনা। গীতার শিক্ষার এইরূপ স্তরভেদ আছে—গীতা সাধনায় কেমন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয় দেখাইয়া দিয়াছে—ইহা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিব না—নিম্ন অধিকারীগণের পক্ষে গীতা যে উপদেশ দিয়াছে, সেইটিকেই গীতার চরম শিক্ষা বলিয়া ভুল করিব।

আজকাল আমাদের দেশে দেশের জন্য, সমাজের জন্য কর্ম্ম করিবার একটা প্রবল প্রেরণা আসিয়াছে এবং ইহার বশে অনেকেই ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকে জীবন-বিরোধী কর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া নিন্দা করিতেছেন; আবার কেহ কেহ এই পাশ্চাত্য কর্ম্ম-প্রবণতার আদর্শটিকেই গীতার শিক্ষা বলিয়া, ভারতের প্রকৃত অধ্যাত্ম শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। কর্ম্মবিমুখ অবসাদগ্রস্ত ভারতে যাঁহারা এই সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মের প্রেরণা জাগ্রত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে অনেকে স্বামী বিবেকানন্দকে আজও ভুল বুঝিতেছেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"ফেলে দে নিজের মুক্তি, ফেলে দে ধ্যান;—মানুষ কি কথা, দেশের একটা কুকুর যতদিন অভুক্ত থাকিবে ততদিন তাকে আহার দেওয়াই আমার ধর্ম্ম, আর সব অধর্ম্ম।" এই সব বজ্রধ্বনির ভিতর দিয়াই ভারতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইয়াছে—আর এই বাণী আধুনিক যুবকদিগের প্রাণে যে সাড়া তুলিতেছে, ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শ তাহা তুলিতে পারে নাই। ইহার কারণ স্বামী বিবেকানন্দকে এবং ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শকে লোকে এখনও ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই।

স্বামীজী ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অভুক্ত থাকিলেও তিনি কোন দিন নিজে ধ্যান জপ পরিত্যাগ করেন নাই, আর অধ্যাত্ম সাধনা ছাড়িয়া দিয়া দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলনেও প্রবৃত্ত হন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ জগতে অতুল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন—জনসেবার জন্য মিশন স্থাপন করিয়া নহে, এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য খ্রীষ্টানগণই তাঁহার অগ্রগামী। তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম ছিল বেদান্ত ও অধ্যাত্ম-সাধনার আদর্শ প্রচার, ইহার জন্যই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যুবকগণকে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়াছিলেন—অতএব তাঁহার দোহাই দিয়া অধ্যাত্ম সাধনাকে হেয় করা চলে না।

স্বামীজী ১৮৯৪ সালে সিকাগো হইতে লিখিত একখানি পত্রে নিজ জীবন-ব্রত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—"এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং

এখনো করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহাগুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না। আর তাহা ছাড়া, যে সকল যুবক বর্ত্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করিবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণ স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়াছে, তাহাদেরই বা কী অবস্থা হইত?… ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই, আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীরা তাহাদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়াপরার ধরা-বাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডীই যে কখনো অতিক্রম করিতে পারে না।…আমার সমাদর হউক আর না হউক, আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।" (উদ্বোধন —ফাল্গুন, ১৩৪৮)

ভারতবাসী ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অতি সঙ্কীর্ণ পারিবারিক গণ্ডীর বাহিরে যাইবার ক্ষমতা তাহাদের ছিলনা—এই মারাত্মক অবসাদ দূর করিবার জন্যই তিনি জনসেবার আদর্শ বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই। কিন্তু এই বাণী সকলের জন্য নহে। তিনি জনসাধারণের অন্নকষ্ট দূর করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই কষ্ট দূর হইলেই মানুষের সকল দুঃখ ঘুচিবে না, আর এই কার্য্যটিও করিতে হইলে—চাই অধ্যাত্ম সাধনা-সম্পন্ন কর্ম্মী এবং দেশব্যাপী অধ্যাত্ম আন্দোলন; অন্যত্র তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"So every improvement in India requires first of all an upheaval in religion. Before flooding India with socialistic or political ideas, first deluge the land with spiritual ideas. The first work that demands our attention is, that the most wonderful truths confined in our Upanishads, in our Scriptures, in our Puranas must be brought out from the books…and scattered broadcast all over the land, so that these truths may run like fire all over the country, from north to south, and east to west, from the Himalayas to Commorin, from Sind to the Brahmaputra." ("My plan of campaign"—Swami Vivekananda.) অর্থাৎ "ভারতের কোন উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চাই অধ্যাত্ম্ আন্দোলন। ভারতকে সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবধারায় ভাসাইয়া দিবার পূর্ব্বে, অধ্যাত্ম ভাবধারার বন্যা বহাইয়া দাও। আমাদের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইতেছে আমাদের উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য সত্য নিহিত রহিয়াছে সেই-গুলিকে বাহির করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া, যেন সেই সকল সত্য আগুনের ন্যায় আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হয়।"

সকলেই সমুচ্চ অধ্যাত্ম সাধনার অধিকারী নহে। যাহারা তমসাচ্ছন্ন অবসাদগ্রস্ত, তাঁহাদিগকে বৈরাগ্যের বাণী না শুনাইয়া তাহাদের স্বভাব ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁহাদিগকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিতে হইবে—ইহা গীতার শিক্ষা।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্। ৩।২৬

জ্ঞানী ব্যক্তি সাধারণকে কর্ম্মের আদর্শ দেখাইবার জন্য সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু "যুক্ত" হইয়া অর্থাৎ ভগবানের সহিত যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া—তাঁহারই কর্ম্ম প্রকৃত কর্ম্মযোগ। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মযোগী হইতে হইলে চাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। ৬।৩৫

মানুষ এখন যে-ভাবে পত্নী-পুত্র লইয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতেছে তাহার মধ্যে থাকিয়া এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না, তাই গীতার আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্মযোগী হইতে হইলে এক অবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, পত্নী-পুত্রের মায়া কাটাইয়া "নির্ম্মম" হইয়া অধ্যাত্ম সাধনায় ব্রতী হইতে হয়। গীতা যে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কিরূপ "নির্ম্মম" হইতে বলিয়াছে—'অর্জ্জুনের দৃষ্টান্তে প্রথমেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, অর্জ্জুনকে নিজ হস্তে আত্মীয় স্বজনকে বধ করিতে বলা হইয়াছে—এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মযোগী হইতে হইলে অনেক বৈরাগ্য-সাধনার প্রয়োজন। অতএব রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন,

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,'

ইহাতে আর যাহাই হউক, গীতার আদর্শ, ভারতের অধ্যাত্ম আদর্শটিকে পরিস্ফুট করা হয় নাই। আর রবীন্দ্রনাথের এই কথাটি যে আধুনিক ভারতীয়গণের মধ্যে অতিশয় প্রিয় হইয়াছে ইহাতে ভারতের উপর পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবই প্রমাণিত হয়। তবে সংসারে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া মানুষ অধ্যাত্ম-সাধনার জন্য কতকটা প্রস্তুত হইতে পারে—এবং এইখানেই হইতেছে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীতার শিক্ষা, গীতার আদর্শের বহুল প্রচারের সার্থকতা। যে যে অবস্থাতেই থাকুক তাহারই উপযোগী শিক্ষা গীতার মধ্যে আছে, আর গীতার শিক্ষা একটুমাত্র গ্রহণ করিতে পারিলেও অনেক লাভ হয়।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ২।৪০

"এই সাধনায় কোন সামান্য প্রয়াসও বৃথা হয় না। ইহাতে কোনই অনিষ্ট নাই, এই ধর্ম্ম স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও মহাভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।" অতএব স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারে বাস করিয়াও যাহারা গীতার শিক্ষা অনুযায়ী কাম-ক্রোধকে সংযত করা অভ্যাস করে, শাস্ত্র অনুযায়ী কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করে, সুখদুঃখ, মান অপমান, জয় পরাজয়ে সমভাব রক্ষা করে, পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগ করে, সর্ব্বত্র সকল সময়ে ভগবানকে স্মরণ করে, সকল কর্ম্ম যজ্ঞরূপে ভগবানে অর্পণ করে—তাহাদের দোষ ত্রুটি সকল ক্রমশঃ দূর হয়, পাপ ক্ষীণ হইয়া আসে—তখন তাহারা চরম সাধনার যোগ্য হইয়া উঠে। সেই চরম সাধনা হইতেছে, সকল কর্ত্তব্য, সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। সংসারে স্ত্রীপুত্র পরিজনে বেষ্টিত থাকিয়া—এ সম্পূর্ণ হয় না, ইহার জন্য সব কিছু পরিত্যাগ

করিতে হয় এবং এ পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের শিক্ষার সহিত গীতার শিক্ষার বেশ মিল আছে এবং ভারতে বহুকাল হইতেই এই ত্যাগের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, জাবেনি উপনিষদে বলা হইয়াছে, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ—যে দিনই বিষয়ে বৈরাগ্য হইবে সেই দিনই অন্যান্য আশ্রমের সম্বন্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

গ্রহস্থাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসিস্থিতঃ॥

—ভাগবত ১১।১৭।১২

"আমার কটিদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, আমার হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও আমার বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমার মস্তকে সন্ন্যাসাশ্রম অবস্থিত।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

অঙ্গনা

(গীতি ও নৃত্যনাট্য)

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ দৃশ্য

তক্ষশিলার বনবীথি ও লতামণ্ডপ। বসন্তোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। রাজা উৎসবের পুনরুদ্বোধন করিবার আদেশ দিয়াছেন। এবার উৎসব উদ্বোধনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে দেবী উৎপলার উপর।

অশোকমূলে বেদীর পুরোভাগে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুণী কৃপালী। রাণী উৎপলা উৎসব উদ্বোধনের পূর্ব্বে কৃপালীর পদধূলি লইতেছেন। রাণীর পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পুরাঙ্গনাগণ। রাণী ও পুরাঙ্গনা সকলে বাসন্তী রঙের পরিচ্ছদ ও পুষ্প আভরণে সজ্জিতা। সকলের বেশভূষায় সুস্পষ্ট পুজারিণী ভাব; শুধু কৃপালীর পরিধানে নৈমিত্তিক ভিক্ষুণী বেশ।—অশোকবেদী নানা উপকরণে সজ্জিত।

কৃপালী। (উৎপলার প্রণাম শেষে সস্নেহে দুই হাত ধরিয়া তুলিলেন)—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ভিক্ষুং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

রাণী ও পুরাঙ্গনাগণ। (হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন) বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ভিক্ষুং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

কৃপালী। এ উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হোক্। নব বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে তক্ষশিলার অধিবাসীদের জীবনে আসুক নূতন আনন্দের প্রেরণা।

রাণী। আমাদের পরম সৌভাগ্য! ভিক্ষুণী কৃপালী দয়া করে আজ পৌরহিত্যের ভার নিয়েছেন। এ বসন্ত উৎসব সার্থক হয়েছে।

কৃপালী। শান্তি! শান্তি! এই আনন্দের ভিতর দিয়েই আসুক বিশ্বমানবের কল্যাণ। (আশীর্ব্বাদ) রাজকুলবধূ উৎপলার জীবন শান্তিময়—আনন্দময় হোক্।

রাণী। শান্তি! জানি, এ আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হবে না। কিন্তু শান্তি তো পাচ্ছিনে দেবী। রাত্রিদিন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার অন্তর কেঁপে উঠ্ছে! সামান্য একটী কঙ্কনের জন্য আজ তক্ষশিলায় হবে প্রাণদণ্ড! আমি রাজার মহিষী; একটী কঙ্কন কত তুচ্ছ আমার কাছে। কিন্তু রাজা মানলেন না কোন অনুনয়। কি হবে, দেবী?

কৃপালী। রাজ্য শাসনের জন্য কঠোরতার প্রয়োজন হয়। সে কঠোরতা হয় তো নারীর পক্ষে অসহ্য। তাই ব'লে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা তো রাণীর কর্ত্তব্য নয়, কল্যাণি!

রাণী। সবই বুঝি, দেবী। তবুও ভাব্‌তে কষ্ট হয়। একটা তরুণ জীবন! সম্মুখে তার কত বড় ভবিষ্যৎ! আশা, আনন্দ, কল্পনা—সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে রাজার কঠোর আদেশে। নিদারুণ রাজদণ্ড!

কৃপালী। রাজা অমিতকীর্ত্তি ন্যায়বান। তিনি অবিচার করবেন না, রাণী। আপনি নিশ্চিন্তে উৎসবের আয়োজন করুন। রাজা হয় তো বিচার শেষে অমাত্যদের নিয়ে উৎসব মণ্ডপেই এসে উপস্থিত হবেন।

রাণী। আপনার আদেশই মাথা পেতে নিলেম, দেবী।

(কৃপালী অশোকমূলে করজোড়ে দাঁড়াইলেন)

কৃপালী। নির্ব্বাসিতা সীতা তোমার সুশীতল ছায়াস্পর্শে ক্লান্তি দূর ক'রেছে; যুগে যুগে নারী হ'য়েছে ধন্য তোমার কল্যাণস্পর্শে; হে ছায়া-স্নিগ্ধ অশোক! আজ নব-বসন্তের এই কিশলয়-উৎসবে আমরা তোমার বন্দনা করি।

কৃপালীর সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অশোককে নমস্কার করিলেন। কৃপালী ও রাণী বেদীমূলস্থিত পুষ্পপাত্র হইতে কিছু ফুল হাতে লইলেন। কৃপালী অগ্রণী হইয়া অশোক প্রদক্ষিণ করিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহার অনুগমন করিতে করিতে রাণী অশোক মূলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

রাণী। অশোক শোক রহিতায়ৈ নমঃ। নমো বসন্ত বধূ চারুহাসিন্তৈ নমঃ। (পুরাঙ্গনাদের প্রতি) বান্ধবীগণ, তোমরা ততক্ষণ আবাহন নৃত্যে বসন্তকে অভিনন্দিত কর।

কৃপালী ও রাণী অশোক প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গনাগণ খৈ ছড়াইয়া আবাহন সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা বসন্তকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে লাগিল।

অঙ্গনাগণ। (লাজাঞ্জলি সহ)

গান ও আবাহন নৃত্য

এসো— এসো সবুজ শাখায় দুলিয়ে পাখা
'সোণার বরণ!—এসো।
এসো প্রজাপতির রূপের মেলায়
ভরিয়ে ডালা—
চিত্তহরণ! এসো।
ফুলকলিদের গোপন বুকে
মিলন তৃষা;
তোমার লাগি ভ্রমর কাঁদে,
হারায় দিশা।
স্বপন-শরণ! এসো॥
এসো চঞ্চল মলয়ের অঞ্চল বহিয়া—
মৃদুল বকুল বনে রহিয়া রহিয়া—
এসো নব কিশলয়ে ফেলিয়া চরণ; —এসো।

(বিনতার প্রবেশ)

বিনতা। (নমস্কার করিতে করিতে) নমস্তে দেবী কৃপালি! নমস্তে রাণী উৎপললেখা! নমস্তে—নমস্তে।

রাণী। এই যে বান্ধবী বিনতা! মেঘ না চাইতেই জল! কিন্তু আজ যে একা?

বিনতা। দোসর তো আজও ভগবান দেন নি জুটিয়ে।

রাণী। কেন, পৌরনটী বিপাশা!

বিনতা। পৌরনটী বিপাশা পেয়েছেন এবার সৌরজগতে গৌরবের স্থান। আমার পাশায় এখনো আসে নি দান। হারজিতের খেলা তাই আজও শেষ হয় নি।

কৃপালী। ওঃ! (মৃদু হাসিলেন)

রাণী। হেঁয়ালি তো ঠিক বুঝ্‌লেম না, বিনতা!

বিনতা। সময় হ'লে আপনিই বুঝ্‌বেন। বিপাশা খুঁজ্‌ছে মুক্তির পথ, তাই তার সোণার রথ এবার ধীরে ধীরে পুষ্পক হ'য়ে উঠ্‌ছে আমাদের চোখে।

রাণী। তার মানে?

বিনতা। মানেটা কি রাণী উৎপললেখাকেও বুঝিয়ে দিতে হবে?

কৃপালী। হবে বৈ কি। বান্ধবীর মনের কথা তো পথচারী জান্‌বে না।

বিনতা। কিন্তু দেবীর তো দেখ্‌ছি অগোচর নেই। পথচারীকে নিয়েই তো ঘটেছে বিপাশার জীবনে বিপ্লব। তাই আজ ঘর ছেড়ে পথে ব'সবার নেশায় সে হ'য়েছে পাগল। তার যৌবনের সুবর্ণ পতাকা এবার উড়বে তক্ষশিলার পথে পথে।

কৃপালী। বান্ধবী বিনতার পতাকাই বা নিশ্চল হবে কেন?

বিনতা। পথের বাইরে যে ধ্বজা বেঁধেছে, তার পতাকা কি সচল হয় কোনদিন?

রাণী। কেন হবে না?

বিনতা। হবার সুযোগ নেই, তাই। বিপাশা আজ সত্যই হ'য়েছে বিজয়িনী। তাই নটীর জীবনে অঙ্গনার মর্য্যাদা আপনা থেকেই দিয়েছে ধরা। যৌবন সমুদ্র মন্থন ক'রে ওর অন্তরে জেগে উঠেছে আজ চিরন্তনী উর্ব্বশী: এক হাতে বিষপাত্র অন্য হাতে অফুরন্ত অমৃতের উৎস।

রাণী। বিপাশার নামে আজ এত উচ্ছ্বাস! শুনিই না ব্যাপারটা কি?

বিনতা। ব্যাপার মোটেই জটিল নয়। পথে যেতে অভিসারিকা বিপাশার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয় হ'লো এক বিদেশী বণিকের। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওর দেহমনে উঠ্‌লো বিপ্লবের ঝড়। সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রলো সেই নিরাশ্রয় পথিকের উদ্দেশে। নাম সুবর্ণ গুপ্ত, কেরলের অধিবাসী। একদিন শ্রেষ্ঠী ছিলেন, আজ নিঃস্ব।

রাণী। সুবর্ণ গুপ্ত? (চিন্তান্বিতা হইলেন)

বিনতা। হাঁ, সুবর্ণ গুপ্ত। সোনার মত গায়ের রঙ, সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের দীপ্তি।

কৃপালী। তার পর?

বিনতা। তারপর ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। ওদের প্রেম সফল হ'লো। বিপাশা পেলো অঙ্গনার মর্য্যাদা। পাবে নারীর সম্মান,—গৃহ—সমাজ—সন্তান।

রাণী। তবে যে শুনেছিলেম—কঙ্কন চুরির অপরাধে যে ধৃত হ'য়েছে, সে এক বিদেশী বণিক; নাম সুবর্ণ গুপ্ত!

বিনতা। একই ইতিহাসের সে এক অধ্যায়। নির্ব্বিঘ্নে বিপাশা তাঁর নৌকা বিপদ সমুদ্র পার ক'রে এনেছে। এবার তুলে দেবে ওরা নির্ম্মল প্রেমের শুভ্র পাল। ওদের ডিঙা সপ্ত সমুদ্র পার হ'য়ে চলবে জয়যাত্রার পথে।

রাণী। বল কি, বল কি বিনতা; সুবর্ণ গুপ্ত পেয়েছে মুক্তি? জানো, ঠিক জানো তুমি?

বিনতা। জানি; মুক্তি না পেয়ে থাক্‌লেও, পাবে নিশ্চয়ই।

রাণী। শুনে নিশ্চিন্ত হ'লেম।

কৃপালী। কিন্তু, আমি হ'লেম চিন্তিত।

রাণী। হয় তো এমনিই। কিংবা কারণ আছে অনেক। বন্ধনের ভিতর দিয়ে কারো বা আসে মুক্তি, আর কেউ বা মুক্তির পথে দাঁড়িয়ে নতুন ক'রে গ্রন্থি বাঁধে বন্ধনের। যে মরে সে হয় অমর, যে বাঁচে সে তলিয়ে যায় মৃত্যুর অতল তলে।

(নেপথ্যে)

জয়তু অমিতকীর্ত্তি! রাজরাজেশ্বরো বা,
জয়তু নরপতি।
জীব-জীবন লালন গৌরব,
দিশি দিশি সুযশঃ সৌরভ,
বিমলজ্ঞান শুভ্র-কীর্ত্তি ভূপতি।

রাণী। ওই যে, রাজা তাঁর অমাত্যদের নিয়ে এই দিকেই আসছেন। দেবী কৃপালী, বিনতা, আপনারা উৎসব করুন। আমি পুরাঙ্গনাদের নিয়ে মন্দির পথে যাই।

বিনতা। আসুন।

কৃপালী। (মস্তক বাঁকাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। রাণী ও পুরাঙ্গনাগণ মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অপর পথ দিয়া চারণগণ ও তাহাদের পশ্চাতে রাজা, কবি, মিত্রানন্দ, সেনাপতি প্রভৃতির প্রবেশ। কৃপালী ও বিনতা সকলকে অভিবাদন করিলেন।

চারণগণ। জয়তু অমিতকীর্ত্তি রাজ রাজেশ্বরো বা
জয়তু নরপতি।
জীব জীবন লালন-গৌরব,
দিশি দিশি সুযশঃ সৌরভ
বিমল জ্ঞান শুভ্র কীর্ত্তি ভূপতি।
(অশোক প্রদক্ষিণ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল)

অমিতকীর্ত্তি। এই যে দেবী কৃপালী, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

কৃপালী। (সসম্মানে) জয়স্তু রাজন্‌।

অমিত। এই যে, পৌরবান্ধবী বিনতা!

বিনতা। নমস্তে রাজন্‌।

মিত্রানন্দ। এবার দেখ্‌ছি অশোককে আর দোহদ দিতে হবে না। তার শাখায় আপনা-আপনি ফুটবে বকুল, পলাশ, কুরুবক, চন্দ্রমল্লিকা।

কবি। সে কি, মিত্র? অশোকের শাখায় বকুল-পলাশ!

মিত্রানন্দ। আজ্ঞে অবিকল। যাঁরা উদ্বোধনের আয়োজন ক'রেছেন, তাঁরা তো আর আমাদের মত নীরস তরুবর নন্‌। তাঁরা সব অঘটন ঘটন পটিয়সী—অর্থাৎ যাঁরা দিনকে রাত, রাতকে দিন ক'রতে পারেন।

অমিত। অঘটন ঘটন পটিয়সী যা সা মায়া। নারীই তো সেই মায়ার প্রতীক্‌। পারেন, ওঁরা সবই পারেন।

কবি। পারলেও, সখা মিত্রানন্দের কোন লাভ নেই। কারণ পুষ্পশাখায় কল্পান্তর ঘটলেও তো মিত্রের চিত্তবিকার দূর হবার কোন ভরসা নেই।

মিত্রানন্দ। না থাক্‌লেও, কিঞ্চিৎ বাতাস তো পাওয়া যাবে।

অম্বপালি। মিত্র সেই আনন্দেই থাকুন। কবির কথায় বলতে গেলে—এও সেই রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

কবি। তোমার অঙ্গের ছোঁয়া অঙ্গে মোর বুলাবে পরশ,
প্রভাতের মৃদু সমীরণে—
স্নিগ্ধবাস চম্পকের মত
মদির কুঙ্কুম গন্ধ তনুমন করিবে অবশ।

অমিত। সাধু, সাধু কবিবর!

অশ্বপালি। বয়স্য মিত্রানন্দও বিশেষ অসাধু নন্, মহারাজ। তবে, এই বসন্ত সমাগমে মাঝে মাঝে ওঁর চিত্তে বুদ্‌বুদ্ দেখা দিচ্ছে।

মিত্রানন্দ। বুদ্‌বুদ্ তবুও ভাল মহারাজ। অনেকের গোপন অন্তরে যে রসের গাঁজলা বেঁধে উঠ্‌বার যোগাড় হ'য়েছে।

অমিত। সাধুবাদ আজ একবাক্যে সকলকেই জ্ঞাপন করা উচিত। কি বলেন, দেবী কৃপালী?

কৃপালী। মহারাজ সুবিবেচক। কিন্তু আর কালক্ষেপ না ক'রে উৎসবের সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করুন, মহারাজ!

বিনতা। হাঁ। বিলম্বের তো আর কোন কারণ নেই, মহারাজ। বিশেষ, রাজরোষ যখন নিবৃত্ত হ'য়েছে।

অমিত। রাজরোষ! (সহসা চমকিয়া উঠিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনতার মুখপানে চাহিলেন) হাঁ, রাজরোষ নিবৃত্ত হ'য়েছে। তক্ষশিলায় এবার পূর্ণাহুতি হ'য়েছে অনাচারের। সেনাপতি অশ্বপালি, আমার আদেশ ঘোষিত করুন—তক্ষশিলার গৃহে গৃহে আবার হোক আনন্দ উৎসব।

বিনতা। কিন্তু মহারাজ, যে গৃহের আনন্দ এই পূর্ণাহুতির সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের মত গেল নিবিয়ে, সেখানে কি আর ফুট্‌বে উৎসবের হাসি?

অশ্বপালি। বিনতা!

বিনতা। (সসম্ভ্রমে) আদেশ করুন।

অশ্বপালি। অকারণ দুঃখিত হবেন না। রাজশক্তি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনে যন্ত্র-পুত্তলির মতই দণ্ড ধারণ করে। কখনও কারো মুখাপেক্ষী হয় না।

বিনতা। জানি সেনাপতি। কিন্তু এ-ও জানি, রাজশক্তি বিচার করে, শুধু শাস্তিই দেয় না।

অমিত। (চম্‌কাইয়া উঠিলেন) পৌর বান্ধবী!

বিনতা। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

কৃপালী। (নিরস্ত করিয়া) বান্ধবী বিনতা!

কবি। পলকে পলকে আসে বিস্ময় ফুলের জোয়ার,
আকাশে বাতাসে চলে রাত্রিদিন কত কানাকানি;
তবু কাঁদে রুষ্ট বসুন্ধরা,
পুষ্পে কাঁদে শ্বাসরুদ্ধ কীট—
অতৃপ্ত কামনা কাঁদে প্রবঞ্চিত মানুষের হৃদয় পঞ্জরে।
বেদনার গানে কেহ রচে আনন্দ উৎসব বিদ্যুৎ-অক্ষরে।

অমিত। সেনাপতি! বুঝে উঠ্‌তে পারলেম না, কোথায় অতৃপ্তির কাঁটা অন্তরে বিঁধে আছে।

অশ্বপালি। বুঝ্‌বার প্রয়োজন নেই, মহারাজ। প্রতিহারী—প্রতিহারী!

সসম্মানে অভিবাদন করিয়া প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। আজ্ঞা করুন অধিনায়ক।

অশ্বপালি। রাজ-পুরোহিতকে অবিলম্বে উৎসব মণ্ডপে আহ্বান কর; আর পুরাঙ্গনাদের সংবাদ দাও, সত্বর উৎসবে যোগদান করবেন।

অমিত। তাই হোক। (অভিবাদনসহ প্রতিহারীর প্রস্থান)

কবি। তাই হোক্ মহারাজ। উৎসবের তরঙ্গ লীলায়িত হ'য়ে উঠুক তক্ষশিলার বন-উপবন। মুছে যাক্ মানুষের গ্লানি, ধুয়ে যাক্ অন্তরের ক্লেশ। পূর্ণ করি পানপাত্র চিত্তমদিরায়, মানুষ উঠুক গাহি জীবনের নিত্য জয়গান।

অমিত। ওই যে, মর্ত্ত্যের উর্ব্বশী বিপাশা অলকনন্দার মত চঞ্চল গতিতে এইদিকেই এগিয়ে আস্‌ছেন।

অশ্বপালি। এইবার বনতল হবে জীবন্ত।

কবি। আর সেই সঙ্গে সখা মিত্রানন্দের—

মিত্রানন্দ। হবে জীবনান্ত, কবিবর।

কবি। বেশ—বেশ। তা হ'লে মিত্রের তো দেখছি কতক পরিমাণে আত্মোপলব্ধি হ'য়েছে।

অশ্বপালি। না হ'য়ে আর উপায় কি আছে, কবিবর!

নেপথ্যে পুরাঙ্গনাদের কলরব ও শঙ্খধ্বনি

বিনতা। দেবী কৃপালী, আসুন—আমরা বিপাশাকে আজ অভিনন্দিত করি।

কৃপালী। সময় হ'লে অভিনন্দন সে আপনিই পাবে, বিনতা।

বিনতা। এখনও কি সময় হয় নি, দেবী?

কৃপালী। না।

ক্ষিপ্রপদে বিপাশার প্রবেশ

বিপাশা। (রাজার পদতলে একখানি আচ্ছাদিত অর্ঘ্যপাত্র রাখিয়া প্রণাম করিল) মহারাজ!

অমিত। একি! সহসা একি পরিবর্ত্তন বিপাশার বসনে ভূষণে?

বিপাশা। পৌরনটী বিপাশা আর বেঁচে নেই, রাজন্! আছে শুধু তার কঙ্কাল। আমায় বিদায় দিন, মহারাজ!

অমিত। (বিস্ময়াবিষ্টের মত চাহিয়া রহিলেন) সে কি!

কবি। বিদায়!

বিপাশা। হাঁ, বিদায়। এতকাল দস্যুবৃত্তি ক'রে যে ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ ক'রেছিলেম, আজ সর্ব্বস্বই নিবেদন ক'রে গেলেম রাজার পায়ে।

মিত্রানন্দ। তা তো গেলেন, কিন্তু এত লোক থাক্‌তে, রাজা ছাড়া কি আর ঐশ্বর্য্য নিবেদনের পাত্র পেলেন না দেবী?

বিপাশা। আমায় দেবী ব'লে সম্বোধন করবেন না মিত্রবর।

কবি। তবে?

বিপাশা। আমি নারী।

মিত্রানন্দ। আপনি দেবীই হোন—আর নারীই হোন তাতে বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু দানের বেলায় এমন মারাত্মক ভুল আপনি কেন ক'রলেন, সেইটে ঠিক ভেবে উঠ্‌তে পারছি না।

অশ্বপালি। ভেবে উঠ্‌বার আর দরকার নেই, মিত্রানন্দ।

অমিত। বিপাশা!

বিপাশা। আদেশ করুন।

অমিত। কোথায় যাবে তুমি?

বিপাশা। যাবো নগরের সীমা ছাড়িয়ে, বহু দূরে—গ্রামের পথে। নদীর পারে আবার নতুন ক'রে বাঁধবো আমার খেলাঘর। অতীত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

বিনতা। প্রায়শ্চিত্ত হ'তে কি এখনো বাকী আছে, বিপাশা?

কৃপালী। হয় তো আছে। তুমি তা বুঝ্‌বে না, বিনতা।

বিনতা। ভালো। আমার আর বুঝেও কাজ নেই।

অমিত। বিপাশা!

বিপাশা। মহারাজ!

অমিত। ভাল ক'রে ভেবে দেখেছো?

বিপাশা। হাঁ, মহারাজ! ভাবনা আমার শেষ হ'য়ে গেছে।

অমিত। তবে যাও। তোমার ঐশ্বর্য্য রাজভাণ্ডারে গচ্ছিত রইল।

অশ্বপালি। উৎসবটা শেষ ক'রে গেলে হ'তো না, মহারাজ?

অমিত। না থাক্।

বিপাশা। (বিনতা ও কৃপালীর পাশে গিয়া তাহাদের হাত নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিল ও একে একে বিদায় সম্ভাষণ জানাইল) বিনতা—কৃপালী, তবে যাই। আমায় বিদায় দাও তোমরা। (অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া) আমায় বিদায় দিন, আপনারা। (পুনরায় রাজার পদধূলি লইল) মহারাজ! আসি তবে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন নারীর মর্য্যাদা পেয়ে এ জীবন ধন্য হয়।

(শিথিল পদে মণ্ডপ ত্যাগ করিল)

অম্বপালি। একি অঘটন! তক্ষশিলার উৎসব মণ্ডপে কি তবে লাগলো দেবতার অভিশাপ?

কবি। তোমার ছন্দের তালে নিত্য একি দ্বন্দ্ব অবিরাম, পলে পলে ভাঙে গড়ে বিশ্ব নব নব।

অমিত। (চিন্তিত ভাবে) সেনাপতি, আমার আদেশ প্রচার করুন, তক্ষশিলায় আর কখনো হবে না বসন্তোৎসব। আসুন দেবী কৃপালী, এসো বিনতা, আমরা মন্দির পথে যাই। (নিষ্ক্রমণ)

(আগামীবারে সমাপ্য)

বসন্ত জাগিল

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

আমার চোখের ঘুম কে যে কবে কেড়ে নিয়েছে তার ঠিকানা নেই! পথে পথে ঘুরি, দেশে দেশে ফিরি, গাছপালা পশুপক্ষীদের সঙ্গে কথা কই, আর জলের ধারে বসে সরোবরের রূপ দেখি. আকাশের দিকে চেয়ে থাকি।—এমনি ক'রে আমার গতি আমায় যুগ-যুগান্তের বিরহ-মিলনের বিচিত্র পথরেখার মধ্য দিয়ে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে নিয়ে চলেছে। জানিনে আমি। কিন্তু তবু চলেছি—।

সেদিন প্রভাত হবার আগেই দেখি রাস্তা দিয়ে দুটি তরুণ কুয়াসার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কৌতূহল হ'ল, তাদের কাছে গেলাম—আরে, যেন চেনা-চেনা মনে হচ্চে, চিনিই ত। ওরা এর মধ্যে এক বছরে অনেকটা বড় হয়েচে দেখছি···দু' বছর আগে ওদের দেখেচি নিতান্ত বালক।···আর কুড়ি বছর আগে এদের বাবা···। হ্যাঁ, তাদেরও দেখেচি এই পথে, এই সময়ে এমনি ভাবে ভোরে বেড়াতে। তখন তারা ছিল যুবক, তাদের মুখে শুনেছিলাম, আলোচনা হ'চ্চিল, ভালোবাসা আর প্রেম এক কিনা! একজন বলছিল, প্রেমের মধ্যে দেহের সম্পর্ক থাকে না—দেহাতীত ভালোবাসার নামই প্রেম। আর একজন মাথা নেড়ে বলেছিল, কিন্তু তাই বলে ভালোবাসাকে আমরা ছোট ব'লে মেনে নেবো না। মানুষ মানুষই—দেবতা নয়। আগে প্রীতি, পার্থিব ভালোবাসা তবে ত প্রেম—প্রেমকে পেতে গেলে তার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তরগুলো পার হ'য়ে তবে সেখানে পৌঁছানো যায়।···

আর আজকে কুড়ি বছর পরে এদের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুনলাম একজন বলছে, কালকে ভাই মোটে ঘুমোতে পারিনি। আর গায়ে লেপ থাকে না, কেমন যেন গরম গরম লাগে। ভোর হ'তে না হ'তে ঘুম গেল ভেঙে।

আর একজন বল্লে, আমারও ঠিক তাই, শেষে তোকে গিয়ে ডাকলুম। আজ কিন্তু বেশ মিঠে হাওয়া দিয়েছে। আচ্ছা চল্ না, একটু সমীরকে ডেকে তার বাড়ী চা খাওয়া যাক্।

—না, তার চেয়ে লেকের দিকে গেলে দেখ্‌বি মনটা যেন মুক্তি পাবে। বরং ফেরবার পথে হীরেনের বাড়ী গিয়ে ওঠা যাবে।

—আমি হীরেনের বাড়ী যাবো না।

—কেন, সত্যিই কি সমীরের বোন্ তোকে ইয়ে—।

বাধা দিয়ে আর একজন জবাব দিলে—ধ্যেৎ, তাহ'লে তোমারও কি হীরেনের দিদির বড় মেয়ের দিকে···?

আমার আর ভালো লাগ্‌লো না, ওরাও কুয়াসার মধ্য দিয়ে ঝাপ্‌সা হ'য়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি এগিয়ে চ'লেছি···। পূর্ব্বাকাশে যেন আলোক-সারথীর আগমনবার্ত্তা আসছে আস্তে আস্তে। ব্যাপারীর দল বাজারের দিকে চলেছে, আজকে তাদের বিশ্রাম নেবার দরকার হ'ল যে হঠাৎ?—গরম লাগ্‌ছে।—কোথাকার বাজারে যাবে গো?—কলকাতার বাজারে, সেই জগুবাবুর বাজারে।—কি আছে?—কচি এঁচোড় আর বীট, শালগম, গাজর।

এরা বেশ আছে, জীবনের সঙ্গে এদের একটা ঘরোয়া সম্পর্ক। আমার কিন্তু এমন নয়, আমি যেতে চাই এক পথে, আর জীবন আমায় নিয়ে যায় আর এক পথে। এরা আছে ভালো, ছোট্ট জীবনের আশা, নিবিড় সহজ জীবনের বাসা।···এদের কথা ভাবতে ভাবতে খানিকটা অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছি, যখন খেয়াল হ'ল দেখি আমি সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। ব্যাপারীর দল চলে গেছে, পূর্ব্বদিগন্তের রক্তিমাভা আকাশখানাকে লাজারুণ ক'রে তুলেছে। কানে গেল কোকিলের কুহু তান, কোন্ গাছে বসে ডাকছে কাকে আপন মনে। খেয়াল গেল কোকিলকে দেখি, আহা, আপন মনে মধুর ডাকে যে আমার প্রাণে আনন্দ দিল ভ'রে, তার রূপ দেখ্‌ব না! গাছের দিকে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম—গাছের কচি কিশলয় কি সুন্দর! হাতছানি দিয়ে ওরা আমায় ডাকছে, একটু একটু বাতাসে ওরা দুলছে, আর মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা শিশির ওদের গা থেকে ঝরে পড়ছে। আমি হাত পেতে দিলাম শিশির বিন্দুকে ধরবার জন্যে। ধরা দিল না ত ও। দেবে না ধরা জানি।···আবার সেই চাষীদের কথা পড়ল মনে। তারা জগুবাবুর বাজার গেছে, যাই সেখানে। কাজ নেই আমার কিছুই।

হেঁটেই চলা আমার অভ্যাস, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে উড়ে

চলি। গড়িয়াহাটের রাস্তাটা বেশ ভালো লাগছে। রাস্তায় লোকজন চলাচল শুরু হ'য়ে গেছে। লেকের পথে যাচ্ছে এক দম্পতি—হাস্যকলোচ্ছ্বাসে তাদের পথ যেন স্বপ্নপুরীর রূপসায়রের পাশের পথটার মতই অপূর্ব্ব সুন্দর হ'য়ে উঠেচে।

ছেলেটিকে আমি চিনি—ওর নাম অরুণ, মেয়েটিকেও দেখেছি যেন কোথায়। স্মৃতিশক্তি যেন দিন দিন আমার ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। স্মৃতিই সম্বল, আর তাও যদি হারিয়ে ফেলি তবে ত নিরুপায়—বাঁচবো কি নিয়ে? কেউ নেই যে আমার, আজ মনে হয় যেন কোন কালে কেউ ছিলও না আমার।…ঠিক্, ঠিক্ কথা, মনে পড়েছে। অরুণকে দেখেছি গতবারে এলাহাবাদে। সে এক স্মরণীয় ঘটনা—তরুণ তরুণী দেখ্‌লে আমি একটু মনোযোগ দিই, বিশেষ ক'রে যদি তারা দু'জন থাকে। বিকেল বেলা এলাহাবাদে সবে সেদিন পৌঁচেছি, আর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। ফাঁকা পথ, কেউ কোথাও নেই সামনে যতদূর দেখা যায়। আস্তে আস্তে এলবার্ট পার্কে প্রবেশ করলাম, একটু জনবিরল জায়গায় বসে ভাবছিলাম যেন কি সব কথা। হঠাৎ বামাকণ্ঠের কলকাকলীতে ভাবনার খেই হারিয়ে গেল, ফিরে দেখি—তরুণ-তরুণী পাশাপাশি, মেয়েটি বল্‌ছে, তোমার মত Bright career আমি কারুর দেখিনি অরুণদা। আমার ইচ্ছে হয়—।

মেয়েটি স্তব্ধ হ'য়ে গেল, ছেলেটি বল্লে, মীরা তুমি রবীন্দ্রনাথের সেই গানখানা গাও না! দ্বার খোল্…দ্বার খোল্…লাগ্‌লো যে দোল্। কলকাতায় থাক্‌তে বিরক্ত বোধ হয়। সেখানে না আছে এমন পার্ক, তা ছাড়া এলাহাবাদে এসে যেন আমি নতুন মানুষ হ'য়ে যাই। না আছে একটা প্রাণবন্ত মানুষ।

সেই অরুণের সঙ্গে আজ আবার দেখা, আজ তাকে আরও যেন চক্‌চকে দেখাচ্ছে—সঙ্গে সেই এলাহাবাদের মেয়েটি নয় ত'? কাছে গেলাম—নাঃ, সে নয়। এ যে দেখচি অরুণের বৌ। তবে মীরার সঙ্গে অরুণের বিয়ে হয়নি?

অরুণের বৌ বলছে, এমন প্রভাত আমার জীবনে আসেনি গো। কি ভালোই লাগ্‌ছে যে!

আগে এসব কথা শুনলে আমার হাসি পেত, ভাবতাম, জীবনের বসন্ত বেশিদিন থাক্‌বে না, এ উচ্ছ্বাস কদিনের? তার পর কষ্ট হ'ত এদের জন্তে, যারা দুদিন পরে বিগত-যৌবনের জন্তে হাহাকার করবে। কিন্তু আজকাল ভালোই লাগে—জীবনের আনন্দের সুধাপাত্র পান করুক এরা, যতটুকু পারে। দুঃখ ত রয়েছেই, তার মাঝে যেটুকু পায় তাই ভালো।

অরুণের বৌকে দেখেচি এর আগে, মুকুন্দপুর গাঁয়ের পুকুর-ঘাটে দুপুরবেলায় বুকে কলসী নিয়ে সাঁতার শিখ্‌তে। তখন ও সবে একটু বড় হয়ে উঠ্‌চে। তার পায়ের জল ছুটে গিয়ে গোঁসাইগিন্নীর গায়ে পড়তে তিনি গালাগাল দিলেন, আ মর্, ছুঁড়ির বড় বাড় হ'য়েছে যে। বাপের মুখে ভাত রোচে না, আর মেয়ের যেন দিন দিন ধিঙ্গীপনা বেড়ে চলেছে।

মেয়েটির যত হাসি তত হাত পা ছোঁড়া—দু'ই বেড়ে গেল। আর যারা সব ছিল তারাও ওকে ব'ক্‌লে, কিন্তু ওর খেয়ালই নেই। ও আপন মনে হেসেই চলেছে—ওর যে প্রাণবান জীবন; তার সজীবতার সে কি স্পষ্ট অভিব্যক্তি!

—আরে থাম্ থাম্ ছুঁড়ি, আমাদেরো যৈবন ছেলো।

ব'লে শাপ-শাপান্ত করতে করতে গোঁসাইগিন্নী চলে গেলেন।

আমি আবার দেখলাম যে আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি, ওরা কখন চ'লে গেছে। আমার দুপাশ দিয়ে প্রাণবন্যার মত লোকজন চলাচল করছে। কোথায় যেন যাচ্ছি আমি? ভুলে গেছি—। রাম-রাবণের যুদ্ধ হ'য়েছিল, তারও কতদিন আগে মহাদেবের তপোভঙ্গ হয়েছিল, কালিদাস কাব্য লিখেছিল তাই নিয়ে, পার্ব্বতীর সঙ্গে আবার শঙ্করের মিলন হ'ল,…এমনি সব আরো কত কথা; বেহুলার কথা, সাবিত্রীর কথা আমার মনে চিত্রপটের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চলতে ভুলে গেলাম। হয় এমনি মাঝে মাঝে, যখন যুগযুগান্তরে আমার মন উড়ে যায়, আমি তখন পথ ভুলে যাই, জীবন ভুলে যাই, চলতে পারি না—গতি হারিয়ে ফেলি।

কতক্ষণ বসেছিলাম, তারপর আবার চল্‌ছি—কোথায়, কেন, কার কাছে, কিচ্ছু জানি না—শুধু জানি আমি চলেছি অন্তহীন অনন্তের উদ্দেশে, মহাকালের নির্দ্দেশে।

বাজার ক'রে রমেশবাবু ফিরছেন, পথে দেখা প্রবোধবাবুর সঙ্গে। আলাপ হচ্ছে, আর মশাই যা জিনিসপত্রের দর হ'ল, কিচ্ছু খাবার উপায় নেই, দুদিন পরে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

প্রবোধবাবু ঈষৎ হেসে বাজারের থলির দিকে কটাক্ষ ক'রে বল্লেন, কিন্তু আপনার বাজারের আয়োজনে ত দুর্ভিক্ষের কোনো অবকাশ দেখিনে। 'ইহাতে সবই পাইবেন' যাবো নাকি?

—হেঁ, হেঃ, কী যে বলেন।…আরে আরে, নিশ্চয় নিশ্চয়, বল্‌তে ভুলে গেছি যে, গিন্নী বার বার ক'রে বলে দিয়েছেন। আপনি আজ রাতে আমাদের ওখানে—দেখুন দিকিন্ একলা মানুষ আপনি। আর কেন দাদা এ কষ্ট, পরিবার নিয়ে ত আমরাও আছি, ভয়টা কিসের? নিয়ে আসুন না তাঁদের—

ভয় না মশাই, দেশের অবস্থা এখানকার চেয়ে ঢের ভালো। প্রবোধবাবু একটু হেসে আবার বল্লেন, আমি আপনার বাড়ী থেকেই ফিরছি। আজ রাতে আমার নেমন্তন্ন আপনার বাড়ী, তেমনি আবার আমার ওখানে আপনার নেমন্তন্ন আজ সকালে। গিন্নীর বিশেষ অনুরোধ।

রমেশবাবু বাজারটার দিকে একবার করুণনেত্রে ক'রে বল্লেন, সে কী মশাই, বলা নেই কওয়া নেই—তা ভালো, বহুৎ আচ্ছা। কবে এলেন উনি?—

—কাল। আর পারিনে ভাই একলা। নিয়েই এলাম।

—তাই বুঝি দু'দিন দেখিনি।

ওরা চলে গেল। আপিসের বাবু ওরা, আমার মত ভব-ঘুরেমীর চাক্‌রী নয়, আপিসের কেরাণীগিরি। বেলা বাড়ছে, পথে লোকও বাড়ছে, বাড়ছে গাড়ী ঘোড়ার সংখ্যা—শুনেছি এখানে নাকি পেট্রল কম দিচ্ছে—কিন্তু মোটর ত অনেক চলছে?

বেলা দশটায় মেয়েরা চলেছে বেণী দুলিয়ে স্কুলে কিম্বা কলেজে, ছেলেরাও যাচ্ছে, বাবুদের ভিড় কমেছে—আজকাল সকাল সকাল আপিস বসে। কর্পোরেশনের চাকুরেরা এখনও বাড়ীতে আছেন। কিরণবাবু কর্পোরেশনের লোক, তাঁর সঙ্গে পথে দেখা—ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, পাঁচ সাতটি ছেলেমেয়ে, পরিপূর্ণ সংসার। আপিসে তাঁর অখণ্ড আধিপত্য। সবাই ভয়

করে। রামদাস হাজরা তাঁর তাঁবে 'কনিষ্ঠ কেরাণী'—আসতে তার আজ বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে। তরুণ বয়স, আর শ্বশুর-বাড়ীর নিমন্ত্রণ—দেরী হবে না কেন! সে এসে কিরণবাবুর কাছে আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্‌লে, তার মায়ের অসুখটা আজ ভয়ানক বেড়েছে তাই।

কিরণবাবু তখনও আফিসের কাজে হাত দেননি। অন্যমনস্ক হয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। এখন মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি? কি হয়েছে?

রামদাস ভয়ে ভয়ে আবার কথাটা বল্‌লে।

অন্যদিন হ'লে হয়ত কিরণবাবু বল্‌তেন, এটা আমার বাড়ী নয় যে যখন খুশী আসবে যাবে—ওসব চল্‌বে না। মায়ের অসুখ ক'রেছে বেশ হ'য়েছে, জানো আমার বাড়ীর কি অবস্থা? গিন্নীর ব্লাড্‌ প্রেশার, মেয়ের এক্লাম্‌সিয়া, ছেলের টাইফয়েড্‌, এক ছেলে বিবাগী, দুই ছেলে বেকার—আমার তবু দেরী হয় না। আর তোমার মায়ের অসুখ তুমি থাক্‌লেই ভালো হ'য়ে যাবে? ওসব—

...আজ কিন্তু ওধার দিয়েই তিনি গেলেন না, বল্‌লেন, কি অসুখ হে, ভালো ডাক্তার টাক্তার দেখাচ্ছ? আমার এক বন্ধুকে দিচ্ছি চিঠি লিখে, যাও দেখা ক'রে ব'লো—কি কম হ'য়ে যাবে।

বলেই তিনি খস্‌ খস্‌ ক'রে দিলেন লিখে বন্ধুকে চিঠি, রামদাস হাজরা পেলো ছুটি। সে চিঠি সে বোধহয় পেশ করবে স্ত্রীর কাছে। দুপুর বেলাটা যে এমন মধুর হয়ে উঠ্‌বে হাজরার-পো কল্পনাও করেনি। সারাটা রাস্তা সে প্রায় দৌড়েই এলো কল্পনার নেশায় বিভোর হয়ে।

আমি চুপ চাপ কিরণবাবুর উদারতার দিকে চেয়ে বসে দুপুরটা কাটিয়ে দিলাম। তারপর বিকেল সন্ধ্যেটা প্রথম বসন্তের মধুর বাতাসে মাতামাতি, আর প্রাণবন্যার আবেগ উচ্ছ্বাস দেখে কাট্‌ল।

রাত্রি যত গভীর হ'য়ে আসে আমার বেদনা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। একে একে ঘরে ঘরে বাতি নিভে গেল। বিরহীদেরও হয় ত চোখে ঘুম নামলো। বৃদ্ধদের এক ঘুম শেষ হ'য়ে আবার নিদ্রা এলো। আমি শুধু জেগে বসে আছি। আমার চোখে ঘুম নেই। আকাশের নক্ষত্রলোকে হয়ত দেবতাদের যাতায়াত আমোদ-প্রমোদ চলেছে, পৃথিবীর বুকে সুপ্তির শান্তি নেমেছে, ঘুমন্ত শিশুর মত চারিদিকে একটা নীরবতার নিরবচ্ছিন্নতা।

আমি বসে থাক্‌তে পারি না, আমায় কে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে, এ চলার অবসান নেই। দেশ হ'তে দেশান্তরে, যুগ হ'তে যুগান্তরে আমি চলেছি—চলেছি একেলা। আমি সকলের প্রাণে দিয়ে যাই আনন্দের হিল্লোল, সঙ্গে নিয়ে চলি প্রাণবন্যার জীবন্ত উন্মত্ত উদ্দাম গতি—বসন্তের অগ্রদূত, আমি ফাল্গুন। আমার কোথাও স্থিতি নেই। চলেছি, কে যেন কিসের আকর্ষণে অনবরত টান্‌ছে সামনে। আমি ফাল্গুন, বসন্তের ফল্গুর সন্ধান আমি জানি না, সেই উৎস সন্ধানে মহাদেবের কাল থেকে বর্ত্তমান মহাসমরের যুগকে ছাড়িয়ে চলেছি। আমি ফাল্গুন, আমায় যন্ত্রদানবের উন্মত্ত তাণ্ডব ভয় দেখাতে পারে না, তার ভ্রূকুটিকে ভ্রূক্ষেপে অবহেলা করে আমি চলি। আমি ফাল্গুন, মহাকালের মহিমা আমার অক্ষয় কবচ।

অলস চিন্তা

শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

দুই-তলা এক নূতন বাড়ীতে উঠিয়া এসেছি সবে,
সবে দিন দুই হবে।
গেছে কটা দিন ঘর-দোর গুছোতেই;
সারা বাড়ীটার ঝুল্‌-ঝাড়া আর জঞ্জাল ঘুচোতেই।
এই দুটো দিন সব কিছু যেন হয়েছিল এলোমেলো।
আজ অবসর এলো—
ভাবনা-বিহীন বিশ্রাম লভিবার।
ঘর-দোর সবই গুছোনো হয়েছে; কাজ নেই হাতে,
তায় আজ রবিবার।
নূতন-গোছানো ঘরটিতে তাই বেতের চেয়ারে
চুপ করে থাকি বসে।
শূন্য মনের ফাঁকা আকাশেতে অলস ভাবনা
একে একে যায় ভেসে—
শরতের সাদা ছিন্ন মেঘের মত,
এলো-মেলো কত শত।
এ ঘরের সাথে পুরাণো বাড়ীর ঘরের তুলনা করি।
সেখানে দেয়াল জুড়ি
খাটখানা ছিল।—এখানে তোষক্‌ পাতা।
ডান দিকে ছিল সেলাইয়ের কল। এখানেতে দেখি
ঝোলানো রয়েছে কাঁথা।
ঠাকুমার ছবি দেয়ালেতে ছিল, আমারি হাতের আঁকা।
এ বাড়ীতে দেখি ফাঁকা।
দেয়ালেতে শুধু পেরেক রয়েছে বেঁকে।
তাহারি তলায় সাদা দেয়ালেতে চতুঃসীমার
আবছায়া দাগ রেখে।
ছবি চলে গেছে কবে সে পুরোণো ভাড়াটের সঙ্গেই।
ভাড়াটে কে জানা নেই।

কাহারি বা ছবি, কার সাদা দেয়ালেতে—
দাগ রেখে গেছে। কোথা থেকে এসে আমি সেই দাগ
দেখি বসে চেয়ারেতে।
ভাবি মনে মনে, কার ছবি ছিল সারা দাগখানি জুড়ে?
হয়ত গেছিল 'টুর'-এ
এ বাড়ীর ছেলে, পুরোণো বাসিন্দার।
দাগটা বোধহয় উষ্ণীর ধারে তাদের দলের বড় গ্রূপ্‌-ফটোটার।
হয়ত বা কেউ তাহাদের গৃহ-দেবতার ছবিটারে,
মা-কালীরও হতে পারে,
রেখেছিল ওই পেরেকেতে ঝুলিয়েই।
হাট থেকে কেনা পটুয়ার আঁকা মা-কালীর ছবি;
তারি দাগ বুঝি এই।
হরিণের ছবি কার্পেটে বোনা পশমে কিম্বা উলে
ওইখানে ছিল ঝুলে;
হয়ত বা কোন্‌ বাড়ীর মেয়ের বোনা।
হয়ত তা থেকে 'ঘর' তুলে নিতে পাড়ার মেয়ের
হত কত আনাগোনা।
কিংবা হয়ত আয়না একটা ছিল ওই দাগ-জুড়ে।
হয়ত বা ঘুরে ঘুরে
মুখ দেখে যেত এতটুকু ফাঁক পেলে,
আমাদেরই মত কোনো ভাড়াটের সবে স্কুল ছেড়ে
কালেজেতে ঢোকা ছেলে।
হতে পারে সবই; কতো রকমের কত ছবি হতে পারে।
তাই ভাবি বারে বারে—
কাহারি বা ছবি কার সাদা দেয়ালেতে
দাগ রেখে গেছে। কোথা থেকে এসে আমি কেন ভাবি
বসে বসে চেয়ারেতে।

অপরাধ-বিজ্ঞান

শ্রীআনন ঘোষাল

সঠিক অপরাধ

অপরাধ ও অপরাধীদের সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে প্রথমেই জানা দরকার সঠিক অপরাধ কাকে বলে। পৃথিবীতে যা কিছু পাপ বা অন্যায় তা অপরাধ নয়। মানুষের কোনও কাজ বা ব্যবহার যদি প্রত্যক্ষভাবে সমাজের পক্ষে বিশেষরূপ ক্ষতিকর হয়, তবেই তাকে আমরা অপরাধ বলি। এই বিশেষরূপ কথাটী প্রণিধানযোগ্য। এমন অনেক ছোটখাট অপরাধ আছে যা একদেশে অপরাধ বলে বিবেচিত হলেও, অন্যদেশে তা অপরাধ বলে স্বীকৃত হয় না। আত্মহত্যা বিলাতে একটা অপরাধ, কিন্তু জাপানে তা অপরাধ নয়। এদেশে আত্মহত্যা অপরাধ নয়, কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা অপরাধ। বিলাতে আত্মহন্তারকের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। আত্মহত্যা সকল দেশে অপরাধ বলে বিবেচিত হয় না। কারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোটা সমাজের পক্ষে কতিপয় ব্যক্তির এইরূপ আত্মহত্যা সবিশেষ ক্ষতিকর নয়। আমার মতে যে সকল আদর্শহীন, স্বার্থপ্রণোদিত গুরুতর অকাজ বা কুকাজ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণের দ্বারা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে, সেই সকল কাজ বা অকাজকেই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ বলা উচিত। রাজনৈতিক অপরাধগুলি বিজ্ঞানসম্মত অপরাধের আওতায় আসে না। কারণ তাদের কার্য্যাদি কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হয় না এবং তাদের কাজের পিছনে থাকে একটা বিশেষ আদর্শ। তাই আজ যে বিদ্রোহী, কাল সে স্বদেশপ্রেমিক হয়। রাজা শিবাজীর কাহিনী এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল অপরাধীরা অপরাধ করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে নয়। এই কারণে রাজনৈতিক অপরাধীদের সাধারণ অপরাধীদের পর্য্যায়ে না ফেলে, প্রত্যেক রাষ্ট্রই তাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকে। জনসাধারণ তাদের বিপথগামী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে করে দুঃখিত হয়। রাষ্ট্রের হিতের জন্য তাদের দমন করে, কিন্তু সাধারণ অপরাধীদের পর্য্যায় তাদের ফেলতে দ্বিধা বোধ করে।

অন্যায়, পাপ ও অপরাধ

সঠিক অপরাধ কি তা সঠিকভাবে বুঝতে গেলে, উপরের গুরুতর বা সবিশেষ কথাটীর বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অন্যায়, পাপ ও অপরাধ এই তিনটি নিন্দনীয় কাজ একই পর্য্যায়ে পড়ে। এক কথায় তাদের প্রকৃতি বা স্বরূপ থাকে একই, তফাৎ হয় শুধু কম বেশী গুরুত্বের। ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে কেহ বাধ্য নয়, কিন্তু কেউ যদি কিরূপ অবস্থায় পড়ে সে ভিক্ষা চাইছে তা না জেনে বা জানবার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র ভিক্ষা চাইবার জন্যই, কোনও ভিখারীকে রূঢ়ভাবে তিরস্কার করে ত তার সেই কাজকে অন্যায়কার্য্য বলি। অপরদিকে বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য কেহ আইনতঃ বাধ্য নয়, কিন্তু পিতামাতার প্রতি তার এই অবহেলাকে আমরা পাপ-কার্য্য বলি। ইহা পুত্রের পক্ষে অন্যায় ত বটেই পাপও বটে। আমরা পুত্রকে তার এই নীতিবিগর্হিত কার্য্যের জন্য নিন্দা করি বটে, কিন্তু তাকে এইজন্য কোনওরূপ শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। এই ত গেল অন্যায় ও পাপকার্য্যের কথা, অপরদিকে জাল উইল তৈরী করে ভাইকে ফাঁকি দেওয়ার কাজকে আমরা অন্যায়, পাপ এবং সেই সঙ্গে আইনতঃ ও লোকতঃ অপরাধ বলি। একটী কার্য্যকরী উদাহরণ দ্বারা বিষয়টীর বিশদ ব্যাখ্যা করা যাক। একদল আদিম অধিবাসীর বাসস্থান একপাল নেকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হল। গোষ্ঠির সকলেই এই আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন যে কোনও কারণেই হোক, এই সাধারণ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য, অপর সকলকে সাহায্য না করে লুকিয়ে বসে রইল। তার এই নিন্দার্হ কার্য্য এক্ষেত্রে অন্যায় বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এই লোকটি যদি এইরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বসাধারণের আত্মরক্ষার জন্য তৈরী অস্ত্রশস্ত্রগুলোও নিয়ে সরে পড়ে ত তার এই দুষ্কার্য্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

অন্যায় পাপ ও অপরাধ, এই কার্য্য তিনটীকে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে যা কিছু প্রভেদ, তা গুরুত্বের বা degreeর, বিষয়বস্তুর বা kind এর নয়। অর্থাৎ বিষয়বস্তু একই, তফাৎ শুধু গুরুত্বের। এক কথায় গুরুতর অন্যায়কে আমরা পাপ এবং গুরুতর পাপকে আমরা অপরাধ বলি। যা কিছু অপরাধ তা পাপও বটে অন্যায়ও। কিন্তু যা কিছু অন্যায় বা পাপ তা অপরাধ নয়। অপরাধ অন্যায় ও পাপের শেষ স্তর। অর্থাৎ পাপের মাত্রা পূর্ণ হলে তা হয় অপরাধ।

(অন্যায় = অন্যায় + পাপ + অপরাধ। পাপ = পাপ + অপরাধ। অপরাধ = অপরাধ।)

(চিত্রটি ভালরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পার্শ্ব হতে কেন্দ্রের দিকে চিত্রের রঙ পর্য্যায়ক্রমে ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠেছে। এই পার্থক্যের পর্য্যায়গুলি হচ্ছে গুরুত্বের। বহির্বৃত্তটী হচ্ছে কমবেশী অন্যায়ের বা different degree of sinএর। মধ্যবৃত্তটি হচ্ছে কম বেশী পাপের বা different degree of vice এর। এবং অন্তর্বৃত্তটী হচ্ছে কমবেশী অপরাধ বা crimeএর। অন্তর্বৃত্তটীর মধ্যস্থল পার্শ্বদেশ অপেক্ষা অধিকতর গাঢ়। সবিশেষ বা গুরুতর অপরাধ বুঝাবার জন্য, বৃত্তের মধ্যস্থল পার্শ্বদেশ অপেক্ষা অধিকতর গাঢ় দেখা যায়।)

সঠিক অপরাধ সর্ব্বসাধারণ দ্বারা অপরাধরূপে স্বীকৃত হওয়া চাই।

মনুষ্যসমাজে এই অন্যায় ও পাপের প্রাবল্য এত বেশী যে শতকরা আশীজন লোকই তাদের জীবনে বহুবারই কোনও না কোনও কারণে এই পাপ বা অন্যায়ের আমলে এসেছে। সমাজবিশেষের বহুসংখ্যক লোক যা করে, বাকি লোককে তা সহ্য করতে হয়। ফলে, এইসব কারণে গুরুতর শাস্তি কাউকে দেওয়া যায় না। তাছাড়া এই পাপ বা অন্যায় কার্য্যদ্বারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে গোটা সমাজের কোনও গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয় না। অন্যায়কারী থেকে পাপী ও পাপী থেকে অপরাধী হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ না ইহা সংঘটিত হয়, ততক্ষণ সমাজের পক্ষে চুপ করে থাকাই শ্রেয়ঃ। কারণ সকলেই যে সব সময় পাপ বা অন্যায় করে তা নয়, বরং তাদের এই কার্য্যের জন্য তারা প্রায়ই অনুতপ্ত হয় ও নিজেদের শুধরে নেবার চেষ্টা করে। ধর্ম্মশিক্ষা বা সৎ উপদেশ দ্বারা অন্যায়কারী ও পাপীদের যথাক্রমে পাপ ও অন্যায় কার্য্য থেকে বিরত করা সহজ। কিন্তু অপরাধীরা উপদেশ বা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ ধার ধারে না। কোনও কোনও অপরাধীর কাছে অপরাধ করাই একটা ধর্ম্ম। সাময়িক ক্রোধ, লোভ, মোহ বা বুদ্ধিনাশের জন্য মানুষ পাপ বা অন্যায় করে এবং প্রায়ই দেখা যায় তারা তাদের ভুল বুঝতে পারা মাত্র নিজেদের শুধরে নেয় বা নেবার চেষ্টা করে। মানুষ পাপ বা অন্যায় করে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ, কিন্তু অপরাধ করে সর্ব্বদাই জ্ঞানতঃ। এই জ্ঞানতঃ অবস্থাটা থেকেই অপরাধের গুরুত্বের বিষয় বুঝা যায়। বিরাট জনসংখ্যার তুলনায় মাত্র স্বল্প কয়জনই, তাদের পাপ বা অন্যায়ের মাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করে অন্যায়কারী থেকে পাপী ও পাপী থেকে অপরাধীতে পরিণত হয়েছে। এজন্য সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বসমাজের সভ্য মানুষ অন্যায়কারী ও পাপীদের জন্য কোনও পার্থিব শাস্তির ব্যবস্থা করে নি। তবে ক্রমবর্দ্ধমান পাপ বা অন্যায় কার্য্য যে অপরাধী হবার পথ প্রশস্ত করে এ কথা খাঁটী সত্য। আমি একজন উৎকট বালক-অপরাধীকে জানি। প্রথমাবস্থায় সে একজন অত্যাচারী ও পাপী ছিল। কিন্তু সে পরে একজন অপরাধীতে পরিণত হয়। উক্ত বালক অপরাধীর অভিভাবকের তৎকালীন বিবৃতি থেকে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"ছেলেটির বাপ মা হঠাৎ মারা যাওয়ায় পড়শীরা তাকে আমার কাছে গছিয়ে দেয়। ছেলেটা তখন নিতান্ত শিশু। সম্পর্কিত আত্মীয় বিধায়, আমি তাকে ফেলতে পারি নি। আমার স্ত্রী কিন্তু তাকে একেবারেই পছন্দ করল না। সে তাকে প্রায়ই মারধর করত। দেখাদেখি আমার পুত্রেরাও তাকে মারত। প্রতিরোধ বা প্রতিশোধের প্রয়াস পেলে আমার স্ত্রী, এমন কি বাড়ীর চাকরও তাকে মারধর এবং তিরস্কার করত। ফলে সে প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরত। পাড়ার বখা ছেলেরাই হত তার সঙ্গী। সে বাচ্ছা কুকুর, ছাগলছানা, যাকে পেত তাকেই মারত। ভিখারী দেখলে সে তাদের গায়ে কাদা ছুঁড়ত। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শিশুদের সে মারধর করত। দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করা যে একটা সনাতন নীতি, এরূপ একটা ধারণা শৈশব অবস্থাতেই তার মনে শেকড় গাড়ে। হাঁ, আমি স্বীকার করি, এইরূপ অবস্থার জন্য আমাদের অবহেলা ও অশ্রদ্ধাই দায়ী। একদিন ভাঁড়ারের জানলা গলে আচার চুরি করার সময় সে ধরা পড়ে। প্রহৃত হওয়ার পর সে বলে উঠে, সকলকেই ডেকে আচার খাওয়ান হয়, আর আমার বেলাই খালি 'বের বের'। আচার খেতে আমার ইচ্ছে হয় না বুঝি। ছেলেটা তখনও শিশু। শিশু মনের এই সকাতর নালিশ আমাকে অভিভূত করে। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর ভয়ে তার প্রতি কোনও রূপ সুবিচার করতে, সেদিনও যেমন অক্ষম ছিলাম, আজও তেমনি অক্ষম। জানি না, আসল অপরাধী কে, সে না আমি, না আমার স্ত্রী।"

সঠিক অপরাধ বলতে, আমরা চুরি, জুয়োচুরি, ডাকাতি, শঠতা, বলাৎকার, জালিয়াতি, খুন (হত্যা নয়) প্রথম প্রভৃতি অপরাধ বুঝি। কারণ এই সব অপরাধ প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি করে ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়। এই সকল অপরাধ একসঙ্গে আদর্শহীন, গুরুতর ও স্বার্থ-প্রণোদিত এবং এই সকল অপরাধ সকল দেশে, সকল যুগে, সর্ব্ব-সাধারণ দ্বারা অপরাধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যভিচার বৈজ্ঞানিক অপরাধ নয়। রাষ্ট্রভেদে এই অপরাধগুলি ফৌজদারীর মধ্যে পড়লেও, আমার মতে এগুলি দেওয়ানি অপরাধ। এই বিশ্বাসঘাতকতা বা ব্যভিচার কোনও ব্যাপক অপরাধ নয়। বরং এই অপরাধ দুইটাকে ব্যক্তিগত অপরাধ বলা চলে। এই অপরাধদ্বয় ব্যাপকভাবে সমাজের কোনও ক্ষতি করে না। যে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে তা করে এবং এরূপ অপরাধ সে জীবনে হয়ত একবার ও একজনের উপরই করে। এই অপরাধ দুইটা প্রায়ই অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়, গচ্ছিত দ্রব্যাদির আত্মসাতের ইচ্ছা প্রারম্ভেই (অর্থাৎ ঐরূপ দ্রব্য গ্রহণকালীন) কাহারও মনে থাকে না। পরবর্ত্তীকালের কোনও এক সময় এই আত্মসাৎরূপ প্রবৃত্তি ব্যক্তিবিশেষের মনে বাসা বাঁধে। এইরূপ অবস্থায় এই অপরাধগুলিকে ফৌজদারী অপরাধরূপে বিবেচনা করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। বিশ্বাসঘাতকতাকে অপরাধরূপে একান্তই যদি স্বীকার করতে হয় ত এই সব অপরাধকে 'আকস্মিক' বা chanced অপরাধের মধ্যে ফেলা উচিত। ইহাকে অভ্যাস বা স্বভাব অপরাধের মধ্যে ফেলা উচিত নয়। পরদ্রব্য তদ্রূপ বা Criminal misappropriation সম্বন্ধেও এইরূপ বলা চলে। সঠিক অপরাধ সর্ব্বদাই পূর্ব্ব-কল্পিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত অপরাধের মূল কথা হচ্ছে এই। এই ব্যভিচার বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরাধ প্রায় পূর্ব্বকল্পিত হয় না। সুতরাং এই অপরাধগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত অপরাধও বলা চলে না। এক কথায় সঠিক বা বিজ্ঞান-সম্মত অপরাধের প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে এই—যে সকল অকাজ বা কুকাজ একাধারে আদর্শহীন, স্বার্থপ্রণোদিত, পূর্ব্বকল্পিত ও গুরুতর, যে সকল অপরাধ প্রত্যক্ষভাবে গোটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, যে সকল অপরাধ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণের দ্বারা সভ্য সমাজে অপরাধরূপে স্বীকৃত—সেই সকল অপরাধই বিজ্ঞানসম্মত বা সঠিক অপরাধ। উপরি উক্ত সংজ্ঞার মধ্যে যে সকল অকাজ বা কুকাজ পড়ে না, তা বিজ্ঞান-সম্মত অপরাধ নয়। তবে যে ক্ষেত্রে ব্যভিচার, বিশ্বাসঘাতকতা আদি অপরাধ পূর্ব্বকল্পিত সে ক্ষেত্রে উহা অপরাধরূপেই বিবেচিত হবে। এমন অনেক অপরাধী আছে, যারা পরদ্রব্য আত্মসাত করবার উদ্দেশ্যে নানা অছিলায়, ফরিয়াদীর বিশ্বাস উৎপাদন করে ও পরে তার গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে। এরূপ ক্ষেত্রে তারা সঠিক অপরাধী ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে যারা একটার পর একটা নারীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তারাও এই সঠিক অপরাধীর মধ্যে পড়ে, অবশ্য যদি এরূপ কার্য্যের দ্বারা অপর কোনও ব্যক্তির স্বার্থের বা অধিকারের সবিশেষ হানি ঘটে তবেই।

লোকচক্ষে খুন একটা সাধারণ অপরাধ, কিন্তু সবপ্রকার খুনই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ নয়। স্ত্রীর বা কন্যার উপর অত্যাচারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে যদি মানুষ অত্যাচারীকে খুন করে ত সেই খুনকে হত্যা বলেই অভিহিত করা উচিত। এইরূপ খুন ব্যাপকভাবে সমাজের কোনও ক্ষতি করা দূরে থাকুক, অনেক সময় উপকারই করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষ অপরাধ করে রাষ্ট্র-বিধির বিরুদ্ধে, সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত শাস্তি দেওয়ার ভার নিজের হস্তে নেওয়ার জন্যই সে অপরাধী। এমন অনেক রাষ্ট্রের কথা শুনা যায়, যেখানে এইরূপ ক্ষেত্রে, দুইটামাত্র সাক্ষী রেখে অপরাধীকে হত্যা করা অপরাধরূপে বিবেচিত হয় নি। তবে দেশভেদে এইরূপ খুনকে অপরাধ বলেই ধরা হয়, কারণ ফরিয়াদীর উপর শাস্তি দেওয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া কোনও অবস্থাতেই নিরাপদ নয়।

যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্যদের হত্যা করা অপরাধ নয় এবং যে কারণে এইরূপ হত্যাকে অপরাধ বলে ধরা হয় না, সেই কারণেই এইরূপ হত্যাকে

বিজ্ঞানসম্মত অপরাধও বলা যায় না। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মানুষ যে সকল অপরাধ করে সেই সকল অপরাধ কখনই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ নয়। রাষ্ট্রবিধিতে এই সব অপরাধের জন্ত যেমন শাস্তির ব্যবস্থা আছে, তেমনি এই সব অপরাধীদের তৎকালীন মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করে কম শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। আইনের উদ্দেশ্য এখানে মানুষের স্বাভাবিক ক্রোধকে শাস্তির দৃষ্টান্ত দ্বারা সংযত করা। এইরূপ শাস্তির মধ্যে থাকে সহানুভূতি, প্রতিশোধের স্পৃহা থাকে না। অপর দিকে যে সকল খুন জখম প্রভৃতি পূর্ব্বকল্পিত ও স্বার্থপ্রণোদিত, সেই সকল খুনের প্রায়ই একমাত্র শাস্তি হয় ফাঁসী। এক কথায় যে সকল খুন জখম প্রভৃতি অপরাধ সম্পত্তি বা বিত্ত লাভের জন্ত সংঘটিত হয়, সেই সকল খুন জখম প্রভৃতিই বিজ্ঞানসম্মত অপরাধ। এই একই কারণে পেশাদারী খুনেদের আমরা সঠিক অপরাধী বলি।

উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত কোনও অপরাধ যে অপরাধ নয়, তা শিশুরাও বুঝে। কিন্তু এমন অনেক উন্মাদ আছে যাদের বাহ্যতঃ উন্মাদরূপে বুঝা যায় না। বরং তাদের অত্যধিক স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে থাকে তারা উন্মাদ। এই ধরণের উন্মাদের দ্বারা কৃত কোনও অপরাধকেও অপরাধ বলা উচিৎ নয়। আমি একজন বিশেষ ভদ্রমহিলাকে জানি, যিনি স্বভাবতঃ একজন স্বাভাবিক মানুষ বলেই বিবেচিত হন, যদি না তাঁর স্বামী উপস্থিত থাকেন। কিন্তু স্বামীকে দেখামাত্রই তিনি একান্তভাবে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন। কারণে ও অকারণে, তখন তিনি শুধু স্বামীর উপর নয়, পাড়াপড়শীদের উপরও অহেতুক অপরাধমূলক অত্যাচার সুরু করেন। পুলিশ থেকে তাঁকে পাগলা হাঁসপাতালে পাঠান হয়। কিন্তু পাগলা হাঁসপাতালে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বাভাবিক হয়ে উঠেন এবং ছাড়া পান। বাড়ী ফিরার পরও তাঁকে স্বাভাবিক দেখা যায়। কিন্তু অফিস থেকে তাঁর স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ কানে যাওয়া মাত্র তিনি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ এগুলি একপ্রকার মানসিক রোগ। কিন্তু পুরাপুরি উন্মাদ না হলে, মানসিক রোগকে আমরা রোগ বলে স্বীকার করি না, এইজন্ত আমরা অবিচারও করি অনেক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাক। বহুদিন পূর্ব্বে বড়বাজার অঞ্চলে জনৈক মাড়য়ারী তার শিশুপুত্রকে ত্রিতলের জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়। তদন্তের সময় সে নিম্নোক্তরূপ একটা স্বীকারোক্তি করে। স্বীকারোক্তিটী প্রণিধানযোগ্য।

"কোনও একটা ঘটনার পর আমার একটা উৎকট-মানসিক রোগ জন্মে। অদ্ভুত অদ্ভুত দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসে। আমি কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। এই অভাবনীয় রোগের কথা আমি কাউকে বলি না। বললে হয়ত কেউ বিশ্বাস করত না। তাছাড়া বলতেও আমার লজ্জা হত। একদিন আমার ইচ্ছে হল, আমি ত্রিতল থেকে লাফিয়ে পড়ি। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে না পেরে, শেষে ভিতর থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা বাইরে ফেলেদি, সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছারও উপশম ঘটে। পরের দিন আমার ইচ্ছে হয়, আমার পুত্রটীকে উপর হতে ফেলেদি। প্রাণপণে মনকে বাধ্য করবার চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। নাচার হয়ে চাকরকে ডাকি, কিন্তু কেউ আসে না। অবশেষে আমি ছেলেটাকে উপর থেকে ফেলেদি। ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমার চেতনা আসে। আমি ছুটে গিয়ে, ছেলেটাকে আমার বুকে তুলে নি।"

মধ্য কলিকাতার চাঞ্চল্যকর শিশুহত্যা এই জাতীয় অপরাধের একটা প্রকৃষ্ট উদাহারণ। আদালতে মামলাটীর বিচার হয়, ঘটনাটীর বিবরণ ছিল এইরূপ। ১৯৩৯ সালের এক শীতের রাত্রে একজন গুজরাটী যুবক থানায় এসে এজাহার দেয়, সে তার মনিবের শিশুপুত্রকে খুন করেছে। সে এইরূপ স্বীকারোক্তি করে বটে, কিন্তু তার পরিধেয় বস্ত্রাদিতে কোনও রূপ রক্তের দাগ দেখা যায় না। আসামী ছিল বহুবাজারের কোনও ভাটিয়া ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার আসামীকে সনাক্ত করেন এবং বলেন, আসামী তাঁর শিশুপুত্রকে ঠাকুর দেখাবার অছিলায় বেলা তিনটায় বাইরে নিয়ে যায়। ডাক্তার তাদের জন্ত অনেক খোঁজাখুজী করেন; আসামী যে তাঁর শিশুপুত্রকে খুন করেছে, একথা ডাক্তার কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে শিশুটী আসামীর খুব প্রিয় ছিল এবং আসামী নিজে ছিল বাড়ীর সকলের খুব প্রিয় পাত্র।

আসামী পুলিশ অফিসারদের বারাকপুরের এক মাঠে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ মাটির উপর কিছু রক্ত দেখে। কিছুদূরে কথিত শিশুটীর রক্তমাখা পরিধেয় বস্ত্রাদিও আবিষ্কার করে। কিন্তু শিশুটীর দেহটীর কোনও সন্ধান তারা পায় না। শিশুর জামাটার বোতামগুলা লাগান ছিল। ফ্রকটীর অবস্থাও ছিল অনুরূপ। বহুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আসামী বলে, ফরিয়াদির সহিত তার অবৈধ সম্বন্ধ ছিল; তার এই দুরবস্থার জন্ত ফরিয়াদি দায়ী, অথচ পূর্ব্বের ন্যায় তার প্রতি সে আর আগ্রহশীল নয়। এইজন্ত তার এক ভগ্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে সে ডাক্তারের উপর এইরূপ প্রতিশোধ নেয়। পরে কিন্তু আসামী বলে, তার এই পূর্ব্ব বিবরণ মিথ্যা। সে নিম্নলিখিত রূপ এক নূতন বিবৃতিও দেয়।

"আমার বাপ মায়ের আমি অবৈধ সন্তান। পিতা ছিলেন একজন সরকারী অফিসার। মা ছিলেন একজন হিন্দুনারী, মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে তাঁর এক মুসলমান বান্ধবীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। পালিতা মাতাকেই আমি মা' বলে জানতাম। বড় হওয়ার পর বাড়ীর সকলে তাদের এক মুসলমান আত্মীয়ার সঙ্গে আমার সাদি দিতে চান। কিন্তু মা' আমার এই বিবাহে মত দেন না। তিনি তখন আমার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং আমাকে জানান, আমি একজন হিন্দু। তিনি বলেন, তাঁর প্রিয় বান্ধবী আমাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে, তাঁর স্বর্গীয়া বান্ধবীর অবমাননা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। আমাকে তখন আমার সত্যকার পিতার নিকট পাঠান হয়। পিতা অনিচ্ছা সত্বে আমাকে গ্রহণ করেন, কিন্তু বাড়ীতে স্থান দেন না। তিনি আমাকে একটী বোর্ডিংয়ে রাখেন, সেখান থেকে আমি পড়া শুনা করি। খরচ খরচার অধিকাংশই কিন্তু আমার মাকেই বহন করতে হয়। শিশুটীর মা ছিল তখন অবিবাহিতা বালিকা। বোর্ডিংয়ের পরের বাড়ীটাতেই সে থাকত। আমাদের মধ্যে এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। কিছুদিন পরে লছমীর বিয়ে হয়। লছমী (শিশুটীর মাতা) শ্বশুর বাড়ী চলে যায়। তারপর অনেকদিন তাকে দেখিনি। দু'মাস আগে ট্রেণে তার সঙ্গে দেখা হয়। তারই ইচ্ছায় ও উপদেশে তার স্বামীর কাছে চাকরী নিই। প্রথম প্রথম লছমী আমাকে খুবই যত্ন করত। কিন্তু সম্প্রতি সে আমাকে বিশেষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে। এজন্ত আমি বিশেষ ব্যথিত হই। আমার মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগে, ছেলেটাকে নিয়ে প্রথমে যাই আমি কাঁচরাপাড়ায়। সেখানকার একটা দোকান থেকে আমি ছুরী কিনি। তারপর শ্যামনগরে এনে ছেলেটাকে দুধ খাওয়াই। ছেলেটা ক্ষিদেয় কাঁদছিল, সন্ধ্যার কিছু পর ছেলেটাকে ব্যারাকপুরের একটা মাঠে আনি। ছেলেটাকে আমি খুব ভালবাসতাম। পিছন ফিরে ছুরিটা ছেলেটার গলদেশে শ্বাস-নালীর মধ্যে সজোরে বসিয়ে দিই। তারপর সেদিকে আর না তাকিয়ে তার দেহটাকে সেইখানে রেখেই আমি চলে আসি। দেহটা কোথায় গেল তা আমি জানি না।"

ফরিয়াদি এবং বাটীর অপরাপর সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, ফরিয়াদির স্ত্রী আসামীকে পূর্ব্বে কখনও দেখেনি। দুই মাস আগে লছমী তার বাপের দেশ থেকে কোলকাতায় ফেরে। তার দুইদিন পরেই আসামী ডাক্তারের কাছে আসে ও চাকুরী নেয়। ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার ছিল তখন একজন বাঙ্গালী। স্বদেশপ্রীতিবশতঃ ফরিয়া

ভাই রূপে ডাক্তার তাকে কার্য্যে বাহাল করে। দুইদিন পূর্ব্বে লছমীর নাম অঙ্কিত (মিসেস্ অমুক) কয়েকটী জার্ম্মান সিলভারের বাসন লছমীর বাক্সে আসামী চুপে চুপে রেখে যায়। লছমী তার এই কাজ দূর থেকে দেখে ও স্বামীকে জানায়। আসামীর এই বিসদৃশ ব্যবহারে বাটীর সকলে আশ্চর্য্য হয় ও আসামীকে অনুযোগ করে। কিন্তু এজন্য তাকে কেউ ভর্ৎসনা বা অপমান করে নি।

আসামী পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচরাপাড়ার যে দোকান থেকে ছুরী কিনেছিল সেই দোকান এবং শ্যামনগরের যে দোকানে শিশুটাকে দুধ খাইয়েছিল সেই দোকানটী দেখিয়ে দেয়। যে ট্যাক্সি এবং রিক্সাতে চড়ে আসামী কিছুটা দূর গিয়েছিল, সেই রিক্সাওয়ালা ও ট্যাক্সিচালককেও পুলিশ খুঁজে বার করে। এমন কি একজন কুলিকেও পাওয়া যায় যে আসামীকে ব্যারাকপুরের টিকিট কিনতে সাহায্য করেছিল। সব কয়টী সাক্ষীই শিশুটীর ফটো থেকে শিশুটীকে সনাক্ত করে, তারা আসামীর বিবরণও সমর্থন করে। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও পুলিশ শিশুটীর মৃতদেহের কোনও সন্ধান পায় না। আশে পাশের পুকুরগুলিতে পুলিশ জাল ফেলে, গঙ্গার ধারেও অনেক খোঁজাখুঁজি করে, কিন্তু লাসের কোনও সন্ধান পায় না। বহু চেষ্টার পর কিছু দূরে একটা ছোট কাঁচা মাথা পায় বটে, কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষায় উহা একটা ১০ বছরের ছেলের মাথা বলে প্রমাণিত হয়। শিশুটীর বয়স ছিল মাত্র দুই বৎসর। তার মার বয়স ছিল তখন মাত্র আঠার। ওদিকে রক্তপরীক্ষকের রিপোর্টে জানা যায়, শিশুটীর পরিধেয় বস্ত্রাদিতে মনুষ্য রক্তের সঙ্গে কিছু ছাগ রক্তও আছে। এ সম্বন্ধে আসামীকে অনেক পীড়া পীড়ি করা হয়। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আসামী বলে, ছেলেটীকে সে মাদ্রাজে তার বোনের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে এবং দশ বৎসর পরে সে তাকে ফিরিয়ে দেবে। অনেক উপরোধ অনুরোধের পর আসামী গুজরাটী ভাষায় নিম্নলিখিত রূপ একটা চিঠি লিখে পুলিশের হাতে দেয়।

"প্রিয় বহিন, ছেলেটীর পিতামাতা কাতর ও পুলিশের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে আমি অক্ষম। এদিকে আমার জীবনও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কয় রাত্রি আমার ঘুম নেই, চিন্তা ও অবসাদে আমি কাতর। আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা আপাততঃ মুলতবী থাক। আশাকরি খোকা তোমার কাছে ভালই আছে। অফুরন্ত জীবন আমাদের পড়ে রয়েছে। সময় ও সুবিধার অভাব হবে না। আমার মুখ চেয়ে পুলিশের হাতে ছেলেটিকে দিয়া দিও। ভয় নেই, তোমার বা আমার ওতে কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। ডিম্বের বর্ণ থেকে যেমন পক্ষীকে চেনা যায়, আশাকরি, তেমনি আমার চিঠির ভাষা থেকে চিঠির প্রকৃত স্বরূপ তুমি বুঝতে পারবে। হাঁ, আমি ভালই আছি। ইতি—"

অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ গুজরাটের কোনও এক পল্লীতে আসামীর নিজ বাড়ী খুঁজে বার করে। ছোট্ট একটা খোড়ো বাড়ী। আসামীর এক অন্ধপ্রায় বৃদ্ধা মাতা মাত্র সেখানে বাস করে। পড়শীদের দয়ার উপর নির্ভর করে তিনি বেঁচে আছেন। কচিৎ কখনও মাত্র আসামী তাঁকে সামান্যরূপ সাহায্য পাঠায়। আসামীর এক সম্পর্কীয় ভগ্নী আছে বটে, কিন্তু সে থাকে তার স্বামীর সঙ্গে সিংহলে। তদন্তে প্রকাশ পায় আসামীর যাবতীয় কাহিনী কল্পিত। বৃদ্ধার চিঠিপত্র তল্লাস করে পুলিশ আসামীর লেখা খানকতক চিঠি উদ্ধার করে। দুইখানি চিঠির তর্জ্জমা নিয়ে দেওয়া গেল।

"মা ভাল আছ ত? শুনলে সুখী হবে, আমি বিয়ে করেছি। খুব ভাল বউ হয়েছে, মা। খুব সুন্দরী সত্যি বলছি। সে প্রায়ই তোমার কথা বলে, তোমাকে দেখতে চায়। কাল দুজনে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম। এর দাদারা খুব ধনী লোক। বিয়েতে আমরা পেয়েছি একটা মোটর গাড়ী, আর চমৎকার একটা বাড়ী। আমি একটা এখানে ব্যবসা ফেঁদেছি। অনেক টাকা লাভ হয়। শোন মা, তোমার বউ লেখাপড়াও জানে তোমার ছেলের চাইতেও, বুঝলে। আমরা দুজনে শীঘ্রই তোমাকে প্রণাম করে আসব।"

এর পরের চিঠিখানা প্রায় এক বছর পরের লেখা। অন্ততঃ চিঠির তারিখ থেকে তাই মনে হয়। দুখানি চিঠিই কোলকাতা থেকে লেখা হয়েছে, কিন্তু ঠিকানা কোনটাতেই দেওয়া নেই। দ্বিতীয় চিঠিখানির কিয়দংশও নিয়ে দেওয়া হল।

চিঠি দুইখানির বিবরণ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা সহজেই অনুমেয়।

"মা, আমি মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে জাপান থেকে সস্ত্রীক ফিরেছি। চোখের চিকিৎসার জন্যে আমি সেখানে যাই। কিন্তু মা, আমি ভাল হতে পারি নি। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। তোমার বউই এখন আমার একমাত্র চক্ষু। সে আমাকে খুব যত্ন করে। আমার কথা তুমি ভেব না। হাঁ, আমাদের একটা খোকা হয়েছে। ভারি চমৎকার খোকা। ভারি নরম তার দেহ। তুমি ভাল আছত মা। ভগবান আমার চক্ষু নিয়েছেন কিন্তু একটা খোকা দিয়েছেন, আর দিয়েছেন একজন সেবা-পরায়ণ বৌ। না মা, আমার কোন দুঃখই নেই। আমি খুব ভাল আছি।"

অপহৃত শিশুটীর মাতা আসামীর পায় ধরে কান্নাকাটি করে। আসামীকে একটু বিচলিত হতেও দেখা যায়। অবশেষে আসামী, লছমী দেবীর সঙ্গে একাকী বদ্ধ দুয়ারের মধ্যে কয়েক মিনিটের জন্য কথা কইতে চায়। এই প্রস্তাবে রাজী হলে সে শিশুটীকে ফিরিয়ে দেবে এইরূপ প্রতিশ্রুতিও দেয়। সে আরও বলে—লছমী দেবীকে সে বরাবরই বহিনের মত দেখেছে এবং ওদিনেও তাকে বহিনের মতই সম্মান দেবে। এরূপ প্রস্তাবে লছমী দেবী রাজী হন কিন্তু তাঁর স্বামী রাজী হন না। লছমী দেবী বলেন তিনি একজন ভারতীয় নারী। তাঁর নারীত্বের সম্মান পুত্র বা পতির জীবনাপেক্ষাও মুল্যবান। তাছাড়া আত্মরক্ষা করতে তিনি অপারগ নন। কিন্তু এরূপ একটা দুঃসাহসিক ব্যাপারে কেহ মত দেন না। আসামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়।

এরপর পুলিশ আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করে। তদন্তে প্রকাশ পায়, আসামী মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে রূপোজীবিনীদের গৃহে গিয়েছে। রূপোজীবিনীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, আসামী উচ্ছৃঙ্খল ধরণে যুবকদের নিয়ে তাদের গৃহে গিয়েছে বটে কিন্তু সে নিজে তাদের বহিন বলেই সম্বোধন করেছে। লছমী দেবীর প্রতিও যে সে কখনও কোনওরূপ বিসদৃশ ব্যবহার করেছে, এমন কোনও প্রমাণও পুলিশ পায় না। ভাই সম্বোধনটী আসামী বিশেষ পছন্দ করত এবং প্রায়ই তাকে অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ দেখা যেত। সবিশেষ অনুসন্ধানের পরও আসামী সম্বন্ধে আর কোনও তথ্য জানা যায় নি।

লছমী দেবীকে বালিকা বললেই চলে। তার উপর ছেলেটী ছিল তার প্রথম সন্তান। লছমী দেবীর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি পুলিশকে বিশেষ অভিভূত করে। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও তারা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ হন। আসামীকে শেষ পর্য্যন্ত এক সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা ও প্রশ্নোত্তরের পর নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আসামী একটী বিশেষ রকমের মানসিক রোগে ভুগছে। সে অনেক কিছু কল্পনা করে এবং তার সে কল্পনা সাহিত্যিকদের ন্যায় সাহিত্য রচনায় আবদ্ধ না রেখে সে তার সেই কল্পনাকে (সত্যকার) রূপ দিতে যায় বাস্তবতার মধ্যে (বা বাস্তব জগতে) ডাঃ সাহেব আরও বলেন, আসামী নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করে এবং সে মা হতে চায় এবং এইজন্যই ও লছমী দেবীর নাম-অঙ্কিত বাসনগুলি লছমী দেবীর বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়? বাক্সটী যেন তারই, আপাততঃ সে ফরিয়াদীর স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করছে। এরূপ অবস্থায় লছমী দেবীকে সতীনরূপে দেখে, তার উপর হিংসুক হয়ে উঠা আসামীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে হয়ত

আসামী লছমী দেবীকেই হত্যা করত। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে সে শুধু মা হতে চায়। কিন্তু সে পুরুষ, মা হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে নিজেকে অন্তঃস্বত্বারূপে কল্পনা করে ছেলেটীকে সরিয়ে দিয়েছে। দশদিন দশমাস পরে হয় ত সে ছেলেটীকে বার করবে অর্থাৎ ছেলেটীকে তখন সে প্রসব করবে। আসামীকে পীড়াপীড়ি করা বৃথা। পীড়াপীড়ির ফলে সে মিথ্যার পর মিথ্যা বলবে মাত্র। আসামী যে স্ত্রীরূপে নিজেকে কল্পনা করত (স্ত্রী মাত্রকেই) এইরূপ ভগ্নী সম্বোধন, তার এক বিশিষ্ট প্রমাণ। এইজন্যই পুরুষরূপে সে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেনি।

এইরূপ আরও অনেক প্রকার অপরাধী আছে যারা প্রকারান্তরে উন্মাদই, কিন্তু তাদের উন্মাদ অবস্থা বাস্তব জগতে ধরা পড়ে না এবং তাদের অপরাধসকল অপরাধরূপেই চালু হয়। এই উন্মাদ অবস্থার ন্যায় উত্তেজনা দ্বারা অভিভূত হয়েও অনেক মানুষ অপরাধ করে যা স্বাভাবিক অবস্থায় তারা করে না। এইরূপ একটা অপরাধের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল। দৃষ্টান্তটী রবার্ট হণ্ট সাহেবের অপরাধবিজ্ঞান পুস্তকের ৭১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

বর্টিমের সহরের কোনও এক আদালতে একটী ভদ্রঘরের মহিলাকে বিচারার্থ আনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল চুরির। দোকান থেকে সিল্কের টুক্‌রা চুরি করার অপরাধে তিনি ধৃত হন। দোকান থেকে বেমালুম সিল্কের কাটা টুকরা তিনি তুলে নিয়েছিলেন। দোকানদার তাঁকে বামালশুদ্ধ ধরে ফেলে। থানায় পুলিশ মহিলাটীর দেহ তল্লাস করে। মহিলাটী কিন্তু তাঁর নাম বা ঠিকানা জানাতে চান না। পুলিশ নাচার হয়ে তাঁকে বিচারার্থ চালান দেয়। এসময় মহিলাটীকে বিশেষ উত্তেজিত ও লজ্জিত দেখা যায়। মহিলাটী তিন দিন চোর-স্ত্রীলোক ও গণিকাদের সঙ্গে কারাবাস করেন। তাঁর বড় ছেলে অতি কষ্টে তাঁর সন্ধান পান এবং তাঁকে জামীনে খালাস করে আনেন। এক অভিনব অবস্থা ও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে মহিলাটী লজ্জায় ও ঘৃণায় অস্থির হয়ে উঠেন এবং কিছুদিন পরে চিন্তায় চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্কের বিকার ঘটে। কিছু সুস্থ হবার পর তিনি নিম্নলিখিত রূপ বিবৃতি দেন।

"আমার দুইটী মাত্র পুত্র। ছোট ছেলেটী ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে। আমি সদাসর্ব্বদাই তার জন্য চিন্তিত থাকি। একদিন খবর এল আমার পুত্রের রণক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটেছে। আমি শোকে উন্মাদের মত হই। বীর পুত্রের সম্মান রক্ষার জন্য আমার মন উতলা হয়ে উঠে। আমার ইচ্ছে হয় একটা সিল্কের জাতীয় পতাকা কিনে আনি। আমি ছুটে চলে যাই বাজারের দিকে। অনাহার ও অনিদ্রায় আমার মন অস্থির। কিন্তু তবু আমি ছুটে চলি। পথের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে দু দুবার হোঁচট্ খাই। শেষে রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়ী চাপা পড়ি। ধরাধরি করে কয়জন লোক আমাকে রাস্তার উপর উঠিয়ে দেয়। আমি পূর্ব্ব হতেই উত্তেজিত ছিলাম। এর পর আমার উত্তেজনা শেষ সীমায় এসে পৌঁছায়। আমার টাকা সমেত ব্যাগটা রাস্তায়ই পড়ে থাকে। কিন্তু সেদিকে আমার দৃষ্টি থাকে না। আমি আবার ছুটে চলি। এর পর কি হয়েছিল তা আমার মনে নেই। তবে ক্ষীণভাবে আমার মনে পড়ে, কারা যেন আমায় ধরে কোথায় নিয়ে এল। দারুণ উত্তেজনায় আমি আমার নাম পর্য্যন্ত ভুলে যাই। যখন আমি আমাতে ফিরে আসি, অর্থাৎ স্মৃতি শক্তি ফিরে পাই, তখন আমি জানতে পারি আমি একজন চোর। চৌর্য্য অপরাধে আমার বিচার হবে। আমি এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করি। আমাকে এরা মেরে ফেলুক, ফাঁসী দিক, কিন্তু জেলে না দেয়।"

মানুষ সাধারণতঃ মস্তিষ্কের দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক ছাড়া মেরুদণ্ডস্থিত (মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুদণ্ডের উপর অবস্থিত) স্নায়ু-কেন্দ্রগুলিও মানুষের কার্য্যবিশেষের জন্য দায়ী থাকে। নিদ্রা যাওয়ার সময় কেহ যদি ব্যক্তিবিশেষের পায়ে চিমটি কাটে, তা হলে ঐ ব্যক্তি অজ্ঞাত-সারেই পা-টা সরিয়ে নেয়। এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই মানুষের এইরূপ ব্যবহারের জন্য দায়ী। এরূপ অবস্থায় মস্তিষ্ক থাকে সুপ্ত এবং এই জন্য জাগ্রত হওয়ার পর মানুষের এই (চিমটী-কাটাজনিত ব্যথা) চিমটী কাটার বা পা সরানর কথা মনে থাকে না। ইংরাজীতে একে বলে Reflex Action. সবিশেষ উত্তেজনার মধ্যে পড়লে, মানুষের মস্তিষ্ক তার স্নায়ুকেন্দ্রগুলি থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কের আদেশ ব্যতিরেকে বা মস্তিষ্ককে না জানিয়ে, এই স্নায়ুকেন্দ্রগুলি স্বাধীনভাবে কাজ করে। ফলে মানুষের অবস্থা হয় তখন হাল-বিহীন নৌকা বা চালক-বিহীন ছুটন্ত শকটের মত, ঠিক এইরূপ অবস্থাতেই উপরি উক্ত অপরাধটী সংঘটিত হয়েছিল। এইজন্য চুরির ব্যাপারটী তার মনে ছিল না। রাত্রে অনেকে উত্তেজিত বা ভীত হয়ে ভূত দেখেন এবং ভয় পেয়ে দৌড় দেন। মাঠ ঘাট পথ খানা বেড়া ডিঙিয়ে তাঁরা ছুটে আসেন। কিন্তু তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন পথ দিয়ে এবং কেমন করে তাঁরা পালিয়ে এলেন—তাঁরা সে সম্বন্ধে কিছু জানাতে পারেন না। ভূত দেখা এবং এই ভূত দেখার পূর্ব্বেকার ঘটনাগুলি ছাড়া তাঁদের আর কিছুই মনে থাকে না। উপরোক্ত কারণেই তাঁদের এইরূপ স্মৃতিবিস্মৃতি ঘটে। নিম্নের স্বীকার উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য।

"হঠাৎ দীঘিটার ওপারে দেখলাম একটা হলদে রঙের জন্তু। বাঘ বলেই মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুট দিলাম। বাড়ী ফিরে দেখলাম আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত। আমার জামা কাপড় ভিজে। সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত। মাথায় একটা আঘাত। কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে। কোন পথ দিয়ে আমি ফিরে এসেছি তা আমার মনে নেই। কোথাও পড়ে গিয়েছিলাম কিনা তাও মনে নেই। ছোট খালটি ডিঙিয়ে এসেছি কিনা, তাও জানি না। বাগানের মধ্য দিয়ে এসেছি, না পথ বেয়ে এসেছি তাও জানি না।"

উক্তরূপ আরও কয়েক প্রকার বেঠিক অপরাধ আছে, যে সকল অপরাধকে অপরাধরূপে আদবেই ধরা উচিত নয়। এমন অনেক চুরি আছে যা এক প্রকার রোগ। এই সব লোকেরা চুরি করে লাভালাভের জন্যে নয়; চুরি করবার এক অত্যদ্ভুত ইচ্ছা তাদের পেয়ে বসে। এইরূপ ইচ্ছা দুর্দ্দমনীয় হয় না বটে, কিন্তু এই ইচ্ছার নিবৃত্তি না ঘটা পর্য্যন্ত তারা এক দারুণ অস্বস্তি অনুভব করে। তারা চুরি করে তাদের এই ইচ্ছার নিবৃত্তির বা অস্বস্তির উপশমের জন্যে। একদিন তারা চুরি করে, পরের দিন তারা চুরির জিনিস ফিরিয়ে দেয়। য়ুরোপে এমন অনেক ম্যানিয়াগ্রস্ত ধনকুবের আছে, যারা দোকান থেকে বেমালুম জিনিস সরিয়ে পকেটে পুরেন। দোকানদাররা দেখে, কিন্তু কিছু বলে না। পরের দিন বড় রকমের একটা বিল পাঠিয়ে তারা মূল্যাদি আদায় করে নেয়। এই সব রোগীরা চুরি করার জন্য দ্রব্যাদি খুঁজে বেড়ায় না। তালা ভেঙে বা পাঁচিল টপকেও তারা চুরি করে না। কোনও দ্রব্য একেবারে সামনে না পড়লে তাদের এইরূপ ইচ্ছার উদয় হয় না। এই ইচ্ছার স্বরূপ ও গতি থাকে মৃদু এবং সদাসর্ব্বদাই এই ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। ইহা সাময়িকভাবেই আসে। বিশেষ জানাশুনা বাড়ী বা দোকান না হলে, রোগীরা এই সব কাজে হাত দেয় না। অনেক সময় এইরূপ ইচ্ছা তারা দমনও করে। এ সম্বন্ধে কয়েকটী এ দেশী উদাহরণ দেওয়া যাক।

আমার এক সম্পাদক বন্ধু একদা আমার বাড়ীতে তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুকে নিয়ে আসেন। তার এই "অমুক বাবু" বন্ধুটীর এই রোগ ছিল। ঘরে বসে গল্প করতে করতে কখন যে তিনি আমার দামী মাফলারটা সরিয়ে ফেলেন তা আমি জানতে পারি না। উঠবার সময় আমার মাফলারটা আমার হাতেই তুলে দিয়ে সেটা আমাকেই তাঁর গলায় বেঁধে দিতে বলেন। আমি মাফলারটা নিঃসন্দেহে তাঁরই মনে করে সযত্নে তাঁর গলায় বেঁধে দি। বন্ধুটি সবই দেখেন এবং শোনেন, কিন্তু

মুখে কিছুই বলেন না। কয়দিন পরে বন্ধুটি সব কথা আমায় খুলে বলেন এবং আমাকে তাঁর সেই বন্ধুটার বাড়ী নিয়ে যান। অমুকবাবুর ঘরের একটা আনলায় আমার মাফলারটা ঝুলান দেখি। সম্পাদক বন্ধু নির্ব্বিকার চিত্তে মাফলারটা তুলে নিয়ে জানান, তিনি দুদিন আগে ওটা ওখানে ফেলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ অধোবদন থেকে ভদ্রলোক উত্তর দেন—কেন লজ্জা দিচ্ছেন, ওটা আমি কালই সকালে দিয়ে আসতাম। বুঝলাম অমুকবাবুর এইরূপ ইচ্ছার নিবৃত্তি বন্ধুবরের উপর দিয়েই সাধারণতঃ চলে।

কিছুদিন আগে এক মহিলা কবির গৃহেও এইরূপ একটী চুরি হয়। এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে আসেন এবং একটী মূল্যবান সোনার হার নিয়ে সরে পড়েন। মহিলা কবি সবই দেখেন, কিন্তু মহিলাটীকে কিছু বলিতে কুণ্ঠিত হন। পরের দিন মহিলাটী তাঁর বাড়ীতে পুনরায় বেড়াতে আসেন, কিছুক্ষণ পরে হারটাও পুর্ব্বস্থানে ন্যাস্ত দেখা যায়। ঐদিনই আবার মহিলা কবির একটা ছোট খাট কম মূল্যের জিনিষ খোয়া যায়। কিন্তু পরের দিন তিনি কাশ্মীর রওনা হন, সুতরাং জিনিসটীও তিনি আর ফিরে পান না।

এই সব অপরাধী ছাড়া শিশু ও অপরিণত বালক দ্বারা কৃত কোনও অপরাধ অপরাধরূপে স্বীকৃত হয় না। মাতাল অবস্থায় লোকে যদি কোনও অপরাধ করে ত তার সেই অপরাধকেও অপরাধরূপে ধরা হয় না, যদি না সেই ব্যক্তি অপরাধ করার উদ্দেশ্যেই মদ্যপান করে থাকে। এই সকল অপরাধী বা অপরাধ-রোগীরা ভুলক্রমে যাতে আসল অপরাধীরূপে শাস্তি না পায়, সে সম্বন্ধে রাষ্ট্র মাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পূর্ব্বাপর মানসিক অবস্থা, হাবভাব, ব্যবহার, সামাজিক আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা লক্ষ্য করে সহজেই বুঝে নেওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সঠিক অপরাধী বা অপরাধ-রোগী। অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহের উদ্রেক হওয়া মাত্র, তাকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রেখে বা জামীনে খালাস দিয়ে, অপরাধীর মানসিক, পারিপার্শ্বিক ও অপরাপর বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া উচিত। তাদের বংশ-পরিচয় (অর্থাৎ তাদের পিতামাতা এবং পিতৃ ও মাতৃকুলের অপরাপর ব্যক্তিদের জীবন বৃত্তান্ত) থেকে অপরাধীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞাত হয়ে তাদের এই রোগ এবং রোগের কারণ সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানা যায়। বৃটিশ আইনের মূল নীতি হচ্ছে, পঞ্চাশটা অপরাধী খালাস পাক ক্ষতি নেই, কিন্তু ভুলক্রমে একজন নিরপরাধীরও যেন শাস্তি না হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় পুলিশ ও ভারতীয় আদালতসমূহ এ বিষয়ে সবিশেষ সচেতন। ভারতীয় দণ্ডবিধি মাত্র জ্ঞানতঃ দোষী ব্যক্তিদেরই শাস্তি চাহে। উপরি উক্ত ক্রিপ্টোম্যানিয়ার কথাই ধরা যাক। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় চৌর্য্য অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ। কেহ যদি অপরের দখলীভূত কোনও অস্থির বা অস্থাবর দ্রব্য দখলীভূত ব্যক্তির বিনা অনুমতিতে আত্মসাতের বা ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্য অপসরণ করে ত তার এই কার্য্যকে চৌর্য্য কার্য্য বলা হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীরা উক্ত রূপে দ্রব্যাদি অপসরণ করে বটে, কিন্তু তা তারা করে আত্মসাতের বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। এইরূপ কার্য্য সে করে তার অপরাধ-স্পৃহার (আত্ম নিবৃত্তির) নিবৃত্তির জন্যে। তার এই কাজের জন্য সে প্রায়ই অনুতপ্ত হয় এবং হৃত দ্রব্য ফেরত দেবার জন্য সর্ব্বদাই সুযোগ ও সুবিধা খোঁজে। অনেক সময় লজ্জার খাতিরে সে হৃত দ্রব্য বিনষ্ট করে, কিন্তু পারতপক্ষে আত্মসাত করে না।

এ বিষয়ে পুলিশের সহিত মনস্তত্ত্ব পণ্ডিতদের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এমন অনেক রাষ্ট্র আছে যেখানে য়ুনিভারসিটীর প্রফেসাররা পুলিশকে প্রায়ই পরামর্শ দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতে এমন একটীও বিশ্ববিদ্যালয় নেই, যেখানে অপরাধ-বিজ্ঞান চর্চ্চার কোনও ব্যবস্থা আছে। (ক্রমশঃ)

বিত্ত ও চিত্ত

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু শেষে আছে যে শশ্মান, তারে লয়ে
কি করিব? জীবনের বাঁকা পথ বয়ে

চলিতে চলিতে যদি শুধু পাই গ্লানি
অপমান হাহাকার রিক্ততার হানি?

কঠিন দারিদ্র্য যবে ক্রূর দম্ভ ভরে
কেড়ে লয় অন্ন জল, শুখাইয়া মরে

অন্নাভাবে তিলে তিলে পুত্র পরিজন
প্রখর তপন তাপে ফুলের মতন

ঝরে পড়ে রোগতাপে পত্নী প্রিয়তমা
অচিকিৎসা অনাহারে? কাব্য মনোরমা

কোন্ সুধা দানিয়া তখন রিক্ততারে
জীবনের করিবে মধুর? হাহাকারে

দিবে ঢাকি? বৃথা কবি কীর্ত্তির সৌরভ
বৃথা হায় বিত্ত হ'তে চিত্তের গৌরব।

বাংলা : ১৯৪৩

শ্রীঅমিয় গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড় এখানে তুষার ধবল, কাঁপুনে শীত ;
আমরা তাতেও দমি না আদৌ—গাঁথছি ভিত্।

ইমারত্ শেষ হ'বে কিনা হ'বে জানি না তা' ;
ফাঁপা মানুষেরা বোঝে কি সহজে স্বাধীনতা !

তবু দূরে থেকে হই উন্মনা খুলি বেতার ;
বাংলাকে পেয়ে মন খুশি হয়, শুনি সেতার।

জাপানী বিমান দিয়ে গেছে হানা—তবুও নাকি
যায়নি প্রেয়সী প্রিয়তমে তার ফেলিয়া রাখি !

জিনিষের দাম বাড়ে শতগুণ, অর্থ নাই ;
গ্রামে হয় লুঠ, শহরে ডাকাতি—কোথায় ঠাঁই !

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলিছে শতেক প্রাণ
জন-সমুদ্রে হাঁকে মহাকাল তোলে তুফান।

মন্বন্তরে মরেনিকো যারা—তারা অমর ;
শত্রুসূদন সাজছে যে আজ, দেখ সমর !

ট্র্যাজেডি

শ্রীবিজয়রঞ্জন বসু এম-এ

বর্ষার মুখর দিন। কলকাতার কোন এক বড়লোকের ঘরে কয়েকজন তরুণ জটলা করছে। তাদের ঘরোয়া বৈঠকের আজ অধিবেশন ছিল—বিশেষ কোন কারণে সভাপতি না আসায় তারা নিজেরাই আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে। এ কথা সে কথা থেকে অধিপ বললে, "আচ্ছা, এই বর্ষাকালের দিনে কালিদাস কী করতেন?"

সকলেই বাইরের আকাশের দিকে তাকালে।

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ চারিদিকে ঘনঘটা করে রয়েছে, কোথাও কালো, কোথাও ধূম্র। বর্ষার অন্ধকারের সঙ্গে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া মিলে গিয়ে করুণভাবে সহরের বুকের ওপর নামছিলো। অবিরাম বৃষ্টির মধ্যে ট্রাম বাসের যাওয়ার শব্দ ও বিজলী-বাতির ক্ষীণ আলো সেই করুণ ভাবকে আরও ঘোরালো করে তুলছিলো। সহরের এই প্রাকৃতিক দৃশ্যে মন ময়ূরের মত নেচে না উঠলেও বর্ষা ও কালিদাসের কথায় সকলেই বাইরের দিকে চাইলে, যদি উজ্জয়িনীর কোন পথভোলা মেঘ মালবিকা কি শকুন্তলার জীবনের কোন অজ্ঞাত দিনের, কি কোন না-জানা ঘটনার ইঙ্গিত দিতে পারে। কিন্তু চোখে পড়লো শুধু ইলিশ মাছ হস্তে ঊর্দ্ধশ্বাস পথিক, আর উৎক্ষিপ্ত কলকাতার বিশিষ্ট রকমের কাদা।

হঠাৎ প্রতুল বলে উঠলো, "কালিদাস কি আর করতো, প্রেম করতো আর নাটক লিখতো"। কথা চলে গেল নাটকে, কালিদাসের নাটক থেকে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে, তবে কালিদাসেরই চতুর্দ্দিকে কথা ঘুরতে থাকলো।

প্রভাস চুপ করে একধারে বসেছিলো। ধীরে ধীরে বললে, "সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য সম্পূর্ণ নয়; তার কারণ, জীবনের যে দুটো দিক—tragic ও comic, সেই দুটো দিকের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে হয় নি। দেখ, সংস্কৃতে tragedy নেই। প্রত্যেক বড় বড় সাহিত্যিকই comedy লিখেছেন। জীবনটা ত শুধু একটানা প্রিয়া, সুরা, আর কাব্যের সংমিশ্রণে নয়, তার মধ্যে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, অভাব আছে, পরাধীনতা আছে—আর এই সবের একীভূত ফল হচ্ছে অশ্রু। জীবনে হাসিও যেমন সত্য, অশ্রুও তেমনি সত্য। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যকারেরা জীবনের এই দিকটা মোটেই দেখেন নি"।

বিদিত আর চুপ করে থাকতে পারলে না; বললে, "মশাই কালিদাসের সময় অভাব ছিলো না, তাই অশ্রুও ছিলো না, সেই জন্যেই সংস্কৃতে tragedy নেই।" সীতাংশু বললে, "বিদূষকের একটা কুঁজ কিন্তু তাকে বড়ই কষ্ট দিতো"।

সবাই হেসে ওঠা সত্ত্বেও প্রভাস গম্ভীর হয়ে বললে, "তা হয় না বিদিত। আগে সম্পূর্ণ সুখ ছিলো আর এখন কেবল দুঃখ—এটা কাঁচা কথা। সুখ দুঃখ চিরকালই পাশাপাশি আছে।"

বিদিত বললে, "আরে মশাই, আপনি যেন কী। একবার ভেবে দেখুন তো কালিদাসের সময়টা—অশোকমঞ্জরী প্রিয়ার পদাঘাতে মুঞ্জরিত হয়ে উঠছে, বলাকা ভেসে যাচ্ছে, সুন্দরীরা অর্দ্ধাবৃত দেহে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাতে তাদের লীলাপদ্ম, কানে কুন্দকলি, মাথায় কুরুবক, তনুদেহে রক্তাম্বর, পায়ে নূপুর, কন্দর্পকান্তি রাজা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী—এর মধ্যে থেকে comedyই হয় মশায়, tragedy হয় না"—

একজন বলে উঠলো, "আর এই সবের মধ্যে তুমি রসসৃষ্টি না করে বিদূষকের অপভ্রংশের মতো রসভঙ্গ করছো আর পেল্লায় ভুঁড়ি বাগাচ্ছ।"

বিদিত একটু বিরক্ত হয়ে থেমে গেল। তার মোটা চেহারার ওপর সকলেই একটু কটাক্ষপাত করে। বিদিত তাতে চটে, তবে বিশেষ রাগে না। তাকে বিরক্ত করে সীতাংশুই বেশী।

প্রভাস আবার সুরু করলে, "যে আবহাওয়ার মধ্যে তাঁরা ছিলেন, তাতে তাঁরা ঠিকই করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গীটা সম্পূর্ণ নয়—তাঁরা একটা দিকই দেখেছিলেন; দুঃখের দিকটা মোটেই দেখেন নি, বা দেখে থাকলেও তা নিয়ে কোন সাহিত্য রচনা হয় নি। এই আমি বলছিলাম।"

প্রতুল বললে, "তা হলে ত' যে আবহাওয়ার মধ্যে আমরা এখন আছি, তাতে আমাদের এক একটা খাটিয়ায় শুয়ে কচি সংসদের সভ্যদের মতো ভেউ ভেউ করে কাঁদা উচিত। মানে, আমি এই স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কথা বলছিলাম।"

সৌভাগ্যক্রমে বাড়ীর উড়ে চাকরটা এই সময়ে চা নিয়ে এল। বলে উঠলো অধিপ "অপূর্ব্ব সমন্বয়"।

চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার অবসরে হাল্কা হাসি থামতেই বীরেন যেন সবই ঠিক করে দিতে পারে এমনিভাবে আস্তে আস্তে বিবৃতি প্রকাশ করলে, "tragedy যে একেবারে নেই, এ কথা বলতে পারি না প্রভাসদা।"

সকলে বলে উঠলো, "কোথায় হে, তুমি আবার সংস্কৃত সাহিত্যে tragedy পেলে কোথায়?"

বীরেন বললে, "সম্প্রতি একটা পুঁথি পাওয়া গেছে। সেটা কালিদাসের; তবে এখনও সঠিক করে কিছু বলা যায় না, কারণ এই পুঁথিটা নিয়ে এখন বড় বড় পণ্ডিতেরা গবেষণা করছেন তার কতটুকু আসল আর কতটুকু interpolation তা নির্দ্ধারণ করবার জন্যে।"

প্রভাস জিজ্ঞাসা করলে, "কিন্তু কালিদাস যে একজন ছিলেন তার প্রমাণ? বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, আরও কত চণ্ডীদাস বেরুচ্ছে। তেমনি হয়ত কোন দিন দেখবে—মানে আমরা দেখব না—যে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক ব্যক্তি কি না, এ নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে গিয়েছে initiated মহলে।"

বীরেন বললে, "না, না, ষ্টাইলের অভ্রান্ত মানদণ্ডে যাচাই করে পণ্ডিতেরা এর মধ্যে কালিদাসের অমর লেখনীর সন্ধান অনেকাংশে পেয়েছেন। এই যেমন, বিক্রমোর্ব্বশীয়ের মধ্যে "তু" এর ব্যবহার ১০%, কিন্তু কমে কমে শকুন্তলাতে হয়েছে ৫%, আর সেই অনুপাতে এই নতুন নাটকটিতে ৩%।"

প্রভাস প্রশ্ন করলে, "নাটকখানির নামটি কি? বইটা পড়েছ? কি ব্যাপার নিয়ে লেখা?"

বীরেন বললে, "নাম 'কাব্যানুপেক্ষিতম্'। ব্যাপারটা হচ্ছে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের'ই continuation…অনসূয়া, প্রিয়ম্বদাকে নিয়ে লেখা।"

বিদিত বললে, "বীরেনবাবু দিব্যি পাকা চাল দিচ্ছেন।"

বীরেন বললে, "না, না, বাজে কথা বলছি না; যে group থেকে এই নাটকটা নিয়ে research করা হচ্ছে তার মধ্যে আমাদের Dr. Ghosh আছেন। তিনিই আমায় সেদিন নাটকটা পড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই researchএর ঘরে বসে পড়েছি। গল্পটা আপনারা যদি শোনেন ত বলতে পারি।"

প্রভাস বললে, "শুনতে তো অনেক আগে থেকেই চাওয়া হচ্ছে।" বীরেন সুরু করলে, "আপনারা Shakespearএর নাটককে যেভাবে tragedy বলেন এটা সে রকম নয়। Shakespearএর নাটকে তৃতীয় অঙ্ক থেকে নাট্যকার এক একজন লোককে মারতে সুরু করার পর দেখা যায় যে পঞ্চম অঙ্কের শেষে সব কটা প্রধান লোকই মরে গিয়েছে। এ নাটকটা তা নয়। সাধারণতঃ আমরা যাকে comedy বলি তার মধ্যে যে কতটা tragedy অন্তর্নিহিত আছে লেখক তারই অতি গূঢ় ইঙ্গিত করেছেন—আর সেইটেই হচ্ছে আখ্যানভাগের মূলমন্ত্র। যাক, সে আখ্যান ভাগটা এই :—

বিদিত বিপুল উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো, "বলুন মশাই বাজে কথা রেখে।"

বীরেন বিদিতের উৎসাহে একটু হেসে সুরু করলে, "নাটকটার নান্দীশ্লোকে বলা হয়েছে যে কালিদাস তাঁর শকুন্তলার অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদাকে ভুলে যান নি। তাঁদের জীবনের একটা সুন্দর উপসংহার তিনি এই নাটকে করেছেন, আর সেই জন্যেই এটা সুধীবৃন্দের কাছে উপস্থিত করা হচ্ছে।

নাটকটার প্রথম অঙ্কে আমরা দেখছি—রাজা ও শকুন্তলার কথাবার্ত্তা। শকুন্তলা তাঁর সখীদ্বয়ের জন্য বড়ই কাতর হয়ে দুষ্মন্তকে বলছেন যেন তিনি তাঁদের আনার ব্যবস্থা করেন। রাজাও অতীতে সখীদের কাছে বিশেষ উপকৃত হয়েছেন। তাঁরা তাঁর প্রেম ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন—এমন কি তাঁদের সাহায্য না পেলে তাঁর পক্ষে শকুন্তলা লাভ সম্ভব নাও হতে পারতো—এই সব কথা স্মরণ করে তিনি সখীদ্বয়কে আনবার জন্যে বিদূষককে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বিদূষক তপোবনে গিয়ে বড় সুখী হয়েছেন! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তপোবনের শ্যামল শোভা, কৃষ্ণসার মৃগ, পাখীদের কূজন তাঁর মন হরণ করেছে। তার ওপর তাঁর সুখের আধিক্য হওয়ার কারণ হচ্ছে যে তিনি শকুন্তলার সখীদ্বয়ের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করবার একটা সুযোগ পাবেন।"

কে একজন বলে উঠলো, "তিনি nature's natural কিনা।" বীরেন আবার আরম্ভ করলে, "পথে যেতে যেতে বিদূষকের মনে হলো যে, আমায় সবাই পেটুক বলে কারণ আমি বেশী খাই। কিন্তু ঔদরিক ক্ষুধা ছাড়া আমার যে আরও আর একটা ক্ষুধা আছে তার সন্ধান ত' কেউ রাখে না। এই তপোবনে এসে মহারাজ স্ত্রীরত্ন লাভ করেছিলেন; আমাকেও চেষ্টা করে দেখতে হবে তেমন কোন পদার্থ আমার ভাগ্যে পড়ে কিনা।"

সীতাংশু বলে উঠলো, "বিদিত, তোমার পেটে পেটে এত?" খুব একটা হাসির ধূম পড়ে গেল।

বিদিত কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললে, "আমার আবার কি মশাই; আপনাদের যেমন সব কথা।"

প্রভাস বললে, "বলে যাও বীরেন।"

বীরেন বলতে লাগলো, "এইবার আমরা দ্বিতীয় অঙ্কে এসে পড়লুম। সেখানে দেখছি যে সাধারণ কুশলসম্ভাষণের পর বিদূষক একটু রহস্যালাপে মত্ত হয়েছেন। তাঁর আন্তরিক অভিসন্ধি হচ্ছে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার মনোরঞ্জন করা। কথায় কথায় বিদূষক বললেন, প্রিয়সখীরা, তোমাদের রাজসভায় যাইতে হইবে, কারণ মহারাজের ও রাজমহিষীর এইরূপই আদেশ। তোমাদের দেখিয়া তাঁহারা সঞ্জীবিত হইবেন ও ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে তোমরাও প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করিতে পার।"

অনসূয়া উত্তরে বলছেন, "আমরা তপোবনের অধিবাসী। আমরা বল্কল মাত্র পরিধান করিয়া দিনাতিপাত করি। রাজধানীতে ত বল্কল পরিধান করিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।" তার উত্তরে বিদূষক বলছেন, "তজ্জন্য তোমরা চিন্তামাত্র করিও না; আমি তোমাদের উত্তম চীনাংশুক ক্রয় করিয়া দিব।"

প্রিয়ম্বদা—'বয়স্য, আমরা বিশেষ সুষ্ঠুভাবে কথা কহিতে জানি না, তাহার কী হইবে? আমাদিগকে রাজধানীর ভাষা শিখাইবে ত?'

'বিদূষক—'প্রিয়ম্বদে! তুমি যাহাই বল তাহাই শ্রুতিমধুর।'

প্রিয়ম্বদা—'ভদ্র, রাজধানীতে গিয়া তুমি রাজসন্নিধানে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া যাইবে না ত? আমাদের তোমার সঙ্গসুখ দানে তৃপ্ত করিবে ত?'

বিদূষক—'তোমাদের নিকট থাকিতে পাইলে ব্রাহ্মণ স্বর্গেও যাইতে চাহিবে না, নিরন্তর তোমাদেরই অনুগমন করিবে।'

অনসূয়া—'ভদ্র, তোমার কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেছি; তবে ইদানীং রাজধানী গমন সম্ভবে না—কারণ মহর্ষি কণ্ব অনুপস্থিত। তিনি কয়েক দিবসের মধ্যেই সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিবেন, তখন আমরা রাজধানী যাইব। তুমিও এই কয়েক দিন তপোবনের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া দিনযাপন কর।'

বিদূষক—'তাহাই হউক।'

প্রিয়ম্বদা—'বয়স্য, তোমার কোনপ্রকার অসুবিধা হইবে না ত?'

বিদূষক—'প্রিয়ম্বদে, তোমাদের সাহচর্য্য পাইলে আমি কৃষ্ণসার হইয়াও থাকিতে অভিলাষী। তোমরা আমার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবে, আমার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইবে, আমার নাসিকাগ্রভাগে ক্ষত হইলে ইঙ্গুদী তৈল প্রদান করিবে—অহো, স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হইবে।'

সীতাংশু অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। বিদিতের হাসি দেখে তাকে রাগাবার লোভ সামলাতে পারলে না; বলে উঠলো, "বহুৎ আচ্ছা বিদিত, খুব জমিয়েছ যে।"

"এর পরেই আমরা তৃতীয় অঙ্কে এসে উপস্থিত হচ্ছি। সখীরা রাজধানীতে এসেছেন ও শকুন্তলা আর দুষ্মন্তের সাহচর্য্যে সুখে

বাস করছেন। রাজধানীর ঐশ্বর্য্য, রাজার মিষ্ট ভাষা, শকুন্তলার সঙ্গ, মহাকালের মন্দির ও রাজ্যের অন্যান্য দেখবার জিনিস তাঁদের যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে। তাঁরা তপোবনে ফিরে যেতে বিশেষ ইচ্ছুক ন'ন। রাজার স্তায়পরতা ও সুষ্ঠু রাজ্যপরিচালনায় তাঁরা আনন্দিত। তপোবনের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা মনে করে তাঁরা ভীত হয়ে উঠছেন। স্বর্গের অপ্সরার মতো তাঁরা রাজার বাগানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চিত্তবিনোদন করছেন। এর মধ্যে বিদূষকের রসালাপও তাঁদের সুখের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। তাঁরা ব্রাহ্মণের প্রেমালাপে বিশেষ বিচলিত না হলেও তার অমায়িক ব্যবহারে আনন্দিত হয়েছেন।"

"চতুর্থ অঙ্কে আমরা কণ্বমুনির আশ্রমে ফিরে এলাম। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার অনেকদিন অনুপস্থিতিতে মহর্ষি একটু চিন্তিত হয়েছেন। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত আশ্রমের সমস্ত কাজ ঠিক করে করতে পারছেন না—তাঁদের তপশ্চর্য্যারও ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে। গাছপালায় ঠিক জল দেওয়া হচ্ছে না, পশুপাখীদেরও ঠিক যত্ন হচ্ছে না, তাই মহর্ষি কণ্ব সখীদের আনবার জন্ত ঋষিকুমারদের রাজধানীতে পাঠাচ্ছেন।"

রাজধানীতে এসে তাপসকুমারেরা সখীদের মহর্ষির ইচ্ছা জানালেন। শকুন্তলা প্রথমেই আপত্তি করলেন। তিনি সখীদের এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। রাজারও তাই অভিপ্রায়। সখীদেরও যাবার বিশেষ ইচ্ছা নেই, তবে অনসূয়া বললেন, 'সখি, চল আমরা যাই, নচেৎ মহর্ষির অসুবিধা হইবে'। প্রিয়ম্বদা কিন্তু বিশেষ আপত্তি করলেন। তিনি বললেন, 'না, আমরা আরও কিছুদিন পরে যাইব। আমরা রাজধানীতে বিশেষ সুখে আছি; এতদ্ব্যতীত, এত সত্বর তপোবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজ ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন'। এই কথা শুনে শার্ঙ্গরব অত্যন্ত রেগে গেলেন। তিনি এই বলে সখীদের অভিশাপ দিলেন যে, 'তোমরা যে আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মহর্ষির অবমাননা করিলে এবং রাজধানীর কলুষতাকে তপোবনের পবিত্রতা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলে এই পাপে তোমাদের গণ্ডের উপর বিস্ফোটক হউক।"

এই নিদারুণ অভিশাপে সখীরা তাড়াতাড়ি এসে শার্ঙ্গরবের পা দুটী ধরে খুব কাতরস্বরে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। তাঁদের অনুনয়ে তপস্বীর রাগ কিঞ্চিৎ কমলে তিনি বললেন, 'আমার নির্গত বাক্য আর অন্তর্গত হইবে না। তবে তোমরা আমার ভগ্নীস্থানীয়া: সুতরাং ক্ষমার যোগ্যা। আমার বাক্যের অন্যথা হইবে না; তবে যদি তোমরা কোনদিন সর্ব্বান্তঃকরণে হাস্য করিতে পার তাহা হইলে তোমাদের শাপমোচন হইবে। এই বলে তপস্বীরা তপোবনে ফিরে গেলেন"।

বীরেন বললে, "এর পর পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হচ্ছে। সখীদ্বয় রোগাক্রান্তা হয়েছেন। তাঁদের গণ্ডদ্বয় স্ফীত হয়েছে আর তার ওপর বিস্ফোটকও দেখা দিয়েছে। মহারাজ বিশেষ চিন্তিত। শকুন্তলাও বিশেষ উদ্বিগ্না; কারণ তিনি সখীগতপ্রাণা। রাজ্যের সমস্ত বৈদ্য এসে তাঁদের চিকিৎসা করছেন। অন্যান্য দেশের রাজসভা থেকে বিদূষক আনা হয়েছে, তারা নানারকম রসকরি করে সখীদের হাসাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কেউই সফল হচ্ছে না। তা' ছাড়া রাজার বিদূষক ত' আছেই। সেও নানাপ্রকার রসের অবতারণা করা সত্ত্বেও সখীদের রোগমুক্তির কোন আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না। বৈদ্যেরা বিধান দিলেন যে প্রত্যহ সখীরা যেন প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় নদীতীরে ভ্রমণ করেন, তা'তে মন প্রফুল্ল হবে ও শারীরিক উপকারও হতে পারে। সখীরা তাই করতে লাগলেন।"

এই পর্য্যন্ত বলে বীরেন বললে, "দেখ, শেষের দিকটা ভারি সুন্দর বলে আমি কপি করে নিয়েছি, অবশ্য খুব মোটামুটিভাবে—তোমরা শোন, আমি পড়ে যাই।"

প্রভাস উত্তর করলে, "আচ্ছা, পড়েই যাও।"

বীরেন সুরু করলে, "তখন শরৎকাল। রেবা কূলে কূলে পরিপূর্ণা। আকাশে বলাকা সঞ্চরমান। বায়ুসঞ্চালিত কাশপুষ্প-রেণু চতুর্দ্দিকে বর্ষিত হইতেছে। প্রকৃতি মনোহারিণী। রেবার শীতল শীকরবাহী সমীরণ যেন নন্দনকাননের পারিজাতের সস্নেহ পরশ বুলাইয়া দিতেছে। এমন এক প্রত্যুষে অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা শকুন্তলার সমভিব্যাহারে রেবাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতি প্রত্যুষে বিদূষক নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন। নদীগর্ভে অসংখ্য মৎস্য ও কর্কটশিশু সুখে বিচরণ করিতেছিল। অবগাহন-কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্কটসমূহ বিদূষকের সর্ব্বাঙ্গে যথেচ্ছ দংশন আরম্ভ করিল। দংশনজ্বালায় বিরক্ত হইয়া বিদূষক মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। সম্মুখে সখীত্রয় থাকায় তিনি হস্তদ্বারা কর্কটের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাই নদীগর্ভে অধিকতর প্রবিষ্ট হইয়া হস্তপদদ্বয় ইতস্ততঃ দেহের সহিত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের করুণভাব ও অপদস্থতা ঢাকিবার আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া সখীত্রয় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হাস্য করিতে দেখিয়া বিদূষক কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত হস্তসঞ্চালন বন্ধ করিলেন ও আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হইলেন। কর্কটগণও পুনরায় দংশন করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহাকে আবার বাধ্য হইয়া হস্তপদ ঘর্ষণ করিতে হইল। সখীরাও বিদূষকের বিমূঢ়ভাব দেখিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রাণ ভরিয়া হাস্য করিবার পর সখীদের শাপমোচন হইল। তাঁহাদের শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইল। তাঁহারা শকুন্তলার নিকট বিদূষকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। শকুন্তলা বিদূষককে বলিলেন, "ভদ্র, তোমার কৃপায় ইঁহাদের শাপমোচন হইয়াছে, অতএব তুমি পুরস্কার প্রার্থনা কর।" বিদূষক মহা আনন্দিত হইয়া বলিল, "মহারাণী, আমি বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়াছি; কিন্তু একজনকে ফেলিয়া অপরকে বিবাহ করিতে আমার মন চাহিতেছে না; অতএব আমি উভয়কেই বিবাহ করিব—এই পুরস্কার প্রদান করুন।"

শকুন্তলা সখীদের দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক।"

এই বলে বীরেন গল্প শেষ করলে। বললে, "বলুন তো প্রভাসদা, এটা কত বড় *tragedy*. আমার মনে হয়, এটা কালিদাসেরই।"

তখনও বাইরে প্রবলভাবে বৃষ্টি পড়ছে।

সংস্কৃত বাঙ্‌ময়ের বিস্তার

অধ্যাপক শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম-এ, পিএচ-ডি

সংস্কৃত ভাষা ও তদনুবর্ত্তী প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত গ্রন্থসমূহের বিষয়-বৈচিত্র্য, পরিমাণ, সংখ্যা ও ব্যাপকতার পরিচয় লাভ করিতে হইলেও আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের প্রবর্তিত রীতি অবলম্বনে বিরচিত গ্রন্থপঞ্জী ও বিবরণীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এত বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহা উদ্দাম কল্পনারও অগোচর রহিয়া যাইত যদি না আমরা এইরূপ গ্রন্থ-বিবরণী সমূহের উপর দৃষ্টিপাত করিবার সুযোগ লাভ করিতাম। অফ্রেক্ট্ প্রভৃতি প্রতীচ্যদেশীয় পণ্ডিতগণ যে অসামান্য নিষ্ঠা ও অলৌকিক পরিশ্রম ও সাধনার ফলস্বরূপ গ্রন্থবিবরণী প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্জন ও পরিবর্ধন গবেষণার বৃদ্ধির ফলে আবশ্যক হইয়াছে। সম্প্রতি মাদ্রাজ প্রদেশে অফ্রেক্ট্ প্রণীত গ্রন্থ বিবরণীর অভিনব সংস্করণ প্রণীত ও প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন মঠ, বিদ্যামন্দির ও পণ্ডিতগণের গৃহে যে পুস্তকাবলী সংগৃহীত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান ও বিবরণরচনাকার্য্য এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই ইহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় হইতেছে সুদূর ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের যে অমূল্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থসমূহ তত্রত্য গ্রন্থাগারে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার পরিচয় লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর দীর্ঘকালব্যাপী ও অকুণ্ঠ সাধনার ফলে। লণ্ডন মহানগরীতে India office এর গ্রন্থাগারে যে বিপুল সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থরাজি সঞ্চিত আছে এবং প্রতি বৎসর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের সন্নিবেশের ফলে যাহার পরিমাণ নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার বিস্ময়াবহ বিবরণ উক্ত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষগণের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাঁহার সুদীর্ঘকাল ইংলণ্ড প্রবাসের সময় ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক-সমূহের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য-সংবলিত যে পরিবর্ধিত ও পরিসংস্কৃত গ্রন্থ-বিবরণী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা একাধারে যেমন সংস্কৃত গ্রন্থ সমুদ্রের প্রতিবিম্বস্বরূপে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সাহায্য করিতেছে, তেমনই ডক্টর চৌধুরীর লোকোত্তর প্রাণপাতী সাধনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই গ্রন্থ বিবরণীর রচনায় প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন ডক্টর প্রাণনাথ। কিন্তু তাহার যে সংশোধন ও বিস্তার ডক্টর চৌধুরী কর্তৃক সাধিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব অবদান। এই সংশোধন কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও সমীক্ষার প্রয়োজন তাহা কল্পনা করা অনভিজ্ঞের পক্ষে দুঃসাধ্য। কারণ সমস্ত গ্রন্থের পুনঃ পরীক্ষা ও পূর্ব্ব পরীক্ষার প্রমাদ-সংশোধন যেমন অপেক্ষিত, তেমনই অভিনব গ্রন্থসমূহের বিবরণ প্রদান করিতে তাঁহাকে অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারিক ডক্টর র‍্যাণ্ডেল্ ডক্টর্ প্রাণনাথ ও ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এই মনীষিদ্বয়ের প্রণীত "Catalogue of the Library of the India office" গ্রন্থের দ্বিতীয় সম্পুটের সংস্কৃত-গ্রন্থ-বিবরণীর ভূমিকায় স্পষ্ট ভাষায় উক্ত পণ্ডিতের আপেক্ষিক কৃতিত্বের পরিচয় প্রসঙ্গে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বস্তুর সংগতি ও সমন্বয় ডক্টর্ চৌধুরীর নিজস্ব কৃতিত্ব। তা ছাড়াও ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত যে নূতন গ্রন্থসমূহ সমাহৃত হইয়াছিল তাহার বিবরণ ডক্টর্ চৌধুরীর একক প্রয়াসের ফল। ডক্টর র‍্যাণ্ডেলের উক্তি হইতেই প্রকাশ পায় যে এ গ্রন্থ ন্যূনকল্পে চারি হাজার পৃষ্ঠা অতিক্রম করিবে। বিষয়ানুক্রমে গ্রন্থসূচী সহ এ গ্রন্থ পাঁচ হাজার পৃষ্ঠা অতিক্রম করিবে, সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থের সংখ্যা নির্ধারণ করার উপায় নাই। কিন্তু ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে যে সহস্র সহস্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকাশিত গ্রন্থ আছে, এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডই তার অকাট্য প্রমাণ। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কেনাড়ী, মারাঠী, গুজরাটী, উড়িয়া, ফরাসী, জার্মান, ইতালীয় প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত পুস্তকের মূল্য নির্ধারণ তত্তদ্ভাষায় অশেষ জ্ঞানসাপেক্ষ। ইণ্ডিয়া অফিসে সহস্র সহস্র গ্রন্থের ১০০।১৫০ সংস্করণ আছে, প্রায়ই ইহা লক্ষিত হয়। এ সব সংস্করণের তুলনামূলক সমালোচনাও সম্পূর্ণ অসাধ্যসাধন, সন্দেহ নাই।

আমরা ডক্টর্ চৌধুরীর কৃতিত্বের যেদিকের পরিচয় দিলাম, তাহা তাঁহার সাধনার একান্ত বহিরঙ্গ-ভাগ। অন্তরঙ্গ অংশের বিষয় কিছু উল্লেখ না করিলে আমাদের পরিচয় নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই বিবরণীতে "A" হইতে "G" পর্য্যন্ত আদ্যাক্ষর বিশিষ্ট গ্রন্থসমূহের নাম, গ্রন্থকার, সম্পাদক, মুদ্রাযন্ত্র, পত্রাঙ্ক ও প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এক একটী গ্রন্থের যত সংস্করণ ও যত টীকাদি রচিত হইয়াছে ইহাতে তাহার বিবৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের পণ্ডিতগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান পর্য্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও তাহার ব্যাখ্যা, বিবৃতি, বিচার ও বস্তুর রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কোন পরিচয় সম্ভব হইত না যদি এইরূপ তথ্যগর্ভ বিবরণ প্রণীত না হইত। আর ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ গ্রন্থ সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে, তাহার পরিচয়ও এই গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এত বিভিন্ন সংস্করণ ও ব্যাখ্যা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের বুধমণ্ডলী দ্বারা রচিত হইয়াছে যে তাহার ইয়ত্তা নির্ধারণ নিরঙ্কুশ কল্পনারও অসাধ্য। কল্পনা হইতে বাস্তব আরও বিচিত্র, এই উক্তির সার্থকতা এই গ্রন্থের নানাস্থানে প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য ও বিপুলতার অনুরূপই হইতেছে ভারতবর্ষের সারস্বত সাধনা ও অবদান। ভারতবাসী নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ সচেতন নহে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সারস্বত সাধনার ক্রমবিবর্ত্তনের পরিচয় সম্পাদনে শিক্ষিত সমাজের ঔদাসীন্য অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভারতের আত্মার আনন্দময় ও বিজ্ঞানময় কোষের সহিত নিবিড় পরিচয় সংঘটিত না হইলে ভারতের আত্মোপলব্ধি হইবে না এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। ডকটর্ যতীন্দ্রবিমলের সাধনাদর্পণে ভারতবর্ষের বিদ্যাময় মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যে যদি ভারতের আনন্দময় ও বিজ্ঞানময় কোষের স্বরূপের এই প্রতিকৃতি অপ্রখ্যাত ও অজ্ঞাত রহিয়া যায় তাহাতে আত্ম-বিড়ম্বনা ও আত্মাবসাদনাই বাড়িয়া যাইবে। স্বদেশবাসীর দৃষ্টির অন্তরালে সুদূর প্রবাসে আত্মীয়স্বজনের স্নেহ ও প্রেরণার বিরহ খেদ তুচ্ছ করিয়া ভারতবর্ষের অমূল্য ও অক্ষয় সম্পদ্রাশির লুপ্তোদ্ধার করিয়া ডকটর্ যতীন্দ্রবিমল জগদ্ধাত্রীর সমক্ষে যে রত্নরাজির উপঢৌকন উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার যথাযোগ্য সমাদর করিবার দরদী ব্যক্তির অভাব হইলে দুঃখ ও খেদের স্থান থাকিবে না। আনন্দের বিষয় ও আশার স্থল এই যে ডকটর্ যতীন্দ্রবিমল প্রতীচ্য মনীষীদের সাধন-মন্ত্র সম্পূর্ণ অধিগত করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজির সংগ্রহ করিয়াই তুষ্ট হন নাই। তিনি এই সমস্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বহু গ্রন্থের আধুনিক-রীতি সম্মত সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সংস্কৃতানুরাগী নির্মৎসর মনীষি-বৃন্দের কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। ইহা ভারতীয় ও

বিদেশীয় বহুবিধ ভাষাজ্ঞান ও বতীন্দ্রবিমলের কঠোর অধ্যবসায়ের জলন্ত পরিচয়। তামিল, তেলেগু প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় অধিকার হেতু তিনি এ অপূর্ব গ্রন্থ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। আমরা এই সারস্বত সাধকের দীর্ঘ জীবন ও গৌরববহুল যশঃসমুজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে তিনটি বিষয়ের চিন্তা স্বতই চিত্তে উদিত হইতেছে। প্রথম ইংরেজ রাজপুরুষদের সহিত ভূতপূর্ব মুসলমান শাসকদের বৈলক্ষণ্য; দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে—ইংরেজের সহিত ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত যোগসূত্র; তৃতীয় সংস্কৃত সাহিত্য ও বিদ্যার পাশ্চাত্য দেশে প্রচারের হেতুর বৈচিত্র্য। বৌদ্ধপণ্ডিত তারানাথ তিব্বতী ভাষায় তদানীন্তন ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক বাংলা ও বিহার আক্রমণের বিবরণে বৌদ্ধ বিহারসমূহের ধ্বংস এবং বহুকালসঞ্চিত গ্রন্থরাজির বিনাশ সাধনের উল্লেখ করা হইয়াছে। তারানাথের গ্রন্থ জার্মাণ ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। বিক্রমশিলা ও নালন্দার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ ও বিদ্যায়তনের ও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থসমূহের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার অরুন্তুদ ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া সহৃদয়মাত্রই ব্যথিত হইয়া থাকেন। কথঞ্চিৎ আশ্বাসের বিষয় যে ইহার কিয়দংশ নেপালে ও তিব্বতে অনুবাদের মধ্যে এখনও জীবিত আছে। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে সংস্কৃতসাহিত্যসেবিগণের সমাদর করিতে মোগল সম্রাটগণ ও তদনুবর্ত্তী অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু তাহা মনে হয় মরুভূমির মধ্যে উর্বর ভূমিখণ্ডের ন্যায় স্বল্প প্রসারী। পক্ষান্তরে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হইতেই দুই একজন ইংরেজ মনীষীর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টি পতিত হইল এবং ফলে সংস্কৃত আলোচনার শ্রীবৃদ্ধি হইল। দুঃখের বিষয় ইহাতে বাধা দিয়াছিলেন আমাদের স্বদেশবাসী। সে বাধা তৎকালে ফলপ্রসূ না হইলেও ভাবী ভারতবর্ষীয়গণের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বৈমনস্য ও অশ্রদ্ধার বীজ তৎকালেই উপ্ত হইয়াছিল। আজ সংস্কৃতানুরাগীদের স্থান অতি হেয় এবং সংস্কৃতাধ্যাপকমণ্ডলী শীর্ণকলেবর ও ক্ষীণপ্রাণ—ইহার পরিণাম ব্যতীত কিছু নয়। সংস্কৃত ভাষা য়ুরোপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রায় প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ হইতে বহু সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া স্বদেশের গ্রন্থাগার সমূহে সযত্নে ও সাদরে রক্ষা করিতেছেন। সে দেশের শাসক সম্প্রদায় সংস্কৃত গ্রন্থের রক্ষণ, সংস্কৃত ভাষা ও বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। তাই মনে হয় যদি কোনদিন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হয়, তথাপি ইংলণ্ডের সহিত ও অন্যান্য য়ুরোপীয় দেশের সহিত তাহার সংস্কৃতিমূলক সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন হইবে না। কারণ তাহার নিজের চিরন্তন জ্ঞানের ভাণ্ডার ঐ সমস্ত দেশেই সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। যদিও আজ ভারতবাসী দারিদ্র্যের পেষণে অর্থসম্পত্তিকেই জীবনের একমাত্র সাধনার বিষয় মনে করিতেছে এবং অর্থ ও কামই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছে এবং ধর্ম ও মোক্ষের চিন্তা বাতুলতা ও ব্যর্থতার প্রতীক বলিয়া মনে করিতেছে; তথাপি মনে হয় ভারতবর্ষের নববিধান রচনার সময় প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তাহার দৃষ্টি প্রসারিত হইবে। দারিদ্র্য বিদূরিত হইলে এবং অন্নময় ও প্রাণময় কোষের দাবী পূরণ করা হইলে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের দাবী উপস্থিত হইবে এবং তাহার সমাধানের আয়োজন করিতেই হইবে। এখন এ স্বপ্নের কথা থাক্। ভারতবর্ষের লুপ্ত সম্পদের উদ্ধার আবশ্যক হইলে একদিন ভারতবাসীকে সমুদ্র পারে অবস্থিত এই বিদ্যায়তন ও গ্রন্থাগারসমূহে সযত্ন রক্ষিত রত্নসমূহের সন্ধানে যাইতে হইবে। তাই মনে হয় দূরদর্শী ইংরেজগণ নিছক জ্ঞান পিপাসার প্রেরণায় ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রাচীন রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া ভারতবাসীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য এ সম্বন্ধ সংস্কৃতিমূলকই হইবে বলিয়া অনাবিল প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনে দৃঢ়ীকৃত হইবে। সংস্কৃত ভাষার য়ুরোপে প্রচারের সহিত ভারতবর্ষে ইংরাজী ভাষার প্রচারের কোন সাজাত্য নাই। ভারতবাসীরা ইংরাজী ভাষার অনুশীলন করে—তাহার মুখ্য ও মৌলিক কারণ ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজা এবং ইংরাজী ভারতবাসীর রাজার ভাষা। রাজনৈতিক বন্ধনসূত্র ছিন্ন হইলে ইংরাজী ভাষার প্রচার এত ব্যাপক ও দূরপ্রসারী থাকিবে কিনা তাহা চিন্তার বিষয়। যাহাই হউক না—সংস্কৃত ভাষার প্রচার যে যুগেই ও যে দেশেই হইয়াছে তাহার মূলে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কোন সময়েই ছিল না ও আজও নাই। ইহার মূলে আছে কেবল জিজ্ঞাসার প্রেরণা। যাঁহারা জ্ঞানব্রতী এবং জ্ঞানযজ্ঞের ঋত্বিক্ তাঁহারাই সংস্কৃতের আদর করিবেন ও করিতেছেন। ভারতবাসী আজ জ্ঞানসাধনায় বিমুখ। নিষ্কাম বিদ্যানুশীলন আজ স্বপ্ন ও উপহাসের বিষয় হইয়াছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই আজ একমাত্র কাম্য এবং যে বিদ্যার অনুশীলনে আর্থিক অভ্যুদয়ের আশা নাই তাহা আজ ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাতই রহিয়াছে। পুনরুক্তি হইলেও বলিব—অর্থ ও কামই আজ দরিদ্র নিরন্ন নির্বীর্য ভারতবাসীর নিকট একমাত্র পুরুষার্থ। যদি সুদিন আসে এবং ধন-সর্বস্বতা বুদ্ধির মোহমদিরা বিদূরিত হয় তবে আবার সংস্কৃত আলোচনার সময় আসিবে এবং জগতের সহিত ভারতের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। তখন এই সম্পদের পরিপালক ইংরেজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতি ভারতবাসীর ধন্যবাদ ও প্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে।

স্মৃতি

শ্রীসুভদ্রা রায় বি-এ

সমুখের পানে দীপ্ত আলোক
হে অতীত, তুমি ধরেছ তুলি
সুদূরের বুকে কোন্ সে পাপিয়া
গাহিয়া উঠিল জগত ভুলি
অতীতের স্মৃতি মর্মের মাঝে
তবু উল্লাসে উঠিছে হায়!
নিশীথ পথের ধূলায় মলিন
ঝরে পড়া ঐ ফুলের প্রায়

বন্ধন মারা মমতার ভরা
উথলি উঠিছে দুকূল ব্যাপী
সে যে উজ্জল ভিতরে বাহিরে
সে স্মৃতিরে বল কেমনে চাপি?
সে স্মৃতি আমার শয়নে স্বপনে
শত শতাব্দী নয়ন মাঝে,
ধূপের মতন পুড়ে পুড়ে হায়
গন্ধ বিলায় সকল কাজে!

১লা এপ্রিল

শ্রীকানাই বসু

আড্ডা আজ আর জমিবে না। একে চৈত্র মাসের নিদারুণ গরম, তাহার উপর আড্ডাধারী অবিনাশের যে রকম মেজাজ দেখা গেল, তাহাতে আজ যে আড্ডা জমিবার আর আশা নাই তাহা সকলেই বুঝিলাম। সিধু আমাদের দিকে চাহিয়া ঠোঁট মচ্‌কাইল। পুলিন ডাক্তার ও আমি হাত উলটাইয়া ও ঘাড় নাড়িয়া তাহা সমর্থন করিলাম। এ সকলই ঘটিল অবিনাশের অগোচরে। সে তখনও তাহার ছেলে সুবোধকে বকিয়া চলিয়াছে।

সুবোধ অবশ্য ঘরে নাই। হয়তো বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যেও সে নাই। কিন্তু তাহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। ঘরের মেজেতে একপাটি বিবর্ণ ও বিকৃত নাগরা জুতা পড়িয়া আছে।

বছর দশ এগারোর ছেলে সুবোধ। কিন্তু অবিনাশ বলে শয়তানের বয়সও নাই, জাতিও নাই। নানাবিধ কীর্ত্তিকলাপের দ্বারা অবিনাশের কাছে তাহার ছেলের শয়তানত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার নবতম শয়তানীর কাহিনী শুনিলাম।

গতকাল রাত্রে অবিনাশের এক নব-বিবাহিতা ভাইঝি ও তাহার স্বামী এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসে। আজ সকালে জামাই আহারাদির পর অফিসে যাইবার সময়ে তাহার জরিদার নাগরার একপাটি পায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জুতা যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন আর তাহার পদস্থ হইবার অবস্থা নাই। ভেলভেটের নাগরা সারা সকাল চৌবাচ্ছায় অবগাহন করিয়া যতই কোমল ও শীতল হোক, জামাতা বাবাজী তাহাকে পদচ্যুত করিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া খুড়শ্বশুর মহাশয়ের তালি দেওয়া ক্যাম্বিসের জুতা, এক সাইজ বড় হওয়া সত্ত্বেও, পরিয়া অফিসে গিয়াছে। অফিসের ফেরৎ আবার এ বাড়ীতে আসার কথা ছিল, কিন্তু জামাতা আসে নাই। সুবোধের মা বলিতেছেন, জামাই নিশ্চয় রাগ করিয়াছে। সুবোধের মা আরও বলিয়াছেন, এক জোড়া ভালো জুতা কিনিয়া জামাইকে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

অফিস হইতে ফিরিয়া অবিনাশ সুবোধের দুষ্কৃতির কাহিনী শুনিয়াছে। শুনিয়া চটিয়াছে, কিন্তু ক্ষেপিয়াছে সুবোধের মায়ের অবোধ আচরণে। ছেলের নিন্দা তিনি অবশ্য যথেষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু সিল্কের পাঞ্জাবি, জরিপাড় চাদর ও তালিমারা ঢিলা ক্যাম্বিশ জুতার সজ্জায় সজ্জিত জামাতার কথা বলিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতেই অবিনাশ ক্ষেপিয়াছে। সুবোধ তাহার রসবোধ পাইয়াছে তাহার মায়ের কাছ হইতে তাহা আমরা জানিতাম। অবিনাশের চরিত্রেও দোষের লেশমাত্র নাই।

সকল রকম পরিহাস, উপহাস ও রস-রসিকতার উপর সে খড়্গ-হস্ত। এ সম্বন্ধে তাহার একটি নিজস্ব মৌলিক মতবাদ বা pet theory আছে। সে বলে পরিহাস বিনামূল্যে হয় না। পরিহাস করিতে গেলে তাহার দাম দিতে হইবেই। যে পরিহাস করে, যাহাকে পরিহাস করা হয় এবং যাহারা সেই পরিহাস উপ:ভাগ করিয়া আনন্দ পায়, ইহাদের কাহারও না কাহারও উপর দিয়া দাম আদায় হইবেই।

এতক্ষণ অবিনাশের কথাই বলা হইল। কিন্তু অবিনাশই সব নহে। আড্ডার রসদ—চা, পান, সিগারেট ও এটা ওটা ভাজা ভুজি—সে-ই জোগাইলেও, এক তাহাকে লইয়াই কিছু আড্ডা নহে। আমরাও আছি। পরিহাসের কথায় পুলিন ডাক্তারের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল কাল ১লা এপ্রিল। ১লা এপ্রিল বৎসরে একবারের বেশী আসে না, অতএব উহার সদ্ব্যবহার করা চাই। সদ্ব্যবহারের পাত্র সম্বন্ধেও পুলিনের কিছু ভাবিবার দরকার করিল না।

পুলিস কোর্টের মুটু উকীল নূতন গাড়ী করিয়াছে এবং কথা কহিতে গেলেই আত্ম-মর্য্যাদায় অত্যধিক ঝোঁক দিয়া ফেলে। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন কোর্টের মধ্যেই তাহাকে কি বলিয়াছেন এবং পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর যে তাহাকে পার্টনার না পাইলে ব্রিজের টেবিলে বসিতে চাহেন না, এসকল খবর যে কোনও কথার ভিতর সে আপনাকে শুনাইয়া দিবেই। সুতরাং পুলিন ডাক্তারের মতে মুটু উকীলকে না ঠকাইলে ১লা এপ্রিলের কোনও অর্থই হয় না। সিধুর ও আমার আপত্তি নাই।

কিন্তু অবিনাশের আছে। তাহার আপত্তি মুটুর প্রতি স্নেহ-প্রসূত নহে। পরিহাস মাত্রেই তাহার আপত্তি। তাহার উপর আবার জামাইকে জুতা কিনিয়া দিতে হইতেছে। সে তাহার উদ্ভট থিওরি, পরিহাসের দামের কথা পাড়িল।

অবিনাশের বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা শুনিলে মরা মানুষের রাগ হয়, তা পুলিন ডাক্তার তো জীবন্ত লোক। ডাক্তার জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পুলিন যতই রাগে চঞ্চল হয়, অবিনাশ ততই ধীরভাবে পরম নির্লিপ্ত উদাসীন সুরে চিবাইয়া চিবাইয়া তাহার cynicismএর বাণী আওড়াইতে থাকে। ফল এই হইল যে, যদিই বা এমনিতে মুটু উকীলের ১লা এপ্রিল কৃত্য সম্পন্ন করা নাও হইত, অবিনাশের বিজ্ঞতার চাবুকে পুলিনের দুষ্টবুদ্ধির অশ্ব চার পা তুলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল ছুটিবার জন্য। অনেক মতলব ভাঁজা হইল এবং অনেক মতলব বাতিল হইল। অবশেষে বহু গবেষণার পর যে মতলব খাড়া হইল সেটা যে মুটু উকীলের অমোঘ মৃত্যুবাণ হইবে, তাহা ভাবিয়া আমাদের মন অতি নিঃস্বার্থ বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল। সব দিক দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল শিকারের পলাইবার ফাঁক কোথাও নাই এবং শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে যে জালের পাকে পাকে নিজেকে জড়াইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিল না।

আমরা বন্ধুবর মুটুর সেই চরম মুহূর্ত্তের ছবি মানস নেত্রে দেখিয়া অতি উৎসাহের সহিত এই মতলবকে কার্য্যকরী করিবার উপায় উদ্ভাবনে মন নিবিষ্ট করিলাম।

দেখা গেল এই মতলব মতো কাজ সুরু করিতে গেলে কেবল একটি যন্ত্র আমাদের জোগাড় করিতে হইবে। সেই যন্ত্র একজন সদাশয় সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক। এই মনুষ্যযন্ত্রের সাহায্যেই আমরা প্রথমে মুটু উকীলের সন্দেহের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিব। তারপর সেই ভদ্রলোকের ছুটি এবং আমাদের কার্য্যারম্ভ।

"সৌম্যমূর্ত্তি" কথাটা বোধহয় পুলিনই বলে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ও সিধুর মুখ দিয়া সমস্বরে বাহির হইল—"ঠিক আমাদের মাষ্টার ম'শায়ের মতো।"

এই কথা বলার পরক্ষণেই এক নাটকীয় যোগাযোগ ঘটিল। মাষ্টার মহাশয়ের আবক্ষ শাদা দাড়ী ও স্বাভাবিক প্রশান্তি-ভরা মুখখানি পথের উপর দেখা গেল। পুলিন আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ঐ যে মাষ্টার মশাই। বাঃ বাঃ! এ নিশ্চয় শ্রীভগবানের একান্ত ইচ্ছে যে মুটুর ঘাড়টা কাল আমাদের দিয়েই মটকাবেন। সবই তাঁর কৃপা!"

ইচ্ছা করিলে ও সুযোগ বুঝিলে পুলিন ডাক্তার ভগবদ্‌ভক্ত হইয়া উঠে। তাহার কথিত ভগবান সত্যই মুটুর বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়াছেন মনে হইল। কারণ মাষ্টার মহাশয় কেবল মাত্র জানালার বাহিরে দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। পরমুহূর্ত্তেই ঘরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

দেখিয়া পুলিনের ভক্তির সীমা রহিল না। গদগদ কণ্ঠে বলিল—"মাষ্টার মশাই, আপনি ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তি।"

মাষ্টার মহাশয় হাসিমুখে বলিলেন—"নিশ্চয়, তাতে আর সন্দেহ আছে? ঈশ্বর না প্রেরণ করলে আর এলুম কি করে? শুধু ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিই নই, ঈশ্বর-আনিত ব্যক্তিও বটে। কারণ ঈশ্বরের অজানা আর কি আছে বল?"

ঈশ্বরতত্ত্ব শুনিতে সিধুর ভাল লাগে না। সে কহিল—"যাক্‌গে, ঈশ্বরের কথা থাক্ মাষ্টার মশাই, আমাদের কথাটা আপনাকে বলি। অবিনাশ, মাষ্টার ম'শায়ের চা-টা আনতে বলে দাও হে।"

অবিনাশ চা ইত্যাদি সরবরাহ করিতে কখনই কাতর নয়। কিন্তু সিধুর কর্ত্তৃত্ব তাহার সহ্য হয় না। সে রাগ করিয়া বলিল "কেন, তুমি বলতে পার না? ইয়ার্কি মারবেন ওঁরা, আর হুকুম করবেন আমার ওপর। আমি পারব না যাও। পার তো নিজে বলগে।"

সিধুর সব বাড়ীতেই অবারিত দ্বার। তাহার কারণ দ্বার বারিত হইলেও সে তাহা মানে না। সে উঠিয়া গিয়া অবিনাশের স্ত্রীকে জানাইয়া আসিল মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন। ঐ জানানোটাই শুধু প্রয়োজন।

মাষ্টার মহাশয় ছেলে বুড়া সকলেরই মাষ্টার মহাশয়। কয়েক বৎসর হইল এই পাড়ায় বসতি করিয়াছেন। সবারই সুখ ও দুঃখে তাঁহার ভাগ আছে। আলো ও হাওয়ার মত তিনি সহজ ও সুপ্রাপ্য এবং সকলেরই নিজস্ব।

লাঠিটি দেয়ালের কোণে রাখিয়া, জুতা খুলিয়া, মাষ্টার মহাশয় তক্তাপোষের উপর বসিয়া বলিলেন—"তারপর? ঈশ্বর আজ এই মুহূর্ত্তে তাঁর এ দূতকে তোমাদের কাছে কেন প্রেরণ করলেন শুনি?"

পুলিন বলিল—"আপনাকে একটি কাজ করতে হবে মাষ্টার ম'শাই, বুঝেছেন?"

মাষ্টার মহাশয় কহিলেন—"এ বোঝা তো খুব শক্ত নয় বাবা, কিন্তু কাজ করতে হবে বলছ, তাইতো! ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ—সিধু রাগ করো না বাবা, ঈশ্বরের কথা বলছি না, আমার কথা বলছি—ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করেছেন বটে কিন্তু কাজের লোক করে প্রেরণ করেননি।"

পুলিন বলিল—"না না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার আমরাই করব, আপনি শুধু বসে বসে, বুঝেছেন—"

মাষ্টার মহাশয় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া কহিলেন "বুঝেছি তাহলে আমি খুব পারব। যে কাজে আমাকে কিছু করতে হবে না, সে কাজ যত শক্তই হোক, আমি খুব পারব। আর বসে বসে? সে তুমি দেখে নিও, বসে বসে হাত-পা না নেড়ে করবার যত কাজ আছে সব তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আমার নামে লিখে রাখো।"

অতঃপর মাষ্টার মহাশয়ের সকাশে ষড়যন্ত্র পেশ করা হইল। তিনি তাঁহার সহজ হাসিমাখা মুখে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া শুনিতে লাগিলেন। আর এক ব্যক্তি নীরবে শুনিল, সে অবিনাশ। আমরা মাষ্টার মহাশয়ের মাথা নাড়ায় ও হাসি মুখের সমর্থন পাইয়া উৎসাহিত হইতেছি দেখিয়াও অবিনাশ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিল।

মাষ্টার মহাশয়ের চুল শাদা হইয়াছে, দাড়ি শাদা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চোখ এখনও কালো আছে, তাহাতে যোলারঙের আমেজ লাগে নাই। দলের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াও অবিনাশ যে এত গম্ভীর ও নীরব রহিয়াছে ইহা তাঁহার চোখ এড়াইল না। তিনি অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বল?"

প্রগাঢ় বৈরাগ্য ও অবহেলাভরে অবিনাশ উত্তর দিল—"আমার বলা বলিতে কি আসে যায় বলুন? আমি আবার একটা লোক, আমার আবার কথা, "হঃ?" বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া দেয়ালে লম্বিত ক্যালেণ্ডার পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

একচল্লিশ বৎসর বয়সের অবিনাশের অভিমান হইয়াছে, তাহা মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন—"তবু?"

অবিনাশ মুখ ফিরাইল না। সে ক্যালেণ্ডার পড়িতে পড়িতে বলিল—"না, আমি কিছু বলব না।" এবং মাষ্টার মহাশয় দ্বিতীয় অনুরোধ করিবার আগেই কণ্ঠ উচ্চতর করিয়া বলিল—"না, মাষ্টার মশাই, আপনি আমাকে মাপ করবেন, আমি এতে একটি কথাও কইতে চাই না।" সে আরও একটু ঘুরিয়া বসিয়া ক্যালেণ্ডারের তারিখগুলি বোধহয় ঠিক দিতে লাগিল।

সিধু বলিল—"আঃ, ওর কথা ছেড়ে দিন, মাষ্টার মশাই। ও আবার কি বলবে?"

অবিনাশ ক্যালেণ্ডার ছাড়িয়া ঘুরিয়া সোজা হইয়া বসিল ও প্রবল কণ্ঠে বলিল—"কেন বলব না? আলবৎ বলব। তাহলে বলি শুনুন মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টার মহাশয় খুসী হইলেন যে অবিনাশ কিছু বলিবে। বলিলেন—"বল বাবা।"

সিধু তক্তাপোষের উপর চড় মারিয়া বলিল—"আহা হা, ওর কথা শুনতে হবে না আপনাকে, আমি বলি শুনুন—"

মাষ্টার মহাশয় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি ফিরাইয়া সিধুর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ, বল।" তারপর পুলিন এবং আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"তোমরাও বল বাবা, আমি শুনছি।"

এই জন্যই মাষ্টার মহাশয় সর্ব্বজনপ্রিয়। সকলের কথাই তিনি শুনিতে প্রস্তুত ও শুনিয়াও থাকেন। সবাই যদি একই সঙ্গে শুনাইতে চাহে, তাহাতেও তিনি আপত্তি করেন না। যদিচ সকলের কথা একই সঙ্গে শুনিতে গেলে কাহারও কথাই শোনা যায় না, তথাপি যাহারা না শুনাইয়া ছাড়িবে না তাহারা তো খুশী হয়।

সুতরাং অবিনাশ সুরু করিল তাহার পরিহাসাস্তিক মতবাদ এবং আমরা যুগপৎ মাষ্টার মহাশয়কে উপলক্ষ ও অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া প্রবল তর্ক করিলাম। এই গোলযোগের মধ্যে বসিয়া মাষ্টার মহাশয় তাঁহার মৃদুহাসি ও গম্ভীর মনোযোগ সহকারে ক্রমান্বয়ে সামনে, পিছনে, এ-পাশে, ও-পাশে চাহিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয় বলিয়াই আমাদের কলরব কিছু পরে থামিয়া আসিল। তখন মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"অবিনাশ রাগ করো না, তোমারই ভুল। তোমার কথা মানতে গেলে তো লোকের ঠাট্টা তামাসা করা ছেড়ে দিতে হয়। তা হলে সংসারে বাঁচা দায় হবে যে বাবা।"

আমরা জিতিলাম। জয়লাভের আনন্দে সিধু অবিনাশের ম্রিয়মান মুখের দিকে চাহিয়া তক্তাপোষে চড় মারিয়া বলিল—"হ্যায়।"

মাষ্টার মহাশয় তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আর সিধু, তোমরা অবিনাশের কথাটি মেনে না নিয়ে ভুল করছ। ওর কথাটি বড় খাঁটি কথা।"

সিধু তক্তায় আর একটি চড় মারিবার জন্য হাত তুলিয়াছিল। হাত উত্তোলিতই রহিল, মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"চাটি মেরে তর্ক করে উড়িয়ে দেবার কথা ওটি নয়। দাম না দিয়ে কস্মিনকালে কিছুই পাওয়া যায় না, ইহজগতেই বল, আর পরজগতেই বল"।

অবিনাশের মুখ উজ্জ্বল হইল। সিধু এক পলক সেই দিকে চাহিয়া বলিল—'তাহলে কি আপনার যুক্তি হচ্ছে যে—"

অবিনাশের চাকর চা লইয়া আসিল। হাত বাড়াইয়া চায়ের বাটী লইয়া মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"পাগল না কি? আমার আবার যুক্তি কিসের? সে ভয় কোরো না, যুক্তিটুক্তি আমার নেই বাবা! তবে একটা গল্প মনে পড়ল, যদি শোনো তো বলি।"

পুলিন ডাক্তার গল্পের পোকা। তাকিয়া ঠেস দিতে দিতে কখন সে শুইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, "আলবাৎ। যদি শোনো আমার কি?" ভালো করিয়া গল্প শুনিবার আগ্রহে সে তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল।

ভালো করিয়া গল্প উপভোগ করিবার জন্য অবিনাশ তাকিয়াটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল—"বলুন।"

আড্ডা জমাইবার পক্ষে মাষ্টার মহাশয়ের গল্পের মতো দাওয়াই আর নাই। আমি অবহিত হইয়া বসিলাম। সিধুও মাষ্টার মহাশয়ের গল্পের কম ভক্ত নয়। কিন্তু তর্কের জের টানিয়া বলিল—"গল্পই বলুন আর যাই বলুন, অবিনাশের কথা তা বলে আমি মানতে পারব না, মরে গেলেও—"

গল্প শুনিতে বসিয়া কোনও বিলম্ব কোনও বাধা পুলিন ডাক্তার সহ্য করিতেপারে না। সে চীৎকার করিয়া বলিল—"মরগে না বাইরে গিয়ে। এখানে যদি ফের বক্ বক্ করবি তো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দোবো, হ্যাঁ।"

চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়া মাষ্টার মহাশয় গল্প সুরু করিলেন।

"গল্প বলছি বটে, কিন্তু বানিয়ে বলছি না। আমার নিজেরই কথা। বল্লে তোমরা হয় তো বিশ্বাস করবে না। কিন্তু একদিন আমার এমন দিন ছিল যখন এই যে এতবড় শাদা দাড়ী, এই আমার সাইনবোর্ডটি, এটি ছিল না। এমন কি তখন দাড়ীই ছিল না। মনে করছ অহঙ্কার করছি, কিন্তু সত্যি। সেইকালের কথা।

বছর পাঁচেক হল চাকরিতে ঢুকেছি, একটা মস্ত বড় "এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড-এ।"

সিধু বলিল—"পাঁচ বছর চাকরি করেন, অথচ দাড়ী নেই?"

মাষ্টার মহাশয় জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবিনাশ তাড়াতাড়ি তাকিয়াতে বাঁ হাতের কনুয়ের ভর দিয়া উঁচু হইয়া ডান হাত তুলিয়া বলিল—"আপনি থামুন মাষ্টার মশাই, আমি ওর জবাব দিচ্ছি।" পরে সিধুকে বলিল—"দাড়ী না থাকলে চাকরি করা যায়না? তোমাদের বাড়ীর ঝিয়ের দাড়ী আছে কি? ষ্টুপিড্!" সে তাকিয়ার উপর দেহভার ঢালিয়া দিল।

সিধু বলিল—"বুদ্ধির ঢেঁকি! যা বোঝো না, তাতে কথা কইতে যাও কেন? বলছি, পাঁচ বছর চাকরি হল, তখনও দাড়ী হয়নি? এত ছোট বয়েসে চাকরিতে ঢুকেছিলেন?"

এবার মাষ্টার মহাশয় জবাব দিলেন—"হয়নি তো বলিনি বাবা, ছিলনা বলিছি। কামাতুম কিনা তখন।"

অবিনাশ বলিল—"হল? বুদ্ধিমান?"

পুলিন আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিল না, বলিল—"অবিনাশ, সিধে, আর একটি কথা যদি কয়েছ, দু'জনের মাথায় ঠোকাঠুকি করে মাথা ফাটিয়ে তবে ছাড়ব, মনে থাকে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"যাক্, যা বলছিলুম। মার্চেন্ট অফিসে কাজ করি, অথচ এমনি অদৃষ্ট যে সবার সঙ্গেই ভাব, সবাই স্নেহ করে। সেদিন অফিসে গিয়ে বসে সবে দুর্গানামটি শেষ করেছি, বেয়ারা একটা সার্কুলার নিয়ে এল কি? না, একজন পুরোণ পার্টনার, অনেক দিন হল রিটায়ার করে দেশে বাস করছিলেন, তিনি দেহরক্ষা করেছেন। তাই তাঁর স্মৃতির সম্মানে অফিস এগারোটার সময় বন্ধ হবে। মনটা কিরকম খুশী হল তা বুঝতেই পারছ। ভদ্দরলোক নিজের প্রাণ দিয়েও যে আমাদের উপকার করে গেলেন, তার জন্তে তাঁকে প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ না করে পারলুম না। চেয়ে দেখি আশে পাশের সকলেরই হাসিমুখ। সুরেশ্বর নামে একটি ছোকরা আমার পাশেই বসতো। অল্পেতেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। বল্লুম—"সুরেশ্বর, একটা লিষ্ট করতে পার, আর কতগুলি পুরোনো পার্টনার এখনো জীয়নো আছে? তা হলে বোঝা যায় হরির ইচ্ছেয় কটা বাড়তি ছুটি পাওনা আছে।"

সুরেশ্বর অত্যন্ত হাসতে লাগ্‌ল। বল্লে, আর ভাই, আগে এই ছুটিটাই ভোগ কর, তারপর ভবিষ্যতের কথা ভেবো। বলে—আরও হাসতে লাগিল।

পার্টনার জীইয়ে রাখা কথাটা, মিছে কথা বলব না, একটু রসিকতা করেই বলেছিলুম। কিন্তু সুরেশ্বর এত বেশী হাসবে তা আশা করিনি। রসিকতা সফল হলে মন যে অতিশয় খুশী হয়, তা বলা বাহুল্য। বল্লুম—আরে এ ছুটি তো মিলেই গেছে। এ আর ভোগ করা-করি কি? ক'ঘণ্টারই বা ছুটি, খালি ছুটোছুটিই সার। ভবিষ্যতের ভাবনাটাও তো ভাবতে হবে।"

—"যা বলেছ দাদা, ছুটি তো নয়, খালি ছুটোছুটিই সার।" সুরেশ্বরের হাসি উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ল। তখন তো বুঝিনি কত বড় সত্যি কথা বলেছি। ছুটোছুটির রসিকতাও সফল হল দেখে আরও আনন্দিত হলুম।

ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু মুখখানিকে অতি প্রশান্ত ও গম্ভীর করে আমার টেবিলের ধারে এগিয়ে এলেন। টেবিলের ওপর থেকে আমার পালকটি, মানে আমার পায়রার পালকটি তুলে নিয়ে বল্লেন—"কি হে সুরেশ্বর, এত হাসির ঘটা কেন? কাজ-কর্ম কিছু নেই বুঝি হাতে? মাষ্টারও যে—আ-া-াঃ।" পালক তখন তাঁর কানের ভেতর দিয়ে মরমে পশিয়ে চোখ দু'টি বুজিয়ে দিয়েছে।

বড়বাবু হলেও লোকটি ভদ্রলোক ছিলেন। অবাধে কথাবার্ত্তা কইতুম আমরা। বল্লুম—"আজ আর কাজ-কর্মের কথা কেন বড়বাবু? এই তো সাড়ে দশটা বাজে, এগারোটায় পিটুটান। আমি তো বাবা আজ খাতা-পত্তর খুলছি না।"

বড়বাবু ঈষৎ হেসে বল্লেন—"না খুলতে পারলেই ভালো।"

যেমন বাঁধা মাইনের চেয়ে উপরি টাকাটা-সিকেটা বেশি প্রীতিকর, তেমনি ক্যালেণ্ডারের বাঁধা ছুটির চেয়ে উপরি ছুটিতে আহ্লাদ বেশি হয় তা বোধ হয় জানো? এরকম একটা উপরি ছুটি বাড়ীতে পড়ে পড়ে গড়িয়ে নষ্ট করতে ইচ্ছে হলনা। ঠিক করলুম মাছ ধরতে যাব, আমার এক জানা পুকুর আছে, সেইখানে। সুরেশ্বর বল্লে, সেও যাবে। দুজনে বসে বসে মাছ ধরার প্ল্যান করতে লেগে গেলুম। সুরেশ্বর কারণে অকারণে কথায় কথায় হাসতে লাগল।

পৌনে এগারোটায় কলম-টলম তুলে রেডি। এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিটে উঠে পড়লুম। কে একজন বল্লে "এখনো পাঁচ মিনিট আছে যে হে।"

"থাকুক, ওটা তোমাকে দান করলুম," বলে বড়বাবুর কাছে গিয়ে উপদেশ দিলুম "আর কেন সার, দোকান-পাট তুলুন না।" বড়বাবু বল্লেন—"এই যে ভাই, হয়ে গেছে। তোমরা এগোও।"

এগোলুম। পেছনে আসতে আসতে সুরেশ্বর কি যেন বল্লে। সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। বুঝলুম হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ছুটিটা পেয়ে শুধু সুরেশ্বরের নয়, সকলেরই হাসি রোগ ধরেছে।

এগারোটা বাজতে এক মিনিটে ট্রাম এলো। উঠে বসলুম। এগারোটা বাজতে পৌনে এক মিনিটে ট্রাম ছাড়লো ও সুরেশ্বর উঠল। আমার পাশে বসে সুরেশ্বর কথা কইলে। আমি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইলুম। এগারোটায় সুরেশ্বর আর আমি ট্রাম থেকে নামলুম। এগারোটা বেজে তিন মিনিটে আমি কাঁদ কাঁদ মুখে, আর সুরেশ্বর হাসি-মুখে অফিসে ফিরে এসে নিজ নিজ চেয়ারে বসলুম। সুরেশ্বরের হাসিতে সকলে যোগ দিল। আমি ঘাড় হেঁট করে টেবিলের ওপর চেয়ে রইলুম। টেবিলের ওপর আবার সেই সার্কুলার। এবারে তারিখটার নীচে লাল-কালির দাগ টানা। তারিখটা ১লা এপ্রিল।

বড়বাবু ডেকে বল্লেন—"কি হে মাষ্টার, চার শুকিয়ে গেল নাকি? কি মাছ ধরলে? রাঘব বোয়াল? বড়বাবুর গাম্ভীর্য্যের মুখোস একনিমেষে খসল। তাঁর প্রবল হাসির সঙ্গে তখন আমার হাসিও মিল্‌ল।"

বাস্তবিকই তারিফ করতে হয়। শুনলুম বুদ্ধিটা বড়বাবুরই, হাতের কাজটা হরেশ্বরের। সার্কুলারের তলায় বড়সাহেবের সইটি যা করেছিল, সে দেখলে বড়সাহেবেরও হিংসে হতো। ভারি আনন্দ হল। প্রচুর হাসতে হাসতে ও অতি দুঃখের সঙ্গে খাতাপত্তর খুললুম। এই গেল প্রথম পর্ব।

বেলা যখন সাড়ে বারোটা, তখন ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা এসে জানালে আমাকে কে টেলিফোনে ডাকছে। বললুম "যা যা, নিতাই-বাবুকে বলগে যা ওতে চলবে না, আরও কিছু বুদ্ধি থাকে তো বার করতে বল্।"

ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের নিতাই একটি কাজিল ছোকরা। খানিকক্ষণ আগেই ঐ রকম টেলিফোনের ডাক পাঠিয়েছিল এক বাবুর জন্তে। সে বেচারা টেলিফোনের কথা আর শোনেনি, গিয়ে খালি নিতাইয়ের হাসি শুনে ফিরে এসেছে।

বেয়ারা আবার এলো। বল্লে ক্যাশিয়ারবাবু ডাকছেন। ক্যাশিয়ার-বাবু প্রবীণ লোক, আমার ঠাট্টার যুগ্যি নন, মানে আমি তাঁর ঠাট্টার যুগ্যি নই। গেলুম। ক্যাশিয়ারবাবু বল্লেন—"না হে, মিথ্যে নয়, সত্যি কল্। লালবাজার পুলিশ অফিস থেকে তোমার নাম করে খুঁজছে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা জরুরী।" বলে টেলিফোনের রিসিভারটা হাতে তুলে দিলেন।

জরুরী নয়, ভীষণ খবর। একটা বেয়াড়া মোটা গলায় কটকটে ইংরিজিতে রিসিভারটা কথা কইলে। নাম বল্লে—সার্জেণ্ট এণ্ডারসন্, লালবাজার এমার্জেন্সি অফিস। খবর বল্লে—'একটি বাঙ্গালী যুবক ঘণ্টা খানেক আগে লালবাজারের সামনে মোটর চাপা পড়েছে। এখনও জ্ঞান হয়নি। অবস্থা সঙ্গীন। লোকটির পরিচয় কিছু জানা যায়নি।'

বল্লুম—"খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাকে এ খবর দেবার উদ্দেশ্য কি? আর আমার নাম ঠিকানাই বা পেলে কোথা?"

সার্জেণ্ট এণ্ডারসনের জালার মতো গলা আমাকে ধমকে দিলে—"সেই কথাই তো বলা হচ্ছে, কথায় বাধা দিও না। সেই হতভাগ্য বাঙ্গালী যুবকের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেছে, তাতে তোমার নাম ও অফিস লেখা রয়েছে।"

আমি বিস্ময় ও ধমকের ভয়ে অবাক হয়ে রইলুম, ভাবতে লাগলুম কে এমন লোক যে আমার নাম ঠিকানা লিখে লালবাজারের পথ দিয়ে মোটরযোগে পরলোকযাত্রা করলে। সার্জেণ্ট তখন লোকটার বর্ণনা বলে যাচ্ছে। সব বাঙ্গালী যুবকই টেনিস সার্ট পরে কিম্বা পরতে পারে। চশমা, ছাতা, রিষ্টওয়াচ এবং পাঁচ ফিট ছ' ইঞ্চি, কিছুই কারও সঙ্গে মেলেনা, অথবা সবার সঙ্গেই মিলে যায়। আমি সব কথা শুনছিই না। হঠাৎ কানে এলো—"আর তার হাতে একটা নীল কাগজে ছাপা বাড়ীর নক্সা, গোল করে পাকানো।"

শুনেই মাথা ঘুরে গেল। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলুম—"ব্লু প্রিণ্ট? তার নীচে কি এই এই কথা লেখা আছে?"

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে এণ্ডারসনের জবাব পেলুম—"রাইট্ ও।"

আবার জিজ্ঞেসা করলুম—"যে কাগজে আমার নাম লেখা আছে তার উল্টো পিঠে কি একটা রাস্তার নক্সার মতো আঁকা আছে?"

সার্জেণ্ট খুশী হয়ে বল্লে—"ঠিক তাই। তাহলে তুমি এই যুবককে চিনতে পেরেছ? এর বাড়ীতে একটা খবর দেওয়া দরকার, এতক্ষণ এর পরিচয় জানা না থাকাতে কিছু করতে পারা যায়নি। বাবু, তুমি একবার দয়া করে আসতে পারবে কি?"

দয়া টয়া নয়, যেতে হবে বলেই যেতে হবে। কর্ত্তব্য, অপ্রিয় হলেও আমার ঘাড়েই এসে পড়ল যখন, তখন আর উপায় কি? বড়বাবুকে সব বলে ছুটি নিয়ে ছুটলুম।

আহা, বিধবার একমাত্র ছেলে এই আনন্দ। বয়স যোরেনি, বিয়ে করেছে। অতি ফুর্ত্তিবাজ ছেলে। জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ যাহোক করে একখানি মাথা গোঁজার মতো বাড়ী তুলবে। আজই সকালে ঐ প্ল্যান নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। কত পরামর্শ করলে, কত জল্পনা কল্পনা। আহা! সব বুঝি শেষ হয়ে গেল! আমার জানা একজন কনট্রাকটারের বাড়ীর ডিরেকসন্ (নিশানা) কাগজে এঁকে নিয়ে গেল। আমার নাম করে দেখা করবে বলে আমার নাম, আপিসের ঠিকানা লিখে নিলে। যেন চোখের ওপর ভাসছিল আনন্দর চেহারা। হাসি মুখ, ডান হাতে নীল নক্সাটা পাকানো, বাঁ হাতে কোঁচা। কোথায় রইল তার বাড়ী, আর কোথায় রইল তার প্ল্যান। এমনি করেই মানুষের সব প্ল্যান ভেস্তে যায়। কিন্তু আমি এখন তার বুড়ী মাকেই বা বলি কি, আর তার কচি বৌটাকেই বা কি খবর দেব? বৌয়ের কথা বলতে অজ্ঞান ছিল।

মানব জীবনের নশ্বরতার কথা ভাবতে ভাবতে হন্হন্ করে চলেছি। চোত-বোশেখের রদ্দুর আর নিদারুণ দুশ্চিন্তায় মাথা যেন ঘুরছে। লালবাজারে গিয়ে আর এক বিপদ। ও-রাজ্যে তো কখনো পদার্পণ করিনি—ঘুরে ঘুরে হয়রান, এমার্জেন্সি ডিপার্টমেণ্ট আর খুঁজে পাইনা। যাকে জিজ্ঞাসা করি, কেউ বলতে পারেনা। বরং যেন পাগল মনে করে হেসে উড়িয়ে দেয়।

তিনবার করে সমস্ত কম্পাউণ্ড, বাড়ী ঘুরে এসে লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এণ্ডারসন ব্যাটার কথা বোধহয় ঠিক বুঝতে পারিনি, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কি বলেছে সে, আর কি শুনেছি আমি। এখন কোন দিকে যাই। আনন্দ বোধহয় আর টিকে নেই। কিন্তু তার দেহটার তো গতি করতে হবে। এতক্ষণে দেহটাকে মর্গেই পাঠিয়ে দিলে কিনা কে জানে। কবে যে ছাড়বে, আর কবে যে গতি হবে!

গতি আর আমাকে করতে হল না। দেখি দেহের গতি দেহ নিজেই করছে। রাস্তার ওপার থেকে আনন্দ'র দেহ এসে হাজির হল। সেই পাকানো নীল নক্সার কাগজ হাতে রয়েছে তখনও। দেখে বুকের মধ্যে যে কি করে উঠল তা বলে বোঝাতে পারিনা।

হাঁ করে চেয়ে রইলুম। আনন্দ বল্লে—"কি, মাষ্টার যে, কতক্ষণ?—আরে মুখে কথা নেই, হাঁ করে দেখছ কি? ভুত দেখেছ নাকি?"

বল্লুম—"তুমি আছ?" আনন্দ বল্লে—"আছিবলে আছি। দিব্যি জলজ্যান্ত আছি। তুমি কি ভাবছ যে আমি গাড়ী চাপা পড়েছি?"

বোকার মত বল্লুম—"পড়োনি? তবে কে গাড়ী চাপা পড়ল? এমার্জেন্সি ডিপার্টমেণ্ট"···

পাপিষ্ঠ আনন্দ সার্জেণ্ট এণ্ডারসনের ভাষায় ও গলায় বল্লে—"ভেরি সরি, বাবু, এমারজেন্সি ডিপাটমেণ্ট বন্ধ হয়ে গেছে, আর সার্জেণ্ট এণ্ডারসন ১লা এপ্রিল থেকে পেন্সন নিয়েছে, না হলে তোমাকে সব খবর দিতে পারতুম।" সে হো হো করে হেসে উঠল। আমি রাগ করতে গিয়েও রাগতে পারলুম না। তার মাকে আর বৌকে দুঃসংবাদ দেওয়ার হাত থেকে যে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে, এর জন্তেই তাকে আশীর্ব্বাদ করলুম। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল দুপুর রোদে এই দুর্ভাবনায় আর দুর্ভোগে। ঘোলের সরবৎ খাইয়ে পান খাইয়ে আনন্দ আমাকে ঠাণ্ডা করলে। এতক্ষণে তার পেজোমোর কথা ভেবে আমার হাসি এল। পাপিষ্ঠ এই মতলব করেই আজ প্ল্যানটা হাতে করে আমার বাড়ী গিয়েছিল, এই মতলব করেই একটা কাগজে আমার নামধাম লিখেছিল। ছাতা হাতে বাঙ্গালী যুবক বা চশমা-পরা বাঙ্গালী যুবক হাজার হাজার আছে, কিন্তু পাকানো নীল প্ল্যান হাতে বল্লে আজ আমার ওর কথাই মনে পড়বে। সখের থিয়েটারে অভিনয় করতো, টেলিফোনে সাহেবের গলা নকল করতে তার কিছুই অসুবিধে হয়নি। টেলিফোন করে দিয়েই দেখতে এসেছে লালবাজারে আমার অবস্থাটা। এমন প্রাণান্ত ঠাট্টাও লোকে করে?

হাসতে হাসতে এবং তাকে গালাগাল দিতে দিতে অফিসে ফিরে এলুম। বাবুরা সাগ্রহে ও সহানুভূতিতে গদগদ হয়ে ছুটে এল এবং আনন্দ-সংবাদ শুনে হেসে লুটিয়ে পড়ল।

আমরাও আনন্দ সংবাদে হাসিতে লাগিলাম। অবিনাশ হাসি চাপিবার উদ্দেশ্যে ক্যালেণ্ডার পড়িবার চেষ্টা করিল।

অবিনাশের চাকর আসিয়া একটা কাঁসার থালা হইতে এক একটা কলাই করা বাটি নামাইয়া দিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় আসিলে চা একপ্রস্থে হয় না, তাহা অবিনাশের স্ত্রী জানিত। মাষ্টার মহাশয়ের সৎসঙ্গে আমাদেরও উপরি পাওনা হইত।

সিধু বলিল—ওয়াণ্ডারফুল! আপনার আনন্দবাবুর ঠিকানাটা দিতে হবে মাষ্টার মশাই। তাঁর কাছ থেকে অনেক জিনিষ পাওয়া যাবে। জিনিয়াস্!

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—সে এখন কোথায় আছে তা তো জানি না। মাঝে শুনেছিলুম আনন্দ মীরাটে না মাদুরায় কোথায় বদলি হয়েছে। তবে খবর পেলে তোমাকে জানাব।

অবিনাশ বলিল—"আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনার একবার খেয়াল হলনা যে, গাড়ী চাপা-পড়া লোককে লালবাজারে কেন ফেলে রাখবে? তাকে নিশ্চয় মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়ে দেবে যদি বাঁচাতে পারে। আর এমার্জেন্সি ডিপার্ট তো হাসপাতালেই থাকে।"

মাষ্টার মহাশয় চায়ের বাটি হইতে প্রসন্নবদন তুলিয়া কহিলেন—"তা আর খেয়াল হয়নি? অনেকবার হয়েছে। ঠিক এই কথাই আমি কত বার ভেবেছি। কিন্তু সে লালবাজার থেকে ফেরবার পর। প্রথম যখন আনন্দ অর্থাৎ এণ্ডারসন্ সার্জেণ্ট টেলিফোনে দুর্ঘটনার খবর দিলে, তখন ও খেয়ালটি হয়নি বাবা।"

পুলিন জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু অবিনাশের দামের থিওরি সত্যি হল কিসে? ১লা এপ্রিল তো সেবার আপনার চূড়ান্ত হ'ল, কিন্তু—

মাষ্টার মহাশয় চায়ের বাটি তক্তাপোষের নীচে নামাইয়া দিয়া বলিলেন—"চূড়ান্ত তখনও হয়নি। জানো তো আমাদের বাঙ্গালা শাস্ত্রে বলে বার বার তিন বার?"

বলিলাম—"আরও আছে?"

"আছে বইকি।"

পুলিন খুশী হইয়া বলিল—"সেই দিনেই?"

—"হুঁ, সেই দিনেই তো। তা নইলে আর এ গল্প বলব কেন?"

সিধু বলিল—"বাঃ বাঃ, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মাষ্টার মশাই, আপনাকে হিংসে হচ্ছে।"

প্রচণ্ড ধমক দিয়া পুলিন সিধুকে থামাইয়া দিল এবং অবিনাশ তাকিয়া বুকের তলায় লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া ডাকিল—"মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"এই যে বলি বাবা। তুমি কান খাড়া করে শুয়েছ, তা দেখেছি অবিনাশ। কিন্তু এবার আর কিছু চালাকি করতে পারেনি।

লালবাজার থেকে ফিরে সবে কাগজ পত্তরে মন দিয়েছি, আবার ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের দূত এলো—টেলিফোনে আমাকে ডাকছে। বলে দিলুম, যাবনা, যাঃ। বড়বাবু শুনতে পেয়ে বল্লেন, "মাষ্টার কি ভয় পেলে নাকি—সত্যি ডাকও তো হতে পারে, যাও না।"

বল্লুম - দু'বছরে একটা টেলিফোন আসে না আমার, আর আজ ডাকের ওপর ডাক। ক্ষেপেছেন আপনি? এ আপনার ১লা এপ্রিলের মাহাত্ম্য। নেড়া বেলতলায় দু'বারই যায় না বড়বাবু, তিনবার তো নয়ই।

বেয়ারা ফিরে গেল। ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের এক বাবু এসে বল্লেন—"কী আপনার রকম বলুন তো? টেলিফোনটা সেই থেকে আটকে আছে, একবার শুনলেই কি ঠকে যাবেন?"

ভাবলুম, তা বটে। এবারে আর ঠকছি না। তবে কোন্ মহাত্মা দেখতে ক্ষতি কি। ফাঁদে পা না দিলেই হ'ল। গেলুম এবং টেলিফোনও ধরলুম। টেলিফোনের স্বর প্রকৃত স্বর থেকে তফাৎ হয়ই। ঠিক না মিললেও সুধীরচন্দ্রের সুকণ্ঠ চেনা অসম্ভব হল না। সুধীর ছিল আমার আর একটি মহারসিক বন্ধু।

দুচার কথা শুনেই আমার সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না। বিশ্বাসে দাঁড়াল। সুধীরচন্দ্রের সামান্য তোতলামিটাই তাকে ধরিয়ে দিলে। কিন্তু কিছু জানতে দিলুম না যে আমি ধরে ফেলেছি। সমস্ত খবরটি তার বলা হলে রিসিভারের চোঙের ভেতর মোটা গলায় বল্লুম—"যে আজ্ঞে, অমুকবাবু এলেই আমি তক্ষুণি জানিয়ে দোব। সে কি কথা! এত বড় জরুরি খবর! তাঁর পটলডাঙ্গার বাসায় তো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি এলেই তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। না, না, এ কি ভুলে যাবার কথা? আচ্ছা, নমস্কার।"

তারপর রিসিভার নামিয়ে যথাস্থানে রেখে এক থেকে কুড়ি পর্য্যন্ত গুণলুম। গণনার পর রিসিভার তুলে নিয়ে সুধীরের অফিস ডাকলুম। সুধীরকে পেলুম। সুধীর বল্লে—কে? বল্লুম, কে তাও বলতে হবে? কিন্তু একটা যে গোড়ায় গলদ করে ফেলেছ ভাই। আমার ছেলেটা যে দিন দুই আগে তার মামার বাড়ী গেছে, তা বোধহয় তোমার জানা ছিল না, না?

টেলিফোন তো টেলিভিসন নয়। দেখতে পেলুম না ধরা পড়ে গিয়ে বন্ধুর মুখখানি কেমন উজ্জ্বল হল। তবু ভাঙ্গে তো মচ্কায় না। সুধীর বল্লে—"কে বল তো? অমুক কি?"

বল্লুম—"তবু ভালো যে চিনতে পেরেছ।"

সুধীর বিস্ময়ের সুরে বল্লে—"কী বল্লে বল তো? তোমার ছেলের কি হয়েছে?"

বল্লুম "আহা, তোমার স্মৃতি শক্তি এত খারাপ হয়ে গেল। এই যে পাঁচ মিনিটও হয়নি তুমি আমাকে খবর দিলে আমার ছেলে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এরই মধ্যে ভুলে গেলে। সুধীর বল্লে—"সে কি? আমি—না-না, আ-আমি কেন—সে কি—"

তার আম্তা আম্তা আর শেষ করতে দিলুম না। "ছেলেটা মামার বাড়ী থেকে ফিরে আসুক, তার পর ১লা এপ্রিল না হয়, ১লা মে কোরো, কেমন?" বলে টেলিফোন রেখে দিলুম।

বড়বাবুকে এসে বল্লুম 'এই বারবার তিনবার হল সার। তবে এবার আর ঠকিনি।"

বড়বাবু সব শুনে বল্লেন—"ছি ছি, ছেলে পুলের অকল্যাণ নিয়ে ঠাট্টা, এসব কি কথা? এ অত্যন্ত অন্যায়।" বাবুরা সকলেই সুধীরের বুদ্ধির নিন্দে করলেন ও আমার বুদ্ধির তারিফ করলেন।

সারা দিনের ব্যাপার নিয়ে হাসিতে গল্পতে অফিসের কাজ সেদিন আমার এগোয় নি বেশি। পাঁচটার জায়গায় প্রায় পৌনে ছটা হয়ে গিয়েছিল অফিস থেকে বেরোতে।

আমি বললাম—"এ তো দেখছি উল্টো ১লা এপ্রিল হয়েছিল মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টার মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"হুঁ, এটা উল্টোই হয়ে গেল।"

সিধু বলিল—"এইটে কিন্তু আপনার চরম হয়েছিল, যাকে বলে olimax কিম্বা anti-olimax-ও বলা যায়, কি বলুন?"

নিমীলিত চোখে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"হুঁ।"

অবিনাশ শুইয়াছিল। সেই ভাবেই বলিল—"তারপর?"

কয়েক মুহূর্ত্ত মাষ্টার মহাশয় নীরব রহিলেন। তারপর একটি রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন :

তারপর আর সামান্যই আছে। থাকতুম তখন একটা বাড়ীর নীচের তলায় দুখানা ঘর নিয়ে। বাসায় ফিরে দেখি স্ত্রী ছেলেটাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন।

সিধু কহিল—"হ্যাঁ? যে ছেলে মামার বাড়ীতে ছিল?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—"হ্যাঁ, ঐ একটিই ছেলে ছিল। বাবার কাছে যাব, বাবার কাছে যাব বলে মামার বাড়ীতে বড় কান্নাকাটি করেছিল, তাই তার মামা দুপুর বেলায় রেখে গিয়েছিলেন।

ছেলেটার সবে জ্ঞানের মতো হয়েছে। কথা কইতে পারছে না। আচ্ছন্নের মতো আমার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

যখন পড়ে গিয়েছিল তখন সারা বাড়ীটাতে পুরুষ বলতে বিভিন্ন ভাড়াটেদের গুটি তিন চার শিশু। দৈবাৎ ওপরের ভাড়াটেদের একটি আত্মীয় ছেলে এসে পড়েছিল। সেই ছেলেটিই যাবার সময় কোন দোকান থেকে টেলিফোন করে দিয়ে গেছে। তোত্‌লা নয়, ছেলেমানুষ, টেলিফোনে কথা কইতে নার্ভাস বোধ করে থাকবে। আমি বলেছি অমুক বাবুকে এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেছে। বাড়ী সুদ্ধ স্ত্রীলোক ছেলের মাথায় জল দিয়েছেন, হাওয়া করেছেন, আমার স্ত্রীকে ভরসা দিয়েছেন, আর আমার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্ করেছেন।

ছেলে নিয়ে ছুটলুম হাসপাতালে। স্ত্রী মানা শুনলেন না, চল্লেন সঙ্গে। ডাক্তারেরা বল্লে—ব্রেণের ভেতর বোধহয় রক্তপাত হচ্ছে, আরও আগে আনা উচিত ছিল।

আবার মাষ্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমাদের কাহারও কথা কহিতে ভরসা হইল না। উগ্র ও উদ্বিগ্ন কৌতূহল লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের মুদিত চক্ষু দুইটির পানে চাহিয়া রহিলাম। প্রশ্ন করিতে হইল না, তিনি নিজেই বাকীটুকু বলিলেন।

দিন পাঁচেক পরে স্বামী স্ত্রীতে ফিরে এলুম শুধু হাতে।

বুড়ী এখনও থাকে থাকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁগা, এত দেরী করে এলে কেন? কখন খবর দিয়েছি, আর একটু আগে আসতে পারলে না? আবার বলে খোকাকে নিয়ে আসবে না, হ্যাঁগা?

বোধহয় বাহাত্তুরে ধরেছে।

মাষ্টার মহাশয়ের স্বর ভারী ও মৃদু হইয়া আসিল।

অবিনাশ তাকিয়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছে। সিধু মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া আছে। মাষ্টার মহাশয়ের দুইটি চোখের কোল বাহিয়া দুই ফোঁটা জল তাঁহার শাদা দাড়ির উপর ঝরিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন :

"লোকে বলেছিল আর একটি এলেই দুঃখু ভুলবে। কিন্তু আর তো খোকা ফিরে এল না।

বাহাত্তুরেই হোক আর যাই হোক, বুঝুক আর না বুঝুক, বুড়ীকে সত্যি জবাবই দি। বলি—তক্ষুণি এলুম না পাছে ঠকে যাই, পাছে এপ্রিলফুল হয়ে যাই। দুবার ঠকেছিলুম কিনা, তাই এবার না ঠকে তার দাম দিতে হল।"

ঘরের ভিতর একটি নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে মাষ্টার মহাশয়ই সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিলেন।

ক্ষিপ্রহাতে চোখ দুইটি মুছিয়া লইয়া মাষ্টার মহাশয় স্বাভাবিক স্মিত-মুখে বলিলেন "তাই বলে কি লোকে ঠাট্টা পরিহাস করা ছেড়ে দেবে? পাগল! তবে রাগ কোরোনা বাবা, কালকে আমার আসা বোধহয় হয়ে উঠবে না।"

"দানিশাব্দ" সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

আমার নিকট "আইন-সার-সংগ্রহ" নামক একখানি প্রাচীন ছাপা বইয়ের প্রতিলিপি আছে। উহার মলাটে যাহা লেখা আছে, তাহা দেখিলেই পাঠকগণ উহার স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন ; যথা :—

"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ ভরসা।
আইনের সার সংগ্রহ।
ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সালাবধী ১৮৩২ সাল পর্য্যন্ত॥
আদালত বিষয়ক আইন॥

শান্তিপুরের মুনসেফ পদাভিসিক্ত সদ্বিচারক শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগ্রহ হইয়া বহরা গ্রামে॥ শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত দীং বিদ্যাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল॥

বঙ্গাব্দা ১২৪৮ সংখ্যক॥
দানিশাব্দা ৯১ সংখ্যক॥
শ্রীপ্রাণকিশোর রায় স্বাক্ষর॥"

পুথিখানি প্রাচীন দেশীয় তুলোট কাগজে লিখিত। উপরে সে সনের উল্লেখ আছে, তাহা মূলগ্রন্থের মুদ্রণ কাল হওয়াই সম্ভব। প্রতিলিপির তারিখ নাই।

বিগত ১৩২০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত আমার 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ" নামক পুস্তকে আমি এই প্রসঙ্গে এরূপ লিখিয়াছিলাম :—

"এই গ্রন্থ হইতে আর একটি সত্য আবিষ্কৃত হইল। আমরা জানিতে পারিতেছি, তখন বঙ্গের স্থান বিশেষে "দানিশাব্দ" বলিয়া একটি অব্দের প্রচলন ছিল। দিনেমারগণই যে এই অব্দের প্রচলন-কর্ত্তা, তাহা বলাই বাহুল্য। যে দিনেমারগণ একদিন বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনে প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইত, আজ তথায় তাহাদের নাম ও চিহ্নমাত্র নাই ; কিন্তু তাহাদের প্রচলিত সন গৃহস্থের নিভৃত নিকেতনে লুক্কায়িত প্রাচীন গ্রন্থাদির দৃঢ় মুষ্টিবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আজও তাহাদের বিলুপ্ত গৌরবের কথা বাঙ্গালীর স্মৃতিপটে জাগাইয়া তুলিতেছে। জ্ঞানীগণ যথার্থই বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।" (১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইংরেজী Danish শব্দের সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়াই অর্থাৎ Danish শব্দকে "দানিশ" করা হইয়াছে মনে করিয়াই আমি উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম। এতদিন পরেও আমার এই অভিমত সম্বন্ধে কাহারও মুখে কোন বিরুদ্ধ কথা শুনা না গেলেও সমীচীনতা সম্বন্ধে আমার নিজের মনেই আজ একটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। পারসী ভাষায় "দানেশ" শব্দ আছে ; তাহার অর্থ—আকল বা জ্ঞান। এই "দানেশ" শব্দের সহিত "দানিশ" শব্দের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, জানি না। দেখা যাইতেছে, নবাবী আমলে অর্থাৎ ১৭৪৯ কি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে এই সনের উৎপত্তি হইয়াছিল। যাহা হউক, এখন এই সংশয়ের নিরসন ও প্রকৃত সত্যের নিরূপণ হওয়া আবশ্যক।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য, এই অব্দের প্রচলন কর্ত্তা কে, কোন্ ঘটনা উপলক্ষ করিয়া কখন ইহার প্রচলন হইয়াছিল এবং বঙ্গের কোন্ স্থানে ইহার প্রচলন ছিল বা এখনও আছে? পুঁথিতে উল্লেখিত "বহরা" গ্রাম কোথায়? "ভারতবর্ষের" বিজ্ঞপাঠকদের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে আলোক-পাত করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখের বিষয় হইবে।

উপনিবেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নদীর ধার দিয়াই বেলে-মাটির পথ। পূর্ণিমার জোয়ারে জল তীরের অনেকখানি অবধি ছাপাইয়া গিয়াছিল, তাই পথের উপরে একরাশ এঁটেল মাটি জমিয়া গিয়াছে। রবারের জুতোটাকে অত্যন্ত চাপিয়া চাপিয়া মণিমোহন চলিতে লাগিল। বেশ ছাপ পড়িতেছে কাদায়। চরকা—চরকা মার্কা জুতা। সস্তা, টেঁকেও অনেকদিন।

এ পাশে নদী। বসন্তের ছোঁয়ায় জলের ঘোলাটে বর্ণ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে অনেকটা। পরপারহীন অসীম জলের বুকে যতটা চোখ যায় অসংখ্য জেলে-নৌকা ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাচিয়া উঠিতেছে। এ বৎসর ইলিশ-মাছ পড়িতেছে বেশ। দু' পয়সা করিয়া এক একটা বড় বড় মাছ বিক্রয় হয়। পশ্চিম বঙ্গের ছেলের কাছে ইহা পরম বিচিত্র ও বিস্ময়কর ব্যাপার।

ওই যে—শাদা বড় নৌকাটা আবার আসিয়াছে।

মাসে একবার করিয়া নৌকাখানা এই বন্দরে আসিয়া ভেড়ে। নৌকাখানা বর্মিদের। তাহারা এখানে নাকি ব্যবসা করিতে আসে। কখনো কিছু সুপারী কেনে, কখনো ধান, কখনো বা নারিকেল। আকিয়াবে নাকি তাহাদের কারবার আছে।

দুইজন বর্মিলোক এ পাশে বসিয়া নিজেদের মধ্যে কি আলোচনা করিতেছে, একজন একটা ষ্টোভ ধরাইতেছে; আর একজন নৌকার ছৈয়ের উপর বসিয়া চোখ বুজিয়া একটা লম্বা চুরুট টানিতেছে। চরের উপর দুইটা মস্ত মস্ত লোহার নোঙর—জোয়ারের জল আসিয়া নৌকাটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে না পারে।

বেশ আছে ওরা। বাঁচিতে হয় তো ওদের মতো করিয়াই। সুদূর বর্মা—মেঘের মতো মাথা তুলিয়া পাহাড়, তাহার কারুকার্যখচিত গুহাগর্ভে অপূর্ব ভাস্কর্য; উপত্যকা ভরিয়া নানা রঙের ফুল যেন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। ধূপের ধোঁয়া—ফুলের গন্ধ, রেশমী ঘাগরা-পরা চূড়া-বাঁধা মেয়ের দল। প্যাগোডার উদ্ধত শিরে সোনার দীপ্তি ঝলমল্ করিতেছে। সমুদ্রের নীল জল পান করিয়া ইরাবতী যেন নীলকণ্ঠ।

সেই দেশ হইতে ওরা আসিয়াছে। পাহাড়—নদী, সমুদ্র ডিঙাইয়া। ঘরের টান এই সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারেও ওদের বিচলিত করিয়া তোলে না। আর এই ছয়টি মাস মাত্র সে পশ্চিম বঙ্গ হইতে নিম্নবঙ্গে আসিয়াছে, অথচ ইহারি মধ্যে পাকুড় প্যাসেঞ্জার আর বর্ধমানের ধান ক্ষেত থাকিয়া থাকিয়া তাহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

তা, যে যাই করুক, এখানে সব চাইতে ফলাও ব্যবসা লইয়া বসিয়াছে—কবিরাজ বলরাম মণ্ডল, ভিষক্‌রত্ন।

ভদ্রলোক বলিলে বাংলা দেশের যে বিশেষ সম্প্রদায়টি বোঝায়, তাহাদের সংখ্যা এখানে নাই বলিলেই চলে। এক আছেন পোষ্টমাষ্টার—তিনি একাই বেশ আসর জমাইয়া নিতে পারেন। খাসমহালের কর্মচারীদের দু একজন মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তা ছাড়া সম্প্রতি মণিমোহন আসিয়াছে, কলেক্‌সনের ফাঁকে ফাঁকে টাকা জমা দিতে আসিলে সেও কখনো কখনো এখানকার তাসের আড্ডায় আসিয়া যোগ দেয়।

আতিথেয়তার ব্যাপারে বলরামের তুলনা নাই।

খাটো চেহারার দোহারা গোছের লোকটি, মোটামুটি সুপুরুষই বলা চলে। ঠিক চাঁদির উপরে খানিকটা জায়গা লইয়া চুল পাত্‌লা হইয়া আসিয়াছে, কিছুদিনের মধ্যেই টাক পড়িবে বোধ হয়। মুখখানা গোলগাল—বেশ খানিকটা পরিতৃপ্ত আনন্দে যেন উদ্ভাসিত হইয়া আছে। তাসের সঙ্গী কোনো বন্ধু বান্ধবকে দেখিলেই সে পরিতৃপ্তিটা যেন বন্যার মত উচ্ছ্বল হইয়া ওঠে, মাথার অপরিস্ফুট টাকটিও যেন আনন্দে জলজল করিতে থাকে।

ডাকিয়া বলেন, ওরে তামাক দে।

গড়গড়ায় করিয়া তামাক আসে। উগ্র মধুর গন্ধে ভরিয়া যায় ঘরটা। ফর্শীর নলটা আগন্তুকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলরাম ময়লা বালিশটার তলা হইতে এক প্যাকেট তাস বাহির করেন। চটকদার তাস—উপরে বিদেশী নারীমূর্ত্তি।

সজোরে তাস জোড়াকে ভাঁজিয়া বলরাম বলেন—আসুন, হয়ে যাক এক বাজি। কি খেলবেন, ব্রীজ? ওঃ, আপনি তো আবার ব্রীজ জানেন না, তা হলে ব্রে-ই হোক।

তিন বাজি ব্রে হইতে তিনবারই হয়তো তামাক আসিয়া যাইবে।

বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বিশেষ রকম আয়োজন হয়। যেদিন বেশি রাত্রে খেলাটা বেশ করিয়া জমিয়া যায়, সেদিন কবিরাজ মশাই মদনানন্দ মোদকের কৌটাটি নামাইয়া আনেন। সে অমৃত এক এক দলা পেটে পড়িলে আর কাহাকেও কিছু দেখিতে হয় না—এই চর ইস্‌মাইলকেও যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রলোক বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কবিরাজের যে হাতযশ আছে সেটা মানিতেই হইবে।

এ হেন মানুষ বলরাম। এই পাণ্ডব-বর্জিত নদীর চরে তিনি একটা নতুন জগৎ সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন। রোগীর জন্য এমন উৎকণ্ঠার কিছু নাই। চরে যথেষ্ট জমি আছে, নোনা জলের পুকুর আছে, সুপারীর বাগান আছে, প্রায় পঞ্চাশটি মহিষ আছে—এক রকম ছোটখাটো জমিদার বলিলেই চলে। সুতরাং কবিরাজীটা তাঁহার পেশা নয়—নেশাই বলিতে হয়।

নদীর ধার দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মণিমোহন ভিষক্‌রত্নের আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু অন্যদিনের মতো ভিষক্‌রত্নকে আজ বাহিরের ঘরে পাওয়া গেল না। ভিতর হইতে মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো

গলার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল, তাহাতে বোঝা গেল, কবিরাজ কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

মণিমোহন বিস্ময় বোধ করিল। কবিরাজ যে এখানে নারী-সঙ্গহীন নিরাত্মীয় দিন কাটাইতেছে, এই কথাই সকলে জানে। সুদূর ফরিদপুর অঞ্চলে তাহার দেশ—আজ দশ বছর আগে সে বিপত্নীক হইয়াছে। সুতরাং কোথা হইতে আবার একটি স্ত্রীলোক জোটাইয়া আনিল সে?

ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়া মণিমোহন আশে-পাশে আরো কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারিল। ওদিকের বারান্দায় তারের উপর দুখানা শাড়ী শুকাইতেছে। অন্দর ও বাহিরের ঘরটির মাঝখানকার অবারিত দ্বারটির উপরে পর্দা ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে একটা। তামাক-সরবরাহকারী সদাপ্রস্তুত ভৃত্য রাধানাথকেও দেখিতে পাওয়া গেল না—সম্ভবত তাহাকে কোনো কাজে পাঠানো হইয়াছে।

মণিমোহন একটা গলা খাঁকারি দিয়া ডাকিল, মণ্ডল মশাই!

ভিতর হইতে সাড়া দিয়া বলরাম বলিলেন, কে? বসুন, আসছি।

মণিমোহন ফরাসের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেওয়ালের গায়ে একটা ওয়াল-ক্লক অশ্রান্তভাবে টক্‌টক্‌ করিতেছে, পেণ্ডুলামের উপরকার ফাটা-কাঁচের উপর এক খণ্ড কাগজ আঁটা—তাহাতে লেখা: "বুধবার।" অর্থাৎ, বুধবারে দম দিতে হইবে। তিন চারখানা ক্যালেণ্ডার—তাহাদের দুখানা গত বৎসরের। একখানা গ্রুপ্‌-ফটোগ্রাফ, কালের ছোঁয়াচ লাগিয়া প্রায় ফেড্‌ করিয়া আসিয়াছে। দুইখানা বড় বড় চীনা ছবি—কিছুদিন আগে সহর হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে। একখানি যুদ্ধের ছবি—ট্রেঞ্চ্‌-ফাইটিং হইতেছে, এরোপ্লেন বোমা ফেলিতেছে, ট্যাঙ্কগুলি পাহাড় বাহিয়া উঠিতেছে। আর একখানা একটু আদি রসাশ্রিত—একটি মেয়ে বেশবাস অসম্বৃত করিয়া অশোভন-ভঙ্গিতে বসিয়া।

একটু দেরী করিয়াই কবিরাজ বাহিরে আসিলেন। সাধারণত, তাঁহার আতিথেয়তার পক্ষে ইহা ব্যতিক্রম। বন্ধু-বান্ধব আসিলে এত দেরী করিয়া তিনি কখনো তাহাদের অভ্যর্থনা করেন না।

বাহিরে আসিয়া কবিরাজ একগাল হাসিলেন।

—এই যে আপনি। কবে এলেন?

—কাল।

—বেশ, বেশ, ভালো ছিলেন তো? আজকাল আবার যে রকম নোনার তিড়িক, প্রায়ই আমাশা-টামাশা হচ্ছে। পথে-ঘাটে ঘুরতে হয়, একটু সাবধান থাকবেন আর কি।

মণিমোহন মাথা নাড়িয়া বলিল, হুঁ। এবার ভাবছি আপনার কাছ থেকে কিছু ওষুধ-পত্তর নিয়ে যাব।

—তা যাবেন। ভাস্কর-লবণ আর কৃষ্ণ-চতুর্মুখ, পেটের অবস্থা পরিষ্কার রাখতে ওর আর জুড়ি নেই—বুঝলেন না?

—বেশ তো, দেবেন ওষুধ দুটো।

কিন্তু ইহার ফাঁকে ফাঁকেই মণিমোহন লক্ষ্য করিতেছিল, কেমন যেন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ভিষকৃরত্ন। বন্ধু-বান্ধব আসিলে সাধারণত যে-ভাবে সে খুসি হইয়া উঠিত, আজ যেন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। যেন তাহার উপস্থিতিটা বলরামের কাছে তেমন প্রীতিকর ঠেকিতেছে না। আরো বিস্ময়ের সঙ্গে মণিমোহন দেখিল, ইহার মধ্যে বলরাম একবারও তামাক আনিতে আদেশ দিল না, অথবা, তাকিয়ার তলা হইতে তাস জোড়া বাহির করিয়া একবারও বলিল না, হবে নাকি এক বাজি রে! আসুন না।

প্রশ্নটা শেষ পর্যন্ত করিতে হইল মণিমোহনকেই।

—বাড়িতে কেউ এসেছে নাকি?

বলরাম খানিকটা হাসিলেন—তবে হাসিটা যেন একটু অপ্রতিভ ঠেকিল। বলিলেন, আজ্ঞে হাঁ—অনেকটা তাই বই কি। হাত পুড়িয়ে আর রেঁধে খাওয়া যায় না, তাই গ্রামের একটি পরিচিত মেয়েকে নিয়ে এসেছি কিছুদিনের জন্যে—অন্তত দেখাশোনাটা তো করতে পারবে।

কোথা হইতে এক বোঝা পুঁই শাক আনিয়া রাধানাথ ঝুপ্‌ করিয়া ভিষকৃরত্নের সম্মুখে ফেলিল। বলিল, চিংড়ি মাছ পাওয়া গেল না বাবু!

—পাওয়া গেলনা? কেন পাওয়া গেলনা শুনি? সকাল থেকে বারবার ক'রে বলছি, বাবুর আর বেরোতে সময়ই হয়না! চিংড়ি মাছ পাসনি তো ও জঙ্গলগুলো এনে হাজির করেছিস কি জন্য? দূর ক'রে টেনে ফেলে দে সব।

রাধানাথ কহিল, না পাওয়া গেলে কি করব বাবু? জেলেরাই পায়না, আমি কি গড়িয়ে আনব নাকি?

—যা যা হয়েছে, আর তকরার করিসনি। এগুলো ভেতরে নিয়ে যা। এতটুকু উপকার নেই, তক্কের বেলায় চওড়া চওড়া কথা।

রাধানাথ বিড় বিড় করিতে করিতে শাকের বোঝাটা তুলিয়া লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মণিমোহনের দিকে চোখ তুলিয়া বলরাম বলিলেন, দেখেছেন তো ব্যাপারটা! মেয়েটা ভালোবাসে পুঁই চিংড়ি, কাল থেকে বলছি—তা আজ এসে বলছে মাছ পাওয়া গেলনা। দূর ক'রে দেব হতভাগা অকর্মাকে।

মণিমোহন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বলিল আচ্ছা, এখন উঠি কবিরাজ মশাই।

কবিরাজ অসংকোচেই কহিলেন, আসুন। মাঝে মাঝে দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেবেন আর কি। তা ছাড়া কৃষ্ণচতুর্মুখ আর ভাস্কর-লবণ—

—বিকেলে নিয়ে যাব'খন, বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

চলিতে চলিতে মণিমোহনের মনে বলরামের পরিবর্তনের কথাটা বিশেষ করিয়া বাজিতে লাগিল। এতদিন এই চরের নির্বাসনে বসিয়া যে নিঃসঙ্গ নিরাত্মীয় জীবন কবিরাজকে যাপন করিতে হইয়াছে, সে জীবনটাকে সে সামাজিকতা দিয়াই পূর্ণ করিয়া নিতে চাহিয়াছিল। তাই তাম্রকূট বিতরণে তাহার কৃপণতা ছিলনা, সুযোগ এবং সময় পাইলেই এক জোড়া তাস ভাঁজিয়া লইয়া খেলিতে বসিতে তাহার বাধে নাই। বাহিরের জগৎটাকেই সংসারে পরিবর্তিত করিয়া বেশ সুখী এবং পরিতৃপ্ত হইয়া ছিল সে।

কিন্তু সামাজিকতারও একটা সীমা আছে মানুষের। প্রয়োজনের বাহিরে নিজেকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিয়া মাঝে মাঝে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতে হয় তাহাকে। সেই মুহূর্তে নিজের

বহুল প্রসারিত সত্তাটাকে তাহার সংকুচিত করিয়া আনিতে হয়, একটি কেন্দ্র-বিন্দুর চারিদিকে নিজেকে ঘন করিয়া সে আবদ্ধ রাখিতে চায়। বহুদিনের অতিরিক্ত আত্ম-প্রসারের ক্লান্তি তাই আজ নবাগতার সীমানাতে আসিয়াই বিশ্রাম খুঁজিতেছে। সেই কারণে মেয়েটির প্রতি তাঁর মনোযোগ যে একটু বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে বিস্ময়বোধ করিবার কিছু নাই।

আজ স্ত্রীর কথা খুব বেশি করিয়া তাহার মনে পড়িতেছে। ছয়মাস হইল সে বাড়ী ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া আছে—একবারও এমন একটু ছুটি পাইলনা যে বাড়ি হইতে ঘুরিয়া আসে। তা ছাড়া একটু আগেই হরিদাসের কাছে যা শুনিয়াছে, তাহাতে আরো কিছুদিনের মধ্যেও যাওয়াটা ঘটিয়া উঠিবে কিনা অনুমান করা কঠিন।

চিঠি আসিতেছেনা। বাড়িতে কি হইয়াছে কে জানে? এই দূর বিদেশে বসিয়া মনে উৎকণ্ঠা পোষণ করা ছাড়া কিছুই আর করিবার নাই। কয়েকটা টাকার জন্য এভাবে আত্মপীড়ন করার কোনো অর্থ হয়না। আর একটা মাস দেখিয়া না হয় চাকরীই ছাড়িয়া দিবে সে। বি-এস্-সি তো পাশ করিয়াছে—কিছু না কিছু একটা জুটিয়া যাইবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু এই যে—সামনেই কাছারী। খাওয়া দাওয়া সারিয়া দুপুরের মধ্যে কাগজপত্র সব ঠিক করিয়া নিতে হইবে—না হইলে বিকালে রওনা হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। বসিয়া দুটি দিন বিশ্রাম করারও জো নাই—এ মাসের মধ্যে তাহাকে দশহাজার টাকার কলেক্‌শন দেখাইতে হইবেই।

মুরগী-চুরির ব্যাপারটা কিন্তু ডি-সুজা এত সহজেই ভুলিতে পারিতেছিল না। খাসা বড় মুরগীটা—অন্তত আড়াই সের মাংস যে হইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। নধর পরিপূর্ণ শরীরে লালকালো পালকগুলি রোদ লাগিয়া যেন চিক চিক করিয়া দীপ্তি পাইত—দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত ডি-সুজা। ধবধবে শাদা যে বড় মুরগীটা অন্যান্য মোরগদের একান্ত লোভের বস্তু ছিল, বিপুল বাহু-বলে সেই সর্বজন-প্রিয়াকে সে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিল। নারী বীরভোগ্যা, তাহার গর্বিত আচরণে এ সত্যটা সব সময়ে প্রকাশ পাইত।

রুখিয়া যখন দাঁড়াইত—তখন একটা দেখিবার মতো বস্তু হইত সেটা। ময়ূর-কণ্ঠী রঙের দীর্ঘ লেজের গুচ্ছটি বিস্তৃত হইয়া জাপানী পাখার মতো ছড়াইয়া পড়িত—গলার পালকগুলি ফুলিয়া উঠিয়া বুকের সঙ্গে মিশিয়া যাইত, মাথার চূড়ার লাল রঙ যেন আগুনের মতো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সকাল বেলায় যখন বাড়ীর প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করিত, তখন কাহার সাধ্য ঘুমাইয়া থাকিবে! সে তীক্ষ্ণ তীব্র চীৎকারে বাড়ী শুদ্ধ সবাই তো জাগিয়া উঠিতই—দু মাইল দূর পর্যন্ত সে শব্দ ভাসিয়া যাইত।

ডি-সুজা সুতরাং আক্ষেপ করিতেছিল।

লিসি বলিল, তোমার হোলো কি ঠাকুর্দা? একটা মুরগীর শোকে কি আজ সারাদিন মুখ থুবড়ো ক'রে বসে থাকবে?

—একটা—একটা মুরগী! একে তুই এই ব'লে উড়িয়ে দিতে চাস? এ রকম একটা মুরগী যে লক্ষটার সমান। ক'জনের এমন মুরগী আছে খোঁজ করে ছাখ্ দিকি। তা ছাড়া কদিন বাদে গঞ্জালেস্ আসবে, ভেবেছিলুম, তখন ওটাকে কাজে লাগাব, তা আর—

রোষে অভিমানে কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল ডি-সুজার।

লিসি কহিল, তাই বলে তুমি জোহানের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে কেন?

জ্বলিয়া উঠিল ডি-সুজা।

—জোহান! ওকে তুই বুঝি নিরীহ ভালো মানুষটি ভেবেছিস, তাই না? আমি ক'দিন থেকেই দেখেছি মুরগীটার দিকে ও প্রায়ই আড়চোখে তাকায়। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।

লিসি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ও মুরগীটার দিকে যে একবার তাকাত, তার ওপরেই তো তোমার সন্দেহ হ'ত ঠাকুর্দা। তার চেয়ে এ বরং ভালোই হয়েছে—এখন অন্তত রাত্তিরে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

ডি-সুজা বলিল—হয়েছে, থাম্ থাম্। আজকাল দেখছি, জোহান ছোঁড়াটার ওপর তোর মন ফিরেছে। খবর্দার বলছি, ওকে কক্ষনো আমার বাড়িতে ঢুকতে দিবিনে। ঢুকলে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব—এই বলে রাখলুম।

মুহূর্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল লিসির মুখ। পর্তুগীজের মেয়ে—কিন্তু ভিতরে খানিকটা মগের রক্ত আছে বলিয়াই নাকটা একটু খর্বাকার এবং ভ্রূরেখা অপেক্ষাকৃত বিরল। সবটা মিলিয়া কেমন একটা অপরিচিত বৈশিষ্ট্য আছে সে মুখে। তাই সে রাগ করিলে কেন যেন ডি-সুজার মতো অসংযমী মানুষও ভয় পাইয়া যায়।

লিসি বড় বড় পা ফেলিয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল এবং ডি-সুজা খানিকক্ষণ রহিল একেবারে গুম্ হইয়া বসিয়া। বাস্তবিক, এ সত্যটা তাহার কাছে আর চাপা নাই যে লিসির আকর্ষণটা জোহানের দিকে ক্রমশই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। সময় অসময়ে জোহান এ বাড়িতে আসিয়া জাঁকাইয়া বসে, পান চিবায় এবং আরো কতটা যে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ডি-সুজা অনুমান করিতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে বাহির হইতে সে যখন বাড়িতে আসে, হয়তো দেখে জোহান লিসির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া অত্যন্ত বেশি পরিমাণে হাসিতেছে। দেখিয়া ডি-সুজার মনের শেষ প্রান্তটা অবধি জ্বলিয়া যায় যেন। তবু কিছু বলিবার জো নাই। জোহান ছোটবেলা হইতেই এ বাড়িতে আসে যায়, লিসির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে। তা ছাড়া লিসির চ্যাপ্টা নাক এবং বিরল ভ্রূর উপর দিয়া যখন ক্রোধের দীপ্তি ছড়াইয়া পড়ে, তখন ডি-সুজা কেন যেন অত্যন্ত অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত বোধ করিতে থাকে।

তবু নিতান্ত মনের জ্বালাতেই সে লিসির মুখের উপরে এতবড় কথাটা বলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে। একেই তো মুরগীটা খোয়া যাইবার ফলে ক্ষোভে দুঃখে তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর জোহানের প্রতি লিসির এই পক্ষপাতের মতো অসহ্য ব্যাপার আর কিছু নাই। পাত্র হিসাবে জোহান নিতান্ত অযোগ্য নয়, কিন্তু দিনের পর দিন যে সে অধিকার বিস্তার করিয়া ডি-সুজার মন হইতে লিসিকে ছিনাইয়া লইতেছে এ অপরাধ ক্ষমা করিবার নয়। বিশেষ করিয়া মুরগী চুরির সন্দেহটা সেই জন্যই জোহানের উপর তাহার বেশি করিয়া পড়িয়াছে।

বাইরের দরজায় কয়েকটা ঘা পড়িল।

ডি-সুজা বলিল, কে ?

দরজার পথে একজন বর্মি মূর্তি দেখা দিল। ইহাদের বড় নৌকাটাই আজ সকালে আসিয়া ভিড়িয়াছে। ডি-সুজা সুপারীর কারবার করে, তাই সুপারীর সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাইবার জন্যই সে এখানে আসিয়াছে বোধ হয়।

চকিত হইয়া ডি-সুজা বলিল, তোমরা কখন এলে ?

বর্মিটি হাসিল। পালিশ করা তামার উপর চিত্রকরা মুখ, সে মুখে এতটুকু ভাবের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করা যায় না। মনের অসংখ্য ওঠা-পড়া তাহার বাহিরের অবয়বে আসিয়া যেন একটি রেখাও আঁকিয়া দিতে পারে নাই। পাথরের একটা প্রতিমূর্তির উপর যেন একটুকরা যান্ত্রিক হাসি ফুটিয়া উঠিল।

সে বলিল, কাল সকালে।

ডি-সুজা চারদিকে একবার তাকাইল। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়া বাহিরের কবাটটায় শক্ত করিয়া খিল আঁটিয়া দিয়া বলিল, ভিতরে এসো।

দুইজনে ঘরে ঢুকিল। অত্যন্ত সাবধানে ডি-সুজা ঘরের সমস্ত দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিল। আধা-অন্ধকারে ভরিয়া গেল ঘরটা। এককোণে স্তূপাকার রাশীকৃত রসুন হইতে উগ্র খানিকটা গন্ধ উঠিয়া নিরুদ্ধ আবহাওয়াটার মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেরোসিনের একটা ছোট ডিবা আনিয়া জ্বালিল ডি-সুজা। ঘরময় একটা বিচিত্র নীলাভ আলো ছড়াইয়া পড়িল—এবং তাহার আভাতে বর্মির ঘষা তামায় তৈরী মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকমে নৃশংস দেখাইতে লাগিল।

গলা নীচু করিয়া ডি-সুজা কহিল, তারপর কি খবর ?

বর্মিটি পেটের দিকে হাত চালাইয়া রেশমি লুঙ্গির মধ্য হইতে ভাঁজ করা একখানা চিঠি বাহির করিয়া ডি-সুজার হাতে দিল।

চিঠিটা পড়িয়া ডি-সুজা সেটাকে ডিবার শিখার মুখে ধরিল। দেখিতে দেখিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল সেখানা। ছাইগুলিকে জুতা দিয়া বেশ করিয়া মাড়াইয়া ডি-সুজা কহিল, দশ সের ?

বর্মিটি বলিল, হাঁ।

ফুঁ দিয়া বাতিটা নিভাইয়া দিয়া ডি-সুজা বলিল, এবার আশে পাশের অবস্থা গরম। একটু সাবধান হয়ে চালাতে হবে। শুনেছি, গোলমাল হবার আশঙ্কা আছে।

বর্মিটি হাসিল। আধা অন্ধকারে তাহার সে অনুভূতি-বর্জিত মুখখানা দেখা গেল না—কেবল সামনের সোনা বাঁধানো দাঁতটা যেন একবার ঝিলিক দিয়া গেল।

বলিল, হুঁ, সে ভয় খুব আছে। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে যে পুলিশ আসবে, এ প্রায় ধরে নেওয়া যায়। তবে আর দু মাস মাত্র সময়—এর ভেতরে যদি না আসে তো সাত আট মাসের মধ্যে এ তল্লাটে আর ভিড়বে না।

ডি-সুজা কিন্তু বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

—কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পুলিশ আসবে ? তা হলে তো এখন থেকেই হুঁসিয়ার থাকতে হয়।

—তা বই কি। সেই জন্যেই এটা রেখে দাও। দরকার মতো কাজে লাগাতে হবে। অন্ধকারের মধ্যেই এবার সে যাহা বাহির করিয়া আনিল, অস্পষ্টভাবে সেটাকে দেখিয়াই ডি-সুজা চমকিয়া উঠিল। হিমশীতল তাহার স্পর্শ—অন্ধকারে শাদা ছোট নলটি চিক চিক করিতেছে।

—হাঁ ভরাই আছে। একটু সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো, ছটা ঘরের একটাও খরচ হয়নি। ধরা যদি পড়িতেই হয়, তা হলে খালি খালি ধরা দেওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। দু একজনকে মেরে—তবে তো।

তাহার নীরব হাসিটা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া উঠিল। সংক্ষিপ্ত চাপা হাসি—কিন্তু মুখের কথার মতোই তাহা নিষ্ঠুর এবং অর্থপূর্ণ।

বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল ডি-সুজার। তবু হাত বাড়াইয়া সে অস্ত্রটা লইল, বলিল, আচ্ছা তাই হবে।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তা হলে আমি চলি।

তখন সন্ধ্যা বেশ ঘন হইয়া আসিতেছে। বাইরে উঠানের উপরে একরাশ সুপারী ও নারিকেলের ছায়া নত হইয়া পড়িয়াছে—স্বাভাবিকের অপেক্ষা আরো এক পোচ গভীর অন্ধকার। দরজা খুলিয়া ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্র মনে হইল দরজার দিক হইতে কেউ যেন চট্ করিয়া সরিয়া গেল।

দুইজনেই দাঁড়াইল থমকিয়া। নক্ষত্রবেগে দক্ষিণ হাতটাকে কোমরের কাছে লইয়া গিয়া বর্মিটি কঠিনস্বরে বলিল, কে গেল ?

দ্রুতগতিতে সামনে আগাইয়া গেল ডি-সুজা। সদর দরজাটা হাট করিয়া খোলা, বাহিরে হাল্কা অন্ধকারের বিস্তৃতি। তাহার মধ্যে কাহারও আভাস পাওয়া গেলনা।

রান্নাঘরের মধ্য হইতে মাংস ভাজার গন্ধ আসিতেছে।

ডি-সুজা ডাকিল, লিসি !

একটা ঝাঁজরী হাতে করিয়া লিসি বাহির হইয়া আসিল, বলিল, ডাকছ ?

—বাড়িতে কেউ এসেছিল ?

—না তো।

—সদর দরজাটা কে খুলে রেখেছে ?

লিসি অবিকৃত স্বরে বলিল, আমি। কেন কি হয়েছে ? তাহার জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি বারান্দার লণ্ঠনটার অপরিচ্ছন্ন আলোয় নবাগতের মুখের উপর ঘুরিতেছিল।

ডি-সুজা চাপা গলায় বলিল, না, কিছু হয়নি।

বর্মিটির পাথরের মতো ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ দৃষ্টিটা একবারের জন্য লিসির সঙ্গে মিলিল মাত্র। মনের অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে একটা ভয়ের আকস্মিক চমক উঠিয়া লিসির সর্বাঙ্গে যেন শিরশির করিয়া ছড়াইয়া গেল। মনে হইল, মুহূর্তের দৃষ্টিটাকেই একটা সন্ধানী আলোর মতো ফেলিয়া এই লোকটা তাহার ভিতরের অনেকখানিই দেখিয়া লইয়াছে।

বাহির হইয়া যাওয়ার সময় সে আর একবার ডি-সুজার কানের কাছে বলিয়া গেল, সাবধান থেকো, খুব সাবধান।

ডি-সুজার হাতের মধ্যে রিভলভারের কুঁদাটা পাথরের মতো ভারী আর শীতল হইয়া উঠিতেছে। তাহার কপালে জমিয়াছে দুইটা বড় বড় ঘামের বিন্দু। (ক্রমশঃ)

ভাস্কর শ্রীপ্রমোদগোপাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বাংলার নব্যচিত্রকলা সারাভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, কিন্তু ভাস্কর্য্যে বাংলা পিছাইয়া আছে। এ বিষয়ে বোম্বে অগ্রণী। আমাদের দেশে যে ক্ষমতাবান শিল্পীর অভাব আছে তাহা নহে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব আছে। অনেক দক্ষ শিল্পী সুযোগের অভাবে প্রকৃত ক্ষমতা দেখাইতে পারিতেছেন না। চিত্রকরেরা বিশেষ কোনো পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও কাজ করিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু ভাস্করের পৃষ্ঠপোষকের দরকার হয়। চিত্রকর মাঠে ঘাটে শোয়ার ঘরে যেখানে খুসি কাজ করিতে পারেন। কিন্তু ভাস্করের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তাহার একটি ষ্টুডিও বা কাজ করার ঘর চাই, তাহার কাজ ব্যয়সাপেক্ষ। সে শুধু মনের আনন্দে কাজ করিয়া যাইতে পারেনা।

আমাদের বাংলাদেশের কাজের অর্ডার বাহিরে চলিয়া যায়, এগুলি বাংলার ভিতরেই রাখা চলে। আজ একজন তরুণ শিল্পীর পারচয় দিতেছি। তিনি গভর্মেণ্ট স্কুল অফ আর্ট কলিকাতা হইতে পাশ করিয়াছেন। তিনি যশের উচ্চ শিখরে এখনো আরোহণ করেন নাই কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, তাঁহার কাজের উপর কলারসিকদের দৃষ্টি পড়িলে তাঁহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইবে।

বালকৃষ্ণ

বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন। কলিকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসএ তিনি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং চিত্র সমালোচকগণ তাঁহার কাজের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। সরাইখেলা এবং পাতিয়ালা মহারাজার সংগ্রহে তাঁহার কাজ স্থান পাইয়াছে। মার্ব্বেল পাথর ও ব্রোঞ্জ দুই কাজই তিনি করিয়াছেন। তাঁহার কাজের যে কয়টি চিত্র এ সঙ্গে দেওয়া হইল, তাহাতে তাঁহার নিপুণতা যথেষ্ট সূচিত হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

বাল কৃষ্ণ (১নং চিত্র)—এই মূর্ত্তিটি ক্রয় করিয়াছেন—পাতিয়ালার মহারাণী। তিনি এ কাজে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা দুইশত টাকা অধিক দিয়া শিল্পীকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। ইহা বেলজিয়াম কষ্টিপাথরে প্রস্তুত। দাক্ষিণাত্যের ঢংএর সঙ্গে বাংলার শিল্পনীতি ইহাতে যেন মিশ খাইয়াছে। বহু রাজন্যবর্গ এই মূর্ত্তিটির প্রশংসা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, শিল্পী উড়িষ্যার কোণারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া করিয়াছেন।

ধুম্নরী

ও সাধনা লব্ধ জীবনের বিকাশ দেখা যায়। অন্তচিত্রগুলিতে চিন্তাকুল, বৈরাগী, ধুম্নরী—শিল্পীর বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ভাস্কর্য্যের

মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ নিরত শিল্পী—প্রমোদগোপাল

বৈরাগী
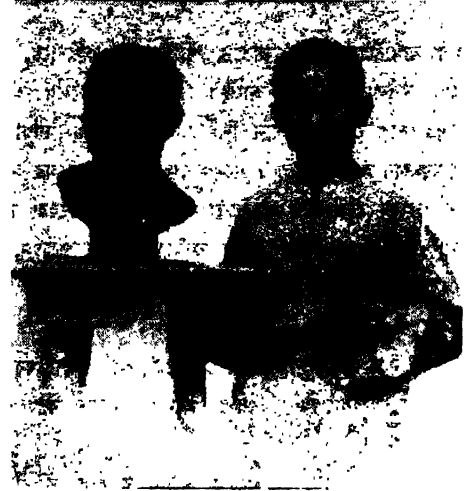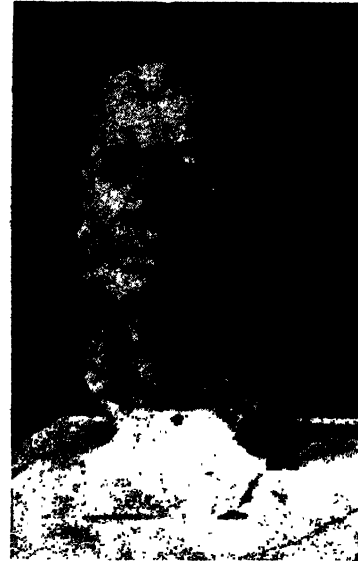
স্যার পি, সি, রায়ের চিত্র (২নং চিত্র)—ব্রোঞ্জের মূর্ত্তি—একটি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতির উদাহরণ। মনীষী ও বিজ্ঞান সাধকের বৈশিষ্ট্য যে কোন কাজ তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে পারিবেন। তাঁহার সাফল্য কামনা করি।

নবীন ও প্রবীণ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তরুণের চোখে আলো করে ঝলমল
দেখিতে না চায়, করিতেই চায় কিছু,

প্রবীণের ক্ষীণ আঁখি তারা অচপল
দেখিয়া শুনিয়া তবে সে করিবে পিছু।

লাবণ্য ও কমল

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত বি-এ

আমার স্মৃতির দুয়ারে এসে অতিথি হ'য়েছে দুটী নারী। দুজন এসেছে দুই দেশ থেকে, দুই রূপ নিয়ে। একজন এসেছে—শান্ত জ্যোতি নিয়ে; তার "তনু দীর্ঘ দেহটী, বর্ণ চিক্কণ শ্যাম, টানা চোখ পক্ষচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত ক'রে পিছু হটিয়ে চুল আঁট ক'রে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটী একটী অনতিপক্ক ফলের মত রমণীয়।" অন্যজন এসেছে দীপ্ত প্রভা নিয়ে। তার পানে চেয়ে চোখে পড়ে শুধু সৌন্দর্য্যই, অন্য কিছু ভাববার আর অবকাশ থাকে না। পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্য যেন মূর্ত্তি ধরেছে! দুই অমর শিল্পীর মানসকন্যা তারা দুজনে; একজন 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য, অন্যজন 'শেষপ্রশ্নে'র কমল।

লাবণ্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ আষাঢ়ের মেঘসজল ঘন-ছায়াচ্ছন্ন সেই শিলং পাহাড়ের পট-ভূমিতে—যেখানে অমিতের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। তারপর গ্রন্থ-সমাপ্তিতে অমিতের সাথে যেমন লাবণ্যের পরিচয় শেষ হ'ল না, তেমনি আমাদের সাথেও পরিচয়ের শেষ হ'ল না। সে জেগে রইল আমাদের মনের গোপন সিংহাসনে।

কমলের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় যখন সুরু হ'ল, তার অনেক আগে থেকেই শিবনাথের সঙ্গে তার পরিচয় সুরু হ'য়েছে এবং গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত শিবনাথের সঙ্গে তার পরিচয় শেষ হ'য়ে গেছে কিন্তু আমাদের সাথে তা হয় নি। লাবণ্যের আরম্ভ আর শেষ—দুটোই আমাদের মনে বেশ স্পষ্ট, কিন্তু কমলের আরম্ভটা আমাদের কাছে যেমন অস্পষ্ট, শেষটাও তেমনি। তাই লাবণ্যকে আমরা যতটা সহজে বুঝতে পারি, কমলকে ততটা সহজে বুঝতে পারি না। লাবণ্যকে বুঝতে কোথাও আমাদের ভুল হবার অবকাশ থাকে না। প্রথম দর্শনেই আমরা লাবণ্যকে বুঝতে পারি এবং ক্রমে ক্রমে সে বোঝাটাই গভীর থেকে গভীরতর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কমলের বেলায় ঠিক তার বিপরীত। আমরা তাকে বুঝতে গিয়ে বার বার ভুল ক'রে বসি। প্রথম দর্শনেই কমলের কথাগুলো—"আমায় একখানা ফর্সা ধোপার বাড়ীর কাপড় দিতে ব'লে দিন" অথবা "আমি কিন্তু কারো মাথা-সাবান গায়ে মাখি নে" ইত্যাদি থেকে মনে হয় যে সে অশিক্ষিত ও অভদ্র, কিন্তু পুস্তকের ভিতরে আর খানিকটা অগ্রসর হ'লেই আমরা তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও যুক্তির দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হই এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বের ভুল ভেঙ্গে যায়। দ্বিতীয়তঃ মনে হয়, কমলের জীবনে আছে শুধু আনন্দের স্পৃহা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযম, কিন্তু যখনি আমরা তার ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হই, তখনি দেখি সেখানে সে নিরামিষাহারী এবং অতি সংযমপরায়ণ। তৃতীয়তঃ, আমরা মনে করি কমল ঘোর স্বার্থপর। আপনার সুখ এবং সুবিধা ছাড়া তার কাম্য আর কিছুই নেই। কিন্তু যখনি দেখি যে রোগীর সেবা করবার জন্য নোংরা মুচি-পাড়ায় যেতেও সে কুণ্ঠিত নয়, তখনি তার প্রতি আমাদের এ ভুল নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। তাই সহজে কমলকে বোঝা সম্ভব নয়।

কমল এবং লাবণ্য দুজনেই আধুনিকা, সুন্দরী এবং স্বাধীনা। কিন্তু কমলের অগ্রগতি লাবণ্যকেও ছাপিয়ে উঠতে চায়। লাবণ্য একা মোটর নিয়ে শিলং পাহাড়ে বেড়াতে বের হয়, আর কমল মুহূর্ত্তের আলাপে অপরিচিত-প্রায় অতিথির মোটরে চেপে তার ইচ্ছার অসঙ্কোচে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় এগিয়ে চলে।

লাবণ্য শান্তিবাহী আর কমল বিদ্রোহী। তাই লাবণ্য দেয় তৃপ্তি, আর কমল অন্তরে আনে উদ্বেগ।

লাবণ্য আর কমল দুজনেরই অন্তর গভীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ, কিন্তু তাদের ভালবাসার মাঝে কতই না প্রভেদ! লাবণ্যের ভালবাসা ব'য়ে চলেছে প্রশান্ত নদীর মত তার নির্ম্মল, শীতল বারিরাশি নিয়ে সমুদ্রের দিকে। তাই তার প্রেম-তটিনীর সলিল-সেকে দুতীরে জেগে উঠেছে তরুলতার শ্যামলিমা, ফুটে উঠেছে কত না ফুল—কত না আধফোটা কুঁড়ি। তাই লাবণ্যের ভালবাসা ছুটে চলেছে গন্ধে, গানে, ছন্দে, সুরে। তাই তার ভালবাসাকে ঘিরে জেগে উঠেছে কাব্যের সমারোহ।

কমলের ভালবাসা তো তেমন নয়! তার ভালবাসা অগ্নির উজ্জ্বল শিখা। তাকে সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের বড় অল্প। অগ্নি জ্বলে ওঠে ইন্ধনকে পুড়িয়ে, কমলের ভালবাসাও তেমনি জেগে ওঠে শিবনাথকে ঘিরে। তারপর সে-আগুনের তেজে শিবনাথ যখন ছাই হ'য়ে যায়—তার প্রয়োজন যখন যায় ফুরিয়ে, তখন সে আবার আশ্রয় করে নূতন ইন্ধনকে অজিতকে। তাই তার ভালবাসা ফুটাতে পারে না কোন ফুল, জাগাতে পারে না কোন গান। তাই তার প্রেম রচনা করতে পারে না কোন গৃহ, পারে শুধু চলতে। আমরা মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করতে পারি—দুজনার একজন ছুটে চলেছে দুর্ব্বার গতিতে—আশে পাশে যতকিছু কোমল, যতকিছু সংস্কারের প্রাকার সব ভেঙ্গে চুরে; অন্যজন এগিয়ে চলেছে শান্ত পাদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে—পথের দুপাশে জেগে উঠছে যতটুকু সুখ, যতটুকু আনন্দ সব কুড়িয়ে নিয়ে—মালা গেঁথে। কমল ভাঙ্গে, লাবণ্য গড়ে।

একটু মন দিয়ে বিচার করলেই মনে হয় কমল ভালবেসেছে কেবল ভালবাসাকেই, লাবণ্য ভালবাসার পাত্রকে ভালবেসেছে। তাই একনিষ্ঠতা বলতে যা বুঝায় কমলের ভালবাসায় তা ছিল না। তার ভালবাসা ছিল মুক্ত-ভালবাসা। সে ভালবাসা কোনদিন তাকে চিরন্তনীর শেকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে নি। তাই সে বলেছিল—"একদিন যাকে ভালবেসেছি, কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্ত্তন হবার যো নেই, মনের এই অচল, অনড়, জড়ধর্ম্ম সুস্থও নয়, সুন্দরও নয়।" কমল আপন হাতে ভাল-বাসার বন্ধনে সহজেই নিজেকে বেঁধেছে, আবার যখন প্রয়োজন হয়েছে তেমনি নিজের হাতে সহজভাবে সে বাঁধন খুলে ফেলেছে। তার বাঁধনে কোনদিন ফাঁস লাগে নি। কিন্তু লাবণ্য যখন অমিতকে ভালবাসল তখন তার সাথে সেই যে বাঁধা পড়ল সে বাঁধন আর কোনদিনই ঘুচাতে পারল না।

লাবণ্যের মনে সর্ব্বদাই এই ভয় ছিল—পাছে তার ভালবাসায় কোনদিন ক্লান্তি আসে, পাছে তার প্রেমের স্বপ্ন যায় বাস্তবের স্পর্শে চূর্ণ হ'য়ে। যদি কোনদিন তার প্রেমের অসম্মান ঘটে এই ভয়ে সে অমিতকে বিয়ে করতেও পারল না। কিন্তু কমলের মনে এ সঙ্কোচ নেই। ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য নেই তার সর্ব্বক্ষণ সতর্কতা। সে জানত—যদি তার ভালবাসা ভেঙ্গে যায়, আবার সে নূতন করে ভালবাসা গড়ে নিতে পারবে। তাতে তাঁর ভালবাসার কোন অসম্মান হবে না। লাবণ্যের ভালবাসা যে-স্বর্গ গড়ে তোলে, কমলের ভালবাসা বাস্তবের কঠিন আঘাতে তাকে ধ্বংস করে ফেলে।

লাবণ্যের জীবন ভালবাসার আনন্দে উজ্জ্বল, ভালবাসার বেদনায় মধুর। কমলের জীবন রহস্যময়। দুঃখে শোক করবার যেমন তার অবসর নেই, সুখে উল্লাস করবারও তার তেমন সুযোগ নেই। সুখ-দুঃখের দুই ধারা তার জীবনে এসে এক হ'য়ে যায়। সুখ তাকে স্পর্শ করে, কিন্তু মাতাল করতে পারে না। দুঃখ তাকে আচ্ছন্ন করে, অভিভূত করতে পারে না।

লাবণ্য এবং কমল উভয়েই শিক্ষিতা। লাবণ্যের বাবার একমাত্র

সখ ছিল বিস্তায়, মেয়েটীর মধ্যে তার সেই সখটীর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। বি-এ পরীক্ষায় সে হয়েছিল তৃতীয়। এম-এতেও তেমনি অধিকার করেছিল একটা উচ্চ স্থান। তার শিক্ষাও ছিল, কাল্‌চারও ছিল। কমলের গায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কোন ছাপ ছিল না। সে তার পিতার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল এবং তাই তাকে করেছিল অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারিণী। অনর্থক বিদ্যা জাহির করবার প্রবৃত্তিও তার ছিল না। অজিত যেদিন তাকে বলেছিল—"আপনি ইংরেজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরিজি জানাটাও ত উচিত"—সেদিন অজিতের প্রশ্নের উত্তরে কমল শুধু একটুখানি মুচ্‌কি হাসি হেসেছিল। লাবণ্যের শিক্ষা হ'য়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট নিয়মের পথে, কমলের শিক্ষা হ'য়েছিল স্বভাবের সহজ সরল পথে।

লাবণ্য আর কমল দুজনার মাঝেই ছিল দৃঢ়তা, অবিচলতা। অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, মনোরমা প্রভৃতির কাছ থেকে বহুবার যে-অপমান এসেছে তা কমলকে স্পর্শ করতে পারে নি। তেমনি লিসি সিসির অপমানও লাবণ্যকে বিচলিত করতে পারে নি। কিন্তু লাবণ্যের চেয়ে কমলের সহিষ্ণুতার পরিচয় পাই বেশী। লাবণ্য পিতার কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিল, সে আঘাত সহ্যও করেছিল। কিন্তু তার সে সহনশীলতার মাঝে ছিল অভিমান। তারপর তার জীবন লীলায়িত ছন্দেই ব'য়ে চলল। লিসি সিসির কাছ থেকে যে অপমানের আঘাত সে পেয়েছিল, তা অনায়াসে সহ্য করতে পারার কারণ ছিল। অমিতের ভালবাসা তার অন্তরকে ঘিরে রেখেছিল অচ্ছেদ্য বর্ম্মের মত। কমলের বিরুদ্ধদল ছিল লাবণ্যের তুলনায় ঢের বেশী। কমলের কাছে যত আঘাত, যত অপমান এসেছিল তা তাকে একলাই সহ্য করতে হ'য়েছিল—যখন তার পাশে ছিল না শিবনাথ, ছিল না অজিত, ছিল না কেউ।

কমলের ভিতরে যেমন আমরা পদে পদে কমলকেই খুঁজে পাই, লাবণ্যের মাঝে তেমনভাবে লাবণ্যকে আমরা পাই না। একটা রঙ্গিণ কল্পনা জাল সর্ব্বদাই লাবণ্যকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে। তাই আমরা অমিতের মানসী প্রতিমা লাবণ্যকেই স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই, প্রকৃত লাবণ্যকে বড় খুঁজে পাই না।

শেষ-প্রশ্নের কমলকে অনেকেই ঘৃণা করেন। প্রত্যেক সংস্কারের মূলে সে যে আঘাত ক'রে গেছে তার বিরুদ্ধে তাঁদের ঘোরতর অভিযোগ। এর কারণ বলতে গেলে কমলের ভাষায় বলতে হয়—"অনেকদিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষ হঠাৎ সইতে পারে না।" 'শেষ কমলের বাবাকে সাহেব আর মা-কে বাঙ্গালীরূপে উপস্থিত করার মধ্যে শরৎবাবুর একটা উদ্দেশ্য র'য়ে গেছে। কমল প্রাচ্যেরও ছিল না, পাশ্চাত্যেরও ছিল না, ছিল এ-দুয়ের সংমিশ্রণ। তাই সে সকল ক্ষেত্রেই পক্ষপাতশূন্য বিচার করতে পেরেছিল। কোনদিকে তার পক্ষপাতিত্ব ছিল না। কমল আমাদের কেউ ছিল না বলেই তার বিচার ছিল সকল সংস্কারশূন্য। নতুবা তার মনে থাকত আমাদের চিরাচরিত সংস্কারের প্রতি একটা প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা। তবে লোকে যে কমলের চেয়ে লাবণ্যকে বেশী ভালবাসে তার কারণ বোধহয় এই যে, লাবণ্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আমাদেরই আপনার শান্ত, স্নিগ্ধ, তেজস্বী, বুদ্ধিদীপ্ত বাঙ্গালী মেয়েটীকে। কিন্তু কমলের মধ্যে যাকে আমরা পাই সে প্রতিপদে আঘাত করে—আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে, আমাদের আদর্শ ও ভালবাসাকে। লাবণ্য প্রতিদিনের চির-পরিচিত চন্দ্র ; কমল হঠাৎ জেগে ওঠা একটা গতিশীল উল্কা।

শেষ কথা এই যে লাবণ্যের ভালবাসা নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় তার প্রেমাস্পদের কাছে। তার ভালবাসা জেগে ওঠে তাকেও ছাপিয়ে। তাই ভালবাসা বাঁচাবার জন্য সে নিজেকে টেনে নেয় অমিতের কাছ থেকে দূরে। কিন্তু কমলের ভালবাসা তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি, তার ভালবাসার চেয়ে সে ছিল মহৎ। কমল ভালবাসার ছিল না, ভালবাসাই ছিল তার। লাবণ্যের ভালবাসা কুসুমের সুবাস। সে বাতাসকে ভালবেসে নিজেকে তার মাঝে একান্ত ভাবে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু কমলের ভালবাসা বসন্তের তরু। সে বাতাসকে ভালবেসে নিজেকেই ফলে পত্রে সাজিয়ে তোলে, নিজেকে হারিয়ে ফেলে না। আপনাকে সে প্রতিষ্ঠিত রাখে আপনারই অক্ষুণ্ণ গৌরবে। সে-ই শুধু বলতে পারে, "কমল কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।"

প্রলয় তাণ্ডব

ডাঃ শ্রীইন্দুভূষণ রায়

ধূর্জ্জটি তাণ্ডবে মাতে ;—
শৃঙ্গনাদ উঠে,
নিশীথ তন্দ্রা টুটে,
ব্যোম—ব্যোম—রব সাথে !

বহ্নি ত্রিনয়নে জ্বলিছে ধ্বক্-ধ্বক্,
শিখা চতুর্দ্দিকে ছুটিছে লক্ লক্,
বিশ্ব দহিবারে, সৃষ্টি নাশিবারে—
বিশ্বনাথ বুঝি সাধে।

শূল ডমরু করে,
বাঘ ছাল উড়ে,
শিরসি সুরধুনী মুক্তধরে,

গলে দোলে হাড়মালা,
ভালে আধ শশিকলা,
হুঙ্কার মুখে বার বার—!

নন্দী-ভৃঙ্গী সাথে তাথৈ তাথৈ নাচে,
ভূত-প্রেতগণ অট্ট-অট্ট হাসে,
অম্বর কম্পিত, ত্রস্ত চরাচর—
বৃষভ-প্রলয়-ঘন-নাদে !

বাড়ব অনল জ্বলে,
ফাটে গিরি, মহী টলে,
দিকে দিকে শুধু হাহাকার—!

কেন এ করাল বেশ—?
কল্প কি হল শেষ—?
জলে স্থলে নভে মহামার ?

ভুজগ বন্ধন খুলিয়া জটাজুটে
খসিয়া খসিয়া উগারে কালকূটে,
সম্বর,—ত্র্যম্বক ! সম্বর নাচ, নহে
ডুবে ধরা তব পদাঘাতে !

শতাব্দীর শিল্প—সোভিয়েট্

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম-এ (লণ্ডন), এফ্-আর্-এ-আই (লণ্ডন)

"Art belongs to the people. It must have its deepest roots in the broad masses of workers. It must be understood and loved by them"—Lenin.

সোভিয়েট্ রাশিয়ায় বর্তমানে শিল্প কয়েকজন বিলাসী ব্যক্তিদের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ নয়, ইহা সমগ্র জনসাধারণের। সৌখিনতার দিন আর সেখানে নেই, সোভিয়েট্ জাতির ও সমাজের শিক্ষাদীক্ষায় শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। সোভিয়েট্ ইউনিয়নের বৃহৎ আয়তন এবং বিভিন্ন জাতির সমাবেশের দরুণ সেখানকার শিল্প সংঘবদ্ধ করার দরকার

যৌবন শিল্পী—আইভানডে

হয়ে পড়ে। তাই ১৯৩৬ সনে সেখানে "কেন্দ্রীয় শিল্প সমিতি" প্রতিষ্ঠা করা হয়। মস্কোর সবচেয়ে একটি সুন্দর বাড়ীতে শিল্প সমিতির প্রধান কেন্দ্র হয় এবং কার্ডেন্‌জেভ্‌এর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম্ম পরিচালিত হয়। এই সমিতি সমগ্র রাশিয়ার বিভিন্ন শিল্প বিভাগের সুবন্দোবস্ত করার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। সঙ্গীত, অভিনয় এবং চারুশিল্পই হচ্ছে কেন্দ্রীয় শিল্প সমিতির প্রধান অঙ্গ। সঙ্গীত ও অভিনয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, কেবলমাত্র রাশিয়ার চারু-শিল্প সম্বন্ধেই আলোচনা করব। শিল্প-রীতির মূল উদ্দেশ্যের সমস্যা-সমাধান

কিষাণ-রমণী শিল্পী—কারাখান

করাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। সেইজন্য সোভিয়েট্ ইউনিয়নে শিল্পী ও ভাস্করদের নিয়ে বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে একমাত্র শিল্প সমস্যা-সমাধানের চেষ্টাই করা হয়। এসব কেন্দ্রে বিশেষ বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করার ফলে বিভিন্ন শিল্পীরা শিল্প সম্বন্ধীয় মতবাদ এবং শিল্প শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থায় নানা রকম আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। "স্যোসিয়ালিষ্টিক্ রিয়ালিজম্" (socialistic realism) এবং "ফর্ম্মালিজম্" (Forma-

lism)এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব এই হচ্ছে স্বভাবত তাদের আলোচ্য বিষয়। বর্ত্তমানে "স্যোসিয়ালিষ্ট্ রিয়ালিজম্" হচ্ছে সোভিয়েট্ শিল্পীদের মূল
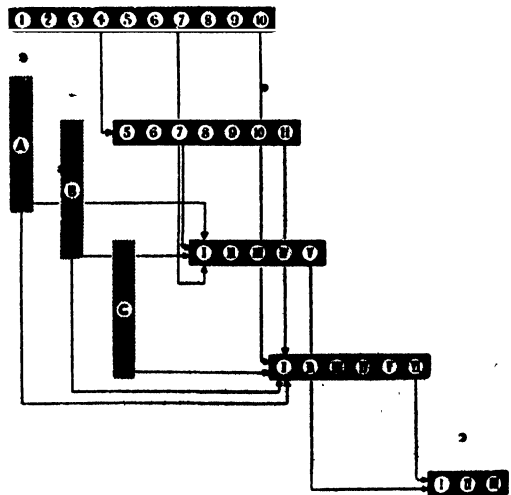
আদর্শ এবং সেখানে শিল্পে "ফর্মালিজম্‌" অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়, কেননা তাঁরা মনে করেন এটা ধ্বংসোন্মুখ বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি-প্রসূত।

এখন দেখা যাক "স্যোসিয়ালিষ্ট্‌ রিয়ালিজম্‌"টা বলতে কি বোঝায়।

পেট্রোগ্রাড্‌ রক্ষা শিল্পী—দেনেকা

সোভিয়েট্‌ শিল্প জগতে এই নতুন আদর্শটি জোর করে বাইরে থেকে আমদানী করা হয়নি। ২৫ বৎসরের গণ-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে

কারখানায় নারী-সদস্য—কৃষক মেয়ের একটি এ্যাপ্লিকে কাজ

সোভিয়েট্‌ শিল্পী এবং লেখকেরা যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন তা থেকেই উদ্ভব হয়েছে এই "স্যোসিয়ালিষ্ট্‌ রিয়ালিজম্‌" মতবাদ। প্রাচীনের গতানুগতিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলেই সোভিয়েট্‌ রাশিয়ায় এই নতুন রীতির প্রবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠতে পারে সামাজিক বিদ্রোহ অঙ্কন করাই কি শিল্পের একমাত্র কাজ? রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক ভাবধারা থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করে খেয়াল অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করাই কি বাঞ্ছনীয় নয়?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, গণতান্ত্রিক সমাজ, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৃষ্টির সমষ্টি নিয়ে এক অখণ্ডভাবে গড়ে উঠেছে এবং সেখানে যেমন নানাদিকে—কি শিক্ষায়, কি সাহিত্যে, কি শ্রমশিল্পে, কি সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে জনসেবার এক বিরাট আয়োজন চলেছে তেমনি চারু শিল্পের দায়িত্বও সোভিয়েট্‌ সমাজে খুব বেশী। ষ্ট্যালিন সোভিয়েট্‌ লেখকদের বলেছেন "engineers of the human soul." তাই "স্যোসিয়ালিষ্ট্‌ রিয়ালিজম্‌" শিল্পেও তুলে ধরতে চায় এমন একটা বাস্তব জীবন, যেখানে বুজরুকি এবং ধাপ্পাবাজী দিয়ে মানুষ ঠকানর চালাকি নেই। কিন্তু তাই বলে ব্যক্তিত্বকে সেখানে মোটেই খর্ব্ব করা হয়নি বরং প্রত্যেকটি নরনারী যাতে আপন আপন প্রতিভার পূর্ণবিকাশের সুযোগ পায় তার সুব্যবস্থা করতে সোভিয়েট্‌ সমাজ বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেনি। আবার "স্যোসিয়া-লিষ্ট্‌ রিয়ালিজম্‌" বলতে এও বোঝায় না যে আলোকচিত্রের হুবহু অনুকরণ। এ ক্ষেত্রে বাস্তবতার অর্থ সত্য এবং আদর্শের যোগাযোগ। সামাজিক বিবর্ত্তনে যেমন বাস্তবকে আদর্শ ভ্রষ্ট করা হয়নি তেমনি সেখানে আদর্শকেও বাস্তবচ্যুত হতে দেওয়া হয়নি। এ দুটির মিলনেই সোভিয়েট্‌ রাশিয়ায় গড়ে উঠেছে "স্যোসিয়ালিষ্ট্‌ রিয়ালিজম্‌"। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা দরকার যে "স্যোসিয়ালিষ্ট্‌ রিয়ালিজম্‌" যে চরম এবং চিরস্থায়ী তা সোভিয়েট্‌ শিল্পীরা কখনই মনে করে না। কেননা মার্ক্স মতবাদের গোড়ার কথাই হচ্ছে, কাল ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থার ক্রম বিবর্ত্তন।

এই আদর্শ অনুযায়ী সোভিয়েট্‌ রাশিয়ায় কিরূপ ভাবে শিল্প সৃষ্টির কাজ চলেছে তা এখন দেখা যাক। বিদ্রোহের পর সোভিয়েট্‌ ইউনিয়নের সমস্ত মিউজিয়ম ঘরগুলি জনসাধারণের জন্যে খুলে দেওয়া হয় এবং তাদের নেতারা লোকজন কবে আসবে তার অপেক্ষায় বসে না থেকে শিল্পবস্তুগুলি এমনভাবে চোখের সামনে ধরে দিলেন যে দেখতে দেখতে

মিউজিয়মগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এ হিসাবে পাশ্চাত্যের এবং আমাদের দেশের মিউজিয়ম দর্শকদের সঙ্গে রাশিয়ার পার্থক্য এই যে সেখানকার লোকেরা একটা আগ্রহ ও দরদ দিয়ে শিল্পবস্তুগুলি বুঝবার চেষ্টা করে—কোন অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের স্থান সেখানে নেই। সোভিয়েট নাগরিকদের মতে তাদের শিল্প ও ভাস্কর্য্য জাতীয় জীবনের একটা উৎস এবং প্রত্যেকটি ভাল ছবি তাদের আদরের বস্তু—যা সোভিয়েট দেশ ও সংস্কৃতিকে মহান করে তুলেছে। তারা কখনই মনে করে না যে আঁকা ছবি পৃথিবীর অন্য দেশের মত শিল্পীর নিজস্ব বন্ধুদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। সে জন্যে সোভিয়েট জনসাধারণ প্রত্যেকটি শিল্পবস্তু এমন ভাবে গ্রহণ করেছে যেন মনে হয় এগুলি তাদের নিজস্ব হাতে-গড়া জিনিষ।

তাই সোভিয়েট রাশিয়ায় কোন শিল্পীর কাজ অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে না—এসবের ব্যবস্থার ভার সাধারণত 'শিক্ষা সমবায় সমিতি'র—ওপর ন্যস্ত। বরং সোভিয়েট শ্রমশিল্প ও সংস্কৃতি অসম্ভব দ্রুতগতিতে বেড়ে চলার ফলে সেখানে শিল্পীদের চাহিদা এত বেশী যে নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করতে হয়। ছোট সময় থেকে কি ভাবে সেখানে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তার একটা নমুনা "লেনিনগ্রাড একাডেমি অফ্ আর্টস্"এর নক্সা থেকেই অনেকটা বুঝতে পারা যাবে।

প্রস্তর-মূর্ত্তি

পূর্ব্বপ্রদত্ত নক্সার সংখ্যাগুলি নির্দ্দেশ করে কত বছর স্কুলে পড়তে হবে। প্রথমে দশ বছর পর্য্যন্ত নিম্ন প্রাথমিক বিভাগে ছাত্রছাত্রীদের

হাতেখড়ি দিতে হয়। কিন্তু এর মধ্যে আবার যে সব ছেলেমেয়েরা শিল্প কাজে প্রতিভা দেখাতে পারবে তাদের প্রথম পংক্তির চতুর্থ শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় পংক্তির পঞ্চম শ্রেণীতে সরিয়ে এনে আরও এক বছর বেশী পড়ানর ব্যবস্থা করা হয়। (দ্রষ্টব্য ৫-১১)। তৃতীয় পংক্তিতে (I—V) প্রমশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাই বেশী, তাই প্রথম পংক্তির সপ্তম শ্রেণীতে আবার যে সব প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের সরিয়ে আনা হয় তৃতীয় পংক্তিতে। কেননা "এ" এবং "বি" কেন্দ্রস্থিত পংক্তিগুলিতে সাধারণ শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাই বেশী। প্রাথমিক শিল্প-শিক্ষার পর ছেলেমেয়েদের ভর্ত্তি হতে হয় চতুর্থ পংক্তির প্রথম শ্রেণীতে। "সি" কেন্দ্রস্থিত এইসব শ্রেণীতেই বিশেষ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এর পাঠ্যবিবরকে তখন বলা হয় 'একাডেমিক্ কোর্স্'। পঞ্চম পংক্তিতে অর্থাৎ সবচেয়ে নীচের পংক্তিতে যারা একাডেমির পাঠ্য শেষ করেছে তাদের শিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে দক্ষ করার জন্যে ভর্ত্তি করা হয় এবং এখানে বাইরের ছাত্রছাত্রীদেরও পড়ার সুযোগ আছে।

একাডেমিতে সাধারণতঃ কলা শিল্প, ভাস্কর্য এবং স্থপতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য স্থাপত্য শিল্পের ব্যবস্থা "ফিল্ম একাডেমির" মত সহরের অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে করা হয়েছে—যার মধ্যে মস্কোর 'একাডেমি অফ্ আর্কিটেক্চার' সবচেয়ে বিখ্যাত।

ডালে পাখী—সোভিয়েট রাশিয়ার আট বছরের একটি ছেলে কর্তৃক অঙ্কিত

"একাডেমি অফ্ আর্টস্"-এ প্রথম তিন বছরেই ছেলেমেয়েরা মোটামুটিভাবে শিল্প সম্বন্ধীয় একটা শিক্ষা পায়। তারপর চতুর্থ ও পঞ্চমশ্রেণীতে তাদের বিশেষভাবে দক্ষ হওয়ার জন্যে একটা পথ বাছলে নিতে হয়। শেষে আবার 'ডিপ্লোমা' পাওয়ার জন্যে 'থিসিস্' দিয়ে পরিষ্কারভাবে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে হয় শিল্পের কোন্ বিভাগে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। যদি তার এই ইচ্ছা কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেন তবে তাকে একাডেমির একটি গবেষণাগারে এক বছরের জন্যে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯৩৬ সনে কেবলমাত্র লেনিনগ্রাড্ একাডেমিতেই ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি হয়েছিল। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা সরকার থেকে বৃত্তি পায় এবং যারা সহরের বাইরে থেকে আসে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে করে দেন। লেনিনগ্রাড্ একাডেমির মত সোভিয়েট্ ইউনিয়নে আরও তিনটি উচ্চ শিল্প বিভালয় এবং দক্ষ শিল্পীদের জন্যে ৩৮টি স্কুল আছে। জনসাধারণের মধ্যে যারা শিল্প সম্বন্ধে বিশেষভাবে উৎসুক তাদের জন্যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার শিল্প কেন্দ্র, ৩৫ হাজার ক্লাব এবং ২২ হাজার "সমবায় কিষাণ শিল্প বিভালয়" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সোভিয়েট্ রাশিয়ায় এইভাবে ছেলেদের ধীরে ধীরে শিল্পী করে গড়ে তোলার এক ব্যাপক চেষ্টা চলেছে। যেই তারা পড়া শেষ করে বেরিয়ে এল তখনই তাদের প্রথম কর্ত্তব্য "শিল্পী সমবায়ের" সভ্য হওয়া। যদি কোন কারণে কেউ এখানকার সভ্য না হতে পারে তবে নিজস্ব একাডেমি কিম্বা বিভালয় তার চাকুরীর সন্ধান করে দিতে বাধ্য। অবশ্য সোভিয়েট্ ইউনিয়নে শিল্পীদের জন্যে হাজার হাজার পথ খোলা রয়েছে, কোন কিছুর জন্যেই তাদের বেগ পেতে হয় না।

রাশিয়া কেবল শিল্পী তৈরী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, যে সব গ্রামে এখনও প্রাচীন শিল্প ও কারিগর রয়েছে তাদের বাঁচানর জন্যে সেখানে সব রকম প্রচেষ্টা চলেছে।

জর্জিয়ার প্রাচীন শিল্প, উজ্বেগিস্থান, তাজিকিস্থান, টার্কমেনিস্থান, সাইবেরিয়া এবং মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি রিপাব্লিকের জনশিল্প রক্ষার জন্যে সরকার থেকে যেমন একদিকে বহু অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তেমনি বড় বড় জনশিল্প মিউজিয়ম গড়ে তুলে তাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাও চলেছে। নতুন শিল্পীরা যাতে জনশিল্প থেকে প্রেরণা ও উৎসাহ পেতে পারে তার জন্যে সোভিয়েট্ রাশিয়ায় প্রদর্শনী, বক্তৃতা, ছায়া-চিত্রের যে বিপুল আয়োজন করা হয়েছে তা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। সবচেয়ে মজার কথা রাশিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়নে যে সব লোকশিক্ষা এখনও বেঁচে আছে তাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য যাতে বজায় থাকে তার চেষ্টা চলেছে চারিদিকে। পল্লীর যে সব কৃষক রমণীদের শিল্পে হাত রয়েছে অথচ কাজের চাপে সময় নেই তাদের শিল্প শিক্ষার জন্যে পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা হয়েছে।

শিল্প সম্বন্ধে 'জনমত' সংগ্রহ ব্যাপারেও সোভিয়েট্ রাশিয়া কোনরূপ কার্পণ্য দেখায় নি। ধরুন আজ একটা জায়গায় নতুন একটা শিল্প গ্যালারী খোলা হবে। সংবাদ পেয়েই কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী বৃন্দ স্থানটি পরিদর্শনের জন্যে চলে যাবেন। এদের সঙ্গে আবার থাকবে খবরের কাগজের বিশেষ শিল্প-সংবাদদাতা। তখন এই কমিশনের কর্ত্তব্যনানারূপ নোট্ তৈরী করে গ্যালারীর কর্তৃপক্ষকে জানান। একজন ডিরেক্টর এবং বৈজ্ঞানিক সহকারীদের নিয়েই গ্যালারীর কর্তৃপক্ষের সৃষ্টি। এদের মিলিত মত "কেন্দ্রীয় শিল্প সমিতি"কে জানাবার পর যদি কোনদিকেই কোন আপত্তি না থাকে তবে ঐ গ্যালারী খোলা হবে।

জনসাধারণের জন্যে যখন প্রদর্শনীটি খোলা হল তখন দর্শকদের মতামত পাওয়ার জন্যে সেখানে একখানা খাতা রেখে দেওয়া হয়। কেননা বিশেষজ্ঞদের সব সময়েই 'জনমতের' ওপর লক্ষ্য রাখা চাই—কাজে যদি কোন ভুলচুক বেরিয়ে পড়ে কিংবা বাইরের লোকের কোন বক্তব্য থাকে তবে তার প্রতিকার কর্তৃপক্ষ তখনই করতে বাধ্য।

এইভাবে গণতান্ত্রিক সোভিয়েট্ রাশিয়ার মানুষকে খুসী করার জন্যে, সুন্দর করার জন্যে কি চেষ্টাই না চলেছে। তাই সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র সোভিয়েট্ ইউনিয়ন্ আজ অতি গর্ব্বের সঙ্গে বলতে পারে—

"Art for the people, the people for art." অর্থাৎ শিল্প জনসাধারণের, জনসাধারণ শিল্পের জন্য।

বনফুল

নিমাই ঘটক বাড়িতেই ছিল।

স্মিতহাস্যে নিমাই তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। নিমাইয়ের দোহারা চেহারা, বর্ণ যে খুব টকটকে ফরসা তাহা নয়, কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টিতে, চোখ মুখের গড়নে, মৃদুহাস্যে এমন একটা রূপ আছে যাহা সচরাচর দেখা যায় না। নিমাইয়ের একমাত্র পার্থিব বন্ধন ছিলেন মা, তিনি বছরখানেক পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। এখন নিমাই একা। নিজেই রাঁধিয়া খায়, ঘরের একটি গাই আছে সেটির পরিচর্য্যা করে, নিজের কাজকর্ম্ম নিজেই করিয়া লয়। তাহার খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘরটি বেশ পরিষ্কার করিয়া নিকানো, তকতকে ঝকঝকে। কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়া নিমাই বাহিরের দাওয়ায় বসিয়াছিল, শঙ্করের গাড়ি থামিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আসুন, স্কুল আজ বন্ধ"

"স্কুল দেখতে আসি নি, তোমার কাছে এসেছি"

নিমাই তাড়াতাড়ি একটি কম্বলের আসন বিছাইয়া দিল। শঙ্কর উপবেশন করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। নিমাইয়ের মতো নিমাইয়ের ঘরটিরও বেশ একটি নিরাভরণ সৌন্দর্য্য আছে। চমকপ্রদ নয় কিন্তু দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। একটি অতি সাধারণ চৌকি এবং বই রাখিবার শেলফ্ ছাড়া ঘরে অন্য কোন প্রকার আসবাবই নাই। তাহার সামান্য কাপড় জামা দড়ির আলনাতে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো। সেলফ্‌গুলি কেরোসিন কাঠের, প্রত্যেকটিতে বই ঠাসা, প্রত্যেকটি বই মলাট দেওয়া।

"ছবি-গঞ্জে মুকুন্দ পোদ্দারের বাড়ি যাচ্ছি। ভাবলাম অনেক দিন তোমাকে দেখি নি একবার নেবে যাই। একটু স্বার্থও যে নেই তা নয়—আমার সেই প্রবন্ধটা—"

"হ্যাঁ, আমার পড়া হয়ে গেছে—"

উঠিয়া একটি খাতার ভিতর হইতে একটি লম্বা খাম বাহির করিল এবং খামের ভিতর হইতে প্রবন্ধটি বাহির করিয়া শঙ্করকে দিল। বেশ যত্ন সহকারেই প্রবন্ধটি রাখিয়াছিল, বোঝা গেল।

"কোন বক্তব্য আছে এ সম্বন্ধে?"

"আমার বেশ ভালই লেগেছে। তবে—"

স্মিতমুখে নিমাই চুপ করিয়া গেল।

"তবে কি—"

"কেবল—একটু মানে—"

"অত ইতস্তত করবার দরকার কি, বলেই ফেল না"

"সাহিত্যের পূর্ব্বে কোনরকম বিশেষণ বসাতে আমার যেন কেমন একটু লাগে। এমন কি "জাতীয়" "স্বদেশী"—এই সব বিশেষণও"

"প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে যখন এক একটা করে' বৈশিষ্ট্য রয়েছে তখন তা অস্বীকার করি কি করে' বল?"

"আমার অবশ্য বেশী বিদ্যে নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রত্যেক সাহিত্যেরই আসল বৈশিষ্ট্য তা চিরন্তন মানুষের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্খার সহৃদয় আলোচনা—কোন বিশেষ দেশের মানুষের নয়—"

"তা ঠিকই। ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু প্রত্যেক দেশের মানুষের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্খা মূলত এক হলেও বাইরে সে সবের প্রকাশ দেশে দেশে একটু ভিন্ন নয়? এই যেমন ধর আমাদের দেশের একজন নারী আর পাশ্চাত্য দেশের একজন নারী। উভয়েই নারী বটে—কিন্তু একজনের কালো রূপ, মাথায় খোঁপা, পায়ে আলতা, পরণে শাড়ি, নাকে নাকছাবি, মুখে পান, চোখের কালো তারায় সভয় সলজ্জ দৃষ্টি, আর একজনের ধপধপে শাদা রং, মাথার চুল ছাঁটা, পায়ে জুতো, পরণে স্কার্ট, নাকে পাউডারের গুঁড়ো, মুখে লিপ্‌ষ্টিক, চোখের নীল তারায় নির্ভয় কৌতূহল দৃষ্টি। দুজনেরই মন বিশ্লেষণ করলে উভয়-ক্ষেত্রেই হয়তো চিরন্তনী নারীকে দেখা যাবে—কিন্তু দুজনের বাইরের রূপ আলাদা। সাহিত্যেরও তেমনি একটা বাইরের রূপ আছে। তাছাড়া যে মানুষ সাহিত্যের প্রধান উপাদান সেই মানুষের আশা-আকাঙ্খা-আদর্শ সব দেশে সমান নয়, ভাল-লাগা মন্দ-লাগার রূপ নানাদেশে নানারকম—তাই—"

"আপনি বাংলার জাতীয় সাহিত্যের এমন কি রূপ দেখাতে পেরেছেন যা অন্য দেশের সাহিত্যে নেই! আপনি মধুর রসের কথা বলেছেন, তা কি অন্য সাহিত্যে বিরল?"

"মধুর রস আমাদের সাহিত্যের বিশেষ রস। ওইটেই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা বীররস চাই না, অদ্ভুত রস চাই না, বীভৎস রস চাই না—যদি মধুর রসও তার সঙ্গে সঙ্গে না থাকে। ওই মধুর রসটাই আমরা ভালবাসি। বৈষ্ণব সাহিত্যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে মাধুর্য্য একদিন আপামরভদ্র সকলের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত হয়েছিল তাই এখনও আমাদের সাহিত্যের মূল সুর। শুধু রাধা-কৃষ্ণ নয়, যশোদা-গোপাল, সুবল-কানাই, বৃন্দা-চন্দ্রাবলী, এমন কি জটিলা-কুটিলা-আয়ান ঘোষও আমাদের প্রিয় —মানব-প্রেমের নানা রস-রূপের সাধনাতেই আমরা তন্ময়। ও ছাড়া আমরা আর কিছুতে আনন্দ পাই না। কালীর মতন ভীষণাও আমাদের আদরে আবদারে বিগলিতা, মহাদেবের মতন সন্ন্যাসীকেও আমরা জামাই সাজিয়েছি, দুর্গার যে রূপে আমরা মুগ্ধ তা তাঁর মহিষমর্দ্দিনী রূপ নয় তা তাঁর কন্যারূপ। দুর্গা আমাদের ঘরের মেয়ে। মধুর-রস-সমুদ্রেই সোনার তরী ভাসিয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় কবি, রাবণকে রিয়ালিষ্টিক রাক্ষসরূপ দিলে মাইকেলের কাব্য এতটা আদর পেত কিনা সন্দেহ। রাবণ শুধু যে মানুষ তা নয়—সে রীতিমত বাঙালী—"

নিমাই হাসিয়া বলিল—"কিন্তু এত সব উদাহরণ আপনি আপনার প্রবন্ধে দেন নি—"

"উদাহরণ না দিলেও যা বলেছি তাতে—আচ্ছা উদাহরণ দিয়ে দেব—বড় হয়ে যাবে বলে দিই নি—"

সহসা এই রস-আলোচনার মাঝে একটা বেসুর বাজিল।

মলিন-বসন-পরিহিত জীর্ণ-শীর্ণ একটা লোক আসিয়া শঙ্করকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

"এ আবার কে"

নিমাই ঘটক চিনিত—গ্রামেরই একজন কৃষক। উহাদের পল্লীতে শঙ্করের ব্যবস্থাতেই কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ইঁদারা প্রস্তুত করানো হইয়াছিল, কিন্তু ইঁদারাটি ইহারই মধ্যে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, পুনরায় সংস্কার করা প্রয়োজন।

"কতদিন আগে ইঁদারা হয়েছিল"

"মাস ছয়েক আগে"

"পাকা ইঁদারা ?"

"হ্যাঁ"

"ছ' মাসের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেল কি করে ? হয়েছে কি—"

"বাঁধানো পাড় ধসে' ধসে' পড়ে যাচ্ছে"

"এ রকম হবার মানে—"

মানে যে কি তাহা নিমাই ঘটক জানিত, কিন্তু সে কিছু বলিল না। সে নির্ব্বিবাদী লোক, কাহারও নামে লাগানো তাহার স্বভাব নয়। সে চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র চাষাও সভয়ে করজোড়ে চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর শঙ্কর বলিল—"আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করব। মাটির পাট দিয়েই বাঁধিয়ে দেওয়া যাবে আপাতত। তোমরাও কিছু চাঁদা তুলতে পার যদি ভাল হয়। আমরা তো একবার করে দিয়েছি, মেরামতটা অন্তত তোমাদের নিজেদের করা উচিত। আরও কয়েক জায়গা থেকে ইঁদারা ভাঙার খবর এসেছে, আমরা কত আর করি বল—"

চাষা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বাঙালী না হইলেও বাংলা বোঝে। পুরুষানুক্রমে হাতজোড় করিয়া থাকাই তাহাদের অভ্যাস। বহু কটূক্তি, বহু উপহাস, বহু প্রহার, বহু অত্যাচার সত্ত্বেও তাহারা হাতজোড় করিয়া থাকে। উহা করা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় তাহাদের নাই।

শঙ্কর বলিল—"আচ্ছা, যাও তুমি, আমি ব্যবস্থা করব"

খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। শঙ্কর পকেট হইতে ডায়েরি বাহির করিয়া ইঁদারার কথাটা লিখিয়া লইল।

ইহার পর রস-সাহিত্যের আলোচনা আর জমিল না।

শঙ্কর উঠিবার উপক্রম করিল।

"আমাকে এক গ্লাস জল দাও দিকি—খেয়ে বেরিয়ে পড়ি"

নিমাই উঠিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে ছোট একখানি চকচকে কাঁসার রেকাবিতে চারটি গুড়ের বাতাসা ও একগ্লাস জল লইয়া আসিল।

"এ আবার কেন"

ঈষৎ হাসিয়া নিমাই বলিল, "কুন্তলাদিদি বলেছেন শুধু জল কাউকে দিতে নেই"

"কুন্তলাদিদিটি কে"

"আমাদের হরি'দার স্ত্রী। কুন্তলাদির কথা শোনেন নি ?"

"খুব শুনেছি। তাঁর শিষ্য হয়েছ না কি"

নিমাই স্মিতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল—"শিষ্য না হয়ে উপায় নেই। বড় ভাল লাগে তাঁকে—সত্যিই ভক্তি হয়"

"কেন কি দেখলে তাঁর মধ্যে"

"তিনি সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর এম-এ, অথচ তাঁর জীবন এত সরল অনাড়ম্বর যে এমন আর আমি দেখিনি, কল্পনাও করিনি"

"উৎপলের স্ত্রী সুরমাও খুব সরল অনাড়ম্বর, সে-ও লেখাপড়া কিছু কম জানে না"

"তিনি বড় লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ—তাঁর কথা ছেড়ে দিন—"

"কেন বড়লোক বলে' অপরাধটা কি হল !"

"অপরাধ নয়। বড়লোকের পক্ষে অহমিকাটা ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু দারিদ্র্যের অহমিকা ত্যাগ করা সত্যিই বড় শক্ত, কারণ ওইটুকু অবলম্বন করেই দরিদ্রেরা মাথা উঁচু করে' থাকে। আমার মনে হয় কুন্তলাদি'র সেটুকুও বোধহয় নেই। অথচ তাঁর যা গুণ তাতে অহঙ্কারী হলে বেমানান হত না—"

"কি গুণ ? এম-এ ডিগ্রিটা ?"

"তাতো আছেই। কিন্তু ডিগ্রি সত্ত্বেও তিনি সংসারের সব কাজ হাসিমুখে করেন—রাঁধেন, বাসন মাজেন, বড়ি দেন, চরকা কাটেন, পিসিমার সেবা করেন, আবার ওর মধ্যে একটু লেখাপড়াও করেন—"

"তা যদি হয় তাহলে তো—"

"সত্যিই অদ্ভুত। আলাপ নেই আপনার সঙ্গে ?"

"আলাপ করতে সাহস করি নি—"

নিমাই আবার খানিকক্ষণ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল—"চলুন একদিন আমার সঙ্গে। তাঁর পরদা নেই, আর হরিদা কে তো চেনেনই—"

"আচ্ছা, পরে দেখা যাবে এখন চলি—"

শঙ্কর আর দেরি করিল না, ছবি-গঞ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

ছবি-গঞ্জের মুকুন্দ পোদ্দার একজন বর্দ্ধিষ্ণু মহাজন। বেশ বিস্তৃত তেজারতি কারবার আছে। দরিদ্র বিপন্ন চাষীদের চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায়। উৎপল ও শঙ্করের এই সব জনহিতকর প্রচেষ্টার সহিত তাঁহার সহানুভূতি না থাকিবারই কথা, কিন্তু বাহির হইতে মনে হয় তিনি যেন এ সব ব্যাপারে অত্যুৎসাহী। তাঁহার ব্যবহার এবং আচরণ দেখিলে তাঁহার এ উৎসাহকে চট্ করিয়া মেকি বলিয়া মনে হওয়া শক্ত। ছবিগঞ্জে—পাঠশালা স্থাপনের জন্য তিনি ঘর দিয়াছেন, অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, নৈশবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নিজের বৈঠকখানাটি দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় করিবার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত মনোভাবটি—সম্ভবত তাঁহার অজ্ঞাতসারেই—তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী। মুখে তিনি অতি-বিনয়ী। শঙ্করের সহিত দেখা হইবামাত্র গদগদ স্বাগত-সম্ভাষণের আতিশয্যে তাহাকে অস্থির করিয়া তোলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যাহা ব্যক্ত করে তাহা মোটেই সম্মান-জ্ঞাপক নহে। সে দৃষ্টিকে ভাষায় অনুবাদ করিলে অনেকটা এইরূপ দাঁড়ায়—"থাম ব্যাটা,

তোকে দেখাচ্ছি! দেশ উদ্ধার করতে এসেছেন ইস্ ভারি আমার নায়েক—"

যদি ইহাই মুকুন্দ পোদ্দারের মনের কথা হয় তাহা হইলে বাহিরের আচরণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য কোথায় এ কথা যাঁহারা ভাবিবেন তাঁহারা মুকুন্দ পোদ্দার জাতীয় লোকদের সম্যকরূপে চেনেন না। চিনিলে ইহা তাঁহাদের অজ্ঞাত থাকিত না যে ইঁহাদের মনের কথার সহিত বাহিরের আচরণের প্রায়ই গরমিল থাকে। শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য সৎ অসৎ কোনপ্রকার কার্য্য করিতেই ইঁহারা পশ্চাৎপদ হন না। এ ক্ষেত্রে মুকুন্দ পোদ্দারের মনোভাব অনেকটা এই রকম—"ও, তোমরা মহত্ত্ব আস্ফালন করিয়া আমাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিবে ভাবিয়াছ—দেখা যাক কে কাহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিতে পারে—টাকা আমারও কিছু কম নাই—টাকা দিয়া স্কুল পাঠশালা আমিও করিয়া দিতে পারি এবং করিয়া দিবও। তোমরাই যে উদারতার অভিনয় করিয়া সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবে—আর আমি পিছনে পড়িয়া থাকিব তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। দেখাই যাক না তোমাদের দৌড়টা কতদূর"

মুকুন্দ পোদ্দার নাতিস্থূল পুষ্টকান্তি ব্যক্তি। বেশ কুচকুচে কালো রং, মাথায় এককালে ঢেউ-খেলানো এলব্যার্ট টেড়ি ছিল এখন টাক পড়িয়াছে। গলায় সোনার হার, বাহুমূলে সোনার তাবিজ, অনামিকায় নীলা-বসানো সোনার আংটি, এমন কি সামনের কয়েকটি দাঁতেও সোনা-লাগানো।

শঙ্কর যখন ছবি-গঞ্জে পৌঁছিল তখন প্রায় অপরাহ্ণ। মুকুন্দ তাকিয়া ঠেস দিয়া নিত্যসঙ্গী কাঠের হাতবাক্সটির নিকট বসিয়াছিলেন। শঙ্করকে দেখিবামাত্র সোচ্ছ্বাসে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

"আসুন দেবতা, আসুন আসুন—সকাল থেকে আপনার কথাই ভাবছি বসে' বসে'। ওরে গোবরাকে খবর দে—বল বাবু এসেছেন—চা-টা আনুক—"

"আমার একটু দেরি হয়ে গেল—"

"এমন আর কি দেরি হয়েছে দেবতা। আপনারা পাঁচ কাজের মানুষ, আমাদের মতো নিষ্কর্ম্মা তো ন'ন—হে হে হে হে—পাঁচ জায়গায় ঘুরতে গেলেই দেরি একটু আধটু হয়েই থাকে—"

মুকুন্দর চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল—মুখে বিনীত হাস্য।

"আপনাদের পাঠশালা কেমন চলছে—বলুন"

"চলছে। ভালই চলছে—বলতে হবে, গতকাল গুটিদশেক ছাত্তর জুটেছিল, না হে ভজহরি"

পাশের ঘর হইতে ভজহরি উত্তর দিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা জুটেছিল—"

"মাত্র দশজন ?"

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

"এতেই অবাক হচ্ছেন দেবতা! আমার বিবেচনায় ওই দশ জনই যথেষ্ট আপাতক্—ওই শেষ পর্য্যন্ত টেঁকে কি না দেখুন—"

"এখানে এত কম ছেলে হবার কারণ কি, অন্য অন্য গ্রামে তো এত কম হয় নি—"

"এটা যে চাষার গ্রাম দেবতা, এ বেটা ছাতুখোর চাষারা লেখাপড়ার মর্ম্ম কি বুঝবে বলুন। বলে কি জানেন, বলে যে ছেলেকে যদি পাঠশালায় পাঠাই তাহলে আমাদের গরু চরাবে কে—এই যাদের মতিগতি, তাদের আর কতদূর কি হবে বলুন—"

মুকুন্দ পোদ্দারের মুখে হাসি এবং চোখে অগ্নির আভা ফুটিয়া উঠিল।

"তবু চেষ্টা করতে হবে বই কি"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই—চেষ্টা করব বই কি—চেষ্টা তো করছিই। নাইট স্কুল খোলবার ঘর সব সাফ-সুতরো করিয়ে রেখেছি। মাষ্টারের জন্য একটা মোড়া, ছাত্তরদের জন্যে মাদুর সতরঞ্চি—সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। কথা দিয়েছি যখন তখন সে কথার নড়চড় করব না। আসুন না, দেখবেন—"

এমন সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কথাবার্ত্তায় বাধা পড়িয়া গেল। পিছনের বারান্দায় কে যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভজহরি সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিল শোনা গেল—"আরে মোলো—রোতা কাহে—"

"কাঁদছে না কি মাগী। এতো আচ্ছা এক ফৈজত হল দেখছি—"

তাহার পর শঙ্করের দিকে ফিরিয়া মুকুন্দ বলিলেন, "গরীব চাষাদের উদ্ধার করবার জন্যে আপনারা ব্যাঙ্ক খুললেন, কিন্তু এ বেটারা আমাদের পাছ ছাড়বে না। আমাদের সুদ বেশী, সোনা রূপো বন্ধকী না রেখে আমরা ধার দিই না, তবু আমাদের ছাড়বে না। ওদের যত বুঝিয়ে বলি—তুম লোগকা উদ্ধার কা বাস্তে উৎপলবাবু ব্যাংক খুলা হ্যা—হুঁয়াই যাও—কিছুতে যাবে না—"

মুকুন্দ পোদ্দারের চোখের দৃষ্টিতে যেন আগুনের হলকা ছুটিতে লাগিল।

"যায় না কেন"

"যাবে কি করে'? আপনারা তো জমিজরাৎ না থাকলে টাকা দেবেন না। এ মাগীর না আছে জমি, না আছে জরাৎ। জন খেটে খায়"

"স্বামী নেই ?"

"স্বামীটিকে পূর্ব্বেই খেয়েছেন। সে দিকে সৌভাগ্যবতী। একটি কাঠ-ব্যাটা ছিল, তিনি বিয়ে করে' বউ নিয়ে সরেছেন শহরে—"

"কাঠ-ব্যাটা কি—"

"সৎ ছেলে। এতদিন এদেশে আছেন কাঠ-ব্যাটা কাকে বলে জানেন না, অথচ আপনারা এ দেশ উদ্ধার করতে চান!"

শঙ্কর একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মনের কথা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে মুকুন্দও ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি পাকা লোক, তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনারা তো সেদিন এসেছেন আপনাদের আর কি দোষ দোব—আমি সারা জীবনটাই এ অঞ্চলে কাটালাম—'খাবুনি' কাকে বলে আমিই জানতাম না, সেদিন শিখলাম ভজহরির কাছে—দুট পরবের সময় ওরা ময়দা আর চালের গুঁড়ি দিয়ে যে 'ঠেকুয়া' তৈরি করে তাকে বলে 'খাবুনি'। জানতেন ?"

শঙ্করকে স্বীকার করিতে হইল যে সে জানিত না। ভজহরি

আবার পাশের ঘরে ক্রন্দমানা রমণীটিকে সান্ত্বনা দিল—"রোও মৎ—রো-কে কি হোগা—জেবর জোগাড় কর—তব রুপিয়া মিলে গা"

জেবর কথাটা শঙ্কর জানিত—জেবর মানে গহনা। জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের জন্যে ও টাকা চায় ?"

"একটা ল্যাংনেঙে ছেলে আছে তার বিয়ে দেবে, সেইজন্যে হাঁস্থলিটি বাঁধা দিয়ে টাকা নেবার জন্যে দমাদ্দমি করছে। এদের উদ্ধার করা কি সহজ আপনি ভেবেছেন ? হারামজাদিরা বিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয় কেন তাও তো বুঝি না। বিয়ে দিলেই তো ছেলে শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ওর কাঠ-ব্যাটা বেশ ছিল এতদিন —আমারই এখানে খাটত খুটতো—যেই গওনা করে' বউটি নিয়ে এসেছে—বাস অমনি উধাও। গওনা মানে বোঝেন তো ? দ্বিরাগমন। হাঁস্থলিটা ওজন করে' দেখেছ ভজহরি ?"

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল—"বিশ ভরি সাড়ে ন' আনা"

"গোটা দশেক টাকার বেশী দেওয়া যায় না। মাসে টাকা পিছু দু'আনা করে স্থদ দিতে হবে"

ভজহরি বলিল—"স্থদ দিতে ও রাজি আছে, কিন্তু কুড়িটা টাকা চায়"

"চাইলেই কি দেওয়া যায় ? আমার পোষানো চাই তো—"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মুকুন্দ বলিলেন—"টাকায় তিন আনা করে' স্থদ দিতে রাজি আছে ?"

"আছে"

"তাহলে দাও। কিন্তু তিন মাস যদি স্থদ না দেয় তাহলে হাঁস্থলি আর ফেরত পাবে না। বাকি টাকাটা খেটে শোধ করতে হবে। রাজি যদি হয় দাও—ছাড়বে না যখন উপায় কি"

"বুঝা ?"

ভজহরি তাহার নিজস্ব হিন্দীতে মেয়েটিকে মুকুন্দর প্রস্তাব বুঝাইতে স্থরু করিল।

মুকুন্দ বলিল—"চলুন আমরা ততক্ষণ ঘরটা দেখে আসি। একটা লণ্ঠন দরকার হবে, সেটা এখনও জোগাড় হয়ে ওঠেনি। আপাতক তেলের ডিব্‌রিই জলুক একটা—অ্যাঁ, কি বলেন আপনি"

"লণ্ঠন আমি কালই পাঠিয়ে দেব"

মহত্ত্ব-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইবার লোক মুকুন্দ নন।

"পাঠিয়ে দেবার দরকার নেই। এতই যখন করতে পেরেছি একটা লণ্ঠনও দিতে পারব। ও ভজহরি, লণ্ঠন একটা চাই—বুঝলে—"

পাশের ঘর হইতে উত্তর আসিল—"যে আজ্ঞে"

উভয়ে উঠিয়া নৈশ-বিদ্যালয়ের ঘরটি দেখিতে গেলেন।

৪

করেক দিন পরে শঙ্কর মুরারিপুর নামে আর একটা গ্রাম হইতে ফিরিতেছিল। সেখানে শঙ্করের স্থাপিত ডিস্‌পেন্সারির নূতন ডাক্তারবাবুটির সহিত স্থানীয় কয়েকজন বেহারীদের মনোমালিন্য হইয়াছিল। বেহারীদের ইচ্ছা ছিল একজন বেহারীই নিযুক্ত করা। বাঙালী ডাক্তারবাবুটির সহিত নানা ছুতায় তাই তাহারা কলহ করিতেছে। ডাক্তারবাবুটিও কলহ-প্রবণ এবং বেহারীদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত, স্থতরাং কিছুতেই নিজেকে তাহাদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। মুরারিপুরের স্থানীয় অধিবাসীরা সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছে। শঙ্কর তাহারই তদন্ত করিতে গিয়াছিল। সাময়িকভাবে মিটমাট হইয়া গেল বটে, কিন্তু অনুরূপ ঘটনা পুনরায় ঘটিবার সম্ভাবনাটা রহিয়া গেল। আসল সমস্যার সমাধান হইল না।

……রাত্রি হইয়াছে। শুক্লা অষ্টমীর চন্দ্র পশ্চিম দিগন্তে হেলিয়া পড়িয়াছে, তাহার কাছে দুই একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রও জ্বলিতেছে। চক্রবাল-রেখা-সংলগ্ন বৃক্ষশ্রেণী পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো দেখাইতেছে। মেঠো রাস্তায় গরুর গাড়ি চলিতেছে, মেঠো স্থরে কোথায় যেন একটা বাঁশের বাঁশি বাজিতেছে। মুশাই নীরবে গাড়ি হাঁকাইতেছে। শঙ্কর ভাবিতেছে।

ভাবিতেছে—এই বেহারে তাহার এবং উৎপলের বাবা বহুকাল পূর্ব্বে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। বেহারই তাহাদের জন্মভূমি এবং তাহারাও নানা দেশ ঘুরিয়া অবশেষে বেহারে আসিয়াই পুনরায় নিজেদের জীবন আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের কি বাংলা দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত ছিল ? অনেক হিতৈষী তাহাকে এবং উৎপলকে উপদেশ দিয়াছিলেন—দেশের উপকার করিতে হইলে বাংলা দেশের উপকার কর গিয়া। এ দেশে জনহিতকর কিছু করা ভস্মে ঘি ঢালার মতোই নিরর্থক। বেহারের প্রতি শহরে শহরে প্রতি গ্রামে গ্রামে খোঁজ করিয়া দেখ—যেখানেই বাঙালী গিয়াছে সেখানেই তাহারা কিছু না কিছু জনহিতকর কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু বেহারীরা কি তজ্জন্য বাঙালীদের প্রতি কৃতজ্ঞ ? মোটেই না। "বাঙালী-বেহারী ফিলিং" নামক বিষটি ক্রমশ উগ্রতর হইয়া বরং প্রবাসী-বাঙালীদের জীবন দিন দিন দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। ভবিষ্যতে আরও তুলিবে। স্থতরাং এখানে নূতন করিয়া জীবন পত্তন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শঙ্কর কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-বেহারী, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য প্রভৃতি নানা বিভাগে জাতিকে বিভক্ত করিয়া খণ্ড-কলহ করিলে আমাদের কোন দিনই মঙ্গল নাই। যাহা অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে-প্রাণে বুঝিয়াছি তাহাকে কেন প্রশ্রয় দিব ? বেহারে বাঙালী-বেহারী ফিলিং আছে বলিয়াই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কর্ত্তব্য সেই ফিলিং-সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করা। তল্পিতল্পা গুটাইয়া প্রস্থান করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না, কাপুরুষতা প্রকাশ করা হইবে মাত্র। প্রতিশোধ বাসনায় যদি বঙ্গদেশ হইতে বেহারী বিদূরিত করিবার আন্দোলন করা যায় তাহাতে এই ফিলিং বৃদ্ধিই পাইবে কমিবে না। ভাবিয়া দেখা উচিত কি করিয়া এই 'ফিলিং' দূর করা যায়। ইহার উত্তর—ভালবাসিয়া। তুমি যদি সত্যই ইহাদের ভালবাসিতে পার তাহা হইলে এ 'ফিলিং' আর থাকিবে না। উপকার করিলেই লোকে কৃতজ্ঞতা অনুভব করিবে ইহা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ বটে কিন্তু মানুষ সব সময় নীতিশাস্ত্র মানিয়া চলে না—সে মানিয়া চলে নিজের হৃদয়কে। সেই হৃদয় যদি জয় করিতে পার তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান হইবে। হৃদয় জয় করিবার মন্ত্র ধর্ম্মনীতি নহে, রাজনীতি নহে—ভালবাসা। এই ফিলিং-প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বিবেচ্য। এই ফিলিং কাহাদের মধ্যে ? চাকুরি-প্রার্থী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে।

তাহারাই এই বিষ চতুর্দ্দিকে ছড়াইতেছে। আমরা—বাঙালীরা যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে আমরা কেহ চাকুরি করিব না তাহা হইলে বোধহয় আপাতত অবিলম্বে এ সমস্যার মূল ছিন্ন হয়। চাকুরি জীবিকা-অর্জ্জনের একটা উপায় বটে কিন্তু একমাত্র উপায় নয়—প্রশস্ত উপায় তো নয়ই। মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, সিন্ধি, কচ্ছি, গুজরাটি, ইহারা তো নানা প্রদেশে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে—বেহারী-মাড়োয়ারি অথবা বেহারী-কচ্ছি ফিলিং তো কোথাও হয় নাই। চাকর হইবার জন্য যে সব তথা-কথিত শিক্ষিত বাঙালী বেহারীরা রাজদরবারে ভীড় করে এই ফিলিং তাহাদের মধ্যে।

অনেকে প্রশ্ন করেন—চাকরি না করিলে বাঙালীর ছেলে করিবে কি? চাকরি ছাড়া আর কোন্ কর্ম্ম করিবার তাহারা উপযুক্ত? তা ছাড়া, অন্যায়ভাবে (এমন কি কংগ্রেস মিনিষ্ট্রির সময় বিশেষ করিয়া) তাহারা চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইবে কেন? চাকুরির স্বপক্ষে তাঁহাদের আরও যুক্তি আছে। তাঁহারা মনে করেন চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না এবং তাহা না থাকিলে যে কালচারের গর্ব্বে আমরা স্ফীত তাহার চাকচিক্যও ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে। এমন কি তাঁহারা এ আশঙ্কাও করেন যে আমাদের সাহিত্য আমাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সংস্কার সমস্তই নাকি বিনষ্ট হইবে যদি আমাদের চাকুরি না থাকে।

বাঙালী-সন্তান চাকুরি ছাড়া অন্য কোন প্রকার কাজ করিতে অপারগ একথা স্বীকার করিতে লজ্জা হয় এবং সম্ভবত সে কথা সত্যও নহে। জীবিকা-অর্জ্জনের ভিন্ন পন্থায় এখনও তাহারা চলিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সে সব পথে চলিবার জন্য যে ধরণের চরিত্র প্রয়োজন বর্ত্তমানে হয় তো তাহাদের সে চরিত্র নাই। কিন্তু সেজন্য হতাশ হইলে চলিবে না। কেরাণীগিরি করিবার মতো চরিত্রও যে বাঙালীর ছিল না ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। সাধনার দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট কেরাণী হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। সাধনা করিলে আবার তাহারাই উৎকৃষ্ট বণিক অথবা চাষী হইবে—তাহাতে সন্দেহ কি। বণিক অথবা চাষীর কাজ যে ঘৃণ্য নয়, বরং দাসত্ব অপেক্ষা অধিক গৌরবজনক—এই সুস্থ মনোবৃত্তি শুধু ছেলেদের নয় ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যেও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা সময়-সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যস্ত হইলে চলিবে না, হয় তো দুই এক পুরুষকে এজন্য কষ্ট সহ্য করিতে হইবে—কিন্তু ইহাই একমাত্র সদুপায়। বাঙালীর ছেলে চাকুরি ছাড়া আর কিছু করিতে পারিবে না অতএব চাকুরি-লাভ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার হীনতা সহ্য কর, সকলের সঙ্গে কলহ কর, নানাপ্রকার জাল জুয়াচুরির আশ্রয় লও—এ মনোভাব মোটেই প্রশংসনীয় নয়। বাঙালীর ছেলে অন্যায়ভাবে চাকুরির ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে? সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পার কিন্তু চাকরি ছাড়া গ্রাসাচ্ছাদন জুটাইবার অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে আমরা অক্ষম একথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হও। বরং অন্যক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের সামর্থ্য যদি তোমার থাকে তাহা হইলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের আন্দোলন সফল হইবার আশা আছে। হীন মনোবৃত্তি চাকরের কোন আন্দোলনকেই কেহ কখনও গ্রাহ্য করে না। তাঁহারা এই অহঙ্কারকে মূলধন করিয়া আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করিতেছেন তাঁহারা শক্তিকেই খাতির করেন অন্য কিছুকে নয়। সুতরাং স্বদেশবাসীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া শক্তি সংগ্রহে মন দাও। হয় তো স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের পথেও ভবিষ্যতে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, সে বিঘ্নও শক্তির সহায়তাতেই উৎপাটন করিতে হইবে। কিন্তু সে সব দূর ভবিষ্যতের কথা। এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের নিমিত্ত নিজেদের প্রস্তুত করা। পারতপক্ষে চাকুরি আমরা করিব না—এই প্রতিজ্ঞা করিলে মনে স্বতঃই শক্তি আসিবে। এই সুস্থ সবল মনোভাবই আমাদের পরিত্রাণের এক-মাত্র উপায়। যাঁহারা মনে করেন যে চাকুরি না থাকিলে আমাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি থাকিবে না—তাঁহারা ভুলিয়া যান যে আজকাল সমাজে অর্থেরই প্রতিপত্তি, চাকুরেদের নয়। যে কালচার লোপ হইবার ভয়ে তাঁহারা অস্থির সেই সোফা-সেটি-মোটর-রেডিও-সমন্বিত পোষাক-পরিচ্ছদ-সর্ব্বস্ব ঝুটা কালচার আমাদের কালচার নয়—ওই বিদেশী বস্তু সত্যই যদি লোপ পায় তাহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছু নাই। ওই বাহ্যিক কালচার আঁকড়াইয়া ধরিতে গিয়াই আমরা আমাদের আন্তরিক কালচার হারাইতে বসিয়াছি। আতিথেয়তা, দয়া, উদারতা, আন্তরিকতা, গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিকতা, বিনয়, শিক্ষা, সাধনা প্রভৃতি যে সব মহদ্‌গুণাবলী আমাদের ভারতীয় কালচারের অঙ্গ তাহা কি এই চাকুরি-প্রার্থী অথবা চাকুরিজীবী সম্প্রদায়ের আছে? স্বার্থ ছাড়া আর কি বোঝেন তাঁহারা? তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সকলেই স্বার্থপর, যাঁহারা চাকুরি করেন তাঁহাদের স্বার্থপরতা অধীনতা-দুষ্ট বলিয়া আরও ভয়ঙ্কর। আমাদের চাকুরি না থাকিলে আমাদের সাহিত্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে এমন আশঙ্কাও অনেকে করেন। সাহিত্য প্রতিভাবান গুণীদের সৃষ্টি। প্রতিভাবান ব্যক্তি কখন সমাজের কোন স্তরে জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। সমাজের দুঃখ দারিদ্র্যই অনেক সময় বহু প্রতিভাবানের প্রতিভাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রতিভাকে লালন করা অবশ্য সমাজের কর্ত্তব্য। কিন্তু চাকুরিজীবীরা কি আমাদের দেশের প্রতিভাবানদের সত্যই লালন করেন?

কয়জন চাকুরিয়া বই কিনিয়া পড়েন? কয়জনের সামর্থ্য আছে? কয়জনের বুদ্ধি আছে? বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত কয়জন স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন? বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার স্কট ছিলেন অথবা রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়া বাঙালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—এই গর্ব্বে তির্য্যকপথে আপন অহঙ্কারের রসদ সংগ্রহ করা ছাড়া চাকুরিয়া বাঙালী বাংলা সাহিত্যের সহিত আর কি ভাবে যে সম্পৃক্ত তাহা শঙ্করের বুদ্ধির অগম্য।

বেহারের উপর রাগ করিয়া যাঁহারা বাংলা দেশে ফিরিয়া যাইতে চান তাঁহাদের কি ধারণা যে বাংলা দেশে চাকুরি অফুরন্ত? সেখানেও তো হিন্দু মুসলমান সমস্যা। সেখানেও তো চাকুরির জন্য লাঠালাঠি ধ্বস্তাধ্বস্তি এবং অবশেষে অপমান। না, চাকুরির মোহ পরিত্যাগ না করিলে বাঙালীর মঙ্গল নাই। ভারতবর্ষের যে প্রদেশেই সে থাকুক আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখিয়া মানুষের মতো যদি থাকিতে পারে তবে আর কোন সমস্যাই আপাতত থাকিবে না।

এতদিন সে যেখানে গিয়াছে চাকুরিয়া-বেশে গিয়াছে, শাসক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-রূপে হাকিমি চালে হুকুম চালাইয়াছে, লোকে তাহাদের ভয় করিয়াছে কিন্তু ভালবাসে নাই, তাহারা যে উপকার করিয়াছে সে উপকারকেও কেহ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ভালবাসা না থাকিলে কিছুই হৃদয়-গ্রাহ্য হয় না।

শঙ্করের নটবর ডাক্তারের কথা মনে পড়িল। লোকটা পাশ-করা ডাক্তারও নয়। চরিত্রে অনেক দোষ আছে। মদ খায়, চরিত্র খারাপ। চরিত্রহীনতার জন্য বহুবার বহুস্থানে লাঞ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু সকলে তাহাকে ভালবাসে। আপামর ভদ্র সকলেই তাহার প্রিয়, কেহ তাহার পর নয়। এই ভালবাসার জোর যে কতখানি তাহা সেবার নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। প্রতিপত্তিশালী ফিলিং-ওলা অনেক বেহারী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাহারা চেষ্টাও কম করে নাই—কিন্তু নটবর ডাক্তারের সহিত কেহ পারিল না। নটবর ডাক্তার দাঁড়াইয়াছেন একথা প্রচারিত হইবামাত্র সকলে তাহাকেই ভোট দিতে উদ্যত হইল। কয়েকজন বেহারী বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শঙ্করকে অবশেষে গিয়া অনেক তোষামোদ করিয়া নটবরকে এই দ্বন্দ্ব হইতে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছে। 'উইথ ড্র' না করিলে সেই নির্ব্বাচিত হইত। কই, বেহারী-বাঙালী-ফিলিং তো নটবরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই!

সহসা মুশাই কথা কহিল।

"বিশঠো রুপিয়া কা বড়া জরুরৎ পড়লো ছে—"

"কি জরুরৎ"

মুশাই চুপ করিয়া রহিল

"কিসের জরুরৎ রে—"

মুশাই এবারও কোন উত্তর দিল না, জিহ্বা ও তালু সহযোগে টকটক শব্দ করিতে করিতে গরু হাঁকাইতে লাগিল।

শঙ্কর বুঝিল প্রকৃত কারণটা বলিতে মুশাই রাজি নয়, বিশ্বাসযোগ্য একটা মিথ্যাও সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তাই চুপ করিয়া আছে। ক্রমশঃ

চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুঁথি

অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ্-ডি

এখন আর একটি শেষ প্রশ্নের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পুঁথিতে যে চণ্ডীদাসের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে ও পদাবলীর বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস, যাঁহার গানের সুর আজ বহু শতাব্দী ধরিয়া কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রাণকে আকুল করিয়া আসিতেছে—এই দুইএর মধ্যে কি সম্পর্ক? ইঁহারা কি এক না বিভিন্ন? পুঁথির পদগুলির বহুল উদ্ধার ও বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া এই প্রশ্নের যথাযোগ্য বিচার হওয়া অসম্ভব। এ সম্বন্ধে এইটুকু সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে কবিত্বশক্তির দিক দিয়া আখ্যায়িকার ও পদাবলীর রচয়িতার মধ্যে যে দুরতিক্রমণীয় ব্যবধান ছিল, বর্ত্তমান আবিষ্কারের ফলে তাহা অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। দীন চণ্ডীদাসকে তৃতীয় শ্রেণীর কবি বলিয়া আমরা বরাবর উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং বাস্তবিক তাঁহার রচনার যে নমুনা আমাদের নিকট উপস্থিত ছিল তাহাতে এইরূপ ধারণা যে অযৌক্তিক তাহা বলা যায় না। পৌরাণিক ঘটনার শুষ্ক, রসহীন বর্ণনা, ভাষার শ্লথ-শিথিল বিন্যাস, কেবল ছন্দের পাদ পূরণের জন্য অহেতুক বাক্যাবলীর বারংবার প্রয়োগ, অসংযত পরিমিতিহীন বহুভাষিতা, একই বিষয়ের ক্লান্তিকর, পৌনঃপুনিক পুনরাবৃত্তি, ভাবসংহতি ও রস-গাঢ়তার অভাব—এ সমস্ত দোষই তাঁহার রচনায় সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই শিশু-সুলভ অর্থহীন কাকলীর কবি যে মহাকবি চণ্ডীদাসের সরল, মর্ম্মস্পর্শী, ভাব-ঘন পদগুলির রচয়িতা হইতে পারেন ইহা যেন আমাদের ধারণারও অগম্য। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসে আরোপিত পুরাতন ও নূতন পদগুলি মনোযোগের সহিত পড়িলে প্রতীতি হয় তাঁহার দুর্ব্বলতার বীজ ঠিক কবিত্বশক্তির দৈন্য অপেক্ষা পরিকল্পনার অনুপযোগিতার মধ্যেই নিহিত আছে। কোন কবি যদি সঙ্কল্প করেন যে তিনি কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ও রাধাকৃষ্ণলীলার খুঁটী-নাটি কিছুই বাদ না দিয়া প্রত্যেকটী ঘটনার উপর কবিতা লিখিবেন ও রসোদ্রেক অপেক্ষা ঘটনা-বিবৃতিই তাঁহার মুখ্যতর উদ্দেশ্য হইবে তবে তিনি যত বড় কবিই হউন না কেন তাঁহার অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী। 'ছত্রিশ অক্ষরের কবিতা' একটা হাস্যকর বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ইহার দ্বারা হাস্যরস ছাড়া যদি কোন করুণ রসের উদ্রেক হয় তবে তাহা কবির এই ব্যর্থ-প্রচেষ্টা-সম্বন্ধীয়। ইংরেজ কবি চসার ও যীশুমাতার উপর A. B. C. নামধেয় বর্ণমালার অক্ষরানুযায়ী এক কবিতা লিখিয়াছিলেন, এবং সেই প্রচেষ্টার ফলও একরূপই হইয়াছিল। কবিত্বের রথ পথে-বিপথে, পাহাড়-জঙ্গল, উপত্যকা-অধিত্যকা সর্ব্বত্র চালাইতে চেষ্টা করিলে তাহার হোঁচট্ অনিবার্য্য।

তথাপি আমার মনে হয় যে দীন চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে এমন এক পরিণতিতে পৌঁছিয়াছিল, যাহাতে তাঁহার পক্ষে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলীর রচয়িতা হওয়া অসম্ভব নহে। এই নবাবিষ্কৃত পুঁথিতে অনেকগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা পাওয়া যায়। ইহাদের সুর, ভাব, উপমা ও রস-গাঢ়তা মহাকবির সর্ব্বজন-পরিচিত পদগুলির কাব্যোৎকর্ষের সহিত তুলনীয়। চণ্ডীদাসের প্রথম শ্রেণীর পদ সংখ্যায় ৫০।৬০টীর অধিক নহে। যদি আখ্যায়িকাকারের সহিত তাঁহার সমস্ত সম্বন্ধ অস্বীকার করা যায়, তবে এই ৫০।৬০টী পদের জন্য এক স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হয়। যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্যের গীতি-কবিতা—সঙ্কলন-গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে এমন কি শেক্সপিয়ার, শেলী, কীট্স্, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবার্ণ, টেনিসন প্রভৃতি সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর গীতি-কাব্য-রচয়িতাদেরও কবিতার মধ্যেও উৎকর্ষের যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। মুষ্টিমেয় প্রথম শ্রেণীর কবিতার সহিত অসংখ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর ও অল্লাধিক কয়েকটা তৃতীয় শ্রেণীর কবিতাও তাঁহাদের কাব্যগ্রন্থে একত্র গ্রথিত দেখা যায়। সঙ্কলনকারী অবশ্য প্রথম শ্রেণীর কবিতাই নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন—চণ্ডীদাসের তথা সমগ্র বৈষ্ণব-কবির সম্বন্ধেও এই নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্কলন-গ্রন্থে অনুল্লেখের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কবিতার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। সুতরাং মহাকবি চণ্ডীদাসেরও নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা ছিল এবং আখ্যায়িকা-গ্রন্থের আবিষ্কার হয়ত সৌভাগ্যক্রমে সেই

হারানো সূত্রটী আমাদের নিকট পুনরুদ্ধার করিয়াছে। আশাকরি প্রবন্ধের মধ্যে অংশতঃ উল্লিখিত ও শেষে উদ্ধৃত পদগুলি হইতে পাঠকেরা এ বিষয়ে কিছু ধারণা করিতে পারিবেন।

(১১)

নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে এই সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে গিয়া আমি চণ্ডীদাস-সমস্যার অসাধারণ জটিলতা মোটেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করিতেছি না। আখ্যায়িকার মধ্যে চণ্ডীদাস-রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদগুলি একটীও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই ইহা পূর্ব্বোক্ত অনুমানের আপাত-বিরোধী। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে আখ্যায়িকার ১২০৩ হইতে ১৮৬০ বা ৬৫০র বেশী পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট পদগুলি অনায়াসেই স্থান লাভ করিতে পারে। যদি সম্পূর্ণ পুঁথির আবিষ্কারের পরেও উক্ত পদগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত না দেখা যায়, তবে সমস্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহাও সত্য যে চণ্ডীদাস নামের অন্তরালে ছোট বড় অনেক কবি আত্মগোপন করিয়া আছেন; সুতরাং চণ্ডীদাসের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আমাদের যে অভিমত তাহার গঠনে চণ্ডীদাস ছাড়া অন্যান্য কবিরও প্রভাব থাকা সম্ভব। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস প্রভৃতি সমধর্ম্মী কবির কোন কোন পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়া থাকিবে, সুতরাং তাঁহার শিরোদেশ হয়ত ঋণ করা মুকুটের রশ্মিজাল-ভাস্বর হইয়াছে। কিন্তু এ সমস্ত জটিলতার সূত্র স্বীকার করিলেও ইহা নিশ্চিত যে চণ্ডীদাস একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কবি ছিলেন; তাহা না হইলে খ্যাতি-লোলুপ অন্যান্য কবি তাঁহার বিরাট মহিমার নিকট আত্মবিলোপ করিবেন কেন ও অন্য কোন কোন শ্রেষ্ঠ কবির ন্যায্য গৌরব তাঁহাতেই বা আরোপিত হইবে কেন? সাহিত্যক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে পরের দ্রব্য সগৌরবে আত্মসাৎ করা দিগ্বিজয়ী বীরের পক্ষেই সম্ভব। সাধারণের চক্ষে চণ্ডীদাস বৈষ্ণব-কবিত্ব-মহিমার প্রতীক না হইলে অন্যের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ রাজকরের ন্যায় তাঁহার প্রতিভা-বেদীমূলে সমর্পিত হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দীপশিখা উজ্জ্বল না হইলে তাহাতে পতঙ্গকুল ঝাঁপ দেয় না; পূর্ণচন্দ্র-দীপ্তিতেই নক্ষত্রসমূহ আপন আপন রশ্মি মিশায়। মোট কথা, আমাদের অনুমান যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা বৈষ্ণব-কাব্য-জগতে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত করে।

এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। যখন চণ্ডীদাস সমস্যা জন্মগ্রহণ করে নাই, তখন হইতে রমণীমোহন মল্লিক ও নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহগ্রন্থদ্বয়ে উপাখ্যানমূলক পালা-গান ও বিশুদ্ধ গীতি-ধর্ম্মী পদ-সমূহ পাশাপাশি স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে কোন উৎকট অসামঞ্জস্য না পাঠক না সঙ্কলনকারী কাহারও বিচার বুদ্ধিকে আঘাত করে নাই। উভয়বিধ রচনাই চণ্ডীদাসের বলিয়া নির্ব্বিবাদে স্বীকৃত হইয়াছে।* হয়ত তাঁহারা একই আকর-গ্রন্থে দুই রকম পদই পাইয়াছিলেন; অথবা নূতন পালা-গানগুলি পূর্ব্ব-পরিজ্ঞাত বিখ্যাত পদাবলীর সহিত জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা বিষয়ক পদগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রমণীবাবু বা নীলরতনবাবুর সংগ্রহ-গ্রন্থে কতকগুলি পদ কবিত্বশক্তিতে নিকৃষ্ট ও চণ্ডীদাসের নামের সহিত জড়িত হইবার অযোগ্য এরূপ আপত্তি কখনও উত্থাপিত হয় নাই। আখ্যায়িকার প্রারম্ভসূচক পদগুলির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ সন্দেহ প্রথম মাথা তুলিল। এরূপ সন্দেহ যে স্বাভাবিক তাহা ঠিক; পদগুলির কাব্যগত অপকর্ষ কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু সেই কারণেই ইহা যে চণ্ডীদাস নামধেয় অপর এক নিকৃষ্ট কবির রচনা এরূপ সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী হয় না। হয়ত এগুলি কবির প্রথম বয়সের, কাঁচা হাতের রচনা; হয়ত এগুলিতে পৌরাণিক উপাখ্যানের অন্ধ অনুসরণ ও বিবৃতিমূলক উপাদানের অতি-প্রাধান্য কবিত্বরস বিকাশের অনুকূল হয় নাই। আখ্যায়িকার আগা-গোড়া একই হাতের রচনা-চিহ্ন সুপরিস্ফুট; বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোজক-সূত্রের অস্তিত্ব, ভাব, ভাষা, উপমা ও দার্শনিক তত্ত্বের সাম্য ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যে কবি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় এত অপটু ও দ্বিধা-কম্পিত-হস্ত, তিনিই রাসলীলা, মাথুর বিরহ ও আক্ষেপানুরাগের পদে কবিত্বের অনেক উন্নততর পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছেন। এই ক্রম-পরিণতির প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে, উভয় কবিকে অভিন্ন মনে করার বিরুদ্ধে যে দুরতিক্রম্য বাধা সাধারণতঃ অনুভূত হইয়া থাকে তাহা অনেকাংশে অপসারিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে আমার সিদ্ধান্ত মণীন্দ্রবাবুর সহিত এক। কিন্তু সিদ্ধান্ত অভিন্ন হইলেও আমাদের পারস্পরিক যুক্তিধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মণীন্দ্রবাবু আখ্যায়িকার অনুরোধে চণ্ডীদাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদগুলি বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত আছেন। আমার মতে এরূপ বিসর্জ্জন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। চণ্ডীদাসের সমস্ত পদ, অন্য কোন বিরুদ্ধ দাবী প্রমাণিত না হইলে আখ্যায়িকার কাঠামোর মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করান যাইতে পারে এবং আখ্যায়িকার মধ্যেই এমন কবিত্ব-শক্তির নিদর্শন আছে যাহাতে প্রথম শ্রেণীর পদগুলির জন্য স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য আমার যুক্তির সারবত্তা প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে একটী সর্ত্তপূরণের উপর—তাহা হইতেছে নবাবিষ্কৃত পুঁথির মধ্যে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদগুলির সহিত সুর-সাম্য ও কবিত্বশক্তি-সামঞ্জস্যের যে অনুভূতি আমি পাইয়াছি সুধী-সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক রসবোধের দ্বারা তাহার সমর্থন। এই অনুভূতি যদি অসমর্থিত হয়, তবে তাহার নূতন সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইবার উপযোগিতা বহুলাংশে দুর্ব্বল হইবে ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। সাহিত্য-সমস্যা বিচারে নানাবিধ গুণ ও যোগ্যতার প্রয়োজন হইলেও, সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক রসবোধই শ্রেষ্ঠ সহায়। ইহাই প্রশ্ন-নিষ্পত্তির উচ্চতম বিচারালয়। সেই উচ্চতম বিচারাধিকরণের উপর চূড়ান্ত মীমাংসার ভার অর্পণ করিয়া তাহার অভিমত প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

পুঁথিতে প্রাপ্ত কয়েকটি পদ নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। এইরূপ কবিত্ব-গুণসম্পন্ন অন্ততঃ ৪০।৫০টী পদ ইহাতে পাওয়া যাইবে।

শুনহ মধুকর, তাঁহারে বলিব কোন কথা
যেমত জলের মীন, জল-আচ্ছাদনে থাকে
ইদিক্ উদিক্ নাহি তথা॥

ধীবর দেখিলে যেন তরাসে কাঁপিয়া মরে
দাঁড়াইতে নাহি কোন স্থান।

বনের হরিণী যেন বাউল হইয়া ফিরে
আন-বনে তেজয়ে পরাণ॥

অকূল সমুদ্র মাঝে মকর ডুবিয়া থাকে
এ কূল ও কূল নাহি পায়।

তেমত মকর সম পড়িলাম দরিয়াতে
সকলি তেমতি হেন প্রায়॥

সিন্ধু সেবিলুম (আশে !) পিয়াস যাইব দূরে
পিয়াস হইল দুগুণ বড়ি।

শীতল হইব বলি করিনু চাঁদের সেবা
তাহাতেও তাপ দুহু পড়ি॥

* ১৩৩৪ সালের ২য় সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এইরূপ সন্দেহের একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা স্পষ্টোক্তিতে পরিণত হয় নাই।

কল্পতরুর গাছ সেবিনু যতন করি
তাহা গেল ডালে মূলে ভাঙ্গি।
ছায়ার কারণ আউ রবির কিরণ পাই
বড়ই বিধাতা ইহ রঙ্গি॥
কত না কহিব দুখ কহিলে কি জানি হয়
কহিতে বিষম উঠে জ্বালা।
সে দুখ জানাব যারে সে গেল মথুরাপুরে
শরণ রহিল তরুতলা॥
কদম্ব কানন বন এখানে করিত কেলি
ঐ দেখ রাস-রস-লীলা।
এই দেখ বংশীবট যমুনা কানন বনে
এইখানে বসন হরিলা॥
এই দেখ ভোজন-থালি যজ্ঞ-পত্নী অন্নলয়্যা
দুভাই খাইলে নিজ সুখে।
ঐ দেখ মাধবিলতা এখানে সঙ্কেত স্থান
করিত লালস অতি মোকে॥
ঐ দেখ করল রাস এইখানে অদেখ ভেল
যবে সে কহিল নিতে কান্ধে।
সবারে তেজিয়া পহু গেলা কতি প্রাণনাথে
গোপী কভু স্থির নাহি বান্ধে॥
এইখানে আসিয়া মেলি সকল গোপিনিগণে
হরষে ভেটল ঘনশ্যাম।
চণ্ডীদাস মুরছিয়া পড়ি রহে তা দেখিয়া
শুনিতে পুরব অনুপাম॥

(৮৬৩নং পদ)

ঘর হল্য কাল কানন সমান
গুরুজনা হল্য বিষে।
ভাবনা গণনা কালা জপমালা
নিবারণ পাব কিসে॥
ঘুমাইলে দেখি কালার বরণ
শুইলে সোয়াস্তি নাঞি।
গমনে কালিয়া দেখিএ ভালিয়া
সতত সকল ঠাঁঞি॥
হৃদয়ে কালিয়া দেখিএ সঘনে
মুদিলে নয়ন দুটী।
দেখিতে দেখিতে নয়নের জল
সঘনে সঘনে ছুটি॥
দেখিতে সেরূপ রাখিব কোথাহ
থুইতে নাহিক ঠাঁঞি।
নয়নে না ধরে উথলিয়া পড়ে
হেন কভু দেখি নাঞি॥
রূপ মনোহর কি মোহিনী সই
দেখিলে নয়ন চলি।
কিসে নিবারিব এ হেন পিরিতি
তুমি ভুলাইলে ভালি॥
কালিয়্যা বরণ কি হল্য মরমে
সপনে দেখিএ কালা।
উঠিতে বসিতে দিক মেহারিতে
মোরল-বিষম জ্বালা॥

ভাবিতে ভাবিতে কালিয়া কানুরে
কালিয়া হইল তনু।
কিসে ভাল হবে কহ না উপায়
বেদনা হল সে দুনু॥
চণ্ডীদাস বলে পাইবে ঔষধ
কহিএ ওঝার বাড়ি।
পূর্ণমাসী ভাল প্রবীণ চেতনি
সেই সে কর‍্যাছে ডেড়ি॥ (৯৫৯)
হেদে গো সজনি সই।

তাহার কারণে সব তেয়াগিব
মরম-মরমি তুই॥
সকল ছাড়ুক গুরু পরিজনা
কুলে তিলাঞ্জলি দিব।
শ্যামের লাগিয়া এ তনু রাখ্যাছি
মাণিক করিয়া নিব॥
মাণিক করিয়া পদক গড়াঞা
হৃদয়ে পরিব গলে।
কারিগর কাছে গিয়া কুতূহলে
তাহাই বান্ধাব ভালে॥
মাঝে নীলমণি তার চারি ধারে
রতন মাণিক বেড়া।
সেই রূপখানি তাহে নিরখিব
তিলেক নহিব ছাড়া॥
হিয়াতে রাখিব কেহ না দেখিব
আপন মনেতে জানে।
কালরূপ খানি তাথে নিরখিব
লহেত আমার মনে॥
শুনহ সজনি সো মোর পরাণি
শরণ লইল তার।
এক আছে কথা বড় হিয়া ব্যথা
পরিণামে আছে ভয়॥
এখন এমতি সরস বচনে
করিয়া প্রেমের লেঠা।
পরিণামে পাছে গরলের রাশি
পথে জানি হয় কাঁটা॥
যখন চলিএ সরাসরি বাটে
নয়ান মুন্দিয়া যাই।
পুন সেই বাটে আসিতে আসিতে
কণ্টক বাজয়ে পায়॥
মধুর গাগরি পিয়াস লাগিলে
খাইতে বড়ই সুখ।
সেই সে অমিয়া কোন ফল দিল
গরল সমান দুখ॥
কখন সময়ে শীতল বাতাস
কখন গরম (?) হয়।
কালের গতিকে দারুণ কুজন
কখন ভালুই নয়॥
বন্ধু একজন থাকয়ে বেথিত
পরাণ সোসর সেই।
একদিন কালে সেই বন্ধুজনা
রিপুর সমান হয় (?)॥

পরিণামে পাছে দুখের সাগরে
পড়িএ মরিয়া মাঝে।
পরের পিরিতি দেখিএ তেমতি
করায় সময় কাজে॥
চণ্ডিদাস বলে পরিণাম গণ
কি তার করিছ ভয়।
হৃদয় মানসে বান্ধহ বন্ধুরে
মোর মনে হেন লয়॥ (২২৭)

হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়া থাকি এ
তবু সে হারায়ে কত।
মুখে মুখ ভরি রসিক মুরারি
মধু পীতে চাহে যত॥
হেন তার মন যৌবনের বন
হইতে চাহেন পাখি।
(জ্ঞানদাস তুলনীয়)
ফুলে মধু খাঞা বুলএ ফিরিয়া
এই মনে লয় সাখি॥
রসের বাগানে রসের ফুলেতে
খাইতে রসের স্বাদ।
হেন তার চিত কহেন বেকত
তাহে গুরুজনা বাদ॥
নহি স্বতন্তর বিষ যেন ঘর
কি তার কহিব কথা।
নহে সে নাগরে হিয়ার ভিতরে
রাখিলে না হয় ব্যথা॥
হেন লয় চিতে বসি এক ভিতে—
তেজি পাষণ্ডির সঙ্গ।
বসাইয়া কাছে যত মনে আছে
করিএ রসের রঙ্গ॥
হিয়া বিদারিয়া রাখিএ ভরিয়া
যেখানে পরাণ মোর।
মনের ডোরেতে বান্ধি এ বন্ধুরে
সদাই করি এ কোর॥
আঁখে রাখি যদি সেই গুণ-নিধি
না করে নয়ন-ব্যথা।
রূপ বেশ করি লঞা অঙ্গে পরি
নয়ন-অঞ্জন রাতা॥
নহে সেইরূপ আনন্দের কূপ
বসনে বান্ধিয়া রাখি।
নিরন্তর যেন বিরলে বসিয়া
আল্যায়া? সে রূপ দেখি॥
এ সব বচন সখির সহিতে
কহেন সুন্দরী রাধা।
চণ্ডীদাস বলে লোকের কথারে
তাহে কি আছয়ে বাধা॥ (২২৮)

লৌহ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে লৌহের আকরিক প্রস্তরের বিভিন্ন নাম, তাহাতে লৌহের ভাগ এবং ভারতের মধ্যে আসাম, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, উড়িষ্যা, বাঙ্গলা ও বিহারে তাহার অবস্থান সম্বন্ধে সবিশেষ বলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

নেপাল

অরুণ কোসি নদীর উপত্যকায় প্রচুর লৌহপ্রস্তর আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা* অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা গোর্লি খরক বলিয়া একটী স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই নামে কিছু ভুল আছে। নেপালের মাক্ষিকের মলভাগ নিতান্ত কম এবং তাহা মৃত্তিকা স্তরের উপর অবস্থিত বলিয়া এক বিশেষ সুবিধা আছে। †

বোম্বাই

বোম্বাই প্রদেশে যথেষ্ট লৌহপ্রস্তর আছে। রত্নগিরি জেলায় প্রধানতঃ ল্যাটেরাইট দেখিতে পাওয়া গেলেও ইহার অনেক স্থানে লৌহ-বহুল "প্রস্তরের" অবস্থান আছে। সাতারা জেলার মাক্ষিক হইতে wootz বা ইস্পাত প্রস্তুত হইত; ইহার মধ্যে মহাবালেশ্বর লৌহ শিল্পের একটী কেন্দ্র ছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঁচমহল জেলায় পালানপুরের গোধরা গ্রামে এবং নারুকোটএর জম্বুগোর ও সূর্য্যপুরে উৎকৃষ্ট মাক্ষিক রহিয়াছে। করয়া, রেওয়াকান্থা, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানের মাক্ষিক-মল বা গাদ (slag) দেখিয়া মনে হয়, এককালে এই সকল স্থানেও মাক্ষিক সংশ্লিষ্ট শিল্পের সন্নিবেশ ছিল।

বোম্বাই প্রদেশের করদরাজ্যের মধ্যে কোলাপুর প্রধান। এই স্থানে তিন প্রকার মাক্ষিক আছে। সায়াদ্রি পর্ব্বতমালার নিকটস্থ শিলাগড়, পান্‌হালা, ভূধরগড় এবং কোলাপুরে এই বিষয়ে বিশেষ সমৃদ্ধ। এককালে এতদঞ্চলের শিল্প বহু লোকের জীবিকার্জ্জনে সহায়তা করিত, এখন আর তাহা নাই।

পঞ্চনদ

পঞ্চনদের মধ্যে ঝিলম-এ কোট কারেণা পাহাড়ে প্রচুর হেমাটাইট আছে বলিয়া কথিত আছে। কাঙ্গড়া জেলা১, মণ্ডি২ ও শিরমুর করদ-রাজ্যে "প্রস্তরের" অবস্থান সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদেরা একমত। শিরমুর রাজ্যে

* T. H. D. La Touche quotes Hodgson as his authority in "An Annotated Index of Economic Minerals of India."

† "Iron ore is found near the surface and is not surpassed in purity by that of any other country"—W. W. Hunter, Imp. Gaz. of India (1886) Vol X p. 278.

১ An abundant supply of magnetic and micaceous iron ores are found"—Ball, Econ, Geo. of India—III p. 404.

২ There are considerable iron mines in Mundi—Ibid p. 405.

ভারতের তদানীন্তন কালের (১৮৮১) একমাত্র ব্লাষ্ট ফার্নেস (blast furnace) অবস্থিত ছিল বলিয়া এই গৌরবের অধিকারী।

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের বহুস্থানে প্রচুর * মাক্ষিক আছে, তাহার মধ্যে কয়েক স্থানের মাক্ষিকে লৌহের অংশ খুবই বেশী। এই প্রদেশে মাক্ষিকের সহিত কাষ্ঠের প্রাচুর্য্য থাকায় বহু চুল্লী ছিল এবং বরাবরই ভারত উৎপাদিত লৌহের মোট পরিমাণের সহিত যোগ দিয়া প্রদর্শিত হইত।

মধ্যপ্রদেশের মধ্যে চন্দা জেলা * সর্ব্বপ্রধান।

দেওয়ালগাঁর নিকট খণ্ডেশ্বর নামে ২৫০ ফুট উঁচু পাহাড়টীর প্রায় সমস্তই লৌহপ্রস্তর দ্বারা গঠিত। লোহারা, ওগুলপেট, মেটাপুর, ভানাপুর, মেণ্ডা গুল্লোহি, পিপলগাঁ, রত্নপুর প্রভৃতি অপর কয়েকটী স্থানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার "প্রস্তর" প্রধানতঃ হেমাটাইট হইলেও ম্যাগনেটাইটের অভাব নাই। মধ্যপ্রদেশের অপরাপর অংশের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মণ্ডলায় রামগড়ে, ভাণ্ডারায় চাঁদপুর ও তিরোরা পরগণায়, বলাঘাট, জব্বলপুরের প্রায় শতাধিক স্থানে, বন্দা জেলায় ও নরসিংহপুরে মাক্ষিকের অবস্থান সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদেরা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। নরসিংহপুরের তেন্দুখেরার মাক্ষিক হইতে বহুকাল খুব ভাল ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছে এবং পরিমাণও খুব বেশী।

বস্তার রাজ্য সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নানা স্থানে বহু পরিমাণ প্রস্তর পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে আধুনিক কারখানার প্রয়োজনীয় লৌহ-প্রস্তর সরবরাহ করা সম্ভব হইবে। অনুমান হয় এই স্থানে ৬১ কোটী টন প্রস্তর রহিয়াছে।†

যখন চন্দা লইয়া বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে, তখনও কেহ রায়পুর জেলার কথা চিন্তা করেন নাই। কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বে প্রমথনাথের চক্ষুকে ইহা এড়াইতে পারে নাই। ১৮৮৭ সালে তিনি রায়পুর জেলার ধল্লি-লোহারা সম্বন্ধে আপনার মত লিপিবদ্ধ করেন। ঐ স্থানে যে প্রচুর এবং উৎকৃষ্ট মাক্ষিক (শতকরা ৫৫ হইতে ৭২·৫ ভাগ লৌহ) অবস্থিত তাহাতে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন।* একথা তখন কাহারও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং ক্রমে তাহা লোকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যায়।

১৯০৬ সালে ধল্লি-লোহারা নব-সৃষ্ট দ্রুগ জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। লৌহ শিল্পের ব্যাপারে দ্রুগ-এর নাম কেহ স্মরণ না করিলেও প্রকারান্তরে ইহা টাটা কোম্পানীর কারখানা স্থাপনের সহায়তা করিয়াছে। যখন চন্দা প্রভৃতি জেলায় বহু অনুসন্ধান ও প্রচুর অর্থব্যয়ের পর টাটারা হতাশ হইয়া লৌহ শিল্পের কল্পনা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সার ডোরাব টাটা তাহা মধ্যপ্রদেশের চীফ্ সেক্রেটারীকে জানাইবার উদ্দেশ্যে নাগপুরে তাঁহার অফিসে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন চীফ সেক্রেটারী অফিস ঘরে না থাকায় তিনি ইতস্ততঃ পাদচারণা করিতে করিতে সেখানে মধ্যপ্রদেশের এক ম্যাপ বা মানচিত্রের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টিপাত করেন। তাহাতে দ্রুগ জেলা ঘন রঙ দ্বারা প্রদর্শিত ছিল, অর্থাৎ তথায় প্রচুর মাক্ষিকের নির্দ্দেশ করিতেছিল। অফিস সংলগ্ন ক্ষুদ্র প্রদর্শনীতে দ্রুগ জেলার মাক্ষিকের যে নমুনা দেখিতে পান, তাহাতে তিনি অবসন্ন দেহে ও মনে নূতন শক্তি লাভ করিলেন এবং পুনরায় পূর্ণোদ্যমে কাজে লাগিয়া যান। ১৮৮৭ সালে প্রমথনাথ বসু লিখিত নথিপত্র বাহির করিয়া পড়া চলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভূতত্ত্ববিদেরা পাহাড় জঙ্গল ভাঙ্গিয়া নূতন "প্রস্তরের" সন্ধান আনিয়া দিলেন।

পরে মিঃ সি পি পেরিন (Mr. C. P. Perin) এই স্থান দেখিয়া বলিয়াছেন যে উহা খনিজ জগতের এক আশ্চর্য্য ব্যাপার (the iron ores "were one of the mineral wonders of the world")। কেহ বা ইহাকে নিরেট লৌহের পাহাড় বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন ("veritable hill of almost solid iron")। ইহাতে প্রমথনাথ বসুর উপর যে বিশ্বাস জন্মিল, তাহারই ফলে বসু মহাশয়ের আহ্বানে টাটারা ছুটিয়া ময়ূরভঞ্জে গিয়া পড়ে এবং টাটা কোম্পানী মধ্যপ্রদেশে না হইয়া ময়ূরভঞ্জের নিকটে জন্মলাভ করে।

মধ্যভারত

মধ্যভারতের (Central India) বিভিন্ন প্রদেশেও মাক্ষিকের সংস্থান সম্বন্ধে যথেষ্ট সুনাম আছে এবং এখনও বহুস্থানে ঐ 'প্রস্তর' হইতে লৌহ উদ্ধার করা হয়। বুন্দেলখণ্ড, নিমার, মালোয়া, ধর, গুণা এবং নর্ম্মদার উপত্যকায় চাঁদগড়, পৌয়াসা, বারওয়াই, কান্দিকোট, বাগ প্রভৃতি স্থানে লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। মধ্যভারতের বহু করদরাজ্যে (Central India Agency) বিজাওয়ার (হীরাপুর), গোয়ালিয়র† (পার পর্ব্বত, মাঙ্গোর, সান্টো প্রভৃতি স্থান) উল্লেখযোগ্য।

---

* The Central Provinces is rich in its iron ores, particularly in Chanda district, and a scientific examination into the resources of this district was conducted in 1881-82 by Ritter von Schwarz, a gentleman of great experience in iron mining in Austria, and his report promises favourably for the future. He considered that with the construction of an ironwork at Dungarpur, and the erection of more blast furnaces, there was no reason to doubt that Chanda District alone was capable of turning out 260,000 tons of iron or steel yearly. He reported further that, besides supplying India with much of her steel and iron requirements, Chanda was able to open out an export trade with England in articles which were now imported from the Continent, particularly in Ferro-manganese and Brescian steel.—W. W. Hunter—Imp. Gaz. of India (1887) Vol. III p 300.

V. Ball writes on Chanda in Econ. Geo. of India, Pt. III p. 387—"Extra-ordinary richness and abundance of the iron ores in this district." Again "The Chanda district surpasses all others in the Wardha Valley for richness of iron ore."

† Ore deposits large and rich enough to be worked commercially occur in numerous places along the two high ridges which flank the range and on the watershed of the Malenagar at the southern end of the range. The total reserves have been estimated to be at least 610 million tons of the first class ore. The largest deposits are two on the watershed of the Malenagar, and one 2¼ miles north of Loa. In these deposits there are at least 400 million tons of ore.—Rec. Geo. Sur. India—Vol. 74. (1939) Part I, p. 50.

* "The Iron Industry of the Western Portion of the District of Raipur by Pramatha Nath Bose, B.sc. (Lond), F.G.S., Dy. Superintendent, Geological Survey of India" —Rec. Geo. Sur. of India, Vol VX (1887) p. 167

"The richest and most extensive ores of the district are to be found in this (Daundi-Lohara) zemindari...... The hill of Dalli for about seven miles of its length. is full of good hæmatite, which is developed in hard, red, rather thin bedded chipli sandstone."

† "Gwalior contains several remarkably rich deposits of iron ore"—V. Ball, Econ. Geo. India. Pt. III p. 394.

"Iron containing 75 per cent. of metal is raised and smelted in many places"—W. W. Hunter, Imp. Gaz. Ind. (1886) Vol. V. p.228,

বহুদিন পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট লৌহ মাক্ষিক ও লৌহ শিল্পের কেন্দ্র বলিয়া ইন্দোরের সুনাম ছিল।

মহীশূর

মহীশূরের মহীশূর জেলায় মালভিল্লি তালুকের মধ্যে তিপ্পুরের নিকট নিকট প্রাবণ পাহাড়ে, শিমোগা জেলার কোদাইছাদ্রি, কাদুরের বাবা বুদান পাহাড়* ও উব্রার্ণীর নিকটস্থ ভূমিতে এবং চিতলদ্রুগ জেলাস্থিত পাহাড় শ্রেণীতে, তুমকুড় জেলার চিকায়াকানহিলি প্রদেশে হেমাটাইটের অবস্থান জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে বাবা বুদন পাহাড়ের 'প্রস্তর' কারখানার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। *

মাদ্রাজ

এ পর্য্যন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মাক্ষিক সংস্থানে বিহার উড়িষ্যার পরেই মাদ্রাজের স্থান। ইহার মধ্যে সালেম জেলা প্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মাক্ষিক যে কেবল গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে, লক্ষ লক্ষ টন মাক্ষিক† একস্থানে পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করেন। সালেমের মাক্ষিক হইতে উট্‌স্ (Wootz) বা বিশেষ ইস্পাত প্রস্তুত হইত এরূপ ধারণা ভুল নহে।

মাদুরা (মদুরৈ) জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই মাক্ষিক রহিয়াছে; বিশেষতঃ কোটামপট্টি ও শিবগাঙ্গেয়ী জমিদারীতে এবং তত্রত্য পর্ব্বতের সানুদেশে সর্ব্বত্রই "প্রস্তর" দেখিতে পাওয়া যায়। টেনকারেই (Tenkarei) গ্রাম এককালে এ বিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

আর্কট (আর্কাড়), উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় জেলাতেই প্রচুর লৌহপ্রস্তর রহিয়াছে; তন্মধ্যে দক্ষিণ আর্কটের ত্রিনোমালাই তালুক, কালরায়ানা পাহাড় (Kalrayana Hills) ও পনপারাপ্পি (Panparappi) ও রাভাতনালুর (Ravatnallur)-এর কিছু স্বতন্ত্র পরিচয় আছে।

দক্ষিণ আর্কটের পোর্টো নোভো (Porto Navo)তে প্রথম আধুনিক কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল।

মাদ্রাজের অন্যান্য স্থানের মধ্যে মলবার (Malabar) জেলার নানা অংশে (বিশেষতঃ বেপুর-এ) ও নীলগিরির কার্‌রাচোলা ও ডোডাবেট্টাতে, অনন্তপুর জেলায় কড্ডাপা (বা কদপ) ও কর্ণুল (কর্ণূলু) জেলার কড্ডাপা ও কর্ণুল পাহাড়ে ও গন্নিগুল (Gunnygul) শ্রেণীতে, কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলায় ও ভিজগপত্তমে প্রচুর মাক্ষিক রহিয়াছে। তাহা ছাড়া চিঙ্গলপুট, ত্রিচিনপল্লী, পুডুকোটাই প্রভৃতি স্থানে মাক্ষিকের অবস্থান সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদের একমত হইয়াছেন। ‡

রাজপুতানা

রাজপুতানার প্রায় সর্ব্বাংশে প্রচুর "প্রস্তর" পাওয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা যতদূর বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই মাক্ষিক বিশেষ গুণসম্পন্ন।

আলওয়ার (ডানগড়ের নিকট আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীতে), জয়পুর (কারওয়াঁর), আজমীড় (আজমীর জেলা) ও উদয়পুর (গাঙ্গপুর) রাজ্যগুলি লৌহ মাক্ষিকে সমৃদ্ধ।

* "Massive bands of magnetite and hematite quartzite"—Sampat Iyengar quoted in T. H. D. La Touche's "Annotated Index of Minerals of Economic Value."

† Magnetic iron occurs in practically inexhaustible quantities"—W. W. Hunter, Imp. Gaz. Ind. (1886) Vol. XII p. 153

‡ Cf. T. H D. La Touche, M.A., F.G.S.—An Annotated Index of Minerals of Economic Value.

হায়দরাবাদ ও বিরার

হায়দরাবাদের মাক্ষিক ও লৌহ বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ ছিল এবং দেশ-বিদেশ হইতে বণিক আসিয়া ইহার সন্ধান লইত। এ বিষয়ে মিত্রপল্লী ও কোণ্ডারপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিরারে প্রচুর মাক্ষিক রহিয়াছে, বিশেষতঃ করঞ্জার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় এবং উত্তরপূর্ব্ব দিকে অমরাবতীর নিকটস্থ সকল পর্ব্বতগাত্রে লৌহপ্রস্তর দৃষ্ট হয়।

ভারতের সুবিধা

ভারতবর্ষের আধুনিক লৌহশিল্প নূতন বলিয়া এক দিকে যেমন দুঃখ করিতে হয় কিন্তু অপর দিকে তাহার এক বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। যেখানে বহুদিন ধরিয়া মৃত্তিকগর্ভ হইতে "প্রস্তর" উঠাইতে হইয়াছে সেখানে খাদ বা খনি গভীর হওয়ায় উহা উত্তোলনের ব্যয় বেশী পড়িতেছে। শুনা যায় কোনও কোনও দেশে উৎকৃষ্ট মাক্ষিকের সন্ধানে মানুষ ছয় শত ফুট মৃত্তিকাগর্ভে নামিতেছে। অতএব ইহা সহজেই অনুমেয় যে তাহারা ভারতবর্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত হইতে বাধ্য; অথচ ভারতের বাজারে ইহারাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লৌহ ইস্পাতের বাণিজ্য করিয়া ধনী হইয়াছে।

ভারতের লৌহশিল্প নূতন বিধায় তাহার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে অতি সামান্য পরিমাণ লৌহপ্রস্তর ক্ষয় হইয়াছে। তাহা ছাড়া উড়িষ্যা ও বিহারের মাক্ষিক একেবারে পর্ব্বতগাত্রে বা ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত। অনেক সময় খননের পর একবারে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে স্থাপিত মালগাড়ীর উপর তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।*

ইহা ছাড়া ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উৎকৃষ্ট কয়লার খনি এই লৌহ প্রস্তরক্ষেত্রের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এই সুবিধা একদিন লৌহশিল্পে ইংলণ্ডকে জগতে শীর্ষস্থান দিয়াছিল। আশা করা যায় মারাত্মক যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত শ্বেত বা পীত জাতি যদি আপন প্রভাব বিস্তার দ্বারা ভারতের শিল্প ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প না হয়, তাহা হইলে আবার একদিন ভারতবর্ষ অতীতের ন্যায় আপন আসনলাভে সমর্থ হইবে। এই কয় বৎসরের চেষ্টায় ভারতের কাঁচা লৌহ (pig iron) জগতের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে; যথাস্থানে এ বিষয় আলোচিত হইবে।

ভারতের ভাণ্ডার

ভারতের সমস্ত মাক্ষিকের কোনও পরিমাণ স্থির নির্দ্ধারিত হয় নাই, এখনও সতত নূতন খনির সন্ধান মিলিতেছে। ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে শতকরা ষাট ভাগ লৌহযুক্ত প্রস্তরের পরিমাণ অন্ততঃ ২৮৩ কোটী টন ছিল। ইহা কেবল সিংহভূম

* "There (Keonjhar, Bonai and Mayurbhanj) exists one of the major iron fields of the world, in which enormous tonnages of rich ore are readily available. It usually occurs at or near the tops of hills......"
—Mineral Resources of India—Coggin Brown.

"Most of the actual reserves are located near consuming points and are so situat.d that the ore is taken almost entirely from open pits, the much more expensive deep mining not being necessary at the present time.—United States Tariff Cummission—Iron and Steel—Report No. 128 (1938) p. 233.

'Ore-beds consist of intensely metamorphosed ancient surface flows. The ore here as in Brazil, forms a solid cap on the tops of the mountains, and covers the slopes in the form of larger and smaller stones and float. The cost of mining is therefore very low indeed"—A. Sahlin (Engineer to the Tatas).

জেলা ও ইষ্টার্ণ ষ্টেট্‌স্ এজেন্সীর অন্তর্ভূত বিহার উড়িষ্যার কয়েকটি মাত্র করদ রাজ্যের হিসাব। নিম্নলিখিত হিসাব * হইতে সমস্ত পরিমাণ ও প্রত্যেক স্থানের অংশ সংক্ষেপে বুঝিতে পারা যাইবে :

সিংহভূম জেলা	১০৭,৪০,০০,০০০	টন
কেঁওঝর ষ্টেট	৮০,৬০,০০,০০০	„
বনাই „	৬৫,৬০,০০,০০০	„
বনাই ও কেঁওঝর (অমীমাংসিত স্বত্ব)	২৮,০০,০	
ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট	১,৬০,০০.০০০	
মোট	২৮৩,২০,০০,০০০	„

উপরোক্ত কয়েকটী স্থানের সহিত অন্যান্য প্রদেশের হিসাব ধরিলে পরিমাণ ৩৩২ কোটী ৬০ লক্ষ টন প্রকাশ্য বা জ্ঞাত মাক্ষিক বলিয়া ধরা যায়। তা ছাড়া অনুমিত বা গৌণ-মাক্ষিকের পরিমাণ ২০০০ কোটী টন হওয়াও অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ভারতের যত স্থানে প্রস্তরের নূতন সন্ধান হইয়াছে, তাহাতে এ অনুমান ভিত্তিহীন নয়। এই প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বস্তার ষ্টেটের কথা একবার স্মরণ করা উচিত।

* Records of the Geological Survey of India, Vol. LVII (1919:23)—1925, p. 152

চায়ের গান

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

চেঁচাই সাধে 'চা চাই চা চাই' ব'লে ?
চা ছাড়া এ কুম্ভকর্ণে ঘুম হ'তে কে তোলে ?
গব্য রসের ভোগের সাথে
যোগাযোগ নেই খাওয়ার পাতে,
চায়ের যোগেই দু'চার ফোঁটা জঠরে যায় চ'লে।
চিনির সাথেও রসনাযোগ নেইক আমার মোটে।
চায়ের নামেই দু'এক চামচ ভাগ্যে যা হয় জোটে।
পেট যবে কয় "আহুতি কই ?"
পকেটে নেই এক আনি বই,
এক পেয়ালা চা খেয়ে লই পেট যবে যায় জ্ব'লে।
বন্ধু আসেন শ্যালক আসেন মিঠাই আনাই নাকি ?
"চা কর রে" ব'লে তখন চাকরটারেই ডাকি।
সস্তায় যে চা না চালায়,
পস্তায় সে আখেরে হায়,
মায়ের গায়ের গয়না বেচে চায়ের দোকান খোলে।
চা কোথা নেই ? ইষ্টেশনে ইষ্টিমারে ট্রেণে,
খেলার মাঠে মেলার হাটে বস্তিপাড়ার লেনে।
শহর পথে ডাইনে বাঁয়ে
চায়ের ধোঁয়া লাগছে গায়ে।
কলেজে তার যেমন প্রতাপ তেম্নি প্রতাপ টোলে।
শ্মশানে চা, ব্যসনে চা, উৎসবে চা চাই,
নিমন্ত্রিতের কমায় ক্ষুধা বরযাত্রীর খাঁই।
কারখানাতে ঘর্ম্ম ঘুচায়,
কয়লা খাদে চর্ম্ম মুছায়,
পথভিখারীর রাত-শিকারীর ঝুলি ঝোলায় ঝোলে।
বর্ষাতে চা চাঙ্গা রাখে, শীতেও করে সেবা,
গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণা হরে এমন দোস্ত কেবা ?
দোস্তি পাতায় হাতায় না সে,
তাতায় কিন্তু মাতায় না সে,
এমন চায়ে না চায় যেজন আফিসে সেই ঢোলে।

কর্ম্মী লোকের মিতা এ চা, নিষ্কর্ম্মার সাথী।
সুরার সুলভ প্রতিনিধি, সোমরসের নাতি।
এরেই ঘিরে জমে যে ভিড়
তারাই মারে রাজা উজির,
তর্করণে আস্ফালনে দেনার তাগিদ ভোলে।
মুখ না ধুয়েই মাটির ভাঁড়ে চুমুক করি দান,
ট্রেণের রাতে অনিদ্রাতে চাঙ্গা রাখি প্রাণ।
টাকে যখন হাত বুলায়ে
দেখি সবি যায় ঘুলায়ে,
পেয়ালাতে চুমুক দিতেই বুদ্ধি তখন খোলে।
হাজার হাজার লোকে দেখ মরছে পাহাড় চ'ষে।
চায়ের নিন্দা করে যেজন দিব্যি ঘরে ব'সে,
লক্ষ লোকের অন্ন-লতা
মারুতে করে সহায়তা,
আমরা তারেই 'চা-মার' বলি, কাঁধে দিই তার থ'লে।
চায়ে চুমুক দিতে দিতেই প্রেমের রিহার্সাল,
পেয়ালাটাই শেষকালে হয় অধর এবং গাল।
প্রেমের স্বপন এই চা গড়ে
ভাঙ্গে আবার দুদিন 'পরে,
চা-পেয়ালায় ঝড় উঠে হায় কী তুফানই তোলে।
চা যে না চায়, পয়সা বাঁচায়, খাঁচায় রাখ তাকে।
সর্দ্দি ধরাও, ডুবাও তারে পচা ডোবার পাঁকে।
খেয়ে কেউ কেউ কোকো কাফি
রাখে চায়ের তৃষ্ণা চাপি';
ব্যর্থ প্রয়াস, দুধের পিয়াস মেটে কি হায় ঘোলে।
প্রচুর টাকা থাকলে এ চা একলা খেতাম না।
ভিখারীরেও বল্‌তাম—"বাপু আগে ত চা খা।"
খুলে দিতাম চা-সত্তর
ঠিক গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর,
কয়লা খাদের ধারে ঝ'রেয় কিংবা আসানসোলে।

ভেবেছিলাম চায়ের আয়েই চা খাব পেট ভ'রে,
চা-বাগানের শেয়ারগুলো লুটিল হায় চোরে।
স্বর্গবাসের নেইক ক্ষুধা,
চা সেথা নেই, আছে সুধা,
চা যদি পাই নরকে যাই হেথায় ছুটি হ'লে।
চোরের সঙ্গে সেথায় দেখা হ'তেও পারে ম'লে।

গিরিশ-প্রসঙ্গ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলার বর্ত্তমান নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্যের ভিত্তিমূলে ইতিহাসের যে কণ্টকাকীর্ণ স্থানটি এ পর্য্যন্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—আধুনিক নাট্যশালার আলোকজ্জ্বল চক্ষুচমৎকারী আভায় উদ্‌ভ্রান্ত দর্শকবৃন্দের নিকট যাহা অজ্ঞাত, অপরিচিত, রহস্যাবৃত—প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠার কর্ণিক লইয়া যে নাট্য-স্থপতি তথায় হৃদয়-শোণিত সেচন করিয়াছিলেন—তিনি বঙ্গ-নাট্যশালার স্রষ্টা এবং নাট্য-সাহিত্যের পোষ্টা—বাঙ্গালীর গৌরব—গিরিশচন্দ্র। আর তাঁহারই হৃদয়-রক্তে 'তাগাড়' মাখিয়া মজুর-রূপে ভিত্তি গঠনে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও প্রত্যেকের কথা উক্ত ভিত্তিমূলের প্রস্তরে রক্তের অক্ষরে লেখা আছে; তাহা মুছিবার নয়, মুছিতে পারে না। সেই অজানিত অতীতলিপি আজ জাতির সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিবার সময় আসিয়াছে, প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ, একটা গোটা জাতির সর্ব্বাঙ্গীন পরিচয় পাইবার একমাত্র উপায়—জাতীয় নাট্যশালা। ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে বর্ত্তমানের যত মূল্যই থাকুক, জাতীয় জীবনের সহিত সম্যক পরিচিত হইতে হইলে জাতির অতীতের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলিও পড়িতে হইবে—বর্ত্তমানে বিদ্যুতা-লোকে উদ্ভাসিত মনোরম নাট্যমন্দির হইতে নামিয়া অতীতের পুতিগন্ধময় আবর্জ্জনাস্তূপ ঘাঁটিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিষ্ঠাতাদের শ্রমশক্তি, গঠন-শিল্প ও প্রতিভার সন্ধান করিতে হইবে। গিরিশ-প্রসঙ্গের আলোচনায় আমরা সেই সুযোগটুকু পরিপূর্ণভাবেই পাইব; যেহেতু, গিরিশচন্দ্রের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বিরাট কর্ম্ম-জীবনের সহিত বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর নাট্যশালা তথা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ঐতিহাসিকগণের মতেও শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের ইতিহাস নানাকারণে সমাজের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

নাট্যসম্রাট স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশ-প্রসঙ্গ লিখিতে বসিয়া প্রথমেই রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের শ্রমুখ-নিঃসৃত এক রস-ভাস মনে পড়িতেছে—'গিরিশবাবু ছিলেন রাজমিস্ত্রী, আর আমরা ছিলাম মজুর। যে 'তাগাড়' আমরা মাখিয়া দিয়াছি, তিনি তদ্দ্বারা তাঁহার সিদ্ধ কর্ণিকের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সৌধচূড় নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।"

গিরিশচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর—১৩১৯ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র শুক্রবার কলিকাতা টাউন হলের স্মৃতিসভায় অমৃতলাল ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন। গিরিশ-প্রসঙ্গে—'গিরিশ কি করিয়াছিলেন' তাহা বলিবার পূর্ব্বে 'গিরিশ কি ছিলেন এবং তাঁহার বিয়োগের পর দেশের বিশিষ্ট মনীষিগণ কি ভাবে গিরিশকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন'—আমি খুব সংক্ষেপেই সে সম্বন্ধে একটি নির্ঘণ্ট দিব। কারণ, বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে—তরুণ বয়সে স্বর্গত গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য টাউন হলের শোক-সভায় যে বিপুল জনসমারোহ দেখিয়াছিলাম এবং নেতৃবৃন্দ সেদিন তথায় শ্রদ্ধা-সহকারে যে-ভাবে গিরিশ-প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সে দৃশ্যটি আজও যেন চক্ষুর সমক্ষে ভাসিতেছে, লেখনী সর্ব্বাগ্রে তাহাই ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে। কিন্তু প্রশস্তিকারী যে সকল মনীষীদের উল্লেখ করিতেছি—দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের মধ্যে কেহই আজ জীবিত নাই! ইহাও উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না যে, গিরিশচন্দ্রের দীর্ঘজীবনকালে তাঁহার অনন্যসাধারণ নাট্য-প্রতিভায় উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ এই সকল সমাজ-বরেণ্য মনীষীদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই বলিয়া তাঁহারা যেন টাউন হলের সেই বিরাট শোক-সভায় কর্ত্তব্যচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিক্ষিত মন তৎকালে এই সত্য উপলব্ধি করে যে, জটিল সমস্যা-গুলির সমাধানে জাতির জীবন ও সমাজের গতির অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে জাতীয় নাটক ও নাট্যশালা। বর্ত্তমান যুগে মানবের মন কোন বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম্মমন্দির বা বিধিবদ্ধ সমিতির দ্বারা চালিত নয়—আদর্শ-

জীবনকে আদর্শ নাটকই প্রত্যক্ষভাবে উদাহরণ দ্বারা লোকের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয়—সেই নাটক ও নাট্যালয়ের নেতা স্রষ্টা ও গুরু গিরিশচন্দ্র! দাঁত হারাইলে আমরা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি। গিরিশচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর বাঙ্গালার নেতারা তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন এবং দেশবাসীকে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে জানাইয়া দেন—গিরিশচন্দ্র কি ছিলেন, তাঁহার স্থান অতঃপর কোথায়?

শোকসভার প্রধান উদ্যোক্তা বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলেন: মহাকবি, নাট্যগুরু, নটকবি, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার অভাব পূর্ণ হইবার নহে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ছিলেন। প্রথম যৌবনে আমি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম, আমি তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করিতাম। পরে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হওয়ায় আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেও একটু অবকাশ পাইলেই তাঁহার সহিত দেখা করিতাম। একদিন অসময়ে হঠাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই; গিয়া দেখি, গিরিশবাবু উনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের ইতিহাস পড়িতেছেন! গিরিশবাবু যেমন কবি তেমনই গুণীও ছিলেন; তাঁহার এমন অনেক গুণ ছিল যাহা সচরাচর দেখা যায় না।

বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন: আজ যাঁহার স্মৃতি-সম্মানার্থ এই সভা হইতেছে, তিনি বাঙ্গলা দেশের এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন; তিনি সর্ব্বজনবিদিত, সর্ব্বজনসমাদৃত, এক কথায়—বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এমন সভার বিশেষত্ব আছে। সচরাচর যে সকল সভা হয়, তাহাতে কেবল শিক্ষিত প্রৌঢ় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমাগত হইয়া থাকেন। কিন্তু এই সভায় আমার ন্যায় পক্বকেশ বৃদ্ধ উপস্থিত, আপনাদের মধ্যে অনেক বালককেও (বালক বলিলাম বলিয়া ক্ষমা করিবেন) উপস্থিত দেখিতেছি। আমাদের দেশে পর্দ্দানশীন মহিলাগণের সভায় উপস্থিত হইবার প্রথা নাই।* সে প্রথা যদি থাকিত, তাহা হইলে আজ বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতাকে গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি সভায় উপস্থিত থাকিতে দেখিতে পাইতাম। আমি জানি—বঙ্গদেশে এমন মহিলা প্রায়ই নাই—যাঁহারা গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থপাঠ এবং তাঁহার গ্রন্থের অভিনয় দেখেন নাই। গিরিশচন্দ্র দেশে আমার চেয়েও অধিক পরিচিত ছিলেন, আমার চেয়েও অনেকে তাঁহাকে বেশী চিনিতেন। আমি গিরিশবাবুর বাল্যবন্ধু ছিলাম, আমি তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলাম, অনেক সময় আমি তাঁহার সহিত আনন্দে কাটাইয়াছি। হইতে পারে তিনি দোষশূন্য ছিলেন না; মানুষ সংসারে তাই বা কে? আমরা পরের দোষানুসন্ধানে বড়ই ব্যস্ত থাকি, কিন্তু নিজের দোষ দেখিবার অবকাশ পাই না। সংসারে জীবন-সংগ্রাম করিয়া যে লোক বড় হয়, অনেকেই তাহার দোষ দেখে, তাহার নিন্দা করে; কিন্তু তিনি সংসার ছাড়িয়া যখন চলিয়া যান, তখন লোকে তাঁহার অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারে, লোকে কদর করে। দাঁত থাকিতে আমরা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধেও এই কথা খাটিয়া যায়। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

চিনে না জীবনকালে,
মরিলে অমর বলে,
তাই কি হে চলে গেলে তুমি?

আজ গিরিশ আমাদের দৃষ্টির অতীত, তাই আজ আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশার্থ—তাঁহার স্মৃতিসম্মানার্থ—তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষার্থ এই সভায় সমবেত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ আমরা কি করিব? তাঁহার এক একখানি নাটক—এক একটি স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ। মানুষের দ্বারায় নির্ম্মিত স্তম্ভ কালে ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বিলুপ্ত হইবার নহে। যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে—ততদিন গিরিশচন্দ্রের স্বরচিত কীর্ত্তিস্তম্ভ অটুট থাকিবে।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন: গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে ব্যথাভোগ না করিয়াছেন এমন লোক বাঙ্গালায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে নাট্যশালাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে নাট্যশালাকে ঘৃণা করিবার পরিবর্ত্তে সমাদর করিবারই ইচ্ছা স্বতঃই মনে উদয় হইয়া থাকে। নাট্যশালা আমোদের নিকেতন স্বরূপ হইলেও পক্ষান্তরে ইহা লোকশিক্ষারও আলয়। পেশাদারী থিয়েটার বলিয়া ইহাকে ঘৃণা করিবার কিছুই নাই। গিরিশচন্দ্র বঙ্গীয় নাট্যশালার উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় নাট্যশালা সংস্কৃত, পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে মানুষ এমন গুণবান হইতে পারে না। এই দুঃখের সময় আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে বলিতে পারি—তাঁহাদের শোকে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

অমৃতবাজার-সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলেন: গিরিশবাবু আমার পঁয়তাল্লিশ বৎসরের বন্ধু। আমি তাঁহার গুণে চিরদিন মুগ্ধ ছিলাম। তিনি যদি কেবল 'বিল্বমঙ্গল' ও 'চৈতন্যলীলা' রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও নাট্য-জগতে—সাহিত্য-জগতে অমর বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

ডাঃ রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর বলেন: গিরিশবাবুর প্রধান গুণ ছিল—তিনি নিজের দোষ গোপন করিতেন না, বরং সাধারণের নিকট দোষ প্রকাশ করিতেই ভালবাসিতেন। মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্রবে তাঁহার সকল দোষের নিরাকরণ এবং চরিত্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এমন পরিবর্ত্তন জগতের ইতিহাসে দুর্ল্লভ। পূজনীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা খুবই সত্য, গিরিশবাবুর অতুলনীয় গ্রন্থাবলীই তাঁহার স্মৃতিমন্দির।

সাহিত্য ও বসুমতী-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলেন: আমি এক কথায় বলিতে পারি—রাজা রামমোহন রায়ের পর গিরিশ-বাবুর ন্যায় সৃষ্টিকুশলী আর কেহ জন্মান নাই। তাঁহার শেষ নাটকে 'তপোবলে'র ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় তিনিও বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয় দ্যুতি বিকীরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাটকের এক একটি চরিত্রকে উজ্জ্বল চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন: স্বদেশীর যখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, গিরিশবাবুই তখন নাট্যশালায় স্বদেশী মন্ত্র প্রচার করিয়া তাহার পুষ্টিবিধান করিয়াছিলেন। গিরিশবাবু যদি গিরিশবাবু না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই 'বিল্বমঙ্গল' লিখিতে পারিতেন না। একদল কবি আছেন—তাঁহারা কোঁচড়ে করিয়া স্বর্ণ লইয়া আকাশে উঠিয়া বর্ষণ করেন, কিন্তু গিরিশবাবু মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া মাটি মাখিয়া আকাশে উঠিয়া স্বর্ণরেণু বৃষ্টি করিতেন!

নায়ক-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন: বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রের শতদল কমল ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তিনি সাহিত্য ও কাব্যের রাজহংস ছিলেন।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন: ভগবান শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছিলেন, ভক্তিরসের তুফান ছুটাইয়া লোককে পাগল করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সে অভিনয় দর্শন সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। গিরিশচন্দ্র ভগবানের সে লীলা রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শন করিয়া মানুষকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই অভিনয় দেখিয়া নাস্তিকের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, পাপীর অন্তর হরিপ্রেমে বিগলিত হইয়া উঠিয়াছিল, পাপস্পৃহা তাহার হৃদয় হইতে চিরদিনের মত মুছিয়া গিয়াছিল। যে লেখকের লেখনীর এমন শক্তি, যিনি

---

* ৩২ বৎসর পূর্ব্বে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলিয়াছেন, স্মরণ রাখিতে হইবে।

লিখিয়া—অভিনয়ে মাতাইয়া পাপীকে পুণ্যবান করিতে পারেন, তাঁহার যে কত শক্তি—তাহা কে নির্ণয় করিবে? এমন শক্তিমান পুরুষ হইয়াও মহাপুরুষ গিরিশচন্দ্রকে জীবিতাবস্থায় লোকের নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছে! কিন্তু আজ তিনি মৃত, আজ তিনি মানুষের নিন্দার অতীত—তাই আজ কাহারও মুখে তাঁহার নিন্দা নাই, সকলেরই মুখে তাঁহার সুখ্যাতি। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়—মরণ বড় পবিত্র জিনিস, মরণের জয় সর্ব্বত্র!

সভাপতি বর্দ্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর বলেন: গিরিশবাবু শুধু নটচূড়ামণি ছিলেন না, তিনি জ্ঞানী ও অন্তরে যোগী ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারাই বুঝিতেন—'তিনি ক্ষ্যাপা মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে' ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি-সভায় সভাপতির পদে বৃত হইয়া আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন বাঙ্গলার প্রধান নেতা। তিনি আলিপুরের দায়রা-আদালত হইতে উক্ত সভায় সভাপতির নামে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি প্রেরণ করেন—দায়রায় একটি সঙ্গীণ মামলা-সম্পর্কে সারাদিন আদালতে উপস্থিত থাকিতে বাধ্য হওয়ায় আমি মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতি-সভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। সভার অনুষ্ঠানের সহিত আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। সভাপতি মহাশয় যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্রখানি সভায় পাঠ করিয়া সমাগত জনবৃন্দকে অনুপস্থিতির কারণ জানাইয়া দেন।

উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অসুস্থতা নিবন্ধন অনুরূপ পত্র যোগে সভার কার্য্যে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

টাউনহলের এই মহাসভাতেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে 'গিরিশ মেমোরিয়াল কমিটি' গঠিত হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি তাহার প্রেসিডেণ্ট, টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্পাদক এবং বঙ্গের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কালক্রমে উক্ত কমিটি সংগৃহীত অর্থে 'গিরিশ পার্কে' গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি, বেলুড় মঠে 'গিরিশ মন্দির' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের তত্ত্বাবধানে প্রতি দুই বৎসর অন্তর গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীর ও নাট্য-কলা সম্বন্ধে আলোচনা-কল্পে 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতামালা'র ব্যবস্থা করেন।

ইহার কিছুকাল পরে আর এক মহাসভায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় গিরিশচন্দ্রের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—গিরিশচন্দ্র ছিলেন খাঁটি দেশী কবি। তাঁহার লেখার যাচাই করিতে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, জার্ম্মানিতে যাইতে হইবে না, দেশীয় ভাবে তিনি দেশমাতৃকার সেবা করিয়াছেন, এই জন্যই তিনি মহাকবি—দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। এমন একদিন আসিবে—যে দিন সমস্ত জগত ভারতের দ্বারে আসিয়া নতজানু হইয়া ভারতের ধর্ম্ম সাহিত্য কাব্য নাটক আলোচনা করিবে। তখন তাঁহারা গিরিশচন্দ্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন, জানিবেন গিরিশচন্দ্র কত বড়!

পরিব্রাজক বিদেশের 'নাট্যশালা' দেখিয়া যেমন তথাকার রুচি সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় প্রাপ্ত হন, তেমনি কোন দেশের পৌর-সভার অনুষ্ঠান হইতে জাতির অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও জীবন-শক্তির আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং উল্লিখিত সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী বত্রিশ বৎসর পরেও আজ আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, জাতির জীবনের উপর কতখানি প্রভাব ছিল গিরিশচন্দ্রের এবং এরূপ ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তির স্থান আমাদের জাতীয় সাহিত্যের কত উচ্চে।

কিন্তু অসংখ্য বিঘ্নসঙ্কুল পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়া কত দুর্ভোগের পর এই স্থানটি আয়ত্ত করা গিরিশচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। এই মনীষীর সহিত যাঁহাদের যোগসূত্র রচনার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, স্মৃতি কথা সাজাইয়াও কেহ কেহ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেগুলি আমাদের সাহিত্যের সম্পদ স্বরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বয়সে এই গম্ভীরপ্রকৃতি বিরাট পুরুষের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে লেখকের মিশিবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ ঘটে—তাহাকে সৌভাগ্য ছাড়া কি বলিব? তরুণ বয়সে সাংবাদিক ও নাট্যকার-রূপে তাঁহার স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া পার্শ্বে বসিয়া নট-নাটক-নাট্যশালা-সম্পর্কে আলোচনা করিবার যে সুযোগ উপস্থিত হয়—তাহার পশ্চাতে ছিল তারুণ্যের অভিমানপুষ্ট এক অভিনব উদ্যম। গিরিশ-প্রসঙ্গে আমার সাহিত্য-জীবনের সহিত সেই তথ্যটির সংযোগ থাকায় উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না।

সেটা ইংরাজী ১৯০৬ অব্দের জুলাই মাস, গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মিরকাশিম' তখন দেশ-প্রেমের উচ্ছ্বাসে দেশবাসীকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, আর সমগ্র দেশ জুড়িয়া বহিয়াছে স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দাম বন্যা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধ মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালীর দৌর্ব্বল্য ও জড়তা ভাঙ্গিয়া সঞ্চার করিয়াছে এক প্রচণ্ড উত্তেজনা। বলা বাহুল্য, আমাদের ছাত্র-জীবনেও তাহা রীতিমত চাঞ্চল্য উপস্থিত করে এবং প্রকৃতিগত শক্তি অনুসারে অধিকাংশ ছাত্রকেই তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। বাণীকুঞ্জের গুঞ্জন শৈশব হইতেই আমাদের কানে বাঁশীর ঝঙ্কার তুলিয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, হেম-নবীন-মাইকেল রবীন্দ্রনাথের কাব্য আর গিরিশচন্দ্রের নাটক শৈশবেই আমাদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল। উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া আমরা এখন মাথা খেলাইতে সুরু করিয়া দিলাম। ফলে, খাতার কাগজে রূপায়িত হইয়া উঠিল এক নাটকীয় চিত্র। সগর্ব্বে ও সানন্দে তাহা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের নিকট দাখিল করিবার উদ্দেশ্যে। এখনকার মত সাময়িক বা মাসিকের ছড়াছড়ি ত তখন ছিল না যে সম্পাদক মহাশয়দের এজলাসে গিয়া ছাপার অক্ষরে ছাপিবার জন্য দাখিল করিব! নাটক যখন লিখিয়াছি তখন নাট্য-সম্রাটের নিকটে লইয়া যাওয়া চাইই—তিনি যেন নূতন লেখকের নাটকখানি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছেন!

তরুণ বয়সের আশা যেমন বিরাট, সাহসও তদ্রূপ দুর্ব্বার। একদা মধ্যাহ্নে গিরিশচন্দ্রের মজলিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, নগ্নদেহ হস্তীকর্ণ এক বিরাট মূর্ত্তির পুরোভাগে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বেশে প্রিয়দর্শন এতগুলি লোক উপবিষ্ট যে অঙ্গুলিপর্ব্বে তাহাদের সংখ্যা কুলায় না। রঙ্গমঞ্চে বহু ভূমিকায় যে বাঞ্ছিত মূর্ত্তিটির বিভিন্ন রূপ দেখিয়াছি—তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না, সশ্রদ্ধ নীরব অভিবাদন জানাইতেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—কি চাই?

তরুণ-সুলভ সাহসে ভর করিয়া নির্ভয়ে উত্তর করিলাম—একখানা নাটক লিখেছি, আপনাকে দেখাতে চাই।

পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—তোমার বয়স কত?

বলিলাম—আঠারো চলছে।

দৃঢ়স্বরে বলিলেন—আজ থেকে আট বছর পরে এসো, তখন তোমার নাটক শুনবো।

কথাগুলি বলিয়াই তিনি এমন সহজ ভঙ্গিতে সম্মুখে উপবিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিগুলির সহিত কথা আরম্ভ করিলেন যে আর দ্বিতীয় কথা বলিবার কিম্বা একটি মিনিট মাত্র তথায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস বা স্পৃহা হইল না। গভীর একটা অভিমান মনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া নামিয়া আসিলাম। উপরে উঠিয়া অত বড় লোকটির ঘরে ঢুকিবার সময় যেমন কোন বাধা পাই নাই, ফিরিবার সময়ও তেমনি কেহই কোনরূপ প্রশ্ন করে নাই—কে আমি, কি আমার নাম।

পাঁচ বৎসর পরের কথা। বাঙ্গলার নাট্যাকাশে তখন নবীন সূর্য্যোদয়

হইয়াছে—দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস, মেবার পতন, সাজাহান প্রভৃতি নাটকরাজির তেজোময় রূপ তরুণ-সমাজের অন্তরে নবতম আলোকপাত করিয়াছে—তখনও গিরিশচন্দ্রের নাট্য-সাধনার বিরাম নাই, শঙ্করাচার্য্য, রাজা অশোক, তপোবল প্রভৃতি নাট্য-সম্রাটের অপরাজেয় প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং অভিজাতবংশীয় নটকেশরী অমরেন্দ্রনাথ দত্তের বিরাট নাট্য-জীবনের দ্বিতীয় যুগ তখন চলিয়াছে। এই সময় তিনি বহু ব্যয়ে 'নাট্য-মন্দির' নামে নট-নাটক-নাট্যশালা-সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকাখানির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্য-দিকপালগণের রচিত প্রবন্ধাবলীর সহিত সাহিত্য-রসিক পাঠক-সমাজকে সুপরিচিত করিতে বদ্ধপরিকর হন। ঘটনাচক্রে উক্ত পত্রিকার সংস্রবে ইহার প্রধান লেখক গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে যেদিন পুনরায় আমাকে উপস্থিত হইতে হয়—সে দিনটির কথাও আমার জীবন-স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

আমার প্রথম নাটক 'বাজীরাও' তখন অভিনীত হইতেছে। 'নাট্য-মন্দির' পরিচালনার ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া অমরবাবু নিশ্চিন্ত। সহসা একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—'গিরিশবাবু আপনাকে ডেকেছেন, আলাপ করতে চান।' যে সুরে অমরবাবু কথাটি বলিলেন তাহার বৈশিষ্ট্যটুকু উপলব্ধি করিয়াও আমি চুপ করিয়া রহিলাম। অমরবাবু পুনরায় বলিলেন—'গিরিশবাবু আপনাকে ডেকেছেন আলাপ করবেন বলে—কথাটা জোর দিয়ে বললুম কেন বোধ হয় বুঝতে পারেন নি!'

বলা বাহুল্য, অমরবাবুর কথা শুনিবামাত্রই আমি ইহার গুরুত্বটুকু বুঝিয়াছিলাম। গিরিশচন্দ্র দুনিয়ায় কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না, কোন সভা-সমিতিতে যান না, অকারণে কাহাকেও ডাকেন না। অথচ তিনিই আমার মত এক তরুণ সাহিত্যসেবীকে সাদরে স্মরণ করিয়াছেন! আমার পক্ষে ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা, আমি কিন্তু নীরব। তখন অতীতের কথাটি আমাকে ব্যক্ত করিতে হইল। অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে অবশেষে বলিলাম—অনেক আগেই আমি তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হতুম, কিন্তু আট বছর পরে তিনি আমাকে নাটক নিয়ে যেতে বলেছিলেন। সে শুভদিন আসতে এখনো তিন বছর বাকি, অথচ তার আগেই আমার নাটক নাট্যশালার পাদপ্রদীপের আলোকে ফুটে উঠেছে। এখন কি করি বলুন ত?

কথাগুলি শুনিয়া অমরবাবুর অপরূপ সুন্দর মুখখানার উপর যে মধুর ভাবটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আজও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। পরম স্নেহভাজনের প্রতি তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধাভাজনের অনুরাগ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ এই সময় নাট্য সংক্রান্ত কোন একটি ব্যাপার লইয়া গিরিশবাবুর সহিত অমরেন্দ্রনাথের মনোমালিন্য চলিতেছিল, অথচ গিরিশচন্দ্র 'নাট্য-মন্দিরে' প্রধান লেখক, তাঁহার রচনার অভাবে 'নাট্য-মন্দির' দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। বিচক্ষণ অমরেন্দ্রনাথ নাট্য-মন্দিরের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গিরিশচন্দ্রের আলয়ে গিয়া মনোমালিন্যের জঞ্জাল নিশ্চিহ্ন করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে আমার অভিমানের কথা শুনিয়া তিনি উল্লাসের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'বিউটিফুল সিচুয়েশন' ত! আরে, আগে এ-কথা বলতে হয়। যা হোক, আপনি এক কাজ করুন—বই ত বেরিয়েছে, একখানা নিয়ে গিয়ে বলুন—নিয়ম ভঙ্গ অমরবাবুই করেছেন, আটটা বছর অপেক্ষা করার আর তর সয়নি, বিচার করে এখন বলুন কি করি?

সেই দিনই অপরাহ্নে নাট্য-গুরু সন্দর্শনে বাহির হইলাম। তিনি আজ নিজে আহ্বান করিয়াছেন; সেদিনের মত খাতা বগলে করিয়া লেখা শুনাইবার আশায় যাইতেছি না—আজ আমি নাট্যকার, আমার নাটক শ্রেষ্ঠ নাট্যশালায় অভিনীত হইতেছে, 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকারও প্রধান কর্ম্মী আমি—সেদিনের তুলনায় যোগ্যতার দিক দিয়া কত পার্থক্য আজ—কিন্তু তবু বুকখানি যেন ভয়ে সঙ্কোচে লজ্জায় দুরু দুরু করিতেছে—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের সে দুঃসাহস আজ যেন অন্তরের অন্তরালে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে!

কম্পিতপদে সেই পরিচিত ঘরখানির ভিতর ঢুকিলাম। শয্যাটির উপর সেই বিরাট পুরুষ উপবিষ্ট, দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণ হইলেও মুখের গাম্ভীর্য্য এবং অসামান্য দুটি কর্ণের সৌন্দর্য্য তেমনই অটুট আছে। একটু তফাতে বসিয়া অবিনাশ বাবু 'তপোবল' নাটকের প্রুফ পড়িতেছেন, নটগুরুর মন ও দৃষ্টি সে দিকেই নিবদ্ধ। চারিধারে বিবিধ গ্রন্থের সারি, হাতের কাছে ছোট একটি ঘণ্টা এবং পিঠ চুলকাইবার একটি ধাতুময় হাত।

ঘরের মধ্যে গিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম, সম্ভাষণের প্রাথমিক ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না, জিহ্বা নীরব। অবিনাশবাবুর সহিত 'নাট্য-মন্দির' আফিসে পূর্ব্বেই আলাপ হইয়াছিল, তিনিই সাদর সম্ভাষণে মুখ রক্ষা করিলেন—'আসুন, আসুন। নাট্য মন্দিরের মণিবাবু! 'বাজীরাও'এর অথার।

শেষের কথাগুলি গৃহস্বামীকেই লক্ষ্য করিয়া বলিলেন। পরক্ষণে নাট্যগুরুর স্নেহের আহ্বান আমার সকল সঙ্কোচ ও স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিল—এসো বাবা এসো, ব'স।

অমরবাবু রহস্য করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন নিয়মভঙ্গের জন্য বিচার চাহিতে। কিন্তু স্নেহের নির্ঝর সে দিন যে ভাবে বহিয়াছিল, কিছুই সেখানে যোগাইবার প্রয়োজন হয় নাই। পূর্ণ একটি ঘণ্টা সেই স্নেহময় মহাপুরুষের সংস্পর্শে কাটাইয়া যখন বাহিরে আসিলাম—মনে হইল, স্বল্প সময়ে যে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি, তাহাকেই পাথেয় করিয়া জীবন-পথে পাড়ি দেওয়া চলে।

ইহার পর প্রতি অপরাহ্নে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া জ্ঞান ও তথ্য আহরণের যে সুযোগ ঘটে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। মহাপ্রস্থানের তিনদিন পূর্ব্বেও 'নৃত্য-কলা' নামে প্রবন্ধের প্রুফ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে শুনাইবার এবং যথাযথ নির্দ্দেশ লইবার নিদর্শনটিও এই প্রসঙ্গের সহিত অচ্ছেদ্য হইয়া আছে। গিরিশচন্দ্রের বিয়োগবার্ত্তার সহিত তাঁহার সেই শেষ প্রবন্ধটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের 'নাট্য-মন্দিরে' প্রকাশিত হইয়াছিল।

গিরিশ শতবার্ষিকী স্মৃতি উৎসবে—গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশ্যে আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি—গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজার মতই মহিমাব্যঞ্জক। যদি ভবিষ্যতে অবকাশ ঘটে—এই মহামনীষার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহার রহস্যময় নাট্যজীবন ও নাটকাবলী সম্বন্ধে যে সকল অভিনব তথ্য সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল তাহা সাহিত্যরসিক সমাজকে উপহার দিয়া ধন্য হইব।

সিন্‌কোনা ও কুইনাইন

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

(৪)

জাভা ও ভারতের সিন্‌কোনা উৎপাদন সম্বন্ধে তুলনা

জাভার সহিত ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার সিন্‌কোনা চাষ তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একই সময়ে (১৮৩২ খৃঃ নাগাদ) ভারতে ও জাভায় সিন্‌কোনা আবাদ বসাইবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আমলের ভারত সরকারের দীর্ঘসূত্রতার জন্য ভারতের আবাদ প্রায় ত্রিশ বৎসর পিছাইয়া পড়ে। এমন কি ভারতের দ্বিতীয় দফার আবাদের জন্য বীজ জাভা হইতেই আমদানী করা হয়।

আবাদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে জাভার সহিত ভারতের প্রধান পার্থক্য এই যে, জাভায় ব্যবসায়িকগণ নিজেদের অর্থে সিন্‌কোনার আবাদ করিতেছেন, কিন্তু ভারতে ইহা সরকারী সম্পত্তি। ভারতে এ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে বিশ্বাস ছিল 'state is the best agency for producing quinine', তবে আইনতঃ ইহা সরকারের একচেটিয়া শিল্প বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। কিন্তু না হইলে কি হয়, ভারতে সিন্‌কোনার আশানুরূপ উন্নতি না হওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্টই এ যাবৎ পূর্ণমাত্রায় দায়ী। তবে আশার কথা এই যে, বাংলা সরকার কুইনাইন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কতকটা উদার মত পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৪৩) কুইনাইনের ভূতপূর্ব্ব ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন যে, যদিও বাংলা সরকার কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সিন্‌কোনা আবাদের জন্য সরকারী জমী বা অর্থসাহায্য দিতে পারিবেন না, কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যদি নিজেরা উপযুক্ত ক্ষেত্র সংগ্রহ করিয়া সিন্‌কোনা আবাদ বসাইতে চাহে, তবে সেক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি আনুষঙ্গিক নানাবিধ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহা হইতে মনে হয়, যে-সমস্ত চা বাগানে কোটা নিরূপণের ফলে ক্ষেত্রের অংশবিশেষ অকেজো হইয়া পড়িয়া আছে, সেগুলি সিন্‌কোনা আবাদের কাজে লাগিতে পারে। মাদ্রাজে এরূপ অনেকগুলি আবাদের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুইনাইনের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এ দেশের শাসক সম্প্রদায় ভারতীয় সিন্‌কোনা ও কুইনাইনের প্রসার সম্বন্ধে কেবলমাত্র উদাসীন নহেন উপরন্তু বিপক্ষপাতীই ছিলেন। বর্ত্তমানে এই মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং অধুনা বিশেষ করিয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক সরকারগুলি জনপ্রিয় মন্ত্রীবর্গের পরিচালনাধীনে আসিবার পর হইতে নানা বিষয়ে সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে। বাংলা সরকারের সিন্‌কোনা বিভাগের উন্নতি সম্বন্ধে দেখিতে গেলে প্রবন্ধের শেষভাগে সিন্‌কোনা বাবদ বাংলা সরকারের আয়, ব্যয় ও নিট্‌ লাভের তালিকাটি দেখিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে।

গবেষণার দিক দিয়া বাংলার তুলনায় জাভা অনেক অগ্রণী। জাভার এক একরে প্রতি বৎসর গড়ে ৬০০ পাউণ্ড লেজারিয়ানা ছাল উৎপাদিত হয় এবং এই ছালে শতকরা ৬ হইতে ৮ ভাগ পর্য্যন্ত কুইনাইন পাওয়া যায়। এদিকে বাংলা দেশের প্রতি একরে গড়পড়তা ৩০০ পাউণ্ড মাত্র শুষ্ক ত্বক্‌ পাওয়া যায় এবং উহাতে কুইনাইনের পরিমাণও মাত্র শতকরা ৪ কিম্বা উর্দ্ধতন ৫ ভাগ। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন হিসাব ধরিয়া জাভার এক একরে বৎসরে (৬০০ × $\frac{৬}{১০০}$) = ৩৬ পাউণ্ড এবং বাংলা দেশে (৩০০ × $\frac{৪}{১০০}$) = ১২ পাউণ্ড কুইনাইন হইয়া থাকে। এদিক দিয়া আমরা জাভার এক তৃতীয়াংশ। অথচ বিশেষজ্ঞগণের মতে বাংলার সিন্‌কোনা ক্ষেত্র জাভার ক্ষেত্রের মাটী ও আবহাওয়ার তুলনায় কোন অংশেই ন্যূন নহে।

জাভার এই উন্নতির মূলে আছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রচেষ্টা। যে উনবিংশ শতাব্দীতে জাভা সিন্‌কোনায় পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল, সেই শতাব্দীতে অর্থাৎ সিন্‌কোনা আবাদের প্রারম্ভ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত মোটের উপর ৭৫,০০,০০০ পাউণ্ড শুষ্কত্বক্‌ সংগ্রহ করিয়াছে এবং নিজের প্রয়োজনে অন্যত্র হইতে ২৬,৯০,০০০ পাউণ্ড ছাল আমদানী করিয়াছে। ঐ শতাব্দীতে অর্থাৎ বাংলাদেশে কুইনাইন কারখানা স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত বাংলার মধ্যে সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র ৮৭,৫৮৪ পাউণ্ড কুইনাইন সাল্‌ফেট ও ১,৪১,৩৮৮ পাউণ্ড সিন্‌কোনা চূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছিল। তবে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সরকারী কুইনাইন

কুইনাইন-বটিকা প্রস্তুতের যন্ত্র

বিভাগ নিজেই নিজের ব্যয় বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য এ বিভাগকে লাভজনক করিবার উদ্দেশ্য সরকারের নাই, কারণ এ বিভাগ হইতে লাভ না করিয়া যথাসম্ভব সুলভে কুইনাইন বিক্রয় করিতে পারিলেই দেশবাসী অধিক উপকৃত হয়।

যাহা হউক উভয় দেশের মোটামুটি তুলনা করিলে সর্ব্বশেষ দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ গড়পড়তা প্রতি বৎসর দেড় লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন আমদানী করে, এবং ক্ষুদ্রকায় যবদ্বীপ প্রতি বৎসর কম বেশী দশ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন রপ্তানি করিয়া থাকে।

এইরূপ অবস্থার কারণ সন্ধান করিতে গেলে আর একবার বলিতে হয় যে, ভারত সরকারের ঔদাসীন্যই ছিল ইহার মূল কারণ। আমাদের শাসক সম্প্রদায় বিদেশ হইতে কুইনাইন আমদানী করিতেন প্রচুর, অথচ সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন, পাছে ভারতে প্রয়োজনাতিরিক্ত কুইনাইন উৎপাদিত হইয়া সিন্‌কোনা বিভাগের লোকসান হয়। যাহা হউক শুভ লক্ষণ এই যে, এতকাল পরে সরকার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াছেন

এবং বুঝিয়াছেন যে আগামী চল্লিশ বৎসরের মধ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদনের কোনরূপ আশঙ্কা আদৌ নাই।

কুইনাইনের কারখানা

মাদ্রাজের কুইনাইন কারখানার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলার কারখানা Government quinine Factory po. Mungpoo Dt. Darjeeling) ইহা অপেক্ষা অনেক বড়। বাংলা সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত এই কারখানাটি মাংপুতে সমুদ্র বক্ষ হইতে ৪,০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই কারখানায় কুইনাইন প্রস্তুত হইতেছে।

এই কারখানায় প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ আছে :—

১। পেষাই বিভাগ—Grinding House

২। চোলাই বিভাগ—Extraction Factory

৩। সাফাই বিভাগ—Purifying and drying house.

উপরোক্ত তিনটি বিভাগের প্রথম দুইটি বৈদ্যুতিক শক্তিতে এবং শেষেরটি বাষ্পীয় শক্তির দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচালিত। এখানকার বৈদ্যুতিক শক্তি 'রাংবি ঝোরা' নামক এক পার্ব্বত্য জলধারা হইতে Hydro Electric Plant এর দ্বারা উৎপাদন করা হয়।

কারখানার তিনটি বিভাগের মধ্যে পেষাই বিভাগে তিনটি বিভিন্ন কাজ হয় :—

(১) প্রথম যন্ত্রে আবাদ হইতে আনীত সিন্‌কোনা বৃক্ষের শুষ্ক ত্বক্‌গুলি চূর্ণ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় যন্ত্রে চূর্ণ ত্বক্‌গুলির শুষ্ক অংশগুলি ছাঁকিয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট মোটা অংশ পুনরায় প্রথম যন্ত্রে পেষণ করিবার জন্য পাঠান হইয়া থাকে।

(৩) তৃতীয় যন্ত্রের সাহায্যে দ্বিতীয় যন্ত্রের দ্বারা ছাঁকিয়া লওয়া শুষ্ক চূর্ণগুলিকে পরিমাণ মত চূণ ও জলের সহিত মিশ্রিত করা হয় এবং এই মিশ্রিত চূণ ও জলে সিন্‌কোনার ত্বক্‌চূর্ণ ৩৬ ঘণ্টা ভিজানো থাকে। পরে উহা পেষাই বিভাগ হইতে চোলাই বিভাগে প্রেরিত হয়।

দ্বিতীয় অর্থাৎ চোলাই বিভাগে ১১টি টব আছে, ইহাদের প্রত্যেকে ৪৪০ পাউণ্ড ত্বক্‌চূর্ণ ধারণ করিতে পারে। ঐ টবে পেষাই বিভাগের চূণ ও জলমিশ্রিত ত্বক্‌চূর্ণ ঢালিয়া নানা প্রক্রিয়ার পর উহাতে কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করা হয় এবং গরম তেল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ফলে ত্বক্‌ চূর্ণ হইতে ক্ষার পদার্থ নিষ্কাশিত হইয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। * দেড় ঘণ্টার মধ্যে কটাহের সমগ্র অংশ থিতাইয়া গেলে উপর হইতে তেলটি তুলিয়া লইয়া উহাতে সাল্‌ফিউরিক্‌ এসিড ও জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে ক্ষার দ্রব্যসহ এসিডটি তলায় জমা হয় ও তেলটি উপরে ভাসিয়া উঠে! এই প্রণালীতে এসিডের সহিত যে কুইনাইন সঞ্চিত হয় উহা 'Quinine Bisulphate'। ইহার পর এই দ্রব পদার্থটিকে জ্বাল দিয়া ও পুনরায় কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করিয়া 'Quinine Sulphate' প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। সাল্‌ফেট্‌ হইবার পর ইহাকে ঠাণ্ডা করা হয় এবং কুইনাইন দানা বাঁধিয়া যায়। এদিকে যে তেলটুকু চূণ, জল ও ত্বক্‌চূর্ণে মিশ্রিত হইয়াছিল তাহা অবিকৃত অবস্থায় নিষ্কাসিত হওয়ায় পুনরায় ক্ষার নিষ্কাসনের কাজে লাগে। প্রকৃতপক্ষে তৈলের বিশেষ কোন খরচই হয় না।

দ্বিতীয় কারখানায় প্রস্তুত দানা বাঁধা কুইনাইন অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া উহাকে শোধন করিবার জন্য তৃতীয় কারখানায় পাঠান হয়। তৃতীয় কারখানায় এই দানার সহিত জল ও অঙ্গারক (carbon) মিশাইয়া ইহাকে বর্ণশূন্য করিয়া সিল্কের ছাঁকনীতে ছাঁকিয়া লওয়া হয়।

এই সূত্রে জ্বরহারী সিন্‌কোনার (cinchona febrifuge) উল্লেখ করিতে হয়। কুইনাইন কারখানায় কুইনাইন সাল্‌ফেট ও সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ একত্রে প্রস্তুত করা হয়, কারণ ইহার সুবিধা এই যে, একই ত্বক্‌চূর্ণ হইতে এই দুই বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিন্‌কোনা ত্বক্‌চূর্ণ হইতে কুইনাইন সালফেট্‌ নিষ্কাসন করার পর অবশিষ্ট যে কয়টি ক্ষার দ্রব্য উহার মধ্যে পড়িয়া থাকে তাহাই একত্রে গ্রহণ করিয়া সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ প্রস্তুত হয়। কুইনাইন সাল্‌ফেটের সহিত সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজের অনুপাত মোটামুটি ২ : ১। এই সমস্ত কারণে কুইনাইন সালফেট এবং সিন্‌কোনা ফেব্রিফিউজ একত্রে উৎপাদন করা লাভজনক এবং সেই জন্যই মাংপুর কারখানায় এখনও পর্য্যন্ত দুই রকমই একত্রে উৎপাদিত হয়। ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর এই কারখানায় ৮,৯৩,৮৪৫ পাউণ্ড শুষ্ক ত্বক্‌ হইতে ৫০,১৬১ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট ও ২৮,৩০৫ পাউণ্ড ফেব্রিফিউজ উৎপাদিত হইয়াছিল।

মাংপুর কারখানায় প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কুইনাইন প্রস্তুত হয়। প্রথমবার ছাঁকিয়া যে কুইনাইন পাওয়া যায় উহা Government Standard অর্থাৎ বাংলা সরকারের স্থিরীকৃত মান অনুযায়ী হইয়া থাকে। উহাকে আর একবার শোধন করিলে যে শ্রেণীর কুইনাইন পাওয়া যায় তাহা B. P. standard বা ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ার মান অনুযায়ী হয়। গভর্ণমেণ্ট স্থিরীকৃত মান শতকরা ৮৫ ভাগ পর্য্যন্ত কুইনাইন থাকে এবং 'বিপি' মান-এ অন্যূন শতকরা ৯৭ ভাগ কুইনাইন থাকিবেই! গভর্ণমেণ্ট মান হইতে 'বিপি' মান-এ পরিবর্ত্তন করিতে পাউণ্ড প্রতি কয়েকখানা মাত্র অধিক খরচ হয়।

কারখানা হইতে এইরূপে কুইনাইনের গুঁড়া প্রস্তুত করিয়া উহাই বটীকা নির্ম্মাণ যন্ত্রের সাহায্যে বটীকাকারে পরিবর্ত্তিত করা হয়। বাংলা সরকারের কুইনাইন বিভাগ গুঁড়া এবং বটীকা উভয় প্রকারই বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিক্রয়ের জন্য কুইনাইন চারি আউন্স এবং এক পাউণ্ডের প্যাকেটে ভর্ত্তি করা হয়।

মাংপু কুইনাইনের কারখানা হইতে প্রতিবৎসর কমবেশী ৫০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে এই দশকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ৫৭,৩১৩ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত হইয়াছিল। এই কারখানাটি পূর্ণমাত্রায় কাজ করিলে বর্ত্তমান অবস্থায় ৬০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপাদন করিতে পারে এবং কারখানায় সামান্য মাত্র উন্নতিসাধন করিলে এখান হইতে বৎসরে ৭৫,০০০ পাউণ্ডও প্রস্তুত হওয়া সম্ভব। দার্জ্জিলিং জেলায় সিন্‌কোনার উপযুক্ত যত জমী বর্ত্তমানে বাংলা সরকারের জ্ঞাতসারে রহিয়াছে, সেই সমস্ত জমীতে আবাদের বন্দোবস্ত করিলে ও কারখানার উৎপাদন শক্তি উপযুক্তভাবে বৰ্দ্ধিত করিলে দশ বারো বৎসর পরে দার্জ্জিলিং জেলা হইতে অন্যূন ১,২০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন নিঃসন্দেহে উৎপাদিত হইতে পারে।

কুইনাইন বিক্রয়

বাংলা দেশে কুইনাইন প্রস্তুতের প্রথম দিকের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কি এক অজ্ঞাত ও রহস্যময় কারণে ভারত সচিব লর্ড স্যালিস্‌বারী (Marquess of Salisbury ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ভারত সচিব ছিলেন) স্থির করিয়াছিলেন যে, বাংলা দেশে বিক্রয়ের জন্য কুইনাইন প্রস্তুত করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেবল দেশের মধ্যে জ্বরহারী হিসাবে সিন্‌কোনা চূর্ণ (cinchona febrifuge) সরবরাহ করিতে পারিলেই বঙ্গীয় সিন্‌কোনা বিভাগের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে। এই কথাটি ১৮৭৪

---

* Sir George King এবং G. A. Gammie 'Oil process of Quinine Manufacture' এর উপর গবেষণা করিয়া সাফল্যলাভ করিবার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার এই বিষয়টির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেন। বর্ত্তমানের অনুসৃত কুইনাইন নিষ্কাসন ব্যবস্থা এই গবেষণা অনুসারেই হইয়া থাকে।

খৃষ্টাব্দে যখন বাংলা সরকার কম-লাভের সিন্‌কোনা সাক্‌সিরুব্রার পরিবর্ত্তে অধিকলাভজনক সিন্‌কোনা লেজারিয়ানা আবাদ করিবার জন্ত নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, সেই সময়ে বলা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, বাংলা দেশকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক হারে অতিরিক্ত সিন্‌কোনা প্রস্তুত করিতে হইবে না। তাঁহারা বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, কুইনাইনের যাবতীয় প্রয়োজন আমদানী করিয়াই মিটিবে। ঐ সময়ে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় সমস্তই ইংলণ্ডের সহিত হইয়া থাকিত।

যাহা হউক, জ্বরহারী সিন্‌কোনাচূর্ণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা বাংলাদেশে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং দেড় বৎসর পরে ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে উহা সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া দেশের আভ্যন্তরীণ সরকারী ব্যবহারে নিয়োজিত হইয়াছিল। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে ইতিপূর্ব্বে যত কুইনাইন গড়ে প্রতি বৎসর আমদানী করিতে হইত, তাহার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আমদানী হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার পর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের কারখানায় অর্থাৎ উপরে বর্ণিত মাংপু কারখানায় প্রথম কুইনাইন প্রস্তুত হয়। এই সময় কারখানার পরিমাণ এতই ছোট ছিল যে, যতটুকু সামান্ত বৃক্ষত্বক এ দেশে পাওয়া যাইত, সেটুকুই সমগ্রভাবে এই কারখানায় ব্যবহৃত হইতে পারিত না। যাহা হউক এই সময় হইতে দেশী কুইনাইন ও কেব্রিফিউজ দুই রকমই সরকারী হাঁসপাতালে ও অন্যান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হইতেছে।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারতে সিন্‌কোনার আবাদ ও কুইনাইন প্রস্তুতের ব্যবস্থা বিশেষ উন্নতিলাভ করে। বঙ্গদেশ, মাদ্রাজ ও তৎকালে সিংহলেও সিন্‌কোনার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়, এমন কি ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই কুইনাইন সাল্‌ফেটের দাম অত্যন্ত কমিয়া যায়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাংলার যাবতীয় কুইনাইন সরকারী কাজেই ব্যবহৃত হইত, বাজারে বিক্রয় করা হইত না। বাজারের যাবতীয় কুইনাইন বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রচুর কুইনাইন গুদামে সঞ্চিত হইয়া যাওয়ায় ইহা সাধারণ্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা বাধ্য হইয়া করিতে হয়। যাহাতে দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে সকলেই ইহাকে হাতের কাছে পাইতে পারে এই জন্ত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে পোষ্ট অফিসে কুইনাইন বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ও কাগজের মোড়কে ৫ গ্রেণ কুইনাইন এক পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই প্রথম দেশী কুইনাইন বিক্রয়ের ইতিহাস এবং ইহা হইতেই পোষ্ট অফিসের কুইনাইন কথাটি এদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

পোষ্ট অফিসের কুইনাইন পরবর্ত্তী কালে আরও সুলভ হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে এক পয়সার মোড়ককে ৫ হইতে বাড়াইয়া ৭ গ্রেণ করা হয় এবং ১৯০৯ হইতে ইহাকে ১০ গ্রেণ করা হইয়াছিল। ১০ গ্রেণ কুইনাইন চূর্ণ বা ৩৸০ গ্রেণের তিনটি বটীকা কাগজের মোড়কে বিক্রীত হইত। এই বৎসর হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে পরীক্ষামূলক ভাবে ২০টি ৪-গ্রেণী বটীকা শিশি ভরিয়া তিন আনা মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ করা হয় এবং চারি বৎসর পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে 'শিশি'র কুইনাইন সারা বাংলায় বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে ইহার মূল্য বাড়াইয়া চারি আনা করা হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই মূল্য দ্বিগুণ করা হইয়াছিল।

পোষ্ট অফিসের ন্তায় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কুইনাইন বিক্রয় ইটালী দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ওদেশে ম্যালেরিয়া নিরাকরণের জন্ত কুইনাইনের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় সরকারী কুইনাইন (state quinine), সূচী চিকিৎসার জন্ত পরিশুদ্ধ কুইনাইন ও শিশুদের ব্যবহারের জন্ত কুইনাইন ট্যানেট মিশ্রিত 'চকোলেট বন্‌বন্‌' বা একজাতীয় লজঞ্জুস প্রস্তুত করিয়া পোষ্ট অফিস, ইটালিয়ান রেড্ ক্রশ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এবং পল্লীগ্রামের সাধারণ দোকানে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা বিশেষ ফল পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও দেখা গেল যে পোষ্ট অফিসের মারফৎ কুইনাইন বিক্রয়ই বিশেষ কার্য্যকরী হইল, কারণ বোম্বাই প্রদেশে গ্রামের মোড়লদের দ্বারা ও আসামে 'গাঁওবুড়া'দের সাহায্যে সরকারী কুইনাইন বিক্রয়ের প্রচেষ্টা কৃতকার্য্য হয় নাই।

বাংলা দেশে পোষ্ট অফিসের মারফৎ গত চারি বৎসরে কত কুইনাইন বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

বৎসর	পাউণ্ড	মোড়ক সংখ্যা
১৯৩৮-৩৯	৯,৯৪২	৮৬,৯৯৪
১৯৩৯-৪০	৯,৫০১	৮৩,১৩৪
১৯৪০-৪১	১২,৪১৯	১,০৮,৬৬৯
১৯৪১ ৪২	৮,৭০০	৭৬,১২৬

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগের অনুমান যে, বর্ত্তমানে এই প্রদেশের প্রায় ৬০,০০,০০০ অধিবাসী ডাক্তারের সহিত পরামর্শ না করিয়াই পোষ্ট অফিস ও দোকান হইতে পরিমাণমত কুইনাইন কিনিয়া সেবন করিয়া থাকে।

বাংলাদেশের মফঃস্বলে পোষ্ট অফিস ছাড়া সাধারণের কাছে খুচরা কুইনাইন বিক্রয়ের আর একটি স্থান ছিল বা আছে—উহা সিভিল সার্জ্জেনের অফিস। এ ছাড়া দেশী কুইনাইন গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালে, মিলিটারী ও পুলিস বিভাগে, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ও রেলোয়ে ইত্যাদি বিভাগীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত এবং হয়। তবে পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট ছাড়া অন্যত্র ইহার পাইকারী বিক্রয় বা রপ্তানি ছিল না।

সিন্‌কোনা বিভাগে নিযুক্ত কয়েকজন পাহাড়িয়া শ্রমিক

অর্থাৎ ছয় সাত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাজারের যাবতীয় কুইনাইন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। এইরূপ উল্টা ব্যবস্থার ফলে প্রচুর পরিমাণে দেশী কুইনাইন গুদামে জমিয়া যাওয়ায় ১৯৩৬ সালের ১০ই নভেম্বর বাংলা সরকার সাওয়ালেশ এণ্ড কোং এবং চৌধুরী কোম্পানীর সহিত কুইনাইন বিক্রয়ের যুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলা সরকার উক্ত কোম্পানীদ্বয়কে প্রতি বৎসর ২৫,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন সরবরাহ করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং ঐ অঙ্গীকার ছয় বৎসর যাবৎ অর্থাৎ ১৯৪২ নভেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল। Reserve field অর্থাৎ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের গভর্ণমেণ্ট হাসপাতাল, মিলিটারী ও পুলিস বিভাগ ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় কুইনাইন সরবরাহ করিবার কেন্দ্র ছিল গভর্ণমেণ্টের আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেল। সাওয়ালেশ ও চৌধুরী কোম্পানী প্রেসিডেন্সি জেল হইতে যাহাদের কুইনাইন দেওয়া হইত, সেই সমস্ত স্থান ছাড়া অন্যত্র কুইনাইন বিক্রয় করিত। এ ছাড়া ১৯৩৬ সালেই ভারত সরকার বাংলা সরকারের সহিত একত্র হইয়া তিন বৎসরের জন্ত বহির্ভারতেও কুইনাইন বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে দেখা যায় যে, সরকারী কুইনাইন প্রেসিডেন্সী জেল ও সাওয়ালেশ এই দুইটি কেন্দ্র হইতে দেওয়া হইত। বহুদিন ধরিয়া দুইটি বিক্রয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রকে এক করিবার জন্ত কথা চলিতেছিল।

তদনুসারে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব কুইনাইন বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়। প্রথমেই প্রেসিডেন্সী জেলের কাজ এই ডিপোর উপর ন্যস্ত করা হয়। সওয়ালেশ কোম্পানীর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হইতে ঐ কাজও এই ডিপোর উপর আসিয়াছে। এই ডিপোটি উপস্থিত কলিকাতার হিন্দুস্থান বিল্ডিংসএ স্থাপিত রহিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ইহার ম্যানেজার। প্রেসিডেন্সি জেল হইতে কুইনাইন বিতরণের কাজও এই অবনীবাবুই করিতেন।

কুইনাইনের মূল্য (সমস্ত মূল্যই কুইনাইন সালফেটের দেওয়া হইল)

ভারতের মধ্যে কুইনাইন উৎপাদনের প্রধানতম স্থান দার্জ্জিলিং জেলা। এখানে কুইনাইনের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় পাউণ্ড প্রতি ১৩্ হইতে ১৪্ টাকা করিয়া পড়ে। এই ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগ কুলী ও কর্ম্মচারীদের পারিশ্রমিক ও বেতন খাতে। মাদ্রাজে কুইনাইনের উৎপাদন ব্যয় পাউণ্ড প্রতি ১৫্ টাকা। তবে বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য নানারূপ ব্যয় বাহুল্যের ফলে পাউণ্ড প্রতি গড় উৎপাদন খরচ কিছু বাড়িয়াছে।

ভারতে যখন কুইনাইন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় নাই, তখন আমদানী-করা কুইনাইনের মূল্য ছিল প্রতি পাউণ্ড ১১২্ টাকা।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা, মাদ্রাজ ও সিংহলে কুইনাইন প্রস্তুতের ফলে ইহার মূল্য কমিয়া ৩৭্ টাকা হইয়াছিল। বাংলাদেশে কুইনাইন সালফেটের দাম হইয়াছিল পাউণ্ড প্রতি ২০্ টাকা এবং সিনকোনা ফেব্রিফিউজ ১৭্ টাকা।

১৮৯২-১৯০৩ পর্য্যন্ত সরকারী কুইনাইনের মূল্য ছিল প্রতি পাউণ্ড ২১৸৵০—ইহা বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতা কমিশন পাইত ৩৷০।

১৯০৪-১৯০৯—সরকারী কুইনাইনের মূল্য হয় প্রতি পাউণ্ড ১৫৷৵০ (ইহা হইতে বিক্রেতাকে কমিশন দেওয়া হইত ২৷০)।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে মাংপু ও মানসংএর একত্র উৎপাদনের ফলে কুইনাইনের বাজার দর কমিয়া পাউণ্ড প্রতি ৯্ হইতে ১৩্ টাকা দাঁড়াইয়াছিল। সরকারী কুইনাইনের দাম হয় ১০৸৵০ (কমিশন ১৸)।

১৯১৩—সরকারী কুইনাইনের দাম ১৬৷৵১০ (কমিশন ৩৷৵৫)

গত মহাযুদ্ধের শেষভাগে (১৯১৬-১৮) কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া বাজারে প্রতি পাউণ্ড ৩০্ টাকা হইতে নাকি ৬০্ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ঐ সময় গভর্ণমেণ্টের কুইনাইনের গড় দাম ছিল ২১৸৵ (কমিশন ৩৷৵৫) ও সর্ব্বোচ্চ দাম উঠিয়াছিল ৩০্ টাকা। গভর্ণমেণ্ট কুইনাইনের দর কম রাখার কারণ এই যে, দেশের জনসাধারণ গরীবের ঔষধ কুইনাইনের মূল্য কম রাখিবার জন্য নানারূপ আন্দোলন করে; তবে যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া এবং যুদ্ধকালীন তেজী বাজার ও মুদ্রাসম্প্রসারণের (Inflation) জন্য মূল্যের ঘাট্‌তি বাড়তি অবশ্যম্ভাবী।

১৯১৮-১৯ সরকারী কুইনাইনের দর ৪৬৸০ (কমিশন ৫৷৵১০)

১৯২১ খৃষ্টাব্দে কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৪৮্ টাকা। এই সময় কুইনাইনের যোগান বাড়াইবার জন্য জাভা হইতে সিন্‌কোনা ছাল আমদানী করিয়া মাংপুর কারখানায় ভারত সরকারের প্রয়োজনের জন্য কুইনাইন প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ইহার ফলে কুইনাইনের মূল্য অনেক কমিয়া যায়।

১৯২৬-২৭ হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কুইনাইনের মূল্য ১৮্ টাকা ছিল। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ১৯৪০ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত কুইনাইনের মূল্য পূর্ব্ব মূল্যের শতকরা ৩৩⅓ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া ২৪্ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। ১লা ডিসেম্বর হইতে পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া এক পাউণ্ডের দাম হইয়াছিল ২৫৷০। বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৪৩) ৩রা মার্চ্চ হইতে পুনরায় বর্দ্ধিত করিয়া উহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৩৭্ টাকা। কিন্তু জাভা জাপানের হস্তগত হইবার পর হইতে বাজারে কুইনাইনের পাইকারী দর সরকারী মূল্যের বহুগুণ উপরে উঠিয়া গিয়াছে। অবশ্য আইনের দৃষ্টিতে ইহা ব্ল্যাকমার্কেট প্রাইস বা চোরা বাজারের দর।

এই প্রসঙ্গে বাংলার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ বিহারে কুইনাইনের মূল্য সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে কুইনাইন অনেকটা দুষ্প্রাপ্য হওয়ার জন্য বিহার প্রাদেশিক সরকার রাঁচির নামকুমে একটি প্রাদেশিক ডিপো খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এখান হইতে রেজিষ্টার্ড ঔষধের দোকানে ও যে সকল চিকিৎসকের এইরূপ দোকান বা ডাক্তারখানা আছে, তাহাদিগকে কুইনাইন বিক্রয় করা হইবে। বিহার সরকার কুইনাইন ও জ্বরহারী সিন্‌কোনার মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন প্রতি পাউণ্ড যথাক্রমে ৩২্ টাকা ও ১৬৷০ এবং ঔষধের দোকানগুলি সর্ব্বোচ্চ খুচরা ৩৬৸৵০ ও ১৮৷৵০ দরে বিক্রয় করিতে পারিবে। উপরন্তু বটীকা প্রস্তুতের বন্দোবস্ত ঠিক হইলে বিহার প্রাদেশিক পোষ্ট অফিসের মারফৎ ।৵০ আনায় এক প্যাকেট করিয়া কুইনাইন বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ প্যাকেটে ৪ গ্রেণের ২০টি করিয়া বটীকা থাকিবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

অগ্নি-গিরি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

গিরিবালা নয়—আগ্নেয়গিরি ! ষোল বছরের মেয়ে—
সহসা সেদিন হেরিনু সভয়ে বিস্মিত চোখ চেয়ে !

ঐটুকু বুকে এত অভিমান জমে' উঠে' এতদিন
কোন্ সে রুদ্ধ গুপ্ত গুহায় ছিল তা সুপ্তিলীন ?
একটি আঘাতে কাটিয়া পড়িল সঙ্কোচ-বাধা টুটে'—
গলিত অশ্রু, স্খলিত বাক্য, রক্ত নেত্রপুটে !

কি আর বলেছি ; বলেছিনু শুধু, "মিটেছে স্বপ্ন-আশা,
ক্ষমিও আমারে,—চলিনু বিদেশে, ভুলে' যেও ভালবাসা,
এই সংসার রঙ্গমঞ্চ অদৃষ্ট-দেবতার,
এতদিনকার প্রণয়-লীলার আজি অবসান তার !"

—"সবই অভিনয় ! তাই বুঝি মোরে ভুলায়েছ এতদিন ?"
সর্পিণীসম গর্জ্জন তার ক্রন্দনে হ'ল লীন !
রমণীর প্রেমই রমণীর প্রাণ, শুধু স্নেহ-মন নহে ;—
কাঁপিয়া উঠিনু অগ্নি-গিরির আগ্নের পরিচয়ে !

একজন বিদেশী বন্ধু

শ্রীবীণা দে

ব্যথিত চিত্তে যে বন্ধুটীর কথা লিখ্‌তে ব'সেছি, তাঁর নাম মিঃ এইচ, পন্টেন মুলার। ইনি ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের আশ্বিন মাসে সুইডেনে জন্মগ্রহণ করেন। মিঃ মুলার দেহে ও নামে সুইডীস হ'লেও মনে প্রাণে খাঁটি ভারতীয় হিন্দু ছিলেন। ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শনে তাঁর প্রচুর পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রেও তাঁর অসামান্য জ্ঞান ছিল। গীতার কর্ম্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, আত্মার অবিনশ্বরতা এবং দেহের নশ্বরতায় তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।

তিনি ভারতের যা' কিছু শাশ্বত, সুন্দর ও মহৎ, তা'র সাথে সুইডেনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ; আর সুইডেনের যা' কিছু শ্রেষ্ঠ ও সুষ্ঠু তাই ভারতের বুকে বিলিয়ে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রেছেন। আজ প্রায় ৩৮ বছর ধরে' তিনি এই সাধনাই করে' গেছেন নীরবে—নিজেকে অন্তরালে রেখে। এই কল্‌কাতাতেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন এবং শেষ নিশ্বাসও এখানেই ফেলেছেন, কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁকে চিন্‌ত।

তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন,—৺অটলবিহারী ঘোষ, ৺গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর জন্ উড্‌রফ্ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথের প্রতি মুলারের যে কী অসীম ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, তা' ভাষায় বোঝানো যায় না। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিরও তিনি একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্টের মূল সদস্য ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের এবং তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের আঁকা বহু ভাল ছবি তাঁর সংগ্রহের মধ্যে আছে। যা' কিছু সুন্দর যা' কিছু শ্রেষ্ঠ, সব সময় তিনি তার আদর ক'রেছেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। প্রথম যখন গীতাঞ্জলি ইংরাজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখন মিঃ মুলার লণ্ডনে ছিলেন। নিজের টাকায় তিনি দু'শো কপি ইংরাজী গীতাঞ্জলি কিনে সুইডেনে বড় বড় লোকদের উপহার দেন এবং গীতাঞ্জলির অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গানের অন্তর্নিহিত গভীর ভাব, আর কোন বিদেশী বোধহয় মিঃ মুলারের মত এমনভাবে বুঝ্‌তে এবং বোঝাতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ যখন এ জগৎ ছেড়ে চলে' যান, মিঃ মুলার তখন করাচীতে ; নিজে ব্যক্তিগতভাবে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে' 'তার' করেন, তা' ছাড়া সমগ্র সুইডেনের পক্ষ থেকে সুইডীস রাজকীয় প্রতিনিধির দ্বারায় গভীর দুঃখ ও সহানুভূতি জানিয়ে 'তার' করেন। তিনি সব সময়েই ভারত এবং সুইডেনের মধ্যে কৃষ্টির দিক দিয়ে দোভাষীর কাজ ক'রেছেন।

যখনই কোন নূতন সুইডীস ভারতে এসেছেন, তিনি আগেই এসে মিঃ মুলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছেন, মিঃ মুলারের উপদেশ ও পরামর্শ মত কাজ ক'রেছেন।

মিঃ মুলার কুড়ি বছর বয়সে ব্যবসায়সূত্রে ভারতে আসেন। চামড়ার ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধনশালী হ'ন। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকেই তিনি নির্জ্জনতা প্রিয় হ'য়ে পড়েন। যুদ্ধারম্ভের কিছুদিন আগে থেকেই তিনি চামড়ার ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলেন। পরে তিনি 'উইমকো' দেশলাই কোম্পানীর কলিকাতা অফিসের প্রধান কর্ত্তারূপে কাজ করেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা, এক পুত্র। তিন জনেই সুইডেনে। বড় মেয়ে ইরীদ্ মুলার, স্বভাবে মৃদু মধুর বাঙালী মেয়ের মত। অবনীন্দ্রনাথ ইরীদকে খুবই স্নেহ করেন। ইরীদ্ পিতার ভাবে অনুপ্রাণিত। আমাদের সাড়ী এবং ধূপের সৌরভ তা'র সবচেয়ে প্রিয় এবং বড় বিলাসের সামগ্রী।

মিঃ মুলার সব বিষয়েই আভিজাত্যপূর্ণ সুরুচির পরিচয় দিতেন। তাঁর মেঝের কার্পেট ছিল পারস্যদেশের উৎকৃষ্ট নিদর্শন, ঘরের পর্দ্দা দক্ষিণ ভারতের পরিকল্পনায় বোনা দেশী তাঁতের কাপড় ; ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথের ছবি ও মুকুলদের এচিং। টেবিলের উপর সাজানো থাক্‌ত দক্ষিণ ভারতীয় পিতল ও ব্রোঞ্জের বহু পুরাতন ও সুন্দর মূর্ত্তি। তাঁর বাড়ীর রান্না, খাবার ও পানীয় বন্ধুমহলে বিখ্যাত ও লোভনীয় ছিল। খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। নিজে ইদানীং খেতেন দৈ, আর পান করতেন ডাবের জল ও কমলালেবুর রস। চায়ের সঙ্গে বিকেলে নিম্‌কি ও সন্দেশ খেতে খুব ভালবাসতেন। খাবার টেবিলে বসে' আমরা তথাকথিত হিন্দুরা যখন মাংস ডিমের শ্রাদ্ধ ক'রেছি, তখন মিঃ মুলার বসে' আপেল ষ্টু এবং দৈ খেয়েছেন। মাংস দিতে গেলেই হেসে ব'লেছেন "অখাদ্য আমি খাই না, আমি ব্রাহ্মণ।" নিজেকে সব সময়ে 'ভারতীয় হিন্দু' বলে' পরিচয় দিতে ভালবাস্‌তেন। নিজে একাদশী,

মিঃ এইচ-পন্টেন মুলার
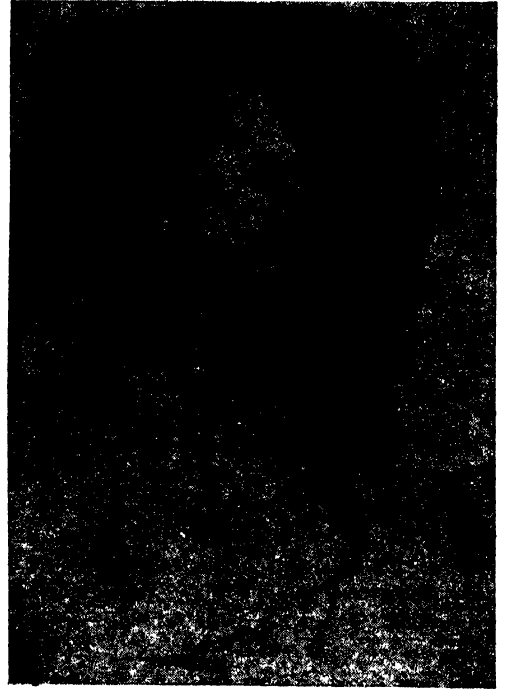
পূর্ণিমা, অমাবস্যা ক'র্‌তেন। হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন—কয়েক বছর আগে নিজের কোষ্ঠী তৈয়ারী করান এবং কাশী থেকে ভৃগু করিয়ে আনান। কিছুদিন থেকে তাঁর ক'ল্‌কাতার বাইরে নির্জ্জনে একটা খড়ে-ছাওয়া মাটীরঘর ক'রবার ইচ্ছা হ'য়েছিল। এই উদ্দেশ্যে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রিয়তম বন্ধু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান।

১৪ই মার্চ্চ রবিবার বেলা চারটার সময় তিনি হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হ'ন এবং ১৭ই মার্চ্চ ১৯৪৩ ভোর ছ'টায় তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। পুষ্পশোভিত বহুমূল্য শবাধারে তাঁর দেহ রক্ষা করে' রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে' তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রার্থনার পর তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। শুক্রবার সকালে শিল্পী মুকুল দে এবং কুমার সুহৃদচন্দ্র সিংহ মুলারের অস্থি গঙ্গায় দিয়ে' আসেন।

বৈশাখের তারা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

মহাবিষুব সংক্রান্তির নিশি শেষে নবীন উষার আবাহন—শুভ নববর্ষ। রঙীণ সন্ধ্যায় প্রখর রবি যখন অস্ত যাবেন, পশ্চিম আকাশের ললাটে সগৌরবে জ্বলে উঠ্‌বে শান্ত শুক্র—অমল শুভ্র দীপ্ত গ্রহ। নীল গগনে তারার সভায় বিরাজ কর্বেন দশমীর চাঁদ। সুধাংশুর শীতল কর বহু নক্ষত্রকে হতশ্রী কর্বে। তবু বহু সহস্র নক্ষত্রের উদাস উজ্জ্বল রূপে আকাশ-পট সমুজ্জ্বল হবে। যুগ-যুগান্তর এরা পৃথিবী-রঙ্গ-মঞ্চের নীরব দর্শক। ধরণী জন্মিবার কোটী কোটী বৎসর পূর্ব হ'তে তারা অসীম ব্যোমে সমাহিত। শুভ নববর্ষে এরা স্থানান্তরিত হবেন। এদের সম্মুখে যুগে যুগে কত পথিক নীহারিকা ব্যোম পথে ভেসে গেছে, কত গ্রহ-কঙ্কর কত নক্ষত্রের আকর্ষণে তাদের বিশাল দেহে আশ্রয় নিয়েছে। কত পৃথিবী জন্মেছে, কত গ্রহতারকা অবলুপ্ত হ'য়েছে। বিপুলকায় নক্ষত্র-রাজি কোটি কোটি যোজন দূর হ'তে চিরদিন আমাদের দৃষ্টিপথে ঝলমল করে। এ বিশাল বিশ্বে আমাদের সুমহান দেব দিবাকর স্বয়ং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র।

খোলা মাঠে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকলে কতকগুলি জ্যোতিষ্ককে ঠিক এক রকম জোট বেঁধে থাকতে দেখি। সমাজের প্রাক্কাল থেকে মানুষ অনেকের নাম দিয়েছে। ধ্রুবতারা দেখে প্রাচীন নাবিকরা অকুতোভয়ে সমুদ্রের উপর নিরুদ্দেশ যাত্রা ক'রে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করত। শিশুকাল হ'তে আমরা পুস্তকে অনেক গ্রহ-নক্ষত্রের নাম পড়ি। কিন্তু আকাশ-ছাওয়া জ্যোতিষ্কদের কোন্‌টি কে, এ কথা জানবার সাধ হয়। আজ শুভ পহেলা বৈশাখে তারার সভায় বিচরণ করে আমরা তাদের চেনবার চেষ্টা করব।

সন্ধ্যা হতে উষার প্রাক্কাল অবধি গগন সাজানো থাকে তারকায়। সারা পৃথিবীর উপর আকাশপট যেন নীল রঙের ছাতা। তাতে গ্রহ-নক্ষত্রের আকারে চুমকী বসানো। এই নক্ষত্র সমাহিত চাঁদোয়াখানি কে যেন ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে টেনে নেয়। সন্ধ্যায় যাদের পূর্ব্ব গগনে দেখি অধিক রাত্রে তাদের আর দর্শন পাইনা। সন্ধ্যায় যারা মাথার উপর থাকে, নিত্য তারা ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে হেলে পড়ে। পূর্ব্ব-গগনে যারা থাকে তারা মাথার উপর উঠে পশ্চিমের দিকে সরে যায়। যাদের পূব-গগনে প্রথম রাত্রে দেখিনি, তারা রাত্রের মাঝে বা নিশির শেষ ভাগে পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়। চাঁদোয়ায় টান পড়ে। আবার পরের দিন সন্ধ্যায় যে সেখানে ছিল সে সেখানে এসে জোটে। ঠিক পূর্ব্বদিনের নিজ নিজ স্থান অধিকার করতে প্রত্যেকের ৩ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড বিলম্ব হয়। এইটুকু বিলম্ব হয় বলে পশ্চিম দিগন্তে যে নক্ষত্রেরা আজ আছে, এক মাস পরে তাদের আর সেথায় দেখ্‌তে পাবনা। মাথার উপরের তারকা-খচিত আস্তরণ খানিতে নিশি নিশি টান পড়ে, তাই তার একটা মাসিক গোটাবার পালা আছে। যাদের পহেলা বৈশাখ পূর্ব্ব গগনের নিচে দেখতে পাবোনা জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগে এমন অনেক অজানারা সেখানে দেখা দেবে। মনে হয় যেন ছাতাটিও একটি গোলক, পৃথিবীর চারি দিকে পূর্ব্ব হতে পশ্চিমে ঘুরছে।

আসল ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরূপ। আকাশে নক্ষত্রেরা নিজ নিজ স্থানে চিরদিন বিদ্যমান। তাদেরও গতি আছে। কিন্তু নক্ষত্রদের পরিচয় পাবার সন্ধানে আমাদের সে গতির কথা জানবার প্রয়োজন নাই। বলছিলাম নক্ষত্রেরা নিজ নিজ স্থানে ঠিক্ সাজানো আছে। তাই তাদের বলা হয় সমাহিত নক্ষত্র বা ফিক্স্‌ড্ ষ্টার। তারা নির্দ্দিষ্ট স্থলে আছে বলে তাদের এক একটি ব্যূহ নির্দ্ধারিত ক'রে আমরা তাদের চিন্‌তে পারি। সেই সমষ্টির তারকাদের সত্যই পরস্পরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। তারা কেহ কাহারও সন্নিকটেও নাই। তারা প্রত্যেকে এক একটা সূর্য্য। যাদের আমরা একটি নক্ষত্র দেখি তাদের মধ্যে অনেকে দুটা বা অধিক নক্ষত্রের সম্মিলিত রূপ। দূর হ'তে এক দেখায়। প্রত্যেকেই আমাদের সূর্য্য হতে বহুগুণ বড়। রবিকে ঘিরে যেমন গ্রহ, উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষে ঘুরচে, ঐ সব সূর্য্যদেরও প্রদক্ষিণ করবার গ্রহ, উপগ্রহ আছে। তাদের জ্যোতিও সূর্য্যের জ্যোতির বহুগুণ। তাই আমরা নক্ষত্রদের আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র ধরিত্রীর বক্ষ হ'তে দেখতে পাই।

আকাশে সমাহিত এই নির্দ্দিষ্ট তারকা মণ্ডলদের আমরা চলতে দেখি, কারণ পৃথিবী নিজের অক্ষে সূর্য্যকে সম্মুখে রেখে লাট্টুর মতো ঘুরছে। সে ঘোরে পশ্চিম হতে পূর্ব্বদিকে তাই মনে হয় আকাশের পটটা পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্চে। তাতে সমাহিত এক এক সারি নক্ষত্র পশ্চিম দিগন্তের অন্তরালে হারিয়ে যাচ্চে। সূর্য্য উদয় হ'তে পর উদয়ের মুহূর্ত্ত অবধি এক দিনমান। সেই দিনমানে পৃথিবী এক পাক ঘোরে। পৃথিবীর কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থল ঠিক্ পরদিন মধ্যাহ্নে সূর্য্যের অব্যবহিত নিয়ে আস্‌তে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। কিন্তু তারকার বিশ্বে ঠিক্ পৃথিবীর আবর্ত্তনের সময় নির্দ্ধারিত করা হয় অন্য প্রকারে। আজ ঠিক যে সময় সূর্য্য মাথার উপর আকাশ পটের অব্যবহিত মাঝখানে তুঙ্গে পৌঁছায়, ঠিক সেই স্থলে পরদিন সূর্য্যকে ধরতে পৃথিবীর সময় লাগে, এক পাক ঘোরার পরও তিন মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড। কারণ সূর্য্য নিজে প্রতিদিন আকাশ পথে সরে যাচ্ছে। পৃথিবী এক পাক ঘুরে ঠিক তার নীচে আসতে পারেনা। নক্ষত্র সময় তাই প্রতিদিন আমাদের সময় অপেক্ষা ৩ মিঃ ৫৬ সেঃ বেশী। নিজের অক্ষে আবর্ত্তন করতে মেদিনীর সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেকেণ্ড। জ্যোতিষীরা একে বলে তারকা-বিশ্বের সময়, সাইডিরিয়েল টাইম। জ্যোতিষ্কদের গতি-বিধি লক্ষ্য করবার জন্য যে সব আধুনিক মান-মন্দির বা অব্‌সারভেটারি আছে সেখানে যে সব ঘড়ি আছে তারা তারকা-বিশ্বের সময় নির্দ্দেশ করে। এদের দিনমান তাই আমাদের মানে ২৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড। এ থেকে প্রমাণ হয় যে প্রতিদিন সূর্য্যকে ধরতে পৃথিবীর এক পাক ঘোরবার পর প্রায় চার মিনিট অধিক সময় লাগে। যোগ করলে পৃথিবীকে বাস্তবিক বছরে অর্থাৎ ৩৬৫।০ দিনে ৩৬৬।০ পাক্ ঘুরতে হয়। তার কারণ এই যে আমাদের সৌর মণ্ডলের মণ্ডলাধিপতি সূর্য্যদেব স্বয়ং প্রত্যহ আকাশ পথে এক এক ডিগ্রী সরে যান।

জ্যোতিষ্কদের পরিচয় পাবার পক্ষে পৃথিবী স্থির এবং আকাশপট পশ্চিম-গগনে গুটিয়ে যাচ্চে, এই আপাতঃ দৃষ্টি-ভঙ্গিই বিশেষ সহায়ক। জ্যোতিষ্করা স্থির আছে। সবাই এক জোটে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে পশ্চিম পথে যাত্রা করছে, এ নিয়মের বিশেষ দুটা ব্যত্যয় দেখা যায়। প্রথমতঃ ঠিক উত্তর মেরুতে যে একটি তারকা আছে তাকে দিনের পর দিন, সন্ধ্যা হ'তে প্রভাতকাল অবধি, একই স্থলে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এর নাম ধ্রুবতারা। পৃথিবীর উত্তর ভাগে অবস্থিত সকল লোক এই ধ্রুবতারাকে দেখতে পায়। ঠিক্ দক্ষিণ মেরুর উপর ঐ রকম একটি ধ্রুবতারা আছে। পৃথিবীর বিষুব রেখার দক্ষিণের ভূ-মণ্ডল হ'তে দক্ষিণের ধ্রুবতারা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তার ইংরাজি নাম হ্যাড্‌লীস্ অক্‌টাণ্ট। পৃথিবীর ভিতর দিয়ে একটি শলাকা চালিয়ে দিয়ে যদি একটা মুখ ধ্রুবতারায় এবং অন্য মুখটি হ্যাড্‌লিস্ অক্টাণ্টে আটকে দিয়ে মেদিনী গোলককে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তা'হলে ঘোরার ঝোঁকটা মাঝখানেই বেশী হ'বে। উত্তর ও দক্ষিণ

মেরু থেকে যে তারাদের দর্শন পাওয়া যায়, তারা দৃষ্টির বাহিরে যায় না। একটা ঘূর্ণায়মান লাটু, বা গোলাকে পর্য্যবেক্ষণ করলে এ সত্য বোঝা যাবে। কাজেই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর পক্ষে ধ্রুবতারা চিরদিন একই স্থলে থাকে। অবশ্য ৫০০০ বৎসর অন্তর ধ্রুবতারা বদল হয়। পৃথিবী ও সারা বিশ্বের পরস্পরের গতিতে এবং সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী ব্যোমে সরে যায়। গ্রহ নক্ষত্রের অনুসন্ধানে এখন সে বিচার অনাবশ্যক।

কেবল যে ধ্রুবতারার উদয় অস্ত নাই এমন নয়। পৃথিবীর ২৫ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে যে সব তারকা অবস্থিত তাদেরও নিত্য দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুবতারা বিষুব রেখার (ইকোয়েটারের) উত্তর দিগন্তে সম-ভূমিতে দেখা যায়।

মেরুর ঠিক মাথার উপর তার স্থান। মেরুর দিকে পৃথিবীর মাঝখানে বিষুব রেখার দেশ হতে যত উঠে আসা যায় ধ্রুব তারাকে তত উচ্চে দেখা যায়। বিষুব-রেখায় যে সব দেশ আছে সেখান থেকে ধ্রুবতারাকে একেবারে সোজা সরল রেখায় শেষে দিগন্তে দেখতে পাওয়া যায়। কলিকাতার অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৬ মিনিট। তাই একেবারে উত্তর দিকে উন্নতাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৬ মিঃ উপরে ধ্রুব তারা দৃষ্ট হয়। ধ্রুব তারার উন্নতাংশ (অলটিটিউড) যেখানে যত, সে স্থলের সেটা অক্ষাংশের পরিমাণ। এক এক স্থলে চুম্বকে যে উত্তর দেখায়, জ্যোতিষের উত্তর তাহ'তে ভিন্ন। কলিকাতায় কম্পাস দিয়ে উত্তর নির্ণয় করলে ধ্রুবতারা দেখা সহজ হয়। কারণ কলিকাতায় চুম্বকে দেখানো উত্তরে জ্যোতিষের উত্তরে বিশেষ পার্থক্য নাই। পঞ্জিকায় ভারতবর্ষের সকল স্থানের অক্ষাংশ বা ল্যাটিটিউড্ লিখিত হয়েছে।

ধ্রুবতারাকে চিনলে অনেক নক্ষত্রমণ্ডল চেনা যায়। ধ্রুবতারা চেনবার একটা সহজ উপায় আছে। সমাজের আদিকাল হ'তে ধ্রুবতারা মনুষ্যকে পথ দেখিয়েছে। কম্পাস সৃষ্টি হবার বহু পূর্ব্বে সে প্রাচীন নাবিকদের দিক নির্ণয় করতে সহায়তা করত।

বৈশাখের প্রথম দিকে সন্ধ্যার পর সাড়ে আটটার সময় উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে, উত্তর পূর্ব্ব আকাশে সপ্তর্ষি-মণ্ডল দৃষ্টি পথে পড়বে। ইংরাজিতে এ-মণ্ডলকে বলে—গ্রেট বেয়ার, প্লাউ (লাঙ্গল) বা গ্রেট ডিপার। আমি নিচে সপ্তর্ষির একটি মানচিত্র দিলাম। এই মণ্ডলী ধ্রুব-

সপ্তর্ষি মণ্ডল ও ধ্রুবতারা
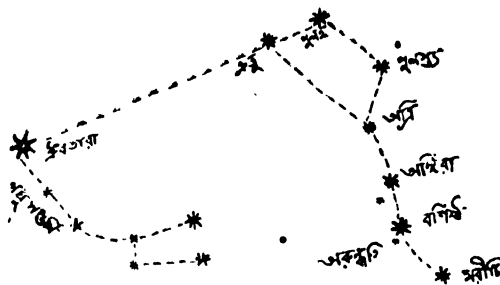
তারাকে ঘিরে আকাশে ঘোরে। এর চতুষ্কোণের উপরের দুটি তারা পুলহ ও ক্রতুকে সংযুক্ত করে, সেই রেখাকে বাড়িয়ে নিয়ে গেলে যে তারার উপর পড়ে সেটি ধ্রুবতারা। সপ্তর্ষি সন্ধ্যা থেকে প্রভাত অবধি ঘুরে বহু স্থলে দেখা দেবে। মোট কথা ভালুকের লেজের তারা উত্তর পূর্ব্ব হ'তে উত্তর-পশ্চিমে সবার সঙ্গে ঘুরবে। কিন্তু সে ক্রতু ও পুলহকেও টেনে নিয়ে ঘুরবে। সমস্ত ব্যূহটি যেদিকে যখনই থাকুক না কেন পুলহ ও ক্রতু সংযুক্ত হ'লেই ধ্রুবতারাকে দেখিয়ে দেবে। তাই এই দুটি নক্ষত্রের ইংরাজি নাম—পয়েন্টার বা নির্ণায়ক।

ধ্রুবতারা বরং সপ্তর্ষির আকারের ছোট একটি তারকা-মণ্ডলীর শেষের নক্ষত্র। তার ইংরাজি নাম—লিটল্ বেয়ার। ধ্রুবতারা ছোট ভালুকের লেজের ডগার তারা। এ-মণ্ডলের আমাদের নাম লঘু সপ্তর্ষি। যখন এ মণ্ডল ঘোরে মনে হয় যেন ভালুকের লেজের ডগা ধ্রুব-তারা-খুঁটিতে বাঁধা।

ল্যাটিন কথা উরস্ (Ursa) গ্রীক শব্দ আরক্টস (Arctos) এবং সংস্কৃত কথা ঋক্ষ মানে ভল্লুক। তিনটি কথার ধাতুগত সম্পর্ক আছে। অনেকের ধারণা ঋষি এবং ursa এক রকম শব্দ। ঋক্ষ শব্দের অন্য অর্থ নক্ষত্র। হয় তো হিন্দু, রোমকের নিকট ursa শিখে এদের ঋষি নাম দিয়েছে। না হয়তো রোমক বা গ্রীক হিন্দুর নিকট সপ্ত ঋষি শুনে এ মণ্ডলীর নাম দিয়েছে ursa বা ভল্লুক। এ বিষয়ে জল্পনা করতে আমি নারাজ এবং অক্ষম। বিলাতী জ্যোতিষীরা কিরূপে এদের ভল্লুক পরিকল্পনা করেছেন সেই ছোট ও বড় ভালুকের পরিকল্পিত রূপের একটি চিত্র দিলাম। তার নিচে যে সিংহটি দেখা যাবে সেটি সিংহরাশি।
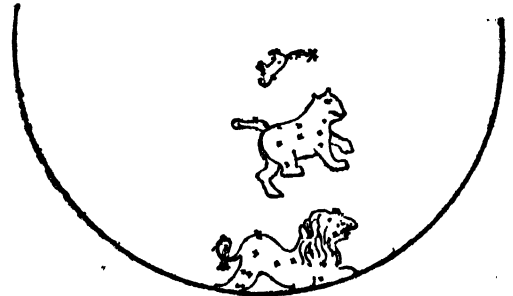
ঋক্ষ ও সিংহ

আবার বলি—আমাদের দৃষ্টিতে সাতটি তারকা কাছাকাছি দেখা যায়। তারা কিন্তু পরস্পর হ'তে বহুদূরে। সপ্তর্ষি মণ্ডলে দূরবীণ দিয়ে আরও বহু নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুত বশিষ্টকে একটি নক্ষত্র বলে বোধ হলেও ওটি যুগল নক্ষত্র। দুটি নক্ষত্রকে একসঙ্গে দেখা যায় বলে ওকে বড় দেখায়। আমাদের দৃষ্টি-রেখার সঙ্গে তারা এমন সোজা হয়ে ঘোরে যে সহজ চোখে তাদের এক দেখি। তারাগুলি বহু আলোক বর্ষ দূরে। কথাটা উপলব্ধি করবার পূর্ব্বে আলোক-বর্ষ কি, তার ধারণা করা কর্ত্তব্য।

আলোর রশ্মি এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল ছোটে। তা' হ'লে এক বৎসরে একটি রশ্মি ছোটে।

১৮৬,০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল।

এই গুণফলকে বলে এক আলোক-বর্ষ দূরত্ব। এর বহু গুণ দূরে আছে ক্রতু। তার আবার বহু "বর্ষ" দূরে পুলহ। এ দূরত্ব ধারণা করতে কল্পনাও দেউলে হয়ে যায়। কিন্তু এ কথাটা বোঝা যায় যে আমরা পহেলা বৈশাখে যে নক্ষত্রদের দেখব, সে তাদের পূর্ব্বের রূপ। এমন কি আমাদের মণ্ডলপতি সূর্য্যদেবের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগে আট মিনিট।

এই সাতটি তারাকে একবার চিনলে আর ভোলা যায় না। আরবরা এদের বিভিন্ন নাম রেখেছিল। বশিষ্ঠর পাশে যে ছোট তারাটি আছে তার নাম অরুন্ধতী, ইংরাজি নাম আলকর। সাতটি মহামুনি মুক্ত হয়ে আকাশে তারকারূপে বিরাজ করছেন এবং বশিষ্ঠের সাধ্বী স্ত্রী অরুন্ধতীও নক্ষত্ররূপে স্বামীর পার্শ্বে অবস্থান করছেন, এদের নামে এই পরি-কল্পনার সঙ্কেত।

আরবীতে ক্রতুর নাম ডুভে, পুলহের নাম মিরাক। পুলস্ত্যের নাম ফেক্কা, অত্রির মেগ্রেজ, অঙ্গিরার অল্ ইওত, বশিষ্ঠের মীজার এবং মরীচির নাম অল্কায়েদ।

অরুন্ধতীকে আরবরা বলে সায়দাক, যার অর্থ পরীক্ষা। কারণ তারাটি ছোট বলে তাকে অনুসন্ধান করে বার করা দৃষ্টি-শক্তির পরীক্ষা।

ধ্রুবতারা এবং দুটি মণ্ডল চেনা হ'ল। এদের সহায়তায় আরও অন্য মণ্ডল চেনা যাবে। এবার আমি রাশিচক্র এবং হিন্দু-জ্যোতিষের নক্ষত্রদের কথা বলব। তাদের চিনলে অনেক তারার পরিচয় পাওয়া যাবে। আমরা শিশুকাল হ'তে যাদের কথা শুনি, তাদের পরিচয় নিশ্চয়ই আনন্দ দেবে। তার পূর্ব্বে গ্রহদের কথা বলব।

পূর্ব্বে বলেছি সকল নক্ষত্র স্থির। মনে হয় পটে আঁকা ছবির মত পটের সঙ্গে নক্ষত্রেরা পশ্চিমে ঝুলে পড়ে এবং সেদিকে অনেকে ভোর রাত্রে অদৃশ্য হয়। এ নিয়মের ব্যত্যয় দেখতে পাই ধ্রুব তারার এবং কথঞ্চিত তার আশপাশের নক্ষত্রমণ্ডলে। কিন্তু একদল জ্যোতিষ্ক আছে যারা স্থির নয়। তারা কেহ ক্ষিপ্রগতিতে কেহ বিলম্বে স্থানান্তরিত হয়। পুলহ ক্রতুর পার্শ্বে কত কোটি বৎসর আছে, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বৃহস্পতিকে পহেলা বৈশাখে যেখানে দেখা যাবে পহেলা আশ্বিন সেখানে দেখা যাবে না এবং ১৩৫১ সালের পহেলা বৈশাখে নির্দ্ধারিত রূপে বুঝতে পারা যাবে যে সে স্থানান্তরিত হয়েছে। তাই তার শ্রেণীর জ্যোতিষ্কদের বলে গ্রহ। আবার চাঁদকে শুক্লপ্রতিপদ হ'তে প্রতিদিন পশ্চিম হ'তে পূর্ব্ব আকাশে ধাপে ধাপে আরোহণ করতে দেখা যায়। অষ্টমীর রাত্রে তাকে মাথার উপর দেখি। তখন সে অর্দ্ধ-চন্দ্র। তার পর ধীরে ধীরে পুব-দিকে নেমে যখন চন্দ্র একেবারে সূর্য্যের বিপরীত দিকে স্থান অধিকার করে, সেদিন সে পূর্ণচন্দ্র। তার ভুবন-ভরা বিমোহন কান্তি হ'তে আনন্দ ঝরে পড়ে। কিন্তু চাঁদ উপগ্রহ। পৃথিবী গ্রহ, সে পৃথিবীগ্রহের গ্রহ তাই উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট্।

ইংরাজি শব্দ প্ল্যানেট, ভারতের গ্রহ শব্দ হ'তে বিভিন্ন। আমাদের নব-গ্রহ রবি, সোম, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু। ইংরাজি প্ল্যানেট কথা মানে ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্ক। এরা যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে অন্য নক্ষত্রের টানে সূর্য্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ক্রমশঃই শীতল হ'য়ে এক একটি গোলক হ'য়ে বিভিন্ন জগত সৃষ্ট হয়েছে। এরা সবাই রবির সন্তান। তাদের নিজেদের প্রভা নাই। রবিকর তাদের উদ্ভাষিত করে। সেই প্রতিফলিত রশ্মি আমাদের চক্ষে প্রবেশ ক'রে আমাদের চিত্তে তাদের রূপ ফুটিয়ে তোলে। এরা সবাই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে। তাই সূর্য্য যে পথে চলেন এরা সেই পথের আশে পাশে চলে। সূর্য্যের পথ চিনলে এদের চেনা যায়। পৃথিবী রবিকে একবার প্রদক্ষিণ করলে এক বৎসর পূর্ণ হয়। অবশ্য আমাদের একবৎসর হয় পৃথিবীর রবি পরিক্রমণে। পরিক্রমণের গতি এবং সূর্য্য হতে দূরত্ব প্ল্যানেটদের বর্ষের কাল নিরূপণ করে। পৃথিবী, প্ল্যানেটরা, সূর্য্য এবং চন্দ্র সবাই ব্যোমে এক বিস্তৃত পথে চলাফেরা করে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ নয়টি প্ল্যানেট-গ্রহ বা ভ্রাম্যমান জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার করেছে—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। প্লুটো আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩০ সালে। সূর্য্যের সান্নিধ্য হিসাবে আমি তাদের নাম দিলাম। পৃথিবী এবং মঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য গ্রহ-কঙ্কর চাকার আকারে একটি কক্ষে গ্রহ-দেরই মত রবিকে পরিক্রমণ করে। সবাই সূর্য্যকে ঘিরে বিবর্ত্তন করে। এদের চেনবার উপায় কি?

প্রথম পার্থক্য নক্ষত্র দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে, গ্রহের আলো স্থির। এরা আমাদের নিকট প্রতিবাসী, পৃথিবীর আত্মীয়। সূর্য্যের রশ্মিতে আলোকিত। সূর্য্য নিজে এক বৎসরে আকাশে পূর্ণ এক চক্কর ভ্রমণ করেন। আকাশে রবির ক্রান্তি-চক্র গোল। কেন্দ্রের কোণের পরিমাণে গোলকের পরিধি ৩৬০ ডিগ্রী বা অংশ। বারো মাসে ৩৬০ ডিগ্রি ভ্রমণ করেন তাই সূর্য্য-মাসে ত্রিশ ডিগ্রী চলেন।

এই এক একটি ৩০ ডিগ্রীর বিভাগকে এক একটি রাশি বলে। এক রাশিতে সূর্য্য এক এক মাস থাকেন—দিন এক এক ডিগ্রী সরেন। সূর্য্যের বাৎসরিক ভ্রমণ পথের বারো ভাগের এক ভাগ এক এক রাশি।

প্রায় সকল প্রাচীন জাতি রাশিচক্র জানত। আর এও একটা বিচিত্র ব্যাপার যে প্রত্যেকেই রাশি চক্রের অনেকগুলিকে জন্তুর নামে অভিহিত করেছে। আমরা আপাততঃ নিজেদের কথা বলব।

ত্রিশ অংশ সূর্য্য-পথের মধ্যে যতগুলি প্রধান তারা আছে, তাদের সম্মিলিত করলে এক একটা জন্তুর রূপ সত্যই হয়। সিংহের চিত্র দিয়েছি। বৃশ্চিক রাশির মধ্যে যত বড় তারা আছে তাদের যোগ করলে একটা বিছার রূপ হয়। বৈশাখে রাত্রি এগারোটায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়ালে মাথা আকাশের একটু নিচে দক্ষিণ পূর্ব্বে তাদের দেখা যাবে। আর এক কথা। রাশি একটা রেখা মাত্র নয়। সূর্য্য যে পথে ফেরেন, তার উপর নিচের কতকগুলি তারাকে নিয়ে এক এক রাশি। অতএব রাশি মানে তারার গুচ্ছ। মেষ রাশি মানে সূর্য্যের ভ্রমণ-পথের একটি ত্রিশ অংশের মধ্যে যত তারা আছে তাদের বিভাগ।

চাঁদও এই পথে ঘোরেন। কিন্তু শশীর কক্ষ ছোট এবং চলন দ্রুত। তাই সাড়ে সাতাশ দিনে সে সমস্ত রাশি চক্র ভ্রমণ করে। এই সাড়ে সাতাশ দিনে সূর্য্য দুই নক্ষত্র ঘর সরে যায়! তাই সূর্য্যকে ঘুরে এসে ধরতে চাঁদের আরো প্রায় দুদিন লাগে। সুতরাং চান্দ্রমাস ২৯।০ দিন। পৃথিবীর মত সে নিজের অক্ষে ঘোরে না। আমরা পৃথিবী হ'তে মাত্র তার একটাই দিক দেখতে পাই। সেটা মুকুরের মত। তার উপর সূর্য্য-কিরণ পড়ে প্রতিফলিত হ'য়ে চন্দ্র-রশ্মিরূপে আমাদের চোখে ঠিক্‌রে আসে। সুতরাং চাঁদ যখন সূর্য্যের কাছে থাকে তার অন্ধকার পিছনটা আমাদের দিকে থাকে। তাই তাকে দেখতে পাই না। তখন অমানিশা। তার পর সে প্রতি দিন প্রায় ১৩⅓ অংশ সূর্য্য হতে সরে যায়। তার নিচের দিকটা সাদা হয় রবিকরে। সে যত সরে তত তার দেহ কলায় কলায় শুভ্র হয়। যে দিকটা সূর্য্যের দিকে থাকে সেটুকু শুভ্র হয়। ক্রমশঃ সে পূর্ণশশী হয় সূর্য্যের বিপরীত দিকে পৌঁছে। তার পর আবার কমতে আরম্ভ করে। নিম্নে চন্দ্রের গতি ও জ্যোৎস্নার পরিণতির একটা চিত্র দেওয়া হইল।
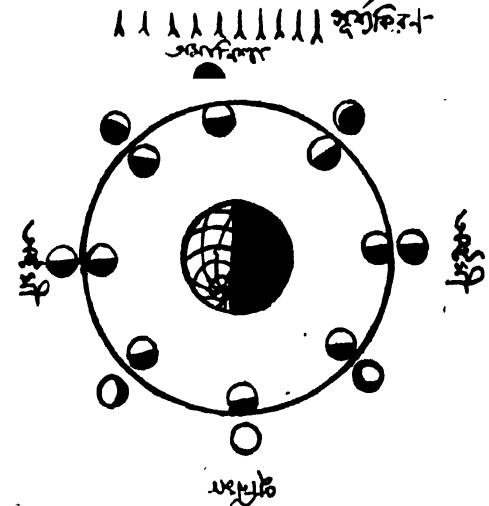
জ্যোৎস্নার পরিণতি

চন্দ্র প্রত্যেক রাশিতে দিনে তের এবং এক তৃতীয় অংশ করে চলে। তাই রাশি চক্রকে আবার সাতাশ ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। সেই ১৩⅓

ভাগ বৃত্তাংশের মধ্যে প্রধান নক্ষত্র বা নক্ষত্র পুঞ্জ দেখে এক এক ভাগের নাম করা হ'য়েছে। সাতাশকে ১৩⅓ দিয়ে গুণ করলে তিন শত ষাট হয়। নিচে দেওয়া চিত্র হ'তে কথাটা আরও স্পষ্ট হবে।
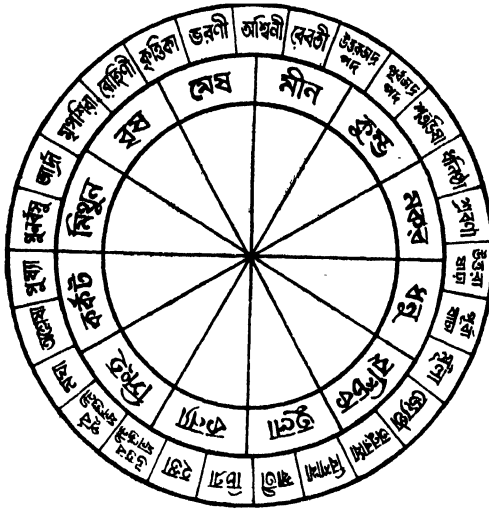
রাশি-নক্ষত্র

রাশিদের নাম—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। সূর্য্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে প্রবেশ করেন, জ্যৈষ্ঠে বৃষে এই রকম ভাবে চৈত্রে যান মীন রাশিতে। সাতাশটি নক্ষত্রের নাম পাঁজিতে পাওয়া যাবে। রাশির সওয়া দুই বিভাগ করে একটি নক্ষত্র। রাশি যদি হয় বিভাগ—নক্ষত্র এক একটি জেলা।

মেষরাশি—অশ্বিনী, ভরণী এবং কৃত্তিকার চার ভাগের এক ভাগ নিয়ে।* তা' হলে মেষ রাশির সন্ধান পেলে আমরা মেষ-রাশির নক্ষত্রগুলিকে চিনতে পারব। কিম্বা তার অন্তর্গত একটি নক্ষত্র-বিভাগকে চিনতে পারলে মেষের পরিচয় পেতে পারি।

বৈশাখে সূর্য্য থাকেন মেষে। তার প্রখর কিরণে আমরা মেষ রাশি দেখ্‌তে পাবোনা। কিন্তু তার স্থান নির্দ্দেশ করতে পারলে সন্ধ্যার পর অবশিষ্ট কয়েকটি রাশি চিনতে পারব। কারণ তারা ব্যোমে সূর্য্য-পথে (ইক্‌লিপটিকে) পর পর সাজানো আছে। এরা সাজানো আছে আকাশে পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমে। আমরা বিপরীত দিকে ঘুরি। তাই তাদের পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বে দেখি। বৈশাখে সূর্য্য মেষ রাশিতে। সুতরাং প্রভাতে আমরা যে স্থলটায় সূর্য্যোদয় দেখব সে স্থল মেশ রাশির অন্তর্গত। আমরা বিপরীত দিকে ঘুরচি—পশ্চিম হ'তে পূর্ব্বে। ক্রমশঃ কলিকাতা ঘুরতে ঘুরতে এমন স্থলে আসবে, যখন রবিকে দেখব মাথার উপর। আমরা সূর্য্য পথে যখন সাত ঘরে অর্থাৎ তুলা রাশিতে পৌঁছিব, তখন দেখব সূর্য্য আমাদের পশ্চিমে। আর একটু ঘুরলে সূর্য্যকে দেখ্‌তে পাবোনা। সূর্য্যের পথে বৃষ থেকে উল্টো দিকে অর্থাৎ বৃষকে পশ্চিমে, তার পর মিথুন, তার পশ্চিমে কর্কট এই রকম ভাবে সারা রাতে প্রায় ১৮০ ডিগ্রী আকাশ দেখতে পাব। সকালে কোথায় সূর্য্য ওঠে আর সন্ধ্যায় কোথায় সূর্য্যাস্ত হয়, সেই স্থান দুটি ঠিক্ করে দেখলে আকাশের এক বিন্দু হতে অপর বিন্দু যোগ ক'রে মাথার উপর বৃত্ত চাপ পরিকল্পনা করলে সূর্য্য পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তখন রাশির তারা-মণ্ডল চেনা সহজ হবে।

বৈশাখের প্রথম দিনে আরও একটা সহায়ক পাওয়া যাবে। বলেছি চন্দ্র প্রত্যহ এক এক নক্ষত্রে বিচরণ করে। সেদিন সন্ধ্যায় চাঁদ দেখলে, নক্ষত্র এবং তা হ'তে যে রাশিতে চাঁদ আছে এবং ক্রমশঃ তার আশে পাশে যে রাশি আছে তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় হবে।
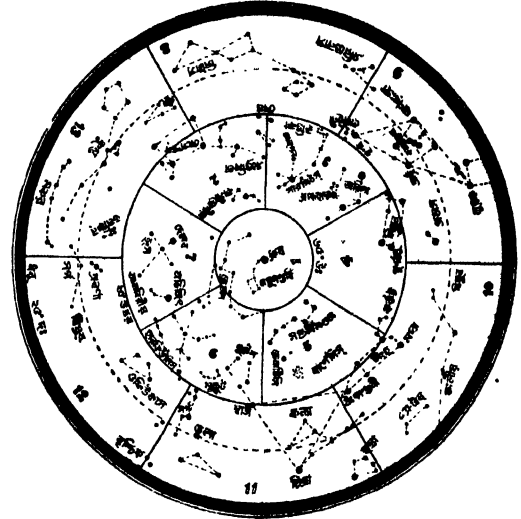
এবার গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার সহায়তা নিলে, ব্যাপারটি সহজ হবে।

সেদিন দশমী ইংরাজি ঘণ্টা ১০।৩৬।২২ অবধি চন্দ্র থাকবেন অশ্লেষা নক্ষত্রে। তার পর নিশ্চয় মঘা নক্ষত্রে যাবেন। মঘা নক্ষত্র সিংহ রাশির প্রথম নক্ষত্র। এটি দশম নক্ষত্র। এ সংবাদ পাঁজির জ্যোতিষ-বচনের মধ্যে পাওয়া যাবে। আমি মানচিত্রে তার স্থান দেখালাম। পাঁজির প্রথম দিন বৈশাখের বর্ণনায় লেখা আছে ঘ ১০।৩৬।২২ গতে চন্দ্র কর্কট ছেড়ে সিংহে যাবেন। তা হলে সন্ধ্যার সময় যেখানে চাঁদকে দেখতে পাওয়া যাবে, তার সন্নিকটে যে বড় নক্ষত্রটি দেখা যাবে—সে মঘা। এবং সেই স্থান থেকে ত্রিশ অংশ আকাশের পূর্ব্ব দিক অবধি সিংহ রাশি। এতে সিংহের রূপ নিচে দেওয়া মানচিত্র হতে প্রতীয়মান হবে। মঘা খুব উজ্জ্বল প্রথম শ্রেণীর তারা। তার ইংরাজি নাম Regulus। এর পৃষ্ঠের তারাটির নাম পূর্ব্বফল্গুনী। এর লেজের কাছে যে বড় তারা আছে তার নাম উত্তরফাল্গুনী বা ডেনিবোলা। এ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা—বড় উজ্জ্বল। মঘাও প্রথম শ্রেণীর তারা। প্রথম শ্রেণীর তারার শতকরা ৪০ মাত্রা যার উজ্জ্বলতা সে দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা। তার আবার ৬০ মাত্রা কম জ্যোতি যার সে তৃতীয় শ্রেণীর তারা। দশমীতে এবার চন্দ্রের সান্নিধ্য মঘার জ্যোতি ম্লান করবে। কিন্তু প্রতিপদে ঠিক্ সন্ধ্যায় দেখলে তার গৌরব উপলব্ধি হবে।

মঘার আলোক পৃথিবীতে পৌঁছতে লাগে ৫৬ বৎসর। বৈশাখে যে মঘা দেখ্‌ব সে তার ১২৯৪ সালের রূপ। আজিকার মঘা ১৪০৬ সালে দেখা যাবে। এর দূরত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে উপরে যা' বলেছি সেই হিসাব অনুসারে। মঘা সূর্য্য হতে সত্তর গুণ উজ্জ্বল?

সিংহ রাশিকে চেনবার আর একটা উপায় বলি। পুলহ ও ক্রতু যোগ ক'রে রেখাটিকে টেনে নিয়ে গেলে ধ্রুব তারা পাওয়া যায়। ক্রতু ও পুলহকে যোগ করে প্রায় ততখানি নিচের দিকে নামালে সিংহের পৃষ্ঠে পড়ে।

* চিত্রকরের ভ্রমে চিত্রের নক্ষত্রের ঘরগুলি দেখান ভুল হয়েছে। মেষ এবং অশ্বিনী ঠিক একসঙ্গে আরম্ভ হবে। তাহ'লে বাকী চিত্রটি ঠিক হবে সেই অনুপাতে সব নক্ষত্রগুলিকে একটু বামে সরিয়ে দেখতে হবে। মেষ ও অশ্বিনী একত্র আরম্ভ।

পয়লা বৈশাখ এ প্রবন্ধ পড়া না হতে পারে। উপরে যা' বলেছি—তা স্মরণ রেখে পাঁজি দেখলে বোঝা যাবে ২রা বৈশাখ বেলা ১২।৪৭।৫১ অবধি চন্দ্র মঘায় বিরাজ কর্বেন। তা' হ'লে সন্ধ্যায় যেখানে চাঁদ দেখা যাবে সে স্থল পূর্ব্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রের আকাশ। পূর্ব্ব ফাল্গুনী সিংহের পৃষ্ঠে। তাকে ভাল ক'রে আবার জানবার অবসর হ'বে। তার সঙ্গে অন্তদেরও। চাঁদের পশ্চিম দিকে দেখা যাবে মঘা; পূর্ব্বদিকে উত্তর ফাল্গুনী বা ডেনিবোলা। ৫ই বৈশাখ রাত্রে চন্দ্র উত্তর ফাল্গুনী (ডেনেবোলায়) যাবেন, চৌঠা হস্তা এবং সোমবার ৫ই চিত্রায় প্রবেশ করবেন। পরদিন অপরাহ্ণ ৫।১০।৬ অবধি চিত্রায় থাকবেন তাই চিত্রায় পূর্ণিমা। এই স্থানগুলি এই প্রবন্ধে দেওয়া মান-চিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, সূর্য্য পথ এবং চন্দ্র পথের নক্ষত্রগুলি নিশ্চয় চেনা যাবে। চিত্রায় পূর্ণিমা চৈত্রের। তাই সে মাসের নামকরণ হয়েছে চৈত্র। সে নক্ষত্রে পূর্ণিমা হয় সে মাসের নাম সে নক্ষত্র অনুসারে হয়। চিত্রার ঠিক উত্তর পূর্ব্বে যেদিকে সূর্য্য উঠেছিল, সেদিকে তাকালে খুব উজ্জ্বল প্রথম শ্রেণীর একটি নক্ষত্র দেখা যাবে। সে স্বাতী। স্বাতী চেনবার আর একটি উপায় আছে। সপ্তর্ষির বশিষ্ঠ ও মরীচি যোগ ক'রে সে রেখা টেনে নিয়ে গেলে স্বাতী নক্ষত্রে পড়ে। স্বাতী এবং চিত্রা যোগ ক'রে, স্বাতী ও চিত্রা হ'তে উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্রে দুটি রেখা টানলে একটি সমত্রিভুজ ত্রিকোণ হয়। স্বাতী নক্ষত্র যে মণ্ডলের, তার নাম বুতেশ। বুতেশের কয়টি তারা যোগ করলে ভীমের গদা কিম্বা বাউলের এক-তারার আকার হয়।

স্থানাভাবে এ মাসে অন্য নক্ষত্রের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আগামীবারে অন্যদের সন্ধান দিব। কিন্তু জ্যৈষ্ঠে বৃষ রাশি দেখা যাবে না কারণ সূর্য্য সেখানে থাকবেন। তাই অন্ততঃ এ মাসে কৃত্তিকা ভরণী, রোহিনী ও মৃগশিরাকে দেখে রাখা আবশ্যক। এ মাসে তাদের দেখে রাখলে, আগামী বারে বিবরণ দিব। একটি কৃত্তিকার এবং একটি কালপুরুষের মানচিত্র, প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হল। এদের চেনা সহজ।
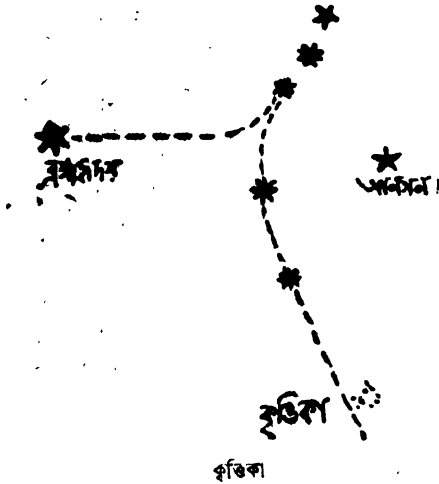
কৃত্তিকা

কৃত্তিকাকে একেবারে সূর্য্যপথের পশ্চিমে সূর্য্যাস্তের পর অতি অল্পকাল দেখতে পাওয়া যাবে। হীরার টুকরার মত ছটি তারা হীরার গোছার মধ্যে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। বস্তুতঃ ঐ থোকায় হাজার দু'হাজার তারা আছে। চোখে যে কটি নক্ষত্র দেখা যাবে, ঠিক তাদের উপরে আছেন শনি। আর কৃত্তিকার উপর হতে মালার মত উত্তর দিকে যে তারার সারি উঠে গেছে তাদের নাম পারস্যুস (Porseus)। তাদের পূর্ব্বে ব্রহ্মহৃদয় (capella) খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র।
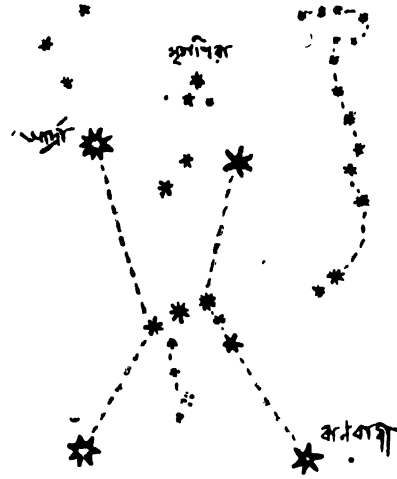
কালপুরুষ

কালপুরুষে আছে মৃগশিরা ও আর্দ্রা। কালপুরুষ চেনা সহজ। সিংহ দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু দক্ষিণ পশ্চিমে তাকালেই দেখা যাবে কালপুরুষ। একবার দেখলে তাকে বিস্মৃত হবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আগামী বারে বলব। তার মাথার উপর চিক্ চিক্ করছে মৃগশিরা। কালপুরুষের পূর্ব্ব দিকের বড় তারাটি আর্দ্রা। সে ২০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। আমরা অবশ্য তাই ১১৫০-এর আর্দ্রা দেখব। সূর্য্যের তুলনায় আর্দ্রা ১২০০ গুণ উজ্জ্বল।

সন্ধ্যার সময় সূর্য্যাস্তের পরেই ঠিক পশ্চিমে তাকালে শুক্র বা সুখতারা দেখা যাবে। সে গ্রহ—তাই মিট্ মিট্ করবে না। তার উজ্জ্বল বরণ শিশুকাল হতে সবাই দেখেছে। ধ্রুবতারার দিকে মুখ ফিরে দাঁড়িয়ে মাথার উপর হ'তে একটু পশ্চিমে অমনি এক বড় গ্রহ দেখা যাবে, বৃহস্পতি। বৃহস্পতির ব্যাস পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা ১০·৯৫ গুণ বড়। সে পৃথিবী অপেক্ষা ৩১৭ গুণ ভারি। বাকী আটটি প্ল্যানেটের সম্মিলিত ওজনের প্রায় দ্বিগুণ তার ওজন। তার ৯টি উপগ্রহ আছে। সে ১১·৮৬ (প্রায় বারো) বছরে সূর্য্যকে একপাক প্রদক্ষিণ করে। তাই এক এক রাশিতে তার স্থিতি প্রায় এক বৎসর। শনির পরিক্রমণকাল প্রায় ৩০ (১১·৮৬) বৎসর। তাই শনি এক এক রাশিতে প্রায় আড়াই বছর থাকেন। আপাততঃ তিনি বৃষে। শনির ৯টি চাঁদ আছে। তার চারিদিকে এক চাকার মত আবেষ্টনী দূরবীনের সাহায্যে দেখা যায়। সেগুলি অসংখ্য তারার টুকরা, শনির টানে তাকে ঘিরে তার সঙ্গে ঘোর পাক খাচ্চে। তার ব্যাস পৃথিবী অপেক্ষা ৯·০২ গুণ বড় এবং ওজন পৃথিবী অপেক্ষা ৯৫ গুণ।

চলতি-ইতিহাস

শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়

রুশিয়ার রণাঙ্গন

দক্ষিণ রুশিয়ার রণক্ষেত্রে নাৎসী বাহিনী কর্ত্তৃক খারকভ অধিকার সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যাতে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, লালফৌজের যে বাহু স্ট্যালিনো হইয়া ট্যাগানরগ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল রষ্টোভের পতনের পূর্বে তাহা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারে নাই। হিটলারের নাৎসী বাহিনী এই সুযোগ হারায় নাই। ইয়োরোপে জার্মানীর বিরুদ্ধে কোথাও দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের সৃষ্টি না হওয়ায় নাৎসী-অধিকৃত ইয়োরোপ হইতে জার্মানী প্রয়োজনমত সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেছে। ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম হইতে ১২ ডিভিসন সৈন্য ডোনেৎস্ রণক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। লালফৌজের প্রবল চাপে পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদলের ১৩ ডিভিসন উক্ত বাহিনীর সহিত যোগদান করে। এই ২৫ ডিভিসন সম্মিলিত সৈন্য কর্ত্তৃক খারকভ রণাঙ্গনে অভিযান পরিচালিত হয়। সংখ্যাগুরু নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েট সৈন্যদল জেনারেল গোলিকভের নেতৃত্বে প্রবল বাধাদানের পর পশ্চাদপসরণ করে। খারকভের ৫০ মাইল উত্তরস্থ বিয়েলগরোদ লালফৌজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। জার্মানীর প্রবল ট্যাঙ্ক আক্রমণ ও নাৎসী বাহিনীর সংখ্যাগুরুত্ব যেমন সোভিয়েট বাহিনীর পশ্চাদপসরণের জন্য দায়ী, তেমনই আরও কতকগুলি বিষয় ইহার মূলে সুদীর্ঘ পথে যোগাযোগ রক্ষা ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রশ্ন আছে। ইহার উপর আছে—গলিত বরফ। 'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যাতেই আমরা বলিয়াছিলাম, শীঘ্রই আমরা রুশ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির মধ্যে শৈথিল্যের সংবাদ পাইব, কিন্তু তাহা জার্মানীর প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য নহে, অথবা রুশযোদ্ধৃগণের অক্ষমতাও ইহার জন্য দায়ী নহে—রুশিয়ার গলিত তুষারই ইহার জন্য দায়ী। আমাদের উক্ত প্রবন্ধ রচিত হইবার পর রয়টার কর্তৃক দক্ষিণ রুশিয়ায় অতি শীঘ্র বসন্তের আবির্ভাবের সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে ইহা পাঠকগণ অবগত আছেন। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—গলিত তুষার কি একমাত্র রুশিয়ার প্রতি-আক্রমণে বাধা সৃষ্টি করিল? রুশবাহিনী যদি ইহাতে অসুবিধায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে নাৎসীবাহিনী ইহাতে কোন অসুবিধা অনুভব করিল না কেন? প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে উভয় পক্ষেরই সমান অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু রুশ ও নাৎসী বাহিনীর আক্রমণের মধ্যে পার্থক্য আছে। মজদক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নাৎসী বাহিনীকে রষ্টোভ এবং খারকভ পর্যন্ত লালফৌজের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাদপসরণ জার্মানীতে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ককেশাস অধিকৃত হইলে যথেষ্ট তৈল হস্তগত হইত কিন্তু তাহা হয় নাই, ককেশাস নাৎসী বাহিনীর সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর
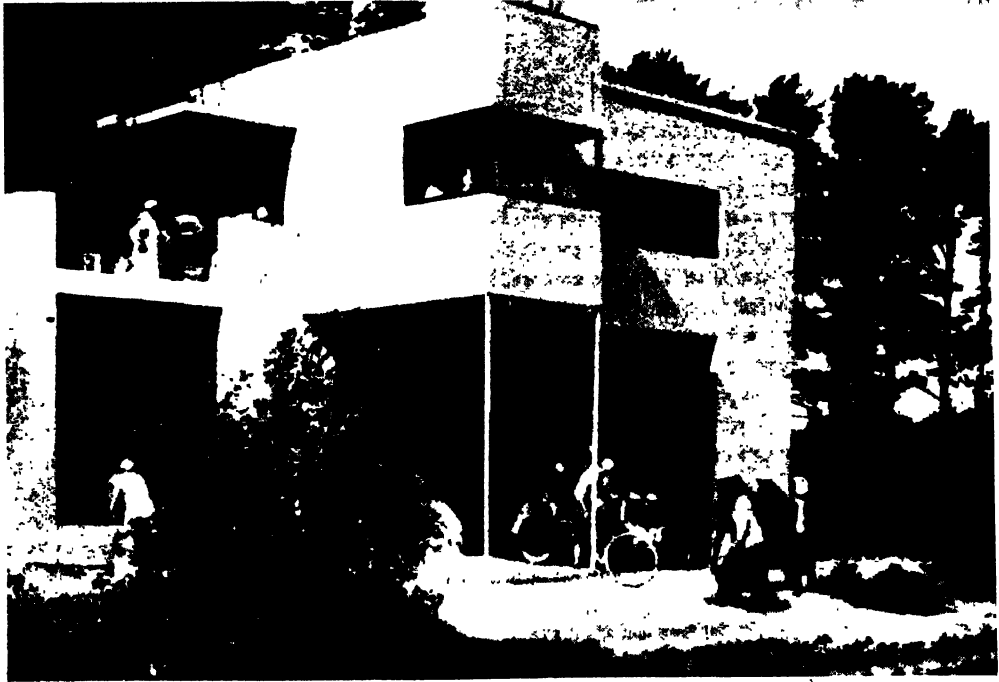
রাশিয়ার সমবায় কৃষক-সমিতির একটি রন্ধনশালা — অজিত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

কার্য করিয়াছে। মজদক এবং স্ট্যালিন্‌গ্রাড হইতে যে লালফৌজ একের পর এক অঞ্চল অধিকার করিয়া ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের শস্যভাণ্ডার ইউক্রেন অধিকারে থাকিলে তবু অনাহারের দায় হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, ইহাই সান্ত্বনা। কিন্তু সেই শস্যভাণ্ডারের চাবিকাঠি

ইউক্রেনের রাজধানী যখন লালফৌজ অধিকার করিয়া লইল তখন জার্মান নাগরিকগণের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগিবে—দীর্ঘকাল অপরিসীম ক্লেশ

রাশিয়ার একচ্ছত্র নেতা ষ্টালিনের একটি আধুনিক চিত্র
অজিত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

সহ্য করিয়া লক্ষ লক্ষ আত্মীয়স্বজনের প্রাণবিসর্জনের বিনিময়ে লাভ হইল কি? ইহার উপর নাৎসী বাহিনীর ক্রম পরাজয় তাহাদের নৈতিকশক্তির মূলে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিবে তাহাও চিন্তনীয়। ফলে শতপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও হিটলারকে আপনার সকল সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া খারকভ পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইতে হইয়াছে। খারকভ পুনরধিকৃত হইলে একদিকে যেমন জার্মান নাগরিকগণকে সান্ত্বনা ও কৈফিয়ৎ প্রদান করা যাইবে অপরদিকে তেমনই নাৎসী বাহিনীর নৈতিক শক্তিকেও ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে। ইহারই ফলে হিটলারের মরীয়া হইয়া খারকভ আক্রমণ। কিন্তু লালফৌজের নিকট ঐ সকল প্রশ্নের বালাই নাই। নাৎসী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অসংখ্য লালফৌজের প্রাণদান ও অপরিসীম রণসম্ভারের বিনাশ সোভিয়েটের অভিপ্রেত নয়। মস্কোস্থ সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষের আদেশেই যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে লালফৌজ খারকভ এবং বিয়েলগরোদ পরিত্যাগ করিয়াছে পাঠকগণ বোধহয় সংবাদের এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন। কাজেই কোন্ অপরিহার্য প্রয়োজনে নাৎসী বাহিনী কর্তৃক খারকভ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং কোন্ রণনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হইয়া লালফৌজ সংগ্রাম ও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে তাহা বর্তমানে সুপরিস্ফুট। গোলিকভের সৈন্যদল বর্তমানে আপনাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং নাৎসী বাহিনী কর্তৃক ডোনেৎস অতিক্রমের প্রচেষ্টা সকল ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে।

রুশিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে লালফৌজের সম্ভাব্য অগ্রগতি সম্বন্ধে আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যায় যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম তাহা বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছে। মোঝাইস্ক-এর পশ্চিমে সোভিয়েট বাহিনী যখন অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করে তখনই আমরা বলিয়াছিলাম যে লালফৌজের লক্ষ্য স্মোলেনস্ক। ঐ প্রসঙ্গে আমরা জানাইয়াছিলাম যে, রুশ সৈন্যের একটি বাহু যদি দক্ষিণে ভিয়াজমা হইয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলে খারকভের ন্যায় স্মোলেনস্ক-এরও রুশ অধিকারে আসা আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমাদের এই সামরিক পরিকল্পনা মিথ্যা হয় নাই; স্বয়ং মার্শাল টিমোশেঙ্কো ভিয়াজমা অধিকার করিয়া স্মোলেনস্ক অভিমুখে অগ্রসর। ভ্যাভিনো, ডুরোভো প্রভৃতি অধিকার করিয়া লালফৌজ বর্তমানে স্মোলেনস্ক-এর ৪৫ মাইল পূর্বে ডোরোগোবাগ-এ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিয়েলি হইতে অগ্রসরমান জেনারেল কোনিয়েভ-এর বাহিনী কর্তৃক মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনীর সাহায্যপ্রাপ্তি সম্ভাবনা। অগ্রসরমান সোভিয়েট বাহিনীর কামানের গোলায় স্মোলেনস্ক এর আকাশ আলোকিত ও বিদীর্ণ হইতেছে। মধ্য রণাঙ্গনের সুদৃঢ় ঘাঁটি স্মোলেনস্ক পরিত্যাগের পূর্বে নাৎসী বাহিনী ইহার ধ্বংস কার্য আরম্ভ করিয়াছে।

ইল্‌মেন্ হ্রদের দক্ষিণাঞ্চলেও রুশবাহিনী তীব্র আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং জার্মান সৈন্যকে কয়েকস্থানে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে। এই আক্রমণকে স্টারায়া রুশা পুনরধিকারের প্রারম্ভিক অভিযান বলা যাইতে পারে।

কিন্তু রুশিয়ার অভিযান বর্তমানে যতই সাফল্যমণ্ডিত হউক না কেন, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রুশিয়ায় বসন্তের পূর্ণ আবির্ভাবের সঙ্গে তুষারসিক্ত জমি শুষ্ক হইলে নাৎসী অভিযানের তীব্রতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। জার্মানী যে বর্তমানে একেবারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, প্রতি আক্রমণে সে এখন সম্পূর্ণ অক্ষম, এরূপ ধারণা করিবার মত কোন নির্ভর-যোগ্য কারণ এখনও উপস্থিত হয় নাই। জার্মানীর কারখানায় যথেষ্ট শ্রমিকের অভাব হইয়াছে বটে, নারীদিগকেও আজ অন্তঃপুর হইতে সামরিক প্রয়োজনে বহির্জগতে ডাক দেওয়া হইয়াছে এ কথাও সত্য, বহু রণনিপুণ জার্মান সৈন্য যে রুশিয়া আক্রমণে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই, সেইখানেই আপন শেষ শয্যা রচনা করিয়াছে, একথা অস্বীকারেরও কোন কারণ দেখিনা—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সমস্ত নাৎসী অধিকৃত ইয়োরোপের জনবল, শ্রমশক্তি এবং কাঁচামাল ও রণ-সম্ভারের উপাদান আজ জার্মানীর করতলগত। যতদিন ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি না হইতেছে ততদিন জার্মানী অবাধে ঐ সকল শক্তি রুশ রণক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে পারিবে। অবশ্য লালফৌজের শীতকালীন আক্রমণ সোভিয়েট রুশিয়ার রণশক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আগামী বসন্তকালীন অভিযানের জন্য যে কয়েক লক্ষ সৈন্য রুশিয়া পৃথক ভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে এ বিশ্বাসও আমরা নিরাপদে করিতে পারি, কারণ নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত রুশিয়ার রণনীতি তাহা আমাদের নিকট পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও জার্মানী এখনও প্রতি-আক্রমণের শক্তি হারায় নাই এবং মিত্রশক্তির রণ-সম্ভার লইয়া লালফৌজ আজ পর্যন্ত নাৎসী বাহিনীকে রণক্ষেত্রে একাই ঠেকাইয়া রাখিতেছে। টিউনিসিয়ার যুদ্ধকে মিত্রশক্তির কেহ কেহ দ্বিতীয় রণক্ষেত্র বলিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু টিউনিসিয়ার সংগ্রামে দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। পশ্চিমে মিত্রশক্তির রণক্ষেত্র বলিতে একমাত্র টিউনিসিয়া। কিন্তু এই টিউনিসিয়ার রণক্ষেত্রে নাৎসী বাহিনীর সাহায্যের জন্য রুশ রণক্ষেত্র হইতে কোন সৈন্য বা সমরোপকরণ আফ্রিকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে এমন কোন সংবাদ আজও আমরা পাই নাই। টিউনিসিয়ার সংগ্রাম যত প্রচণ্ড আকার ধারণ করুক না কেন, তাহার জন্য রুশ রণাঙ্গনে নাৎসী বাহিনীর চাপ কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। গত ২৫এ মার্চ লণ্ডনস্থ সোভিয়েট দূত মঃ মৈস্কি এক ভোজ সভায় বলিয়াছেন যে, মঃ স্ট্যালিনের উপযুক্ত নেতৃত্বে লালফৌজ আমাদের সকলের সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। আমার দেশ এবং দেশবাসী আশা করে, আমাদের মিত্র-শক্তি—বিশেষ বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—প্রথম সুবিধাজনক মুহূর্তে

এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের সকল শক্তি নিয়োগ করিবে। রুশিয়া, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের জনসাধারণও ইহাই কামনা করে এবং প্রথম সুবিধাজনক মুহূর্তে'ই মিত্রশক্তির আক্রমণে হিটলারকে দ্বিতীয় রণাঙ্গনে লিপ্ত দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।

টিউনিসিয়ার যুদ্ধ

বর্তমানে টিউনিসিয়ার সংগ্রাম কিছু প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এবং যুদ্ধের ফলাফল মিত্রশক্তির অনুকূলে গিয়াছে। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে অষ্টমবাহিনী ম্যারেথ লাইনে আক্রমণ পরিচালনা করে। মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ঐ সময়ে গাফসা ও সেনেদ্ অধিকৃত হয়। গাফসা ও মাক্নাসি হইয়া একটি রেলপথ স্ফাক্স-এ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মার্কিন বাহিনী বর্তমানে মাক্নাসির উপর চাপ দিতেছে। এই রণাঙ্গনে কয়েকটি আক্রমণে সহস্রাধিক শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে। বৃটিশ বাহিনী এল্ হাম্মা অঞ্চলে রোমেলের পশ্চাদ্রক্ষী সৈন্যদলের পার্শ্বদেশে আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে এবং জেবেল তেবাগা অধিকৃত হইয়াছে। জেবেল তেবাগা হইতে একটি পথ গাবেস পর্যন্ত গিয়াছে। এই পথটি অপর একটি রাস্তা দ্বারা এল্ হাম্মা-র সহিত সংযুক্ত। গাবেস্ হইতে একটি রেলপথ গ্রাইবা-তে গাফ্সা—স্ফাক্স রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। স্ফাক্স হইতে সমুদ্রতীর ধরিয়া রেলপথে টিউনিসের সহিত সংযোগ আছে।—মেদ্জেস্-এল্-বাব্, পঁ-দু'্-ফ এবং নাবেয়ুল হইতে মিত্রশক্তি কর্তৃক রেলপথ ধরিয়া ত্রিশূলাকারে টিউনিস অভিমুখে অভিযান পরিচালিত হইলে টিউনিসের পতন রোধ করা জার্মানীর পক্ষে কঠিন হইবে। কিন্তু মিত্রশক্তি কর্তৃক এই অভিযানের এখনও যথেষ্ট বিলম্ব হইলে যুদ্ধের তীব্রতা অধিকতর বৃদ্ধির আশা করা যায়। বর্তমানে টিউনিসিয়ার সংগ্রামে মিত্রশক্তির যুদ্ধের গতি যেভাবে চলিতেছে, উহা সহজেই আরও দ্রুততর হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা। আমাদের বিশ্বাস, বৃটিশ, মার্কিণ এবং ফরাসী সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী রণক্ষেত্রে শত্রু-সৈন্যের উপর অধিকতর তীব্র ও ব্যাপক চাপ প্রদান করিয়া অক্ষ-বাহিনীকে দ্রুত পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিতে সক্ষম। মিত্রশক্তির যুদ্ধের তীব্রতা শীঘ্রই আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। রণনীতি এবং রাজনীতি উভয় দিক হইতেই মিত্রশক্তির সত্বর টিউনিসিয়া অধিকার করা প্রয়োজন। ইহাতে শুধু যে আফ্রিকা হইতে অক্ষশক্তির শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছিয়া যাইবে তাহাই নহে, মিত্রশক্তির দ্বিতীয় রণাঙ্গন পরিচালনা এই সংগ্রামের উপর নির্ভর করিতেছে। আফ্রিকার যুদ্ধ মিত্রশক্তি কর্তৃক যত শীঘ্র পরিসমাপ্ত হইবে, মিত্রশক্তি কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে ইয়োরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির সময় ততই নিকটবর্তী হইবে।

হের হিটলার ও মিঃ চার্চিল

১৯৪৩ সালের ২১এ মার্চ রাজনীতি ও সমাজনীতির দিক হইতে একটি উল্লেখযোগ্য দিবস। হিটলার ও চার্চিল কর্তৃক একই দিনে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। গত ৮ই নভেম্বর মিউনিক বক্তৃতার পর সুদীর্ঘকালের অবসানে হিটলার কর্তৃক নীরবতা ভঙ্গ হইল। 'জার্মান বীর দিবস' উপলক্ষে বার্লিনে এই বক্তৃতা হয়। মাত্র ১৫ মিনিটেই হিটলারের বক্তৃতার পরিসমাপ্তি !

হিটলারের বক্তৃতায় সেই পুরাতন গান অতি পুরাতন সুরেই গীত হইয়াছে। বলশেভিজম্ কি ভাবে সমগ্র ইয়োরোপ অধিকারে উদ্যত হইয়াছিল, দশ বৎসর পূর্বে নাৎসী আন্দোলন শুরু না হইলে আজ জার্মানীর কি অবস্থা হইত, জার্মান বাহিনী কর্তৃক এই নির্মম বলশেভিক্ আক্রমণ প্রতিহত না হইলে সমগ্র ইয়োরোপ আজ কি ভাবে ধ্বংসস্তূপে
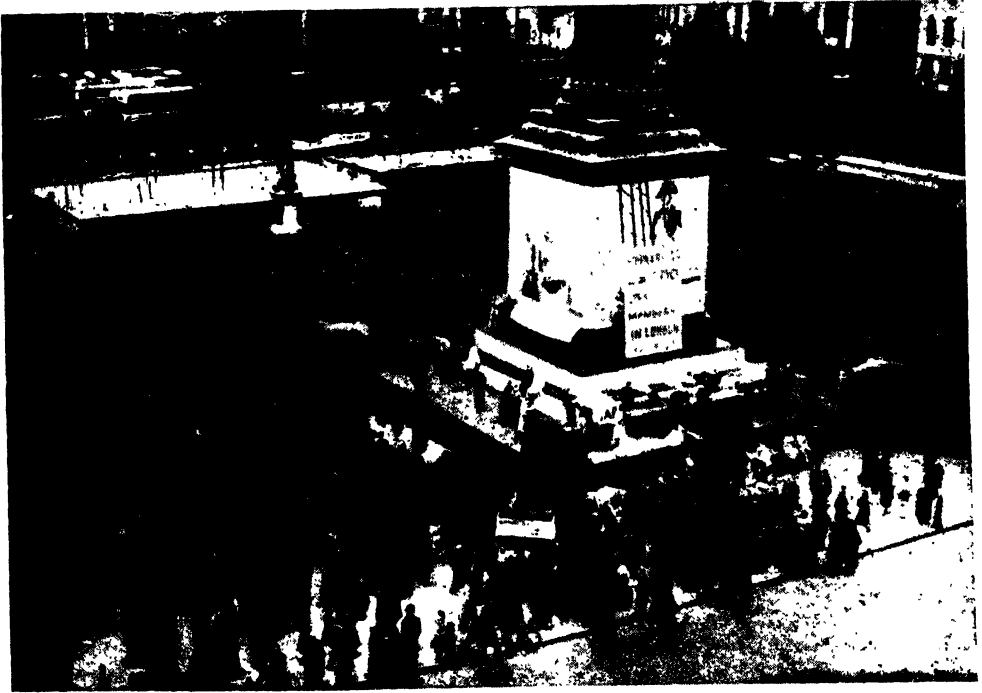
লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারে একটি বিরাট জনসভায় ইউরোপে Second Front খোলার দাবী জ্ঞাপন — অজিত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

আছে। টিউনিসিয়ার সংগ্রাম এতদিন পর্যন্ত যেন উভয় পক্ষের দড়ি টানাটানিতে পর্যবসিত ছিল। টিউনিসিয়া রণক্ষেত্রের জমি শুষ্ক ও কঠিন

পরিণত হইত—হিটলার শ্রোতৃবর্গকে আর একবার সেই কাহিনী শুনাইয়াছেন এবং কল্পনা-নয়নে উক্ত চিত্র দর্শন করিয়া বারম্বার শিহরিয়া

একটি অশ্বারোহী কশাক সৈন্য অজিত মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

উঠিয়াছেন। উইলসন্-এর চৌদ্দ দফার ন্যায় অ্যাটলাণ্টিক সনদের গুরুত্বহীনতার কথা ক্রুর উল্লেখ করিয়াছেন, পরিশেষে সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ ভিক্ষায় বক্তৃতার পরিসমাপ্তি। হিটলারের ১৯৩৯-৪০ সালের বক্তৃতার সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের নিকট এই বক্তৃতার ভাষা ও সুর যে কোথায় নামিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল কর্তৃক ঐ দিন বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছে। যুদ্ধান্তে বৃটেনকে যে সকল অর্থনীতিক ও সমাজনীতিক প্রশ্নাদির সম্মুখীন হইতে হইবে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় প্রধানতঃ ঐ সকল বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। বক্তৃতার প্রথমাংশে যুদ্ধ বিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন যে, আগামী বৎসরের কোন সময়ে, অথবা তাহার পরবর্তী বৎসরে হিটলার ও হিটলারবাদকে ধ্বংস হইতে দেখিবার আশা করা যায়। তাহার পর অবিলম্বে নিষ্ঠুর লোলুপ জাপানকে শাস্তি প্রদানের জন্য, দীর্ঘ অত্যাচারিত মহাচীনের পুনরুদ্ধারের জন্য, বৃটিশ ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্য সকল জাপ কবল হইতে মুক্ত করার জন্য এবং চিরদিনের জন্য অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ভারতের উপকূল ভাগে জাপ আক্রমণাশঙ্কা দূরীভূত করার জন্য বৃটেন অতি সত্বর পৃথিবীর অপর প্রান্তে ধাবিত হইবে। প্রধান মন্ত্রী আশা করেন ১৯৪৪ অথবা ১৯৪৫ সালে নাৎসীবাদ ধ্বংস হইবে; অতি উত্তম কথা। কিন্তু হিটলারের শক্তি যতদিন লোপ না পাইবে, প্রাচ্যের রণাঙ্গন কি ততদিন ইয়োরোপের রণক্ষেত্রের মুখ চাহিয়া দিন গুণিবে? বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতের উপকূলে জাপ আক্রমণের আশঙ্কা আছে সত্য, কিন্তু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপান শুধু নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবে এবং উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে শুধু আক্রমণের আশঙ্কাই থাকিবে—তাহার অধিক কিছু হইবে না—প্রধান মন্ত্রী কি তাঁহার বক্তৃতায় ইহাই জানাইতে চান? অথচ প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমের যুদ্ধ এখনও চরমে পৌঁছায় নাই এবং প্রাচ্যের যুদ্ধ মাত্র প্রথম পর্য্যায়ে! বহুদিন হইতে চীন মিত্রশক্তির নিকট সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে, চীনে খাদ্যদ্রব্য এবং উন্নত ধরণের রণসম্ভারের একান্ত অভাব। অনেকের ধারণা চীনে জাপান ছেলেখেলা করিতেছে, আপনার সকল শক্তি সে চীনে প্রয়োগ করে নাই। কিন্তু মিঃ ইডেন সম্প্রতি বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, জাপান তাহার সর্বপ্রকার সামরিক শক্তি চীনে প্রয়োগ করিয়াছে। বর্তমানের যুদ্ধ সমষ্টি-সংগ্রাম, সমগ্র রণশক্তি মাত্র দুইটি শিবিরেই বিভক্ত এবং প্রত্যেক রণাঙ্গন পরস্পরের উপর নির্ভর-শীল। মিঃ ইডেনও তাঁহার বক্তৃতায় যুদ্ধের এই রূপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যেক রণক্ষেত্রকে বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভাবে দেখিলে চলে না। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রীর নিকটও ইহা অজ্ঞাত নয়। মিত্রশক্তি টিউনিসিয়ার সংগ্রামে লিপ্ত বলিয়াই আজ সহজে ইয়োরোপে নূতন রণাঙ্গনের সৃষ্টি করা সম্ভব হইতেছে না। ইয়োরোপে মিত্রশক্তিকে যথেষ্ট ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে বলিয়াই প্রাচ্যে জাপান আপন অভিযান পরিচালনার সুযোগ পাইয়াছে এবং যুদ্ধের প্রারম্ভেই সে ইহাকে তাহার 'সুবর্ণ সুযোগ' বলিয়া স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছে।

যুদ্ধান্তে বৃটেনকে নূতন করিয়া পুনর্গঠনের জন্য প্রধানমন্ত্রী একটি চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন। রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও তাহার সাফল্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক ও সমাজনীতিক ব্যবস্থা গঠনে উৎসাহিত করে। কিন্তু রুশিয়ার এই সাফল্য তাহার বর্ষ সংখ্যার জন্য নয়। প্রধান মন্ত্রী যে চতুর্বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে যথেষ্ট আশার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। বেকার-সমস্যা, জনস্বাস্থ্য, গণশিক্ষা, শ্রমশিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থা—প্রত্যেক বিষয় লইয়াই প্রধান মন্ত্রী সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ চার্চিলের পরিকল্পনা যদি তাঁহার আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করে তাহা হইলে উহা যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এই পরিকল্পনা সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হইলে প্রয়োজন সর্বপ্রথমে শ্রমশিল্পকে জাতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা। সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা যতদিন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত না হইবে ততদিন বাজারে প্রতিযোগিতার অবসান হইবে না। বর্তমান অর্থনীতিক কাঠামোর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বেকার ও অন্যান্য সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রে তাহা সম্ভব হয় নাই।

জাপ-মিত্রশক্তি সংঘর্ষ

দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মার্চের প্রথমে মার্কিণ বিমানশক্তির নিকট জাপ নৌশক্তির পরাজয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাপ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি নূতন জাপবহর অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। মার্কিন বিমান বাহিনী ১০খানি যুদ্ধ জাহাজ, ১২টি সৈন্য ও মালবাহী জাহাজ এবং ৫৫খানি জাপ বিমান ধ্বংস করিয়াছে। ১৫,০০০ জাপ সৈন্যের প্রাণহানি হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ নৌশক্তির প্রাধান্য ইহাতে যথেষ্ট আঘাত পাইয়াছে এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া অভিযান প্রেরণ করিতে জাপানের বেশ কিছুদিন সময় লাগিবে।

আরাকান অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা 'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যাতেই জাপ শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, জাপানের আত্মরক্ষামূলক ঘাঁটিগুলি ক্রমশঃই অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে ইহা স্পষ্ট। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার শক্তি এখনও লাভ না করিলেও সুদৃঢ় আত্মরক্ষা আক্রমণাত্মক

অভিযান পরিচালনার পূর্বাভাষ। দুঃখের বিষয় আমাদের এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইয়াছে। প্রায় দুইমাস পূর্বে যে কালাদান অঞ্চল মিত্রশক্তি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, জাপবাহিনী কর্তৃক তাহা পুনরধিকৃত হইয়াছে। মিত্রশক্তিবাহিনী—প্রধানতঃ ভারতীয় সৈন্য—আড়াই দিনে ৫০ মাইল অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চট্টগ্রাম, ফেনী ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইতিমধ্যে কয়েকবার জাপ-বিমান হানা দিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অবশ্য সামান্য। সামরিক কারণে সকল আক্রান্ত অঞ্চলের নাম প্রকাশ অথবা আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান সম্ভব নয়। গত ২৭ মার্চ কক্সবাজারে যে জাপ বিমান আক্রমণ চালায় তাহাদের মধ্যে ১২খানি বিমান মিত্রশক্তি কর্তৃক ধ্বংস হইয়াছে। ক্ষতি ও হতাহতের সংখ্যা সামান্য বলিয়াই প্রকাশ। মিত্র-শক্তির বিমান বাহিনীও ভামো, টাঙ্গু প্রভৃতি বিভিন্ন জাপ ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করিয়া আসিতেছে। আরাকানের এই যুদ্ধ যে ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম নয় তাহা 'ভারতবর্ষ'-এর পাঠকদিগকে আমরা বহু পূর্বেই জানাইয়াছি। ভারত সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা এবং জাপশক্তিবৃদ্ধিতে বাধা প্রদানই এই আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য বলা যায়।

'ভারতবর্ষ'-এর গত চৈত্র সংখ্যায় আমরা এ কথাও জানাইয়াছিলাম যে, বর্তমানে চীনের প্রতি জাপানের মনোযোগী হওয়া স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থার দিক দিয়া বিচার করিলে জাপানের পক্ষে চীনে ব্যাপক অভিযান পরিচালনার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়। চীনে জাপানের অবিলম্বে অবহিত হওয়া সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা হয় নাই, জাপান এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। বর্মারোডের উত্তরে সালুইন নদী অতিক্রমে ব্যর্থ হইয়া জাপানীরা বর্মা রোডের দক্ষিণে নূতন অভিযান শুরু করিয়াছে। ৪টি দলে বিভক্ত এই বাহিনীর অভিযানের লক্ষ্য উত্তর-পশ্চিম হইতে চেংকাং আক্রমণ বলিয়াই বোধ হয়।

দক্ষিণ হুপে এবং উত্তর হুনানে চীনারা তীব্র প্রতি-আক্রমণ করিয়াছে। হুপে-হুনান সীমান্তে চীনা বাহিনী হোয়াজুং পুনরধিকার করিয়াছে। ইয়াংসির দক্ষিণ তীরে সাসির দক্ষিণে জাপবাহিনী নূতন সৈন্য সহযোগে তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে।

খাদ্যাভাবে পীড়িত, অনুপযুক্ত অস্ত্রে সজ্জিত চীনা বাহিনী প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তি জাপানকে যেভাবে বাধা প্রদান করিয়া চলিয়াছে তাহা সত্যই চীনাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কিন্তু ইহার জন্য দূর হইতে বাহবা প্রদান করিলেই চীনাদের দুঃখের অবসান হইবে না। অবিলম্বে ইয়োরোপে মিত্রশক্তির যেরূপ দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি আবশ্যক, চীনে অনতিবিলম্বে সামরিক সাহায্য প্রদানও ঠিক ততখানি প্রয়োজন। মিত্র-শক্তির পক্ষে চীনে সাহায্য প্রদান করিতে হইলে বর্মা রোড অধিকার করা একান্ত দরকার—এবং ইহার জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধার করা। কিন্তু বর্তমান বর্ষের শেষ অথবা আগামী বর্ষের প্রারম্ভের পূর্বে যে এই অভিযান আরম্ভ হইবে না তাহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মিঃ চার্চিলও প্রাচ্য রণাঙ্গন অপেক্ষা প্রতীচ্যের রণক্ষেত্রের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মিত্রশক্তির স্মরণ রাখা প্রয়োজন
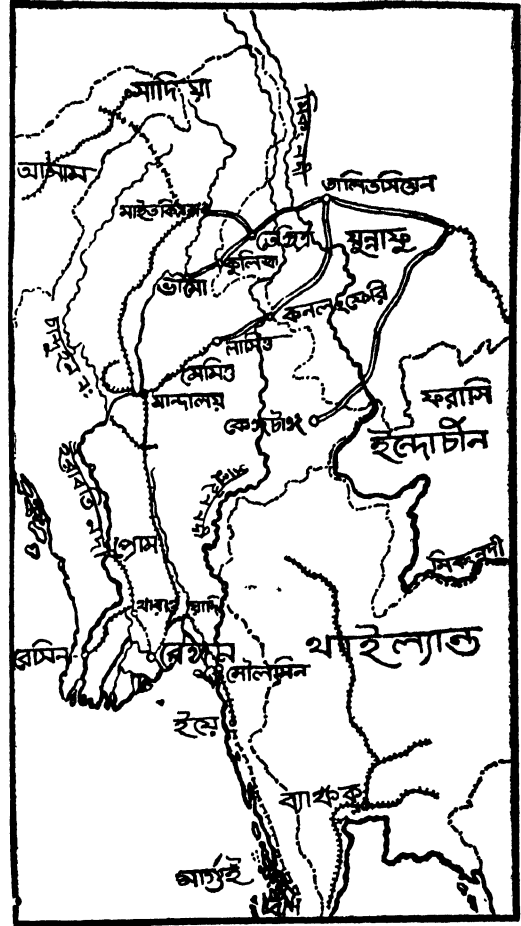
উত্তর ব্রহ্ম

সহযোগী চীনকে অবিলম্বে সাহায্য প্রদান বর্তমানে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

২৯।৩।৪৩

সওয়ার

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

উড়েছিল যত নীল ময়ূরের দল—
ঝাঁকে ঝাঁকে তারা মরুতে মরেছে আজ ;
বাসনা-রঙীন বাসর ভাঙার ছল
কামনা আমার গড়েছে স্বর্ণ-তাজ !
বর্ষা মুখর পঙ্কিল পৃথিবীতে
উপবাসী যত অজগর ধেয়ে আসে—

বাসরে গরল ঢালিতে ক্ষুব্ধ চিতে
আসে তাই, আর সৃষ্টিরে তারা নাশে !
মহাসমারোহে তবু আসে কল্যাণী
মরণের গানে বরণের গান শত—
এও শেষ হবে ; তাও আমি জানি জানি,
ভাঙা আর গড়া নিয়ত চলিছে কত !

কামনা আমার যোদ্ধ-সওয়ার সম
মনের-গহনে সেই মোর মনোরম !
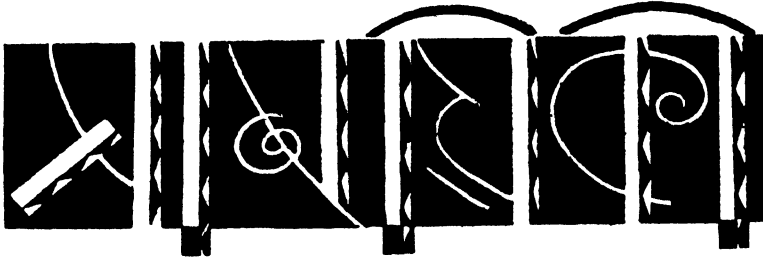
মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ—

সহসা ৩০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার সকালে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইল—বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ-কে-ফজলুল হক ২৮শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাঁহার পদত্যাগ পত্র গভর্ণর গ্রহণ করিয়াছেন। সংবাদটি পাইয়া বাঙ্গালার সকল লোক স্তম্ভিত হইল; কারণ ১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে বাঙ্গালায় মন্ত্রিমণ্ডল পরিচালিত হইতেছিল এবং ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর হইতে পুরাতন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া হক সাহেবই যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিলেন, তাহা দেশবাসী জনপ্রিয় বলিয়া মনে করিয়াছিল।
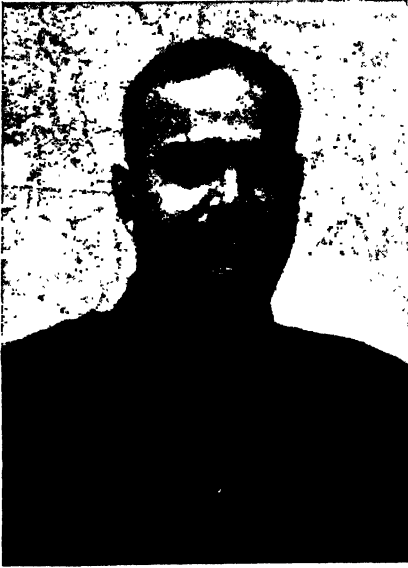
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অবশ্য ১৯৪১ সালে কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর চেষ্টাতেই এই জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইলেও তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়া সরকার তাঁহাকে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিতে দেন নাই। তাঁহার দলের শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিসভায় স্থান পাইয়াছিলেন। আর একজনের উপদেশ ও সংগঠনশক্তির ফল দেশের লোক বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিল—তিনি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদবাবু ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক বৎসরের অধিক কাল তাঁহার পক্ষে তথায় কাজ করা সম্ভব হয় নাই। গভর্ণরের সহিত মতভেদের ফলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তিনি মেদিনীপুরের

মৌলবী এ-কে-ফজলুল হক

দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগকে কোনরূপ সাহায্য দানে অসমর্থ হইয়া নিরুপায়ভাবে পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু

তাহার পর গত কয় মাসে নূতন মন্ত্রিসভায় আর কোন সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই। মধ্যে প্রধান মন্ত্রী ৪ জন নূতন সদস্যকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। এদিকে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে মন্ত্রিসভার বিপক্ষ দল মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের জন্য তিনবার চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছেন। লীগ দল ও শ্বেতাঙ্গ দল একযোগে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে নূতন দল গঠন করিয়াছিলেন। সে দলের সদস্য সংখ্যা অধিক হয় নাই।

২৮শে মার্চ্চ রবিবার রাত্রিতে প্রধান মন্ত্রী গভর্ণর কর্ত্তৃক আহুত হইয়া লাট প্রাসাদে গমন করেন। তথায় প্রধান মন্ত্রীকে কয়েকটি প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বলা হয়। প্রধান মন্ত্রী তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করিতে বলা হয়। পদত্যাগ পত্র নাকি টাইপ করাই ছিল। প্রথমে হক সাহেব স্বাক্ষর করেন নাই—তিনি তাঁহার সহযোগীদের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু প্রধান মন্ত্রীকে নাকি পদচ্যুতির ভয় দেখাইয়া গভর্ণর সেই স্থানেই প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লন। পরদিন ২৯শে মার্চ্চ সোমবার সকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন ছিল। তথায় প্রধান মন্ত্রী সদস্যগণের অনুরোধে পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা প্রকাশ করেন। গভর্ণর হক সাহেবের নিকট নূতন মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে কি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা হক সাহেব ব্যবস্থা পরিষদেও প্রকাশ করেন নাই। সে প্রস্তাব যে হক সাহেবের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ছিল না, শুধু তিনি তাহাই জানাইয়া দিয়াছেন। সোমবার ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনার কথা ছিল; কিন্তু মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় আর বাজেট সম্পর্কে আলোচনা হয় নাই। সভাপতি মৌলবী নৌশের আলি ১৪দিনের জন্য সভার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

৩০শে মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে "নবযুগ" সম্পাদক মৌলানা আমেদ আলির সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়াছিল। তাহাতে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে—জনসাধারণের ইষ্টের জন্য গভর্ণর সার জন হার্ব্বার্টের আর গভর্ণর পদে থাকা উচিত নহে। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়া বে-আইনী কাজ করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে গঠিত মন্ত্রিসভা দেশ হইতে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূর করিয়াছিলেন কাজেই সেই মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া গভর্ণরের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। ঐ জনসভায় শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, অধ্যাপক অতুল সেন, শ্রীযুক্ত সোমনাথ লাহিড়ী ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সকলের বক্তৃতাতেই বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

মঙ্গলবার প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য সকল মন্ত্রী গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হক সাহেব সে দিন হাইকোর্টে যাইয়াও পুনরায় ওকালতী ব্যবসা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

৩১শে মার্চ্চ কলিকাতা লাট প্রাসাদ হইতে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া সকলকে জানান হইয়াছে যে গভর্ণর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে বাঙ্গালার শাসন সংক্রান্ত সকল কার্য্যভার স্ব-হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১শে মার্চ্চ সরকারী

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৎসরের শেষ দিন। সে দিনের মধ্যে পরবর্ত্তী বৎসরের ব্যয় বরাদ্দ স্থির না হইলে ১লা এপ্রিল হইতে কোন অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হইবে না। কাজেই গভর্ণরের পক্ষে এই কার্য্য করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু গভর্ণর এই সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসহ নহে। কারণ এখনও ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য মৌলবী এ-কে-ফজলুল হকের নেতৃত্বে আস্থাবান। কাজেই এখনও যদি গভর্ণরকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন

করিতে হয়, তবে হক্ সাহেবকে ডাকিয়া তাহা করা ছাড়া গভর্ণরের গত্যন্তর নাই। কি ভাবিয়া গভর্ণর হক সাহেবকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন, তাহাও জানা যায় নাই। অথচ সরকারী বিবৃতিতে জলের মত পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে—হক সাহেব প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়াছেন। ওদিকে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতিও পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়ায় গভর্ণরের পক্ষে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া তদ্বারা ব্যয় মঞ্জুর করাইয়া লওয়াও সম্ভব হয় নাই।

৩১শে মার্চ্চ তারিখেও হক সাহেব এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রীরা সকলেই হক সাহেবের নেতৃত্বে আস্থাবান। কাজেই হক সাহেব পদত্যাগ করায় সকলেই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে তাঁহাদের কার্য্যকালও শেষ হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহাদিগকে একযোগে পদত্যাগপত্র গভর্ণরের নিকট পাঠাইয়া দিতে বলা হইয়াছিল; মন্ত্রীরা সকলে একযোগে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া গভর্ণরের কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগের পর তাঁহাদের আর পৃথকভাবে পদত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই।

এই ঘটনার পর ৩১শে মার্চ্চ গভর্ণর আর একখানি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া অপর ৭জন মন্ত্রীরও পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন—তাঁহাদের নাম—(১) ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর (২) শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু (৩) খান বাহাদুর আবদুল করিম (৪) শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) খান বাহাদুর হাসেম আলি খান (৬) মৌলবী সামসুদ্দীন আহমদ ও (৭) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ। এদিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিসন দলের ১০ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত এক পত্র হক সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে ও তাহা তাঁহাকে গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করিতে বলা হইয়াছে। ঐ পত্রে সকলেই হক সাহেবের নেতৃত্বে তাঁহাদের বিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ ১০ জন ছাড়াও ব্যবস্থা পরিষদের প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিসন দলের ২০ জনেরও অধিক সদস্য বর্ত্তমানে ভারত রক্ষা আইনে আটক আছেন।

বিলাতে ও এদেশে—

বিলাতে যুদ্ধের জন্য লোকের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য শতকরা ২১ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ভারতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য সে স্থলে শতকরা ১০০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। কোন কোন জিনিষের দাম তদপেক্ষা অধিকও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা এ দেশে এখনও কিছুই হয় নাই।

গম আমদানীতে বাধা—

অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে গম আসিতেছে জানিয়া জনসাধারণ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। বিদেশী গম সুলভ হইলে পাঞ্জাবের গমও সুলভ হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু খবর আসিয়াছে যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে যে গম সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বৃটীশ সরকার তাহা কিনিয়া লইয়াছে। এখন ভারত সরকার যদি সেই গম পুনরায় কিনিতে চায়, তাহা হইলে বেশী দাম দিয়া তাহা কিনিতে হইবে। এই সংবাদ সত্য হইলে তাহা ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

যক্ষ্মা হাসপাতালে সরকারী সাহায্য—

তিন চার বৎসর পূর্ব্বে সরকার দার্জ্জিলিঙের পার্ব্বত্য অঞ্চলে যক্ষ্মারোগীদিগের জন্য যে স্বাস্থ্যাবাস স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা আনুমানিক ব্যয় হইবে স্থির হইয়াছিল। উক্ত স্বাস্থ্যাবাসে গমনাগমনের জন্য যে রাস্তা তৈয়ারীর পরিকল্পনা ছিল তাহার আনুমানিক ব্যয় ১৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য উহা কার্য্যকরী করা সম্ভব না হওয়ায় সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ঘোষণা করেন যে, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে আরও ৫০টী ফ্রী-বেড-এর জন্য বঙ্গীয় সরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা বার্ষিক স্থায়ী-সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে সরকার সর্ব্বমোট ৮০টী ফ্রী-বেডের ব্যবস্থা করিলেন।

মিঃ এ, কে, চন্দ—

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ এ, কে, চন্দ ১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বি, এম, সেন মহাশয় গত ১লা এপ্রিল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট্ ফ্যাকালটি—

এতদিন পরে এ দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিও গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ করিল এবং ১লা এপ্রিল হইতে সে জন্য গভর্ণমেণ্ট হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট্ ফ্যাকালটি গঠন করিয়া দিয়াছেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত এ, এন্, সেন ও ডাক্তার জে-এন মজুমদার উক্ত ফ্যাকালটির জেনারেল কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃষ্ণনগরের ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যাল, উত্তরপাড়ার ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ীর ডাক্তার অরুণচন্দ্র দাশগুপ্ত, গোয়ালন্দের ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ গুহ, চট্টগ্রামের ডাক্তার শচীমোহন চৌধুরী প্রভৃতি অনেকে কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছেন। হোমিওপ্যাথিক কলেজসমূহ হইতে ৫ জন সদস্য গ্রহণ করা হইবে। বহুদিন পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকে অপর সকল চিকিৎসা পদ্ধতির সহিত সমান মর্য্যাদালাভ করিতে দেখিয়া দেশবাসীমাত্রই আনন্দ লাভ করিবেন।

সাহিত্য পরিষদের নূতন শাখা—

হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগরে সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত শাখা প্রতিষ্ঠার উৎসবে স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় সাহিত্য শাখার উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বক্তৃতা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সাহা সমবেত সাহিত্যিকগণকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেন—

স্বর্গত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেন সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি
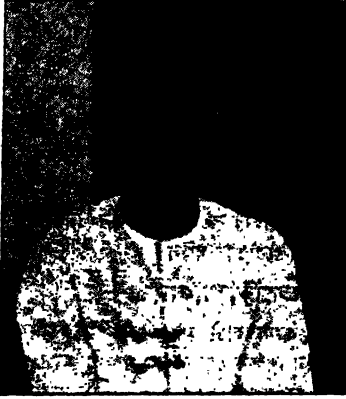
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র সেন

প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সেনের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল "বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী উপন্যাস।" প্রবীণ ইংরাজ সমালোচক মিঃহাবরাট রীড, মিঃ এডইন মূর এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ এন, কে, সিদ্ধান্ত শ্রীযুক্ত সেনের প্রবন্ধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত সেনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

চাউলের মূল্য নির্দ্ধারণ—

গত ১৫ই মার্চ এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—নিম্নলিখিত দরে খুচরা চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইল—মোটা চাউল—প্রতি সের—সওয়া ৪ আনা। মাঝারি চাউল—প্রতি সের—৪ আনা তিন পয়সা। সরু চাউল—প্রতি সের সাড়ে ৫ আনা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক সময়ে ২ সের চাউল বিক্রয় করা হইবে। এই ব্যবস্থা কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ ভাবে চাউল পাওয়া প্রায় একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। কলিকাতা সহরে চাউল ক্রয়ের সারি দেওয়া দেখেন নাই বা তাহার কষ্ট অনুভব করেন নাই, এমন লোক খুব কমই আছেন। ঐ দরে যদি সর্ব্বত্র চাউল পাওয়া যাইত, দেশের লোক তাহা দ্বারা উপকৃত হইত। কিন্তু ব্যবস্থা করিবে কে?

২৪ পরগণা সাহিত্য সম্মিলন—

গত ১৯শে মার্চ্চ দক্ষিণ বারাসত হিতৈষিণী লাইব্রেরীর উদ্যোগে ২৪ পরগণা জেলা সাহিত্য সম্মিলন ও একটি কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মূল সভাপতি হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর ধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল যথাক্রমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিশু, জনসেবা ও সঙ্গীত বিভাগের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় বারাকপুর, আরিয়াদহ, বরাহ নগর, কাশীপুর, ঢাকুরিয়া প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বহু সাহিত্যিক যোগদান করিয়াছিলেন। এই দুর্য্যোগের মধ্যে যাঁহারা এই সাহিত্য সম্মিলনের জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা জেলাবাসী সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

সিঁথি বাণী মন্দির—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী উত্তর কলিকাতা সিঁথি বাণী মন্দিরের উদ্যোগে ৩৯নং বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে এক সাহিত্য সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি বন্দে আলি মিয়া প্রভৃতি উপস্থিত অনেকে 'সিনেমা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। গৃহস্বামী তরুণ কবি শ্রীযুক্ত বলরাম ঘোষের উদ্যোগে সম্মিলনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সভায় আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতিরও আয়োজন ছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতিপূজা—

গত ২৮শে মার্চ্চ রবিবার বিকালে ২৪ পরগণা নৈহাটীতে স্থানীয় নারায়ণ বাণী মন্দিরের উদ্যোগে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী সভার উদ্বোধন করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে হরপ্রসাদের দানের কথা সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল।

প্রভু গুহ ঠাকুরতা—

গত ১৩ই মার্চ ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট একস্‌প্যানসান বোর্ডের প্রচার বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রভু গুহ ঠাকুরতা মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। ছাত্রজীবন হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল

অধ্যক্ষ ডক্টর প্রভু গুহ ঠাকুরতা

এবং সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও প্রচারশিল্পী হিসাবে তিনি সর্ব্বজনবিদিত ও জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার মধুর স্বভাব ও

অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মৃত্যুতে দেশ প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী—

গত ৩০শে ফাল্গুন নটগুরু গিরিশচন্দ্রের জন্মশত বার্ষিকী উৎসব কলিকাতা গিরিশ পার্কে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে পার্কে রক্ষিত মর্ম্মর মূর্ত্তিতে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন—"গিরিশচন্দ্রের জন্ম শত বার্ষিকীর অনুষ্ঠান করিয়া বাঙ্গালী তাহার অপরিশোধ্য ঋণ-শোধের কথঞ্চিৎ আয়োজন করিয়াছে। ১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন বঙ্গের নটকুলগুরু এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মদাতা গিরিশচন্দ্র বাগবাজারের সম্ভ্রান্ত ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবন-কথা অনেকেরই সুপরিচিত। সাধারণ অভিনেতারূপে যাত্রার দল গঠন করিয়া তিনি তাঁহার অসাধারণ জীবনযাত্রা সুরু করেন। কিন্তু সেই অঙ্কুর হইতে যে বিশাল মহীরুহের জন্ম হয়, বাঙ্গালা আজও আনন্দে তাহার ফল আস্বাদন করিতেছে। নটজীবনে গিরিশচন্দ্র অভিনয়ে যে উৎকর্ষ দেখান তাহার ফলে নাট্যশালা জনসাধারণের শিক্ষা ও আমোদের ক্ষেত্রে পরিণত হয়।"

সার আজিজুল

ভারতের হাই কমিশনার সার আজিজুল হক সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সার আজিজুলের আকস্মিক আগমন ব্যক্তিগত কারণে বলিয়া ঘোষিত হইলেও কিছুদিন পূর্ব্বে 'ষ্টার অফ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা বলিয়াছেন—তিনি হয়ত বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্যপদও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে দুইমাস কাল সার আজিজুল ছুটী ভোগ করিবেন এবং দুইমাসের জন্য একটী অস্থায়ী অফিস তাঁহার জন্য খোলা হইবে।

ধান চাউলের নিয়ন্ত্রণাদেশ বাতিল—

ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া দিবার জন্য ১৯৪২ সালের ২১শে জুলাই বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যে আদেশ জারি করিয়াছিলেন, গত ১১ই মার্চ্চ হইতে সেই আদেশ বাতিল করা হইয়াছে। আদেশ থাকা সত্ত্বেও লোকজন নির্দ্দিষ্ট মূল্যে মাল পায় নাই। আদেশ বাতিল হওয়ার পর লোক হয়ত সুবিধা পাইতে পারে। যে আদেশ জারি বা বাতিল উভয় অবস্থাতেই একরূপ, সে আদেশের কি মূল্য আছে?

পরলোকে অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৬০ বৎসর বয়সে নাট্যকার অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় যশোহরের মল্লিকপুর গ্রামে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। যাত্রাভিনয়ের জন্য তিনি বহু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও সুঅভিনেতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন শক্তিশালী নাট্যকারের তিরোভাব ঘটিল।

পরলোকে মিঃ সত্যমূর্ত্তি—

বিশিষ্ট দেশ-নেতা মিঃ সত্যমূর্ত্তি গত ২৮শে মার্চ্চ মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। মিঃ সত্যমূর্ত্তিকে ১৯৪২ সালের ১১ই আগষ্ট ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। ভেলোর, অমরাবতী প্রভৃতি জেলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হয়। অমরাবতী জেলে মিঃ সত্যমূর্ত্তি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং এই কারণে তাঁহাকে মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুদিন পরে স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল। মিঃ সত্যমূর্ত্তি কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস-কর্ম্মি ও দেশ-সেবকের তিরোভাব ঘটিল।

মহাদেব চট্টোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা কামারহাটী সাগর দত্ত অবৈতনিক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেলঘরিয়া নিবাসী মহাদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১০ই মার্চ্চ মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ও যত্নে উক্ত বিদ্যালয় বিশেষ উন্নতি-
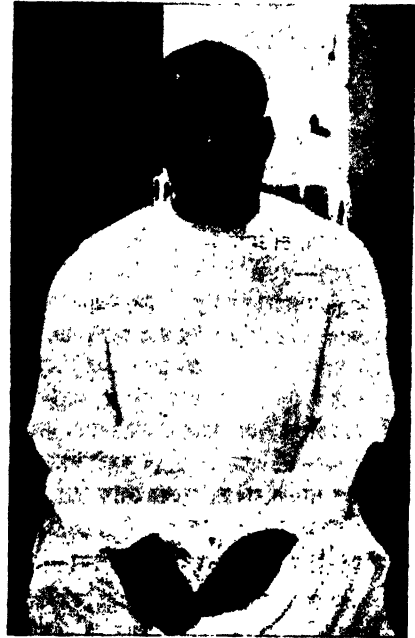
৺মহাদেব চট্টোপাধ্যায়

লাভ করিয়াছিল। তিনি বহুদিন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছিলেন এবং ঐ অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন।

বিপজ্জনক বাংলা—

সম্প্রতি ভারত সরকার সমগ্র বাংলা দেশকে বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বাংলার যে কোন

স্থানে গুরুতর বিমান হানার আশঙ্কা আছে এরূপ কথাও ঘোষিত হইয়াছে। বাংলা সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী জনরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস অথবা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বে অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা হ্রাস করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। জনরক্ষা সম্পর্কে সে সমস্ত অঞ্চলে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা যাহাতে দ্রুত কার্য্যকরী হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে সরকার অফিসার ও স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলে জনরক্ষা সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সরকারকে জানাইবার জন্য কর্পোরেশনকেও অনুরোধ করা হইয়াছে।

কাগজ সমস্যা—

সম্প্রতি সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ করা হইয়াছিল যে ভারতে মোট যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার শতকরা ১০ ভাগ জনসাধারণের কাজের জন্য পাওয়া যাইবে। গভর্ণমেন্টের মিতব্যয়িতাব ফলে আরও অধিক কাগজ পাওয়া যাইবে বলিয়া বর্ত্তমানে আশা করা যাইতেছে। এক সংবাদে প্রকাশ, এই কাগজ আরও ২০ ভাগ বেশী পাওয়া যাইবে অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ কাগজ পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমানে কাগজ প্রস্তুতের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে আশা করা যাইতেছে কাগজের মোট পরিমাণ প্রায় ১২ হাজার টন বৃদ্ধি পাইবে। সুষ্ঠুভাবে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যে কয়শ্রেণীর কাগজ সহজে প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে সরকারী প্রয়োজনীয় কাগজ সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা এবং যে কাগজ অত্যাবশ্যকীয় নহে তাহা উৎপাদন করার উপর নিষেধাজ্ঞা ও বহু প্রকারের প্রস্তুত কাগজের সংখ্যা হ্রাসের প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

সমাবর্ত্তন উৎসব—

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। গত ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নানা বিষয়ে মোট ১৬১৭ জন ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে— পি, এইচ্, ডি—৫জন, ডি, এস্, সি—৫জন; এম, ডি—২জন; এম্, এল্—২জন; এম্-এ—৪১৭ জন; এম্, এস্, সি—১২৫ জন; বি, কম্—৩৪৩জন; বি, টি—২৭৩ জন; বি, এল্—১০৫জন; এম্, বি—২২৫ জন; ডি, পি, এইচ্—২৬ জন; বি, ই—৭৪জন; বি, মেটে—১১জন এবং ইংরাজী কথ্য ভাষায় ডিপ্লোমা পাইয়াছেন—৪জন। ইহা ছাড়া কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ ৬১ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার সার জন হারবার্ট দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। অভিভাষণের একস্থানে চ্যান্সেলার বলেন—"আমি আশাকরি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সেনা বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহক শাখা সমূহে আরামের চাকুরী লাভে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত শাখাসমূহে যোগদান করিয়া তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিবেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হইবে সৈন্য, নাবিক ও বৈমানিক তৈয়ারী করা। উহার উদ্দেশ্য আরও অধিক ব্যাপক।"

ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার ভাষণে সমালোচকদের দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার বিশ্লেষণ করেন এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে কি ভাবে পরিচালিত

গভর্ণর ও ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়

করা হইতেছে তাহার উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গতঃ ভাইস চ্যান্সেলার বলেন—"শিক্ষামন্ত্রীর নির্দ্দেশক্রমে ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে সমস্ত স্কুল-কলেজগুলিকে ছুটি দেওয়া হয়। ছাত্রদের পড়াশুনার ক্ষতি যে বিস্তর হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। পূজার বন্ধের পর স্কুল কলেজ আবার খুলিল। স্কুল-কলেজে ছাত্র সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিল কিন্তু ২০শে ডিসেম্বর কলিকাতার উপর বোমা পড়িল।

এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় এ-আর-পি শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে লইয়া 'ডিফেন্স স্কোয়াড' গঠনের প্রস্তাব গভর্ণমেন্টের নিকট আনয়ন করেন এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী এই বিষয়ে একটা 'সিলেবাস'ও দাঁড় করান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গভর্ণমেন্ট এই পরিকল্পনা নাকচ করিয়া দেন।"

চ্যান্সেলার ও ভাইস চ্যান্সেলারের বক্তৃতার তাৎপর্য্য বুঝা কঠিন। কারণ চ্যান্সেলার যুদ্ধে ছাত্রগণকে আহ্বান করিতেছেন, অপর পক্ষে ভাইস্-চ্যান্সেলার নাকচের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।—'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য'!

যাকে রাখ—

রেলের উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় ভারত সরকার এখন নৌকা ডিঙ্গি প্রভৃতির সাহায্যে মাল চলাচলে উৎসাহ দিতেছেন। এই সকল (জল) যানের সাহায্যে সম্প্রতি ওখা হইতে বরোদায় প্রচুর পরিমাণ কয়লা এবং করাচী হইতে বোম্বায়ে তুলা চালান

হইয়াছে। বোম্বাই হইতে উপকণ্ঠস্থ কয়েকটি স্থানে চার কোটী ইট এবং মালাবার হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর কাঠ বহন করা হইয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে এই কার্য্যের জন্ম বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। কি ভাবে রেল ও অন্যান্য যানবাহনের সহযোগে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে ক্রটী করা হয় নাই। এই সেদিন পর্য্যন্ত রেল সাহায্যে মাল পাঠাইবার জন্য কি বিরাট চেষ্টা, বিজ্ঞাপন, প্রচার, এমন কি ভাড়া হ্রাসের ব্যবস্থা হইতেছিল। আজ যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সমস্ত ব্যাপার ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সম্ভবতঃ যুদ্ধান্তে এই শিক্ষার কথা মনে থাকিবে এবং নৌকা ডিঙ্গি, গরু মহিষের গাড়ী, লরী প্রভৃতি সবই নিজ নিজ স্থানে বাঁচিয়া থাকিবার ব্যবস্থা হইবে।

ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর—

বাংলার গভর্ণর ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়া শাসনভার গ্রহণ করার পর ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটের সমগ্র ব্যয় বরাদ্দ নিজ ক্ষমতাবলে মঞ্জুর করিয়াছেন।

যুক্ত শরৎচন্দ্র বসু স্থানান্তরিত—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে এতদিন মাকারায় আটক রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, তাঁহাকে দক্ষিণ ভারতের কুন্নুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের জন্মোৎসব—

অন্যান্যবৎসরের মত এবারেও নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে একটি বৈষ্ণব-সম্মিলন হয়। সভাপতির পদ গ্রহণ করেন রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বহু বৈষ্ণব, পণ্ডিত-সজ্জন এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর চট্টোপাধ্যায় বি-এ সভাপতির রচিত একটি গৌরবন্দনা গান করেন। নৈয়ায়িকপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী তর্কতীর্থ সভাপতিকে বৈষ্ণব সাহিত্য ও কীর্ত্তন প্রচারের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অতঃপর নবদ্বীপের প্রবীণ সাহিত্যসেবী ও জনসেবক শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায়কে 'সৎসাহিত্যপ্রসূনসমধুকর' উপাধি দান করা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত জনরঞ্জন রায় 'বৈষ্ণব চিত্রের উৎস' সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ বাংলার বাহিরে—বিশেষতঃ বেনারসে—চৈতন্যধর্ম কিরূপ বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রভূষণ সাংখ্যতীর্থ ও আশুতোষ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য যথাক্রমে বৈষ্ণব ধর্মের উচ্চ আদর্শ ও দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পাশ্চাত্য জগতে ধর্মভাবের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও নির্বাসিত হইয়াছে। ধর্মের সঙ্গে শান্তির যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে বর্তমান জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন যে যুদ্ধ-বিগ্রহ যখন থামিয়া যাইবে, তখন যদি মানুষ শান্তির জন্য ব্যাকুল হয়, তবে ভারত-বর্ষের দিকেই সকলকে ফিরিতে হইবে। কারণ আজিও ভারত তাহার সনাতন ধর্মবুদ্ধি হারায় নাই।

সভার কার্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী এবং অন্যান্য সঙ্গিগণ লইয়া রায় বাহাদুর রূপাভিসার কীর্ত্তন করেন। বহু লোক মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত এই কীর্ত্তন গান শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকটি বালিকা সুন্দর ভজন গাহিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৪।৫ মাস রোগ ভোগের সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। সুরেনবাবু কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হইতেই অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক ৺সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দীর্ঘ ২৫ বৎসরের উপর তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা, অনন্যসাধারণ ছাত্র-বাৎসল্য এবং বাঙ্গালা সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্তি তাঁহাকে প্রবাসী বাঙ্গালার একটি গৌরবস্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালীদের শিক্ষার প্রসার যাহাতে ব্যাহত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেজন্য তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল। সুরেনবাবুর অকাল বিয়োগ প্রবাসী বাঙ্গালীগণ একজন প্রকৃত সহৃদয় বিদ্বান্ অধ্যাপকের অভাব অনুভব করিবেন।

পরলোকে ডাঃ ভ্যানমেনন—

প্রাচ্যভাষায় বিশেষজ্ঞ ডাঃ জন ভ্যান মেনন গত ১৭ই মার্চ্চ বুধবার কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর অস্থায়ী লাইব্রেরিয়ান ও কলিকাতা মিউজিয়ামের নৃ-তত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। ডাঃ ভ্যানমেনন বৃটেন, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তির তিরোভাব ঘটিল।

সুলভে খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহের উদ্যম—

দেশের যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সরকার-প্রদত্ত খাদ্য-সরবরাহ ব্যাপারটিও একশ্রেণীর অতি-লোভী অসাধু ব্যবসায়ীর চক্রান্তে ক্ষুন্ন

বাবু লক্ষ্মীচাদ বৈজনাথ

ও বিড়ম্বিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই সময় কলিকাতা বড়বাজার অঞ্চলে ৩১নং কটন ষ্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেসার্স লক্ষ্মীচাদ বৈজনাথ প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রায় তিন মাসকাল ধরিয়া প্রত্যহ নিয়মিতরূপে প্রায় সাত আট সহস্র ক্ষুধাতুরকে পুরী-তরকারী সরবরাহ করিতেছেন, এ সংবাদ বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানে প্রতিসের আটার মূল্য যেখানে চৌদ্দ আনারও অধিক ইঁহারা সে ক্ষেত্রে আট আনা সের দরে উৎকৃষ্ট পুরী ও তৎসহ তরকারী দিয়া সহস্র সহস্র লোকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সুলভে খাদ্য সরবরাহের সহিত সম্প্রতি ইঁহারা মিলের দরে সর্ব্বসাধারণকে বস্ত্র যোগাইবার যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের সোল সেলিং এজেন্টরূপে এই প্রতিষ্ঠান হইতে নির্দ্দিষ্ট নম্বরের যে-সকল ধুতি ও সাড়ী জনসাধারণকে আশাতীত সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হইতেছে। আমরা স্থানান্তরে বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক মিলগুলির উৎপন্ন বস্ত্রের বিপুল লাভের অঙ্ক প্রদর্শন করিয়াছি। কিন্তু ঢাকেশ্বরী মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহযোগিতায় দেশের এই সঙ্কটকালে লক্ষ্মীচাদ বৈজনাথের প্রতিষ্ঠানটি জনহিতকল্পে ব্যাপকভাবে যে সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, অতি লাভে পরিপুষ্ট তথাকথিত মিলগুলির কর্ত্তৃপক্ষগণ এরূপ কোন সৎসাহসের পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশবাসীর প্রতি বাঙ্গালা দেশের ঢাকেশ্বরী মিল তথা লক্ষ্মীচাদ বৈজনাথ কোম্পানীর এই সহানুভূতি জাতির স্মৃতিপথে চির-জাগরূক থাকিবে।

বাঙ্গালায় মাছের চাষ—

বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের সহিত মাছের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। বাঙ্গালীর পক্ষে মাছ একটী প্রয়োজনীয় খাদ্য, সুতরাং অন্যান্য ফসল বৃদ্ধির প্রচেষ্টার সহিত মৎস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি বঙ্গীয় ফিসারী বিভাগের ডিরেক্টর এক বিবৃতি দ্বারা বাঙ্গালায় পুষ্করিণী বিল প্রভৃতি জলাশয়ে মৎস্য বৃদ্ধির এক সহজ পরিকল্পনা সাধারণকে অবগত করাইয়াছেন। এইরূপ প্রচেষ্টা সত্য সত্যই হওয়া দরকার এবং আমরাও তাঁহার সহিত একমত যে চাষের অপেক্ষা মৎস্য উৎপাদনের ব্যয় এবং ক্ষতির সম্ভাবনা কম। এই কার্য্যের একটী উপায়স্বরূপ তিনি বলেন যে "বর্ষাকালে বন্যার সময় ধানক্ষেত ও ছোট ছোট খালগুলিতে রোহিত কাতলা ও মৃগেল মাছের যে সকল পোনা ঝাঁকে ঝাঁকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া পুকুর এবং হ্রদে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" আমরা যতদূর জানি সর্ব্বত্রই এরূপ রুই মৃগেল প্রভৃতির ছানা ধান ক্ষেত ও ছোট ছোট খালগুলিতে পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা শোল, ল্যাঠা, আড় প্রভৃতি মাছের পোনার ঝাঁক। সুতরাং পুকুরে তাহা ছাড়িলে ফল খুব ভাল না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন।

বহরমপুর মিউনিসিপালিটী—

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরবাসী রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি বহরমপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ কর্ত্তৃক উক্ত মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্যামাপদ বাবুর ন্যায় কংগ্রেস কর্ম্মীর সাফল্যে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। বহরমপুরের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত রামদাস সেন মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান অনুত্তম সেন এম-এ,বি-এল উক্ত মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এরূপ অল্প বয়সে এই সম্মানলাভ সচরাচর দেখা যায় না।

শ্রীযুত অনুত্তম সেন
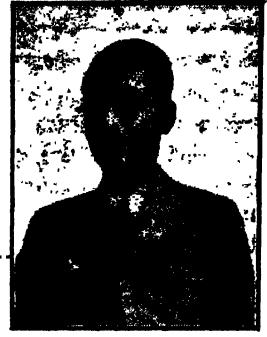
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ক্রিকেট ঃ

বরোদা রাজ্য ঃ ৩০৮ ও ৩২১

হায়দরাবাদ ঃ ২১৫ ও ১০৭

রঞ্জি-ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বরোদা রাজ্যদল ৩০৭ রানে হায়দরাবাদ দলকে পরাজিত ক'রে প্রথম রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হয়েছে। হায়দরাবাদ দল ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৭-৩৮ সালে রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হয়। বরোদা রাজ্য দল রঞ্জিট্রফি পেয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। প্রতিযোগিতার প্রারম্ভ থেকেই দলের খেলোয়াড়রা বিজয়ীর মত খেলেছে। ফাইনালে হায়দরাবাদ দল পরাজিত হ'লেও তাদের পরাজয় অগৌরবের নয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে জয় লাভের জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত আবহাওয়া। টসে জয়লাভ ক'রে বরোদা দল প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করলে। কিন্তু সূচনা ভাল হ'ল না। বরোদা দলের খেলোয়াড়রা খুব ধীরে সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকে। কোন উইকেট না গিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজের সময় রান উঠল ৩১। তৃতীয় উইকেটের জুটীতে অধিকারী এবং হাজারী খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। চা-পানের সময়ে ২ উইকেটে ১৫০ রান উঠল। প্রথম দিনের শেষে বরোদা দলের ২১৩ রান উঠল ৪ উইকেটে। অধিকারী ৫৬ রান ক'রে আউট হয়েছেন। হাজারী এবং সি এস নাইডু যথাক্রমে ৫৯ রান ও ১৩ রান ক'রে নট্ আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনে ২টা ১০ মিনিটে বরোদা দলের প্রথম ইনিংস ৩০৮ রানে শেষ হ'ল। হাজারী ৮১ এবং সি এস নাইডু ৪৫ রান ক'রে আউট হ'লেন। গোলাম আমেদ ১১৪ রান দিয়ে ৬টি উইকেট পেলেন।

হায়দরাবাদ প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৩৬ রান তুললে। কুরশী এবং ভরতচাঁদ যথাক্রমে ৪৫ ও ৪৯ রান করে নট্ আউট রইলেন। দর্শকেরা সকলেই আশা করলে হায়দরাবাদ দলও উপযুক্ত রান তুলে বরোদাদলকে প্রত্যুত্তর দিবে। কিন্তু তা আর হ'ল না।

তৃতীয় দিনে হায়দরাবাদ দলের প্রথম ইনিংস ২১৫ রানে শেষ হ'ল। সি এস নাইডু এবং হাজারীর বল মারাত্মক হ'ল। হাজারী ৫৯ রানে ৪টা এবং সি এস নাইডু ৬০ রানে ৬টা উইকেট পেলেন। বরোদা ৯৩ রানে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বরোদা ১৮৭ রান করলে, ২টো উইকেট হারিয়ে। এবারেও হাজারী এবং অধিকারীর জুটী দাঁড়িয়ে গেল। অধিকারী ৭০ রান এবং হাজারী ৫৮ রান ক'রে নট আউট রইলেন।

চতুর্থ দিনে বরোদা দলের খেলার সূচনা মোটেই ভাল হ'লনা। অধিকারী কোন রান না করেই আউট হলেন, তাঁর পূর্ব্ব দিনের ৭০ রানই রয়ে গেল। হাজারীর সঙ্গে জুটী হলেন এম নাইডু। কিন্তু তিনিও বেশীক্ষণ উইকেটে রইলেন না, ২ রান ক'রেই বিদায় নিলেন। দুটো ভাল উইকেট পড়ে গেল; এদিকে কিন্তু মাত্র ৫ রান মোট সংখ্যায় যোগ হয়েছে। বরোদা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩২১ রানে শেষ হলে তারা ৪১৪ রানে অগ্রগামী হয়।

বিভিন্ন রকমের ব্যাট চালনা ক'রে হাজারী ৯৭ রান তুললেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ৩ রানের জন্যে 'সেঞ্চুরী' করতে পারলেন না। ১৮৩ মিনিট খেলে তাঁর রান সংখ্যায় ৮টা 'চার' পান। হায়দরাবাদ দলের মেটা ১০৩ রানে ৫টি উইকেট পেয়ে বোলিংয়ে কৃতিত্ব দেখান।

হায়দরাবাদ ৪১৪ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। কিন্তু বরোদা দলের বোলিংয়ের সামনে তাদের উইকেট বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। মাত্র ১০৭ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'য়ে গেল। হাজারী ২৭ রানে এবং সি এস নাইডু ৪৬ রানে ৫টি ক'রে উইকেট পেলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী দল ঃ

প্রথম খেলা—১৯৩৪-৩৫ বোম্বাই দল; ১৯৩৫-৩৬ বোম্বাই; ১৯৩৬-৩৭ নবনগর দল; ১৯৩৭-৩৮ হায়দরাবাদ দল; ১৯৩৮-৩৯ বাঙলা দল; ১৯৩৯-৪০ মহারাষ্ট্র দল; ১৯৪০-৪১ মহারাষ্ট্র; ১৯৪১-৪২ বোম্বাই দল।

বোম্বাইতে প্রদর্শনী ক্রিকেট ঃ

বেঙ্গল সাইক্লোন একাদশ ঃ ৭০৩ ও ১৫৬ (৪ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)

বিজাপুর ফেমিন একাদশ ঃ ৬৭৬ ও ১১৫ (৬ উইকেট)

বোম্বাইয়ের ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে বেঙ্গল সাইক্লোন ফণ্ড ও বিজাপুর দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে একটা প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হয়। এই চারদিনের খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংশিত ভাবে শেষ হয়েছে। এই উপলক্ষে বেঙ্গল সাইক্লোন ও বিজাপুর ফেমিন নামে দুটী

শক্তিশালী ক্রিকেট দল গঠিত হয়। সি কে নাইডু বেঙ্গল সাইক্লোন একাদশের অধিনায়কত্ব করেন। অপর দিকে বিজাপুর ফেমিন একাদশে অধিনায়ক ছিলেন প্রফেসর দেওধর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যোগদান করায় ক্রিকেট খেলাটি বিশেষ দর্শনীয় এবং উপভোগ্য হয়েছিলো। খেলায় কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে।

প্রথম ব্যাটিং পেয়ে বেঙ্গল সাইক্লোন একাদশ ৭০৩ রান করে। হাজারীর ২৬৪ রান এবং গুলমহম্মদের ১৪৪ রান উল্লেখযোগ্য। প্রত্যুত্তরে বিজাপুর ফেমিন একাদশের প্রথম ইনিংসে ৬৭৩ রান উঠে। দলের তিন জন সেঞ্চুরী করেন। প্রফেসার দেওধর ১০৬, কে সি ইব্রাহিম ২৫০ এবং কে এন রঙ্গনেকার ১৩৮ রান করেন। মাত্র ৬ রানের জন্য সোহানী শত রান পূর্ণ করতে পারলেন না। নওমল ৭৬ রানে ৪টা উইকেট পেলেন।

বেঙ্গল সাইক্লোন একাদশ দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেটে ১৫৬ উঠলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করে। মন্ত্রী করেন ৫৩ রান। অধিকারী ৫৩ করে নট্ আউট থেকে যান।

বিজাপুর দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। খেলা শেষ হতে ৮৫ মিনিট সময়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৬ উইকেটে ১১৫ উঠলো, আর খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'ল। অমরনাথ ৩৬ রান করলেন। এবারও নওমল বেশী উইকেট নিলেন। ৫৩ রান দিয়ে তিনি ৩টে উইকেট পেলেন।

খেলায় নূতন রেকর্ড :

(১) বেঙ্গল সাইক্লোন একাদশের প্রথম ইনিংশের ৭০৩ রান ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোন ক্রিকেট খেলায় হয়নি।

(২) এই খেলায় উভয় দলের মিলিত রান সংখ্যা হয়েছে ১৩৭৬। এই সংখ্যা ১৯৩৯ সালের স্থাপিত বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র দলের একত্র ১৩২০ রান সংখ্যার রেকর্ডকে অতিক্রম করে নূতন রেকর্ড করেছে।

(৩) উভয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় ছ'জন খেলোয়াড়ের দ্বিশতাধিক রান এই প্রথম।

(৪) ছুই ইনিংসে উভয়দলের মোট ৫ জন খেলোয়াড়ের শতাধিক রান করাও এই প্রথম।

(৫) হাজারীর ২৬৪ রান ১৯৪১ সালে বিজয় মার্চ্চেন্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত ২৪৩ রানের রেকর্ড অতিক্রম করেছে।

(৬) সাত উইকেটের জুটীতে ইব্রাহিম ও রঙ্গনেকারের একত্র ২৭৪ রানকে নূতন রেকর্ড হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

এসিয়াটিক ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা :

এসিয়াটিক ভারোত্তলন প্রতিযোগিতার সুনাম ইতিমধ্যে বাঙ্গালার বাইরে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য বৎসরের প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। তাছাড়া বাঙ্গালাদেশের বাইর থেকে কোন প্রতিযোগীকে যোগদান করতে দেখা যায়নি। খেলার ফলাফলও খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি। বর্ত্তমান যুদ্ধই এই সমস্তের যে কিছুটা কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ফলাফল :

ব্যাণ্টম ওয়েট : ১ম—শঙ্করকুমার খাঁ।

মিলিটারী প্রেসে ১৪০½ পাউণ্ড, স্ন্যাচে ১৪০½ পাউণ্ড এবং ক্লিন ও জার্কে ১৭৯½ পাউণ্ড তুলেছেন। মোট ৪০৬½ পাউণ্ড।

২য়—দাশরথি পাল।

ফেদার ওয়েট : ১ম—বৈদ্যনাথ ঘোষ;

মিলিটারী প্রেসে ১৫৩ পাউণ্ড, স্ন্যাচে ১৬০½ পাউণ্ড ও ক্লিনও জার্কে ১৭৯½ পাউণ্ড তুলেছেন। মোট ৪৬০½ পাউণ্ড।

২য়—এন ডি একা; মোট তুলেছেন ৪৩০½ পাউণ্ড।

লাইট ওয়েট : ১ম—অজয়কুমার সরকার;

মিলিটারী প্রেসে ১৩৩ পাউণ্ড, স্ন্যাচে ১৪৯½ পাউণ্ড ও ক্লিন ও জার্কে ১৯০ পাউণ্ড তুলেছেন। মোট ৪৮২ পাউণ্ড।

মিডল ওয়েট : ১ম—ডবলিউ আই ওয়াল্টার।

মিলিটারী প্রেসে ১৭২ পাউণ্ড, স্ন্যাচে ১৮২ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্কে ২২২ পাউণ্ড তুলেছেন। মোট ৫৭৬ পাউণ্ড।

হেভী ওয়েট : ১ম—হেমচন্দ্র মুখার্জি।

ড্রাইভ : স্থির বল মারবার তিনটি অবস্থা :—বাম ও ডান পা, কাঁধ, বাহু এবং চোখের অবস্থান লক্ষনীয় ছবি—সুশীল ব্যানার্জি

মিলিটারী প্রেসে ১৭৭ পাউণ্ড, স্ন্যাচে ১৫২ পাউণ্ড, ক্লিন ও জার্কে ২২২ পাউণ্ড তুলেছেন। মোট ৫৫১ পাউণ্ড।

হকি লীগ ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগের সকল বিভাগের খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রথম বিভাগের হকি লীগ তালিকায় রেঞ্জার্স শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। যদিও তাদের আর মাত্র একটা খেলা বাকি কিন্তু আর কোন দল বাকি খেলায় জয়ী হলেও তাদের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারবে না। লীগ তালিকার শেষে আছে হকি খেলার নামকরা কাষ্টমস দল।

কাষ্টমস ক্লাব এপর্য্যন্ত ১৭ বার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এত বেশী বার অপর কোন ক্লাব হয়নি। ১৯৩০-৩৩ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি পাঁচ বার লীগ পায়। হকি লীগে এটাও তাদের একটা রেকর্ড। এছাড়া ১৯৩৬-৩৯ সাল পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি চার বার লীগ পাওয়ারও রেকর্ড আছে। কাষ্টমস হকি খেলার একটি শক্তিশালী দল।

বিখ্যাত বাইটন কাপ প্রতিযোগিতাতেও কাষ্টমস দলের রেকর্ড এখনও অক্ষুন্ন রয়েছে। এ রকম একটি শক্তিশালী দলের শোচনীয় ব্যবস্থা দেখে ক্রীড়ামোদী মাত্রেই মর্ম্মাহত হবেন। বর্ত্তমান বৎসরে তাদের এই শোচনীয় ব্যর্থতার একমাত্র কারণ যুদ্ধের দরুণ বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের খেলায় অনুপস্থিতি। ক্যালকাটা রেঞ্জার্স এ পর্য্যন্ত ৮ বার লীগ পেয়েছে। উপর্য্যুপরি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে চার বার ১৯১৪-১৭ সাল পর্য্যন্ত।

লীগের দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ভবানীপুর ক্লাব। ১৬ খেলায় ২৯ পয়েন্ট পেয়েছে, একটাতেও পরাজিত হয়নি। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী কলেজিয়ান্সের থেকে মাত্র তারা এক পয়েন্ট বেশী পেয়েছে।

স্লো-কিক : স্থির বল ধীরে মারবার তিনটি অবস্থা :—দুই পা, পায়ের হাঁটু, মাথা এবং চোখের অবস্থান লক্ষনীয় ছবি—সুশীল ব্যানার্জি

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঋষিমশাই"—১৷৷০
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্র" (১ম খণ্ড)—৫৲
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গ পরিচয়" (২য় খণ্ড)—২৷৷০
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রণীত নাটিকা "ভাই-ভাই"—।৵০
নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রণীত রূপ-নাটিকা "স্বপ্নমায়া"—৷৷০
শ্রীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পগ্রন্থ "ক্ষুধার্ত্ত মানব"—১৷৷০

আগামী আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষের একত্রিংশ বর্ষ আরম্ভ

গত ত্রিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' কি ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য নানা দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও আমরা ভারতবর্ষের চাঁদার হার বৃদ্ধি করি নাই। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্ব্বের মতই সহযোগিতা করিয়া আমাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৷০, ভি-পি—৬৸০, ষাণ্মাষিক ৩৲০, ভি-পিতে ৩৷৷৴০। ভি-পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি-পির টাকা অনেক সময় বিলম্বে পাওয়া যায়, ফলে পরবর্ত্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়। গ্রাহকগণের টাকা ২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা আমরা ভি-পিতে পাঠাইব। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকগণই দয়া করিয়া মণিঅর্ডার কূপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কূপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন। মণিঅর্ডার পাঠাইবার ঠিকানা—

কার্য্যাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন　　সমাপ্তি　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
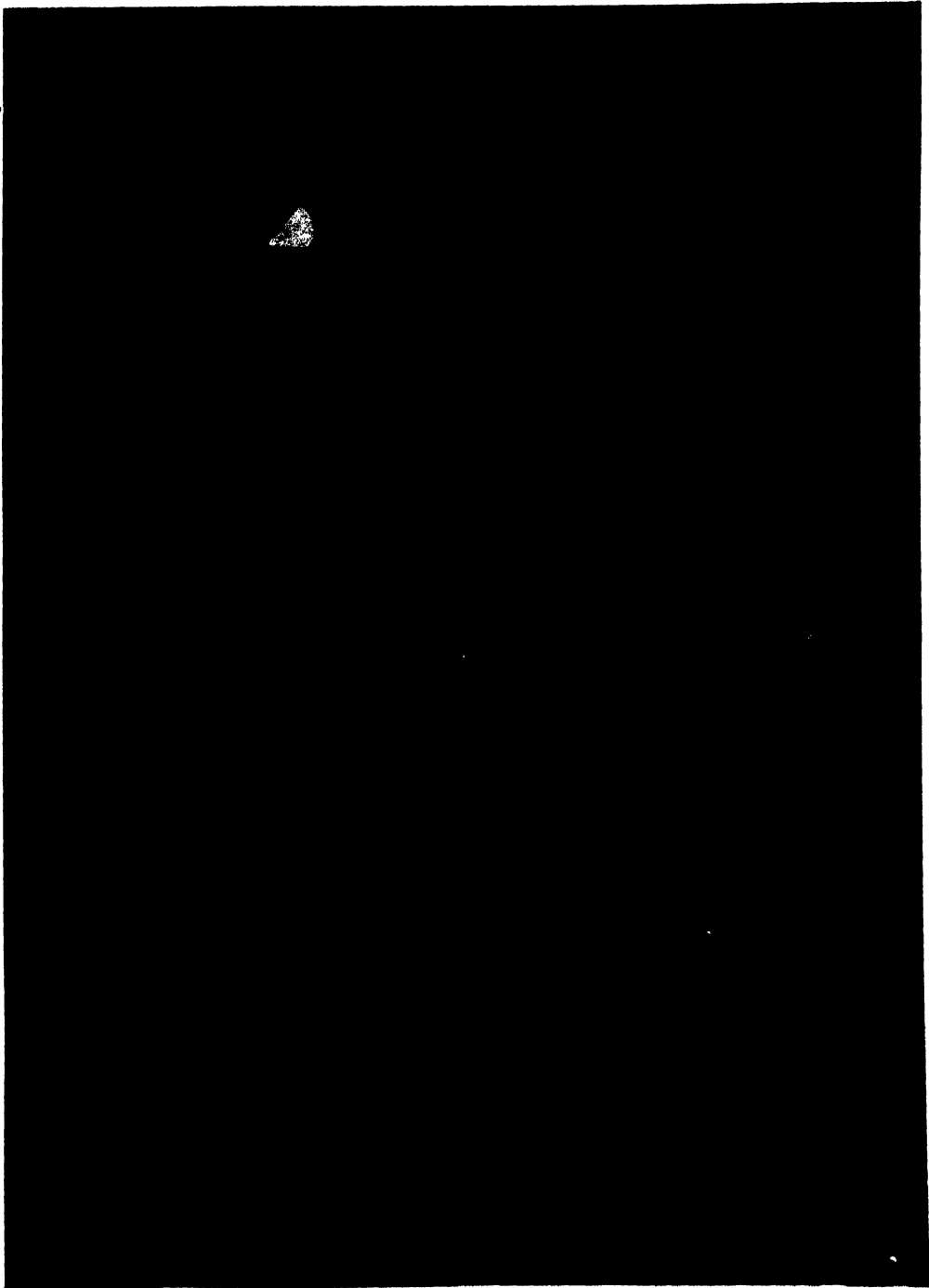
জ্যৈষ্ঠ—১৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আধুনিক বাংলা গানে সুর ও কথা

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম্-এ

আমাদের আধুনিক বাংলা গানে সুর ও কথার একটা সুসামঞ্জস্য সার্থক সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা চলেছে। এ চেষ্টা যে সকল ক্ষেত্রে সফল হচ্ছে তা বলা যায় না, কিন্তু চেষ্টা যে চলেছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। চেষ্টা করছেন অনেকেই, কিন্তু এ বিষয়ে সাফল্য অর্জ্জন করতে পেরেছেন দু-চার জন। এইটাই স্বাভাবিক। কোন ক্ষেত্রেই সত্যকার প্রতিভা সুলভ নয়, সুতরাং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম আশা করা যায় না।

সুর ও ভাষার সমন্বয় করতে গিয়ে কেউ কেউ ভাষাকে অর্থাৎ গানের কাব্যাংশকে এত অসঙ্গত প্রাধান্য দিয়ে বসেছেন যে তার ফলে তাঁদের বাংলা গান হয়ে উঠেছে সুর-সংযোগে গানের কাব্যাংশের আবেগপূর্ণ আবৃত্তি। আবার কেউ কেউ সুরকে এত অত্যধিক প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছেন যে গানের কাব্যাংশ সুরের আড়ালে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে এবং তার ফলে তাঁদের বাংলা গান হিন্দী ওস্তাদী গানের অক্ষম সুর-তর্জ্জমা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্ত্তমানে মাত্র কয়েকজন প্রতিভাশালী সুরশিল্পীর গানে সুর ও কথার অর্থাৎ সঙ্গীত ও কাব্যের সার্থক সমন্বয় হয়েছে।

কাব্য ও সঙ্গীতের সমন্বয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও হয়েছে, কিন্তু সে সমন্বয় কাব্যের তাগিদে যতটা, সঙ্গীতের তাগিদে ততটা নয়।

কাব্য ও সঙ্গীতের সমন্বয় অনেক ক্ষেত্রেই হয়েছে। আমাদের প্রাচীন কথকতার মধ্যে, স্তবপাঠের মধ্যে, এক শ্রেণীর সঙ্গীতধর্ম্মী আবৃত্তির মধ্যে, মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে সুরের সঙ্গে কথার সমন্বয়-চেষ্টা হামেসাই হয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে।

এখন কথা হচ্ছে, সুর এবং ভাষার এই সমন্বয় কি সকল ক্ষেত্রে এক জাতীয়? তা কখনই হতে পারে না। এই সমন্বয় কোথাও বা সুরের খাতিরে হয়েছে, কোথাও বা হয়েছে কাব্যের খাতিরে। কথকতার মধ্যেও স্থানে স্থানে সুর এবং ভাষার সমন্বয় হয়ে থাকে, কিন্তু সেখানে এই সমন্বয় হয় কথার খাতিরে, সুরের খাতিরে নয়। এই সমন্বয়ের ফলে ভাষা যতটা লাভবান হয়, সুর তার শতাংশের একাংশও লাভবান হয় না। এক্ষেত্রে কথার জন্যেই সুরের অবতারণা, সুরের জন্য কথার অবতারণা নয়। কথকতায় কথার আবেদনই প্রধান, সুর কেবল সেই আবেদনকে আরও জোরালো করে তোলে। আবার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কথার সঙ্গে সুরের যতই সমন্বয় হোক্ না কেন, এ সমন্বয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরকে কথার দ্বারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

আসল কথা, সুর এবং ভাষার সমন্বয়-সাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উভয়কে সমান অধিকার দেওয়া নয়, একটির সাহায্যে অপরটিকে

স্ফুটতর করে তোলা। আমাদের শুধু দেখতে হবে, কোথায় সুর কথাকে এগিয়ে দিয়েছে আর কোথায় বা কথা সুরকে এগিয়ে দিয়েছে। যেখানে সুর কথাকে এগিয়ে দিচ্ছে, সেখানে আমরা পাচ্ছি কথকতা, স্তবপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং নানাশ্রেণীর সঙ্গীতধর্মী আবৃত্তি। আর কথা যেখানে সুরকে এগিয়ে দিচ্ছে সেখানে আমরা পাচ্ছি সঙ্গীত।

এখানে কথা উঠতে পারে, কথকতা থেকে আরম্ভ করে উচ্চাঙ্গের কণ্ঠসঙ্গীত পর্য্যন্ত সবকিছুর মধ্যেই যদি সুর ও ভাষার যোগাযোগ না হয়েই পারে না, তবে সুর ও ভাষার সমন্বয়-সাধনের কৃতিত্ব বিশেষ একশ্রেণীর সুরশিল্পীদের প্রাপ্য কি করে হতে পারে?

একথার উত্তর এই যে, সুর এবং ভাষার একত্র সমাবেশ আর সমন্বয় এক জিনিষ নয়। গান মাত্রের মধ্যেই সুর এবং ভাষার যোগাযোগ দেখা যায়, কিন্তু সার্থক সমন্বয় অতি অল্প ক্ষেত্রেই ঘটে উঠে।

স্তবপাঠ অনেকেই করে থাকেন, কিন্তু সকলেই কিছু প্রথম-শ্রেণীর স্তবপাঠক নন। তার কারণ স্তবের বাণীকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে সুরের সাহায্য কতটুকু নিতে হবে, সে ওজন-জ্ঞান যাঁর আছে অর্থাৎ কথার সঙ্গে সুরের রসান কি পরিমাণে যোগ করলে কথার জৌলুস বেড়ে যায়, সেই পরিমাণ-জ্ঞান যাঁর আছে তিনিই স্তবপাঠের মধ্যে কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয় করতে পারেন এবং তাঁকেই আমরা প্রথম শ্রেণীর স্তবপাঠকের সম্মান দিয়ে থাকি।

দেখা গেছে অনেক বড় গায়ক স্তবপাঠ করতে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। তার কারণ স্বতন্ত্র করে সুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বটে, কিন্তু সুর ও কথার সমন্বয়ে যে জিনিষটির সৃষ্টি হয়, সে জিনিষটির সঙ্গে তাঁর আদৌ পরিচয় নেই।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, সুর এবং ভাষার যোগাযোগ সকলেই করেছেন, কিন্তু সার্থক সমন্বয় করতে পেরেছেন কয় জন?

কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের গানেও কি কথা ও সুরের সার্থক সমন্বয় হয় নি? তার উত্তরে আমরা বলবে., নিশ্চয়ই হয়েছে, কিন্তু সে সমন্বয়ের ফলে গানের বাণী যতটা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, সুর ততটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। সে উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত-সৃষ্টি করেনও নি।

কিন্তু আমরা যে শ্রেণীর আধুনিক সুর-শিল্পীদের কথা বলছি, তাঁদের উদ্দেশ্য অন্যরূপ। তাঁরাও রবীন্দ্রনাথের মতই চান যে সুরের সাহায্যে বাণী লাভবান হোক, কিন্তু ঐখানেই তাঁদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তাঁরা চান সুর বাণীকে অনুরঞ্জিত করুক এবং সুরের দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়ে গানের বাণী সুর-বিকাশের সহায়করূপে অধিকতর উপযোগী হয়ে উঠুক। আসল কথা রবীন্দ্রনাথ সুরকে কাব্যরসে অভিষিক্ত করে কাব্যরসকেই অধিকতর ঘনীভূত করে তুলেছেন, আর আমি যে শ্রেণীর আধুনিক সুর-শিল্পীদের কথা বলছি, তাঁরা কাব্যরসকে সুর-রসে অভিষিক্ত করে সুরের আবেদনকেই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন।

অনেকে হয়ত বলবেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাণী এবং সুরের যে সমন্বয় হয়েছে, তার ফলে না হয় বাণীই লাভবান হয়েছে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের মার্গসঙ্গীতের বেলায় ত সে কথা বলা চলে না। সেখানে সুর এবং বাণীর যোগাযোগের ফলে সুরই ত লাভবান হয়েছে।

এখানে আমাদের উত্তর এই যে, উচ্চাঙ্গের মার্গসঙ্গীতে বাণী আছে বটে, কিন্তু সে বাণী সুরের বাহনমাত্র। সুর সেখানে গানের বাণীকে অবলম্বন করে চলাফেরা করে মাত্র। আমরা যেমন যান-বাহন ব্যবহার করি যাতায়াতের সুবিধার জন্য।

কিন্তু এক শ্রেণীর সৌখীন লোক আছেন, যাঁরা যানবাহন ব্যবহার করেন কাজের খাতিরে নয়, নিজের অন্তর্নিহিত সৌখিনতা-টুকুকে উপভোগ করবার জন্যে। যানবাহনের সঙ্গে এঁদের শুধু প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়, আনন্দের সম্বন্ধও বটে।

উচ্চাঙ্গের মার্গসঙ্গীতে কথার সঙ্গে সুরের সম্বন্ধ ঠিক আনন্দের নয়, প্রয়োজনের। তাই কথাগুলিকে সেখানে যেমন তেমন করে কাজে লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের নিয়ে আনন্দ করা হয় নি।

কথার কাজ হচ্ছে সুরকে সীমাবদ্ধ করা, অর্থাৎ সুরের বস্তু-নিরপেক্ষ, অনির্দ্দিষ্ট, নির্ব্বিশেষ আনন্দ-বেদনাকে একটি পরিচিত, নির্দ্দিষ্ট বাস্তব এবং পার্থিব ঘটনা বা পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে রূপবান করে তোলা।

উচ্চাঙ্গের মার্গসঙ্গীত যাঁরা সৃষ্টি করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্য কিন্তু অন্যরূপ। তাঁরা সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে অনির্দ্দিষ্ট নির্ব্বিশেষে, বস্তুনিরপেক্ষ সুরলোকেই অবস্থান করতে চান—মাটির পৃথিবীর নির্দ্দিষ্ট এবং বিশেষ সুখ-দুঃখের স্পর্শ যথাসম্ভব বাঁচিয়ে। সুতরাং উচ্চাঙ্গের মার্গসঙ্গীতে বাণী থাকলেও সেখানে সে তার স্বধর্ম্ম পালন করবার মত সুযোগ ও ক্ষেত্র কোনটাই পায় না।

আসল কথা, উচ্চাঙ্গের মার্গসঙ্গীত হচ্ছে—বস্তুনিরপেক্ষ এবং নৈর্ব্যক্তিক, আর আমরা যে শ্রেণীর আধুনিক গানের কথা বলছি, তা হচ্ছে বস্তুসাপেক্ষ এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সুতরাং এ দুয়ের মধ্যে তুলনাই চলতে পারে না। এরা এক জাতীয়ই নয়।

আমরা যে শ্রেণীর সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করছি, তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সুর এবং কথা কোনটিই এখানে অনাদৃত হয় নি, অথচ সুরের প্রাধান্য শেষ পর্য্যন্ত বজায় থেকে গেছে। এই প্রাধান্য টুকুর মধ্যে কিন্তু বেশ একটু মজা আছে।

প্রাধান্য একপ্রকারের নয়। এক শ্রেণীর প্রাধান্য আছে যা অপ্রধানকে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করিয়ে নেয় মাত্র; আর এক শ্রেণীর প্রাধান্য আছে যা অপ্রধানের সেবাটুকু, সাহচর্য্যটুকু সচেতন-ভাবে সাগ্রহে উপভোগ করে এবং তার ভিতর দিয়ে নিজের একটি বিশেষ চেতনাকেই আর এক ভাবে ফিরিয়ে পায়। এখানেই প্রধান ও অপ্রধানে হয় সমন্বয়।

উপনিবেশ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(৩)

পোষ্ট্‌মাষ্টার হরিদাস সাহাকেও এখানে সঙ্গীহীন জীবন কাটাইতে হয়।

তাই বলিয়া তিনি বিপত্নীক নন। রণচণ্ডী একটি স্ত্রী আছেন, আর আছে কাকের মতো কালো, বকের মতো শীর্ণ একপাল ছেলেমেয়ে। পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করা দূরে থাকুক, তাহারা যে চতুর্দশ পুরুষকে নরকস্থ করিতেই জন্মিয়াছে, ইহাতে পোষ্ট্‌মাষ্টারের কোনো সন্দেহ নাই। ঢাকা সহরে মামারবাড়ীতে তাহারা আছে এবং সম্ভবত কুশলেই আছে বলিয়া হরিদাস অনুমান করেন। রাগের মাথায় কুরূপা স্ত্রীর গায়ে একদিন হাত তুলিয়াছিলেন বলিয়া ছেলেপিলে লইয়া স্ত্রী জন্মের মতো বাপের বাড়ী গিয়া উঠিয়াছেন। বড়লোক বৃদ্ধশ্বশুর নাকি গর্জন করিয়া বলিয়াছেন, হরিদাস তাঁহার বাড়ীর ত্রিসীমানাতে আসিলেও তিনি তাঁহার হাড় মাংস একত্র রাখিবেন না।

শুনিয়া হরিদাস খুশি হইয়াছিলেন। রাজসাহীতে থাকিবার সময়ে শনিগ্রহরূপী শয়তান পোষ্টাল্ সুপারিন্টেণ্ডেটের মৃত্যু সংবাদেও তিনি এতটা খুশি হইয়া ওঠেন নাই। শ্বশুর বাড়ীর ত্রিসীমানার কাছে আগানো তো দূরের কথা, তাহারা তাঁহার ছায়া না মাড়াইলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। সখের খাতিরে একদা বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সখের সেই নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইয়া হরিদাস সাহা বহুকাল পরে ভগবানকে একটা নমস্কার করিয়া বসিলেন।

তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বিশ্বাস না থাকুক, আরোগ্যের আশ্বাসে হাতে গলায় একরাশ মাদুলি ঝুলাইয়াছেন হরিদাস। কিন্তু চর্-ইসমাইলের এই অনাত্মীয় প্রবাস-জীবনে কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় যখন সমস্ত মাদুলি আর তাবিজের অনুশাসনকে অস্বীকার করিয়া হাঁপানির টান উঠিয়া আসে, তখন হয়তো মাঝে মাঝে কুরূপা তীক্ষ্ণকণ্ঠী স্ত্রীর স্মৃতি সমস্ত বিতৃষ্ণার স্তূপ ভেদ করিয়া ঠেলিয়া ওঠে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া যখন মুমূর্ষু কাত্‌লা মাছের মতো হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বাতাসের যোগাযোগ রাখিতে হয়, যখন রহিয়া রহিয়া কেবল এই কথাটাই মনে পড়ে যে মৃত্যুর রূপটা ইহার চাইতে অনেক বাঞ্ছনীয়, তখন চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভাসিয়া ওঠে স্ত্রীর মুখখানা। এখন কেউ একবার বুকের উপরে একখানা কোমল হাত বুলাইয়া দিলে যন্ত্রণার অনেকখানি লাঘব হইত হয়তো।

এপাশ ওপাশ করিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকেন, কেরামদ্দী ?

পিয়ন কেরামদ্দী এ সময়টায় প্রায়ই তাঁহার পাশে আসিয়া বসে। পোষ্টাপিসেরই এক পাশে সে-ও থাকে। এখানে তাহার বাড়ী নয়—বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছে। দুইজনেই বৈদেশিক বলিয়া পোষ্ট্‌মাষ্টারের প্রতি কেমন একটা স্নেহ ও সহানুভূতি আছে কেরামদ্দীর।

জবাব দেয়, কি বলছেন ?

—এ কষ্ট আর তো সয়না। বাড়ীর ওদের আনতেই হয়—না ?

কেরামদ্দী তাঁহাকে চেনে। তাই মনে মনে এতটুকুও উৎসাহিত বোধ করেনা। কিন্তু প্রকাশ্যে সমর্থন করিয়া বলে, আজ্ঞে আনাই তো উচিত।

—শ্বশুর মশাই, গুরুজন। দুটো মন্দ কথা যদি বলেই থাকেন, সেটা ঘাড় পেতে নেওয়াই সঙ্গত। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে লজ্জার কিছু নেই।

—আজ্ঞে তা তো নেই-ই।

পোষ্ট্‌মাষ্টার শ্বাস টানিতে টানিতে বলেন, তা হলে কালই একখানা দরখাস্ত দিয়ে দেব, কেমন ? এক মাসের ছুটি—হ্যাঁ, এর কমে দেশে গিয়ে ওদের আর নিয়ে আসা যায়না।

—আজ্ঞে, তা যায়না।

হরিদাসের কণ্ঠস্বর এবারে সন্দিগ্ধ ও বেদনার্ত হইয়া ওঠে।

—কিন্তু যদি ছুটি না দেয় ?

কেরামদ্দী আশ্বাস দিয়া বলে, আজ্ঞে তা দেবেনা কেন ?

উত্তেজিত হইয়া ওঠেন হরিদাস। বুকের উপর হাত চাপিয়া তিনি প্রায় উঠিয়া বসেন: না-ও দিতে পারে—বিশ্বাস নেই ব্যাটাদের। মানুষ মরুক কিংবা বাঁচুক, তাতে ওদের কোনো নজর আছে নাকি? যেমন ক'রে পারে খাটিয়ে নিলেই যেন হ'ল !

উত্তেজনা বাড়িতে থাকে হরিদাসের। চোখ দুইটা বড় বড় হইয়া ওঠে—গলার আওয়াজটা পুরোপুরি বসিয়া যায়। শ্বাসের টানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাস্ ফ্যাস্ করিয়া বলিতে থাকেন, না দেয় ছুটি না দিল। রিজাইন্ দেব এমন চাকরীতে। ঘরে কি খাওয়ার ভাবনা আছে যে জান প্রাণ দিয়ে এখানে পড়ে' থাকব ? ছুটি না পেলে আমি ঠিক চাকরীতে রিজাইন্ দেব—নিশ্চয় দেব, এ আমি তোমাকে ব'লে রাখলাম কেরামদ্দী।

কেরামদ্দী ব্যস্ত হইয়া ওঠে। একপাশে টি-পয়ের উপর হইতে মালিশের ওষুধটা লইয়া সে হরিদাসের বুকে ডলিতে থাকে। শান্তস্বরে বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না বাবু। যা দরকার তা করা যাবে কাল সকালে।

কিন্তু পরের দিন সকালে উঠিয়া এসব কথা আর হরিদাসের স্মরণ থাকেনা।

বিস্মৃতিই বলিতে হইবে একরকম। হাঁপানির অসহ্য কষ্টের সময় মুখ দিয়া অবচেতনার যে কথাগুলি বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সেগুলিকে অসুস্থতার প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয়না। দিনের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত রকমের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আসিয়া যেন অভিভূত করিয়া ফেলে হরিদাসকে। নিশীথের গৃহপ্রবণ পীড়াতুর মনটি দিবালোকের সংস্রবে আসিয়া বিদ্রোহী এবং

যাযাবর হইয়া ওঠে। হরিদাসকে তখন সিনিক্ বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

কেরামদ্দী মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দেয়।

—ছুটির দরখাস্ত করবেন নাকি বাবু?

সশব্দে হাসিয়া ওঠেন হরিদাস। হাসিতে কৌতুক এবং শ্লেষ মিশানো।

—ছুটি! ছুটি কিসের জন্যে? তুমি কি ভাবছ, ওই কাল্‌-প্যাঁচাদের ভাবনায় রাত্তিরে আমার ঘুম হচ্ছেনা? বাপ—যে ক'রে ওগুলোর হাত এড়িয়েছি, আমিই জানি।

—ছেলেপিলের মুখ একবারও দেখতে ইচ্ছে করেনা বাবু?

আর একবার সশব্দ উচ্চ হাসিতে প্রশ্নটাকে উড়াইয়া দেন হরিদাস। মুখের সামনে হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া তিনি চোখ বুঁজিয়া কিছুক্ষণ ধূমপান করেন। তারপর বলেন, কখনো পাহাড় অঞ্চলে বেড়িয়েছ কেরামদ্দী?

—আজ্ঞে না।

—আমি বেড়িয়েছি। সুসঙ্গের পাহাড়ে—যেখানে হাতী ধরে। সে কি জঙ্গল আর দুর্গম! একটুর জন্যে বাঘের মুখে পড়িনি সেবার।

হুঁকা হইতে কল্‌কেটা নামাইয়া লয় কেরামদ্দী। পোষ্ট মাষ্টারের চোখমুখ ধারালো হইয়া ওঠে। কালো মুখের উপর দিয়া একটা ইঙ্গিতপূর্ণ গাম্ভীর্য ঘনাইয়া আসে—সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া একটা প্রত্যাসন্ন গল্পের সঙ্কেত। লোকটা সর্বাঙ্গ দিয়া গল্প বলিতে জানে।

—দু দিকে দশবারো হাত উঁচু পাহাড, মাঝখান দিয়ে হাত তিন চারেক চওড়া একটুখানি জংলা পথ। পাহাড়ে শ্যাওলা আর নানারকম আগাছায় বুক সমান জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ নাকে এল বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। বাঘের গায়ের গন্ধ—একবার যে শুঁকেছে, সেইই টের পায়। থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলুম। তারপর তাকিয়ে দেখি—

কেরামদ্দী কল্‌কেটা নামাইয়া রাখে। সাগ্রহ কৌতূহলে বলে, তারপর?

* * * *

এম্‌নি করিয়া দিন কাটে হরিদাসের। স্তূপাকার অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি বিরাজ করিতেছেন—ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই সুযোগ ও সুবিধামতো তিনি খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কত নতুন প্রকৃতির মানুষ, কত বিচিত্র রকমের রীতি নীতি। নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে, ছোট বড়ো অসংখ্য বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও পৃথিবী সম্বন্ধে একটা নিজস্ব চিন্তাধারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহার।

এই যে নিজস্ব দর্শন-রীতিটি, ইহা হরিদাসকে জগৎ সম্বন্ধে একরকম অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে বলিলেই চলে।

বলরাম ভিষক্‌রত্নের তাসের আড্ডায় বসিয়া মাঝে মাঝে হয়তো বলেন, নাঃ মশাই, কিছুতেই কিছু হওয়ার নয়।

শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করে, কিসের কথা বলছেন?

—এই তাসটাস সব। একদিন সব কিছুই হাওয়ায় উড়ে যাবে মশাই—একেবারে ফাঁকা। ওই যে শাস্ত্রে বলছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যে—ওইটেই একমাত্র খাঁটি কথা।

মদনানন্দ মোদকের আমেজে বলরাম ভিষক্‌রত্ন অতিরিক্ত প্রফুল্ল হইয়া ওঠেন।

—বলি মাষ্টারের যে অতিরিক্ত বৈরাগ্য দেখছি। একেবারে সাক্ষাৎ হরিদাস স্বামী—অ্যাঁঃ!

কঠিন মুখে হরিদাস বলেন, বৈরাগ্য নয়। নর্থ বিহার ভূমিকম্পের সময় আমি জামালপুরে ছিলুম তো। সব অবস্থাটাই নিজের চোখে দেখেছি দাদা। বেশ গড়ে উঠেছিল—হঠাৎ একটা যেন হাতুড়ির ঘা খেয়ে ভেঙে চুরে ছত্রাকার হয়ে পড়ল। মনে হয়, সমস্ত দুনিয়াটাই একদিন এরকম হাতুড়ির ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে—ধরে রাখবার এত যে চেষ্টা, এদের কোনো-টাতেই কিছু হবার নয়।

মদনানন্দ মোদকের নেশার দুইটা দিকই আছে সম্ভবত। বলরাম হঠাৎ অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া যান। বলেন, যা বলেছ ভাই। ভগবানের মার দুনিয়ার বার—ও ঠেকাবার জো নেই।

হরিদাস যেন বিরক্ত বোধ করেন।

—দৌলতখাঁয় যেবার বান হয়েছিল, জানো সে কথা?

—জানিনে আবার! ওদিকটাকে তো একরকম মুছে নিয়েছিল বললেই চলে। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাই সে বানে মারা যায়—ওঃ, সে কি কাণ্ড!

—মনে করো, আবার যদি তেমন কিছু একটা হয়!

বলরাম সভয়ে বলেন, বাপরে!

হরিদাস হাসিয়া বলেন, মন্দ হয়না তা হলে। যদি বেঁচে থাকি, তা হলে বেশ নতুন রকমের একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে, কি বলো বলরাম?

—সর্বনাশ! অমন অভিজ্ঞতা দিয়ে দরকার নেই—বেশ সুখেই আছি মশাই। চরের জমি ভরা ধান, সুপুরীর খন্দ—এমন সময় অমন কু ডাক ডাকতে আছে! তার ওপর আসছে চৈত্র মাস—ও সব কথা ব'লে ভয় পাইয়ে দিয়োনা দাদা।

হরিদাসের মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই থাকে।

—ভয় পাও কেন অমন? স্ত্রী পুত্র তো কেউ নেই তোমার। একদিন যখন মরতেই হবে, তখন একটা কিছু বিরাট্ ব্যাপারের মাঝখানে ঘটা ক'রে মরাই ভালো না? মনে করো, এখানে লাগল এসিয়াটিক কলেরার মড়ক, আরো দশজনের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও শেষ হয়ে গেলে, তখন কে ভোগ করবে তোমার এই ক্ষেত-ভরা ধান আর গোলাভরা সুপারী?

—হয়েছে, হয়েছে, থামো।—রীতিমতো আতঙ্কিত হইয়া ওঠেন বলরাম: এই সাত সকালে কি সব আরম্ভ ক'রে দিলে? এসো, এসো এক বাজি ব্রে হয়ে যাক্—

তাস জোড়া ময়লা তাকিয়ার তলা হইতে বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু পৃথিবীটা এমন জায়গা যে সম্পর্ক না থাকিলেও এখানে নতুন করিয়া গড়িয়া নিতে কষ্ট হয়না।

অন্তত বলরামের হইলনা। একা দিনগুলি কাটিতেছিল। রাধানাথ যা হোক করিয়া রাঁধিয়া নামাইত, রান্নার স্বাদগন্ধ যাই থাক। দুধ ঘী এবং মাছের প্রাচুর্যে সেটা এমন মর্মান্তিক বোধ হইত না। কিন্তু "ভূমৈব সুখম্"—অতএব কোথা হইতে মেয়েটি আসিয়া জুটিয়া গেল।

দেখা গেল, বলরামের পৃথিবীটা হঠাৎ বিচিত্র রকমে বদলাইয়া গেছে।

তাসের পাটটা তুলিয়া দিতে পারিলেই বলরাম যেন শান্তি পান একরকম। তবে বহুদিনের অভ্যাস, একেবারে চট্ করিয়া ছাড়িয়া দিলে ধাতে সহিবেনা বলিয়াই মোটামুটি আঁকড়াইয়া আছেন এখনো। কিন্তু ব্রীজের জোরালো ডাকের মুখেও একান্ত মনোযোগটা অন্তঃপুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া যায়। মাঝে মাঝে খেলার সময় তিনি এমন এক একটা ভুল করিয়া বসেন যে তাঁহার পার্টনার চটিয়া মটিয়া আগুন হইয়া ওঠে।

তা—দূর সম্পর্কের আত্মীয়ার প্রতি এতখানি মনোযোগ—আপাতদৃষ্টিতে এটাকে একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে। কিন্তু ভালোবাসিবার ক্ষমতাটা তো আর সকলের সমান নয়। মানুষের চরিত্রগত তারতম্য বিচার করিয়াই ভালোবাসার পাত্রাপাত্র ও পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। যে বলরাম এতখানি বন্ধুবৎসল যে তামাক এবং মোদক ব্যয়ের দিকে তাঁহাকে একেবারে অকুণ্ঠ বলিলেই হয়, তিনি যে আত্মীয়াকে একটু অতিরিক্তই ভালোবাসিবেন, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

আত্মীয়াটির নাম মুক্তকেশী—সংক্ষেপে মুক্তো।

বয়স বাইশ তেইশ হইবে। আঁটো সাঁটো গড়ন, কপালটা অতিরিক্ত চওড়া। কিন্তু প্রশস্ত কপালটির সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে অশোভন রকমের বড় একটা মেটে সিঁদুরের ফোঁটায়। গ্রামের মেয়ে হইলেও সে পাতা কাটিয়া সিঁথি কাটে, পুরু ঠোঁট দু'খানি পানের রঙে সর্বদাই রাঙা হইয়া আছে।

সুন্দরী বলিলে যা বোঝায়—মুক্ত ঠিক তা নয়। তবু মুক্তর শ্রী আছে। বিবাহ হইয়াছে। চোদ্দ বৎসর বয়সে গুড়ের মহাজন নবদ্বীপ সরকারের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে স্বামীসেবা করিয়াছে। বিচিত্র ইহাই যে এই পরম নিষ্ঠার কোনো পুরস্কারই সে পায় নাই। পুরা ছয়টি বৎসর আসিল গেল, কিন্তু সরকার কুলধ্বজ কোনও বংশধর আসিয়া তাহার কোল উজ্জ্বল করিয়া বসিল না। শিকড় বাকড়, কালীর দুয়ারে ইট বাঁধা, এমন কি পঞ্জিকার পেটেণ্ট্ ওষুধ, কিছুই কাজে আসিল না। সুতরাং পুত্রপিণ্ডলোভী নবদ্বীপ আর একবার হাতে মাকু লইয়া ছাঁদনাতলায় ভ্যাঁ করিতে গেল এবং সেই অবকাশে পিতা রাখোহরি সরকার একখানা গোরুর গাড়ি ডাকিয়া পোঁটলা পুঁটলিসহ মুক্তোকে তাহাতে চাপাইয়া দিল।

তারপর দুইটা বৎসর কাটিল বাপের বাড়ীতেই। (ক্রমশঃ)

পাল রাজধানী বটপর্ব্বতিকা

ডাঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, পিএইচ্-ডি

বাংলার পাল রাজগণের স্থায়ী রাজধানী কোথায় ছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তরূপে জানা যায় নাই। তাঁহাদের যে সমুদয় তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে যে জয়স্কন্ধাবার হইতে রাজা শাসনোক্ত ভূমি দানের আদেশ দিয়াছেন তাহার নাম আছে। এইরূপে আমরা পালরাজাদের আমলের অনেকগুলি জয়স্কন্ধাবারের নাম পাই। জয়স্কন্ধাবার শব্দে সৈন্য-শিবির ও রাজধানী দুইই বুঝায় এবং পাল ও সেন রাজগণের শাসনে যে সমুদয় জয়স্কন্ধাবারের নাম আছে তাহা রাজধানী অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। খুব সম্ভব উক্ত রাজগণের এইপ্রকার একাধিক রাজধানী ছিল এবং তাঁহারা কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন নাই।

পালরাজগণের শাসনে যে সমুদয় জয়স্কন্ধাবারের নাম আছে তাহার মধ্যে পাটলিপুত্র ও মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) গঙ্গাতীরবর্ত্তী সুপরিচিতস্থান। প্রথম মহীপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপালের জয়স্কন্ধাবার বিলাসপুর ও হরধাম (আনুমানিক পাঠ) কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ এ দুইটি স্থানই গঙ্গাতীরবর্ত্তী কারণ রাজা গঙ্গাস্নান করিয়া উক্ত শাসনদ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। নালন্দা শাসনে ধর্ম্মপালের দ্বিতীয় এক জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ আছে। ইহার নাম সঠিক পড়া যায়না সম্ভবতঃ 'কপিলা'। দ্বিতীয় গোপালের শাসনে বটপর্ব্বতিকা নামক আর একটি জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ দুটির অবস্থিতি সম্বন্ধেও নিশ্চিত কিছু জানা যায় নাই। তবে বটপর্ব্বতিকা সম্বন্ধে সম্প্রতি একটা নূতন তথ্য পাইয়াছি ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

৺বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত 'তীর্থমঙ্গল' নামক গ্রন্থের কথা অনেকেই জানেন। আর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে কাশীগমন করেন এবং কবিতায় এই তীর্থযাত্রার বিবরণ লেখেন। এই গ্রন্থ ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজমহল, তেল্যাগাগড়ি ও মকরীগলি পার হইয়া নৌকা অগ্রসর হওয়ার বর্ণনা এইরূপ :—

লক্ষীপুর শ্রামপুর থাকিল বামেতে।
স্নান করি চলে নৌকা বাহিতে বাহিতে। ২২০
সম্মুখে আছেন এক বটেশ্বর পর্ব্বত।
দেখিয়া চালায় নৌকা চলে যেন রথ। ২২১
তাহার উপর আছেন দেবতা বিস্তর
সবে বলে তাঁর নাম মহাবটেশ্বর। ২২২
তাহার নিকট আছেন দেবতা বিস্তর
যাত্রী লয়্যা মহাশয় চলিলা সত্বর। ২২৩
... ...
কুঠরের মধ্যে দেব করিলা প্রণাম।
বিস্তর পাথর হেতু পাথরঘাটা নাম। ২২৬

পাথরঘাটার নিটকবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থিত বটেশ্বর পর্ব্বতই পাল রাজার জয়স্কন্ধাবার বটপর্ব্বতিকা এরূপ অনুমান করা খুব স্বাভাবিক। নাম সাদৃশ্য ব্যতীত এই অনুমানের পক্ষে আরও দুই একটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ পাটলিপুত্র, মুদ্গগিরি, বিলাসপুর ও হরধাম (?) দ্বিতীয় গোপালের রাজ্যের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী-যুগের এই চারিটি জয়স্কন্ধাবারই গঙ্গাতীরে ছিল। দ্বিতীয়তঃ পাথরঘাটা ধর্ম্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল বিহারের অবস্থিতি বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সুতরাং তাহার নিকটেই একটি জয়স্কন্ধাবার থাকা খুবই স্বাভাবিক। তৃতীয়তঃ তীর্থমঙ্গলের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে বটেশ্বর পর্ব্বতে অনেক প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি ছিল এবং ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থানের ধ্বংসাবশেষ।

"তীর্থমঙ্গলের' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু কুল-পঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে মহারাজা বল্লালসেন তাঁহার শ্বশুর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব বটেশ্বর মিত্রকে মগধের আধিপত্য দান করেন এবং তিনিই এইস্থানে আসিয়া স্বীয় রাজধানী এবং নিজ নামানুসারে "বটেশ্বর নাথ" নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লালের অনেক পূর্ব্বেই যে সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে বট-পর্ব্বতিকা নামে স্থান ছিল তাহা বসুজ মহাশয় জানিতেন না, কারণ তখন দ্বিতীয় গোপালের শাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্যথা সম্ভবতঃ আমরা কুলশাস্ত্রে পালসম্রাট ধর্ম্মপালের জামাতা অথবা শ্বশুরের কোন সংবাদ পাইতাম।

প্রবাহ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

অনেক অনুসন্ধান করিয়া জমীদার-তনয়ের ঠিকানা মিলিল। ঐ যে আমবাগানের মধ্য দিয়া প্রকাণ্ড একটা ধ্বংস স্তূপের মত কি দেখা যাইতেছে, ঐটিই বর্ত্তমান মালিকের প্রাসাদ। দূর হইতে দেখিয়াই রমেশ হতাশ হইল। প্রাচীনকালে জীবরাজ্যে যে সকল অতিকায় প্রাণী আহারমুক্তিতে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিত আজ গভীর অরণ্যে, পর্ব্বতের প্রদেশে তাহাদের বিরাট কঙ্কালরাশি দেখিয়া বিজ্ঞানী ছাত্রগণ যেমন তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অনুমান করিয়া লয়, ঐ বিপুল হর্ম্মের দিকে চাহিয়া রমেশও তেমনই ঐ জমীদার-বংশের সাবেক-কালীন বিভব-গরিমা অনুমান করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু প্রাচীনকালের অর্থ-গৌরবের দীপ তেলে একালের মোটর যানে স্পন্দন জাগে না। বিশেষ করিয়া যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রমেশ আজ বাহির হইয়াছে তাহার গহ্বরটি বিপুল এবং এই জমীদার-তনয়টিই তাহার শেষ ভরসা। সুতরাং দূর হইতে ঐশ্বর্য্যের অস্থি দেখিয়া তাহার কোন অনুসন্ধিৎসা জাগিল না, যাহা অনুমান করিল তাহাতে আর তাহার পা' বাড়াইতে যেন প্রবৃত্তি হইল না।

তবু তাহাকে যাইতেই হইবে। যে পর্ব্বতপ্রমাণ কর্ত্তব্যের ভার সে বহন করিতেছে, তাহাকে লাঘব করিবার উপায় নাই এবং লাঘব করিবার জন্যও সে তাহা গ্রহণ করে নাই। জীবনে তাহার এই একটি মাত্র ব্রত, একান্ত সাধনা। এই সাধনার পথে হতাশা নাই, লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন নাই, বিবেক নাই, রুচিবোধের দম্ভ নাই, ভদ্রবংশের অভিমান নাই, আছে শুধু পথ এবং লক্ষ্য। সে পথ দুঃসাহসের, সে লক্ষ্য বিজয়ীর। পথের দুঃখ যে বরণ করিয়া জয় করিয়া ছুটিয়া যাইবে, লক্ষ্য তাহারই প্রতিপথের প্রান্তভাগে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিবে। আজ দীর্ঘ সাত বছর সে এই বোঝা বহন করিতেছে, কোনদিন যে ভারবোধ হয় নাই তাহা নহে, তথাপি ক্লান্তি বলিয়া সে কিছু জানে না। এই সাতটি বছরের অভিজ্ঞতা শুধু প্রবঞ্চনা আর প্রতিকূলতায় পরিকীর্ণ, তবু সে ছুটিয়া চলিয়াছে, কঠিনতম ঘোড়দৌড়ের সে প্রধান এবং প্রথম সওয়ার। উনিশ বছরের যে তরুণ নামিয়া আসিয়াছিল গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করিতে, গণদেবতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে—আজ ছাব্বিশ বছর বয়সে তাহার কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয় নাই, গতি মন্থর হয় নাই কিন্তু তারুণ্য যেন নিঃশেষে শুকাইয়া গিয়াছে। আজ চোখে তাহার স্বপ্ন নাই, আছে বহ্নি—যাহার দীপ্তিতে সে সম্মুখের পথ দেখিয়া চলে। ক্ষণেকের জন্য হতাশ হইলেও সে পরক্ষণেই আমবাগানের দিকে চলিতে শুরু করিল। তাহার চোখের দিকে তাকাইলে মনে হয় আমবাগানের মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে চলিতে সে অদূরেই এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের সন্ধান পাইয়াছে, সেখানে সে অবাধে বিচরণ করিবে। এই তরুণ জমীদারটিকে পাইলেই আপাততঃ তাহার চলিবে।

বাগান বটে কিন্তু আগাছায় আর ঝোপে, সৌখীনতার অবকাশ রাখে নাই। অসংখ্য জানা ও অজানা লতাগুল্মে চারিদিকে একটা নিবিড়তা আনিয়া দিয়াছে। বাগানের মধ্য দিয়া যে পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া জমিদার-বাড়ীর দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহাকে পথ বলিয়া মনেই হয় না। লোক চলাচলের অভাবে তাহার মাঝে মাঝে ঘাস গজাইয়া উঠিয়াছে, বাগানের অরণ্য এই পথটিকেও খাস করিয়া লইল বলিয়া। জমীদার-বাড়ী যাইবার সদর রাস্তা বোধ করি অন্য একটা আছে কিন্তু রমেশের আর ঘুরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না, সে এই পথ দিয়াই চলিল। এই স্থানটার নির্জ্জনতায় কি একটা মোহের সৃষ্টি করিল, সে কয়েক পদ দ্রুত অগ্রসর হইয়াই আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি করিয়া কি হইবে? গত সাত বছর ধরিয়া সে ছুটিয়া চলিয়াছে, অপরকে ছুটাইয়া চলিয়াছে। তাহার উদ্যমের দীপশিখায় সহস্র সহস্র প্রাণে সে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার সঙ্গী কেহ নাই, সহকর্ম্মী বলিয়া মনে করিবার মত কাহারও কথা আর সে ভাবিতে পারে না। একে একে সবাই পথ ছাড়িয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। কেহ ভয়ে, কেহ ক্লান্তিতে কেহ বা লোভে। হ্যাঁ, লোভেই তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে। ঘর তাহাদের প্রলোভন দেখাইয়া টানিয়া লইয়াছে। পথে তাহাদের বিস্ময় ছিল, উদ্দীপনা ছিল, বিজয়ের আশা ছিল, পরাজয়ের গৌরব ছিল কেবল ছিল না শান্তি, ছিল না আরাম, ছিল না অবরুদ্ধ সম্ভোগের সঞ্চয়। তাই যেদিন প্রথম তাহাদের কানে পৌঁছিল রুদ্ধ ঘরের আবেদন, সেইদিনই তাহারা আরামের মলিন শয্যাতলে আশ্রয় লইল। যাহাদের উপর ছিল লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নবজীবন দান করিবার ভার, তাহারা বোধ করি এখন সকাল-সন্ধ্যা আপিস করিয়া রুগ্ন পঙ্গু শিশুদের জন্য কুইনিন্ কিনিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। ভাবিতেই রমেশ শিহরিয়া উঠে। সমগ্র পৃথিবীর অবিচার, ভেদবুদ্ধি, সংশয় আর হতাশা যাহারা দূর করিতে চাহিয়াছিল তাহারা কেমন করিয়া নিজেদের এক ক্ষুদ্র গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিল? যে সংসারে নিশিদিন রোগ আর দারিদ্র্য, অপমান আর পদলেহন সেই সংসারে কি সুখ তাহারা পাইল? সেখানে কিসের আশ্রয়, শান্তির কি সংজ্ঞা? না, শান্তি তাহারা পায় নাই, এই সমাজে শান্তি বলিয়া কিছু নাই। যাহারা পলাইয়াছে তাহারা হয় তো আজ মৃত্যুর দিকে তাকাইয়া আছে। সে একা, কিন্তু এই একাকীত্বই তাহাকে মহৎ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার আকাঙ্ক্ষাকে করিয়াছে বিরাট।

অপরাহ্ণ এখন সন্ধ্যার দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্যালোক এখনও মিলাইয়া যায় নাই, তবে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। বাগানের মধ্য দিয়া কিছুই দেখা যায় না, শুধু গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়া দূরে একটা নারিকেল গাছের শীর্ষে পাতাগুলি রক্তিম আলোয় ঝিকিমিকি করিতেছে। রমেশ একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু সন্ধ্যা আসন্ন বলিয়া তাহার কোন উদ্বেগ নাই, সে আপন মনেই চলিতে লাগিল। সে একা, সহায়হীন, সম্বলহীন, নিতান্ত একা।

একা! ভাবিতেই তাহার ভালো লাগে। সে একা, তাহার দোসর নাই। দেশের অগণিত নরনারীকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাহার একার উপর। জাতিকে উদ্ধার করিবার দায়িত্ব যাহার, সে দোসর পাইবে কোথায়? তাহাকে একাকীই চলিতে হইবে—এ তাহার পরম ভাগ্য, তাহার গৌরব। সহসা যেন সে বাহুতে নূতন বল পাইল, অবসন্ন পা দুইটা দ্রুত চলিতে লাগিল। এখন সে যেন পায়ে হাঁটিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে পারে।

সকলের মত তাহাকেও সংসার ডাকিয়াছিল কিন্তু সে হেলাভরে সে ডাক শুনে নাই, পথের আহ্বানে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য সেদিন সে ছিল দলপতি, সংগ্রামের সে ছিল অধিনায়ক। সেদিন সে একাকীত্বের মোহে ঘর ছাড়ে নাই, তবে ঘর তাহাকে বিদায় দিয়াছিল একাকীর বেশে। সে বিদায় কি মর্ম্মন্তুদ অথচ কত মধুর।

এই ত সেদিনের কথা! রমেশ সাত বছর পূর্ব্বেকার জীবনে ফিরিয়া গেল। সুমিত্রার সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। তাহার সহপাঠী ও সহকর্ম্মী অবনীর বোন্ সুমিত্রার সঙ্গে তাহার বিবাহ। সুমিত্রার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল অবনীর জন্যই। ছাত্র আন্দোলনে অবনী ছিল তাহার ডান হাত, আর সুমিত্রা ছিল তাহাদের উভয়েরই পরামর্শদাত্রী।

বি-এ পাশ করার সঙ্গে জ্যেঠামশায় আনিয়া দিলেন সরকারী চাকুরী এবং জ্যাঠাইমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুমিত্রাকে ঘরে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন এইবার ঔষধ অব্যর্থ ধরিবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু বিবাহের নামে তাহার সর্ব্বশরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইল। শুধু রুদ্ধ ঘরে জীবন যাপন করিবার কল্পনায় নহে, বিবাহের সঙ্গে আছে ভালোবাসার প্রশ্ন, সুমিত্রাকে ভালোবাসার প্রশ্ন এবং এইটিই সেদিন তাহার মনুষ্যত্বের প্রতি অধিক অপমানকর। সুমিত্রা কেন, কোন মেয়েকেই ভালোবাসার কথা সে ভাবিতেই পারে নাই। বৃহৎ সমাজ সৃষ্টি যাহার ব্রত সে একটা মেয়ের ভালোবাসায় চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিবে? জ্যাঠাইমা তাহাকে এমন নীচ সন্দেহ করিয়াছেন বলিয়া অভিমানে, লজ্জায়, রাগে তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। জ্যাঠাইমাকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া দিয়া সোজা অবনীর বাড়ী গিয়া কড়া নাড়িল।

দরজা খুলিয়া রমেশকে দেখিয়া অবনী চমকিয়া উঠিল, "একি! তুমি এত রাত্রে আর এই বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে—ইস্—একেবারে স্নান ক'রে গিয়েছ। এস—এস—"

তাহাকে পড়িবার ঘরে বসাইয়া অবনী ডাকিল, "সুমি—সুমি কোথায় আছিস্? রমেশ এসেছে, সুমি—"

"না, সুমিকে দরকার নেই। তুমি থাক্‌লেই—"

"সেকি! তুমি আগে জামা কাপড় বদ্‌লে ফেল। তারপর—"

"জামা-কাপড় বদ্‌লাবার সময় নেই। শোন, জ্যাঠাইমা বল্‌ছেন বিয়ে ক'রতে—আর জ্যাঠামশাই এনেছেন চাক্‌রি—গবর্ণমেণ্টের।"

"ওঃ এই! আরে তাহ'লে তো সুমিকে ডাক্‌তেই হয়। এমন শুভ সংবাদটা তাকে—"

"ছেলেমানুষি ক'রো না, অবনী। বিয়ে আমি করতে পারিনা—আর চাকরির কথা মুখে উচ্চারণ ক'রতেও আমার ঘৃণা করে। সে জন্য নয়, আমি এসেছি অন্য কারণে। জ্যাঠাইমার কথায় মনে হ'ল উনি সুমিত্রাকেই আমার পাত্রী স্থির করেছেন। ওঁদের বিশ্বাস বোধ হয় এই যে, সুমিত্রার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেই আমি ঘরকুণো হ'য়ে ব'সে থাকবো—ভুলে যাবো আমার ব্রত। এ আমার অপমান, আমার আদর্শের অপমান—আর এ অপমানের জন্য তোমরাই দায়ী! তোমরাই—"

"কিন্তু সুমিকে তো তুমি ভালোবাসো ব'লেই জানি। সেও তোমাকে মনে মনে—"

"মিছে কথা। ভালো আমি কাউকেই বাসিনে। ভালোবাসা আর বিয়ে, এসব কথা আমি ভাবতেই পারিনে। কোন একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব থাক্‌লেই অমনি বিয়ে ক'রতে হবে এমন কাপুরুষতাকে আমি প্রশ্রয় দেবো না। আমার পথ সংসারের বাইরে—সংসার করবার কল্পনা করাও আমার কাছে পাপ। তোমরা সুমির জন্য অন্য পাত্র দেখ, আর আমাকে আজই চলে যেতে হবে।"

"সুমির জন্য না হয় অন্য পাত্র দেখ্‌বো, কিন্তু তুমি চলে যাবে কেন? এ তোমার পাগলামী রমেশ!"

"প্রতিভাকে লোকে পাগলামীই ব'লে থাকে। আচ্ছা, আমি বলি—"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইতেই সহসা পাথরের মত স্তব্ধ হইয়া গেল। অবনী দেখিল ভিতরদিককার দরজা দিয়া সুমিত্রা প্রবেশ করিতেছে। অবনী যেন এতক্ষণে অকূলে কূল পাইল।

"এই যে সুমি এসেছিস্। দেখ্‌, তোর রমেশদা কোথায় যেতে চাচ্ছে। আমি ওপরে যাচ্ছি।" বলিয়া অবনী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কয়েক মিনিট দুইজনেই চুপচাপ্। তাহার পর রমেশ কি বলিবে খুঁজিয়া পাইবার পূর্ব্বেই সুমিত্রা শান্তকণ্ঠে কহিল, "আমি সব শুনেছি।"

তাহা হইলে তাহার কথা, ভালোবাসা সম্বন্ধে সমস্ত উক্তি সুমিত্রা শুনিয়া ফেলিয়াছে? রমেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেই কথাগুলোই সুমিত্রার সম্মুখেই পুনরাবৃত্তি করিবে বলিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল। এই মুহূর্ত্তে তাহাকে কঠিন হইতেই হইবে—সুমিত্রার চোখের জলেও সে বিচলিত হইবে না।

কিন্তু তাহাকে বলিতে হইল না। সুমিত্রা তাহার মুখের উপর সহজ দৃষ্টি রাখিয়া ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমার জন্য আপনি একটুও ভাববেন না। আপনার যা' আদর্শ আপনি তাই করুন। এমন কি, এখান থেকে যদি সেই জন্যই আপনাকে চলে যেতে হয় তাহ'লেও আমার কিছু বল্‌বার নেই।"

সুমিত্রা এইবার দৃষ্টি নত করিল। রমেশ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। সুমিত্রা একি বলিল? সে ভাবিয়াছিল তাহার নিষ্ঠুর আঘাতে সুমিত্রা নিশ্চয়ই ছিন্নলতাটির মত তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু মৃদুকণ্ঠে সুমিত্রা যাহা বলিল তাহা যত স্পষ্টই হোক্, তাহার এই কয়টা কথার ভিতর দিয়া এমন একটা কঠিন অনাস্পৃহা প্রকাশ পাইল যাহা রমেশকে যেন মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিল। এক নিমেষে যেন সব কিছুই নিরর্থক হইয়া গেল। তাহার মনে হইল এখান হইতে এক পা' কোথাও যাইবার তাহার এতটুকু শক্তি নাই।

কি মনে করিয়া সে একবার ভালো করিয়া সুমিত্রার মুখখানা দেখিয়া লইল। কৈ সে মুখে তো অভিমানের কোন উদ্বেলতা নাই, নিদারুণ অভিমানে ওষ্ঠ দু'টিত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে না? সহসা রমেশ স্থির করিল তাহাকে যাইতেই হইবে। কেন সে পড়িয়া থাকিবে এইখানে? এখানে থাকিয়া কি লাভ হইবে তাহার? অজ্ঞাত কোন দেশে, সহায়হীন নির্ব্বান্ধব হইয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইবে—প্রতিমুহূর্ত্তে বিপদকে বরণ করিবে, মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিবে। এইবার যেন সত্যই সে সংকল্প করিল।

অস্ফুট কণ্ঠে রমেশ কহিল, "হ্যাঁ, যেতে আমাকে হবেই।"

পরক্ষণেই সে বাহির হইয়া আসিল। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় দুইটি করুণ আঁখির ব্যাকুল মিনতি যাহাকে অনায়াসে তৃষিত বক্ষের নিবিড় সান্নিধ্যে টানিয়া আনিতে পারিত, রুদ্ধ অভিমানের নির্ব্বাক্ কঠিনতা সেই অশান্ত হৃদয়টিকে নিমেষে দূরে ঠেলিয়া দিল। অশ্রান্ত বর্ষা মাথায় করিয়া রমেশ পথে নামিয়া পড়িল। সুমিত্রা তাহারই দিকে চাহিয়া আছে কি না তাহাও আর দেখা হয় নাই।

ইহার পর আছে সাত বছরের ইতিহাস। মাত্র সাতটি বছর কিন্তু রমেশের মনে হয় সে এক দীর্ঘ জীবনের কাহিনী। সে জীবনে কত অভিযান, কত শিহরণ, কত বিচিত্র হতাশার মধ্য দিয়া তাহার প্রতিটি দিন চলিয়া গিয়াছে।

"হ্যাঁগা ভালো মানুষের পো, এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছ গা?"

রমণীকণ্ঠের সম্বোধনে রমেশের যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল ইতিমধ্যে কখন সে সেই প্রাচীন বাড়ীটির নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। বিরাট প্রাচীরের মধ্যে একটি মাত্র ছোট দরজা। তাহার চৌকাঠের কাছে একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক তাহারই দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে সম্ভবত বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেছিল রমেশকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার হাতে খান-কয়েক নিঙ্‌ড়ানো ভিজা কাপড়।

অপ্রস্তুতভাবে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সুধীরবাবু বাড়ী আছেন? আমি তাঁর কাছেই এসেছি।"

"তেনার কাছে এয়েছ তা' ইদ্দিকে কেন? এটা খিড়কির পথ দেখতে পাওনা? যাও, ঐদিক দিয়ে ঘুরে সদরে যাও। সেখানে নায়েব-গোমস্তা আছে, তেনার খপর দেবে'খন।" বলিয়া স্ত্রীলোকটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া রমেশের মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক্ কোন্ পথ দিয়া যাইবে ভাবিয়া না পাইয়া রমেশ জমিদার বাড়ীর দেয়াল ঘেঁসিয়া সদরের দিকটা অনুমান করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া দেখিল একটা ছোট সিঁড়ি বাগান হইতে উঠিয়া একটা দরজায় গিয়া শেষ হইয়াছে। দরজাটা একতলা এবং দোতলার মাঝামাঝি একটা স্থানে যেন প্রাচীর ছিদ্র করিয়া তৈরী। দরজাটির দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিতেই রমেশ অবাক্ হইয়া গেল। দরজার ঠিক্ বাহিরে সিঁড়ির উপর একটি তরুণী দাঁড়াইয়া তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। চোখো-চোখি হইবামাত্র তরুণীটি কহিল, "আপনি সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

বিস্ময়-বিমূঢ় রমেশ একটা সম্মতিসূচক ভঙ্গী করিল।

"তা হলে উঠে আসুন।"

তরুণীটির কণ্ঠস্বর মধুর না হইলেও রমেশের কানে এ কথাকয়টা যেন বেশী করিয়া বাজিল। তরুণীটি তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিয়া পিছন ফিরিল। রমেশ তাহার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া দেখিল অন্ধকার একটি সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়া আর একটি সিঁড়ি নীচে নামিয়া অন্ধকারেই মিলাইয়া গিয়াছে, আর সেই সিঁড়ির শেষ ধাপে সেই তরুণীটি দাঁড়াইয়া তাহারই অপেক্ষা করিতেছে।

তরুণীটি কহিল, "সাবধানে নেমে আসুন। মাঝে কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙ্গা আছে।"

অন্ধকারে ভাঙ্গা সিঁড়ি লক্ষ্য করিতে করিতে যখন রমেশ নামিয়া আসিল তখন দেখিল তাহার সামনে একটা গলির মত পথ চলিয়া গিয়াছে। দেওয়ালে দুই একটা ছিদ্র দিয়া গোধূলির ম্লান আলো আসিয়া আলোয়-ছায়ায় এই সংকীর্ণ গলির পথ রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। রমেশ মুখ তুলিয়া দেখিল এবারেও তরুণীটি কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আছে, সে অগ্রসর হইল।

এই পথটি প্রাচীন বাড়ীটির প্রাচীনতম পথ, আঁকিয়া বাঁকিয়া অবশেষে আর একটা সিঁড়িতে গিয়া থামিয়া গিয়াছে—রমেশ সেই অপরিচিতার পিছু পিছু চলিতে লাগিল। যাহার পিছনে পিছনে সে চলিয়াছে তাহাকে সে ভালো করিয়া দেখে নাই কিন্তু তাহার আচরণে বোধ হয় সে যেন রমেশকে পরিচিত লোক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছে। জীবনে তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় অনেক, কিন্তু আজিকার এই অভিযান সম্পূর্ণ নূতন। এক প্রাচীন জমীদার বাড়ীর অন্দরমহলের গোপন পথ দিয়া সে চলিয়াছে, আর তাহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে এক অপরিচিতা নারী। রমেশের মনে হইল সে যেন মধ্য যুগের নাইট। তাহার অগ্রবর্ত্তিনী এক অসামান্যা শক্তিমতী রাজকন্যা তাহাকে শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া কোন এক দুর্গম দুর্গের গোপন আশ্রয়ে লইয়া যাইতেছে। রমেশ তাহার মুখ তাহার ভ্রূভঙ্গী অনুমান করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু মেয়েটি একবারও পিছন ফিরিল না। শুধু তাহার দৃপ্ত স্কন্ধদেশ, তাহার বলিষ্ঠ চলনভঙ্গী রমেশকে থাকিয়া থাকিয়া চমকিত করিয়া দিল।

সুড়ঙ্গ পথের শেষে সিঁড়ি বাহিয়া রমেশ যখন একটি প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখনও সে ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। আধো আলোয় আধো অন্ধকারে মেয়েটি তাহার দিকে একখানি ভারি হাতল-ভাঙা চেয়ার আগাইয়া দিয়া নিজে আর একখানিতে বসিয়া পড়িল। একটু পরে মেয়েটিই প্রথম কথা কহিল।

"সুধীরবাবুর কাছে আপনি টাকার জন্য এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু সুধীরবাবু তো এখন আর টাকা দিতে পারবেন না।"

"কেন?"

"এখানকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জানেন যে আপনি এখানে আজ আসছেন।"

"সে তো জানবেনই।"

"শুধু তাই নয়। ডেপুটি আপনাকে সন্দেহ করেন। এখন আপনাকে টাকা দিলে জমীদারীর দিক্ থেকে তার ফলটা ভালো হবে না। কেন না—"

"বলুন।"

"কেন না, সত্য হোক মিথ্যা হোক—আপনি যদি কোন মামলায় জড়িয়ে পড়েন তখন ডেপুটির পক্ষে আপনার সাহায্যকারীকে খুঁজে বার করা শক্ত হবে না।"

"বুঝেছি।"

রমেশ মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মেয়েটি তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিল। দাসী একটা লণ্ঠন অদূরে টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। রমেশ' মুখ তুলিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, একবার সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না?"

কিন্তু মেয়েটির মুখের উপর চোখ পড়িতেই রমেশ পলকে চমকিয়া উঠিল। আশ্চর্য্য! সেই মুখ, সেই আনত অথচ দীপ্ত চাহনি। এইবার মেয়েটি তাহার দিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "তবু ভালো যে চিনতে পারলেন এতক্ষণে!"

রমেশ সবিস্ময়ে কহিল, "আপনি—তুমি—সুমিত্রা, সুধীরের—"

রমেশের প্রশ্ন শেষ হইল না, ঘরের দরজার নিকট স্বয়ং সুধীরবাবুর কণ্ঠ শোনা গেল, "ছোট বৌ, কোথায় গেলে? আমার সেই পামিষ্ট্রির খাতাখানা—"

বলিতে বলিতে তিনি ঘরে ঢুকিয়াই আগন্তুককে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "আরে রমেশ যে! কতক্ষণ এসেছ? কিন্তু কি রোগাই হ'য়ে গেছ! আবার চুল কাটাও বন্ধ ক'রেছ দেখ্‌ছি। আমি তোমারই কথা ভাবছিলুম। তোমাকে আসতে লিখে অবধি—" তাহার পর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কি যেন সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "যাক্ সে কথা। কিন্তু এ ঘরে এলে কি ক'রে? আমি ত বৈঠকখানায় তোমারই অপেক্ষা ক'রছিলুম।"

রমেশ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সুমিত্রা কহিল, "উনি পথ হারিয়ে খিড়কির দিকে গিয়ে পড়েছিলেন, আমিই ওঁকে এই ঘরে এনে বসিয়েছি।"

সুধীরবাবুর সস্নেহ উৎকণ্ঠার পর সুমিত্রার কথা কয়টা যেন বড় বেশী কঠিন শুনাইল।

সুধীরবাবু তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ, ভালোই হ'য়েছে। তা' রমেশ ক'দিন আছ ত আমাদের এখানে? অনেক দিন পরে তোমাকে পাওয়া গেছে, সহজে ছাড়ছি নে। কি বল, ছোট বৌ?"

সুধীরবাবু রমেশের পিঠ চাপড়াইয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু এবারেও রমেশকে কিছু বলিতে হইল না। সুমিত্রা কহিল, "তা কি হয়? ওঁর কত কাজ! ওঁদের মত লোকের কি কোথাও দুদণ্ড বস্‌বার সময় আছে? ওঁকে আজই চলে যেতে হবে।"

রমেশ একবার সুমিত্রার দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল। তাহার মনে হইল সুমিত্রার চোখে-মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছে। সরলমতি সুধীরবাবুর কিছুই চোখে পড়ে নাই। তিনি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "কিন্তু ওর সঙ্গে যে আমার অনেক কথা। কতদিন পরে—না রমেশ, সে হবে না। তোমাকে কয়েক দিন থেকে যেতেই হবে। কত কথা যে জমে আছে—"

হাসিয়া সুমিত্রা কহিল, "কি এমন কথা? তোমার জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের কথা? ওসব জানবার ওঁর আগ্রহ নেই। হাতের রেখায় উনি নিশ্চয়ই তোমার মত বিশ্বাস করেন না।"

সলজ্জভাবে পত্নীর কথার প্রতিবাদ করিয়া সুধীরবাবু কহিলেন, "না-না, ও-কথা নয়। আরও অনেক কথা আলোচনা ক'রবার আছে।"

এতক্ষণে রমেশ কথা কহিল। শান্ত কণ্ঠে বলিল, "যে কথা আলোচনা ক'রতে চাইছ, সে সমস্তই তোমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, সুধীর। তার আর আবশ্যক নেই।"

রমেশের কথা শুনিয়া সুধীরবাবুর মুখের চেহারাটা পলকে বদলাইয়া গেল। তিনি ম্লানমুখে স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমি রমেশবাবুকে সব বুঝিয়ে ব'লেছি। তিনি—"

সুধীরবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি মিথ্যা আশঙ্কা ক'রছ। ডেপুটি কিছুই জানতে পারবেন না। তাছাড়া রমেশ এমন কিছু ভয়ঙ্কর কাজ ক'রতেই পারে না। যাতে—"

সুমিত্রা যেন সহসা ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, "না, তা' হয় না। আমি তা' হ'তে দেবো না। তোমার জমীদারীর এই দুঃসময়ে ওঁর খেয়াল-খুশীর জন্য টাকা বার ক'রতে আমি দেবো না। খেয়াল-খুশীই তো! ওঁর কাছে যা' আদর্শ, আমাদের কাছে তা' খেয়াল খুশী ছাড়া আর কি? আমি দিতে দেবো না এ টাকা!"

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত শুনাইল। সুমিত্রার এই আকস্মিক এবং অহেতুক ভাবান্তরে সুধীরবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। রমেশের সঙ্গে পরিচয় তাঁহার অনেক দিনের; কিন্তু সে পরিচয় যতই পুরাতন হোক্ তাহা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাই রমেশের সম্মুখে স্ত্রীর এই অসঙ্গত জিদ্ শুধু অশোভন ঠেকিল তাহা নহে, ইহার মধ্যে নিহিত অপমান রমেশকে আঘাত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকেই যেন বিদ্ধ করিয়া দিল। কিন্তু ভৎর্সনা করিবার, শাসন করিবার ভাবা তাঁহার আসে না, তিনি কিছুই না বলিয়া চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলেন। রমেশ আর একবার সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল। রমেশের মুখে অপমানের কোন কালিমা, বেদনার কোন রেখা ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু দৃষ্টি নত করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যেন বড় শীর্ণ দেখাইল।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সুমিত্রার মনে হইয়াছিল আঘাতটা অতি-মাত্রায় গুরু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল ঐ কথা কয়টা যেন তাহাকেও নির্ম্মম আঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া দিয়াছে। তাহার পর রমেশের শীর্ণ মুখের মৌন সহায়হীনতা তাহাকে অকারণে আরও নিষ্ঠুর করিয়া তুলিল। কিসের একটা অদৃশ্য দাহ তাহার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল তথাপি সে সংযত কণ্ঠে নিজের কথার জের টানিয়া কহিল, "সে যাই হোক্, অতগুলো টাকা দেবার মত অবস্থা এখন আমাদের নয় এই কথাটাই আমি ওঁকে জানিয়ে দিতে চাই।"

একটু ভাবিয়া লইয়া সুধীরবাবু বলিলেন, "সেদিন বড় তরফের চার নম্বর মহালের দরুণ যে টাকাটা পাওয়া গেছে তার থেকে—"

"না, তার থেকেও দেওয়া চলবে না। সে টাকায় কাছারী বাড়ীটা মেরামত ক'রবো ব'লে আমি তুলে রেখেছি।"

সুমিত্রা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুধীরবাবু বুঝিলেন, যে কোন কারণেই হোক্ রমেশকে সুমিত্রা প্রতারক ঠাওরাইয়া লইয়াছে এবং একবার যখন একটা ধারণা তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছে তখন তাহা যত ভ্রান্তই হউক কিছুতেই সুমিত্রার মন হইতে মুছিয়া যাইবে না। রমেশের সঙ্গে নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিবেন, তাহার পর কয়েক দিন একত্রে বাস করিয়া যাইবার সময় রমেশকে টাকা কয়টা দিয়া দিবেন, এই অভিপ্রায়েই তিনি সাদরে রমেশকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এমন সময় সুমিত্রা বিরূপ হইয়া উঠিল। সুধীরবাবু নিতান্তই সাধাসিধে মানুষ, স্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করিয়া টাকা দিবার সাধ্য নাই অথচ স্ত্রীর এই অন্যায় বিরুদ্ধতাকেও প্রশ্রয় দিতে পারিতেছেন না, এমন একটা বিপাকে পড়িয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেলে রমেশ কহিল, "আজ তা হ'লে উঠি, সুধীর।"

রমেশকে উঠিতে দেখিয়া সুধীরবাবু তাহার দুইটি হাত ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, "আজকের রাতটা থেকে যাও রমেশ। আজ ছোট-বৌএর মনটা ভালো নেই। কাল সকালে আমি বুঝিয়ে বললেই ও রাজী হ'য়ে যাবে। ও ত কখনও এ রকম ভাবে কাউকে ফিরিয়ে দেয় না। তুমি আমার এই কথাটা রাখো, রমেশ।"

তাঁহার এই আন্তরিক অনুরোধে রমেশ বিচলিত হইল। কিন্তু উপায় নাই। সুমিত্রা আজ তাহাকে নিরাশ্রয় করিতে চাহে, তাহাকে এখনই বাহির হইতে হইবে। রমেশ সুধীরবাবুর হাতে একটু চাপ দিয়া কহিল, "তুমি দুঃখ ক'রো না, সুধীর। আর এক দিন আসবো।"

"তোমার টাকাটা?"

রমেশ হাসিয়া কহিল, "এমন কিছু দরকার ছিল না। চললুম ভাই।"

দুইজনে অগ্রসর হইতেই দেখিল দরজার নিকট সুমিত্রা একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "আসুন, আপনাকে এই পথেই এগিয়ে দিই।"

সুমিত্রা এমন সহজভাবে রমেশকে আহ্বান করিল যেন অবাঞ্ছনীয় কিছুই ঘটে নাই। সুধীরবাবু বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমেশ দরজার দিকে পা' বাড়াইল। সুমিত্রা লণ্ঠনটা লইয়া আগে আগে চলিল।

পথে কোন কথাই হইল না। আবার সেই বাগানের দিক্‌কার দরজায় আসিয়া লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া সুমিত্রা থমকিয়া দাঁড়াইল। রমেশের মনে হইল সে যেন কিছু বলিতে চায়। রমেশ জিজ্ঞাসুনেত্রে সুমিত্রার দিকে চাহিল। অস্পষ্ট আলোয় তাহার মুখ দেখা গেল না, তথাপি রমেশের বোধ হইল সুমিত্রা যেন প্রাণপণ চেষ্টায় উদ্‌গত অশ্রুকে রোধ করিতেছে।

লণ্ঠনটা নামাইয়া রাখিয়া সুমিত্রা ধীরে ধীরে বুকের মধ্য হইতে একটা ছোট পুঁটলী বাহির করিয়া রমেশের দিকে বাড়াইয়া ধরিল। রমেশ দেখিল পুঁটলীটি গহনার, তবু সে তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল।

সুমিত্রা কহিল, "এই গহনা ক'খানায় আপনার টাকার জোগাড় হয়ে যাবে।"

"তা' হ'তে পারে কিন্তু তোমার গহনা আমি নেবো কেন?" বলিয়া রমেশ বাগানের পথে নামিতে শুরু করিল।

সুমিত্রা তাহা দেখিয়া যেন শক্তি সঞ্চয় করিয়া কহিল, "এ গহনা আমার বাবা গড়িয়ে রেখেছিলেন, আপনার সঙ্গে আমার বিয়েতে যৌতুক দেবেন ব'লে।"

তাহার স্বর ভাঙা শুনাইল। রমেশ সিঁড়ি নামিতে নামিতে কহিল, "তা হোক্। ও সব তোমারই থাক্।"

রমেশ বাগানের পথে নামিয়া পড়িল। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া চাহিয়া দেখিল সুমিত্রা লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, শুধু তাহার ওষ্ঠ দুইটি বার বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

সাত বৎসর পূর্ব্বে সেই শ্রাবণ রাত্রিতে যদি ঐ ওষ্ঠ দু'টি এমনই কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিত তাহা হইলে হয়তো আজ আর রমেশকে এমন করিয়া পথের প্রেমে মাতিয়া দুর্গমের অভিসারে ছুটিয়া যাইতে হইত না। বাগানের পথে নামিয়া রমেশের বুকের মধ্যে যেন একটা যন্ত্রণা কণ্ঠ অবধি ঠেলিয়া উঠিয়া আসিল। কিন্তু সে ফিরিয়া চাহিল না।

ক্ষীণ চন্দ্রালোকে পথ চলিতে চলিতে রমেশের মনে হইল সে যেন সীমাহীন অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সংসারধর্ম্ম ও গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনিলবরণ রায়

পাশ্চাত্য প্রভাবের বশে আজকাল আমাদের দেশে সন্ন্যাস নিন্দিত হইতেছে। যে সংসার-বিরাগী ভক্ত ঈশ্বর-লাভের অভিপ্রায়ে পত্নী-পুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতেছে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

দেবতা নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, "হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!"

পত্নী ও পুত্রের মধ্যেও ভগবান আছেন সত্য, কিন্তু কয়জন তাহা দেখিতে পায়? সর্ব্বভূতের মধ্যে যাঁহারা এক আত্মা, এক ভগবান দেখেন, তাঁহারই পত্নী ও পুত্রের মধ্যেও ভগবানকে দেখিতে পান—তাঁহাদের আত্মপর ভেদ দূর হইয়া যায়। তাহার পূর্ব্বে মানুষ পত্নী ও পুত্রের মধ্যে ভগবানকে দেখেনা, ভগবানের সেবা করে না, পরন্তু নিজ অহংয়েরই সেবা করে, "আমার" পত্নী, "আমার" পুত্র—এই অহংভাবই তাহাদের সকল ব্যবহারের মূলে থাকে—এই অহং ভাব দূর করিতে না পারিলে কেহই অধ্যাত্ম-জীবন বা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অতএব স্ত্রী-পুত্র গৃহ বিত্ত প্রভৃতি যে সবকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের অহংভাব পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় সে সবকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিতেই হইবে। অহংভাব লইয়া সংসারে আমরা যে কর্ম্মই করি না কেন, তাহা আমাদিগকে এই দুঃখদ্বন্দ্বময় প্রাকৃত জীবনে বদ্ধ রাখিবে, তাই উপনিষদ অতি জোরের সহিতই বলিয়াছে,

ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকেন
অমৃতত্বমানশুঃ। কৈবল্যং মহানারায়ণ ১০।৫

গীতা এই আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছে, তবে গীতা "ত্যাগ" শব্দের যে অর্থ দিয়াছে তাহাতেই সাধারণ সন্ন্যাসীদের সহিত গীতার শিক্ষার প্রভেদ হইয়াছে। গীতার শিক্ষার কর্ম্মত্যাগের আদর্শ হইতেছে আসক্তি ত্যাগ, কর্ম্মফল কামনা ত্যাগ (৫।১১,১২)। তবে সাধারণ সাংসারিক জীবনে থাকিয়া এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ এক রকম অসম্ভব। গীতা কোথাও বাহ্য সন্ন্যাস গ্রহণ বা সন্ন্যাস আশ্রমের উপদেশ দেয় নাই, বলিয়াছে ইহা একটা পন্থা হইলেও দুর্গম পন্থা (৫।৬)। তথাপি গীতার যে উচ্চতর সাধনা, ব্রহ্মের মধ্যে অহংভাবের নির্ব্বাণ এবং পুরুষোত্তমের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ—তাহার অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা সাধারণ সাংসারিক জীবনে, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে লাভ করা যায় না—সেখান হইতে সরিয়া অধ্যাত্ম জীবনের অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে বাস করা প্রয়োজন হয়—গীতা তাহারই ইঙ্গিত দিয়াছে—"বিবিক্তদেশসেবিত্ব-মরতির্জ্জনসংসদি (১৩।১১), বিবিক্তসেবি-লঘ্বাশী যত বাক্‌কায়-মানসঃ" (১৮।৫২)। তবে ইহা সন্ন্যাস আশ্রম নহে—কারণ সন্ন্যাস আশ্রমে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। গীতা বলিয়াছে—যজ্ঞ দান তপস্যা এ-সব কর্ম্ম কখনই পরিত্যাজ্য নহে। নিজের জন্ম বা নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্ম কর্ম্ম না করিয়া সর্ব্বভূতের জন্ম, ভগবানের জন্ম কর্ম্ম করাই গীতার মতে প্রকৃত যজ্ঞ, দান, তপস্যা—এবং গীতার সাধনায় এইরূপ কর্ম্মের উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সকল সময়েই স্বীকৃত হইয়াছে। আর গীতা যে নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া কায়মনবাক্য সংযত করিয়া সাধনা করিতে বলিয়াছে—তাহাও কেবল সাধন অবস্থার জন্ম; সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ যেখানেই থাকুন এবং যাহাই করুন তাহাতে তাহার আর কোন ক্ষতি হয় না এবং তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতের হিতসাধনে জগতে ভগবানের ইচ্ছা সাধনে নিযুক্ত থাকেন।

কেবল নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের জন্ম কর্ম্মে রত না থাকিয়া, সমাজের হিতের জন্ম, দেশের হিতের জন্ম কর্ম্ম করিলে তাহাতে ক্ষুদ্র অহংভাবের ক্ষয় হয়, মানুষ একটা উদারতা লাভ করে—এই জন্ম অনেকে এইটিকেই গীতার কর্ম্মযোগ বলিয়া থাকেন। নিজের জন্মই হউক, আর পরের জন্মই হউক, যে-কোন কর্ম্ম যদি যজ্ঞ ভাবে ভগবানে উৎসর্গ করিয়া করা যায় তাহাই হয় কর্ম্মযোগের সূচনা—ইহার দ্বারা অহংভাবের ক্ষয় হইলে মানুষ ক্রমশঃ সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে ভাবে রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্ম্ম করা হয় তাহা রাজসিক—তাহাতে অহংভাবের একটু রূপান্তর হইলেও তাহা দূর হয় না, মানুষ নিজের দেশ বা সম্প্রদায়ের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে—সেইটিই হয় তাহার পরিবর্দ্ধিত অহং এবং তাহার সেবার জন্ম সে অন্তের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়, তাহা ছাড়া এই সব কাজের মধ্যে নাম যশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং সেই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্ম মানুষ অস্থিরভাবে কর্ম্ম করে। গীতার কর্ম্মযোগের ভিত্তিরূপে যে শান্ত নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন, এইরূপ রাজসিক কর্ম্মের মধ্যে তাহা গড়িয়া উঠিতে পারে না—অতএব এইরূপ কর্ম্ম অধ্যাত্ম সাধনার অনুকূল হয়না।

গীতা যেমন সন্ন্যাসীদের স্থায় কর্ম্মত্যাগ অনুমোদন করে নাই, তেমনি যে তীব্র রাজসিক কর্ম্ম, activism, আধুনিক যুগের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও অনুমোদন করে নাই। তবে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা রাজসিক কর্ম্মে ক্ষতি হয় কম; যাহারা রাজসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত তাহারা আত্ম-বিকাশে অগ্রসর হইতে পারে না, অহংভাব ও বাসনার মধ্যেই ঘুরপাক খাইতে থাকে। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করিলে মানুষ তামসিকতার মধ্যে প্লাবিত হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এই জন্ম গীতা কর্ম্মত্যাগের আদর্শ প্রচার করা বিপজ্জনক বলিয়াছে—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।—৩।২৪

সন্ন্যাসীদের কর্ম্মত্যাগের আদর্শের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গীতা কর্ম্মের উপর বেশী জোর দিয়াছে বলিয়াই ভুল হয় যে, গীতা বুঝি পাশ্চাত্য রাজসিক কর্ম্মেরই আদর্শ প্রচার করিয়াছে। গীতা অবশ্য বলিয়াছে যে, তামসিকতা অপেক্ষা এইরূপ রাজসিক কর্ম্মও ভাল—কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ (৩।৮)। কিন্তু এইরূপ কর্ম্মই যে গীতার আদর্শ কর্ম্মযোগ নহে গীতার পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় দুইটি অনুধাবন করিলে সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"রাখো রে ধ্যান থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধূলো বালি
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হ'য়ে
ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।"

এই কবিতায় আধুনিক মনোভাব অনুযায়ী শ্রমকে অত্যুচ্চ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা খুবই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু এখানে কর্ম্মযোগের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। ভগবান সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মের মধ্যে রহিয়াছেন, অতি তুচ্ছ কর্ম্মের ভিতর দিয়াও আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে পারি, কিন্তু সে-জন্য সাধনার প্রয়োজন, শুধু কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মযোগ হয় না। অসংখ্য কুলী মজুর ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অশ্রান্তভাবে কর্ম্ম করিতেছে, তাহারা কি সকলেই কর্ম্মযোগী? ভগবান আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, সকলের হৃদয়ের মধ্যে রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জানি না, তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ যোগ নাই—সাধারণতঃ আমরা জীবন যাপন করি, কর্ম্ম করি ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অহং ভাবের বশে—এবং এইটিই হইতেছে সংসারের সকল দুঃখ ও অশান্তির মূল—এই মূলটি উচ্ছেদ করাই অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য—ইহার জন্য ধ্যান ও পূজার সার্থকতা আছে—তাই গীতা বলিয়াছেন, ধ্যানযোগপরো নিত্যং। কর্ম্মের ভিতর দিয়াই ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস, সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে, মামনুস্মর যুধ্য চ, অনুভব করিতে হইবে আমি কর্ম্ম করিতেছি না, আমার ভিতর দিয়া প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম করিতেছে, সেই-সব কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে ভগবানকে উৎসর্গ করিতে হইবে, কর্ম্মের ফলের প্রতি এবং কর্ম্মের প্রতি আসক্তি ও মমত্ব-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে—তবেই আমরা কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হইতে পারিব—এবং ইহার জন্য ধ্যান করা, পত্রপুষ্প ফল জল দিয়া ভগবানের পূজা করার খুবই উপযোগিতা ও সার্থকতা আছে।

বর্ত্তমানে মানুষের সাংসারিক জীবন যে-ভাবে চলিতেছে তাহার মধ্যে থাকিয়া এই কর্ম্মযোগের সাধনা করা এক রকম অসম্ভব—লোকের ভগবানে বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, উচ্চতর অধ্যাত্ম জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষার জোর নাই, উচ্চতর জীবন লাভের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সংযমের একান্ত অভাব, নীচ ইন্দ্রিয় ভোগের জন্যই সকলে অস্থিরভাবে ধাবিত, এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ শত বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে—ইহার মধ্যে থাকিয়া গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণ কোনরকমে চলিতে পারে কিন্তু প্রকৃত-অধ্যাত্মসাধনা, যোগ সাধনা হয় না *। রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন—

"কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি
ধরণীর ধূলি তাই লয়ে আছি,
পাই নি চরণ ধূলি হে।"

অতএব দিব্য অধ্যাত্মজীবনলাভের জন্য সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন না করিয়া গীতার কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে হইলেও বর্ত্তমান সামাজিক জীবন হইতে শেষ পর্য্যন্ত সরিয়া যাইতেই হয়; এমন কোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকিতে হয় যেখানে সাধক অহংশূন্য হইয়া প্রকৃত নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে এবং সকল সময়ে ভগবানে মন রাখিতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানে দেশসেবা, জনসেবা যে-ভাবে চলিতেছে—ইহার মধ্যে থাকিয়া অধ্যাত্ম জীবন গঠন করা যায় না, কারণ এখানে সাত্ত্বিকতার বিকাশ না হইয়া রাজসিকতাই বৃদ্ধি পাইতে পারে—তাহাতে এই নীচের জীবনের বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া যায়।

কিন্তু এইরূপ অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্য সকলেই প্রস্তুত নহে। তাহাদের পক্ষে সংসারে থাকিয়া—আপন আপন প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারবর্গ প্রতিপালন, দেশসেবা, সমাজসেবা প্রভৃতি কর্ম্মে ব্রতী থাকাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ কর্ম্মের মধ্যে তাহারা গীতার ভাব যতটা আনিতে পারিবে, অহং, মমতা ও আসক্তিকে দমন করিয়া, সুখে দুঃখে, লাভ লোকসানে, মান অপমানে সমভাবে থাকা অভ্যাস করিয়া, কাম ক্রোধের বেগ সংযত করিয়া, নিয়মিত গীতা পাঠ, ধ্যান ও পূজা করিয়া ক্রমশঃ তাহারা প্রকৃত কর্ম্মযোগ ও অধ্যাত্ম জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিবে।

কর্ম্মযোগে শেষ সিদ্ধিলাভের জন্য এখন সাময়িকভাবে সংসার হইতে সরিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সংসার ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ গীতার শিক্ষা নহে—এবং এইখানেই হইতেছে সন্ন্যাসীদের সহিত গীতার মূল প্রভেদ। সন্ন্যাসীদের মতে সিদ্ধি ও জ্ঞানলাভের পর আর কর্ম্মের স্থান নাই। গীতার মতে সিদ্ধ পুরুষের কর্ম্মই দিব্য কর্ম্ম, তাঁহারাই কর্ম্মযোগী, কর্ম্মের প্রকৃত কৌশল জানেন—তাঁহারা আসিয়া যখন সংসারের সকল কর্ম্মে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি পরিচালন করিবেন—তখনই সমাজজীবনের প্রকৃত উন্নতি ও রূপান্তর সাধিত হইবে—তখনই সমাজ প্রকৃতভাবে আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে—তখনই মানুষের গার্হস্থ্য জীবন হইবে প্রকৃত গার্হস্থ্য আশ্রম। এখন আর অধ্যাত্ম-জীবন লাভের জন্য, অধ্যাত্ম সাধনার জন্য কাহাকেও সংসার ও সমাজ হইতে সরিয়া যাইতে হইবে না।

সমাজকে এইরূপ অধ্যাত্মভাবে গড়িয়া তোলাই ছিল প্রাচীন বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার আদর্শ। কিন্তু তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই—সেটা চিরকাল একটা সমুচ্চ আদর্শের মত থাকিয়া গিয়াছে—কার্য্যতঃ সমাজ জীবনে অনেক গ্লানি থাকিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে সেই সব গ্লানি এমন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে যে সমাজকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার জন্য ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে এবং এইরূপ একটি সন্ধিক্ষণকে উপলক্ষ করিয়া গীতার শিক্ষা কথিত হইয়াছে। স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রের উপর সমাজ যে নিগ্রহ করিয়াছিল, গীতা তাহার প্রতিবাদ করিয়া সাম্যের আদর্শ দেখাইয়াছে, বলিয়াছে সকলের মধ্যেই এমন কি নীচ পতিত চণ্ডালের মধ্যেও এক ব্রহ্ম সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন, গতানুগতিকভাবে জাতিগত বৃত্তি বা ব্যবসা অনুসরণ না করিয়া যাহাতে লোকে আপন আপন প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম্ম করে এবং সেই কর্ম্মকে যজ্ঞরূপে ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করে সেই শিক্ষা দিয়াছে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আসক্তি বর্জ্জন করিয়া, আত্ম পর সকলকেই সমান

---

* হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে বিধবাগণকে যে ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে বলা হয় তাহাতে মিথ্যাচারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

ভাবে দেখিয়া, সর্ব্বভূতের হিত সাধনে রত থাকিতে বলিয়াছে। ইহার জন্ত বর্ত্তমান পারিবারিক জীবন ও সমাজ জীবনকে যদি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে হয়—অন্ধ মায়া ও আসক্তির বশে তাহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া চলিবে না, ধ্বংসের ভিতর দিয়া নূতন সৃষ্টি—ইহাই গীতার আদর্শ, তাই গীতা কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া তাহার শিক্ষার সূচনা করিয়াছে। মানুষ যখন অন্ধ মায়ার বশে পুরাতন গ্লানিময় জীবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়—তখন বিরাট ধ্বংসলীলা আসে প্রকৃতির বিধানে—এই ভাবেই বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রের অবতারণা হইয়াছে—ইহার ভিতর দিয়াই মানবজাতির দিব্য অধ্যাত্মজীবনের সূচনা হইবে।

মানুষের সাংসারিক জীবন এখন যে-ভাবে চলিতেছে—ইহার মধ্যে থাকিয়া মানুষ প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করিবে ইহা দুরাশা—গীতা বলিয়াছে, অনিত্যং অসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ (৯।৩৩)। এই সংসার ধর্ম্মক্ষেত্র এখানে শাস্ত্রানুযায়ী জীবনযাপন করিয়া মানুষ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধের জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে—কিন্তু সেই উচ্চতর জীবনলাভ করিতে হইলে একদিন এই দুঃখময় অনিত্য সংসারকে নির্ম্মমভাবে বর্জ্জন করিতেই হইবে, মানুষের অতি আদরে সাজান ঘরকে ভাঙ্গিয়া দিতেই হইবে—কারণ ইহা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞান অহং ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকলেই এই শেষ ত্যাগের অধিকারী নহে, গীতা এই চরম শিক্ষা অল্প কয়েকজন ভগবানের একান্ত ভক্ত ও প্রিয়ের জন্তই দিয়াছে—

অসীতি দৃঢ়মিষ্টো মে ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্। ১৮।৬৪

গীতার শিক্ষা মুখ্যতঃ ব্যক্তি বিশেষের জন্ত, তাহা সমাজের জন্ত নহে—তবে একদিন সমাজও যে মুক্ত অধ্যাত্ম-জীবন লাভ করিতে পারে গীতা সে ইঙ্গিতও দিয়াছে, বলিয়াছে সকলেই একান্তভাবে ভগবানের ভজনা করিলে উচ্চ জীবন লাভ করিতে পারে। তবে সে আশা গীতার যুগেও সুদূরপরাহত ছিল—মানুষ তখনও সমষ্টিগতভাবে অধ্যাত্ম জীবন লাভের জন্ত, সমাজকে অধ্যাত্মভাবে গঠন করিবার জন্ত প্রস্তুত হয় নাই—তাই অধ্যাত্ম জীবন লাভ করিতে হইলে ব্যক্তিকে সমাজ ছাড়িয়া যাইতে হইত, মুনিঋষিগণ সংসারের কোলাহল হইতে দূরে গিয়া নিজেদের শান্তিময় আশ্রম রচনা করিতেন। তবে গীতা যে উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ দিয়াছে তাহা বৌদ্ধ বা মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের আদর্শ নহে। সন্ন্যাসীগণের আদর্শ হইতেছে—সাংসারিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে চিরদিনের জন্ত বর্জ্জন করিয়া, ব্যক্তিগত সত্তা ও জীবনের লোপসাধন করিয়া ব্রহ্মে লীন হওয়া বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। গীতার আদর্শ এইরূপ ব্যক্তিগত সত্তার লোপ সাধন নহে, গীতার মতে জীব হইতেছে ভগবানের সনাতন অংশ, সে কখনই লুপ্ত হয় না; তবে আমরা যাহাকে 'অহং' বলি সেইটিই জীব নহে, সেইটিই আমাদের প্রকৃত সত্তা নহে, এই "অহং"কে লুপ্ত করিয়া আমাদের অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। এই সত্তায় আমরা ভগবানের অংশ, মূলতঃ ভগবানের সহিত এবং অন্তান্ত মানবের সহিত এক। এই অধ্যাত্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতে হইবে—তাহাই হইবে দিব্য অধ্যাত্ম জীবন। তখন সংসারে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হইবে—পরস্পরের সহিত প্রেমময় শান্তিময় আনন্দময় আদানপ্রদানই হইবে সমাজ জীবনের ধারা। সে জীবনে কোন ভোগ ঐশ্বর্য্যই পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইবে না, কারণ আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, ভোগ এ-সবই হইতেছে ভগবানের বিভূতি—ভাগবত জীবনের মধ্যে এই সবেরই স্থান আছে—তাই গীতার শিক্ষা হইতেছে, ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যম্ সমৃদ্ধম্। গীতা যে সব ইঙ্গিত বহু পূর্ব্বে দিয়াছে—তদনুযায়ী সমাজের জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্ত মানুষ ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারায় এতদিনে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিশ্ব-রণ গাজন

শ্রীলতিকা ঘোষ

জটাজুটধারী শিঙ্গায় ফুকারি বাচিছে,
আলু থালু বেশ নয়নে আবেশ নাচিছে,

কারা গো পাগল নৃত্য দোদুল দোলায়ে
ডম্বরুর তালে ধরণীরে দেয় ভোলায়ে।

দিক্ ভৈরবী উচ্চ কি নাদে গরজে,
পুজে নটরাজে রক্ত-বরণ সরোজে;

নাহি মায়ালেশ নাহিক আবেশ প্রখর
দৃষ্টি-শোণিত রণ-কল্লোল মুখর।

পৃথিবীর জন শিবের গাজনে মাতিছে
শিঙার ধ্বনিতে ধরণী আসন পাতিছে।

পদ টল্ টল্ হাসে খল্ খল্ সরসে
আদেশে পাগল গাহে সঙ্গীত হরসে

থামাবে কে আজ রুদ্রপ্রলয় নাচেরে,
চৈত্র নেশায় তীব্র বিষাণ বাজেরে

মৃত্যু প্লাবিত নিশীথে গাজন গাহিয়া
হাসিছে স্বপন অতীতের পানে চাহিয়া।

নাহি জানি কোন্ দূরে সে সৃজন গড়িছে
নবীন স্বপন কি নব মায়ায় ভরিছে,

শুধু আজ ভাবি শ্রান্ত ধরণী যাচিয়া
গেলোকি মুক্তি রক্ত গাজনে নাচিয়া!

পঞ্চাশ-এক

(রস-রচনা)

শ্রীজানকীরঞ্জন রাজপণ্ডিত বি-এ

বহুদিনের সাধ সাংবাদিক হ'ব। কিন্তু সুযোগ কোথায়? যা' হো'ক, চেষ্টাও ত করতে হ'বে। গায়ে খদ্দর চাপিয়ে জাতীয়তা-বাদী সংবাদ-পত্রের দুয়ারে দুয়ারে ধর্না দিলাম। কিন্তু সব জায়গায় এক প্রশ্ন:—"আপনার অভিজ্ঞতা"? কোথায়ও বড় সুবিধে হ'ল না। তবু সাংবাদিক হওয়ার সখ ছাড়লাম না। মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রের অফিসে 'রিপোর্ট' পাঠাই। মনে এ আশা এখনও আছে যে, হয়ত একদিন এইভাবে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে একজন খাঁটি সাংবাদিক হ'য়ে উঠ্‌ব।

ভ্রাম্যমান বে-সরকারী সাংবাদিক জীবনের একখানি report আজ আপনাদের সামনে ধরছি। বিচার ক'রে দেখবেন এটা আমার study কিনা। নিজের মতামত কিছুই চাপাই না। এটা একবারে যা'কে বলে "Purely honest journalism' তা'ই। মতামতের জন্য আমি দায়ী হ'তে পারিনা।

প্রায় বছর খানেক আগে বি-এন-রেল-লাইনের একটা ছোট্ট 'ষ্টেশনে' নেমে পড়লাম। ভাবলাম, সেই শালবন আর কাঁকরের দেশে হয়ত কিছু রসাল সংবাদের সন্ধান পা'ব। ছোট্ট পথ, দু'পাশে শালবন; কাঁকরে পথের উপর গো-যান 'হেঁচ্‌কা হোঁ' 'কেঁচ্‌কা কোঁ' শব্দে চলেছে। কিন্তু, এই বনের মাঝে এ কী দৃশ্য! ঐ যে বনের পাশে ভীরু-সর্পিল পথখানি ধ'রে একদল লোক 'হন্তদন্ত' হ'য়ে ছুটে চলেছে।—কোথায়? একজনকে ডাক দিলাম "মশাই! অ—মশাই!" লোকটা ঘুরে জবাব দিলে—"কেন বাবু! কি প্রয়োজন? আমরা চলেছি 'পঞ্চাশ-এক' এর বিরুদ্ধে সভায় প্রতিবাদ জানাতে।"

পঞ্চাশ এক!! কি জিনিস সে? হিটলার ছাড়া অন্য কোন দৈত্যের নাম ত মনে পড়ছে না। গোলক ধাঁধায় পড়লাম। কিন্তু তখন লোকটা গেছে নাগালের বাইরে। ঠিক করলাম সভায় যেতেই হবে।

যথারীতি সভা বসেছে। সভার নাম "পঞ্চাশ-এক।" এটা অলঙ্কার নির্ম্মাতাগণের একটা সম্মেলন। সভার উদ্দেশ্য 'পঞ্চাশ--এক'এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। নিজের অজ্ঞতা ঢেকে তিনবার ঢোক গিলে সভার একধারে জায়গা ক'রে নিলাম।

সভা আরম্ভ হ'ল। সভাপতি ম'শায়ের নির্দ্দেশে দামোদরবাবু বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। গভীর নিস্তব্ধতা; কাঁটাটী পড়লেও শোনা যাবে। আমি গভীর উদ্বেগে দুরন্ত দৈত্য 'পঞ্চাশ-এক'এর পরীক্ষা করতে লাগলাম।......বক্তার বক্তৃতা চলেছে। জনতা অবাক; আমিও কৌতূহলী। * * * * সন্ধান পেরেছি, পেয়েছি!

এতক্ষণে দৈত্যবরের সন্ধান ও পরিচয় জানলাম। এ দৈত্য আর কেউ নয়......কেন্দ্রীয়-পরিষদের "বরপণ-প্রথা-নিবারণী" বিলের পরিকল্পিত Rs 51 অর্থাৎ পঞ্চাশ-এক। বাঁচা গেল।

আমার ডায়েরী থেকে দামোদরবাবুর বক্তৃতা আপনাদের একটু শোনাচ্ছি। * * * * "ভদ্র মহোদয়গণ! আমাদের সম্মুখে মহাসঙ্কট উপস্থিত। ইউরোপের রণ-তাণ্ডব এখনও আমাদের জীবনে কোনও বিঘ্ন ঘটায় নি। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়কে বৃত্তি-শূন্য করবার জন্ম দেশের একদল লোক আজ দৃঢ়-সঙ্কল্প। কলমের একটী খোঁচায়,আইনের একটী প্যাঁচে সহস্র সহস্র মানুষকে বৃত্তি-শূন্য করবার ষড়যন্ত্র চলছে। যদি কন্যাপক্ষ ৫১৲ টাকার বেশী না দেন, তা' হ'লে আমাদের কি উপায় হ'বে? আমরা কি বৃত্তি-শূন্য হ'ব না? ৫১৲ টাকার মধ্যে সোনার গহনা গড়িয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয় উদারনৈতিকদের মত আমরা কন্যা-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সর্ব্বক্ষেত্রে সহযোগিতা ক'রে আসছি। কত কম সোনা দিয়ে হাল ফ্যাসনের গহনা গড়িয়ে দেওয়া যায়, আমরা তার record সৃষ্টি করেছি। এইভাবে জামাই শ্রেণীকে ফ্যাসনের নামে প্রতারিত করেছি। কিন্তু তার প্রতিদান পাচ্ছি কি? দুর্দ্দিনে যা'রা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে এসেছে, তাদের আজ জাতীয় জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে কেন? আমরা এই ধ্বংসকর আইনের তীব্র প্রতিবাদ করছি। এও আজ জানিয়ে দিচ্ছি যে, যদি জনমতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও আইনটা বিধিবদ্ধ করা হয়, তা' হ'লে বাংলার প্রতি জেলায়, প্রতি মহকুমায়,প্রতি সহরে এই আইনটাকে ব্যর্থ করবার জন্য তীব্র আন্দোলন চালাব। আমরা অসহযোগিতার সমর্থক নই। কিন্তু প্রয়োজন হ'লে আমরা প্রত্যক্ষ কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।"

বিলটীর প্রতিবাদ ক'রে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। আমিও বক্তৃতার রিপোর্ট নিয়ে সভা ছাড়লাম।

২

ক্রোশ দুই পথ হেঁটে ঘোষালপুরের আমবাগানের ভেতর দিয়ে রমাইভেটী গ্রামে পৌঁছুলাম। এখানেও একটা সভা হচ্ছে। আলোচ্য বিষয়:—51 অর্থাৎ 'পঞ্চাশ-এক'। দেশের নাপিত, কুমার, মালাকার, তন্তুবায়, মোদক প্রভৃতি সভায় তাদের অভিমত জানাতে এসেছে। সভা আরম্ভ হ'ল। সভাপতি মহাশয়কে মাল্য-দানের পর সনাতনবাবু বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। সনাতনবাবুর বক্তৃতা থেকে একটু অংশ আপনাদের শোনাচ্ছি। তিনি বললেন:—"ভদ্রমহোদয়গণ! এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আজকার সভা বাংলার প্রাচীন শিল্পী সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি-মূলক মহাসম্মেলন। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে যথোপযুক্ত প্রতিনিধি নিয়ে আমরা এই প্রতিবাদ-সম্মেলনের আয়োজন করেছি। আজ "পঞ্চাশ-এক" একটা মহাকালরূপে আমাদের গ্রাস করতে আসছে। বিবাহের প্রধান ব্যয় যদি ৫১৲ টাকা ধার্য্য করা হয়, তবে তার প্রতিক্রিয়া কি হ'বে? আমরা কোথায় দাঁড়াব? এই আইনের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের উপর প্রবল ধাক্কা আসবে। প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলিতেও কম খরচ হ'বে। আমরা একরূপ বৃত্তি-শূন্য হ'ব। আমরা এই পরিকল্পিত বিলের তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা মোটেই সাম্প্রদায়িক নই। কিন্তু আমাদের প্রতি-বাদ সত্ত্বেও যদি এই আইন রচিত হয়, তা'হলে মিঃ জিন্নার পাকীস্থান দাবীর ন্যায় আমরা বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলির জন্য বাংলার "কাঁকীস্থানের" দাবী সমর্থন করব।" (ঘন ঘন হাততালি)

বিলের বিরোধিতা ক'রে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল।

৩

রমাইভেটী ছেড়ে চললাম জনার্দ্দনপুরের নারী সম্মেলনে যোগদান করবার জন্ত। জানলাম, নারী সম্মেলন বিলটী পরিপূর্ণ সমর্থন করে। কিন্তু নারী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রসূনবাবু এখনও অবিবাহিত। তিনি প্রথমে ঘরোয়া বৈঠকে 'না গ্রহণ, না বর্জ্জন' নীতি গ্রহণ করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্ঘের কুমারী সভ্যাদের তীব্র প্রতিবাদে সক্ষম হ'লেন না। স্থির হ'ল, প্রকাশ্য অধিবেশনে যথারীতি বিতর্কের পর বিষয়টি ভোটে দেওয়া হ'বে।

গায়ত্রী দেবী সম্মেলনের সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হয়েছেন। বিলটীর সমর্থনে বহু কুমারী সভ্যা বক্তৃতা করলেন। সম্মেলনের ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল বিলের সমর্থকসূচক প্রস্তাবটী গৃহীত হ'বে। প্রসূনবাবু বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বক্তৃতার অংশবিশেষ আপনাদের শোনাচ্ছি।

বললেন :—"প্রগতিবাদী নারী সম্মেলনের এই সভায় আমার অভিমত আজ আপনাদের কাছে প্রহেলিকা ব'লে মনে হবে। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই নারী-সমাজের ক্ষতিকর কোনও বিষয় আমি সমর্থন করতে পারব না। সেইজন্তই আমি বিলটীর তীব্র প্রতিবাদ করতে উঠেছি। (সভাস্থলে স্লেম্ স্লেম্ রব।) আমি বিচলিত হ'ব না—বিচলিত হ'তে জানি না। নারী-সমাজের স্বার্থ এবং কল্যাণের দিকে চেয়েই আমি এই ধ্বংসকর, প্রতিক্রিয়ামূলক আইনের বিরোধিতা করছি। এমন একদল লোক আছেন—যাঁদের মনে হ'বে নারীর কল্যাণ-কামী, সংস্কারপন্থী। কিন্তু তাঁরা অন্তরে এক একজন স্মৃতিকার মনু—পরাশর। প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ নারী সমাজকে পিতৃ-সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত ক'রেছে। বিবাহকালীন যৌতুক প্রথা স্মৃতিকারের অন্যায়কে অনেক পরিমাণে compensate করেছে। পরিকল্পিত আইনটী নারীসমাজকে আবার প্রাচীন স্মৃতিকারের যুগে ফিরে যেতে বলছে। তাই নয় কি? (ঘন ঘন হাততালি)" প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হ'ল। হট্টগোলের মাঝে ফলাফল শোনা গেল না।

৪

জনার্দ্দনপুর ছেড়ে চললাম পীরডাঙ্গা গ্রামে। এখানে একটা সর্ব্বদল সম্মেলনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। সঙ্কট মুহূর্ত্তে united front-এর প্রয়োজনীয়তা এখানকার জনসাধারণ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছে। সম্মেলনে র‍্যাডিক্যাল, গান্ধী-পন্থী, বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ-তন্ত্রবাদী, অগ্রসর কংগ্রেস পন্থী, সনাতনী, আইনজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিগণ সমবেত হ'য়েছেন। সম্মেলন সুরু হ'ল। প্রসিদ্ধ, দল-নিরপেক্ষ আইনজীবী হিতসাধনবাবু সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'লেন।

প্রথমে উঠলেন সুকেশবাবু (বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতন্ত্রবাদী)। বললেন :—"মাননীয় সভাপতি মহাশয়! ভদ্রমহোদয়গণ! আমি বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টি নিয়ে এই আইনটার বিশ্লেষণ করব। প্রচলিত বরপণ প্রথাটার মধ্য দিয়ে ধন-সম্পদের অনেকখানি Proper distribution হ'ত। আইনটা বিধিবদ্ধ হ'লে সেটা আর হবে না। কিন্তু আইনের আর একটা দিক আছে। আজ হিন্দু সমাজের মধ্যে দুইটী বিশিষ্ট শ্রেণীর সন্ধান পেয়েছি। (১) বরপক্ষ-শ্রেণী (২) কন্যাপক্ষ-শ্রেণী। স্বার্থ বোধ থেকে জাগবে শ্রেণী চেতনা। শ্রেণী চেতনা জাগবার পর সুরু হ'বে শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রেণী সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠিত হ'বে মার্ক্স-পরিকল্পিত শ্রেণীহীন সমাজ। অতএব এই বিপুল সম্ভাবনার জন্ত আমি বিলটার সমর্থন করছি।"

সুকেশবাবুর পর র‍্যাডিক্যাল পার্টির রামরতনবাবু বললেন :—"সভাপতি মহাশয়! ভদ্রমহোদয়গণ! আমি একটা system ধ'রে বিলটার বিশ্লেষণ করব, বিলের মধ্যে কোনও method নেই। বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথা থাকবে, অথচ বরপণ প্রথার কড়াকড়ি থাকবেনা—এটা শুধু হাস্যকর নয়, অসম্ভব। বর্ত্তমান বিবাহ-প্রথা থাকলে সেই সঙ্গে বরপণ-প্রথাও থাকবে। বরপণ-প্রথাকে একেবারে লোপ করবার ব্যবস্থা এই আইনে নেই। ৫১ টাকা বরপণ থাকবে; ক্ষেত্র বিশেষে বেশী হ'তে পারে। বিলটা সব দিক দিয়েই inconsistent এবং illogical। আমি সংস্কারপন্থী নই; আমূল পরিবর্ত্তনকামী। অতএব বিল সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকব।"

র‍্যাডিক্যাল পার্টির পর অগ্রসর-কংগ্রেস দলের ধীমানবাবু বললেন :—"ভদ্রমহোদয়গণ! আলোচ্য বিলটা বাংলার প্রতি-ক্রিয়াশীল মন্ত্রিমণ্ডলীর পরিকল্পনা নয়। সুতরাং বিরাম এবং আপোষ-বিহীন সংগ্রামের প্রয়োজন হ'বেনা। প্রয়োজন হ'লে আপোষ-হীন সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হ'ব না।" (ঘন ঘন হাততালি)

অগ্রসর দলের বক্তৃতার পর খাঁটি গান্ধী-পন্থী বিমানবাবু বক্তৃতা আরম্ভ করলেন :—"সভাপতি মহাশয়! ভদ্রমহোদয়গণ! আমি খাঁটি গান্ধী-পন্থী এবং দৈহিক ও মানসিক অহিংসায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। আমি সম্মেলনের চারদিকে হিংসার গন্ধ পাচ্ছি। বিলটীর ছত্রে ছত্রে, অক্ষরে অক্ষরে হিংসার সন্ধান পেয়েছি। বর বিবাহে যৌতুক পান; এই বিলের মধ্যে সেটা বন্ধ করবার চেষ্টা হ'য়েছে। এটা দারুণ হিংসা, শ্রেণী সংগ্রাম। এর মধ্যে আমি হিংস্র মার্ক্স-বাদের গন্ধ পাচ্ছি। অবিমিশ্র অহিংস-পন্থী হিসাবে আমি হিংসা সমর্থন ক'রতে পারিনা। সেইজন্ত এই বিলটাও সমর্থন ক'রতে পারিনা।"

সনাতনী যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন :—"ভদ্রমহোদয়গণ! আইনের দ্বারা হিন্দুর পবিত্র বিবাহ-সংস্কার নিয়ন্ত্রিত হ'বে, এটা আমরা সমর্থন করিনা। আমরা বিধবা-বিবাহ আইন সমর্থন করি নাই; সর্দ্দার আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেছি। আজ আলোচ্য বিলটারও তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমার নিবেদন, সরকার বাহাদুর এই বিলটাকে বে-আইনী ঘোষণা ক'রে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণা বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করবেন।"

দল-নিরপেক্ষ সভাপতি মহাশয় তাঁর 'ফ্রেঞ্চ-কাট' দাড়িতে হাত দিয়ে অভিভাষণ আরম্ভ করলেন :—"ভদ্রমহোদয়গণ! নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও ভয় নেই। আইনের মধ্যে আছে বড় বড় ফাঁক। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে ৫১ হাজার টাকার থলেও পার হ'য়ে যাবে। হ্যাঁ, একটা কথা। Demand এবং Supply নীতির ঘাত-প্রতিঘাতে দুনিয়া চলছে—চলবেও। 'পঞ্চাশ-এক' বলুন, একবট্টি বলুন, আর একাত্তর বলুন, কেউ আপনাদের কিছু ক্ষতি কর'তে পারবেনা। ক্ষতি যখন হ'চ্ছেই না, তখন একটা বড় রকমের সংস্কারের বাহ্‌বা নিবেন না কেন? অতএব, আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলুন "Long live পঞ্চাশ-এক।"

Long live এর হট্টগোলে সভাভঙ্গ হ'ল। সিদ্ধান্ত কিছুই হ'লনা। ভিড়ের চাপে কাউন্টেন পেনটি হারালুম। এইখানেই আজ আমার honest journalism শেষ করছি।

অঞ্জনা

(গীতি ও নৃত্যনাট্য)

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

পঞ্চম দৃশ্য

দিগন্তে পর্ব্বতলেখা ও অরণ্যানী। ছায়াঘন গ্রামপ্রান্তে—ইরাবতী তীরে ছোট একখানি পর্ণকুটীর। অঙ্গনে পুষ্পিত তরু ও লতাবিতান। বিপাশা আনমনে ইতস্ততঃ ফিরিয়া বেড়াইতেছে; সুবর্ণগুপ্ত সন্তর্পণে সকৌতুক লঘুপদে তাহার অনুসরণ করিতেছে। দূর বনে রাখালিয়া বাঁশীতে প্রতিধ্বনিত হয় বিস্মৃত অতীতের একটা করুণ সুর। কুটীরের সম্মুখেই আঁকাবাঁকা গ্রামপথ।

সুবর্ণ। বিপাশা!

বিপাশা। এঁ্যা (চম্‌কাইয়া উঠিল)

সুবর্ণ। কি ভাব্‌ছো অমন আন্‌মনে?

বিপাশা। (দীর্ঘশ্বাস সহ) কই না। ভাবিনি তো।

সুবর্ণ। তুমি রাতদিন অমন আন্‌মনা থাকো কেন?

বিপাশা। আন্‌মনা আমি হইনে, সুবর্ণ। আমি চাই আমার নতুন ঘর, নতুন সংসারকে আনন্দের গানে মুখর ক'রে রাখ্‌তে, কিন্তু হয় না। আমার সব কিছু থেকে থেকে কেমন বেদনার্ত্ত হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, কোথায় যেন একটা ক্ষত র'য়ে গেছে; যেন বুকের তলায় ছোট একটা কাঁটা রাত্রিদিন অন্তরকে বিষিয়ে তুল্‌তে চায়।

সুবর্ণ। কাঁটা?

বিপাশা। হ্যাঁ, কাঁটা। না—না, কাঁটা নয়, আমার অতীত জীবনের গ্লানি; পঙ্কিল আবিলতা।

সুবর্ণ। তোমার অতীতকে ভুলে যাও, বিপাশা।

বিপাশা। ভুলে যাবো?

সুবর্ণ। হাঁ, যাবে।

বিপাশা। তুমি পারবে আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে আমায় নারীর সম্মান দিতে?

সুবর্ণ। পারবো।

বিপাশা। আমি ছিলেম নটী—পতিতা। সর্ব্বাঙ্গে কলঙ্কের কালিমা।—বারবিলাসিনী পৌরনর্ত্তকী—গণিকা। (ঘৃণার্ত্ত বেদনায় মুখ ঢাকিল।)

সুবর্ণ। তা হোক। তুমি কি ছিলে, তা তো আমার জান্‌বার দরকার নেই বিপাশা। আমার কাছে তুমি দেবী; আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (হাত ধরিয়া) তুমি দিয়েছ আমার জীবন-ভিক্ষা; তুমি রেখেছ আমার প্রাণ—মর্ত্ত্যলোকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ!

বিপাশা। না গো, না। আমি পিশাচী। আমায় চেনো না তুমি। যদি চিন্‌তে, ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌তো। তবু সহ্য ক'রেছি—নীরবে বুক পেতে নিয়েছি সব গ্লানি। চাইনি কোন ঐশ্বর্য্য, চাইনি সুখ! শুধু একটা দিন পৃথিবীতে নারীর মর্য্যাদা পাব ব'লে। আমি হব মা; পাব সন্তান; আমার নারীত্বের হবে পূর্ণ অভিষেক।

সুবর্ণ। নতুন ক'রে চিন্‌বার আর দরকার নেই বিপাশা। সেই পরিচয়েই তোমায় সব চেয়ে বড় পরিচয়।

বিপাশা। (বিহ্বলভাবে সুবর্ণের মুখপানে চাহিয়া রহিল।) সুবর্ণ!

সুবর্ণ। (মন্ত্রমুগ্ধের মত) বিপাশা! দেবী তুমি। মাতৃত্বের অপূর্ব্ব মন্দাকিনী ধারায় আপ্লুত তোমার দেহমন। ছিলে গণিকা, কিন্তু আজ তুমি মহীয়সী নারী।

বিপাশা। তবে তাই ভালো। নতুন ক'রে আর বিপাশাকে জান্‌তে চেয়ো না কোনদিন। যদি পারো তাকে পত্নীর মর্য্যাদা দিতে, জন্মজন্মান্তর ধ'রে সে তার সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দেবে তোমার পায়ে।

সুবর্ণ। তাই দেবো। (বিপাশার স্কন্ধে হাত রাখিয়া) তাই দেবো দেবী। যুদ্ধ শ্রান্ত পুরুষ আমি! বিনিময়ে কোনদিন তার বেশী কিছু চাইবো না।—আচ্ছা, বিপাশা! একটা কথা আমায় ব'লবে?

বিপাশা। কোন কিছুই তো গোপন করিনি, সুবর্ণ।

সুবর্ণ। জানি। তবু একটা কথা!—একটা কথা জান্‌বার কৌতুহল মাঝে মাঝে আমায় চঞ্চল করে। কতবার ভেবেছি, জিজ্ঞেস্‌ ক'রবো। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা পরক্ষণেই মনের মধ্যে মিলিয়ে যায়। আজ ব'লবে?

বিপাশা। কেন ব'লবো না। যার পায়ে সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়েছি, তার কাছে না-বলার কি থাক্‌তে পারে শ্রেষ্ঠী?

সুবর্ণ। তোমার মনের অজান্তে হয় তো আছে!

বিপাশা। যদি থাকে, একদিন না একদিন আপনিই প্রকাশ হবে তোমার কাছে।

সুবর্ণ। কিন্তু, তুমি তো সে কথা ব'ল্‌তে চাও না, বিপাশা!

বিপাশা। (চঞ্চল হইয়া উঠিল।) কি কথা—কি কথা সুবর্ণ? (ক্ষণেক কি ভাবিয়া) আমি ব'ল্‌তে চাই না! না—না; যা ব'ল্‌তে চাই না, তুমি তা জান্‌তে চেয়ো না সুবর্ণ। কি জানি, যদি এই বিশ্বাসের বন্ধন দম্‌কা হাওয়ায় ছিঁড়ে যায়! আমার খেয়া বান্‌চাল হবে। আমি খুঁজে পাব না জীবনের কূল-কিনারা।

সুবর্ণ। সে তোমার অলীক আশঙ্কা বিপাশা।

বিপাশা। (সুবর্ণগুপ্তের হাতখানি চাপিয়া ধরিল) অলীক নয়, সুবর্ণ। আমার অন্তর যেন থেকে থেকে কেঁপে ওঠে; কে যেন কানে কানে ব'লে যায়—বিপাশা, তোর বালির ঘর চৈতালি বাতাসে মিলিয়ে যাবে ওই দূর আকাশে।

সুবর্ণ। ভুল, ভুল দেবী। যদি আকস্মিক ভূমিকম্পে সারা বিশ্ব ওই মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়, পলকে কক্ষচ্যুত হয় চন্দ্র, সূর্য্য, তারা—তবুও তোমার ছবি কোনদিন ম্লান হবে না সুবর্ণগুপ্তের জীবনে।

বিপাশা। থামো, থামো তুমি (অস্থির হইয়া উঠিল)।

সুবর্ণ। ও কি! অমন ক'রছো কেন?

বিপাশা। এমনিই। চলো সুবর্ণ, ওই ঝরণার ধারে কিছুক্ষণ বসি'। না, থাক্‌। তার চেয়ে বরং এইখানেই ব'সো তুমি, এই তমালের ছায়ায়। তোমার কোলে মাথা রেখে আমি বিশ্রাম করি। আমার জীবনের চরম মুহূর্ত্তে তার বেশী তো কামনা করিনি কোনদিন।

সুবর্ণ। কেন?

বিপাশা। সাহস হয় নি। অতখানি পাওনাই কি আমার কম তপস্যা, সুবর্ণ? আমার মত একজন গণিকা পেয়েছে স্বামী, পেয়েছে ঘর;—পাবে সন্তান—নারীর শ্রেষ্ঠ আসন!

সুবর্ণ। মাঝে মাঝে তোমার মাথাটা কেমন বিকৃত হ'য়ে যায়। চলো বিপাশা, বিশ্রাম ক'রবে চলো।

বিপাশা। চলো।

[সুবর্ণ আগে আগে গিয়া তমালের ছায়ায় বসিল, বিপাশা তাহার কোলের কাছে গিয়া বিশ্রামের জন্ত শিথিলভাবে বসিল।]

সুবর্ণ। বিপাশা, এই নির্জ্জন বাস তোমার ভাল লাগে ?

বিপাশা। এই তো চেয়েছিলাম। নদীর ধারে—বনের পারে ছোট্ট একখানি ঘর। দূর বনে বাজ্‌বে রাখাল ছেলের বাঁশী; অঙ্গনে উঠ্‌বে শিশুর কলকোলাহল।

সুবর্ণ। শিশু! আমাদেরই কল্পনার রূপ নিয়ে, যারা পৃথিবীতে আসবে নতুন অতিথি হ'য়ে!

বিপাশা। (সলজ্জভাবে সুবর্ণ গুপ্তের মুখপানে চাহিল।) সুবর্ণ!

সুবর্ণ। (বিপাশার অলক-গুচ্ছ লইয়া খেলা করিতে লাগিল) অতিথি! নতুন অতিথি! অঙ্গনে উঠ্‌বে কলকোলাহল! আধো আধো কথায় অস্পষ্ট ছোঁয়া লেগে দেহমন শিউরে উঠ্‌বে। (বিপাশার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল)—বিপাশা! (নির্নিমেষে মুখপানে চাহিয়া রহিল।)

[নেপথ্যে পথচারী বাউলের গান ও একতারার ধ্বনি।]

বিপাশা। (বেশ সংবৃত করিয়া উঠিয়া বসিল) শোন—শোন! বাউল! ডাকো না একবার!

সুবর্ণ। ডাক্‌তে হবে না; আপনিই আসবে। পথচারী বাউল, ভিক্ষায় বেরিয়েছে।

বিপাশা। আমি দেবো ভিক্ষা।

সুবর্ণ। তা জানি। কিন্তু পথচারী বাউল; বিদেশী বণিক নয়! (বিপাশার চিবুক স্পর্শ করিয়া মৃদু হাসিল।)

বিপাশা। বণিক নয় ব'লেই তো—গান গেয়ে হাত বাড়িয়েছে আমাদের দ্বারে। আমরা চেয়ে আছি নীরবে। বণিক হ'লে অমন গান গেয়ে ভিক্ষে চাইত না। চাঁদের আলোয় শুষ্ক মুখখানি তুলে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাক্‌তো আমার মুখপানে। বিনতা গুন্ গুন্ সুরে গাইতো অভিসারের গান।

(গান গাহিতে গাহিতে সম্মুখের পথ ধরিয়া বাউল চলিয়া গেল)

গান

মিছে মায়ার বাঁধন বাঁধিস্ কেন
কান্না তো না রবে।
(হায়) ভাঙ্‌বে যখন সোনার স্বপন
কি হবে তোর তবে!
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশী
ব'সে খেয়ার ঘাটে,
দিনের শেষে ডুব্‌লো রবি
রাঙা অস্ত পাটে।
দিন যাবে দিন রবে না ভাই, সবই মিছে ভবে;
আজ পোহালে কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে?
তাই থাক্‌তে সময়, পথ খুঁজে নে
যেতেই যখন হবে॥

[সুবর্ণ ও বিপাশা নির্ব্বাক হইয়া বাউলের গান শুনিতেছিল। বাউল সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনমনে গান গাহিয়া পথ অতিবাহন করিয়া চলিল। বাউল চলিয়া গেলে যেন সহসা বিপাশার চমক ভাঙিল]

বিপাশা। কই ডাক্‌লে না! ডাক্‌লে না বাউলকে? (ব্যস্তসমস্ত ভাবে) ডাকো—ডাকো ওকে। আমি ভিক্ষে দেবো। যা চায় সব দেবো।

সুবর্ণ। ঘর বাঁধবে না ব'লে যে পথ ধ'রে গান গেয়ে চলেছে, তার পথে বাধা দিয়ে তো লাভ নেই বিপাশা। শুন্‌লে না?—ও আর ঘরমুখো হবে না।

বিপাশা। (দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে) কিন্তু আমরা বাঁধবো ঘর। ঘর বাঁধবো ব'লেই তো পথের মানুষকে বেঁধে এনেছি ঘরে।

সুবর্ণ। ঘরে যাকে বেঁধে এনেছ, তার জন্যেই তো ঘর ছেড়েছ বিপাশা!

বিপাশা। সে ঘর ছিল আমার খেলাঘর। অতীত জীবনের দুঃস্বপ্ন!

সুবর্ণ। ঠিক বলেছ বিপাশা, দুঃস্বপ্ন! অতীত মাত্রই যেন মানুষের জীবনে দুঃস্বপ্ন। কখনো হয় তো কারও ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে দুএকটী সুখ-স্মৃতি। তাও সাম্‌নের পথে চল্‌তে চল্‌তে কখন কর্পূরের মত বাতাসে মিলিয়ে যায়। (ক্ষণেক কি ভাবিয়া)—কই, বললে না তো?

বিপাশা। কি?

সুবর্ণ। কেমন ক'রে আমার প্রাণ রক্ষা ক'রলে? রাজার সেই কঠোর আদেশ!—মৃত্যুদণ্ড!

বিপাশা। (চমকিয়া উঠিল) না—না। আমি বলতে পারবো না। (সুবর্ণের হাত চাপিয়া ধরিল) আমায় জিজ্ঞেস ক'রো না। জান্‌তে চেয়ো না তুমি।

সুবর্ণ। অমন উতলা হ'চ্ছ কেন, বিপাশা?

বিপাশা। উতলা হবো না? হবো না উতলা?

সুবর্ণ। না।

বিপাশা। শুনে যদি তুমি শিউরে ওঠ! যদি ঘৃণায় পদাঘাত কর বিপাশার বুকে! আমার স্বপ্ন—আমার সাধনা—সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

সুবর্ণ। ছিঃ বিপাশা! আমার ভালবাসাকে তুমি অবিশ্বাস ক'রো না। আমি তো ব'লেছি—তোমার আসন সুবর্ণ গুপ্তের জীবনে চিরদিন অটুট থাকবে।

বিপাশা। আমি গণিকা।

সুবর্ণ। তা হোক।

বিপাশা। আমি বারবিলাসিনী।

সুবর্ণ। তা হোক।

বিপাশা। আমি জীবনে ক'রেছি মহাপাপ!

সুবর্ণ। তবুও তুমি আমার কাছে দেবী। আমায় জীবন দিয়েছ।

বিপাশা। সুবর্ণ, তুমি নিরপরাধ ছিলে। রাণী উৎপললেখার কঙ্কন তুমি তো চুরি কর নি।

সুবর্ণ। তবুও আমারই হতো প্রাণদণ্ড। আত্মীয়হীন—বান্ধবহীন প্রবাসে রাজরোষ থেকে কেউ আমায় রক্ষা ক'রতে পারতো না। তুমি মমতাময়ী নারী, ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত আকাশ থেকে নেমে এসে সেই বিপদের মাঝখানে আমায় বুকে তুলে নিয়েছ। রাজরোষ ক'রতো না বিচার—কে অপরাধী, কে নিরপরাধী!

বিপাশা। প্রকৃত অপরাধী যদি ধরা না পড়তো, যে কোন নিরপরাধেরই হতো প্রাণদণ্ড। (সুবর্ণের পায়ে ধরিয়া) সুবর্ণ, বলো বলো—তুমি আমায় ক্ষমা ক'রবে?

সুবর্ণ। ক'রবো। তোমার শত অপরাধ আমি ক্ষমা ক'রবো।

বিপাশা। আমি—আমি তোমায় ভালবাসি। (তৃষিত দৃষ্টিতে মুখপানে চাহিল।)

সুবর্ণ। জানি। (বিপাশার মস্তকে হাত বুলাইল।)

বিপাশা। আমি—আমি আর এক নিরপরাধ কিশোরের প্রাণ নিয়ে বাঁচিয়েছি তোমার জীবন। তারই বিনিময়ে—

সুবর্ণ। (শিহরিয়া উঠিল) বিপাশা!

বিপাশা। মিথ্যা বলিনি। যাকে পাব ব'লে জীবনে মহাপাপ করতেও দ্বিধা করিনি, তার কাছে সত্য গোপন করবো না, সুবর্ণ।

সুবর্ণ। (উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া) বিপাশা! তুমি নরহত্যা ক'রে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ?

বিপাশা। হাঁ।

সুবর্ণ। (নিজের কণ্ঠ রোধ করবার চেষ্টা করিয়া) প্রাণ! কি

প্রয়োজন ছিল এই প্রাণে! (বিপাশার কণ্ঠে বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া) কেন ক'রলে এ কাজ? আমারই জন্যে করেছ নরহত্যা—মহাপাতক!—বলো, বলো কোন হতভাগ্যের প্রাণের বিনিময়ে বাঁচিয়েছ আমায়?

বিপাশা। সোমনাথ। নিষ্কলঙ্ক—উদার তরুণ! সোমনাথ আমায় ভালবাস্‌তো। কিন্তু আমি অপবিত্র হ'তে দিই নি তার প্রেম? তাই রাজার সম্মুখে আমিই তাকে উপস্থিত ক'রেছিলাম—অপরাধী ব'লে। সে নিরপরাধ। তবু আমার জন্যে অপরাধ স্বীকার ক'রে মাথা পেতে নিয়েছে মৃত্যুদণ্ড।

সুবর্ণ। (অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল) বিপাশা! এ কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ তুমি? একটী নিরপরাধ তরুণের জীবন নিয়ে--

বিপাশা। তুমিও তো নিরপরাধ ছিলে সুবর্ণ।

সুবর্ণ। তা হোক। তবু সেই মৃত্যুই ছিল আমার বরণীয়। তুমি সরে যাও, সরে যাও আমার চোখের সামনে থেকে। আমি আর এক তিলও সইতে পারছি না। তোমার ওই রাক্ষুসী প্রেমের জন্যে দিয়েছ নরবলি! উঃ সোমনাথ!

বিপাশা। নরবলি নয়, সুবর্ণ! এ আমার আত্মবলি দান। তোমায় পাবো ব'লে আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছি মহাপাপ! তিল তিল ক'রে অনন্ত নরক ভোগেও যার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হবে না। আমার এ সাধনা—এ তপস্যাকে পায়ে ঠেলো না।

সুবর্ণ। না—না। আমি পারবো না সে পাপ সইতে। তুমি যাও—এই মুহূর্ত্তে চলে যাও আমার সাম্‌নে থেকে।

বিপাশা। সুবর্ণ! (করুণ নেত্রে মুখপানে চাহিল।)

সুবর্ণ। হাঃ—হা—হা—হা! মায়াবিনী!—পিশাচী!—নরহত্যা! উঃ—

বিপাশা। (সুবর্ণের পা জড়াইয়া ধরিয়া) সুবর্ণ! আমায় ক্ষমা কর। আমায় ভুল বুঝো না। আমি রাজ্য-ঐশ্বর্য্য পাপ-পুণ্য সব তুচ্ছ ক'রেছি—শুধু তোমায় পাবো ব'লে। স্বামী! দেবতা! আমায় ক্ষমা করো।

সুবর্ণ। (সজোরে পা ছিনাইয়া লইয়া পদাঘাত করিল) স্বামী! ভ্রষ্টা—পিশাচী—বারাঙ্গনা, দূর হ'য়ে যা।

(বিপাশা ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল)

বিপাশা। ওঃ, মা। (ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।)

সুবর্ণ। হাঃ—হা—হা—হা! প্রেম! গণিকা—বারবিলাসিনীর প্রেম!

[ঘৃণাভরে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।]

—দীর্ঘ বিরাম—

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিপাশার গৃহ। সজ্জিত কক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিপাশা নৃত্য করিতেছে। পার্শ্বে বীণা বাজাইয়া বিনতা গান গাহিতেছে। সোমনাথের বন্ধু দেবদত্ত, শ্রেষ্ঠী মহানাদের পুত্র অপলক ও দেবদত্তের নূতন বন্ধু লৌলিক সকৌতুকে নৃত্য-গীত উপভোগ করিতেছে ও মাঝে মাঝে সুরা পান করিতেছে। অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার জন্য বিপাশা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেই নৃত্যভঙ্গী যেন আর কোনরূপেই আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। বিপাশার বেশভূষার আর পূর্ব্বের সেই ঐশ্বর্য্য নাই। বিনতা মাঝে মাঝে করুণ দৃষ্টিতে বিপাশার দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইতেছে।

—গান—

আজি চৈত্র বনে
এলো পূবালি হাওয়া—পথভুলে।
তারি নূপুর বাজে শিমুল শাখে,
আঁচল লুটায় ঝরা বকুলে॥
সাঁঝের তারা তারে জানায় নতি,
হোক দেহের দীপে আজি তারি আরতি;
দে নিবিড় বাঁধন—দে কবরী খুলে॥
আমি বনের কুসুম—ফুটি গহন রাতে,
কহি কত না কথা দূর সমীর সাথে;
তারি পরশ লাগে মোর অধর কোণে,
ওঠে হিয়ার কমল সরমে দুলে॥

বিপাশা। আমি আর পারি না।

বিনতা। নৃত্য কি ভুলে গেলে? (বীণা রাখিয়া উঠিয়া আসিল)

বিপাশা। ভুলতে তো পারি নি, বিনতা! কিন্তু দেহ আর শাসন মানে না। আমায় মুক্তি দে—

দেবদত্ত। হয় তো ভুলে গেছেন চরণের ছন্দ, অপলকের মুখপানে চেয়ে।

লৌলিক। (হাসিয়া উঠিল) ওর পানে চেয়ে পলক প'ড়বে না ব'লেই তো পেয়েছে অমন সুন্দর নাম।—অ—প—ল—ক!

বিনতা। সে কথা কি ব'লতে!

বিপাশা। মন আমার থেকে থেকে সবই যেন ভুলে যাচ্ছে বিনতা। তাই দেহ এমন ছন্দছাড়া।

বিনতা। দেহের বেসাতিই যাদের জীবনের সম্বল, তারা ছন্নছাড়া হ'লে ভাগ্য যে চোখ রাঙাবে, বিপাশা!—এসো লৌলিক, (হাত ধরিয়া) প্রিয় বান্ধবীর চরণের তালে তালে ছন্দ মিলিয়ে দেবে, এসো।

লৌলিক। (মদ্যপান করিয়া) সে হ'চ্ছে না, বাবা। কৌলিক প্রথা লঙ্ঘন ক'রে শ্রীমান লৌলিক পায়ে ধ'রতে পারবে না।

বিনতা। পায়ে ধর'বে কেন, বন্ধু! গায়ে বুলিয়ে নেবে বিপাশার আঁচলের পরশ। লোকললামভূতা বিপাশা—তক্ষশিলার কিন্নরী! গায়ে নেবে না তার স্পর্শ?

দেবদত্ত। আর আমি?

বিনতা। সে তো বহুদিনের পুরাণো সম্পর্ক বন্ধু! তুমি আর আমি। বিপাশা আর—

বিপাশা। বিনতা! (নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিল)

দেবদত্ত। সোমনাথের কথা মনে হ'লে, বিপাশার বুঝি আজও কষ্ট হয়? তা আর হবে না? অমন বন্ধু—

বিপাশা। দেবদত্ত!

দেবদত্ত। নীরব হওয়াই ভালো। কিন্তু সোমনাথের পরিবর্ত্তে আজ তো অপলক আছে দেবী। তেমনি লাজুক—তেমনি সুঠাম।

বিপাশা। নিরস্ত হোন্।

লৌলিক। (মত্ত ভাবে) কি ব'ললে, এ—এই—সোমনাথ! সেই ছেলেটা? বাপের অত ধনরত্ন থাকতে রাণী উৎপলার কঙ্কন চুরি। (বিপাশার পানে চাহিয়া) আপনার—আপনার জন্যেই তো ক'রেছিল চুরি।

অপলক। লৌলিক! উন্মাদের মত প্রলাপ ব'কো না।

লৌলিক। না-না। তা ব'লিনি। ছেলেটা পাগল হ'য়ে গেল কিনা,—বিপাশার প্রেমে। মাঝখান থেকে জল্লাদের হাতে গেল পৈতৃক প্রাণ।

বিপাশা। (অস্থির হইয়া উঠিল) বিনতা! ওঁদের বাইরে নিয়ে যাও। যেতে বলো—আজকের মত ফিরিয়ে দাও।

বিনতা। হৃদয় নির্ম্মম না ক'রলে তো নটীর জীবিকা চল্‌বে না, বিপাশা।

বিপাশা। (পালঙ্কে শিথিলভাবে বসিয়া পড়িল। আঁচলে মুখ ঢাকিয়া) আমি চাইনা—চাইনা এমনি ক'রে আমার জীবিকা অর্জ্জন ক'রতে। তার চেয়ে দিনের পর দিন না খেয়ে ম'রবো।

বিনতা। সে কথা তো আজ আর ভাবতে হ'তো না। মিছিমিছি যাবার বেলায় রাজার ভাণ্ডারে বিলিয়ে দিয়ে গেলে তোমার অতুল সম্পদ—রত্ন—অলঙ্কার—সব!

বিপাশা। বেশ ক'রেছি। ঐশ্বর্য্য তো আমি চাই নি।

বিনতা। চেয়েছিলে যা, তা কি হয় কখনও? পাগল! গণিকা পাবে নারীর মর্য্যাদা, হবে গৃহের অঙ্গনা! তাই, তোমার নৈবেদ্যের থালা ভ'রে উঠেছে আজ অপমানের গ্লানিতে।

বিপাশা। ঠিক ব'লেছিস্ বিনতা। আমি বারাঙ্গনা। তার বেশী কোন পরিচয়—কোন প্রাপ্যই নেই আমার। (প্রদীপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল) আমি সাজাবো দেহের বেসাতি। গাইবো আনন্দের গান। (অতিথিদের প্রতি) ফিরিয়ে দেবো না বন্ধু, তোমরাই তো আমার পথের সাথী—জীবনের সম্বল। এই নাও—(করঙ্ক ও তাম্বুলদান হাতে বিলোল নৃত্যভঙ্গীতে অগ্রসর হইল)

মৌলিক। (মদ্যপান করিয়া) বাঃ বাঃ! এই তো চাই। (অপলকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া) দেখছো কি, অপলক? মর্ত্ত্যের উর্ব্বশী এই বিপাশার পায়ে স্বয়ং মহারাজাধিরাজ তক্ষশিলাধিপতিও আত্মদান ক'রে কৃতার্থ হ'য়েছেন। তুমি ভাগ্যবান বন্ধু! তাই জীবনে এসেছে সুবর্ণ সুযোগ।

দেবদত্ত। কিন্তু দেবী বিনতার আজ এত কৃপণতা কেন?

অপলক। দাতা কখনও কৃপণ হয় না দেবদত্ত।

মৌলিক। আরে বাঃ—বাঃ ভাই। এই তো মুখ ফুটেছে। আমি ভেবেছিলাম বন্ধুবর ক্ষপণক বুঝি আজ বিবরক হ'য়ে যান। অবশ্য—

দেবদত্ত। ক্ষপণক কি?

মৌলিক। ওঃ, হাঁ—হাঁ। করটক—না, না—শরটক—বরণক; ওই রকম কি যেন একটা—পিঙ্গলক কিংবা সঞ্জীবক।

দেবদত্ত। তোমার মস্তক।

মৌলিক। মস্তক? না—নাঃ মস্তক নয়। নাসা—কর্ণ—উঁহুঁ! চক্ষু—নয়ন! ঠিক-ঠিক—পলক!—অ—প—ল—ক। বা-বাঃ! (মদ্য পান করিল)

বিনতা। থামো, মৌলিক।

অপলক। আপনারা উন্মত্তের কথায় কর্ণপাত করবেন না। তার চেয়ে বরং সঙ্গীতে মনোনিবেশ করুন।

বিনতা বীণা লইয়া বসিল। যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে বিপাশা অপরূপ নৃত্যে আত্মনিবেশ করিল। ধীরে ধীরে নৃত্য সৌন্দর্য্য ও সৌকর্য্যের চরম সীমায় উত্থিত হইল। অতিথিরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার নৃত্য দেখিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পর, সকলের অলক্ষ্যে সুবর্ণগুপ্ত বিপাশার পরিত্যক্ত একটি নূপুর ও একখানি বসন বুকে করিয়া গৃহকোণে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা রুক্ষ ও চোখে উদাস দৃষ্টি। নৃত্য শেষ হইবার পূর্ব্বে আচম্বিতে সুবর্ণের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিপাশা শিহরিয়া উঠিল। তাহার হাত হইতে করঙ্কপাত্র সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। মনে হইল, সে বুঝি সংজ্ঞা হারাইতেছে। অপরিচিত সুবর্ণকে দেখিয়া সকলে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

সুবর্ণ। বিপাশা।

বিপাশা। না,—না। (চোখ ঢাকিল)

সুবর্ণ। আমায় ক্ষমা কর। ফিরে চল তোমার গৃহে—

বিপাশা। আর হয় না, হয়না সুবর্ণ। বিনতা—(মনে হইল, পড়িয়া যাইবে)

বিনতা। (তাড়াতাড়ি বিপাশাকে ধরিয়া ফেলিল) কি হ'লো? কি হ'লো বিপাশা?

বিপাশা। আমি পারবো না। ভ্রষ্টা—বারাঙ্গনা—

সুবর্ণ। সব দোষ ক্ষমা ক'রো বিপাশা! আমি ভুল ক'রেছি। তুমি দেবী—আমার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী।

অপলক। বেশ! এ পারে সুবর্ণ, ওপারে সোমনাথ অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে!

বিপাশা। (বিনতাকে আশ্রয় করিয়া তাহার স্কন্ধে মস্তক লুটাইল) আমায় পথ ব'লে দে—পথ ব'লে দে বিনতা।

বিনতা। সব পথ তো আপন হাতেই রুদ্ধ ক'রেছ বিপাশা।

বিপাশা। নেই!—পথ নেই আমার?

[সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে দেবী কৃপালীর প্রবেশ]

কৃপালী। পথ কখনো রুদ্ধ হয় না, দেবী!

বিপাশা। কে? দেবী! দেবী কৃপালী? একি সৌভাগ্য আমার।

[বিনতার কণ্ঠ ছাড়িয়া কৃপালীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল]

কৃপালী। চলো, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দেবো, বান্ধবী! (দুই হাত ধরিয়া তুলিলেন)

এসো। বলো—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি॥
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি॥।

বিপাশা। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—

[দেবী কৃপালী ও তাঁহার পিছু পিছু বিপাশা কক্ষ ত্যাগ করিলেন সকলে বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিল]

সমাপ্ত

যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি…

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

নয়নে দাও হে প্রভু দাও হে আলো
ঘুচে যাক্ দৃষ্টি হ'তে সকল কালো।
রবে না ভেদ রবে না আপন পরে
তোমারে দেখব সখা ঘরে ঘরে।
হৃদয়ে এই প্রণয়ের আলোক জ্বালো।
নয়নে দাও হে প্রভু দাও হে আলো॥

আমার এই বুকের মাঝে লুকিয়ে আছে
সবাকার সকল হিয়া প্রাণের কাছে।
ধরণীর মৃত্যুশোকের মোহের পরে
চিরদিন এই মিলনের সুধা ঝরে।
হৃদয়ে এই প্রণয়ের আলোক জ্বালো—
নয়নে দাও হে প্রভু দাও হে আলো॥

অত্যাচার

শ্রীসতী দেবী

পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর এক সহরে বিরাট কারখানা। দুই হাজার শ্রমিক সেখানে কাজ করিয়া নিজেদের অন্নসংস্থান করে।

একদিন সকালে কারখানার চতুর্দ্দিকের কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে শঙ্কিত চরণে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়ায় এক অতি দরিদ্র রমণী—সঙ্গে তাহার ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত জীর্ণ শীর্ণ এক বালক।

সসঙ্কোচে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সে একটী মজুরের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আফিস ঘর কোনদিকে আমাকে দেখিয়ে দেবে?"

মজুর আঙুল তুলিয়া দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে আফিস ঘর, ম্যানেজার সাহেব ঘরেই আছেন।"

রমণী পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কম্পিত পদে আফিস ঘরে প্রবেশ করিল।

ম্যানেজার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া খাতায় কি লিখিতে-ছিলেন, তাহাদের দেখিয়া একটু বিরক্তভাবে বলিলেন, "কে তুই, কি চাস্ এখানে?"

রমণী কাতরকণ্ঠে বলিল, "হুজুর, আমরা বড় গরীব। তাই আপনার কাছে চাকরীর জন্যে এসেছি। আমাকে দয়া কোরে একটা কাজ দিন। চাকরী না পেলে খেতে পাবো না, হুজুর।"

কলমের ডগা দাঁতে চাপিয়া এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোকে কারখানায় ভর্ত্তি কোরে নেওয়া হবে। কাল সকালেই আসিস। যা এখন, হ্যাঁ কি নাম তোর?"

"আমাকে সকলে নাথথুর মা বলে ডাকে হুজুর।"

কাজ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পাইয়াও সে যায় না। ম্যানেজার মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আবার কি?"

"হুজুর যখন দয়া কোরে আমাকে কাজ দিলেন, তখন আমার বাচ্চাকেও একটা কাজ দিন।"

তাহার কথায় ম্যানেজার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তোর এ রুগ্ন ছেলে কি কাজ কোরবে? সেরে গেলে নিয়ে আসিস্ তখন ওকে কাজ দোব।"

তবু সে আবেদন জানায়, "হুজুর মালিক, দয়া কোরে ওকে কাজ দিন, আমরা বড় গরীব…"

তাহার কাকুতি শুনিয়া ম্যানেজারের দয়া হইল, বলিলেন, "ভর্ত্তি হোয়ে ও যদি ঠিক মত কাজ করতে না আসে?"

ম্যানেজারের কথায় আশ্বস্ত হইয়া রমণী বলিল, "আমি ওকে রোজ সাথে কোরে নিয়ে আসবো।"

ম্যানেজার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা কাল সকালে ওকেও নিয়ে আসবি।"

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রমণী বিদায় নেয়। ম্যানেজার দয়া করিয়া নাথথুকে হাল্কা কাজ দিলেন।

* * * *

ছয়মাস কাটিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া নাথথু এখন সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে দেখিলে আর পূর্ব্বের ম্যালেরিয়ায় শীর্ণ নাথথুকে চেনা যায় না। কাজ পূর্ব্বের মতই করে।

একদিন বিকালে ম্যানেজার নাথথুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একটী মজুর আসিয়া জানাইল, নাথথু আজ কাজে আসে নাই। ম্যানেজার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে তার? আচ্ছা, ডাক্ তার মাকে।"

নাথথুর মা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

"এই, তোর ছেলে আজ কাজে আসেনি কেন?"

"তার বড় জ্বর, তাই সে আসেনি কারখানায়।"

"শোন নাথথুর মা, কারখানায় এখন কাজ বেড়েছে, তাই বাইরে থেকে লোক নেওয়া হচ্ছে, তোর ছেলেকেও কাজে নেওয়া হবে। ও যেন কাল আমার সঙ্গে দেখা করে, বুঝলি ভুলিস নে যেন।"

"না হুজুর ভুলবো না, কাল ঠিক সাথে কোরে নিয়ে আসবো।"

পরদিন কিন্তু নাথথু আসে না। ম্যানেজার বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে বলিলেন, "এ কি রকম ব্যাপার তার, যখন সে রুগ্ন ছিল তখন দরকার না থাকলেও দয়া কোরে তাকে কাজ দিয়েছিলুম, আর এখন কাজের সময়, তার দেখা নেই, এর মানে কি? তোরা কি ভেবেছিস?"

"হুজুর নাথথু আজকাল আমার কথা শোনে না। আজ সকালে কাজে আসবার জন্যে কত কোরে বললুম, কিছুতেই শুনলেনা, ঝগড়া কোরে বাড়ী থেকে চলে গেল।"

"তোরা দুটোই সমান পাজী, আমারই ভুল হয়েছিল তখন তোদের কাজে ভর্ত্তি করা। সব দূর কোরে দোব।"

নাথথুর মা কাতর কণ্ঠে বলিল, "আমার কি দোষ হুজুর? ও আমার কথা আজ কাল শোনে না। হুজুর মালেক, দয়া কোরে জবাব দেবেন না। বড় গরীব আমি হুজুর।"

"আচ্ছা যা তোর নিজের কাজে। তবে নাথথুর জবাব আজ থেকেই হয়ে গেল বলে দিস্ ওকে?"

* * * *

বিকাল বেলায় কারখানার ছুটির পর ম্যানেজার গাড়ীতে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিলেন, হঠাৎ দূরে নাথথুকে দেখিতে পাইলেন।

ড্রাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুতপদে নিকটে গিয়া দেখিলেন—নাথথু ও কয়েকটী ছেলে জুয়া খেলিতেছে।

দেখিয়াই সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলিয়া উঠিল। ঠাস্ করিয়া সজোরে গালে এক চড় বসাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"কাজে না গিয়ে এই হচ্ছে? যখন খেতে না পেয়ে রুগ্ন হয়ে ছিলি তখন দয়া কোরে কাজ দিয়েছিলুম, তার ফল এই? বেইমান—বদমাস…"

ঘা কতক তাহাকে দিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

চারিদিকে ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। সকলে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়াছিল। এবার সকলে সমবেদনা জানাইতে লাগিল, উঃ কি মারটাই না মারলে ঐ কচি ছেলেকে। কোন দোষ করেনি, শুধু শুধু এসে মার!

কয়েকদিন পরে খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে সংবাদ বাহির হইল—

…কারখানার ম্যানেজারের অমানুষিক অত্যাচার। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেদিনীপুরের কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

বন্যা ও বাত্যা-পীড়িত ২৪পরগণা ও মেদিনীপুরের মর্ম্মন্তুদ চিত্র জনগণের অন্তর হইতে বিলুপ্ত প্রায়। আজ যেদিকে দৃষ্টি পড়ে—শুধু রোগ-শোক-জরা-ব্যাধি, হাহাকার, আর্ত্তনাদ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব। এই দুঃখের দিনে কে কাহাকে রক্ষা করে, কে কাহাকে বাঁচায়? সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। এই কথা সত্য—নিঃসন্দেহ; কিন্তু তথাপি বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে মেদিনীপুরের সমস্যা স্বতন্ত্র।

গত ২৮শে আশ্বিনের প্রবল ঝড় ও বন্যার পর আজ প্রায় ছয়টী মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহারা, বিষয়-সম্পত্তি বঞ্চিত, আত্মীয় বিয়োগ-বেদনা-কাতর লক্ষ লক্ষ নরনারী, বালবৃদ্ধ কি ঘোরতর অবস্থা বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া, কি কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া এই সুদুস্তর কাল-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতেছে—দেশের কয়জন ব্যক্তি নিঃস্বজনগণের জন্যই বিশেষ উদ্বেগ ছিল। মহাকালের রুদ্র শাসন-দণ্ডে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভেদ-বিসম্বাদ আজ সমীকৃত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ—এক সময়ে যাহারা খুবই সঙ্গতিপন্ন বলিয়া খ্যাত ছিল—ঘরবাড়ী ভাসিয়া যাওয়ায় এবং শস্যাদি বিনষ্ট হওয়ায় গৃহ-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া খাইয়া আজ তাহারাও নিঃস্ব জনগণের সমপর্য্যায়ে উপনীত। ভারত সেবাশ্রমসঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক, মেদিনীপুরে সঙ্ঘের সেবাকার্য্যের প্রধান পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক স্বামী যোগানন্দজী সম্প্রতি কলিকাতা আসিয়া স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন—উহা অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ। তাঁহার রিপোর্টে প্রকাশ—উক্ত অঞ্চলের শতকরা ৯০জনেরও অধিক ব্যক্তির সম্মুখে আজ অন্ন-সমস্যা উদগ্র। চাউল দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল ও ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—চাউল, কাপড় ও মাদুর বিতরণ—গেঁওখালি কেন্দ্র

উহার খোঁজ রাখিল? ভগ্ন গৃহের উন্মুক্ত ভূখণ্ডের উপর ক্ষুদ্রাকার ছাপ্পর বাঁধিয়া সন্তান-সন্ততিসহ নগ্নদেহে সারাটী শীতকাল কাটিয়া গেল। কুয়াসা-জাল ছিন্ন করিয়া বর্ষার ঘনঘটা মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে, আজিও অধিকাংশ গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই।

জনসাধারণের ধারণা—এত দীর্ঘকাল গভর্ণমেণ্ট ও বিভিন্ন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সেবা যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থার ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে। এইরূপ মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু কার্য্যতঃ উহা ভিন্নরূপ। বিপন্ন জনসাধারণ কোন প্রকারে বাঁচিয়া আছে বটে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থার কোন স্থায়ী উন্নতি হয় নাই। সমস্যা সর্ব্বত্র সমান হইলেও এতদিন পর্য্যন্ত নিতান্ত দরিদ্র ও অল্প পরিমাণ চাউল প্রচুর জলে সিদ্ধ করিয়া কচুশাক বা শাকসব্জী সহযোগে সফেন উহাই খাইয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি জীবন-ধারণ করিতেছে। উক্ত অঞ্চলে স্বামীজী নিশাযোগে অনুসন্ধান করিয়া এমন একটী গৃহস্থও দেখেন নাই যেখানে অগ্নিক্রিয়া অব্যাহত—যাহাদের ঘরে ক্ষেত্রজাত কিছু কিছু খেসারী ডাল সঞ্চিত তাহারা উহাই ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া কোন প্রকারে জলযোগ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ ডাউলের আয়ুষ্কালই বা কয়দিন? দীর্ঘকাল সেবাকার্য্য পরিচালন করিয়া স্বামীজী যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন উহাতে তিনি বলেন যে—যে সকল মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগকে এতদিন পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয় নাই অবিলম্বে তাহাদের একটা উপযুক্ত বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট

হইতে গৃহনির্ম্মাণ ও ভরণপোষণের জন্য বহু পরিবারকে কিছু কিছু ঋণ দেওয়া হইয়াছে, কৃষিঋণেরও ব্যাপক ব্যবস্থা ও বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে; টেষ্ট, রিলিফ স্বরূপ ভগ্ন বাঁধের সংস্কার কার্য্যে সহস্র সহস্র নিরন্ন প্রতিপালিত হইতেছে, ঘরে ঘরে লবণ তৈয়ারীও বিক্রয়ে কোন বাধা নাই। সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্গতজনগণের জীবন-রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন—ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া নানা উপায়ে বিভিন্ন ধারায় কায চলিতেছে। কিন্তু মানুষের অভাব অত্যন্ত—ঋণ-লব্ধ সামান্য অর্থে কয়দিনই বা চলিতে পারে। বাঁধের কার্য্য সমাপ্ত প্রায়। ব্যাপক লবণ তৈয়ারী কার্য্যে প্রধান সমস্যা-কড়া। লক্ষ লক্ষ লৌহ কড়া কোথা হইতে মিলিবে? তারপর বর্ষার প্রারম্ভে ভূমির উপরিভাগের লবণ-ময় শুষ্ক স্তরটী ধুইয়া গেলে এই আয়ের পথটীও রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব অন্য কার্য্যের ব্যবস্থা না করিলে পুনঃ তাহারা বেকার হইয়া পড়িবে।

অনেকের আশা—আগামী বৎসর ধান্য প্রচুর উৎপন্ন হইবে। বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি লবণাক্ত ভূমির উর্ব্বরা শক্তির উপর সন্দিহান। বৈজ্ঞানিক মতে যেটাই সত্য হউক না কেন, সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন এই যে চাষের গরু ও বীজধান্য কোথা? এই সম্পর্কে সরকার পক্ষ জনসাধারণকে যথেষ্ট আশ্বাস ও ভরসা দিয়াছেন। কিছু কিছু কায্যও বর্ত্তমানে আরম্ভ হইয়াছে।

মধ্য দিয়া চিরকাল এই অনুভূতিটাই লাভ হইয়াছে। কিন্তু মেদিনীপুরের ব্যাপার ভিন্নরূপ। এখানে সহস্র সহস্র মণ তণ্ডুল বিতরণ কর—কিন্তু একবিন্দুও পানীয় জল নাই। সরকার কর্ত্তৃক যে কয়টী নলকূপ খনন করা হইয়াছে প্রায় উহাই সম্বল। কলিকাতার মেয়র ফাণ্ড হইতে বিধ্বস্ত অঞ্চলের দূষিত জলাশয়গুলির সংস্কার কার্য্য বর্ত্তমানে আরম্ভ হইয়াছে। পানীয় জলের সংস্থান যদিও বা করা যায় তথাপি শিশুকণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদ প্রশমিত হইবে না; প্রচুর গোদুগ্ধ আমদানী কর—কিন্তু বাসস্থান কোথা? গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হউক—লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা কই? বস্ত্রাভাব যদিও বা দূরীভূত হয়—তথাপি ব্যাধিতে উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা কোথা? তারপর কৃষি-সমস্যা, শিল্পসমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা—সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গ-মালার সঙ্গে সঙ্গে এমনি পর্ব্বতপ্রমাণ সমস্যা স্তূপীকৃত হইয়াছে। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে প্রয়োজনের তুলনায় কয়টী মুদ্রাই বা দান করা হইয়াছে? তবে সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি এতদিন যাবৎ কি করিল? সেবাব্রতী কর্ম্মীবৃন্দ একটামাত্র কার্য্য করিয়াছেন—মুমূর্ষু রোগীকে মৃগনাভি প্রয়োগ করিয়া যেভাবে কোন প্রকারে চাঙ্গা করিয়া রাখা হয়, তাঁহারা প্রায় সেই প্রকারে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত নরনারীকে এক-বেলা সামান্য নুন-ভাত দিয়া অতি কষ্টে মৃত্যুর কবল হইতে জীয়াইয়া

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—দাতব্য চিকিৎসালয়—ছোড়খালি কেন্দ্র

জনসাধারণ চাহেন—এতদিন পর্য্যন্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কি ভাবে কার্য্য করিয়াছেন সেই কথাটী অবগত হইতে, কেননা এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের হস্তে তাহারা সহস্র সহস্র অর্থ দান করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ ছয়টী মাস যাবৎ সেবাকার্য্য পরিচালন করিয়া সহস্র সহস্র হতভাগ্যদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যে মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছে আজ পর্য্যন্ত যত দুর্ভিক্ষ বন্যা-মহামারিতে আমরা সেবা-কার্য্য করিয়াছি কোথাও সেইরূপ হয় নাই। দীন-দুঃখী আর্ত্তের সেবার মধ্যে আছে সুমহান আত্ম-তৃপ্তি, ব্যথিতের অশ্রু-বিমোচনে আছে আত্মানুভূতির পরম সন্ধান, মানুষের কল্যাণ চিন্তা ও হিতকার্য্যের মধ্যে আছে স্বীয় জীবনে শান্তি ও আনন্দের অমিয় নির্ঝর। রিলিফ, ওয়ার্কের

রাখিয়াছেন। কিন্তু উহাদের মধ্যে কোন জীবনীশক্তির স্পন্দন অনুভূত হয় না বলিলেই হয়। শুধু কতকগুলি জীর্ণ কঙ্কাল অবশিষ্ট আছে মাত্র। সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি অন্ন ও বস্ত্র-সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধানে সমর্থ নহেন—উহাদের লক্ষ্য যাহাতে মানুষগুলি একেবারে না মরিয়া যায় সাময়িক সাহায্য দিয়া শুধু সেইটুকুই তত্ত্বাবধান করা। তাই এক সের চাউল বিতরণের সময় পুনঃ পুনঃ তাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন—কোন লোকটী সর্ব্বাপেক্ষা অভাবগ্রস্ত। এক খণ্ড বস্ত্রদানের সময় বিচার করিয়া দেখিয়াছেন—কাহার প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থের দ্বারা এতদিন এইরূপ কঠোর নীতির মধ্য দিয়া কার্য্য করিয়াও

বর্ত্তমানে আমরা নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছি। সেখানকার অভাবের ব্যাপকতা ইহা হইতেই স্পষ্ট অনুভূত হইবে।

সেবাকেন্দ্রে বসিয়া বসিয়া কর্ম্মিগণ আর একটী বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন—তাঁহারা সহস্র সহস্র অস্থি-চর্ম্মসার, বুভুক্ষু নরনারীর করুণা-মাখা, বিবর্ণ মুখ-মণ্ডল দিনের পর দিন নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখে-বেদনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছেন। তৃষ্ণার্ত্ত শিশুকণ্ঠের করুণ ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের অন্তরে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিয়াছে। শত শত জননী ভগিনীর নগ্নদশা প্রত্যক্ষ করিয়া অধো-দৃষ্টিতে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন—এক চামচে মাত্র জমানো দুধের জন্য ৫।৬ মাইল দূর হইতে ঘরের নবীনা বধূটী পর্য্যন্ত সদ্যোজাত শিশু কোলে করিয়া সেবাকেন্দ্রে ছুটিয়া আসিয়াছে—"বাবা, আমার বাছাকে রক্ষা কর। তোমরা আমাদের ধর্ম্মের বাপ!"—দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই। সারাটী দিন উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে বিরাট জনস্রোত অবিশ্রান্ত পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত এই অবস্থা—আবেদন, নিবেদন, কাতরোক্তি, শেষ পর্য্যন্ত পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠন—শুধু এক মুষ্টি চাউল বা একটি পুরাতন বস্ত্রের জন্য। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান-গুলি স্ব স্ব অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা যতদূর পারিয়াছেন—অন্নবস্ত্র, ঔষধ-পথ্যাদি দিয়া সাহায্য করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটী করেন নাই। কিন্তু স্ব স্ব শক্তি সামর্থ্যের বাহিরে যে সমস্যা ও আবেদন, অন্তরকে বাধ্য হইয়া সেখানে পাষাণ করিতে হইয়াছে। সেবাব্রতী কর্ম্মিগণের পক্ষে বোধহয় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। এমনি অবস্থার মধ্য দিয়া ছয়টী মাস কাটিয়াছে। সম্মুখে অন্ততঃ আরো দীর্ঘ ছয়টী মাস অবশিষ্ট। আগামী ফসল উঠা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। জনসাধারণের নিকট হইতে আমরা যে আর্থিক সাহায্য পাইয়াছিলাম উহা প্রায় নিঃশেষিত। বর্ত্তমানে আর কোন সাহায্য আমরা পাইতেছি না; অথচ প্রার্থীর সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেমন করিয়া এই বিপন্ন নরনারীদিগের প্রাণ রক্ষা করিব, কোন যুক্তি দিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিব—আজ সেই চিন্তাতেই অন্তর উদ্বেলিত। ক্ষুধাতে কোন যুক্তি মানে না, মৌখিক স্তোকবাক্যে তাহাকে ভুলানো যায় না, কোন নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বাঁধাও তাহাকে অসম্ভব। সে চায়—খাদ্য; সে চায়—পানীয়। উহা আজ কোথা হইতে আসিবে?

বন্যার প্রায় এক মাস পর দেশব্যাপী যখন বিরাট আন্দোলন—সেই উত্তেজনার মুহূর্ত্তে জনসাধারণের প্রত্যেকেই প্রায় কিছু না কিছু কর্ত্তব্য করিয়াছেন—ইহা সত্য। তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন ভ্রাতা-ভগ্নীর জীবন রক্ষার জন্য এই নিদারুণ অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনেও দেশবাসী যে মহত্ত্ব, যে প্রেম, যে ত্যাগ, যে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন—উহার তুলনা নাই। দীন-দুঃখী আর্ত্তগণের প্রাণ ঢালা আশীর্ব্বাদে জীবনের সকল দিক উন্নতি অভ্যুদয় ঋদ্ধি-সিদ্ধিতে ভরপুর হইয়া উঠুক! কিন্তু একদিন দান করিয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না—যতদিন না স্থানীয় অবস্থার উন্নতি হয়, যতদিন লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগ্নী উদরপূর্ত্তি করিয়া খাইতে না পায় ততদিন আমরা কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সুরম্য হর্ম্ম্যে অবস্থানপূর্ব্বক আরামে ভোগ্য পদার্থ গ্রহণ করিব? এই আত্মীয়তা ও সমবেদনা বোধ যদি সর্ব্বদা দেশবাসীগণের অন্তরে জাগরূক না থাকে, যদি সকলে মিলিয়া এই বিরাট কার্য্যের পূর্ব্বাপর দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, তবে কোন সেবা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা নাই যে এই ব্যাপক ও ব্যয়সাধ্য কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারে। দেশের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাণ ও অবলম্বন। দেশের অর্থ-নৈতিক দিক বিবেচনা করিলে অধিকাংশ গৃহস্থেরই আজ সামর্থ্য কমিয়া গিয়াছে। উহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনো দেশে শত শত সমর্থ ব্যক্তি, রাজা, জমিদার, ধনী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি আছেন যাঁহারা সহস্র সহস্র টাকা অবলীলাক্রমে দান করিতে পারেন।

গত নভেম্বর মাস হইতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম থানার গেঁওখালি, ছোড়খালি, দুর্গাচক, সুন্দিতে, ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ থানার শিবকালীনগরে এবং বালেশ্বর (উড়িষ্যা) জেলার জলেশ্বর থানার নেম্পোতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রায় ১৪৪ খানি গ্রামের বার সহস্র নরনারী শিশুর মধ্যে নিয়মিত সাহায্যদান করিয়া আসিতেছে। চাউল, ডাউল, কাপড়, কম্বল, হেসিয়ান, মাদুর, জমানো দুগ্ধ প্রভৃতি প্রতি সপ্তাহে বিতরিত হইতেছে। সেবাকার্য্যের শৃঙ্খলা বিধানের জন্য প্রত্যেক সাহায্যার্থীর নামে একখানি করিয়া টিকিট বিলি করা হইয়াছে। সপ্তাহে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে উক্ত টিকিটসহ সেবাকেন্দ্রে উপস্থিত হইলেই প্রার্থীগণকে এক সপ্তাহের উপযোগী চাউল ও অনুমোদিত দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। পাঁচজন অভিজ্ঞ ডাক্তার সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ছয় মাসে সঙ্ঘ প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন। আরো অন্যূন দুই লক্ষাধিক টাকা পাইলে সঙ্ঘ স্বীয় নির্দ্দিষ্ট এলাকায় আগামী ফসল পর্য্যন্ত এই কার্য্য পরিচালন করিতে পারেন। মেদিনীপুরের বর্ত্তমান সমস্যা প্রধানতঃ অন্ন-বস্ত্র, বাসগৃহ, স্ব স্ব বর্ণগত ও বংশগত বৃত্তির মূলধন, চাষের গরু ও বীজ ধান্য, শিশুগণের জন্য গোদুগ্ধ ও ঔষধ-পথ্যাদির অভাব ইত্যাদি। গভর্ণমেণ্ট, জনসাধারণ ও বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা, অর্থ-সামর্থ্য, বুদ্ধি-পরামর্শ ও কর্ম্মশক্তি যদি একত্রিত হয় তবে বিপন্ন জনগণের দুঃখের অনেকটা লাঘব হইতে পারে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কেমনে ফিরাব মোরে?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

আমিও যে বুকে পুষে রাখিয়াছি আশা!
আমারও কি সম্বল কান্না শুধু হবে?
ভালোবাসিয়াছি আমি প্রিয় এই ভবে!
তুমি কি বলিতে চাও, মিছে ভালোবাসা?
মনে কর, করিয়াছি আমি মহাভুল!
তা-ই হবে—মহাভুল, এখন উপায়?

আলো তবু লাগে ভালো সোনালী উষায়!
ভালোবাসি হাসি, গান—ভালোবাসি ফুল!
কেমনে ফিরাব মোরে? চাই না ফিরিতে!
ব্যথা পাই—দুঃখ নাই, তবু ভালোবাসি;
উপেক্ষা পেয়েছি জেনে তবু কেন আসি?
লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই—বলিবে এ-চিতে?

এ জীবন বৃথা হ'ল? তাই মোর ভালো!
বিরহ দেখায় মোরে মিলনের আলো।

কেন ?

শ্রীসিতাংশুকুমার দাশগুপ্ত এম্-এ

বিমলকুমার খেতে খেতে সহসা দুহাতে চোখ বুজে আচ্ছন্নের মত বসে রইল। স্থান—সোরাবজীর হোটেল। কাল—সন্ধ্যারাত্রি উত্তীর্ণ। দু'একজন যারা পানীয়ের অপেক্ষায় বসেছিল তারা আশ্চর্য্য হয়ে এ ওর দিকে তাকালো—আর বেয়ারাটা হঠাৎ থমকে একবার দেখেই তার মনিবকে ছুটে গিয়ে খবর দিলে।

অকস্মাৎ আলোকোজ্জ্বল ভোজনশালায় মুহ্যমান হওয়াটা বিচিত্র বই কি। কিন্তু মানুষের আভ্যন্তরিক কলকব্জা সে আরও বিচিত্র! এই বিমলকেই আজ তিনঘণ্টাধরে ঢাকা এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখা গিয়েছিল—ঠায় দাঁড়িয়ে নয়। কখনও প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারী করতে, কখনও ওয়েটিং রুমের আরাম কেদারায় চুপ করে বসে থাক্‌তে। সে কথা বলেছে টিকিট কলেক্‌টর ও কুলীর সঙ্গে। খেয়েছে প্যাকেট দেড়েক কড়া সিগারেট! এই আচ্ছন্নতা কড়া সিগারেট খাবার ফল হতে পারে, তিনঘণ্টায় পনেরটা সিগারেট ধ্বংস—বারো মিনিটে একটি! কিন্তু যে ওকে জানে সেই বল্‌বে কি রকম পাকা ধূমপায়ী সে! ষোল বছরের অভ্যাস এটা! তবু কেন সে মুহ্যমান হলো?

ঢাকা এক্‌স্‌প্রেস পৌঁছবার কথা পাঁচটায়, সাড়ে সাতটায় গোটা-পাঁচেক মিলিটারী স্পেশ্যাল পার করে সে ছুটে এল। বিমলকে দেখা গেছে গাড়ীর এমাথা থেকে ওমাথা অবধি নিঃশব্দে ঘুরতে। দুবার ঘোরার পরে মুখে ফুটেছিল এক হতাশাব্যঞ্জক ছবি। কারো প্রতীক্ষায় সে ছিল। হয়তো প্রতীক্ষিতজনের জন্য উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা সে মুখে এতটা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল যে, সে আর কোথাও যায়নি, সটান সোরাবজীতে এসে ঢুকেছে।

স্ত্রী প্রতিমা, বলেছিল সিনেমা দেখতে যাবার জন্য। কিন্তু যাওয়া হয়নি। কেননা এই ট্রেনেই তার বন্ধু আস্‌ছে।

প্রতিমা একটু রাগ করতে পারে, ছবিটা দুজনে দেখবে বলে এই দিনটি সে চিহ্নিত করে রেখেছিল। জীবনের অনেকদিনের যে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র তাচ্ছিল্যভাব বাষ্পকণার মত হাওয়ায় মিশেছিল একটি দিনের কথা না রাখায় তাই আজ হয়ত প্রতিমার কাছে সঘন মেঘপুঞ্জ হয়ে দেখা দিতে পারে—কূলপ্লাবী বর্ষণের ভূমিকায়। তা হোক তবু ওটা জীবনের মধ্যে এমন কিছু গুরুতর নয়, যার জন্য আজ দশজনের মধ্যে সে এমনিতর মুহ্যমান হবে! বর্ষণ হলে মেঘও হাল্‌কা হয়ে যায়!

আর এটা ত বিমলকুমার জেনেশুনে বিচার করেই এসেছে। তবে এক হতে পারে ঢাকা এক্সপ্রেস ছেড়ে যাবার পর সে হয়তো ভাবলে পত্নীর অনুরোধও রাখলুম না, বন্ধুও এলো না। এতটা ত্যাগ স্বীকার করে এতটা আশা করে থাকার পর বন্ধুর না আসাটা সত্যিই দুঃখের। কিন্তু তাওতো এমন কিছু নয়। বন্ধু কাল এলেও চলে, পরশু হলেও চলে, এমন কি না এলেও দিন চলতে থাক্‌বে। অকস্মাৎ খেতে খেতে এ প্রকার মনোভঙ্গের কারণ এটা হতেই পারেনা—অন্ততঃ সে রকম মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক বিমল নয়। ওর যেমন সুস্থ দেহ তেমনি সবল মন।

অবশ্য গাড়ী যে এতটা লেট্ হবে তা সে জানত না; এমন কি, ওই টিকিট কালেকটরটিও জানত না। স্পেশালের অত খবর কে রাখে! তাই এই আসে এই আসে করে এক প্রতীক্ষা মনের মধ্যে জেগে থাকে। এতে স্নায়ু অনেকখানি উত্তেজিত হয়। রাগও হয়, অবসাদও আসে। আর এই অবসাদ দূর করতেই ত সে চা পান করে চাঙ্গা হতে সোরাবজীতে গিয়ে ঢুকেছে।

চা-পান করতে করতে সে একবার ভাবলে জীবনের তিনটি ঘণ্টা ত বেমালুম বৃথা উড়ে গেল। নিছক অপচয়। স্বল্পায়ু জীবনের সঞ্চয় হতে তিনশ আশীটি মিনিট এই যে নিরুদ্দেশ খসে পড়ল এই দুঃখটা দার্শনিক হলেও, ক্লেশদায়ক! তবে আমাদের বিমলকুমার তত দার্শনিক নয়। এমন কত তিনঘণ্টা তার স্খলিত হয়ে গেছে তার জন্য কে দুঃখ করে! তবে আর কি কারণ থাক্‌তে পারে?

সোরাবজীর মনিব এতক্ষণ বিল লিখে টাকা নিচ্ছিলেন। এবার গম্ভীর বদনে উঠে এলেন। বিমলের কাঁধে মৃদু ঠেলা দিয়ে তিনি বল্লেন—মিষ্টার, কি হয়েছে আপনার?

বিমল শব্দহীন। এতগুলো লোক আশ্চর্য্য হয়ে গেল। মনিবটি খানিকটা কড়াসুর ও খানিকটা সহানুভূতি মিশিয়ে এক বুলি আওড়ালেন। শুনে বিমলকুমার হাত তুলে মনিবের মুখের দিকে তাকালো। ক্লান্ত বিষন্ন চোখদুটো অথচ এত রক্তাভ যে শরীরের সব রক্তই ষড়যন্ত্র করে বেচারী চোখকে আক্রমণ করেছে।

স্খলিত সুরে সে বলে—মিষ্টার আমায় মাপ করো!

মনিব শঙ্কিত হয়ে বল্লেন, কেন, কি হয়েছে আপনার!

একটা গাড়ী ডাক্‌তে পাঠান। আমি অসুস্থ। মনিব ইঙ্গিতে বেয়ারাকে ডাক্‌লেন। বেয়ারা বল্লে, যাচ্ছি আমি। বিল আট আনা—একছুটে সে বেরিয়ে গেল। বিমল তখন মনিবকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বল্লে—দেখুন, মস্ত এক বিপদ হয়েছে—

—কি?

—আর তার জন্য অনুরোধ জানাতে হচ্ছে—

—আহা, ব্যাপার কি? শুনিই না?

পকেট দেখিয়ে বিমলকুমার বল্লে, মনিব্যাগটা উধাও এ মাসের মাইনে সমেত!

সোরাবজীর মনিব কঠিন ভ্রূকুটি করে বল্‌লেন—আমি তা টের পেয়েছি।

বাধা দিয়ে বিমল বল্‌লো, না, অত ছোট মনে করো না। আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছিনা। নাও, এইটে বাঁধা দিচ্ছি। বলে সে হাত থেকে কি যেন খুলে দিলে। সোরাবজীর মনিব সেটা ভালো করে পরীক্ষা করলেন। বিমল বল্লে, এটা আমার বিয়ের আংটী! অনেক দাম ওর। রসিদটা জলদি চাই।

নিঃশব্দে রসিদ লেখা হলো।

রিক্সা করে আস্‌তে আস্‌তে বিমল একবার না ভেবে পারলো না যে বিয়ের বার্ষিক তিথিতে আংটিটা আজ ও বাঁধা দিয়ে এল। লজ্জা থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় ছিল ওটা। বিমলকুমার কি মুহ্যমান হয়েছিল এইটে কল্পনা করে, না মাসের মাইনে সমেত মনিব্যাগ হারিয়েছিল বলে?

সিন্‌কোনা ও কুইনাইন

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল

(৫)

কুইনাইনের বর্ত্তমান অভাব

কুইনাইন সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা শেষ করিয়া ও প্রবন্ধের শেষে কুইনাইন সংক্রান্ত কতকগুলি সংখ্যা দিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষে কুইনাইনের যে অভাব উপলব্ধি হইয়াছে সেই বিষয়ে ও সরকারী পক্ষ হইতে কি ভাবে ইহার প্রতিকার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে সেই সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষে কুইনাইনের অভাব প্রকৃত পক্ষে গত বৎসর (১৯৪২) জাভা জাপানের কুক্ষীগত হইবার পর হইতেই দেখা দিয়াছে। সুখের বিষয় ভারত সরকার অবস্থাটি শীঘ্রই অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, যে-পরিমাণ কুইনাইন ভারতে সঞ্চিত আছে তাহা যদি উপযুক্তভাবে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে উহাতেই অনেক কাজ পাওয়া যাইতে পারে, সে জন্য ভারত সরকার ভারতে সঞ্চিত সমস্ত কুইনাইনের হিসাব লইয়া উহা কোথায় কিরূপে খরচ করা হইবে সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রদেশের সরকারী কুইনাইন খরচ কত হইতে পারে তাহার আনুমানিক হিসাব প্রত্যেক প্রদেশের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ও আনুসঙ্গিক আরও বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে দিল্লীতে তিনদিন ব্যাপী এক কুইনাইন কন্‌ফারেন্স আহ্বান করেন। ঐ অধিবেশনে কুইনাইন সম্বন্ধে সম্যক আলোচিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

(১) বর্ত্তমান অবস্থায় কুইনাইন সরবরাহ করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং আগামী পাঁচ বৎসরের মত কুইনাইন বিতরণের নিয়ন্ত্রণ (Ration) করিয়াও প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহাদের চাহিদা মিটান হইবে।

(২) সরকারী প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ Reserve fieldএ (কুইনাইনের রিজার্ভ ফিল্ড অর্থাৎ সরকারী হাসপাতাল, রেলওয়ে, লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইত্যাদি) সরবরাহ করিবার জন্য প্রত্যেকটি প্রদেশ যে পরিমাণ চাহিয়াছে, সেই পরিমাণই তাহাদের সরবরাহ করা হইবে।

(৩) প্রদেশগুলির সাধারণ কুইনাইন খরচার শতকরা ৭৫ ভাগ প্রথমে সরবরাহ করা হইবে। সাধারণ খরচ অর্থে ১৯৪২ সালের মার্চ্চ হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের গড় খরচ, তবে এই গড় ধরিবার পরও প্রদেশ বিশেষের স্বতন্ত্র চাহিদার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

এ ছাড়া কুইনাইনের অন্যান্য পরিবর্ত্ত (substitute) সম্বন্ধেও আলোচিত হইয়াছে। আমেরিকা হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এটেব্রিন (atebrin) আনাইবার কথাও হইয়াছিল। রুশীয় প্রণালীতে সিন্‌কোনার আবাদ বসাইবার বিষয়ও তাঁহারা আলোচনা করেন এবং ইহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৯) যে, ভারত সরকারের ব্যয়ে বাংলা দেশে রুশীয় প্রণালীতে আবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর ভারতে মজুত মালের পূর্ণ তালিকা গ্রহণ করিয়া এবং আগামী কয়েক বৎসরে কিরূপ পরিমাণ কুইনাইন জন্মাইতে পারে তাহার হিসাব লইয়া ও কুইনাইনের পরিবর্ত্তগুলি যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিয়া এবং কুইনাইন বিক্রয়ের সম্ভবমত সঙ্কোচসাধনের ব্যবস্থা করিয়া ভারত সরকার সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া রোগীর বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।

কুইনাইন কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ১লা এপ্রেল ১৯৪২ হইতে নিয়ন্ত্রণের হিসাব ধরা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাংলা সরকারের কুইনাইন-গোলা (Quinine Depot) হইতে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে কুইনাইন সরবরাহ করা হইত; কিন্তু গত সেপ্টেম্বরের পর হইতে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে; কারণ অতঃপর ভারত সরকারই তাহাদের নির্দ্ধারণ মত সরবরাহ করিতেছেন।

এদিকে বাংলা দেশের জেলাগুলি নির্দ্ধারণ মত কুইনাইন জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের নির্দ্দেশ মত পাইতেছে। বাংলা দেশের খরচের জন্য নির্দ্দিষ্ট মোট কুইনাইন কোন জেলায় কি পরিমাণ দেওয়া যাইবে, জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর তাহার হিসাব করিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং কলিকাতার কুইনাইন-গোলা গত নভেম্বর মাস হইতে প্রত্যেক জেলায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কুইনাইন জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উহা জেলার সিভিল সার্জ্জেনকে অর্পণ করেন এবং তিনি নির্দ্দিষ্ট বিক্রেতাকে বিক্রয় করিতে দেন। খাস কলিকাতায় সরকারী কুইনাইন সরকারী মূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য কলিকাতার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটি এবং কোন কোন ওয়ার্ডে দুইটি করিয়া ঔষধের চল্‌তি দোকানে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

এই সূত্রে ১৬ই মার্চ্চ ১৯৪২ তারিখে বাংলার কুইনাইন বিভাগের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণের বাজেট বক্তৃতা হইতে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্রথমতঃ পরিষদকে জানাইয়াছেন যে, আমেরিকা ভারতবর্ষকে ৮০,০০০ পাউণ্ড এটেব্রিন সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার বক্তৃতায় পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার দোকান সমূহে বিক্রয়ের জন্য বাংলা সরকার উপরিল্লিখিত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রথম দফায় গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪২-এ মোট ৫,০০০ পাউণ্ড, দ্বিতীয় দফায় ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩-এ ৩৯৬ পাউণ্ড এবং তৃতীয় দফায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ১২,৮৭৬ পাউণ্ড কুইনাইন বাংলার বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করিয়াছেন।

সরকারী ব্যবস্থা ও চেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে কুইনাইনের অভাব যথেষ্টই রহিয়াছে। আমেরিকা হইতে আটেব্রিন আমদানী হইলে হয়ত অবস্থার আরও কতকটা উন্নতি হইতে পারে কিন্তু ইহার মূল্যও পূর্ব্বের তুলনায় অনেকখানি বাড়িয়াছে। দরিদ্রের পক্ষে কুইনাইন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্বে সরকার বাংলা দেশের ২৬টি জেলায় বিনা মূল্যে কুইনাইন বিতরণের জন্য ৩,৫৪,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন বিধায় কুইনাইন ব্যবহারের জন্য সরকার আরও ৪২,০০০ টাকা জনস্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট ২৪,০০০ টাকা কুইনাইন বিতরণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছে (এ সংবাদ গত পৌষের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল)। এইরূপে দেশের অভাব কতকটা প্রশমিত করা হইয়াছে। কিন্তু এতৎসত্বেও একথা সত্য যে, বর্ত্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে কুইনাইনের অভাবে কিছু কষ্ট পাইতেই হইবে। তবে আশার কথা এই যে, বর্ত্তমান দুঃখের ফলে কুইনাইন উৎপাদনের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া দূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যে কুইনাইন বিষয়ে স্বয়ংপূর্ণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ছাড়া কুইনাইনের সুলভ পরিবর্ত্ত (substitute) আবিষ্কারের জন্য স্থানে স্থানে অনুসন্ধান এবং গবেষণাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আসামের রাণী সবিতা দেবী ডিস্পেন্সারীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীননাথ দেবশর্ম্মা জানাইয়াছেন যে, 'ম্যালেরিয়া

যোগে পল্লীগ্রামে যতগুলি বনৌষধি ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে লতাগুটী অন্যতম। লতাগুটীর বৈজ্ঞানিক নাম 'Casalpinia Bonducilla' বা 'Febrifuge nut'। ইহার শুষ্ক শাঁসটা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ১০ গ্রেণ শুষ্ক চূর্ণ প্রত্যহ দুইবার খাইলেই যথেষ্ট হয়। ম্যালেরিয়া ছাড়া নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতিতেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী'। কুইনাইনের অভাবে পড়িয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এইরূপে দেশী ঔষধ যদি জনসমাজে প্রচার ও প্রচলিত করাইতে পারেন তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অভাবে আমাদের স্থায়ী উপকার সাধিত হইতেছে। এই সব দিক দিয়া মনে হয় যে বর্ত্তমানের সাময়িক অভাবই ভবিষ্যতে প্রাচুর্য্যের চিরকল্যাণ দান করিতেছে।

বাংলা দেশের সিন্‌কোনা বিভাগ পরিচালন করিতে বাংলা সরকারের আয়, ব্যয় ও নিট্ লাভ—

বৎসর	আয়	ব্যয়	নিট্ লাভ
১৯৩১-৩২	৬,২৪,২১১ টাকা	৪,৩৯,৪৭৫ টাকা	১,৮৪,৭৩৬ টাকা
১৯৩২-৩৩	৬,৯৫,০৩২ "	৩,৯৫,৫৭২ "	২,৯৯,৬৬০ "
১৯৩৩ ৩৪	৮,৭৭,৬৬৭ "	৪,৩৩,১৬৯ "	৪,৪৪,৪৯৮ "
১৯৩৪-৩৫	৮,৩৪,৮২২ "	৪,২৭,৬৪৯ "	৪,০৭,৩১৩ "
১৯৩৫-৩৬	১০,৬৬,২৬৭ "	৪,৪৪,৩৩৬ "	৬,২১,৯৩২ "
১৯৩৬-৩৭	১০,৮০,৪০০ "	৪, ৪৭,৬৫৫ "	৬,৩৩,৩৪৫ "
১৯৩৭-৩৮	১৪,৪১,৯৪১ "	৪,৭৯,০৩৫ "	৯,৬২,৯০৬ "
১৯৩৮-৩৯	১৯,৫৬,১১২ "	৫,৩৪,০৭৩ "	১৪,২৩.০৩৯ "
১৯৩৯-৪০	১৬,৭৯,২৬৭ "	৫,৫৬,৭৫৬ "	১১,২২,৫১১ "

ভারতে কুইনাইন আমদানী

(১৯৩৭-৩৮এর পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবগুলি ব্রহ্মদেশ সহ)

বৎসর	আমদানীর পরিমাণ পাউণ্ড	আমদানী মূল্য টাকা
১৯০৯-১০ হইতে ১৯১৩-১৪ পর্য্যন্ত গড় (প্রাক্ যুদ্ধকাল)	১,১৯,০০০	১১,০১,০০০
১৯১৪-১৫ হইতে ১৯১৮-১৯ পর্য্যন্ত গড় (যুদ্ধকাল)	৭৬,০০০	১৭,৮৯,০০০
১৯১৯-২০ হইতে ১৯২৩-২৪ পর্য্যন্ত গড় (যুদ্ধোত্তর কাল)	৮১,০০০	২৭,৫৮,০০০
১৯২২-২৩	৮০,০০০	২৫,১২,০০০
১৯২৩-২৪	৯৬,০০০	২৬,৩৭,০০০
১৯২৪-২৫	১,০৮,০০০	২৮,০৯,০০০
১৯২৫-২৬	১,৩০,০০০	৩০,৯৬,০০০
১৯২৬-২৭	১,২০,০০০	২৬,২৫,০০০
১৯২৭-২৮	১,১৪,০০০	২৩,৪২,০০০
১৯২৮-২৯	১,৩৩,০০০	২৪,৪৭,০০০
১৯২৯-৩০	১,২৯,০৩৭	২৮,৭৫,০০০
১৯৩০-৩১	১,০৬,৭০৪	২২,৮৮,০০০
১৯৩১-৩২	১,১১,০৫৬	২৫,৬৫,০০০
১৯৩২-৩৩	১,০২,৬৬০,	২৬,৩৪,০০০
১৯৩৩-৩৪	১,২৭,৫৭২	৩১,৭৪,০০০
১৯৩৪-৩৫	১,০০,৬২৮	২৫,৯০,০০০
১৯৩৫-৩৬	১;০৩,৬১০	২৬,১৮,০০০
১৯৩৬-৩৭	৯৯,০৪৯	২৩,২০;০০০
১৯৩৭-৩৮	১,০৫,৩২৯	২৬,২৯,০০০
১৯৩৮-৩৯	৯৮,১৩৫	২৫,৩৭,০০০
১৯৩৯-৪০	৮৩,০০০	২৪,৮৭,০০০
১৯৪০-৪১	১,০০,০০০	৩২,২৮,০০০

এ ছাড়া ভারত সরকার তাঁহার নিজের প্রয়োজনের জন্য সামান্য পরিমাণ কুইনাইন আমদানী করেন। উদাহরণ স্বরূপ পাঁচ বৎসরের হিসাব দেখা যাইতে পারে।

বৎসর	আমদানীর পরিমাণ পাউণ্ড	আমদানীর মূল্য টাকা
১৯৩৫-৩৬	২৩৭	৪,৪৯৪
১৯৩৬-৩৭	৪০	১,৯০৮
১৯৩৭-৩৮	৬৭	১,৫৬৯
১৯৩৮-৩৯	৭৩	২,৮৪৪
১৯৩৯-৪০	২৪০	৫,৩৬৮

এ ছাড়া বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশ বৎসরের আমদানী হিসাব লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, আমদানীর পরিমাণ ঐ সময়েই প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১৮৯৯-১৯০০ হইতে ১৯০৩-১৯০৪ এই পাঁচ বৎসরে বাৎসরিক গড় আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫৪,০০০ পাউণ্ড; পরবর্ত্তী বৎসরে গড় আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৬৮,৬৪৮ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। ইহার মূল্য দিতে হয় ৬,৯২,৩২৯ টাকা। পর বৎসরে কুইনাইনের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭১,২৩৭ পাউণ্ড হইয়াছিল—মূল্য ৬,২৮,৪০০ টাকা। এই সময় হইতে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯১৫ সালে এক লক্ষ পাউণ্ডে উপনীত হয়।

এই সময়ের আমদানীর আর একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে, এ সময়ের প্রায় সমস্ত আমদানীই বাংলা দেশের ভিতর দিয়া হইত এবং আমদানীর প্রায় সবটুকুই ইংলণ্ড হইতে আসিত।

বর্ত্তমানে কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ কুইনাইন কত মূল্যে আমদানী করা হয় তাহা বুঝিবার জন্য পাঁচ বৎসরের হিসাব (১৯৩৫-৩৬ হইতে ১৯৩৯-৪০) নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমদানীর দেশ	১৯৩৫-৩৬ পাউণ্ড	১৯৩৫-৩৬ টাকা	১৯৩৬-৩৭ পাউণ্ড	১৯৩৬-৩৭ ট	১৯৩৭-৩৮		১৯৩৮-৩৯		১৯৩৯-৪০	
যুক্ত রাজ্য ও চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ	২৭,৭৬৭	৭,৯২৫৩২	২৮,৩৬৪	৭,৬৬,৭১৩	২৪,৯৮৯	৭,১৪,৯২২	২৩,০৯৮	৭,১১৫৯৪	২৪,৬০৯	৮,১৮,৭৭১
ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্টস্—	২২৬	১,৫৮০	৮৩০	১১,৫৪০	৫১১	৮,৮৭৪	৩২৯	৫,৬৬৬	৩,১৩৩	৩৫,৫৫৬
অন্যান্য ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত দেশ	১১২	১,৩৩১	২৯	২,২৭৬	৮১	৪০৮	১	৩২৩	৪২	৭৭৩,
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে মোট	২৮,১০৫	৭,৯৫,৪৪৩	২৯,২২৩	৭,৮০,৫৩৩	২৫,৫৮১	৭,২৪,২০৪	২৩,৪২৮	৭,১৭,৫৮৩	২৭,৭৮৪	৮,৫৫.১০০
জার্ম্মানী	৪৫,১৬০	১১,৩০,১৪০	৩৭,৮৯৩	৮,৪৫,৭৩০	৫২,২৮৫	১২,৬৬,০৩৬	৫৫,১৩১	১৩,৯২,৩৯১,	১৬,৩৪৮	৪,৬২,৭৩৮
নেদারল্যাণ্ডস্	১২,১০১	২,৫৪,৫১৩	১০,০২২	১,৮৬,৪৮৯	৭,৫৭৯	১,৭৭,৪৪১	১১,৪৪৮	২,৪৩,৫৭৩	৫,৮৮৪	১,৫৫,৩৩৮

বেল্‌জিয়াম	১৬	১,৮৩৯	৪	১১৬	৪,০০০	৭১,৯১০	...	...	...	...
ফ্রান্স	১০৬	২,৮৩৮	৯০	৪,৬৩২	৮১২	২২,৭১৪	১২২	৫,৪৬৪	৬৭	৬,৪২৯
সুইজারল্যাণ্ড	৫,৩৭৮	১,২৯,৫০৭	৫,৬৯০	১,৫৫,৭৩৯	২,৮৩৭	৭৭,৩০০	৬৪৪	২০,৯৬৩	১১,০৫৯	৩,৩৪,৮৭৯
জাভা	৯,৬১৯	২,১৫,৬৮৪	১৪,২১৯	২,৮০,১৪৪	১০,০৩২	২,১৬,৪৪৪	৪,৬৭০	৯৬,১৫৩	১৭,৬১১	৫,৩৪,৯৫৮
* যুক্তরাষ্ট্র, আতলাস্তিক পথে	২,৮৭৬	৮০,৩৭৫	১,৮৫৩	৬৪,৭৬৪	২,১৩৪	৬৯,৫৪৯	২,৬৭৮	৬০,৫৯৯	৩,১৫৭	১,২৮,৪৬৩
” প্রশান্ত মহাসাগর পথে	১৭	৫৫৬	১৪	৪৬৯	৪৯	২,১১০	৮	২৪৮	৭৮৯	৭,৩৮৪
অন্যান্য দেশ	২৩২	৬,৯৩৭	৪১	১,২৬৪	২০	৮৯০	৬	২০৮	৮৪	১,৯৩০
ভিন্ন রাজ্য হইতে মোট	৭৫,৫০৫	১৮,২২,৩৯৯	৬৯,৮২৬	১৫,৩৯,০৭৭	৭৯,৭৪৮	১৯,০৪,৩৭৪	৭৪,৭০৭	১৮,১৯,৫৯৯	৫৪,৯৯৯	১৬,৩২,০৮৮
ভারতের মোট আমদানী	১,০৩,৬১০	২৬,১৭,৮৪২	৯৯,০৪৯	২৩,১৯,৬১০	১,০৫,২২৯	২৬,২৮,৫৭৮	৯৮,১৩৫	২৫,৩৭,১৮২	৮২,৭৮৩	২৪,৮৭,১৮৮

উপরোক্ত পাঁচ বৎসরের হিসাব হইতেই দেখা যাউক, ভারতের কোন প্রদেশ কি পরিমাণ আমদানী করিয়াছে এবং সেজন্য কত টাকা মূল্য বাবদ দিয়াছে

		বাংলা	বোম্বাই	সিন্ধু	মাদ্রাজ		ব্রহ্মদেশ		মোট
১৯৩৫-৩৬	পাউণ্ড	৪৬,৬৫৭	৪০,১৯৬	৭,৩৪০	৭,৬২৪		১,৭৯৩	—	১,০৩,৬১০
	টাকা	১২,২৪,৯৮৭	৯,৯২,৭২৯	১,৮১,৫৯৯	১,৬৩,২৯৫		৫৫,২৩২	=	২৬,১৭,৮৪২
১৯৩৬-৩৭	পাঃ	৫৯,৫৯৩	২৫,০০৮	৫,১০১	৭,১৭১		২,১৭৬	=	৯৯,০৪৯
	টাকা	১২,৮০,০৯৮	৬,৭৫,৫৪০	১,৪১,৭৫০	১,৫৫,৩৪৯		৬৭,১৯৩	=	২৩,১৯,৬১০
১৯৩৭-৩৮	পাঃ	৬০,৫১৪	৩০,৮৫৯	৬,৮৫১	৭,১০৫		এই বৎসর	=	১,০৫,২২৯
	টাকা	১৫,৯৬,৭ ।	৮,৫৬,০২৫	২,০৬,৫৮০	১,৬৯,১৮৬		ব্রহ্মদেশ	=	২৬,২৮,৫৭৮
১৯৩৮-৩৯	পাঃ	৫৫,৩৮৪	২৮,২৮৬	৫,৮১.	৮,৬৫৪	—	ভারত	=	৯৮,১৩৫
	টাকা	১৩,৭৬,০১৪	৭,৯৭,৯৮১	১,৭২,১৩৮	১,৯১,০৪৯	—	হইতে	=	২৫,৩৭,১৮২
১৯৩৯-৪০	পাঃ	৩৮,৮০০	৩১,৯৩৮	৯,৩৩৫	২,৭১০	—	বিচ্ছিন্ন	=	৮২,৭৮৩
	টাকা	১০,৮৯,৮৬২	১০,২৯,৯৯৩	২,৮৭,৯৩৭	৭৯,৩৯৬	—	হয়।	=	২৪,৮৭,১৮৮

ইহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে বাংলাদেশে আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে (১৯৪০-৪১) ৪৮, ৮৬৮ পাউণ্ড ও (১৯৪১-৪২) ৪৯, ৩৮০ পাউণ্ড।

ভারত হইতে সিন্‌কোনা রপ্তানি

ভারতবর্ষ হইতে সিন্‌কোনার শুষ্ক ত্বক্ সামান্য পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে ; প্রদেশ হিসাবে বিচার করিলে এই সমস্ত রপ্তানিই মাদ্রাজ হইতে হইয়া থাকে। বাংলা দেশে প্রয়োজন মত সময়ে সময়ে সিন্‌কোনা ত্বক্ আমদানী করা হয় কিন্তু রপ্তানি একেবারেই হয় না। মাত্র পাঁচ বৎসরের সিন্‌কোনা রপ্তানির হিসাব দেওয়া গেল।

	১৯৩৫-৩৬		১৯৩৬-৩৭		১৯৩৭-৩৮		১৯৩৮-৩৯		১৯৩৯-৪০	
	পাউণ্ড	মূল্য টাকা	পাঃ	টাকা	পাঃ	টাকা	পাঃ	টাকা	পাঃ	টাকা
যুক্তরাজ্য	১৪,১২২	৩,৫৩০	২,৬০৫	৭৮৯	৯১৮	২৩৯	৩,১১৬	৭৭৯	৫৭,৪০০	১৯,০৯৩
জার্ম্মানী	—	—	২০,৫০৪	৭,৮৪৫	১৪,২০০	৪,৯৫০	৩,৩০০	১,২৩৭	—	—
ফ্রান্স	৯,৪০৮	২,৬৪৬	২৯,১২২	৭,৯৩,	১৩,১০৪	৪,৬৪১	২৬,০৩৬	৯,১০১	১১,৪২৪	৪,৮৯৬
অন্যান্য দেশ	৫৮৮	১২৬	—	—	—	—	—	—	—	—
মোট	২৪,১১৮	৬,৩০২	৫,২২৩১	১৬,০২৬	২৮,২২২	৯,৮২০	৫৩,৪৫২	১১,১১৭	৬৮,৮২৪	২০,৯৮৯

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুষ্ক ত্বক রপ্তানীর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাংলাদেশ এইরূপ রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়াছে, মাদ্রাজও পরিমাণ কমাইতেছে। ১৮৯৮-১৯০০ সালে ৩২,৯০,২৩৬ পাউণ্ড ছাল রপ্তানী দিয়াছিল ; ১৯০৬-০৭ সালে মাত্র ৪,৯৪,৫৮৭ পাউণ্ড। সে সময়ের সমস্ত রপ্তানীই ইংলণ্ড হইতে।

ভারতবর্ষ হইতে কুইনাইন বিদেশে রপ্তানি হয়। গত কয় বৎসরের রপ্তানির যেটুকু হিসাব ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বিশেষ কারণে এই সম্বন্ধের কতকগুলি সংবাদ গোপনীয় বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়।

১৯৩৫-৩৬	মাদ্রাজ হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যে রপ্তানি হইয়াছে	১২ পাউণ্ড,	মূল্য ৯৫ টাকা
১৯৩৬-৩৭	বাংলাদেশ হইতে সুমাত্রায় রপ্তানি হইয়াছে,	২,৫৯৭ পাউণ্ড,	মূল্য ১২,৯৩৯ টাকা
১৯৩৮-৩৯	ঐ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রপ্তানি হইয়াছে	১৪৮ পাউণ্ড,	মূল্য ১,৬১৫ টাকা
১৯৩৯-৪০	ঐ ঐ ঐ	২৩২ পাউণ্ড	মূল্য ১,৭৭৯ টাকা

রপ্তানীর এইটুকু হিসাব সাধারণভাবে জানিতে পারা যায়।

* যুক্তরাষ্ট্র হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই উভয় সমুদ্রপথ দিয়াই আমদানী হইয়া থাকে। তবে পূর্ব্বের প্রশান্ত মহাসাগর পথে আমদানীর পরিমাণ নিতান্তই কম।

সমাপ্ত

ভারতীয় চিত্র-শিল্পের ক্রম-বিকাশ

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র এম্-এ

ভারতের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই স্থানীয় ও সাময়িক শিল্প সৃষ্টির ভিতরেও একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র ভারতীয় শিল্পে সর্ব্বত্রই রহিয়া গিয়াছে। ভারতীয় শিল্পের ক্রমোন্নতি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে সুরু হইয়াছে এবং উহাতে কিছু কিছু পারস্য ও গ্রীক প্রভাব পড়িয়াছে ইহা ধরিয়া লইলেও আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় শিল্প সাধনার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এই ভারতীয় চিন্তাধারার একটিমাত্র বিশেষ রূপ—ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে একটি

বাগগুহার চিত্র শিল্পী—প্রাণকৃষ্ণ পাল

উন্নত, সংস্কৃত, সুসভ্য জাতির পবিত্র হৃদয়ের অনুভূতি। তাহার প্রধান কারণ ইহার মূলে রহিয়া গিয়াছে একটি সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুভূতি। অন্যান্য দেশে ধর্ম্মের স্থান আসিয়াছে রাষ্ট্রের পরে—তাই সে জগতে যে শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ভিতর রহিয়া গিয়াছে রাজ ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক, আর রাজকীয় শৌর্য্যের প্রচারচেষ্টা। কিন্তু ভারতবর্ষের ধর্ম্ম রাজ সিংহাসনের বহু উর্দ্ধে স্থান পাইয়াছে, তাই যে শিল্প ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে রাজানুশাসনের ক্রীতদাস হইতে হয় নাই, রাজ মহিমা গান গাহিয়া বাঁচিবার অধিকার লাভ করিতে হয় নাই। তাহার গতি হইয়াছে স্বচ্ছন্দ, সাবলীল—আপন মহিমায় সে আপনার আসন

প্রাচীন পটচিত্র সংগ্রাহক—দেবপ্রসাদ ঘোষ

দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে। একমাত্র এই কারণেই ভারতীয় শিল্পীর দৃষ্টি ভঙ্গী একটি সুষ্ঠু ও সংযত ধারা বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।

ছিন্নমস্তা শিল্পী—নরেন্দ্র মল্লিক

ভাবের প্রেরণাই হইতেছে সমস্ত শিল্পের উৎস, তবে বিভিন্ন দেশের শিল্প সাধনার মতবাদের উপর সেই দেশের সামাজিক, দার্শনিক ও ধর্ম্মজীবনের

প্রভাব সেই দেশের শিল্পকে একটি বিশেষ রূপে রূপায়িত করিয়া তুলে। পাশ্চাত্য জগতের শিল্পে যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি রহিয়াছে তাহাতে কল্পনার স্থান খুব বেশী নাই, সেখানে বাস্তবের প্রাধান্যকেই স্বীকার করিয়া লওয়া

সূত্রধর শিল্পী--ইন্দু রক্ষিত

হইয়াছে কিন্তু ভারতীয় শিল্প সাধনার মূলে রহিয়াছে ধর্ম্ম এবং প্রেমেরই উচ্চাদর্শ। তাই গ্রীক শিল্পের ন্যায় ভারতীয় শিল্পে সে নগ্ন নারীমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না তাহা নহে তবে তাহার ভিতর একটি আদর্শের বৈষম্য রহিয়া গিয়াছে। গ্রীক মূর্ত্তিতে নারীর প্রত্যেকটি অঙ্গকে সুষ্ঠু ও বাস্তবের অনুরূপ করিয়া দেখাইবার প্রয়াস রহিয়াছে কিন্তু ভারতীয় শিল্পী অঙ্গের সচ্ছন্দ গতি-ভঙ্গিমার উপরই বিশেষ নজর রাখিয়াছেন।

ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন আমরা গুহা চিত্রাবলীতেই বেশী করিয়া দেখিতে পাই—ভারতের প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রের অনুসরণ করিলেও আমরা দেখিতে পাইব সেকালের রুচিবোধ সৌন্দর্য্যবোধ বর্ত্তমান হইতে অনেক প্রকারে বিভিন্ন ধরণের ছিল। এখন আর আমরা সাহিত্যে রূপ বর্ণনা করিতে গেলে নায়িকাকে পদ্মপলাশলোচন বলি না, তাহার অধরকে বিম্বাধর বলিতে লজ্জাবোধ করি—আমাদের নায়িকারা কোমরে আর চন্দ্রহারও পরেন না, তেমনি তৎকালীন শিল্প এবং বর্ত্তমানে
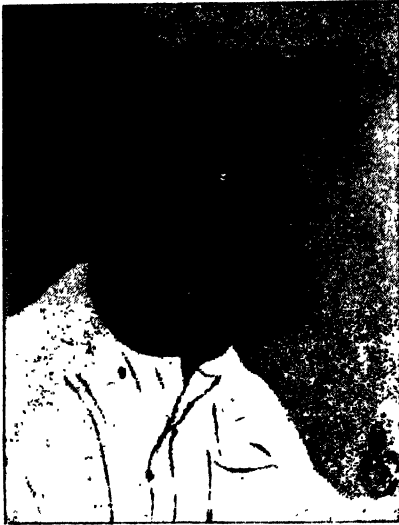
চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় অঙ্কিত

শিল্পধারার রুচিবোধ অনেক পরিমাণে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে ছয়টি বিষয় সম্বন্ধে শিল্পীকে সচেতন থাকিতে হইত।

"রূপ-ভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গং ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥"

অর্থাৎ রূপের বিষয় অভিজ্ঞতা, মাপের জ্ঞান, অভিব্যক্তি ও লাবণ্য, অবয়ব বর্ণ ইত্যাদির সৌসাদৃশ্য এবং শিল্পীর সুনিপুণ হস্তচালনা এই ছয়টি বিষয়ের উপরই চিত্রের সার্থকতা নির্ভর করিত। রসিক শিল্পী সমস্ত নিয়ম মানিয়া লইয়াও প্রতিভার বলে বহু প্রাণবন্ত মনোহর আলেখ্য অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইতেন। 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্ নামক' প্রাচীন গ্রন্থে চিত্রকলা সম্বন্ধে বেশ গভীর অনুশীলন হইয়াছে দেখিতে পাই।

অজন্তার ভিত্তি চিত্রে আমরা ভারতীয় শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় পাই—প্রত্যেকখানি চিত্রই বর্ণে ছন্দে ও ভাবে চিত্র জগতের এক অভিনব সম্পদ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দেশের চিত্রগুলির সহিত বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়া যায় অজন্তার ছবিগুলি শিল্পী স্বাধীন ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়া তুলির টানে টানে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে—অন্য দেশের মত 'মডেলে'র কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। জাপানের বর-ভূধরের মন্দিরের ভাস্কর্য্য চিত্রের সহিত এই চিত্রগুলির অনেক পরিমাণে সৌসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে।

প্রতীক্ষা শিল্পী—গোপাল ঘোষ

বাগগুহায় প্রাচীর চিত্রের যে ভগ্নাবশেষ রহিয়া গিয়াছে তাহা আমাদের প্রাচীন ইটালীর ভিত্তি চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—এখানে যে সমস্ত হাতী ঘোড়া অঙ্কিত হইয়াছে তাহা যেমন প্রাণবন্ত তেমনি রুচিসম্মত হইয়াছে। প্রাচীনত্বের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে একমাত্র গ্রীসের চিত্রকলাকেই বাগ ও অজন্তার সমসাময়িক বলা চলে। সম্প্রতি আশুতোষ মিউজিয়ম অফ ইণ্ডিয়ান আর্ট এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট—ইঁহাদের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে বাগগুহার বোধসত্ত্বের যে চিত্রের বৃহৎ প্রতিচ্ছবিটি শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক ইতালীয় শিল্প সারফিসকাচাদোরিয়া অনুকরণে বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন ভারতের চিত্র সম্পদের আসল রূপটি অতি নিখুঁতভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। একান্ত অরসিকের নিকটে এই চিত্রটি আকর্ষণীয় ও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। বোধসত্ত্বের এইরূপটি আমরা অন্য কোথাও বড় একটা দেখিতে পাই না। বাগগুহার নর্ত্তকীবৃন্দের, সিওনবসাল মন্দিরের অপ্সরার, জাপানের হরিয়ুজি মন্দিরের বুদ্ধের, সিংহলের সিগিরিয়া ভিত্তিচিত্রের মহিলা এবং পরিচারিকার যে ছবিগুলি প্রাণকৃষ্ণ বাবু এবং সুশীল পাল মহাশয় প্রদর্শনীর জন্য বড় করিয়া আঁকিয়াছেন তাহা প্রদর্শনীর একটি বিশেষ গর্ব্বের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আশুতোষ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত কয়েকখানি প্রাচীন পটচিত্র যদি আমরা একটু বিশেষভাবে আলোচনা করি তাহা

হইলে আমরা দেখিতে পাইব প্রাচীন ভিত্তি চিত্রগুলির সহিত ইহার যথেষ্ট পরিমাণ সৌসাদৃশ্য রহিয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশও আমাদের চোখে বেশ সুন্দরভাবে ধরা পড়ে।

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর অধিক আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে। তাই প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা উল্লিখিত প্রদর্শনীর কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। আধুনিক চিত্রকলায় দেবদেবীর স্থান আজিও অটুট রহিয়াছে সত্য—কিন্তু মানুষের শিক্ষা, সভ্যতা রুচিবোধের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে দেবদেবীর শুধুই আকৃতি ও অবয়বের নহে—তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও সাধিত হইয়াছে—তবে পৌরাণিক প্রভাব হইতে যে তাঁদের একেবারেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা বলা চলে না। শিল্পী নরেন্দ্র মল্লিকের 'ছিন্নমস্তা' ছবিটিতে যেমন আধুনিক ভাবধারার একটি সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে তেমনি প্রাচীন তান্ত্রিক প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে—আলেখ্যের পশ্চাতের ত্রিকোণ চিহ্নটি তান্ত্রিক সাধনার একটি বিশেষ অপরিহার্য্য নিদর্শন। অবশ্য এই ত্রিকোণ আকারের গঠন ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে—ভারতীয় ভাস্কর্য্যও এই আকারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। খুলনা জেলার অন্তর্গত রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহরেও এইরূপ একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে—মন্দিরের সংলগ্ন যে স্থানটিতে পূজার ফুল, জল ফেলা হইত তাহার আকারও ত্রিকোণ।

শিল্পী ইন্দু রক্ষিতের সূত্রধরের চিত্রটি সকলের চোখেই ভাল লাগিবে—বৃদ্ধ সূত্রধরের অঙ্গভঙ্গী তাহার বেশভূষা তাহার অভিব্যক্তি সব মিলিয়া ছবিখানিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। উদীয়মানশিল্পী গোপাল ঘোষের 'প্রতীক্ষা' ছবিখানিতে শিল্পী সকলের চেয়ে বেশী করিয়া মনের ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন—নারী ও প্রকৃতি উন্মুক্ত হইয়া প্রিয়জনের দর্শন কামনা করিতেছে—নারী তাহার হৃদয় মন লইয়া এমন একটি জায়গায় উপস্থিত হইয়াছে সেখান হইতে এই ধরণীর আকাশ, বাতাস, বৃক্ষ, পুষ্প সকলের সহিত আপনাকে—আপন হৃদয়ের গভীর ব্যাকুলতাকে মিশাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। সাধারণ বাঙ্গালা ছবি হইতে এই ছবিখানির অবস্থিতি একটু পৃথক মনে হয়; শিল্পী যেন কোন উচ্চতর স্থানে বসিয়া এ দৃশ্যটি অঙ্কিত করিয়াছেন তাই সমতলভূমি হইতে প্রাচীর, বৃক্ষ, গৃহ ইত্যাদির উচ্চতা অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিল্পী চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের ছবিগুলির ভিতর আমরা যথার্থ শিল্পীর গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই। পৃথিবীর অতি সাধারণ বিষয়-বস্তু হইতে তিনি রস আহরণ করিতে পারেন—যাহাকে আমাদের চোখে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, শিল্পী তাহারই বিশিষ্ট মুখাকৃতি হইতে অভিনবত্ব খুঁজিয়া বাহির করেন। এমন একটি রেখায় সমগ্র মুখখানিকে ফুটাইয়া তুলেন, এমনি একটু আলো-ছায়ার সম্মিলনে সেই মুখখানিকে রূপায়িত করিয়া তুলেন যাহাকে কেবল মাত্র প্রতিকৃতি বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া চলেনা—তাহা শিল্পীর সৃষ্টিতে উপভোগ্যও হইয়া উঠে। খ্যাতনামা শিল্পী সুধীর খাস্তগীরের 'বংশীবাদক' এবং "কালোমেয়ে" ছবি দুখানি যথার্থই তাহার প্রতিভার

বংশীবাদক　　শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর

পরিচয় দেয়। তুলিটানগুলি যেমন একদিকে শিল্পীর নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় অপরদিকে তেমনি ছবিখানি আমাদের অন্তরে এক অপূর্ব্ব সুর-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে। এইখানেই শিল্পীর প্রচেষ্টা সত্যই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণকৃষ্ণবাবুর এবং শ্রীমতী শান্তার ছবিগুলি মোগল-শিল্পের অনুকরণে অঙ্কিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং সূক্ষ্মকার্য্যের দিক দিয়া বিচার করিলে সেগুলি যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হয়।

'একটী লহমা শাশ্বত হ'ল !'

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সেদিন তোমায় খুঁজিয়া ফিরেছি সকলখানে।
রৌদ্র-দগ্ধ দিবসের বুকে ক্লান্তি জাগে—
দেখেছো কি তার দীপ্তি যা ফোটে আত্মদানে?
আলোকে খুঁজিয়া রাত্রি তাহার মৃত্যু মাগে!

রাজ-পথ দিয়ে যে পথিক যায় দেখেছো তুমি?
তাহাদেরই সাথে আমিও চলেছি মুক্তি টানে!
রিক্ত সে আমি বন্ধ্যা আমার সে বন-ভূমি;
যেদিন তোমায় খুঁজিয়া ফিরেছি সকলখানে!

সহসা সেদিন উৎসব মাঝে দাঁড়ালে এসে।
মুখর দিনের এত প্রাচুর্য্য আনিল তোমা?
মোর তরে নহে আলো উজ্জ্বল রাত্রি শেষে,
তুমি রহিবে কি নিখিল মনের হে প্রিয়তমা?

একটি প্রভাত চাহেনি তোমায় রাত্রি শেষে,
একটি কুঁড়ি সে রহিবে না তব পরশ লাগি।
একটি দিবস রূপায়িত হ'য়ে আমারই দেশে,
ঝরিয়া পড়িবে রাত্রির কোলে মৃত্যু-মাগি!

আজিকে তোমায় জনতার ভিড়ে দেখিনু আমি;
অত্যাচারীর লোহার শিকল আমারে ঘিরে—
রয়েছে দেখিয়া সুমুখেতে আসি দাঁড়ালে থামি,
একটি লহমা শাশ্বত হ'য়ে স্তব্ধ করিল শতাব্দীরে!'

বনফুল

শঙ্করও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিল "তোকে নিয়ে তো মহা মুসকিল দেখছি, রোজ রোজ টাকা পাব কোথায় ?"

মুশাই নিরুত্তর। সে জানে বাবু টাকা দিবেই এবং শঙ্করও জানে যে টাকা যখন চাহিয়াছে তখন না দিয়া উপায় নাই, দিতেই হইবে। না দিলেই কামাই করিতে সুরু করিবে। হঠাৎ এমন আত্মগোপন করিবে যে কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যাইবে না। একবার তো অনেক কষ্টে তাহাকে ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। গ্রামের প্রান্তে যে অশ্বত্থ গাছটাকে সকলে উপদেবতার আশ্রয়স্থল ভাবিয়া ভয় করে-সেই গাছটারই মগডালে মুশাই উঠিয়া বসিয়াছিল—সেইখানেই নাকি দিবারাত্রি বসিয়া থাকিত—কেবল রাত্রে যখন তাহার বউ যমুনিয়া তাহার জন্য খাবার লইয়া যাইত তখনই সে একবার খাইবার জন্য নামিত। যমুনিয়াকে খোশামোদ করিয়াই শঙ্কর তাহার নাগাল পাইয়াছিল। মুশাইয়ের সহিত সম্পর্ক এরূপ যে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। মুশাই না থাকিলে তাহার কাজ-কর্ম্ম সব অচল—সে-ই তাহার দক্ষিণ হস্ত। নিরক্ষর হইলে কি হয় এমন তাহার বুদ্ধি এবং শঙ্করের পছন্দ-অপছন্দ সে এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছে যে শিক্ষিত কোন ভদ্রলোকের পক্ষেও তাহার স্থান পূরণ করা অসম্ভব। সে একাধারে গাড়োয়ান, খানসামা, পাচক, ম্যানেজার এবং হিতৈষী। তাছাড়া শঙ্করকে সে ছেলে-বেলায় 'খেলাইয়াছিল'—অর্থাৎ তাহার রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য ছিল, কোলে করিয়া বেড়াইত। তখন তাহার বয়স বোধহয় বছর দশেক ছিল এবং শঙ্কর ছিল, বছর খানেকের। এখন উভয়ের বয়স বাড়িয়াছে কিন্তু সম্পর্ক বদলায় নাই। এখনও সে যেন শঙ্করের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভৃত্য এবং শঙ্কর যেন দুরন্ত দামাল শিশু।

গাড়ি আসিয়া বাড়ির নিকট থামিল।

অমিয়া তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিল—খুকী ঘুমাইয়াছে। "ভাগ্যে আজ তোমার আসতে দেরী হল—আমি এইমাত্র রান্নাঘর থেকে আসছি ?"

"এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিলে ? কেন !"

"খুকীকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে তরকারিটা পুড়ে গিয়েছিল। বড্ড বায়নাদার হয়েছে বাপু, কিছুতে কি ঘুমুতে চায় চাপড়ে চাপড়ে হাত ব্যথা হয়ে যাবে তবু ঘুমুবে না। চাপড়ানো বন্ধ করলেই বলবে—চাপলাও—"

অমিয়া হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

এই তাহার ঘর। এখানে বাঙালী-বেহারি সমস্যা নাই, দেশোদ্ধারের দুশ্চিন্তা নাই। এখানে আছে কেবল অমিয়া এবং তাহার কন্যা। কোন উগ্রতা নাই, কোন উন্মাদনা নাই কোন অভিনবত্ব নাই। ইহাই তাহার নির্ভরযোগ্য আশ্রয়-নীড়, বাহিরের সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য হইতে রক্ষা করে, সর্ব্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্য-দিয়া পরিচর্য্যা করে, সকলপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ্য করে। খিল লাগাইয়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়া গেল—বাহিরের পৃথিবী তাহার কলরব-কোলাহল লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—ভিতরে রহিল সহজ সরল অনাড়ম্বর শান্তি। সহসা তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল—মা রাঁচিতে কেমন আছেন কে জানে।

৫

ঝুমমর আসিয়া বসিয়াছিল।

ভাঙা গলায় মাঝে মাঝে হাঁকিতেছিল—"এ খোখি দিদি—"

অমিয়া পূজার ঘরে ছিল, জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—"ঝুমর আজ যে মানুষের ভাষায় কথা কইছ বড়—"

ঝাপসা কণ্ঠে ঝুমমর উত্তর দিল—"গল্লা বঝি গেলেইছে মাইজি"

অর্থাৎ গলা ধরিয়া গিয়াছে। তাহা না হইলে সে তাহার স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী কুকুর, বিড়াল, মহিষ, মুরগি না হয় অন্য কোন প্রকার জানোয়ারের ডাক ডাকিয়া তাহার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিত। আজ তাহার গলা ধরিয়া গিয়াছে বলিয়া কিছুই করিতে পারিতেছে না। মুখ দেখিয়া মনে হইল এ জন্য যেন সে লজ্জিত।

ঝুমমর ভিক্ষা করিয়া জীবন-ধারণ করে। বেঁটে লোকটি, ছোট্ট মুখখানি। পাতলা একজোড়া গোঁফ তৈলাভাবে রুক্ষ। থুতনির কাছে কাঁচাপাকা ছাগলদাড়ি তাহাও তৈলাভাবে শ্রীহীন। গালের লোল-চর্ম্মে বলিরেখা। ছোট ছোট চক্ষু দুইটি কোটর-গত এবং পীতাভ। একটি পা কাটা। নিজেই এখান ওখান হইতে কাঠের টুক্‌রা, চামড়ার বেল্ট প্রভৃতি জোগাড় করিয়া লইয়া একটি কাঠের পা বানাইয়া লইয়াছে। তাহারই উপর ভর দিয়া একটি লাঠির সাহায্যে সে চলা-ফেরা করে। মাথায় একটি টিনের বাটি—সম্ভবত কোকোজেমের খালি টিন—টুপির মতো করিয়া পরিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সংক্ষেপে নিজের জীবনের যে পরিচয় দেয় তাহা এই।

দক্ষিণে তাহার বাড়ি। সেইখানেই এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে সে চাষবাসের কাজ করিত। লাঙল চষিত, 'কামৌনি' 'দৌনি' সব করিত। তাহার বিবাহও হইয়াছিল। তিনটি পুত্র আছে। একটি বেশ সাবালক আর দুইটি ছোট ছোট। প্রভুর জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহার্থে সে একদিন একটা বড় গাছে ওঠে। সেখান হইতে পা ফসকাইয়া পড়িয়া গিয়া তাহার পা-টি ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাহার প্রভু অবশ্য তাহার জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন —নিজের গরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে সরকারী হাসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তারবাবুও চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট খারাপ পা কিছুতেই বাঁচিল না। হাঁটুর উপর হইতে কাটিয়া না দিলে ডাক্তারবাবু বলিলেন তাহার প্রাণও

না কি বাঁচিত না। পা-টি সুতরাং কাটিয়া ফেলিতে হইল। কাটা পা লইয়া চাষের কাজ চলে না সুতরাং ন্যায্যভাবেই প্রভু তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। খঞ্জ বেকার স্বামীর সহিত থাকা নিরর্থক বুঝিয়া স্ত্রী-ও আর একটি সমর্থ লোকের সহিত 'চুমানা' করিল। তাহার এই আচরণকেও ঝুমঝুম অন্যায় বলিয়া মনে করে না। প্রভুর নিকট ঋণ করিয়া সে জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বিবাহ দিয়াছিল, পুত্র খাটিয়া সেই ঋণ শোধ করিতেছে। নাবালক ছেলে দুইটি তাহার সঙ্গেই আছে। স্ত্রী তাহাদের না কি বড় মার-ধোর করে তাই তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারাও ভিক্ষা করে, তাহাদেরও সে জানোয়ারের ডাক ডাকিতে শিখাইতেছে। ভাগ্যে ছেলেবেলায় একজন ওস্তাদের কাছে এই বিদ্যাটা শিখিয়াছিল তাই বাবু ভেইয়াদের মনোরঞ্জন করিয়া কোনরূপে দিন-গুজরাণ করিতেছে। অমনি ভিক্ষা চাহিলে রোজ রোজ লোকে দিবে কেন। অন্ন সংস্থানের এই উপায়টিও সম্প্রতি কিন্তু বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা বসিয়া গিয়াছে।

ঝুম্‌ঝুম অমিয়ার একজন পোষ্য। প্রায়ই আসে। অমিয়ার আর একজন পোষ্যও আছে—সুরদাস। সে জন্মান্ধ। ভজন গায়। দাইটিও কিছুদিন হইতে চারটি ছেলে-মেয়ে লইয়া অমিয়ার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাসখানেক হইতে ক্রমাগত আমাশয়ে ভুগিতেছে, ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে, কাজ করিতে পারে না। অমিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাড়াইয়া দিলে চারটি শিশুসহ রোগে অন্নাভাবে হয়তো রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া থাকিবে। স্বামীটা পাগল, কোথায় কখন থাকে ঠিক নাই। মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হয়, খিড়কীর দরজায় দাঁড়াইয়া স্ত্রীর উপর তম্বী করে। ভাবার্থ—খবরদার যেন সে কোনক্রমে বেচাল না হয়, সতীত্বই আসল ধর্ম্ম, ইজ্জৎ যেন ষোল আনা বজায় থাকে—ইত্যাদি। ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া চুমাও খায়। আবার কোথায় উধাও হইয়া যায়। এককালে শঙ্করের বাবার গাড়ি ঘোড়া ছিল, এখন সে সব কিছু নাই, আস্তাবলটা খালি পড়িয়া আছে। তাহাতেই দাইটা সন্তানসন্ততি লইয়া থাকে।

এতগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া অমিয়া এতটুকু বিরক্ত নয়। শঙ্কর সাহিত্য লইয়া যখন মাতিয়া ছিল তখন অমিয়া যথাসাধ্য নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে সেই সাহিত্যেরই রস-গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত। তাহার মনে হইত সাহিত্য-রসিক না হইতে পারিলে শঙ্করের মন পাওয়া যাইবে না। কিছু রস যে সে না পাইত তাহা নয় কিন্তু তাহা তাহার প্রাণ-মনকে তেমন নাড়া দিত না। অনেকটা যেন কর্ত্তব্য-বোধেই সে শঙ্করের এবং সমসাময়িক লেখক-লেখিকাদের রচনার সহিত পরিচয় লাভ করিবার চেষ্টা করিত। এখন সে সব দিন গিয়াছে। শঙ্কর মাতিয়াছে পল্লী-উন্নয়ন লইয়া। গরীব দুঃখীদের কিসে ভাল হয় ইহাই এখন তাহার ধ্যান-জ্ঞান। অমিয়াও তাই যথাসাধ্য গরীব দুঃখীদের দুঃখ মোচন করিবার চেষ্টা করে। তাহার আয়ত্তের মধ্যে যতটুকু ততটুকুই করে। স্বামীকে সুখী করাই তাহার উদ্দেশ্য। সাহিত্যচর্চ্চা অপেক্ষা এসব করিয়া ঢের বেশী আনন্দও পায়। আনন্দের আর একটা গোপন কারণও আছে। কলিকাতায় শঙ্কর যেমন ছিল এখানে আসিয়া আর তেমনটি নাই। তাহার স্বভাব অনেক বদলাইয়াছে। মুখে অবশ্য সে শঙ্করকে কখনও কিছু বলে না। কলিকাতায় যখন সে মদ খাইয়া অধিক রাত্রে বাড়ি ফিরিত তখনও যেমন সে নীরব ছিল এখনও তেমনই নীরব আছে। কিন্তু সে সব বোঝে। শঙ্কর তাহাকে যতটা নির্ব্বোধ মনে করে ঠিক ততটা নির্ব্বোধ সে নয়। উৎপলবাবুর স্ত্রী সুরমার মতো হয়তো সে বিদুষী নয় কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে তাহার মন কখনও ভুল করে না। শঙ্কর যখন কুপথে যায় তখন সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ না পাইলেও তাহার অন্তর্যামী মন যেমন আসল সত্যটি বুঝিতে পারে, কুপথ হইতে সুপথে যখন ফিরিয়া আসে তখনও তেমনি পারে। কিছুই তাহার মনের অগোচরে থাকে না। কলিকাতায় শঙ্কর যখন বিপথগামী হইয়াছিল তখন তাহার মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল বইকি, কিন্তু খুব বেশী বিচলিত সে হয় নাই, তাহার কারণ শঙ্করের মহত্ত্বের প্রতি তাহার গভীর আস্থা ছিল। সে জানিত সোনাতে কখনও কলঙ্ক লাগিবে না। সাময়িকভাবে একটু আধটু ছাই বা ধূলা যদি লাগেও তাহা যথাকালে আপনি উঠিয়া যাইবে। উহা লইয়া বেশী হৈ চৈ করিলে সুবর্ণ অধিকারীর সুবর্ণ চরিত্রে জ্ঞানের অভাবই সূচিত করে। এখন আবার স্বর্ণের স্বাভাবিক দীপ্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সব দীন দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ দিয়া তাহার স্বামীর স্বাভাবিক মহত্ত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সব দীন দরিদ্রদের সে-ও সেবা করিতে উৎসুক। তাহার এই মনোভাব যদিও কলিকাতায় সাহিত্য-চর্চ্চা করিবার মতো শুষ্ক কর্ত্তব্য-বোধ-মাত্রই নয় কিন্তু তাহা শঙ্করের প্রেরণার মতো আবেগপূর্ণও নয়। অমিয়ার প্রধান লক্ষ্য শঙ্কর—অন্য কিছু নয়।

"খোখি দিদি—এ খোখি দিদি—আব"

"দাত্‌তি"

খোখি দিদি উঠানে বাঘা কুকুরটার ঘাড়ে চড়িয়া তাহার কান মোচড়াইতেছিল। বলিষ্ঠ বাঘা অস্ফুট কুঁ কুঁ শব্দ করিতে করিতে তাহার এই স্নেহের অত্যাচার সহ্যও করিতেছিল। ঝুম্‌ঝুমের প্রতি খোখি দিদির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়াতে সে নিস্তার পাইয়া বাঁচিল। "দাত্‌তি" বলিয়া খোকি দিদি প্রবীণ গিন্নির মতো ঝুম্‌ঝুমের দিকে আগাইয়া গেল। কিছুদূর গিয়া তাহার হুঁশ হইল যে রিক্তহস্তে যাওয়ার তো কোন অর্থ হয় না। তখন সে ফিরিয়া মাকে ডাকিল।

"মা, ঝম্‌মু—তাল দাও"

"যাচ্ছি"

অমিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। একটু তাড়া-তাড়িই আসিল, তাহার ভয় পাছে খুকী ঝুম্‌ঝুমকে ছুঁইয়া ফেলে। মেয়ের তো সকলের সঙ্গে ভাব, এখনই হয়তো উহার ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

"বাঘাকে ছুঁয়েছ ?"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া খুকী বলিল—"না—"

'হাঁ'কে খুকী "না" বলে।

"তবে দাঁড়াও গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিই মাথায়—"

অমিয়া পুনরায় পূজার ঘরে ঢুকিল এবং গঙ্গাজল আনিয়া মেয়ের মাথায় ছিটাইয়া দিল।

"গঙ্গা—গঙ্গা—গঙ্গা—"

খুকী মাথা পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া বলিল—"গগগা গগ্‌গা—" এবং হাসিল।

সর্দ্দিতে নাক বন্ধ—'গঙ্গা' উচ্চারণ হয় না।

"আলো দাও—"

জলের ছিটা চোখে মুখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা চমৎকার লাগে।

"না, আর দিতে হবে না—"

তাহার পর ঝুম্‌মরের দিকে ফিরিয়া অমিয়া বলিল, "তুই আর চাল নিয়ে কি কর্‌বি। দুপুরে বরং ছেলে দুটোকে নিয়ে এখানেই খাস—"

ঝুম্‌মর সেলাম করিল। তাহার পর সসঙ্কোচে হাসিয়া ধরা-গলায় পুনরায় আবেদন জানাইল—"এক টুকরা পাঁওরোটি মিলতিয়ে মাইজি, রাতি সে ভুখলো ছি—"

গ্রামের দুইটি বেকার বাঙালী যুবককে উৎসাহিত করিয়া শঙ্কর এখানে একটি "বেকারি" স্থাপন করাইয়াছে। শঙ্কর সেখান হইতে রোজ পাউরুটি লয়। ঝুম্‌মর শঙ্করেরই উচ্ছিষ্ট পাঁউরুটি মাঝে মাঝে দুই এক টুকরা খাইয়া দেখিয়াছে। চমৎকার খাইতে! একটু চা দিয়া ভিজাইয়া লইলে তো আরও চমৎকার, চিবাইতে হয় না, ভিজিবামাত্র নরম তুলতুল করে।

"গরীব মানুষের আবার পাঁউরুটি খাওয়ার সখ কেন রোজ রোজ—মুড়ি খাও না চারটি—"

ঝুম্‌মর একটু অপ্রস্তুত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

খুকী বলিল—"পালুটি কাবে? পালুটি? দিত্‌তি"

খুকী ভাণ্ডার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মীট সেফে কোথায় পাঁউরুটি থাকে তাহা তাহার অজানা নাই।

"বাবা বাবা, মেয়ের কর্ত্তাত্তির জ্বালায় গেলাম—"

মেয়ের পিছু পিছু অমিয়াও ভাণ্ডার ঘরে ঢুকিল এবং ঝুম্‌মরের জন্য একটুকরা রুটি তাহার হাতে দিল।

"আলগোছে দিও ছুঁয়ো না যেন"

"আত্‌তা"

শঙ্কর এতক্ষণ বাহিরের ঘরে নানাবিধ লোক পরিবৃত হইয়া নানারূপ সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিল। একটু ফাঁক পাইয়া সে ভিতরে আসিল একটু চায়ের আশায়। পূজা সারিয়া অমিয়া এই সময় একটু চা-পান করে, শঙ্করও প্রায়ই এ সুযোগ ছাড়ে না। আসিবামাত্র খুকু তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

"হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ—"

মানে কোলে কর। কোলে তুলিয়া লইতে হইল।

"তোমার চা খাওয়া হয়ে গেল না কি"

"না। এসো না—"

"হামরো এক জরা দিঅ মাইজি"

"মুখপোড়ার পাঁউরুটি চাই, চা-ও চাই! সুখ আর ধরছে না"

হাসিয়া শঙ্করের দিকে চাহিয়া অমিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

"গল্‌লা বঝি গেলছে মাইজি"

"হাসপাতাল থেকে ওষুধ নাওগে যাও না। তোমাদের জন্যে তো হাসপাতাল করিয়ে দেওয়া হয়েছে—"

ঝুম্‌মর বলিল যে হাসপাতালে সে গিয়াছিল, তাহার গলায় কি একটা ঔষধ তাহারা লাগাইয়াও দিয়াছিল কিন্তু কোন উপকারই হয় নাই বরং আরও বেশী বসিয়া গিয়াছে।

অমিয়া শঙ্করকে বলিল—"এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার বাবুটি তেমন সুবিধের নয়। হয় কিছু জানে না, নয় গরীবদের ভাল করে' দেখে না। আমাদের দাইটার আমাশয় তো মাসখানেক থেকে কিছুতেই সারছে না অথচ রোজ ওষুধ খাচ্ছে—"

"কি করি বল, শিক্ষিত লোক দেখেই তো রাখা হয়েছে। এখুনি বেরুব একবার তখন খোঁজ করব—"

ঝুম্‌মরকে বলিল—"চা পি-কে হামারা সাথ তুম চলো দাবাকা ইন্‌তিজাম কর দেঙ্গে"

শঙ্কর হিন্দি ভাল জানে না। হিন্দি, ভাঙা উর্দ্দু, মোচড়ানো বাংলা প্রভৃতি মিশাইয়া একটা খিচুড়ি ভাষায় যাহোক করিয়া কাজ চালাইয়া লয়।

'ইনতিজাম' শব্দটা ঝুম্‌মর ভাল বুঝিল না, কিন্তু শঙ্করের কথার সারমর্ম্ম বুঝিতে তাহার বিঘ্ন হইল না। সে বসিয়া রহিল।

ঝুম্‌মরকে সঙ্গে লইয়া শঙ্কর হাসপাতালে গিয়া দেখিল—সেখানে অনেক রোগী ভীড় করিয়া রহিয়াছে কিন্তু ডাক্তারবাবু নাই। তিনি উৎপলকে দেখিতে গিয়াছেন। উৎপলের নাকি পরশু হইতে শরীর খারাপ। শঙ্করও তিন চারদিন উৎপলের খবর পায় নাই, উৎপলের বাড়িতে যায় নাই। সে ঝুম্‌মরকে হাসপাতালে বসাইয়া উৎপলের বাড়ি চলিয়া গেল।

৬

নিজের বাড়ির সম্মুখের প্রশস্ত গোলাপ বাগানে দাঁড়াইয়া উৎপল কয়েকটি সদ্য-ক্রীত মূল্যবান গোলাপ-চারার বিষয়ে মালীকে উপদেশ দিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

"তোমার কথাই ভাবছিলাম। এত লোকের এত উপকার করে' বেড়াচ্ছ আমার একটু কর না।"

"হয়েছে কি তোর।"

"সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ওই দেখ ওধারের স্নো কুইনটার কি দশা, এ দিকে এভারেষ্টও যায় যায়—ডিউক অব ওয়েলিংটন পর্য্যন্ত ঘায়েল হয়ে পড়েছে—"

শঙ্করকে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে দেখিয়া উৎপল বলিল—"অমন ভ্রূকুটি করবার দরকার নেই, খুব সাংঘাতিক কিছু নয়—উই। উই ভার্স্যাস we। তামাকের জল দিয়ে দিয়ে পরিশ্রান্ত হয়েছি, তোমার যদি কিছু জানা থাকে বল"

সহসা থামিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ সিগারেট খাওনি মনে হচ্ছে—"

পকেট হইতে সোনার সিগারেট কেস বাহির করিয়া উৎপল সেটি শঙ্করের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। একটি সিগারেট তুলিয়া লইয়া শঙ্কর বলিল, "তোমাকে তখুনি বলেছিলাম ওই প্রমথ ডাক্তারকে রেখ না, লোকটা বড় বেশী কথা বলে আর একের নম্বর ফাঁকিবাজ—"

"কেন, কি করেছে—"

"এখনি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। বহু রোগী বসে' আছে অথচ তার পাত্তা নেই। হাসপাতালে বলে এসেছে যে তোমার না কি অসুখ তুমি ডেকে পাঠিয়েছ। তোমার যে কিছু হয় নি তাতো দেখতেই পাচ্ছি—"

উৎপল অপ্রতিভ হইল।

"I stand rebuked. আমিই ডেকে পাঠিয়েছি—ভদ্রলোক এখানেই আছেন"

"কি হয়েছে তোর!"

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

"চলতি ভাষায় সর্দি, ডাক্তারি ভাষায় ইনফ্লুয়েঞ্জা"

"এতেই এত ভয়?"

"ভয় অসুখকে নয় সুরমাকে। আয় ভেতরে আয়—"

ভিতরের সুবিস্তৃত দালানে প্রমথ ডাক্তার ও বীরু খানসামা ছিল। প্রমথ ডাক্তার বীরুখানসামার অন্তরে সম্ভ্রম উদ্রেক করিবার মানসেই সম্ভবত তাহাকে সবিস্তারে বুঝাইতেছিলেন—ব্রংকাইটিস কেট্‌ল্ কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, ফুটবাথ দিতে হইলে জলের উত্তাপ ঠিক কতটা হওয়া প্রয়োজন, অ্যাসপিরিন নামক ঔষধের ডোজ—কি দোষ কি কি, অ্যাসপিরিন না দিয়া তিনি ভেরামন কেন ব্যবহার করিতেছেন, উৎপলের চিকিৎসার জন্ত কি কি 'প্রি-কশান' তিনি লইবেন—এমন সময় উৎপল ও শঙ্কর আসিয়া প্রবেশ করিল। বীরু পাশের দরজা দিয়া সুট করিয়া সরিয়া পড়িল—প্রমথ ডাক্তার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"এটা কি!"

শঙ্কর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

"ওটা হচ্ছে সার ব্রংকাইটিস্ কেট্‌ল্। বেশী কাসি হলে কিম্বা লাংসে কোন অ্যানটিসেপটিক দিতে হলে আমরা এটা ব্যবহার করি—"

বুক-খোলা-জামা গায়ে মাল-কোঁচা-মারা প্রমথ ডাক্তার বেশ সপ্রতিভ ব্যক্তি।

উৎপল প্রমথ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি হাসপাতাল ফেলে চলে এসেছেন, শঙ্করের কাছে আমাকে বকুনি খেতে হল—"

"হাসপাতালে আপনি গিয়েছিলেন না কি সার, কোন দরকার ছিল—"

"একটা রোগী নিয়ে গিয়েছিলাম"

"ও, চলুন যাচ্ছি—কি রোগী"

"ঝুমুমরটাকে নিয়ে গেসলাম। ওর কাসি কিছুতেই সারছে না, গলাটা ভেঙেই আছে, ওই বেচারার উপজীবিকা—"

ডাক্তারবাবু ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। "ঝুমুমর? কই, চিনতে পারছি না"

"ওই যে কাঠের পা পরে' বেড়ায়, সব রকম জানোয়ারের ডাক ডাকে—"

"বুঝেছি বুঝেছি। ওর গলায় তো রোজ থ্রোট পেন্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সার—মেণ্ডেলস পিগমেণ্ট দিচ্ছি—"

"কমছে না কিন্তু"

"গলার ভেতরটা একবার explore করা দরকার। করিই বা কি করে'—আমাদের ল্যারিংগোস্কোপ যে নেই—"

উৎপল এতক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সবিস্ময়ে ব্রংকাইটিস্ কেটল্‌টাকেই নিরীক্ষণ করিতেছিল।

"এটা কি আমার জন্তেই এনেছেন?"

"হাঁ, সার—"

"হাসপাতাল থেকে?"

"হাঁ, সার। রাত্রে যদি কোন ফিট অফ কাফ টাফ হয় দরকার লাগতে পারে।"

উৎপলকে নীরব দেখিয়া এবং তাহার নীরবতার কারণ অনুমান করিয়া লইয়া ডাক্তারবাবু পুনরায় বলিলেন—

"স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলবে—ব্র্যাণ্ড নিউ আছে—"

"আছে না কি? আচ্ছা। আপনি আপনার প্রেসক্রুপশন ডিরেকশন সব লিখে রেখে যান—"

"সারটেনলি"

ডাক্তারবাবু পটাং করিয়া বুক পকেট হইতে ফাউণ্টেনপেন বাহির করিয়া লিখিতে বসিয়া গেলেন।

শঙ্কর বলিল—"ল্যারিংগোস্কোপ আনা যদি দরকার মনে করেন আনিয়ে নিন না—"

"বলেন তো আজই অর্ডার প্লেস করে দি"

প্রমথ ডাক্তার লিখিতে লিখিতে উত্তর দিলেন।

"দিন"

"আয় ওপরে আয়—"

উৎপল সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

"যাচ্ছি—"

প্রমথ ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া শঙ্কর বলিল, "ঝুমুমরটাকে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এসেছি। আপনি তাহলে গিয়ে তার একটা ব্যবস্থা করে দিন—"

"সারটেনলি। একটা গার্গারিসমা দিয়ে দেখি আজ। পরে না হয় লিংটাস্ দেব যদি না কমে—"

উৎপল উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, শঙ্করও অনুগমন করিল। ডাক্তারবাবু প্রেসক্রুপশন ও ডিরেকশন লিখিতে লাগিলেন।

সুরমা স্পিরিট ষ্টোভে দুধ গরম করিতেছিল। শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইতেই উৎপল সুরমার দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার জন্তে শঙ্করের কাছে বকুনি খেতে হল—"

সুরমা কিছু না বলিয়া স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে চাহিল ও স্পিরিট ষ্টোভ হইতে দুধটা নামাইয়া নিপুণভাবে একটি সুদৃশ্য পেয়ালায় ঢালিল—এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না—এবং নীরবে বাহির হইয়া গেল।

মৃদু হাসিয়া উৎপল বলিল—"দশটা বাজল"

"তা হবে বোধ হয়—"

"বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। দুধ গরম করে' কাপে ঢালা হয়ে গেছে যখন—"

পাশের ঘরের একটা ঘড়িতে টং টং করিয়া দশটা বাজিল।

"ওই শোন। এখন সমস্তা ওইটি গলাধঃকরণ করতে হবে! কি মুশকিল—"

"খিদে না থাকলে জোর করে' খাওয়াবে না কি—"

"ওই তো মজা, জোর করে না কখনও। ঠিক সময়ে দুধটি গরম করে পাশে রেখে যাবে, হয় তো একবার বলবে খাও—যদি না খাও কিছু বলবে না, মুখও যে ভার করে' থাকবে তা নয়; কিন্তু কেমন যেন সর্বদা মনে হতে থাকবে নেপথ্যে ও চটেছে—সে এক ভারী অস্বস্তি, তার চেয়ে খাওয়াই ভাল—"

"এ সময়ে রোজ দুধ খাস না কি"

"তোমার ওই ডাক্তার এসে ব্যবস্থা করেছে। ডাক্তারের বাক্য সুরমার কাছে বেদবাক্য—"

সুরমা আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবামাত্র উৎপল থামিয়া গেল এবং নিতান্ত ভালমানুষের মতো মুখ-চোখ করিয়া

বলিল, "শঙ্করকে বলছিলাম সুরমা হয় তো তোমাকে কফি না খাইয়ে ছাড়বে না"

"কফির কথা বলতেই গেসলাম—"

শঙ্কর বলিল, "আমাকে কিন্তু এখনই উঠতে হবে। বেশী দেরী করতে পারব না"

উৎপল গম্ভীর মুখে সুরমার দিকে চাহিয়া ছদ্ম আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, "না দেরী করিয়ে দিও না, দেশের কাজে বাধা দেওয়া অন্যায়। একেই তো তুমি সকাল বেলা ডাক্তারকে ডেকে গরীবদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছ"

"আমরা গরীব নই বলে' বিনা চিকিৎসায় মারা যাব না কি"

এই বলিয়া সুরমা ঘরের কোন হইতে একটি চৌকো ফ্রেম বাহির করিল এবং স্মিতমুখে শঙ্করের দিকে একবার চাহিয়া অর্দ্ধ-সমাপ্ত কার্পেটের আসনটিতে মন দিল।

"কেন, আপনারা তো চরণবাবুকে ডাকতেন। তিনি ডাক্তারও ভাল, লোকও ভাল, কারও চাকরি করেন না, তিনিই তো বেশ ছিলেন, তাঁকে ছাড়লেন কেন"

"তাঁকেই ডাকতে পাঠিয়েছিলাম, তিনি এলেন কই। তাঁকে পাওয়া শক্ত। পরশু বললেন ছুটোর সময় যাব, কাল তিনটে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে বীরুকে পাঠালাম সাইকেল করে'। তিনি বললেন—আমার এখনও কয়েকটা গরীব রোগী দেখতে বাকি আছে তাদের দেখে তবে যাব। আমরা যেন বড়লোক হয়ে চোরের দায়ে ধরা পড়েছি—"

সুরমা কার্পেটের আসন বুনিতে সুরু করিয়া দিল। উৎপল দুধের কাপটা তুলিয়া এক চুমুক পান করিয়া নীরবে আবার তাহা নামাইয়া রাখিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিয়া গেল। আসনের ফুলগুলির দিকে চাহিয়া শঙ্কর বলিল, "বাঃ, আসন তো বেশ চমৎকার হচ্ছে আপনার—"

উৎপল বলিল, "তা হচ্ছে। কিন্তু ওতে তোমার বা আমার কোন লাভ নেই"

"কেন"

"আমরা পাব না। প্রত্যেক মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতের বসবার জন্যে একটি করে' দান করবেন উনি ঠিক করেছেন—"

"বেশ, ভালই তো"

"ও! কুন্তলা দেবীর সঙ্গে তোমারও আলাপ হয়েছে না কি"

"না। তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি"

"তিনিই এই সদিচ্ছাটি ওঁর অন্তরে—তোমরা সাহিত্যিকেরা যাকে বল উদ্বুদ্ধ—তাই করেছেন! তোমারও সহানুভূতি দেখে মনে হচ্ছে যে হয় তো তোমার সঙ্গেও—"

"না আলাপ হয় নি, কিন্তু আলাপ করতে হবে। ওঁর সম্বন্ধে যা শুনি তাতে মনে হয় চেষ্টা করলে ওঁকে হয় তো আমাদের কাজে লাগাতে পারা যায়—"

সুরমা আপন মনে বুনিতেছিল।

এই কথায় বলিল, "আপনাদের এই ধরণের পল্লীসংস্কার ওর পছন্দ-সই নয়—"

"তাই না কি? বলছিলেন কিছু?"

"একদিন কথা হয়েছিল তাতেই আভাসে বুঝলাম"

'আভাস' কথাটা শুনিয়া উৎপল ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া সুবোধ বালকের ন্যায় দুধের কাপটি তুলিয়া আর এক চুমুক পান করিল।

"আভাসে বুঝেছেন মানে?"

"এ নিয়ে তর্ক করলে হয় তো ওর মনের ভাবটা স্পষ্ট বোঝা যেত, কিন্তু তা আর আমি করি নি। কি হবে বাজে তর্ক করে' ওর সঙ্গে—"

"বিশেষত হেরে যাবার সম্ভাবনাটাই যখন বেশী"

উৎপল ফোড়ন কাটিল।

ইহাতে সুরমা চটিল না, মুচকি হাসিয়া বলিল—"তাও ঠিক। ভয় করে ওর সঙ্গে তর্ক করতে—"

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "খুব মুখরা না কি?"

"না। খুব কম কথা বলে। দারুণ সংস্কৃত জানে বলে' ভয় হয়!"

উৎপল দুধের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিল এবং বলিল, "সুরমার কাছে ওঁর সঠিক চিত্রটি পাবে না।"

"কেন?" শঙ্কর প্রশ্ন করিল

"দুজনে বন্ধুত্ব হয়েছে"

সুরমা হাসিল, শঙ্করও হাসিল।

উৎপল বলিল—"পাশের ঘর থেকে সেদিন আমি যতদূর আন্দাজ করেছিলাম তাতে ওঁর সম্বন্ধে একটি উপমাই আমার মনে হয়েছিল—সুরমা যদি রাগ না করে বলতে পারি—"

সুরমা সহাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। কোন প্রকার মন্তব্য করিল না।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপমা, শুনিই না"

"কামান। কামানও বেশী কথা বলে না, কিন্তু যখন বলে তখন একেবারে কনভিনসিং"

কফির সরঞ্জাম লইয়া ভৃত্য প্রবেশ করিল এবং ছোট একটি টেবিলে সেগুলি রাখিয়া টেবিলটি আগাইয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

"আর কিছু খাবেন?"

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না"

সহসা শঙ্করের অনাহার-ক্লিষ্ট ঝুমুরের কথা মনে পড়িল। সে হয়তো তাহার অপেক্ষায় এখনও হাসপাতালে বসিয়া আছে। ডাক্তারবাবু এবার তাহাকে ঠিক-মতো ঔষধ দিয়াছেন কি না কে জানে।

ক্রমশঃ

যুদ্ধ ও খাদ্য
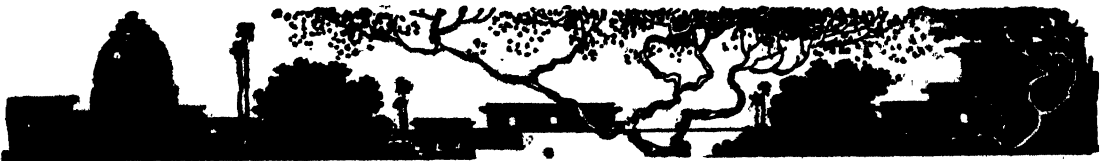
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ইয়োরোপের মহাসমর তিন বৎসর পার হইয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে এবং পরমায়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শশীকলার মত শ্রীবৃদ্ধি হইতে দেখা যাইতেছে। আমাদের নিকট যুদ্ধ ভীতিটা ভূতের ভয়ের মত ভীষণই ছিল। ভূত আছে কিম্বা নাই—সে সম্বন্ধে মতৈক্য থাক্ আর নাই থাক্, ভয়টা কম নয়। যুদ্ধের ভূত কোনও অমাবস্যায় রাত্রে ইয়োরোপের স্যাওড়া গাছ হইতে নামিয়া আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিতে উদ্যত হইবে কি-না, প্রথমে ইহাই ছিল ভীতিবিহ্বল জল্পনা কল্পনার বিষয়বস্তু। অনেকে ভাবিতেন, আমাদের রাম নামের দাপটে ভূত মহাশয় ভাগাড় দিয়াই প্রস্থান করিবেন, আমাদের ঘাড় অটুট থাকিবে। অনেকে মনে করিতেন এবং এখনও মনে করেন যে একালের ভূত রাম নামে ডরায় না, আমাদের স্কন্ধ তাহার আসল লক্ষ্য। কথাটা নানা রকমে সত্যের রূপ ধারণ করিতেছে। মোটে গোটা কয়েক বোমা পড়িয়াছে, তদধিক কিছু হয় নাই সত্য এবং এ্যাক্‌চুয়্যাল ফাইটিও সুরু হইতে হয় ত দেরীও আছে ইহাও ঠিক—কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে-ফাইটিং মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের রূপ ধরিয়াছে তাহাতেই জান্ নিকাল যায় যায়! আমরা বেলি ফাইটিঙের কথা বলিতেছি। আগেকার দিনে চালের দাম পাঁচ অথবা ছয় টাকা হইলে লোকের ভাবনার অন্ত থাকিত না, এখন সেই চাল এক কুড়ি টাকার ওপর! আগেকার কালে নূতন ধান উঠিলে চালের দাম পড়িয়া যাইত, লোকে একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিত, এখন নূতন আসিল, নূতনও পুরাতন হইয়া গেল, দাম পড়া দূরের কথা, চড়া ছাড়া কথা নাই। ঋতুরাজ বসন্তের আগমন ও নির্গমন সম্বন্ধে আমাদের কোন ধ্যান ধারণা জন্মে না (যেহেতু আমরা কবি নহি! আমাদের কাছে বসন্ত মহামারীরূপেই পরিচিত।) বলিয়া কবি দুঃখ করিয়া গাহিয়াছিলেন, 'কখন্ বসন্ত এল এবার হ'ল না গান', কখন যে শরৎলক্ষ্মী নবীন ধানের মঞ্জরী সাজাইয়া আসিলেন এবং নবোঢ়া বধূটির মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রস্থিত হইলেন তাহা জানিতেও পারা গেল না।

প্রবল জ্বরের সঙ্গে গায়ের উত্তাপ, শিরঃপীড়া, বমন-বেগ প্রভৃতি উপসর্গাদির উদ্ভব নিতান্তই স্বাভাবিক, প্রধান খাদ্য চালের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি তেমনই স্বাভাবিক। একজোড়া ধুতি বা শাড়ী কিনিতে হইলে একখানা দশ টাকার নোটের মায়া ছাড়িতে হয়। এক জোড়া কাপড় ক'মাসই বা চলে? এক জোড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ হইতে লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা-কুটুম্বিতা, আফিস-আদালতই বা কেমন করিয়া চলে? তারপর জামা আছে, জুতা আছে। আরে আছে সবই! আহা-আহ্নির কথায় কি শেষ আছে? না, সীমা আছে? খাওয়া এবং পরা দুইটাই বড় কথা বটে, কিন্তু গাছ থাকিলে যেমন ডাল-পালা, পাতা শিকড় থাকিবেই, মানুষ থাকিলে তাহার হাত পা চোখ কান পিঠ পেট না থাকিয়া পারে না, খাওয়া-পরার বায়নাক্কাই কি কম! খাওয়ার কথা যদি ধর, কেবল চাল হইলেই চলিবে না, চালের সঙ্গে ডাল চাই, দু'টা আলু চাই, একটুখানি শাক চাই, দু'টা বেগুন চাই—আর চাহিতে চাহিতে একটু তেল কিম্বা একটুখানি মশলা না চাহিব? কিছু যদি না'ও চাই, নুন না হইলে ত চলিবে না। ছেলেপুলে যদি দু' একটা থাকে, দুধ যদি নাই পাওয়া যায়, পিটুলী গুলিয়া দিতে হইবে—পিটুলী ত চালেরই রূপান্তর। যে জিনিষগুলার নাম করা গেল, তাহার কোনটা যুদ্ধে যায় না বটে কিন্তু যুদ্ধের বাজারে দামের পারদ-রেখাটা কোন্ ডিগ্রীতে গিয়া ঠেক্ খাইয়াছে তাহা দেখিয়াই চক্ষুঃস্থির! তার-পর, পরার কথা। কাপড়ের দামের কথা সবাই জানেন, জামারও তাই, জুতারও তাই, গেঞ্জিরও তাই—উড়ুনী যে উড়ুনী, হাত দিতে গেলে আঙ্গুলে ফোস্কা উঠিয়া পড়ে। তারপর চাকর বলে, যুদ্ধ বাধিয়া মাহিনা বাড়াইতে হইবে; ধোপা বলে, বাজারে সোডার দাম আগুন, দাম বাড়াইতে হইবে; মুটে বলে, যুদ্ধ; মুচী বলে যুদ্ধ; ময়রা বলে যুদ্ধ। কয়লা-ওয়ালা বলে, ওয়ার্কস ওয়ার; গোয়ালা বলে, অজন্মা, খড় মিলে না, দুধ দু' সের টাকায়। আটা-ওয়ালা বলে, যুদ্ধ, গম নাই, টাকায় এক সের আটা। সেকালে আদার ব্যাপারী (ক'ড়ে নয়)ও জাহাজের খবর রাখিত না, এখন তাহারা শুধু জাহাজ নয়, ইউবোট, সাবমেরিণ টর্পেডোর সংখ্যা-নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত করিতে পারে। পালঙ শাক বিক্রেতা বলে, পালঙে ভিটামিন প্রচুর, স্বাস্থ্য ভাল হইবে কিন্তু যুদ্ধ! মাথা থাকিলে কেশ থাকিবে (আহা ইন্দ্রলুপ্ত হইত ত ভাল হইত!) কেশ থাকিলে মুণ্ডন করাও দরকার; কিন্তু যুদ্ধ, হিটলার নারকোল সব গোগ্রাসে গিলিতেছে। গৃহিণীরা দগ্ধ-বদন হিটলারের অষ্টকুষ্টির সন্তান তোজোরও সেই সঙ্গে আমরণ শুক্ষশ্রহীন গবর্ণমেণ্টের চৌদ্দপুরুষের মষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার করতঃ সপ্তাহে আরোহণ করিয়া তাথিয়া নাচিয়া দিনাতিবাহিত করিতেছেন। কর্ত্তার দলের এত সহজে নিষ্কৃতিলাভ ঘটিতে পারে না। গৃহিণীগণের অস্থি কয়খানি ভর্জ্জিত হইবার আশঙ্কায় খাওয়া-পরার যোগাযুগি উপকরণগুলি সংগ্রহ করিতেই হইবে। হইতেছেও। মুখে যতই বলা যাক্, আর পারি না! না পারিয়া উপায়ও ত নাই। জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি, কথা খাঁটি! কিন্তু তিনিও বোধহয় যুদ্ধের ডামাডোলে হাত গুটাইয়া ফেলিয়াছেন। পুরীর পুরুষোত্তমদেবকে (সাগ্রজ—সানুজা!) বলিবার কিছু নাই, কেননা, তাঁহাদের হাতই নাই, কি করিবেন? বলিলে বলিবেন কি করিব বাপু, আমাদের ত হাত নাই। যেমন আমাদের গবর্ণমেণ্ট বলেন, গোপন মজুতদারেরা মাল হোর্ড করিতেছে, আমরা কি করি বল? আমাদের ত হাত নাই! হাত যদি না থাকে, কোন কিছু করারও উপায় নাই, তা' আমরা মানি। সেই জন্য জগন্নাথকে কিছু বলি না। কিন্তু সরকার বাহাদুর টুঁটো হইলেন কবে? বাল্মীকীর হাজারখানেক মাথা, পুরাণে বলে আর সরকারের লাখখানেক হাত, ইহা ত চোখেই দেখা যায়। চোখের ব্যাপারেও শুনি, তাঁহারা দশটা ইন্দ্র জোড়া দিলে যাহা হয় তাহাই, অর্থাৎ দশসহস্র লোচন। গোপন মজুতদার কি এমনই ধূম্রলোচন যে সরকারের লোচনে ধুঁয়া দিয়া দেয়! তাজ্জব বটে! আমরা জানিতাম, খোদার উপর-আলা নাই; কিন্তু দেখিতেছি, খোদকারী যাহারা করে, তাহাদের কাছে তিনিও লোয়ার-সব-অর্ডিনেট!

গৃহিণীরা এবং কর্ত্তারা বলেন, যুদ্ধ শেষ হইলে বাঁচি, বাপু! কেবল যাহারা যুদ্ধের কাজে ঠিকাদারী করিয়া লাল হইতেছে তাহারা—আর যাঁহারা যুদ্ধের আফিসে চাকরী পাইয়া দু' চার পয়সার মুখ দেখিতেছে তাঁহারা ছাড়া সবাই ভাবিতেছে ও বলিতেছে, একটা এস্পার ওস্পার হইয়া গেলে বাঁচা যায়! কিন্তু বাঁচা কিরূপে যাইবে সেইটা লইয়া আমি বিষম ভাবনায় পড়িয়াছি। গল্প শুনিয়াছি একজন গাঁজাখোর মারা গিয়াছিল। যখন তাহার শব শ্মশানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, সেই সময়ে তাহার একজন কলিগ্ (সম্ভবতঃ নন্দী-ভৃঙ্গীর নন্দী অথবা ভৃঙ্গী) ছুটিয়া আসিয়া বলিল, উঁহু অমন কাজ করো না। এখনও গাঁজা খেলে বাঁচতে পারে। দাঁড়াও এক ছিলিম্ তৈরী করি। আমাদের জন্যও গাঁজা সাজার দরকার হইবে।

যুদ্ধের সময় মধ্যে খাদ্যাভাব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়া সকলেই আমরা যুদ্ধকেই দায়ী করিতেছি এবং যুদ্ধের অবসানে খাদ্য বাহুল্য হইবে ধরিয়া লইয়া, যুদ্ধ কবে ও কোন নাগাদ শেষ হইবে তাহারই চিন্তায় মশ্‌গুল্ হইয়া রহিয়াছি। একবারও ভাবিতেছি না যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া খাবার জিনিষের দাম কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমিবার নামটি করে না কেন? যাহাদের পল্লীগ্রামের সহিত কুটুম্বিতা এখনও আছে এবং পল্লীগ্রামে দুই দশ বিঘা ধেনো জমি যাহাদের আছে, তাহারা, বৎসরের পর বৎসর জমির ধান কিরূপ কমিয়া যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তান্বিত না হইয়া পারিতেছে না। যে জমির ধানের দৌলতে সারা বৎসরের অন্ন বস্ত্রের কোন সমস্যা ত ছিলই না, উপরন্তু তাহা হইতে বার মাসে তের পার্ব্বণ না হোক, পূজাটা আসটা, মনসার গান যাত্রা সবই হইত, কয় বৎসরের মধ্যে সেই ধান এমন হইয়া পড়িয়াছে যে কৃষক তাহার ছেলেকে ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ পড়াইয়া দরখাস্ত বগলে সহরে অফিস আদালতের দরজায় ধর্ণা দিতে পাঠাইতে পারিলে বাঁচে। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশটার সামাজিক ইতিহাসের যে-টুকু পরিচয় আছে, তাহাতে দেখা যায়, দেশের জমি স্বর্ণ প্রসব করিত বলিয়া দেশের লোকগুলার অধিকাংশ নিষ্কর্ম্মা, গল্পে, আড্ডাধারী হইলেও কাহারও একতিল ক্ষতি অথবা বৃদ্ধি ছিল না। চাষের সময় মাঠে মাঠে ঘুরিত, ফসল তুলিবার সময়ও কিছু পরিশ্রম করিত আর বাকী সময়টা তাস পাসা খেলিয়া, টপ্পা বাউল গাহিয়া পুকুরে ছিপ ফেলিয়া তামুক খাইয়া দিব্য কাটাইয়া দিত। ইহারা দোল দুর্গোৎসব করিত। বারোয়ারী উপলক্ষে মহোৎসব বসাইয়া দিত; ষষ্ঠী মার্কণ্ডের পূজা হইতে স্বর্গীয় ব্যক্তিদের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বিশ পঞ্চাশখানা পাতা পাতাইতে না পারিলে আপনাকে কুলাঙ্গার মনে করিত। সেই বাঙ্গালা দেশ, বাঙ্গালা দেশই আছে, কৃষক সেই কৃষকই এবং বলদ জোড়া তেমনই লাঙ্গল চষে; চাষা-বৌ তেমনই মুড়ি ভাজিয়া মাঠে দিয়া আসে—বীজ বপনের গান, ধান্য রোপণের গাথা, নবান্নের সঙ্গীত, ধান কাঠার গান, ধান আছড়ানোর ছড়া, সব সেই আছে কিন্তু মরাইয়ের পেট ভরে না কেন? যেখানে দশটা মরাই ছিল, সেখানে দু'টি দেখা যায় কেন? সে দু'টিও বামনাকার ধরিয়াছে কেন? পুরুষানুক্রমে জমির উপসত্ব ভোগ করিয়া পল্লীগ্রামে বাস করিয়া যাহারা দশ বিশটা কৃষাণ, খানসামা, রাখাল রাখিয়া, শাল দোশালা চড়াইয়া মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গ রচনা করিত, আজ তাহারা জমিগুলা প্রজা অথবা ভাগে বিলি করিয়া বাড়ীগুলাকে চাবী বন্ধ করিয়া শেয়াল কুকুর বাঁদুড় চামচিকাকে কেয়ার টেকার নিযুক্ত করিয়া সহরে গিয়া বাসা ভাড়া করিয়া চাকরীর সন্ধানে লালায়িত হয় কেন? বেশী নয়, বিগত পঁচিশ বৎসরের জমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ লক্ষ্য করিলেই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে। যাঁহারা এই হ্রাসের পরিমাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা—চিন্তা হইতে দুশ্চিন্তায় পতিত হইয়াছেন—তদতিরিক্ত কিছু নয়। গবর্ণমেণ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু গরীবের চালে ফুটা হইলে বর্ষার প্রারম্ভে সে বেচারা যেমন গোঁজা-গুঁজি দিয়াই মাথাটা গুঁজিয়া থাকিবার ভরসা করে, গবর্ণমেণ্টও সেই গোঁজামিলের ব্যবস্থাই করিয়া আসিতেছেন। তদতিরিক্ত কিছু নয়; কারণ তদধিক বিদ্যাও তাঁহাদের নাই। জলের অভাব বুঝিলে ইরিগেসন্ ক্যানেল কাটিয়া দিয়াছেন; দেশী সারে কাজ হয় না বিবেচনা করতঃ বিদেশী অথবা রাসায়নিক ম্যানিওর দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু 'হরে দরে' সেই হাঁটু জল। উনিশ ও কুড়িতে যতটুকু পার্থক্য, মাত্র ততটুকু। গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ দোষ দিই না। এই দেশে গবর্ণমেণ্ট বলিতে আজও দেশের লোক থাজা গজাদের বুঝে না, গবর্ণমেণ্ট বলিতে খোদ সরকার বাহাদুরকেই বুঝে। বুঝাটা যে খুব অন্যায় তাহাও নয়। অন্য বিষয়ে যাহাই হোক, খাদ্য-বিষয়ে ইংরাজ পরের মাথায় হাত বুলাইতেই অভ্যস্ত। তাহার দেশে এত জমি নাই যে চাষ করিয়া ফসল উৎপাদন করিয়া দেশের লোকের জঠরাগ্নি নিবাইতে পারে। তাই এখানকার কলাটা, ওখানকার মাকড়টা, এর ক্ষেতের মূলা ওর ক্ষেতের শশা এই রকম করিয়া সংগ্রহ করিয়াই দিন গুজরাণ করিতে হয়। কৃষি বিষয়ে অজ্ঞ ইংরাজ যখন বিশেষজ্ঞ হইয়া প্রদেশের কৃষির উন্নতি করিবার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়া পড়িল—কমিশন বসাইল, বৈঠকে বৈঠকে ধূলা পরিমাণ করিয়া ফেলিল, তখন কৃষি লক্ষ্মী বোধ করি কোন আড়ালে বসিয়া করুণ হাসি হাসিলেন। তা তিনি হাসুন, ইংরাজ কিন্তু দমিবার জাত নয়। কৃষি-দপ্তর খোলা হইল, কৃষি মন্ত্রী আসিলেন, কৃষি, কৃষি, কৃষি! কৃষি ছাড়া কথা নাই —ডাল ম্যানিওর চালা ট্রেক্টর, সেঁচ খালের জল—দানসাগর শ্রাদ্ধ পর্ব্ব! যে জমি বিঘায় দশ মণ দিত, ভূরিভোজনে পরিতুষ্ট হইয়া দিল আট মণ। যদি বল, কৃষি-দপ্তরে দেশী লোক ছিল, কৃষি-মন্ত্রী ত এ দেশের লোকই হয়, ইংরাজের বুদ্ধির ভাঁড়ারে না হয় অষ্টরম্ভা স্বীকার করিয়া লওয়া গেল, এই দেশী লোকগুলা কি করিল? কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশী লোকগুলা (অর্থাৎ আমরা সকলেই) কাকাতুয়া জাতীয় পক্ষী ছাড়া আর কিছুই নই। ইংরাজ যাহা শিখাইয়াছে, তাহাই শিখিয়াছি, ইংরাজ যাহা শিখায় নাই, তাহা শিখি নাই, তাহা বিদ্যা নয় অবিদ্যা! ইংরাজ 'তারা' বুলি শিখাইয়াছে, দাঁড়ে বসিয়া, চানা খাইয়া "তাই ডাকে মা তারা তারা।"

একটি কথা খোলসা করা ভাল। বার বার ইংরাজ বলিতেছি, ইংরাজের দোষ দিতেছি দেখিয়া কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠক যেন রাজনীতির বোট্‌কা গন্ধ আবিষ্কার না করিয়া বসেন। মুখ্যতঃ ইংরাজ জাতির সঙ্গে আমাদের ঘর-করণা বলিয়া ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক্ ইংরাজের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইংরাজ একা দোষী নয়, সমস্ত ইয়োরোপ, আমেরিকা—ঠগ বাছিতে গাঁ উজোড়! সুড়ঙ্গ বাহিয়া, সিঁধ কাটিয়া সকলেই বিদ্যার সাজে সজ্জিতা অবিদ্যাকে সাপটিয়া ধরিয়াছে। কীচক যেমন যাজ্ঞসেনীবেশিনী ভীমসেনকে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়াছিল।

খাদ্যের কথাটা খুব বড় করিয়া তাহারা কোনও দিন ভাবে নাই। ভাবিবার দরকারও হয় নাই। তাহাদের দেশগুলা দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর দেশ নয়; অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়ন দরিদ্রনারায়ণ ভোজন প্রভৃতি অবান্তর কথাগুলা তাহাদের অভিধানে লেখা নাই। অভিধান বহির্ভূত কাজ করা তাহাদের কোষ্ঠিতে লেখা নাই; গণিয়া লোক নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণে সম্মতি জ্ঞাপন, লোক গণিয়া 'পাতা' পাতা, ভোজন আসনে বসিয়া উচ্ছিষ্ট হস্তে যাহার যতটুকু ক্ষুধা ততটুকু খাদ্য তুলিয়া লওয়া যে দেশের কৌলিক ব্যবস্থা, সে দেশের লোক খাদ্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইবার দরকার না বুঝিতে পারে। যেটুকু দরকার, সেটুকু যদি দেশে নাই জন্মে, এদেশ সেদেশ হইতে আনিয়া জাত দিয়া, জমাইয়া সাঁতলাইয়া কৌটা পুরিয়া, বরফ চাপা দিয়া রাখিয়া ধীরে সুস্থে খাইতে পাইলেই হইল। যুদ্ধের ঠেলায় এখান ওখান হইতে খাদ্যদ্রব্য আনয়নে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এখন চক্ষু ছানাবড়া! একখানা বিলাতী কাগজে একটি ঘটনা পড়িতে-ছিলাম। খাস বিলাতে টেমস নদীর সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে একটি আস্ত কলা খাইতেছিল। ইহা দেখিয়া শ'খানেক ছেলে ও মেয়ে, বাঘের পিছনে যেমন ফেউ লাগে, মেয়েটির পিছনে তেমনই লাগিয়াছিল। একটা আস্ত কলা একটা মেয়ে একা খায়, এমন একটা অভাবনীয় দৃশ্যে লোক জমিবে না ত কি হইবে! বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণী এমন একটা রাসায়নিক বটিকা প্রস্তুত করিয়াছিল যে এক বটিকা সেবনে যুদ্ধরত সৈনিক অন্ততঃ পাঁচদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণার বালাই বুঝিতে পারিত না।

দরকার রেল চালানো—বড় বড় কারখানায় বড় বড় মাথা ঘামিয়া গেল; দরকার জাহাজ চালানো—ডকে ডকে বৃষোৎসর্গ; দরকার এরোপ্লেন উড়ানো—আকাশের কাকচিল সন্ন্যাস গ্রহণান্তর বনে গেল; দরকার সাবান, কেশ তৈল, সুগন্ধি, সিগারেট, ঔষধ, লাইট, ব্যান্ বহুবিধ হ্যান ও নানাবিধ ভ্যান, লাগাও ইণ্ডাষ্ট্রি—খটাখট, ঝনাঝন, ধপাধপ!

চিমনীর ধোঁয়ায় নীল আকাশ কালো হইয়া গেল! পৃথিবীর বুকে যেন আগুন ধরিয়াছে, পাক দিয়া অহর্নিশি ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

কলকারখানা, ইণ্ডাষ্ট্রিতে যদি উদরের জ্বালা প্রশমিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জার্ম্মানীকে বিশ পঁচিশ বৎসর অন্তর কালাপাহাড়ের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইত না। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানে তাহার যে ব্যুৎপত্তি সর্ব্বাধিক প্রগাঢ়, তাহা চিবাইয়া কামড়াইয়া গিলিয়াই সে তুষ্ট থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না, হইবার নয়। পেটের মধ্যে যে চিতা (রাবণের চিতা?) অহরহ জ্বলিতেছে, তাহাতে ইন্ধন দিতে হইবেই। সে ইন্ধন বসুমতী নামে যে কল্পতরু আছে, তাহাই দিতে পারে; অন্ত কোথায়ও তাহা পাইবার নয়, পাওয়া যায় না। সায়ান্স, কমার্স, ইণ্ডাষ্ট্রির স্বপ্নে বিভোর থাকিতে থাকিতে জ্বলন্ত চিতা যে মুহূর্ত্তে ইন্ধনাভাবে ক্রোধান্ধ হইয়া গর্জ্জিতে থাকে, সেই মুহূর্ত্তেই অরণি-কাষ্ঠের সন্ধানে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে হয়। তাহার জন্ত লাখে লাখে লোককে মৃত্যু বরণ করিতে হয়। পূজাবাড়ীতে দেবীর সম্মুখে দেবীর 'সন্তোষ' বিধানের জন্ত পশুবলির ব্যবস্থার মত খাণ্ড-যজ্ঞে লক্ষ কোটী নরবলির এই ব্যবস্থা।

একটা কথা সহজেই মনে হইতে পারে যে খাভাভাব যদি অনেক দিন হইয়াছিল, এতদিন তাহার উৎকট রূপ প্রকাশ না পাইয়া এই যুদ্ধের সময়ই একচক্রা নগরের রাক্ষসীর বীভৎস মূর্ত্তিতে হাউ মাউ খাউ রবে বাহির হইয়া পড়িল কেন? প্রশ্ন স্বাভাবিক; উত্তর যাহা দিব তাহাও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। ধরুন একটি বুড়ো লোকের কথা। বুড়ো ছিল একরকম ভালয় মন্দয় মিশিয়া। একদিন একটা শক্ত অসুখে পড়িবামাত্র উপসর্গ ত ঝাঁকে ঝাঁকে আসিলই, অধিকন্তু এমন কতকগুলা রোগ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল,যাহার অস্তিত্বও বুড়া বেচারার জানা ছিল না। ডাক্তাররা বলিল, শরীর খলু ব্যাধিমন্দির—ভিতরে সবই পোষা ছিল, এতদিন জোর করিতে পারে তাই, আজ বুড়াকে কাবু দেখিয়া ঘায়েল করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যুদ্ধের সঙ্গে খাণ্ড সঙ্কটের ব্যাপারটা সেইরূপ। পৃথিবীটা রোগশয্যায় শুইয়াছে। রোগ জটিল, দিন কাটে না মাস কাটে, রাত্রি ত নয়, যেন কালরাত্রি। সমস্তই অনিশ্চয়তার মধ্যে হাবু ডুবু খাইতেছে। এই ফাঁড়া কাটাইয়া উঠিতে পারিবে কি-না—পারিলেও অবস্থাটা কিরূপ হইবে বুঝিতে না পারায় অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইবার কোন লক্ষণ নাই। বুড়ার উত্তরাধিকারীরা বুড়ার উইলের উপর কতকটা নির্ভর করিতে পারিলেও এই সময়ে কিছু হাতাইয়া হতাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেও পারে বৈ কি। যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা লড়াইও করিতেছে আবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর গঠন কিরূপ হইবে তাহার গবেষণায় লঙ্কাভাগও করিতেছে। যাহারা ব্যবসা করিতেছে তাহারা যুদ্ধোত্তর কালের জন্ত সঞ্চয়ে মনোনিবেশ না করিবে কেন? ঘর যখন পোড়ে, কিসে 'সিগারেট খায়,' কিসে কি শুধু আকাশেই বেড়ায়, পৃথিবীতে কি তাহার অভাব আছে? অনিশ্চয়তার দুশ্চিন্তায় সকলেই অল্প বিস্তর কাতর। গবর্ণমেণ্টের দুশ্চিন্তা লাখে লাখে সৈন্ত যুদ্ধে রত, তাহাদের ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন। গৃহস্থ ভাবিতেছে, কে জানে বাবা কি হয়, চাল ডাল কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখা ভাল, আর কিছু না-ও যদি জোটে, নুন ভাতটা থাকিলে বাঁচিতে পারা যাইবে। যিনি বড় গৃহস্থ তিনি কিঞ্চিৎ বড় হাতে সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; আর স্বল্পজীবীরা মৌমাছি সাজিয়া গুণ গুণ রবে বাজারে গুঞ্জরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাপড় সেলাই করিয়া, তালি দিয়া, তালির উপরে তালি, হাফসোলের পর ফুলসোল্—তারও পরে রি-সোল্ করিয়া চলিলেও চলিতে পারে কিন্তু উদরে রিপু-কর্ম্মটি সহে না!

অনেকে বলেন, যুদ্ধের দরুণ হাজারে ব্যাজার নাই, লাখে অরুচি নাই, সৈন্ত সামন্ত উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া জাগীদার হইয়াছে বলিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা। কথাটা একেবারে মিথ্যা না হইলেও, বিশ্বের অন্নদাত্রী, জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা ভারতবর্ষের প্রতি আরোপ করিলে জগজ্জননী মাতার নিন্দা করা হয়। যে ভারতবর্ষ নিজের সন্তান সন্ততির অন্নের অভাব পূরণ করিয়া বিশ্বের যে-যেখানে অন্নহীন বুভুক্ষু তাহাকেই ক্ষুধার অন্ন দিত, সেই ভারতবর্ষ কয়েক সহস্র (না-হয় কয়েক লক্ষই হইল।) সৈন্ত সামন্তের চাপেই কুব্জপৃষ্ঠে ন্যুব্জদেহ হইয়া পড়িল, প্রাচুর্য্যেভরা ভারতের পক্ষে এ কথা কি অপমানকর নয়?

ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা আমাদের সেই বসুমতীর কথাতে আসিয়া পড়িতে বাধ্য।

সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত বড় বড় যে ক'টা যুদ্ধ হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার ইতিবৃত্ত লেখা আছে, সে সমস্তগুলা যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ঐ রাবণের চুল্লীটির জন্তই যত লড়াই, যত সংগ্রাম। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ব্যাপারটা দেখ। সেকালের সেই যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন প্রভৃতি যত পুণ্যশ্লোক এবং ভাল লোকই হোন্ না পৃথিবীটাকে কেবলমাত্র পতিহীনা নারীদের মর্ম্মভেদী বিলাপ শুনিবার জন্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হেতুটা কি? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাঁচ ভাই, ইহারাও রাজপুত্র এবং দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতির জ্ঞাতি-ভ্রাতা। জ্ঞাতিও তেমন দূর জ্ঞাতি নয়' এই খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই গোছের। যুধিষ্ঠির ভালমানুষ এবং বেচারা গোছের লোক, দ্বন্দ্ববিবাদে দারুণ অরুচি, ধর্ম্মকর্ম্মেই ঝোঁক বেশী। জাঠতুতো ভাই দুর্য্যোধনকে বলিয়া পাঠাইল—ভাই হে, আমরা পথে পথে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, রাজার ছেলে হইয়াও নিরাশ্রয়, নিরন্ন। তুমি মাত্র পাঁচখানি গ্রাম আমাদের দাও, আমরা তাহা লইয়াই খুসী থাকিব। বলা নিষ্প্রয়োজন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা পাঁচখানি গ্রাম লইয়া রাজা বাদশা হইবার দুরাশা করেন নাই। পাঁচখানা গ্রামের মাঠে লাঙ্গল চষিয়া, ধান, গম বুনিয়া (নিজেরা অথবা ভাগ বিলি বন্দোবস্তে) পেটের জ্বালা মিটাইতেন এবং বড় জোর পাঁচখানা কুঁড়ে বাঁধিয়া দিন গুজরাণ করিতেন। কিন্তু—

—দুর্য্যোধন করিয়াছে পণ
বিনাযুদ্ধে সূচ্যাগ্র মেদিনী না করিবে প্রদান।

বেচারারা খায় কি? থাকে কোথায়? ধরিত্রীর উপর তাহাদেরও দাবী আছে, বল প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিয়া দাবী উদ্ধার করিতে হয়। কিন্তু যুধিষ্ঠির ভালমানুষ ভদ্রলোক, যুদ্ধেও রুচি নাই, অথচ পেট চলে না। যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত অনিচ্ছা। তাই তাঁহাদের মুরুব্বি শ্রীকৃষ্ণকে পৌরাণিক মিউনিকের অভিনয় করিতে হইল। শ্রীকৃষ্ণেরও বাদ-বিসম্বাদে অরুচি; জ্ঞাতিবিরোধ মিটিয়া যায়, গরীব পাঁচটি ভাই দু'মুঠা খাইতে ও মোটা পরিতে পায়, তাঁহারও সেই ইচ্ছা। মিউনিকে গিয়া দুর্য্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন, তাহার বাপ কানা ধৃতরাষ্ট্রকেও সলাপরামর্শ অনেক দিলেন, কিন্তু ভবীয়া ভুলিল না। অগত্যা যুদ্ধ হইল। তবেই দেখা গেল, কারণটা সেই রাবণ রাজার চুল্লী। যাহা নিবে না, সদাই জ্বলে। বয়লারে কয়লা দিতেই হইবে। নতুবা চক্ষু স্থির!

আজ যে যুদ্ধ ইয়োরোপ জ্বালাইয়া এসিয়ায় আগুন ধরাইয়া এসিয়া-সীমান্ত ভারতের মগডালও ভাতাইয়া তুলিয়াছে, তাহার মূলান্বেষণ করিলেও সেই রবেণের চিতাটিই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আজ যদি এই যুদ্ধ মিটিয়াও যায়, সন্ধিসূত্রে হোক্ অথবা নিশ্চিহ্ন হইয়াই হোক্ একে অপরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া শান্তির জল ছিটাইয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া যায়, বেশীদিন কেহ ঘরে থাকিতে পারিবে না। ক্ষুধার জ্বালা যেদিন দুর্ব্বিসহ হইবে, পরের কাড়িয়া কুড়িয়া না লইলে আর চলে না এই বোধ জাগ্রত হইবে, সেইদিন আবার সাজ সাজ রব পড়িবে। আবার রণদামামা বাজিবে, আবার ট্যাঙ্কের ধূলিতে ধরা মলিন, এরোপ্লেনের ঝাঁকে আকাশ বিকম্পিত, ইউ-বোটের উৎপাতে সাগর বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিবে। মাঝে যে ক'টা বৎসর চুপচাপ থাকিবে সে ক'টা বৎসর যারণাস্ত্র নির্ম্মাণেই কাটিবে। যে জাতি যত অল্প সময়ে অল্প আয়াসে যতবেশী লোককে

শমন সদনে প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহার তত বীর-পণা, তত জয় জয়কার।

ইয়োরোপের বিজ্ঞান এদিকে যে খুবই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ কি! জুৎ করিয়া লাগ-সৈ গোছের একটি বোমা মেঘের আড়ালে থাকিয়া ধরিত্রীর বুকে ফেলিতে পারিলে শত্রু দেশের হাজার হাজার নরনারীকে চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সাবাড় করা যায়! কত ঘর বাড়ী নগর বোমার আগুনে পোড়াইয়া ছারখার করিতে পারা যায়! ইহার যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহাই বা মন্দ কি! শীতের রাত্রি, রজনী পূর্ণিমাশালিনী, গৃহস্থ অঘোরে নিদ্রিত, কোন দায়ে দায়ী নয়, কোন দোষে দোষী নয়, অকস্মাৎ তোজো কোম্পানীর বোমা গুড়ুম্ গুড়ুম্, ক্রম্! শুনি, জার্ম্মানী নাকি ইংলণ্ডকে সমতলভূমি করিয়া ফেলিয়াছে; শুনি, ইংলণ্ড নাকি বের্লিনকে ধোপার পাটায় ফেলিয়া হিঁসৃসো হিঁসৃসো করিতেছে। বিজ্ঞান জগতের উপকার কতখানি করিয়াছে জানি না, ধরার ভার মোচনে, লোকভার অপসারণে যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। কিন্তু মূল সেই রাবণের চিতা! জাপানের খাদ্য দরকার, বাসস্থান দরকার। নিজের দেশে তাহা নাই। চীন দেশের যতটা সে গ্রাস করিয়াছে তাহাতেও তাহার পুরা দু' মুঠা হয় না, তাই এখন ভারতবর্ষের পানে বাহু প্রসার করিতে হইয়াছে। ভারত স্বর্ণপ্রসূ। যুগে যুগে শতাব্দীতে শতাব্দীতে ভাগ্যান্বেষী, খাদ্যান্বেষী ভারতকে আয়ত্তে আনিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে। যে পাইয়াছে, ভাগ্যলক্ষ্মী স্কন্ধে তুলিয়া তাহাকে ভাগ্যসৌধের শিখরে বসাইয়া দিয়াছে; জগতে সে অপরাজেয়, অসামান্য, অসাধারণ হইয়াছে। আর ব্যর্থমনোরথ জন, তাহার পানে ঈর্ষানীল নেত্রে চাহিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়াছে। আমাদের সেই ভারতবর্ষ। বিশ্বের অন্নদাত্রী, জগতের Granary ভারতবর্ষ। আমরা তাহার সনাতন অধিবাসী, খাদ্য পাইতে আমরাই চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছি। চাল নাই, ডাল নাই, তেল নাই, বাজার খালি। যদি বা জিনিষ মিলে, অগ্নিমূল্য। হাত দিতে গেলে হাত পুড়িয়া যায়। আবার হাত বাঁচাইতে গেলে জঠরাগ্নি সমস্ত মানুষটাকেই দাহ করিয়া ফেলে। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর, আকাশে বোমা!

বসুমতী অনেক কাল ধরিয়া অনেক ধন প্রসব করিয়াছেন, আর তাঁহার ধন প্রসবের শক্তি নাই! "মাতা বসুমতী ধন প্রসব না করিলে ধন কেহ গড়িতে পারে না।" সুসভ্য ইয়োরোপ এ কথা বিশ্বাস করে না, মানে না। ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় আসিয়া আমরাও বসুমতীকে চিনিতে অক্ষম হইয়াছি। কিন্তু এই ভারতবর্ষের পুরাণ কথা, কাহিনী ও ইতিবৃত্তের সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও আছে তাঁহাদের পক্ষে আজিকার অপরিচিতা বসুমতীর সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিবার কথা নয়। সেকালের 'গল্পে' আছে, দেশে অজন্মা হইয়াছে, রাজারা ভূমি যজ্ঞ করিলেন, মাটী আবার প্রসন্ন হইল। যজ্ঞ কথাটার তাৎপর্য্য লইয়া গোলযোগ বাঁধিতে পারে। যদি কেহ মনে করেন যে ইয়া জটা ইয়া দাড়ী, নাসাগ্র বিঘূর্ণিত লোচন মুনি ঋষি ধরিয়া ধরিয়া মণখানেক চন্দন কাঠ, সের দশেক গব্যঘৃত, কুড়ি খানেক বেল পাতা দাহ করার সঙ্গে কতকগুলা অনুস্বার বিসর্গ সম্বলিত মন্ত্রোচ্চারণ করার নাম যজ্ঞ, আমাদের মনে হয়, এ ধারণা সত্য না-ও হইতে পারে। তবে বস্তুটি ঠিক কি তাহা বলাও কঠিন। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—নদীর নির্ম্মল জলের উপরই জমির উৎপাদিকা শক্তি মুখ্যতঃ নির্ভর করিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ কাহারো থাকিতে পারে না। যতদিন আকাশের জল পর্ব্বতগাত্র বহিয়া দেশের নদ-নদী পূর্ণ রাখিত, সারা বৎসর নদীতে জল অব্যাহত ও অবাধস্রোতে প্রবাহিত থাকিত, ততদিন জমি স্বর্ণ প্রসব করিতে কার্পণ্য করে নাই। যেদিন হইতে অলঙ্কারের পর অলঙ্কার, শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল তাহাদের সর্ব্ব অঙ্গ পরিশোভিত করিয়াছে, সেই দিন হইতে নদীও মজিয়াছে, জমিও নিরস হইয়াছে, আমাদের সম্মুখে যমের দক্ষিণ দ্বারও মুক্ত হইয়াছে। এ কথা কি ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান স্বীকার করিবে? না। যদি স্বীকারই করিবে, তবে রেল চালাইবার জন্য নদীর উপরে সেতুর পর সেতু গাঁথিয়া নদীর দফা গয়া করিবে কেন? শুধু কি তাই? বসুমতীকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে তাহার কত না যত্ন, কত না আগ্রহ! বসুমতীর নীচে লৌহ আছে, তুলিয়া লইতেই হইবে, নতুবা তাহার রেল হয় না, জাহাজ চলে না, কারখানা নড়ে না, কামান হয় না, ট্যাঙ্ক হয় না, এরোপ্লেন হয় না, বোমা হয় না, গোলাগুলি হয় না, ইমারত হয় না! এ সকল না হইলে সভ্য হওয়া যায় না। বসুমতীর নীচে কয়লা আছে, না তুলিলে নয়। কয়লা না হইলে সভ্যতার বার আনা বরবাদ। বসুমতীর নীচে তেল আছে, লাগাও পাম্প, চোঁ চোঁ তোল। তৈল বিনা বিকল সভ্যতা। বন কাঠ, গাছ চিরিয়া তক্তা কর—যুদ্ধে লাগিবে, জাহাজে লাগিবে, সহর গড়িতে লাগিবে। সহর না হইল যদি, কেমন সে সভ্যতা! বিজ্ঞান কি একবারও ভাবিল যে ঐ লৌহ, তাম্র, তৈল, বালি, কয়লা বসুমতীর দেহাভ্যন্তরের ষ্টমাক, ইণ্টেষ্টাইন্ হার্ট, লাংস্? ঐগুলাই বসুমতীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে? ঐগুলাই তাহার দেহে রস দেয়, সজীবতা দেয় এবং তাহা হইতেই বসুমতী সানন্দে স্বর্ণ প্রসব করেন? কোন্ বৈজ্ঞানিক কবে চিন্তা করিয়াছেন যে ডিফরেষ্টেসানের ফলে বৃষ্টির ভাগ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে? তাহারই ফলে সময়ে বৃষ্টি হয় না, হইলেও এমত হয় না যাহাতে নদী ভরে! পোষ্যপুত্রে পুত্রের সাধ যতখানি মিটে, ঘোলে দুধের স্বাদ যতখানি মিটে, ইরিগেসনের জলে জমির আকাঙ্ক্ষা ততখানিই পুরে। ততখানিই যে পুরিতেছে, তাহা ত হাতেনাতেই দেখা যায়। হাতে পাঁজি রহিয়াছে, মঙ্গলবার হাতড়াইয়া বেড়াইবার দরকার কি!

কিন্তু কথা এই যে এ সব কথা বলি কাকে? বলি কেন? বলিয়া লাভই কি? আকাশ যদি বৃষ্টি না করে, তুমি আমি তার কি করিতে পারি? নদী যদি জলাধার ভরিয়া না রাখে কিম্বা নদী যদি শুকায়, আমরা তার কি করিব? লোহা তোলা, তেল তোলা, বালি তোলা পৃথিবীময় চলিতেছে, তুমি আমি কথা কহিবার কে হে বাপু? তাই ত বলিতেছিলাম, অরণ্যে রোদন করি কেন? তবে কথা কি, রোদনই যখন সম্বল, তখন বনই বা কি, জনপদই বা কি! হাত যখন কিছুতেই নাই, তখন রোদন ছাড়া করিবার আছেই বা কি!

আজ গভর্ণমেণ্ট এদেশের গম এদেশে, সে প্রদেশের চাল এ প্রদেশে আনিয়া আংশিক অভাব পূরণের চেষ্টা করিতেছেন সত্য কথা, কিন্তু এ ভাবে ক'দিন চলিতে পারে? বিমুখ বসুমতীর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে অভাব ঘুচিবার সম্ভাবনা কোথায়?

গান

নজরুল

সবই যদি গেল হারাতে হারাতে
দুখ কেন করি আর।
এইটুকু লাগি' কেন আর কাঁদি
মিছে কেন হাহাকার!
হে মোর দেবতা, জীবনের পাতে

লিখিলে যে গান আপনার হাতে
সেই ক্ষণিকের অবেলার সুরে
কী যে ছিল সাধিবার
সবই যদি গেল হারাতে হারাতে
দুখ নাহি করি আর।

গ্রাম্য শাসক

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল্

ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান ব'লে শ্যামগ্রামের বেশ খ্যাতি আছে। আর শোভা-সম্পদে গ্রামখানিকে কমনীয় করে তুলেছে শীর্ণকায়া নদীটি। এই নদীর তীরে অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ রায় বাহাদুর ললিতমোহন ভট্টাচার্য্যের আধুনিক রুচিসম্পন্ন নবনির্ম্মিত বাড়ীখানি ছবির মত ঝকঝক করছে। এখনও গৃহপ্রবেশ হয় নাই—খুব ঘটা করে তারই আয়োজন চলেছে। যদিও রায়বাহাদুর কলিকাতায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে একখানি সুন্দর বাড়ী করেছিলেন, কিন্তু সহরের অনভ্যস্ত আধুনিকতা, জীবনযাপনে কৃত্রিমতা ও নারী প্রগতি তাঁকে এরূপ অতিষ্ঠ করে তোলে যে, অবশেষে তাঁর চিত্ত বাল্য কৈশোরের লীলাভূমি শ্যামগ্রামের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি।

ললিতবাবুর পিতা জগন্নাথ ভট্টাচার্য্য একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার যাজন ও গুরুগিরি ব্যবসায় ছিল। কায়-ক্লেশে তিনি একমাত্র পুত্র ললিতমোহনকে গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষা লাভের সুযোগ দেন। ফলে পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। পিতা তখন আত্মীয় স্বজন ও যজমানদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে বহু বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে পুত্রের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে দেন। কালক্রমে দরিদ্র পুরোহিতপুত্র ওকালতী পাশ ক'রে উকীল হ'ন—উকীল থেকে মুন্সেফের পদ পা'ন—পরে জেলার জজ হ'য়ে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন। তাঁর তিনটি ছেলেই কৃতি হ'য়েছেন;—জ্যেষ্ঠ মুন্সেফ, দ্বিতীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কনিষ্ঠ ডাক্তারী পাশ ক'রে সম্প্রতি য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হ'য়েছেন। একমাত্র কন্যা রমাকে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। এক কথায় বল্‌তে গেলে রায় বাহাদুরের সুখের সংসার। এখন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে তিনি তাঁর সকল পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও জামাতাকে সাদরে আহ্বান করেছেন। কেবল কনিষ্ঠ পুত্র সত্যব্রত এখনও বিবাহ করেন নাই।

দেশের পৈত্রিক বাড়ীতে রায়বাহাদুরের আসবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে বেশ একটু সাড়া পড়ে যায়, সবাই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব করবার জন্য এরূপ ব্যস্ত হ'য়ে উঠেন যে, তাঁদের মধ্যে যেন রীতিমত একটা প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেছে। এই সব লোকের অতিরিক্ত ভক্তি ভালবাসা ও বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাসে রায় বাহাদুর ত একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লেন—দিবারাত্র লোকজনের গুঞ্জন! চাই চাকরী, টাকা, সুপারিশ চিঠি; নিত্য আসে চাঁদার খাতা, আরও কত কি! অনেকে দুপুরে ও রাত্রে খাবারের সংস্থান পর্য্যন্ত ক'রে তাঁকে অবাক করে দেন। রায়বাহাদুর শিবতুল্য লোক, উপরন্ত অত্যন্ত লাজুক ও ধর্ম্মভীরু। তিনি কাকেও কটু কথা বলতে জানেন না। প্রতিবেশীদের স্নেহের বাড়াবাড়ি যখন তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল সেই সময় রায়বাহাদুরের সহপাঠী ও বন্ধু দীনু মোক্তার এই সব কাণ্ড দেখে হেসে বল্‌লেন "ভায়া, তুমি যদি এমনি ভাবে এদের আস্কারা দাও তা'হলে সব ছেড়ে ছুড়ে তোমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। এরা দেখছি তোমার পাকা কাঁঠাল পেয়েছে! হাকিমী ক'রে চিরদিন সহরে বাস করে এসেছ—এখনও গাঁয়ের ভূত তো দেখো নি।" রায়বাহাদুর বিষণ্ণ মুখে বল্‌লেন, "কলকাতা থেকে পালিয়ে এলুম এই আশায় যে গাঁয়ের মধ্যে নিরিবিলি চুপচাপ থাক্‌বো—শান্তিতে বাস কর্‌বো, এখন দেখ্‌ছি দিন রাত আমার বিশ্রামের উপায় নাই—আমাকে ভাই, তুমি বাঁচাও, নইলে আমি এখান থেকে পালিয়ে কাশীবাসী হ'বো। তোমার বউদিদিও বড্ড ভয় পেয়ে গেছেন।" দীনু মোক্তার হেসে বল্‌লেন "কুচপরোয়া নেই, আমার পরামর্শ মত চলো, দেখ্‌বে এই মৌমাছির দল কেমন ক'রে তাড়াই।"

তারপর থেকে রায়বাহাদুরের বাড়ীর দেউড়ীতে এক নেপালী দারোয়ান বাহাল হ'ল। আর দীনু মোক্তার ঘাঁটী আগ্‌লে বস্‌লেন। অকারণ রায়বাহাদুরকে উত্যক্ত করা বন্ধ হলো। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে রায়বাহাদুর দীনু মোক্তার, হরিশ মুখুয্যে, গোবিন্দ চাটুয্যে আর নব ভট্টাচার্যদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করেন, বৈকালে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চা চলে; তাদের নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে উপদেশ দেন। এ দিকে যে সব লোক রায়বাহাদুরের কাছে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেষ্‌তে পারে না তা'রা সব ক্ষেপে উঠলো; ফলে এক বিপক্ষ দল সৃষ্টি হ'ল।

স্থানীয় হাইস্কুলের সেক্রেটারী এবং ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সুরেন মুখুয্যের বৈঠকখানায় এ দলের আসর বেশ জমেছে। গ্রামের মধ্যে তিনিই যখন শ্রেষ্ঠ মাতব্বর ব্যক্তি, দলপতির আসন তাঁরই প্রাপ্য। সুরেনবাবু খোসমেজাজে বসে হুকায় তামাক টান্‌ছেন আর নগেন চাটুয্যে বল্‌ছেন "আরে ভায়া দেখছো বুড়োর স্বভাব, কোথাকার দীনু মোক্তার হ'লো সারথী, আর যত ছোঁড়ার দল হলো ইয়ার বন্ধু! শেষে ছোঁড়াদের মাথা খাবে দেখ্‌ছি, তুমি এর একটা বিহিত করো।" সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে নগেন চাটুয্যের কথার প্রতিধ্বনি উঠ্‌লো। সুরেন মুখুয্যে হেসে বল্লেন, "বুদ্ধি বিবেচনা কি সকলের সমান হয় ভায়া, দেখ্‌ছো তো মাসে কত মামলার বিচার কর্‌তে হয় আমাকে—পারে উপরওয়ালা একটা মামলার রায় উল্টাতে! রায়বাহাদুরের এমনি অহঙ্কার যে একবার আমার বাড়ীতে এসে দেখা অবধি কর্‌লো না বা ডাক্‌লে না। ডাক্‌লে কি না বেটা দীনু মোক্তারকে! আচ্ছা, তোমরা দেখে নিয়ো আমার চালে ঐ জগন্নাথ ঠাকুরের বেটা ললিত ঠাকুর এখানে এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ায় কি না! জানতো তোমরা থানার দারোগা, মহকুমার হাকিম, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট আমার হাতের পুতুল। আমার অসাধ্য কি আছে!"

এ দিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে রায়বাহাদুরের গৃহপ্রবেশের দিন সমাগত। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। ছোক্‌রার দল কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। রায়বাহাদুর নিজের গ্রাম ছাড়া আশ পাশের গ্রামগুলির উচ্চ নীচ ইতর ভদ্র ও দীন দরিদ্র সকলকেই এই শুভ কার্য্যে নিমন্ত্রণ করলেন। গিন্নীও বেরুলেন মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে। সদরে হাকিমদের নিমন্ত্রণের ভার পড়লো

জামাইয়ের উপর। নব-নির্ম্মিত বাড়ীর বহির্ভাগে প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটান হ'ল। এক দিকে ঢালা বিছানা ক'রে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্ত বসবার ব্যবস্থা ও অপর দিকে খাবারের জন্ত যায়গা রাখা হ'ল। বাটীর সম্মুখে নহবৎখানা থেকে নদীর ধার পর্য্যন্ত সমস্ত পথটি পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করা হ'ল।

(২)

গৃহ প্রবেশের পূর্ব্বদিনের কথা। রাত্রি প্রভাত হতেই সুরেন মুখুয্যে স্থানীয় হাই স্কুলের হেডমাষ্টারকে ডাকিয়ে এনে গম্ভীরভাবে বললেন,"মাষ্টার ম'শায়,স্কুলের ছেলেগুলো যে জাহান্নামে যেতে ব'সেছে দেখছেন কি?" মাষ্টার মহাশয় প্রশ্নটী হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে জিজ্ঞাসুভাবে সেক্রেটারীবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। সুরেনবাবু একটু উগ্রকণ্ঠে বল্লেন, "মশাই যে গাছ থেকে পড়লেন দেখছি, বলি ললিত ভট্টাচার্য্যের বাড়ী যে ছাত্রদের আড্ডা বস্ছে আর সেখানে ছেলেগুলির মস্তক চর্ব্বণ করা হচ্ছে তার কিছু খবর রাখেন কি?" হেডমাষ্টার মহাশয় আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন,"সার, আপনি কি বল্ছেন? আপনি সব ভুল শুনেছেন।" সেক্রেটারীবাবু হেডমাষ্টারের জবাবে তেলে বেগুণে জলে বল্লেন, "শুনুন মশাই, আমার হুকুম, আজ স্কুলে ছেলেদের ডেকে বলে দেবেন যেন কোন ছেলে ললিত ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর ত্রিসীমায় না যায়। এই আদেশের অবহেলা কল্লে তার শাস্তি হ'বে।" হেডমাষ্টার মহাশয় শুষ্ক মুখে প্রস্থান কল্লেন।

বৈকালের দিকে থানার বড় দারোগাবাবুর বাসায় প্রকাণ্ড দু'টী রুই মাছ ও কিছু নূতন পাটালী গুড় নিয়ে সুরেনবাবু দেখা দিলেন। দারোগা প্রণববাবু একগাল হেসে বল্লেন "আসুন, আসুন, সুরেনবাবু খবর কি?" সুরেন হেসে জবাব দিলেন,"দাদা,আজ পুকুর থেকে মাছ ধরা হ'লো আর একটা প্রজা কিছু নূতন গুড় দিয়ে গেল, তাই আপনার ছেলেমেয়েদের জন্ত কিছু নিয়ে এলুম।" দারোগাবাবু হৃষ্ট মনে চাকরকে ডেকে জিনিষগুলো রাখ্‌তে বল্লেন। সুরেন মুখুয্যে নানাবিধ আলাপের পর বল্লেন, "দাদা, একটা বড় বিপদে পড়েছি—ইজ্জৎ যে আমার যায়, তাই আপনার সাহায্যপ্রার্থী।" তারপর কিছুক্ষণ ধরে দু'জনের মধ্যে কাণাঘুষা কথাবার্ত্তা পরামর্শ চলল। দারোগাবাবু একটু চিন্তিতভাবে বল্লেন, "সুরেনবাবু, শুনেছি রায়বাহাদুর রিটায়ার্ড জজ, এক ছেলে মুন্সেফ, এক ছেলে এস, ডি, ও, তাছাড়া জামাই পুলিশ লাইনে বড় রকমের চাকরী করে শুনেছি। এ লোকের পিছনে লাগলে শেষ রক্ষা হ'বে তো?" সুরেন মুখুয্যে রাস্তায় বেরুতে বেরুতে ব'ল্লেন, "হাতিয়ার যখন ঠিক আছে ভাবনা কি দাদা?"

শ্যামগ্রাম থেকে থানা দু' মাইল দূরে। বড়নদীতীরে হাঁটা পথে একখানা বড় মাঠ, জলপথে একটু ঘুরে যেতে হয়। সুরেন মুখুয্যে হাঁটা পথেই বাড়ী ফিরে এসে দেখেন নগেন চাটুয্যে তাঁর প্রতীক্ষা কচ্ছেন। এই নগেনের উপর শত্রু হননের আর একটি অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ-কৌশলসহ সুরেন মুখুয্যে অর্পণ করেছিলেন। সুতরাং নগেনকে দেখেই দেহের সমস্ত অবসাদ সবলে দমন করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর কি হে?" নগেন বললেন, "আমি দাদা, ডাঃ গাঙ্গুলী, হরেন চাটুয্যে, ইন্‌জিনিয়ার, প্রফেসর তারক রায়, আর পশ্চিম পাড়ার সুরেশ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের আকার ইঙ্গিতে আমাদের মতলবটা প্রকাশ কর্ত্তে তাঁ'রা তো আমাকে মারেন আর কি? বল্লেন, "গ্রামের ভাগ্যি যে এমনি একজন সুসন্তান গ্রামে ফিরে এসেছেন, তাঁর দ্বারা গ্রাম উজ্জ্বল হ'বে গ্রামের উন্নতি হ'বে, আর তুমি আস্‌ছো দলাদলির সৃষ্টি ক'রে ভদ্রলোককে অপদস্থ ক'ত্তে—যাও, ও সব অপকার্য্যে আমরা নেই। এ যুগে বংশজ ব্রাহ্মণের বাড়ী খেলে কুলীনের জাত যায় না—সে সব দিন চলে গেছে।" সুরেন বালিশের উপর মাথা রেখে মলিন মুখে বললেন, "তবে তো নগেন ভায়া, এই বড়ের চাল টিকল না।" উভয়ে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক নিস্তব্ধ। সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নগেন বলে উঠলেন, "ভটচায বাড়ীতে তো লোক কিল কিল করছে—খুব সমারোহ সুরু হয়েছে। আচ্ছা দাদা, ওদের ঘাটে পুলিশ সাহেবের লঞ্চ বাঁধা কেন?" কথাটা শুনেই সুরেন স্প্রীংয়ের মত লাফিয়ে উঠে বললেন, "কোথাকার পুলিশ সাহেব খবর নিলে?" নগেন আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন, "না, আমি তো ঘাটে যাই নি।" সুরেন হতাশভাবে বললেন, "তাহ'লে তো সব এলোমেলো মনে হচ্ছে, আচ্ছা তুমি আজ যাও, কাল খুব সকালে এসো। এখন বড়ই পরিশ্রান্ত হয়েছি ভায়া, একটু ঠাণ্ডা হয়ে ভেবে দেখি কি করা যায়।"

(৩)

প্রত্যূষে রায়বাহাদুরের বাড়ীর সানাই বাজানার সঙ্গে সঙ্গে সুরেনের ঘুম ভাঙ্গল। বিছানা হতে উঠেই এক কলকে তামাক সেজে আমেজ করে সবে সটকায় টান দিয়েছেন এমন সময় খবর এল যে "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ৮টা'র সময় থানায় আসছেন, দারোগাবাবু তাঁকে সেখানে উপস্থিত থাক্‌তে বলেছেন।" সুরেনের বুকটা অজ্ঞাতসারে কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরেই বেশ বিন্যাস ক'রে থানার দিকে যাত্রা করলেন—রাস্তায় নগেনকে ধরে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

থানায় পৌঁছে সুরেন দেখলেন,ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই ইনস্‌পেক্‌সন শেষ করে দারোগাবাবু ও এস, ডি, ও সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নদীর তীর সংলগ্ন লঞ্চের দিকে চলেছেন। সুরেন দ্রুতপদে তাঁর কাছে গিয়ে আভূমি নত হয়ে সেলাম ঠুকে হাতজোড় করে দাঁড়াতেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি? কি চাও?" দারোগাবাবু একটু অগ্রসর হ'য়ে বললেন, "হুজুর, ইনি সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, ইনি সেই গ্রামে একটা এনার্কিষ্ট সমিতির সম্বন্ধে হুজুরের নিকট কিছু বলতে চান।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুরেনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "বটে, আচ্ছা, সুরেনবাবু আমাদের সঙ্গে লঞ্চে চলুন, আপনার ইউনিয়নেই আমরা যাচ্ছি, লঞ্চে বসে সব শুনবো।" সুরেন যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন, বিহ্বলভাবে হাতজোড় করে বললেন, "হুজুরের হুকুম শিরোধার্য্য।"

লঞ্চে একটা ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে মুখে পাইপ লাগিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুরেনকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার ইউনিয়নের কোথায় এই সমিতি?" সুরেন হাত দুটো মর্দ্দন করতে করতে বললেন, "আমাদের গ্রামে ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে।" প্রশ্ন হল, "কার বাড়ী বলুন, আর কোন ব্যক্তি এর লীডার?" সুরেন সোৎসাহে বললেন, "ললিত ভট্টাচার্য্যের বাড়ী, আর এর ব্রেন হ'চ্ছে যদুনাথ

চৌধুরী, মোক্তার।" সাহেব চমকিতভাবে চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুরেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "রায়-বাহাদুর ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য—রিটায়ার্ড জজ?" সুরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "আজ্ঞে হুজুর।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সুরেনের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে ডেকের উপর বুটের ঠোক্কর মেরে বললেন, "ননসেন্স্—য়্যাবসার্ড!"—জুতার ঠোক্কর যেন সুরেনের বুকের উপর পড়ল—সুরেন ভড়কে গেলেন, তাঁর গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। এই সময়ে এস-ডি-ও সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট কি যেন চুপি চুপি বলে তাঁর হাতে একখানা কাগজ দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাগজখানা পড়ে প্রসন্ন হলেন। পরক্ষণে হাসিমুখে সুরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সুরেনবাবু, আপনার প্রতিবাসী রায়বাহাদুরের বাড়ীতে বিরাট ভোজ—হৈ চৈ ব্যাপার। আর আজ এই দিনে আপনি গ্রাম ছেড়ে তাঁর নামে পুলিশ করবার জন্য এসেছেন থানায়, ব্যাপারটা কি বলুন তো?" সুরেন শুষ্ক মুখে আমতা আমতা ক'রে বললেন, "হুজুর, আমার রিপোর্টটা ঠিক রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধে নয়, যদুনাথ চৌধুরী মোক্তার ও কতকগুলি য়্যানার্কিষ্টদের বিরুদ্ধে।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, "আচ্ছা, আপনাদের নূতন পুলিশ সাহেব সেখানে আছেন। তাঁকে তদন্ত ক'র্ত্তে বলবো। আর মনে রাখবেন, আপনার রিপোর্ট মিথ্যা প্রমাণ হ'লে আপনাকে চালান দেওয়া হ'বে।" শেষের কথাগুলি শুনে সুরেন শিউরে উঠলেন। দেখতে দেখতে লঞ্চ গ্রামের শীর্ণকায়া নদীর ভিতরে প্রবেশ করল। সুরেন সভয়ে দেখলেন, লঞ্চ রায় বাহাদুরের ঘাটেই নোঙর করল—আর নদীর তীরে রায় বাহাদুর স্বয়ং এবং আরও অনেক লোক জড় হয়েছেন। লঞ্চ তীরে লাগলে তাঁরা সকলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং এস-ডি-ও-কে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। সুরেন মাথা নীচু করে হতভম্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে রহিলেন। রায়বাহাদুর সুরেনকে স্থাণুর মত দণ্ডায়মান দেখে বললেন, 'এস, এস বাবাজী! সকাল থেকে আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; ও! তুমি বুঝি এই সম্মানিত অতিথিদের এগিয়ে আনতে গিয়েছিলে, দেখে বড্ড সুখী হলুম, তাই তোমাকে দেখি নি বটে! এস বাবা, তোমায় খুব পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে।" সুরেন নীরবে মুখখানা নীচু করে সকলের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। রায়বাহাদুরের জামাতা মিঃ অরুণ চাটার্জ্জি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সপুত্র রায়বাহাদুর ও উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে সুরেনের দিকে তাকাতেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হেসে বল্লেন, "ইনি এই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মিঃ সুরেন্দ্র মুখার্জ্জি।" পরে একটু থেমে সুরেনের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "ইনি মিঃ অরুণ চাটার্জ্জি, আপনাদের জেলার নূতন পুলিশ সাহেব—আপনার কথিত 'ইনফরমেশন' আমি এঁকে সব পরে বলছি।"—সুরেনের কানে সব কথা পৌঁছিল কিনা সন্দেহ, বজ্রাহতের ন্যায় কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রহিলেন তিনি নিজেও জানেন না—যখন রায়বাহাদুর এসে সস্নেহে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন "বাবাজী এখনো দাঁড়িয়ে—যাও স্নান সেরে এসো।"—তখন তাঁর চৈতন্য হল। জড়িত ও অস্ফুট কণ্ঠে "এই যাচ্ছি" বলেই তিনি রায়বাহাদুরের দিকে আর দৃষ্টিপাত না করে বহু লোকের সকৌতুক দৃষ্টি এড়িয়ে টলতে টলতে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন।

বাড়ীতে গিয়ে সুরেন দেখেন, তাঁর অপেক্ষায় বহুলোক বসে আছেন। তখন মধ্যাহ্ন সমাগত। বৃদ্ধ নন্দ বাঁড়ুয্যে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এস, বাবাজী, তোমার অপেক্ষায় আমরা বসে আছি—বলো, আমরা কি করবো? ভটচার্য বাড়ী খেতে যাবো, না বাড়ীতেই খাবো?" সুরেন কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থেকে বললেন, "না কাকা, নিমন্ত্রণে যাওয়া হবে না' সবাইকে বলুন বাড়ীতে গিয়ে খেতে। আমি বড়ই ক্লান্ত—আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।" সুরেন অন্দরে প্রবেশ করলে তাঁর স্ত্রী বিরক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "বলি হাঁগা, তোমার কি হ'য়েছে? সেই ভোরে কোথায় গেলে, ফিরলে এই দুপুরে,—বাইরে এতো লোকই বা কেন? ব্যাপার কি?" ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত মুখে দৃঢ়কণ্ঠে সুরেন বললেন, "তোমার এই সব অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন নেই—অনেক বেলা হয়েছে খাবারের বন্দোবস্ত কর।" সুরেনের স্ত্রী আশ্চর্য্যান্বিতভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সে কি! আজ যে নিমন্ত্রণ আছে, ভুলে গেলে?" সুরেন কর্কশকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "ভুলি নি—নিমন্ত্রণে আমি যাবো না, তুমিও যাবে না।"—বলেই সশব্দে গৃহে প্রবেশ করলেন।

রায়বাহাদুরের বাড়ীতে গৃহপ্রবেশের উৎসব খুব সমারোহেই চলছিল। রায়বাহাদুর নিজে চারদিকে ঘুরে ফিরে সকলকে মিষ্টবচনে আদর সম্ভাষণ করছিলেন। যখন মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেল তিনি এক সময়ে দীনু মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা দীনু, সুরেন তো এলো না—তা'দের পাড়ার বাঁড়ুয্যেরাও এ'লো না—ব্যাপার কি! একবার কাউকে পাঠাও।" দীনু ম্লানমুখে বললেন, "তারা আসবে না—সুরেন তা'দের নিয়ে দল পাকিয়েছে।" রায়বাহাদুর কোন প্রত্যুত্তর না করে তৎক্ষণাৎ সুরেনের বাড়ীর দিকে চললেন।

সুরেনের বৈঠকখানায় বিরোধী দলের মজলিস তখন বেশ জেঁকে উঠেছে। সুরেন একাই একশো; দৃঢ়স্বরে সকলকে উৎসাহ দিচ্ছেন। এমন সময় রায়বাহাদুরকে আসতে দেখেই সকলে তড়িৎ-পৃষ্ঠের মত চমকে উঠলেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করে কোমল-কণ্ঠে বললেন, "আমি কি অপরাধ করেছি যাতে আপনারা এই শুভদিনে আমার গৃহে পদধূলি দিতে অস্বীকৃত বলুন?" কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। একটু পরে বৃদ্ধ নন্দ বাঁড়ুয্যে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, "দেখ ভাই, মনে কিছু করো না; একটা কথা বলছি কি—এই সামাজিক ব্যাপার কিনা, বহুদিন ধরেই চলে আসছে—আমরা হচ্ছি নিকষ কুলীন, কাজেই বংশজ বাড়ীতে পাত পেড়ে খাওয়াটা চলেনা; তবে হ্যাঁ, ইদানীং দুই এক বাড়ীতে না খেয়েছি তা' নয়, তবে তার জন্য প্রণামী বলো বা সম্মান বলেই ধরো—আমরা কিছু পেয়ে থাকি। আর তুমি ভাই, সেটা দিতেও সক্ষম। এখন উপযুক্ত প্রণামী দিলে আমরা অর্থাৎ এই রামশরণ রামগঙ্গার সন্তানরা তোমার বাড়ীতে খেতে পারি।" রায়বাহাদুর স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল কি ভাবলেন তিনিই জানেন—পরে অতি মোলায়েম কণ্ঠে বললেন, "দেখুন, এ যুগে ঘুষ দিয়ে কাকেও খাওয়ান আমার বিবেকবিরুদ্ধ, আমি আবার আপনাদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে চলুন। এই গ্রামের অন্যান্য কুলীনের সন্তান —আপনাদেরই সমপর্য্যায়—তাঁরাও যখন দয়া ক'রে আমার

বাড়ীতে পদধূলি দিয়েছেন—এখন আমি যদি আপনাদের জন্ত প্রণামীর ব্যবস্থা করি, তাঁরা কি ভাববেন বলুন ত ?" রায়বাহাদুর সকলকে নির্ব্বাক দেখে ম্লানমুখে ধীরভাবে প্রস্থান করলেন।

এত বড় ভোজটা এভাবে মারা যাওয়ায়, দলের অনেকেই মনে মনে সুরেন ও নন্দ বাঁড়ুয্যের উপর চটেছিল। মেয়েরাও মনমরা হয়েছিল। অপরাহ্নের দিকে আর একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার পাড়ার সকলকে অবাক করে দিল। কি সর্ব্বনাশ, সুরেনের বৈঠকখানায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস-ডি-ও, ইনেস্‌পেক্টর প্রভৃতির সমাগম হয়েছে, সামনের উঠানটি কনেষ্টেবল, চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতিতে ভরে গেছে। আব সুরেন মুখুয্যে বলীর ছাগলের মত ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁপছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সকলের সামনেই যেভাবে তাকে শাসাচ্ছিলেন, তাতে বুঝতে কারুর বাকি রইল না যে সুরেন নিজেই খাল কেটে কুমীরকে ডেকে এনেছে! অর্থাৎ অন্তের অনিষ্টের জন্তে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে যে অভিযোগ করেছিল, তদন্তের ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাকেই অভিযুক্ত করবার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন। এখন তাঁর অন্ত মূর্ত্তি ; রুক্ষস্বরে বলছিলেন, "আপনার রিপোর্ট মিথ্যা বলে প্রমাণিত হ'য়েছে। আর আপনার বিরুদ্ধে যে দরখাস্ত পেয়েছি তা তদন্ত করে প্রমাণ হ'য়েছে যে আপনি চৌকিদারদের মাইনে না দিয়ে তা'দের কাছ থেকে মাইনে পেয়েছি বলে সই নিয়ে থাকেন, গ্রামের রাস্তা ও পুল মেরামতের কণ্ট্রাক্ট আপনার আত্মীয় বন্ধুর বেনামীতে নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেন। সুতরাং উক্ত অপরাধের জন্ত আমি আপনাকে য়্যারেষ্ট কচ্ছি ও মহকুমায় বিচারার্থ চালান দিচ্ছি।" সুরেন এবার ভেঙ্গে পড়লেন, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে বুঝে কোন প্রতিবাদ না করেই কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে উঠলেন, "সার, আমায় এবার মাপ করুন—আমি চৌকিদারদের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা, হবে না। আপনার উপর এতগুলি নিরীহ লোকের কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল, আপনি তার অপব্যবহার করেছেন—আপনার শাসনে আপনার স্থায় অন্তান্ত ইউনিয়মের দুষ্ট স্বভাবান্বিত প্রেসিডেণ্টদেরও চেতনা হবে।" ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশে তখনি সুরেনের হাতে হাতকড়ি পড়ল, আর সেটি সন্তর্পণে পরিয়ে দিলেন তাঁরই অন্তরঙ্গ দারোগা বন্ধুটি—আগের দিন সুরেন যাঁকে ভেট দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে অন্দর মহলে বামাকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনতে পাওয়া গেল।

অবিলম্বে সুরেনের য়্যারেষ্টের খবর নানাভাবে রঞ্জিত হয়ে গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। আর দলে দলে লোক ছুটল। বন্দী সুরেনকে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সদলবলে যখন রায়বাহাদুরের বাড়ীর প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হইলেন তখন বেলা পড়ে গিয়েছে। রায়বাহাদুরের বাড়ীর কোলাহলও অনেকটা মন্দীভূত হয়েছে। কর্ত্তা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সবেমাত্র বাড়ীর ভিতরে গিয়েছেন, এমন সময় সুরেনের স্ত্রী ও পুত্র নন্দলাল রায় বাহাদুরের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। নন্দলাল কাঁদতে কাঁদতে জানাল, "ঠাকুর্দ্দা, আমার বাবাকে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি তাঁকে ছাড়িয়ে দিন।" সুরেনের স্ত্রীও রায় বাহাদুরের পায়ের গোড়ায় বসে মেঝের উপরে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করে দিলেন। রায় বাহাদুর তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "মা, তুমি ক্ষান্ত হও—আমি দেখ্‌ছি ব্যাপারটা কি ?" তখনই কন্তাকে ডেকে তার উপর সুরেনের স্ত্রীর ভার দিয়ে তিনি দ্রুতপদে বাইরে এলেন।

রায় বাহাদুরকে দেখেই সুরেন রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, "কাকাবাবু, আমায় বাঁচান।" রায় বাহাদুর ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট সব কথা শুনে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "মিঃ সেন, একে কি ক্ষমা ক'র্ত্তে পারেন না ?"—ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আশ্চর্য্যান্বিতভাবে রায় বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে উত্তর করলেন, "কি বলছেন আপনি সার, যে লোক আপনার ন্যায় নিরীহ পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট করতে ইতস্তত করলে না—তাকে আপনি ক্ষমা করতে বলছেন ?—এ যে ভীষণ লোক!" এ কথার পরেও যখন রায় বাহাদুর খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগিলেন তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব অগত্যা বললেন, "সার, আপনার অনুরোধ আমি এড়াতে পাচ্ছিনা। তবে সুরেনকে ইউনিয়ন বোর্ডের 'প্রেসিডেণ্টসিপ' ছেড়ে দিতে হ'বে—আমি এমন নীচপ্রকৃতির কোন লোককে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে রাখ্‌তে পারি না।" রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসু নেত্রে সুরেনের দিকে তাকালেন। সুরেন সজল নয়নে উত্তর করলেন, "আমি এ প্রস্তাবে রাজী আছি।" ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নির্দ্দেশ মত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পদে লিখিত ভাবে ইস্তফা দিলে সুরেনের মুক্তি মিল্‌ল।

মুক্তি লাভের পর মন্ত্রমুগ্ধের স্থায় রায় বাহাদুরের দু'টী পায়ের কাছে মাথা রেখে সুরেন নীরবে প্রণাম করলেন ; পরে গভীর মিনতিপূর্ণকণ্ঠে বললেন, "কাকাবাবু, যা অন্যায় করেছি তা'র মাপ চাইবার মুখ আমার নাই। আপনি দেবতা, আর আমি গ্রাম্য ভূত! আমার পূর্ব্ব আচরণ আপনি ভুলে যাবেন—এই বিনীত প্রার্থনা।" অনুতাপের অশ্রুধারায় সুরেনের ক্লিষ্টমুখখানি সিক্ত হয়ে উঠল।

রায় বাহাদুর সস্নেহে সুরেনকে বাহুপাশে আবদ্ধ করলেন।

দু'ধারা

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

জোয়ারের জলে যারা আসিয়াছে ভেসে
ধরণীর ধূলা মেখে হ'ল যারা বড়,—
দুনিয়ার তারা দু'দিনের তরে এসে,
দুঃখ ও সুখে তিলে তিলে করে জড়।

সুখের কোষ্ঠি পাথরেতে যবে দেখে ;
দুঃখের আঁচ তাতে লাগিয়াছে কিনা,
দেনার খাতাটি চাপা দিয়ে তারা রেখে—
বেদনার ঘরে পাওনার সুদ বিনা!

আসল ও সুদ নাইক যাহার মোটে,
দেনার ভারেতে যাহার মাথাটি নত ;
দুঃখের ভাত তাও নাহি তার জোটে—
আঁখিতে তাহার বেদনার ছাপ শত!

দুঃখ ও সুখে জীবন প্রবাহ চলে—
দিবস ও রাত্রি আসে আর যায় ফিরে ;
দেহ বেঁচে রয় ; প্রাণটিরে অবহেলে
আসল ও সুদ শোধ হয়—আঁখিনীরে!

কথা ঃ—শ্রীমতী সুজাতা ঘটক বি-এ, বি-টি

সুর ও স্বরলিপি ঃ—জগৎ ঘটক

যদি বা বসন্ত হ'ল অবসান।
রেখোনা রেখোনা মনে আর অভিমান।
যদি ঝরে ফুল দল
ফেলিওনা আঁখি জল,
মাধবী রজনী শোন গাহে নব গান।

বকুল ঝরে বা যদি পথের ধূলায়—
(তার) বাসনা রাখিয়া যাবে কনক চাঁপায়।
তোমার অলক মূলে
তাহারি একটি তুলে—
রাখিয়ো যতনে স্মরি'—ভাঙি' তব মান।

I i ন্‌া সা প্‌া ন্‌া | সা -রা রগমা -রগপা | মা গসা রা গা | গসা -া -া -া I
য দি বা ব স ন্ ত০ ০ ০ ০ হ' ল০ অ ব সা ০ ০ ন্

I রা মা মপা পা | পাণ -ধণমপা পা পা | পা মা পা ধা | পমা -া -গমগা -রা II
রে খো না রে খো না০ ০ ম নে আ র অ ভি মা ০ ০ ০ ন্

II মা পা পনা নাধ | না র্সা নর্সা -া | না র্সা র্রর্মর্মা র্রা | না র্সা গা -ধধপা I
য দি ঝ রে ফু ল দ ল্ ফে লি ও০ ০ না আঁ খি জ ০ ০ ল্

I পা পা পধা মা | মাগ পমগগা রা রগসরা | রা রপা মা মগা | রগমা -গমগা -রগরা -সা II
মা ধ বী র জ নী০ ০ শো ন০ ০ গা হে০ ন ব০ গা০ ০০ ০০ ন্

II সা ন্‌সা -রমা রা | স্‌া সণ্‌সণ্‌া ধ্‌া প্‌া | প্‌া ন্‌া সা সরা | সা -া রা -া I
ব কু০ ০ ল্ ঝ রে বা০ ০ য দি প থে র ধূ লা ০ ০ য়্

I রা রমা মা মা | মপা পা পা পা | পা পমা পা ধা | মা -া -গগা রা I
বা স না রা খি য়া যা বে ক ন০ ক চাঁ পা ০ ০ য়্

I মা পা পনা না | নর্সা র্সা র্সান র্সা | না র্সা র্রর্মর্মা র্রা | -র্সা র্রর্সা ণর্সণা ধপা I
তো মা র অ ল ক মূ লে তা হা রি০ ০ এ ক্ টি তু০ লে০

I পা পা পধাম মা | মগা পমগগা রা রগসরা | রা রপা মা মগা | রগমা -গমগা -রগরা -সা II II
রা খি য়ো য ত০ নে০ ০ স্ম রি'০ ০ ভা ঙি'০ ত ব০ মা০ ০০ ০০ ন্

বৈশাখের তারা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বৈশাখের তারা চিরদিনের তারা। কিন্তু সূর্য্য ভ্রাম্যমান, পৃথিবী নিজের অক্ষে এবং মার্ত্তণ্ডের আকর্ষণে তার সঙ্গে ঘোরে। পরিদৃশ্যমান নভোমণ্ডল বৃত্তাকার। সুতরাং আমরা আকাশপটে সমাহিত সকল নক্ষত্রকে সকল ঋতুতে দেখতে পাইনা।

জ্যৈষ্ঠ মাসে এ প্রবন্ধ পড়া হবে। তখন সূর্য্য থাকবেন বৃষরাশিতে। ভাস্করের জ্যোতিতে বৃষ রাশির নক্ষত্রগুলি এবং তাদের উপরে, নীচে যত তারকা ব্যূহ আছে অদৃশ্য হবে।

হীরার টুকরার সমষ্টির মত কৃত্তিকার বিশিষ্ট রচনার কথা বলেছি। কৃত্তিকা রূপকথার সাতভাই চম্পা। সুপ্ত চাঁপার মত রূপ। তার পৃষ্ঠদেশ হ'তে উত্তর আকাশে মালার মত যে তারকারাশি উঠে গেছে তাদের নাম পারসুস। আমাদের দৃষ্টিতে পারসুসের পূর্ব্বে বেশ একটি বড় নক্ষত্র জ্বলে। তার নাম ব্রহ্মহৃদয় বা ক্যাপেল্লা। ঠিক ক্যাপেল্লা হতে পারসুসের বড় তারা যতদূর, ততদূরে পশ্চিম দিকে দেখা যায় একটি উজ্জ্বল তারা। তার নাম অল্‌গল্‌। এটি পরিবর্ত্তনশীল (ভেরিএবল্‌) তারা। বেশ দপ্‌ দপ্‌ ক'রে এক টানে দুদিন কুড়ি ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট জ্বলে। তারপর হঠাৎ অল্‌গল মলিন হয়। এ ভুতুড়ে ব্যবহার দেখে আরবরা তার নাম দিয়েছিল—অল্‌গল বা যাদুকর ভূত। অনুসন্ধানের ফলে এখন বোঝা গেছে যে অল্‌গল্‌কে একটি ছোট তারা প্রদক্ষিণ করে। তিনদিন অন্তর সে আলগলের সামনে এসে আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। নক্ষত্রে গ্রহণ লাগে তাই আমরা তাকে মলিন দেখি। এ রকম পরিবর্ত্তনশীল তারা নভোমণ্ডলে অনেক আছে। আর আছে যুগল তারা। দূর থেকে দুটিকে এক দেখায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কালপুরুষকেও দেখা যাবেনা। কিন্তু গত মাসে আমরা তাকে চিনেছি। তার কাঁধের পূর্ব্বের লাল তারা আর্দ্রা (Betelgeux) এবং পশ্চিম পায়ের তারা রিগেল বা বাণরাজা প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক। Rigel ৫০০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। আজ আমাদের চোখে পড়ে তার ৮৫০ বঙ্গাব্দের রূপ। এই ৫০০ বছরে পৃথিবীর উপর দিয়ে কত ঝড় বহে গেছে, কত রাজবংশ উচ্ছেদ হয়েছে, কত জাতি উন্নত হয়েছে, কত জাতির পায়ে শৃঙ্খল পড়েছে। কিন্তু ১৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে ছুটে সে সব কাণ্ড আজিকার বাণরাজা দেখতে পায়নি। আমাদের ভাস্করের জ্যোতি অপেক্ষা রিগেলের জ্যোতি ১৫,০০০ গুণ উজ্জ্বল। কালপুরুষের কোমরের তিনটি তারকা প্রায় বিষুব রেখার উপর দিয়ে গেছে। তাদের শেষের তারাটির নিচে এক প্রকাণ্ড নীহারিকা দেখা যায়। নীহারিকা কালে আবার তারায় পরিণত হবে।

জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগে পশ্চিম গগনে সূর্য্য ডোববার পর অবশ্য শুক্র দেখা যাবে। পঞ্জিকা বলছেন, ধরুন ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯মে—শু ২।১৬। ১৪।২৫। এবং বৃ ২।২৮।৪০।৫২।

পাঁজিতে মেষ রাশিকে ০ বলে বর্ণনা করা হয়, তাই র বা রবি আছেন ১।৪।৪।৫৬। প্রথম অঙ্কটি রাশির অঙ্ক। রবি ১ অর্থাৎ বৃষে শু এবং বৃ মানে শুক্র এবং বৃহস্পতি ২ অর্থাৎ মিথুন রাশির ত্রিশ অংশ ভাগের আকাশের মধ্যে দেখা যাবে। শুক্রকে দেখা যাবে ১৬ ডিগ্রি ১৪ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড মিথুন রাশির বিভাগে। অর্থাৎ মাঝখানের একটু পূর্ব্বে। শুক্রকে চেনা সহজ! সূর্য্য ডুবলেই পশ্চিম গগনে জ্বলে উঠবে তার স্থির শান্ত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। তা হ'লে শুক্রের অর্দ্ধেক পশ্চিমের, অর্দ্ধেক পূর্ব্বের সূর্য্যাপথ, মিথুন রাশি। সে রাশির আবার শেষের দিকে অর্থাৎ ২৮ ডিগ্রি ৪০ মি ৫২ সেকেণ্ডের বৃত্তাংশে দেখা যাবে তেমনি উজ্জ্বল গ্রহ—বৃহস্পতি।

তাদের মাথার উপর উত্তরদিকে দুটি তারা পরস্পর ৫ ডিগ্রির ব্যবধানে মুখোমুখি দেখা যাবে। পশ্চিমের তারাটির নাম ক্যাষ্টার এবং পূর্ব্বেরটির

মিথুন

নাম পোলাক্স। আমাদের মতে এরা পুনর্ব্বসু নক্ষত্র। জুপিটারের এই দুই পুত্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হেতু, দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ইংরাজি ভাষায় বলে ক্যাষ্টর ও পোলাক্স। সূর্য্যকে একপাক প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির লাগে ১২ বছর। আমাদের ধরণী সে কার্য্য করেন ৩৬৫¼ দিনে। গত বৎসরের ৯ই মে হ'তে বৃহস্পতি আছেন মিথুন রাশিতে। ১২ই জ্যৈষ্ঠ ২৬মে তিনি কর্কটে প্রবেশ করবেন।

পোলাক্স পুনর্ব্বসু আমাদের ৩২ আলোকবর্ষ দূরে। ১৩১৮ সালে মহাত্মাজীর স্বাধীনতা আন্দোলন দেখতে যে রশ্মি ছুটে ছিল আজ তার সেই রশ্মি তাঁকে কারাগারে দেখবে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯মে—পূর্ণিমা। সেদিন চাঁদ থাকবেন বিশাখা নক্ষত্রে। যে মাসের সে পূর্ণিমা, সে মাসের নাম বৈশাখ। তার আগের পূর্ণিমায় চাঁদ ছিল চিত্রায়। চিত্রা চন্দ্রমার মিলিত সৌন্দর্য্য কাব্য-প্রসিদ্ধ। কিন্তু জ্যোতিষের দিক থেকে সে পূর্ণিমা হ'তে চৈত্র মাসের নামকরণ হয়। জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা হবে ৩রা আষাঢ়। সে দিন চাঁদ থাকবেন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। তাই দ্বিতীয় মাসের নাম জ্যৈষ্ঠ। প্রথমে ভারতবর্ষে চান্দ্রমাস হিসাবে কাল গণনা হত। মাস শব্দই চন্দ্রমা হ'তে হ'য়েছে। মা+অস+অন্‌—মাস্‌ মানে চন্দ্র, প্রথমা একবচন মাঃ। সৌরমাস প্রবর্ত্তন হবার পরও মাসের নাম সাবেকী হিসাবে চলেছে।

কর্কটে বড় তারা নাই। কতকগুলি তারা চিক্‌ চিক্‌ করছে। এদের পাশ্চাত্যদেশে বলে মৌচাক। তাদের উপরের বড় তারাটি পুষ্যা এবং নিচের পূর্ব্বদিকে যেটিকে দেখা যাবে, সেটি অশ্লেষা।

মিথুনের নিচে Procyon বা প্রভাস বলে একটি উজ্জ্বল প্রথম শ্রেণীর তারা দৃষ্টি পথে পড়বে। এটি ছোট কুকুর মণ্ডলীর (Canisminor) বড় তারা। তার পায়ের কাছে পুব আকাশে কয়টি তারাকে যোগ করলে একটি কল্পিত কুকুরের রূপ হতে পারে। তারও নিচে দক্ষিণে বড় তারা আছে Sirius বা লুব্ধক। এদের জ্যৈষ্ঠে দেখা যাবে না—সূর্য্যাস্তের সময় একেবারে দক্ষিণ পশ্চিম ঘেঁসে থাকবে।

সিংহের পরিচয় পূর্ব্বেই পেয়েছি। মঘা সিংহের পায়ের থাবা—ঘাড় থেকে সে অবধি (?) জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত। তার পূর্ব্বদিকে লাঙ্গুলে উত্তর ফল্গুনী। সিংহের উপরে ত্রিভুজের আকারে একটা ব্যূহ আছে। তার নাম লঘুসিংহ। তার উত্তর পশ্চিমে দুটা ইংরাজী M জোড়া দিলে যেমন দেখতে হয়, সেই আকৃতির এক মলিন সমষ্টি আছে। এর নাম লিন্‌কস।

সপ্তর্ষির বশিষ্ঠ ও মরীচির ঠিক নিচে দক্ষিণে ক্যানিস ভেনাসিটি নামে

দুটি তারা। একটি তৃতীয় শ্রেণীর, সহজে চক্ষে পড়বেনা। সপ্তর্ষির ক্রতু ও পুলস্তকে সংযোগ করে রেখা টানলে বড়টির উপর পড়ে।

ঠিক তাদের দক্ষিণে কোমা বারেনিসি (Coma Berenecis)। এ গোছা ঠিক উত্তরফল্গুনীর একটু উত্তর পূর্ব্বে। কৃত্তিকার মত অনেকগুলি ছোট ছোট চিক চিকে তারার সম্মিলন। মনে হয় যেন একপাল সাদা হাঁস উত্তর দিকে উড়ে যাচ্ছে। এদের নামের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিজড়িত আছে। মিশর-নরেশ তৃতীয় টলেমী সিরীয়া অভিযান করেছিলেন। তাঁর মহিষী বেরেনিসি দেব-মন্দিরে মানত করেছিলেন যে স্বামী অক্ষত দেহে বিজয়ী হ'য়ে ঘরে ফিরলে তাঁর নিজের অতি সুন্দর চুলের গোছা কেটে দেবতাকে অর্ঘ্য দেবেন। বিজয়ী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে মুণ্ডিত-শির মহিষীকে দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন। তখন রাজ পুরোহিত বল্লেন—"মহারাজ দুঃখের কারণ কি? আমাদের রাজ-মহিষীর কেশগুচ্ছ দেবতা-গ্রাহ্য হ'য়ে স্বর্গে আপনারই বিজয়কেতন হ'য়ে উড়ছে। ঐ দেখুন।" তিনি এই তারাপুঞ্জ দেখিয়ে দিলেন। তদবধি এদের নাম হ'ল কোমা বেরেনিসিস।

সিংহের পূর্ব্বে কন্যা রাশি। উত্তরফল্গুনীর (Denebola) শেষপাদ হস্তা এবং চিত্রার অর্দ্ধপাদ নিয়ে কন্যা রাশি। আশ্বিন মাস কন্যা রাশি। উত্তরফল্গুনী আমরা চিনেছি এবার হস্তা ও চিত্রা চিনব।

হস্তা পাঁচটি তারার বিশিষ্ট ব্যূহ। আমাদের মতে, পাঁচটিকে যোগ করে হঠাৎ দেখলে, যেন পঞ্চাঙ্গুলি প্রসারিত হস্তের রূপ চোখে পড়ে। "হস্তাকৃতি পঞ্চ তারাত্মকম" এই ত্রয়োদশ নক্ষত্রপুঞ্জকে পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বলে—করভাস বা বায়স মণ্ডলী। উভয় পরিকল্পনার চিত্র দিলাম।

হাত না কাক

প্রাচীনেরা কবি ছিলেন—তাঁদের তারাদের সম্পর্কীয় গল্পগুলি স্মরণ করলে এই কথাই মনে হয়। কন্যার রূপ সম্বন্ধে ভারতের পরিকল্পনা—জলে নৌকাস্থ শস্যাগ্নিধারিণী।

হস্তার পশ্চিমে ক্ষুদ্র একটি ব্যূহ দেখা যাবে। তার নাম ক্রেটার।

চিত্রাকে চেনা কঠিন নয়। উত্তর-ফল্গুনী হ'তে দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি রেখা টানলে বড় তারা চিত্রা বা Spica। স্পাইকা মানে গমের শীষ। এখানে দেশী বিলাতী পরিকল্পনার মিলন-স্পর্শ। একদিকে হস্তা পূর্ব্বে চিত্রা, তাদের মাঝে ইংরাজি L এর মতো সাজানো তারাদের নিয়ে কন্যা রাশি। দানবেরা যখন পাতাল হ'তে (বোধ হয় বিষুবের দক্ষিণ হ'তে)

কন্যা
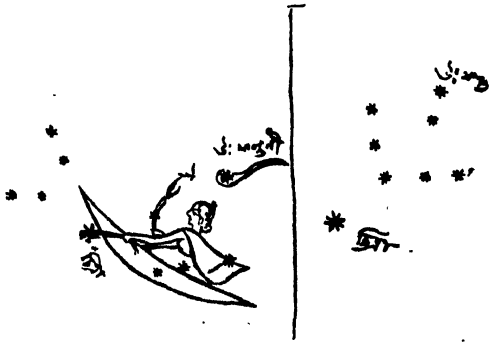
স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করছিল, ইন্দ্র ছদ্মবেশে তাদের একখানি ইঁট দিয়েছিলেন। সিঁড়ি যখন প্রায় সম্পূর্ণ, তখন তিনি ঝগড়াটে ছেলের মত, ইঁটখানি ফেরত চাইলেন। দানবেরা রেগে তাঁর ইঁট ফেরত দিল। অমনি স্বর্গের সিঁড়ি হুড়মুড় করে পড়ে গেল। কিন্তু ইন্দ্রের দেওয়া ইঁটখানি আকাশের মাঝে জ্বলতে লাগ্‌লো। দেবতারা আনন্দে—চিত্রং চিত্রং—অর্থাৎ বিচিত্র, বিচিত্র, বলে চীৎকার করতে লাগলেন। সেই অবধি এর নাম চিত্রা। নীহারিকা বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়ে জমাট বেঁধে তারা হয়। এ গল্পের সঙ্কেতও তাই। কিন্তু মাথা ঘামিয়ে এ মনোরম গল্পকে নিরাস বিজ্ঞানের রূপক বলে গ্রহণ করবার প্রয়োজন কি? "এক মৌক্তিক সমুজ্জ্বল প্রভা" চিত্রা বিষুবের ঈষৎ দক্ষিণে বেশ দৃষ্টিসুখকর। সে পৃথিবী হ'তে ২৩০ আলোক বর্ষ দূরে। রবি অপেক্ষা ১৫০০ গুণ জ্যোতির্ম্ময়। ক্রতু এবং পুলস্তকে যোগ ক'রে রেখা টানলে সে রেখা চিত্রার কিছু পূর্ব্বে পৌছে।

চিত্রার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তার দক্ষিণে কালীয় বা হাইড্রাকে দেখা যায়। হায়ড্রা মানে অজগর জল সাপ। কালীয় যমুনার অজগর। কতকগুলি তারার সর্পিল সারি দেখে উভয় জাতি তাদের সর্প-শ্রেণী ভুক্ত করেছেন। কিন্তু হিন্দুর অবতার শত্রুর অন্তিম-প্রার্থনায় তাকে ক্ষমা করেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ বিষধর কালীয়ের স্তবে তুষ্ট হয়ে তাকে আকাশে তারা করে রেখেছেন। এ মণ্ডলী কর্কটের নিচ থেকে এঁকে বেঁকে কুটিল গতিতে তুলা রাশির নিচে অবধি প্রসারিত। উত্তরের মানচিত্রে দশম ঘরে বিষুবের উপরে তার এক মুখ দেখা যাবে। দক্ষিণের মান-চিত্রে ১৭ ঘরে তার শেষ।

হায়ড্রার দক্ষিণে সেণ্টরাস। গ্রীক ভাষায় সেণ্টরাস অর্দ্ধেক ঘোড়া অর্দ্ধেক মানুষ। এ ব্যূহ দক্ষিণ আকাশে। এর প্রক্সিমা সেণ্টরাস প্রথম শ্রেণীর তারা। নক্ষত্রদের মধ্যে সে পৃথিবীর নিকটতম তারা ৪-৩ 'বর্ষ' মাত্র দূরে অবস্থিত। এ ব্যূহের সমস্ত তারা কলিকাতার অক্ষাংশ হ'তে দেখা যাবেনা। দ্বিতীয় সেণ্টরাসও প্রথম শ্রেণীর তারা—৩০০ বর্ষ দূরে। এরা দক্ষিণ দেশ হতে দেখা যায়।

তৌলিনী চিত্রার্দ্ধং স্বাতী বিশাখায়া পাদত্রয়ম।

তুলার স্বাতী নক্ষত্রের কথা পূর্ব্বে বলেছি। বুটেশ মণ্ডলীর এ তারা। (উত্তরে মানচিত্র ৬ ঘর।) সপ্তর্ষির বশিষ্ঠ ও মরীচি যোগ ক'রে, রেখাকে টেনে নিয়ে গেলে স্বাতী বা Arcturus পাওয়া যায়। বলেছি সংস্কৃত ঋক্ষ, লাটিন ursa এবং গ্রীক Arcturus—এক শব্দের ভিন্নরূপ। স্বাতী, চিত্রা এবং উত্তরফল্গুনী পরস্পর যোগ করলে এক সমদ্বিভুজ ত্রিকোণ হয়। সংস্কৃত গ্রন্থের বর্ণনায় স্বাতী—"বিদ্রুম প্রবাল সদৃশ" এবং "কুঙ্কুম সদৃশারুণরৈকতারকঃ।" তার দূরত্ব ৪১ "বর্ষ"। সূর্য্যাপেক্ষা মাত্র শতগুণ উজ্জ্বল। উত্তর ভ-ভাগে স্বাতী, অভিজিত এবং ব্রহ্ম-হৃদয় সবার চেয়ে উজ্জ্বল তারা। অবশ্য গ্রহরা নিকটে আছে ব'লে তাদের অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। ভালুকের লেজের ডগার নিচে এই তারা দেখা যায় বলে গ্রীকরা এর নাম রেখেছিল—আরকটরাস। ঐ রকম তাদের দেওয়া নাম—ভালুক সমুদ্র বা Arotic ocean এবং তার বিপরীতে আছে বলে দক্ষিণ মহাসমুদ্র Anti arotio বা Antartio মহাসমুদ্র।

স্বাতীর উত্তর পূর্ব্বে ইংরাজি u-র আকারের অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি ব্যূহ করোনা বা মুকুট। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে রাত্রি দশটা নাগাদ স্বাতী আমাদের মাথার উপর আসবে। তার অব্যবহিত উত্তর পূর্ব্বে মুকুট ভারি সুদর্শন। উত্তর মান-চিত্রের ৬ ঘরে তাকে দেখা যাবে।

ঐ ঘরে এক প্রকাণ্ড মণ্ডলী দেখা যাবে। তার নাম হারকুলিস। হারকুলিস ছিল গ্রীকদেশের বীর। তার প্রকাণ্ড দেহের নামে এই ব্যূহের নাম। এর পায়ের কাছে একটি মাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা আছে। এখানে এক প্রকাণ্ড নীহারিকা আছে। নীহারিকার কথা অন্য সময় বলব।

এদের সকলের উপরে দেখা যাবে ড্রেকো বা ড্রাগন। তার অংশ বিশেষ ধ্রুব হ'তে দশ পনেরো ডিগ্রির মধ্যে তাই আমাদের দেশ থেকে বারো মাস দেখা যায়। চীন দেশের দক্ষিণতম অংশ প্রায় উড়িষ্যার সমান

অক্ষাংশে। উত্তর চীনের অক্ষাংশ জার্ম্মানী, ফ্রান্স এমন কি দক্ষিণ ইংলণ্ডের সমান। তাই কি চীনেরা ড্রাগনকে জাতীয় পতাকায় সন্নিবেশিত করেছে? ক্রেমীর যুদ্ধে ইংরাজের জাতীয় পতাকায় ড্রাগন ছিল। অবশ্য আমি অন্যত্র বলেছি—নাগ-পূজা হ'তে ড্রাগনের সম্মান।

এবার বিশাখার কথা বলব। বলেছি ৫ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা। বিশাখা চেনা সহজ হবে। বিশাখা মাত্র একটি তারা নয়—ঐ ব্যূহের নাম বিশাখা। রামায়ণে আছে পত্নীদের মধ্যে সুগ্রীবকে দেখতে হয়েছিল যেন বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ সংপূর্ণ ইতি চন্দ্রমাঃ। ৫ই জ্যৈষ্ঠ মহামুনি বাল্মিকীর উপমার উপযোগিতা চাক্ষুষ প্রমাণ হবে। তার রূপ সম্বন্ধে জ্যোতিষ গ্রন্থ বলেছে এরা, তোরণাকৃতি পঞ্চতারকা।

উত্তরের মানচিত্রে মুকুটের ঠিক নিচে সর্পাকৃতি একদল তারা আছে। তাদের নাম সারপেন্‌স্। এরা তুলা রাশিতে বিশাখার পূর্ব্ব অবধি নেমে গেছে। দক্ষিণ ম্যাপে ১২ ঘরে তাদের দেখা যাবে।

বৈশাখী পূর্ণিমা, ভারতের কেন, জগতের একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন বুদ্ধ পূর্ণিমা—শাক্য সিংহের আবির্ভাবের শুভ-দিন। শ্রীকৃষ্ণের সেদিন ফুলদোল। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব আচার্য্যের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিন।

দক্ষিণ আকাশ

তুলা রাশিকে আকাশের দক্ষিণ দিকে দেখা যাবে। বৃশ্চিককে আরো দক্ষিণে দেখতে পাওয়া যাবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে রাত্রি দশটার সময় তার সমস্ত রূপটা ফুটে উঠবে।

মেষ থেকে কন্যা অবধি রাশিকে আকাশ বিষুবের কাছাকাছি উত্তরে এবং বাকী ছয়টিকে দক্ষিণে দেখা যায় কেন? রাশিচক্র রবির ক্রান্তি-পথ। বিষুব ঠিক পৃথিবীর পূর্ব্ব-পশ্চিম আকাশের মধ্য ভাগের কল্পিত রেখা। পৃথিবী নিজের কক্ষে ২৩ ডিগ্রি ২৭ মিঃ ঝুঁকে ঘোরে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযোগ ক'রে মাথার উপর দিয়ে রেখা টানলে, সে আকাশকে অমনি উত্তর-দক্ষিণে ভাগ করে। এ বৃত্তাংশ স্থানীয় মিরিডিয়ন বা মধ্য রেখা। আকাশের বিষুব রেখা এবং রবির ক্রান্তি পথ এক নয়। ক্রান্তি বৃত্তের হিসাবে বিষুব-বৃত্ত ট্যারচা। সূর্য্যকে বৈশাখে যেখানে উদয় হতে দেখা যায় শীতকালে সে বিন্দু হতে অনেকটা দক্ষিণে উদয়ের সময় সূর্য্যকে দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুবর দিকে মুখ করে উদয়, অস্তের সময় দাঁড়ালে বোঝা যাবে সূর্যের ক্রান্তি পথ বাঁকা। এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত দু'খানি মানচিত্র অধ্যয়ন করলে এ'কথা আরো সরলভাবে বোঝা যাবে।* একটা চাকা অপর চাকার মাঝে দিয়ে দুটিকে কাঁক করলে যেমন হয়, বিষুব এবং রাশিচক্র তেমনিভাবে আছে। অতএব এদের সংযোগ স্থল বা সংক্রান্তি দুই স্থলে। এক মেষের-প্রারম্ভে আর এক তুলার গোড়ায়। বিষুব এবং রবির ক্রান্তি-পথ সংক্রান্ত হয় ব'লে চৈত্রমাসের শেষদিন মহাবিষুব সংক্রান্তি। সম্পাত-বিন্দু দুটিকে বলে নোড্। এর একটি হ'তে বৈশাখ মাস আরম্ভ হয়েছিল, অন্যটি হ'তে কার্ত্তিক। তাই মেষ হ'তে তুলা বা বৈশাখ হ'তে আশ্বিন আমরা সূর্য্যকে উত্তরে দেখতে পাই। কার্ত্তিক হতে তার দক্ষিণায়ন আরম্ভ। মেষ এবং তুলা আরম্ভের দিন ধরিত্রী সূর্য্যের ভ্রমণ পথে সর্ব্বাপেক্ষা সোজা থাকে বলে দিন রাত সমান। পৃথিবীর কক্ষ বা চলন পথ চেপটানো বৃত্ত, ইলিপ্স বা ডিম্ব বৃত্ত। যখন বিষুব রেখা এবং ক্রান্তি-পথ সংক্রান্ত হয় তখন ঠিক মেরুর উপর সূর্য্য থাকে। দিন রাত সমান হয়। সে দিন সূর্য্য ঠিক্ পূর্ব্বে ওঠে, ঠিক্ পশ্চিমে ডোবে। তার পর উত্তরায়ন। তাই ২১ মার্চ্চ, ২২ সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি, দিন রাত সমান। ২২ জুন সকল দিন অপেক্ষা দিবাভাগ বড়, ২২ ডিসেম্বরের রাত সব রাতের, চেয়ে বড়।

কিন্তু ২১ মার্চ্চ তো—৩১ চৈত্র নয়। ১৩ এপ্রিল (এ বছর ১৪ এপ্রিল) মহা-বিষুব সংক্রান্তি। জ্যোতিষের মতে সে ঘটনা ঘটেছে ২১ মার্চ্চ বা ৭ই চৈত্র দোল পূর্ণিমায়! আমাদের পাঁজির গণনা কি ভুল?

এর উত্তর সরল। সত্যই সংক্রান্তি হয়েছে ৭ই চৈত্র। আগে চান্দ্রমাসের প্রবর্ত্তন ছিল। যে সময় সৌরমাসের চলন আরম্ভ হ'য়েছিল, সে সময় মহাবিষুব সংক্রান্তি ছিল ৩১ চৈত্র। গণনার সেই প্রথা চলে আসছে।

পৃথিবী রবির সঙ্গে ব্যোমে ঘোরে। বলেছি নিজের চলন-পথ বা কক্ষে ধরিত্রী ২৩ ডিগ্রী ২৭ মিনিট মাথা হেঁট করে ঘোরে। সে গোল নয়, উত্তর-দক্ষিণ কিছু চাপা। তাই তার মাঝখানটা (বিষুব) স্ফীত। কাজেই আকর্ষণ কেন্দ্র বৃত্ত কেন্দ্র হ'তে বিভিন্ন। তার উপর সূর্য্য ও চন্দ্রের এবং গ্রহদের আকর্ষণ আছে। ফলে সে প্রতি বছর অতি সামান্য স্থানান্তরিত হয়। অর্থাৎ তার ঘোরার পথের সম্পাত বিন্দু সরে যায়। বছরে নোড গড়ে সওয়া পঞ্চাশ সেকেণ্ড সরে যায়। যবে থেকে সৌর বছর গোনা আরম্ভ হয়েছে, সেদিন থেকে সে প্রায় সাড়ে একুশ অক্ষাংশ মীন রাশির দিকে পেছিয়ে গেছে। তাই এই গরমিল। পৃথিবীর এই সরে যাওয়াকে ইংরাজিতে বলে প্রিসিসন বা মেরুর অগ্র-অয়ন। এখন পৃথিবী লঘুসপ্তর্ষির শেষের

---

* ম্যাপটি উপর-নীচ করে ধরে একটি পরিচিত ব্যূহের নীচে ধরলে তার পরম্পরায় সব ব্যূহ চেনা যাবে। উত্তর মানচিত্রে মেরুর দিকে ম্যাপের মধ্যস্থলটা রাখলে এবং 'ভারতবর্ষ'খানি টেবিলে না শুইয়ে উচু ক'রে ধরলে সুবিধা হবে।

তারার দিকে মেরুর মাথা রেখে ঘোরে। তাই এখন সে ধ্রুবতারা। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তার উত্তর মেরুর উপরে ধ্রুবতারা ছিল ড্রাগন-ব্যূহর মাঝের বড় তারা থুবন। আটহাজার বৎসর পরে দেনেব হবে ধ্রুবতারা। বারহাজার বৎসর পরে অভিজিতের পালা। আবার ঠিক মেষের প্রথমে সংক্রান্তি হ'তে লাগবে তেইশ-হাজার বছর।
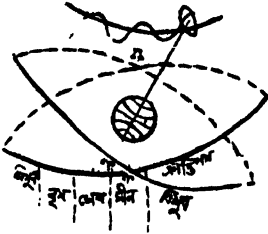
সংক্রান্তির অগ্র-অয়ন

সংক্রান্তির অগ্র-অয়ন (Precession) এর একটি চিত্র দিলাম। উপরের হিসাবে এক অংশ সরতে লাগে ৭৫ বছরের কিছু বেশী। কিন্তু এ বিষয়ে সব জ্যোতিষী একমত নন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে হিন্দু জ্যোতিষের গণনা তা'হলে কি ভুল? ১৩৫০ সালের হিন্দু পঞ্জিকা ৮ই চৈত্রকে পহেলা বৈশাখ বলেনি। কিন্তু আসল শুভ নববর্ষ যে সেদিন হওয়া উচিত ছিল, সেকথা সে ভোলেনি! তার লগ্নমান প্রভৃতি হিসাবে তাকে এ-কথা স্মরণ করতে হয়। তাই পাঁজিতে অয়নাংশের কথা লেখা থাকে। অয়ন মানে সূর্য্যের চলন। অয়নাংশ মানে কত অংশ আসল সংক্রান্তি হ'তে সে চলেছে। এ বছরের অয়নাংশ ২১ ডিগ্রি ৩৯ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড। তাহলে সংক্রান্তি হ'য়েছিল পহেলা বৈশাখের সাড়ে একুশ দিনের কিছু পূর্ব্বে।

পঞ্চাশ সেকেণ্ড বাৎসরিক অয়নাংশ নির্ভুল নয়। পৃথিবীর কক্ষ চ্যাপটা, ধরণী যখন সূর্য্যের কাছে আসে তার চলন দ্রুত হয়। দূরে গেলে টান কম, চলন মন্থর গতি হয়। গত দশ বৎসরের পাঁজির অয়নাংশ হিসাব করে দেখেছি বাৎসরিক অয়ন গড়ে ৫৪″ হয়। আবার গত বৎসরের সঙ্গে তুলনা করলে হয় ৪৮″ সেকেণ্ড।

ইকুইনক্স বা সমনিশ বা ৭ই চৈত্রের কাছাকাছি দিন হ'তে সংক্রান্তিকে পাঁজিতে বলে সায়ন (স+অয়ন) সংক্রান্তি। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ৭ই বৈশাখ ২১ এপ্রেলের দিন-পঞ্জির মারজিনে লেখা আছে—সায়ন বৃষ সংক্রান্তি দং ২০।৫০। ঐ রকম ৯ই জ্যৈষ্ঠ-সায়ন মিথুন সংক্রান্তি ইত্যাদি। ৯ই চৈত্র ২২ মার্চ্চ ১৫৩০ সায়ন মেষ সংক্রান্তি দং ৩।৩৪। ইংরাজি ২১ মার্চ্চ ঠিক কি ৪৪ সালের ২২ মার্চ্চ নির্ভুল, এ কথা গণিতজ্ঞ বলতে পারবেন।

বৃশ্চিক কেন দক্ষিণে এখন তা বোঝা যাবে।

বৃশ্চিকের একটি ভিন্ন চিত্র দিলাম।
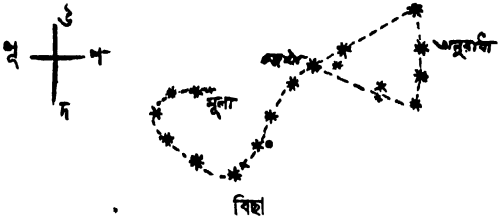
বিছা

বিছার নামটি ভীতিপ্রদ হলেও তার চেহারা খুব জমকালো। অনুরাধা বড় নক্ষত্র নয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠা বা Antares প্রথম শ্রেণীর তারা। সে আর্দ্রা এবং বৃষের রোহিণীর অল্‌ডিবেরাণের মত লাল তারা। আমাদের সূর্য হতে জ্যেষ্ঠার ব্যাস ৪৫০ গুণ বড়। তাই এ রেড জায়ান্ট বা লাল রাক্ষস জাতীয় তারা।

এই চিত্রের অন্তদিকে মূলা। সে ধনুরাশির তারা। ধনুরাশিতে প্রথম শ্রেণীর তারা নাই, কিন্তু অনেকগুলি তারা মিলে, তার রূপকে দৃষ্টি সুখকর করেছে।

এবার অভিজিত বা ভেগার কথা বলব। তারকা ত্রয়াত্মক শৃঙ্গাটকা-কৃতি। উত্তর মানচিত্রে ৭ ঘরে তাকে দেখা যাবে। পাশ্চাত্যেরা এ ব্যূহকে শৃঙ্গাটক বা সিঙ্গারা না বলে লায়ার বা গ্রীক বীণা বলে। রাত্রি দশটার পর অভিজিতকে সগৌরবে নভোমণ্ডলে ভাল করে দেখা যাবে। তার উজ্জ্বল কান্তি বিমোহন। সে মাত্র ২৬ বর্ষ দূরে অবস্থিত। গত যুদ্ধের শেষের দিকের তার রূপ আমরা এ বৎসর দেখব। এ মণ্ডলের একটি তারা যুগল।

অভিজিতের বামদিকে ঈষৎ পূর্ব্বে সিগনাস বা হংস ব্যূহ। তার দেনেব প্রথম শ্রেণীর তারা। নিচের তারাটির নাম আরবী—আল্‌বিরীয়। সম্পূর্ণ মণ্ডলটি হাঁসের আকারের। দেনেব ৬০০ আলোক-বর্ষ দূরের তারা। রবি হতে দশ হাজার গুণ উজ্জ্বল।

এ মাসে মাত্র আর একটি বড় নক্ষত্রের কথা বলব—শ্রবণা বা অলটেয়ার। অভিজিত দেনেব এবং শ্রবণা যোগ করলে একটি ত্রিকোণ হয়।

সূর্য্যের অয়ন বা চলন এবং পৃথিবীর ক্রান্তি ও বিবর্ত্তনের জন্য প্রতি মাসে সকল তারা দেখা যায় না। আকাশও গোল, কাজেই গোল পৃথিবীর উল্টা দিকে নভে কি আছে তা দেখবার উপায় নাই। সূর্য্যও মেদিনীকে রাশি হ'তে রাশিতে টেনে নিয়ে চলে।

তারা চেনা একটা অনুশীলন। সকল সাধনার মত এ বিষয়ে দেহের পরিশ্রম ও মনের সংযম অনিবার্য্য। ঐকান্তিক একাগ্রতা ভিন্ন এ সাধনার সিদ্ধি অসম্ভব। কিন্তু এ অনুশীলনে আনন্দ অপার। বিশ্ব যেমন অনন্ত এ বিষয়ের তেমনি অন্ত নাই।

পাতঞ্জল দর্শনে সিদ্ধির যে সব উপায় আছে সকল কাজেই সে সব উপায়ে সিদ্ধি পাওয়া যায়। যোগের চরম উদ্দেশ্য ব্যতীত অনেক বাহ্যিক বিভূতির কথা পাতঞ্জল দর্শনে বর্ণিত হয়েছে। আমরা মহামুনির তিনটি সূত্রের সরল অর্থ নিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রদের সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

ভুবন জ্ঞানম্ সূর্য্যসংযমাৎ। সূর্য্যে সংযত মনোবৃত্তি অভিনিবেশ করলে ভুবনজ্ঞান হয়। সূর্য্যের ক্রান্তি পথ এবং তার তেজ প্রভৃতি অনুশীলন করলে ধীরে ধীরে নক্ষত্র মণ্ডলদের পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য মানে আমাদের রবি ছাড়া সকল নক্ষত্রকে ধরা যেতে পারে। সূর্য্য-সংযমে ভুবনজ্ঞান হয় চূড়ান্ত।

চন্দ্রে তারাব্যূহ জ্ঞানম্। চন্দ্রের গতি, চলন-পথ হ্রাস, বৃদ্ধির জ্ঞানের দ্বারা নক্ষত্রব্যূহদের জ্ঞান জন্মে—এ কথা আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি।

ধ্রুবে তদ্গতি জ্ঞানম্। ধ্রুবকে স্থির একই স্থলে দেখি। তার সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য্যের গতি এবং নক্ষত্রমণ্ডলের আপাতঃ দৃষ্ট গতির দ্বারা আমরা নক্ষত্রব্যূহের সন্ধান করি। এদের সবারই আবার গতি আছে। এ জ্ঞান গভীর অনুশীলন সাপেক্ষ।

ভারতবর্ষ জ্যোতিষের জন্মস্থান। জ্যোতিষ সকল জাতিরই কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ভারতবর্ষের অনুশীলনের রীতি ও পদ্ধতি অন্যত্র হ'তে পৃথক। বহু জ্যোতিষের গ্রন্থ এখন অবলুপ্ত। সকল কৃষ্টি যেমন একদিন বদ্ধ হ'য়েছিল, জ্যোতিষ চর্চ্চাও তেমনি মাত্র ফলিত জ্যোতিষে আবদ্ধ হয়েছিল। গ্রহদের চলা-ফেরার সঙ্কেত হ'তে মানুষের ভাগ্যের সঙ্কেত জানবার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছিলেন পণ্ডিতকুল। গণিত-মূলক জ্যোতিষের অগ্রগতি বন্ধ হ'ল। প্রাচীন পদ্ধতিতে যে সব নলিকা-যন্ত্র প্রভৃতির কথা শাস্ত্রে আছে, তাদের ব্যবহার ও উন্নতির আজ সন্ধান পাই না। এ দুর্ভাগ্য কেবল আমাদের জাতের ঘটে নি। মিশর, গ্রীস, রোমের কৃষ্টি বিস্মৃতির সলিলে নিমগ্ন। কালদীয় সুমেরীয়র অবস্থাও তদ্রূপ। ভারতীয় এবং আরব জ্যোতিষের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল মাত্র।

আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞা জ্যোতিষ্কদের সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করেছে। গণিত, পদার্থবিজ্ঞা, রসায়ন প্রভৃতি জ্যোতিষকে সাহায্য করছে।

এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বিষয় প্রবেশের আহ্বান। মহামতি জিনস্,

প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং আমাদের জগদানন্দ রায় মহাশয় প্রভৃতি মনীষীরা এ সম্বন্ধে সরল ভাষায় লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। এডিংটন তাঁর Expanding Universe গ্রন্থে আমাদের গণিতজ্ঞ পণ্ডিত প্রফেসার সেনের গণনার ফল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিমেটারের অঙ্কফলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কৃষ্টি জগতের সম্পদ। আমাদের নবীন পণ্ডিতেরা দেশী ও বিদেশী জ্যোতিষ জ্ঞান সমন্বয় ক'রে এ বিচিত্র শাস্ত্রের উন্নতি করবেন, সে আশা আমি পোষণ করি।

অনন্ত সৃষ্টি, বিশাল বিশ্ব। তাই নক্ষত্র জগতও অনন্ত। কোনো ইক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য না নিলে মানুষের চোখ দুহাজার হতে তিন হাজার অবধি নক্ষত্র দেখতে পারে। তার অধিক দেখবার দৃষ্টিশক্তি তার নাই। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা তারার সংখ্যা নির্ণয় করছেন। কেবল আমাদের তারকা বিশ্বে কোটি কোটি সূর্য্য আছে। বড় দূরবীনে জ্যোতির্ব্বিদেরা প্রায় দেড় কোটি নক্ষত্র দেখেছেন।

এস্থলে একটা কথা বলি। একটি জ্যোতিষ্ক হতে অন্যটি লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত। গ্রহ, তারকা, নীহারিকা, ধূমকেতু, গ্রহকক্ষর প্রভৃতি অসংখ্য। ব্যোমের আকার সীমাহীন। তার উপর যখন এ কথা স্মরণ করে রাখতে হয় যে এই ব্যোমে জ্যোতিষ্করা পরস্পর হ'তে বহু দূরে দূরে অবস্থিত তখন ব্যোম কি অনন্ত বিস্তৃত তা কল্পনাও করা যায়না। মহান ব্যোম হ'তে সুমহান সৃষ্টিকর্ত্তা কতবড় সে কথা ভাবলেও পুলক অনুভব করা যায়। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী জিন্‌স বলেছেন যে আমাদের পৃথিবীতে যত সমুদ্র আছে তাদের বেলায় যত বালি আছে ততসংখ্যক নক্ষত্র বিশ্বে বর্ত্তমান। আমি যে নক্ষত্রের তালিকার কথা বললাম সে আমাদের বিশ্ব মহলের মাত্র কতকগুলি অতিকায় নক্ষত্রের সংখ্যা নির্ণয়ের আয়োজন। এ মহল্লার নাম গ্যালাক্‌টিক। এই রকম যে কত অসংখ্য গ্যালাকটিকে বিশ্ব পূর্ণ তার ইয়ত্বা করা অসম্ভব। দূর হতে সহরের উপরে আকাশের আলো দেখলে যেমন একটা প্রকাণ্ড সুআলোকিত নগরের আভাষ পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের আকাশে তাকিয়ে, ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গার জ্যোতি দেখে, বৈজ্ঞানিক স্থির করেছেন যে সে আলো আমাদের গ্যালাক্‌টিকের বাহিরের অপর নক্ষত্রখচিত আকাশ রাজ্যের ছায়া।

আমাদের তারকা বিশ্বে নক্ষত্রদের কথঞ্চিত দূরত্বের আভাষ দিয়েছি। গ্রহেরা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং ভাস্করের সন্তান। চাঁদ পৃথিবী হতে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে। তার চেয়ে ৪০০ গুণ দূরে সূর্য্য অবস্থিত। সূর্য্যকে একপাক প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীকে নিজের কক্ষে ৩ কোটি ৭২ লক্ষ মাইল ভ্রমণ করতে হয়। রবি পৃথিবী হতে ৯ কোটি ২৯ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের ভানু পৃথিবীর তুলনায় এতবড় যে তার মধ্যে তের লক্ষ পৃথিবী প্যাক্ করে রাখা যায়। সূর্য্য হ'তে গ্রহদের মোটামুটি দূরত্বের একটা পরিচয় দিচ্ছি। সূর্য্য হ'তে পৃথিবীর দূরত্ব যদি হয় ১০ তাহ'লে সূর্য্য হতে দূরত্ব—বুধের ৩·৯, শুক্রের ৭·২, মঙ্গলের ১৫·২, গ্রহ কঙ্করের গুচ্ছের ২৬·৫, বৃহস্পতির ৫২, শনির ৯৫·৪, উরেনাসের ১৯১·৯, নেপচুনের ৩০০·৭ এবং প্লুটোর ৩৯৬। ১০ যদি হয় ৯,২৯০০,০০০ মাইল তাহলে এর ৩৯৬ গুণ কত মাইল হবে অঙ্কটা কষা সোজা, কিন্তু তার গুণফলের সংখ্যার আয়তনটা ভীতিপ্রদ। নিকটতম নক্ষত্র নিকটতম গ্রহ হতে অন্ততঃ দশ কোটি মাইল দূরে।

সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল ছুটছে, সে আবার এই সমস্ত গ্যালাক্সির মধ্যে সকলের সঙ্গে ঘোরে। সে ঘোরার পথে রবির একপাক ঘুরতে লাগে ২৫ কোটি বৎসর।

আমি পূর্ব্বে অন্যত্র যে কথা বলেছিলাম সে কথা পুনরায় বলে এ প্রবন্ধ আপাতত শেষ করব। আবার কার্ত্তিক মাসে অনেকগুলি গ্রহ নক্ষত্রের পরিচয় দিব।

এ সৃষ্টি যে একজন অধ্যক্ষের ইচ্ছাসম্মত, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাঁরই অধ্যক্ষতায় তাঁরই প্রকৃতি চরাচর প্রসব করেন। তিনি অব্যয়—বিশ্বের প্রভব, প্রলয়, স্থান, নিধান, বীজ। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এ আয়োজনের প্রয়োজন কি? সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

সকল ন্যায়, সব তর্ক, সব বিচার, যাবতীয় দার্শনিক গবেষণা—এখানে এসে পথ হারিয়ে ফেলে।

উত্তর মাত্র একটি- তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা!

স্মৃতি-চিত্র

শ্রীস্নেহলতা দেবী

ছায়ায় ঘেরা নদীর তটে
বকুল বীথির তলে তলে,
আজো তোমার কাঁখের ঘটে
কাঁকন বাজে পলে পলে।

পাখী যখন প্রথম ডাকে
অরুণ-রাগে মেঘের ফাঁকে

লতাজালের আড়াল থেকে
দেখতে মোরে কৌতুহলে।
দুলিয়ে রাঙা আঁচলখানি
উষার মত মোহনরূপে,
আঁকা-বাঁকা বনের পথে
চল্‌তে তুমি চুপে চুপে।

কলকলিয়ে বল্‌ত নদী,
"গাহন কর এলেই যদি।"

আল্‌তা পায়ের ছোপ লাগিত
শিশির ভেজা তৃণের দলে॥

গাহন ক'রে ফিরতে তুমি
ভিজা চুলে হাস্য মুখে
আঁচল-ঝরা জলধারার
দাগটি রেখে পথের বুকে।

আম বাগানের মধ্য দিয়া
যেতে কলস আন্দোলিয়া

মুকুলঝরা মধু তোমার
ঝর্‌ত শিরে আশিস্ ছলে॥
সিক্ত বসন তেয়াগিয়া
পরতে তুমি তসর শাড়ী,
দিব্য রুচি শুভ্র শুচি
সে রূপ কি আর ভুলতে পারি?

নারী তুমি সাজতে দেবী
ভক্তিভরে সে রূপ সেবি

তুলসী তলায় করতে প্রণাম

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জনকল্যাণব্রতী এই বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সময়োচিত কার্য্যপদ্ধতির সহিত পরিচিত হইয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং আমাদের দেশের পল্লী-অঞ্চলের কর্ম্মীবৃন্দ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করিতেছি। গত ১৯০৯ অব্দে স্থানীয় অসহায় ও নিরুপায় অনাথদের শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের সাহায্যকল্পে আরিয়াদহ-নিবাসী (২৪ পরগণা) ৺রায়সাহেব রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হরেন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই তিনজন সহৃদয় ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ক্ষুদ্রভাবে যে অনাথ ভাণ্ডারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, বর্ত্তমানে তাহাই দুইটি বৃহৎ অট্টালিকা আশ্রয় করিয়া ব্যাপকভাবে জনসেবা এবং স্থানীয় দুস্থগণকে শিল্পসম্পর্কে স্বাবলম্বী হইবার সুযোগ দিতেছে। প্রতিষ্ঠার পর এই ভাণ্ডারটি প্রায় নয় বৎসর ধরিয়া গ্রামের বিভিন্নস্থান
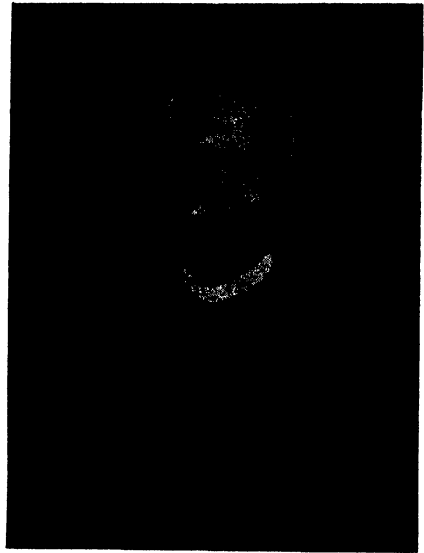
রায়সাহেব রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

আশ্রয় করিয়া সেবাব্রত পালন করিতে থাকে। পরে ১৯১৮ অব্দে এই গ্রামনিবাসিনী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতিরক্ষা-

হরেন্দ্রগোপাল মুখোপাধ্যায়
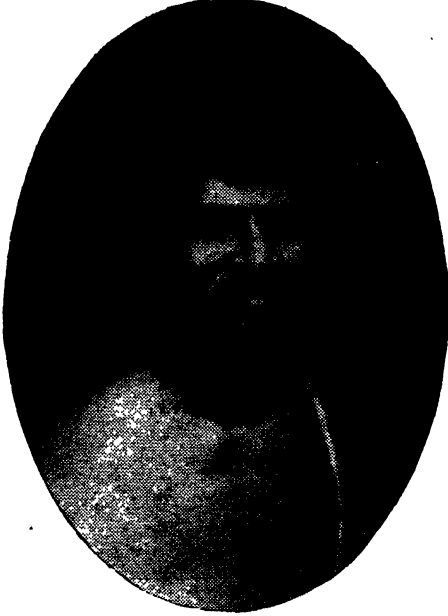
কল্পে প্রথম অট্টালিকাটি অনাথ ভাণ্ডারকে দান করায় উহা 'ক্ষেত্রনাথ স্মৃতিমন্দির' নামে অভিহিত এবং উক্তভবনে ভাণ্ডার স্থায়ীভাবে স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর তৎকালে দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে পৌরহিত্য

নিজস্ব ভবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ভাণ্ডারের প্রথম সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় ভাণ্ডার হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত দরিদ্রদিগকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য একটি আদর্শ শিল্পালয় খুলিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই সম্পর্কে নাড়াজোলের রাজা স্বর্গত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ১৯১৮ অব্দে অনাথ ভাণ্ডার ভবনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগ দিয়াছিলেন এবং বঙ্গ-গৌরব সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় আশীর্ব্বচনে উদ্যোক্তাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ফলে মামুলী প্রথায় চরকা চালাইয়া শিল্পচর্চ্চা সুরু হয়। কিন্তু ভাণ্ডারের সেই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তবে জনসেবার কার্য্য নানা ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বারাকপুরের তৎকালীন মহকুমা হাকিম এইচ-ডব্লিউ লাইন আই-সি-এস-এর চেষ্টায় কলিকাতার রয়েল টার্ফ ক্লাব ভাণ্ডারকে নিয়মিতভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। এতদ্ভিন্ন কলিকাতার বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ী ডাঃ যামিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ওঙ্কারমল জেঠিয়া প্রভৃতির প্রচুর সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাতীর সন্নিহিত বিস্তীর্ণ জমির সহিত সুবৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিয়া এই বাড়ীতে পূর্ব্বপরিকল্পিত শিল্প-বিভাগটিকে নূতন উদ্যমে চালু করা হয়। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে রাজগীরের স্বামী কৃপানন্দজী, বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। এই ব্যাপারটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রী এসোসিয়েসন, বারাকপুরের এস-ডি-ও মিঃ এ, উলার আই-সি-এস এবং তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুরের সাহায্য, কলিকাতা ফুটবল এসোসিয়েসন, আরিয়াদহের বিশিষ্ট ডাক্তার নারায়ণচন্দ্র মিত্র, ব্যবসায়ী বাসবচন্দ্র দাস, সনৎকুমার ঘোষাল প্রভৃতির সাহায্য পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আরিয়াদহের বিশিষ্ট অধিবাসী রেঙ্গুন প্রবাসী স্বনামখ্যাত য়্যাডভোকেট কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃযুগলের নামে এককালীন বিশিষ্ট অর্থদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় রেঙ্গুনে

ভাণ্ডারের নূতন গৃহ

করেন এবং সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, পাইকপাড়ার কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, ভারতবর্ষ সম্পাদক রায় বাহাদুর জলধর সেন, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি উক্ত উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

আইন-ব্যবসায়ে বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিভিন্ন সদনুষ্ঠান ও বদান্যতায় প্রবাসে বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠানটি আরিয়াদহ এবং তাহার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বর কামারহাটি

প্রভৃতি অঞ্চলের অসহায় অনাথগণকে অন্নবস্ত্র, ঔষধ পথ্যাদি বিতরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই ; উত্তরবঙ্গের ভীষণ বন্যার সাহায্যকল্পে সার পি, সি, রায় পরিচালিত সঙ্কটত্রাণ সমিতিতে চাউল ও বস্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিহার ভূমিকম্পে, বর্দ্ধমানের বন্যায় এবং মেদিনীপুরের ঝঞ্ঝায় অনাথ ভাণ্ডার বস্ত্র চাউল ও লোকজন পাঠাইয়া যথাসাধ্য সেবা ও সাহায্যে অবহিত ছিলেন। এ সম্পর্কে সার হরিশঙ্কর পাল, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী সন্তোষকুমার বসু, পাইকপাড়ার স্বর্গত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, কাশীপুর গানফ্যাক্টরীর কর্ম্মীবৃন্দ, দক্ষিণেশ্বর ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরীর ডাইরেক্টর, বিশিষ্ট হার্ডোয়ার মার্চেন্টস্ এস, এন, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড কোং প্রভৃতি নানাভাবে ভাণ্ডারকে সাহায্য করেন। সম্প্রতি কুষ্টিয়ার সুপ্রসিদ্ধ মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষ দুস্থগণের জন্য প্রস্তুত নির্দ্দিষ্ট মূল্যের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ' দিয়া তাঁহাদের জনসেবায় সাহায্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে অনাথ ভাণ্ডারের শিল্প বিভাগের কাজগুলি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া যেমন জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে, তেমনই বহু অনাথ বালক ও নর-নারীর স্বাবলম্বন—স্পৃহা সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। এই বিভাগটির প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়ের স্বপ্ন এতদিনে সফল হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। ভাণ্ডারের শিল্পীদের হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বিভিন্ন শ্রেণীর সামগ্রীসম্ভার কুটীর-শিল্পের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহা আশার কথা, আনন্দের কথা।

পল্লীবাসীদিগকে খাঁটি দুগ্ধ যোগাইবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ভাণ্ডার গোশালা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কতিপয় গাভী এবং হৃষ্টপুষ্ট যণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। এই অঞ্চলের দরিদ্র বালক-বালিকাগণকে শিক্ষার সুযোগ দিবার জন্য ভাণ্ডার-ভবনে নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া উদ্যোক্তাগণ জনসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ভাণ্ডারের সেবকবৃন্দ যাহাতে সচ্চরিত্র ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ থাকিয়া সাধারণের আস্থাভাজন হন, সেদিকেও কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ। প্রত্যূষে স্তোত্রাদি পাঠ ও দেবারাধনা এবং প্রতি রবিবার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাগবৎ পাঠ ও নামকীর্ত্তনে সেবক এবং জনসাধারণের অন্তরে স্বধর্ম্মনিষ্ঠার প্রেরণা দিয়া থাকেন। ভাণ্ডারের সেবকগণকে স্বাস্থ্যলাভের সুযোগ দিবার জন্য রাজগিরে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ স্বামী কৃপানন্দজীর তত্ত্বাবধানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

এই সকল অনুষ্ঠানের পশ্চাতে যে সুশিক্ষিত অজ্ঞাতনামা ত্যাগী মানুষটির কর্ম্মময় হস্তের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রহিয়াছে, তিনিই এই বিরাট সংস্থাটির প্রাণস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা দেশের ধনাঢ্য-সমাজের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

ভাণ্ডারের কর্ম্মীবৃন্দ

কুসংস্কার ?

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

বড়লোক তাহারা। কত বেশী বড়লোক, কি পরিমাণ টাকা তাহাদের, কল্পনা করিতে সাধারণ লোকের কষ্ট হইতে পারে।

তাহাদের বাড়ীতে বিবাহ ১৩৪৯ সালের ফাল্গুন মাসে, যখন অগ্নিমূল্য প্রত্যেকটি জিনিসের। যখন শাড়ী, ব্লাউস্, বেনারসী, ক্রেপ, ব্রোকেড্, ভায়েলা, ঘড়ি, গহনা, খাটবিছানা, জুতা, টয়লেট্ আগের দরের চতুর্গুণ ; যখন সহজে ছাদে তেগ্‌লা দেওয়া যায়না, পেট্রোল পাওয়া যায়না, ভালো করিয়া আলো জ্বালা যায়না। যখন ময়দা, চিনি, পোলাওয়ের চাল অনেক বেশী দাম দিয়াও সংগ্রহ করিতে কষ্ট হয়, সেই সন ১৩৪৯ সালের ফাল্গুন মাস! যখন নমস্কারী ও লৌকিকতায় মাথায় বজ্রাঘাত হইবার কথা, প্রীতি-উপহার ছাপানো চলেনা কবিযশোপ্রার্থীদের।

কিন্তু ইহাদের কষ্ট নাই, পাঁচতলা বাড়ী আলোয় আলো, ঘরে ঘরে আশার অতিরিক্ত উপকরণ স্তূপীকৃত, বাড়ীর সাম্‌নে মোটরের পর মোটর দাঁড়াইতেছে, সুন্দরীর পর সুন্দরী নামিতেছে—পেন্টিং ও লিপ্‌ষ্টিকের, জড়োয়া ও জর্জ্জেটের বিজ্ঞাপন দিয়া।

সেই ক্ষণিকের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবার সময়ে শুনিতে পাইলাম দরোয়ানদের প্রতি সাবধান বাণী—যেন একটিও বাজে লোক না ঢোকে!

তবু একজন ঢুকিল পুরোহিতের পশ্চাতে, লোকটিকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম ওদিকের মোড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল।

ভিতরের উজ্জ্বল আসরের একপাশে গিয়া সে বসিল। সাবান দিয়া ঘরে কাচা সার্ট ও চাদরের উপর পাঁচশো বাতির কিরণ আসিয়া পড়াতে যেন তাহার একটু লজ্জা হইল, অনেক লোকের পশ্চাতে উঠিয়া গিয়া বসিল।

ছোট্ট 'বোকে' হাতের কাছে ধরিতে একবার ইতস্তত: করিয়া শেষটা লইল। দ্বিধা কাটিয়া যাইতে সরবং, চা, সিগারেট, পান, কবিতা, সবই সে হাত বাড়াইয়া লইল।

খাবার স্থান ত্রিতলে, মর্ম্মর-মণ্ডিত হল্‌-এ। টেবিলের ব্যবস্থা। দেখি সে আমার পাশেই বসিয়াছে। কাঁচাপাকা দাড়ী, ছাঁটিয়া সমান করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, চোখে ক্ষুধার জ্বালা।

বেগুন-ভাজা চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে সে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল খাওয়া সুরু হইয়াছে কিনা।

সুরু হইবার পর আর অপেক্ষা করিলনা। প্রত্যেকটি বস্তু সে তিনবার করিয়া চাহিয়া লইল এবং কি তৃপ্তি ও আগ্রহের সহিত খাইতে লাগিল বলিবার নয়।

'দিন ত মশায় পোলাও আর একটু' 'মাছ? এদিকে' 'মাংস? দিন্' 'চপ দেবেন ত একটা, দিন্ আর একটা' 'ফ্রাই? দিন্। দিন্। দিন্।' শুনিয়া শুনিয়া আমারই লজ্জা করিতে লাগিল। 'দই? এই গেলাসে দিন্ সুর। ভর্ত্তি ক'রে দিন্।' 'ডিমসন্দেশ আর একটা দেবেন'! নাঃ, অসহ্য! লক্ষ্য করিলাম লোকটা একটা ডিমসন্দেশ পকেটে পুরিয়াছে। আমি দেখিতে পাইয়াছি দেখিয়া আমাকে শুষ্ক ম্লান হাসির সহিত বলিল, 'মেয়েটা ভালোবাসে।' আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্যাপারটা চাপা দিবার জন্য বলিল—'মিষ্টি এরা অনেকরকম করেছে। ভালো ক'রে খেতে হবে। পরিবেশনের অব্যবস্থা দেখেছেন?'

গৃহস্বামী এই সময়ে আসিয়া সবিনয়ে 'আপনাকে কি দেবে?' 'কেমন হ'ল মিষ্টার বোস?' 'চাটুয্যেমশাই যে হাত গুটিয়ে?' বলিতে বলিতে অগ্রসর হইলেন।

আমার আগেই লোকটি বলিল—'চমৎকার হয়েছে সব জিনিষপত্তর!'

গৃহকর্ত্তা কহিলেন—'আপনি কে? আপনাকে ত চিন্‌তে পারছিনা? কোন্ পক্ষের আপনি?'

গবদ সিল্ক ও জরীপাড় চাদরের মাঝখানে কোঁচকানো সাট ও মলিন উড়ানী অবশ্য অত্যন্ত অশোভন ও বেমানান দেখাইতেছিল, অভ্যস্ত চক্ষুর সম্মুখে রবাহূতকে চিনিতে দেরী হয়না।

তাছাড়া সে যখন 'আজ্ঞে আমি'র বেশী আর কিছু বলিতে পারিলনা এবং খোঁচাখোঁচা দাড়ী-ভরা মুখ সরমে শঙ্কায় অকস্মাৎ নিষ্প্রভ হইয়া গেল, তখন তাহাকে শুনিতেই হইল—'উঠে পড়ো, ওঠো শিগ্‌গির!'

'আহা, বসেছে যখন, খেয়ে নিক্‌না' একথাটা মনে আসিলেও মুখ দিয়া আমার বাহির হইলনা সমবেত বহুকণ্ঠের গর্জ্জনে।

'দূর ক'রে দাও রাস্কেল্‌কে' 'দাও ঘা-কতক!' ধ্বনির মধ্যে তাহার গলাটা ধরিয়া দরোয়ানের হাতে তাহাকে সমর্পণ করা হইল। অন্তরালে দুই গালে খুব জোরে চড় মারারও আওয়াজ পাইলাম।

একটা অজাত-কুজাত লোক—হয়ত চোর এবং বদ্‌মাইস্, ধরা পড়িয়া যাওয়াতে সকলেই যেন স্বস্তিবোধ করিতে লাগিল এবং ঐ শ্রেণীর আর যাহারা ছিল তাহারা বোধ করি ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিল।

কিন্তু আমার পাশে সেই অর্দ্ধভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত লোকটার শূন্য পাতা এমন বিমর্ষভাবে পড়িয়া রহিল যে চোখের কোণ ঝাপ্‌সা হইয়া যাওয়াতে বাকী মিষ্টান্নগুলি আর খাওয়া গেলনা।

৪২৲ টাকা মণ ময়দা এবং ৩০৲ চালের দিনে যে লোকটা ফাঁকি দিয়া খাইতে আসিয়াছিল তার প্রতি প্রথমে কেন যে বিরক্ত হইয়াছিলাম বুঝিতে পারিলাম না।

নীচে আসরে সঙ্গীত চলিতেছিল, নূতন নিমন্ত্রিতদল জমিয়াছে।

রাস্তায় কাঙালীরা পুরাতন পাতাগুলি সংগ্রহ করিয়া একটুকরাও খাদ্য পাইতেছেনা, দুর্ম্মূল্যের দিনে অপচয় করিতে নাই বলিয়া সকলে সুবিবেচকের মত কিছুই ফেলে নাই। যাহাদের পাতা পাতিয়া কেহ খাওয়াইবেনা, ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া যাহাদের উদরপূর্ত্তি হয়, waste not want not নীতিতে তাহাদের আমরা কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি, স্বচক্ষে দেখিলাম।

আর একটু ওধারে অন্ধকার ফুটপাতে সেই লোকটিকে যেন লক্ষ্য করিলাম, গায়ের চাদরটা তাহার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। হয়ত তাহা ফিরিয়া পাইবার প্রত্যাশায় ছিল। স্বল্প আলোকেও জামায় রক্তের দাগ এবং বিবর্ণমুখ নজরে পড়িল।

কাছাকাছি যাইতে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল বুঝিবা আমার কাছ হইতেও নির্য্যাতনের আশঙ্কায়।

পাঁচতলা বাড়ীর আলোকিত প্রতিঘরে হাস্যপরিহাস ও অলঙ্কার-শিঞ্জনে যে রূপলোক রচিত হইয়াছিল একটি ভীরু দরিদ্র হতভাগ্য প্রৌঢ়ের দীর্ঘশ্বাসে সেখানে যেন অভিশাপ ঘনাইয়া উঠিল।

* * * *

১৫ই ফাল্গুন ঐ বাড়ীর যে মেয়েটির বিবাহ হইল, ১লা চৈত্র তাহার টাইফয়েডের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কোনো যোগ আছে বলিলে লোকে আমায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিতে পারে, কাজেই নিরস্ত হইলাম।

শতাব্দীর শিল্প–পিকাসো

শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায় এম-এ (লণ্ডন), এফ-আর-এ-আই (লণ্ডন)

উনবিংশ শতাব্দীতে একমাত্র ফ্রান্স এবং ফরাসী জাতটাই যা কিছু শিল্প সৃষ্টি করে এবং বলতে গেলে এ ছাড়া অন্যত্র ভাল শিল্পের উদ্ভব মোটেই হয় নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স তার গৌরব রক্ষা করতে পারেনি —স্পেন এই সম্মানের অধিকারী হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীদের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর পার্থক্য এইখানে

ছুটি নগ্ন নারী

অশ্বারোহ

যে পূর্ব্বোক্ত শিল্পীরা সব সময় প্রতিকৃতি সামনে রেখে ছবি আঁকতেন, আর বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল শিল্পীদের আদর্শই হল প্রতিকৃতি একেবারে দূরে সরিয়ে রাখা। ১৯০৪-১৯০৮ সনে যখন প্রথম জনসাধারণ পিকাসোর ছবির প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পায় তখন সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল একটি বিষয় লক্ষ্য করে যে—প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ছবিগুলি কিরূপ জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

সমাজের প্রত্যেকটি ভাঙাগড়ার ইতিহাসের পেছনে একটা হেতু থাকে। পিকাসোর বয়স যখন উনিশ তখন. প্যারিস-শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলিতে তিনি দেখলেন এক নূতন রূপ—যেখানে প্রতিকৃতির কোন স্থান নেই। সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত শিল্পী ম্যাটিস্‌ও. প্যারিস-শিল্পীদের এই অভিনবত্বে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। সুতরাং পিকাসোর শিল্প-জগৎ যেন তৈরী হয়েই ছিল—তিনি একদিকে দেখেছিলেন স্পেনীয় শিল্পীধারা এবং অন্য দিকে পেয়েছিলেন কিউবিজম্‌-এর অনুপ্রেরণা—যা স্পেনের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে স্পেনে যাওয়া ছাড়া পিকাসোর সমস্ত জীবনটাই কাটে প্যারিসে। এখানে তাঁর বহু সাহিত্যিক বন্ধু হয়। দৈনন্দিন জীবনে তাঁর শিল্পী-বন্ধুদের চেয়ে সাহিত্যিকদের দরকার ছিল বেশী—কেননা পিকাসো জানতে চাইতেন নূতন চিন্তাধারা—যা তাকে সব সময় অনুপ্রাণিত করত। তাই গোড়ার দিকে তার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে ম্যাক্স জ্যাকবের সঙ্গে এবং পরে তিনি আঁদ্রি স্যামন্ প্রভৃতি "স্যুরিয়ালিষ্ট্" লেখকদের সংস্রবে আসেন। অবশ্য তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ আলাদা ধরণের ছিল। স্বভাবতঃ শিল্পীরা নিজের সত্ত্বা নিজের মধ্যে উপলব্ধি করতে চান না; তাই পিকাসো নিজের মধ্যে দেখতে চাইতেন তাঁর আঁকা বস্তুর প্রতিবিম্ব—যার ফলে পিকাসোর বন্ধুত্ব শুধু সাহিত্যিকদের সঙ্গেই সম্ভব হল।

নারী

পিকাসোর প্রতিভা সেইখানে, যেখানে তিনি শিল্পী ও কারিগর দুইই। তিনি শিল্প জগতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করে দিতে চাইতেন এবং তাঁর এই প্রচেষ্টায় যাতে কোনরূপ কার্পণ্য না থাকে সেই জন্যেই বিভিন্ন সাহিত্য ও শিল্প থেকে নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে সব সময় চেষ্টা করেছেন। এই মনোভাবই ছিল পিকাসোর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

১৯০৮ সনে পিকাসো যখন স্পেন থেকে তাঁর আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য পটগুলি নিয়ে প্যারিসে ফিরে এলেন তখন থেকেই তিনি কিউবিজম্ পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে সুরু করে দিয়েছেন। দেখা যায় মোটামুটি তিনটি কারণে পিকাসো কিউবিজম্‌-এর ভক্ত হয়ে ওঠেন।

প্রথমতঃ 'কম্পোজিসন্' মানুষের জীবন যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক জগতে বিজ্ঞান যে আবিষ্কার করেছে তার সত্ত্বা উপলব্ধি

করা। তৃতীয়তঃ শিল্প, বাঁধাধরা কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসেছে—গতানুগতিক "ফ্রেমের" মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব—তাই কিউবিজম্ এর সৃষ্টি অনিবার্য্য।

ঠিক সেই সময়েই পিকাসোর আবির্ভাব হল এবং তিনি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত জিনিষটাকে উপলব্ধি করে শিল্প সৃষ্টি কাজ সুরু করে দিলেন।

কিউবিজম্ সবে মাত্র সুরু হয়েছে। পিকাসো প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন ছাড়াও মানুষের প্রতিকৃতি কিউবিজম্ সাহায্যে প্রকাশ করতে লাগলেন। যদিও পিকাসো কিউবিজম্ পদ্ধতিতে প্রথম আঁকেন প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং পরে "Still lives"; কিন্তু নিজে স্প্যানিয়ার্ড ছিলেন বলে পিকাসো বেশ বুঝতেন যে মানুষ নিয়েই হচ্ছে তার কারবার। মানুষের মুখ, মানুষের দেহ, সব যেন পিকাসোর জন্যে অপেক্ষা করেছিল। তাই পিকাসো সব সময়েই নরনারীর মুখ দেখে বলতেন পৃথিবীর মতই ওরা আদিম। দিনের পর দিন পিকাসো আপ্রাণ চেষ্টা সুরু করলেন মানুষের দেহ ও মুখের গঠন কাজে। এই প্রথম প্রচেষ্টায় পিকাসোকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে কিন্তু তিনি কখনও আদর্শচ্যুত হননি, কোন কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারেনি।

অনুপ্রেরণা

আপ্রাণ প্রচেষ্টা চলতে লাগল।

অধিকাংশ জনসাধারণের ধারণাতেই আসত না, ফুল, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জগৎ প্রভৃতির তুলনায় মানুষের দেহ ও মুখের পার্থক্য কোথায়। পৃথিবীতে সব জিনিষই প্রথম প্রথম অদ্ভুত বলে মনে হয়। ঠিক ছবি সম্বন্ধেও এ কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু একটি ছবি ভাল করে কিছুদিন ধরে

মেয়েদের মাথার চুল

শিল্পীর ছেলের প্রতিকৃতি

দেখলে আশ্চর্য্য মনে হবে—যা আগে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল পরে যেন এই অদ্ভুত কথাটাই অদ্ভুত বলে মনে হতে থাকে।

শিশু যখন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সে দেখার ভঙ্গী অন্য মানুষদের চেয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শিশুর ছোট চোখে মায়ের মুখ খুব বড় দেখায় এবং কিছুক্ষণের জন্যে অন্ততঃ সে নিশ্চিত মায়ের মুখের একাংশ কেবলমাত্র দেখতে পায়। সে মায়ের মুখের একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গী এবং দিকই লক্ষ্য করে থাকে—অন্য কোন ভঙ্গী ও দিক তার চিন্তাতেও আসে না। তেমনিভাবে পিকাসো মানুষের দেহ ও মুখের মধ্যে একটা সত্তাকেই উপলব্ধি করে থাকেন এবং পরে এই ভাবটাই তাঁর ছবিতে ফোটাতে চেষ্টা করেন। আফ্রিকার আদিম শিল্প ছাড়া বোধহয় আর কোন শিল্পীই পিকাসোর মত বিষয় বস্তুকে এইভাবে ফোটাতে চেষ্টা করেন নি।

বাস্তবিকই একজনের দেহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার প্রায় সবটা কাপড়, জামা, টুপি প্রভৃতি জিনিষে আবৃত থাকে। কিন্তু মানুষ মাত্রই একজনের দেহ সম্পূর্ণরূপে দেখতে চেষ্টা করে। পিকাসোর বিশেষত্ব হচ্ছে সেইখানে—যেখানে তিনি একটিমাত্র চোখ দেখতে চাইলে তার কাছে অন্য চোখটির কোন অস্তিত্বই থাকে না; সত্যিকারের শিল্পী বিশেষতঃ স্পেনীয় শিল্পী বলে চোখকে চোখই দেখলেন, যাতে তাঁর দৃশ্যমান বস্তুর অঙ্কন কিউবিজম-এ সার্থক পরিণতি লাভ করল।

পিকাসোর শিল্প ভালভাবে বুঝতে হলে আফ্রিকার আদিম শিল্পের সঙ্গে আমাদের একটু পরিচয় থাকা দরকার। ১৯০৭ সন থেকেই আফ্রিকার আদিম শিল্প সভ্য জগতে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং স্বভাবতই পিকাসো এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। বিষয় বস্তুর বাস্তব দিকটাই পিকাসোর চোখে পড়ল, বাস্তবতা বলতে এখানে দৃশ্যমান বস্তু বোঝায় না, বস্তুর সত্তাকে বোঝায়। তাই পিকাসো কি দেখতে পান, তা প্রকাশ না করে কি দেখতে পান না তাই প্রকাশ করতেন। অর্থাৎ কিনা যা সাধারণতঃ জনসাধারণের অবশ্য দেখা উচিত কিন্তু তারা সত্যি তা দেখতে পায় না এই ভাবটি পিকাসো তাঁর ছবিতে ফুটিয়ে তুলতেন।

এই পরীক্ষা-মূলক কাজে পিকাসো ক্রমশই এগিয়ে চললেন এবং গত মহাযুদ্ধের গোড়াতে অর্থাৎ ১৯১৪ সনে তাঁর ছবিতে রংএর উজ্জ্বলতা বেড়ে উঠল; প্রথমেই বলেছি পিকাসো মানুষের অবয়বকে অবয়ব বলেই মনে করতেন—মানুষের আত্মা তাঁকে মোটেই অনুপ্রাণিত করতে পারিনি। কেননা পিকাসোর মতে মানুষের দেহ ও মুখ যখন সব ভাষা বলতে পারে তখন আত্মার উপলব্ধির সার্থকতা কোথায়? যখন রংএর খেলায় মনের সব ভাব প্রকাশ করা যায় তবে কথা কিম্বা লেখার প্রয়োজন কি? কিন্তু ১৯২৭ থেকে ১৯৩৫ সনে পিকাসোর এই মনোভাব ক্রমশই বদলে গেল। মানুষের আত্মা তাঁর চিন্তাধারার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসল। চোখ থাকলে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না—এই অনুভূতিই পিকাসোর জীবনে প্রথম তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নষ্ট করে দিয়ে যায়। যার ফলে তিনি বিষয়-বস্তুকে উপলব্ধি করে আকার দিলেন বটে কিন্তু তাঁর দৃষ্টির গভীরতা সেখানে রইল না। পিকাসোর পক্ষে এটা হয়ে উঠল বড়ই দুর্বিসহ; তাই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী চিরদিনের জন্যে ছবি আঁকা ছেড়ে দিলেন।

কৈশোর স্বপ্ন

রায়বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

এত নৃত্য, এত গীত, এত কোলাহল
শুধাইছ তবু কেন চোখে মোর জল?

মনে পড়ে বৃন্দাবন স্বপ্ন কৈশোরের
ভুলিব কেমনে বন্ধু ব্যথা মরমের!

ছায়া ঘেরা বনভূমি শ্যামলতমাল
এঁকেছে প্রকৃতি সে কি ছবি সুরসাল!

মনে পড়ে যমুনার পুলিন শোভন,
নীপশাখে ময়ূরের পুচ্ছ প্রসারণ;

মল্লিকা মালতী যূথী কুসুমের মেলা,
মাধবীর গুচ্ছে কত ভ্রমরের খেলা।

যমুনার কালো জলে তরুণীর দল,
বিকশিত শত শত সোনার কমল।

গানে গানে ছেয়ে দিত আকাশ ভুবন,
কি আনন্দ কি পুলক! সাধের স্বপন!

তমালের ডালে বাঁধি ফুলের ঝুলনা
কত প্রেমে ঝুলাইত কিশোরী ললনা!

বন ফুলে মালা গাঁথি দোলাইত গলে,
প্রেমে প্রাণ গলাইত প্রতি পলে পলে।

তেমন চাঁদিনী রাতি কোথায় কি আছে!
বাতাস মদির গন্ধে মাতাল হয়েছে!

যমুনার কুলুকুলু কোকিল কুহরে,
অধীরা ললনাকুল পুলকে শিহরে।

সে সুখের দিনগুলি আসে কি আবার?
তাই ভাবি তিক্ত মোর সকল সংসার।

বনফুল-মালা আর পরাবে না কেহ,
ছুটিবে না বাঁশী শুনে পরিহরি গেহ!

রাজত্বের বন্দিশালে আমি অধিরাজ!
উৎসবের উৎস মাঝে দৈন্য দেয় লাজ।
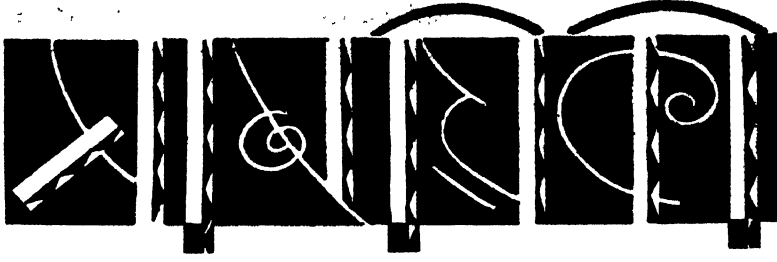
বাংলার নুতন মন্ত্রী—

গত ২৪শে এপ্রিল বাংলার নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রিসভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন—১। খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন (প্রধান মন্ত্রী) স্বরাষ্ট্র বিভাগ (অসামরিক দেশরক্ষা বিভাগসহ) ২। হোসেন শহীদ শারওয়ার্দি—অসামরিক সরবরাহ ৩। শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী—অর্থ বিভাগ ৪। মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁন্—শিক্ষা ৫। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন—পূর্ত্ত ও যান-বাহন বিভাগ। ৬। খাঁনবাহাদুর সৈয়দ মুয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন—কৃষি (পল্লীসংস্কারসহ) ৭। শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব বিভাগ (লোকাপসরণ ও রিলিফ সহ) ৮। নবাব মুশারফ হোসেন—বিচার ও আইন বিভাগ ৯। মিঃ খাজা সাহাবুদ্দিন—বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগ (যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনসহ) ১০। শ্রীযুক্ত প্রেমহরি বর্ম্মণ—বন ও আবগারী বিভাগ ১১। খাঁন বাহাদুর মৌলবী জালালুদ্দিন আহম্মদ—জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ১২। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক—প্রচার বিভাগ ১৩। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—সমবায় ঋণদান ও পল্লীঋণ বিভাগ।

গবর্ণর গত ৩১শে মার্চ্চ ভারত শাসন আইনের যে ৯৩ ধারা প্রয়োগ করেন তাহা এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পর প্রত্যাহার করা হয়। গভর্ণর জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীকে অপসারিত করার ফলে দেশে বিক্ষোভ উপস্থিত হইলেও আমাদের বিশ্বাস,

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন পাইন

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

নবনিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাদের কার্য্যক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া জনগণের প্রশংসা লাভে সমর্থ হইবেন। কারণ তাঁহারা প্রায়

মন্ত্রী নবাব মশারফ হোসেন

সকলেই খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী এবং জনগণের মঙ্গল বিধানে তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও উপেক্ষণীয় নহে।

খাদ্য সমস্যা সমাধানের চেষ্টা—

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ এইচ, এস্, সুরাবর্দ্দি একটা বিজ্ঞপ্তিতে সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, ভূতপূর্ব্ব

মন্ত্রী মিঃ এচ্-এস্-সুরাবর্দ্দী

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার এখন তাঁহাদের হাতে আসিয়াছে। তাঁহাদের হাতে যে ক্ষমতা আছে তাহাতে তাঁহারা বিষয়টীর প্রতিকার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। তাঁহারা ভারত সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। এতদসম্পর্কে আরো জানা গিয়াছে যে, এই প্রদেশের এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ধান-চাউল আমদানী ও রপ্তানি সম্পর্কে যে সকল নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা বাতিল করিয়া শীঘ্রই সরকারীভাবে এক আদেশ জারী করা হইবে। তবে কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চল, দার্জ্জিলিং এবং চট্টগ্রাম জেলা হইতে ধান-চাউল রপ্তানী সম্পর্কে যে সকল বিধিনিষেধ আছে তাহা বলবৎ থাকিবে। এসকল অঞ্চল হইতে ধান-চাউল অন্যত্র প্রেরণ করিতে হইলে যথাক্রমে কলিকাতার অসামরিক বিভাগের ডাইরেক্টর, দার্জ্জিলিং-এর ডেপুটী কমিশনার এবং চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

কর্পোরেশনে খাদ্য সরবরাহ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদিগকে খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য যে খাদ্য সরবরাহ বিশেষ কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহার সভায় স্থির হইয়াছে, কর্পোরেশনের লাইসেন্স অফিসার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষালকে খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ভার প্রদান করা হইবে। কলিকাতা সহরের অধিবাসীরা যদি ইহার পর নিয়মিতভাবে ও নির্দ্ধারিত মূল্যে খাদ্য ক্রয় করিতে সমর্থ হয় তবেই এই নিয়োগ সার্থক হইবে।

সাংবাদিকগণের সহিত আলোচনা—

গত ৩০শে এপ্রিল বাংলা সরকারের দপ্তরখানায় কয়েকজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত প্রধান মন্ত্রী সার নাজিমুদ্দিন আলোচনা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না হয় তিনি তাহাই চাহেন। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আবেদন জানাইয়া বলেন, এরূপ কিছু প্রকাশ করা উচিত হইবে না যাহাতে বর্ত্তমান পরিস্থিতি আরও খারাপ হইয়া পড়ে।

বহরমপুরে পূর্ণিমা সম্মিলন—

গত ১৮ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে গ্রাণ্ট হলে কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পূর্ণিমা সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এবং তথায় নিয়মিতভাবে পূর্ণিমা সম্মিলন করিবার জন্য একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী সমিতির সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পূর্ণিমা সম্মিলনে সাহিত্য আলোচনার ব্যবস্থা এদেশে নূতন নহে। ইহা যতই প্রসার লাভ করে, ততই মঙ্গলের বিষয়।

মহিলাদের জন্য দোকান—

গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার নিম্নলিখিত ৬টি দোকানে শুধু মহিলাদিগকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন—(১) ৭৩ হাজরা রোড (২) ১৮৮এ রাসবিহারী এভেনিউ (৩) ৬ গোরাচাঁদ রোড (৪) ১৩।১এ পাটোয়ার বাগান লেন

মির্জাপুর ও (৫) ২২।৮ গান ফ্যাক্‌টারী রোড কাশীপুর। এই সকল দোকানে শুধু মহিলাদিগকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হইতেছে বটে, কিন্তু সেখানেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়েদের যাইবার উপায় নাই। কলিকাতার সহরতলী হইতে যে সকল স্ত্রীলোক প্রত্যহ দলে দলে সহরে চাউল ক্রয় করিতে আসিতেছে, তাহাদের ভীড়ে দোকানগুলি পূর্ণ থাকে। গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা কতদিনে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি।

বন্দীর মেয়র পদলাভ—

ডাক্তার এম, ডি, ডি, গিলডার সম্প্রতি বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীর অধিকাংশ সদস্যের ভোট পাইয়া তথায় মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাক্তার গিলডার বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী ছিলেন; তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির সহিত গ্রেপ্তার হইয়া বর্ত্তমানে কারাগারে আটক আছেন। বন্দীকে এইভাবে সম্মানিত করিয়া বোম্বাইবাসীরা উপযুক্ত পাত্রেই দান করিলেন।

বঙ্গীয় অর্থনীতিক সম্মিলন—

গত ১১, ১২, ১৩, ১৪ই এপ্রিল মহাবোধি সোসাইটী হলে শনিবারের বৈঠকের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ অর্থনৈতিক সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভার উদ্বোধন করেন ও শ্রীযুক্ত গগনবিহারী লাল মেহেটা মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। শাখা সভাপতিগণ: খাদ্য সমস্যা—ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল। ভারতের খনিজ সম্পদ—ডক্টর সিরিল ফক্স। যুদ্ধ, মুদ্রানীতি ও অর্থনীতি—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান। বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দালাল। সমর, শিল্প ও শ্রমিক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা—ডক্টর বিনয়কুমার সরকার।

বঙ্গীয় অর্থনীতিক সম্মিলনে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেটা ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

অধ্যাপক নির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীঅনিমেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ পি. আর. গুপ্ত, শ্রীঅতুল সুর, শ্রীসরল সেন ও শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

'খাদ্য-সমস্যা' শাখার সভাপতির অভিভাষণে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল বলেন, "সমগ্র সমস্যাটা খুব ভালভাবে বিচার করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে খাদ্য-সমস্যা সমাধান কল্পে সর্ব্বপ্রকার সরকারী নীতি যদি জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে না পারে তবে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। আমার মতে বিশেষজ্ঞগণ এবং জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত একটী কেন্দ্রীয় খাদ্য-কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপদেশানুক্রমে অসামরিক খাদ্য-বিভাগের খাদ্য-সম্পর্কিত নীতি পরিচালন করিবার ব্যবস্থাই এই গুরুতর সমস্যা সমাধানের মূল সূত্র হওয়া উচিত।"

'বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়' শাখার সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দালাল বলেন, "বর্ত্তমান যুদ্ধ ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার পূর্ব্বাভাষ; যুদ্ধের পর ঐগুলি জাতীয় সম্পত্তি হইবে ও সন্তোষজনকভাবে জনসেবা করিতে পারিবে। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের কার্য্য ক্রমে প্রসারলাভ করিতেছে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্কগুলি ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। জাতীয় বিত্ত ও মঙ্গলের অনুকূল পন্থায় ব্যাঙ্কের কার্য্যসমূহ প্রসার করা প্রয়োজন।"

'সমর, শিল্প ও শ্রমিক' বিভাগের সভাপতির অভিভাষণে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত বলেন, "দেশের কুটীর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের পুনর্জীবন ও শ্রমিকদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। অতিমাত্রায় ফাঁপাই টাকা আকস্মিকভাবে বাজারে চালু করার ফলে ভারতীয় সমর শিল্পের অবস্থা যতটা ভাল বলিয়া বোধহয়, বাস্তবিক ততটা আশাপ্রদ নয়। যুদ্ধের ফলে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের বহু অর্থলাভ ঘটিলেও তাহাতে দেশের কোন উপকারই হইবে না। যুদ্ধের পর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইলে ভারতীয় সমর শিল্পের অধিকাংশই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ভারতীয় শ্রমিকদের উপর অকারণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহারা যে সকল সুবিধা ভোগ করিতেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাও পায় না, তবে শ্রমিকদের নৈতিক জীবনের উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।"

কণ্ট্রোলের দোকান—

কলিকাতা সহরে নির্দ্ধারিত সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে পাড়ায় পাড়ায় দোকান খোলা হইয়াছে। ঐ সকল দোকানে কম দামে প্রত্যেক ক্রেতাকে এক সের বা দুই সের চাউল দেওয়া হয়। কিন্তু যাঁহারা ঐ সকল দোকানের সম্মুখের ভিড় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সুলভ মূল্যে চাউল

ক্রয়ের আশা ত্যাগ করা ছাড়া অন্য গতি নাই। এক একটি দোকানের সম্মুখে এক এক সময়ে ৩।৪ শত লোককে ভিড় করিতে দেখা যায়। উহারা সকলেই যে অভাবগ্রস্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—তাহা না হইলে তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্র ও বৃষ্টি মাথায় করিয়া পথে দাঁড়াইয়া থাকিত না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে যে ঐ চাউলক্রয় করিয়া তখনই তাহা কিছু লাভ লইয়া বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহাও প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত চাকুরিয়াদের পক্ষে প্রত্যহ দুই সের চাল কিনিয়া সংসার করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁহাদের জন্য অন্তত এক সপ্তাহের উপযোগী চাউল দিবার কোন ব্যবস্থা কি করা যায় না? কণ্ট্রোলের দোকানের সংখ্যাই বা এতদিনে বাড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই কেন? এ বিষয়ে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তারা অবহিত হইলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগকে অধিক মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিতে হইবে না।

নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন—

সম্প্রতি পাটনায় নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন—'ডাক্তারগণ যদি ভারতীয় ভেষজ এখন হইতে বহুল পরিমাণে ব্যবহার না করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পাটনা প্রিন্স অব ওয়েলস্ মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর ডাঃ ত্রিদিব নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার অভিভাষণে চিকিৎসকগণকে গ্র্যাজুয়েট ও লাইসেন্সিয়েট এই দুই ভাগে বিভক্ত প্রথা রহিত করিবার অনুরোধ জানান। সম্মেলনের সভাপতি করাচীর ডাঃ রোচিরাম আমেস্বর তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যেমন স্বরাজের প্রয়োজন আছে তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও স্বরাজের প্রয়োজনীয়তা আছে। চিকিৎসা ব্যবসার উন্নতি কল্পে আই-এম্-এস্-দের একচেটিয়া অধিকার রহিত করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে কুইনাইনের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন—'সরকার যদি ভারতে উপযুক্ত উপায়ে সিন্কোনা চাষের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ১লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে ৬৮ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত করা সম্ভব। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর অন্যূন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং ভালভাবে কুইনাইন প্রস্তুতের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুইনাইন বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব।'

অধ্যক্ষ ভূপতিমোহন সেন—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন সম্প্রতি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায় কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে এক বিরাট সভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। অধ্যক্ষ ভূপতি-মোহন-ই সর্ব্বপ্রথমপ্রেসিডেন্সি কলেজের স্থায়ী বাঙ্গালী অধ্যক্ষরূপে কাজ করিয়াছেন। ১৯০৮ সালে তিনি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত এই তিন বিষয়ে অনার্সসহ বি-এ পাশ করেন এবং ১৯১০ সালে এম-এস্-সি পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হন। তাহার পর ইংলণ্ডে যাইয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনিয়র র‍্যাংলার'রূপে পরিচিত হন। ১৯১৫ সালে আই-ই-এস বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। গত ১৯৩১ সাল হইতে দ্বাদশ
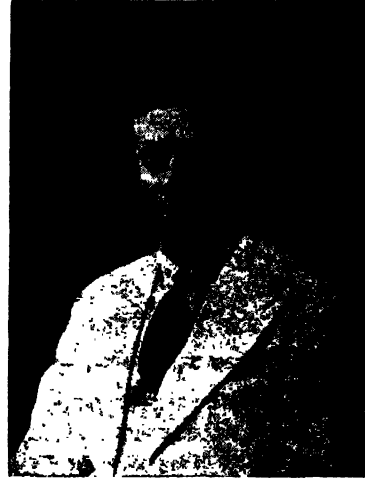
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন

বৎসর কাল তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি দেশহিতে ব্রতী হউন, ইহা আমরা প্রার্থনা করি।

আচার্য্য রায়ের সম্বর্দ্ধনা—

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাড়ী খুলনা জেলার রাড়ুলী কাটিপাড়া গ্রামে। তিনি প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মের ছুটির সময় গ্রামে যাইয়া তথায় কিছুদিন কাটাইয়া আসিতেন। এখন তিনি বার্দ্ধক্যের জন্য প্রায় শক্তিহীন হইয়াছেন, এ অবস্থাতেও তিনি সম্প্রতি দেশের বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতেছেন। গত ২৫শে এপ্রিল তাঁর গ্রামবাসীরা সেখানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। সেই সম্বর্দ্ধনায় কলিকাতা হইতে ডক্টর মেঘনাদ সাহা, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ডক্টর বি-সি-গুহ, অধ্যাপক ভুবনমোহন মজুমদার, শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার প্রভৃতি যাইয়া যোগদান করিয়াছিলেন। আচার্য্য রায়ের এই গ্রামপ্রীতির আদর্শ যেন বাঙ্গালী মাত্রকেই অনুপ্রাণিত করে, আমরা আজ তাহাই প্রার্থনা করি।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত সরসীকুমার দত্ত মহাশয়ের কন্যা ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউসনের ছাত্রী শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত গত বৎসর বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া রাধাকান্ত স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি বাংলাতেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া ইনিষ্টিটিউসন হইতে আই-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াও তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার জীবনে সাফল্য কামনা করি।

বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য—

সম্রাট নিম্নলিখিত তিনজনকে বড়লাটের শাসন পরিষদের নূতন সদস্য করিয়াছেন—(১) সার মহম্মদ আজিজুল হক—ইনি

ডক্‌টর সার মহম্মদ আজিজুল হক

লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন, এখন বাণিজ্য সচিব হইলেন (২) ডাক্তার এন-বি-খারে—প্রবাসী ভারতবাসী বিভাগের

সার অশোককুমার রায়

ভারপ্রাপ্ত হইলেন। (৩) সার অশোককুমার রায়; ইনি বাঙ্গালার এড্‌ভোকেট জেনারেল ছিলেন, সার সুলতান আমেদের স্থানে বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য হইলেন। সার সুলতান আমেদকে পরিষদের সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভার প্রদত্ত হইল। সার আজিজুল ও সার অশোককুমার উভয়েই বাঙ্গালী, কাজেই তাঁহাদের নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরববোধ করিবেন। তাঁহাদের কর্ম্মশক্তিতেও লোকের বিশ্বাস আছে, কাজেই লোক আশা করে, তাঁহাদের দ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে।

নূতন প্রধান বিচারপতি—

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হ্যারল্ড ডার্বিসায়ার ছুটী লওয়ায় তাঁহার স্থানে মাননীয় বিচারপতি টি-আমীরআলিকে অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বিচারপতি আমীর আলি তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সর্ব্বজনবিদিত। কাজেই তাঁহার নিয়োগে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন।

রাণাঘাট সাহিত্য সংসদ—

গত ২৫শে এপ্রিল রবিবার রাণাঘাট সাহিত্য সংসদের উদ্যোগে রাণাঘাট সিনেমা হলে স্বর্গীয় কবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ ও স্বর্গত ঐতিহাসিক 'নদীয়ার কাহিনী' প্রণেতা রায় বাহাদুর কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয়ের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় স্বর্গত মনীষীদ্বয়ের সাহিত্য প্রতিভা সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় স্থানীয় ও কলিকাতার বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটী বাতিল—

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ১লা মে হইতে বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটী বাতিল করিয়া দিয়াছেন। কমিশনাররা নাকি বর্ত্তমান বর্ষের আয় ব্যয় স্থির করিতে পারেন নাই। মিউনিসি-পালিটীর কার্য্যভার গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর উপর সকল কার্য্যের ভার দিয়াছেন এবং অন্যতম কমিশনার মৌলবী সৈয়দ আবদুল গণিকে বসু মহাশয়ের পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়াছেন।

সাংবাদিক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়—

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় ২৫ বৎসর যাবৎ লাহোর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদকত্ব করিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায় মহাশয় যে প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা বাংলা ও বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। শ্রীযুক্ত রায় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া তাঁহার মূল্যবান ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ সম্ভারে জাতীয় সংবাদপত্রগুলির গৌরববৃদ্ধি করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন—

গত ২৪শে এপ্রিল বাঁকুড়ায় নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সম্মেলনের একবিংশতি অধিবেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের কিং জর্জ্জ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনে ডাঃ দাশগুপ্ত অভিভাষণ প্রসঙ্গে বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া বলেন—'আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যার সমাধান করা খুব সহজসাধ্য নহে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আর্থিক প্রাচুর্য্য এবং সমাজের জাগরণের উপর উহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।'

নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন—

সম্প্রতি নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলনে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার জন্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ সকল প্রস্তাবের মধ্যে অধ্যাপকগণের দুঃখ দুর্দ্দশার ব্যাপার বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। অধ্যাপক সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবাবলী সরকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হইলে শিক্ষাব্রতীগণের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে সন্দেহ নাই।

নির্ম্মলকুমার মিত্র—

উন্নতিশীল ঔষধ প্রতিষ্ঠানের আলোচনা প্রসঙ্গে গত ফাল্গুন সংখ্যায় আমরা ইহার তরুণ পরিচালক শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমার মিত্রের

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার মিত্র

কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উক্ত সংখ্যায় নির্ম্মল-কুমারের ছবির নিম্নে অন্যের নাম ভ্রমক্রমে ছাপা হওয়ায় পাঠকগণের অবগতির জন্য উক্ত ছবিখানি বর্ত্তমান সংখ্যায় নামের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইতেছে।

বেগম আজাদের পরলোক প্রাপ্তি—

কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পত্নী বেগম জুলেখা খাতুন গত ২রা এপ্রিল মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দুই বৎসর কাল রোগ ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার স্বামী এখন জেলে—পত্নীর মৃত্যুকালেও তাঁহাকে পত্নীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। বেগম সাহেবা হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের কন্যা, তাঁহার কোন সন্তান নাই।

লক্ষপতির আত্মহত্যা—

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ধনকুবের যদুনাথ মল্লিকের পৌত্র প্রদ্যুম্নকুমার মল্লিক গত ১১ই এপ্রিল তাঁহার মধুপুরস্থ বাটীতে বন্দুকের সাহায্যে নিজ পত্নীকে খুন করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। আর্থিক দুরবস্থা উপস্থিত হওয়ায় তিনি নানাকারণে মনোকষ্টে ছিলেন। তাহাই বোধহয় আত্মহত্যার কারণ। তাঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।

ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ দত্ত—

মিঃ দত্ত প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড গমন করেন ও সেখানে এম-এ ও এল্-এল্-বি পরীক্ষায় পাশ করিয়া গ্রেস ইন হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তিনি য়্যুনিভার্সিটী ল' কলেজে ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১৯ খৃঃ হইতে তিনি কলিকাতা ছোট আদালতে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া কোর্টের ব্যবহারাজীবগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৩৭ সনে কলিকাতা কর্পোরেশনের মনোনীত কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। গত ২৯শে মার্চ্চ তিনি আইন ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি স্যার বিপিনবিহারী ঘোষের জামাতা। তাঁহার লাইব্রেরীর যাবতীয় আইন পুস্তকাবলী (যাহার মূল্য অন্যূন ৫০০০০৲ হাজার টাকা হইবে) তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের বার এসোসিয়েসনকে দান করিয়া তাঁহার দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

মাদ্রাজে আ-মাজা চাউল—

কলে মাজা চাউলের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে লোকের রুচির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঢেঁকি ছাঁটা চাউল সম্ভবতঃ দূর পল্লীর স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; সহরে তাহা গোয়েন্দা লাগাইয়া বাহির করিতে হয়। ইহাতে যে চাউলের সার বস্তু ও খাদ্যপ্রাণ বহু পরিমাণে নষ্ট হয় তাহা নহে, চাউলের পরিমাণেরও অনেকখানি সাথে করিয়া লইয়া ওজন হ্রাস করে এবং শীঘ্র পরিপাক হইয়া যায় বলিয়া আবার খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এখনকার দিনে তাহা বড়ই ক্ষতিকর। সকল দিক বিবেচনা করিয়া মাদ্রাজ সরকার চাউল কলের মালিকদের নোটীশ দিয়া চাল-ছাঁটাই করিবার অনুমতি পত্র গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন; সেখানে মাজিয়া ছাঁটিয়া চাউলের অপচয় রোধ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

পরলোকে কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়—

দিঘাপাতিয়া রাজ পরিবারের কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায় গত ১১ই মার্চ্চ ৬৬ বৎসর বয়সে রাজসাহীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। দানশীলতার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা প্রমোদানাথ, কুমার শরৎকুমার ও কুমার বসন্ত কুমারের মত তিনি সকল জনহিতকর কার্য্যের অন্যতম উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

উচ্চতর পরিষদে নির্ব্বাচন—

গত ১১ই মার্চ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের (নিম্নতর পরিষদ) সদস্যগণ নিম্নলিখিত ৯ জনকে ৯ বৎসরের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদ) সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—(১) মৌলানা আক্রাম খাঁ (২) খাঁ সাহেব ডবলিউ, জামান (৩) বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত (৪) আর-ডবলিউ-ফাগুর্সান (৫) হুমায়ুন কবীর (৬) কাদের বক্স (৭) খাঁ বাহাদুর মহম্মদ জান (৮) হরিদাস মজুমদার (৯) মাংটুরাম জয়পুরিয়া। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৩ জন নূতন—(১) খাঁ সাহেব ডবলিউ-জামান (২) হরিদাস মজুমদার ও (৩) মাংটুরাম জয়পুরিয়া। বাকী ৬ জন পূর্ব্বেও সদস্য ছিলেন।

অধিক খাদ্য-শস্য উৎপাদন—

সারা ভারতবর্ষে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই সকল প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের জন্য প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে সকল বীজ বিতরণ করিয়াছিলেন, সেগুলি সকল ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় নাই। এখন কলিকাতা কর্পোরেশন ও কলিকাতার সকল পতিত জমীতে শস্য উৎপাদনের জন্য সহরবাসীদিগকে উৎসাহ দান করিবেন এবং দরিদ্র অধিবাসীদিগকে এ জন্য বিনামূল্যে বীজ দান করিবেন। কুলটী নদীর ধারে কর্পোরেশনের যে সাড়ে তিন হাজার বিঘা পতিত জমী আছে, সেখানেও এবার খাদ্য শস্যের চাষ করা হইবে। ব্যবস্থা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই—তবে আরও আগে যদি সকলে এ বিষয়ে অবহিত হইতেন, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।

কলিকাতায় আটা সরবরাহ—

কলিকাতাস্থ বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার জানাইয়াছেন যে এপ্রিল মাসে কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ের জন্য ৬০ হাজার মণ আটা দেওয়া হইয়াছে; তাহা ছাড়া ৬ হাজার ৪ মণ আটা সরকারী অনুমোদিত দোকানের জন্য দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণকে ৬ আনা সেরের অধিক মূল্যে আটা ক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বাজারে কিন্তু কোন দোকানীই ঐ দরে আটা দেয় না। কাজেই ক্রেতারা বিষম অসুবিধার মধ্যে পতিত হইয়াছেন ও দোকানী যে দর চাহিতেছে সেই দর দিয়াই আটা ক্রয় করিতে হইতেছে।

খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ১৫০৲ টাকার কম বেতন পান, তাঁহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু কোন কর্ম্মচারীই ৪ জনের অধিক লোকের খাদ্য পাইবেন না। যে কর্ম্মচারীর বাড়ীতে ৪টির অধিক পোষ্য আছে, তাঁহাকে কি তবে বাকী কয় জনকে না খাওয়াইয়া রাখিতে হইবে? গভর্ণমেণ্টের এত বড় মেশিনারী কি কোন কর্ম্মচারীর কয়জন পোষ্য তাহা স্থির করিবার পক্ষে উপযুক্ত নহে?

কলিকাতার নূতন মেয়র—

গত ৩০শে এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন মেয়র নির্ব্বাচন হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনে বাঙ্গালার নূতন মন্ত্রিসভার রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। একজন মন্ত্রী কর্পোরেশনের সভায় যাইয়া ভোট দান করা সত্বেও গভর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রার্থী পরাজিত হইয়াছেন। যিনি মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তিনি মৌলবী এ-কে ফজলুল হকের দলের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী; তাঁহার নির্ব্বাচন সাফল্যে মিঃ হকের দলের প্রতি লোকের আস্থাই প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলীম লীগ দলের প্রার্থী মিঃ ইস্পাহানীকে পরাজিত করিয়া স্বতন্ত্র মুসলীম দলের প্রার্থী মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন (৪২-৩৭ ভোট) এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষকে পরাজিত (৫৯-২১ ভোট) করিয়া শ্রীযুক্ত আনন্দী-

মেয়র মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা
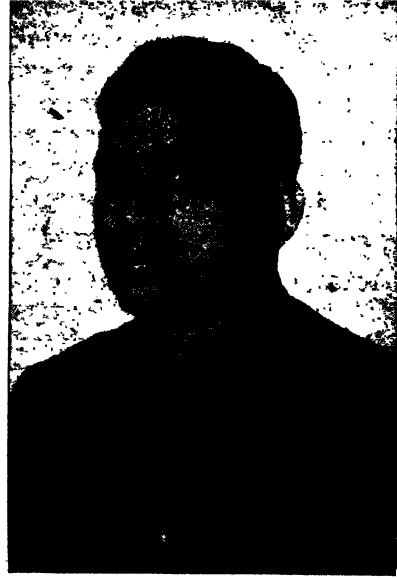
লাল পোদ্দার ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নূতন মেয়র মিঃ বদরুদ্দোজার বয়স মাত্র ৪৫ বৎসর; তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুরের অধিবাসী। এম-এ, বি-এল পাশ করিয়া তিনি কিছুদিন কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ও শীঘ্রই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে সম্মিলিত দল বাঙ্গালা দেশে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল মিঃ বদরুদ্দোজা সেই দলের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি, বাঙ্গালা ও উর্দ্দু তিন ভাষাতেই চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারেন। ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দারের বয়সও মাত্র ৩০ বৎসর। তিনি বড়বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। ১৯৪০ সালে তিনি বিনা বাধায় কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত

হইয়াছিলেন। আমরা নূতন মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র জন্মতিথি উৎসব—

গত ২রা এপ্রিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলিকাতায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ১০৫তম জন্ম দিবস উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভায় সার যদুনাথ সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ভবানীপুর ব্যাঙ্কের মামলা—

ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি সাধন সম্পর্কে আলিপুরে অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুক্ত কে-সি-দাশগুপ্তের আদালতে যে মামলা চলিতেছিল, তাহার বিচার শেষ হইয়াছে। আসামী রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র বসু ও সুশীল ঘোষের যথাক্রমে ৭, ৪ ও ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ভবেশচন্দ্র সেন, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গণপতিচন্দ্র প্রত্যেকের ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। জগবন্ধু বসু, বিনয়ভূষণ মজুমদার, ননীগোপাল দে ও মুকুল রায় চৌধুরী মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এই ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ার ফলে বহু ধনী দরিদ্রের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

মেয়র ধনভাণ্ডারের সাহায্য—

মেদিনীপুর ঝড়ের পর মেয়র যে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার প্রদত্ত ৫০ হাজার টাকা দিয়া তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় ৬টি পুষ্করিণী খনন করা হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনের এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বি, এন, দে দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্থানগুলি দেখিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহাদের খনন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ অর্থের পরিবর্ত্তে চাউল দেওয়া হইবে।

চাউলের মূল্যের পার্থক্য—

গত ১১ই এপ্রিল তারিখে ভারতের বিভিন্ন স্থানে চাউলের দর (মণ করা) কত ছিল, তাহা ১৩ই এপ্রিল দিল্লী হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে—চাঁদপুর (বাংলা)—২৩৬৵, পূর্ণিয়া (বিহার)—১২৷০ ; বেরিলি (যুক্তপ্রদেশ)—১০৷০, রায়পুর (মধ্যপ্রদেশ)—৮৷০ ; বেজওয়াদা (মাদ্রাজ) ৭৷৶০ ; কটক (উড়িষ্যা)—৬৲ ; লারকানা (সিন্ধু)—৬৷০ ; এই ত সমগ্র ভারতবর্ষের কথা। বাংলা দেশের মধ্যে একই সময় চাউলের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিরূপ, তাহা দেখিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। খাদ্য সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি বোধহয় এ সকলের দিকে পতিত হয় না।

মেদিনীপুরে সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৯ই বৈশাখ মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যাসাগর স্মৃতি-ভবনে মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রধান সভাপতি এবং কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক সাহিত্য শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয় তাঁহার ভাষণে লিখিয়াছেন—'তরবারি অপেক্ষা লেখনী যে অধিক শক্তিশালী তাহা আর একবার প্রচার করা হউক। আজিকার এই ঘোর দুর্দ্দিনে ও বিষম সঙ্কটকালে সাহিত্য সম্মিলনের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে তাহা এই নবশক্তির উদ্বোধনে।" মেদিনীপুরবাসীরা প্রতি বৎসর এই সম্মিলনের আয়োজন করিয়া তাঁহাদের সাহিত্য প্রীতির পরিচয় দিয়া থাকেন।

কৃষ্ণনগর সাহিত্য সঙ্গীতি—

গত ২৫শে এপ্রিল রবিবার অপরাহ্নে কৃষ্ণনগরে স্থানীয় রামবক্স স্কুল গৃহে সাহিত্য সঙ্গীতির বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় স্থানীয় বহু সম্রান্ত ব্যক্তি ও কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতির কর্ম্মীবৃন্দ স্থানীয় যুবকদিগকে নানাপ্রকার পুরস্কারাদি দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

কুমারী শেলিনা মণ্ডল—

কুমারী শেলিনা মণ্ডলের বয়স ৮ বৎসর। সম্প্রতি শেলিনা আধুনিক নানাপ্রকার নৃত্যে অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়া দর্শক

কুমারী শেলিনা মণ্ডল

মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছে। কলিকাতার বহু প্রতিষ্ঠানে নৃত্য দেখাইবার জন্য শেলিনা আহূত হইয়া থাকে।

চারুচন্দ্র মিত্র—

সাহিত্যিক চারুচন্দ্র মিত্র গত ৭ই বৈশাখ ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বহু সাময়িক পত্রে এক সময়ে তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইত এবং 'যমুনা' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিল।

ভ্রম সংশোধন—

কলিকাতা ৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ রায় মহাশয় জানাইয়াছেন, অগ্রহায়ণ (১৩৪৯) সংখ্যার ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত 'চণ্ডীদাসের বনপাস পুঁথি' বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে 'পুঁথিখানি ত্রিভঙ্গ রায়ের বাড়ীতে পূজিত হইত।' ইহা ঠিক নহে। 'পুঁথিখানি ত্রিভঙ্গরায়ের জ্ঞাতিভাই তিনকড়ি রায় ও দেবনাথ রায়ের বাড়ীতে পূজিত হইত। ত্রিভঙ্গ রায় তাহা দেখিয়া উহাদের নিকট পুঁথিখানি প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় ত্রিভঙ্গবাবুর উপরে পুঁথিখানি প্রকাশের বন্দোবস্ত করিবার ভার দেন।'

মনোনীত কাউন্সিলার—

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৪৩-৪৪ বর্ষের জন্য বাঙ্গালার গভর্ণর কর্ত্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মনোনীত হইয়াছেন —(১) বি-এন-রায়চৌধুরী (২) সুরেন্দ্রনাথ দাস (৩) খান বাহাদুর এ-এস-এম আবদার রহমন (৪) হরিদাস সাহা (৫) আর-এ-গোমেস (৬) কলিকাতা ইম-

ব্যারিষ্টার-কবি
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস
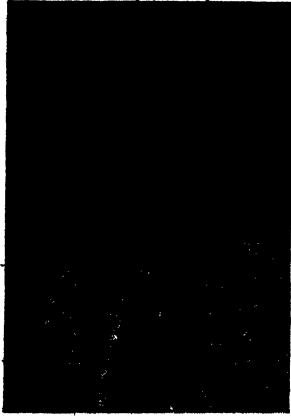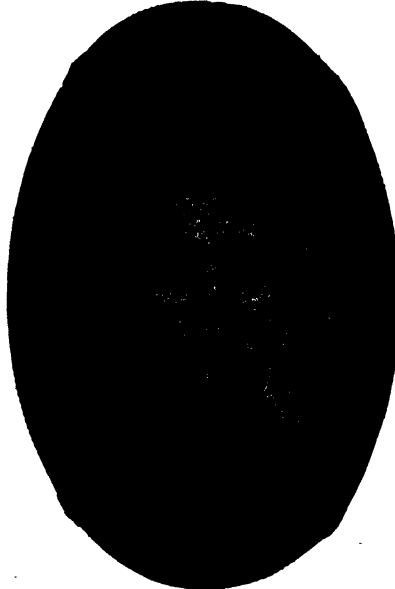
সাংবাদিক খাঁন সাহেব ওয়াহিদুজ্জামান

প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান (পদাধিকারে) (৭) খান সাহেব ওয়াহিদুজ্জামান (৮) সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। ইহাদের মধ্যে খান সাহেব জামান সাংবাদিক, ইনি বঙ্গীয় সমবায় আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ও সর্ব্বজনপরিচিত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ব্যারিষ্টার ও কবি। ভারতবর্ষের পাঠকগণের নিকট সুরেশচন্দ্রের কবিতা অপরিচিত নহে।

রুজভেল্টের দূতও নিরাশ—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের দূত মিঃ ফিলিপস্ ভারতে আসিয়া ভারতের অবস্থার কথা নিজে দেখিয়া গিয়াছেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। আমরা জানিতাম, এ বিষয়ে দেশীয় লোকদের সম্পর্কে কড়া ব্যবস্থা করা হয়—এখন দেখিতেছি বন্ধু মার্কিণের প্রতিনিধি সম্বন্ধেও ঐ একই ব্যবস্থা।

নূতন প্রধান বিচারপতি—

আগে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে পৃথক পৃথক হাইকোর্ট ছিল—এখন তাহার উপর দিল্লীতে সর্ব্বোচ্চ ফেডারেল কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে। সার মরিস গাওয়ার উক্ত ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সম্প্রতি তিনি অবসরগ্রহণ করায় সার উইলিয়ম প্যাট্রিক স্পেন্স নূতন প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সার উইলিয়ম এখনও এদেশে আসিয়া পৌঁছেন নাই—সেজন্য সার শ্রীনিবাস বরদাচারী অস্থায়ীভাবে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে ও কোন ভারতবাসীকে ঐ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা সম্ভব হইল না—ইহাই পরিতাপের বিষয়।

বার্ণার্ড শ ও গান্ধীজি—

মাদ্রাজের 'হিন্দু'পত্রের নয়া দিল্লীর সংবাদদাতা জানাইতেছেন—জর্জ বার্ণার্ড শ'কে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের উপায় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে বলা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন—এখনই গান্ধীজিকে মুক্তি প্রদান করা সম্রাটের কর্ত্তব্য। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মন্ত্রিসভা গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করিয়া যে অন্যায় করিয়াছে, সে জন্য সম্রাটের ক্ষমাপ্রার্থনা করা উচিত। মিঃ বার্ণার্ড শ এখন পৃথিবীর অন্যতম প্রধান চিন্তাশীল মনীষী। তাঁহার এই মতও কি উপেক্ষিত হইবে?

ধীরেন্দ্রমোহন মিত্র—

পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সেণ্ট্রাল সার্কেলের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ধীরেন্দ্রমোহন মিত্র মহাশয় মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে গত ৩০শে এপ্রিল নাগপুরে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৩ দিন পূর্ব্বে তিনি পাটনা হইতে নাগপুরে গিয়াছিলেন। তিনি ২৫ বৎসর কাল সরকারী চাকরী করিতেছিলেন।

লাহোরে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লায়ালপুরের পথে গত ২৯শে এপ্রিল লাহোরে যাইয়া জলন্ধর দয়ানন্দ কলেজের পুরস্কার বিতরণ সভায় নেতৃত্ব করিয়াছেন। তিনি তথায় বলিয়াছেন—বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের লোক যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করে তাহা হইলে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস সত্বর পরিবর্ত্তিত

হইবে। ভারত শুধু ভৌগলিকভাবে অখণ্ড নহে, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও ভারত অখণ্ড এবং এক।

নূতন চাষাবাদের ব্যবস্থা—

কলিকাতা ও তাহার নিকটস্থ স্থানসমূহের পতিত জমিগুলিতে যাহাতে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। কুলটী খালের নিকটস্থ ১৭ মাইল পরিমাণ জমী, পলতা, টালা, যাদবপুর প্রভৃতি স্থানের খোলা জমী প্রভৃতিতে খাদ্যশস্য চাষের এক পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এক বিশেষজ্ঞের উপর ভার দিয়াছেন। যে সকল পতিত জমীতে নূতন চাষ হইবে, সে সকল জমীর খাজনাও মাপ করা হইবে। এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইলে লোক ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে।

বিলাতে প্রচারিত নবতম শ্বেতপত্র—

ভারত সরকার শ্বেতপত্ররূপে সম্প্রতি লণ্ডনে ৫০ হাজার শব্দের এক পুস্তিকায় গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। ভারতের ঘটনা লণ্ডনের জনসাধারণের নিকট দুষ্প্রাপ্য কাগজে ছাপাইয়া প্রচারের উদ্দেশ্য ভারত সরকারের যাহাই থাকুক না কেন, অনুমান করা যাইতে পারে, গান্ধীজীর অনশনকালেও দেশেও যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল এই পুস্তিকা হয়ত তাহারই জবাবদিহিরূপে সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। কংগ্রেস নেতাদিগকে ৯ই আগষ্ট তারিখে গ্রেপ্তারের পর যে সকল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তজ্জন্য গান্ধীজী এবং কংগ্রেস যে দায়ী তাহাই শ্বেতপত্রে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। বিলাতে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে ভারতের হিন্দু ছাত্রদেরই এই বিশৃঙ্খল কার্য্যের পুরোভাগে দেখা গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। এই যে বিশৃঙ্খল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার জন্য দায়ী জনতা—সরকার নহেন; এইরূপ কথাও উক্ত শ্বেতপত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনায় যাহাই লিপিবদ্ধ হউক না কেন, কিন্তু একটি প্রদেশ এবং একটী সম্প্রদায় আংশিকভাবে সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। শ্বেতপত্র সম্বন্ধীয় রয়টারের সংবাদে প্রকাশ—সিন্ধুতে অপেক্ষাকৃত কম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং মুসলমানরা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রায় যোগদান করে নাই।

আসামে পাইকারী জরিমানা—

আসামে মোট ২,৮৮,৯১১৲ টাকা পাইকারী জরিমানা করা হইয়াছিল; প্রকাশ, উহার মধ্যে ২,১৪,৪০৭ টাকা ৯ আনা ৯ পাই আদায় করা হইয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে উক্ত জরিমানা আদায় করা হইয়াছে।

যোগাযোগ স্থাপনে অসম্মতি—

শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারীয়ার নেতৃত্বে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত নেতৃসম্মেলন হইতে প্রেরিত বিবৃতির উত্তরে বড়লাট যে জবাব দিয়াছেন তাহা নিতান্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। বড়লাট বাহাদুর জানাইয়াছেন যে—'গান্ধীজী যদি কংগ্রেসের আগষ্ট-প্রস্তাবের সহিত সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার "প্রকাশ্য বিদ্রোহে"র ফলে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের দিকে যে প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে, সমভাবে তাহার নিন্দা করেন এবং ভবিষ্যতের জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গ্রহণযোগ্য প্রতিশ্রুতি তিনি ও কংগ্রেস দিতে রাজী হন, তবেই বিষয়টি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।'—সুতরাং দেখা যাইতেছে সরকার যোগাযোগ স্থাপনে ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতি এবং অতীতের জন্য দস্তুর মত অনুশোচনা দাবী করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুরের এই বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে ১লা এপ্রিল তারিখে! রসঘন দিনটিকে এমন করিয়া যে রসহীন করা হইবে তাহা বোধহয় রাজাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

সাইকেল রিক্সা প্রবর্ত্তন—

বহু মফঃস্বল সহরে যান-বাহন হিসাবে সাইকেল রিক্সা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা গমনাগমনের পক্ষে একাধারে সুলভ এবং দ্রুত। কলিকাতা সহরের বাহিরে এই যানবাহন বিশেষভাবে আদৃত হইলেও কলিকাতা কর্পোরেশন এ যাবৎ কর্পোরেশনের এলাকায় ইহা বিপদাশঙ্কায় প্রচলিত হইতে দেন নাই। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, কতকগুলি বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে এই যানবাহন ব্যবহৃত হইতে পারে।

উড়িষ্যায় উদ্বৃত্ত চাউল—

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে যে, উড়িষ্যার অধিবাসীগণের প্রয়োজন মিটাইয়াও গত তিন বৎসর উক্ত প্রদেশে প্রায় ১ লক্ষ বাইশ হাজার মণ ধান উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

জনসভায় বিক্ষোভ জ্ঞাপন—

বাংলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রতিবাদকল্পে কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের কয়েকটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৪শে এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে স্যার আবদুল হালিম গজনবী এম্-এল-এ (কেন্দ্রীয়)র সভাপতিত্বে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে—"এই প্রদেশে একটী সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইতেছে এইরূপ অজুহাতে বাংলার গবর্ণর কর্ত্তৃক যেরূপ শাসনতান্ত্রিক নিয়মবিগর্হিত উপায়ে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে মিঃ এ, কে, ফজলুল হকের পদত্যাগ ও তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মিদের মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটান হয়, কলিকাতার নাগরিকগণের এই সভা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে।

মুস্লিম লীগের নেতাকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিয়া যে ভাবে এ দেশে এক সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভা গঠন করা হইতেছে, এই সভা তাহারও তীব্র নিন্দাবাদ করিতেছে। লীগ-দলের উক্ত নেতা আইন সভার অন্যান্য মুস্লিমদলের সহিত কোন সংযোগ সাধন করিতে এবং পরিষদের অন্যান্য দলের আন্তরিক সহযোগিতার সাহায্যে কাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এই প্রদেশের স্বার্থবিরোধী একটি স্বেচ্ছাচারী শক্তি ও আমলাতন্ত্রের শাসন কায়েম করিবার জন্য জনমত পদদলিত করিয়া আইন সভার যে মুষ্টিমেয় হিন্দু সদস্যগণ একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের স্ব স্ব

দল পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সভা সেই সব হিন্দু সদস্যের কার্য্যেরও নিন্দা করিতেছে।"

সভাপতি স্যার আবদুল হালিম গজনবী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"* * * বিগত কিছুকাল যাবত দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিরাজিত ছিল এবং মিঃ ফজলুল হকের কৃতিত্ব এই যে, তাঁহার গভর্ণমেণ্ট এই সাম্প্রদায়িক শান্তি-প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক উপায়ে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইতেছে, তাহার ফলে সারা প্রদেশব্যাপী গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতে বাধ্য। যখন আমাদের সকলের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য উপায়াদি নির্দ্ধারণার্থ আমাদের সকলের চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে আমরা এমন এক রাজনীতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি যাহার ফলে জনসাধারণের শক্তিশালী দলগুলির সহানুভূতি বিদূরিত হইয়াছে। কোন মন্ত্রীসভা তাহাদের স্কন্ধে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইলে যদি সেই মন্ত্রীসভা কোন কারণে বর্ত্তমান সময়ের গুরুতর প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম না হয়, তবে সে দোষ তাহাদেরই স্কন্ধে বর্ত্তাইবে।"

ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মৌলবী এ,কে, ফজলুল হক সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পরামর্শক্রমে তিনি যখন একটি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন তাহাতে সমস্ত দলই যোগ দিলেন, একমাত্র সার নাজিমুদ্দিনই তাঁহার দল লইয়া উহাতে যোগ দিলেন না; কারণ তাঁহারা বলিলেন যে, এই প্রগতিশীল মন্ত্রিসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আছেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। * * * মিঃ হক অভিযোগ করেন যে, তাঁহার প্রগতিশীল মন্ত্রিসভাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া মুস্লিম লীগের একমাত্র মন্ত্রীসভা—উহাতে ঢাকের বাঁয়ার মত দুর্ব্বল দুই একটি উপদল থাকিবে—গঠন করিবার জন্য অনেকদিন হইতেই একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এইজন্য তাঁহার মন্ত্রিসভাকে ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে আঘাত করিয়াও কৃতকার্য্য হওয়া গেল না। তার পরই আসিল তাঁহার পদত্যাগ পত্র আদায়ের পালা। * * * এইরূপভাবে "একটা মন্ত্রিসভা" খাড়া করা হইল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—এইটা কি অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভা? অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠন করার সর্ত্তে পদত্যাগ পত্রে সহি করাইয়া লইয়া এক্ষণে একটী দলগত মন্ত্রিসভা গঠন করা—আমার প্রতি গবর্ণরের এই যে, আচরণ—ইহা ভাল হইয়াছে? বাংলার যদি বিবেক থাকে, বাঙ্গালীর যদি বিবেক থাকে তাহা হইলে তাহারা ইহার উত্তর দিক। বাঙ্গালী এ ইতিহাস জানে না। আমি যতক্ষণ জেলে না যাইতেছি ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার জনগণকে আমি এ ইতিহাস শোনাইতে থাকিব।

গত ২৫শে এপ্রিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় মিঃ হক বলেন—"জাপানী সৈন্যদল কর্ত্তৃক গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার পর তিনি দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন তিনটী জেলা হইতে চাউল সরাইয়া ফেলার আয়োজন হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, কৃষি বিভাগের গড়পড়তা ফসলের হিসাব দেখিয়া গভর্ণর জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত তিন জেলায় নাকি বাড়তি চাউল আছে। আর সেইজন্যই যাহাতে সেগুলি শত্রুহস্তে না পড়ে তাহার জন্য গভর্ণর তাঁহার সেক্রেটারীকে ডাকিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই তিন জেলা হইতে ৩০ লক্ষ মণ চাউল সরাইয়া ফেলিবার জরুরী আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর গভর্ণর এ বিষয় তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। মিঃ হক বলেন, তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে তথ্যাদির দ্বারা ঐ তিন জেলায় বাড়তি চাউলের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাতে গত বৎসরের ফসল বৃদ্ধি, বর্ত্তমান বৎসরের লোক বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ জরুরী অবস্থার চাহিদার পরিমাণ প্রভৃতি কোন বিষয়ই কোনরূপ হিসাব করা হয় নাই। কিন্তু গভর্ণর পুনর্ব্বার হুকুম দিলেন—"আগামী কল্যের মধ্যেই জাপানীরা আসিয়া পড়িবে সুতরাং ১০ ঘণ্টার মধ্যেই চাউল সরান চাই-ই।" তখন মিঃ হক নিরুপায় হইয়া বলিলেন যে তিনি চাউল সরান বিষয়ে সহায়তা করিবেন কিন্তু এরূপ কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। তখন বিনা কাগজপত্রেই কোন একটী কোম্পানীকে পাকড়াও করা হইল, আর চাউল সরাইবার জন্য ২০ লক্ষ টাকা আগাম দেওয়া হইল। এইভাবে ছিনিমিনি খেলিতে খেলিতে বাংলার চাউল সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। * * * আজ প্রচার করা হইতেছে বাংলায় প্রচুর চাউল মজুদ রহিয়াছে। কিন্তু এ কথা আদৌ সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে যে চাউল থাকা উচিত ছিল তাহার সিকি চাউলও বর্ত্তমানে এদেশে নাই।"

উক্ত জনসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—"গত আগষ্ট মাসে গুলী চালনার সময়ই মিঃ হক ও গভর্ণরের মধ্যে লড়াই সুরু হয়। সেই সময় মিঃ হক গভর্ণরকে বলিয়াছিলেন—"এক মিনিটের জন্যও আপনি আমার অবস্থায় আসুন এবং মনে করুন ইংলণ্ড ভারতবর্ষ দ্বারা শাসিত হইতেছে ও আপনি (গভর্ণর) ভারতীয়—একজন মন্ত্রী। এই অবস্থায় ইংলণ্ডের জনসাধারণের উপর গুলী চলিলে আপনার (গভর্ণরের) মনের অবস্থা কি হইত?" আমি মিঃ হককে সেই সময় বলিয়াছিলাম যে তাঁহার চাকরী আর বেশী দিনের নয়।

মেয়র সৈয়দ বদরুদ্দোজা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"দেশবাসীর প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে মিঃ হক তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। মিঃ হক মেদিনীপুরের ব্যাপার সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যেদিন মিঃ হক পরিষদে এক তদন্ত কমিটীর কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন সেই রাত্রেই গভর্ণর একখানি পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিলেন "প্রিয় প্রধান মন্ত্রী, আপনি আমাকে না জানাইয়া পরিষদে যে একটী তদন্ত কমিটি নিয়োগে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন আপনার এই আচরণের জন্য আপনি আমার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য।" মিঃ হক উত্তরে জানান যে পরিষদে তাঁহার আচরণ সম্পর্কে তিনি (মিঃ হক) গবর্ণরের নিকটে কোনও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। তিনি (মিঃ হক) গবর্ণরকে এই-রূপ সতর্ক করিয়া দিতে চান যে তিনি তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর প্রতি যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন সেরূপ ভাষা যেন আর ব্যবহার না করেন।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু টাউনহলের বক্তৃতায় বলেন—"আইনসভার জনকয়েক বর্ণহিন্দু সদস্য যে দলত্যাগ করিয়া স্যার নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন ইহা বিশেষ লজ্জা ও ঘৃণার কথা। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা হয় ত মন্ত্রী হইবার যথেষ্ট যোগ্য; কিন্তু কংগ্রেস যে মহান নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া দল ভাঙ্গিয়া তাঁহারা মুস্লিম লীগের আওতায় মন্ত্রী হইতে যাইতেছেন। আমরা এই সব দলত্যাগকারীদের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিব।"

খাদ্য সমস্যা

ডাঃ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এম্-বি

আমাদের বাঙ্গালা দেশে এবারে যে খাদ্যাভাব হইবে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য 'চাউল' সাধারণতঃ যে পরিমাণ জন্মায় এবারে তাহার অর্দ্ধেকও জন্মায় নাই। কোন জেলাতেই অধিক ফসল হয় নাই, বরিশাল, কুমিল্লা, পাবনা, বর্দ্ধমান ইত্যাদি যে সকল জেলাগুলিতে বেশী পরিমাণ চাউল জন্মিয়া থাকে সেখানে ।৶০ আনার বেশী ফসল হয় নাই। বাঙ্গালায় যতটা চাউল জন্মায় তাহাতে এদেশের খাদ্য সঙ্কুলান হয় না। প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টন (২৭ মনে ১ টন) চাউল বর্ম্মা হইতে আমদানী করিয়া এদেশের লোকদের বাঁচিয়া থাকিতে হয়। এ বৎসর যুদ্ধের দরুণ বর্ম্মা হইতে চাল আমদানী তো বন্ধই, অধিকন্তু, বাঙ্গালাদেশে সামরিক ও বেসামরিক বহু লোক আমদানী হইয়াছে। তাহাদের ব্যবহারের জন্য চাউল বাঙ্গালাকে যোগাইতে হইবে তো বটেই—কিছু চাউল ইরাক, ইরাণ, মিশর প্রভৃতি দেশে নিয়োজিত সৈন্যদের জন্যও যে রপ্তানী করিতে হইবে না তাহাও সুনিশ্চিত বলা যায় না। আমাদের সরকারী দূরদর্শিতার অভাবে, সময় মত পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার অন্তরায় ইত্যাদির দরুণ এবং এ বৎসর পাটের চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় চাউল উৎপন্ন কম হইয়াছে। নানারূপ দৈবদুর্ব্বিপাক বশতও শস্য উৎপন্ন কম হইয়াছে। ফলে আমাদের দেশবাসীকে যে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে ও বহু লোকের প্রাণনাশ হইবে তাহা সুনিশ্চিত। অনাহারের দরুণ দুর্ব্বলতা ও রোগ-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুহার বৃদ্ধি অনিবার্য্য। এখন হইতেই এই বিষয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

এদেশে শতকরা ৯০ জন লোক চাষ আবাদের উপর নির্ভর করে। ফসল কম হইলে অন্নাভাব হইবে তাহা তাহারা ভাল করিয়াই বুঝে কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা তাহারা করিতে পারেনা—প্রধানতঃ তাহারা একযোগে কাজ করিতে শিখে নাই ও দ্বিতীয়তঃ কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের উদর পূরণের ও পুষ্টির অভাব না হইতে পারে সে বিষয় তাহাদের জ্ঞানের অভাব। সরকারের উচিৎ এই বিষয় চিন্তা করিয়া একটি পরিকল্পনা স্থির করা এবং কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদের বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে, প্রতি কুটিরে, তাহা প্রচার করা। 'Grow more food' campaign খবরের কাগজে প্রচার করিয়া বা বড় বড় সহরে সরকারী চাকুরে ও অন্য লোক দ্বারা করিলেই চলিবে না। প্রতি মহকুমা, ইউনিয়ন, গ্রামগুলিতে ইহার প্রচার চাই ও হাতে কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

আমরা বাঙ্গালার মাটীর সদ্ব্যবহার করিনা। চাষা বহুপরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালাদেশে প্রতি একরে যতটা ধান পায়, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষ করিলে তাহার দশগুণ না হউক অন্ততঃ ৪ গুণ ফসলও চেষ্টা করিলে জন্মাইতে পারে।

বাঙ্গালার গ্রামে প্রতি গৃহস্থেরই অল্প বিস্তর জমি আছে যেখানে তাহারা তরি-তরকারী ফল-মূল, সয়াবীন, চীনা বাদাম, ইত্যাদি লাগাইয়া নিজেদের ও প্রতিবেশীদের ব্যবহারের উপযুক্ত খাদ্য তৈয়ার করিতে পারেন। সরকারী হিসাবে বাঙ্গালা দেশে প্রায় ১।০ কোটী বিঘা অনাবাদী জমি আছে—এই জমিতে মনুষ্য ও পশুদের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

পুকুরের পাড়ে, ডোবার ধারে উঠানে, রান্নাঘরের পিছনে বহু শাক-সব্জি হেলায় উৎপন্ন করা যাইতে পারে। পুঁই, কলমি, লাউ, কুমড়া, ডেঙ্গো, পালঙ, প্রভৃতি সব্জির ব্যবহার আজকাল কমিয়াছে কিন্তু ঐসবগুলি খাদ্যপ্রাণ (Vitamin) প্রধান তরীতরকারী ব্যবহারে আমাদের দাঁত, চামড়া ও গ্রন্থি আবরণগুলি যে কত ভাল হয় তাহা বৈজ্ঞানিকেরা প্রচার করিয়া দিলে এবং সাধারণ গৃহস্থদের বুঝাইয়া দিলে সকলেই হাসি মুখে ব্যবহার করিবে। মুলা, গাজর, বাঁধাকপি, মটর, বীট, সীম, বিলাতী বেগুন, করলা ইত্যাদি সহজেই তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

আমাদের সকলেরই মৎস্য, তরি-তরকারী, হাঁস মুরগী ইত্যাদি চাষ করিবার ব্যবস্থা করা এ বৎসর নিতান্ত প্রয়োজন। ইহা অল্প সময়ে ও সামান্য ব্যয়ে হইতে পারে। উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা উন্নততর ব্যবস্থা ও উহাদের সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা প্রয়োজন।

নদীপ্রধান আমাদের দেশে খাল, বিল, পুকুরের অভাব নাই। বাঙ্গালার দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্রের অফুরন্ত মাছ আমরা আজ পর্য্যন্তও কাজে লাগাইতে শিখি নাই। আমাদের মৎস্য ব্যবসা এমন এক শ্রেণীর লোকের হাতে আছে যাহারা শুধু অশিক্ষিত নহে—কুসংস্কারাচ্ছন্ন অলস প্রকৃতির। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের চাষ করিবার নিয়মাবলী, আমদানী রপ্তানীর ব্যবস্থা, ইত্যাদি তাহারা জানেনা—জানিতে চাহেও না। আমাদের সরকারের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচিত—এই সময় মাছের চাষ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা। ইহাতে বহু লোকের খাদ্য সমস্যা শুধু পূরণ হইবে না—উৎকৃষ্টতর খাদ্য ব্যবহারে দেশের লোকের স্বাস্থ্যও উন্নত হইবে।

মৎস্যর চাষ আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সাধারণতঃ করেন না। পুকুর যাঁহাদের আছে তাঁহারা সখ করিয়া মাঝে মাঝে মাছ ধরেন। তাঁহাদের সহরে বন্ধুবান্ধবদের মাছ ধরিবার জন্য মাঝে মাঝে ব্যবস্থা করিয়া আমোদ পাইয়া থাকেন ও নিজেদের পুকুরের গর্ব্ব করিয়া আনন্দ পান। বৎসরে ২০।২৫ দিন তাঁহাদের পুকুরের মাছ গৃহস্থ নিজেরা খাইয়া রুচি হইলে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াইয়া আনন্দ পান—তাহার অধিক কিছু করিবার ইচ্ছা বা কল্পনা তাঁহাদের নাই—হয়ও না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা ও মাছগুলির ওজন বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করা উচিৎ। সরকারের এ বিষয়ে যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। উপযুক্ত স্থানে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় কি করিয়া মাছ ফুটাইতে হয়, কি প্রকারে অধিকাংশ ডিম রক্ষা পায় ও কি উপায়ে ছোট চারা মাছ সহজে বাঁচে ও বড় করিতে পারা যায় তাহা হাতে কলমে লোকেদের দেখান উচিৎ—যাহাতে সাধারণে ঐ বিদ্যা শীঘ্র অর্জ্জন করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইতে পারে। "মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে" প্রবাদ বাঙ্গালায় সত্য হওয়া অসম্ভব নয়।

পাঞ্চালের রাজনৈতিক অবস্থা

ডক্টর শ্রীবিমলা চরণ লাহা এম-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্

প্রাচীন ব্রাহ্মণ সাহিত্যে পাঞ্চালবাসী ও পাঞ্চালরাজাদের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতে যে সমস্ত নৃপতি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পাঞ্চাল রাজ ক্রৈব্যের নাম শতপথ ব্রাহ্মণে[১] দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিবিগণের অধিরাজ পরিবক্রা বা পরিচক্রা বজ্রাখ ধরিয়াছিলেন[২]। পাঞ্চালদেশের ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া অসংখ্য দানসামগ্রী নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন[৩]। ইন্দ্রের মহাভিষেক প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে পাঞ্চালগণ মধ্যদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন[৪]। কুরুপাঞ্চাল দেশের নৃপতিগণ রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের পরিচয়[৫]। তাঁহারা শীতকালে পররাষ্ট্র আক্রমণে বহির্গত হইতেন এবং গ্রীষ্মকালে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন[৬]। বহুশক্তিশালী পাঞ্চালরাজ দুর্ম্মুখ অনেক রাজ্য জয় করেন। পরে প্রত্যেকবুদ্ধ হইবার ইচ্ছায় তিনি তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করেন[৭]। জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে[৮] এই নৃপতি দ্বিমুখ নামে পরিচিত। সোনসাত্রসোহ নামে অপর একটি রাজা বহু সমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ প্রচুর ধনলাভ করেন[৯]।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পাঞ্চালের শক্তিশালী রাজা ছিলেন দ্রুপদ। কৌরবগণ তাঁহার রাজ্যের উত্তরভাগ জয় করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণগুরু দ্রোণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদীকে (পাঞ্চালী) পঞ্চপাণ্ডবের সহিত বিবাহ দিয়া কৌরবদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। এক সময়ে অঙ্গরাজ কর্ণ বহুসৈন্য লইয়া পাঞ্চালদেশ আক্রমণ করেন। দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি তাঁহার সামন্তরাজগণের নিকট হইতে কর আদায় করেন। কিছুদিন পরে ভীমসেন পাঞ্চালদেশ আক্রমণ করেন এবং নানা কৌশলে এই দেশকে আপনার অধীনে আনেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে পাণ্ডবগণের মিত্র রাজা দ্রুপদ স্বপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং অক্ষৌহিণী সৈন্য প্রেরণ করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন পরে পাণ্ডবসৈন্যের সেনাপতি হন। কিন্তু এই যুদ্ধে দ্রুপদরাজার পরিবারবর্গের এবং তাঁহার সামরিক শক্তির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল[১০]। কুরুপাঞ্চাল দেশের রাজন্যবর্গের মধ্যে যুদ্ধ হইত এবং কখনও কৌরবগণ এবং কখনও পাঞ্চালগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিত[১১]।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পাঞ্চাল রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। জৈনগ্রন্থে হরিসেন নামে পাঞ্চালের দশম চক্রবর্ত্তী রাজার এবং ব্রহ্মদত্ত নামে পরাক্রমশালী সার্ব্বভৌম রাজার উল্লেখ আছে[১২]। উত্তর পাঞ্চালের শক্তিশালী রাজা চূড়নী ব্রহ্মদত্ত সমস্ত জম্বুদ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন[১৩]। রামায়ণ,[১৪] গণ্ডতিন্দু জাতক এবং জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্রে[১৫] ব্রহ্মদত্ত নামে পাঞ্চালের এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে বিবৃত আছে যে এই রাজা সৌভাগ্যবান হইলেও পাপাসক্ত ছিলেন। এই রাজা ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন। তিনি অন্যায় করধার্য্য করিতেন। পাঞ্চালদেশে প্রবাহন জৈবালী নামে এক পুণ্যবান রাজা ছিলেন। সৎকার্য্যের জন্য তিনি যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন[১৬]।

বৌদ্ধযুগে পাঞ্চালদেশে গণতন্ত্রের প্রচলন ছিল। পাঞ্চালরাজ্যে পদাতিক সৈন্য, সমরপটু এবং লৌহ অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষ অনেক ব্যক্তি ছিল[১৭]।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে[১৮] পাঞ্চালদেশে প্রজাতন্ত্রশাসনের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের অন্ততঃ একশতবর্ষ পরেও পাঞ্চাল একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত পাঞ্চালদেশ মহাপদ্ম নন্দ[১৯] কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া মগধসম্রাটগণের অধীনে আসে নাই, ততদিন ধরিয়া পাঞ্চালরাজ্য স্বাধীন ছিল। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে পাঞ্চালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে বিরচিত গার্গীসংহিতায় পাঞ্চাল যবন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। এই আক্রমণ সম্রাট অশোকের পরবর্ত্তী যুগে ঘটিয়াছিল[২০]। প্রায় খৃষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে অধিচ্ছত্রের (অহিচ্ছত্রের) রাজবংশোদ্ভূত আষাঢ় সেনের শাসনাধীনে উত্তর পাঞ্চাল সামরিক গৌরব লাভ করে। আষাঢ় সেনের দুইটা পভোসা গুহা-লিপির মধ্যে একটিতে বিবৃত আছে যে অধিচ্ছত্রের রাজা বৃহস্পতি মিত্রের মাতুল ছিলেন। এই বৃহস্পতি মিত্র মিত্রবংশোদ্ভূত। তিনি তৎকালীন মগধের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। এই লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে উত্তর পাঞ্চালের রাজবংশ মগধের মিত্রগণের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের পদমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। মগধ সম্রাটের সামন্তগণ অপেক্ষা তৎকালীন অহিচ্ছত্রের রাজা আষাঢ় সেনের পদ মর্য্যাদা উচ্চতর ছিল বলিয়া হয় না। তথাকথিত পাঞ্চালশ্রেণীভুক্ত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা পাঞ্চাল, পাটলিপুত্র এবং আউধের অন্তর্গত বস্তি জেলায় পাওয়া যায়। এই প্রকার কতকগুলি মুদ্রায় মিত্রবংশোদ্ভূত নরপতির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু ইহা হইতে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে তাঁহারা এই সময়ে উত্তর পাঞ্চালে স্থানীয় বংশ স্থাপন করিয়াছিলেন[২১]।

কুষাণ এবং গুপ্তযুগে পাঞ্চাল রাজ্যের গৌরব বিলুপ্ত হয়। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং লিখিত বিবরণে অহিচ্ছত্র দেশের উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহাতে রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় না। ৮৪০-৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা ভোজ এবং তাঁহার পুত্রের অধীনে এবং পুনরায় দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে গাহারওয়ার নৃপতিগণের অধীনে পাঞ্চালদেশ উত্তর ভারতের প্রধান রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়[২২]।

১৩, ৫, ৪, ৭ ২। শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩, ৫, ৪, ৭

ঐ, ১৩, ৫, ৪, ৮ ৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩, ৩৮, ১৪

শতপথ ব্রাহ্মণ ৬। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১, ৮, ৪, ১-২

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৯, ৩৯, ২৩

জৈন সূত্র (এস, বি. ই), ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৭

শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩, ৫, ৪

১০। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, অঃ ৯৪; সভাপর্ব্ব, অঃ ২৯; বনপর্ব্ব, অঃ ২৫৩; ভীষ্মপর্ব্ব অঃ ১৯; উদ্যোগ পর্ব্ব, অঃ ১৫৬-৭, ১৭২-১৯৪; কর্ণপর্ব্ব অঃ ৬; বিরাট্পর্ব্ব, অঃ ৪, দ্রোণপর্ব্ব, অঃ ২২

১১। Law, Ancient Mid-Indian Ksatriya Tribes, vol. I, pp. 58 59'

১২। বিবিধ তীর্থকল্প, পৃঃ ৫০

১৩। মহাউম্মগ্গ জাতক (জাতক, ৬, পৃঃ ৩২৯)

১৪। রামায়ণ, আদিকাণ্ড, সর্গ ৩৩ ১৫। ২য় ভাগ, পৃঃ ৬১।

১৬। বৃহদারণ্যক উঃ, ৬, ১১ এবং ছান্দোগ্য উঃ, ৫, ৩, ১

১৭। জাতক (Fausboll), খণ্ড ৬, পৃঃ ৩৯৬

১৮। শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ, পৃঃ ৪৫৫

১৯। Ray Choudhuri, Political History of Ancient India- 4th Ed, p. 188

২০। Max Muller, India, what can it teach us p 298

২১। Ray Choudhuri, Political History of Ancient India, 4th Ed, p 327

২২। Sir Charles Eliot; Hinduism & Buddhism, vol I.p 27

"রক্তদান"

ডাক্তার শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ

রক্ত ও মাংসে গড়া জীবদেহে রক্তই জীবন-প্রদীপকে প্রজ্জ্বলিত রাখে। রক্তের অল্পতা বা কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলে অথবা কোনও রোগের উপসর্গ-রূপে কিংবা আকস্মিক অপঘাত প্রভৃতির ফলে সহসা অযথা বেশী-মাত্রায় রক্তক্ষয় হইলে দেহে বিবিধ অলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সময়ে তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে রোগীর জীবন প্রদীপ অকালেই নির্বাপিত হয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক, ক্ষ্যাপার পরশ-পাথর সন্ধানের মত 'মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা' লাভের বিফল প্রয়াস না করিয়া মানুষকে সুস্থ ও রোগহীনভাবে দীর্ঘজীবী করিবার জন্ত নিরত কঠোর তপঃসাধনায় রত। সেই একনিষ্ঠ সাধনার ফলে গত ৫০ বৎসরের মধ্যে এমন বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ঔষধাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাতে এ যাবৎ দুরারোগ্য বলিয়া জ্ঞাত নানা ব্যাধির চিকিৎসা বর্ত্তমানে সহজসাধ্য হইয়াছে।

চিকিৎসার জন্ত রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা বহু যুগ হইতে প্রচলিত থাকিলেও ক্ষেত্র বিশেষে জীবদেহে অপরের রক্ত প্রবেশ করাইয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিবার ব্যবস্থা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসার ফল। যতদূর জানা যায় এইরূপ চিকিৎসার প্রথম প্রচলন হয় সপ্তদশ শতকে, কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগে কয়েকটি অসুবিধা থাকায় ইহা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক ইহাতে হতাশ না হইয়া কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হইল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে Landsteener আবিষ্কার করিলেন যে সব মানুষের রক্ত সকলের দেহে সমান ক্রিয়া করেনা। রক্তের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ আছে। বিজ্ঞান ও চিকিৎসা জগতে এই আবিষ্কারের মূল্য এত অধিক যে জগৎ সভায় Landseener একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী হইলেন এবং তিনি নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইলেন। এই আবিষ্কারের ফলে দেখা গেল যে রক্তের লোহিত কণার মধ্যে এমন একটি পদার্থ (agglutinogen) আছে যাহা এই শ্রেণী ভেদের জন্ত দায়ী। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রক্ত হইতে এই লাল-রক্ত কণিকাগুলিকে বাদ দিয়া যদি বাকী অংশ (Plasma) জীবদেহে প্রয়োগ করা যায় তবে কোনও অসুবিধা হয়না।

এই তথ্য আবিষ্কারে চিকিৎসা জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইলেও বৈজ্ঞানিকের পূর্ণ তৃপ্তি হইল না। কারণ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল রোগশয্যার পার্শ্বে অপরের রক্ত লইয়া তাহাকে ব্যবহারযোগ্য করা সময়সাপেক্ষ, অথচ ভবিষ্যতে ব্যবহারের আশায় পূর্ব্বাহ্নে রক্তসংগ্রহ করিয়া অনির্দ্দিষ্টকালের জন্ত তাহাকে কার্য্যকরী করিয়া রাখা সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিকের সাধনা এই অসম্ভবকেও সম্ভব করিল—এখন পূর্বাহ্নে রক্ত সঞ্চয় করিয়া লাল-কণিকা বর্জন করিয়া কেবলমাত্র প্লাজমাকে ঘনীভূত ও শুষ্ক করিয়া বোতল-বন্দী করা সম্ভব হইয়াছে; যাহাতে প্রয়োজন মত Distilled water সংযোগে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রক্ত-চিকিৎসা করা যে কোন চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভবপর। ইহাও অসম্ভব নহে যে অদূর ভবিষ্যতে কোন উৎসাহী ব্যবসায়ী এই প্রথায় রক্ত সঞ্চিত করিয়া ঔষধরূপে উহার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া এই চিকিৎসাপদ্ধতিকে সহজলভ্য ও অল্প ব্যয়সাপেক্ষ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু যতদিন না এইরূপ কোন উদ্যোগী ব্যবসায়ীর আবির্ভাব ঘটিতেছে ততদিন আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবেনা বিশেষত আজিকার দিনে যখন জাতি-ধর্ম্ম নির্বিশেষে দেশের জনসাধারণ সর্ব্বদাই মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিতেছে। এই জন্তই ভারত গবর্ণমেণ্ট ও রেড ক্রস সোসাইটির সহ-যোগিতায় কলিকাতা অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন ও পাবলিক্ হেলথ-এ সম্প্রতি যে ব্লড ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা সমীচীন ও সময়ো-পযোগী বলিয়া মনে হয়। ইহাদের কার্য্য পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। সাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিলে যেমন ইচ্ছামত টাকা বাহির করিয়া লওয়া যায়, এখানেও সেইরূপ রক্ত আমানতকারী প্রয়োজন মত রক্ত লইতে পারেন। প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির দৈহিক সামর্থ্য মত এখানে রক্ত জমা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে যে কেবল আমানতকারীই প্রয়োজনকালে উপকৃত হইবেন তাহা নহে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুও সময়োচিত সাহায্য পাইতে পারেন। এখানে বলা আবশ্যক যে প্রণালীতে সাবধানতার সহিত মানুষের দেহ হইতে রক্ত গ্রহণ করা হয় তাহাতে জীবনের কোন আশঙ্কা নাই ইহা নিশ্চিত, পরন্তু দাতার দেহে সামান্তরূপ সাময়িক বৈলক্ষণ্যও প্রকাশ পায় না।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যখন বিমান আক্রমণের আতঙ্কে সকলেই শঙ্কিত তখন এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা আছে। কারণ বিমান আক্রমণের ফলে গুরুতরভাবে আহত ও মৃত প্রায়ের অনেকেরই জীবনীশক্তি উদ্দীপিত করিতে রক্ত চিকিৎসা বিশেষ কার্যকরী। কে কবে কি ভাবে আহত হইবে তাহা গণিয়া বলা যায় না; কিন্তু সে দিন যদি সত্যই কাহারো নিজের বা আত্ম-পরিজনের ভাগ্যে আসে, প্রয়োজন হইলে এই রক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা কোথা হইতে হইবে! সেই সংকটময় মূহুর্ত্তে তাহার জন্ত রক্তদান করিতে কেহ অগ্রসর হইবে কিনা সন্দেহ, আর হইলেও সেই দাতার রক্ত, গ্রহীতার রক্তের সমশ্রেণীভুক্ত হইবে কিনা কে বলিতে পারে! কাজেই এই অতি প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কটিকে আপন আপন সামর্থ্যমত সমৃদ্ধ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। মানুষ জীবনবীমা করে আত্ম-পরিজনের ভবিষ্যত সংস্থানের আশায়, তেমনি নিজের অথবা আত্মীয়-স্বজনের জীবন রক্ষার আশায় সামান্ত একটু রক্তদানে ক্ষতি কি? হয়ত নিজের জীবনে এই ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু একের সামান্ত ত্যাগে অপর কাহারো যদি জীবন রক্ষা হয় তাহাতেই বা দোষ কোথায়? পরহিত সকল শাস্ত্রমতেই পুণ্য কার্য। সে হিসাবে এই দানও পুণ্য কার্য। সমর্থ ব্যক্তির পক্ষে এ পুণ্য অর্জন করা কর্ত্তব্য। দধীচি আপন অস্থিদানে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন কিন্তু সে দানের মধ্যে হিংসার আভাষ ছিল, কারণ সে অস্থির ব্যবহার হইয়াছিল, দুস্কৃত হইলেও জীবের প্রাণ হরণের জন্ত। কিন্তু বর্ত্তমানের এইরক্ত দান সম্পূর্ণ অহিংস নীতিমূলক —যেহেতু ইহার প্রতি কণাটি ব্যবহৃত হইবে—শত্রুমিত্র নির্বিচারে—জীবন রক্ষার জন্ত, নাশের জন্ত নয়।

এলে নাকো তুমি—

বন্দে আলী

আমার ভবনে নিভে গেছে দীপ আঁধার নামিয়া আসে
বাঁকা চাঁদখানি ডুবিয়া গিয়াছে মোর বাতায়ন পাশে।
দুখরাতি মম হবে নাকো ভোর
আমার জীবনে শুধু আঁখি লোর
পূবালি বাতাস দ্বারে আসি হায় ফেরে ব্যথা নিশ্বাসে।

তুমি যে আসিতে চেয়েছিলে আজি সে কি গো গিয়েছ ভুলি।
আমার কামনা বকুল শাখায় ক্ষণে ক্ষণে ওঠে দুলি।
এলে নাকো তুমি হে পাষাণ প্রিয়
মেঘে মেঘে হেরি তব উত্তরীয়
তোমার মনের মদির স্বপন আসে যূথ ফুল বাসে।

রাজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

অনুকূল চক্রবর্ত্তীকে আমরা রাজা বলিয়া ডাকি। তাহার আসল নাম প্রায় বিস্মরণের গর্ভে নামিয়া গিয়াছে। আমারই প্রতিবেশী অনুকূল। লোকটী রসজ্ঞ, সুশ্রী, সুকণ্ঠ ও অভিনয়ে সুদক্ষ। চরিত্র সুন্দর, স্বভাব শিশুর মত, কিন্তু দরিদ্র। সংসারের আয় খুবই অল্প, কিন্তু খরচ অনেক। তাই দারিদ্র্যও ঘুচিতে চাহেনা এবং দেনার ভার দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। স্ত্রী ও পুত্র কন্যা লইয়া অনেকগুলিকেই তাহার আহার যোগাইতে হয়। শৈশব হইতেই সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের কর্ম্মে অপটু। দরিদ্রের সন্তান বলিয়া লেখাপড়াও বিশেষ হয় নাই। তাই শৈশব ও যৌবনের অনেক বৎসর পর্য্যন্ত, রাখাল ছেলেদের সহিত মাঠে মাঠে, বনে বনে গান গাহিয়া, বাঁশী বাজাইয়া কাটাইয়া দিয়াছিল। তাহারপর বিবাহ হইল, কিন্তু অর্থাগম হইলনা। অবশেষে তাহার সুকণ্ঠ ও সুশ্রী চেহারার প্রতি চরণ পালের দৃষ্টি পড়িল। চরণ পাল অনুকূলকে যাত্রাদলে থাকিবার প্রস্তাব করিতেই অনুকূল রাজী হইল। উহা তাহার চিরকালের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা। সেই স্বপ্ন যখন সত্য হইতে চলিয়াছে, তখন অনুকূল সহজেই রাজী হইয়া গেল। সেই হইতেই বীণা অপেরা পার্টিতে, অনুকূল থাকিয়া গেল। পীরগাঁয়ের মেলায় যাত্রায় রাজার পার্ট করিয়া সে সুনাম কিনিয়াছিল তাহার ফলেই, সকলে তাহাকে 'রাজা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার প্রকৃত নামের স্থলে সকলের নিকট 'রাজা' নামেই পরিচিত হইয়া উঠিল। এখন আর কেহ অনুকূল বলেনা, বলিলে হঠাৎ চিনিতে একটু চিন্তা করিতে হয়।

যাত্রাগানে ব্যস্ত না থাকিলে রাজা আমার বৈঠকখানায় চায়ের আসরে আসে। চা-তামাক খায়। তাহার সুখদুঃখের কাহিনী শোনায়।

পীরপুরের মেলায় তিনরাত্রি যাত্রা করিয়া কাল রাত্রে রাজা বাড়ী ফিরিয়াছে। আজ সকালে সে আমার বৈঠকখানাতে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম—কি রাজা, খবর কি? পীরপুরের মেলায় কেমন গান হল?

রাজা একগাল হাসিয়া বলিল—চমৎকার বুঝলেন—চমৎকার। বুঝলেন বাবু, এবার জমিদারবাবুরা আমায় একটা মেডেল দিয়েছেন, আর পাঁচটা টাকা বখশীস্ করেছেন। রাজা তাহার ছিন্ন মলিন চাদরের প্রান্ত হইতে রূপার মেডেলটী বাহির করিয়া, আমার হাতে দিল।

—বাঃ, এইবার তোমার কপাল ফিরবে রাজা। প্রত্যেকবার শুধু মেডেল পাও, টাকা কোনদিনই তো পাওনা। যাক্, মাইনে দিয়েছে তো পাল মশাই।

মুখে একটা শব্দ করিয়া রাজা বলিল, মাইনে পেলাম, বখশীস্ পেলাম, তবুও পেট ভরলনা বাবু। শুনে আপনারা অবাকই হবেন বাবু। ম্যানেজার পাল ম'শায় বললেন, রাজা, এবার দল অনেকদিন বসে ছিল, আর দেনা পত্তরও হয়ে গিয়েছে, মাইনে কিন্তু পুরো দিতে পারবনা। হাতে মাত্র দশটা টাকা দিলেন, আবার ঐ বখশীসের পাঁচটা টাকার মধ্যে দুটো টাকা ভাগ নিলেন।

সবিস্ময়ে বলিলাম, তার মানে। কেন, ঐ বখশীস্ তো তোমাকেই বাবুরা দিয়েছেন। এতে পাল কেন ভাগ বসাল।

রাজা হাসিয়া বলিল, মজা তো ঐখানেই বাবু! নইলে আবার দুঃখ কিসের। তিনদিনরাত জেগে, পরিশ্রম করে, গলা ভেঙ্গে গান করলাম, কিন্তু পেলাম ঐ দশটা টাকা মাইনে, আর বখশীসের তিনটে। লাভ এই রূপোর মেডেলটা। ভাবছি, বড় মেয়েটার হাতে, দুগাছা করে চার গাছা রূপোর চুড়ি গড়িয়ে দেব। আরও গোটা তিনেক মেডেল রয়েছে। কোনোদিনই তো ওদের কিছু দিতে পারিনে। সোনার গয়না দেবার কথা মনেও আনতে পারিনে। তাই মনে মনে ভেবেছি, মেডেলগুলো ভেঙ্গে, ক'গাছা চুড়ি করে দেব। মেয়েটা শুধু হাতে ঘুরে বেড়ায়, সমবয়সীদের হাতে চুড়ি দেখে, আমায় কতদিন চুড়ির কথা বলেছে। আমি প্রত্যেক বারই বলেছি, এবার গান গেয়ে এসে, গয়না গড়িয়ে দেব। তাই ভাবছি বাবু—

রাজা চা শেষ করিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

বলিলাম, আচ্ছা রাজা, তোমার চেহারা যেমন সুশ্রী, গলাও তেমনি চমৎকার। সত্যিই তোমার অভিনয় করার ক্ষমতা আছে। তুমি কেন একটা বড় দলে চাকরী নাওনা। মাইনে বেশী পাবে। ঐ চরণ পালের দলে খেটে খুটে যাত্রা করবে; বলতে গেলে তোমার জন্যেই ঐ যাত্রার দল টিকে আছে। অথচ তোমায় মাইনে দেবেনা, বখশীস্ যা পাবে, তারও ভাগ দিতে হ'বে। এ দিকের বিশ ত্রিশ খানা গাঁ, তোমার নাম শুনেই তোমাদের বীণা অপেরা শুনতে আসে। দেখছো তো, ঐ চরণ পালের অবস্থা কি ছিল, আর কি হয়েছে। বাড়ী, ঘর বিষয় সম্পত্তি, বাগান পুকুর, আর শুনতে পাওয়া যায় হাতেও দু' এক হাজার জমিয়েছে। বলতে গেলে, ও সবই তোমার দৌলতে। অথচ তোমায় ভালমানুষ পেয়ে, শুধু ফাঁকি দেয়। এই তিনদিনে, তোমাদের যাত্রার কুরণ ছিল দুশো টাকার। অথচ তুমি পেলে মাত্র দশ টাকা। এ স্রেফ ফাঁকি, বুঝলে রাজা।

রাজা বলিল, সবই বুঝি বাবু। অন্য দলে গেলে মাইনেও বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ কে বা চেষ্টা করে, আর তা ছাড়া এটা গাঁয়ের দল। হাজার হোক দেশের দলতো। অন্য দলে গেলে, চিরকাল বিদেশে বিদেশে থাকতে হ'বে। আর এ দেশের দল, দু চার রাত বিদেশে গান করলেও মাসের মধ্যে কিছুদিনও বাড়ী থাকা চলে। এই সুবিধা বাবু।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। চাকর ঘরে আলো দিয়া গেল! আমার বন্ধুরা এই সময় আমার বৈঠকখানায় গল্প গুজব করিতে আসে। একে একে তাহারা আসিতেই, রাজা বলিল, বাবু এখন তবে উঠি। আবার কাল আসব।

বলিলাম, আচ্ছা।

রাজা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন একটু কাজে বাহির হইয়াছিলাম। রথতলার পাশ দিয়া, সরু গলিতে ঢুকিয়া, সদর রাস্তায় যাইব ভাবিয়া চলিতেছি। সেই গলির ভিতর রাজার বাড়ী। দূর হইতে, রাজার স্ত্রীর উচ্চকণ্ঠ শুনিয়া, ধীরে ধীরে, রাজার বাড়ীতে ঢুকিলাম। রাজা তাহার ভগ্ন-দালানে বসিয়াছিল; আমায় দেখিয়া একমুখ হাসিয়া বলিল, এই যে, হঠাৎ বাবু এসে গিয়েছেন যে, ওরে মণি, বাবুকে একটা বসবার জায়গা দে। বড় মেয়েটা ম্লানমুখে দূরে দাঁড়াইয়া, আর তাহারই পায়ের কাছে, ইতঃস্ততঃভাবে রাজার রূপার মেডেলগুলি পড়িয়া রহিয়াছে।

বলিলাম, ব্যাপার কি রাজা?

রাজা মৃদু হাসিল মাত্র। কিন্তু জবাব দিল, রাজার গৃহিণী।

উচ্চ রুক্ষকণ্ঠকে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিলেন, দেখতো ঠাকুরপো, ঘরে একমুঠো চাল নেই, পরণে সব ন্যাকড়া, ঘরের চালে আজ দু'বছর হ'তে এক আঁটি খড় পড়েনি। সামনে এই দুরন্ত বর্ষা আসছে, ও ঘর কি আর থাকবে। তারপর চারদিকে দেনা, দেনার তাগাদায় হাড় মাস ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল। আজ সকালে মেয়ে বাপে যুক্তি করে, মেয়ের জন্যে রূপোর চুড়ি গড়াতে চলছিলেন। যে পাঁচ ছটা টাকা রয়েছে, তাই দিয়ে এখন ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা না করে, কি করে মানুষ চুড়ি গড়াতে যায়, তাই বলতো ঠাকুর পো। ছেলে মেয়েগুলো সকাল হ'তে কাঁদছে, এমন কিছু নেই যে বাছাদের মুখে দি। রাজার গৃহিণী ছিন্ন মলিন আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

রাজার মেয়ে মণি কাঁদ কাঁদ মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর রাজা নির্ব্বিকার, মুখে সেই মৃদু হাসি। রাজার গৃহিণী সেই হাসিটা লক্ষ্য করিয়া, কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল, মুখে হাসিই বা ফোটে কি করে। দেখলে গা জ্বলে যায়।

মাথা চুলকাইয়া রাজা বলিল, কি করি বল, এটা আমার স্বভাব বুঝলে না। হাসিটা আপনিই বেরিয়ে আসে। কত চেষ্টা করি, যাতে হাসি না আসে, যাতে মুখখানা বেশ গম্ভীর, আর ভার ভার হয়, কিন্তু তা হয়ে উঠে না। পেটে ভাত নেই, পরণের কাপড় নেই, চারদিকে অভাব, সবই জানি, সবই বুঝি, কিন্তু তবুও হাসিটা কোনমতেই মুছতে পারলাম না। ভগবানের এও একটা বোধ হয় অভিশাপ।

—পোড়াকপাল ভগবানের—রাজার গৃহিণী ঝঙ্কার তুলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। রাজা বলিল, মা মণি, মেডেলগুলো এখন তুলে রাখ। এবার গান গেয়ে এসে, এই এত টাকা আনব। ছিঃ! রূপোর চুড়ি আবার হাতে দেয়, এবার সোনার চুড়ি গড়িয়ে দেব।

মণির মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল, সত্যি বাবা, সোনার গয়না করে দেবে! মেয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, রাজা বলিল, হ্যাঁ মা, সোনার গয়নাই গড়িয়ে দেব।

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে, গাঁয়ের বারোয়ারী তলায়, গোপীনাথজীর মন্দিরে যাত্রা হইয়া থাকে। গাঁয়ের দল বলিয়া বীণা অপেরা প্রথম রাত্রেই গান করিয়া থাকে। ইহার পর দু' এক রাত বিভিন্ন দলের গান হয়। যাহাদের দল শ্রেষ্ঠ বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট বিবেচিত হয়, তাহারা মেডেল ও পারিতোষিক পাইয়া থাকে। এই এক রাত গানের জন্য, বীণা অপেরা অন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক লয় না, বারোয়ারীর কর্ত্তৃপক্ষ অভিনেতাদের জলযোগ করাইয়া থাকেন।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন কয়েক আগে, চরণ পাল আসিয়া ডাকিল, ঠাকুরম'শায় আছেন নাকি?

রাজা বাড়িতেই ছিল। সাদরে চরণ পালকে বসিতে বলিয়া, তামাক সাজিবার উপক্রম করিতেই, মণি বলিল, বাবা, মা একবার তোমায় ডাকছে, এখুনি এস। চরণ পাল মৃদু হাসিয়া বলিল, যান যান ঠাকুরম'শাই, জরুরী ডাক শুনে আসুন! রাজা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

বাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই রাজার গৃহিণী বলিল, এবার ও মিন্‌সেকে বলো, আগাম পনেরটা টাকা দেবে, তবে যাত্রা করবে, নইলে না।

রাজা বিস্মিত হইয়া বলিল, বল কি? এ যে বারোয়ারীর যাত্রা, টাকা চাইব কি করে?—যেমন করে লোকে চায়, তেমনি করে চাইবে, এই হাত পেতে। আগাম পনের টাকা নিয়ে, আমার হাতে দেবে, তবে যাত্রা করতে পারবে—এই বলে দিলাম। যদি তা না কর, তবে আমিও বলে দিলাম, যাত্রা শেষ করে ফিরে এসে, আমায় জ্যান্ত দেখতে পাবে না। ঐ ঐখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

রাজা শিহরিয়া উঠিল।

—ভাল বিপদ, আরে এ যে বারোয়ারীর যাত্রা, টাকা নেব কি করে।

—ও আমি জানিনে। আমার চাই টাকা। ঐ মিনসে ভুঁড়ি মোটা করবে, আর তোমরা রাত জেগে গলা ভেঙ্গে খালি হাতে গান করে আসবে, তা হ'বে না। শক্ত হও দেখি, আপনি টাকা দেবে। মোট কথা, আমার হাতে ঐ পনেরটা টাকা না দিয়ে, তুমি যদি এক পা বাড়াও, তবে এই শেষ। ফিরে এসে মড়া মুখ দেখতে হ'বে। আমি বামুনের মেয়ে, যা বললাম তার এক বর্ণও মিথ্যে হবে না—হবে না—হবে না। এই তিন সত্যি করলাম।

রাজা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ধীর পদে বাহিরে আসিল।

চরণ পাল বলিল, কি ব্যাপার ঠাকুর মশাই, মুখখানা যে ভার ভার।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, রাজা বলিল, পাল মশাই, আমায় পনেরটা টাকা দেন। দিতেই হ'বে। বিশেষ দরকার।

চরণ পাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, টাকা? কোথায় টাকা পাব? দেখছেন তো দল নিয়ে কি রকম লোকসান যাচ্ছে। আপনার অজানা তো কিছুই নেই।

দৃঢ়স্বরে রাজা বলিল, আমার টাকার দরকার খুবই পাল মশাই। কালকের মধ্যেই টাকা চাই। আমায় আগাম দেন, পরে আমার মাইনে থেকে, কেটে নেবেন।

চরণ পাল মহা-বিস্ময়ে তাহার গোলগাল মুখখানি আরও গোল করিয়া বলিল, কি যে বলেন ঠাকুর মশাই। ও সব টাকার কথা এখন ছাড়ুন, পরে একটা ভাল গাওনা করে, না হয় কিছু দেব।

—না—না, পরে নয়। কালই চাই পাল মশায়। আপনার অনেক টাকা আছে,। আমি গরীব, ভারী গরীব, পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, চারদিকে পাওনাদার। আমায় ধার দেন, পরে পনের টাকা মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া চরণ পাল বলিল, ক্ষেপেছেন ঠাকুরমশাই, এই চোতসংক্রান্তি আসছে, শুনছি হেম চাটুয্যের দলও আসছে। খুব ভালভাবে গান করতে হ'বে, যাতে মেডেল-গুলো আমরাই পাই। আজ দুপুরে খেয়ে দেয়ে বুঝলেন, আখ্‌ড়া ঘরে যাবেন। একটু সকাল সকাল যাবেন—

রাজা বলিল, আমি তা হ'লে পারব না পাল ম'শাই।

চরণ পাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, টাকা ভিন্ন গান গাইবেন না। আচ্ছা, তবে ও বেলা পাবেন। চরণ পাল চলিয়া গেল।

বৈকালে পনরটা টাকা রাজার হাতে দিয়া চরণ পাল একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল, গাঁয়ের যাত্রা কিন্তু এ ভাবে চাপ দিয়ে টাকা নেওয়াটা ভাল হ'ল না ঠাকুর মশাই। আচ্ছা সন্ধ্যাবেলায় যাবেন কিন্তু, ঘড়ি ধরে। টাকা যখন নিয়েছেন, তখন তো আর কোন কথাই নেই। সময় মত যাবেন। যেন ডাকতে না হয়, হাঁ, টাইম্ মত কাজ চাই আমার।

চরণ পালের কণ্ঠে প্রভুত্বের সুর বাজিয়া উঠিল।

বিস্ময়ে চম্‌কাইয়া রাজা বলিল, টাইম মত ঘড়ি ধরে—

—হাঁ—হাঁ, টাইম্ মত যাওয়া চাই। যেমন টাকা দিচ্ছি, তেমনি কাজ আদায় করে নেব। তবে কি টাকা আগাম দিয়েও, আবার খোসামুদী করতে হ'বে নাকি।

চরণ পালের কণ্ঠে ব্যঙ্গের সুর। আর তাহার কদাকার গোল মুখখানা কুৎসিত হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাজা তাহার হাতের টাকার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া যেন কণ্ঠহারা হইয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, গ্রামের মুদী ভোলানাথ আসিয়া বলিল, প্রণাম হই ঠাকুরমশাই। ভোলানাথ চরণ পালের দিকে চাহিয়া বলিল—এইবার কিছু টাকা না দিলে আর চলে না পাল মশাই। অনেক টাকা বাকী পড়েছে।

চরণ পাল বলিল, তাই নাকি? কিন্তু বাকী পড়ে কেন? মাসে মাসে মাইনে দিই। এ কেউ বলতে পারবে না যে, চরণ পাল লোককে মাইনে দেয় না।

—ভোলানাথ মুদী হাসিয়া বলিল, তা ন্যায্য কথা পাল মশাই।

সগর্ব্বে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চরণ পাল বলিল, এই তো বারোয়ারীর যাত্রা, আজ বাদে কাল হচ্ছে। এ গাঁয়ের যাত্রা, গোপীনাথজীর চরণে গান নিবেদন করাই আমরা কৃতার্থ হওয়া মনে করি। কিন্তু বুঝলে ভোলানাথ, এবার ঠাকুরমশাই বললেন, পনের টাকা আগাম চাই, তবে যাত্রা করব। তাই দিলামও। ভোলানাথ সাপ দেখার মত চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, বলেন কি! বারোয়ারীর যাত্রায় উনি টাকা চাইলেন! চাইতে পারলেন! হা পালমশাই? সগর্ব্বে, রাজার হস্ত ধৃত নোট কয়খানির দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া চরণ পাল বলিল, বিশ্বাস না হয়, ঐ দেখ। এখনও হাতে টাকা রয়েছে। না হয়, তোমাদের ঠাকুর মশাইকেই জিজ্ঞেস কর না।

ভোলানাথ বলিল, হা ঠাকুরমশাই, টাকা নিয়েছেন?

শান্তসুরে রাজা বলিল, হুঁ।

চরণ পাল হাসিয়া বলিল, দেখলে তো।

তারপর একে একে গোয়ালা, জেলিনী, কাপড়ের দোকানের ভক্তনাথ, ছিদাম কলু উপস্থিত হইয়া তাগাদা সুরু করিল। শান্ত মুখে রাজা একবার সকলের মুখের দিকে চাহিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

চরণ পাল একবার ঘরের দিকে চাহিয়া সকলকে বলিল, চল হে তোমরা। তা হ'লে ঠাকুরমশাই এখন চললাম। সন্ধ্যে-বেলায় যাবেন, যেন দেরী করবেন না। হাঁ, যখন টাকা নিয়েছেন, তখন কাজে যেন ফাঁকী দেবেন না। টাইম মত যাওয়া চাই—সকলকে লইয়া চরণ পাল চলিয়া গেল।

টাকাগুলি ভাঙ্গা ডালা খোলা একটা বাক্সে রাখিয়া রাজা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রী কন্যা কেহই বাড়ী নাই। গৃহিণী থাকিলে, হয়তো উহাদের সহিত তুমুল বচসা লাগাইয়া দিত। রাজা মনে মনে বুঝিল, এ সবই ষড়যন্ত্র। চরণ পাল গ্রামের সকলকেই বলিয়াছে যে, গ্রামের বারোয়ারীর যাত্রায় ঠাকুর মশাই চাপ দিয়া টাকা আদায় করিয়াছে। তাই, এই অসময়ে এতগুলি পাওনাদারকে একরূপ সঙ্গে লইয়াই চরণ পাল তাহাকে টাকা দিতে আসিয়াছিল। তাহাকে সকলের নিকট অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করাই চরণ পালের উদ্দেশ্য ছিল। তাহার উদ্দেশ্য বেশ ভাল ভাবেই পূর্ণ হইয়াছে।

রাজা সেই পড়ন্ত বেলার দিকে চাহিয়া, মনে মনে ভাবিল, এই অস্তগামী সূর্য্যের ক্রম-বিলীয়মান আলোর মতই তাহার এতদিনকার মান, সম্মান, আদর, খ্যাতি, নিভিয়া আসিতেছে। কিন্তু গোপীনাথজী তুমি তো জান। রাজা দুই হাত যোড় করিয়া, শূন্যের পানে চাহিয়া বলিল, গোপীনাথজী তুমি তো জান, বল, আমি কি দোষে দোষী। তুমি বল আমি কি অপরাধী?

আজ চৈত্র-সংক্রান্তি। রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বারোয়ারী তলা জনাকীর্ণ। চারিদিকে আলো ঝলমল করিতেছে। দোকান, পসারী, লোকজনের ভীড়ে, ছেলেমেয়েদের উচ্চ হাসির রোলে, বারোয়ারী তলা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এইমাত্র কনসার্ট শেষ হইল, ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িতেই যাত্রা সুরু হইল। আসরের সব চেয়ে, সেরা জায়গায়, বন্ধু বান্ধবসহ বসিয়া যাত্রা দেখিতেছি। 'পৃথু-রাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ' সুরু হইল। রাজা চিরদিনই 'রাজার' ভূমিকা লইয়া আসরে নামে, আজও তাহার ব্যতিক্রম হয়নি। 'পৃথু রাজার' ভূমিকা লইয়া রাজা আসরে নামিল। তাহার ছিন্ন মলিন কাপড় জামা এখন আর নাই, তাহার উপর সলমা চুম্‌কীর কাজ করা, ভেল্‌ভেটের জামা, মাথায় রাজমুকুট, কোমে তরবারী। দীপ্ত মুখে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে, রাজা আসরে প্রবেশ করিল।

রাজা অভিনয় করিয়া যাইতেছে, মন্ত্রী, উজীর, সেপাই, শাস্ত্রী, সকলে রাজার সামান্য ইঙ্গিতে সন্ত্রস্ত। রাজার সামান্য কথায়, মন্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া, বারংবার প্রণাম জানাইতেছে, রাজ্যের প্রজারা যশোগান করিতেছে, রাজার জয়ধ্বনিতে, চতুর্দ্দিক ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এখন আর পাওনাদারদের ভয়ে, রাজা সন্ত্রস্ত নয়। রাজা এখন এক অখণ্ড বিশাল রাজ্যের অধিপতি,

তাহার সামান্য ইঙ্গিতে, সহস্র সহস্র মানুষের জীবনান্ত হইতে পারে, তাঁহার সামান্য হুঙ্কারে সমস্ত রাজ্য ভয়ে কাঁপিয়া উঠে, সামান্য আদেশে, সামান্য ইঙ্গিতে, সেপাই, শান্ত্রী, সভাসদ প্রভৃতি তটস্থ হইয়া রহে।

রাজার অভিনয় পূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছি, কিন্তু আজিকার এই অভিনয় যেন অপূর্ব্ব। সমস্ত লোক মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাহার অভিনয় দেখিতে লাগিল। এক অঙ্ক শেষ হইতেই, রাজা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া লোকজনের সমালোচনা শুনিবার জন্য, একটা সস্তা সিগারেট ধরাইয়া নিজেকে লোকজনের পিছনে আত্ম-গোপন করিয়া দাঁড়াইল।

একজন দর্শক বলিল, বেড়ে মাইরী, এমন যাত্রা, রাজা কিন্তু বহুদিন করেনি। আজকের পার্ট, আগের চেয়ে অনেক ভাল হচ্ছে।

তাহার বন্ধু উত্তর করিল, হ'বেনা, ইয়ার্কী নাকি? পাল ম'শায়ের কাছ থেকে রাজা পনেরটা টাকা নিয়েছে যে। ভাল না হ'লে, পাল ম'শায় রক্ষা রাখবে ভেবেছিস্।

—সে কথা ঠিক। কিন্তু দেশের বারোয়ারীর যাত্রায়, রাজার টাকা নেওয়া ভারী অন্যায় হয়েছে। ছিঃ—ছিঃ, আরে এটা যে সকলের। এই বারোয়ারী আমার, তোমার, ঐ পাল মশাই, রাজার সকলেরই যে। এতে টাকা নেওয়া ভারী অন্যায় হয়েছে।

রাজা হাতের সিগারেটটা দূরে ফেলিয়া করুণভাবে হাসিল। অন্যায়ই বটে। সবই তাহার অন্যায়। পেট ভরিয়া দুই বেলা খাইতে পায় না, ছেলে মেয়েরা একখানি নূতন কাপড়ের মুখ দেখিতে পায় না, নিজে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, অর্দ্ধাহারে, অসংখ্য পাওনাদারের নিত্য লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়া রাত্রি জাগিয়া পরিশ্রম করিয়া, এই যাত্রা করিয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত কোনদিনই পুরো মাহিনা কপালে জুটিল না, এও তাহার অন্যায়। অথচ চরণ পাল এই যাত্রা দলের কর্ত্তা হইয়া দিন দিন সম্পত্তির উপর সম্পত্তি করিয়া যাইতেছে। দুই হাতে সারি সারি সোনার আংটী, পরিধানে সুন্দর সুন্দর দামী জামা কাপড়। আর সে ও তাহার মত হতভাগ্য অভিনেতারা শুষ্কমুখে, রাতের পর রাত এই অসম্ভব পরিশ্রম করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। লোকে অবশ্য জয়ধ্বনি করে। কিন্তু শুষ্ক জয়ধ্বনিতে, তাহাদের দগ্ধ উদর, তেমনি খাঁ খাঁ করিতে থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য, অর্থ, সবই চরণ পালের বৃহৎ উদরে স্থানলাভ করে। অন্যায় বৈকি—তাহার মত হতভাগ্য দরিদ্রের ও দুর্ব্বলের সবই অন্যায়।

অতি করুণভাবে ম্লান হাসিয়া রাজা, এক পা এক পা করিয়া সাজঘরের পানে চলিল। আসরে নামিবার সময় আসন্ন। কিন্তু রাজা সাজঘরে গেল না। বাহিরেই পায়চারী করিতে লাগিল। কোন সময় আসরে নামিতে হইবে, এ তাহার নখদর্পণে।

মনের ক্রোধকে শান্ত করিবার জন্য, রাজা রাত্রির স্নিগ্ধ হাওয়ায় বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু চিত্তের বিক্ষোভ শান্ত হইল না। লোক দুটীর মন্তব্য, তাহার সারা মনের এক প্রান্ত হইতে, অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত, এক বিষাক্ত ক্রোধের, এক তীব্র ঘৃণাময় জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল।

একজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, একি ঠাকুর মশাই, আপনি এখানে। ওদিকে আপনার যে এখন পার্ট, যান দৌড়ে যান।

শান্তভাবে রাজা বলিল—কোথায়? কোথায় যাব?

লোকটী অবাক হইয়া বলিল, বাঃ আসরে যেতে হ'বে না। সব মাটী হ'ল ঠাকুর মশাই। মন্ত্রী, রাণী, সব গিয়েছে অনেকক্ষণ—যান্—যান্।

—আসরে? ওঃ, আচ্ছা চল—

রাজা আসরে ঢুকিতেই, স্থান কাল ভুলিয়া চরণ পাল ক্ষিপ্তের মত কুৎসিত মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, নবাব সাহেব এলেন। ছ্যাঃ-ছ্যাঃ নাম ডোবালে। বলি, ছিলে কোথায় এতক্ষণ, আগাম টাকা দিয়ে শেষে এই কেলেঙ্কারী।

অগণিতদর্শক হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। কেহ শিয়াল, কুকুরের স্বর নকল করিয়া, ডাকিতে লাগিল, ছেলে মেয়েদের কান্না,—চারিদিকের হাসি, হট্টগোল, রাজার প্রতি কুৎসিত টিট্‌কারী প্রভৃতিতে যাত্রার আসর এক বিরাট মেছো-হাটায় পরিণত হইল।

কে কাহাকে থামায়। সকলেই থামিবার অনুরোধ জানাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে গোলমাল থামিল না, বরং বাড়িতে লাগিল।

রাজা নির্ব্বিকার। গোলমাল ক্রমশঃ থামিয়া গেল, যাত্রা আবার সুরু হইল। কিন্তু যেন প্রাণ নাই, সকলেই যেন নির্জ্জীব পুতুলের মত আড়ষ্টভাবে হাত পা নাড়িয়া যাইতেছে।

রাজা অন্যমনস্ক, কণ্ঠ উঠে না, অভিনয়ে সেই প্রাণস্পর্শী ভাব নাই, সেই দৃপ্ত ভঙ্গিমা, সেই সজীব গতিশীলতা, সব যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে। যে প্রশংসা ও জয়ধ্বনি, এই কিছুক্ষণ আগে, আসরে ধ্বনিত হইতেছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে বারংবার ব্যঙ্গোক্তি, অভদ্র কটু-ভাষা প্রভৃতিতে যাত্রার আসর মুখরিত হইতে লাগিল।

প্রাণহীন ভাবেই যাত্রা চলিতে লাগিল। রাজার এইরূপ অভিনয় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। কি যে কারণ বুঝিলাম না।

যাত্রা দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ সকলে সচকিত হইয়া উঠিল। তৃতীয় অঙ্কের প্রথমেই, রাজার পার্ট। কিন্তু কোথায় রাজা। সকলে চারিদিক খুঁজিতে লাগিল। আসরে, দোকানে, সাজঘরে, বা লোকজনের ভীড়ের মধ্যে কোথাও রাজাকে পাওয়া গেল না। একজন লোক তাহার বাড়িতে ছুটিল।

চরণ পাল উন্মাদের মত গালাগাল সুরু করিয়া দিল, আবার সেই হট্টগোল সুরু হইল। রাজাকে কোথাও পাওয়া গেল না। বাড়ীতেও রাজা নাই, সেই গোলমালের মধ্যে, কাহারা যেন আসরের আলো নিভাইয়া দিল। দারুণ অন্ধকার ও গোলমালের ভিতর যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

আমি আসর ছাড়িয়া বাহিরে আসিলাম।

উদ্বিগ্ন হইয়া বন্ধুদের বলিলাম, কিন্তু রাজা কোথায় গেল?

সকালবেলা একজন চাষী খবর আনিল।

রাজাকে পাওয়া গিয়াছে। কদমবিলের ওপারে, জোড়া বটতলার একটী ডালে, লম্বা চুমকীর কাজ করা, ভেলভেটের সাজ পোষাক গায়ে দিয়া, মাথায় রাজমুকুট, কোষে তরবারী শুদ্ধ রাজা গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে। রাজা রাজবেশ পরিয়াই এপার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইচ্ছাশক্তির সাধনা

যাদুকর শ্রীদেবকুমার ঘোষাল

যুগ যুগ ধরিয়া মানব শক্তিঅর্জ্জনের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। শক্তির বহুবিধ ধারা; তন্মধ্যে ইচ্ছাশক্তিই সকলের উপরে, কেননা একমাত্র এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই দুনিয়ার যাবতীয় শক্তি ও সাফল্যের অধিকারী হওয়া যায়। অথবা এই ইচ্ছাশক্তিই সকল সাধনা—সকল শক্তির মূলে। এই ইচ্ছাশক্তির চরম স্তরে পৌছানোর অর্থই ভগবৎ শক্তি লাভ এবং প্রাচীনকাল হইতে যথার্থ সুধান্বেষী ব্যক্তিগণ অন্য সব ত্যাগ করিয়া এই ইচ্ছাশক্তির সাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

এই ইচ্ছা শক্তির সাধনায় যোগীরা যোগমার্গে, ত্যাগীরা ত্যাগমার্গে যে পন্থা বাছিয়া লন, গৃহীরা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভিতর দিয়াও ঠিক তাহারই অনুশীলন করিয়া থাকেন এবং সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই ইচ্ছাশক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা। এখন যে পন্থা ধরিয়াই হউক এই সাধনা অত্যন্ত উৎকট জিনিষ। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার সম্যক আলোচনা সম্ভব নহে। কর্ম্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা হইতে সামান্য যা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহারই কথঞ্চিৎ এখানে আলোচনা করিব।

ইচ্ছা-শক্তি সাধনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে দুনিয়ায় ফাঁকি দিয়া কোন বড় জিনিষই কখনও লাভ করা যাইতে পারে না। প্রতিটী সাধনাই একান্ত যত্ন ও আয়াসসাধ্য। আমাদের মনোজগতে অহরহ যত কিছু সৃষ্টি হইতেছে, বিচার করিতে গেলে সকলের মূলেই এই ইচ্ছাশক্তি; এক কথায় এই ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন জগতে যেন অন্য কিছুর অস্তিত্বই নাই। আমাদের কাম ক্রোধাদিসম্ভূত আহারনিদ্রা, ইত্যাদি ভোগবৃত্তি ও দয়া দাক্ষিণ্য ক্ষমা, শিষ্টাচারাদি উচ্চপ্রবৃত্তি ইত্যাদি প্রত্যেকের স্ফুরণেই এই ইচ্ছাশক্তি প্রতিপলে কাজ করিতেছে এবং যে পরিমাণে উহা নিয়োগ করিতেছি সেই পরিমাণে উক্ত শক্তির ক্ষয় হইতেছে। এখন ইচ্ছাশক্তি দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে হইলে মনকে ইন্দ্রিয়াধিগম্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া—অন্য সর্ব্ববিধ ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া—একমাত্র বাঞ্ছিত দিকেই উহাকে নিয়োগ করিতে হইবে। আতশী কাচ যেমন সূর্য্য রশ্মিতে ধরিলে বহুমুখী রশ্মিজালে একদিকে মিলিত হওয়ায় দাহিকা শক্তির সৃষ্টি করে, ইচ্ছাশক্তিও তেমনি নানাদিকে ধাবিত না হইয়া যদি একই লক্ষ্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাও তেমনি অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে। অষ্টমবর্ষীয় ঋষিপুত্র যখন পিতৃ অপমানের প্রতিশোধার্থ মহারাজ পরীক্ষিতকে এক সপ্তাহের মধ্যে তক্ষক দংশনের অভিশাপ দিলেন, মহামুনি কপিল যখন ব্রহ্মশাপে সগরবংশ ভস্মস্তূপে পরিণত করিলেন, মহাতপা বিশ্বামিত্র যখন দ্বিতীয় স্বর্গ ও দ্বিতীয় সৃষ্টির অবতারণা করিলেন এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য যে ইচ্ছা মাত্র মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিতেন এ সমস্তই ইচ্ছাশক্তিরই অপূর্ব্ব মহিমা। কৃচ্ছ্র সাধনা দ্বারা মনকে বহির্জগতের সমগ্র বিষয় হইতে নির্লিপ্ত করিয়া কাম ক্রোধাদি সমূলে বিসর্জ্জন দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে সুদীর্ঘ তপস্যার পর এই ইচ্ছাশক্তিকে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়। প্রধানতঃ যে তিনটী উপায়ে আমরা এই সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহাই একটু আলোচনা করা যাক্।

প্রথমতঃ ভক্তির পন্থা—ভগবৎ প্রেম। বিশ্বের সমগ্র শক্তির একমাত্র উৎস সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান। আমাদের ইচ্ছাশক্তিও তাঁহারই অংশ। এই ইচ্ছাশক্তি অন্য কোন দিকে ধাবিত না হইয়া যদি একমাত্র তাঁহাতেই নিয়োজিত হয় তাহা হইলে সেই মহাশক্তির সঙ্গে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া এমন বিচিত্র রূপ ধারণ করে যে তখন তাহার অসাধ্য জগতে আর কিছুই থাকে না। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" এই ভক্তির পথে ভক্ত যে পরিমাণে ইচ্ছাশক্তিকে প্রাণের প্রীতি ও ব্যাকুলতা মাখাইয়া অনন্তমুখী করিতে পারিবেন সিদ্ধি লাভ ও সেই পরিমাণে হইবে। কোন প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক নয়, কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটী প্রত্যক্ষ ঘটনা দ্বারা ইহার সত্যতা একটু দেখান যাইতেছে।

কাণপুরের অদূরবর্ত্তী গঙ্গাতীরে "সিদ্ধবাবা" নামক জনৈক সাধু বাস করিতেন। একটা উঁচু ঢিবির উপরে সাধুকে সর্ব্বদা ধ্যানরত দেখা যাইত। কখনও তাঁহাকে কোথাও যাইতে দেখা যাইত না। এক সময় ঐ স্থানটী বৃটিশ সৈন্যের কৃত্রিম যুদ্ধের (Mock fight) নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হয় এবং কমাণ্ডার সাহেব উক্ত সাধুকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য আদেশ করেন। সাধু একবার মাত্র বলিলেন "আমি ভগবানের উপাসনা করিতেছি—আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিনা।" সাধু যখন কোনমতেই রাজী হইলেন না, কমাণ্ডার তখন বিরক্ত হইয়া ভালমন্দ বিচার না করিয়া ঐ স্থানেই যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কমাণ্ডার সাহেব মনে করিলেন যে সত্য সত্যই যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইবে,তখন সাধু আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে। কিন্তু দেখা গেল যুদ্ধ যখন নিয়মিতভাবে চলিতেছে তখনও সাধু স্থির, নির্ভীকভাবেই উপবিষ্ট আছেন। যদিও বন্দুকের গুলি সাধুর গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা কম ছিল, কিন্তু তথাপি সাধুকে ঐরূপ অবিচলিতভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সাহেবের অত্যন্ত বিস্ময়বোধ হইল এবং সাহেব তখন সৈনিকদিগকে হুকুম দিলেন সাধুর চতুর্দ্দিকে গুলি নিক্ষেপ কর। আশ্চর্য্যের বিষয় সাধু পূর্ব্বের ন্যায়ই স্থির ও অচঞ্চল! সাহেব তখন নিজে বন্দুক ধরিয়া সাধুর চারিদিকে, পরে সাধুর দেহ লক্ষ্য করিয়া অনবরত গুলি ছুড়িতে লাগিলেন। কিন্তু সাধু ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই ধ্যানে নিবিষ্টমনা হইয়া অবিচলিতভাবে বসিয়া আছেন। কমাণ্ডার সাহেব তখন সাধুর পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা চাহিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে সাধুর স্থানে কোনরূপ অশান্তি সৃষ্টি না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভগবানে নির্লিপ্তমনা ব্যক্তির কোন ইচ্ছাই অসম্পূর্ণ থাকিতে পারেনা। আবার প্রেম ও সাধনার তারতম্য হিসাবেই সাধকেরও গুরু লঘু ভেদ হয়, এইজন্যই মহাতপ বিশ্বামিত্রও ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় পন্থা—যোগের পথ। যোগীরা আসন, মুদ্রা, প্রণায়ামাদিদ্বারা মন অর্থাৎ এই ইচ্ছাশক্তিকে এতদূর একাগ্র ও সংযত করিয়া থাকেন যাহাতে তাঁহারা এই সাধনা প্রভাবে এক অসীমশক্তির অধিকারী হন। অতীত যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সেদিন ত্রৈলঙ্গ স্বামী, সাধু হরিদাস, বামা ক্ষেপা ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যোগীগণ যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। জাহাজ হইতে সমুদ্র বক্ষে একখানি তরবারী ফেলিয়া দিয়া আধ ঘণ্টা জাহাজ চলিবার পর হাত বাড়াইয়া সমুদ্র হইতে তরবারী তুলিয়া লওয়া, একই সময়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দুইটী মূর্ত্তি, একটি কলিকাতায় ও অপরটী কাশীধামে দেখিতে পাওয়া, ভক্তের প্রার্থিত দুষ্প্রাপ্য জিনিষ মুহূর্ত্তের মধ্যে উপস্থিত করা ইত্যাদি যে কি শক্তি সাপেক্ষ—তাহা শক্তিহীন, সাধনাহীন আমরা, আমাদের ধারণা করিবারও ক্ষমতা নাই।

তারপর তৃতীয় পথ—কর্ম্মের। গৃহীগণ গৃহে বসিয়া সাংসারিক কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়াও এই সিদ্ধিই লাভ করিয়া থাকেন। প্রকৃত গৃহী যখন গীতোক্ত গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া অনাসক্তভাবে সকল কর্ত্তব্য

করিয়া যান তখন তাঁহার ভিতর দিয়াও ইচ্ছাশক্তির যে এই অতুলনীয় প্রভাবই দৃষ্ট হয় নিম্নে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

মাণ্ডব্য মুনি ত্রিশূলের উপর বসিয়া যখন একান্ত মনে উপাসনা করিতেছিলেন তখন পরমা সতী প্রজ্ঞা তাঁহার কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে শৌণ্ডিকালয় হইতে কাঁধের উপরে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নিশীথ রাত্রি—অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া প্রজ্ঞা স্বামীসহ মাণ্ডব্য মুনির উপর পড়িয়া গেলেন। মুনি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রজ্ঞাকে শাপ দিলেন—'তুই যে স্বামীর জন্ত আমার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইলি রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তোর সেই স্বামীর মৃত্যু হইবে।"

প্রজ্ঞা মুনির পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ঐ নিদারুণ অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুনি কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। নিরুপায় হইয়া প্রজ্ঞা তখন মুনিকে বলিলেন— "ঠাকুর আমি যদি সতী হই, এবং অনন্যমনে পতিসেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার স্বামীর কিছুই হইবে না—এরাত্রিও প্রভাত হইবেনা"। তাহাই ঘটিল, সূর্য্য-সংক্রমণ স্তম্ভিত—রাত্রি আর প্রভাত হয়না। শেষে দেবতারা সকলে একত্রে প্রজ্ঞার নিকট আসিয়া, স্বামীর পরলোকগমনের পরিবর্ত্তে স্বামীর শত বর্ষ পরমায়ু,—দিব্যকান্তি ইত্যাদি প্রদানে প্রতিশ্রুতি দিলে প্রজ্ঞা তখন নিজ বাক্য প্রত্যাহার করেন। নিষ্ঠাবান্ গৃহী সমগ্র ইচ্ছাশক্তি ভগবানে আরোপ করিয়া যাবতীয় কাজ তাঁহারা কাজ মনে করিয়া অনাসক্তভাবে যে সমস্ত কাজ করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে বহুমুখী মনে হইলেও কার্য্যতঃ একমুখীই হইয়া থাকে এবং এই নিষ্ঠাদ্বারাই তিনি তখন অনন্তশক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। ইহা দার্শনিক সত্য—ইহাতে প্রশ্নের কিছুই নাই।

এইবার এই ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মানব মন মুহূর্ত্তের জন্ত শূন্য থাকিতে পারে না। "mind is a tabula rasa"—প্রতি-নিয়ত চিন্তাধারা আমাদের মনোজগতে কাজ করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ দিকে উহা ধাবিত হইতেছে। প্রতি চিন্তার অর্থই কিছু না কিছু ইচ্ছাশক্তি; সুতরাং এলোমেলো বাজে চিন্তা কুচিন্তা—কুকথা ইত্যাদি সর্ব্বদাই আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে নষ্ট করিতেছে। এইরূপে দিনদিন আমরা মানসিক বল হারাইয়া ফেলিতেছি। গৃহী আমরা, আমরা যদিও ভগবানে বা কোন একটামাত্র লক্ষ্যে সমস্ত শক্তি সর্ব্বদা নিয়োগ করিতে পারি না, তথাপি আমাদের স্ব স্ব জীবনের আদর্শানুযায়ী লক্ষ্য-সমূহ ঠিক করিয়া শুধু সেই দিকেই যাহাতে ইচ্ছাশক্তি নিয়োজিত হয় ইহাই সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা দরকার। মানব মন যত সুন্দরই প্রতীয়মান হউক, নরকের বীভৎস জঞ্জালে পরিপূর্ণ, ইহা প্রামাণিক সত্য। চিন্তারাশি এত বিশৃঙ্খল ও দুর্দ্দমনীয়ভাবে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে যে ইহাকে সংযত করিয়া স্ব স্ব লক্ষ্য স্থির রাখা যে কতদূর আয়াসসাধ্য তাহা এক ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহই বুঝিবেন না। অথচ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অসাধ্য সাধন দূরে থাকুক সাধারণভাবে মানুষ হইতে হইলেও এই ভাবেই সাধনা করিতে হইবে। জগতের মনীষীদের প্রত্যেকের জীবনই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রিয়তমাসু

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

বাতাবী লেবুর বনে বাতাসের হু-হু স্বনে
ঝর্‌ঝর্‌ ঝংকার বাজ্‌ছে!
কোথায় অনেক দূরে বিবাগী করুণ সুরে
একটা রাতের পাখী ডাক্‌ছে !!
আর সব নিঃঝুম, আমারি গো নাই ঘুম:
একেলা বন্দীশালে জাগ্‌ছি !
আকাশে মহুয়া-চাঁদ পেতেছে রেশমী-ফাঁদ:
অকারণে তাই ব'সে কাঁদ্‌ছি !!
নমিতা গো হায়, হায়—কত রাত ব'য়ে যায়
রঙীন স্বপনে বুনে এম্‌নি !
পাখী ওড়ে, দিন ওড়ে: সময়ের চাকা ঘোরে—
তুমি কি গো আজো আছো তেম্‌নি ?
এই সব মধুরাতে থম্‌থ'মে জো'ছ'নাতে
তোমারো কি ওঠে মন আকুলি ?

দু'চোখেতে নামে ঢল্: টলোমল্ টলোমল্—
ব্যথায় পাথার ওঠে দোদুলি' ?
চূর্ণির কালোজলে জাগে যবে ঝল্‌ম'লে
মেঘ-রাঙা ছায়া-নীল সন্ধ্যা—
একা বসি বাতায়নে থাকো নাকি আন্‌মনে:
বুকে জলে হু-হু আশা বন্ধ্যা !
নমিতা গো হায়, হায়—কত রাত ব'য়ে যায়
স্বপনের জাল বুনে এম্‌নি !
পাখী ওড়ে, দিন ওড়ে সময়ের চাকা ঘোরে—
তুমি কি গো আজো আছো তেম্‌নি ?
বন্দীশালার দ্বারে আজ আসে বারে বারে
বাতাবী ফুলের তাজা গন্ধ !
অশ্রুর বরিষায় তাই মন ভেসে যায়:
গেঁথে যাই এলোমেলো ছন্দ !

এক—দো—তিন

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বি-টি

গাড়ীখানা শুধু মেয়েলোক, বৃদ্ধ ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েতে বোঝাই; সক্ষম দেহ কেহ নাই বলিলেও চলে। এক প্রৌঢ় সৈনিকের পাশে বসিয়া একজন স্ত্রীলোক—দেখিলেই দুর্ব্বল ও অসুস্থ মনে হয়। চোখ বুজিয়া সে আপন মনে গুণিতেছে—'এক, দো, তিন'; কখনও বা টানিয়া টানিয়া বলিতেছে—এক—দো—তিন। ও পাশের বেঞ্চের মেয়ে দুইটি সে কথা বলাবলি করিতেছিল। এক বুড়া ভদ্রলোক সে দিকে চাহিতে সবাই চুপ করিল।

একটু পরে স্ত্রীলোকটি মিলিটারী কায়দায় বলিয়া উঠিল—'এক! দো! তিন!' চারিদিকে একটা খিল্ খিল্ হাসির শব্দ শুনা গেল।

সৈনিক পুরুষ দাঁড়াইয়া বলিলেন 'দয়া করিয়া আমার কথাটি শুনুন। গত সপ্তাহে আমাদের তিনটি ছেলেই যুদ্ধে মারা গিয়াছে, কাল রওনা হইবার পূর্ব্বে এঁকে পাগলা গারদে রাখিতে যাইতেছি।'

নিস্তব্ধ রাত্রির মধ্যে গাড়ী চলিতেছে। "এক—দো—তিন"।

বিদেশী গল্পের ছায়ায়
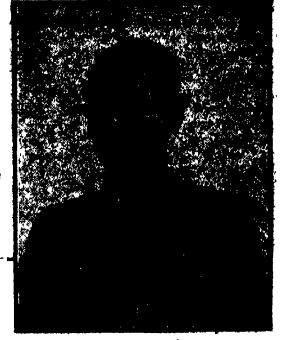
শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল খেলা ঃ

ফুটবল খেলাকে বাঙ্গালার জাতীয় খেলা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাঙ্গালা দেশেই ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের থেকে বেশী। কিন্তু একটা অভিযোগ শুনা যাচ্ছে বাঙ্গালা দেশের ফুটবল খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নাকি পূর্ব্বের তুলনায় অনেকখানি পড়ে গেছে। এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। খেলা-ধূলায় বাঙ্গালী তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহ কমে গেছে। উপযুক্ত সুযোগের অভাবে বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা মাঠ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের স্থান পূরণ করছে অবাঙ্গালী আধাপেশাদার খেলোয়াড়রা। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, অনুশীলনের অভাব এবং সর্ব্বোপরি একনিষ্ঠার অভাব থাকায় খেলার কোন উন্নতি হচ্ছে না। ভারতীয় ফুটবল প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত সহযোগিতা না থাকলে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডকে উন্নত করা কোনদিনই সম্ভবপর হবে না। উপযুক্ত ফুটবল শিক্ষকের শিক্ষাধীনে রেখে উৎসাহী খেলোয়াড়দের অনুশীলনের ব্যবস্থা করা প্রতিষ্ঠাবান ক্লাবগুলির পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু খেলোয়াড় তৈরী করার থেকে, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খেলোয়াড় আমদানী করার উৎসাহ তাদের পেয়ে বসেছে। এদিকে খেলোয়াড় তৈরীর ব্যবস্থা না থাকায় ভাল খেলোয়াড় পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ভাল খেলোয়াড় হতে গেলে বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ফুটবল খেলার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। 'ভারতবর্ষ' মারফৎ বৈদেশিক ফুটবল শিক্ষক এবং খেলোয়াড়দের অবলম্বিত ফুটবল খেলার পদ্ধতিগুলি সহজভাবে আলোচনা করা যাবে। উৎসাহী খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীদের কাছে এইগুলি সমাদর লাভ করবে বলেই আশা করি।

ফুটবল খেলায় আক্রমণ ভাগ ঃ

ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়দের দুটি উদ্দেশ্য থাকে। প্রথমত যতগুলি সম্ভব বিপক্ষদলকে গোল দিয়ে দলকে অগ্রগামী রাখা এবং দ্বিতীয়ত বিপক্ষদল যাতে গোল দিতে না পারে তার জন্য তাদের বাধা দান করা। তবে উভয় ক্ষেত্রেই খেলোয়াড়রা ফুটবল খেলার প্রচলিত আইন পালন করতে বাধ্য। অযথা শারীরিক শক্তিপ্রয়োগে খেলার আইন অমান্য ক'রে গোল দিতে পারে না। উভয় দলের এই গোলদানের তারতম্যের উপরই খেলার জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় এবং খেলার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত যে দল বিপক্ষদল অপেক্ষা অধিক গোলের ব্যবধানে অগ্রগামী থাকে সেই দলই বিজয়ীর সম্মান পায়। বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির উপর খেলাধূলা প্রতিষ্ঠিত না হলে তা মোটেই দর্শনীয় হয় না এবং খেলোয়াড়রাও সেই ধরণের খেলাতে বিশেষ আনন্দ পায় না। যে শ্রেণীর খেলা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির উপর বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই জাতীয় খেলাগুলির জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশী। বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির অভাবে খেলায় উৎকর্ষতা লাভ হয় না। তাছাড়া খেলায় প্রাধান্য লাভের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা আছে। জয়লাভের উদ্দেশ্যেই ফুটবল খেলাকে দু'ভাগ করা হয়েছে। তারা যথাক্রমে (১) আক্রমণ ভাগ এবং (২) রক্ষণভাগ।

এই আক্রমণ ভাগের খেলাকেই ফুটবল খেলার প্রধান অঙ্গ বলা চলে। (১) সেণ্টার ফরওয়ার্ড (২) লেফট ইন্ (৩) রাইট ইন্ (৪) লেফট আউট ও (৫) রাইট আউট এই পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে আক্রমণ ভাগ গঠিত। এই পাঁচজন ফরওয়ার্ড পরস্পরের সহযোগিতায় বিপক্ষদলের গোল সম্মুখে আক্রমণ ব্যূহ রচনা ক'রে গোল দিতে চেষ্টা করে। খেলায় যোগদানকারী মোট এগার জনের মধ্যে বাকি ছয়জন খেলোয়াড় থাকে রক্ষণ ভাগে। তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে বিপক্ষদলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের বাধা দেওয়া যাতে তারা গোলদেবার সুযোগ না পায়। এ ছাড়াও রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা দলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের যথাযথভাবে বল সরবরাহ ক'রে গোল দেবার সুযোগ সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন একটি দল বিপক্ষদল অপেক্ষা দুর্ব্বল আক্রমণ ভাগ নিয়ে খেলায় জয়লাভ করতে পারে না সে দলের রক্ষণভাগ যতই শক্তিশালী হউক না কেন। বিপক্ষদলের আক্রমণ থেকে রক্ষণভাগ রক্ষার প্রধানতম পদ্ধতি হচ্ছে বিপক্ষদলকে আক্রমণ ক'রে বিপর্য্যস্ত করা। আর সে আক্রমণ যত অতর্কিত হবে তত হবে শক্তিশালী ও কার্য্যকরী।

খেলার সূচনা থেকেই বিপক্ষদলকে আক্রমণ করতে হবে। এবং এই আক্রমণের ধারা খেলার শেষ সময় পর্য্যন্ত যাতে সমান থাকে সে বিষয়ে খেলোয়াড়দের সদাই দৃষ্টি রাখতে হবে। এই কৌশল অবলম্বনে দেখা যাবে বিপক্ষদল আত্মরক্ষায় এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা সুশৃঙ্খলভাবে আক্রমণ চালাতে পারছে না। ফলে এ দিকের রক্ষণভাগের উপর চাপ খুব কম পড়বে। খেলায় যত কম চাপ পড়বে ততই খেলায় প্রাধান্য লাভের পক্ষে তাদের সুবিধা হবে সব থেকে বেশী।

এই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হ'ল আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের খেলার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা। আক্রমণের পদ্ধতির মধ্যে অতর্কিত আক্রমণের গুরুত্বই সব থেকে বেশী। বিভিন্ন দেশের ফুটবল খেলার পদ্ধতি আলোচনা ক'রে দেখা গেছে সহস্রাধিক পদ্ধতিতে খেলোয়াড়রা গোল দিতে পারে। সুতরাং খেলোয়াড়রা নিয়মিতভাবে একই ধরণের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে যেন বিপক্ষ দলের গোলের সামনে উপস্থিত না হয়। একই ধরণের আক্রমণ কৌশল ব্যবহার করলে বিপক্ষ পূর্ব্ব থেকেই সাবধান হয়ে সেই আক্রমণ ব্যর্থ করতে পারবে। কিন্তু আক্রমণভাগের বিভিন্ন আক্রমণ পদ্ধতি ব্যর্থ করা সম্ভবপর নয়। কোন না কোন সময়ে তারা পরাজয় স্বীকার করবেই। বিপক্ষ দলের রক্ষণভাগকে বিপর্য্যস্ত করতে হলে বিভিন্ন আক্রমণ কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন এবং বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের অনুমানের পূর্ব্বেই আক্রমণ

পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করতে হবে। খেলার সর্ব্বক্ষণ মাঠের চারপাশে বলের উপর দৃষ্টি রেখে খেলা উচিত। প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলোয়াড়রা কখনও তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে খেলার ফলাফল দেখে না। তারা জানে কখন স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয় এবং যেখানেই সুযোগ আবির্ভাব হবে সেইখানেই উপস্থিত হয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। খেলায় জয়লাভ করাই খেলোয়াড়দের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কেননা খেলায় অমীমাংসিত ফলাফলের উপর খেলোয়াড় কিম্বা দর্শকের কেউ আনন্দ পায় না।

এবার ফুটবল মাঠে আসা যাক। একটি শক্তিশালী ফুটবল দলের শিক্ষিত আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা কি পদ্ধতিতে খেলার সূচনা থেকে বিপক্ষ দলের গোল অভিমুখে অগ্রসর হয় তার বর্ণনা করি।

খেলার সূচনা : ফুটবল খেলার নিয়ম অনুসারে সেণ্টার ফরওয়ার্ডকে দিয়েই খেলার সূচনা হবে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড তার দুপাশের যে কোন একজন ইনসাইড ফরওয়ার্ডকে (Inside forward) সর্ট পাশ দিয়ে খেলার সূচনা করবে। ইনসাইড খেলোয়াড় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের কাটিয়ে কয়েক গজ বলটিকে ড্রিবল করে নিয়ে যাবার পর যখন দেখবে বিপক্ষ দল তাকে বাধা দেবার জন্যে খুবই নিকটবর্ত্তী হয়েছে তখন বলটিকে এগিয়ে দেবে নিজ দলের যে কোন উইং হাফকে। কিন্তু অনেক সময় উইংহাফের স্থান হচ্ছে আউট ও ইনসাইড ফরওয়ার্ডদের মাঝখানে। কেবলমাত্র খেলার সূচনাতেই দুজন উইংহাফ অতিরিক্ত ফরওয়ার্ডের খেলা খেলবে। উইংহাফ বলটি নিয়ে কি করে দেখা যাক। বলটি পেয়ে ড্রিবল করতে করতে সে ক্রমশঃ এগিয়ে যাবে দলের খেলোয়াড়কে ভাল রকমের বল পাশ করবার জন্যে। কিন্তু যদি বিপক্ষ দলের উইংহাফ তাকে বাধা দিতে আসে তাহলে তার উচিত আর অগ্রসর না হওয়া। সে বলটি পাশ করবে দলের আউট সাইড খেলোয়াড়কে আউট সাইড খেলোয়াড় পাশের জন্য পূর্ব্ব থেকেই প্রস্তুত থাকবে ; এবং আউট সাইড খেলোয়াড় বলটি পেয়ে টাচ লাইনের পাশ দিয়ে ছুটে যাবে তারপর গোলের মুখ লক্ষ্য করে বলটি সর্ট করবে যাতে ক'রে ইনসাইড খেলোয়াড়রা হেড দিয়ে গোল দিতে পারে। খেলার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সেণ্টার ফরওয়ার্ড বলটি থ্রু পাশ (through pass) দিলে গোল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ উপরিলিখিত পদ্ধতিতেই খেলার সূচনা করা হয়।

বল আদান প্রদানের সময় সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কোথায় অবস্থান করছে। লক্ষ্য রাখতে গিয়ে কখনও বেশী সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পাশ দিতে বিলম্ব করলে বিপক্ষ দল ঠিক ঠিক স্থানে খেলোয়াড় মোতায়েন করে আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। ফলে খেলার মোড় যাবে ঘুরে। সুতরাং সূচনাতেই আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কোথায় অবস্থান করছে। তাদের অবস্থানের পদ্ধতি দেখেই আক্রমণের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যদি দেখা যায় বিপক্ষ দলের ব্যাক দুজন দাঁড়িয়েছে স্কোয়ারভাবে, অনেকখানি দূরত্ব রেখে তাহ'লে সেণ্টার ফরওয়ার্ড প্রথম বলটি পাশ করেই 'থ্রু পাশ'-এর জন্য দুজন ব্যাকের ব্যবধানের নিরাপদ পথ দিয়েই দ্রুতবেগে অগ্রসর হবে। এদিকে ইনসাইড ফরওয়ার্ড বলটিকে দিবে নিজ দলের সেণ্টার হাফকে। কিছুমাত্র বিলম্ব না করে সেণ্টার হাফের কাজ হচ্ছে বিপক্ষ দলের গোলের দিকে বলটিকে এগিয়ে দেওয়া। ব্যাক দু'জন কাছাকাছি আসবার পূর্ব্বেই সেণ্টার ফরওয়ার্ড তাদের মধ্যে দিয়ে সবেগে এগিয়ে গিয়ে গোল করবে।

কিন্তু যখন দেখা যাবে ব্যাক দুজন দাঁড়িয়েছে কাছাকাছি মাঠের প্রায় মাঝামাঝি তখন এ পদ্ধতি অচল হবে। এই অবস্থায় 'উইং ম্যান'কে দিয়ে খেলানো কার্য্যকরী। ধরা যাক, সেণ্টার ফরওয়ার্ড তার শ্রেষ্ঠ সহযোগি বামদিকের ইনসাইড ফরওয়ার্ডকে বলটি পাশ করে খেলার সূচনা করলো। বলটি পেয়েই কোন বিলম্ব না করে সেকেণ্ড টাচ-এ বলটিকে পাশ দিবে বিপরীত কর্ণায় ফ্ল্যাগের দিকে নিজ দলের রাইট আউট সাইড ফরওয়ার্ডকে। সামনে কোন বাধা উপস্থিত হলে বলটি সেণ্টার হাফকে পিছনে পাশ করা উচিত যাতে করে সে যথাস্থানে বলটিকে নিরাপদে পাশ করতে পারে।

রাইট আউট সাইড খেলোয়াড় যদি নির্ভুল পাস পায় তাহলে ব্যাক তাকে বাধা দেবার পূর্ব্বেই সে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে নিকট দূরত্ব থেকে গোলের মুখে বলটি সেণ্টার করবে। অথবা সে কিছুদূর বলটি 'ড্রিবল' করে নিয়ে গিয়ে ইনসাইড ফরওয়ার্ডদের থ্রু পাশ দিতে পারে। উভয়-দলের খেলোয়াড়দের অবস্থান (Position) দেখে সে এই দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটিকে নিতে পারে। তা নাহলে আক্রমণ ব্যর্থ হবে। খেলার সূচনায় আর এক আক্রমণ পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যায়। এই পদ্ধতিতে সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং দু'জন ইনসাইড ফরওয়ার্ড মোট তিনজনে পরস্পর বল আদান প্রদান করে বিপক্ষদলের গোল অভিমুখে অগ্রসর হয়ে অব্যর্থ গোলের সন্ধান করতে পারে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই এই পদ্ধতি কার্য্যকরী হয় না। কর্দ্দমাক্তমাঠে এই পদ্ধতি একেবারে অচল। তাছাড়া নির্ভুল আদান প্রদানে অভ্যস্ত না থাকলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে যাওয়া ঠিক নয়, বার বার বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের কাছে পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুকনো মাঠ থাকলে এবং খেলোয়াড়রা যদি নির্ভুল 'পাশিং'-এ অভ্যস্ত থাকে তাহলে উপরিলিখিত পদ্ধতিটি বিশেষ কার্য্যকরী হবে।

ফুটবল খেলায় ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের ঝটিকাবাহী সৈন্যদলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। আক্রমণভাগের সকলেই হবে দ্রুতগামী শক্তিশালী কৌশলী খেলোয়াড়। বিপক্ষদলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের শক্তি এবং দুর্ব্বলতা আবিষ্কার করে সেই অনুযায়ী খেলার ধারা অবলম্বন করবার দ্রুত কর্ম্মদক্ষতা অগ্রগামী খেলোয়াড়দের অবশ্য থাকা উচিত। ফুটবল খেলায় জয়লাভের ষোল আনা সম্মান আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের প্রাপ্য। এ সম্মান খেলার মাঠেই শেষ নয়। মাঠের বাইরে—চায়ের টেবিলে এবং সান্ধ্য বৈঠক গোলদাতার অপূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যে মুখরিত হয়ে উঠে। সংবাদপত্রে খেলার সংবাদ পরিবেশনের প্রথমেই গোলদাতার নাম স্থান পায়। ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়দের প্রধান কাজ হচ্ছে বিপক্ষদলকে গোল দেওয়া। এই গোল দেওয়া কিম্বা না দিতে পারার উপরই অগ্রগামী খেলোয়াড়দের খেলার বিচার করা হয়। সাধারণভাবে বিচার করলে খেলোয়াড়ের খেলা যতই খারাপ হউক না কেন তার যদি গোল দেওয়ার নিয়মিত অভ্যাস থাকে তাহলে সেই রকম খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করতে কোন দলই অনিচ্ছুক হবে না।

আক্রমণভাগের খেলা সম্বন্ধে এবং আক্রমণভাগের পাঁচজন খেলোয়াড়-দের খেলার রীতিনীতি সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা ধারাবাহিকভাবে করা যাবে।

বাইটন কাপ ঃ

বি এন রেলওয়ে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের কাপ বিজয়ী রেঞ্জার্স'কে ৩—১ গোলে পরাজিত করে ১৯৪০ সালের কাপ বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে রেলদলের তৃতীয় বিজয়। ১৯৩৭ ও ১৯৩৯ সালেও রেলদল উক্ত কাপ বিজয়ী হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হকি খেলায় রেলদলের যথেষ্ট সুনাম আছে। এই দলটি বহুদিন থেকেই আলোচ্য প্রতিযোগিতায় নিয়মিত যোগদান করে আসছে। এ পর্য্যন্ত রেলদল আটবার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয় এবং পাঁচবার পরাজিত হয়ে তিনবার বিজয়ী হয়েছে। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় কাষ্টমসদলের রেকর্ড সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কাষ্টমস মোট এগার বার কাপ পেয়েছে। উপর্য্যুপরি কাপ বিজয়ের রেকর্ডও তাদের। কাষ্টমস ১৯০৮—১৯১০

এবং ১৯৩০—৩২ সালে উপর্য্যুপরি তিনবার করে বাইটন কাপ পায়। এ রেকর্ড এখনও আছে। বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার এবারের বিজিত রেঞ্জার্স দল মোট সাত বার কাপ বিজয়ী হয়েছে। ১৮৯৯ সালে তারা প্রথম কাপ বিজয়ী হয়।

এবারের ফাইনাল খেলাটিকে খুব বেশী উচ্চাঙ্গের বলা চলে না। একমাত্র জয়লাভ করাটাই যেন উভয় দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফলে উভয় দলকেই খেলায় যথেষ্ট নিয়মভঙ্গ করতে দেখা যায়।

প্রথমার্দ্ধে খেলার আঠার মিনিটে রেলদলের আর কার লেননের কাছ থেকে বল পেয়ে প্রথম গোল এক গোলে অগ্রগামী হয়। এই গোলটি সম্বন্ধে দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দেয়। অনেকেই বলেন, বলটি গোলে মারবার পূর্ব্বে কার হাত দিয়ে বলটি থামিয়ে ছিলেন, এর জন্ম তাঁকে প্রথমে শাস্তি দেওয়া আম্পয়ারের উচিত ছিলো। যাই হউক রেঞ্জার্সের টৌওম রবার্টসনের কাছ থেকে বল পেয়ে গোলটি শোধ করে দেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন পক্ষে আর গোল না হওয়ায় অতিরিক্ত সময় খেলান হয়। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কার দ্বিতীয় গোলটি করেন। শেষ গোলটি দেন গ্লাকেন।

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতির দরুণ বিখ্যাত বাইটন হকি কাপ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালার বাইরে থেকে নামকরা দল যোগ দেয়নি। ভগবন্ত ক্লাব, লাহোর ওয়াই এম সি ও দিল্লী এসোসিয়েসন নাম দিয়াও শেষ পর্য্যন্ত আসে নি। এ সমস্ত কারণে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অন্যান্য বছরের মত যেমন উন্নত হয়নি তেমনি খেলায় দর্শকদের আকর্ষণও খুব বেশী ছিল না। প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে একদিকে বি এন আর 'এ' ও বি জি প্রেস এবং অপর দিকে রেঞ্জার্স ও জি আই পি রেলদলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। ফাইনালে রেঞ্জার্স ও বি এন আর 'এ' প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ ঃ

গ্রিয়ার স্পোর্টিং ১—০ গোলে মহামেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে লক্ষ্মীবিলাস কাপ বিজয়ী হয়েছে।

ক্যালকাটা হকি লীগ ঃ

ক্যালকাটা হকি লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলা শেষ হয়েছে। প্রথম বিভাগে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রেঞ্জার্স ক্লাব। রানার্স আপ হয়েছে পোর্ট কমিশনার্স। দ্বিতীয় বিভাগের হকি লীগ তালিকায় শীর্ষ স্থান পেয়েছে ভবানীপুর ক্লাব। দ্বিতীয় স্থানে আছে কলেজিয়ান্স। উভয়ের মধ্যে মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধান। তৃতীয় বিভাগে ডক্স ডিপার্টমেন্ট লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে।

ফুটবল লীগ ঃ

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। বাঙ্গালা দেশের ফুটবল মরশুম আবার আরম্ভ হয়েছে। গত বছর যে অনিশ্চিয়তার মেঘ ফুটবল মরশুমকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো তা এখনও মুক্ত হয়নি, দর্শকদের মন এবারও আতঙ্কিত হয়ে আছে বুঝি বা ফুটবল লীগ শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে না যায়। যাই হউক ক্যালকাটা ফুটবল লীগের বিভিন্ন বিভাগের কয়েকটি খেলা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। সূচনা মন্দ হয়নি। অন্যান্য বারের মত এবারও ফুটবল খেলোয়াড়দের দল পরিবর্ত্তন করবার হিড়িক কিছুমাত্র কম ছিল না। বিভিন্ন ক্লাবের পরিচালকমণ্ডলী নিজ নিজ দলের সুনাম রক্ষার জন্ম শক্তিশালী খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। লীগচ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় গোলরক্ষক ডি সেন ও অজিত নন্দীকে পুনরায় ফিরে পেয়েছে। এদিকে তাদের সেণ্টার হাফ আমিন এরিয়ান্স ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের নামকরা কয়েকজন খেলোয়াড়কে এখনও দলের হয়ে মাঠে অবতীর্ণ হ'তে দেখা যায় নি। মোহনবাগান ক্লাব গত বছরের থেকে কিছু দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এই দলের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় বিভিন্ন ক্লাবে যোগদান করেছেন। আক্রমণ ভাগে সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং রক্ষণভাগে সেণ্টার হাফ সমস্যা এবারও থেকে যাবে।

ভবানীপুর ক্লাব দল হিসাবে এবার বেশ শক্তিশালী হয়েছে। মোহনবাগানের নীলু মুখার্জি ও এস ঘোষ, বি এণ্ড রেলদলের বি কর, ইষ্টবেঙ্গলের মোজাম্মেল এই দলে যোগদান করেছেন।

এরিয়ান্স ক্লাব এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় আমদানী ক'রে দলকে পুষ্ট করেছেন। রেঞ্জার্স ক্লাবের জি লামসডেন, ইষ্টবেঙ্গলের আমিন ভবানীপুরের খালেক এই দলে সহযোগিতা করবেন। বাকী ভারতীয় দলগুলি নিজদের সামর্থ্য অনুযায়ী তরুণ খেলোয়াড় সংগ্রহ ক'রে দলের সমর্থকদের খুশী রাখতে চেষ্টা করেছেন। লীগতালিকায় ইউরোপীয় দলের অবস্থা খুব আশাপ্রদ নয়। সৈন্তদল থেকে ক্যালকাটা ক্লাব নাকি কয়েকজন শক্তিশালী ফুটবল খেলোয়াড়দের সহযোগিতা লাভ করবে। হয়ত বা লীগ তালিকায় একটা বিশিষ্ট স্থানে ক্যালকাটা ক্লাবের নাম খুঁজে পাওয়া যাবে এমন অভিমতও প্রকাশ করতে ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে শুনা যাচ্ছে। আমরা লীগ খেলার শেষ ফলাফলের অপেক্ষায় রইলাম।

পরলোকে রিচার্ড সিয়ার্স ঃ

আমেরিকার বিখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় রিচার্ড সিয়ার্স ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। রিচার্ড সিয়ার্স আমেরিকান ন্যাশনাল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার প্রথম বছরেই বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন এবং ১৮৮৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ডবলসেও সিয়ার্সের যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৮৮২-১৮৮৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি বিজয়ীর সম্মান পেয়ে এসেছিলেন। উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করে প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছিলেন। টেনিস মহল রিচার্ড সিয়ার্সের মত একজন খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড়কে চিরদিনের মত হারিয়ে সত্যই শোকাভিভূত হয়েছে।

অন্যান্য হকি খেলার ফলাফল ঃ

কাইভান কাপ ঃ

বিজয়ী—ক্যালকাটা রেঞ্জার্স 'বি'। রানার্স আপ—সেণ্ট টমাস।

স্যার আশুতোষ চৌধুরী মেমোরিয়াল কাপ ঃ

বিজয়ী—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ। রানার্স আপ—প্রেসিডেন্সি।

বেঙ্গল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ঃ

বিজয়ী—ক্যালকাটা পুলিস ক্লাব। রানার্স আপ—বি এন আর।

কল্যাণ শীল্ড ঃ

বিজয়ী—সেণ্ট জোসেফ। রানার্স আপ—পোর্ট কমিশনার্স।

জেলা ভলিবল প্রতিযোগিতা ঃ

বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশন পরিচালিত প্রথম বার্ষিক জেলা ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে হুগলী জেলা দল ২-১ গেমে কলিকাতা দলকে পরাজিত ক'রে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।

গ্যারিসন থিয়েটারের অনুষ্ঠান

গ্যারিসন থিয়েটারের অনুষ্ঠানে সাতটী বিভাগীয় প্রতিযোগিতা হয়। এই সাতটীর মধ্যে গোরাদল চারটীতে ও বাঙালীদল

ভিমটীতে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। গোরাদল ১১—১০ পয়েণ্টে অর্থাৎ মাত্র এক পয়েণ্টে বাঙালী দলকে পরাজিত করিয়াছেন।

বিজয়ী	বিজিত
ফেদার ওয়েট	
বি, লাল (S. C. B. A)	গিওলো (Army)
লাইট ওয়েট	
ম্যাককেষ (Army)	বি, ঘোষ (S. C. B. A)
ফ্লাই ওয়েট	
সন্তোষ আইচ রায় (S. C. B. A)	কুলসন (Army)
ব্যাণ্টম ওয়েট	
ব্যালিচুও (Army)	পি, সেন (S. P. B. A)
মিডল ওয়েট	
সার্জেণ্ট ওয়াল (Army)	বি, এন,রায় (Roy's Gymhasium)
লাইট হেভী ওয়েট	
শচীন বসু (S. C. B. A)	রবার্টস (Army)
ওয়েণ্টার ওয়েট	
সার্জেণ্ট হ্যারিসন (Army)	পি, কে, দে (B. & A. Railway)

সিন্ধু লন টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

সিন্ধুলন টেনিস প্রতিযোগিতায় ফাইনালে ইফতিকার আমেদ তিনটি বিভাগে বিজয়ী হ'য়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইফতিকার আমেদ ভারতীয় লন টেনিস ক্রম পর্য্যায় তালিকায় গত বৎসর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ঘস্ মহম্মদ যোগদান করেননি। হল সার্কে'স নামে আমেরিকার একজন নামজাদা টেনিস খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে তাঁর খ্যাতির খবরে আমরা ভেবেছিলাম তিনি প্রতিযোগিতায় অনায়াসে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন কিন্তু সেমিফাইনাল খেলায় বাঙলার তরুণ খেলোয়াড় দিলীপ বসুর কাছে পরাজিত হ'য়ে ক্রীড়ামোদীদের হতাশ করেছিলেন।

ফলাফল ঃ

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ইফতিকার আমেদ ৬-১, ৬-২ গেমে দিলীপ বসুকে পরাজিত করেছেন।

ডবলসের ফাইনালে ইফতিকার আমেদ ও দিলীপ বসু ৬-১, ৬-৪ গেমে সি ক্রেজার ও হল সার্কে'সকে পরাজিত করেছেন।

মিডল ডবলসে ইফতিকার আমেদ ও মিস এম পি ডুকস ৬-১, ৬-২ গেমে হ্যানা ও মিস দেলমাকে পরাজিত করেছেন।

ঘস মহম্মদ পরাজিত ঃ

রিফারেম ক্লাব টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গল ফাইনালে ইফতিকার ৬-৩, ৬-১, ৬-৩ গেমে ষ্ট্রেট সেটে ঘস মহম্মদকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনুদিত কাব্যগ্রন্থ "কুমার সম্ভব"—৩৲
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "সাঁঝের প্রদীপ"—২৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "দস্যু মোহন"—২৲
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "মানুষ আর প্রেম"—১৲
কালীশ মুখোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "রহস্যময়ী গ্রিটা গার্বো"—১৲
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত শিশু-উপন্যাস "ওপারের দূত"- ৸৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "বীরত্বের রাজটীকা"—১।৹
গোকুল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ভুল বোঝা"—১।৹
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দ মন্দির" (৬ষ্ঠ বর্ত্তিকা)—১॥৹
বনফুল প্রণীত উপন্যাস "জঙ্গম" (প্রথম অধ্যায়)—৩৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "দ্বাদশ সূর্য্য"—১।৹
শ্রীবিপিনবিহারী জ্যোতিঃশাস্ত্রী প্রণীত "নবগ্রহ পঞ্জিকা"—৸৹
মৈত্রেয়ী দেবী প্রণীত জীবন-কথা "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"—৩॥৹
হুমায়ুন কবীর প্রণীত প্রবন্ধ-গ্রন্থ "ধারাবাহিক"—২॥৹
শ্রীঅরকান্ত বক্সী প্রণীত নাটক "খুনী"—১।৹
শ্রীনিকুঞ্জ পত্রী প্রণীত "হে বান্ধবী মোর"—২৲
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত "প্রাচীন সাহিত্য"—দ্বিতীয় খণ্ড—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত